"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥১০৭॥

মাঘ • ১৪১১ • ১ম সংখ্যা

১০৭তম বর্ষ   উদ্বোধন কার্যালয়   কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন ॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ | ১ম সংখ্যা ● মাঘ ১৪১১ ● জানুয়ারি ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 'উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ মোট ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ মোট ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা (INR)। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। আমাদের ধারণা, স্থানীয় গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র থেকে বই নিলে আপনার সুবিধা হবে।

'চেক' সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে 'গ্রাহক-নবীকরণ' কিংবা 'পুস্তক ক্রয়' কিংবা 'মায়ের বাড়ির জন্য' কথাটি লিখবেন। টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

◆ যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

◆ গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি।

◆ শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর কৃপা হয়।

◆ ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

◆ ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এসব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

◆ সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।

◆ ঠাকুর সব সাধনা করেছেন। বলতেনঃ "আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।" 'ছাঁচে ঢালা' মানে ঠাকুরকে ধ্যান-চিন্তা করা। ঠাকুরকে ভাবলেই সব ভাব আসবে। তিনি যেসব করেছেন তা চিন্তা করা। ঠাকুর বলতেনঃ "আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না।" তাঁর নিজ মুখের কথা। তাঁকে স্মরণ করলে কোন দুঃখ থাকে না।

◆ বাসনা থেকেই সব। বাসনা না থাকলে কিসের কি? নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি [মুক্তি] হয়।

◆ ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে। কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেকরকম চিন্তা আসতে পারে।

◆ এ কলিতে শুধু সত্যের আঁট থাকলেই ভগবানলাভ হয়। ঠাকুর বলতেনঃ "যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।"

◆ যখনি যাকিছু আহার করবে, তা ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করবে। তাহলে রক্ত শুদ্ধ হবে, রক্ত শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হবে।

◆ ভয় কি বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?

◆ আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।

◆ মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ কর, মুখটি তখনি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষটি দেখে। গুণটি দেখা চাই।

◆ যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।

শ্রীমা সারদাদেবী

মায়ের 'ম্যানেজমেণ্ট'

সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও প্রাসঙ্গিকতা লইয়া আলোচনাসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই আলোচনায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই উঠিয়া আসিয়াছে। বিগত বৎসর দক্ষিণ ভারতে শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে বিশাল রথযাত্রা আয়োজিত হইয়াছিল, তাহাতে যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়াছিল এবং ২০০৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে ভক্তবৃন্দের যে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষিত হইয়াছে—সেসব পর্যালোচনা করিলে 'শ্রীশ্রীমায়ের প্রাসঙ্গিকতা' লইয়া প্রশ্ন করিবার বিশেষ অবকাশ থাকে না। তবে ইহাও সত্য যে, মা নিজের গুণেই প্রাসঙ্গিক—আমরা মায়ের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে যতই সভাসমিতি করি না কেন, উহার বিশেষ মূল্য নাই। ভারতবর্ষের আপামর জনমানসে চির অবগুণ্ঠিতা মা যেন আজ সত্যই অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিয়া নয়ন মেলিয়াছেন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ হইতে শুরু করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীশ্রীমায়ের নামে একত্রিত হইয়া সর্বত্র জয়ধ্বনি করিতেছে এবং এই জন্মমহোৎসব উপলক্ষ্যে যেসব ঘটনা ঘটিতেছে তাহা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে একথা সহজেই অনুভূত হয় যে, বর্তমান যুগলক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের গ্রহণযোগ্যতা যেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী অপেক্ষা অধিকতর এবং ইহাও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে নারীজাতি ক্রমশ সুসংগঠিত হইতেছে ও তাহাদের মনে ভারতবর্ষের নারীজাতির আদর্শ ক্রমশ সুস্পষ্ট ধারণায় রূপান্তরিত হইতেছে। উক্ত আলোচনাসভায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রাসঙ্গিকতার আরেকটি অভিনব দিক উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। উহা শ্রীশ্রীমায়ের 'Management' (ব্যবস্থাপনা), যাহা একেবারে আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী প্রকটিত। 'Administration' (প্রশাসন) শব্দটি অপেক্ষা 'Management' শব্দটি ব্যাপকতর। সেপ্রসঙ্গে আসিবার পূর্বে বর্তমান যুগলক্ষণ কি, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

যদিও যুগলক্ষণ পরিবর্তনীয়, তথাপি পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় এই যুগেও কয়েকটি শুভলক্ষণ এবং কয়েকটি মন্দ লক্ষণ বিদ্যমান। মন্দ লক্ষণগুলির মধ্যে প্রথম ঃ বস্তুবাদী চরিত্র। ইহা যদিও ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে ছিল, তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষাগুণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তা থাকিতে পারে, ইহা পাশ্চাত্যবাসীর ধারণা নাই। তাহারা সর্বোচ্চ 'মন' (mind বা soul) পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে দার্শনিকের সংখ্যা কম এবং তাঁহাদের দর্শনচিন্তা আপামর পাশ্চাত্যবাসীর নিকট খুব কমই পৌঁছিয়াছে। বৃহত্তর জনসাধারণ অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবনযাপন করিয়া থাকে! ঐ তরঙ্গের অভিঘাত ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতেছে এবং ভারতের মেট্রো শহরগুলিতে মানুষের ক্রমবর্ধমান ভোগপরায়ণ জীবনযাত্রা এই কথারই প্রমাণ দিতেছে। এইসকল ভোগবাদী মানুষের নিকট 'ভগবানলাভ জীবনের উদ্দেশ্য' কথাটি হয়তো কথঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করে!

দ্বিতীয়ত, গোঁড়ামি। অর্থাৎ মৌলবাদী চিন্তাভাবনা। যদিও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব উন্নতি হইতেছে, তথাপি ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উদারতা ক্রমক্ষীয়মাণ। এবং এই গোঁড়ামি পরিণতিলাভ করে অসহিষ্ণুতায়। অসহিষ্ণুতার ফল হিংসা-দ্বেষ, যাহার ফলে মানুষ বন্য পশু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। বন্য পশুরা নিজেদের ক্ষুধানিবৃত্তির বাহিরে কিন্তু হিংসা প্রায় করে না বলিলেই চলে। মানুষের মনের অর্থলিপ্সা, যশোলিপ্সা, ক্ষমতালিপ্সা তাহাকে পশ্বধম করিয়া তুলে। যেন-তেন-প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে বিনাশ করাই তাহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মনোভাব ক্রমশ সাহিত্যে, শিল্পে, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে সাধারণ মানুষের সম্মুখে আজ বিরাট এক প্রশ্ন ঃ "কোন্ পথটি সঠিক?" ধর্মের দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের মানুষ এখনো ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ভুলে নাই। পরমপুরুষার্থ হিসাবে মুক্তির ধারণা এখনো তাহার রক্তে বিদ্যমান। তাই তাহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা—"কোন্‌টি ঠিক পথ?" ইহা নির্ণয় করা। এইক্ষণে জাগ্রত-বিবেক হইয়া মন বলিয়া উঠিতেছে ঃ "এই ইহসর্বস্বতা, এই কাপুরুষতা, এই ইন্দ্রিয়লালসা তোমাকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইতেছে; এই সবই ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় দিব্যলোকের সন্ধান কর, নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে অতিক্রম করিয়া চিরন্তন জ্যোতির্ময় আত্মসত্তার সাক্ষাৎকার কর।" আর পরক্ষণেই হতচেতন হইয়া সেই মনই বলিয়া উঠিতেছে ঃ "দেখ নয়ন মেলিয়া, হে মূর্খ, ঐসব আসুরীবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ কেমন মহানন্দে জগৎকে সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে—রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে। হে বুদ্ধিমান, ইন্দ্রিয়াতীত কোন কাল্পনিক সত্তার অনুসন্ধান না করিয়া অপরাপর স্বার্থচেতা মানুষ যাহা করিতেছে, তাহাই কর। জীবনকে উত্তমরূপে সম্ভোগ করিবার কালে 'দয়া-দান-ধর্ম' ইত্যাদি কিঞ্চিৎ রাখিলে মন্দ হয় না। কারণ, এই 'দয়া-দান'-এর সৌগন্ধ জীবনের নানাবিধ সম্ভোগকে আরো উপাদেয় করিয়া তুলিতে পারে!" এইপ্রকার সংশয় আসিয়া বিবেকীর হৃদয় অধিকার করিতেছে। তাহার জীবনের এই দোদুল্যমানতা-জাত অশান্তির অগ্নি নির্বাপণ করিতে পারেন আমাদের সকলের 'মা'। ইহা আবেগপ্রসূত কোন কথা নহে, যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত! কেন, তাহাই সংক্ষেপে আমাদের আলোচ্য।

বর্তমান যুগলক্ষণ কী তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন অতি সহজভাবে। তাঁহার বাণী বিশ্লেষণ করিলেই আমরাও সহজে ইহা বুঝিব। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য; যত মত তত পথ; চালকলাবাঁধা বিদ্যা আমি চাহি না; মন-মুখ এক করাই এযুগের তপস্যা; যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে। অর্থাৎ প্রথম যুগলক্ষণ, কাম-কাঞ্চনাসক্তি; দ্বিতীয়, জীবনে ঈশ্বরলাভই চরম উদ্দেশ্য—ইহার বিস্মরণ; তৃতীয়, গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতা; চতুর্থ, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য অর্থ ও ভোগবাদ; পঞ্চম, মন ও মুখের মিল নাই অর্থাৎ নির্বিচারে মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচার। এইসব অভ্যাস ও চিত্তবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি শ্রদ্ধাহীনতা। অথচ 'শ্রদ্ধা' না থাকিলে কোন ব্যক্তিমানুষ কিংবা কোন সমাজের কখনো কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও ধর্মীয় গোঁড়ামি বা মৌলবাদ সমাজে অল্প-স্বল্প নহে, ব্যাপকাকারে বিদ্যমান। এমনকি স্বনামধন্য বিজ্ঞানী পর্যন্ত ধর্মীয় মৌলবাদের শিকার হইতেছেন। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক গোঁড়ামি বৃদ্ধি পাইয়া একথা বুঝাইয়া দিতেছে যে, সমাজের একটি অংশ এই গোঁড়ামি বা মৌলবাদের আশ্রয়রূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কুসংস্কাররূপ বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"যত মত তত পথ।"

স্বামী বিবেকানন্দ চাহিতেন, এই দেশ সর্বপ্রকার তামসিকতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে রজোগুণে উন্নীত হউক। পরে সমষ্টিগতভাবে সত্ত্বগুণ আসিবে। আমাদের পরিপার্শ্বে রজোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে। মানুষ এখন খুবই ব্যস্ত। তাহার সময় নাই। এমনকি নিজ পুত্রকন্যাকেও একটু সময় দিয়া লালন করিতে পারে না। গ্রামের দিকে চিত্রটি ঠিক এরূপ নহে। তথাপি রজোগুণ গ্রামাঞ্চলেও বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। উন্নয়নের চেষ্টা এবং কিছুটা সাফল্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। সকলে মিলিয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালামের 'স্বপ্নের ভারত ২০২০' হয়তো বাস্তবায়িত হইতেও পারে।

আধুনিক যুগের আরেকটি বিশেষত্ব হইল—Team Work বা দলগত প্রচেষ্টা। এই চারিত্র্যটি মন্দ কাজে ব্যবহার অনেকেই করিতেছে। তথাপি ইহাকে শুভ কাজে প্রয়োগ করিলে দ্রুত উন্নতি হইতে পারে—সে-প্রমাণও আজ এদেশে ভুরি ভুরি পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়ত, Perfection বা পূর্ণতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ। কম্পিউটার মানুষকে সর্বব্যাপারে perfect হইতে শিখাইতেছে। কারণ, কম্পিউটারে সামান্য ভুল করিলেও উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত খেলাধুলা, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, মুদ্রণশিল্প এবং অন্যান্য যাবতীয় industry-তে এখন সকলেই perfection-এর জন্য সচেষ্ট থাকে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "Education is the manifestation of the perfection already in man."—শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। এবং ইহাও সত্য যে, যে যত perfect হইবে, তাহা যেকোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, সে ততই ঈশ্বরের সন্নিকটবর্তী হইবে।

চতুর্থত, মানুষের মনে যুক্তিপ্রিয়তার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যেকোন বিষয়ে মানুষ আজ কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজিতে চাহে। ইহার ফলে যে 'সংশয়'-এর উদ্রেক হয়, তাহা চলার পথে একটি অবশ্যম্ভাবী অবস্থামাত্র। অনেকেই অত্যন্ত সংশয়যুক্ত মন লইয়া বিব্রত। কিন্তু এই অবস্থাটি মধ্যবর্তী অবস্থা। বেদান্তের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে সংশয় আসিতেই পারে। কিন্তু মন যদি যুক্তিনির্ভর পথে অগ্রসর না হয়, বেদান্তসিদ্ধান্ত সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং আধুনিক মানুষের এই যুক্তিপ্রিয়তা তাহাকে বেদান্ত বুঝিতে ও কর্মে পরিণত করিতে সাহায্য করে।

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রশাসনে এই সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার দৈবী শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাপীকে মুহূর্তে মুক্ত করিয়া দেন নাই, অথবা কাহাকেও মকদ্দমায় জয়ী হইতে সাহায্য করেন নাই, কিংবা চটকদারি কিছু দেখাইয়া জগতের নিকট হইতে সম্ভ্রম আদায় করিতে সচেষ্ট হন নাই। অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধি সহায়ে মা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূত তত্ত্বকে কি করিয়া দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করিয়া উপলব্ধি করা যায়, সেকথাই জগৎকে শিখাইয়াছেন। হতাশ নারীর জীবনে মা প্রজ্বলিত করিয়াছেন আশার প্রদীপ। সংসারদগ্ধ মানুষের দহ্যমান চিত্তে পরম শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়াছেন—অনাড়ম্বরভাবে। সেখানে কোন চটকদারি কিংবা হঠকারিতা নাই।

'শ্রমবণ্টন'—ম্যানেজমেণ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আবার সকলের মনের তুষ্টি বজায় রাখাও ম্যানেজমেণ্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রাধুর শ্বশুরালয়ে তত্ত্ব পাঠাইবার কালে প্রত্যেকবারই নলিনীদির মুখভার হইত। ভাল ভাল জিনিস সবই যদি তারা পায়, আমাদের জন্য কী থাকিবে? মা এই বৎসর নলিনীকেই বলিলেন, দেখ নলিনী, কি তোর পছন্দ, এইসব দেখেশুনে বল। এইবার নলিনী বলিল ঃ "ওতে কি করে হবে, পিসিমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক, আর রাধিটা তো একটা পাগল, জ্ঞানগম্য কিছুই নেই; কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে, তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, পিসিমা?" অতএব ভাল জিনিসগুলি নলিনী স্বহস্তেই তত্ত্বে রাখিল। প্রত্যেকের প্রাপ্য মর্যাদা মা তাহাকে দিতেন। ইহাও ম্যানেজমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ কথা।

ম্যানেজমেণ্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল Communication বা যোগাযোগ। কোনরূপ communication gap থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন পর্যালোচনা করিলে

সহজেই প্রতীত হয় তাঁহার অপূর্ব ম্যানেজমেন্টের অন্যতম চাবিকাঠি—দক্ষ যোগাযোগব্যবস্থা। লক্ষণীয়, তৎকালীন সমাজে ইলেকট্রিসিটি ছিল না, টেলিফোন ছিল না, ডাক-ব্যবস্থার সবে প্রাথমিক অবস্থা। কিন্তু মা নিজেও সব খবর রাখিতেন এবং যাহাকে যে-খবর দিবার তাহা প্রেরণ করিতেন।

মূলত ম্যানেজমেন্টে তিনটি ব্যাপার বিবেচ্য—Man, Material এবং Money অর্থাৎ মানুষ, ব্যবহার্য দ্রব্যসকল এবং অর্থ। এই তিনটি ক্ষেত্রেই মা অপূর্ব দক্ষতায় সংসারের কাজকর্ম করিতেন। সকলকে লইয়া একসঙ্গে কিভাবে চলিতে হয় তাহা মা শিখাইয়াছেন। এদিকে পাগলী মামী, রাধু, নলিনী, মাকু, ওদিকে মামাদের অনির্দিষ্টকালের ঝগড়া, অন্যদিকে বিচিত্র ভক্তসমাগম এবং সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যতপ্রকার জটিল সমস্যা! মায়ের সব হিসাব থাকিত। টাকাপয়সার হিসাব রাখিতেন মা। রাঁচির ইন্দু অমুক তারিখে অত টা কা পাঠাইবে, ঐ টাকায় অমুক দেনাটুকু মিটাইব ইত্যাদি। Material-এর মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর উভয়কে ধরিতে হইবে। জমি-জায়গার ব্যাপারে মায়ের অদ্ভুত দূরদর্শিতার বহু উদাহরণ আছে।

চতুর্থত, যেকোন ম্যানেজমেন্টে একটি নির্দিষ্ট দর্শন বা philosophy থাকে, নতুবা পুরো ব্যাপারটিই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীমা নিজের দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সংসার করিতেন। এবং যেকেহ সংশয়যুক্ত হইয়া সমাধানের জন্য তাঁহার নিকট আসিত, তাহাকে উপযুক্ত সমাধান প্রদান করিতেন। এমনকি যখন স্বামী বিমলানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীর সংশয় হইল যে, মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা চলিবে কিনা (কারণ, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পট রাখিয়া পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ), তখন মা স্পষ্ট করিয়া পত্র লিখিলেন ঃ "আমাদের যিনি গুরু তিনি অদ্বৈত, তোমরাও অদ্বৈতবাদী।" নিজের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁহার বোধ সর্বদাই স্বীয় অন্তরে প্রোজ্জ্বল থাকিত। এমনকি শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মায়ের সন্তানভাব।

পঞ্চমত, ম্যানেজমেন্টের লোককে যদি নীতি হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য কেহ চাপ দেয়, তাহার বশ্যতা স্বীকার না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদা কামারপুকুরে যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আবদার করিলেন সন্ন্যাস দিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই গিরিশকে একখানি গেরুয়া কাপড় দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দাবি যে ন্যায্য, ইহা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া নানা যুক্তিসহায়ে তিনি মাকে বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু মা প্রথমাবধি "না বাবা, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক"—বলিতেছিলেন। এবং শেষে গিরিশ পরাজয় স্বীকার করিয়া কলকাতায় ফিরিলেন।

মায়ের যুক্তিপ্রিয়তা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান মহারাজ একদা জয়রামবাটীর গোয়ালাকে বলিয়াছিলেন ঃ "টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই।" মা শুনিয়া বলিলেন ঃ "ও কি জ্ঞান! এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরিবে খেতে পায়। আর তুমি অমন করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা—সে তো জল দেবেই; দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশি পাবে বলে আরো জল মেশাতে চাইবে।"

কাজে perfection শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে সর্বদাই দেখা যাইত। রাত্রি দেড়টা-দুটোয় কেহ উঠিয়াছিলেন কোন কারণে। স্থান জয়রামবাটী। খুটখাট শব্দ শুনিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা মাটির বাড়ির মেঝেতে খুন্তিজাতীয় কিছুর সাহায্যে কিছু করিতেছেন। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন, বাবা, এখানে একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো মেঝেতে থেকে গেছে। কার পা-হাত কেটে যাবে এই ভেবে সেটিকে উপড়ে ফেলছি। দিনের বেলায় একাজ তো সকলের সামনে করা যায় না।

কোনরূপ আলস্য বা তামসিকতা মা কখনো পছন্দ করিতেন না। রজোগুণী মানুষকে মা ভালবাসিতেন। সত্ত্বগুণের তো কথাই নেই। অহর্নিশ সত্ত্বারূঢ়া জগজ্জননী যে সাত্ত্বিক মানুষকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিবেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তামসিকতাকে মা প্রশ্রয় দিতেন না। স্বামী শান্তানন্দের স্মৃতিকথায় আমরা পড়িয়াছি, মা বলিতেছেন ঃ "মন্দ কাজে সর্বদা মন যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময়ে উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না লাগায় আলস্যবশত করলুম না; তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।"

মায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সংসারে তিনি অশান্তি দেখিতেন না। মায়ের সংসার কেমন ছিল, নানান স্মৃতিকথা ও অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ হইতে আমরা জানি। সে-সংসারে অশান্তির পরিমাপ হয় না! অথচ মা বলিতেছেন ঃ "কই মা, তোমরা বল তোমাদের সংসারে অশান্তি। অথচ আমি তো কখনো সংসারে অশান্তি আছে বলে জানিনি।" আজ সমাজের দিকে তাকাইলে, ক্ষুদ্র সংসার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদাকার কর্পোরেট পর্যন্ত সর্বত্রই অশান্তির অশনিসঙ্কেত।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের 'ম্যানেজমেন্ট'-এর মূল প্রক্রিয়াটি ছিল 'নিঃস্বার্থপরতা'র আবরণে আবৃত। আবার এই নিঃস্বার্থপরতার অধিষ্ঠান তাঁহার সর্বগ্রাসী মাতৃত্বে। অর্থাৎ মায়ের নিকট সকলেই সন্তান। যেকোন 'ম্যানেজমেন্ট' যদি এই মাতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ফলশ্রুতিতে নিঃস্বার্থপরতা আপনাআপনি আসিবে। তখনি প্রশাসনের একটি আধ্যাত্মিক রূপ বিকাশলাভ সম্ভব হইবে। জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্ম অধ্যাত্মভাবনায় সম্পৃক্ত হইলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ঃ "এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে অন্য হাতে সংসারের কাজ কর। কাজ শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"—বাস্তবায়িত হইতে পারে। ❑

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র

।।১।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
17/9/27

শ্রীমান কামাখ্যাচরণ*,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বিবাহ এখন করিও না—মা বলিলেও না, তুমি একাই যতটা সম্ভব মার সেবা করিবে।

দীক্ষাদি এখন হইবে না। আমার শরীর, মন এখন উভয়ই খারাপ। এইরূপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লইয়া ঐসব কাজ করা চলে না। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে পরে যাহা হয় দেখা যাইবে। তুমি ঠাকুরের স্মরণ, মনন নিত্য করিবে এবং তাঁর কাছে খুব প্রার্থনা করিবে। তাঁর কৃপায় তোমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

।।২।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

Sett Villas
Madhupur
17/11/27
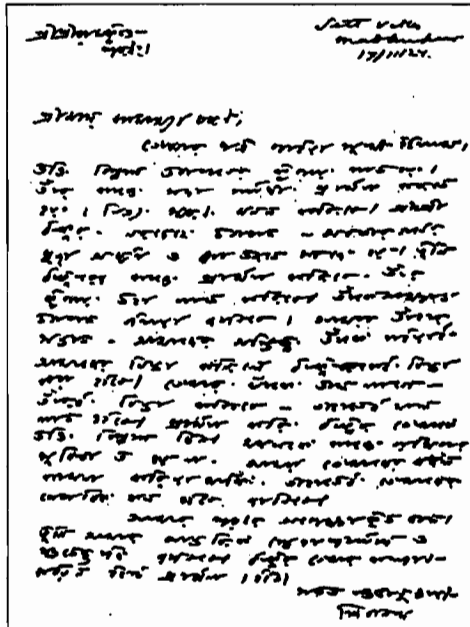
শ্রীমান কামাখ্যাচরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ভক্তি, বিশ্বাস ভগবানের কৃপায় লাভ হয়। তাঁর কাছে সদা সর্ব্বদা প্রার্থনা করতে হয়। নিত্য স্মরণ, মনন করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর নরদেহে ভগবান—অবতারগণের পূজা অর্চ্চনা ও ধ্যানভজন সহজে হয়। তুমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিবে—তাঁর কৃপায় উহা লাভ করিবে। তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানিবে। আমরা তাঁহার সন্তান—আমাদের অস্তিত্ব তাঁকে লইয়াই। আমাদের চিন্তা করিলে ঠাকুরকেই চিন্তা করা হইবে। তোমার যাঁকে ভাল লাগে—তাঁরই চিন্তা করিবে, তাহাতেই ফললাভ হইবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দিন। সকলকে কাছে রাখিবার সুবিধা তো হয় না, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি, তাহাতেই তোমাদের সেবা[য়] ঠিক ফল হইবে জানিবে।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

* ঢাকা-নিবাসী কামাখ্যাচরণ সরকার ১৯২৭ সালে মহাপুরুষ মহারাজের কৃপালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতেন। কর্মজীবনে যখনি সুযোগ হতো, মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনলাভের জন্য তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসতেন। পরিবারের সদস্যদের তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়বার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ৪ মার্চ সামান্য রোগভোগের পর প্রায় ৮১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অধুনা মগরা (হুগলি)-নিবাসী অম্লানকান্তি সরকারের সৌজন্যে পত্র-দুটি প্রাপ্ত।—সম্পাদক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ*

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১॥

শ্লোকার্থঃ *শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! ভক্ত যদি সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হইয়া আমাতেই মনোনিবেশ-পূর্বক যোগাভ্যাস করে তাহা হইলে আমার বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্য সবই পূর্ণরূপে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিবে। সেকথাই এখন শ্রবণ কর।*

ব্যাখ্যাঃ ময়াসক্তমনাঃ = আমাতে (ঈশ্বরে) প্রবল অনুরাগসম্পন্ন ব্যক্তি। দেখা যায়, প্রতি কার্যেই সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে ষোল আনা জ্ঞান এবং টান না থাকিলে কার্যসিদ্ধিতে বিঘ্ন হয়, বিলম্ব হয়। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পথের প্রথম কথা ভগবান বলিলেন, আমাতে প্রবল অনুরাগ থাকা দরকার।

ভগবানের সঙ্গে যোগ করিবার কালে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার বিভূতি, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতেও সাধকের মন কখনো কখনো ধাবিত হয়। ভগবানের ঐশ্বর্যাদিতে মন ধাবিত হইলে অনেক সময় তাঁহার নিজের প্রতি আকর্ষণ একটু কম হইতে পারে। বৈষ্ণবরা বলেন, মর্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহপূর্ণ আচরণে। সাধককে সাবধানে থাকিতে হইবে, ভগবানের উপর টান আছে, না ঐশ্বর্যের মর্যাদার উপরই মন পড়িয়া আছে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (যেমন ব্রাহ্মরা বলিতঃ 'হে ভগবান তুমি ফুল, ফল করিয়াছ...' ইত্যাদি।)

ভগবানের উপর প্রীতি অবিচল থাকিলে মন সর্বদা তাঁহাতেই যুক্ত থাকে। সুতরাং ভগবানের ঐশ্বর্য মাধুর্য ষোলো আনাই জানিতে বুঝিতে পারা যায়। যেমন, কোন একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন বাস করিলে তাঁহার অন্তরের বাহিরের সব ব্যাপারই জানা যায়, ইহা ঠিক তদ্রূপ। খুব ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা করিলে শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়াও ভগবানের বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়িলে সেকথা সহজেই বোধগম্য হয়।

[**মন্তব্যঃ** শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'মদাশ্রয়ঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া। যে ঈশ্বরের শরণাগত, সে কোন জাগতিক বস্তুর উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, দান, তপস্যা বা অন্য কোন পুণ্য কিংবা পাপাদি কর্মের ফলের আশ্রয় সে করে না। কেবল ঈশ্বরই তাহার পরম আশ্রয়।—**সম্পাদক**]

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥২॥

শ্লোকার্থঃ *তোমাকে আমি নিঃশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপায় নির্দেশ দিব। তাহা জানিলে এই শ্রেয়োমার্গে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকিবে না।*

ব্যাখ্যাঃ এই অধ্যায়ে ভগবান ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বসকল (theory) বলিবেন এবং তাহার অনুশীলনের (practice) বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবেন।

[**মন্তব্যঃ** মুণ্ডক উপনিষদেও (১।৩) এইরূপ বলা হইয়াছে—শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কী সেই বস্তু যাহাকে জানিলে সবকিছু জানা যায়? ঋষি উত্তর দিবেন, সেই বস্তু কী, যাহার দ্বারা 'তদক্ষরমধিগম্যতে'—সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়।—**সম্পাদক**]

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৩॥

শ্লোকার্থঃ *[আত্মজ্ঞান লাভ অতি দুর্লভ, সেইকথা শ্রীভগবান বলিতেছেন,] সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে। সেইরূপ প্রযত্নশীল মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তত্ত্বত আমাকে (ঈশ্বরকে) জানিতে পারে।*

ব্যাখ্যাঃ এই জগতের ব্যবস্থা এমন যে, মানুষের মন কিছুতেই জগতের অতীত অথবা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর ধারণা

* *ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।*

করিতে পারে না। মানুষ সুখের আশায় জীবন কাটায় কিন্তু এই জগতে যে স্থায়ী সুখ পাওয়া অসম্ভব, তাহা কিছুতেই বুঝে না। বহুজন্ম দুঃখভোগ করিতে করিতে এবং চিরকাল সর্বদেশে প্রচলিত মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিতে শুনিতে কাহারো মনে ভগবানলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু জগতে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ লোক খুবই কম। কোন জ্ঞানীর মুখে না শুনিলে ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝা সম্ভব হয় না। তাহার উপর সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি ও ইচ্ছা মানুষের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। তাই ভগবানের বিষয়ে (ছিটেফোঁটা কোন একটা ব্যাপারে ভাব বা অনুভূতি) একটু জানাইবার জন্য সিদ্ধপুরুষগণ লোককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতেই ছোট ছোট ধর্মের দল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এক দল আরেক দলের সহিত কলহ করিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করে—ভগবানের বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না। মানবজাতির এই অবস্থা দূর করিবার জন্য মনে হয় জগতে শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহাতে যথার্থ উপকৃত হইতেছে। ভগবানের তত্ত্ব সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে জানাইবার জন্য এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল উপদেশ না দিয়া নিজে আচরণ (demonstration) করিয়া ধর্মের সারতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফল কয়েক পুরুষ না যাইলে বুঝা কঠিন। কিন্তু এখন তো দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরাতন পুরুষ বা ব্যক্তি-ভগবান (personal God)-রূপেই লোকে গ্রহণ করিতেছে।

[মন্তব্য : কেবল ধর্ম নহে, বস্তুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই 'মনুষ্যানাং সহস্রেষু...' ইত্যাদি প্রযোজ্য। পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের মধ্য হইতে নিউটন কিংবা আইনস্টাইন অথবা স্টিফেন হকিংসরা সংখ্যায় অতি অল্প।—সম্পাদক]

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥৪॥

শ্লোকার্থ : *ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে আমার (ঈশ্বরের) ঐশ্বরিক মায়াশক্তি বা প্রকৃতি বিভক্ত।*

ব্যাখ্যা : স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর মানবজীবনের কর্মক্ষেত্র। এই স্থূল-সূক্ষ্মে নির্মিত এই দেহের মাধ্যমে জগৎপ্রপঞ্চ অনুভব করিয়া জীবাত্মা জীবন সম্ভোগ করেন।

[মন্তব্য : স্থূলশরীর = অন্নময় কোশ অর্থাৎ এই অন্ন-নির্ভর রক্তমাংসের খাঁচা। সূক্ষ্মশরীর = প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ অর্থাৎ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। এক্ষেত্রে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে পূজনীয় মহারাজ সাধারণভাবে সূক্ষ্মশরীর বলিয়াছেন। এইসব লইয়া 'জীব'। জীবের জন্য জগৎ। ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ লইয়া এই বাহ্যপ্রকৃতি নির্মিত। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম-রূপে জীব ও জগৎ অস্তিত্ববান। —সম্পাদক]

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥৫॥

শ্লোকার্থ : *[অপরাপ্রকৃতির কথা বলিয়া এক্ষণে ভগবান শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কথা বলিতেছেন :] হে মহাবাহো, এই যে প্রকৃতির কথা বলিলাম, তাহা আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি। এতদতিরিক্ত জীবরূপা আত্মভূত বা চেতনাত্মিকা আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে।*

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত জীবনলীলা সম্ভোগ করিবার জন্য ব্রহ্ম ঐ লীলাক্ষেত্রসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি যেন বহুভাবে বিভক্ত হইলেন।

এই লীলাক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রী মিলিয়াই জীবনলীলা চলিতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র; সেইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞই প্রধান। অন্যদিকে ক্ষেত্র জড়বস্তুতে নির্মিত; তাই তাহা অপ্রধান। ক্ষেত্রী না থাকিলে ক্ষেত্রের কোন প্রয়োজনই থাকে না; ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষেত্র থাকে। প্রকৃতি = কারণ (source, cause)। যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে কোনকিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার প্রকৃতি। যেমন টেবিল-চেয়ারের প্রকৃতি কাঠ।

ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে, জীব ব্রহ্মেরই অংশ। সৎ-চিৎ-আনন্দময়। কিন্তু তিনি এই শরীরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন বলিয়া অপরিণামী হইলেও তাঁহাকে পরিণামী বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য অপরিণামী ব্রহ্মকে এখানে পরিণামী প্রকৃতি 'জীবভূত' বলা হইয়াছে।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥৬॥

শ্লোকার্থ : আমার এই দুই প্রকৃতি হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ এবং চেতনভূতবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে—এইটি ধারণা কর। আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতিদ্বয়ের সাহায্যে আমিই এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ-কর্তা।

ব্যাখ্যা : আমাদের সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে একটা জড় যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাঁহার একটা অংশ দ্বারা সেই যন্ত্র চালাইয়া যেন একটি খেলা করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছামাত্র এই জড়-চেতন সৃষ্ট হয়—যেমন জল আন্দোলিত হইলে তাহাতে ঢেউ উঠে; কতকক্ষণ খেলা করিয়া ঢেউ আবার বিলীন হইয়া যায়। এই জীব ও জগৎ ঠিক তেমনি তাঁহা হইতেই জন্মায়, তাঁহাতেই খেলা করে, আবার তাঁহাতেই মিশিয়া যায়।

[মন্তব্য : যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, উহাই সেই বস্তুর 'প্রভব'। প্রলয়কারণ = সংহারকর্তা।—সম্পাদক] [ক্রমশ]॥ ছাব্বিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

উদ্বোধন

মাঘ ১৩১১
জানুয়ারি ২০০৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

প্রথম প্রস্তাব

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যেসময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন—সেই সময় ভক্তেরা কথাপ্রসঙ্গে কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সেসকল কথা বারবার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেকবার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বারবার শুনিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইত না এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি—এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে।...

রামবাবুর [রামচন্দ্র দত্ত] সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত—এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রামদাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।...

খ্যাপার কথা রামদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিচয় পাইলেন—খ্যাপা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।... তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে।... এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।... স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ। সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন।... গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন।... একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন, "শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিতে আসিস?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরুশিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন, "ও তোমার মাথার ব্যারাম!"...

বৈজ্ঞানিক তর্কযুক্তি সিদ্ধ বিশ্বাসের নিকট কোনরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন, "না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ।...

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে... গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন, "জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর।..."

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যেসকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এবিষয়ে সন্দিহানচিত্ত। পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম। এই মাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহা ভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাব ধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ ভক্তিবিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন—জ্ঞান, ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান ভক্তি এক; জ্ঞান বিবেকানন্দ, ভক্ত পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত ভক্ত ভগবান", তাহা সত্য।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজী ১৮ জুলাই ১৯৬৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৯—এই বছর দেড়েকের মধ্যে আমেরিকা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ২৪টি দেশে প্রায় ৯৫০টি বক্তৃতা দেন, যার মধ্যে কিছু প্রশ্নোত্তর-পর্বও ছিল। দেশে ফেরার পর কলকাতার 'অদ্বৈত আশ্রম'-এর অধ্যক্ষসহ অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ আড়াই ঘণ্টা ধরে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যেটি পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মহারাজজী পরে তাঁর উত্তরগুলিতে স্বয়ং কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দেন। সেটিকে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' প্রকাশ করে 'A Traveller Looks at the World' শিরোনামে। 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান রচনাটি সেই সম্পাদিত সাক্ষাৎকারেরই ভাষান্তর। ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

আগ্রহী পাঠক লক্ষ্য করবেন, কয়েকটি আলোচনা ও মন্তব্য মূলত আমেরিকার প্রসঙ্গেই করা হলেও সেগুলি সাধারণভাবে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটেই প্রযোজ্য। প্রায় ৩৫ বছর আগের এই প্রসঙ্গগুলিতে বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট ও সমাধান প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ও বক্তব্য যেভাবে ব্যাখ্যাত ও উপস্থাপিত হয়েছে, তার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান কালে কিছুমাত্র কমেনি, বরং মনে হয় বেড়েছে।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *পাশ্চাত্যের মানুষের কোন্ কোন্ প্রবণতা আপনার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে এবং কোন্‌গুলিতে আপনি সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছেন ও কেন?*

উত্তর ঃ পাশ্চাত্যে, বিশেষত আমেরিকায় আমি যখন প্রায় দেড় বছর কাটিয়েছি, তখন অনেকগুলি ব্যাপার আমার রীতিমতো ভাল লেগেছে, যা যেকোন বহিরাগত লোকেরই ভাল লাগবে। সেখানকার লোকেদের প্রচণ্ড কর্মশক্তি, কঠোর পরিশ্রম, তিলে তিলে গড়ে তোলা অসাধারণ ঐহিক সম্পদ ও সমৃদ্ধি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি—এগুলি যেকোন মানুষের চোখে পড়তে বাধ্য।

আবার, আপনার প্রশ্নে যে-ইঙ্গিত আছে—সেটাও সত্যি। এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা বাইরের যেকোন মানুষকে বিচলিত করবে, পীড়া দেবে। তার মধ্যে অবধারিত একটি হলো—বস্তুতান্ত্রিকতা বা ইহলোক-সর্বস্বতার একচ্ছত্র উপস্থিতি ও আধিপত্য। বর্তমান আমেরিকান সভ্যতায় লোকে যে-দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখে—মানুষ হলো কেবল ইন্দ্রিয়চালিত খণ্ড খণ্ড কয়েকটি অস্তিত্ব। এই দর্শন মানুষের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকেই তার উচ্চতম এবং একমাত্র আদর্শ বলে তুলে ধরে। বলা যেতে পারে, বস্তুতান্ত্রিকতার এ হলো জঘন্যতম এক রূপ। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে আমেরিকা এই বস্তুতান্ত্রিকতাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছে। তাদের দৃষ্টিতে মানুষ হলো শুধুই একটা দেহ এবং জৈব পরিতৃপ্তিই হলো শেষ কথা। প্রথমদিকে এই দর্শনের মধ্য দিয়ে ভালই ফল ফলেছিল। মানুষ হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল। জাগতিক ব্যাপারে সে নিজেকে সুন্দরভাবে মেলে ধরতে পেরেছিল। পরে পশ্চাতে কিন্তু এ-ব্যবস্থার দোষগুলি ফুটে উঠতে আরম্ভ করল।

এই দোষ থেকেই এসেছে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা, যার কথা আজকের আমেরিকানরাই বলে থাকেন, যথা—যৌনতা, অপরাধপ্রবণতা এবং অন্যান্য নানা দুষ্ট বিস্ফোরণ। ... এটা খুবই চিন্তার বিষয়। পাশাপাশি, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরূপে নারীর মহিমাও আজ উপেক্ষিত।...

এইসব ব্যাপার যেকোন পর্যটককে আহত করে। তার মনে হয় যে, আমেরিকান সমাজ তার আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দিশা—দুটোই হারিয়েছে। ভারতীয় পর্যটকের এটা আরো বেশি করে মনে হয়, কারণ ভারতের রয়েছে এক সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক পটভূমিকা এবং মানব-ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুগভীর বোধ ও চেতনা।

তবে, এসব জিনিস আমি দেখেছি বইপত্র, টিভি ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে ওদেশের মানুষের যেসব যোগাযোগ হয়েছে, সেগুলি কিন্তু ছিল বিশেষ মূল্যবান। কারণ, সেখানে আমি পেয়েছি আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যথা—ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ঈশ্বরভক্ত মানুষজন ও সাদাসিধা নাগরিকদের।

প্রশ্ন ঃ *যেসব দেশে আপনি গেছেন, সেখানে কি এমন কিছু বুদ্ধিজীবীকে পেয়েছেন যাঁরা একটা ব্যাপারে সচেতন যে, বিশ্বের মূল সমস্যাটি হলো মানুষের পুনর্নির্মাণ? যদি তা-ই হয়, তবে তাঁরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?*

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এইরকম কয়েকজন সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। সেটা যে শুধু এবারের আমেরিকা সফরেই হয়েছে তা নয়, এর আগে যখন ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গেছি, তখনো হয়েছে। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা আধুনিক সভ্যতায় মানুষের পতন দেখে আন্তরিকভাবে ব্যথিত।

তবে, একটি ব্যাপার আমি পাশ্চাত্যে লক্ষ্য করেছি—মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা সেখানে খুবই কম। সেখানে এমন কোন দর্শন নেই, যা মানুষকে তার ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমকারী এক সত্তারূপে দেখার দৃষ্টি আমাদের প্রদান করে। এখন তারা এইরকম একটি দর্শনের সন্ধান করছে; যদিও একথা সত্য যে, বিষয়টিকে ঠিকমতো

হৃদয়ঙ্গম করতে তাদের অসুবিধা হয়। এই কারণে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি—বিশেষত আমেরিকায়—সেটা হলো, যতক্ষণ কোন লেখক বা বক্তা সমসাময়িক সমাজের অসম্পূর্ণতার কথা নিয়ে আলোচনা করেন, ততক্ষণ সেটা বেশ ভালই চলে; কিন্তু যেই তিনি তার সমাধান বাতলাতে যান, তখন প্রায়ই রোগের থেকে ওষুধ আরো ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য মানবীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে এটি বিশেষভাবে সত্য। আসলে, মানবচরিত্র সম্বন্ধে যেসব তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা কাজ করেন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তা অতি সীমাবদ্ধ। আর ঠিক এইখানেই ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্যকে কিছু সঞ্জীবনী বস্তু প্রদান করতে পারে। ভারতীয় ভাব কখনো কিছু করণীয় ও অ-করণীয়ের তালিকামাত্র মেলে ধরে না; এই ভাব মানুষের বৃদ্ধি ও বিবর্তনের এক নতুন রাস্তা তৈরি করে দেয়, মানুষকে তার মর্যাদা ও মহিমার এক নতুন দর্শনে উদ্বোধিত করে। এটিই হলো বেদান্তদর্শনের বিরাটত্ব, এবং এইভাবে উপস্থাপিত হলে বিষয়টি সমস্ত উন্নত দেশের চিন্তাশীল মানুষের তাৎক্ষণিক শ্রদ্ধা ও সমাদর অর্জন করে।

প্রশ্ন ঃ *আমেরিকার চিন্তানায়কেরা কি আজ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, সেদেশে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক বাণীপ্রচার প্রকৃত অর্থে 'প্রফেটিক' ছিল? অন্যভাবে বললে, একথা কি আজ বোঝা গেছে যে, বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিতে গিয়ে স্বামীজী যে আসলে সে-জাতিকে তার এমন সব সমস্যার সমাধান দিয়ে এসেছিলেন, যেগুলি পরে দেখা দিয়ে বর্তমানে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে?*

উত্তর ঃ হ্যাঁ, স্বল্পসংখ্যক কিছু চিন্তাশীল মানুষের মনে ধীরে ধীরে আজ এই স্বীকৃতি-ভাবনা আসছে। কিন্তু আজ থেকে ৭৫ বছর আগে আমেরিকার সংস্কৃতি ও সমাজ নিয়ে চার বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দ যে নিবিড় বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করেছিলেন, সাধারণভাবে আজ তার বিশেষ কোন চোখে-পড়ার মতো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এটা স্বাভাবিক। কারণ, জীবনকে অতি গভীরে এবং অতি নিশ্চিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেসব সঞ্জীবনী প্রভাব, তাদের কোনটিই প্রাথমিক অবস্থায় ওপর-ওপর কাজ করে না; তারা মূলে পৌঁছে সেখান থেকেই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তাই স্বামীজীর প্রভাব খুঁজতে হবে আমেরিকান জীবনের গভীরতর স্তরে, এবং সেখানে সে-প্রভাবের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা খুঁজে পেতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

১৮৯৩-তে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাবের ঠিক পরের দশকগুলিতে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল। বর্তমানে কিছু চিন্তাবিদ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আজ যেসব বৈপ্লবিক চিন্তাধারা খ্রিস্টান চার্চগুলিকে আন্দোলিত করে চলেছে ও তাদের মধ্যে যে প্রগতিবাদী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা আসলে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারারই অনুবর্তী। প্রথম শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি সম্প্রতি যে ধর্মীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করে, তাতে একজন ক্যাথলিক নেতা—শিকাগোর দ্য পল (ক্যাথলিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ফাদার রবার্ট ক্যাম্পবেল—এই দৃষ্টিকোণ সমর্থন করেন। ঐ সভায় তিনি খ্রিস্টধর্মে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের বর্তমান সঙ্ঘাতের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিশেষভাবে ক্যাথলিসিজমের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন ('Where Religions Meet', 'Prabuddha Bharata', December 1968)—

"আজ থেকে দশবছর আগে এই বক্তৃতাটি দিলে আমি খ্রিস্টধর্মের এক আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরতাম।... কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তার পর থেকে খ্রিস্টধর্মে এমন এক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, যা তার ইতিহাসে হীনতম।... ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে এসেছে দুটি ধারা—প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী।... প্রাচীনপন্থীরা বলছেন, যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর এবং অ-দ্বিতীয়। এক নিঃশ্বাসে আর কোন নাম তাঁর সঙ্গে উচ্চারণ করা চলে না। কিন্তু নব্যপন্থীরা এব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন; তাঁদের বক্তব্য—যিশুখ্রিস্ট ঐশ্বরিক—একথা সত্য, কিন্তু আমাদের যেকেউই ঐশ্বরিক হয়ে উঠতে পারি। এবং এখানে অবশ্যই হিন্দুর সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিশেষভাবে সুর মিলছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান। উদারপন্থী খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির সহমর্মী। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় যে, অনেক বিষয়ে আপনারা দেখবেন, উদারপন্থী খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি তার দর্শনের অনেকাংশে প্রাচ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে—নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরভাবনা ও সকলের অন্তর্লীন দেবত্ব—এই দুই বিষয়েই।

"মানুষের প্রতি মনোভাবেও একই কথা প্রযোজ্য—উদারপন্থীদের মতে, প্রাচীনপন্থী খ্রিস্টীয় ভাবনায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করছিল মানুষের আদিম পাপ ইত্যাদি গোঁড়া তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন এক নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রগতিপন্থী খ্রিস্টধর্মের কাছে এই ভাবনা ভীষণ আপত্তিজনক, কারণ তা মনে করে যে, প্রশিক্ষণ ও যথাযথ শিক্ষার সাহায্যে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত করে তোলা যায়।

"জগতের প্রতি মনোভাবেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য আছে। প্রাচীনপন্থীরা জগৎকে এক বিপজ্জনক শত্রু বলে মনে করেন। উদারপন্থীরা ভাবেন, এটা মস্ত ভুল। তাঁদের

মতে, জগৎকে উন্নত করে তোলা যায় এবং আমাদের উচিত স্বর্গে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল না হয়ে এই পৃথিবীতে আরো মানবীয় একটি সমাজ গড়ে তুলতে নিজেদের নিয়োগ করা।

"রোমান ক্যাথলিক চার্চে বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিদ্রোহ এগিয়েছে বিশেষ কিছু ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, যেমন—পোপের অভ্রান্ততা, স্বর্গ-নরক ভাবনা এবং আরো অন্য অনেক গোঁড়া তত্ত্ব। উদারপন্থী সম্প্রদায় বলে, 'ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি সেকেলে চিন্তাধারা নিয়ে মাথা ঘামিও না; এস, গড়ে তুলি পারস্পরিক সংহতি, গড়ে তুলি অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক।' আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাথলিক ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি সমীক্ষা করে দেখা গেছে, বিগত পাঁচ-ছয় বছরে প্রচুর ছাত্রছাত্রী উদারপন্থী ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছে।

"আমি জানি, মহান স্বামী বিবেকানন্দ যদি আজ সশরীরে থাকতেন, তবে এই উদারপন্থী খ্রিস্টধর্মের বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করতেন; কারণ তাঁর শিক্ষা ছিল, 'মতবাদ বা ফতোয়া বা চার্চ বা মন্দির নিয়ে মাথা ঘামিও না'—এবং উদারপন্থী খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এইসব চিন্তার শতকরা একশো ভাগ প্রতিধ্বনি করবেন।... যদিও স্বামীজী সমস্ত আধুনিক মনোভাব সমর্থন করতেন না—সম্ভবত এর নৈতিক আচরণবিধির দিকটি তিনি ষোলো আনা মেনে নিতেন না; তবুও আমি মনে করি যে, তিনি এর মূল ভাব-ভাবনাগুলির সঙ্গে সহমত হতেন—যেগুলি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধর্মসমন্বয়ের লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে বলে আমার মনে হয়। আজ যদি স্বামী বিবেকানন্দ এখানে থাকতেন, তবে বোধহয় তিনি এই মানবতামুখী প্রবণতাকে সানন্দে অভিনন্দিত করতেন।"

ফাদার ক্যাম্পবেল যে-সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন, তাকে আজ এমন অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ উপলব্ধি করছেন, যাঁরা গভীরভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে অধ্যয়ন করেছেন।

বেদান্ত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য তার মত খোলাখুলিভাবে বা রেখেঢেকে—যেভাবেই বলুক না কেন, সে আজ ঠিক সেইগুলিই চাইছে যেগুলি স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ করে দিয়ে গিয়েছিলেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকতে হবে, ধর্মগুলিকে উদারতর হতে হবে এবং একে অপরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বহু মানুষ আজ সেটিই বলছেন, যেটি স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের মধ্য দিয়ে বিগত ৭০ বছর ধরে বেদান্ত বলে আসছেন। এইভাবে, ধীরগতিতে কিন্তু সবলভাবে এইসব সত্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। তবে বড্ড ধীরগতিতে। আমেরিকানরা তাঁদের নিজেদের তাৎক্ষণিক সমস্যা, নিজেদের কৃতিত্ব এবং নিজেদের চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত সাফল্য নিয়ে এতই মশগুল হয়ে আছেন যে, জীবনের গভীরতর দিকগুলি নিয়ে ভাবার বা ভারতীয় প্রজ্ঞার মহান ভাবনা ও মূল্যবোধের আলোকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বা মর্জি—কোনটিই তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই লক্ষ্যে কিন্তু খুব বড় একটা কিছু ক্রমশই তৈরি হয়ে উঠছে। একথা বলছি এই কারণে যে, বিগত সফরে টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে আমি যে প্রায় ৯০টারও বেশি সাক্ষাৎকার দিয়েছি, তার প্রায় প্রত্যেকটাতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—আজকের আমেরিকান ও কানাডিয়ানরা যে বিপুলভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার দিকে ঝুঁকছেন, তাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বারেবারে এই প্রশ্নটি ঘুরেফিরে এসেছে।

এইসব গণমাধ্যম বুঝতে পারছে, পাশ্চাত্যের মানুষ বর্তমানে প্রাচ্যবাণীর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও বৈদান্তিক চিন্তাভাবনা প্রচারের যে-কাজ বিবেকানন্দ শুরু করে গিয়েছিলেন, তার পিছনে একটা সত্যিকারের চাহিদা ছিল। আর ঠিক এই কারণেই সে-প্রচার দিনদিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তবে একথাও ঠিক যে, সবসময়ে ভারত থেকে সেরা বস্তুই পাশ্চাত্যে যায় না; অনেক সস্তা জিনিসও চলে যায়। কিন্তু একথার সত্যতা থেকেই যায় যে, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মানুষ সমসাময়িক মানবীয় সমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার কথা জানতে চান। আসলে, তাঁরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা হলো ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী। এঁদের মধ্যে যাঁরা মননশীল—যাঁরা শুধুই সত্যকে চান, কোন চটকদার বা উত্তেজক বস্তু নয়—তাঁরা সমর্থ হন ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেতে; অন্যদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় আরো লঘু ও সস্তা করে ফেলা জিনিস নিয়েই। [ক্রমশ]

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪১

পাশাপাশি ঃ (১) মানগরবিনী, (৪) যতীন্দ্র, (৫) ললিত, (৬) মন, (৮) নেড়া, (৯) পঞ্চতপা, (১১) বরদা, (১২) নারদ, (১৫) হরিদ্বার, (১৬) লোক, (১৮) নেড়ি, (১৯) মনসা, (২০) বগলা, (২১) দনুজদলনী।

ওপর-নিচ ঃ (২) নরেন, (৩) নীলরতন, (৪) যতনে, (৬) মণীন্দ্রনাথ, (৭) কাপড়, (১০) গুদামবাড়ি, (১৩) হরিপ্রসাদ, (১৪) শরৎ, (১৭) কমলা, (১৮) নেপাল।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, আশিসকুমার ঘোষ, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল

কাশীপুর উদ্যানবাটী

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ষষ্ঠবিংশ পর্যায়ে কাশীপুর উদ্যানবাটী।—সম্পাদক

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলাস্থল—উত্তর কলকাতার 'কাশীপুর উদ্যানবাটী' (৯০ কাশীপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২), যার সঙ্গে ঠাকুরের বহু পার্ষদ ও ভক্তের স্মৃতি এবং বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যপ্রেমলীলার স্মৃতি জড়িত। ঠাকুর কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথমে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে, তারপর শ্যামপুকুরে 'শ্যামপুকুরবাটী'তে ১৮৮৫ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর—এই ৭০ দিন কাটানোর পর 'কাশীপুর উদ্যানবাটী'তে আগমন করেন। এখানে তিনি ৮ মাস অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় অবস্থানের পর ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্ট রাত ১টা ২ মিনিটে (রোমান ক্যালেণ্ডার মতে, ১৬ আগস্ট), ১২৯২ সনের ৩১ শ্রাবণ, পূর্ণিমা, রবিবার মহাসমাধিযোগে অপ্রকট হন। তাই ভক্তগণের কাছে এই কাশীপুর উদ্যানবাটী ঠাকুরের অন্ত্যলীলাস্থলরূপে মহাপবিত্র এবং পুণ্যতীর্থরূপে বরণীয়।

এখানেই সন্দিগ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথকে আত্মপরিচয়দানে শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছিলেনঃ "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।" এখানেই তিনি তাঁর উপস্থিত ১১ জন ত্যাগী অন্তরঙ্গ পার্ষদকে গেরুয়াবস্ত্র দান করেছিলেন এবং অন্তর্সন্ন্যাসে অভিষিক্ত করেছিলেন। কাশীপুরে তাঁর বিভিন্ন লীলাকাহিনীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি ঘটনা—প্রথম, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি 'কল্পতরু'রূপে গৃহী ভক্তদের অযাচিত কৃপাদান; দ্বিতীয়, ১৮৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কণ্ঠরোধ অবস্থায় স্বহস্তে অঙ্কিত তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র ও লিখিত আদেশঃ "নরেন শিক্ষে দিবে" এবং তৃতীয়, মহাসমাধিযোগে দেহাবসান। ঠাকুরের এরকম নানা বিচিত্র ও অলৌকিক লীলা এই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সম্ঘটিত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

'কাশীপুর উদ্যানবাটী' সম্পর্কে জানা যায়ঃ "কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লির সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে, তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যানবাটী বিদ্যমান।... (সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী) রানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যানবাটীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় মাসের এবং পরে আরো তিন মাসের অঙ্গীকারপত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত সিমলাপল্লি-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উদ্যানবাটীটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে।"[১]

আরো জানা যায়ঃ "উদ্যানের উত্তরসীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীর-সংলগ্ন পাশাপাশি তিন-চারিখানি ছোট ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বসতবাটী; উহার নিচে চারিখানি এবং উপরে দুইখানিই ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হল-এর ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাধন্য কাশীপুর উদ্যানবাটী

আলোকচিত্রঃ ডি. ডি. সাহা

ঘরখানি—যাহার পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারান্দা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন, উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখনো কখনো পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই-একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।"[২]

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনধারা সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "এই বাটীতে শ্রীমা পূর্বেরই ন্যায়

সেবা করিতে পারিবেন, অথচ ততটা সঙ্কুচিত থাকিতে হইবে না ভাবিয়া তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] যে অপরিসীম আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যুবক ভক্তগণও এখানে পূর্বেরই ন্যায় সেবাব্রতে নিরত রহিলেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও আকর্ষণে আরো ত্যাগীদের তথায় সমাবেশ হইল। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগকে অবলম্বন করিয়া ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী।

"এই নবগৃহেও শ্রীমায়ের জীবনধারা অনেকটা পূর্বেরই ন্যায় ছিল; যাহা কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার প্রয়োজনে। শ্রীমা এখানেও সাধারণ খাদ্যাদি রন্ধন করিতেন। বিশেষ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে গোপালদাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) প্রভৃতি যে দুই-চারিজনের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন, তাঁহারা চিকিৎসকের নিকট প্রস্তুত করার প্রণালী শিখিয়া লইয়া যথাসময়ে শ্রীমাকে দেখাইয়া দিতেন। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীমা ঠাকুরের ভোজ্য বা পানীয় লইয়া তাঁহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইতেন এবং ভোজন করাইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ফিরিতেন। এইসকল কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং সঙ্গিনীর অভাব মিটাইবার নিমিত্ত এই সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার নিকট আনিয়া রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া শ্রীমায়ের সহিত কখনো দুই-চারি ঘণ্টা, কখনো-বা দুই-একদিন কাটাইয়া যাইতেন। লক্ষ্মীদেবী ঠিক কবে আসিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। স্ত্রীভক্তবৃন্দও সর্বদা আসিতে পারিতেন কিনা বিশেষ সন্দেহ! কারণ পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, শ্রীমাকে অনেকসময়েই সঙ্গিনীহীন জীবনযাপন করিতে হইত।"[৩]

ঠাকুরের সেবা সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেন : "২৭ অগ্রহায়ণ (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫) শুভদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরে আনয়ন করা হইল। সেবকরূপে আমরা এবং শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা তাঁর সঙ্গে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও উপস্থিত সকল সন্তানকে একদিন বলিলেন, 'দ্যাখ, আমার এই গলার ঘা একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এই কারণে তোরা সকলে একত্র হয়েছিস।'

"প্রথম প্রথম আমরা দুই-তিনজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্যরন্ধন করিতেন। গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি শ্রীমাকে সাহায্য করিতেন।... ক্রমে সেবকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন দাসীও নিযুক্ত করা হইয়াছিল।"[৪]

বলা আবশ্যক, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকলেও যোগীন-মা সেসময় বৃন্দাবনে ছিলেন।

একদা গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য অর্থব্যয়ে বিশেষ কার্পণ্য না করলেও ঠাকুরের সেবার কাজে নিযুক্ত সেবকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করেই ঠাকুর তাঁর ত্যাগী সন্তানদের ভিক্ষায় উৎসাহ দেন এবং তাঁদের দ্বারা সন্ন্যাসধর্মের মাধুকরীব্রত উদ্‌যাপন করিয়ে শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ জানিয়েছেন : "পরদিন প্রাতে নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), হুটকো-গোপাল (গোপালচন্দ্র ঘোষ) ও আমি প্রথমেই নিচে শ্রীমার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া বলিলাম, 'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।/ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি॥'

"করুণাময়ী শ্রীমা অবাক হইয়া আমাদের সকলকে মুষ্টিভিক্ষা দিলেন।... অবশেষে যাহা ভিক্ষায় পাইলাম, তাহা লইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ঐ ভিক্ষা শ্রীমাকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীমা সেই ভিক্ষান্নের তরল মণ্ড রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা মুখে দিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র। এতে কারু কোন কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম।' তাহার পর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি সকলেই এক-একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল।"[৫]

বলা আবশ্যক, এরপর থেকে গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরের সকলপ্রকার সেবাকাজে আরো সতর্ক হন এবং পূর্বের ন্যায় গৃহী ভক্তেরাই সেবাকাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে থাকেন।

আরেকটি ঘটনা। "কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, তখন সেবানিরত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একদিন স্থির করিলেন যে, উদ্যানের দক্ষিণপার্শ্বের এক খেজুর গাছ হইতে সন্ধ্যার সময় জিরেনের রস খাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। যথাকালে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন প্রভৃতি সকলে দল বাঁধিয়া ঐদিকে চলিলেন। এমন সময় শ্রীমা অকস্মাৎ দেখিলেন, ঠাকুর যেন তীরবেগে নিচে নামিয়া গেলেন। তিনি চমকিত হইয়া ভাবিলেন, 'এও কি সম্ভব? যাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, তিনি কি করে দ্রুত নিচে নামতে পারেন?' অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না। অগত্যা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যাইয়া পরীক্ষা করিতে হইল। দেখিলেন, তিনি সেখানে নাই, ঘর শূন্য। তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও না পাইয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া উৎকট চিন্তাভিভূত হইলেন। একটু পরেই দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর পূর্ববৎ তীরবেগে ঘরে ফিরিলেন। ঔৎসুক্যনিবৃত্তির জন্য তিনি পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি দেখেছ নাকি?' তাহার পর বলিলেন, 'ছেলেরা সব এখানে এসেছে, সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের একপাশে যে খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলুম ঐ গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াত। ছেলেরা তা জানত না। তাই অন্যপথে সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলুম। বলে এলুম, আর কখনো ঢুকিস নে।' তিনি ঐকথা অপর কাহাকেও বলিতে শ্রীমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া শ্রীমায়ের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।"[৬]

কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের নিজ মুখের উক্তি : "কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা ছেলেরা সব করত। তিনি তাদের নানা কথায় আনন্দে রাখতেন। বলতেন, 'একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন করে পারবে।' তিনি সব্বায়ের মন বুঝে চলতেন। সেবার তেমন দরকার হতো না। হয়তো দশ-বারো দিন অন্তর একটু বাহ্যে হতো। তবে রাত জাগতে হতো। খাওয়া তো বড় ছিল না—একটু সুজি, তাও ছেঁকে দিতে হতো। মাংসের জুস হতো। দুটো মরা কুকুর তার ছিবড়ে খেয়ে এই মোটা হলো! একদিন—তখন অকাল—আমলকী খেতে চাইলেন। দুর্গাচরণ (নাগ মহাশয়) তিনদিন পরে গোটা দুই-তিন আমলকী নিয়ে উপস্থিত হলো। বেশ বড় আমলকী। তিনদিন তার খাওয়া-দাওয়া নেই। ঠাকুরের আমলকী হাতে করে কান্না। বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ঢাকা-টাকা চলে গেছ।' আমাকে বললেন, 'ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশি খায়।' আর আর সব রাঁধা ছিল। বললেন, 'একখানা থালায় সব বেড়ে দাও। ও প্রসাদ না হলে খাবে না।' ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিতে বসলেন। সেসব দিয়ে ভাত প্রায় এত কটা খেলেন। তবে দুর্গাচরণ প্রসাদ পেল। তখন বাগানে খুব খরচ হয়। তিনটা রান্না—ঠাকুরের একটা, নরেনদের একটা, অপর সবার একটা। চাঁদা করলে টাকার জন্য। তাই চাঁদার ভয়ে একজন আবার ভেগে গেল!"[৭]

ঠাকুরের আহার সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা—"কাশীপুরের একটি ঘটনায় ঠাকুরের সেবায় শ্রীমায়ের ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে ঠাকুরের জন্য শুগলির ঝোলের ব্যবস্থা হইল। ঠাকুর শ্রীমাকে উহা করিতে আদেশ দিলে তিনি আপত্তি জানাইলেন, 'এগুলো জ্যান্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইঁট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।' শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'সে কি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে।' তখন শ্রীমা রোখ করিয়া উহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল যে, ঠাকুর নিজের সৃষ্টি নিজেই সংহার করিতেছেন।"[৮]

এই ঘরে শ্রীশ্রীমা থাকতেন

কাশীপুরে এই নিদারুণ অসুখের মধ্যেও যে ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে রঙ্গলীলা করতেন, এমন কথাও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমায়ের নিজের কথায় : "একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন, 'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরি করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারেঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম তো হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তারপর তিনদিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও-কয়দিন গোলাপ-মা মণ্ড তৈরি করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।"[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন : "কাশীপুরের বাড়িতে যে কাঠের সিঁড়ি ছিল, উহার ধাপগুলির উচ্চতা এত অধিক ছিল যে, সাধারণ লোকের পক্ষেই উঠানামা কষ্টসাধ্য ছিল; দুর্বল ব্যক্তিদের তো কথাই নাই।"[১০]

এই কাশীপুর-লীলাতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের ওপর সকল ভার সমর্পণ করে একদা বলেছিলেন : "হ্যাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজ দেহ দেখিয়ে) এ-ই সব করবে?" শ্রীমা নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে বললেন : "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর উত্তর দিলেন : "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" তারপর ভাবের ঘোরে তিনি বললেন : "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" শ্রীশ্রীমা অনুযোগের স্বরে বললেন : "আমি মেয়েমানুষ। তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে বললেন : "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে। শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"[১১]

ঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী, সহধর্মিণী, সাক্ষাৎ জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা তাঁর সকল লীলার সঙ্গে সর্বত্র জড়িত—একথা বলা বাহুল্যমাত্র। জগজ্জননী হয়েও তিনি ঠাকুরের মতোই মনুষ্যবৎ লীলা করে গেছেন। তাই ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণায় তিনিও কাতর হয়েছেন।

ঠাকুরের নিদারুণ কষ্ট অথচ সবরকম চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্যের কোন লক্ষণ নেই বুঝে শ্রীশ্রীমা দৈবশক্তির সাহায্যে ঠাকুরের নিরাময়ের জন্য একদা লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুর থেকে তারকেশ্বরে যান। কিন্তু তাঁর তারকেশ্বরে যাওয়ার কথা শুনে ঠাকুর আঙুল নেড়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন, সেখানে গেলে কোন ফল হবে না; তবু শ্রীশ্রীমা তারকেশ্বরে গিয়ে 'হত্যা' দিয়ে মন্দিরে পড়ে থাকেন। সেখানে দ্বিতীয় রাত্রে প্রচণ্ড এক শব্দে শ্রীশ্রীমায়ের তন্দ্রাভঙ্গ হয় এবং এই পার্থিব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অলীক—এই জ্ঞানে তিনি তারকেশ্বর থেকে কাশীপুরে

ফিরে আসেন। অবশেষে দেহরক্ষার কিছুদিন আগে ঠাকুর তাঁর বাহু থেকে সোনার ইষ্টকবচখানিও অপসারিত করে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে অর্পণ করে সকলপ্রকারের ভারমুক্ত হন। কাশীপুরে ক্রন্দনরতা শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ঠাকুরের শেষ নির্দেশ ঃ "তোমার ভাবনা কি? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করেচে, তোমারও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।" ইতোপূর্বে বলেছিলেন ঃ "তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।"

অবশেষে সেই কালরাত্রি! ঠাকুরের মহাপ্রস্থান। শ্রীশ্রীমায়ের মন আগে থেকেই এই বিপদাশঙ্কায় পীড়িত ছিল। সারারাত দারুণ উৎকণ্ঠায় থাকার পর যখন বুঝলেন ঠাকুরের এটি মহাসমাধি, তখন প্রাণের আবেগে সর্বসমক্ষে চিৎকার করে ওঠেন ঃ "মা কালী গো, তুমি কী দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!" সঙ্গে সঙ্গে উচ্চরোলে ক্রন্দন ও বিলাপে তিনি ভূপতিত হওয়ায় লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা, বাবুরাম আর যোগীন শ্রীশ্রীমাকে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে যান ও তাঁর পরিচর্যায় রত হন। শ্রীশ্রীমা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করে গিয়েছিলেন, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। এই সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন ঃ "প্রাতঃকালে মাতাঠাকুরানীকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া 'মা কোথায় গেলি গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য হৃদয়বিদারক, কিন্তু অপরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমরা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য পতি-পত্নীর সেই মধুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম, এইরূপ দৃশ্য ও ভাব আমরা পূর্বে কখনো দেখি নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত মূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অপূর্ব ও মধুর সেই সম্বন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমার।"[১২]

এরপরের ঘটনা সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুর যেইদিন মহাসমাধিতে মগ্ন হন (৩১ শ্রাবণ ১২৯৩), সেইদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে শ্রীমা প্রায় সংজ্ঞাহারা। তিনি আপনার ঘরে শোকাতুরা হইয়া সধবার চিহ্নস্বরূপ দুই হস্তের সোনার বালা ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটিল অন্যরকম। শ্রীমা যখন হস্তের বালা ইত্যাদি খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে হস্তের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার দুইটি হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ-ঘর থেকে ও-ঘর।' শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেইসঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরই শুধু নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দিব্যশরীরে তিনি সর্বদাই বিদ্যমান আছেন। তখন হইতে তিনি যেমন লালপেড়ে কাপড় পরিতেন, তাহাই পরিতে লাগিলেন। তবে লাল নরুন পেড়ে কাপড়ই তিনি পরিতে লাগিলেন।"[১৩]

১৮৮৬ সালের ২১ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে ভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাসভবনে এনে রাখেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ভক্তেরা যখন নানা কারণে এই উদ্যানবাটী ত্যাগ করে চলে যান, তখন থেকে এটি হস্তান্তর হতে থাকে এবং অবশেষে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ এটি ক্রয় করেন। প্রথমে উত্তরাংশ ক্রয় করেন ১৯৪৬ সালের ২৪ মে এবং দক্ষিণাংশ ক্রয় করেন ১৯৪৯ সালের ৬ জুন। বর্তমানে এটি সম্পূর্ণরূপে বেলুড় মঠের অধীন এবং এখন এটির আয়তন ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক ৫০ স্কোয়ার ফুট। অধিগ্রহণের পর পুরনো জীর্ণ বাড়িটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সেই স্থানেই প্রাচীন মূল নকশা অনুযায়ী ঠিক একই ধাঁচে বর্তমানে হুবহু এই বাড়িটি নির্মিত হয়। এবং ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর এই বাড়িটিকেই মন্দিররূপে সযত্নে রক্ষা করা হয়। এখানে ঠাকুরের কোন পৃথক মন্দির বা মূর্তি নেই। এই বাড়ির দোতলার যে-ঘরে তিনি অবস্থান করেছিলেন এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই ঘরের মেঝের ওপর ঠাকুরের শয্যা প্রস্তুত করে সেখানে তাঁর প্রতিকৃতি বসানো আছে—যেখানে নিত্যপূজা হয়। নিচের যে ছোট ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করতেন, সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে নিত্য পূজা করা হয়। নিচের বাকি দুটি ঘরের একটিতে ঠাকুরসহ গৃহী ভক্তদের ছবি এবং অপরটিতে স্বামীজীসহ ত্যাগী ভক্তদের আলোকচিত্র শোভা পাচ্ছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মতিথি ছাড়াও প্রতিবছর ১ জানুয়ারি ও তার পরের দুদিন সাড়ম্বরে ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয়। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস সকাল ৬টা থেকে ১১.৩০ এবং বিকালে ৩.৩০ থেকে রাত ৮টা অবধি উদ্যানবাটী খোলা থাকে। আর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস সকাল ৫.৩০ থেকে ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে ৮.৩০ অবধি খোলা থাকে। উৎসবাদিতে অবশ্য এই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হয়। ❑

পথনির্দেশ ঃ কাশীপুর উদ্যানবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ৯০ কাশীপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২। উত্তর কলকাতার চিৎপুর ব্রিজ থেকে বরানগর অবধি বিস্তৃত কাশীপুর রোডের একাংশের পূর্বদিকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাউসিং এস্টেটের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে এই উদ্যানবাটী—কাশীপুর রোডের ধারেই।

তথ্যসূত্র

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পরিশিষ্ট, ১৯৯৫, পৃঃ ১৮৯-১৯০; (২) ঐ, ১৯০-১৯১; (৩) শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৯৪, পৃঃ ৭৯; (৪) আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১৯৭৩, পৃঃ ৮০-৮১; (৫) ঐ, পৃঃ ১০৪-১০৫; (৬) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮০-৮১; (৭) শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২০০১, পৃঃ ১৯৭; (৮) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮১; (৯) শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৪২; (১০) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৭৯-৮০; (১১) ঐ, পৃঃ ৯৬ (১২) আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২১-১২২; (১৩) ঐ, পৃঃ ১২৬-১২৭

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বেদান্ত-প্রতিমা শ্রীমা

স্বামী ঋতানন্দ*

মুক্তিকামীদের মতে, শ্রীমা সারদাদেবীর আঁচলে বাঁধা রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবিকাঠি। শান্তিকামী নিবেদিতা লিখেছেন: "মা, বেচারা সারার (ওলি বুল) জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।"[১] আমরা একটু তলিয়ে দেখলে দেখব, শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটির মূর্ত ব্যবহারাদর্শ হলো শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন, যাঁর আঁচলে বাঁধা অদ্বৈতজ্ঞান।

আমরা জানি, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ করলেও অত্যন্ত জরুরি ছিল এই তত্ত্বের একটি ব্যবহারাদর্শ জগৎকে দেখানো। সে-কাজটিই শ্রীমা তাঁর সমগ্র জীবন ধরে করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ব্যাবহারিক দিকটিকে জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করে এই নব্য আন্দোলন ও সঙ্ঘকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে।

অদ্বৈতবেদান্ত-মতে জীবত্ব মিথ্যা, অধ্যস্ত মাত্র। জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। মোক্ষ জীবের লক্ষ্য। যেহেতু জীব স্বরূপত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ, সেহেতু ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই মুক্তির কারণ। আত্মার ওপর মনের মালিন্য বা অজ্ঞানের আবরণের দরুন স্বতঃপ্রকাশিত আত্মা যেন আবৃত হয়ে রয়েছেন। অজ্ঞানের আবরণ ভেদ বা মনের মালিন্য চলে গেলে আত্মা স্বতই প্রকাশিত হন। অতএব, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধা'র অর্থ হলো অদ্বৈত সিদ্ধান্ত: জীব স্বরূপত ব্রহ্ম এবং জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব অভিন্ন—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আবার এও আমরা জানি, নিরঙ্কুশ অদ্বৈতজ্ঞান (Absolute knowledge) অব্যবহার্য, যার ব্যবহার সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, চরম সত্য কখনোই ব্যবহারোপযোগী হতে পারে না। অন্যদিকে এও দেখি, এক অভিনব কর্মদর্শন জগতের সামনে উপস্থাপনা স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ও আর্থ-সামাজিক ভাবনার একটি বিশিষ্ট অবদান। তা একইসঙ্গে সনাতন বেদান্তের সিদ্ধান্তকে অঙ্গীকৃত করে বনের বেদান্তকে ঘরে আনার এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মধ্যে যে বিশেষ আলোক তিনি পেয়েছিলেন তা জগতে প্রচার করার এক অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টা। কারণ, তাঁর মতে সেই সমাজই সর্বোচ্চ যেখানে সর্বোত্তম সত্যগুলি বাস্তব রূপ ধারণ করে।

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞান-অবস্থা এবং জ্ঞান-চর্চা দুটি পৃথক। একটি সাধ্য, অপরটি সাধন। একথা জ্ঞানমার্গে প্রসিদ্ধ যে, জ্ঞানাবস্থায় কর্মের প্রবেশ বা সহাবস্থান আলো-আঁধারের মতোই অসম্ভব। জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় অকল্পনীয়। কিন্তু সাধনাবস্থায় সেবার অধিকার সর্বমতসিদ্ধ ও অনুমোদিত। সাধ্য বা আদর্শ হিসাবে জ্ঞানকে সামনে রেখে অর্থাৎ জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম—একথা মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তার ওপরে আরোপিত অজ্ঞান বা মলিনতা দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্নের স্থান যে রয়েছে, তা জ্ঞানমার্গেও স্বীকৃত। সেখানেই সেবার প্রাসঙ্গিকতা। চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানের পূর্বশর্ত। চিত্তশুদ্ধি থেকে অজ্ঞান-নিবৃত্তি। অজ্ঞান নিবৃত্ত হলেই জ্ঞানের স্বত উদয়। জ্ঞানের আচার্য শঙ্করের এই মত। স্বামীজী একটু এগিয়ে বললেন, চিত্তশুদ্ধি নিরঙ্কুশ হলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং জ্ঞানের উদয় ইত্যাদি মধ্যবর্তী সোপানের কল্পনার অবকাশ কোথায়? বললেন: "Why do you seek God, see God." কারণ, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। তাই চিত্তশুদ্ধ হলে আত্মা স্বতই প্রকাশিত।

বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে ছিল জ্ঞান, বাইরে ভক্তি; স্বামীজীর ভিতরে ভক্তি, বাইরে জ্ঞান। আর শ্রীমা সারদাদেবীর? আমাদের মনে হয়, মায়ের ভিতরে ছিল জ্ঞান এবং অবশ্যই তা অদ্বৈতজ্ঞান এবং বাইরে কর্মপ্রবণতা।

"তোমার মেয়ে সারদা গো"—এই ছোট্ট মিষ্টিমধুর সংলাপটি দিয়ে তিনি নির্দয় ডাকাতবাবার হৃদয়ে মাতৃভাব জাগ্রত করলেন। 'মা' বলে এসে দাঁড়াতেই স্বভাব ভাল নয় মেয়েটির হাতে ঠাকুরের খাবারের থালা অকাতরে তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে জীবনের শেষ বাক্যটি উচ্চারণ—"কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার"—মায়ের সমগ্র জীবনটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব বিকাশের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রস্রবণ। আর প্রস্রবণটি প্রবাহিত হয়েছিল ভালবাসার খাতে। "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"—স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি কতবার। আর এও আমরা দেখলাম,

* *গবেষণাপ্রিয় সন্ন্যাসী, বেলুড় মঠ।*

অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিভূমি একত্ব। তা থেকেই ভালবাসার প্রস্রবণ। আর ভালবাসার প্রকাশ ও প্রমাণ সেবায়।

শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবনে সকলের প্রতি মাতৃত্বের স্নেহধারা বর্ষণের পিছনে ছিল তাঁরই মুখনিঃসৃত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত : "আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি; দুলে, বাগদি, ডোমের মাঝেও তিনি।"[২]

এখানে আমাদের আরেকটি সংশয়ের নিরসন হওয়া দরকার। অদ্বৈতজ্ঞানের সকল ব্যবহারকারীই কী তাহলে অপূর্ণ বা অজ্ঞানী? সাধারণ জীব বা জীবকোটি—যাদের কাছে 'জ্ঞান ব্যবহার' মানে জ্ঞানচর্চা—তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সেটি সাধন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তারা অপূর্ণ এবং অজ্ঞানী। অপরপক্ষে, ঈশ্বরের অবতার, অবতারের লীলাসঙ্গিনী এবং অবতারের কিছু নিত্যসঙ্গী বা পার্ষদ, যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঈশ্বরকোটি' নামে অভিহিত করেছেন —তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের বিশেষ অধিকার। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবনের জীবনীকার ও টীকাকার স্বামী সারদানন্দ এঁদের 'অধিকারী পুরুষ' বলে বর্ণনা করেছেন।

দীর্ঘ বারো বছরের অদৃষ্টপূর্ব তপস্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীশ্রীজগদম্বা আদেশ করেন : "ওরে, তুই ভাবমুখে থাক।" আমরা জানি, জগদ্ধিতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবের মিলনভূমিতে ভাবমুখে অবস্থান করে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মন রেখে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত জগতের উচ্চভূমিতেও ইচ্ছামাত্রই বিচরণ করতে পারতেন। এটিই হলো বিশেষ অধিকার। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিশেষ অধিকারীকে কখনো বলেছেন 'বিজ্ঞানী', কখনো বলেছেন 'ঈশ্বরকোটি'। তাঁর ভাষায় : "ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নিচেও আসতে পারে। ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততোলা বাড়ি, কেউ বারবাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ি সাততোলায় যাওয়া-আসা করতে পারে।"[৩] অন্যত্র বলেছেন : "ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি'—'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি'। তা হতে এ অনন্তলীলা আস্বাদন হয়।... বিজ্ঞানী তাই এই 'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি' রাখে আস্বাদনের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য।"[৪] আরো বলেছেন : "নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী।... নারদাদি বাহাদুরি কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টিমবোট (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকেও পার করে নিয়ে যায়।"[৫]

একদিন স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন : "তোমার কী আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?"

মা—"হ্যাঁ, এক-একবার মনে পড়ে, তখন ভাবি এ কী করছি, এ কী করছি! আবার এইসব বাড়িঘর, ছেলেপিলে (হাত চিৎ করে সামনের সব দেখিয়ে) মনে আসে ও ভুলে যাই।"

এই যে এক-একবার মনে পড়া আবার ভুলে যাওয়া—এটি অবতার ও অবতারসঙ্গিনীর জীবনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীমায়ের জীবন আলোচনার সময় এটি আমাদের মনে রাখতে হবে, এ যেন আলো-আঁধারের খেলা। তিনি দেবী ও মানবী ভাবের সুমধুর সমন্বয়ে গড়া অনুপম এক মাতৃমূর্তি। নিখাদ সোনার সঙ্গে যেমন খাদ মিশিয়ে অলঙ্কার তৈরি হলে তা ব্যবহারোপযোগী হয়, ঠিক তেমনি দেব বা দেবী-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানব বা মানবী-ভাবের সুমধুর সমন্বয়ই হলো অবতার বা অবতারসঙ্গিনীর জীবন। তাই তাঁদের জীবন জগতের মানুষের আটপৌরে কাজে লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা অবসানের অব্যবহিত পরে শ্রীমায়ের মন যখন নিদারুণ শোকসন্তপ্ত ও বৈরাগ্যপ্রখর, সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে* শ্রীমা রাধারানীকে যোগমায়ারূপে অবলম্বন করে জগৎকল্যাণের জন্য আরো দীর্ঘ প্রায় চৌত্রিশ বছর ইহজগতে ছিলেন। তাই রাধু সামান্যা নন। মায়ের প্রতি জগতের সকল সন্তানের সমষ্টিভূত যে-আকর্ষণ, তা রাধুর মধ্যে ঘনীভূত হয়েছিল। সে-মায়াবলম্বনে শ্রীমা জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে জগৎকল্যাণের যূপকাষ্ঠে নিঃশেষে নিবেদন করেছেন তা ধর্মের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনের এই পর্বের কিছু আচরণ, কথাবার্তা এবং ঘটনা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, যার পশ্চাতে ছিল তাঁর সেই আঁচলে বাঁধা অদ্বৈতজ্ঞান।

অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশ সমদর্শিত্বে। মায়ের সমদর্শিত্বের ভাব না বুঝে কোন কোন ভক্ত দ্বিধা, কুণ্ঠা, সন্দেহ ইত্যাদির শিকার হতেন। তাঁদের অন্যতম পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন। তাঁর সন্দেহ নিরসনের জন্য মা তাঁর চিঠির উত্তরে লিখলেন : "আমার আপনার পর কেহই নাই, সকলেই সমান... আমার মনের মধ্যে কিছুই দুই-দুই নাই।"[৬]

* শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন : "একে (রাধুকে) আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪৯-১৫০)

সমদর্শিত্বের চূড়ান্ত উক্তিঃ "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।"[৭] বেদান্ত-মতে গুণের অধ্যাহার করে করে যা থাকে, তাই স্বরূপ। এই শোধন প্রক্রিয়ায় জীবের স্বরূপ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। শরৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ও আমজদ ডাকাত। তবু মায়ের কথায় দুজনের স্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং সেখানেই তাঁদের অভেদত্ব।

শ্রীমায়ের প্রার্থনার মধ্যেও 'চৈতন্য' ও 'মুক্তি' কথাটি বারবার ঘুরে এসেছে। তিনি ব্যাকুলভাবে নিত্য প্রার্থনা করতেন ঃ "প্রভু, এদের চৈতন্য করে দাও। মুক্তি দাও। এই সংসারে বেজায় দুঃখকষ্ট। এদের যেন আর সংসারে আসতে না হয়।"[৮]

শ্রীমা সর্বোচ্চ অদ্বৈতানুভব থেকে কিছুটা নেমে নিত্য অনুভব করতেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ভক্ত উমেশবাবুকে বলেছিলেন ঃ "লোকে 'ভগবান' 'ভগবান' করে। (বারান্দার একটি খুঁটি আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে) এই যে খুঁটিটি দেখচ, এর ভিতর ভগবান আরোপ কত্তে পাল্লেও ভগবানলাভ হতে পারে।"[৯]

একত্বদর্শী শ্রীমা বলেন ঃ "একবার দেখি কি, তা জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না, তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি।"[১০] একদিন ঠাকুরপূজার পূর্বেই শ্রীমা তেরো-চোদ্দ বছরের এক লোলুপদৃষ্টি ছেলের হাতে নৈবেদ্য তুলে দিয়েছিলেন। সেবক বাধা দিলে শ্রীমা স্নেহসুধাসিক্ত কণ্ঠে বলেন ঃ "আঃ, বাছাকে খেতে দাও। প্রভু এর মধ্যেও আছেন।" আবার একদিন ঠাকুরের রাত্রিভোগের জন্য নির্দিষ্ট একবাটি দুধ তুলে দেন তাঁর সেবকের হাতে। সেবক আঁতকে উঠে প্রতিবাদ করলে করুণাসিক্ত স্বরে শ্রীমা বলেন ঃ "খাও বাছা, তোমার ভিতরেও ঠাকুর রয়েছেন।" শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, গৃহপালিত টিয়া গঙ্গারামের মধ্যেও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করে তিনি ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট নৈবেদ্য তাকে খাইয়েছেন।[১১] নিজের বালিশখানা সেবিকাকে দিয়ে দেওয়ায় সেবক প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন ঃ "থাক বাবা, ওর ভেতরেও ঠাকুর আছেন।"[১২] শ্রীমা বলেন ঃ "ওদের (বেড়ালদের) ভেতরেও তো আমি আছি। আমি সকলের মা। ইতর জীবজন্তুরও মা।" তিনি চন্দনা-ময়না-টিয়ারও মা, তিনি গরুবাছুরেরও মা। এই ভাব উৎসারিত হয়েছে সর্বজীবের প্রতি সমত্বানুভূতি থেকে। আর সমত্বানুভূতি থেকেই শ্রীমা অদোষদর্শী। জনৈকা অসচ্চরিত্রা রমণীর তাঁর কাছে যাওয়া-আসা সম্বন্ধে বলরামবাবুর স্ত্রীর তীব্র আপত্তি গোলাপ-মার মুখে শুনে শ্রীমা সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন ঃ "আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তারা আসবে। একজন এলে যদি আর একজন না আসে, আমি তার কি করতে পারি?" এখানে লক্ষণীয়, বেদান্ত-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীমা সমস্ত বিশেষাধিকার খণ্ডন করে সমদর্শিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। অদ্বৈতে বিশেষ অধিকারের দাবি অর্থহীন। শ্রীমায়ের নিকটে অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ও তিনকড়ির যাতায়াত সম্বন্ধে কয়েকজন সন্ন্যাসী আপত্তি জানালে তিনি গম্ভীরভাবে বলেন ঃ "ওদের যদি আসতে না দাও, আমি এখানে থাকব না।"[১৩] তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। সতীরও মা, অসতীরও মা।"[১৪]

বেদান্তসাধনকালে অদ্বৈতভূমিতে আরূঢ় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধন-ভজনের চরম উদ্দেশ্য।[১৫] আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত ভাবময়। তাঁর মধ্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং আরো কতরকম ভাবের যে সন্নিবেশ ঘটেছিল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মূলসুরটি অব্যর্থভাবে তাঁর সেই ঐতিহাসিক চিঠিতে প্রকাশ করেছেন ঃ "আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"[১৬]

শ্রীমা বলেছেন ঃ "যেই ঠাকুর, সেই আমি। আমরা কি আলাদা?" ইত্যাদি। সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন ঃ "ও আমার শক্তি।" আমরা জানি, শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবী অভিন্ন সত্তা।[১৭]

অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছেন যে, সকল মতেরই সেটি শেষকথা এবং "যত মত তত পথ"।[১৮] স্বামী সারদানন্দের মতে, ঠাকুরের এই উদার মানসিকতার কারণ তাঁর অদ্বৈতানুভূতি এবং সেই উদারভাবের বশবর্তী হয়েই তাঁর ইসলামধর্ম সাধন।[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একের পর এক অবিরাম সাধনের মতো শ্রীমায়ের জীবনে সাধনের কথা নেই। তবু শ্রীমা অতি সহজেই দেহাতীত অবস্থায় চলে যেতেন। একদিন বলরাম ভবনের ছাদে বসে তিনি ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ব্যুত্থানের পর তিনি যোগীন-মাকে বলেছিলেন ঃ "একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকব। ওটাতে আমার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এল।"[২০] সমাধি-

রাজ্যে গমন ও নির্গমন তাঁর কাছে ছিল সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

আরেকবার নীলাম্বরবাবুর বাড়ির ছাদে এক সন্ধ্যায় যোগীন-মা ও গোলাপ-মার সঙ্গে শ্রীমা ধ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি গভীর সমাধিতে স্থির নিঃস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি অর্ধবাহ্যদশায় নেমে বলতে লাগলেনঃ "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" তাঁরা মায়ের হাত-পা টিপে দেখাতে লাগলেনঃ "এই যে পা, এই যে হাত।" সেদিন মায়ের দেহবোধ আসতে অনেক সময় লেগেছিল। এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে মা কপিল মহারাজকে বলেছিলেনঃ "এইসময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি—এইসব জ্যোতিতে মন লীন হতো। আর দু-চারদিন এভাবে থাকলে দেহ থাকত না।"[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মহিমময় উদারতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁর বেদান্তসাধন ও অদ্বৈতভূমিতে আরোহণের কথা স্বামী সারদানন্দজী বলেছেন। অন্যপক্ষে শ্রীমায়ের মুক্তমন ও উদারতা ছিল অতি স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। মুসলমান ছাত্ররা নিবেদিতাকে 'এশিয়ায় ইসলাম' বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। নিবেদিতা লিখেছেনঃ "এই কথা যখন গত রবিবার মাতাদেবীকে জানিয়েছিলাম, তখন তাঁর সে কী আনন্দ!"

সেকালে জাতপাত ও ছুঁৎমার্গের প্রবল প্রতাপ। কিন্তু শ্রীমা ছিলেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত। গোঁড়া বামুনের মেয়ে হয়ে তিনি অজপাড়াগাঁয়ে 'ছত্রিশজাতের এঁটো' কুড়িয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?"[২২] বিদেশিনী ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার সঙ্গে তিনি একত্রে আহার করেছেন। পাঁচবছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায়, তেমনি নিবেদিতাকে তিনি চুমু খেয়ে আদর করেছেন। বলেছেনঃ "নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।"[২৩] আবার দেশপ্রথাকে মান্য করেও জয়রামবাটীতে সকল কর্মী সন্তানকে তিনি একপাতে মুড়ি ও জিলিপি খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। তিনি বৈদ্য, সূত্র বা বারুজীবী বংশীয় লোকের ছোঁয়া বা তৈরি খাবার খেতে দ্বিধা করেননি। বলেছিলেনঃ "শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?"[২৪]

অদ্বৈত-মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা হলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে গুরু এবং গুরূপদেশ সত্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত। শ্রীমাও বলেছেনঃ "গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি।"[২৫]

মুক্তির অর্থই হচ্ছে সেই পরমতত্ত্বের অনুভূতি। শ্রীমা ঠাকুরের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ "ঠাকুর বলতেন, হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটা আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।"[২৬]

শ্রীমা বলেছিলেনঃ "ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"[২৭] কাশীতে শ্রীভগবান তাঁকে নারায়ণমূর্তিতে দর্শন দিয়ে বলেছিলেনঃ "ঈশ্বরতত্ত্ব না করলে কি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়?"[২৮]

শ্রীভগবানের ও শ্রীমায়ের কথাদুটির অর্থ একই। তা হলো নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করতে হলে সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। গীতাদি শাস্ত্রেও ঐকথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৯] বস্তুত, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হতেই পারে না। এটিও অদ্বৈতবেদান্তের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। "তদনুগ্রহহেতুকেন এব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ ভবিতুম্ অর্হতি।"[৩০] অনেক প্রশ্নোত্তরের পর শ্রীমাও বলেছেনঃ "শুধু তাঁর কৃপাতে হয়।"[৩১] সিদ্ধি আসে ঈশ্বরের কৃপায়। কারণ, দেহধারী মাত্রেই ঈশ্বরের মায়ার এলাকাধীন। তাই তিনি বলতেনঃ "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কী সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।"[৩২]

সর্বভূতে সেই এক চৈতন্যই বিরাজিত। তাই সন্ন্যাসী মাত্রেরই ব্রত সর্বভূতে অভয়দান। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল নবমীর দিন দেবীর নিকট বলি দেবেন। কিন্তু শ্রীমা সন্ন্যাসীর ব্রতটি স্মরণ করালে স্বামীজী সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।[৩৩]

কখনো আবার শ্রীমা তাঁর সর্বভূতস্থ স্বরূপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একবার জনৈক ত্যাগী সন্তান জেদ করতে থাকেন যে, মাকে মাছ খেতে হবে নতুবা তিনি মাছ খাবেন না। সামাজিক রীতিনীতির উল্লেখ, অনুরোধ, যুক্তি সবকিছু ব্যর্থ হলে শ্রীমা গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেনঃ "তুমি কি মনে কর, আমি কি এক মুখেই খাই!"[৩৪] জেদি সন্তানের সম্বিত ফেরে, মায়ের কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। অতঃপর মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে নেন।

বেদান্ত-মতে, দেহ-মন-বুদ্ধির সঙ্গে আত্মাধ্যাস হলো বন্ধনের কারণ। অর্থাৎ সংসারের বন্ধনাত্মকরূপ ততদিনই থাকে, যতদিন মানুষের দেহবুদ্ধি থাকে। দেহাত্মবুদ্ধি যার আছে, সে-ই সংসারী। শ্রীমা তাই বলেছেনঃ "দেহে মায়া

দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ মা, দেড়সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড়সের ছাই।"[৩৫]

মা বলছেন: "*একটা ডেঁওপিঁপড়ে যাচ্ছে, রাধি তাকে* মারবে। দেখলুম কি তা জান? দেখলাম, সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর—ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই! রাধিকে আটকালুম, ভাবলুম—তাই তো, সব জীব যে ঠাকুরের! আমি আর কী করতে পারছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পারতুম, তবে তো হতো!"[৩৬]

ঠাকুর অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিনা তা প্রমাণ করার জন্য তোতাপুরী বলেছিলেন যে, জ্ঞানলাভের পর স্ত্রী কাছে থাকলেও যার বেচাল হয় না তারই জ্ঞান হয়েছে বুঝতে হবে। ঠাকুরের সেকালের ভাব দেখে তোতাপুরী সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। আমরা স্মরণ করতে পারি, ঠাকুর শ্রীমায়ের দেহাবলম্বনে মনে দীর্ঘ বিচার করেছেন এবং শেষে মন সমাধিভূমিতে আরূঢ় হয়েছে। কিন্তু শ্রীমায়ের এরকম বিচার বা ভয় হওয়ার কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। ঠাকুর বলেছেন: "ও যদি এত ভাল না হতো... তাহলে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা, কে বলতে পারে?" শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কারণে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রকাশিত, সেই একই সিদ্ধান্ত শ্রীমা সম্পর্কেও সত্য এবং বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিভূমি একত্ব। তা থেকেই ভালবাসার প্রস্রবণ। মায়ের জীবনের জমাটবাঁধা ভালবাসার পিছনে ছিল সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁর সেই 'এক'কে দেখা। জ্ঞানীর ভাষায় সেই এক হলেন ব্রহ্ম বা আত্মা, মায়ের ভাষায়—'আমার ছেলে বা সন্তান'। বলেছেন: "জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে।" এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত সন্তান-রূপে দেখা মায়ের সে-ভাবেরই চরম প্রকাশ বা নিদর্শন।

সর্বসাধনে সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবত শঙ্কিত হয়েছিলেন শ্রীমাকে কাছে রাখতে। তাই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমায়ের দেহাবলম্বনে অত বেদান্তবিচার এবং দেহের অনিত্যতা সিদ্ধান্ত! এবারে শ্রীমায়ের বদলে যেন অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং! যেন ভয়তরাসে! তাই হয়তো বা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঠাকুরের শ্রীমাকে শংসাপত্র দান: "ও যদি এত ভাল না হতো... " ইত্যাদি। আর শ্রীমায়ের দৃষ্টিভঙ্গি? শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্শ্বে শায়িতা শ্রীমায়ের যে-আঁচলখানি শরীরে বিছানো, তাতে বাঁধা রয়েছে অদ্বৈতজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তিভূমি একত্ব। সেই একত্বের ফলে জ্ঞানী হয় আত্মকাম, আত্মারাম। আর তখনি প্রবাহিত হয় প্রেমপ্রস্রবণ। বিচার সোপান মাত্র। সিদ্ধান্ত একত্ব। তাতে শ্রীমা সর্বদা প্রতিষ্ঠিতা। তাই তো অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়ের আঁচল বিছানো বিছানায় শ্রীরামকৃষ্ণ শায়িত। জ্ঞানী দেখেন, সর্বত্র ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা জগতের নেই। মায়ের কাছে অদ্বৈততত্ত্বের নির্যাসের বহিঃপ্রকাশ মাতৃভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণে তিনি যে-ব্রহ্মকে দর্শন করেছেন, তা জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়; মায়ের কাছে তাঁর শিশুসন্তান। ❑

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব, ১৯৯৩, পৃঃ ৩২
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ২০০১, পৃঃ ৬৩
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, অখণ্ড, ১৯৯৬, পৃঃ ৬৯২
৪ ঐ, পৃঃ ৫৭৭
৫ ঐ, পৃঃ ৫৭৮
৬ শ্রীশ্রীসারদামহিমা—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৯৯, পৃঃ ৮১
৭ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৯৪, পৃঃ ২৮৯
৮ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১৯৮৫, পৃঃ ৪১৯
৯ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৫
১০ শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ২০০২, পৃঃ ১৬৮
১১ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪১৭
১২ শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, ১৯৭২, পৃঃ ৮৫
১৩ শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী, পৃঃ ৩৮০
১৪ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪১৮
১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব, পৃঃ ১৭৫
১৬ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৭৮৫
১৭ শ্রীশ্রীসারদামহিমা, পৃঃ ২৭
১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব, পৃঃ ১৭৫
১৯ ঐ
২০ শ্রীশ্রীসারদামহিমা, পৃঃ ৪৮
২১ শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী, পৃঃ ১১১-১১২
২২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৭৯
২৩ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৫১
২৪ ঐ, পৃঃ ৪২৪
২৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৮
২৬ ঐ, পৃঃ ৫১
২৭ ঐ, পৃঃ ২৯৬
২৮ ঐ, পৃঃ ২৩৫
২৯ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৪৬
৩০ বেদান্তদর্শনম্, ২য় ভাগ, ৩য় সং, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৬৮০
৩১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২৯৬
৩২ ঐ, পৃঃ ২৯০
৩৩ শ্রীশ্রীসারদামহিমা, পৃঃ ৭৫
৩৪ ঐ, পৃঃ ৫৯
৩৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৫১
৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ২য় ভাগ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৭৩

শ্রীরামকৃষ্ণের চার রসদ্দার পাঁচ সেবায়েত

দিলীপকুমার ভারতী*

সাধনকালে একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন : "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসেবশে রাখিস।" জগদম্বাও তাঁকে দেখিয়ে দেন, তাঁর রসদ (খাদ্যাদি) যোগাবার জন্য চারজন রসদ্দারকে পাঠানো হয়েছে। ঠাকুর একথা অনেকবার তাঁর ভক্ত-পার্ষদদের কাছে বলেছেন কিন্তু কিছু রহস্যময়তা ও অস্পষ্টতা তিনি রেখে দিয়েছেন, যথা :

(১) চারজন রসদ্দারের মধ্যে তিনজনের নাম তিনি করেছেন এবং দুজনের ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। রাসমণির জামাতা মথুরামোহন প্রথম এবং শম্ভুচরণ মল্লিক দ্বিতীয় রসদ্দার। সিমলার সুরেন্দ্র মিত্রকে (ঠাকুর কখনো 'সুরেন্দর', কখনোবা 'সুরেশ' বলে ডাকতেন) বলেছেন 'অর্ধ রসদ্দার'। চতুর্থ কাউকে তিনি রসদ্দার বলে চিহ্নিত করেননি।

(২) এই তিনজন মিলে সংখ্যাগতভাবে তিন হতে পারে আবার মর্যাদা বা গুণগতভাবে আড়াইও হতে পারে। কোন্‌টা ঠিক, তা কিন্তু ঠাকুর কোনদিন খুলে বলেননি। ফলে বাকি একজন না দুজন রসদ্দার ছিলেন, সেব্যাপারে রহস্য রয়েছে।

(৩) কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পরম ভক্ত এবং কার্যত রসদ্দার বলরাম বসুকে ঠাকুর রসদ্দার বলে কারো কাছে উল্লেখ করেননি। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম স্বামী সারদানন্দ তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ জানিয়েছেন, বলরাম বসু ঠাকুরের আহার্যের জন্য সবকিছু যোগাতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি। আর যেসব ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিকট রাত্রিযাপন করতেন—তাঁদের জন্য সুরেশ মিত্র লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[১]

এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শুধু বলরাম বসুই নন, সমগ্র বসু-পরিবার বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : " 'বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা'—কর্তা-গিন্নি হইতে বাটির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ।" শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িকে রহস্য করে বলতেন 'মা কালীর কেল্লা'। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : "কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটিকে তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের গৃহে অন্নগ্রহণ করতে খুব ভালবাসতেন; বলতেন : "বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুরসেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা। ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।"[৩] বলরাম যে ঠাকুরের রসদ যোগাবেন, জগদম্বা আগেই জানিয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে বলতেন।

মহিমাচরণকে তিনি বলেছিলেন : "কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—নাহলে মিছরি এসব দেবে কে। আর এঁকে (শ্রীমকে) দেখেছিলাম।"[৪]

'মিছরি এসব দেবে কে' বলে শ্রীরামকৃষ্ণ কার্যত বলরামের রসদ্দারি উল্লেখ করলেন, কিন্তু স্পষ্টোচ্চারণে তা করে যাননি। স্বামী সারদানন্দও বলেছেন : "বলরামবাবুকে ঠাকুর তাঁহার রসদ্দারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনো নির্দিষ্ট করিয়াছেন—একথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরূপ সেবাধিকার দেখিয়াছি তাহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথুরবাবু ভিন্ন অপর রসদ্দারদিগের সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।"[৫]

তাই বলা যায়, স্বামী সারদানন্দ বলরাম বসুকে ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার বলে চিহ্নিত করেছেন, ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি না দিলেও। সারদানন্দজী আরো জানিয়েছেন : "হিসাবে বাকি আর দেড়জন রসদ্দার—কোথায় তাঁহারা? আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকানিবাসিনী মহিলা (সারা. সি. বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড় মঠ স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন—তাঁহারাই কি ঐ দেড়জন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর অদর্শনে একথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?"[৬]

এ তো গেল রসদ্দার প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাঁর পাঁচ সেবায়েতের কথাও বলেছেন, যাঁদের মধ্যে দুজন তাঁর স্বীকৃত রসদ্দার। ১৮৮৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর তিনি ভক্তদের বলেন : "আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথমে সেজোবাবু (মথুরবাবু), তারপর শম্ভু মল্লিক—তাকে আগে কখনো দেখি নাই। ভাবে দেখলাম—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি। আর তিনজন সেবায়েত এখনো ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবরণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়।"[৭]

ঠাকুর এখানে সুরেন্দ্রকে একরকম রসদ্দার বলেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেবায়েত নয়। মথুরবাবু ও শম্ভু মল্লিককে তিনি

* *রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কাঁথি-নিবাসী, গবেষক।*

রসদ্দার সত্ত্বেও এখানে সেবায়েতও বললেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যা বললেন, তা হলো—তখনো তাঁর বাকি তিনজন সেবায়েত ঠিক হয়নি। অথচ এর আট মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর তিরোভাব ঘটেছে। এখান থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, বাকি সেবায়েতরা আসবেন তাঁর তিরোভাবের পর।

বাকি রসদ্দার ও সেবায়েতরা কারা কারা হতে পারেন সেব্যাপারে কিছু আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং এও আমরা দেখব, শ্রীরামকৃষ্ণ রসদ্দার ও সেবায়েতের মধ্যে কী পার্থক্য করেছিলেন। প্রথমে আমরা দেখব, কারা কোন্ কোন্ সময়ে রসদ্দার হয়েছেন।

❋ রসদ্দারগণ ❋

■ মথুরবাবু ■ স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ "প্রথম রসদ্দার মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।"[৮] শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম ১৮৫৩ সালে কলকাতা আসেন অগ্রজ রামকুমারের ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে। মথুরবাবু আমৃত্যু ঠাকুরের সেবা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৪ জুলাই

১৮৭১। তাহলে তাঁর রসদ্দারির কাল দাঁড়ায় ১৮ বছর। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ বলেছেন ১৪ বছর। ঠাকুর নিজেও ১৪ বছরই বলেছেন ঃ "মাকে যাই বললাম, মা এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে আর সাধু-ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকব। একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে।"[৯] তাহলে উলটো দিক থেকে হিসাব করলে দাঁড়ায়, মথুরবাবুর রসদ্দারি শুরু হয় ১৮৫৭ সাল থেকে। সত্যই তাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৩১ মে। ঐসময় কালীবাড়ির পূজক নিযুক্ত হন শ্রীরামকৃষ্ণ-অগ্রজ রামকুমার। বৎসরাধিককাল পরে রামকুমার রোগজর্জীর্ণ হওয়ার কারণে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এর অত্যল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয় এবং পূজক নিযুক্ত হন শ্রীরামকৃষ্ণ। অতএব সোজা হিসাবে মথুরবাবুর রসদ্দারির কাল দাঁড়ায় ১৫ বছর, কারণ রামকুমারের মৃত্যু হয়েছে '১২৬৩ সালের প্রারম্ভে' [স্বামী সারদানন্দের মতে] অর্থাৎ ১৮৫৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে।[১০] [১৮৭১–১৮৫৬ = ১৫ বছর]

সারদানন্দজী প্রদত্ত তথ্যটি তাই ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যে ১৪ বছর বলে উল্লেখ করেছেন? একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, ঠাকুরের পূজক হিসাবে নিযুক্তির সময় থেকেই মথুরবাবুর রসদ্দারি শুরু হয়নি। ১৮৫৬ সালে পূজক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় আত্মহারা হলেন। তাঁর জগদম্বার দর্শনলাভের ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শনের মর্মস্পর্শী বিবরণ স্বামী সারদানন্দ তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) তিনি জগদম্বার চকিত দর্শনলাভ করেন পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে। তারপর থেকে তাঁর জগদম্বাকে নিরন্তর দর্শনের বাসনা জাগে এবং তিনি দিব্যোন্মাদ হয়ে যান। এইসময় থেকে তাঁর পক্ষে প্রথাসিদ্ধভাবে পূজা করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারীরা ঠাকুরের সমালোচনা করতে থাকেন। মথুরবাবু কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মত্ততা ঠিকই বুঝেছিলেন এবং সর্বপ্রকারে তাঁকে সহায়তাদান করেছিলেন। উত্তরোত্তর সেটি তাঁর সেবায় পরিণত হয়। সেজন্য প্রকৃতপক্ষে মথুরবাবুর রসদ্দারির কালকে ধরতে হবে ১৮৫৭ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা-ই ধরেছিলেন। তাহলে মথুরবাবুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা তথা রসদ্দারির কালটি দাঁড়ায় ১৪ বছর।

■ শম্ভু মল্লিক ■ রসদ্দার মথুরানাথের পরই স্বামী সারদানন্দ বলেছেন রসদ্দার শম্ভু মল্লিকের কথা। "দ্বিতীয় দেড়জনের ভিতর শম্ভুবাবু মথুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশববাবু প্রমুখ কলিকাতার ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্ধ রসদ্দার সুরেশবাবু...।"[১১]

বোঝা যাচ্ছে, মথুরানাথের মৃত্যু ও শম্ভুবাবুর ঠাকুরের সেবাধিকার লাভের মধ্যে কালের একটা ব্যবধান রয়েছে। সেটি কত? তবে শম্ভুবাবুর রসদ্দারির কাল যে প্রায় চারবছর তা স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন ঃ "প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন।"[১২]

কিন্তু শম্ভুবাবুর মৃত্যুর কালটি নির্দিষ্ট করেননি সারদানন্দজী। শম্ভুবাবুর রোগটি ছিল বহুমূত্র এবং ঐ রোগে তাঁর জীবনান্ত হয়েছে, তা বলা হয়েছে। ক্রিস্টোফার ঈশারউডের গ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ' থেকে শম্ভুবাবুর মৃত্যুর বছরটি জানা যায়। এখানে আমরা দুটি তথ্য পাচ্ছি ঃ (ক) ১৮৭৬ সালে শম্ভুবাবুর বহুমূত্র রোগে মৃত্যু হয়। (কিন্তু মাস বা তারিখ বলা হয়নি) (খ) তার পরেই বলা হয়েছে ঃ "একই বৎসর (অর্থাৎ ১৮৭৬) মার্চ মাসে চন্দ্রার (চন্দ্রামণিদেবী—শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী) মৃত্যু হয় ৯৪ বৎসর বয়সে।"[১৩]

এথেকে অনুমিত হয়, চন্দ্রামণিদেবীর মৃত্যুর আগেই শম্ভুবাবুর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী সারদানন্দও সেভাবেই বর্ণনা করেছেন—প্রথমে শম্ভুবাবুর মৃত্যু এবং পরে চন্দ্রামণিদেবীর মৃত্যু। অতএব শম্ভুবাবুর মৃত্যু হয়েছে ১৮৭৬-র গোড়ায় (জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি)—এটি বোঝা যাচ্ছে। এখান থেকে হিসাব করলে বলা যায়, শম্ভুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধিকার পান ১৮৭২-এর গোড়ায় অথবা ১৮৭১-র শেষের দিকে।

মথুরবাবুর মৃত্যু হয়েছে ১৮৭১-র জুলাই মাসে। তাহলে মথুরবাবুর মৃত্যু ও শম্ভুবাবুর সেবাধিকারলাভের মধ্যে কালের

ব্যবধান মোটামুটিভাবে প্রায় মাস ছয়েক—এমনটাই দাঁড়ায়। এই কালে ঠাকুরের সেবাধিকার কে লাভ করেছিলেন? সেই তথ্য নির্দিষ্টভাবে দিয়েছেন সারদানন্দজী :

"ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুরবাবুর মৃত্যুর পর পানিহাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভুবাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভুবাবুকে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া যখন নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণিবাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও অধিককাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।"[১৪]

■ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরিন্দর বা সুরেশ) ■ শম্ভুবাবুর কথা বলার পরই স্বামী সারদানন্দ বলেছেন : "অর্ধ রসদ্দার সুরেশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব হইতে চারি-পাঁচ বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।"[১৫]

এই সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) পরের মাসে বরানগরে মুনশিবাবুদের এক ভগ্নজীর্ণ গৃহে 'বরানগর মঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উত্তরকালে 'বেলুড় মঠ'-এ উত্তীর্ণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য তাঁকে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীর (৯০ কাশীপুর রোড) এক দ্বিতল কক্ষে আনা হয়। এর ভাড়া ছিল মাসিক ৮০ টাকা। এত টাকা ভক্তদের পক্ষে দেওয়া কষ্টকর বলে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রনাথকে আদেশ করেন ঐ অর্থ ব্যয় করতে। সুরেন্দ্রনাথ তা সানন্দে পালন করে যেতে থাকেন। তিনি যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন।[১৫]

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে আনা হয় ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ এবং ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ তাঁর দেহাবসান হয়। কাশীপুরের এই বাড়িটির 'লিজ' নেওয়া ছিল আগস্ট (১৮৮৬) পর্যন্ত। যেসব ভক্ত ঠাকুরের সেবা করেছিলেন, তাঁরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গৃহে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তাঁরা থাকবেন কোথায়? তখন সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন তাঁদের সাহায্যার্থে এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি মাসে ঐ ৮০ টাকা করে দিয়ে যাবেন।[১৬]

নরেন্দ্রনাথ তখন বরানগরে ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত বাড়িটি মাসিক অল্প টাকা ভাড়ায় ঠিক করেন। এখানেই সূচনা হয় বরানগর মঠের—১৯ অক্টোবর ১৮৮৬।[১৭] পরে ১৮৯২ সালে এখান থেকে আলমবাজারে (৯৫ দেশবন্ধু রোড) এক দোতলা বাড়িতে মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় মঠ সরিয়ে নেওয়া হয়। তার আগেই সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। এখান থেকে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে উঠে গেছে অনেক পরে—১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮।[১৮]

স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অর্ধ রসদ্দার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগের পর চার-পাঁচ বছর সেবা করেছেন তাঁর ভক্তদের এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তা করেছেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯০-১৮৯১ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সেপর্যন্ত মাসিক ৮০ টাকা করে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তদের সাহায্য করে গেছেন—এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার অধিকার তিনি পান কবে থেকে?

স্বামী সারদানন্দ বলেছেন : সুরেন্দ্রনাথ "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যেসকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।"[১৯] এখন জানা দরকার সুরেন্দ্রনাথ ঠিক কবে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের মতে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অদর্শনের ছয়-সাত বছর আগে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাহলে দাঁড়ায়—১৮৭৯-১৮৮০ সালে তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

ক্রিস্টোফার ঈশারউডের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, রামচন্দ্র দত্ত এবং তাঁর মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং তাঁরা '১৮৭৯ সালের শেষের দিকে' প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দর্শন করেন।[২০] রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর একজন ভক্ত হয়ে পড়েন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন রামচন্দ্রের বন্ধু। রামচন্দ্র বন্ধুকে সবসময়ই বলতে থাকেন, তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) যেন তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যান। সুরেন্দ্রনাথ খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, একে সুরেন্দ্রনাথ ধনীলোক, তায় তাঁর কয়েকটি কুঅভ্যাস ছিল। কিন্তু ক্রমাগত বন্ধুর চাপে শেষে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য হন এবং বলেন, যদি তিনি দেখেন দক্ষিণেশ্বরের সাধু একজন ভণ্ড, তাহলে তিনি তাঁর কান মলে দিয়ে আসবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তপরিবৃত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করার প্রয়োজনবোধ করলেন না, সরাসরি বসে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি সুরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেই বলতে লাগলেন সকলের উদ্দেশে : "বানরের বাচ্চা মাকে দেখলে ছুটে গিয়ে মাকে দুহাতে ধরে তার পেটের নিচে ঝুলে পড়ে। মা এগাছ-সেগাছে লাফ দেয়। বাচ্চা জোর করে মাকে ধরে থাকে, কিন্তু পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আর বিড়ালের বাচ্চাকে দেখ। সে চুপটি করে বসে থাকে। মা-ই তাকে ঘাড়ে ধরে এদিক-ওদিক নিয়ে যায়। তার পড়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই—মা-ই তাকে ধরে রয়েছে। এই হলো তফাত—তোমাকে নিজে করার

আর মা যা করার করাবেন বলে মা বা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে।" ব্যস্, ঐ একটি উপদেশেই সুরেন্দ্রনাথের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। ফেরার পথে রামচন্দ্রকে তিনি বললেন—দক্ষিণেশ্বরের সাধুই আমার কান মলে দিলেন![21]

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণে এমন মজলেন যে, আর কাছ-ছাড়া হতে চান না। তিনি তারপর দিনের কাজের শেষে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসর্গ করতে লাগলেন; রাত্রিতেও থাকতে লাগলেন। রাত্রিবাস করার সুবিধার্থে সুরেন্দ্রনাথ নিজের একপ্রস্থ বিছানা এনে দক্ষিণেশ্বরে রাখলেন কিন্তু তাঁর নিজের নিত্য দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস হলো না। কেন হলো না, তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখেই শোনা যাক : "সুরেন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাকবে বলে একটা বিছানা এনে রেখেছিল। দু-এক দিন এসেও ছিল, তারপর তার পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন সুরেন্দ্র আর কি করে? আর রাত্রে থাকার যো নাই!"[22]

সুরেন্দ্রের নিত্য দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস হলো না বটে, কিন্তু তাঁর বিছানাটি রইল। সে-বিছানায় অপর ভক্তেরা রাত্রিতে শুতে লাগলেন। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ভক্তদের রাত্রিবাসের সুবিধার্থে আরো বিছানার ব্যবস্থা করেন। আর সেইসঙ্গে তাঁদের জন্য ডাল-রুটিরও। অতএব এতে ভুল নেই যে, সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের অল্পদিন পর থেকেই তাঁর এমত সেবার কাজ শুরু করেছিলেন। সেই ভক্তসেবা পরে কাশীপুরে উদ্যানবাটী এবং তৎপরে ঠাকুরের দেহাবসানের পর বরানগর মঠ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল—আমৃত্যু।

রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৭৯ সালের শেষের দিকে, যা হতে পারে ১৮৭৯-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। তাহলে সুরেন্দ্রনাথের প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের সৌভাগ্য হয় ১৮৭৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৮০ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে। স্বামী সারদানন্দ তেমন কথাই বলেছেন। তাহলে সুরেন্দ্রনাথের রসদ্দারির কালটি মোটামুটি এরকম : (ক) ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬-র আগস্ট পর্যন্ত = ৬ বছর বা তারও কিছু বেশি অথবা (খ) ১৮৮৬-র আগস্ট থেকে ১৮৯১ = ৫ বছর বা কিছু বেশি।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, সুরেন্দ্রনাথের সেবাধিকারের কালটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে এবং তাঁর দেহাবসানের পরবর্তী কালে প্রায় আধাআধি বিভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন এমনটা হবে। এজন্যই তিনি সুরেন্দ্রনাথকে অর্ধ রসদ্দার বলে পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন। 'পূর্ণ' বা 'অর্ধ' অভিধাগুলি গুণবাচক হিসাবে তিনি উল্লেখ করেননি, এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। না হলে মথুরবাবু ১৪ বছর সেবা করে আর শম্ভুবাবু ৪ বছর সেবা করে পূর্ণ সেবাধিকারী বা রসদ্দার বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেচিত হতেন না।

অতএব রসদ্দার হিসাবে আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনজনের হিসাব পাচ্ছি—মথুরবাবু, শম্ভু মল্লিক এবং সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এবার চতুর্থজন। [ক্রমশ]

উল্লেখপঞ্জী ও টিকা

সঙ্কেত :

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
পূর্বকথা ও বাল্যজীবন — ১ম ভাগ (১৯৯৩ সং) — লীলাপ্র., ১
সাধকভাব — ঐ — লীলাপ্র., ২
গুরুভাব—পূর্বার্ধ — ঐ — লীলাপ্র., ৩
গুরুভাব—উত্তরার্ধ — ২য় ভাগ (১৯৯৫ সং) — লীলাপ্র., ৪
দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ — ঐ — লীলাপ্র., ৫
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, কথামৃত ভবন প্রকাশিত
যথাক্রমে—কথামৃত ১, ২, ৩, ৪, ৫
৩ Life of Ramakrishna—Romain Roland —L.R./R.R.
৪ Ramakrishna and his disciples—Christopher Isherwood —ঈশারউড
৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৮৭ —সমকালীন
৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৯৯৯ —বাণী-রচনা
৭ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৭৫ —লোকমাতা

তথ্যসূচি

১ লীলাপ্র., ৪।১৩৯
২ ঐ, ৪।১৪০
৩ ঐ, ৪।১৩৮-১৩৯, ঈশারউড, পৃঃ ২৪২
৪ কথামৃত, ৪।২৩৯, ৪।২৮৩, ২।৮৭
৫ লীলাপ্র., ৪।২৩৯
৬ ঐ, ৪।১৪০
৭ কথামৃত, ৪।২৮৩
৮ লীলাপ্র., ৪।১৪০
৯ কথামৃত, ৪।২৪০ (সেজবাবু : রানী রাসমণির সেজ জামাতা—মথুরানাথ বিশ্বাস)
১০ লীলাপ্র., ২।৫৯, ৭৮
১১ ঐ, ৪।১৪০
১২ ঐ, ২।২২৫
১৩ ঈশারউড, পৃঃ ১৫১-১৫২
১৪ লীলাপ্র., ২।২২৩, পাদটিকা
১৫ ঈশারউড, পৃঃ ২৯২
১৬ ঐ, পৃঃ ৩০৮
১৭ রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি ও কর্মরীতি—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', ৩১ মে ১৯৯৭, পৃঃ ৫২/২
১৮ বাণী-রচনা, ৯।৪৪, পাদটিকা
১৯ লীলাপ্র., ৪।১৩৯
২০ (ক) ঈশারউড, পৃঃ ১৬৮; ঈশারউড লিখেছেন : "towards the end of 1879"
(খ) লীলাপ্র., ৫।২৯; এখানে বলা হয়েছে—কেশবের সঙ্গে প্রায় চার বছর পরে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের/১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে রামচন্দ্র ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেশবের সঙ্গে ঠাকুর নিজেই গিয়ে দেখা করেন ১৫ মার্চ ১৮৭৫ (২ চৈত্র ১২৮১)। দ্রঃ রবিজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল, ২।৫৭
(গ) লীলাপ্র., ২।২২৭
২১ ঈশারউড, পৃঃ ১৭২-১৭৩
২২ কথামৃত, ২।১৭৫

ফিরে দেখা

বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান স্বামী ওঙ্কারানন্দজী [অনঙ্গ মহারাজ (১৮৯৪-১৯৭৩)] বেলুড় মঠে যোগদানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্যমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজীই তাঁকে সন্ন্যাসদীক্ষা দান করেন। গভীর শাস্ত্রানুরাগী, সুবক্তা ও সঙ্গীতপ্রিয় স্বামী ওঙ্কারানন্দজী ছিলেন কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং 'বিবেকানন্দ-পাগল'। ১৯৬৬ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। 'হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রম' থেকে পূজ্যপাদ মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাণী ও স্মৃতিকথা সম্বলিত একটি গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই।—সম্পাদক

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে কলেজ জীবনের প্রারম্ভে একদিন এক বন্ধু বলল: "তোকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব—সেখানে গেলে খুবই আনন্দ পাবি। শহরের খুবই কাছে অথচ বাগান, পুকুর ইত্যাদি গ্রাম্য পরিবেশ।" একদিন অপরাহ্ণে বন্ধুর সঙ্গে পৌঁছানো গেল ঐ আকাঙ্ক্ষিত স্থানে। সত্যই পারিপার্শ্বিক দৃশ্য খুবই মনোরম! সামনেই পুকুর, পুকুরের পূর্বপাড়ে একটি ছোট মন্দির। মন্দিরের মধ্যে বেদির ওপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশাল পট এবং তাঁর দুপাশে একটু নিচের দিকে শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আলোকচিত্র শোভা পাচ্ছে।

পুকুরের চারপাশে কয়েক পাক ঘুরতে গিয়ে সামনেই এক বলিষ্ঠ তেজোদীপ্ত মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াবসনধারী সাধুর দর্শন হলো। তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালাম। পরে শুনলাম ইনি এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী (অনঙ্গ মহারাজ)। ব্যক্তিগত আলাপচারিতার পর মহারাজের নির্দেশে নাটমন্দিরে এসে খানিকক্ষণ বসলাম। বসলাম মানে একদৃষ্টে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকা, কারণ তখন জপ-ধ্যান কিছুই জানতাম না। কিছুক্ষণ আশ্রমের সুন্দর পরিবেশে থেকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে এবং মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে বাড়ির পথে এগোলাম। কারণ, সন্ধ্যার আগেই ঐ নির্জন পথ অতিক্রম করতে না পারলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। ফেরার সময়ে মহারাজ আবার আসতে বললেন। পরে জেনেছিলাম, ঐ জায়গাটির নাম—'কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ'। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে রামচন্দ্র দত্তের এই বাগানবাড়িতে এসে ঐ পুকুরের ধারে বসে ভক্তিপ্রসঙ্গ করেছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর গৃহী ভক্তেরা তাঁর পূতাস্থির অংশবিশেষ এখানে সমাধিস্থ করেছিলেন।

আমার ছাত্রজীবনে কলেজের ছুটির পর প্রায় রোজই বাদুড়বাগান থেকে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে যেতাম এবং মহারাজজীর পূত সঙ্গ করে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। ঐসময়ে তাঁর সৎ ও প্রাণোচ্ছল উপদেশাবলীতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার মতো অনেক যুবকেরই ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগলাভ হয়েছিল।

মহারাজের স্বভাব ছিল 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'। ভিতরটা ছিল অতিশয় কোমল ও দয়ালু, কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি বজ্রের থেকেও কঠোর হতেন। মঠে এসে কেউ সাংসারিক কথাবার্তা বললে খুবই রেগে যেতেন। বলতেন: "ভগবান তো তাঁকে স্মরণ-মনন করার জন্য সময় ও সুযোগ করে দেন, কিন্তু আমরা এমনি হতভাগ্য যে, তাঁর দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করি না।" তিনি পবিত্রতা ও সরলতার ওপর জোর দিতেন। নাটমন্দিরে প্রবেশের আগে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে বলতেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, সাধারণ কথা বলতে বলতে যখন ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রসঙ্গ উঠত, তখনি আগে হাত-পা-মুখ ধুয়ে এসে তিনি ঐপ্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। বলতেন, উচ্ছিষ্ট মুখে কখনো ঠাকুরদেবতার প্রসঙ্গ করা উচিত নয়। আমরা মঠে গেলে প্রথমে ঠাকুরের সামনে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান ও প্রণাম করার পর মহারাজকে গিয়ে প্রণাম করতাম—এটাই ছিল তাঁর নির্দেশ। চিন্তা করলে মনে হয়, এগুলি তো সাধারণ ঘটনা কিন্তু তিনি বলতেন, ভাল সংস্কার বা চিন্তাধারা জীবনের শৈশব থেকে অভ্যাস না করলে পরে আর হয়ে ওঠে না।

শাস্ত্র ছিল তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। প্রতি রবিবার সকালে তিনি মঠে উপনিষদের ক্লাস এবং বিকালে 'কথামৃত' বা 'গীতা' পাঠ করতেন। কাশীতে থাকার সময় সেখানকার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে ১৯৩৫ সাল থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর অধ্যক্ষ থাকার পর ১৯৫১ সালে তিনি যোগোদ্যান মঠে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন। প্রাচীন সাধুদের কাছে শুনেছি—প্রথম জীবনে ওঙ্কারানন্দজী কথামৃতকার শ্রীম-র খুব সঙ্গ করেছিলেন এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মর্টন ইনস্টিটিউশন' থেকে ১৯১২ সালে এণ্ট্রান্স এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। ঐবছরই তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে

** পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, সল্ট লেক-নিবাসী বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যেই সুস্পষ্ট।*

মঠে যোগদান করেন। তিনি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মহারাজ আমাদের মতো যুবকদের স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পড়তে খুবই অনুপ্রাণিত করতেন। বিশেষত যাদের মন দুর্বল ও চঞ্চল, পড়াশোনাতে একাগ্রতার অভাব —তাদের উপদেশ দিতেন: "পড়ার টেবিলের সামনে স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভাষণরত ছবিটি রাখবি এবং ঐ ছবির তলায় গীতার 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।/ ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।'—এই শ্লোকটি লিখে রাখবি; পরীক্ষার সময়ে বা মানসিক দুর্বলতায় ঐ ছবির কথা চিন্তা করবি।" তাঁর এই উপদেশ আমার জীবনের মূলমন্ত্র করে রেখেছি। ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষার হল-এ স্বামীজীর ঐ ছবির চিন্তার ফলে সবরকমের দুর্বলতা, জড়তা চলে গিয়ে মনে খুব উৎসাহ পেতাম এবং সব পরীক্ষাতেই কৃতকার্য হতাম।

মহারাজ ছাত্রাবস্থায় মনকে খুব সংযত করতে বলতেন। জোর দিতেন চরিত্র ও সঙ্গগুণের ওপর, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেও নিষেধ করতেন। সিনেমা দেখা বা অপরিচিত স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা বলতেও নিষেধ করতেন। কোন কাজ করব বললে সেটা ফেলে না রেখে প্রাণপণে যথাসময়ে কাজটা শেষ করতে বলতেন। মহারাজ বলতেন: "সত্যপথে এবং সত্যকে আঁকড়ে জীবনে চলা উচিত। তাই তো শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'সত্যই কলির তপস্যা, সত্যতে যার আঁট নেই, তার কিছু হবে না।' "

তাঁর উপদেশ: " 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পড়া ভাল, কিন্তু এখন এই মন-বুদ্ধি নিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে পারবি না। অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে জানতে বা বুঝতে গেলে আগে স্বামী বিবেকানন্দকে জানতে বা পড়তে হয়। স্বামীজীর জীবনী পড়লে বুঝবি কী কঠোর বাস্তব প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং আমাদের সকলের কাছে তাঁর জীবনকে আদর্শ হিসাবে রেখে গেছেন। তাঁর জীবন ছিল ঠাকুরময়।" পরবর্তী কালে তাঁর এই উপদেশ যে কত মহৎ ও অনুসরণযোগ্য তা বুঝতে পারি। তাঁর কথামতো স্বামীজীর জীবনী ও রচনাবলী, গীতা এবং উপনিষদ্ পাঠের পর যতবার 'কথামৃত' পড়ি, ততবারই নতুন করে প্রেরণা পাই। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য দিলীপকুমার রায় ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু; দুজনেরই জন্ম ১৮৯৭ সালে। লণ্ডনে দুজনে একইসঙ্গে থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। একদিন নেতাজী দিলীপ রায়কে বলেছিলেন: "নতুন কথা কিছু শোনাতে পার, যা শুনলে আমি মুগ্ধ হয়ে যাব?" দিলীপ রায় প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন: "আমি শ্রীম-রচিত 'কথামৃত' পঞ্চাশবার পড়েছি এবং এখনো পড়ি ও আনন্দ পাই।" নেতাজী অবাক হয়ে তা শুনলেন এবং ঐদিন থেকে 'কথামৃত' পড়তে শুরু করলেন।

ওঙ্কারানন্দজীর উপদেশাবলীর সারকথা ছিল— অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সর্বতীর্থের সার। যে-কাজই করি না কেন, সেই কাজটি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করলে ধর্মের পথে বা উন্নতির পথে চলতে শুরু করব। স্বামীজীর আদর্শকে ধরে থাকাই বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঁচার একমাত্র উপায়। আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তিই হলো ধর্ম তথা উন্নতির মাপকাঠি।

মাঝে মাঝে মহারাজকে দেখতাম খুব হতাশ হয়ে পড়তেন। অবশ্য নিজের কারণে নয়। বলতেন: "তোরা (ভক্তেরা) হচ্ছিস স্প্রিং-এর গদি দেওয়া চেয়ার। যতক্ষণ চেপে বসে থাকিস, ঠিক আছে। কিন্তু উঠে পড়লেই গদি যেমন ছিল, সেরকমই হয়ে যাবে। এখানে আমার কাছে দেখছি তোদের ভক্তি, বিনয়ের ভাব। যখনি আশ্রমের গেট পার হবি, তখনি আবার পূর্বের ভাব। সেজন্য ধর্মভাব, ধর্মকথা সবসময়ে মনে ধরে রাখার অভ্যাস ও চেষ্টা করতে হয়, মনকে হালকাভাবে ছেড়ে দিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা।" তাই মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা আনতে তিনি স্বামীজীর মর্মস্পর্শী বাণী ও আদর্শ নিত্য স্মরণ করার ওপর জোর দিতেন। আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করে তিনি বলতেন: "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। নিজের ওপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস।" "Faith, Faith, Faith in ourselves, faith, faith in God—this is the secret of greatness." তিনি আমাদের স্বামীজীর অমর বাণী শোনাতেন: "The old religion said that he was an atheist who did not believe in God. The new religion says that he is the atheist who does not believe in himself."

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন সঙ্গদোষে কুপথে গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করে খুব মুষড়ে পড়েছিল। সে মহারাজের কাছে এলে তিনি স্বামীজীর কথা স্মরণ করলেন: "Never mind failures, these are the beauty of life, poetry of life." জীবনে চলার পথে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে, কিন্তু তাতে হতাশ না হয়ে আরো দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশোনা করে যেতে তিনি বলতেন। স্মরণ করাতেন স্বামীজীর উক্তি: "Let a man go down as low as possible but there must come a time when out of sheer desperation he will take an upward curve and have faith on himself."

মহারাজ নিবেদিতার কথা শোনাতেন। একবার স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেনঃ "যতই বয়স বাড়ছে ততই মনে হয়, পৌরুষ ও বীরত্বের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে।" স্বামীজীর কথা—প্রথমে নিজেকে তৈরি কর, নিজে ভাল হও, তবেই অপরকে ভাল করতে পারবে। "First let us be Gods and then help others to be Gods; Be and Make—let this be our Motto."

মহারাজ আমাদের জিজ্ঞাসা করতেনঃ "তোদের জীবনের লক্ষ্য কি?" বলতেনঃ "ভবিষ্যতে কী হতে চাস, তা জীবনের প্রথম থেকেই ঠিক করতে হবে। স্বামীজীর উক্তি—'If a man with an ideal makes a thousand mistakes. I am sure that a man without an ideal makes fifty thousand. Therefore it is better to have an ideal.'" অনঙ্গ মহারাজ নিজে শরীরচর্চা করতেন, ডাম্বেল ও বারবেল নিয়ে ওঠা-বসা করতেন, আমাদেরও হাত লাগাতে বলতেন। এছাড়াও প্রতিদিন প্রায় ৭-৮ মাইল হাঁটতেন। বলতেন, দুর্বল শরীর মানে দুর্বল মন। স্বামীজীর বাণী শোনাতেনঃ "What our country now wants are muscles of iron and nerves of steel.... Our main fault is physical weakness. The weak brain is not able to do anything. First of all our young men must be strong. Religion will come afterwards."

কেউ মন্দির-দর্শনে এলে তাঁর প্রশ্ন ছিলঃ "ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে প্রণাম করেছেন?" না করে থাকলে খুব ধমক দিতেন, বলতেনঃ "আগে মন্দিরে গিয়ে ৩০ মিনিট প্রার্থনা করুন, পরে কথাবার্তা হবে।" তাঁর বিশ্বাস ছিল—সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর আদর্শ নিয়ে যে-কর্মযজ্ঞ করে চলেছে, তার মূলে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অবিচল ভক্তি, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও সর্বোপরি তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা। তিনি আমাদেরও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে দিয়েছেন। কারোর কাছ থেকে তিনি টাকা-পয়সা বা প্রণামী নিতেন না; দিতে এলে বলতেন—মন্দিরে প্রণামী-বাক্স রাখা আছে, সেখানে দিলেই হবে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি সামান্য মনে হলেও এর মধ্যে গূঢ়তত্ত্ব বিদ্যমান। আমাদের আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁর চরণেই সবকিছু নিবেদন করতে তিনি শিক্ষা দিতেন। আর উপদেশ দিতেনঃ "যখনি মন্দির-দর্শনে আসবে তখন ঠাকুরসেবার জন্য দু-চার আনার বাতাসাও সঙ্গে আনবে।" একথার সারমর্ম হলো—"কর নাম ও দান, হবে কল্যাণ।"

সেসময়কার একটি ঘটনা মনে পড়ে। জনৈকা মহিলা মঠে এসে মহারাজকে প্রণাম করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কারণ তাঁর গুরুদেবের (সপ্তম প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ) দেহত্যাগ হয়েছে। মহারাজ মন দিয়ে সব শুনলেন এবং সমবেদনা জানালেন। পরে বুঝিয়ে বললেনঃ "গুরুদেব বলতে আমরা একজনকেই বুঝি—'শ্রীগুরু মহারাজ', যিনি মন্দিরে বসে আমাদের সকলকে দেখছেন ও চালনা করছেন। তা না হলে ভবিষ্যতে এত গুরুদেবরা আসবেন যে, তাঁদের নিয়েই আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে।" মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার জন্য কেউ ফল-মিষ্টি আনলে গ্রহণ করতেন না, সবকিছুই ঠাকুরসেবার জন্য মন্দিরে দিয়ে দিতে আদেশ করতেন।

পূজ্যপাদ অনঙ্গ মহারাজ সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের ওপর খুব জোর দিতেন। ভবিষ্যতে করব বলে অলসভাবে দিন কাটাতে নিষেধ করতেন। বলতেন, কত জন্মের পর এই মানবজন্ম, এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাঁর এইসব প্রাণবন্ত উপদেশাবলী যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল, তা এই পরিণত বয়সে পৌঁছে চিন্তা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর সব উপদেশই শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মিলে যেত। ❑

অনুষ্ঠান-সূচিঃ ফাল্গুন ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ
স্বামী অদ্ভুতানন্দ
মাঘ পূর্ণিমা
১২ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার
(২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)
শ্রীরামকৃষ্ণদেব
ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া
২৮ ফাল্গুন, শনিবার
(১২ মার্চ ২০০৫)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী
১ ফাল্গুন, রবিবার
(১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫)
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি
মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী
২৪ ফাল্গুন, মঙ্গলবার
(৮ মার্চ ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ
৭, ২২ ফাল্গুন
শনিবার, রবিবার
(১৯ ফেব্রুয়ারি, ৬ মার্চ ২০০৫)

মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ

স্বামী ত্যাগরূপানন্দ*

কথায় বলেঃ "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী", অর্থাৎ মানুষ যে-উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনে চলে, সেই অনুযায়ী তার সাফল্য আসে। এখন এই উদ্দেশ্য বা 'ভাবনা' একজনের জীবনে কি করে ঠিক হয়? একটি শিশু একটি পরিবারে জন্মায়; তারপর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের মাঝে সে বড় হতে থাকে। নিজের অজান্তেই পরিবারের সদস্যদের কাছে সে শিক্ষালাভ করে, কিছু কিছু আদবকায়দা ও সংস্কার সে গ্রহণ করে ফেলে। তার সংবেদনশীল মনে মায়ের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি পড়ে। মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ, প্রতিটি প্রাথমিক ধাপে মায়ের সস্নেহ লালন-পালন তার চতুর্দিকে যেন একটি স্নেহের বর্ম তৈরি করে দেয়। মায়ের কাছে তাই শিশুর প্রথম পাঠ নেওয়া। তাঁর কাছেই তার 'জীবনের উদ্দেশ্য'টি প্রথম আকার নিতে শুরু করে। ইংরেজিতে একটি কথা আছেঃ "The hand that rocks the cradle rules the world."—(মায়ের) যে-হাত শিশুর দোলনা আলোড়িত করছে, সেটি জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল লাগা, মন্দ লাগা কী অদ্ভুতভাবে সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে! বড় হয়ে উঠলে এর অনেকগুলি তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যতে রূপান্তরিত হয়।

শিশু আরেকটু বড় হলে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। এইবার তার কাছে আরো বৃহৎ সমাজের দরজা খুলে যায়। নানা পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে, হরেক রকম তাদের আচার-ব্যবহার। স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মনে তখনো জটিলতা প্রবেশ করেনি—বন্ধুদের সঙ্গে তাই সে অবাধে মিশে যায়।

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই কচি মনের গঠনে বেশ বড় ভূমিকা নেন। অনেক সময় আমরা মনে করি, একটি ছাত্র বা ছাত্রী ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্দিকে যাবে, সে-সিদ্ধান্ত সে কিছুটা বড় হয়েই গ্রহণ করে। কথাটা হয়তো ঠিক—তবুও মনে রাখা প্রয়োজন, ছোট বয়সের স্মৃতি পরবর্তী জীবনের একটি বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, যা অনেক ক্ষেত্রে মনের এক অবচেতন স্তরে লুকিয়ে রয়ে যায়। বিদ্যালয় থেকে আহরিত মূল্যবোধের যে-ভিত্তি তার মধ্যে তৈরি হতে শুরু করে—পরবর্তী জীবনে সেটি বড় আকারে প্রস্ফুটিত হয়।

কিছুটা বড় হলে শিশু তার নিজের জীবনে মায়ের ভূমিকা ছাড়াও বাবা, বিদ্যালয় ও সমাজের ভূমিকা বুঝতে শুরু করে। জগতে সে যে একা নয়, সকলকে নিয়েই যে সমাজ আবর্তিত হচ্ছে—একথা তার ধারণা হয়। স্কুলে পড়াকালীন কিন্তু একটি ছাত্র বা ছাত্রী নিজের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয় না, বিশেষত সে যতদিন নিচের ক্লাসগুলিতে রয়েছে। বাকি সকলের সঙ্গে একত্রে চলাই তখন তার কর্তব্য। মাঝে মাঝে কিছু পরীক্ষা রয়েছে, এইগুলির চাপে সে নিজেকে অপরের চেয়ে বেশি যোগ্য বলে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভবিষ্যৎ জীবনের অদ্ভুত অনিশ্চয়তা তাকে তখনো ঘিরে ধরেনি।

এই কালেই সময়ানুবর্তিতা ও বিদ্যালয়োচিত নানা আদবকায়দা সে শেখে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ভবিষ্যৎ জীবনে যেসব গুণগুলি ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে বড় স্তম্ভের কাজ করবে, পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিকে তাঁরা তাদের মনে গ্রথিত করেন। কিন্তু এছাড়াও আরেকটা ব্যাপার হয়, পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তারা একটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সে-স্বপ্নের স্পষ্ট চেহারা তাদের কাছে তখনো পরিস্ফুট নয়—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলছবির মতো সেটা ফুটে ওঠে মনের পর্দায়।

শিক্ষকমহাশয় হয়তো ক্লাসে জীববিজ্ঞান ভারি চমৎকার পড়ান, ফলে বাকি বিষয়গুলির চেয়ে জীববিজ্ঞান পড়তে তাদের বেশি ভাল লাগে। এ যেন একটি বীজ রোপণ হলো; এর ফলস্বরূপ জয়েন্ট এণ্ট্রান্সে ডাক্তারি পরীক্ষায় ভাল ফল, তারপর ডাক্তারি পেশায় চলে যাওয়া। অথবা কোন শিক্ষকের কাছে একটি ছাত্র ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ নেয়, তিনি স্কুলের বিজ্ঞান বিষয়টি তাকে পড়ান। ক্রমে তাঁর স্বপ্ন যেন ছেলেটির মধ্যে প্রবেশ করে—বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা ছেলেটি নিজ জীবনে যেন সফল করে। বহু ক্ষেত্রে কোন প্রতিভাবান অথচ দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষকগণ নিজের উপার্জন থেকেই পড়াশোনা করিয়ে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করেন।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শের প্রেরণাই মানুষকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে একমুখী করে তোলে। এই কারণে ছোটবেলাতেই ছাত্রকে মহৎ আদর্শের কথা শোনানো দরকার। ডেল কার্ণেগি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'How to Win Friends and Influence People'-এ বলেছেন, তাঁর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সাফল্যের কথা পড়েই সাধারণ মানুষ সেই পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা তখন সেই উদাহরণ সামনে রেখে নিজেরাও পরিশ্রম করতে শুরু করে। এই জেদ, জীবনে বড় কিছু করার তীব্র স্পৃহা ভিতরে যেন একটি আগুন জ্বেলে দেয়; বাকি সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে মন একটি লক্ষ্যে ধাবিত হয়, নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানুষ তখন সফল হয়।[১]

হয়তো সমাজে একজন মানুষের পক্ষে অর্থ উপার্জন খুবই জরুরি, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রয়োজন জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ।

** বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম আচার্য।*

একটি সমাজের তখনি উন্নতি হয়, যখন সমাজস্থ বহু মানুষের মধ্যে জীবনে বড় হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। এর জন্য চাই অধ্যবসায়, নিজের উদ্দেশ্যে অটল নিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রসার। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সততা ও নির্ভীকতা উদ্দেশ্যের সফলতা নিয়ে আসে। কিন্তু অন্যায় পথে অর্জিত সাফল্য কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বামীজী 'কর্মযোগ' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ জগতে কর্মই মানুষের প্রকৃত সাফল্যের নির্ধারক। নিজে কঠোর পরিশ্রম না করেও যদি ভুলক্রমে কোন সাফল্য চলে আসে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি কোথায় মিলিয়ে যায়—সূর্য উঠলে কুয়াশা মিলিয়ে যাওয়ার মতো। সত্যের তীব্র উষ্ণতা সমস্ত অন্যায় উপার্জনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; জীবন তখন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ, কিছু মিথ্যা জিনিসের সমষ্টি।[২]

মহাভারতে ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে বলেছেন ঃ

"ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥"[৩]

—ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আমি এই ঘোষণা করছি, তবু কেউ আমার কথা শুনতে চায় না; ধর্মপথে চললে অর্থ ও কাম্যবস্তু সবই (মানুষ) পেতে পারে; তবু কেন (মানুষ) এই ধর্ম সঠিকভাবে সেবা করে না?

মজার কথা এই, কোন একটি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করলে মানুষের মধ্যে ক্রমে উদারতা আসতে শুরু করে। শুধুই নিজের সাফল্য—এই চিন্তার মধ্যে যে একটি স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে, সে ধীরে ধীরে সেটি বুঝতে পারে। তার মধ্যে তখন সেবার ভাব আসে, অপরকে কখনো কখনো এগিয়ে দিয়ে সে নিজে পিছিয়ে আসে। মন কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যায়, তবুও সে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে। হিতোপদেশে (১০৬তম শ্লোক) তাই বলা হয়েছে ঃ

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"[৪]

—'এরা আমার নিজের, এরা আমার পর', ক্ষুদ্রমনা মানুষদেরই এই চিন্তা আসে। যাদের উদার ভাব, তাদের কাছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষই আত্মীয়তুল্য।

সাফল্যের একটি স্তরে ওঠার পর হঠাৎই মানুষের মনে এই চিন্তা আসে—এর পরে কি? একটার পর একটা পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে, তবু জীবনে একটি সময়ের বিন্দু এসে উপস্থিত হয়; তখন যেন একটা blind lane-এ (বন্ধ রাস্তায়) সে এসে হাজির হয়, ভবিষ্যতের পথ আর স্পষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু সময় তো থেমে থাকে না, শরীরেও বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করে, জীবন তখন একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট নৌকার মতো এগিয়ে চলে। অপরপক্ষে, সঠিকভাবে অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করলে নিজের ভিতরে একটা আনন্দের উৎস খুলে যায়। জগতে বেঁচে থাকার মধ্যে তখন একটা আলাদা মাত্রা যোগ হয়—সুরে, শব্দে, ছন্দে এই অপূর্ব সৃষ্টির স্পন্দন তখন নিজের অন্তরে অনুভব করা যায়।

কিভাবে কাজ করলে জীবনের এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়? এই পথকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে 'কর্মযোগ' বলা হয়েছে। বিশ্বের নানাবিধ কাজ যেন একটা বিরাট যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ; আমাদের ছোট-বড় বিবিধ কাজ যেন এই বিরাট হোমানলে এক-একটি আহুতি। আর ঈশ্বর বিরাট যজ্ঞরূপে আহুতিগুলি গ্রহণ করছেন। যে-ব্যক্তি সচেতনভাবে এই বিরাট বিশ্বচক্রে নিজের কর্মকে নিবেদন করে, তাঁর মধ্যে ক্রমে দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি কমে যায়, তখন কর্ম কেবল অপরের কল্যাণের জন্যই সাধিত হয়।[৫]

যেকোন কর্মের সঙ্গেই তার সাফল্যের প্রশ্ন এসে পড়ে। কারণ, সাফল্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই মানুষ কর্মে নিযুক্ত হয়। আবার এর উদগ্র নেশা তাকে অকৃতকার্যতার সম্ভাবনাকে ভুলিয়ে রাখে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করার প্রচণ্ড চাপ ছাত্রদের স্নায়ুকে প্রায়ই টানটান করে ফেলে। খবরের কাগজে আমরা অনেক সময়ে কোন বড় পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই কিছু অসফল পরীক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কথা পড়ি—সমাজ, সংসার ও সর্বোপরি নিজের ভিতরে যে প্রচণ্ড চাপ পরীক্ষার্থী অনুভব করে, তারই বিকৃত প্রকাশ এই ঘটনাগুলিতে। একবার পরীক্ষায় অসফল হলেও তারা তো আরেকবার চেষ্টা করতে পারে, তাছাড়া তাদের জীবনের অনন্ত সম্ভাবনাকে কেন একটি পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত করে দেবে?

অপেক্ষাকৃত বয়স্করা কমবয়সিদের স্কুলের বা কলেজের পাঠ্যক্রম দেখে চমকে ওঠে, তাকে অতিরিক্ত বোঝা বলে মনে করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচির পুনর্বিন্যাস করা হয়—যেটি আগে উঁচু ক্লাসে পড়ানো হতো ক্রমে সেটি নিচু ক্লাসে পড়ানো হয়; যোগ হয় কিছু নতুন বিষয়, আর বর্জন করা হয় কিছু অপ্রয়োজনীয় অধ্যায়। এই কারণে কম বয়সেই কখনো কখনো ছাত্রছাত্রীরা তাদের মা-বাবাদের চেয়ে বেশি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। চতুর্দিকে জ্ঞানের যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর সাম্প্রতিক কালে জগতের তথ্যভাণ্ডারকে ইণ্টারনেট নিয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এত তথ্য যে ছাত্রছাত্রীরা মাথায় রাখবে, সেগুলি তাদের ঠিক উপযুক্ত তো? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি—এই প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে। স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছে, কলেজ পড়ুয়াদের সংখ্যাও লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু দেশের সর্বাত্মক জাগরণ এখনো ঘটছে না কেন?

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর কাছে এই প্রশ্ন অনেকসময় বাহুল্য বলে মনে হয়; সে তো নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা, অর্থ, মান, যশ—এসবই চায়। তার সঙ্গে আবার দেশ, আদর্শবোধ—এসবের সম্পর্ক কি, প্রয়োজনই বা কি? স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাকে দেশের সব সমস্যার সমাধানের মহৌষধ বলে মনে করেছেন।[৬] তিনি বলেছেন, তথ্যের দ্বারা মনকে ভারাক্রান্ত

করার আগে সংযম ও মনঃসংযোগের অভ্যাস প্রয়োজন। মন যদি একবার তৈরি হয়ে যায়, তখন সেই উপযুক্ত যন্ত্র দিয়েই যাবতীয় জ্ঞানরাশি সহজে আহরণ করা যাবে।[৭]

প্রকৃত জ্ঞানী মনের বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা তথ্যের মধ্যে সাধারণ কিছু সূত্র খুঁজে বের করেন। তখনি শিক্ষাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেন—কিছু টুকরো ভাসা-ভাসা তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের হৃদয় ও মনের অন্তস্তলে পৌঁছে তাঁকে যেন নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে। তাঁর চরিত্রে, ব্যবহারে ও ভাবনায় এর ছাপ পড়ে। যেকোন সমস্যার মাঝে এইরকম মানুষ ধীর, স্থির হয়ে থাকেন। তিনি সমস্যাটিকে বুদ্ধি দিয়ে দ্রুত বিশ্লেষণ করেন এবং মরমি হৃদয় দিয়ে সমাধানের সূত্র বের করেন; অতঃপর দৃঢ়, অবিচলিত চিত্তে সূত্রটি কার্যকর করেন। এইভাবে শিক্ষার নির্যাস গ্রহণ করে তিনি নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করেন, তারপর অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে তাতে সংযোজন করেন নতুন মাত্রা।

এখন প্রশ্ন, বর্তমান অবস্থায় কি করে শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে উপযোগী করে তোলা যায়? পড়াশোনার চাপ মাঝে

বর্তমান সমস্যা

মাঝে ছাত্রদের যেন আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে ভাগ করে রাখে, ফলে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। পাঠ্যসূচি, পরীক্ষার ফলের আশা প্রভৃতি যেন ক্রমে তাদের গ্রাস করে ফেলে।

এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য বৃত্তির চর্চা করা দরকার। কিছু পরিমাণ শরীরচর্চা, খেলাধুলা তাই অত্যন্ত জরুরি। 'দৃঢ় শরীরের অন্তর্গত দৃঢ় মন'—এইটি লক্ষ্য হওয়া উচিত। তা না হলে দুর্বল শরীর, মন ও বুদ্ধির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সর্বদা বই নিয়ে বসে থাকলে অনেক সময়ই একটা সমাজ-বিমুখ ভাব চলে আসে। পড়াশোনার ফলাফলের পক্ষে এই ভাব উপকারী হলেও মানুষকে তা অসামাজিক করে তোলে। শরীরচর্চা ছাড়াও গান-বাজনা শোনা, জগতের বড় বড় সাহিত্যিকদের উপন্যাসাদি পড়া, কলা ও কৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে আগ্রহ—খুব প্রয়োজন। এর ফলে হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার হয়, নিজেকে জগতের অনন্ত জ্ঞানরাশির এক উৎসাহী পাঠক বলে মনে হয়, আর তখনি হৃদয় থেকে ক্ষুদ্রতা দূরে চলে যায়।

আমাদের স্কুল বা কলেজের পাঠ্যসূচির মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষার কোন পৃথক স্থান নেই। অথচ পড়াশোনার দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও যুবকদের মধ্যে যে-হতাশা, তা দূর করতে এই শিক্ষা

মূল্যবোধ শিক্ষা

অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশকে স্বামী বিবেকানন্দ জগতের ধর্মচিন্তার শ্রেষ্ঠ ভূমি বলে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্মবিষয়ক চিন্তা অপূর্ব ও গভীর। সেই অমৃতকে আমাদের নিজেদের জীবনে সিঞ্চন করা দরকার। আজকের দিনেও গীতায় বর্ণিত অপূর্ব জ্ঞানরাশি এবং স্বামীজীর জ্ঞানদায়িনী বাণী মানুষের জীবনে নতুন দিঙ্‌নির্দেশ করে দেয়, মানুষকে প্রেরণা দেয়।

অনেকের মনে আবার কখনো কখনো পাপবোধ এসে পীড়া দেয়, তাদের সঙ্কুচিত করে রাখে। স্বামীজীর দৃপ্ত আহ্বান—কোন মানুষই পাপী নয়। তিনি মানুষের অন্তরের দেবত্বের কথা বলেছেন, তাঁর অনন্ত সম্ভাবনার জয়গান করেছেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, এই সম্ভাবনাকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে কার্যকর করতে হবে। বেদান্তের সুউচ্চ তত্ত্বকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, সকলের মধ্যে ভগবান রয়েছেন। কারো মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি, কারো মধ্যে তাঁর প্রকাশ কম। ঈশ্বরের প্রকাশ যার মধ্যে বেশি, তাকে আমরা 'সৎ' বলে অভিহিত করি; আর যার মধ্যে তাঁর প্রকাশ কম, তাকে আমরা 'পাপী' বলি। মনের ওপর থেকে এই পাপবোধের আবরণ দূর করতে পারলেই সেই শুদ্ধ আধারে ভগবান উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হবেন, আর মানুষ তখন দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।[৮]

নিজেদের জীবনে এই শুদ্ধ চিন্তা গ্রথিত করতে গেলে নিত্য কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। নিত্য ব্যায়াম শরীরকে যেমন মজবুত রাখে, পবিত্র চিন্তার সঙ্গে রোজ কিছু সময়ের যোগাযোগ মনকে তেমন সতেজ করে রাখে।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ মনঃসংযোগের অভ্যাস বা ধ্যান মনে নানা চিন্তার তল পেতে সাহায্য করে। দুবেলা নিয়ম করে যদি পনেরো মিনিট মন থেকে সব দুশ্চিন্তা ও কর্মভাবনাকে দূর করে শান্ত হয়ে বসা যায়—তখনি মনের ভিতরে একটা শক্তি জাগতে শুরু করে। নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে ধ্যানের সাহায্যে উদ্‌ভ্রান্ত মনকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা হয়। ফলে যে-কাজগুলি ভাল করে না ভেবেই আমরা আগে করে ফেলেছি, সেগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্যগুলি ক্রমে প্রকট হতে শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে আবার একইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভিতর থেকে একটা সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়, আমরা তখন সতর্ক হয়ে যাই।

মনের প্রধানত তিনটি অবস্থা রয়েছে। ভগবদ্গীতায় এগুলিকে তিনটি গুণ বলা হয়েছে। তমোগুণে মনে ক্লান্তি, অবসাদ ও অপবিত্র চিন্তা আসে। রজোগুণে তীব্র কাজের ইচ্ছা জাগে—একটা কাজ শেষ করার আগেই পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। মন এই অবস্থায় যেন মানুষকে কিছুতেই শান্ত হয়ে থাকতে দেয় না, ক্রমাগত চরকিপাক দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে চলে। তৃতীয় অবস্থা সত্ত্বগুণের—যখন তীব্র কর্মের পরে মনে একটা প্রশান্তির ভাব আসে। তখন আর কর্মের ঢেউ এসে মনের শান্ত অবস্থাকে বিক্ষুব্ধ করে না, সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে যে আরো বৃহৎ একটা পরিকল্পনার রূপায়ণ হচ্ছে, তার ইঙ্গিত আমরা পাই।[৯]

কোন মানুষের মধ্যে এই গুণগুলির যেটির প্রাধান্য রয়েছে, তাকে সেই 'গুণাত্মক' বলে অভিহিত করা হয়।

যেমন বলা হয়—সে তমোগুণী অথবা সে রজোগুণী অথবা সে সত্ত্বগুণী।

যেকোন কাজ করতে গেলেই শরীর ও মনের যৌথ ক্রিয়া দরকার। কাজের প্রগতি কতটা হচ্ছে, সময়ের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা—এগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে নিত্য দিনলিপি (diary) লেখা খুবই উপকারি। যখন আমি জেনে যাব যে, আমার প্রতিটি কাজ আরেকবার (দিনলিপি লেখার সময়) পর্যবেক্ষণ করা হবে—তখন আমি কাজ করার আগে আরো সতর্ক হব। আগাম পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও দিনলিপির অবদান রয়েছে—কাজ করে ফেলে সেটা নথিভুক্ত করা ছাড়াও সময় বিভাজনের ক্ষেত্রে দিনলিপি সাহায্য করে।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে, নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা আরেকটি কার্যকর উপায়। বহু সময়ই নিজের সমস্যাকে আমরা অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই, তাতে তার চেহারা হয়ে ওঠে আরো ভয়ানক। সমমনস্ক মানুষের ক্ষেত্রে মতামত বহু সময় আমাদের মনের কোণে আলো ফেলে, নিজের মধ্য থেকে সমাধানের সূত্র তখন আপনিই বেরিয়ে আসে। একই ক্লাসে যারা পড়ছে, তাদের পারস্পরিক আলোচনাকে সর্বদা উৎসাহিত করা উচিত। এর ফলে স্বার্থপরতার ভাব কমে আসে, বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয় এবং অপরের সুখ-দুঃখকে নিজের বলে আমরা মনে করতে শিখি। তখন অপরকে ডিঙিয়ে গিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেও তাদের আর নিচু দৃষ্টিতে দেখার ভাব থাকবে না। আবার কোন কারণে নিজে অপরের থেকে পিছিয়ে গেলেও মনে হীনমন্যতার ভাব এসে দানা বাঁধবে না। কেননা প্রতিটি মানুষকেই বিধাতা কিছু গুণাবলী দিয়েছেন—সেগুলির দ্বারাই সে অনন্য, অপরের থেকে পৃথক। মানুষ যখন নিজের ভিতরে এই সোনার খনির সন্ধান পায়, তখন সে সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

প্রতিটি প্রাণীকেই বাঁচতে হলে সংগ্রাম (struggle) করতে হয়। এই সংগ্রামের দুটি রূপ—বাইরের এবং ভিতরের। জীববিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তনবাদ আলোচিত হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, যে-প্রজাতি অধিকতর শক্তিশালী সেইটিই রয়ে যায়, অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রজাতি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। এই পৃথিবীতেও বুদ্ধি বা শারীরিক শক্তিতে যে-মানুষ বেশি বলবান—সে-ই ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে, অন্য মানুষ তার অধীনস্থ হয়।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত পাওয়া যায়। তাঁর মতে, এই সংগ্রাম ও ধ্বংসের তত্ত্ব মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, জগতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ—তাঁরা অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করেন, অন্যের দুঃখে নিজেরা ব্যথিত হন। অতএব 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) কেবল ধ্বংসের দ্বারা নির্ধারণ হয় না, হৃদয়বত্তা দিয়েও তার মূল্যায়ন হয়ে থাকে।[১০]

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিটি মানুষের জীবনে এই ভাল ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, কর্তব্য ও অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যারা বীরের মতো এই সংগ্রামের সম্মুখীন হয়, তারাই একে জয় করতে পারে এবং সবশেষে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল হয়। এর জন্য বাইরের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু নিজেদের লক্ষ্য নিজেদেরই স্থির করতে হবে। গীতাতেও তাই বলা হয়েছেঃ "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"[১১]—নিজেকে নিজের দ্বারাই উদ্ধার করা উচিত, নিজেকে অবসন্ন করা উচিত নয়।

সর্বোপরি চাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহস ও ধৈর্য। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান বাধা-বিপত্তিতে হতোদ্যম মানুষকে জাগিয়ে তোলঃ "যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না—ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হউক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।... দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনি আগাইয়া আসেন, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পার।"[১২] ❑

১ How to Win Friends and Influence People—Dale Carnegie, Simon and Schuster Inc.
২ দ্রঃ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 31
৩ মহাভারত, ১৮।৫।৬২
৪ হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৭১
৫ তুলনীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।২৩
৬ তুলনীয় Vivekananda His Call to the Nation, pp. 50-51
৭ Ibid., p. 49
৮ Ibid., p. 27
৯ তুলনীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১৪
১০ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৯৮৯ সং, পৃঃ ১২৯
১১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬।৫
১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ২৭৯

চরণে দিও মা ঠাঁই

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

জননী তোমার অপার অসীম করুণা-নির্ঝরিণী
উষর মর্ত্য-মরুতে চির সুধার সঞ্জীবনী।
অগণন তব মূঢ় সন্তান বিষয়ের বিষে হয়ে হতপ্রাণ
করিছে তোমার স্নেহসুধা পান তুমি যে দুঃখহারিণী ॥

ত্রিভুবন মাঝে ছিল যত প্রেম লৌহনিগড়ে বাঁধা
তব তপ-তাপে গলায়েছ সবে অসাধ্য সাধন-সাধা।
অথবা তুমিই ঘনীভূত প্রেম সুউচ্চ হিমানী-শিরে
ভাগীরথীসম বিগলিত ধারা সিঞ্চিছ শত শিরে
নাহলে কেন যুগ-অবতার পাতিয়া পুণ্য
সাধনার শেষে করে আবাহন—যে-ভ
বসায় তোমারে পূজাবেদি 'পরে সা
কত ধূপ-দীপ মালা-চন্দন, কত ভা
দ্বাদশ বর্ষ দিব্যসাধনা তপস্যা সুদু
তার নির্যাস জপমালা-সহ সঁপিল
লুটায়ে ভূমিতে করে প্রণিপাত স
অভিনব পূজা অভিনব ভাব দেখে
দুরধিগম্য সে-মহাপূজা—সে-পূ
আপামর নরে অকৃপণ হাতে বি
তাই তো আসিল ধূলার ধরায় ন
গভীর সমাধি ব্যথিত যতি শ্রীআ
লাবণ্যে ভরা প্রেমঘন শিশু সুকোম
কণ্ঠদেশেতে বেষ্টিয়া যবে নিবেদিল
এস নরঋষি নরনারায়ণ এস হে ধরণী 'পরে
অসহন কিবা যন্ত্রণা হের শোন সে কাতর
ডাকিছে মর্ত্যমানব আজিকে কেহ নাই দুখহ
তুমি বিনা কেবা জুড়াইবে জ্বালা ঘুচাবে কে ব্য
তাই তো বিবেক আসিল নামিয়া ঋষিধাম পরিহরি
বিশ্বজননী-আজ্ঞাতে সে যে বিশ্বভুবনচারী।
সেবার মূরতি সারদা মায়ের সুমহান সন্তান
সেবাযজ্ঞের যাজ্ঞিকঋষি জীবপ্রেমগতপ্রাণ।
সেই সে-মায়ের মহান আশিসে মর্ত্যে হইল মঠ
নরসখা সেথা দয়ায় স্থাপিলা সেবার মঙ্গলঘট।
এ মঠ হইতে দিকে দিকে আজি সেবার প্রবাহ বহে
অজ্ঞ পতিত আর্তমানব কেহ যেথা পর নহে।
বিশ্ব ব্যাপিয়া শত শাখা মেলি সকলেরে দিতে স্থান
তার সে আকুল আবাহন আজি শোন রে পাতিয়া কান।
যাঁহার অমোঘ আশিসে সৃষ্টি এ সেবা পীঠস্থান
তাঁহার চরণে লও আশ্রয় কে আছ তাপিত প্রাণ।
অপরে যে আছ মুক্তিপ্রার্থী তারাও সদলে এস
জীবন যৌবন পার্থিব ধন সকলই সঁপিবে এস।

সেবাযজ্ঞের পুরোহিত যেবা ধন্য জীবন তার
ঐ হের ডাকে জননী সারদা খুলিয়া মুক্তিদ্বার।
যেবা সচেতন হয়ো না মগন মিথ্যা মায়ার মোহে
জীবসেবা তরে জননী আজিকে প্রাণ বলিদান চাহে।
এ ডাকে যেবা আসিবে ভেদিয়া সকল বন্ধনজাল
সংসারে সে তো জীবন্মুক্ত মঙ্গল পরকাল।
এই সে মঠের অধীশ্বরীরে প্রণতি জানাতে তাই
বিশ্বভুবন মেতেছে আজিকে চরণে দিও মা ঠাঁই।

স্নেহময়ী মা

স্বামী মধুসূদনানন্দ

সর্বা জননী সারদা, জগত-জননী শুভদা
দা, মোক্ষরূপিণী তুমি মোক্ষদা।
এবার কৃপাময়ী করুণাপাথার
করিতে হরণ দুখের ভার,
শুধু জানি তুমি আপনার,
কত আপনার কব কি আর ॥
তো কোথাও জাতিবিচার,
স্নেহময়ী মাতা সবাকার।
পায় তাঁরে আপন করে,
কেমনে ছেড়ে রবে তাঁরে!
হেরি হৃদয়ে হৃদয়-রতন,
পেয়ে পরাণের পরম ধন ॥

সুগত-শরীর

ব্রহ্মচারী যোগস্থচৈতন্য

দূর থেকে সরে এসে ছুঁয়ে যেতে যেতে
হৃদয়ের গম্ভীরায় কী সুর গভীর
বেদনাকে স্পর্শ করে। গাঢ় রাত্রি স্থির—
অন্ধকারে তক্ষকের ডাকে কান পেতে
কে যেন সে-রাত জাগে। জোনাকির আলো
ঘোরেফেরে হেথা-হোথা, গ্রাম আমতলি
ডুবে আছে অন্ধকারে, স্তব্ধ রূপাবলী,
তিতির পাখির ডাকে তমস ফুরালো।
মানুষ কিভাবে বাঁচে ভালবাসাহীন?
যে-কথা বলতে চাই কিভাবে বোঝাব?
প্রেমহীন নীতিবোধে হৃদয় বধির।
তবু বেদনার কাছে জমা আছে ঋণ,
আমি সেই ঋণ তবে কিসে যে মেটাব?
বেলাভূমি-বালি, দাও সুগত-শরীর।

হে বিশ্বজননী

বলহরি বিশ্বাস

হে মাতঃ, জন্ম নিলে তুমি শান্ত পল্লিনীড়ে,
ধর্মধনদ্ধ দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।
কৈশোরেই ছিলে তুমি ক্ষুধিতের অন্নসেবায়,
পশুপক্ষীরাও বঞ্চিত হয়নি তব স্নেহসুধায়।
সমাজ ছিল যখন অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কারে,
তখনো তো বদ্ধ হওনি মিথ্যা লোকাচারে।
কুল, শীল, জাতি, ধর্ম তুমি করোনি বিচার,
নির্বিশেষে বিলায়েছ সবে তব স্নেহভাণ্ডার।
আসিলে শেষে স্বামীর লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে,
স্বামী ও শাশুড়ির নিঃস্বার্থ সেবার তরে।
নহবতের ছোট্ট কুটিরে কষ্ট সহিয়াছ [illegible]
তবুও তোমার মনে 'আনন্দের ঘট' [illegible]রে।
নিশুতি রাত্র শেষে স্নান করিয়া [illegible]
লক্ষবার জপের সাধনায় [illegible]
সতেরও মা তুমি, অসতের[illegible]
কর নাই ভেদজ্ঞান সন্ন্যাসী [illegible]
এই বোধ ছিল তব সব [illegible]
মাগো, দুর্জয় সাহসে [illegible]
শ্বেতাঙ্গ সন্তানেরে তুমি [illegible]
নিবেদিতা তোমায় 'মা[illegible]
তুমিও তাকে 'খুকি' বলে [illegible]
বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি তুমি, [illegible]
চন্দ্রালোক সম তব প্রেমালো[illegible]
অদ্বৈতজ্ঞানে সব বস্তুতে ছিল [illegible]
জড় ও চেতনে ছিল বোধ তোমার [illegible]
স্বার্থদ্বন্দ্ব অসূয়াদীর্ণ অসহিষ্ণু এই সংসারে,
সন্তোষধন ও সহ্যগুণ দাও, হে বিশ্বজননী,
তাপদগ্ধ, অশান্ত, স্বার্থদীর্ণ মোদের অন্তরে!

প্রাণের পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

বাপ্পা ধর*

জগৎশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তার নাম,
বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় দেরেটোন তার গ্রাম।
কলকাতার সিমলাপল্লির বাড়িতে তার জন্ম,
সেখান থেকেই শুরু হলো তার জীবনপথের কর্ম।
ছেলেবেলায় আদর করে ডাকত সবাই 'বিলে',
সবার সাথে সমানভাবে থাকত সে যে মিলে।
সব বিষয়েই ছিল তার প্রবল আকর্ষণ,
মেধা, প্রীতি, সাহস-সহ তার ছিল সরল মন।
পড়াশোনায় ছিল সে যে স্কুলের নয়নমণি,
খেলাধুলায় নেতা ছিল, গানের সুরেতে জ্ঞানী।
নিজের চোখে না দেখে কিছু করত না বিশ্বাস,
জ্ঞানি-গুণিজনদের প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস।
দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি ছিল সে সদয়,
[illegible]পীড়িত ভারতবাসীর মনে এনেছিল বিজয়।
[illegible]সারের দুঃখ নিজের বলে ভাবত সে মনে,
[illegible] মহান মানব আর আসবে না এজীবনে।
[illegible] যে ছিল ভারতবাসীর নতুন পথপ্রদর্শক,
[illegible] মর্যাদা পাইয়ে দিতে নিয়েছিল শপথ।
ভা[illegible]তে মর্যাদা দিতে গেল আমেরিকায়,
[illegible]তা রাখল শিকাগোর ধর্মসভায়।
[illegible] হতে বিশ্বমঞ্চে ভারতের উত্তরণ,
[illegible] জিতল ভারত বিশ্ববাসীর মন।
[illegible]নামটি তার শিকাগোর উপহার,
[illegible]তার গলায় সে যে দিল বিজয়হার।
[illegible]তাল হলো তার বিশ্বজয়ীকে নিয়ে,
[illegible]আবার মহান হলো বিবেকানন্দকে দিয়ে।
আত্মমহিমায় হলেন ভারত-নয়ন তিনি,
ভারতের স্বাধীনতায় একমাত্র নায়ক জানবে তিনি।
১৯০২ সালের অভিশপ্ত সেই ৪ঠা জুলাই,
আমরা আমাদের প্রাণের পুরুষ বিবেকানন্দকে হারাই।

---

* কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী।

শ্রীমা

প্রসিত রায়চৌধুরি

মা তোমার নাম,
মনের শান্তি, প্রাণের আরাম,
যেজন শরণ লয়, কাটে তার ভবভয়,
নিত্যমুক্ত চিত্ত সহসা হয়ে যায় আলোময়।

মা তোমার নাম,
বিশ্বজনেরে বর্ষিছে বরাভয়,
কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত আজিকে
মা সারদার জয়।

অযুত জনের স্মরণে, মননে
শুধুই তোমার নাম,
আর্তজনের আশ্রয় মাগো,
লহ প্রণাম—লহ প্রণাম।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

বাঙালি ঐতিহ্যের অনুবর্তন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।/ সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।" এই 'দেশ' বাংলাদেশ। জীবনানন্দ দাশ এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন ঃ "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,/ তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।" শুধু কবিতার অক্ষরে নয়, সাহিত্যের পাতায় নয়—বিজ্ঞান, চারু-কারুকলা, শিল্পচর্চা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের ওপর ভর দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারে বিশ্বকে আশ্বস্থ করার আবহ, প্রসারিত বাণিজ্য, শাসনকার্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমোচনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ—যা কিনা আজ খণ্ডিত—বিশ্বের আঙিনায় একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে।

পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের বাঙালিয়ানায় কোন ঘাটতি ছিল না। শশাঙ্কের কথা আমরা জানি। গৌড়ের অধিবাসী শশাঙ্ক তামাম ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর ক্ষাত্রবীর্যের জন্য। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় জয়দেব-সহ আরো চারজন বাঙালি নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁরা নিয়েছিলেন এক যুগান্তকারী ভূমিকা। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যসাহিত্য পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বিজয়সিংহ শ্রীলঙ্কা জয় করেছিলেন কতকাল আগে। 'সপ্তডিঙা' থেকে 'মধুকর'—অজস্র বাণিজ্যপোত ভেসেছিল সপ্তসিন্ধুতে। চাঁদ-ধনপতি-শ্রীমন্ত সওদাগরেরা দেশ-দেশান্তরে পৌঁছে দিয়েছিল বাংলাদেশের মশলা, মসলিন-সহ নানা সামগ্রী। সামুদ্রিক প্রতিকূলতাকে সরিয়ে তাঁরা এদেশে বহন করে এনেছিলেন বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্যাস। এসেছিল বহু পণ্যসামগ্রী। তাই বাঙালি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা যেমন করেছে নিরলসভাবে, তেমনি আপন জ্ঞানভাণ্ডারকে পাশ্চাত্যের কাছে করে দিয়েছিল উন্মুক্ত। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।"

সেদিন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মুখচ্ছবিই প্রতিফলিত হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বার দিনগুলিতে মহামতি গোখলে জানাতে ভোলেননি তাঁর অনুভবকে—"What Bengal thinks today, India thinks tomorrow." ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার প্রধান দায় যেন অর্পিত হয়েছিল বাঙালিদেরই ওপর। তাই বহু বাঙালির আত্মত্যাগ স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধু প্রসারিতই করেনি, তাতে যুক্ত করেছিল গতি ও দ্যুতি। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিতে তুরকি আক্রমণে বাংলাদেশ পরাধীন হয়েছিল। সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল দীর্ঘ সাড়ে সাতশো বছর পর ঘুচেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এদেশ ছেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, বাঘা যতীন, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যে-ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন—তা শুধু বাঙালির অহঙ্কার নয়, সে-অহঙ্কার সমগ্র ভারতবর্ষের।

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বাংলাতেই। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণে তাঁর বৈপ্লবিক ভূমিকা চিরস্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর তমিস্রাঘন পরিবেশকে সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ তাঁরা শুধু মুখেই বলেননি, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যজয়ের মূলে ছিল ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব। অতীশ দীপঙ্কর প্রেম-সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব—যা কিনা ভারতীয় দর্শনের প্রধান অবলম্বন—সেই বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের দেশে দেশে। এই ঐতিহ্যই বহন করেছিলেন মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। উত্তরকালে দেশ-দেশান্তরে ভারতবর্ষের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বাঙালির মন ও মননে ভারতীয় দর্শনের প্রগাঢ় রূপটি প্রত্যক্ষ করেই ম্যাক্সমুলার, বুর্ণফ, সিলভাঁ লেভি, সিস্টার নিবেদিতা, রোমাঁ রোলাঁ, স্যার উইলিয়াম জোন্স, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরী ভারতচর্চায় মেতে উঠেছিলেন। বাংলাদেশই হয়েছিল তাঁদের মননচর্চার কেন্দ্রভূমি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চায় আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ যে-কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন, তারই ঐতিহ্য বহন করেছেন উত্তরকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ।

জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য, হাল, শ্রীধর দাশ, অভিরাম প্রমুখ সুললিত কাব্যচর্চার যে-আঙিনা তৈরি করেছিলেন; কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কন মুকুন্দ, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৈষ্ণব কবিজনেরা তা প্রসারিত করেছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দে তারই উজ্জ্বল পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনচিন্তায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে তার উপস্থিতিকে প্রমাণ করেছিল।

বাঙালির ইতিহাসচর্চা সুদীর্ঘকালের। সেই চর্চা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারের কলমে। শিল্পচর্চায় ভারতীয় ঘরানা দেশান্তরে প্রভাব ফেলেছিল রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, মুকুল গুহ, যামিনী রায় প্রমুখের প্রয়াসে। শুধু বাংলাদেশ কেন, তামাম বিশ্বের মানুষকে বাংলাদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনচিন্তা এদেশের প্রতি শুধু আগ্রহীই করে তোলেনি—তাদের টেনে এনেছে এদেশে বারে বারে। ভাষাচর্চায় হরিনাথ দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহঃ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন প্রমুখ বিশ্বমনীষার প্রশংসা অর্জন করেছেন।

আজকের বঙ্গভূমি, আজকের বাঙালি অতীত ইতিহাসের অনেকটাই মনে রাখে না। আর রাখে না বলেই তারা আত্মগত সঙ্কটের আবর্তে মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রায়শই তাই শোনা যায়

বাঙালির কণ্ঠে বাঙালির নিন্দা। বিজ্ঞানচর্চা থেকে খেলাধুলা, সাহিত্য থেকে শিল্পচর্চা, দর্শন থেকে আত্মত্যাগের মহিমা—এসবই আজ বাঙালিকে পাশ্চাত্য থেকে ধার করে এনে বলতে হয় এবং শুনতেও হয়। কিন্তু এই বিকৃত মানসিকতার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন সঠিক মূল্যায়ন। আর, সেইজন্য অতীতের বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাসের দিকে একবার নয়—বারংবার ফিরে তাকাতে হবে। সার্থক হবে কবির অনুভব ঃ "সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

ডঃ তাপস বসু
পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা-৩৯

বাউল ও বীরভূম

ভারতবর্ষের সভ্যতা মূলত ধর্মাশ্রয়ী। সে-ধর্ম মানুষের ধর্ম—মানবতার ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় ঃ "যত্র জীব তত্র শিব।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,/ জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বরের সন্ধানই বাউলের জীবনসাধনা।

'বাউল' কথাটি 'বাতুল' বা 'পাগল' থেকে এসেছে। বীরভূম জেলা শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের মহামিলন তীর্থ। বাউল মেলা বলতে জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুলীর মেলার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে—যে-মেলায় এবছর আখড়া ছিল ১৭৪টি। বাউল দেহবাদী ও মানবতাবাদী—নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বাউলসাধকরা কায়া সাধনা ও মানবতায় ভর করেই সাধনজীবনভিত্তিক ভাবের গান শোনান। মনের মানুষকে পাওয়ার জন্যই তাঁদের আকুতি মূর্ত হয়ে ওঠে। তাতে প্রকাশ ঘটে আধ্যাত্মিকতার। সংসারের জটিল আবর্তে বাউল থাকতে চান না বলেই সকল মানুষকেই তাঁরা আপন করে পেতে চান। তাঁদের জীবনের সেখানেই সার্থকতা। সমাজবহির্ভূত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েও সামাজিক হওয়াটা কম কথা নয়। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, হতাশা, ক্ষোভ, দুঃখ—এসব গানের মধ্যে প্রকাশ পেলেও বাউলগান মূলত তত্ত্বনির্ভর। শ্রোতার বোধের গভীরে প্রবেশ করতে পারে বলেই বাউলগানে উন্মাদনা রয়েছে। সে-উন্মাদনা জীব, জগৎ, জীবনকে ভালবাসার। বাউল সাধক তাঁর নিজের জীবনকে ভালবাসেন বলে সমস্ত মানুষকেই ভালবাসতে শেখান। 'কোথায় পাব তারে, মনের মানুষ যেরে'—তাঁকে খুঁজতেই বাউলের পথচলা। 'অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'—দেহপিঞ্জরের প্রাণবিহঙ্গের রহস্য ভেদ করতেই আত্মনিমগ্ন বাউল। তাঁর নিজস্ব কোন জাতির পরিচয় নেই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র মূর্ত প্রকাশ ঘটে বাউলের মধ্যেই।

বীরভূমের নলহাটী, সাঁইথিয়া, লাভপুর, কঙ্কালীতলা, বক্রেশ্বর পঞ্চ সতীপীঠ। বশিষ্ঠ-আরাধিতা দেবী তারা রয়েছেন তারাপীঠে। আকালীপুরে রয়েছেন মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত দেবী গুহ্যকালী। কেন্দুলীতে রাধাবিনোদের মন্দির, কবি জয়দেবের জন্মস্থান। নানুরে বিশালাক্ষ্মীর মন্দির ও টিবি। এখানেই কবি চণ্ডিদাসের জন্ম। পাথরচাপুড়ীতে দাতা পীরের মাজার। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ। সবমিলিয়ে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্র গোটা বীরভূম জুড়ে। আবার, বাউল বলতেই বীরভূমের বাউল। যদিও প্রতিবেশী মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় বহু বাউল রয়েছেন। কিন্তু বীরভূমের বাউলরা সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছেন বলেই 'বীরভূম মানেই বাউল' কথাটি চালু হয়েছে বলে মনে হয়।

পৃথিবীর আবর্তন রয়েছে। বিবর্তন আছে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। তেমনি বাউলের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মূলত একতারা, ডুবকি, ঘুঙুর বাউলের বাদ্যযন্ত্র। তবে বর্তমানে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র নিয়েও তাঁদের গান করতে দেখা যায়। তাতে অবশ্য বাউল সংস্কৃতির কোন ক্ষতি হয় না। সাজা বাউল, শিল্পী বাউল, গায়ক বাউল এবং সাধনাহীন মানবতার ভাবশূন্য হওয়ার কারণেই তাঁরা গণমানসে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেন না। আধুনিক সুর, ঢঙ, ভাবভঙ্গি দিয়ে তাঁরা শ্রোতাদের মন ভোলাতে চান। তা মাধুকরী অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হলেও জাত বাউল হতে না পারলে সাধনায় সিদ্ধি হয় না। বাউলগানের যে উন্মাদনা, তা সিদ্ধ পুরুষ বা নারীর কাছেই আশা করা যায়। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

বীরভূমে কেন্দুলীর মেলায় ও শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে শুধু নয়—ট্রেনের পথে, গাঁয়ের মঞ্চে অসংখ্য বাউলের গান শোনা যায়। বাউলদের নিয়ে কত কথা ও গবেষণা হয়েছে, তবু এই মুহূর্তে বাউলদের কোন তালিকা নেই। পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল বলেন, বীরভূমে পাঁচশো বাউল আছেন।

বিশ্বমানবতার চেতনায় বাউলকে ধরে রাখতে গেলে আজকে যাঁরা বাউল হয়ে আসছেন, তাঁদের সতর্কতা অবশ্যই দরকার। বাউলগানের প্রাচীনত্বের ধারা বেয়ে চলমান যে-সত্তা, তাকে মনের রসে ডুবিয়ে মনের মানুষ খুঁজতেই হবে। প্রকৃত অর্থে বাউল সকলে হতে পারবেন না ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে ধারায় যেন পরিবর্তন না ঘটে।

চন্দ্রমোহন সিংহ
বারা, বীরভূম-৭৩১২৩৭

একটি স্মরণযোগ্য নাম

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন (মোরাবাদী) আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী (১৯২৭-২০০২)' শীর্ষক সংবাদটি প্রসঙ্গে জানাই, এই আশ্রম প্রসঙ্গে স্বামী বেদান্তানন্দজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে রাঁচিতে যে আরোগ্য আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, সেটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য নিরলস, আদর্শবাদী এই সন্ন্যাসী ভিজে গামছা মাথায় দিয়ে গ্রীষ্মের দুপুরে ট্রাক ড্রাইভার ভাইদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। এইকথা তিনি নিজমুখে পাটনা আশ্রমে আমাকে বলেছিলেন। এই আশ্রম নির্মাণের পিছনে তাঁর কঠোর ত্যাগ ও সেবাভাব আমাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সুভাষ ঘোষ
লোদী রোড, নিউ দিল্লি-১১০০০৩

ভক্তি-জিলিপি

নাতনিকে* দিদা গল্প বলেন,
ভক্তি হলেই ভগবানকেও মেলে,
নাতনিটি বলে, তা-ই বুঝি দিদা?
বল না ভক্তি মিলবে কোথায় গেলে?
দিদা বললেন, মা সারদার
কাছে যদি যাস, ভক্তি মিলতে পারে,
ভগবানকে সে পাওয়ার এমন
সহজ উপায় আর কি কখনো ছাড়ে!
দাদাকে সঙ্গে নিয়েই সে-মেয়ে
পরের দিনেই হাজির মায়ের কাছে,
আঁচলটি ধরে বলে, দাও না গো,
তোমার কাছেই শুনেছি ভক্তি আছে।
মা হেসে বলেন, ওমা, এ কি কথা,
একথা তোমায় কে বলেছে, বল দেখি?
মেয়েটি বলল, দিদা তো বলেছে,
আমাকে কখনো মিথ্যা বলবে সে কি?

মায়ের মহিলা ভক্তরা তাকে
উৎসাহ দিয়ে বলেন, বাগিয়ে ধর,
ওঁর কাছেতেই ভক্তি মিলবে,
খুকুমণি, তুমি ভক্তি আদায় কর।
মেয়েটি তা শুনে মায়ের আঁচল
জড়িয়ে ধরল আরো শক্ত করে,
মা বলেন, থাম, ভক্তি আনছি,
তা কি কাছে আছে? রেখেছি ঠাকুরঘরে।
একটি প্রসাদি অমৃত জিলিপি
মেয়েটির হাতে মা তুলে দেন এনে,
ততক্ষণে তো আরো সে অনেক
ভক্তের দল ব্যাপার গেছেন জেনে।
তাঁরা তো তখন মেয়েটিকে কন,
ও খুকি, ভক্তি দাও আমাদেরও পাতে,
মায়ের দেওয়া সে-জিলিপির ভাগ
টুকরো টুকরো সবাই লাগেন খেতে।

---

* ঘটনাসূত্র : সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী। 'নাতনি'টি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা দুর্গাপুরী দেবী।

ছবি : সৌরীশ মিত্র ● ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

দেবী সারদা

চিরন্তনী

শিশু ও কিশোর বিভাগ

শ্রীশ্রীমায়ের সাধারণ গ্রাম্য ব্যবহার কখনো তাঁর দেবীরূপকে প্রকট হতে দেয়নি। রূপ ঢেকে, স্বরূপ ঢেকে অতি সাবধানে তিনি নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন। তাঁর জন্মকালে কিছু কিছু দিব্যদর্শন দিদিমার (শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী দেবী) হয়েছিল। কিন্তু আদ্যাশক্তি মহামায়ার অদ্ভুত মহিমায় তা আবার সকলে ভুলেও গিয়েছিল। মা হঠাৎ কখনো কখনো নিজের দেবীরূপ প্রকাশ করতেন আর পরক্ষণেই তা ভুলিয়ে দিতেন। ভক্তদের কেউ কেউ তাঁকে দেবী জগদ্ধাত্রী, বগলা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, শীতলা, গঙ্গা, রাধা ও সীতা-রূপে দর্শন করেছিলেন। এখানে সেরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে শিবপূজা করেছিলেন। সীতাদেবী বালি দিয়ে নিজের হাতে শিবলিঙ্গ গড়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর তীর্থে যখন শ্রীশ্রীমা গেলেন তখন—

যদিও মা স্বগত কথাটি বলেছিলেন, পরে সকলে তাঁকে চেপে ধরলেন। গোলাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন—

"আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥"

● চিত্ররূপ : সৌরীশ মিত্র ●

এই সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য শ্রীমৎ স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *স্বামী বিবেকানন্দ সকলকে 'মানুষ' হতে বলেছেন। তিনি ভারতের সম্প্রদায়ভিত্তিক আচার-বিচারমূলক ধর্মানুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু বর্তমানে এই জটিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আমার একান্ত অযৌক্তিক, সময় ও শক্তির অপব্যবহার বলে মনে হয়। আমার মনে হয়, এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্য থেকে আলোর দিকে উত্তরণের পথ মানুষ আপন অধ্যবসায়, বিবেক ও চেতনা থেকেই খুঁজে পাবে। এজন্য ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির দোহাই দিতে হবে কেন? কৃপা করে উত্তর দিলে ধন্য হব।*

—সুদীপ মুখোপাধ্যায়, আগরপাড়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৮

উত্তর ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রগুলি আমাদের ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ে সময় ও শক্তির অপব্যবহার করতে বলে না। আমাদের শাস্ত্রগুলি আমাদের ভিতরে যে-শক্তি আছে, তার উদ্বোধনের কথাই বলে। সেই শক্তির উদ্বোধনের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন অধ্যবসায়, বিবেক, চেতনা এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তুমি উত্তরণের পথ হিসাবে যে বিবেক ও চেতনার কথা বলেছ, তা তো শাস্ত্র থেকেই আমরা পাই। আদর্শের সন্ধান যে-শাস্ত্র দেয় তাকে বাদ দিলে অধ্যবসায় যে পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়!

প্রশ্ন ঃ *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের 'মহারাজ' বলে অভিহিত করা হয়। কেন তাঁদের এভাবে সম্বোধন করা হয়, দয়া করে জানালে উপকৃত হব।*

—পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০ ০৫৬

উত্তর ঃ মঠে একেবারে প্রথমদিকে পরস্পরের সম্বোধনে কোন নির্দিষ্ট প্রথা ছিল না। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ পশ্চিমী প্রথানুযায়ী সাধুদের 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই মঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বোধনে 'মহারাজ' কথাটির প্রচলন হয়।

প্রশ্ন ঃ *আমাদের পরমায়ু সীমিত। বর্তমান সমাজে তাৎক্ষণিক শান্তি পেতে গেলে কোন কোন সময় অন্যায্য পথও অবলম্বন করতে হয়, অন্যথায় বিপদে পড়তে হয়। বেঁচে থাকতে বিতৃষ্ণা আসে। আবার দেখা যায়, কেউ কেউ বাঁকা পথে থেকে বেশ সুখে শান্তিতে আছে। এর থেকে বাঁচার কি কোন স্থায়ী সমাধান রয়েছে? প্রয়োজনীয় পথ বলে দিলে নিশ্চিন্ত হব।*

—শ্রী চৌধুরী, শ্রীপল্লী, বর্ধমান

উত্তর ঃ 'কেউ কেউ বাঁকা পথে থেকে বেশ সুখে শান্তিতে আছে'—কেমন করে জানলে? তাদের অন্তরের খবর কি তোমার জানা আছে? যেটি তাৎক্ষণিক শান্তি বলে মনে করছ, তাই পরিণামে যে বিবেকের দংশনে পরিণত হয়—এ-অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তোমার হয়েছে। তোমার প্রশ্নই তা প্রমাণ করেছে। স্থায়ী সমাধানসূত্র যা শ্রীশ্রীমা দিয়েছেন ঃ "সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই"—তা-ই অবলম্বনীয়।

প্রশ্ন ঃ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের একজায়গায় পড়লাম ঃ "ভেকের মতো যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর।" আমার বড় জানতে ইচ্ছা করে, "ভেকের মতো যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়"—এই বাক্যটির অর্থ কী?*

—অমিতাভ নস্কর, বারাসত, কলকাতা-৭০০ ১২৪

উত্তর ঃ 'ভেক' অর্থাৎ 'গেরুয়া বসন'। যে-ভেক ধারণ করছি, তার মতো মনটিকেও তৈরি করতে হবে। গেরুয়া পড়ছি কিন্তু মনটিকে গেরুয়া অর্থাৎ ত্যাগের রঙে রাঙাচ্ছি না, তাহলে সর্বনাশ। ভেকধারণের সঙ্গে সঙ্গে মনটিকে সেই রঙে রাঙাতে হবে। ত্যাগের আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকার জন্যই ভেকধারণ। অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভেকধারণ করলে সর্বনাশ।

প্রশ্ন ঃ *একজন মানুষের মধ্যে কি কি গুণ বা প্রবৃত্তি থাকলে তাকে 'বলিষ্ঠ চরিত্র'-এর অধিকারী বলা যায়?*

—ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, সাঁকরাইল, হাওড়া

উত্তর ঃ অনন্ত সহিষ্ণুতা, পূর্ণ পবিত্রতা, অসীম অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, ঈর্ষা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা থেকে দূরে থাকা এবং সমস্তরকম ভয় ও প্রলোভনের সামনেও যে মাথা উঁচু করে থাকতে পারে—তাকে বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বলা যায়।

পদকের কাছে এসেও থমকে গেলেন আনন্দরা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় *

দাবা অলিম্পিয়াডে সর্বকালের সেরা পারফরমেন্স করেও শেষপর্যন্ত পদক জেতা হলো না ভারতীয় দাবাড়ুদের। স্পেনের মালোবকায় দাবা অলিম্পিয়াডে যোগ দিয়েছিল শতাধিক দেশ। এত বড় মাপের দাবা অলিম্পিক এর আগে হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের পুরুষ দাবাড়ুরা ষষ্ঠ স্থান পাওয়ায় এদেশের দাবাসমাজ এক অন্য উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এবিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

বারো বছর পর বিশ্বনাথন আনন্দ দাবা অলিম্পিকে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করায় স্বভাবতই নড়েচড়ে বসেছিলেন এদেশের দাবাতাত্ত্বিক ও ক্রীড়াজগৎ। গত তিন-চার বছরে আনন্দ বিশ্ব দাবা সার্কিটে নিজেকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ গ্র্যাণ্ডমাস্টার হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠে এসেছেন স্বজাতীয় কৃষ্ণণ শশীকিরণ। চারবছর আগে গ্র্যাণ্ডমাস্টার হওয়ার পর তাঁর পারফরমেন্স গ্রাফ ক্রমেই উর্ধ্বমুখী। এবছরই বিয়েলে ১৮ ক্যাটাগরির এক উন্নত মাত্রার টুর্ণামেন্টে বাঘা বাঘা গ্র্যাণ্ডমাস্টারদের টপকে তিনি রানার্স হয়েছেন। প্রগ্রেসিভ স্কোরে পিছিয়ে না পড়লে চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারতেন।

স্পেনে অসাধারণ সাফল্যই শশীকে বিশ্বের প্রথম তিরিশ দাবাড়ুর 'এলিট ব্র্যাকেটে' স্থান দেয়। তাঁর মতোই চমকপ্রদ উত্থান সূর্যশেখর গাঙ্গুলি, পেণ্টাইয়া হরিকৃষ্ণদের। তবে ধারাবাহিকতা না থাকায় তাঁরা বিশ্ব সার্কিটে শশীকিরণের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছেন অনেকটাই। এইরকম একটা শক্তিশালী লাইন-আপ নিয়ে ভারত গিয়েছিল দাবা অলিম্পিকে। আর পুরুষদের মতো মেয়েরাও এবার পদকের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। কোনেরু হাম্পি, সাই বিজয়লক্ষ্মী, দ্রোনোভালি হারিকা প্রত্যেকেই বিশ্ব পর্যায়ে উজ্জ্বল পারফরমেন্স দেখিয়েছেন বিভিন্ন টুর্ণামেন্টে।

ভারতের দুটি দলেরই শুরুটা হয়েছিল চমৎকার। ছেলেরা টানা ৬টি ম্যাচ জেতার পর হার স্বীকার করেন শক্তিশালী ইউক্রেনের কাছে। এই ৬টি ম্যাচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্মেনিয়া ও নেদারল্যাণ্ডের মতো বাছাই দলের বিরুদ্ধে জয়। ছেলেদের মতোই কোনেরু হাম্পির নেতৃত্বে ভারতের প্রমীলা ব্রিগেড কিউবা, বালগেরিয়া, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিতে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। বিশেষ করে বিশ্বসেরা স্তেফানোভার বালগেরিয়া ভারতের বিরুদ্ধে হেরে বসায় পদকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। এমনকি দুই হেভিওয়েট দেশ ইউক্রেন ও রাশিয়াও বশ্যতাস্বীকার করে হাম্পিদের কাছে। কিন্তু শেষপর্বে গিয়ে জর্জিয়া, চিনের বিরুদ্ধে হার এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নষ্ট করায় শেষপর্যন্ত নবম স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁদের।

আনন্দের নেতৃত্বে পুরুষ দলও কিউবা, ইজরায়েলের মতো মাঝারি মানের দলের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়ায় পোডিয়ামে উঠতে পারেননি। রাশিয়া, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে হার তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু কিউবা, ইজরায়েল হারিয়ে দেবে—এ বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি আনন্দ। সবমিলিয়ে ভারতের পুরুষ দল ১০টি দেশের বিরুদ্ধে জিতে ষষ্ঠ স্থান নিয়ে সর্বকালীন সেরা পারফরমেন্স করেছে। বিশ্বনাথন আনন্দ অবশ্য সব ক্ষেত্রে তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। বেশ কিছু ম্যাচে টপ বোর্ডে খেলতে বসে সাদা ঘুঁটি নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে ড্র করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে প্রোগ্রেসিভ স্কোর কমে গেছে। শশীকিরণ অবশ্য ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন বেশি। তাঁর থেকে অনেক বেশি এলো রেটিং থাকা গ্র্যাণ্ডমাস্টারদের তিনি ধরাশায়ী করে দিয়েছেন। একই কথা প্রযোজ্য সূর্যশেখর, হরিকৃষ্ণ সম্পর্কে। যখনি সুযোগ পেয়েছেন সূর্যশেখর তাঁর সৃজনধর্মী, পরিকল্পিত খেলার মাধ্যমে দলের পয়েন্ট বাড়িয়ে গেছেন।

মেয়েদের মধ্যে হারিকা একটি অনন্যসাধারণ রেকর্ড করে ফেলেছেন মালোবকায়। কোন ম্যাচ হারেননি তামিলনাড়ুর এই মেয়েটি। তাঁর ওপেনিং গেমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিশ্বের বড় বড় দাবাতাত্ত্বিক। মিডল ও এণ্ড গেমে আরেকটু পরিমার্জনা আনতে পারলে হারিকা ছাপিয়ে যেতে পারেন বিশ্বের পাঁচনম্বর তাঁর স্বদেশীয়া কোনেরু হাম্পিকেও। হাম্পিও তাঁর সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ভুলতে দাবা অলিম্পিককেই প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্ত ব্যর্থতা ছাড়া হাম্পি তাঁর নাম ও কীর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিটি ম্যাচ খেলেছেন। বরং বিজয়লক্ষ্মী তাঁর ওপর অর্পিত আস্থার প্রতিফলন দিতে পারেননি। মেয়েদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী ও ছেলেদের বিভাগে অভিজিৎ কুন্তে যদি আরেকটু তৎপরতা ও উৎকর্ষ দেখাতে পারতেন, তাহলে দুক্ষেত্রেই হয়তো ভারতের ভাগ্যে ব্রোঞ্জ পদক জুটে যেত। তবে পদক না পেলেও বিরাট দাবাবিশ্বে ভারত যে এক বড় শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এই অলিম্পিকে।

দাবা অলিম্পিকের এই সাফল্যই বোধহয় বাড়তি উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ পেণ্টাইয়া হরিকৃষ্ণের মনে। অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলার এই দাবাড়ু তাঁর আদর্শ বিশ্বনাথন আনন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক অসাধারণ নজির স্থাপন করলেন। বিশ্ব জুনিয়র দাবা খেতাব জিতে আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে 'হল অফ ফেম'-এ ঢুকে পড়েছেন তিনি। শৈশব থেকে ল্যাপটপ ও কম্পিউটার-নির্ভর অনুশীলন করার সুফল পেলেন হরিকৃষ্ণ। ফিডে রেটিঙে এগিয়ে থাকা হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক বারকিস ও চিনের ঝাও জুনকে পিছনে ফেলে হরিকৃষ্ণের বিশ্বখেতাব করায়ত্ত হয়েছে। ১৯৮৭-তে বিশ্বনাথন আনন্দ এই খেতাব জেতার পর সিনিয়র স্তরে বেসরকারি ও সরকারি দুক্ষেত্রেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এনে দিয়েছেন দাবার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে। জিতেছেন আরো অসংখ্য গ্রাঁ প্রি পর্যায়ের টুর্ণামেন্ট। হরিকৃষ্ণ কি পারবেন দ্বিতীয় আনন্দ হতে? অথবা তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে? উত্তরটা ভাবিকালের গর্ভে নিহিত থাকলেও একটা কথা এখনি বলা যায়, ভারতের তরুণ তুরকি দাবাড়ুরা দাবার আন্তর্জাতিক সমাজে একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। ❑

* তরুণ ক্রীড়া-সাংবাদিক

সাধারণ স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা

শক্তি মুখোপাধ্যায়*

প্রশ্ন : বুকের বাঁদিকের ব্যথাকে সাধারণত আমরা মনে করি হার্টের দোষ। কিন্তু সত্য কি তাই?

উত্তর : না, বুকের বাঁদিকের ব্যথার কারণ অনেকগুলি। তাই কেবল হার্টের দোষই এর কারণ বললে ভুল বলা হবে। ব্যতিক্রম থাকলেও প্রকৃত হার্ট থেকে উদ্ভূত ব্যথা বুকের মাঝখানে চাপ ধরার অনুভূতি। সঙ্গে শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে, বমির ভাব দেখা দিতে পারে এবং ব্যথাটি অনেক সময় বাঁ হাত দিয়ে নিচে অনামিকা ও কড়ে আঙুল পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। ব্যথার সঙ্গে ঘাম হয় ও অত্যন্ত অস্বস্তি ভাব দেখা দেয়। ব্যতিক্রমে ব্যথাটি বুকের বাম বা ডানদিকেও হতে পারে। ডান হাত দিয়েও তা আঙুল পর্যন্ত সঞ্চারিত হতে পারে। ব্যথার প্রকৃতিও অন্যরকম থাকতে পারে। ভারী চাপবোধ ছাড়া জ্বালা ভাব, ঠেলামারা ভাব থাকতে পারে এবং কণ্ঠস্থলে চাপ ধরা, দাঁতের ব্যথা বা চোয়ালে চাপবোধ—এ সবই হতে পারে। ওপর পেটে এবং পিঠেও ব্যথা হতে দেখা গেছে। জিবের তলায় তাজা নাইট্রোগ্লিসারিন বড়ি গলতে দিলে সাধারণত ৫ মিনিটের মধ্যে এই ব্যথার উপশম হতে পারে। কখনো কখনো ২ বা ৩টি নাইট্রোগ্লিসারিন বড়ি পরপর লাগতে পারে। ব্যথা না কমলে বুঝতে হবে, নাইট্রোগ্লিসারিন সম্ভবত তাজা নয় অথবা বেশ বড় রকমের ঝামেলা বা হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে অথবা ব্যথাটি হার্ট থেকে আদৌ আসছে না। যদি বুকের ব্যথার ধরন সুচ ফোটানোর মতো হয় বা শ্বাস নিতে গেলে খচ করে লাগে, তাহলে সে-ব্যথা হার্টের ব্যথা নয়—মনে রাখা দরকার। খাদ্যনালী বা ইসফেগাসের (Oeso-phagus) আক্ষেপ বা স্প্যাজম (spasm) কিংবা পিত্তনালী বা থলি থেকে উদ্ভূত ব্যথা (Gall bladder—গল ব্লাডারের ব্যথা) বুকের ব্যথা ঘটাতে পারে এবং নাইট্রোগ্লিসারিন বড়ি তারও আংশিক উপশম দিতে পারে। তখন প্রকৃত হার্টের ব্যথার সঙ্গে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া বুকের পাঁজরে চোট লাগার ব্যথা, কোমলাস্থি বা কার্টিলেজের (cartilage) প্রদাহ, ফুসফুসের ধমনিতে রক্তের দলা জমা, ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ বা প্লুরিসি (pleurisy) এবং মহাধমনি বা অ্যাওয়ার্টার ডিসেকশন (dissection of aorta)—এইসকল অবস্থাও বুকের ব্যথার কারণ হতে পারে। পেটে বায়ু বা গ্যাস জমেও বুকের বাঁদিকে ব্যথা দিতে পারে এবং পেট পরিষ্কার হলে তার উপশম হয়। তবে যেকোন ব্যথার ক্ষেত্রেই সুচিকিৎসকের সাহায্য যত শীঘ্র সম্ভব অবশ্যই নেওয়া দরকার।

প্রশ্ন : আমরা যাকে 'হার্ট ব্লক' বলি, সেটি কি? হঠাৎ 'হার্ট ব্লক' কি হতে পারে?

উত্তর : 'হার্ট ব্লক' বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে 'হার্ট, হাইপারটেনশন ও ডায়াবিটিস' গ্রন্থটি পড়ে নেওয়া দরকার। তবে এখানে সংক্ষেপে এবিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। হার্টের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটায় তার বৈদ্যুতিক অনুপ্রাণন। ডান অলিন্দ থেকে বৈদ্যুতিক অনুপ্রাণন বা ইমপালস (impulse) উদ্ভূত হয়ে নিচে নিলয়ের দিকে যাওয়ার পথে দ্বাররক্ষীর মতো আছে এ-ভি নোড (A-V node)। এই এ-ভি নোডে স্বাভাবিকভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিছুক্ষণ বিলম্বিত হয়ে নিচে দুই নিলয়ের দিকে ধাবিত হয়ে তাদের সঙ্কোচন ঘটায়। যদি কোন কারণে এই বিলম্ব স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘ হয় অথবা অলিন্দ থেকে আসা বৈদ্যুতিক প্রবাহ এ-ভি নোডের অসুস্থতায় এমনি বাধা পায় যে, তা হয় নিলয়ের দিকে যেতেই পারে না অথবা মাঝে মাঝে অল্প হারে নিলয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়—তখন বলা হয় 'হার্ট ব্লক' হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক অনুপ্রাণন কেবল বিলম্বিত হলে (কিন্তু প্রতিটি অনুপ্রাণন নিলয়ে পৌঁছাতে পারছে) তাকে বলা হয় প্রথম ধাপের বা ফার্স্ট ডিগ্রি এ-ভি ব্লক বা হার্ট ব্লক (First degree A-V block or First degree heart block)। আর যদি কোন অনুপ্রাণনই নিলয়ে পৌঁছাতে না পারে, নিলয় নিজে তার স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্কোচন ধীরে ধীরে কার্যকর করে চলে, তখন পূর্ণ বা কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়েছে বোঝা যায়। এই দুই ধরনের হার্ট ব্লকের মাঝে আছে আংশিক বা পার্শিয়াল (partial) হার্ট ব্লক—এতে অলিন্দের স্পন্দনের হার যত, তার চেয়ে কম হারে নিলয় স্পন্দিত হয়। মাঝে মাঝে আবার একটা বিশিষ্ট হারে এ-ভি নোড অলিন্দ থেকে আসা বৈদ্যুতিক অনুপ্রাণনগুলিকে নিলয়ে ধাবিত হতে দেয়। যেমন ৩ : ১ বা ২ : ১ এ-ভি ব্লকে সেটি দেখা যায়।

হার্ট ব্লকে হার্টের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) সঙ্কোচনের হার অনেক সময় এমন কম হয় যে, তাতে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদি হার্ট ব্লক নিয়ে রোগীরা চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু খতিয়ে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে যে স্মৃতিভ্রংশতা, শারীরিক দুর্বলতা, চিন্তা করার ক্ষমতার হ্রাস ইত্যাদি হয়তো ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কারো আবার হার্ট ফেলিওরের অবস্থা প্রকট হয় হার্ট ব্লকের জন্য এবং তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, শরীরে জল জমা—এসব লক্ষণ দেখা দেয়। নাড়ির গতি পরীক্ষা করলে যদি বোঝা যায় যে, তা

---

* *আমেরিকার সিরাকুজ-নিবাসী ডাঃ শক্তি মুখোপাধ্যায় হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ, উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠক।*

আস্তে চলছে (যেমন ৩০/৪০ বার প্রতি মিনিটে), তখন দেরি না করে একটি ই.সি.জি. করিয়ে দেখা উচিত যে সত্যিই হার্ট ব্লক হয়েছে কিনা। গত শতাব্দী থেকেই 'পেস মেকার' দিয়ে হার্টের গতি বাড়ানোর ফলে প্রভূত উপকার পেয়েছে এই হার্ট ব্লকের রোগীরা। নানাধরনের পেসমেকার আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি নতুন দিক খুলে দিচ্ছে।

হঠাৎ হার্ট ব্লক নিশ্চয়ই হতে পারে। কোন বিশেষ ধরনের হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে হার্ট ব্লক হঠাৎ হতে পারে। নানাপ্রকার ওষুধের পার্শ্বফল হয়ে হার্ট ব্লক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন—বিটা ব্লকার্স, ডিজিট্যালিস ও হার্টের গতি কম করতে সক্ষম ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্সগুলির কথা মনে রাখতে হবে। এছাড়াও অনেক কারণে হার্ট ব্লক হতে পারে এবং হঠাৎই তা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ *হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ ফুলে যাওয়ার সঙ্গে হার্টের ব্যাধির কোন সম্পর্ক আছে কি?*

উত্তর ঃ এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বোক্ত গ্রন্থটির 'হার্ট ফেলিওর' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

হার্টের অসুখে, বিশেষ করে হার্ট ফেলিওর দেখা দিলে শরীরে জল জমে এবং তা প্রথম পা ফোলা দিয়ে শুরু হয়। যদি রোগনির্ণয় করে ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে ক্রমশ সারা দেহে জল জমে শরীর ফুলে যেতে পারে। পেটে জল জমে উদরী রোগ থেকে হার্ট ফেলিওর প্রায়ই দেখা যায়। ফুসফুসে জল জমলে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। তখন রোগীকে কয়েকটি বালিশে ঠেসান দিয়ে উঠে বসে শ্বাস নিতে হয়।

প্রথম প্রথম অল্প পরিশ্রমে হাঁফ ধরা, দিনের শেষে জুতো পরতে চাপ লাগা (পায়ের চেটো ফোলা শুরু হওয়ার জন্য)—এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয় এবং সারা দেহে জল জমে দেহ ফুলে উঠতে পারে। তাই প্রথম থেকেই সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

হার্ট ফেলিওর ছাড়া অন্য অসুখেও হাত-পা ও সারা দেহ ফুলে যেতে পারে। এর মধ্যে কিডনির অসুখ, যাতে শরীর থেকে প্রচুর অ্যালবুমিন প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তার জন্য সারা শরীরে জল জমতে পারে।

লিভারের অসুখেও পেটে ও শরীরের নিম্নাঙ্গে জল জমতে পারে। এই অসুখেও শরীরে অ্যালবুমিন কমে যায় এবং জল জমার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেও শরীরে জল জমতে পারে।

হার্টকে ঘিরে যে-আস্তরণ আছে, তার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের ফলে হার্টের মধ্যে সারা শরীর থেকে ফিরে আসা রক্ত দ্রুত প্রবেশ করতে পারে না এবং ফলে শিরার মধ্যে রক্তচাপ বাড়ে ও ক্রমশ সারা শরীরে জল জমে দেহ ফুলে উঠতে পারে। ❑

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) 'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখার বিষয়—ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না।

(২) লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়।

(৩) কবিতা ও পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে।

(৫) লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়।

(৬) উচ্চমানের লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হয় না। 'মাধুকরী' বিভাগেই ঐধরনের লেখা প্রকাশিতব্য।

(৭) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতার বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না।

(৮) জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখতে হয়। শব্দসংখ্যা ২,৫০০-এর কম। লেখক বা লেখিকার নাম, ঠিকানা, ফোন নং দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৯) একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

(১০) লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে ঐ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখক-লেখিকার। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে **তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক** ইত্যাদির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(১১) রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(১২) 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগের জন্য লিখলে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই জানাবেন। নতুবা চিঠি গ্রাহ্য হবে না।

(১৩) লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব লেখক-লেখিকাদের।

মগরা ফুল

মেরিয়ন কোড*

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'The Vedanta Kesari'-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৫৪) এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।—সম্পাদক
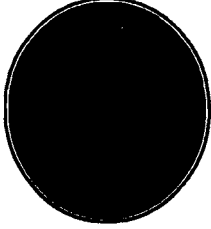
শান্ত প্রকৃতির বাঙালিদের কণ্ঠে ধ্বনিত ['সারদাদেবী' নামটি] এক দীর্ঘস্থায়ী সুমধুর সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো শোনায়। এই সুমিষ্ট সঙ্গীতের দ্যোতনা সেই মহীয়সী আত্মার স্মৃতিচারণ করার অতি সহজ সরল এক উপায়স্বরূপ, যাঁর পদতলে সুদূর আমেরিকা থেকে দলে দলে ভক্ত এসে সমবেত হয়েছিলেন এবং যাঁর মহিমা তাঁদের হৃদয়ে আজও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ভাষণ এবং স্মৃতিচারণের মধ্যে আমি এরূপ এক নিত্যপ্রবহমান অনন্য সুগভীর ভাবের প্রকাশ অনুভব করি, যা অন্য কোন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয় না। তিনি যে নিত্য সত্তাযুক্ত এবং তদুপরি আরো এক অবিনশ্বর সত্তা শ্রীরামকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ—এসম্বন্ধে সত্যসত্যই আমার কোন জ্ঞান ছিল না। মনে নিত্য প্রশ্ন জাগে, তাঁর চরিত্রে কী এমন শক্তি নিহিত ছিল, যা আজও হাজার হাজার ভারতীয় নরনারীকে তাঁর শ্রীচরণের প্রতি আকৃষ্ট করে? তাঁর অন্তর্নিহিত দেবীভাবের কী সেই অমোঘ আকর্ষণ, যা কলকাতায় তাঁর বাড়িতে গেলে যেমন অনুভূত হয়, ঠিক তেমনি অনুভূতি হতে থাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সেই ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গেলে?

আমেরিকার 'ইস্টার্ণ সিবোর্ড' থেকে প্রায় একবছর আগে আমি এদেশে এসেছি ; তখন থেকেই আমি ভারতীয় নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার বিশেষ সুযোগলাভ করি। প্রথমে আমি আশ্রয়লাভ করি দক্ষিণ ব্যাঙ্গালোরের শহরতলিতে 'বাসভানগুডি' নামক স্থানে এক ভারতীয় পরিবারে। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বেদান্ত অনুশীলন অব্যাহত রাখা।

সেখানে প্রতিদিন লক্ষ্য করতাম, সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় বহু রমণী তাঁদের ভারবাহী পশু সমেত 'টেম্পল হিল'-এ এসে সমবেত হন। এই 'টেম্পল হিল' প্রায় হাজার বছর পূর্বের দ্রাবিড়দের মন্দিরসমূহ এবং সেইসকল মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ঝকঝকে কলসি নিয়ে খালি পায়ে তাঁদের চলার মধ্যে প্রকাশিত হতো একপ্রকার দীপ্ত মর্যাদাবোধ এবং স্নিগ্ধ মাধুর্য, যা আমাকে তাঁদের প্রতি এক ভালবাসায় আচ্ছন্ন করে রাখত। সেই সুপরিচ্ছন্ন পাত্রগুলির গায়ে প্রায়শই প্রতিফলিত হতো তাঁদের উজ্জ্বল কিংবা মলিন হয়ে যাওয়া শাড়িগুলি। যেকোন কাজকর্মের পক্ষে উপযুক্ত তাঁদের সেই মার্জিত বেশভূষার সৌন্দর্য দেখে আমি মনে মনে বেশ আনন্দবোধ করতাম। সেই চড়াই প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ পর্বতগাত্র ধরে তাঁদের অবাধ এবং অনুপম আরোহণপর্বটি আমার মতো একজন সর্বদা জুতা-পরিহিতা বিদেশিনীর কাছে এক পরম বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হতো। আবার মাথার ওপর জলভরা কলসি নিয়ে সেই পর্বতগাত্র ধরে তাঁদের অবলীলায় অবতরণপর্বটি তো আমার এক অলৌকিক ঘটনা বলে বোধ হতো।

আবার হয়তো দেখা যেত, দিনের কোন একসময় ঐ রমণীগণ কোন এক মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করছেন। কোন মন্দিরের বিগ্রহ হনুমান, কোথাও গণেশ অথবা মাধব, কোথাও আবার শিব কিংবা কৃষ্ণ। কোন কোন প্রাচীন মন্দিরে সমৃদ্ধি তথা সৃষ্টির প্রতীক নাগদেবতার পূজা করা হতো। দেবদেবীর মূর্তি সেখানে মুখ্য বিচার্য ছিল না; মুখ্য আকর্ষণ ছিল একটি পবিত্র স্থান, মন্ত্রোচ্চারণরত পুরোহিতের উপস্থিতি এবং পুষ্পের সমারোহ। কারণ, এগুলির একত্র সমাবেশের ফলস্বরূপ দিনের যেকোন সময় অন্তরের অন্তর্নিহিত সেই অমূর্ত দেবতার উদ্দেশে পূজানিবেদন পর্বটি সম্পন্ন করা যেত। আবার দেখতাম, সূর্যাস্তের সময় এরকম কোন এক মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাঁরা কোন পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ ও আবৃত্তি করছেন। পরবর্তী কালে বারাণসীতেও আমি অনুরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

আমার মনে হয়, তাঁদের আচরণের মধ্যে দুটি মনোভাব অতি স্পষ্ট। প্রথমটি হলো—যেকোন শ্রমকে অতি সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো—গভীরভাবে অনুভূত এক ধর্মীয় পরিমণ্ডল, যেটি তাঁদের নিকট এক চরম সত্যরূপে প্রমূর্ত। কারণ, এই ভাবটিই তাঁদের অন্তরের সঙ্গে বাইরের জগতে প্রকটিত সকলপ্রকার শক্তির এক অসামান্য সাম্যাবস্থা রক্ষা করে চলেছে। সচেতন

* আমেরিকাবাসিনী জনৈক ভক্ত।

অথবা অচেতনভাবে এখানে নিখিলবিশ্ব এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়ভাব পরিলক্ষিত হয়; জীবনধারণের ক্ষেত্রে এদুটি চেতনা যেন এখানে পরস্পরের পরিপূরক। সেখানে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভয়াবহভাবে প্রকটিত নিখিলবিশ্বকে দমন করে রাখার মতো কোনরকম লোলুপ প্রচেষ্টা নেই।

এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যনগরীর যেসকল অঞ্চলে মানুষ গৃহনির্মাণ করে একত্রে বাস করেন, সেখানে গেলে দেখা যায়, প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গৃহলক্ষ্মীগণ তাঁদের গৃহের অঙ্গন জল ঢেলে ধুয়ে দিচ্ছেন। সকলের কল্যাণের জন্য তাঁরা নিত্যনতুন নকশা এঁকে গৃহের সম্মুখে আলপনা দিচ্ছেন। বস্তুত, প্রাত্যহিক কাজ শুরু করার পূর্বেই তাঁরা এগুলি করেন। তার কিছু পরেই দেখা যায়, গৃহের বালকবালিকাগণ পূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করে আনছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের ডালের তৈরি ঝাড়ু দিয়ে অঙ্গনটি প্রায় শয়নঘরের মেঝের মতো পরিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু তাঁদের সকল কাজের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং জীবনধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সকল শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যেই প্রকাশলাভ করে ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের নীরব আত্মনিবেদনের ভাব।

শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনব্যাপী এই গভীর বিশ্বাসের ভাবটি কিন্তু এদেশে নতুন কিছু নয়। প্রাথমিকভাবে এটি ছিল বেদ থেকে উৎসারিত ভারতীয় নারীর এক সহজাত গুণের চরম প্রকাশস্বরূপ। এবং আজও সেটি জড়বাদের কলঙ্কিত প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আপন মহিমায় পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, নারী পুরুষের সমানাধিকার তথা স্বাধীনতার দাবি এবং ব্যক্তিজীবন ও জনজীবনে দায়ভার সমানভাবে বণ্টনের জন্য নব্য ভারতের সংগ্রামের প্রকৃত রূপটি ঠিক কিরকম? আমার মনে হয়, ভারতীয় জীবনধারার অপরাপর দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করার সময় এসেছে। কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে আমি সেখানকার শিক্ষিকাগণের মধ্যে অতি উচ্চশিক্ষিতা ও প্রবল তারুণ্যপূর্ণ কিছু নারী তথা পরবর্তী প্রজন্মের গৃহবধূ, জননী এবং জনসেবিকাগণের জন্য আদর্শ নেত্রীর সাক্ষাৎলাভ করেছি। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করার অব্যবহিত পরেই তাঁদের দর্শন করে আমি উপলব্ধি করি, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা কী গভীরভাবে তাঁদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে শ্বেতশুভ্র মগরা ফুলের অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ যেরূপ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং যা অন্য কোন ফুলের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়—ঠিক সেরকম তিনি যে-স্থানেই অবস্থান করতেন, সেই স্থানটিই তাঁর সেই নিরন্তর প্রার্থনা এবং ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তাঁর সঙ্গে যেসকল পুরুষ বা নারীর কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের জীবনও এক অলৌকিক আভায় পূর্ণ হয়ে উঠত। তাঁর সান্নিধ্যে এলে তাঁকে না ভালবেসে থাকা যেত না।

পরম মমতা, সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাসহকারে নারীজাতির সেবা করার ভাবটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। এই বিশেষ ভাবটি তাঁর পার্ষদ এবং অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মাধ্যমে জগতের সকল ভক্তের হৃদয়ে বিস্তারলাভ করেছে। নিঃস্বার্থ সেবাভাবের মধ্যে বুদ্ধিশক্তিরও একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতালগুলিতে, গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত কস্তুরবা হাসপাতালে এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে আমি মাত্রাতিরিক্ত কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করেছি—যা আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে বিকশিত সেবাভাবের সর্বোত্তম রূপটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষাদান এবং সেবার কাজে জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মতোই হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন একটি অতি মূল্যবান বিষয়।

অতি কর্মব্যস্ততার অবসরে ভারতীয় মহিলাদের ভূমিকাটি সাধারণত কীরকম হয়ে থাকে? নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স'-এ এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি সমাজের তথাকথিত যাবতীয় রক্ষণশীলতার বেড়াজালকে অস্বীকার করে অন্যতম প্রধান ভারতীয় চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আবার নব্য শাসনতন্ত্রের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধেও তিনি সম্যগ্‌রূপে অবহিত ছিলেন। আমি যখন ভারতবর্ষে এলাম, তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রাচীন এক রাজবংশের ছবির মতো সুন্দর এক প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে পৌঁছে আমি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে মিলিত হই। আমি যেন তাঁদের কতদিনের পরিচিত, ঠিক এইভাবে তাঁরা আমাকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। দেখলাম, যেকোন ধর্মের মানুষকে সাদরে গ্রহণ করা বোধকরি এদেশের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং সেটিই প্রকৃত হিন্দুসংস্কৃতির পরিচায়ক। লক্ষ্য করলাম, সেই রাজপরিবারে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। সেই বিশেষ ক্ষণটি যেন ঈশ্বরের অনুস্মারকরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রতিদিন তাঁদের বসার ঘরটিতে যে রুচিশীল আলোকসজ্জা রচনা করা হতো, তার মধ্য দিয়ে অতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আলোকরূপী ঈশ্বরকে ধারণা করার ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠত। আমি ঐ বসার ঘরটিকে কোনদিন ভুলতে পারব না, কারণ

ঐ ঘরটির মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যেত এক বিরাট প্রাঙ্গণে—যেটি বেশ কিছু প্রাচীন কমলালেবু গাছে শোভিত ছিল। সেখানে একটি আবলুশ কাঠের তৈরি পাটাতনের ওপর অতি নকশা করা গজদন্তের আসনে আমার আমন্ত্রণকর্ত্রী অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত শ্বেতশুভ্র মসলিন শাড়ি পরে পদ্মাসনে উপবেশন করতেন। তিনি দর্শন অথবা বিশ্বের যেকোন ঘটনা, বৈদিক জ্ঞানের মধ্যে নিহিত নীতি এবং মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মসাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও জড়বাদের মতপার্থক্যগুলি অতি সাবলীল ও বুদ্ধিদীপ্তভাবে ইংরেজি ভাষায় অনর্গল আলোচনা করতেন। এটি হলো সেই পরম বিশ্বাসের রমণীয় সৌন্দর্য। এটি হলো নারীত্বের ক্ষেত্রে সুমহান ভারতীয় বিধিনিষেধের স্বর্ণসূত্রের বুনন।

যেসকল ভারতীয় পরিবারের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সর্বত্র আমি লক্ষ্য করেছি, পরিবারের ভৃত্য থেকে শুরু করে সন্তান, অতিথি, পড়শি, কারবারি প্রভৃতি সকলের প্রতি অতি সুমিষ্ট এবং বিনম্র আচরণ—যা দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতাবিশিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সংসারজীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে এই ভাবটি প্রত্যেক ভারতীয় নারীর মনোভাবের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখার দুর্লভ ক্ষমতা, যার ফলস্বরূপ তাঁদের গৃহে অতিথিগণ সর্বদাই অতি স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন।

সমাজের যেকোন অর্থনৈতিক স্তরে প্রকটিত সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সঠিকভাবে পালন করার মানসিকতা এদেশের এক অতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। দিল্লিতে তিন পুত্রের মাতা এক যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন অতি উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। আমাদের দেশে হলে তাঁর পরিচয় হতো একজন 'সোসাইটি উওম্যান' (শৌখিন সমাজের নারী)। লক্ষ্য করলাম, ঐ তিন পুত্র তাঁদের কাছে কখনো সমস্যাস্বরূপ হয়ে ওঠে না। মানসিকভাবে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সকলের সঙ্গে একাত্ম। সংসার এবং নিজস্ব পড়াশুনোর প্রতি তারা সমানভাবে মনোযোগী। সেই সংসারের 'মা'টিও পরম শান্তিময়ী। যেহেতু ঐ সংসারটিকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর যাবতীয় চিন্তাভাবনা এবং শক্তিব্যয়, সেই কারণেই তাঁকে কখনো বিশেষ ব্যস্ত বলে বোধ হতো না। সর্বদা মনে হতো, ঐ সংসারে একটি 'ফোকাস' বর্তমান এবং সেটি আমাকে সেই 'লেন্স'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা সরাসরি সেই মহাকাশ থেকে আগত সূর্যরশ্মিসমূহকে অভিসারী করে এমন এক শক্তির সৃষ্টি করে, যা অগ্নিপ্রজ্বলনের সহায়ক।

পাশ্চাত্যের ঐ শৌখিন নারীদের কথা স্মরণ করলেই আমার মনে ভেসে ওঠে একটি দাম্ভিক ও অস্থির ভাব, অনাবশ্যক কর্মব্যস্ততা তথা ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি প্রবল গতিতে ধাবমান হওয়া অথবা একপ্রকার জটিল জীবনপ্রবাহের স্বার্থে সীমাহীন পরিশ্রম করার চিত্রটি। অতি সহজ সরল ক্ষেত্রেও সেখানে পরিলক্ষিত হয় বস্তুবাহুল্যের বাধ্যবাধকতা এবং অনাবশ্যক পীড়নের প্রতি আত্মসমর্পণ—যার সঙ্গে প্রাচ্যের মানুষের কোনই পরিচয় নেই। নিশ্চিতভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, একজন ভারতীয় গৃহবধূ কিছু ভাল কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং সেই ভাল কাজ করতে করতে তাঁরা হয়তো ক্লান্তও হয়ে পড়েন। তবে সমাজের সর্বস্তরের ক্ষেত্রে যে একথা সত্য, তা বলা যায় না। তবুও একজন পাশ্চাত্য দেশীয় অতিথির মনে যে-বিষয়টি নিরন্তর রেখাপাত করে চলে, সেটি হলো তাঁদের মুখের ভাব এবং আচরণের মধ্যে ব্যাবহারিক পার্থক্যটি। যেকোন ভারতীয় নারীর মুখমণ্ডলে সর্বদা প্রকাশ পায় হৃদয়ের পবিত্রতা এবং সকলকে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রশান্তি। এই ভাবটি মহাত্মাগণের আনন্দময় ভাবের সঙ্গে সদৃশ। (পাশ্চাত্যের শৌখিন নারীগণ সম্বন্ধে) জনৈক আধুনিক সমালোচক লিখেছেন ঃ "দায়িত্ব এবং ক্লান্তিকর কর্মসমূহের দার্শনিক অনুমোদন নয়, পরন্তু শুধু গতি, কখনো বা (তার থেকে উদ্ভূত) রক্তাল্পতা; হৃদয়ের পবিত্রতা নয়, পরন্তু অজ্ঞতা।" বোধকরি এইসকল অবস্থাই সত্য বলে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে। কিন্তু আমি জানি, পাশ্চাত্যের মায়েরা তাঁদের সন্তানদের শারীরিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যত মনোযোগী, তাদের হৃদয় অথবা ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই সচেতন নন। সেদেশের শিক্ষিকা এবং সেবিকাগণের কিজাতীয় মানসিক পরিকাঠামো হওয়া দরকার অথবা কিজাতীয় চলচ্চিত্র তাদের দেখা প্রয়োজন, সেবিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। আত্মজ্ঞান লাভের লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ করার ওপর প্রাচ্যের গুরুত্ব প্রদানের ভাবটি সুস্থ জীবনযাত্রার অতি গভীর এবং সুন্দর একটি দিক—যা পাশ্চাত্যে পরিদৃশ্যমান জীবনধারা থেকে অনেক অধিক মাত্রায় পরিণত, নিয়ন্ত্রিত এবং অভীষ্টসাধনে সমর্থ।

একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে আজ অভাব-অনটনের শেষ নেই; সেখানে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন উন্নত মানের শিক্ষাবিস্তার এবং গ্রামগুলির বিশেষভাবে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিশু পরিষেবার। ভারতবর্ষ এখন যে দুঃখজনক সংক্রমণকালের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে, সেখানে আরো নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে; কিন্তু সেগুলির সমাধানের উপায়ও পরিদৃশ্যমান। আজ ভারতীয়

নারীগণ এক সার্বজনীন উন্নতিসাধনের পথ আবিষ্কার এবং সেটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতিসাধন করা সত্ত্বেও [এদেশে] সেই সুমহান বৈদিক মূল্যবোধগুলির যথাযথ বিকাশলাভের ক্ষেত্র কিন্তু রচিত হয়ে আছে এবং সেখান থেকেই পাশ্চাত্যজগৎ প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। মগরা ফুলের সুগন্ধের মতোই শ্রীশ্রীমায়ের ভাব আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যের নারীগণ আজ সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিজ নিজ শরীর ও বাসস্থানের সাজসজ্জার প্রতি যত কম যত্নবান হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মার পুষ্টিসাধন ও জীবনধারার মধ্যে একটি সার্থক সমন্বয়সাধনের জন্য যত অধিক সচেতন হবেন—ততই আমাদের মধ্যে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত, অস্থির মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। প্রকৃত অর্থে এক সার্থক উন্নত জীবনধারার সন্ধানলাভ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। বহু পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন, ভারতবর্ষে প্রকটিত শারীরিক অপুষ্টি পাশ্চাত্যদেশের আধ্যাত্মিক অপুষ্টির মতো তত মারাত্মক নয়। ধর্ম এবং সেই পরম সত্যস্বরূপ নিত্য বস্তু সম্বন্ধে সচেতনতালাভের মধ্য দিয়ে এদেশে একজন ব্যক্তির জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সবশেষে বলি, বাঙালিদের আবেগভরা 'সারদাদেবী' মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পালিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনবর্ষে একজন আমেরিকান মহিলার পক্ষে ভারতবর্ষে থাকার সৌভাগ্যলাভ এক অতি মহিমময় কৃপাস্বরূপ। ❑

শব্দচেতনা ৪৩

শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি : (১) শ্রীমায়ের অন্যতম সেবিকা (৪) "কেউ পর নয় মা, —— তোমার" (৬) জয়রামবাটীতে বাসকালে এর মা শ্রীমায়ের কাছে সবজি বেচতে আসত (৭) শ্রীমা গোবিন্দজীকে দর্শন করেছিলেন এই তীর্থভ্রমণে (১১) "ছায়া কায়া ——" (১২) এখানে শ্রীমা সাবিত্রী পাহাড় দর্শন করেন (১৩) কোয়ালপাড়ার জনৈক বৃদ্ধ, শ্রীমায়ের আশীর্বাদে যার মনস্কামনা পূর্ণ হয় (১৪) 'শ্রীমা'-র গ্রন্থকারকে আদর করে শ্রীমা বলতেন '—— কার্তিক' (১৬) শ্রীমা ন বছর বয়সে পিতার আদি বাড়ি থেকে যাঁর বাড়িতে আসেন (১৮) সুবাসিনীর দ্বিতীয় কন্যা (২০) শ্রীমার এক লীলাসঙ্গিনী (২১) শ্রীমায়ের এই মন্ত্রশিষ্যের পূর্বনাম গোপেশ।

ওপর-নিচ : (২) এই ভক্তমহিলা শ্রীমাকে স্বপ্নে চণ্ডীরূপে দেখেছিলেন (৩) শ্রীমা এই মন্দির-প্রসিদ্ধ শহরটি দর্শন করেছিলেন (৫) শ্রীমা দেহ থেকে যা উন্মোচন করতেই ঠাকুরের পূর্বের মূর্তিতে আবির্ভাব (৬) "কথার কথা মা নয়, ——" (৮) মিস ম্যাকলাউডকে শ্রীমা যে-নামে ডাকতেন (৯) আমোদরের অপর তীরে এক গ্রাম (১০) শ্রীমা এই খাবারটি খুব পছন্দ করতেন (১১) শ্রীমায়ের স্মৃতিবিজড়িত '—— বাড়ি লেন' (১৫) অরবিন্দ-পত্নীকে শ্রীমা যে-নামে সম্বোধন করতেন (১৬) হরিশকে শাসন এই রূপে (১৭) '—— মহাশয়ের দিনলিপি' থেকেও মায়ের কথা জানা যায় (১৯) "দুইবেলা জপ করবে, আর সর্বদা স্মরণ —— করবে, এতেই সব হবে।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম চৈত্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শ্রীম-র সার্ধশতবর্ষে কথায়, গানে গুরুপ্রণাম
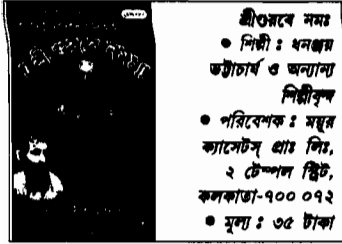
শ্রীগুরবে নমঃ ● শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ ● পরিবেশক : ময়ূর ক্যাসেটস্ প্রাঃ লিঃ, ২ টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ ● মূল্য : ৩৫ টাকা

সম্প্রতি শ্রীম-র ১৫০তম আবির্ভাবতিথি পালনে গাথানী কোম্পানি শ্রীম-র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্ঘ্য **'শ্রীগুরবে নমঃ'** ক্যাসেটটি প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণীকে যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে রূপদান করেছেন, সেই অমর রূপকার শ্রীম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ক্যাসেটটিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে সঙ্কলিত অংশ পাঠ করেছেন শ্রীম-র প্রপৌত্র দীপক গুপ্ত, যিনি দীর্ঘকাল ধরে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের কাজ করে চলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী কথাগুলি শ্রীগুপ্তের সচ্ছন্দ পাঠের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অনুভূত হয় শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাকুলতা। 'কথামৃত' রচনার পিছনে যে-প্রেরণা শ্রীম পেয়েছিলেন, তার উদ্ধৃতি ক্যাসেটটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ক্যাসেটে পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে প্রথম দুটি গান ('মন চল নিজ নিকেতনে' ও 'মা ত্বং হি তারা') বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একটু যেন বেমানান বলে মনে হয়। প্রতিটি গানই অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়। কিন্তু গানগুলি আরো চিত্তাকর্ষক হলে ভাল হতো। তবে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শেষ গান 'রামকৃষ্ণ চরণসরোজে' শেষের দিকে থাকায় অভাববোধটি অনেকাংশে পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মানুষের কাছে ক্যাসেটটি একটি মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে থাকবে। ❑

—ভূপেন্দ্রনাথ শীল

সঙ্গীতে মাতৃপ্রণাম
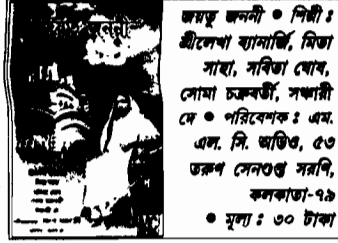
জয়তু জননী ● শিল্পী : শ্রীলেখা ব্যানার্জি, মিতা সাহা, সবিতা ঘোষ, সোমা চক্রবর্তী, সন্ধ্যারী দে ● পরিবেশক : এম. এল. সি. অডিও, ৫৩ তরুণ সেনগুপ্ত সরণি, কলকাতা-৭৯ ● মূল্য : ৩০ টাকা

শ্রীভগবান নারদকে বলছেন : "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।/ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

হয়তো সেজন্যই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। সম্প্রতি এম. এল. সি. অডিও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর উদ্দেশে এরকমই প্রার্থনার গীতিগুচ্ছের সঙ্কলন **'জয়তু জননী'** ক্যাসেটটি প্রকাশ করেছে। দুদিক মিলিয়ে ক্যাসেটটিতে মোট ১০টি গান আছে। গায়িকা শ্রীলেখা ব্যানার্জির গায়নরীতি ভক্তিরসে আপ্লুত। গানের কথাগুলি অপূর্ব। Side A-এর চতুর্থ গান 'ঠাকুর হলেন পরম পিতা' (যদিও ইনলে কার্ডে উল্লেখ আছে 'ঠাকুর মোদের পরম পিতা') বেশ ভালভাবেই গীত হয়েছে। তবে ক্যাসেটটির রেকর্ডিঙে কিছু সমস্যার জন্য প্রত্যেক গানের শেষেই হালকাভাবে অন্য একটি গানের শব্দ ভেসে আসে। ❑

সঙ্গীত-সাগরে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসংগীতামৃত ● ভাষ্যপাঠ, সুর ও শিল্পী : মানিকলাল দে ● পরিবেশক : রাগা মিউজিক কমিউনিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, ১৯এ জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-১৩ ● মূল্য : ৩৫ টাকা

'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "মা! পূজা গেল, জপ গেল; দেখো মা, যেন জড় করো না!... তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নামগুণকীর্তন করব, গান করব মা।" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সঙ্গীতময় রূপটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে রাগা মিউজিক থেকে **'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসংগীতামৃত'** ক্যাসেটটি প্রকাশিত হয়েছে। Side A-এর 'তোর কোলে লুকায়ে থাকি', 'যতনে হৃদয়ে রেখো', 'যখন যেরূপে মাগো', 'তুঝ্সে হামনে দিলকো লাগায়া' এবং Side B-এর 'সুখের বাসনা করো না কদিন', 'আমি ভবে একা দাও হে দেখা', 'মাগো আনন্দময়ী', 'প্রভু ম্যায় গোলাম'—প্রত্যেকটি গানের পূর্বঘটনা উল্লেখ করে শিল্পী মানিকলাল দে বেশ দরদের সঙ্গে গানগুলি গেয়েছেন। তবে গানের বাণীর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। 'তুঝ্সে হামনে' ও 'প্রভু ম্যায় গোলাম' গানদুটি সম্পূর্ণ গীত হয়নি। এতে সঙ্গীতপিপাসু ও সঙ্গীতসাধকগণের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। এছাড়া বেশ কিছু গানের কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন Side B-এর প্রথম গানটিতে গাওয়া হয়েছে 'সুখের বাসনা করো না কদিন'। ওটি হবে—'সুখের বাসনা করো আর কদিন'। ঐ গানেই গাওয়া হয়েছে 'ভাবিলে বিশদ', হবে—'ভাবিলে বিষাদ' ইত্যাদি। ইনলে কার্ডের চিত্রণটি খুবই সুন্দর। সেখানে সুরকার হিসাবে শিল্পীর নাম উল্লিখিত, কিন্তু গানগুলি প্রচলিত সুরেই গাওয়া হয়েছে। যেমন 'সুখের বাসনা'—ভীমপলশ্রীতেই গাওয়া হয়। ❑

কথায় ও সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা

সাধন পথে শ্রীরামকৃষ্ণ (গীতিনাট্য) ● সম্পাদনা, সুর, সঙ্গীত ও নির্দেশনা : বীরেশ্বর রায় চৌধুরী ● পরিবেশক : শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ, শিবপুর, হাওড়া ● মূল্য : ৪০ টাকা

সম্প্রতি শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ-এর অনবদ্য প্রয়াসে **'সাধন পথে শ্রীরামকৃষ্ণ'** ক্যাসেটটি প্রকাশিত হয়েছে। জয়নারায়ণ-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন : "অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখনো

ভাঙা হন?" কথাটি তিনি বলেছিলেন গোবিন্দজীর ভগ্নবিগ্রহের পূজা প্রসঙ্গে। ক্যাসেটটির Side A-এর শুরু হয়েছে এই বিষয়টি দিয়ে। এই পর্বের গানগুলি হলো— 'তোর কোলে লুকায়ে থাকি', 'অন্নপূর্ণা মা যে আমার', 'যতনে হৃদয়ে রেখো', 'সেহি পদ তরণী', 'আর কবে দেখা দিবি মা', 'জগবন্দিনী বিশ্বজননী', 'পায়োজী মোরি রামরতন ধন', 'যো রাম দশরথ কা বেটা', 'ইতনা তো করলো স্বামী'। ক্যাসেটের শেষ ঘটনাটি হলো তোতাপুরীর প্রস্থান। রানী রাসমণির চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর স্বরক্ষেপণ ততটা পরিণত মনে হয় না। গায়কের গায়নরীতি আরো ভাল হলে ঘটনাগুলি অন্য মাত্রা পেত। তোতাপুরীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর উচ্চারণে বাঙলা টান আছে। ইনলে কার্ডের অলঙ্করণ বেশ ভাল, যদিও কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়ে। ❑

জ্যোতিরাত্মার মর্ত্যে আগমন

শ্রীরামকৃষ্ণ পদে নরেন্দ্রনাথ (গীতিনাট্য) • *সম্পাদনা, সুর, সঙ্গীত ও নির্দেশনা : বীরেশ্বর রায়চৌধুরী* • *পরিবেশক : শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ, শিবপুর, হাওড়া* • *মূল্যের উল্লেখ নেই*

শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ নাট্যগোষ্ঠী 'শ্রীরামকৃষ্ণ পদে নরেন্দ্রনাথ' নামে গীতিনাট্যের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছে। গীতিনাট্যটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের নামভূমিকায় বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও অধীর চট্টোপাধ্যায়। যেহেতু নরেন্দ্রনাথ এলেই শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনতে চাইতেন, তাই ক্যাসেটটিতে কয়েকটি গান, যেমন—'মন চল নিজ নিকেতনে', 'দিন তারিণী তারা', 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই', 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি' সংযোজিত হয়েছে ঘটনা অনুসারে। কিন্তু গায়কের গলা খুব কেঁপেছে, যন্ত্রানুষঙ্গও যে উচ্চমানের তা বলা যায় না। রেকর্ডিং আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। খুব বেশি অনুরণনের ফলে কথোপকথন শ্রুতিমধুর হয়নি। গীতিনাট্যটি শুরু হয়েছে ঠাকুরের সামনে নরেন্দ্রনাথের গাওয়া 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি দিয়ে। নরেন্দ্রনাথের ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ঘটনা শুরু হলে ক্যাসেটটির নামকরণ বোধ করি সার্থক হতো। ক্যাসেটটি শুনলে ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের দিব্যসম্পর্কের বহু ঘটনা ও ভাব মনের মধ্যে অনুরণিত হয়, কল্পনায় ভেসে ওঠে সেই অপার্থিব জগতের মধুর চিত্রগুলি। এতে শ্রোতাদের কল্যাণ হবে, বলাই বাহুল্য। ❑

—সুমন লোধ

প্রাপ্তিস্বীকার

✦ ***গীতা-সার-সংগ্রহঃ*** *(১ম ও ২য় খণ্ড)* • *শিল্পী : স্বামী দিব্যব্রতানন্দ* • *উদ্দেশ্য : স্বামী প্রেমেশানন্দ কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ বিশেষ একশোটি শ্লোকের সঙ্কলন 'গীতা-সার-সংগ্রহঃ' থেকে শ্লোকের অর্থসহ আবৃত্তি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি ভূমিকা এবং প্রচলিত গীতা আরতি।* • *পরিবেশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩* • *মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।*

✦ ***এলে পতিতের মাতা পতিতপাবনী*** • *গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী : স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ* • *পরিবেশক : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ সেবাশ্রম, জামসেদপুর* • *মূল্য : ৪০ টাকা।*

✦ ***আজি সঙ্গীতে মোর লহ উপহার*** • *গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী : স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ* • *পরিবেশক : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ সেবাশ্রম, জামসেদপুর* • *মূল্য : ৪০ টাকা।*

✦ ***মন্ত্রমন্দ্রা:*** *(শ্রীরামকৃষ্ণগায়ত্রী এবং দেবীগায়ত্রী মন্ত্রের আবৃত্তি)* • *উদ্দেশ্য : ধ্যানে সহায়তা* • *উপদেষ্টা : স্বামী সর্বগানন্দ* • *পরিকল্পনা, পরিচালনা : গৌতম মুখোপাধ্যায়* • *অংশগ্রহণে : সার্বর্ণ ঘোষচৌধুরি, শিউলী পোদ্দার, গৌতম মুখোপাধ্যায়, অতীশ মুখোপাধ্যায়, অপূর্বলাল মান্না, অম্লান হালদার, পুলক সরকার, নীলু মিত্র* • *পরিবেশক : টি. এম. এস. মিউজিক, দাসনগর, হাওড়া* • *মূল্য : ৪০ টাকা।*

✦ ***পবিত্রগীতি*** • *সুরকার ও শিল্পী : ডঃ মানসী দে* • *প্রযোজনা : ডাঃ সুদীপ্ত দে* • *মূল্য : ৪০ টাকা।*

✦ ***ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ*** *(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজন)* • *শিল্পী : শর্মিষ্ঠা আইচ* • *পরিবেশনা : 'নিবেদন', বিনোদ ভবন, কৃষ্ণনগর রোড, ন'পাড়া, বারাসাত, কলকাতা* • *মূল্য : ৩৫ টাকা।*

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিগত ৪-৬ জানুয়ারি ২০০৫ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে আয়োজিত সমাপ্তি উৎসবের উদ্বোধনী অধিবেশন এবারের প্রচ্ছদে পরিদৃশ্যমান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের একাংশও এতে দেখা যাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির পক্ষে পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক মহারাজ কর্তৃক পঠিত ২০০৩-২০০৪ সালের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার

রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণসভা বেলুড় মঠে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ বিকাল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পঠিত পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি দেওয়া হলো ঃ

এই বছর শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি বর্ষব্যাপী যথোপযুক্ত মর্যাদায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 'রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস্ অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যাণ্ড কালচারাল সেন্টার' নামে কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান ও পৈতৃক ভিটায় রামকৃষ্ণ মিশনের এক নতুন শাখাকেন্দ্র শুরু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে একটি পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার, একটি গবেষণা বিভাগ এবং একটি গ্রামীণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগসহ একটি 'সাংস্কৃতিক বিভাগ' রয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলির মধ্যে—বিহারের মজঃফরপুর ও ছাপড়ায় দুটি নতুন কেন্দ্রের শুরু, বৃন্দাবন সেবাশ্রমে চক্ষুচিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন, বাঁকুড়া সেবাশ্রমের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি উদ্বোধন, লখনৌ সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকে নিউরোসায়েন্স বিভাগ, একটি ১২ শয্যাবিশিষ্ট ইন্টেন্সিভ কেয়ার বিভাগ, একটি ৮ শয্যাবিশিষ্ট স্পেশাল কেয়ার শিশুবিভাগ, একটি ১২ শয্যাবিশিষ্ট নিউন্যাটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার বিভাগ, ৫টি অপারেশন থিয়েটার ও একটি ৪ শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগের উদ্বোধন—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তরাঞ্চল রাজ্যে কনখল সেবাশ্রমের হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের জন্য কিছু অত্যাধুনিক রোগনির্ণায়ক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। ইটানগর কেন্দ্রস্থ হাসপাতালে একটি হোলবডি সি. টি. স্ক্যান, দুটি উচ্চমানের কেবিন ও একটি কালার ডপ্‌লার মেশিনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া (ইউ. জি. সি.-র একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান) মিশনের নরেন্দ্রপুর কলেজকে পাঁচ বছরের জন্য গ্রেড-এ (সাফল্যাঙ্ক ৮৫-৯০%) কলেজরূপে চিহ্নিত করেছে। নতুন দিল্লির ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন ঝাড়খণ্ডের দেওঘর বিদ্যাপীঠকে 'শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় সম্মান' প্রদান করেছে। গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পাপুম পারে জেলা পরিচালন বিভাগ' অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর কেন্দ্রকে নবপ্রবর্তিত বার্ষিক 'ওয়ারিয়র এলউইন পুরস্কার'-এর প্রথম প্রাপক হিসাবে মনোনীত করেছে। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ ও ট্রেনিং' পশ্চিমবঙ্গের সারদাপীঠ কেন্দ্রের শিল্পায়তন বিভাগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০০৩ সালের শ্রেষ্ঠ 'স্কুল ইণ্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ' পুরস্কার দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে রামকৃষ্ণ মঠের নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন, মহীশূর কেন্দ্র কর্তৃক কর্ণাটকের প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যক্তিত্ব গঠন ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসারের জন্য বর্ষব্যাপী 'জ্ঞান বাহিনী প্রকল্প'-এর শুরু ও মহীশূর বিদ্যাশালার উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী গৃহের উদ্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৭৫৯টি গ্রামের ৬৫,০০০ পরিবারের আনুমানিক ২ লক্ষ ৫৫ হাজার বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্য বাবদ ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মিশনের ১০টি হাসপাতাল এবং ১২৭টি ডিস্পেনসারি ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার রোগীর চিকিৎসার জন্য ২৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৭০ হাজার। বিগত বছরে শিক্ষাখাতে মোট খরচের পরিমাণ ৮৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে ১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই অবকাশে আমরা মিশনের সভ্য ও বন্ধুদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব ২০০৪

বিগত ২০০৪ সালে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তার কিছু কিছু সংবাদ 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গ বিগত সংখ্যাগুলিতে পেয়েছেন। এবার প্রকাশিত হচ্ছে মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটীতে আয়োজিত উৎসবের বিবরণ। সেইসঙ্গে থাকছে আরো কিছু কেন্দ্রের প্রধান প্রধান উৎসব-সংবাদ। এছাড়া 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিভাগে বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের গত বছরের উৎসব-অনুষ্ঠানের যেসব সংবাদ এসে পৌঁছেছে, সেগুলিকেও এখানে একত্রিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। বলা বাহুল্য, এসবের বাইরেও আয়োজিত হয়েছে অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান; মাতৃ-আবির্ভাবের আনন্দবার্তা পৌঁছে গেছে বহু গ্রাম-নগর-শহর সহ দেশের অন্দরে-কন্দরে।

● **জয়রামবাটী ঃ 'সারদা রথযাত্রা' ঃ** বলা হয় ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, ভাবের বাহন। কিন্তু কোন কোন সময় মনের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশে ভাষার দুর্বলতা ও সীমিত ক্ষমতা
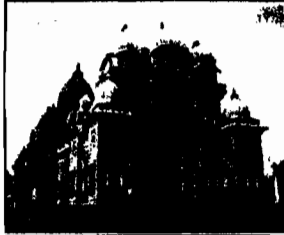
স্বীকার করতেই হয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত ভাবাবেগের আনন্দ-উচ্ছ্বাস শুরু হয় অন্তরে। শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির এক 'সারদা রথযাত্রা'র আয়োজন করেছিল।

বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি। বিকাল ৪টায় গ্রামীণ শিল্পকলার আঙ্গিকে সুসজ্জিত রথের ওপর পদ্মাসনে আসীনা দেবী সারদা জয়রামবাটী থেকে এসে পৌঁছালেন কামারপুকুরে। এখান থেকেই তাঁর প্রকৃত রথযাত্রা শুরু হবে বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে। ভাবটি এই—যেন যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বেরোচ্ছেন 'গৃহলক্ষ্মী'। মঠের পূজারী সন্ন্যাসী কর্পূরারতি করে যাত্রার সূচনা করলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত বহু শত ভক্তের হর্ষমুখর জয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হতে থাকল।

মা এই গ্রামের পথ ধরে, হয়তো বা মেঠো পথে কখনো হেঁটে, কখনো গরুর গাড়িতে পরিভ্রমণ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে। সময়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও আছে সেই প্রান্তর, পুকুর, গাছ-গাছালির গ্রাম্য পরিবেশ। পরমাপ্রকৃতি দেবী সারদা আজ আবার সেই পথ পরিক্রমা করছেন রথে চড়ে। তবে সেদিনের অচেনা গ্রাম্যবধূটি আজ জগজ্জননীরূপে কৃপাবর্ষণ করতে করতে শত-সহস্র ভক্তসন্তানের অঙ্গনে পদার্পণ করছেন।

আনুড়, দেশড়া হয়ে মা চলেছেন কোয়ালপাড়ায় তাঁর 'বৈঠকখানা'র উদ্দেশে। দেশড়া গ্রামের পূর্বপ্রান্তে নফর নন্দীর বংশধরগণের বাস। এঁরই মাধ্যমে রাসমণির কালীবাড়িতে যোগাযোগ হয় ঠাকুরের অগ্রজের। আজ তাঁরই পরিবারের লোকেরা শ্রীশ্রীমাকে তাঁদের গ্রামে বরণ করতে উদ্যোগ নিলেন সকল গ্রামবাসীকে সঙ্গে করে। ঢাক ও নানাবিধ বাদ্য সহযোগে মাকে অভ্যর্থনা জানানোর সে কী অপূর্ব আয়োজন!

২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এক সপ্তাহ ধরে বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর, জয়পুর, ইন্দাস, পাত্রসায়র ও সোনামুখী—এই পাঁচটি ব্লকের প্রায় কুড়িটি গ্রামাঞ্চল পরিক্রমা করল এই 'সারদা রথ'। পথে পড়ল আরো অনেক গ্রাম। উক্ত কুড়িটি গ্রামের পাঠচক্র বা আশ্রমগুলির কাছে রথ পৌঁছালে চতুর্দিক থেকে শ্রদ্ধালু মানুষের স্রোত আছড়ে পড়ে। সোনামুখী ও হিজলডিহায় পাঁচহাজারের অধিক জনসমাগম হয়।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী যেসকল স্থানে রথের সাময়িক বিরতি হয়েছিল, সেখানে ভক্ত-অনুরাগিগণ বহুসংখ্যায় সমবেত হয়েছিলেন। দেবীত্বের ব্যবধান তুচ্ছ করে মা স্বয়মাগতা তাঁদের অঙ্গনে—তাই মাকে পাওয়ার আনন্দে আপ্লুত অগণিত সন্তান। অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ অঞ্চল থেকে প্রায় আধ কিমি. পথ অতিক্রম করে তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খনিনাদ ও গ্রাম্যরীতি অনুসারে পবিত্র জলধারা দিয়ে বরণ করে নিয়ে গেছেন মাকে। এরই সঙ্গে কোথাও কোথাও যোগ হয়েছিল বর্ণময় শোভাযাত্রা, সঙ্কীর্তন, ব্যাণ্ডপার্টি ইত্যাদি। মায়ের নামে বাতাসা 'হরিলুট'ও দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। শুকজোড়া, পাত্রসায়র, সোনামুখী, ময়নাপুর, হিজলডিহা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে আয়োজিত ধর্মসভায় মায়ের জীবন ও বাণী বিশ্লেষণ করেন মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজ এবং অন্যান্য সাধু ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। সেই 'দেবীমাহাত্ম্য' শুনতে আগ্রহী মানুষের ভিড় কোথাও কোথাও সহস্রাধিক! এমন অদ্ভুত ঔৎসুক্য নিয়েই মানুষ হাজির হয়েছিল সন্ধ্যাবেলাতেও—যেখানে যেখানে ভিডিও/সিডির মাধ্যমে মায়ের জীবন ও বাণী প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

মায়ের স্মৃতিবিজড়িত কয়েকটি স্থান পরিক্রমা করতে করতে রথ এসে পৌঁছাল বিষ্ণুপুর রেলস্টেশনে। এখানে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একবার কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন একটি কাঁঠালগাছের তলায়। সেই পবিত্র স্থানটিতে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কাঁঠালগাছ রোপণ করে বেদি নির্মাণ করা হয়েছে, বসানো হয়েছে তাঁর প্রতিকৃতি।

জানা গেছে, রথ যে যে স্থানে থেমেছিল, সেসব অঞ্চলের কোন সমর্থ ব্যক্তিই রথের সামনে না এসে থাকতে পারেননি। অতি বৃদ্ধ মানুষও কাউকে অবলম্বন করে মাঠের আল ভেঙে এসে পৌঁছেছেন মায়ের কাছে। এর আগে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাতৃমন্দিরে যে একসপ্তাহ ধরে সারদাজয়ন্তী পালন করা হয়েছিল, তাতে যোগদান করা তাঁদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি শীতের প্রকোপে ও দূরত্বের কারণে। কিন্তু এদিনের এই অপূর্ব সুযোগ কোনভাবে হারিয়ে নিজেকে 'হতভাগ্য' ভাবতে তাঁরা নারাজ। আর বিশেষত্ব এই যে, মাতৃস্নেহ তাঁদের সকলকে যে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, তাতে ধর্ম-বর্ণ-জাত-মত প্রভৃতি সকলপ্রকার ভেদের সীমারেখা কোন্ অজ্ঞাতে যেন অপসৃত! যাত্রাপথেই পড়ে সেই আমজাদের গ্রাম শিরোমণিপুর। পাশের গ্রাম পাটপুর। মায়ের সেই অপার্থিব করুণাধারা হয়তো আজও সিক্ত করে আমজাদের গোত্রের মানুষজনকে। তাই পৃথক কোন আয়োজন না করলেও

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী রথযাত্রা, জয়রামবাটী

নিকটবর্তী যেখানে রথ পৌঁছেছে, সেখানে সমবেতজনের মধ্যে তাদের উপস্থিতির সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

সপ্তাহান্তে মা ফিরলেন তাঁর 'স্বগৃহে'। পুনর্বার কর্পূরারতি করে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হলো। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর লীলার কথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। যাতে বিশ্বাসী মন বুক বাঁধল ভরসায়। আর যুক্তিপ্রেমী, বিশ্লেষক মানুষকে বিস্মিত করল। ঘটনাটি ঘটল তালসাগড়া গ্রামে। ছোট গ্রামের ছোট একটি আশ্রম। রথ পৌঁছাবে জেনে তাঁদের সাধ্যমতো ভক্তসেবার জন্য খিচুড়ির আয়োজন করেছিলেন আশ্রমের মুষ্টিমেয় যুবক সদস্য ও কয়েকজন গ্রামবাসী। ধারণা ছিল, বড় জোর সাড়ে তিনশো মানুষের সমাবেশ ঘটতে পারে। বাস্তব চিত্র কিন্তু হয়ে উঠল আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার। প্রায় সহস্রাধিক মানুষ আনন্দে উত্তাল হয়ে রয়েছে মাকে ঘিরে। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা মায়ের কাছে মিনতি জানালেন আন্তরিকভাবে। তিনশো জনের জন্য আয়োজিত পরিমাণেই শেষপর্যন্ত সহস্র মানুষের প্রসাদ গ্রহণ সম্ভব হয়ে গেল। উদ্ধার করলেন মা, পূরণ করলেন ভক্তের ঐকান্তিক প্রার্থনা। "এ কেয়া দৈবী মায়া!"—একথা কল্পনা নয়, পাঠক। বিশ্বাস করুন।

● **রাজামুন্দ্রি রামকৃষ্ণ মঠ (অন্ধ্রপ্রদেশ) :** বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ অক্টোবর ২০০৪ একটি রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। রথে আরূঢ়া শ্রীমা সারদাদেবী প্রায় ৩,০০০ কিমি. ভ্রমণ করে উপকূলবর্তী অন্ধ্রের ৭টি জেলার প্রায় ১০০টি গ্রাম ও নগর স্পর্শ করেন। রথ যেখানে যেখানে গেছে, সেখানেই মানুষ উপস্থিত হয়েছে নানা উপচারে, মাঙ্গলিক গীতবাদ্য সহকারে। রথের সঙ্গে গমনরত গাড়ি থেকে শ্রীমা সম্পর্কিত বই, ছবি ইত্যাদি বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া বিনামূল্যে মায়ের জীবন ও বাণীর ওপর ৭৫,০০০ পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে। মায়ের সুন্দর একখানি ছবি ও বাণী-সম্বলিত ৬০,০০০ কার্ডও বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রাগুলিও ছিল খুব আকর্ষক। শোভাযাত্রার সময়ে বিভিন্ন ধ্রুপদী নৃত্য ও ভজন পরিবেশিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা মায়ের বাণী-সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার প্রদর্শন করেন। কোন কোন অঞ্চলে মহিলা ভক্তরা মাথায় পূর্ণকুম্ভ ধারণ করে এসে মাকে অভ্যর্থনা জানান। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরাও শোভাযাত্রাগুলিতে অংশ নেয়। এতে সর্বমোট প্রায় ৪০০ ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রার পরে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলিতে মায়ের জীবন ও বাণীর ওপর বক্তৃতা দেন সন্ন্যাসিবৃন্দ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজামুন্দ্রিতে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সমাপ্তি পর্বে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ১৫০ জন ভক্ত মহিলার অংশগ্রহণে বিশেষ অষ্টোত্তর নাম পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

● **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন :** শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে ৬ নভেম্বর ২০০৪ একটি ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, মঙ্গলাচরণ, ভাষণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

● **মাইসোর আশ্রম :** প্রদর্শনীর জন্য শ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রায় ৮০০ সেট চিত্র প্রকাশ করেছে। প্রতিটি সেটে আছে ৪০টি করে ছবি। এছাড়া ঐ আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে ৬৪০টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৬৩,০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

❁ বিভিন্ন কেন্দ্র শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিগত ২০০৪ সালে উল্লেখযোগ্য যেসব অনুষ্ঠান করে, তাদের কয়েকটি হলো—রথযাত্রা (চেন্নাই মঠ, জয়রামবাটী, রাঁচী মোরাবাদী, রাজামুন্দ্রি), অখণ্ড নামজপ যজ্ঞ (আগরতলা, চেন্নাই মঠ, জয়রামবাটী, মোরাবাদী), অধ্যাত্ম শিবির (গৌহাটী, চণ্ডীগড়, ছাপড়া, জয়পুর, দিল্লি, পুরী মঠ, ভুবনেশ্বর, রায়পুর), দুর্গা-সপ্তশতী হোম (জয়রামবাটী), আন্তর্ধর্মসম্মেলন (ওয়াশিংটন ডিসি), বিভিন্ন স্থায়ী কর্মোদ্যোগ—বিশেষত মহিলাদের জন্য (চেন্নাই মঠ), মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা (আগরতলা, লখনৌ), অনাথ বালিকাদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ (কানপুর), দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাইযন্ত্র বিতরণ (কনখল, গৌহাটী, পুরী মিশন), স্বাস্থ্যমেলা (বাঁকুড়া), বিনামূল্যে ছবি ও পুস্তিকা বিতরণ (মাদুরাই, রাজামুন্দ্রি, হায়দ্রাবাদ), কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আয়োজন (বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম), স্মরণিকা প্রকাশ (উদ্বোধন, আলসুর, গৌহাটী, জয়রামবাটী, ফিজি, ভুবনেশ্বর, মোরাবাদী), অডিও ভিস্যুয়াল শো (পাটনা, সাও পাওলো), স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন (দেওঘর), অডিও/ভিডিও ক্যাসেট/সিডি প্রকাশ (চেন্নাই মঠ, বরানগর মিশন, সারদাপীঠ, হায়দ্রাবাদ), চলচ্চিত্র/স্লাইড প্রদর্শনী (পোরবন্দর, মনসাদ্বীপ, মুম্বই, ম্যাঙ্গালোর, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম), গ্রন্থ/পুস্তিকা প্রকাশ (উদ্বোধন কার্যালয়, ওয়াশিংটন ডিসি, গৌহাটী, ঢাকা, বরানগর মিশন, মোরাবাদী, রাজামুন্দ্রি), e-book প্রকাশ (উদ্বোধন, চেন্নাই মিশন আশ্রম), নাট্যানুষ্ঠান (আগরতলা, ওয়াশিংটন ডিসি, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজকোট)।

রাজামুন্দ্রি রামকৃষ্ণ মঠে রথযাত্রার সূচনা করছেন স্বামী গৌতমানন্দজী ও স্বামী অমেয়ানন্দজী। ইনসেটে রথে উপবিষ্টা শ্রীশ্রীমা।

❁ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ২০০৪ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে জনসভা, যুব-ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকশিক্ষিকা সম্মেলন, ভক্তসম্মেলন, আলোচনা-সভা (সেমিনার), দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। যেসব কেন্দ্র এমন এক বা একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তাদের মধ্যে ছিল: **ভারতে**—আগরতলা, আলসুর, ইছাপুর, ইন্দোর, উটকামণ্ড, এলাহাবাদ, কনখল, কানপুর, কিষাণপুর, গদাধর আশ্রম, গৌহাটী, চণ্ডীগড়, চণ্ডীপুর, চেঙ্গালপট্টু, চেন্নাই বিদ্যাপীঠ, চেন্নাই মঠ ও মিশন, ছাপড়া, জয়পুর, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামতাড়া, টাকি, তিরুবনন্তপুরম, ত্রিচুর, দিল্লি, দেওঘর, নরেন্দ্রপুর, নরোত্তমনগর, পাটনা, পুনে, পুরী মঠ ও মিশন, পোরবন্দর, পোর্ট ব্লেয়ার, বরানগর মঠ ও মিশন, বলরাম মন্দির, বাঁকুড়া, বাগবাজার মঠ, বারাণসী সেবাশ্রম, বিশাখাপত্তনম, বৃন্দাবন, ব্যাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, মজঃফরপুর, মনসাদ্বীপ, মাইসোর, মাদুরাই, মায়াবতী, মালদা, মুম্বই, ম্যাঙ্গালোর, রাঁচী মোরাবাদী, রাঁচী স্যানাটোরিয়াম, রাজকোট, রাজামুন্দ্রি, রায়পুর, লখনৌ, লিমডি, শিলং, সরিষা, সারদাপীঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান ও হায়দ্রাবাদ। **বহির্ভারতে**—ঢাকা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ওয়াশিংটন ডিসি, নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, নিউ ইয়র্ক, টরন্টো, ফিজি এবং সাও পাওলো।

রামকৃষ্ণ মিশন, নরোত্তমনগর (অরুণাচল প্রদেশ): গত ৯-১০ অক্টোবর ও ৫-৬ নভেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ৯ অক্টোবর টুপি, চাসা, খোনসা, সোহা, মপয়া প্রভৃতি গ্রামের ১৬২ জন উপজাতি মহিলাকে আশ্রমে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা টুপি, সোহা ইত্যাদি ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন। মপয়া গ্রামের মহিলারা ভজন পরিবেশন করেন। সকলকে গালে (উপজাতি মহিলাদের পোশাক), বড় আয়না, চিরুনি, শ্রীশ্রীমায়ের ল্যামিনেটেড ফটো দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান-শেষে সকলে বসে প্রসাদ পান। ১০ অক্টোবর ধ্যান, ভজন, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ১৬০ জন মহিলা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলকে শাড়ি, কম্বল ও চাদর দেওয়া হয়। রাত্রে সকলে বসে প্রসাদ পান। ৫-৬ নভেম্বর ধ্যান, ভজন, আরতি, বক্তৃতা, দলগত আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অসম ও অরুণাচল প্রদেশের ১৬০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী ইন্দ্রনাথানন্দজী ও স্বামী নির্বিশেষানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে 'মা সারদা কোচিং সেন্টার' ও 'সারদা মা উইভিং সেন্টার' শুরু হয়েছে। কোচিং সেন্টারে কম খরচে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো এবং উইভিং সেন্টারে স্বনির্ভর প্রকল্পে বিনা খরচে উপজাতি মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের বোনার ও দর্জির কাজ শেখানো হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ মঠ, জামতাড়া: গত ৭ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক 'সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী শশাঙ্কানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, তরুণ গোস্বামী ও ডঃ পূর্বা সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৮-৩০ অক্টোবর ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ আদিবাসী-সহ ২৫৬ জনকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন।

❁ **২০০৩-এও সাড়া পড়েছিল খুব:** ২০০৩ সালের শেষপর্বের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো চেন্নাই মঠ আয়োজিত রথোৎসব। শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ মূর্তিবাহী একটি সুসজ্জিত রথ প্রায় চার সপ্তাহ ধরে (১২ নভেম্বর—১৬ ডিসেম্বর ২০০৩) তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরীর মোট প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। রথারূঢ়া শ্রীশ্রীমাকে দেখতে ৫৪টি প্রধান শহর ও প্রায় ১২৫টির গ্রামের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়। রথের সঙ্গে গমনরত পুস্তককেন্দ্র থেকে বহু পুস্তক ও ছবি বিনামূল্যে বিতরণ ও বিক্রি করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শোভাযাত্রা, জনসভা, চিত্রপ্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত হয় জনচেতনা জাগরণ অনুষ্ঠানের। সূত্রপাত হয় নানা স্থায়ী কর্মোদ্যোগের। সব মিলিয়ে দক্ষিণ ভারতে মাকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। মায়ের কথা যারা জানত না, মায়ের নাম যারা আগে কখনো শোনেনি—এমন বহু ভক্তের কাছে মা পৌঁছে যান তাঁর আবির্ভাবের দেড়শো বছর পূর্তির পুণ্য অনুষ্ঠানে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সুনামিত্রাণ

বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এর ভয়াবহ সুনামি-বিপর্যয়ে রামকৃষ্ণ মিশন তাৎক্ষণিক ত্রাণকার্য শুরু করেছে চেন্নাই, চেঙ্গালপট্টু, পোর্টব্লেয়ার এবং শ্রীলঙ্কার বাট্টিকোলায়। দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য, শীতবস্ত্র, ঔষধ ও বাসনপত্র বিলি করা হচ্ছে। ২০০৪-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৫০,০০০-এরও বেশি দুর্গত মানুষকে ত্রাণসাহায্য করা হয়েছে।

বহির্ভারত

নতুন কেন্দ্র স্থাপন: জার্মানির বিশুওয়াইডেতে রামকৃষ্ণ মঠের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা—**বেদান্ত গেজেলশাফ্ট ই. ভি., বিশুওয়াইডে ২, ডি-৫৭৫২০, স্টাইনেবাখ, জীগ, জার্মানি। ফোন: (৪৯) ২৭৪৭-৯৩০৪৯৩, ফ্যাক্স: (৪৯) ২৭৪৭-৯৩০৪৯৪।**

এই নতুন কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছেন স্বামী বাণেশানন্দজী।

দেহত্যাগ

স্বামী সুবিমলানন্দজী (কানাই মহারাজ) গত ৫ নভেম্বর ২০০৪ বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে মেদিনীপুর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন

তিনি তমলুক, কনখল, কাঁকুড়গাছি, কানপুর, বারাণসী হোম অফ সার্ভিস এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমেই তিনি গত ৫ বছর যাবৎ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত ও বন্ধুবৎসল প্রকৃতির। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হররূপানন্দজী।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪ ক্রিসমাস ইভ উপলক্ষ্যে যিশুখ্রিস্টের জীবনী ও বাণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় তাঁর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী।

'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থের e-book সংস্করণ ঃ স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থটি e-book-এর আকারে (Multimedia CD) প্রকাশিত হয় গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ এই e-book-টি প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনী এই CD-তে পাঠ করেছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীমায়ের বহু রঙিন চিত্রও এই CD-তে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বগানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৮ জুলাই ২০০৪ সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। স্বাগত-ভাষণ দেন দেবী ঘোষ।

বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, ঠাকুরপুকুর (কলকাতা-৬৩) ঃ গত ২২ জুলাই ২০০৪ দাতব্য চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বীরনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) ঃ গত ১ আগস্ট ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় সঙ্গীত, স্বামীজীর রচনা থেকে পাঠ, ভাষণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর দান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। যুবপ্রতিনিধিরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী কৃপানন্দজী।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) ঃ গত ১ আগস্ট ২০০৪ আলোচনা, স্মরণিকা 'চরৈবেতি' প্রকাশ, ভিডিও প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন অমিতকুমার দত্ত, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, অরুণাভ সেনগুপ্ত ও বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুরেশানন্দজী। স্বাগত ও সমাপ্তি ভাষণ দেন যথাক্রমে সম্পাদক রঞ্জন বসাক ও রসময় চক্রবর্তী। এই শিবিরে ২২৩ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) ঃ গত ১ আগস্ট ২০০৪ আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, স্মরণিকা 'যুগাচার্য' প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী, ডঃ অমিতাভ গাঙ্গুলি ও কয়েকজন যুবপ্রতিনিধি। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী ও স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী। এই সম্মেলনে ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' পুস্তকটি তাঁদের সকলকে প্রদান করা হয়।

বিরজা-কৃপা ভবন, সল্ট লেক (কলকাতা-৬৪) ঃ গত ৫ আগস্ট ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী ও 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন স্থাপনের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে ১৮০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

পুণ্যপ্রভা পাঠমন্দির (কলকাতা-৮৪) ঃ গত ৭-১২ আগস্ট ২০০৪ ভক্তিগীতি, আর্তসেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে ওষুধ ও বস্ত্র প্রদান, স্থানীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে বই, খাতা, পেন ও লজেন্স বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ প্রদান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন অ্যাভিনিউ (দুর্গাপুর) ঃ গত ১৯-২০ আগস্ট ২০০৪ শোভাযাত্রা, সারদাস্তোত্র পরিবেশন, সাঁওতালদের মধ্যে পোশাক বিতরণ, নরনারায়ণ-সেবা, রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, সাঁওতালী নৃত্য, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা)-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দেন স্বামী উমানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী, স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী, স্বামী বিমলাত্মানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অনঘানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী সনকানন্দজী, উমা চক্রবর্তী ও ডঃ সুস্মিতা ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক বাসুদেব মুখার্জি।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ২১-২৩ আগস্ট ২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন

ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন, বক্তৃতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যুবসম্মেলনের উদ্বোধন ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে স্বামী বোধস্বরূপানন্দজী ও কেন্দ্রের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এবং যুবসম্মেলনে ১৭০ জন প্রতিনিধি ও ৩০ জন পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, মাতৃসঙ্ঘ, বাগুইআটি (কলকাতা-৫৯) : গত ২৩-২৫ আগস্ট ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্র ও 'গীতা' পাঠ, ভজন, পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ২৩ তারিখ 'ভাগবৎ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ডঃ বিধান বিশ্বাস। এদিন ১৫০ জন প্রসাদ পান। ২৪ তারিখ ভাষণ প্রদান ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ২৫ তারিখ 'চৈতন্যময়ী রানী মা' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) : গত ২৭-২৯ আগস্ট ২০০৪ বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী চেতনানন্দজী, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত, সুব্রত চক্রবর্তী, সোমনাথ মান্না ও অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় এবং ভট্টাচার্য, পাঠচক্রের সভাপতি আলোকময় বসু, সহ-সম্পাদক ডঃ দুলালচন্দ্র সেন ও ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায়। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

যাদবপুর বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (কলকাতা-৯২) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৪ সঙ্ঘগীতি ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, স্মরণিকা 'অভিঃ' প্রকাশ, ভক্তিগীতি, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ২৭৫ জন যুবক এতে অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন সন্দীপ ভট্টাচার্য, মহামণ্ডলের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সোমনাথ বাগচী প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর দেন বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। উপস্থিত সকলকে 'জনগণের অধিকার' পুস্তক এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আলোকচিত্র প্রদান করা হয়।

দাঁইহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৪ অঙ্কন ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, লিখিত পরীক্ষা, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৮৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি এবং ২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে ২টি করে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা তাপসপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণাজী।

বিভিন্ন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কয়েকটি জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. অনুগ্রহ করে অনুষ্ঠান হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠান-সংবাদ পাঠাবেন।

২. নিজেদের ছাপানো প্যাডে (letter head-এ) সংবাদ লিখবেন এবং সোসাইটি-রেজিস্ট্রেশন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করবেন। একেবারে শেষে সংগঠনের সম্পাদক/সহ-সম্পাদকের সই থাকা চাই।

৩. বেলুড় মঠের ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কিনা সেকথাও উল্লেখ প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ : নিজেদের আশ্রমের সংবাদ 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেখলে মনে আনন্দ হয় অবশ্যই। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, প্রাইভেট আশ্রম বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বিগত কয়েক বছরে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় স্থানাভাবহেতু কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বছরে দুবারের বেশি সংবাদ পরিবেশন করা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। এইভাবে অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো একবারের বেশি সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

৪. প্রকাশিতব্য সংবাদটি যেন সংক্ষিপ্ত হয়।

ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর সোম ও সঙ্ঘ-সদস্যবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩০৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে অভিজ্ঞানপত্র ও একটি করে পেন্সিল প্রদান করা হয়। গত ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ আবৃত্তি, বক্তৃতা, ক্যুইজ, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ২০০ ছাত্রছাত্রীকে একটি করে গ্রন্থ প্রদান করা হয়।

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৪ সঙ্গীত, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী মায়াধীশানন্দজী, রমাপ্রসন্ন

বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৪ 'চণ্ডী' পাঠ, সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বামী সর্বভূতানন্দজী ও স্বামী সোমাত্মানন্দজী।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, ক্ষীরকুণ্ডী শাখা (হুগলি) : গত ৩০ আগস্ট ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তিগীতি, যাত্রানুষ্ঠান এবং আবৃত্তি, অঙ্কন, গল্পবলা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সন্ময়ানন্দজী ও সমীর মজুমদার। এই উপলক্ষ্যে ৩ জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

আর্যোদয় (কলকাতা-৬৭) ঃ গত ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, নৃত্যনাট্য, পুস্তক ও চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা হয়।

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠচক্র (হুগলি) ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি, চিত্রপ্রদর্শনী, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ভক্ত, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলকে মায়ের বই এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, বিহপুরীয়া (অসম) ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে সাধনশিবির অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী তপোব্রতানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা (ওড়িশা) ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভক্তসম্মেলন এবং ছাত্রছাত্রীদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ভাষণ ও ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী। গত ৬ সেপ্টেম্বর পূজা, মন্দির-পরিক্রমা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালিত হয়। এদিন প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, হরিনাম, পাঠ, বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ, ভি.ডি.ও প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী পররূপানন্দজী। গত ২১ নভেম্বর ২০০৪ দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে *২৫টি কম্বল, ৫টি ধুতি, ৩০ সেট জামা-প্যান্ট, ৯ সেট* সালোয়ার কামিজ ও ১৮টি গেঞ্জি বিতরণ করা হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) ঃ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী। স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। অনুষ্ঠান-শেষে ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ, ভদ্রকালী (হুগলি) ঃ গত ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শপূত ও লীলাস্মৃতিধন্য ভূমিখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ, কথা, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে শিশু-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ৬ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরেশাত্মানন্দজী এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ব্যাখ্যা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৭ তারিখ শিশু-উৎসবে 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' প্রদর্শিত হয়।

বিবেকানন্দ ভাবসমন্বয় কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ঐ শোভাযাত্রা চেতলা পার্কে স্বামীজীর মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আদ্যাপীঠ মন্দিরে পৌঁছায়। চেতলা পার্কে 'দক্ষিণ কলিকাতা বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র' যুবসমাবেশের আয়োজন করে। ঐ সভায় উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী, পৌরপিতা ফিরহাদ হাকিম ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। আদ্যাপীঠের নাট-মন্দিরে আয়োজিত যুবসমাবেশে ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, স্বামী সুখানন্দজী, ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সদস্য-সংগঠন থেকে প্রায় ৭০০ সদস্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

তাম্রলিপ্ত পশ্চিমাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী, শক্তিপদ ত্রিপাঠী ও পরমানন্দ সাহু। স্বাগত ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানা ও সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন দাস। এদিন ২৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সংসদ, পুঁইল্যা (হাওড়া) ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কথা পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন সংসদের সম্পাদক নির্মলচন্দ্র দাস, ডাঃ দেবনারায়ণ কল্যাণী, পুলককুমার মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবেশচন্দ্র দাস।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি, **(কলকাতা-১৪৪)** ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা, বস্ত্রবিতরণ ও স্মরণিকা 'ঋতায়ণ' প্রকাশ করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। দুপুরে ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এছাড়া ৪৩ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সঙ্গীত, স্বামীজীর বাণী পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী ও কয়েকজন যুবপ্রতিনিধি। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬) ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, শ্রুতিনাটক, গীতি-আলেখ্য, শান্তিমন্ত্র পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার স্মরণে বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভায় ভাষণ দেন আঞ্চলিক সংগঠক শিবাজী ঘোষ ও কলকাতা শাখার সঞ্চালক জয়ন্ত ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ অরুণ উপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর ২০০৪ একটি আলোচনাচক্রে ভাষণ দেন কেন্দ্রের সর্বভারতীয় সভাপতি পদ্মশ্রী পি. পরমেশ্বরণ ও শিবাজী ঘোষ।

বিবেকানন্দ আশ্রম, কটক (ওড়িশা) : গত ১৫-১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯ তারিখ একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রত্যেক দিন ভাষণ দেন শ্রীবন্দনাপুরী দেবী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ কটকের ১২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৪ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে ৬,৮০০ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়।

শ্রীসারদা সঙ্ঘ, রিহাবারী (গুয়াহাটি) : গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', 'উপনিষদ্' ও 'গীতা' পাঠ, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অনন্তানন্দজী ও অধ্যাপিকা মিতা চক্রবর্তী। দুজন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীকে অর্থসাহায্য প্রদান করেন পূজ্যপাদ মহারাজ। এর পূর্বদিন ১০০ দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে কম্বল প্রদান করেন স্বামী অনন্তানন্দজী।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মঙ্গলাচরণ, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, স্বাগত-ভাষণ, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃপ্রসঙ্গ করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার। 'জপধ্যান ও অধ্যাত্মজীবন' বিষয়ে আলোচনা এবং ভাষণ দান করেন স্বামী দিব্যানন্দজী। ধর্মসভায় ১৫৩ জন প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। গত ৩ অক্টোবর ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৯৯ জন রক্তদান করেন। এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলী, সাঁকতোড়িয়া (বর্ধমান) : গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দীপ প্রজ্বলন, মাঙ্গলিক গীত, গীতি-আলেখ্য, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অনুপকৃষ্ণ গুপ্ত।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, বিজুর (বর্ধমান) : গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পূজা, পতাকা উত্তোলন, সমবেত প্রার্থনা, 'কঠ উপনিষদ্' পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া ও কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়ক ও 'বিবেক ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক প্রভাতকুমার ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অরূপ মুখোপাধ্যায় এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীগদাধর আশ্রম, বহরকুলি (বর্ধমান) : গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পতাকা উত্তোলন, 'বেদ' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গ্রন্থ ও ফটো প্রদান, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ ইউথ সার্কেল, বি. ই. কলেজ [ডি. ইউ] (হাওড়া-১০৩) : গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভক্তিগীতি, ওড়িশী নৃত্য, প্রদর্শনী, আন্তঃকলেজ বক্তৃতা প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। আন্তঃকলেজ বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—'বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা'। এই প্রতিযোগিতায় ৭টি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় এবং বি. ই. কলেজের উপাচার্য ডঃ নিখিলরঞ্জন ব্যানার্জি। স্বাগত-ভাষণ দেন সভাপতি ডঃ অসীম বসু। এই অনুষ্ঠানে বি. ই. কলেজের ১৩ জন দুঃস্থ ছাত্রকে 'বিবেকানন্দ ইউথ স্কলারশিপ' প্রদান করা হয়। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। গত ২ অক্টোবর ২০০৪ 'ইউথ সার্কেল'-এর বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মা সারদা সেবাসঙ্ঘ, রাইরংপুর (ওড়িশা) : গত ৩ অক্টোবর ২০০৪ দীপ প্রজ্বলন, সঙ্গীত, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, বি. এন. দাস, তত্ত্বকন্দর মিশ্র প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণের পর সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুপ্রসাদ জেনা। এদিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজীর ৩০০ পুস্তক ও ৮০০ ছবি বিতরণ করা হয়। দুপুরে ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৪৭) : গত ৩ অক্টোবর ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদগান, বিশেষ পূজা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, লীলাগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে **কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ**-এর দক্ষিণাঞ্চলের আশ্রমগুলির একটি সম্মিলিত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। ভাষণ এবং ভক্তদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

পাঁশকুড়া সারদা সঙ্ঘ (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ৩ অক্টোবর ২০০৪ বিশেষ পূজা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রকাশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সত্যপ্রাণাজী। এদিন প্রায় ৩৫০ জনকে প্রসাদ এবং ১০০ দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১০ অক্টোবর ২০০৪ শান্তিমন্ত্র, 'গীতা' ও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে পাঠ, 'মায়ের কথা' পাঠ ও ব্যাখ্যা, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্বামী অনঘানন্দজী, স্বামী লোকোত্তরানন্দজী ও ব্রহ্মচারী হরিষচৈতন্য ভাষণ দেন। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা ও অধ্যাপক কমলকুমার মান্না।

সেবাব্রত

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা (হুগলি) ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৪ দুঃস্থদের চিকিৎসার জন্য 'চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন এবং ভাষণ প্রদান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। মননসভার সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ শেখর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অভিজিত মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সঞ্চিতা রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, বহিচার্ড (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ চৈতন্যপুর নেত্রনিরাময় নিকেতনের সহায়তায় বিনাব্যয়ে চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৪১০ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয়। পরদিন বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, বড় জাগুলী (নদীয়া) ঃ গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদানশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৩ জন রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী শুকদেবানন্দজী।

রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শ্রীমা সারদাদেবী স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও রোগনির্ণয় শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৩৪ জন দুঃস্থ রোগীর বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খয়েরপুর (পশ্চিম ত্রিপুরা) ঃ গত ৯ অক্টোবর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৪০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ এবং ভাষণ প্রদান করেন স্বামী কৃপানাথানন্দজী।

সাঁতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪ মহালয়ার দিন ৭১ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, ফ্রক, জামা, প্যান্ট ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী সগুণানন্দজী।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪ মহালয়ার দিন আগমনী গান, মাতৃসঙ্গীত, মিষ্টি বিতরণ, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাব্রত উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ২৪৫টি শাড়ি, ৩৫টি ধুতি ও ২৫১টি জামা-প্যান্ট বিতরণ করা হয়। সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৭ অক্টোবর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নেত্রনিরাময় নিকেতনের সহযোগিতায় বিনাব্যয়ে চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী। এদিন ২৭০ জনের ছানি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ও ৪৬৫ জনের চিকিৎসা করা হয়। বিকালে ৮০ জন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী।

বাদুড়িয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২০ অক্টোবর ২০০৪ মহাসপ্তমী তিথিতে সেবাশ্রম অনুমোদিত বাদুড়িয়া সারদা সমিতি-র পক্ষ থেকে ৯০ জন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম, নাওরা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ৩০-৩১ অক্টোবর ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, বেলুড় মঠ-এর পরিচালনায় চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিনামূল্যে ৫৩০ জনের চক্ষুপরীক্ষা ও ২১২ জনকে চশমা প্রদান করা হয় এবং ২০ জনকে হাওড়া লায়ন্স হাসপাতালে এনে ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর-নিবাসী পতিতপাবন সামন্ত গত ১৬ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সন্তোষপুর-নিবাসিনী তরুবালা দাস গত ৯ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মেঘালয়-নিবাসী আনন্দকিশোর ঘোষ গত ১১ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, পুরুলিয়া-নিবাসিনী নিরুপমা বক্সী গত ১২ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রাঁচি-নিবাসী সুধীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি গত ১৩ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী সুদর্শন দাস গত ১৫ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী ডঃ নিমাইসাধন বসু গত ১৭ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী জ্যোতিরানী চক্রবর্তী গত ১৮ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ত্রিপুরার মোহনপুর-নিবাসী অটল নাগ গত ১৮ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়া-নিবাসী পরিতোষ বর্ধন গত ১৮ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বড়িশা রামকৃষ্ণ মঠ বৃদ্ধাবাসের আবাসিক ননীগোপাল রায় গত ২২ আগস্ট ২০০৪, ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রয়াত নির্মলকুমার রায়ের অগ্রজ। ❑

গ্রাহকদের উদ্দেশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব

(১) আপনারা সকলেই জানেন, কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য এই বছরে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (by hand) নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকে নিলে ১০০ টাকা। এই সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকরা পান ১১টি সাধারণ সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪) এবং ১টি বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৬)।

এই কারণে শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়ে গেলে তার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব হয় না এবং সাধারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বছরে ২টির বেশি ডুপ্লিকেট কপি দেওয়াও সম্ভব হয় না।

(২) কোন সংখ্যা না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ অবধি অপেক্ষা করে উদ্বোধন কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর (পৌষ) সংখ্যা না পেলে জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখের পর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

(৩) ডুপ্লিকেট কপি ডাকে পাঠালে পুনরায় তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইচ্ছা করলে গ্রাহকগণ VPP মারফত ডুপ্লিকেট কপি পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১টি পত্রিকার ক্ষেত্রে ১০ টাকা দিয়ে পোস্ট অফিস থেকে পত্রিকাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে।

(৩) যাঁরা বৃদ্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়ে এসে হাতে হাতে পত্রিকা নিয়ে যেতে অপারক—তাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ডাকে পত্রিকা নিলে যা খরচ পড়ে অর্থাৎ ১০০ টাকা দিয়ে গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের মাধ্যমে পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে পত্রিকাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে।

(৫) যাঁরা ডাকে শারদীয়া সংখ্যা নেন, তাঁদের কাছে আমাদের প্রস্তাব—এই মূল্যবান সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে নিন। এতে ২৫ টাকা বেশি লাগলেও পত্রিকা হারানোর সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে গ্রাহকমূল্য বাবদ ১২৫ টাকা (১০০+২৫) দিতে হবে।

(৬) গ্রাহকমূল্য জমা দেওয়ার রসিদটি যত্ন করে রাখবেন। কারণ, পূজা সংখ্যা সংগ্রহ করার সময় অতি অবশ্যই এই রসিদটি দেখাতে হবে।

অন্যের পূজা সংখ্যা সংগ্রহ করার সময় সেই ব্যক্তির রসিদ এবং তাঁর Letter of Authorization সঙ্গে আনতে হবে।

(৭) যাঁরা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে হাতে হাতে পত্রিকা নেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে ২ মাসের মধ্যে পত্রিকা সংগ্রহ করে নেবেন। দপ্তরে স্থানাভাব হেতু ২ মাসের পর পত্রিকা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।

(৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০জন স্থানাধিকারীর জন্য ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের 'উদ্বোধন' উপহারস্বরূপ দেওয়া হবে—এটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাবদে অনুদান দিয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী অমর পাড়ুই—তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে। যদি উক্ত স্থানাধিকারীদের কারো সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হয়, অনুগ্রহ করে বিষয়টি তার গোচরে আনবেন।

আশা করি, উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক/গ্রাহিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাব।

বিনীত
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নানা স্বাদের বই

Jyoti Bhushan Chaki's
Bengali Self Tuition in Three Months 30.00

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বই ব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার ৫০.০০

১৮৬০ সালে বরদা প্রসাদ মজুমদারের শুরু করা ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল কিভাবে—তারই সম্পূর্ণ দলিল।

শিল্প ও সংস্কৃতি—বাঁকুড়া ৫০.০০

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির সচিত্র রূপরেখা ফুটে উঠেছে বইটিতে।

প্রসাদ সেনের
রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিলনমেলা ৪০.০০

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি কোন উৎস থেকে এবং তা কেমন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশস্বী শিল্পীর কলমে তারই বর্ণনা।

ছোটদের বুক অফ নলেজ ৩২০.০০

বইটি বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি। বিশাল জ্ঞান-রাজ্যের প্রতিটি বিষয়ের সচিত্র সন্নিবেশ ঘটেছে প্রায় হাজার পাতার দামী কাগজে ছাপা বইটিতে। বইটি কুইজ উৎসাহীদের কাছে সোনার খনি।

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
আমাকে চেনো ২০০.০০

বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুখকেই দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। স্কুল-কলেজ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও নার্সিং ট্রেনিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি অমূল্য সম্পদ।

রাধারমণ রায়ের
কলকাতা বিচিত্রা ৫০.০০

প্রাচীনকাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত এই শহরের রূপান্তরের কাহিনী।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্কর কন্যার কাছে ৪২.০০

নর্মদা পরিক্রমার কাহিনী। অমরকণ্টক থেকে নর্মদার ধার ধরে সোজা আরব সাগরে।

গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০

হিমালয়ের পর্বতশীর্ষে গুহার মধ্যে বৈষ্ণোদেবীর দরবার। যাওয়া-আসার নিখুঁত বর্ণনা। থাকার হদিস। এক কথায় এটি বৈষ্ণোদেবীর দরবার দর্শনের গাইড-বই।

প্রণবেশ চক্রবর্তী
এই বাংলায় প্রতি খণ্ড ৩৫.০০ (১ম ও ২য় খণ্ড)

বাংলার গ্রামেগঞ্জে ছড়ানো আছে কত মন্দির। তাকে কেন্দ্র করে বসে মেলা, হয় উৎসব। তারই সচিত্র কাহিনী এবং বাংলাকে নতুন করে দেখার পথনির্দেশ।

সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদারের ভ্রমণ কাহিনী।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড ◆ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

He is a true hero who performs all the duties of the world with his mind fixed on God.

Sri Ramakrishna

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

SRI MA SARADA DEVI

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভুমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভুমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বিজ্ঞানানন্দ মার্গ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩

দূরভাষ ঃ ২৪১৩৩৬৯, ২৪১৩২৮৬ ◈ ফ্যাক্স ঃ (০৫৩২) ২৪১৫২৩৫ ◈ ই. মেল ঃ rkmsald@sancharnet.in

মাঘমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ শিবির—২০০৫

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুধী ভক্তবৃন্দ,

ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিবছর সারা মাঘ মাস জুড়ে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে) অনুষ্ঠিত হয় মাঘমেলা। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধু ঐ মাসটিতে সমাগত হন স্নানাদি ও কল্পবাসের জন্য।

প্রতিবছর মাঘমেলায় আমরা একটি ধর্মীয় তথা মেডিক্যাল শিবির (ক্যাম্প) পরিচালনা করি—ধর্মপ্রচার ও সাধু-ভক্তসেবার উদ্দেশ্যে। **২০০৫-এ শিবিরটি পরিচালিত হবে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।**

শিবিরের প্রধান প্রধান অঙ্গ হবে ঃ

১. সাধু ও তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি সুসজ্জিত চিকিৎসালয়, যাতে থাকবে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ; থাকবেন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ।

২. ধর্মীয় বক্তৃতা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের জন্য একটি সৎসঙ্গ প্যাণ্ডেল ও মন্দির।

৩. সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বহিরাগত ভক্তদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

৪. হিন্দি, ইংরেজি ও বাঙলায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী এবং বেদান্ত সাহিত্য প্রচারের জন্য একটি পুস্তককেন্দ্র।

৫. শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার ওপর একটি চিত্রপ্রদর্শনী।

একথা বলা বাহুল্য যে, এইসব কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই পুণ্যকর্মে আপনার সহৃদয় অনুদান আমাদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আপনার দানের জন্য আমরা অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার অনুদানের জন্য ধন্যবাদের সঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

দয়া করে আপনার চেক/ড্রাফ্ট ইত্যাদি 'Ramakrishna Mission Sevashrama'-এর নামে 'ক্রস্‌ড ও অ্যাকাউন্ট পেয়ি' করে দেবেন।

আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক—এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

প্রভুসেবায় আপনাদের

স্বামী ত্যাগাত্মানন্দ

সম্পাদক

শিবিরে ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা

এবছর মাঘমেলা শিবিরে যেসব ভক্ত থাকতে চান, তাঁদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। **একজনের একদিনের জন্য খরচ পড়বে ১০০ টাকা। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ভক্তদের তিনদিনের খরচ বাবদ ন্যূনতম ৩০০ টাকা দিতে হবে। কল্পবাস উপলক্ষ্যে যাঁরা ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি অবধি থাকতে ইচ্ছুক, তাঁদের দিতে হবে ২,৫০০ টাকা।**

ভক্ত তীর্থযাত্রীদের তাঁদের থাকা-খাওয়ার খরচ অতি অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে ১৫ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে, ক্রস্‌ড ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট বা মানি অর্ডারের মাধ্যমে 'Ramakrishna Mission Sevashrama, Allahabad'-এর নামে।

● স্নানের প্রধান দিনগুলি ●

পৌষ পূর্ণিমা ২৫ জানুয়ারি, মৌনী অমাবস্যা ৮ ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমী ১৩ ফেব্রুয়ারি, মাঘ পূর্ণিমা ২৪ ফেব্রুয়ারি।

★ **বিশদ বিবরণের জন্য দয়া করে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ-২১১০০৩-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।**

★ **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যেকোন দান আয়কর আইনের (১৯৬১) ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।**

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**
  কাঁকুড়গাছি, ফোন : ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
  হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন : ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন : ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ**, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন : ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**
  ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
  ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন : ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **মা সারদা এজেন্সি**
  রামকৃষ্ণ মিশন স্টাফ কোয়ার্টার, গোলপার্ক, কলকাতা-২৯
  ফোন : ৯৪৩৩১৬৪২৩৪
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক**, সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র**, চেতলা
- **শোভনা ভৌমিক**, ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ২৪৯৭-০১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স**
  ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল**
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫
  ফোন : ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক**, ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
  ৯ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **দাসানুদাস সাহা**, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট
  কলকাতা-৫, ফোন : ২৫৫৪-৬২৯৯
- **রবি হাজরা**
  ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**
  ২৪/৬১ যশোর রোড
  ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮
  ফোন : ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর আইচ
  ৯/এইচ, দমদম রোড, রাজাবাগান
  কলকাতা-৩০, ফোন : ২৫৫৭-০৫৭৬, ৯৮৩০১৩২৩৯২
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, প্রযত্নে বিকাশ সাহা
  মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা-৭৯
  ফোন : ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**
  প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন : ২৫১২-৯৫৬০/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক)
  ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১
  ফোন : ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন : ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**
  ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড, সন্তোষপুর
  যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন : ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর**
  প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা
  কলকাতা-৪৯, ফোন : ২৫৪১-০১২২
- **রূপম চক্রবর্তী**
  প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
  বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬,
  ফোন : ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪
- **বিবেকানন্দ পাঠমন্দির**
  প্রযত্নে কানাইলাল বসু
  ৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর
  কলকাতা-৬৩, ফোন : ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪
- **অলক পাল চৌধুরী**
  প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, সঙ্কটাপল্লী
  ঘোলা বাজার-১১১, ফোন : ২৫৯৫-২১৮৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র**
  ১১/৫৪ ঋষি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৫১

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

"চোখের সামনে যত ভোগসুখ দেখছিস, চোখ বুজলে সব অন্ধকার। এই যে ভোগের জিনিস রয়েছে, এরা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে তোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে রাস্তা চলবি, না আলোয় আলোয় রাস্তা চলবি? আলোর আভাস যখন পেয়েছিস তখন আর ওদিকে তাকাস নে। ওদিকে গেলেই ডুবে যাবি।"

১০৭তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

সূচিপত্র

উদ্বোধন ॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা ● ফাল্গুন ১৪১১ ● ফেব্রুয়ারি ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 'উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ মোট ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ মোট ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা (INR)। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।** উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। আমাদের ধারণা, স্থানীয় গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র থেকে বই নিলে আপনার সুবিধা হবে।

'চেক' সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে 'গ্রাহক-নবীকরণ' কিংবা 'পুস্তক ক্রয়' কিংবা 'মায়ের বাড়ির জন্য' কথাটি লিখবেন। টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

◆ কর্মের ফল অনিবার্য। হেলায় হোক, আর খুব ভক্তির সহিতই হোক, নাম করলে তার ফল হবেই।

◆ এক একটা দিন বয়ে যাচ্ছে, কি করছিস? এদিন আর ফিরে আসবে না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তিনি এখনো বর্তমান রয়েছেন। আন্তরিকভাবে ডাকলে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তাঁকে ছাড়িসনে, তাহলেই মরবি। 'তুমি আমার', 'আমি তোমার'—এই ভাব।

◆ এই বুদ্ধি নিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? মানুষের কী শক্তি আছে? তাঁর শরণাগত হ। তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁকে ভালবাসতে হবে—তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে।

◆ এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ-বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন ডাক আসে।

◆ মনুষ্যজন্ম তো জ্ঞান-ভক্তিলাভের জন্যই। তা যদি না হলো, মিছে বেঁচে থেকে লাভ কি। পশুর মতো খেয়ে, ঘুমিয়ে, কতকগুলি ছেলেপিলে নিয়ে থাকার জন্য এ জীবন নয়। নরশরীরে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। এটি বুঝবার ও ধারণা করবার চেষ্টা কর।

◆ সৎপথে থাকার বাধা অনেক—মহামায়া সহজে ছেড়ে দেন না। তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্য অনেক কাঁদতে হয়, অনেক প্রার্থনা করতে হয়।

◆ মানুষের ভিতর দুটি বৃত্তি আছে—'কু' আর 'সু'। এদের দুজনের খুব লড়াই চলে। একটি ভোগের দিকে টানতে চায়, অপরটি ত্যাগের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এদের হার-জিতের উপর মানুষের মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব নির্ভর করছে।

◆ শুধু কর্ম করলেই হবে না, ভগবদ্ভাব আশ্রয় করে কর্ম করতে হবে। বারো আনা মন ভগবানে দিয়ে রাখতে হবে, আর বাকি চার আনা মনে কর্ম করতে হবে। এইরূপ ভাবে চললে ঠিক ঠিক কাজ করতে পারবি—মনেতে উদারতা আসবে, আনন্দ আসবে।

◆ সংসারে থাকিতে গেলে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়। এই সংসারের এরূপই ধারা। তবে যিনি সেই পরমপদ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই কেবল বীরের মতো সহ্য করিয়া যান।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ঠাকুর ও মায়ের অনন্য ভূমিকা

রেলস্টেশনের নিকটবর্তী এক স্থানে লোহি, হরা, মুর্মু, সোরেনের দল ভিড় করিয়াছে। কোন বড়লোক আসিয়াছেন। তিনি তীর্থপথযাত্রী। সঙ্গে অনেক লোক, সরকার, সান্ত্রি প্রভৃতি। কিন্তু সঙ্গে এক অদ্ভুত মানুষও আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের কথা হয়। তাহা হউক, কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত অর্ধাহারী, বস্ত্রহীন, রোগজীর্ণ মানুষের দল সেবিষয়ে চিন্তিত নহে। তাহারা দুমুঠো পেট ভরিয়া খাইতে চাহে। স্থান দেওঘর। বড়লোক মথুরানাথ বিশ্বাস, অদ্ভুত মানুষটি শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজোবাবুকে (মথুরানাথ) পীড়াপীড়ি করিতেছেন—এইসব অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে খাওয়াইতে হইবে, নূতন বস্ত্র দিতে হইবে, একমাথা তেল দিতে হইবে। সংখ্যায় তাহারা অনেক। এত অর্থ মথুরানাথ সঙ্গে আনেন নাই, কোথায় পাইবেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" অগত্যা মথুরানাথকে সব ব্যবস্থাই করিতে হইল।

ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইরূপ আরো ঘটনা বর্ণিত আছে। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে কি ঠাকুরের আগমন হইয়াছিল? তদুত্তরে বলিতে হইবে ঃ না, তাঁহার আগমনের আরো গভীর তাৎপর্য আছে নিশ্চয়ই। অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। শিক্ষালাভ করিলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখে। বিদ্যাদান অপেক্ষা ধর্মদান শ্রেষ্ঠতর। ধর্ম মানুষের চরিত্রগঠন এবং তাহাকে চিহ্নিতকরণের একটি উপায়। ধর্মদান অপেক্ষা স্ব-স্বরূপের জ্ঞানদান শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, ইহাই শ্রেষ্ঠতম। অজ্ঞানাচ্ছাদিত সংসারী মানুষ ঘুরিয়া-ফিরিয়া কাম-কাঞ্চনের মোহাবর্তে নিত্য ঘূর্ণিত হইতেছে। ঈশ্বরই তাহাকে 'বেশ সুখেই আছি'—এই বোধ দিয়া রাখিয়াছেন। গাঢ় সংসারাসক্তির একটি মোটা আবরণের তলায় একটি আপাত মনোরম দৃশ্যমান পৃথিবীর যাবতীয় চাকচিক্যে আকৃষ্ট নরনারী বেশ আনন্দেই আছে! ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে এই 'সার্কাস' থামিয়া যায়। তথাপি তাঁহার কৃপা অহরহ বর্ষিত হইতেছে। কদাচিৎ কেহ সেই কৃপারশ্মি অনুভব করিয়া 'জিজ্ঞাসু' হইয়া উঠিতেছে। তাহার হৃদয়ে প্রশ্ন উঠিতেছে—'এই জীবনের পরম প্রাপ্তি কিসে হইতে পারে?' ধীরে ধীরে জ্ঞানরশ্মি আকারে বর্ধিত হইতে থাকে, এবং সংসারাসক্তির চাদরখানি তনুকৃত হইয়া পড়ে। "ভগবানলাভের আনন্দ পেলে সংসার আলুনী বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন।

সাধারণের মধ্যে ধর্মের মাধ্যমে ক্রমে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাইয়া আত্মোপলব্ধির পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করাই গীতোক্ত 'লোকসংগ্রহ'। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন ঃ "লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।" অর্থাৎ, লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তোমার চলা উচিত। কাহারা এইভাবে চলিবেন? অবতার এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিবেকানন্দাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য প্রতিবিম্বিত হইবে—ইহা বাঞ্ছনীয়। ঠাকুরের শিষ্যবর্গের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং দেখা যায়, তাঁহারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রত্যেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত ভাবের এক-একটি ভাব নিজ জীবনে পরিস্ফুটিত করিয়াছিলেন। তাই কোন প্রবীণ সন্ন্যাসী একদা সুন্দর ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যোলোজন শিষ্যকে একত্রে গ্রথিত করিলে ঠাকুরের আদল পাওয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে কথা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথে শ্রীশ্রীমায়ের পথচলা নহে, বরং শ্রীরামকৃষ্ণের চলা পথেই তাঁহার একমাত্র গতি—অন্য পথ তাঁহার নাই। কারণ, ঠাকুর ও মা যে অভিন্ন।

পূর্ব পূর্ব অবতারে সর্বদাই শক্তির আগমনের উল্লেখ শাস্ত্র এবং ইতিহাসে বিধৃত আছে। কিন্তু সেই সেই ক্ষেত্রে শক্তির ভূমিকা আর আধুনিক যুগে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকার সহিত সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি কাহারো ভূমিকাই মেলে না। শ্রীশ্রীমায়ের সক্রিয়, জাগ্রত আধ্যাত্মিক ভূমিকা যেভাবে জনসমক্ষে ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশলাভ করিয়াছে তাহা যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভূমিকা—সেব্যাপারে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য ভূমিকা রামকৃষ্ণাবতারের একটি অভিনব চরিত্র। ইহার দীর্ঘতর বিশ্লেষণের পূর্বে আরো কিছু কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঈশ্বরের জন্য যে ব্যাকুলতা, যে তীব্র সাধনার কথা লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেখি না। বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের যোড়শীপূজার কাহিনী স্মরণ করুন। সেই গভীর অমানিশায় শ্রীশ্রীমায়ের যে আপাত সমাহিত ভাব—তাহা কেবল তাঁহার ভিতর ভাবী মহাশক্তির বোধনের সূচনামাত্র ছিল। মায়ের সেই সমাধিতে যেন তাঁহার ভাবী প্রচণ্ড সক্রিয় ভূমিকার ইঙ্গিত-বহনকারী এক মহাশক্তির বোধন হইতেছিল। পরবর্তী কালে 'দেবী' সারদা রূপান্তরিত হইলেন মাতা ও গুরুতে। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাবের এক দিব্য সন্ততির ঐতিহাসিকভাব লক্ষণীয়। সাধনকাল সমাপ্তির পর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন, ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে। কেশব সেন প্রমুখ ভক্ত যখন আসিয়া জুটিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে শ্রীশ্রীমা সাধারণ গৃহবধূর ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে আছেন। ঠাকুরের তখন এককথা : "ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য", "যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানির কাগজ—এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো-সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোনমতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকা-কড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে!"—ইত্যাদি। মোট কথা, সমাজসেবামূলক উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থ, উপদেশ এবং সর্বোপরি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের একাংশের প্রকাশ বলিলেই ভাল। স্বামী বিবেকানন্দ কথিত "আত্মনো-মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—মন্ত্রের 'জগদ্‌হিতায়' অংশটি লইয়া তাঁহার গুরুভাইদের মধ্যেই মতদ্বৈধ ছিল। যখন একজন গুরুভাই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন : "তোমার এসব বিদেশিভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তর দিলেন : "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশাবলীতে আমরা দেখি, মুখ্যত তিনি ধ্যান, জপ এবং ঈশ্বরলাভের উপর জোর দিলেও নিজের জীবনে বিবেকানন্দ-কথিত চার যোগের সমন্বয়সাধনই করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য স্বামীজীর উপদেশ শুনিয়া তবে তাহা পালন করিয়াছেন, তাহা নহে। যেহেতু এই চার যোগের সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশেরই অন্তর্গত ছিল, তাই উহা হাতেনাতে করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বামীজীও এই চার যোগের সমন্বয়ের চিন্তাটি অপর কেহ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটই শিখিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবকাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের যেটুকু অংশ আমরা দেখিয়াছি বা দেখিতেছি, তাহা যেন সমুদ্রে ভাসমান মহাকায় হিমবাহের উপরের দৃশ্যমান অংশটুকু, বাকি সিংহভাগ এখনো জলের তলায় বলিয়া দেখা যাইতেছে না। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে এখনো শক্তিরূপিণী শ্রীসারদার কী ভূমিকা তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় নাই। হইলেও তাহা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মানব-মনে কতটুকু অনুভূত হইবে তাহাও অনুমান করা দুঃসাধ্য। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা যে অভিন্ন তাহা বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন : "এ জ্ঞানদায়িনী, মহা-বুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!" শ্রীশ্রীমাও পরবর্তী কালে বলিয়াছেন : "যেই ঠাকুর সেই আমি।" আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে যদি একই সত্তার দুই বিভিন্ন প্রকাশ

বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অনন্য ভূমিকার প্রশ্ন নাই। কারণ তাহা এককথায় সারিয়া ফেলা যায়— "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত... সম্ভবামি যুগে যুগে।" সকল অবতারের আগমনের এই এক হেতু। আমরা কিন্তু আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-সচেতন মন লইয়া এই একবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দুইটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করিয়া তাঁহাদের অনন্য ভূমিকার বিশ্লেষণ করিতে চাহিতেছি। কেহ হয়তো প্রশ্ন করিবেন—এইভাবে বিশ্লেষণের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা? আসলে এই অজুহাতে তাঁহারই স্মরণ-মনন একটু করিয়া লওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য কিছুই নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন : "কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি অসাধারণ উক্তির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে : "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" এই প্রশ্ন ঠিক কখন, কবে করা হইয়াছিল তাহা জানা না যাইলেও এটুকু বুঝা যায় যে, উহা শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনাবস্থার শেষ ভাগ। অর্থাৎ সেই তীব্র ক্রন্দন, সেই মুহুর্মুহু সমাধি, সেই পরম ব্যাকুলতার অভিঘাতে হৃদয়রাম কিংবা শ্রীশ্রীমায়ের চরম উদ্বেগজনক অবস্থা। অর্থাৎ ঐসময় তাঁহার 'ইষ্টপথ' বলিতে স্বাভাবিকভাবে মনে হইবে সাধনায় সিদ্ধিলাভই ঠাকুরের পরম ইষ্ট। এইখানে থামিয়া গেলে আমরা নির্ঘাত ভুল করিব। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের 'ইষ্টপথ' কী, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ জানা নাই; তথাপি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, আগামী পৃথিবীকে বেদান্ত-নির্ঘোষিত সত্যের আলোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করাও তাঁহার পরম অভীষ্ট। অর্থাৎ সেই 'ইষ্টপথ' ক্ষণস্থায়ী বা অন্তযুক্ত কোন পথ নহে; তাহার অন্ত কোথায় আমরা জানি না। অতএব "তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি"—শ্রীশ্রীমায়ের এই উক্তির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, সেকথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পরেও শ্রীশ্রীমা প্রায় ৩৪ বৎসর (১৮৮৬-১৯২০) স্থূলদেহে ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনন্য ভূমিকার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যেন শ্রীরামকৃষ্ণই এই ৩৪ বৎসর যাবৎ লীলা করিয়া ভক্তগণকে স্বয়ং মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ এই ৩৪ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনেরই এক সম্প্রসারিত অধ্যায়। আসলে অবতার এবং তাঁহার শক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ—এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে যত বেশি আলোচিত হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব অবতারের জীবনকাহিনীতে তাহা ততই কম আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার একটি কারণও আছে বলিয়া মনে হয়। দুই সত্তা না হইলে যেন 'লীলা পোষ্টাই' হয় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হয় রূপ, লীলা, তত্ত্ব। 'ভক্তিরসামৃত' গ্রন্থে রূপ গোস্বামী ধ্যানের সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন : "রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্।" সুষ্ঠুভাবে অবতারের রূপ, গুণ, ক্রীড়া (লীলা) এবং সেবাদি (অবতারের কর্মপদ্ধতি) চিন্তাই ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ নিজের শক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়াবিলাস করিতেছেন। শ্রীরাধিকার হ্লাদিনী শক্তির স্ফুলিঙ্গ গোপীগণের মধ্যে অনুসংক্রামিত হইতেছে। তাই গোপীগণকেও বলা হইল শ্রীভগবানের ক্রীড়াসঙ্গিনী। অর্থাৎ নররূপধারণে অবতার এবং তাঁহার শক্তির পৃথক সত্তা প্রতিপাদিত না হইলে ক্রীড়া-সেবাদির যথার্থ অনুধ্যান হয় না। আবার যখন 'তত্ত্ব' প্রসঙ্গ আসিল, তখন সমাধি। তখন জগৎ নাই। তখন ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভিন্নাবস্থায় বিরাজিত। সকল অবতারের ক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা যায়। অর্থাৎ অবতার ও অবতারশক্তির নরশরীরে আবির্ভাব এবং তাঁহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা লইয়া ভক্তমানস বিশেষ ভাবিত নহে। অথচ এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করিয়া একটা পৌরাণিকতার আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ বিশেষ সমাদৃত হইবে না বলিয়াই অনুমিত হয়। বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ, বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চতুর্দিকে অদ্ভুত এক সাড়া পড়িয়াছে। এই মহা পুণ্যলগ্নে দেশ-বিদেশের বিচিত্র ঘটনাবলীর বিচারে যাইবার অবকাশ এখন নাই। আমরা মূলত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশায় যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য তাহার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিব। [ক্রমশ]

শ্রীমা সারদাদেবীর চারটি পত্র

যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে* লিখিত

।।১।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি
শ্রীচরণ ভরসা

কোঠার
উড়িষা

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি এক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তনে এদেশে আসিয়াছি। [গাজনের] সময় জয়রামবাটী যাইবার আবশ্যক নাই। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের মা

।।২।।

ওঁ রামকৃষ্ণ জয়তি
শরণং

পরে বাবাজীবন

আমি—তোমার পত্র পাইয়া আমি বড়ই সুখি হইলাম আর তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবেন ও সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। আমি ভাল আছি ও বাড়ির সকলে কুশলে আছে জানিবে। ইতি—

কাশী, ১৩১৪ সাল
তাং ১১ই ফাল্গুন, রবিবার

তোমার মাতাদেবী

।।৩।।

৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতা শরণং

সন ১৩১০ সাল
তাং ২২ বৈশাখ

নিরাপদেষু,

পরে বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এখানেও অতিশয় গরম পড়িয়াছে। ৺দেবতা বৃষ্টি হয় নাই। আমি ভাল আছি। বাটীর সকলে ভাল আছে। তোমাদের কুশল সর্বদা লিখিবে ও আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—**

জয়রামবাটী, পোঃ আনুড়, হুগলি।

।।৪।।

ওঁ রামকৃষ্ণ জয়তি

সন ১৩১৪ সাল
তাং ২৬ মাঘ, রবিবার

পরে বাবাজীবন,

তোমার পত্র পাইয়া আমি যারপরনাই আনন্দ হইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি জানিবেন ও বাড়ির সকলে একপ্রকার ভাল আছেন। আমার আশীর্বাদ জানিবেন ও সকলকে জানাইবেন। ইতি—

তোমার মাতাদেবী

---

* শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, বরিশাল-নিবাসী যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের পঞ্চম সন্তান নীহাররঞ্জন সেনগুপ্তের স্ত্রী অধুনা বাঁশদ্রোণী-নিবাসিনী আরতি সেনগুপ্তের সৌজন্যে পত্র-চারটি প্রাপ্ত।

** শ্রীশ্রীমায়ের চিঠি কেউ শ্রুতিলিখন করতেন। পরে সেই চিঠি মাকে পড়ে শোনানো হতো। কখনো কখনো কোন চিঠি মা স্পর্শও করতেন। এই চিঠিতে 'মা' শব্দটি লেখা নেই। যিনি চিঠিটি শ্রুতিলিখন করেছেন, তিনি হয়তো লিখতে ভুলে গেছেন।—সম্পাদক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥৭॥

শ্লোকার্থঃ *হে ধনঞ্জয়, এই জগতে আমার অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ কারণ নাই। মণিময় একটি মালায় মণিসমূহ যেরূপ সূত্রে গ্রথিত থাকে, আমি সেইরূপ সূত্ররূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতে অনুস্যূত হইয়া আছি এবং জগতের বস্তুসমূহ আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত হইয়া আছে।*

ব্যাখ্যাঃ সুতরাং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু কোথাও নাই। বস্তুগুলি যেন ব্রহ্মের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে, যেমন মণিমালায় মণিগুলি সূত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে। যদি সমুদ্রের কথা চিন্তা কর, যেমন ঢেউগুলি জলের গায়ে লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥৮॥

শ্লোকার্থঃ *[স্বাভাবিকভাবেই অর্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'আপনি এই পরিদৃশ্যমান জগতে কিভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন?' তদুত্তরে শ্রীভগবান বলিলেন,] হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে জ্যোতি, চতুর্বেদে আমিই ওঙ্কার। আমিই আকাশে শব্দরূপে এবং মনুষ্যমধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করি।*

ব্যাখ্যাঃ আমার সত্তায় জগতের সব বস্তুই সত্তাবান। এটি সাধারণ (general) তত্ত্ব। কিন্তু কোন কোন বস্তুতে অসাধারণ শক্তিরূপে আমার প্রকাশ দেখা যায়। জলের জলত্ব চিৎ হইতেই আসিয়াছে। রসত্বই তো জলের সত্তা। ব্রহ্মই সেই রস। চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতিতে আমার ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ প্রকাশ।

বেদ শব্দময়। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে প্রাণের স্পন্দন উপস্থিত হইলে একটা ধ্বনি হয়; সেই ওঙ্কার ধ্বনিই সকল শব্দের আদি। তাই বেদ শব্দময়, অতএব আমিই বেদের মূল কারণ।

আকাশের স্পন্দনকেই আমরা শব্দরূপে অনুভব করি। ব্রহ্মই সেই শব্দ।

মানুষের মধ্যে পৌরুষরূপেই আমার [শ্রীভগবানের] বিশেষ প্রকাশ। পৌরুষের সাহায্যে মানুষ সর্বপ্রকার উন্নতি, বিভূতি, এমনকি মুক্তিলাভ পর্যন্ত করিতে পারে। পৌরুষরূপে তিনি যে-মানুষের ভিতর প্রকাশিত হন, সেই মানুষই ক্রমে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিতে পারে। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি; তাহাতে জড় ও চেতন—এই দুইটি বস্তু আছে। জড় বস্তু সর্বপ্রথম তন্মাত্র অর্থাৎ imperceptible finest particles of matter-রূপে থাকে। তাহা ক্রমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-এ পরিণত হয়। ক্ষিতি তন্মাত্র ৮ আনা (৫০%) এবং বাকি তন্মাত্রগুলি ২ আনা (১২½%) মিলিয়া দৃশ্যমান মৃত্তিকারূপে ইন্দ্রিয়গোচর হয়। এই অনুপাতে সকল তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠে এবং আমরা অনুভব করিতে পারি—ইহা ক্ষিতি, ইহা অপ্ ইত্যাদি। শাস্ত্রে ইহাকে 'পঞ্চীকরণ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই জড়প্রকৃতির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্র 'চেতন' ব্রহ্ম পদার্থই অনুস্যূত রহিয়াছেন।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥৯॥

শ্লোকার্থঃ *আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে দীপ্তি, সর্বপ্রাণীর আয়ু (জীবন) এবং তপস্বীর মধ্যে তপঃশক্তিরূপে বিরাজ করি।*

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। পঞ্চভূত যদিও ব্রহ্মের আবৃত অবস্থা হইতে জাত, তথাপি সেইগুলিতে ব্রহ্মের প্রকাশ বিলুপ্ত হয় না। মেঘ যখন সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন চারিদিক রাত্রির অন্ধকারে আবৃত হয় না, যদিও সূর্যকে দেখাই যায় না। সেইজন্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যে মাধুর্য ও আনন্দ দান করে, তাহাতে ব্রহ্মেরই প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

প্রকৃতি তিনগুণে নির্মিত। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশ (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজস্) ও অপ্রকাশ (তমস্) আছে। পৃথিবীর মধ্যে তীব্র গন্ধ, দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ তিনপ্রকার প্রকাশ দেখা যায়। ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকাশ সুগন্ধ আমাদের মধ্যে ভক্তির ভাব প্রকাশ করে। সেইজন্য আমরা দেবালয়ে সুগন্ধি এবং সুন্দর সুন্দর পুষ্প রাখি, যাহাতে মনে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়।

রসের মধ্যে মিষ্টত্বে তাঁহার প্রকাশ। তেজের মধ্যে কোমল মধুর চন্দ্রালোকে তাঁহার প্রকাশ। শব্দের মধ্যে সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীতে তাঁহার প্রকাশ। স্পর্শের মধ্যে মাতৃদেহে, শিশুদেহে ও সাধকদেহে তাঁহার প্রকাশ।

অগ্নির সত্তা তেজ দ্বারা গঠিত। সেই তেজ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে। সর্বজীবের অস্তিত্বের কারণ সচ্চিদানন্দের 'সৎ'-ভাব। সর্বভূতের জীবন অর্থাৎ সত্তা, তাহা ব্রহ্মের সদংশ হইতেই আসিয়াছে।

বাহ্য সুখ-দুঃখকে সহ্য করার নামই তপস্যা। ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ হইয়াও তৎ সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ এইসবে তিনি নির্লিপ্ত। ব্রহ্মের সেই নির্লিপ্ততাশক্তিই মানবের মধ্যে তপস্যারূপে হঠাৎ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মকে বোধে বোধ করিতে হইলে ব্রহ্মের মতো নির্লিপ্ত হইতে হইবে। তপস্যাই নির্লিপ্ততা প্রাপ্তির আদি সাধন।

"সৎ অংশে সন্ধিনী আনন্দাংশে হ্লাদিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ; তাই এই জগতের সত্তা ব্রহ্মবস্তু দ্বারা নির্মিত খাদ্য, পানীয় প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সৎ-অংশ বিদ্যমান। তাহাতে আমাদের গঠন ও বর্ধন সম্ভব। খাদ্যবস্তু জলে পরিণত হইতেছে; পিতার শুক্র ও মাতার রক্ত হইতে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তাহার পর অন্নপানাদি দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয়—ইহাই জগতে সৎ-অংশের প্রমাণ। ইহাই সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীশক্তি।

প্রত্যেক জীব সুখের লালসায় জীবনধারণ করিয়া থাকে। একটু কিছুতে অল্প সুখ অনুভূত হইলেই তাহার ভিতর হইতে এক আনন্দের ভাব প্রকাশ হয়। সেই আনন্দকর সব বস্তুতেই ব্রহ্মের আনন্দ-অংশের প্রকাশ এবং জগতের সব বস্তুই কাহারো না কাহারো আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। যেমন মাটি দেখিলে বাসন তৈরি করিবার জন্য কুমোর আনন্দিত হয়; সুন্দর ফুল দেখিলে ভক্তের মনে দেবতাকে পূজার কথা মনে করিয়া আনন্দ হয়।

আনন্দ কিন্তু বাহিরের জিনিস নহে, আনন্দ মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে; বাহিরের আলোড়নে তাহার প্রকাশ হয় মাত্র। এই আনন্দই সচ্চিদানন্দের হ্লাদিনীশক্তি। সকল জীবেরই একটু একটু হুঁশ আছে। জগদীশ বসু প্রমাণ করিয়াছেন, গাছপালারও হুঁশ আছে। ইহাই ব্রহ্মের চিৎ-অংশের প্রকাশ। ইহাই সচ্চিদানন্দের সম্বিৎ শক্তি। সেইজন্য আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারি যে, এই জগৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন যে যে-বংশে জন্মায়, তাহার মধ্যে সেই বংশের চালচলন কিছু না কিছু থাকেই থাকে; ইহাও ঠিক সেইরূপ।

[মন্তব্য ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ' অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ স্বাভাবিকভাবেই পুণ্য বা পবিত্র। এইরূপে অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি) ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অপুণ্য কোথা হইতে আসিল? ভাষ্যকার বলিলেন, প্রাণিগণ যখন অধর্মকে আশ্রয় করে, তখন তাহাদের সহিত যে ভূতবিশেষ-সংসর্গ সঙ্ঘটিত হয়, তাহার ফলে পৃথিবী অপুণ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বার্থসাধনের জন্য অরণ্য পৃথিবীর বুক হইতে হারাইয়া যাইতেছে। তাহাতে ইকোলজিক্যাল ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে। আমরা যে প্লাস্টিক ব্যবহার করিতেছি, তাহার ফলেও পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। খনিজ তেলের যথেচ্ছ ব্যবহার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অতি বেগুনি রশ্মিকে আসিবার পথ করিয়া দিতেছে। মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আরো বহু উদাহরণ আছে।—সম্পাদক] [ক্রমশ]॥ সাতাশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ চৈত্র ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব
৬ চৈত্র, রবিবার
(২০ মার্চ ২০০৫)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
দোলপূর্ণিমা
১১ চৈত্র, শুক্রবার
(২৫ মার্চ ২০০৫)

স্বামী যোগানন্দ
ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী
১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার
(২৯ মার্চ ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ
৭, ২২ চৈত্র
সোমবার, মঙ্গলবার
(২১ মার্চ, ৫ এপ্রিল ২০০৫)

আজ হতে উদ্বোধন শতবর্ষ আগে

ফাল্গুন ১৩১১
ফেব্রুয়ারি ১৯০৫

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২৭শে জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা হইয়াছিল। দিবাভাগে গুরুপূজা, সঙ্গীতাদি এবং রাত্রে ৺শ্যামাপূজা হয়। অনেক ভক্ত এই পূজায় যোগদান করেন।

২৯শে জানুয়ারি রবিবার এতদুপলক্ষ্যে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র নানাবিধ মনোহর পুষ্প লতা পাতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাতে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বেদের অন্তর্গত পুরুষসূক্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সামগান করেন ও স্বামী শুদ্ধানন্দ কঠোপনিষদের কয়েক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে একদিকে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত চলিতে লাগিল, অপরদিকে মধুর রামায়ণী কথা হইতে লাগিল। গায়ক বাবু পুলিনবিহারী মিত্র ও বাবু লালচাঁদ বড়াল। কালীঘাট-নিবাসী হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকতা করেন। এই কথকতা একটু নূতন রকমের। শুনিতেছি, পণ্ডিত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় এই নূতন কথকতার পালা বাঁধিতেছেন। এই কথকতার মধ্যে সুবিধামত স্থানে স্থানে জাতীয় ভাবের সঙ্গীত ও বক্তৃতা দেওয়াতে সাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে ভদ্রলোক ও দরিদ্র উভয়ের সংখ্যাই অধিক হইয়াছিল। সকলকেই অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন ও অন্যান্য প্রসাদাদি দ্বারা সেবা করা হয়।

*

মান্দ্রাজ মঠে বিগত ২৯শে জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইয়াছিল। বেলা ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত দুইদল ভজনসম্প্রদায় ভজন গাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে এক দল উচ্চবর্ণ ও অপর দল নিম্নজাতি দ্বারা গঠিত। জনৈক ব্রাহ্মণ এই শেষোক্ত দলটি গঠন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বজাতির নিকট বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। মঠস্থ সন্ন্যাসিগণ উভয় দলকেই সমান আদরযত্ন করেন। বেলা ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করান হয়। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার প্রায় একঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা করেন। ইনি স্বামীজীর একজন বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত। ইনি স্বামীজীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া অবশেষে স্বামীজী ও তৎকৃত প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় এবং তিনিই বা স্বামীজীর সঙ্গে ও কথোপকথনে কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, এই সকল বর্ণন করিলেন। অবশেষে মিস্টার ন্যাটেসান মহাশয়ও কিয়ৎক্ষণ স্বামীজীর প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। স্বামীজীর প্রায় ২০০ শিষ্য ও ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন; ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

*

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০/৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। জস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমিতি একখানি স্টিম লঞ্চ জোগাড় করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মান্যবর গোখলে ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ কার্য্যবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভার কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এই বিষয় সভার গোচর করেন। বাবু পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক স্বামীজীর বিরচিত "রামকৃষ্ণ আরাত্রিক" ও "সমাধি" বিষয়ক সঙ্গীত গীত হইলে স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাঠ ও আবৃত্তি হইয়াছিল—(১) Appeal to youngmen of Bengal (এই অংশটি সমিতি মুদ্রিত করাইয়া সভাস্থলে ছাত্রবৃন্দকে বিতরণ করেন) (২) To the Awakened India (৩) "বর্ত্তমান ভারত" প্রবন্ধের শেষাংশ (৪) "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতার শেষাংশ। বক্তাগণের মধ্যে বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ এন ঘোষ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গিরিশবাবু তাঁহার "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহা পঠিত হয়। তৎপরে স্বামী শুদ্ধানন্দ বাঙ্গালা ভাষায় "স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালী" সম্বন্ধে এবং সিস্টার নিবেদিতা ইংরাজী ভাষায় "স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে পুলিনবাবু কর্ত্তৃক গিরিশবাবু বিরচিত স্বামীজী সম্বন্ধীয় দুইটী গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর প্রসাদ বিতরিত হয়।

*

শুনিয়া সুখী হইলাম, বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতি কিছুদিন হইতে অনাথভাণ্ডার ও তৎসঙ্গে এক অনাথালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে ৩ জন অনাথকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতেছেন ও ভাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের এই নবোদ্যমের জন্য আমাদের ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশা করি, সমিতির এই সদ্দৃষ্টান্ত কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় ও বঙ্গের প্রতি পল্লীগ্রামে অনুকৃত হইবে।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসারদাং প্রণমাম্যহম্*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

আজ আমরা শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। বিভিন্ন বক্তা আজ, আগামী কাল ও পরশু শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করবেন। আমি আনন্দিত আপনাদের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে পারব বলে।

একটি কথা আপনারা খেয়াল করতে পারেন। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, আমাদের একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। গণতন্ত্রের অর্থ—সাধারণ মানুষ উচ্চশ্রেণির মানুষের সঙ্গে সমান, উভয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই। এটিই গণতন্ত্র। তাই এই যুগে পরস্পরের প্রতি আমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন মানসিকতা প্রয়োজন। আমরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক—আমরা সকলেই; এখানে জাত বা গোষ্ঠীগত কোন প্রভেদ নেই।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ● আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আপনারা এর চমৎকার বিকাশ দেখতে পাবেন। তিনি এমন একজন, যিনি নিজের কাছে আমেরিকান খ্রিস্টান বা ইংরেজ খ্রিস্টানদেরও টেনে নিয়েছেন—তাদের সঙ্গে থেকেছেন, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। যদিও তিনি গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছিলেন, তবুও তিনি এই সবকিছুকে অতিক্রম করে একটি গণতান্ত্রিক মানসিকতা আনতে পেরেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) এবং আমেরিকার ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডল, সারা বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউড—এঁরা সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে খেয়েওছিলেন। এমনকি একটি মুসলমান ছেলেকে (আমজাদ) তিনি যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করেছেন। তাকে খাওয়ানোর পর তিনি নিজের হাতে উচ্ছিষ্ট ধুয়ে পরিষ্কার করেছেন। কী অপূর্ব ব্যাপার!

এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম, কোন প্রচলিত শিক্ষা তাঁর ছিল না। তবুও তাঁর জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে যেগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশের একটি অদ্ভুত রোগ রয়েছে, যাকে আমরা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে পার্থক্য বলি, সেটি হলো—'অস্পৃশ্যতা'। এই ভাব ভারতবর্ষকে একদিন ধ্বংস করছিল। আজ সময় এসেছে সকল মানুষকে এক এবং অভিন্ন বোধে গ্রহণ করার। অবশ্য শেষপর্যন্ত এটা হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী তাঁদের জীবনে এটি আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন—মানুষে মানুষে সমন্বয়, নারী-পুরুষের মধ্যে সমন্বয়, উঁচু জাত নিচু জাতে সমন্বয়। গণতন্ত্রও এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়, প্রত্যেকেরই তাই একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। এখানে কেউ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়। গণতন্ত্রের অর্থ সাধারণ মানুষ দ্বারা শাসন—সকলেই সাধারণ মানুষ, গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে।

আজ আমরা একটি উৎসব উদ্‌যাপন করছি। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এই শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে আমাদের পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সকল মানুষকে সমান গণ্য করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। উচ্চ-নিচ নয়, কোন বর্ণ বা শ্রেণি নয়—ভারতবর্ষ থেকে জাতপাত, অস্পৃশ্যতা নির্মূল করতে হবে। আপনারা দেখতে পাবেন, তাঁদের জীবনেও এই ব্যাপার ঘটেছে।

এটি একটি শিক্ষা। ভগবদ্গীতা বলেছেন, যখনি ধর্ম মলিন হয়, তখনি ভগবান অবতরণ করেন। নতুন ধর্ম, কালধর্ম সৃষ্টি করতে তিনি আসেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে'। গীতাতে এইরকম পাওয়া যায়। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন; আর এসেছেন শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতবর্ষে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ মানবিক উন্নয়ন আনার জন্য। আমার আশা, এই শিক্ষাগুলি যদি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ভারতবর্ষের

** গত ৪ জানুয়ারি ২০০৫ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে প্রদত্ত পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজীর এই মূল্যবান ভাষণটির সনিষ্ঠ অনুবাদ করেছেন স্বামী জ্যাগরূপানন্দজী।*

সবচেয়ে বড় কলঙ্ক—ছুঁতমার্গ ও জাতপাতের বিচার দূর করার বিরাট কাজ সুনিশ্চিতরূপে শুরু হবে। স্বামীজী যখন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে গিয়েছিলেন, সেসময় বলা হতো—বিদেশিরা ম্লেচ্ছ। স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন, যখন থেকে ভারতবর্ষ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিকে বিশ্বাস করতে শুরু করল, তখন থেকে সে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদান বন্ধ করল। এই 'ম্লেচ্ছ' ধারণা এখন বিনষ্ট করতে হবে। সুখের কথা, বর্তমান কালে এই ধারণাটি নির্মূল হয়েছে। এখন তো এদেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এবিষয়ে একটি বড় দৃষ্টান্ত। তাঁর ছিল দৈবী ব্যক্তিত্ব। আগেই বলেছি, কোন তথাকথিত শিক্ষা তিনি লাভ করেননি, এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি এসেছেন। তবুও তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে এইসব মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শ্রীশ্রীমায়ের ছবি। কে এই ছবি তুলিয়েছিলেন? শ্রীমতী সারা বুল। তিনি শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ করেন একটি ছবি তুলতে দিতে। প্রথমে মা রাজি হননি। অনেক সাধাসাধির পর শ্রীমতী বুল যখন বললেন, এই ছবি আমেরিকাতে নিয়ে গিয়ে আমি আপনাকে পূজা করতে চাই, তখন মা ক্রমে রাজি হন। শ্রীমতী বুলের নেওয়া সবকয়টি ছবিতে আপনারা শ্রীশ্রীমাকে বসা অবস্থায় দেখতে পাবেন। তার মধ্যে একটি ছবিতে দেখি, তিনি একদিকে বসে আছেন এবং ভগিনী নিবেদিতা অপরদিকে। শ্রীশ্রীমায়ের এই ছবিটি দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হই, সর্বত্র এই ছবিটি ছড়িয়ে পড়ছে। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেই সূচিত করেছে।

আমাদের গণতন্ত্র আরো দৃঢ় করতে হবে। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনো খারাপ অবস্থায় রয়েছে। দুহাজারের বেশি বছর ধরে আমরা অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি মেনে চলেছি। তাই আমাদের সামনে মায়ের জীবন একটি বড় উদাহরণ—ভারতবর্ষের সকল মানুষের জন্য। গীতা বলেছেন, মহান ব্যক্তিরা যে-কাজ করেন, বাকি সকলে সেটি অনুসরণ করেন। ভারতে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশিক্ষিত মানুষরা যদি নিজেদের শুধরে নেন, যদি তাঁরা অস্পৃশ্যতা দূর করতে সচেষ্ট হন—তাহলে বাকি সকলে তাঁদের অনুগমন করবেন। গীতায় (৩।২১) এই শিক্ষা রয়েছে—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যা আচরণ করেন, অপর মানুষেরা সেটি অনুসরণ করেন। আমাদের মধ্যে এই অস্পৃশ্যতা দূর করার মনোভাব জাগ্রত হলে আমাদের প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে।

ইতোমধ্যে এদেশে এই ভাব প্রকাশলাভ করেছে—রাজনৈতিকভাবে। প্রত্যেকেরই একটি ভোটে অধিকার থাকে—তথাকথিত 'অস্পৃশ্য'দের, এমনকি উপজাতিদেরও। সকলের একটিমাত্র ভোট। আবার তেমনি ভারতের উচ্চ সমাজের মানুষদের, ব্রাহ্মণদের ও ক্ষত্রিয়দের—সকলেরই একটি করে ভোট। গণতন্ত্র এরই মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সাম্যের ভাবকে নিয়ে এসেছে। এর বিরাট পরিণাম আপনারা হয়তো অনুভব করছেন। নতুন গণতান্ত্রিক সমাজের এই শক্তি—প্রত্যেকেরই একটি ভোট; ভৃত্যেরও একটি ভোট, মনিবেরও একটি ভোট—দুটি নয়। আমি নিশ্চিত, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবৃত্তান্ত সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী, তাঁদের জীবন ও বাণী—ভারতকে, তার আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে ভারতবর্ষে আমরা সমন্বয়, শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারব, প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করব। আমাদের আচার্যগণ এবং উপনিষদ্, গীতা ও ভাগবত বলেছেন, ভগবান সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১০।২০) বলেছেন ঃ "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।"—হে অর্জুন, আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করি। যদি ভগবান সব প্রাণীর হৃদয়েই থাকেন, তাহলে পার্থক্য থাকে কোথায়? আমরাই সামাজিক পার্থক্য তৈরি করি, এই ভেদ কৃত্রিম—এটি চলে যাবে। মানুষের সর্বোচ্চ উপাধির ভিত্তিতেই পার্থক্য রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ স্বরূপত ভগবানের সঙ্গে একাত্ম এবং তিনিই সকল মানুষের অন্তরে অবস্থান করছেন। আমি নিঃসন্দেহ, বেদান্তের এইসকল শিক্ষা—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনে যেরূপ প্রকটিত হয়েছে তা ভারতবর্ষের সকল মানুষকে, এমনকি বিদেশি-দেরও অনুপ্রাণিত করবে। আমার স্থির ধারণা, এটি হবে।

আজ আমি খুব আনন্দিত এই চমৎকার সভায় আসতে পেরে। ভারতের সব জায়গার মানুষ এখানে এসেছেন। পরবর্তী বক্তা (স্বামী গহনানন্দজী) শ্রীশ্রীমায়ের জীবন, তাঁর বাণী ও শিক্ষা সম্পর্কে আরো বিশদভাবে বলবেন। আমি আপনাদের সকলকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি নিশ্চিত, আগামী কয়েকদিন আমরা এখান থেকে অনেক উদ্দীপনা লাভ করব। আপনারা যখন বাড়ি ফিরে যাবেন, তখন এই উদ্দীপনাকে বহন করে নিয়ে যাবেন। সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করতে সচেষ্ট হবেন, আর এর দ্বারা গণতন্ত্র দৃঢ় হবে। এবং তখনি বৈদান্তিক ভারতের আবির্ভাব ঘটবে। স্বামী বিবেকানন্দ তা-ই চেয়েছিলেন। বেদান্ত বলছেন, আমরা সবাই এক, আমিই সেই আত্মা, প্রতিটি জীবই তাই।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। ❑

দক্ষিণেশ্বরে শম্ভু মল্লিক নির্মিত চালাঘর

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার সপ্তবিংশ পর্যায়ে দক্ষিণেশ্বরে শম্ভু মল্লিক নির্মিত চালাঘর।—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান রসদ্দার মথুরমোহন বিশ্বাসের* দেহত্যাগের পর যিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সকলপ্রকার সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি শম্ভুচরণ মল্লিক। তিনি ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দাররূপে পরিচিত ছিলেন এবং কলকাতায় নিজ বাড়িতে বাস করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির পাশেই বিত্তবান ভক্ত শম্ভুচরণের একটি বাগানবাড়ি থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। প্রথমদিকে শম্ভুচরণ ব্রাহ্মসমাজ ও আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও পরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলনের ফলে তাঁর কৃপালাভ করেন এবং তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'গুরুজী' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। শম্ভুচরণের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক লীলাবিলাস হয়। শম্ভুচরণ ও তাঁর স্ত্রী—উভয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাকে নিজেদের বাড়িতে এনে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে তাঁর শ্রীচরণ পূজা করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির উত্তরে ছোট নহবতঘরে শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের অসুবিধা দেখে ভক্ত শম্ভুচরণ কালীবাড়ির বাগানের পাশেই একখণ্ড জমি কিনে অপর ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহায়তায় একটি সুপরিসর চালাঘর নির্মাণ করেন এবং সেটি শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসর্গ করেন। নহবতঘরে থাকার অসুবিধার দরুন শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে এসে কিছুদিন বাসও করেছিলেন এবং কার্যগতিকে এই বাড়িতে ঠাকুরকেও একরাত্রি বাস করতে হয়েছিল।

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "শ্রীশ্রীমায়ের তৃতীয়বার (মার্চ ১৮৭৬) দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পূর্বেই তিনি (শম্ভুচরণ) কালীমন্দিরের সন্নিকটে (এখন যেখানে রামলালদাদাদের বাড়ি, তাহার পার্শ্বে) একখানি চালাঘর করিয়া দিবার জন্য কিছু জমি ২৫০ টাকা মূল্যে মৌরুসি করিয়া লইলেন। নেপাল সরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন) তখন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি গৃহনির্মাণের শুভসঙ্কল্প শুনিয়া প্রয়োজনীয় কাঠ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসময়ে গঙ্গার অপর তীরস্থ বেলুড় গ্রামের কাঠের গোলা হইতে তিনখানি শালের গুঁড়ি পাঠানো হইল; কিন্তু রাত্রে প্রবল জোয়ারের বেগে একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় ইহাতে বিরক্ত হইয়া মাতুলানীকে বলিলেন, 'তোমার ভাগ্য মন্দ'; সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু কটূক্তি করিতেও ভুলিলেন না। কাপ্তেন কিন্তু ভাসিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আর একখানা গুঁড়িকাঠ পাঠাইয়া দিলেন। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইলে শ্রীমা সেখানে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে গৃহকর্মে সাহায্য করিবে ও সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া একজন স্ত্রীলোককে নিয়োগ করা হইল। শীঘ্রই হৃদয়ের পত্নীও ঐ গৃহে আসিয়া শ্রীমায়ের সঙ্গিনী হইলেন।

"শ্রীমা ঐ গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের রুচি ও প্রয়োজনানুরূপ বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া মন্দিরোদ্যানে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজন-সমাপনান্তে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেন। শ্রীমায়ের সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখনো কখনো ঐ গৃহে পদার্পণ করিতেন এবং কিছুকাল

শম্ভু মল্লিক নির্মিত চালাঘরের স্থানে পরবর্তী কালে এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছে। ইনসেটে পাথরফলকটি দেখা যাচ্ছে। ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

---

* রানী রাসমণির সেজো জামাতার নাম নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। কোথাও তিনি 'মথুরানাথ', কোথাও 'মথুরামোহন', কোথাও 'মথুরমোহন'। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : "একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া রানীর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়াই প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরমোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া রানী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।" (উদ্বোধন কার্যালয়, শ্রাবণ ১৪০০, ১ম ভাগ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৯-৪০)

সদালাপ করিয়া নিজস্থানে ফিরিতেন। একদিন মাত্র ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। এক বর্ষার দিনে ঠাকুর ঐ চালায় উপস্থিত হইবার পর এমন মুষলধারে বৃষ্টি চলিতে লাগিল যে, তিনি মন্দিরে প্রত্যাবর্তনে অক্ষম হইয়া আহারান্তে সেখানেই শুইয়া পড়িলেন, আর ঠাট্টা করিয়া শ্রীমাকে বলিলেন, 'কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় না? এ যেন আমি তাই এসেছি।'

"এই চালাতে শ্রীমা দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের আমাশয় হওয়ায় তাঁহার সেবার জন্য শ্রীমাকে পুনর্বার নহবতে আসিতে হয়।"[১]

শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি ছিল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উদ্যানের উত্তরে 'উইমকো ম্যাচ ফ্যাক্টরি'র সংলগ্ন বড় রাস্তার ওপর। এখানে এসে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায়, শম্ভুচরণ মল্লিক কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসর্গীকৃত সেই চালাঘরটি (সুপরিসর মাটির বাড়ি) শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ব্যবহার করার অধিকার দিলে রামলাল প্রথমাবস্থায় এই বাড়িতেই বাস করেছিলেন; পরবর্তী কালে রামলাল এটিকে ভেঙে পাকাবাড়িতে পরিণত করায় তাঁর অপর ভ্রাতা-ভগিনী শিবরাম ও লক্ষ্মীমণিও এখানে বাস করতে শুরু করেন। এই বাড়ির সংলগ্ন জমিতে লক্ষ্মীমণির জন্য একটি পৃথক বাড়িও নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে লক্ষ্মীমণি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে বরাবরের জন্য পুরীতে চলে যাওয়ায় এই দুটি অংশযুক্ত সমগ্র বাড়িটি দুই ভাইয়ে ভাগ করে বসবাস করতে থাকেন। বর্তমানেও সেই ব্যবস্থানুযায়ী বাড়ির সামনের অংশটি রামলালের এবং পিছনের অংশটি শিবরামের বংশধরগণ বসবাস করেন। বর্তমানে সেই চালাঘর না থাকলেও সেই ভিতের ওপরই নির্মিত পাকাবাড়িটি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাস্থলের স্মারকরূপে বিদ্যমান। বাড়ির প্রবেশপথের দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা আছে—'জয় প্রভু রামকৃষ্ণ' (লেখাটি অবশ্য ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে)। ☐

<u>পথনির্দেশ</u>ঃ শম্ভু মল্লিক নির্মিত চালাঘরের স্থানে অধুনা নির্মিত বাড়ির ঠিকানা—৪, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৩৫। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঢোকার মূল ফটকের ঠিক আগে ডানদিকের রাস্তা ধরে মিনিট দুয়েক হাঁটলে বাঁদিকে বাড়িটি পড়বে।

তথ্যসূত্র

(১) শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৯৪, পৃঃ ৫১-৫২

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শব্দচেতনা ৪৪

স্বামীজীর জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি ঃ (১) স্বামী বিবেকানন্দ রচিত একটি গ্রন্থ (৬) "যে-জিনিসটা যত নিকটে, তার —— কম অনুভূতি হয়" (৮) এখানে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হয় বাল্যবন্ধু মতিলাল বসুর (৯) খেতড়ি-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি (১০) "চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ ——, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা" (১৩) "——, মানুষ হও" (১৪) স্বামীজী এই বেশেই ভারত-পরিক্রমা করেছেন (১৬) "আত্মজ্ঞানই গীতার —— লক্ষ্য" (১৭) স্বামীজী সন্তরণ, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন ——বাবুর আখড়ায়। (২১) ব্রুকলিনে স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় 'জগতে ——'।

ওপর-নিচ ঃ (১) "নূতন —— বেরুক" (২) স্বামীজীর পোষা কুকুরের নাম (৩) স্বামীজী বর্ণিত চার যোগের একটি (৪) স্বামীজীর শিষ্য, পূর্বনাম কেদারনাথ (৫) কাশীধামে স্বামীজী যাঁর আশ্রমে থাকতেন (৭) স্বামীজীর প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত "তাঁরে আরতি করে চন্দ্র ——, দেবমানব বন্দে চরণ" (৯) "জীবে প্রেম করে যেই——" (১০) "আমি —— দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক" (১১) ধর্মমহাসভায় স্বামীজী 'ভ্রাতৃভাব' বিষয়ে বক্তৃতায় যে-গল্পটির কথা বলেছিলেন (১২) "প্রত্যেক জাতির যেন একটা না একটা বিশেষ —— থাকে" (১৩) বিদেশের যে-শহরে স্বামীজী ভারতীয় পানওয়ালার দেখা পান (১৫) ভারতের যে-শহরে গিয়ে সেখানকার সরদারজীকে স্পর্শ করে স্বামীজী বলেন ঃ "দেখুন দেখুন কেমন চেতন বিগ্রহ" (১৮) "গেরুয়া ভিক্ষুকের ——" (১৯) "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার —— জিনিস বলিয়া মনে করি।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম বৈশাখ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

'কথামৃত'-এর কথা

রথীন দে*

ভগবান অবিরল ধারায় বর্ষণ করেছেন অমৃত, আর ভক্ত তা সাধ্যমতো ধারণ করেছেন তাঁর হৃদয়পাত্রে। তারপর টলমল হৃদয়পাত্রে লেখনী ডুবিয়ে সৃষ্টি করেছেন অন্তরস্পর্শী এক বিস্ময় সাহিত্য—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

শব্দরসায়নে তিনি সংরক্ষণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শব্দসুধা—ভাবিকালের স্বার্থে। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য হলেও তা যেন শুধু সাহিত্য নয়, ভক্ত আর ভগবানের মধ্যবর্তী মসৃণতম মিলনসেতু।

মূলত ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬—এই চারবছরের শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যই শ্রীম অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর 'কথামৃত'-এ। তথাপি মনে রাখতে হবে, ভগবানের ভাগবত-লীলার এ এক অতি ক্ষুদ্র অধ্যায়। শ্রীম-র ভাষায় ঃ "অমৃতসাগর থেকে একঘড়া জল তুলে রেখেছি, যে যখন তৃষ্ণার্ত হয়ে আসে, তাদের পান করাই।" বাস্তবিকই তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং হলেন অসীম আনন্দসাগর। তবে এই আনন্দ জাগতিক নয়, অপার্থিব—যা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামক পুণ্য ফল্গুধারার উৎসমুখ। অমৃতের বিশেষত্ব, তা নশ্বর দেহকে অবিনশ্বর করে। আর 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য, তা মানবচেতনাকে পূর্ণতা দান করে। অচেতন, অবচেতন বা অর্ধচেতন মনকে পূর্ণচেতন স্তরে উন্নীত করে। সীমাবদ্ধ পার্থিব অনুভূতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মানব-মনকে মুক্ত করে চিরন্তন সচ্চিদানন্দের স্বাদ দান করে।

'কথামৃত'-এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এর সহজবোধ্যতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার কারণেই অধিকাংশ মানুষ আপাতনিরস শাস্ত্রাদির পাঠ-অধ্যয়ন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকেন। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তর পেতে তাঁদের নির্ভর করতে হয় নামী-অনামী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ওপর। আবার সেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণেও একই তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় ভিন্ন ভিন্ন। ফলত বিভ্রান্তি আসা অস্বাভাবিক নয়। তথাপি ন্যূনতম সংস্কৃতজ্ঞানটুকু অথবা ভাষাগত সামান্য ব্যুৎপত্তিটুকু না থাকায় বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে সেইসব আধ্যাত্মিক কৌতূহল চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না। মনের প্রশ্ন মনেই থেকে যায়। কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হৃদয়ঙ্গম করতে কোন ব্যাখ্যাকারের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না কোন ন্যূনতম যোগ্যতারও। কারণ? কারণ আর কিছুই নয়, 'কথামৃত'-এর অনাবিল সহজবোধ্যতা, কথ্যভাষায় মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহিতা, সর্বোপরি অত্যন্ত ঘরোয়া এবং লোকপ্রিয় উপমার মাধ্যমে গূঢ় তত্ত্বকথা উপস্থাপনার স্বকীয়তা। ভাষা, প্রয়োগভঙ্গি, পুঙ্খানুপুঙ্খ পশ্চাৎপট—অসাধারণত্ব কোথায় নেই! তথাপি সাধারণ মানুষের জন্য তা উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত সাধারণভাবে। অতি সাধারণের মোড়কে অসাধারণত্ব—'কথামৃত'-এর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে শুধু নয়, সম্ভবত সাহিত্য হিসাবেও 'কথামৃত' প্রকাশের আগে সেকালে এত প্রাঞ্জল ভাষায় আর কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি।

সাহিত্য বলে বোধহয় ভুল করা হলো; অসাধারণ সাহিত্যগুণসম্পন্ন, কিন্তু সাহিত্যের সীমায় আবদ্ধ নয়। 'কথামৃত' হলো বাঙ্ময়, দৃশ্যময়, গতিময় শ্রীরামকৃষ্ণসত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর 'কথামৃত' এক ও অচ্ছেদ্য। তাঁকে জানতে হলে 'কথামৃত' পড়তেই হবে। নিছক পাঠ করা নয়, সুগভীর অনুধ্যান। তাঁর লীলার দৃশ্যপট, তাঁর মুখোচ্চারিত শব্দরাজি হৃদয়ে গেঁথে ধ্যানে বসলে তাঁর রোমাঞ্চকর স্পর্শ পাওয়া যাবেই। কখনো বা পাঠক চমকে নিজের নিরুচ্চার উপস্থিতি আবিষ্কার করবেন সেদিনের সেই সমবেত ভক্তদের মাঝে, আর এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকেই সহসা আসবে পথনির্দেশ। স্বয়ং ভগবান ততক্ষণে গ্রহণ করেছেন ভক্তের পথপ্রদর্শকের রূপ। তখন আর আত্মানুসন্ধান নয়, শুধুই আত্মোপলব্ধি।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর আলোয় উদ্ভাসিত মন-দর্পণে তখন কেবল তারই প্রতিচ্ছবি। 'কথামৃত'-এর ছোঁয়ায় ভক্ত হবেন ভগবানময়। 'কথামৃত' প্রসঙ্গে তাই স্বয়ং স্বামীজীর স্বীকারোক্তি ঃ "I am really in a transport when I read them." (তাদের কথা পড়লে আমার সমাধি হয়ে যায়।) আর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলছেন ঃ "বারো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে 'কথামৃত' পড়লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে।"[১]

বাস্তবিকই তাই। কথারূপ অমৃতের ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শে মানব-মন পেতে পারে গঙ্গার শীতল শুদ্ধতা, সদ্যোজাত শিশুর নিষ্পাপ আকুলতা। অবাঙ্‌মনস-গোচরও তখন আর অধরা থাকে না, শ্রীরামকৃষ্ণ-চৈতন্যালোকে আপাত-অদৃশ্য আনন্দফল্গুর উৎসও যেন তখন দৃশ্যমান।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' শুধু সর্বজনগ্রাহ্য নয়, সর্বাংশে গ্রাহ্য। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বিশ্বমানসের কাছে এ পুণ্য

* *নবীন প্রজন্মের সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক, বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় মাঝেমধ্যে লেখেন।*

গ্রন্থের আবেদন চিরকালই অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ, অন্য অন্য 'ইজম'-এর মতো রাষ্ট্রনীতির আনুকূল্য বা প্রতিকূলতার ওপর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ইজম'-এর বিস্তৃতি নির্ভর করে না। এর ব্যাপ্তি কেবল মানুষের চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর এই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাববিপ্লবের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সর্বাগ্রে পরিচিত হতে হবে 'কথামৃত'-এর সঙ্গে। পরিচিত হতে হবে সর্বাংশে। কারণ, 'কথামৃত'-এর কোন সারাংশ বা সারসংক্ষেপ হয় না। এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দই যেন এক-একটি বীজমন্ত্র। কখনো বা একই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত মোহাচ্ছন্ন মানুষের মনের দরজায় বারবার ঘা দিতে।

যদি 'কথামৃত'কে ভালভাবে জানা যায়, হৃদয় দিয়ে যদি উপলব্ধি করা যায় মানবসভ্যতার প্রতি 'কথামৃত'-এর অনুচ্চারিত বার্তা—এ জগৎসংসারের স্বরূপও তখন স্পষ্ট হবে। 'কথামৃত'কে বুঝতে পারলে বোঝা যাবে নিজেকে। 'কথামৃত' কোন বাণীসঙ্কলন নয়, প্রাঞ্জল ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত সহজ-সরল ঘটনাপঞ্জী। ঠাকুরের স্পর্শে বর্ণগুলি পর্যন্ত জীবন্ত, প্রতিটি উপদেশই শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় প্রতিবিম্বিত আর পরীক্ষিত। ভাগবতবাক্য যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে ভগবানের নরলীলায়। তাই 'কথামৃত'কে আরো ভালভাবে বুঝতে হলে প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অনুধ্যান। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-পটেই আরো জীবন্ত, আরো হৃদয়স্পর্শী। পরস্পর যেন পরস্পরের নিখুঁত পরিপূরক। তাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ব্যাখ্যা হতে পারে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এবং তাঁর জীবনের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে একমাত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের লক্ষ্য ভগবানলাভ। তাই অসংখ্য অধ্যায় ও খণ্ড-সমন্বিত সুবিশাল এই গ্রন্থের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ভগবান এবং ভগবানলাভের পন্থা। লঙ্কা না জেনে খেলেও যেমন ঝাল লাগে, তেমনি নিছক কৌতূহলে এ-গ্রন্থ পাঠ করলেও অবচেতন অন্ধকার মনদর্পণ উদ্ভাসিত হয় জ্ঞানসূর্যের আলোয়। পরিতৃপ্ত হয় দীর্ঘকাললালিত অসংখ্য জীবনজিজ্ঞাসা।

ব্যাবহারিক জীবনে রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), পূর্ণ (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ), তেজচন্দ্র, ক্ষিরোদ, নারায়ণ, পল্টু প্রমুখের শিক্ষক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—তাঁদের 'মাস্টারমশায়'। তাঁকে ঠাকুরের 'মাস্টার' সম্বোধন কি শুধু সে-কারণেই! নাকি *কোটি কোটি মানুষের আগামিদিনের অধ্যাত্মজীবনের* শিক্ষাগুরু আর পথপ্রদর্শকের প্রতি এ ছিল ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা যুগদেবতার আগাম স্নেহসম্ভাষণ। তাই যখন মাস্টারমশায় পূর্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে বলছেন ঃ "আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে করে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌড়ে এল। আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।" তখন সাশ্রুনয়নে ঠাকুরের আবেগঘন উত্তর ঃ "আহা! আহা!—কিনা, ইনি আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না।"[২]

শুধুই কি পূর্ণচন্দ্র ঘোষ? কোটি কোটি মানুষকে পরমার্থের সন্ধান দিয়ে শ্রীম আজ সকলের অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক, শিক্ষক। তাই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাঁর 'মাস্টারমশায়' উপাধি আজ সার্বজনীন। এজন্যই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, যতদিন থাকবে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব, ততদিন থাকবে অমৃতগ্রন্থ এই 'কথামৃত'। আর থাকবেন অমৃতপুরুষ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সকলের মাস্টারমশায়—লোকশিক্ষকের ভূমিকায়।
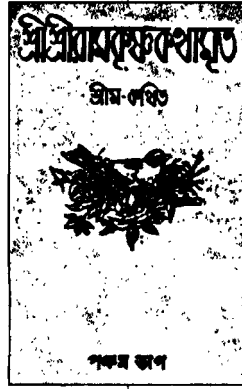
প্রকৃতপক্ষে 'কথামৃত' হলো এক জীবনবেদ। বহুবিধ জীবনজিজ্ঞাসার কার্যকরী ও উজ্জ্বল সমাধান ধারণ করে রয়েছে আশ্চর্য গ্রন্থ এই 'কথামৃত'। স্বামীজীর মতে, এর প্রতিটি কথায় লক্ষ দর্শনগ্রন্থ সৃষ্টি হতে পারে। আর কথামৃতকার মাস্টারমশায় যেন একালের নব ভগীরথ, শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখোৎসারিত বাঙ্ময় শব্দগঙ্গাকে এনেছেন সাধু, অসাধু, পাপী, তাপী সকলের কাছে। আর সেই চৈতন্যময় পুণ্যস্রোতে অবগাহন স্নানে উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে সংসারাগ্নিতে দগ্ধ মানুষজন লাভ করছেন শান্তি শীতল উপশম।

মনে রাখতে হবে, গতানুগতিকতার অনুসরণ কিংবা প্রথাবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণে বহুচর্চিত কোন আধুনিক সাহিত্য জন্ম নিতে পারে না। দৃষ্টান্তসাহিত্যি তাকেই বলা যায়, যা নিজেই এক নব্যতর ধারার সৃষ্টি করে। আবার 'আধুনিকতা' শব্দটিও পুরোপুরি আপেক্ষিক। আজকের আধুনিকতম সাহিত্যরীতির অনুবর্তন যদি আগামিকাল হয়, তবে তা আধুনিক খেতাব হারাবে—যতই তাতে সাহিত্যালঙ্কার কিংবা উপস্থাপনানৈপুণ্য থাকুক না কেন। তবে নির্বিচারে সর্বাংশে প্রচলিত সাহিত্যরীতির ভাঙনও আবার আধুনিক সাহিত্য হতে পারে না। তাকেই কালোত্তীর্ণ আধুনিক সাহিত্য বলা যেতে পারে, সৃষ্টিশীলতা আর গঠনমূলক নব্য দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রধানতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সে-সাহিত্য সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায় এবং তা থেকে আগামী ভবিষ্যতে মসৃণভাবে উত্তরণের পথনির্দেশও করে বৃহত্তর মানবসভ্যতা ও সমাজকে। আবার কিছু সময়ের জন্য হলেও পার্থিব যন্ত্রণাকাতর পাঠককে দেয় অপার্থিব উপশম। আর এই আধুনিকতার পরীক্ষায় এবং জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কে অনেকে চির আধুনিক বললেও আমরা তা বলার পক্ষপাতী নই। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, আধুনিকতা বহুলাংশে একটি আপেক্ষিক ধারণা—সেখানে কোনকিছুই চির আধুনিক হতে পারে না। পরিবর্তে আবেদনের দিক থেকে এই গ্রন্থকে চিরকালীন বা চিরন্তন বলাই যুক্তিসঙ্গত। মহাকালের অমোঘ নিয়মে সব নদী হারায় গতি, কত কীর্তি ডুবে যায় বিস্মৃতির আড়ালে। কালের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে যা টিকে থাকে তাই ব্যতিক্রমী। আর এইরকম ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত-সাহিত্য এক যুগে ভুরি ভুরি জন্ম নেয় না। দৃষ্টান্তমূলক ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী একজন লেখকই পারেন অনায়াসে ব্যতিক্রমী সাহিত্যের জন্ম দিতে। স্বার্থশূন্য আন্তরিক প্রেরণা থেকে যে-লেখা জন্মগ্রহণ করে, একমাত্র সে-লেখাই পেতে পারে পাঠকের অখণ্ড মনোযোগী অন্তঃকরণ। পরিকল্পিত ফরমায়েশি লেখা সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-লেখা উঠে আসে লেখক-হৃদয়ের যত গভীরতম প্রদেশ থেকে, সে-লেখা পাঠকহৃদয়েরও ততটাই গভীরে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। যেহেতু 'কথামৃত' কেবল এক ভাবসাহিত্য নয়, তাই এর জন্মও শ্রীম-র মনোভূমিতে নয়। তথাপি এই গ্রন্থের প্রাণস্পর্শী ভাব বিপ্লব ঘটিয়েছে অসংখ্য পাঠকের ভাবরাজ্যে। কারণ একটাই, শ্রীম-র অন্তরের তাগিদ ঈশ্বরলব্ধ। তাই 'কথামৃত' এত প্রাণস্পর্শী। ঠাকুরের কথা ঠাকুরই প্রচার করেছেন—'কথামৃত' লিখন প্রসঙ্গে এই কথা স্বয়ং কথামৃতকারের।

মনে রাখতে হবে, শ্রীম কিন্তু সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় লেখনী ধারণ করেননি। আক্ষরিক অর্থেই এ ছিল তাঁর সাধনা। তাই দেখা যায়, শেষ চারবছর যখন ডানহাতের অসহ্য neurologic pain-এ ছটফট করছেন, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজী—সব চিকিৎসাকে নিষ্ফল করে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে ব্যথার তীব্রতা, তখনো কিন্তু যন্ত্রণাক্লিষ্ট তাঁর সেই ডানহাতের গতি অব্যাহত। ঈশ্বরলব্ধ কার্যে তাঁর লেখনী কাগজের ওপর আগের মতোই সমান মসৃণ। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে 'কথামৃত'-এর চতুর্থ ভাগ প্রকাশের পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তখনো 'উদ্বোধন', 'প্রবর্তক', 'বঙ্গবাণী', 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখার সরবরাহ অব্যাহত। দৈহিক শক্তিও নিঃশেষিত, শুধু ইচ্ছাটুকু সম্বল করেই যেন লক্ষ্যে অবিচল একালের ব্যাসদেব। কখনো বা আহার বলতে দিনান্তে সামান্য হবিষ্যান্ন। "কলিতে অন্নগত প্রাণ", তাই ওটুকু। নিজ মুক্তির লক্ষ্যে নয়, বাস্তবিকই লোককল্যাণে এই ছিল মহর্ষি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের জনারণ্যে তপস্যা। এ তাঁর ইষ্টসাধনা।

আমরা জানি, আধারভেদে ঠাকুর নির্দেশ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ। শ্রীরামকৃষ্ণমুখামৃত 'কথামৃত'-এর মোড়কে সংরক্ষণ ছিল তাঁর সেই সাধনারই অঙ্গ। তাই নরেন্দ্রনাথ, রাখাল—এঁদের সঙ্গে মেলে না সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসুর সাধনপথ। মনমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত—এঁদের সাধনপথের সঙ্গেও কোন সাযুজ্য নেই লোকশিক্ষক গিরিশচন্দ্রের সাধনপথের। শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশামৃত পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তহৃদয়ে নিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আকার। আর তা থেকে স্ব স্ব পথনির্দেশ পেয়েছেন প্রত্যেকে। তাঁরা যেন পথভ্রষ্ট না হন—সেদিকেও ছিল ঠাকুরের সজাগ দৃষ্টি। ঠাকুরের সন্ন্যাসি-ভক্ত তারক (স্বামী শিবানন্দ) যখন নিজ উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমুখামৃত লিপিবদ্ধ করতে কলম ধরেছিলেন, ঠাকুর তখন একারণেই নিষেধ করেছেন তাঁকে। [ক্রমশ]

তথ্যসূত্র

১ দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বাণানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৯
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ৪।২৩।১

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪২

পাশাপাশি ঃ (১) কপোতেশ্বর, (৩) পঞ্চানন, (৫) মমতা, (৭) নন্দন, (৮) বরদা, (১০) মার, (১১) কান, (১২) বালি, (১৩) বল, (১৪) রম, (১৫) দেব, (১৬) তারক, (১৮) শমন, (১৯) কেশব, (২১) হরগৌরী, (২২) নরসিংহ।

ওপর-নিচ ঃ (১) কর্দম, (২) রবিনন্দন, (৩) পবন, (৪) নটবর, (৬) মকর, (৮) বলি, (৯) দানব, (১০) মান্ধাতা, (১১) কাল, (১২) বাম, (১৩) বক, (১৪) রঘুনন্দন, (১৫) দেবেশ, (১৭) রঘুবর, (১৮) শঙ্করী, (২০) বরাহ।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা রায়চৌধুরী।

স্মৃতিকথা

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী অপূর্বানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অপূর্বানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি স্বহস্ত-লিখিত এই স্মৃতিকথাটি উদ্বোধন কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর লেখা শ্রীশ্রীমায়ের এক অপূর্ব স্মৃতিকথা 'শতরূপে সারদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সচিব থাকার সুবাদে তিনি শ্রীশ্রীমা ছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গ করেছিলেন। অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এই স্মৃতিকথাটি যেমন একটি মূল্যবান দলিল, তেমন লেখার মাধুর্যেও ভক্তজনের চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।—সম্পাদক

যতদূর মনে পড়ে, শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে (গঙ্গাধর মহারাজ) আমি প্রথম দর্শন করি বেলুড় মঠে ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে কালীপূজার কয়েকদিন পর। ইতোপূর্বে তাঁর নামই শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর দর্শন বা পুণ্য সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়নি। তিনি সারগাছি থেকে শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করাতে কলকাতায় কয়েকদিন বাস করে পরে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পুটিয়া রাজবাড়ির একটি যুবক ভক্তও ছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর চরণে মস্তক অবনত হলো। বিশাল চক্ষু, সুঠাম চেহারা, মুখমণ্ডল প্রতিভা-মণ্ডিত। পরনে তসরের খদ্দর, গায়েও আলখাল্লার মতো ঢোলা তসরের জামা। কণ্ঠস্বর মধুর তেজোদ্দীপ্ত, দেহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুপুষ্ট এবং সুন্দর মুখশ্রী। শুনেছিলাম গান্ধীজী প্রবর্তিত খাদি আন্দোলন দেশে প্রচলিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাঁর আশ্রমে কাপাসতুলার চাষ করে গ্রামে তুলা বিতরণ করতেন এবং সুতাকাটা হয়ে গেলে তা দিয়ে আশ্রমের তাঁতে কাপড় বোনা হতো। তিনি বরাবর তাঁতের মোটা কাপড় পড়তেন—হয়তো সুতার খদ্দর, না হয় মুর্শিদাবাদের রেশমি খদ্দর।

মঠে পৌঁছেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শনে গেলেন, ঠাকুরঘর থেকে নেমে এসে ওপরে মহাপুরুষজীর (স্বামী শিবানন্দ) কাছে গেলেন। সারগাছি থেকে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মঠে এসেছেন—এই খবর প্রচারিত হতেই মঠের প্রায় ১০-১২ জন প্রবীণ নবীন সাধু-ব্রহ্মচারী সমবেত হয়েছিলেন মহাপুরুষজীর ঘরের মধ্যে ও বারান্দায়।

গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেই মহাপুরুষজী খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন ঃ "এস, এস গঙ্গাধর—কেমন আছ?" মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতেই তিনি তাঁকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে হাসতে হাসতে বললেন ঃ "গঙ্গাধর রাজবাড়িতে বাস করছে—রাজভোগ খাচ্ছে, তাই আমাদের ভুলে গেছে।" গঙ্গাধর মহারাজ খুবই আন্তরিকতা মাখা স্বরে বললেন ঃ "না, দাদা! শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল—তাই বিপিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি এবং পুটিয়াদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকতে হচ্ছে। তারা খুব যত্ন করে পথ্যাদির সব ব্যবস্থা করে।" এইভাবে নানা কথাবার্তার পরে মহাপুরুষজী ভাঁড়ারিকে ডেকে বললেন ঃ "গঙ্গাধর মহারাজের জন্য ভাল মাছ ও দই-মিষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা কর। একটু বেশি করে আনিও, যাতে সকলেই পেতে পারে।"

গঙ্গাধর মহারাজ নিজের স্বাস্থ্য ও সারগাছি আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা বলার পর বললেন ঃ "দাদা, আপনাকে অনেক দিন বেদপাঠ শুনাইনি—একটু বেদপাঠ শুনুন।" এই বলেই গুরুগম্ভীর স্বরে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তম্‌, বিষ্ণুসূক্তম্‌, নাসদীয়-সূক্তম্‌, দেবীসূক্তম্‌ প্রভৃতি পাঠ করতে লাগলেন। একটা গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হলো। পরে তিনি বললেন ঃ "স্বামীজী 'নাসদীয়সূক্তে'র কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা করতেন। মহাপ্রলয়ের এমন বর্ণনা আর কোথাও নেই। কী গম্ভীর! প্রলয়কালে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, পাতালাদি পৃথিব্যন্ত লোকসমূহ ছিল না—তখন মৃত্যু ছিল না, অমরণও ছিল না; রাত ও দিনের জ্ঞান ছিল না। তিনি বায়ুব্যতিরেকেও প্রাণবন্ত ছিলেন। নিজ মায়ার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে একমাত্র তিনি বিরাজমান ছিলেন।" ইত্যাদি।

মহাপুরুষজী শুনতে শুনতে এমনই ভাবস্থ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কোন বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। তিনি শুধু ঃ "আহা! আহা! গঙ্গাধর আজ কী আনন্দই দিল। স্বামীজীর মুখে ছাড়া এমনটি আর শুনিনি। আমার তো মনে হচ্ছিল যেন স্বামীজীর মুখেই বেদপাঠ শুনছি।" পরে বলেছিলেন ঃ "গঙ্গাধরের গলার স্বর কতকটা স্বামীজীর মতো।"

সেদিন রাত্রে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের মুখে হিমালয় ভ্রমণের কথা শুনবার জন্য মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনিও হৃষীকেশ থেকে আরম্ভ করে দেরাদুন ও মুসৌরী হয়ে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থভ্রমণকথা অতি মনোরম ভাষায় ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করলেন। আমরা তা শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধবৎ যেন তাঁর সঙ্গে ঐসকল পবিত্র তীর্থ দর্শন করলাম। তিনি বর্ণনার মাধ্যমে হিমালয়ের ঐসকল তীর্থস্থানকে আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত

করেছিলেন। তাঁর বলার ভঙ্গি অসাধারণ, যা শ্রোতার চিত্তে বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত করত। তাঁর হিমালয় ভ্রমণকাহিনী নানা দিক দিয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ছিল। তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং প্রকৃত জাতির বাস যে পল্লিগ্রামে ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে, সে-সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তা থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন জনসেবাব্রতের অনুপ্রেরণা। তিনি গরিব পাহাড়িদের ধর্মবুদ্ধি সম্বন্ধে আবেগভরে বলেছিলেন: "পাহাড়িদের এমনই সাধুভক্তি যে, রোজ সকালে রুটি তৈরি করে খাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থই একখানি-দুখানি রুটি সাধুদের দেবে বলে তুলে রাখে। তাদের পেটভরা খাবার জোটে না, কিন্তু তা থেকেই তারা সাধুদের কিছু দেয়। বিশেষ করে কেদার-বদরী যাত্রাপথে গরিব পাহাড়িদের সাধুভক্তি অতুলনীয়। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে কোথাও অভুক্ত থাকতে হয়নি। যদিও আমি টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে রাখতাম না।"

বড় বড় মন্দিরে দেবসেবার নাম করে যে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হচ্ছে—তাতে তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন: "মন্দিরে মন্দিরে যে-অর্থ সঞ্চিত আছে—তা দিয়ে দেশের ও দশের বিশেষ উপকার সাধিত হতে পারে। দরিদ্র ভারতের দেবালয়ে এত ধনদৌলত কেন সঞ্চয় করে রেখেছে? শত শত স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় চলতে পারে ঐ অর্থের সাহায্যে। প্রত্যেক দুর্গম তীর্থস্থানে যাত্রীদের জন্য একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় থাকা বিশেষ দরকার। চিকিৎসার অভাবে কত যাত্রী অকালে প্রাণ হারায়।" এসব কথা বলতে বলতে তাঁর মুখমণ্ডলে বেদনার ছবি ফুটে উঠেছিল। ঐসময় তিনি তিনদিন মঠে ছিলেন। রোজই তিনি মহাপুরুষজীকে বেদপাঠ শোনাতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে তাঁর ভ্রমণকাহিনী বলতেন। তাঁর মুখে হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণকাহিনী শুনে আমার মনে হিমালয়ের তীর্থরাজি ও কৈলাসদর্শনের ইচ্ছা বলবতী হয়—যা পরবর্তী কালে আমাকে হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের চারধাম, তিব্বতের কৈলাস ও মানস সরোবর, কাশ্মীরে অমরনাথ, ক্ষীরভবানী এবং শারদাপীঠ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ পদব্রজে দর্শনের জন্য প্ররোচিত করেছিল।

১৯২০ সালে তিনি মঠে আসেন আমের সময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তিনি দুঝুড়ি নবাবের বাগানের আম এনেছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের বাগানের আম বিখ্যাত। প্রবাদ যে, পাঁচশত বিভিন্ন ভাল ভাল আমগাছ ঐ বাগানে আছে। ঐসব আমের নাম, আকৃতি ও স্বাদ পৃথক পৃথক—বাদশাভোগ, নবাবপছন্দ, রানীপছন্দ, কালাপাহাড়, কোহিনুর ইত্যাদি। আবার সেসব আম কখন কিভাবে কাটতে হয়, খেতে হয়—তারও নিয়ম আছে। তিনি প্রত্যেকটি আমের গায়ে নাম লিখে নম্বর দিয়ে কিরকম স্বাদ, কখন কাটতে হবে সব লিস্ট করে এনেছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

তিনি এসেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে মহাপুরুষজীর ঘরে গেলেন। আমের ঝুড়িগুলিও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। মহাপুরুষজী তো গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেই ভারি খুশি। তিনি মহাপুরুষজীকে প্রণাম করেই মেঝেতে বসে পড়লেন এবং ঝুড়ি থেকে প্রত্যেকটি আম বের করে মহাপুরুষজীকে দেখাতে লাগলেন আর নামের ব্যাখ্যা করে কদিনে পাকবে, কখন কাটতে হবে, কিভাবে খেতে হবে—সব বলে যেতে লাগলেন। এইভাবে তিনি প্রত্যেকটি আম দেখিয়ে দেখিয়ে অতি সন্তর্পণে মেঝেতে রাখলেন। দেখতে দেখতে মেঝে আমে ভরে গেল। তিনি বললেন: "এসব আম আমি নিজের হাতে কেটে ঠাকুরকে খাওয়াব। এরা এসব আম কাটতে পারবে না। কোন আম কাটতে হবে ভোরবেলা, কোন আম ১০টায়, কোন আম দুপুরে, আবার বিকালে বা রাত্রে। কোন আম তৈরি হবে তিনদিন পরে, চারদিন পরে বা পাঁচ/ছয় দিন পরে। সেসব আমের গায়ে লেখা আছে। তা দেখে দেখে আমি নিজেই আম কেটে ঠাকুরের ভোগে দেব। কোন আম খোসা ছাড়িয়ে কাটতে হবে। আমি ভাল চাকু সঙ্গে এনেছি। কোনটা আবার কাটতে হবে বঁটি দিয়ে।" তিনি প্রায় পঞ্চাশ রকমের আম এনেছিলেন—ছোট বড় নানা আকৃতির। অধিকাংশ আমই সবুজ রং। তিনি সেবার মঠে ছয়/সাত দিন বাস করে রোজ আম কেটে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দিতেন। পরে টুকরো টুকরো করে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হতো। প্রত্যেকটি আমই বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে অনুপম। আমের মধ্যে যে এত রকমারি আছে তা কারোরই জানা ছিল না। মহাপুরুষজীও ঐ আম খেয়ে বলেছিলেন: "এত বয়স হয়েছে, কিন্তু কখনো তো এমন ভাল আম খাইনি। কোন আম এত মিষ্টি যে, খেয়ে জল খেতে হয়। গঙ্গাধর এবার ঠাকুরকে নূতন জিনিস খাওয়াল।"

একদিন গঙ্গাধর মহারাজ বেলা দশটা নাগাদ আধখানা আম একটি প্লেটে করে এনে বললেন: "দাদা, দাদা, এক্ষুণিই এই আমটুকু খান। আমি ঠাকুরের ভোগের জন্য আম পাঠিয়ে দিয়েছি। দেরি করলে এর স্বাদ পাবেন না। এক/দুই ঘণ্টা পরে স্বাদ বদলে যাবে। এক্ষুণি আমটি তৈরি হয়েছে—তাই কেমন মিষ্টি গন্ধ ছেড়েছে।" বলতে বলতে মহাপুরুষজীর মুখের কাছে প্লেটটি ধরলেন। মহাপুরুষজীও বালকের মতো তখনি হাতে করে এক টুকরো আম মুখে দিয়ে বললেন: "গঙ্গাধর, এ যেন অমৃত খাচ্ছি! আহা, কী স্বাদ আর কী মিষ্টি গন্ধ!" বলে সব আমটুকু খেতে লাগলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! তৃপ্তিতে ও আনন্দে গঙ্গাধর মহারাজের মুখমণ্ডল লাল হয়ে

উঠল। আমটির রংও ছিল সিঁদুরে লাল। মহাপুরুষজী তখন বৃদ্ধ হয়েছেন, গঙ্গাধর মহারাজও বৃদ্ধ। কিন্তু তখন তাঁদের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন দুজনেই বালক—শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে মিলিত দুটি ভাই।

ঐকালেও গঙ্গাধর মহারাজ প্রতিদিন মহাপুরুষজীকে বেদপাঠ শোনাতেন এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের তাঁর হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণকাহিনী শুনিয়ে আনন্দ দিতেন, সারগাছি আশ্রমের গোড়ার ইতিহাসও বলতেন। তিনি তখনো ছোট ছোট অনাথ বালকদের নিজের হাতে শৌচ করিয়ে দিতেন, তাদের মুখ-হাত-পা ধুইয়ে দিতেন, আবার কাপড়চোপড় কেচে দিতেন, কাপড় পরিয়ে দিতেন। নিজের হাতে তিনি তাদের জলখাবারের মুড়ি পরিবেশন করতেন। যেমন বাংলার ঘরে ঘরে মায়েরা নিজ ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন করে, তিনিও তেমনি ঐ অনাথ বালকদের জন্য করতেন। ঐ বালকরা সকলেই তাঁকে 'বাবা, বাবা' বলে ডাকত। তাদের সব আবদার, মান-অভিমান, ঝগড়াবিবাদ 'বাবা'র কাছে। ঐ মা-বাপ-মরা ছেলেদের তিনিই ছিলেন 'বাবা-মা'। তিনি তাদের সন্তানবৎ স্নেহ করতেন—তাঁর সব অপত্য স্নেহ ঐ অনাথ বালকদের কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হতো। তাঁর আহারাদির কোন পৃথক ব্যবস্থা ছিল না; অনাথ বালকদের জন্য যা রান্না হতো, তাই তিনি তাদের নিয়ে একসঙ্গে বসে খেতেন। তাঁকে দেখে প্রাচীনযুগের মুনিঋষিদের কথাই মনে হতো। মুনিঋষিরা যেমন তাঁদের শিষ্যদের সর্ববিধ কল্যাণসাধনে তৎপর ছিলেন—স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজও তাঁর আশ্রমের অনাথ বালকদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বামীজী প্রবর্তিত 'নরনারায়ণসেবা'র পূর্ণ রূপায়ণ হয়েছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে।

মহাপুরুষজী একদিন বললেন: "ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে গঙ্গাধরের কী চেহারা হয়েছে দেখছ তো? পিলে-যকৃতে পেটটি ভরে গেছে (তখনকার দিনে সারগাছি খুবই ম্যালেরিয়া-প্রবণ স্থান ছিল)। ওকে কত বলি যে, ওসব ছেড়ে মঠে এসে থাক। তা সে কিছুতেই আসবে না। ঐ অনাথ বালকগুলির সেবায় সে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মায়ের মতো ওদের সেবাযত্ন করছে। স্বামীজীর নারায়ণসেবার আদর্শ কার্যে পরিণত করতে গঙ্গাধর যেভাবে আত্মোৎসর্গ করেছে, তেমনটি আমাদের মধ্যে আর কেউ পারেনি। গঙ্গাধর দরিদ্রনারায়ণসেবায় তিলে তিলে নিজের প্রাণটি উৎসর্গ করেছে।" ঐসময়ে মহাপুরুষজী মঠে গঙ্গাধর মহারাজের ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলতেন: "গঙ্গাধর ওখানে কিছু খায় না। ভালমন্দ যা হয় ছেলেদেরই মুখে তুলে ধরে। একে তো আশ্রমের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, সবসময়ে পেট ভরে খাবারই জোটে না। হিমালয়ে তিব্বতে ক্রমাগত কয়েক বৎসর কঠোরতা করে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে—এখন আবার ম্যালেরিয়ার ডিপো সারগাছিতে ভুগে ভুগে গঙ্গাধরের শরীরের অবস্থা দেখছ তো। পেটটা পিলেতে ভর্তি। ওঁকে ভাল করে খাওয়াও, খুব সেবাযত্ন কর—ওতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে।" মহাপুরুষজীর মমতামাখা কথাগুলি সকলেরই অন্তর স্পর্শ করত। গুরুভাইদের মধ্যে কী গভীর ভালবাসাই না ছিল!

মহাপুরুষজী সকলকে বলেছিলেন গঙ্গাধর মহারাজের কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে। তাই একদিন সন্ধ্যার পরে মঠের সব সাধু-ব্রহ্মচারী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কাছে সমবেত হয়ে তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলতে অনুরোধ করায় তিনি বলেছিলেন: "আমি যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রথম যাই, তখন আমার বয়স ষোল/সতেরো বৎসর মাত্র। তিনি যে ভগবান ছিলেন, তা তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই ছিল—সেজন্য নিরামিষ খেতাম, যোগ-সাধনাদিও কিছু কিছু করতাম। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণঘরে জন্ম, তাই আচারনিষ্ঠা খুব ছিল। একাদশী করতাম। অনেকদিন স্বপাক হবিষ্যিও করেছি। কারো বাড়িতে খেতাম না। রুক্ষ মাথায় তিনবেলা গঙ্গাস্নান করতাম। ঠাকুরের কাছে গেলেই তিনি পঞ্চবটীতে নিয়ে গিয়ে ধ্যান করতে বলতেন এবং কাছে বসে কিভাবে ধ্যানে বসতে হয় তা শিখিয়ে দিতেন। ধ্যান করে আসলেই প্রসাদ খেতে দিতেন, কত আদর করতেন। শনি-মঙ্গল বারে ধ্যানজপ বেশি বেশি করতে বলতেন—শনিবার মধুবার, জপধ্যান করলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। আমি তখন খুব প্রাণায়াম করতাম, তাঁকে সেকথা বলতে তিনি প্রাণায়াম করতে বারণ করলেন। বললেন, 'তোদের ওসব কিছু করতে হবে না—ভগবানের নাম করতে করতেই মনের কুম্ভক হয়ে যাবে। প্রাণায়াম ঠিক ঠিক করতে না পারলে তাতে কঠিন রোগ হতে পারে।' তিনি গায়ত্রীজপের কথা খুব বলতেন। একদিন বললেন, 'রোজ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ করবি। তুই ব্রাহ্মণের ছেলে। গায়ত্রীজপ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' তাঁর কথা শুনে গায়ত্রীজপ বাড়িয়ে দিলুম—তাতে খুব আনন্দ পেতাম।

"আমি তখন হবিষ্যি করি। কালীঘরের প্রসাদ খেতে হবে বলে আমি দক্ষিণেশ্বরে খেতাম না। কৌশলে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে আসতাম। ঠাকুর তা লক্ষ্য করেছেন, তাঁর অজানা কিছুই ছিল না। একদিন সকালে গেছি একটি তরমুজ নিয়ে। তিনি আমাকে দেখেই খুব খুশি হয়ে বললেন, 'কি রে, তুই কি

এক্ষুণিই ফিরে যাবি নাকি?' আমি 'না' বলাতে আরো খুশি হলেন। সেদিন আমায় কালীঘরে প্রসাদ পেতে পাঠালেন। তিনি বললেন, 'যা কালীর প্রসাদ খা গে। গঙ্গাজলে রান্না, মহা পবিত্র।' আমি অবশ্য নিরামিষ প্রসাদই খেয়েছিলাম। তিনি ততক্ষণে আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। ফিরে যেতেই আমায় একখিলি পান দিয়ে বললেন, 'খা, খা। খাবার পরে একটি পান খেয়ে মুখশুদ্ধি করতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়।' আমি তখন হরীতকী দিয়ে মুখশুদ্ধি করতাম, পান আদৌ খেতাম না। তিনি গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। বোধহয় ঐ রাত্রেই আমার জিবে কি লিখে আমায় দীক্ষা দিলেন। তখন আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। আমাতে যেন আমি নেই। রাত্রে তিনি তাঁর পদসেবা করতে বললেন এবং কিভাবে টিপতে হয় তা আমার গা-হাত টিপে টিপে দেখালেন। তাঁর পা টিপতে টিপতে আমি তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলটি আমার কপালে ঘসছি দেখে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ও কি করছিস রে? কপালে অমন করে ঘসছিস কেন?' আমি বললুম, 'লোকে গঙ্গামৃত্তিকা, গঙ্গাজল ও চন্দনাদি দিয়ে তিলক ফোঁটা কাটে, আমিও আপনার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালে তিলক কাটছি।' তা শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগলেন।" ঐদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি আরো অনেক কথা বলেছিলেন, সেসব এখন স্মরণ হচ্ছে না।

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ প্রায় প্রতি বছরই বেলুড় মঠে আসতেন এবং পাঁচ/সাত বা দশ দিন কাটিয়ে যেতেন। তিনি এলেই মঠে আনন্দের হাটবাজার বসে যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ ও তাঁর ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়ে তিনি সকলকে খুব আনন্দ দিতেন। ঐ ভ্রমণের সময় যখনি তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে, তখনি শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছেন। ঐ অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তরকে 'অভীঃ' করেছিল এবং তা শ্রোতাদের অন্তরেও শ্রীরামকৃষ্ণচরণে পূর্ণ আত্মনিবেদন ও নির্ভরতার ভাব দৃঢ় করে দিত।

রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) প্রমুখ সকলেই গঙ্গাধর মহারাজকে নিয়ে খুব আনন্দ করতেন। তাতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে কী গভীর ভালবাসা ছিল—তা-ই প্রকটিত হতো। ঐ স্বর্গীয় ভালবাসার তুলনা হয় না। রাজা মহারাজ ছিলেন রসরাজ। তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে নিয়ে কতভাবে না রঙ্গরসিকতা করতেন। গঙ্গাধর মহারাজও ছিলেন উচ্চাঙ্গের রসিকপ্রবর ও রসজ্ঞ। এইভাবে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত যখনি তিনি বেলুড় মঠে এসেছিলেন, তখনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও পাওয়ার এবং ১৯২৩ সাল থেকে বেলুড় মঠে, বোম্বাই আশ্রমে ও সারগাছি আশ্রমে তাঁর একটু একটু সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক স্নেহ-ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। সেই সূত্রে বহু ঘটনা স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে, কিন্তু সেসব প্রকাশের স্থান এ-প্রবন্ধে তো হবে না। তাতে অনেক ব্যক্তিগত ঘটনাও আছে। প্রত্যেকটি ঘটনাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে প্রাণে নিত্য নব নব অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমাই ঘোষণা করছে। তাতে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্শ্বচরগণের দিব্য সান্নিধ্যই আমরা অনুভব করি এবং ঐ দেবমানবদের সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব সঙ্গত করে চির চরিতার্থতা লাভ করি।

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ তিন/চার বার শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার সময় মুর্শিদাবাদের দশসেরি, আধমনি, ত্রিশসেরি, একমনি বড় বড় পান্তুয়া নিয়ে মঠে এসেছিলেন। ঐ পান্তুয়া দেখার জন্য মঠে সাধু-ভক্তদের ভিড় লেগে যেত। বড় কাঠের বারকোশে করে ঐ পান্তুয়া যখন পুরনো শ্রীঠাকুরমন্দিরে নৈবেদ্যের সঙ্গে ভোগ দেওয়া হতো, তখন খুবই সুন্দর দেখাত। সকলেই ঐ পান্তুয়া প্রসাদ পাওয়ার জন্য আশা করে থাকত। ঐ পান্তুয়া দেখতে যেমন বিরাট, কিন্তু তার স্বাদ তত ভাল ছিল না। একমনি পান্তুয়ার অন্তত এক-দেড় ইঞ্চি পুরু শক্ত পোড়া ছাল বড় দা দিয়ে ছাড়িয়ে বাদ দেওয়ার পর বাকি অংশ পাঁউরুটির মতো টুকরো করে কাটতে হতো। অত মোটা শক্ত ছাল ভেদ করে তাতে বেশি রস ঢুকতে পারে না, তাই ছোট পান্তুয়ার মতো তা অত রসালো নয়, খেতেও তত মিষ্টি লাগে না—রসে ডুবিয়ে খেলে ভাল লাগে।

ঐ পান্তুয়া ভাজার প্রণালীতেও বেশ নতুনত্ব আছে। বড় কড়াইতে বেশি করে ঘি ঢেলে দিয়ে একখানি দশহাত কাপড় লম্বালম্বিভাবে রাখতে হয় এবং ঘি গরম হলে বাটা ছানা বড় তাল করে ঐ কাপড়ের ওপর ছাড়তে হয়। কাপড়টি দুজন লোক দুদিক থেকে আগে পিছু টানার ফলে ছানার তালটা গোল হয়ে পান্তুয়ার আকার ধারণ করে। এভাবে সারারাত মৃদু আঁচে ঐ পান্তুয়া ঘিয়ে ভাজা হয়। পরদিন এবং চব্বিশ ঘণ্টা রসে রেখে পরে তা রস থেকে তোলা হয়। এই পান্তুয়া তৈরি হয় মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। অগ্রিম বায়না দিয়ে পান্তুয়া করাতে হয়। গঙ্গাধর মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, স্বামীজী থাকতে তিনি সওয়া মনের দুটি পান্তুয়া মঠে এনেছিলেন—একটি ত্রিশ সের, আরেকটি বিশ সের। তখন মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাড়িতে। স্বামীজী ঐ বিরাট পান্তুয়া দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের ভোগের পর সকলের সঙ্গে আনন্দ করে ঐ পান্তুয়া খেয়েছিলেন। [ক্রমশ]

সেথা-হেথা

ঈশ্বর সেথা, ঈশ্বর সেথা—
তফাতের এই বোধটাকে ধরে রাখা,
ঠাকুর বলেন, জানবে সে-বোধ অজ্ঞানতায় ঢাকা।
ঈশ্বর হেথা, ঈশ্বর হেথা—
এই ভাবনাটি যে-ভক্ত রাখে ধরে,
জেনে রেখো, তার অন্তর আছে জ্ঞানের আলোয় ভরে।

শোন তবে বলি, এক সে তামাকখোর
বেশ ভারি রাতে নেশার তাগিদে
এক পড়শির ঠেলাঠেলি করে দোর।
কারণটা শোন, টিকে ধরাবার জন্যে আগুন চাই,
আগুনের খোঁজে, সে ভেবে দেখল
প্রতিবেশীটির বাড়ি যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
ঘুমকে শিকেয় তুলে,
খুবই জরুরি প্রয়োজন ভেবে
প্রতিবেশী দেয় দরজাটি তার খুলে।
জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বল?
দরজা খোলালে এই এত রাতে এসে?
লোকটি বলল হেসে,
জানই তো ভাই, তামাকের নেশা আছে,
টিকে ধরাবার মতো আগুন বাড়িতে পাইনি
আসতেই হলো তাই তোমাদের কাছে।
প্রতিবেশী বলে, সে কি গো, তোমার হাতেই তো লণ্ঠন,
আগুন পাওনি, সে কি কথা বাপু,
দোর ঠেলাঠেলি, ছুটে আসা অকারণ?
টিকে ধরাবার আগুন তোমার কাছেই তো, লণ্ঠনে,
সঙ্গে রয়েছে, তবু পড়ল না মনে?

ছবি : সৌরীশ মিত্র
ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

স্থান : অযোধ্যা, সময় : ১৮৯৪। একদিন ভিক্ষা থেকে ফিরে ভিক্ষালব্ধ কচুসিদ্ধ খেয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের কথোপকথন—

খক্ খক্

হরিদা, গলায় পেটে কচুর জ্বালা টের পাচ্ছি ভালই।

মহারাজ, লেবু সেবন করলে আরাম পাবেন।
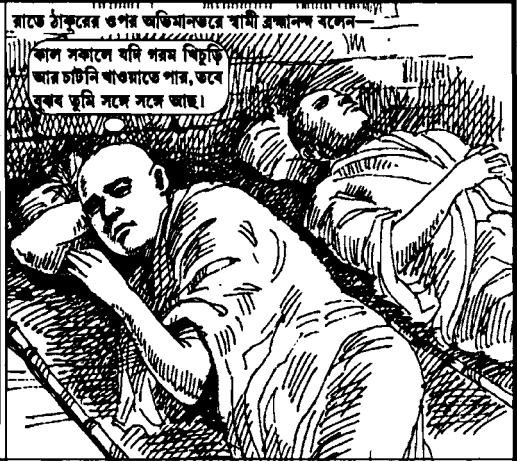
রাতে ঠাকুরের ওপর অভিমানভরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন—

কাল সকালে যদি গরম খিচুড়ি আর চাটনি খাওয়াতে পার, তবে বুঝব তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।

পরদিন সকালে উভয়ে সরযূর তীরে লক্ষ্মণ-বর্জন ঘাটে স্নান সেরে ওঠার পর—

প্রণাম মহারাজ, আমি এক রামাইত সাধু। কাছেই থাকি। আপনাদেরই খুঁজছি। আপনারাই তো কাল একাদশী করেছেন। আপনাদের পারণ করাব, চলুন।

এত সকালে কী পারণ করাবেন বাবাজী?

কৃপা করে ভিতরে আসুন। আপনাদের কৃপায় কাল রামজীর দর্শন পেয়েছি। আমার ২৪ বছরের সাধনা সফল হলো। আপনাদের গরম খিচুড়ি দিয়ে পারণ করাব।

কাল রাত্রে রামজীকে স্বচক্ষে দেখেছি। রামজী বললেন : "আমার খুব খিদে পেয়েছে বাপ্। তুমি এখনি খিচুড়ি রেঁধে ভোগ দাও। আর সরযূর তীরে আমার দুই উপবাসী ভক্ত স্নান করছে। তাদের ডেকে এনে প্রসাদ দাও।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের প্রস্থানের পর, একান্তে—

কে এই দুই মহাপুরুষ? এত বড় ভক্ত তাঁরা যে, রামচন্দ্র স্বয়ং এসে বললেন : "খিদে পেয়েছে"। হে মহামানব, তোমাদের চরণে শতকোটি প্রণাম।

• উৎস : ব্রহ্মানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ •

• চিত্ররূপ : সৌরীশ মিত্র •

আরো তিনটি দুর্লভ পুঁথি

স্বামী প্রভানন্দ*

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চালনের জন্য, তাদের গল্পরুচি মেটানোর জন্য, তাদের চিত্তে ভক্তি-বিশ্বাস সিঞ্চনের জন্য পালাগানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগরক্ষার এই সূত্রটি ধরে সংস্কৃতির ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত ছিল। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্যন্তে পালাগান ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছিল এর বিস্তার। দেবদেবী, তীর্থস্থান প্রভৃতির মাহাত্ম্যবর্ণন ছিল অধিকাংশ প্রাচীন পালাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য। গায়নের দ্বারা প্রচারিত ও প্রসারিত হলেও পালাগান সংরক্ষিত হয়েছিল পুঁথি ও গ্রন্থের মাধ্যমে। এসব ধর্মীয় পালাগানের অনুলিখন পুণ্য ধর্ম-কর্ম হিসাবে বিবেচিত হতো। পুঁথিতে ভণিতা থেকে রচয়িতা, অনুলেখক প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যেত। স্বাভাবিক কারণেই সব পালাগান সমান জনপ্রিয় ছিল না। অপরপক্ষে কয়েকটি পালা রচনাগৌরবে এবং সেইসঙ্গে প্রচারের দাপটে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

আলোচ্য তিনটি পুঁথির দুটির অনুলেখক শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় এবং অপরটির অনুলেখক তাঁর পিতৃদেব পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। কালের ব্যবধানে ভাষা, শব্দের বানান, অক্ষর ইত্যাদি কতকটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। এসব পুঁথির রসগ্রহণ করতে হলে কষ্ট করে অক্ষর চিনতে হবে, বুঝতে হবে লেখার ছাঁদ, বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য। বিচিত্র আকার-প্রকার—অলঙ্করণের দিকে নজর দিতে হবে। কাহিনীর বুননি, শব্দের চয়ন, আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে। তুলট কাগজের ওপর হিরাকস কালি দিয়ে লেখা এসব পুঁথি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির একটি রহস্যঘন অথচ মূল্যবান ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

অতীতে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে[১] শ্রীগদাধরের অনুলিখিত 'হরিশ্চন্দ্রের পালা', 'মহীরাবণের পালা' ও 'সুবাহুর পালা'র সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেইসঙ্গে 'যোগাদ্যার পালা'র কথাও সামান্য উল্লেখ করা হয়েছিল। এর উল্লেখ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ। 'যোগাদ্যা' শব্দের অর্থ মায়াময়ী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী কালী। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন: "উত্তর রাঢ়ের পুরাতন দেবীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর বন্দনা পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের, দ্বিজ দয়ারামের, পরমানন্দ দাসের ও দ্বিজ বাঙ্গারামের ভণিতায়।"[২] অপরপক্ষে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: "অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক যেসব পুঁথি রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে যোগাদ্যাদেবীর বন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা প্রভৃতি 'দুইচারি পাতড়ার' পুঁথিগুলি নেহাত অকিঞ্চিৎকর। 'নেহাত অকিঞ্চিতকর' বলে উল্লিখিত হলেও এই পুঁথি বিষ্ণুপুর সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলে, এমনকি কামারপুকুর গ্রামেও যে প্রচলিত ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।"[৩]

ইদানীং শ্রীগদাধরের অনুলিখিত সমগ্র পুঁথিখানি পাওয়া গেছে। পুঁথির রীতি অনুযায়ী এক পৃষ্ঠায় লেখা, কিন্তু পর পর দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটি পৃষ্ঠার নম্বর। শ্রীগদাধর এই পুঁথির অনুলিখন সমাপ্ত করেছিলেন শনিবার, ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৯ মাঘ অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। সেসময়ে তাঁর বয়স প্রায় তেরো বছর। সময়ের হিসাবে এই পুঁথিখানি তাঁর লেখা চতুর্থ পুঁথি।

বর্ধমান থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ক্ষীরগ্রাম। ক্ষীরগ্রাম ৫১ পীঠের এক পীঠ। সেখানে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর দেহের দক্ষিণ পদাঙ্গুলীমূল পড়েছিল। আবার কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতে, ক্ষীরগ্রামে দেবীর পৃষ্ঠদেশ পড়েছিল। এখানে মহাদেবীর নাম 'যোগাদ্যা'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যোগাদ্যার বন্দনাগীত আছে। আবার 'মহীরাবণবধ' পালায় মহীরাবণের পূজিতা দেবী ভদ্রকালী বা যোগাদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহীরাবণ বধের পর দেবীর ইচ্ছানুসারে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে আদেশ দেন। হনুমান আদেশ পালন করে সেখানে দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন—"মাথায় প্রতিমা করি আন্যা হনুমান।/ অবনী-মণ্ডল মধ্যে ক্ষীরগ্রাম নাম।" গ্রামের মধ্যস্থলে দেবীর মন্দির।

শ্রীগদাধর যে-পুঁথিখানি দেখে লিখেছিলেন, সেটি দ্বিজ দয়ারামের রচিত 'যোগাদ্যা বন্দনা'র একটি প্রতিলিপি। পুঁথি থেকে যতই একের পর এক প্রতিলিপি হতে থাকে, ততই নানাধরনের পরিবর্তন উপস্থিত হতে থাকে। আলোচ্য পুঁথিখানিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এককড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (সং ২০০১) 'যোগাদ্যা বন্দনা'র সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তার সঙ্গে আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিখানির তুলনা করলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

এই গ্রন্থে পাই—

> "বন্দিব যোগাদ্যা মাতা খিরগ্রাম বাসী।
> অবণিতে মহাপিট গুপ্ত বরাণসী॥
> বাম হস্তে খর্পর মা-এর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা।
> লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিল উগ্রচণ্ডা॥"

* *বিদগ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য। বর্তমানে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক।*

শ্রীগদাধরের লেখা পুঁথিতে পাই—

"জয় মা জোগাদ্যা বন্দে খিরগ্রামবাসি।
অবণিতে সিদ্ধপীঠ গুপ্ত বারাণসী॥
দক্ষিণহস্তে খর্পর মায়ের বামহস্তে খাণ্ডা।
রাবণের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা॥"

আবার গ্রন্থে দেখি—

"সাতদিন পূজা কৈল দিয়া সাত বালা।
অবশেষে ক্ষিরগ্রামে করে দিল পালা॥"

অথচ পুঁথিতে দেখি—

"সাতদিন পূজেন রাজা দিয়া সাত বালা।
অবশেষে খিরগ্রামে কর্য্যা দিল পালা॥"

পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে লেখা আছে—'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় সাঃ কামারপুকুর'। তাঁর বন্ধু শ্রীগয়াবিষ্ণুর হস্তাক্ষরে একটি মিশ্রযোগ আছে। কয়েক মাসের হিসাব। পরপৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায়নম্। যোগাদ্যার বন্দনা লিখ্যতে।' —এটুকু প্রাক্‌কথন লিখে শ্রীগদাধর পালাগানের মূলপাঠের প্রতিলিপি লিখেছেন। তুলট কাগজে লেখা ১২ পৃষ্ঠার পুঁথি। এর শেষাংশে রয়েছে পালাশ্রবণের ফলশ্রুতি। সেখানে পাই : "যোগাদ্যার পালা যেবা করয়ে শ্রবণ।/ পরকালে পায় সেই রাতুল চরণ॥/ এই বর মাগি মাগো অভয়চরণে।/ শ্রীগদাধর গোস্বামীকে মাগো করুণা করিবে॥"

অবশেষে প্রতিলিপিকার তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী জুড়ে দিয়েছেন : "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি।" এখানেই শেষ নয়। প্রতিলিপিকার এবার নিজস্ব কিছু বক্তব্য রেখেছেন। রেখেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতেই। তিনি লিখেছেন : "শ্রীগদাধর গোস্বামীর পাপ নাস্তি এবং চন্দ্রাবলি সনে (?) কাননে এক কথা কহিতে ছিলে হে নাগর। যোগিনী-সনে যোগীদের সাথে আছ হে নাগর। বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়ে তাহার কাছে গিয়া বসিতে দিয়া দাঁকে কুট করে[৪] দেয় (?) তোমার চরণ ধরি গড় করি তোমায়, অগ (ওগো) সঙ্গিনী সাথে কথা কহিতেছিলে শ্যাম হে নাগর, আমি দেখিয়াছি তোমায় নাচিতে হে নাগর।"

সতীপীঠ ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত দশভুজার বিগ্রহ। যোগাদ্যার আদি মন্দির গড়েছিলেন বিশ্বকর্মা স্বয়ং। সুড়ঙ্গপথে পাতাল থেকে দেবীকে নিয়ে এসেছিলেন বীর হনুমান। এর পিছনে রয়েছে একটি কাহিনী। রাবণের পুত্র পাতালবাসী মহীরাবণের গৃহদেবী ছিলেন যুগাদ্যা বা ভদ্রকালী। রাম-রাবণ যুদ্ধ চলাকালীন মহীরাবণ একদিন কৌশলে রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করেছিলেন। দেবীর চরণে দুই ভাইকে বলি দেওয়ার আয়োজন করেন মহীরাবণ। অকস্মাৎ বীর হনুমান সেখানে উপস্থিত হন। মহীরাবণকে বধ করে রাম ও লক্ষ্মণকে তিনি উদ্ধার করেন। শ্রীরামচন্দ্র দেবী যুগাদ্যাকে বন্দনা করে জানতে চান কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন? দেবী ক্ষীরগ্রামে সতীপীঠে প্রতিষ্ঠিত হতে চান জানতে পেরে তাঁকে মাথায় করে বীর হনুমান নিয়ে আসেন ক্ষীরগ্রামে। শ্রীরামের আদেশে বিশ্বকর্মা মন্দির নির্মাণ করেন। কালের গ্রাসে প্রথম মন্দির ধ্বংস হয়। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হরি দত্ত দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করেন এবং উগ্রচণ্ডা মূর্তি স্থাপন করেন। কালাপাহাড়ের আক্রমণে মন্দির খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর ১২৪৮ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বর্তমান মন্দির গড়েন এবং বিগ্রহটি প্রতিস্থাপিত করেন।[৫]

পুঁথির সংক্ষিপ্ত কাহিনী : দেবী যোগাদ্যার ঠাঁই ক্ষীরগ্রাম হচ্ছে গুপ্ত কাশী। মায়ের ডান হাতে খড়্গ, আর বাম হাতে অসি। দেবীকে উগ্রচণ্ডা নামে রাবণ চিরকাল পূজা করেছিলেন। তাঁর কৃপায় রাবণ পাতাল জয় করেছিলেন। রাবণপুত্র মহীরাবণের কপাল খারাপ। বীর হনুমান মহীরাবণকে বলি দেন। বাম কাঁধে লক্ষ্মণ, ডান কাঁধে রাম এবং মাথার ওপর প্রতিমা নিয়ে হনুমান ক্ষীরগ্রামে হাজির হন। 'শ্রীরাম' উচ্চারণ করে হনুমান সেখানে দেবীকে স্থাপন করেন। তাঁর আদেশে বিশ্বকর্মা একটি অক্ষয় দেউল রচনা করেন। সেখানকার রাজা ছিলেন হরি দত্ত। মহাদেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। তাঁর ঘুম ভাঙলে দেবী আপন পরিচয় দিয়ে বলেন—"কৈলাস ত্যজিয়া আইলাম নাম ভদ্রকালী।" দেবী রাজাকে পূজা করার পদ্ধতি বলে দেন। সাতদিন ধরে রাজা ধুমধাম করে দেবীর পূজা
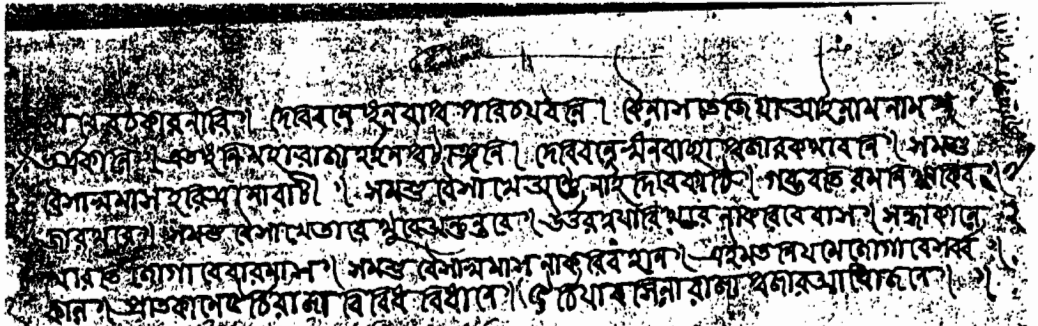
গদাধর চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত 'যোগাদ্যার পালা' পুঁথির অংশবিশেষ

দিলেন। এরপর ক্ষীরগ্রামে পালা করে দেওয়া হলো। সকলের গৃহ থেকে একজনকে দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিতে হবে। গ্রামের অন্য সকলের পালা শেষ হলে এক ব্রাহ্মণের পালা এসে পড়ল। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র। সমস্যা দেখা দিল। পিতা না পুত্র—কে দেবীর উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। এ-বিপদ এড়ানোর জন্য 'স্ত্রীপুত্র লয়্যা দ্বিজ যায় পলাইয়া'। পথে ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী ব্রাহ্মণকে দেখা দিলেন। পালাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলেন—"প্রাণরক্ষা নাহি পায় ক্ষিরগ্রামে রয়্যা।" হেসে দেবী কাত্যায়নী বলেন, যার ভয়ে পালাচ্ছ, আমিই সেই দেবী যোগাদ্যা। ব্রাহ্মণ প্রমাণ চান। ব্রাহ্মণের অনুরোধে দেবী অম্বিকামূর্তি ধারণ করলেন—সিংহারূঢ় দশভুজা দেবী অসুরের বুকে শূল বসিয়ে দিয়েছেন। দেবী প্রতিশ্রুতি দিলেন—"আজি হতে নরবলি না খাইব আমি।" এবং দেবী ধামসার ঘাটে গিয়ে দর্শন দিলেন। স্নান সেরে নিয়ে তিনি এক শাঁখারির কাছ থেকে পাঁচ টাকা মূল্যের শাঁখা কিনলেন। দেবী নিজের পরিচয় দেন : "দুই পুত্র লইয়া আমি থাকি বাপের ঘরে।/ দরিদ্র আমার পতি অন্ন দিতে নারে॥/ দুই পুত্রের নাম কার্তিক গণপতি।/ দুই কন্যার নাম মোর লক্ষ্মী সরস্বতী॥/ বিপ্র বংশে জন্ম আমার নামটি ভবানী।/ সর্বলোকে বলে মোরে গণেশজননী॥" দেবীকে শাঁখা পরিয়ে শাঁখারি তাঁর বাপের বাড়ি অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে যান। ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে বলেন : "এক বই পুত্র নাই কন্যা পাব কোথা।" শাঁখারি ব্রাহ্মণকে সব ঘটনা বলেন। কুলুঙ্গিতে রাখা পাঁচ টাকা ব্রাহ্মণ দেখতে পান ও শাঁখারিকে দেন। এই ঘটনায় চমকে ওঠেন ব্রাহ্মণ। শাঁখারিকে নিয়ে তিনি ধামসার ঘাটে যান। সেখানে জগন্মাতাকে দেখতে পান না। বিপদে পড়ে শাঁখারি খুব কান্নাকাটি করেন। পুঁথিকার বলেন : "বেনের ক্রন্দনে মায়ের দয়া উপজিল। জল হইতে দুই বাহু শঙ্খ দেখাইল।"

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নিজহাতে লেখা পঞ্চম পুঁথিখানি 'পারিজাতহরণ'।

'পারিজাতহরণ' পালাগান সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য উপহার দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন—" 'পারিজাতহরণ' পালার রচয়িতা ভবানীনাথ 'অধ্যাত্মরামায়ণ' রচয়িতার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 'পারিজাতহরণ' আরো একজন লিখিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন 'শ্রীকবি' রসিক।" আরো একটি বাড়তি সংবাদ দিয়েছেন ডঃ সেন। তিনি লিখেছেন : "গোপীনাথ দত্ত ভণিতায় এক কৃষ্ণলীলা রচনার দুইটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। একটি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড', অপরটি 'পারিজাতহরণ'। পুঁথিদুইটি একই নিবন্ধের অংশ বলিয়া মনে হয়।"[৬]

৬×২ অর্থাৎ ১২ পৃষ্ঠার 'পারিজাতহরণ' পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠা সাদা। শুধু লেখা রয়েছে—'শ্রীকৃষ্ণ সহায়', 'শ্রীদুর্গা সহায়'। নাম লেখা না থাকলেও হস্তাক্ষর দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়, শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় এই পুঁথির অনুলেখক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পুঁথির প্রতিলিপির প্রথম ১২ পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত পুঁথির প্রতিলিপির শেষাংশে থাকে কিছু মূল্যবান তথ্য। দুর্ভাগ্য যে, আমরা এসব প্রত্যাশিত মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত।

পুঁথির প্রথমদিককার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রীদুর্গা। অথ পারিজাত হরণঃ।
মুণিবলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
পারিজাতহরণের অপূর্ব কথন॥
এককালে নারায়ণ বিহারকারণ।
রৈবত[৭] পর্বত মধ্যে করিল গমন॥"

এবং শেষাংশ এরকম—নারায়ণের দূত হয়ে নারদ এসেছেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। নারদের কথা শোনার পর ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের ডেকে বলেন :

"শুন দেবগণ এই কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হোয়ে গোপালের দূত॥
দেবের দুর্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মানুষ হইয়া চাহে মুখে নাই লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালে হইল।
পূর্বের কথন সব বুঝি পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ভয়ে লুকাইত।
গোপ অন্ন খেয়ে তেহো গোধন রাখিত।
নবনীত চুরি করি প্রত্যহ খাইত॥"

প্রতিলিপিতে প্রাপ্ত কাহিনী : একদিন নারায়ণ রৈবত পর্বতে বিহার করছিলেন। সেখানে বীণাসমেত নারদমুনি উপস্থিত হন। তিনি কৃষ্ণগীত গেয়ে শোনান। বীণায় বাঁধা ছিল পারিজাত পুষ্প। পুষ্পটি তিনি নারায়ণকে দেন। নারায়ণ রুক্মিণীদেবীকে ডেকে পারিজাত পুষ্প দেন। তিনি ঐ পুষ্প দিয়ে কেশসজ্জা করেন। এমনিতে রুক্মিণীদেবীর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল, পারিজাত পুষ্প কেশে ধারণ করে তাঁর সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল।

সেখান থেকে ফেরার পথে নারদ উপস্থিত হলেন সত্যভামার ঘরে। দ্বারকা নগরে তাঁর বাস। মুনিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন সত্যভামা। নারদ বলেন, তিনি ইন্দ্রের নগরে গিয়েছিলেন এবং পুরন্দর পারিজাত পুষ্প দিয়ে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। সেই পুষ্প তিনি গোবিন্দের হাতে তুলে দিতেই তিনি ভিষ্মকদুহিতা রুক্মিণীকে দান করেন। এখবর শোনামাত্র সত্যভামা ক্ষেপে উঠে তাঁর শরীর থেকে অলঙ্কারগুলি খুলে ফেললেন, পুষ্পের মালা ছিঁড়ে ফেললেন এবং হাহাকার করে ভূমিতলে পড়ে গেলেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি কপালে আঘাত করতে থাকলেন।

এই অবস্থা দেখে নারদ রৈবত পর্বতে ফিরে যান। সেসময়ে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নভোজন করছিলেন। নারদ সত্যভামার খবর বলেন। খবর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিব্রত বোধ

করেন। তাঁর অনুরোধেও রুক্মিণী সেই পারিজাত পুষ্প ফিরিয়ে দিতে নারাজ। শ্রীকৃষ্ণ কি আর করেন! তিনি যান সত্যভামার কাছে, তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তাঁকেও পারিজাত পুষ্প দেবেন—এই আশ্বাস দিতে সত্যভামা উঠে বসেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করে নারদের কাছ থেকে জানতে পারেন, স্বর্গের নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ আছে। গোবিন্দ বলেন, ক্ষীরোদসাগর মন্থন করে যে পারিজাত পুষ্প পাওয়া গিয়েছিল, তাতে তাঁরও তো ভাগ রয়েছে। তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে সে-পুষ্প আনার জন্য নারদকে পাঠান। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বিরক্ত বোধ করেন। তিনি মনুষ্যদেহধারী নারায়ণের এই অনুরোধ একটি অন্যায় আবদার বলে মনে করেন।

রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য। ভরতের প্রার্থনা মঞ্জুর করে "শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক।/ পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক॥"

পুঁথি সমাপ্ত হয়েছে এই কয়েকটি কথা দিয়ে। পুঁথির প্রতিলিপি সমাপ্ত করে লেখক লিখেছেন : "স্বহস্তকং লিখিতং শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। সাকিন কামারপুকুর।" এটি শ্রীগদাধরের পিতৃদেব শ্রীক্ষুদিরামের লেখা অনুলিপি। লেখার তারিখ জানা যায় না। তবে এটুকু অনুমান করতে দ্বিধা নেই, ক্ষুদিরাম সেসময়ে কামারপুকুরের বাড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষুদিরামের জন্ম ১৭৭৪-১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে, কামারপুকুরে বসবাস ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে। রামেশ্বর তীর্থযাত্রা সমাপ্ত

গদাধর চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত 'পারিজাতহরণ' পুঁথির অংশবিশেষ

আরো একটি পুঁথি আমাদের হস্তগত হয়েছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯×২ অর্থাৎ ১৮। পৃষ্ঠার আকার একই। কোন পৃষ্ঠায় ৯টি পঙ্‌ক্তি, কোন পৃষ্ঠায় ১২টি। ছন্দোবদ্ধ, কিন্তু মাত্রা বিভিন্ন। এই পুঁথিতে বলা হয়েছে, 'গয়াশ্রাদ্ধ রামায়ণ' বা শুধু 'গয়াশ্রাদ্ধ' কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী রচিত। কিন্তু প্রচলিত মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের যেসব সংস্করণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে এর সন্ধান মেলে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায় নিম্নোক্ত কাহিনী। চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পর্ণকুটিরে বাস করছিলেন। অকস্মাৎ একদিন ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। শ্রীরামের প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ জানান দশরথের অকালমৃত্যুর দুঃসংবাদ। শুনে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ তিনজনেই মূর্ছা যান। বশিষ্ঠের নির্দেশে তাঁরা তিনদিন অশৌচ পালন করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ করার জন্য শ্রীরাম প্রস্তুত হন। বশিষ্ঠ বলেন : "সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে।/ লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন মতে॥" শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে ফল্গুনদীর তীরে গমন করেন। "তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ।/ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ॥" শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করে শ্রীরাম পিতৃপিণ্ড ফল্গুর জলে সমর্পণ করলেন। পিতৃসত্য পালন করে শ্রীরাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ভরতকে বলেন অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে

করে তিনি কামারপুকুরে বাস করতে থাকেন ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম পায়ে হেঁটে গয়াধাম গিয়েছিলেন। চৈত্রমাসের শুরুতে সেখানে পৌঁছে পিতৃপুরুষদের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করেন। তিনি সেখানে মাসাধিক কাল বাস করেছিলেন। যেদিন তিনি ক্ষেত্রকর্ম সম্পূর্ণ করলেন, সেদিন রাতেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান গদাধরের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন—তিনি ক্ষুদিরামের পুত্ররূপে জন্ম নেবেন এবং তাঁর সেবা গ্রহণ করবেন। এই রোমহর্ষক দেবস্বপ্নের সংবাদ বহন করে ক্ষুদিরাম ফিরলেন কামারপুকুরে। তখন তাঁর বয়স ষাটের কিছু বেশি। আমাদের মনে হয়, এই কালেই ক্ষুদিরাম গয়াশ্রাদ্ধের পুঁথিখানির প্রতিলিপি লিখেছিলেন।

পুঁথিতে গয়াশ্রাদ্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী : একদিন কৈলাসে পার্বতী শঙ্করকে অনুরোধ করেন রামায়ণকীর্তন অর্থাৎ রঘুনাথের গয়াকীর্তি বিষয়ক কাহিনী শোনানোর জন্য। শঙ্কর মনের আনন্দে রামায়ণ কাহিনী বলতে থাকেন। ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় করে অযোধ্যায় গেলেন। এদিকে সীতাদেবী ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র বনবাসে গেলেন। রামচন্দ্রের মনের খেদ, পিতা পুত্রশোকে মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর কোন পারলৌকিক ক্রিয়া তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে করতে পারলেন না। স্থির করেন, গয়াতে গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন।

তাঁরা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে গয়াতীর্থে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণের অনুরোধে রামচন্দ্র গয়ার স্থানমাহাত্ম্য বলতে থাকেন।

গয়াসুর জন্ম থেকেই দেবতাদের ভয়ের কারণ হয়েছিল। ব্রহ্মার বরে তার জন্ম। ষাটহাজার বছর ধরে সে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেছিল। ব্রহ্মা তাকে বর দিতে চান। "অসুর বলেন কর অজর অমর।/ যেন বিষ্ণুচরণ ধরি মস্তক উপর॥/ কুবের বরুণ যম দেব পুরন্দর।/ কেহ যেন নাই আঁটে সংগ্রাম ভিতর॥" তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে ব্রহ্মা ঘরে ফেরেন। এদিকে দেখা গেল, মত্ত হস্তির মতো গয়াসুরের বল। তার ভয়ে দেবতারা পালিয়ে যান। ইন্দ্র, কুবের, বরুণ প্রমুখ দেবতারা গয়াসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লণ্ডভণ্ড হয়ে যান। সব দেবতা নারায়ণের কাছে উপস্থিত হন। হাতজোড় করে বলেন : "তোমার সৃষ্টি নষ্ট হইল অসুরে দিয়া বর।" তখন চক্রপাণি স্বয়ং গরুড়ের পিঠে চেপে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। "দক্ষিণপদ দিলা তার মস্তক উপর॥/ বিষ্ণুর চরণ অসুর মস্তকে ধরিল।/ হরিধ্বনি করি অসুর নাচিতে লাগিল॥" দেবতারা খুশি। কারণ, অতি সহজেই গয়াসুর বশে এসে গেল। "বিষ্ণু বলেন থাক অসুর পাতাল ভুবনে॥/ বাহির হইলে আমি বধিব পরাণে।" গয়াসুর বিষ্ণুর আদেশ মেনে নেয় একটি শর্তে। অসুরের নিবেদন : "এথা পিণ্ডদানে নরের হইব মুকতি।" "চারক্রোশ গয়াসুরের মস্তক প্রসর"—সে-

সময়ের মধ্যে এসে ফল ফুল দিয়ে পিণ্ড দেবেন। কিন্তু রাজা দশরথের দেরি সয় না। "রাজা বলেন বিলম্ব আমি সহিতে না পারি। বালির পিণ্ড দেহ মাগো জনক-ঝিয়ারী।" রাজা তাঁকে শাপ দেবেন বলে ভয় দেখান। কি করেন। অসহায় সীতা বালির পিণ্ড শ্বশুরের হাতে তুলে দেন। সাক্ষী রাখেন আশপাশের ফল্গুনদী, বটবৃক্ষ, সংপা গাছ ও তুলসী গাছকে। সে-পিণ্ড দশরথ অমৃত বলে গ্রহণ করেন। তিনি মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে যান। "সাধু সাধু আকাশে ডাকেন দেবগণ।/ সীতার মস্তকে কৈলা পুষ্প বরিষণ॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য। দুই ভাই ভিক্ষা করার জন্য মুনির নগরে গেলেন। নারীমুখ দেখতে চান না—এই কারণে লক্ষ্মণ নগরে প্রবেশ করলেন না। কোদণ্ড হাতে রাজপুত্র শ্রীরাম নগরে প্রবেশ করলেন। মুনিগণ প্রাতঃকালে তপস্যা করতে বেরিয়ে গেছেন। মুনিপত্নী ও কন্যাগণ ভিক্ষার্থী শ্রীরামের অপরূপ সুন্দর মূর্তি দেখে বিমোহিত। এক বৃদ্ধ মুনিপত্নী তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। শোনা মাত্র বিভিন্ন জন শ্রীরামকে ভিক্ষা দিতে থাকেন। পদ্মাবতী নামে এক মুনিপত্নী নতুন কাপড় দেন ভিক্ষার দ্রব্য বেঁধে নেওয়ার জন্য। শ্রীরাম ভিক্ষা নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে সকলে কাঁদতে থাকেন। "কেহ বলে রামকে গলায় গাঁথি রাখি।/ কেহ বলে রামের নূপুর হয়ে থাকি॥" শ্রীরাম তাঁদের সান্ত্বনা দেন।
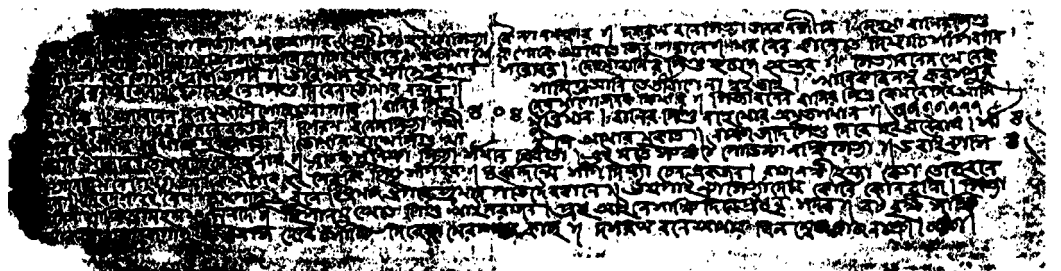
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত 'গয়ার শ্রাদ্ধ' পুঁথির অংশবিশেষ

কারণে গয়ার চারক্রোশ জুড়ে এই মহাতীর্থ—পিণ্ডস্থান। এই মহাতীর্থে রামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করার সঙ্কল্প করেন।

তাঁরা তিনজনেই গেলেন ফল্গুনদীর তীরে। সেখানে অক্ষয়বটের মূলে সীতাদেবীকে রেখে দুভাই পিণ্ডের সামগ্রী — আতপচাল, ঘি, কলা, মধু ভিক্ষা করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। দুটি দৃশ্যমঞ্চ উন্মোচিত হলো। প্রথমটি সীতাদেবীকে কেন্দ্র করে। তিনি ভাগ্যের পরিহাসের কথা ভাবেন—রাজকুমার রামচন্দ্র ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন। তাঁর চোখে জল। বালির পিণ্ড তৈরি করে তিনি ভাবেন, এইভাবেই তো রামচন্দ্র পিণ্ডদান করবেন। তাঁর দুই হাতে বালির পিণ্ড। হঠাৎ দেখেন, দুটি হাত পেতে মৃত দশরথ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। "দেহ দেহ বলি রাজা দুটি হাথ পাতে।" সীতা শ্বশুরকে অনেক বুঝিয়ে বলেন, তিনি গুরুজনকে বালি খেতে দিতে পারবেন না। আরো বলেন, দুই ভাই অল্প

ভক্তাধীন শ্রীরাম শেষপর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দেন—"সবাকার প্রেমভক্তি বুঝি নারায়ণ।/ রাম বলেন প্রতিদিন পাবে দরশন॥/ বিরলে বসিয়া সবে করিলে স্মরণ।/ গুপ্তবেশে সবাকারে দিব দরশন॥" শ্রীরাম চলে যান। কিছুক্ষণ পরে মুনিগণ ফিরে আসেন। সব কাহিনী শুনে তাঁরা চমৎকৃত হন। তাঁরা ধ্যানযোগে ঘটনার সত্যতা জানতে পারেন। মুনিগণ বলেন : "এতকাল তপ করি না পাই দরশন।/ ঘরে বসি তোমরা পাইলে দরশন॥"

এদিকে শ্রীরাম ভিক্ষালব্ধ সবকিছু লক্ষ্মণের হাতে তুলে দেন। তাঁরা দুজনে ফল্গুনদীর তীরে এসে সীতাদেবীর কাছে শোনেন বিস্ময়কর ঘটনা। শোনেন যে, শ্রাদ্ধকর্ম সব সমাপ্ত। প্রয়াত রাজা দশরথ পিণ্ড গ্রহণ করে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছেন। সীতাদেবী বিস্তারিত ঘটনা বলেন। শ্রীরাম ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ

চান। আরক্তলোচন শ্রীরাম সীতাদেবীকে বলেন ঃ "আমি মানি সাক্ষী যদি দেয় কোনজন।/ নতুবা তোমারে আমি করিব বর্জন॥" সীতাদেবী প্রত্যক্ষদর্শী চারজনকে সাক্ষ্য দিতে বলেন। শ্রীরামের ক্রুদ্ধমূর্তি দেখে ফল্গুনদী, সংপা ও তুলসী বৃক্ষ সাক্ষ্য দিতে চান না। সীতাদেবী এদের তিনজনকেই শাপ দেন। সীতাদেবীর শাপবাণীর শক্তি দেখে ভীত বটবৃক্ষ সাক্ষ্য দেন। সীতাদেবী তাঁকে বর দেন। আকাশবাণীতে দেবী সরস্বতী ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করেন। লক্ষ্মণ বলেন ঃ "সীতা মিথ্যা কহিলে তবে ধর্মের অন্যথা।" শ্রীরামও খুশিমনে সীতাকে বলেন ঃ "বাপে মুক্ত করিলে তুমি কিবা দিব গিয়া।"

তখন শ্রীরাম সঙ্কল্প করেন বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃলোকের জন্য শ্রাদ্ধ করবেন। হংস নামে এক মুনিকে তিনি পুরোহিত নির্বাচন করেন। হংস মুনি মন্ত্র পড়েন, শ্রীরাম শ্রাদ্ধকর্ম করেন। গয়ার নাম হলো 'রামগয়া'। পিতৃলোকের সকলে এসে পিণ্ড গ্রহণ করে মুক্ত হয়ে স্বর্গে স্থানলাভ করেন। তাঁরা সকলে শ্রীরামকে আশীর্বাদ করেন। ইন্দ্র আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেন। পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হবে, কিন্তু শ্রীরামের কাছে কিছু নেই। সীতা তাঁর কানের দুল দিলেন, লক্ষ্মণ দিলেন মানিকের আঙটি। শ্রীরাম তাঁকে তালপাতার ওপর লিখে দিলেন এক বিরাট সম্পত্তি। বললেন চোদ্দবছর পর তিনি যখন অযোধ্যায় ফিরবেন, সেসময়ে এই সম্পত্তি পাবেন। শ্রীরামের ভাষায় ঃ "শর্ত পার হইয়া আমি যাব নিজ দেশে॥/ আমার দেশে করিবে আগুসার।" ব্রাহ্মণ মহাখুশি। বিদায় নিলেন। পিতৃলোকের ত্রাণ করে তিনজন হাঁটতে হাঁটতে চিত্রকূট পর্বতে উপনীত হন। "চিত্রকূট পর্বত হৈল বৈকুণ্ঠ সমান।"

এই পালাকাহিনীর একটি পরিশিষ্ট আছে। সেটি অনুধাবনযোগ্য। এর সূত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। পূর্বে বলা হয়েছে, ক্ষুদিরাম যথাবিহিত সকল ক্ষেত্রকার্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদান করলেন। সেদিন রাতে তিনি এক দেবস্বপ্ন দেখলেন ঃ "অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সসম্ভ্রমে সংযতভাবে দুইপার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন।" যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে হৃদয়ের আবেগে ক্ষুদিরাম নানা স্তুতি ও বন্দনা করতে থাকলে ঐ দিব্য পুরুষ বীণানিস্যন্দী মধুর স্বরে তাঁকে বলতে লাগলেন ঃ "খুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।" কল্পনারও অতীত ঐ কথা শুনে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেও পরক্ষণেই নিজের দারিদ্র্য চিন্তা করে ক্ষুদিরাম বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। সেবাপরাধী হওয়ার ভয়ে অত বড় সৌভাগ্যও তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন দেখে ঐ অ-মানব পুরুষ পুনরায় বললেন ঃ "ভয় নাই ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।"[৮] কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষুদিরাম জানতে পারেন চন্দ্রাদেবীরও এক দৈব অভিজ্ঞতার কথা। একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন চন্দ্রাদেবী ও ধনী। শিবের অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত এক দিব্যজ্যোতি চন্দ্রাদেবীকে ছেয়ে ফেলল। তিনি জ্ঞান হারালেন। চন্দ্রার মনে হলো, ঐ জ্যোতি তাঁর উদরে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে চন্দ্রা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি (১২৪২ সালের ৬ ফাল্গুন) চন্দ্রাদেবীর কোল আলোকিত করে আবির্ভূত হলেন শ্রীগদাধর ওরফে শ্রীরামকৃষ্ণ। ❑

তথ্যসূচি

১ আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ, সং ১৯৯৭, পৃঃ ১৯-৩১
২ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৫১৭, ৪৩০
৩ বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২১৫-১২১৬
৪ তুলনীয় ঃ 'দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলী হয়ে'।
৫ বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি—এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৬৬-১৭২
৬ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৩৭৬, ৪৩৭
৭ কৃষ্ণের পুত্রের জন্ম এই পর্বতশিখরে। সমুদ্রের কাছে অবস্থিত এই পর্বতের নাম 'রৈবত' বা 'রৈবতক'।
৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ১৪০০, পৃঃ ৩০

জপ

সুমনকুমার নায়েক

তোমার নামেই জপবো মালা
বসে দিবানিশি,
আলোক-ছায়া, অসীম-সসীম
যেথায় গেল মিশি।
সবাই যখন তোমার পরে,
কলরবে উঠবে ভরে—
তখন আমি তোমার ধ্যানে
করব তোমার স্তব,
বিনা ভাষায়, বিনা মন্ত্রে
করব তোমার জপ।

কণ্ঠ যখন রুদ্ধ হবে
অসাড় হবে স্বর,
চোখে যখন আসবে ছেয়ে
গভীর অন্ধকার—
তখনো তোমায় মনে মনে,
ডাকব বিনা প্রয়োজনে—
পূজব তোমায় প্রেমের ফুলে
না করে কোন রব,
তোমার পায়ে বিকিয়ে দেব
আমার যত সব।

বিবেক-উদয়

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্কাশিহর মৃত্যুর ভয় দুয়ারে ফেলেছে ছায়া
ঘাতকের হাতে চোরা খঞ্জর রক্তে পিছল পথ
অন্ধকারেতে কেঁপে ওঠে বুক, মৃত্যু ধরেছে কায়া
আনন্দময় অমৃতপুরুষ, দেখাও আলোর রথ।

চোখের তারায় বিশ্বাস নেই, ফুটেছে বন্য ক্রোধ
সহনশীলতা প্রত্ন আধারে, হিংসায় প্রতিশোধ
ভালবাসা সেই শ্বেত শতদল, কোথা পাব খোঁজ তার
আনন্দময় হে মহাপুরুষ, কর আজ উদ্ধার।

থাবা হয়ে ওঠে কমনীয় হাত, শিকড়ে ধরায় ঘুন
প্রার্থনা নেই, নিবেদন নেই, মৃত্যুর হারপুন
শুধু প্রতিদিন অকারণে কাড়ে অসহায় শত প্রাণ
আনন্দময় পরম ঠাকুর, আর্তের কর ত্রাণ।

হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ুক রোদের শস্যকণা
ভালবাসা যদি বাঁধ ভেঙে দেয়, জীবন কি জাগবে না?
অন্তরে থাক ঠাকুরের বাণী, অমৃত স্বাদ তাতে
বিশ্বাসে আজ বোধোদয় হোক, এস হাত রাখি হাতে।

দুচোখের মাঝে

দিলীপ মিত্র

দুচোখের মাঝে জ্বলে,
অনন্তের আগুন।
এক চোখে সত্য, অন্য চোখে মায়া।
সত্য, যৌবন হারালে মায়া হয়।
মায়া, মৃত্যু হয়ে সত্যকে চেনায়।
এক চোখে জ্ঞান, ভক্তি
ঈশ্বরকে খোঁজা,
অন্য চোখে বিষয়ী চেতনা।
এক চোখ ঘুম কাড়ে,
অন্য চোখ প্রার্থনায় নিমগ্ন প্রহরী।
দুচোখের কেন্দ্রে চেয়ে দেখ
দিবারাত্রির সত্যের, চিরন্তনী শক্তি।

তোমার চরণ

বাদল রায়

এই সংসার-নৌকাবিহার
জোয়ার-ভাটার টানে,
জানি না তো ভিড়বে কোথায়
আদৌ কোনখানে।
ধরেছি হাল শুধুই পেতে
সুখের খোঁজেই মন,
তাই তো তোমায় ডাকার সময়
পাইনি অনুক্ষণ।
ফেলছি নোঙর ভোগের নীড়ে
কতই বেঁধে বাসা;
ক্লান্ত এখন শরীর, এ-মন
ফুরায় না তো আশা?
আয়নাতে যেই দাঁড়ায় হৃদয়
দেখিই মলিন হাসি;
কেউ তো কোথাও নেই বাজাবার
আনন্দ-বীণ, বাঁশি।
বৃথাই বুঝি জীবন দিলাম
সুখেই—শান্তি খুঁজে;
তোমার চরণ স্পর্শ ছাড়া
আর তো পারি না যে।

মৃণাল অভিনিবেশ

হৃষীকেশ বিশ্বাস

আমি নিজেই নিজের স্থপতি
সুখের কথা যদি বল
আমার কোন অসুখ নেই
আমার আছে অশেষ সহ্যশক্তি
হতে পারি আমি থেকে থেকে উদাসীন
তবুও আমার কাছে আছে শান্তিসুধা
আমার সাহস আছে
আমার সঙ্কল্প আছে
আমার সংযম আছে
আমার ফুলের পরাগরেণু মাখা চৈতন্য আছে
কামরাঙা সবুজ বিদ্যার বিস্তারের জন্য
বস্তুত আমি বদ্ধপরিকরও নই
সুখের কথা যদি বল
আমার কোন ঈর্ষা নেই
আমার আছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি
আমার আছে যত নম্র পরমহংস কথা
আমার আছে তীব্র ইচ্ছাশক্তি
আরো আছে, মৃণাল অভিনিবেশ।

উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য

জয়ন্তী সিংহ

॥১॥

ঠাকুরের উপদেশ অমৃত সমান,
উপমার নাই শেষ মধুর মহান।
সামান্য পাঁকাল মাছ ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
পানকৌড়ি, হংস মাঝে অনুভূতি রেখা।
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর তাহার মাঝারে,
নিহিত রয়েছে যাহা বোঝান ভক্তরে।

॥২॥

গোলমালে গোল বাদে নাও শুধু মাল,
সংসারে করিবে বাস যেমন পাঁকাল।
পাঁকাল মাছটি দেখ থাকে সদা পঙ্কে,
লাগে না তো মলিনতা তার দেহঅঙ্কে।
সূর্যের প্রত্যাশী হয়ে রহে সে উজ্জ্বল,
মানুষ ঈশ্বরমুখী রবে অবিকল।

॥৩॥

করিবে সংসারে বাস যথা পিপীলিকা,
বালি, চিনি মিশে থাকে শুধু চিনি রাখা।
নিত্য ও অনিত্য লয়ে রয়েছে সংসার,
'সং' ছেড়ে নিতে হবে জীবনের 'সার'।
ষষ্ঠ পদে পিপীলিকা দ্বিপদে মানুষ,
সংসার-প্রাঙ্গণে যেন থাকে ঠিক হুঁশ।

॥৪॥

নিত্যসিদ্ধ ভক্তবৃন্দ মৌমাছি সমান,
কেবল ফুলেই সে যে করে মধুপান।
হরিরস পান করে সিদ্ধ ভক্তগণ,
মাছি হলো সংসারের লোকসাধারণ।
বসে মাছি বিষ্ঠায় ফল ফুলেও রাজে,
সাধারণ ভক্তি করেও সংসারেতে মজে।

॥৫॥

পানকৌড়ি মাছ খেতে ডুব দেয় জলে,
মাছ মুখে তীরে ওঠে জল ঝেড়ে ফেলে।
দেহতে থাকে না তার কিছু জলকণা,
এরূপে সংসারমাঝে কর আনাগোনা।
সৎ সঙ্গে সুধাপানে থাক নিশিদিন,
সংসারে কর্তব্য করি হবে না মলিন।

॥৬॥

জলে দুধে মিশে থাকে তবু কি কৌশলে,
হংস নেয় দুধটুকু নীরটুকু ফেলে।
সেরূপ বিষয়রস ত্যাগ করি সদা,
চিদানন্দে মনটুকু পড়ে যেন বাঁধা।
উপমার মালা গেঁথে গেছেন ঠাকুর,
বিষয় আসক্তি মোহ হয় যেন দূর।

যে-সুরে বাজাও

ভক্তি দেবী

জানি না কোন্ পুকুরধারে—বাঁশের ঝাড়ে
জন্মেছিলাম এসে
বিন্ কারণে ভালবেসে
নিজের হাতে নিলে তুলে
বানিয়ে নিলে বাঁশি—
তোমার হাতের ইঙ্গিতে যে
উঠল বেজে সঙ্গীতে সে
সাতটা সুরে বাজল আমার হৃদয় অভিলাষ-ই।

অয়ি রাজাধিরাজ!
সন্ধ্যাবেলায় তাই তো গো আজ
আমার শুধু চাওয়া—
তোমার কাছে জানাতে চাই
আপন মনের শেষ কথাটাই
এটাই আমার এই জীবনের পরমতম পাওয়া।
জনম জনম এমনি করে তোমার বাঁশি হয়ে
আমি বাজব রয়ে রয়ে—
আকাশ ভরে ছড়িয়ে দেব উছল প্রাণের হাসি।

হয়তো আবার তারই সাথে
গভীর কোন তিমির-রাতে
অঝোর-ঝরণ কান্না আমার হেথায় রেখে যাব
সেই কাঁদনে দুটি চরণ
ধুইয়ে তোমার নেবই শরণ
যে-সুর বাজাও তাতেই আমি
তোমার পরশ পাব।
বুক ভরে তাই সপ্তসুরে তোমারই গান গাব।

মাভৈঃ!

বিকাশরঞ্জন চৌধুরী

আঁধারে আর ভয় পাই না,
চোখ আর বন্ধ করি না।
এখন কেবল তাঁর সাথে—
মনের বাঁধন শক্ত করি।

জানি, এ ঝড় ক্ষণস্থায়ী
নিশ্চিত এবার থামবে,
আবার সূর্য উঠবে,
আসবে নূতন সকাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের চার রসদ্দার পাঁচ সেবায়েত

দিলীপকুমার ভারতী*

[পূর্বানুবৃত্তি]

■ চতুর্থ রসদ্দার ■

এক্ষেত্রে দাবিদার দুজনঃ একজন হলেন পূর্বোক্ত পানিহাটীবাসী মণিমোহন সেন—যিনি মথুরবাবুর মৃত্যু ও শম্ভুবাবুর সেবাধিকার লাভের মধ্যবর্তী প্রায় ছয়মাস কাল ঠাকুরের দ্রব্যাদি যোগাবার ভার নিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়জন হতে পারেন নেপালের 'কাপ্তান' বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। দুজনের মধ্যে বিশ্বনাথ বা কাপ্তানেরই অগ্রাধিকার। কেন, তা বলতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বিষয়ে একটু বলে নিতে হবে। সংক্ষেপে তা এরকম—

শ্রীরামকৃষ্ণের নিরন্তর এবং একের পর এক সাধনার কালটি ছিল ১২ বছর—১৮৫৫ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ [১২৬২-১২৭৩ বঙ্গাব্দ]। এই সময়কালের মধ্যে তিনি পঞ্চভাব সাধনা, ৬৪ প্রকার তন্ত্রসাধনা-সহ অদ্বৈতসাধনা তো শেষ করেছেনই এবং তার পরেও সাধনা করেছেন। তা হলো—ভাব থেকে ভাবাতীত ভূমিতে (অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত ভূমিতে) ইচ্ছামতো আরোহণ, স্থিতি ও অবরোহণ। এসময়ের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর যেমন বলতেনঃ "এখানকার অবস্থা (আমার উপলব্ধি) বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে—সেসকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে।"[২৩]

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা তাঁর কেমন ছিল? এককথায় উন্মাদ (দিব্যোন্মাদ), নয়তো জড়। অল্প সময়কাল প্রাকৃত ভূমিতে (দ্বৈত ভূমিতে) অবস্থান করলে কিছুটা স্বাভাবিক মানুষের মতো, কিন্তু অস্বাভাবিক আচরণ। এরই মধ্যে তিনদিনে তিনি ইসলামধর্মে সাধনা সম্পন্ন করেছেন। এই অবস্থা তাঁর চলে ছয়বছরেরও বেশি। পরে ১৮৭৩-এর মে মাসে (১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে) ফলহারিণী কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জননীজ্ঞানে ষোড়শীপূজা সম্পন্ন করার পর তাঁর দিব্যোন্মত্ততার অবসান হয়। তিনি শান্তভাব ধারণ করেন। তাঁর অবস্থা হয় সদানন্দ বালকের মতো। ভাবের উদ্দীপন হলেই সমাধিস্থ হন—কখনো ভাবসমাধি, কখনো জড়সমাধি। সমাধিভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে তাঁর বিচরণ। যেন পাঁচবছরের ছেলে—সর্বদা 'মা, মা'! নিজেই বলতেন—পৌগণ্ডদশা।

এই দিব্যোন্মত্ততার কালে তাঁর নিরন্তর সেবা ও পরিচর্যার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তখন ছিলেন মথুরবাবু, যিনি মায়ের স্নেহ ও সেবা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বদা আগলে রেখেছিলেন বললেও কমই বলা হয়। কিন্তু তিনি চলে গেলেন ১৮৭১-এর জুলাইতে। জগদম্বার বালকের তখন অসহায় অবস্থা! মথুরবাবু চলে গেলেও তখন তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দাসী ছিলেন। তিনি অবশ্যই কিছু নজর রেখেছেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তার সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৮৭২-এ অবশ্য শম্ভুবাবু এসে গেলেন। অন্তর্বর্তী কালে ছিলেন মণিমোহন সেন। সুতরাং মণিমোহন কিছুটা রসদ্দারি না করলেও চলে যেত।

কিন্তু সেই কালে অর্থাৎ মথুরবাবুর মৃত্যুর পর ঠাকুরের একান্ত প্রয়োজন ছিল একজনের—যিনি মায়ের পরিচর্যা করতে পারবেন। নিজের গর্ভধারিণী চন্দ্রামণি দেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে ছিলেন, কিন্তু তাঁর বার্ধক্যহেতু সে-কাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় সেই মাতৃপরিচর্যা করতে দক্ষিণেশ্বরে এলেন শ্রীশ্রীমা—দেবী সারদা। তখন তিনি অষ্টাদশী তরুণী। তিনি এলেন ১৮৭২-এর ২৫ মার্চ (১২৭৮-এর চৈত্র মাসে)। তিনি নহবতে শাশুড়ির কাছে থাকতেন আর অন্তরালবর্তিনী থেকে স্বামীর খাদ্য, পথ্যাদি প্রস্তুত-সহ সর্বপ্রকার সেবা করতেন। ছিলেন ১৮৭৩-এর অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত। তারপর তিনি ফিরে যান কামারপুকুরে (একবছর আটমাস পরে)।[২৪] তিনি কঠিন আমাশয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এরই মধ্যে ঘটে গেছে এক আধ্যাত্মিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৮৭৩-এর মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ করলেন ষোড়শীপূজা। এই পূজার পর তাঁর সাধনযজ্ঞ সমাপ্ত হলো। এবং পরের বছর (১৮৭৪) তিনি খ্রিস্টধর্ম সাধনা করে যিশুকে দর্শন করেন।[২৫] তার পর তিনি উচ্চারণ করেন সেই মহাবাণীঃ "মত—পথ" ("যত মত তত পথ")।

সারদাদেবী যেদিন এলেন স্বামীর কাছে, রাত তখন ন'টা, সেদিন তাঁর গায়ে জ্বর। ঠাকুর তাঁকে দেখে ব্যস্ত হলেন। নিজের ঘরে ভিন্ন শয্যায় তাঁর শোওয়ার ব্যবস্থা করলেন আর দুঃখ করে বারবার বলতে লাগলেনঃ "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?"[২৬] অর্থাৎ, সেজবাবু নেই, তাই তাঁর যত্ন হচ্ছে না। আসলে সেজবাবুর স্থান পূরণ করতে এলেন সারদাদেবী। ঠাকুর তখন সত্যই অসহায়, তার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই বলা যায়, এতই অসহায় যে, নিজের শরীররক্ষা করার মতো সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এই কালটি ছিল ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৪। তবে মথুরবাবু ছিলেন ১৮৭১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত, কোন অসুবিধা ছিল না। লক্ষণীয়, তার পরের বছর ১৮৭২-এ এলেন শম্ভুবাবু।

** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কাঁথি-নিবাসী, গবেষক।*

শম্ভুবাবু বাহ্য রসদ্দারি করতেন। তার খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নিরন্তর সেবা ও আহার যোগানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্য এবছরেই (মার্চ ১৮৭২) এলেন শ্রীশ্রীমা। এই কালটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনে সবচেয়ে সঙ্কটজনক কাল (critical period)। কারণ, শরীর থাকলে তো সাধনা এবং সিদ্ধি, তৎপরে গুরুভাবে প্রতিষ্ঠা। এই কালেই রসদ যুগিয়েছেন শম্ভুবাবু—যিনি মাত্র চারবছর রসদ্দারি করেছেন, যেখানে মথুরবাবু চোদ্দ বছর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় ছয়বছরেরও অধিককাল করেছেন। তৎসত্ত্বেও ঠাকুর নিঃসংশয় ও নির্দ্বিধ স্বীকৃতি দিয়েছেন শম্ভুবাবুকে পূর্ণ রসদ্দার বলে এবং তাঁর যে আগমন ঘটবে তা তিনি দিব্য অধ্যাত্মনেত্রে পূর্বেই দর্শন করেছিলেন বলে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং শম্ভুবাবুর পূর্ণ রসদ্দারির মর্যাদালাভ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালের শেষভাগের গুরুত্বের বিচারে।

ষোড়শীপূজার পর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা শেষ হলো, তিনি জপের মালা পর্যন্ত দেবীর (শ্রীশ্রীমায়ের) পায়ে বিসর্জন দিলেন। তিনি শান্ত হলেন, অর্থাৎ তিনি কিছুটা প্রাকৃত ভূমিতে বিচরণ করতে পারলেন। কিন্তু তখনো ছিল পরিবৃত্তিকাল (Transition Period)। সেই কালের দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচমাস। তারপর দেখা গেল পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণকে—সাধারণ লোকের মতো থাকেন, কথাবার্তা বলেন। তবে 'রাজার ছেলে'—'সাততলা বাড়িতে' তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি। এই সাততলায় উঠে যাচ্ছেন, আবার এই নিচতলায় নেমে আসছেন। এই পরিবৃত্তিকালটি শেষ হওয়ার পর শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে ফিরলেন। এটিই বোধ হয় স্বামীকে রেখে কামারপুকুরে দেবী সারদার ফিরে যাওয়ার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। (প্রাকৃত কারণ অবশ্য আমাশয়জনিত পীড়া।)

আমরা দেখি, এই সঙ্কটকালে রসদ্দারি করেছেন নেপালের কাপ্তান যা পরিমাণের বিচারে, অর্থমূল্যে বা রসদ্দারির সময়কালের নিরিখে তুলনামূলকভাবে অসাধারণ মনে না হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতিজনিত কালের বিচারে অনন্যসাধারণ। ১৮৭৩-এর মে মাসে ষোড়শীপূজা করে সাধনা শেষ করলেও তখনো শ্রীরামকৃষ্ণের এক মহা আবিষ্কার বাকি। ওদিকে তাঁর শরীরও দুর্বল, স্বাস্থ্য ভগ্ন সুদীর্ঘকাল সাধনার জন্য। তাঁর নিজের উপমায়ঃ "মত্ত হাতি কুঁড়েঘরের যে-দশা করে।" অতএব শরীরের সেবাযত্নের কিছু প্রয়োজন তাঁর ছিল। সুতরাং সারদাদেবীকে আবার আসতে হলো। তিনি এলেন—১৮৭৪-এর এপ্রিলের (১২৮১-এর বৈশাখ) কোন একদিন।[২৭]

এবছরেই (১৮৭৪) শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রিস্টধর্মে সাধনা করে মাত্র তিনদিনে যিশুকে দর্শন করলেন। যিশু তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর দেহেই মিলিয়ে গেলেন। এই তিনদিন তিনি কালীমন্দিরে যেতেন না। সালটি যে ১৮৭৪, তার উল্লেখ ক্রিস্টোফার ঈশারউডের গ্রন্থে পাওয়া যায়।[২৮] কিন্তু মাসটি জানা যাচ্ছে না—শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরের আসার আগে না পরে। তবে তা ১৮৭৪-এর শেষের দিকে হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পর। এই অনুমানের কারণ পরে বলা হবে।

যাই হোক, ইসলামধর্মে সাধনা তো শ্রীরামকৃষ্ণ আগেই করেছিলেন। এবার করলেন খ্রিস্টধর্মে। তারপরেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো মহাবাণীঃ "যত মত তত পথ"—জগতে এক মহা আবিষ্কার। কিন্তু এই মহান দিব্যবার্তা তো সকলের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরে ভক্তদের কাছে গল্প করেছেন—এসময় তাঁর মনে হতো, কেউ তো তাঁর কাছে এল না। একদিন ছাদে উঠে হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে ডাক দিলেনঃ "তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না।" তারপর বলেছেনঃ "ঐরূপ হইবার কয়েকদিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।"[২৯]

অনেকটা সেরকমই হয়েছিল, তবে হয়তো 'কয়েক মাস পরেই' হবে। কথায় আছে—পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না যান, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হয়। ব্যাপারটা সেরকমই ঘটল। কেশবচন্দ্র সেনের তখন ঈশ্বরীয় পুরুষ বলে খ্যাতি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন (১৫ মার্চ ১৮৭৫) চললেন কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে, যেখানে ব্রাহ্মসমাজের মস্ত নেতা কেশব সেন সশিষ্য সাধনভজনে কিছুকাল রত রয়েছেন। সঙ্গে ভাগনে হৃদয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলঘরিয়া অনেক দূর পথ। যাবেন কিসে? খরচও তো বেশ। মথুরবাবু নেই। শম্ভুবাবু রয়েছেন অবশ্য। তাঁকে বলা হয়তো যেত, কিন্তু বলার আগেই বিশ্বনাথ উপাধ্যায় জানতে পেরে নিজের থেকেই তাঁর গাড়িটি দিলেন। সেই গাড়ি চড়ে দুজনে গেলেন। সেখানে পৌঁছে বেশ মজার মজার কথাবার্তা হয়েছিল। ঠাকুর বলেছিলেনঃ "কেশব তোমার ল্যাজ খসেছে।" অর্থাৎ তুমি সংসার আর সচ্চিদানন্দে—উভয় বিষয়ে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে পার।

আসলে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের তো তখন ভৌত দেহই খসে গেছে, যা আছে তা পূর্ণতই সচ্চিদানন্দ সত্তা—কোনরকমে একটা জীর্ণ, ভগ্ন, ভৌত আবরণে ঢাকা। তাঁর উভয় বিষয়ে নয়, উভয় লোকেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাই তো তিনি এক 'ল্যাজ খসে যাওয়া' ঈশ্বরীয় পুরুষের কাছে এসেছেন। কেশব ঠাকুরের কথায় মোহিত হয়ে গেলেন এবং গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। তারপর তিনি প্রায়ই সশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের বাড়ি—কমলকুটিরে নিয়ে আসেন তাঁর দিব্যসঙ্গলাভ করার জন্য।[৩০] আর তারপর 'সুলভ সমাচার' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় দিনের পর দিন এই দিব্য মানুষটির কথা লিখতে লাগলেন। সমগ্র দেশের মানুষ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা, তাঁর উপদেশ ও উপলব্ধির কথা জানতে পারল। আরো পরে কেশব এবং অপরাপরদের লেখার মাধ্যমে সাগর পেরিয়ে তাঁর বাণী পৌঁছাল ম্যাক্সমুলারের কাছে। তা অবশ্য আরো পরের ব্যাপার।[৩১]

ক্রমে ভক্তেরা দলে দলে আসতে লাগলেন। এঁরা সব অন্তরঙ্গ ভক্ত। এঁদের অধিকাংশই (লাটু মহারাজ ছাড়া) ছিলেন ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা বড় ব্যবসা এবং চাকরি করতেন। এঁরা কিন্তু আসতে লাগলেন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। প্রথম যে-দুজন এলেন তাঁদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্র। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে অন্তত গান শুনতে তো সমাজের সর্বস্তরের লোকই যেতেন—যেত ছাত্ররাও। তাঁরা সকলেই যে ব্রাহ্ম ছিলেন, তা নয়। সেখানে তাঁরা কেশব সেনের বক্তৃতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জেনেছেন এবং পরম্পরায়ও জেনেছেন।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একে একে ঠাকুরের কাছে অনেকেই এসেছেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫-এর মধ্যে। কিন্তু প্রথম ভক্ত যে কেশবচন্দ্র, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেননি, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি কোন বড় কথা নয়। আসল কথা হলো, শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭৪-এ ছাদের ওপর উঠে অন্তরঙ্গ ভক্তদের উদ্দেশে যে-ডাক দিয়েছিলেন, তা কেশবের মাধ্যমে তাঁদের কাছে কিছু দেরিতে পৌঁছাল। ঠাকুরের ডাক কেশবই যেন তাঁর লাউড স্পিকারে বাজিয়ে গেছেন দিনের পর দিন।

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, তাঁর ডাক ব্যর্থ হয়নি। কেশব শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে পরে বলেছেন যে, তাঁর ডাক দেওয়ার 'কয়েকদিন পরেই' ভক্তসকল একে একে উপস্থিত হলো। কেশবের আসা আর চারবছর পর থেকে অন্যান্যদের একের পর এক আসা যদি সমার্থক হয়, তবে একথা বলাই যায় যে, ঠাকুরের ডাক শোনার 'কয়েকদিন পরেই' (আসলে কয়েক মাস পরে) অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একে একে উপস্থিত হয়েছিলেন।[৩২]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের কোন একদিনে তিনি ডাক দিয়েছিলেন। 'কয়েকদিন পরেই' শব্দবন্ধটিকে গুরুত্ব দিলে সে-ডাক তিনি ১৮৭৪-র শেষের দিকেই দিয়েছিলেন। অতএব তা যে শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের (তিনি এসেছিলেন এপ্রিলে) পরেই সম্ভব, তা বোঝা যায়। আমরা বলতে পারি, কেশব প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা কি সকলেই তাঁর ভক্ত? না, তাঁর কাছে আসতে লাগলেন "রাজা মহারাজা, ভিক্ষুক, সাংবাদিক এবং পণ্ডিত, শিল্পী, ভক্ত, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, মুসলমান, সকল বিশ্বাসের (ধর্মের), সকল কাজের ও ব্যবসায়ের মানুষ, বৃদ্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা (যেমন চোদ্দ-বছরের পূর্ণ)—কে নয়? তাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে আসতেন তাঁকে প্রশ্ন করতে (সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভাদির বিষয়ে)। দিনে-রাতে তাঁর বিশ্রাম ছিল না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা ধরেই তিনি সকল জিজ্ঞাসুর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদিও তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত, তবু তিনি কারোর প্রতি বিমুখ হতেন না—সকলকে সমান করুণা বিতরণ করতেন।"[৩৩]

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ "ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যখন অশেষ জনতা হইতেছিল, তখন একদিন আমরা যাইয়া দেখি, ঠাকুর ভাবাবস্থায় মার (জগন্মাতার) সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'কচ্ছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? (আমার) নাইবার খাইবার সময় নেই! (ঠাকুরের তখন গলদেশে ব্যথা হইয়াছে। একটা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন্‌দিন ফুটো হয়ে যাবে যে! তখন কি করবি?' "[৩৪] এসব অবশ্য অনেক পরের —১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কথা।

কিন্তু এত লোক তো অনেকদিন ধরে এসেছে। শেষে এত ভিড় না হয় হয়েছে, কিন্তু প্রথমদিকে তো অত হয়নি। এঁরা তো সেই 'ডাক' শুনে সকলে আসেননি। তাহলে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রকাশের কথা আপামর জনসাধারণ জানল কী করে? তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলির মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটত। একে কী বলা যায়? 'ডাক'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা বলতে পারি 'প্রচার' (preaching)। তাঁর এই প্রচারকার্য শুরু হয়েছিল সত্যিকারের ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে—পরমহংসত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই।[৩৫] এভাবে তাঁর প্রচারের কাল তথা ভক্তদের আগমনের কালটি দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে—১৮৭৫-পূর্ব এবং ১৮৭৫-উত্তর।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ১৮৭৪-১৮৭৫-এর আগের কালটি ছিল সলতে পাকাবার কাল। এই সলতে পাকাবার কালে এসেছিলেন (মথুরবাবুকে বাদ দিলে) শম্ভুবাবু, মণিমোহন সেন, নেপালের কাপ্তান, মহিমাচরণ, সিঁথির গোপাল, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ।[৩৬] এঁরা মোটামুটি দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী বাসিন্দা।

নেপালের কাপ্তান (উপাধি) ছিলেন নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী। গঙ্গার অপর পারে বেলুড় গ্রামে তাঁর কাঠের গদি ছিল। গঙ্গা পার হলেই দক্ষিণেশ্বর। সুতরাং ঠাকুরের 'প্রচারে' তিনি আকৃষ্ট হয়ে কিছুকাল ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেছিলেন—১৮৭৪-এর আগে থেকেই। ১৮৭৪-এর এপ্রিলে শ্রীশ্রীমা দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা করতে। তার প্রয়োজনও খুবই ছিল, কারণ ঠাকুরের শরীর স্বাস্থ্য ভেঙেছে। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর 'প্রচার'কর্ম শুরু করেছেন। সারদাদেবী এসে নহবতের ছোট ঘরে শাশুড়ির কাছে বাস করতে লাগলেন। শম্ভুবাবু জেনেছিলেন, আগের বারে (১৮৭২ ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে ১৮৭৩ অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত) কিছুকাল শ্রীশ্রীমাকে নহবতে থাকতে হয়েছিল এবং তাতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল। তাই এবার সারদাদেবী আসার পর শম্ভুবাবু তাঁর থাকার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দির-চত্বরের পাশেই কিছু জমি কিনলেন ২৫০ টাকায় এবং সেখানে একটি প্রশস্ত চালাঘর তোলার ব্যবস্থা করলেন।

কাপ্তান বিশ্বনাথ তা জানতে পেরে নিজেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঐ ঘরের জন্য যত শালকাঠ লাগবে তা তিনি দেবেন। তা তিনি দিয়েছিলেন। একখানা কাঠ গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। পুনরায় তিনি সেটি দেন। ফলে শ্রীশ্রীমায়ের থাকার যেমন সুবিধা হয়েছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-পরিচর্যা করার সুবিধাও হয়েছে। এখানে তিনি স্বামীর খাদ্যপ্রস্তুত করতেন, আবার নিজে গিয়ে খাইয়ে আসতেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভীষ্ট কর্ম সম্পাদন ভালমতো করতে পেরেছিলেন। বিশ্বনাথের এই রসদ্দারি তাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৭]

মণিমোহন সেন স্বল্পকাল যে রসদ্দারি করেছিলেন, তার তুলনায় বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের এই রসদ্দারির গুরুত্ব ও মূল্য এজন্যই বেশি যে, এর পিছনে আমরা একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য খুঁজে পাই। পরন্তু দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের 'ডাক' দেওয়ার কালে কাপ্তানের গাড়িও এক সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করেছে। পরবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরে যে ভক্তসমাগম ও জনসমাগম হয়েছে, তার সঙ্গে বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের এই 'গাড়ি'রূপ রসদ্দারিটুকুও অতি মূল্যবান।

এইসব কারণে নেপালের কাপ্তান বিশ্বনাথ উপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ রসদ্দারের মর্যাদালাভ করতে পারেন বলে আমাদের ধারণা।

❁ সেবায়েতগণ ❁

'সেবায়েত' শব্দের অর্থ দেবমন্দিরের পূজারী বা তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ রসদ্দার এবং সেবায়েতের মধ্যে স্পষ্টোচ্চারণে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেননি, কিন্তু তিনি যে সেবায়েতের সেরকম অর্থই করেছেন তা বোঝা যায় তাঁর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বরের উক্তিতে (পূর্বেই বলা হয়েছে) যে, তিনজন সেবায়েত এখনো ঠিক হয়নি কিন্তু সকলেই 'গৌরবরণ'। এই তিনজন সত্যই তাঁর অদর্শনের পর স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা সকলেই শ্বেতকায়—ইউরোপ এবং আমেরিকার।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিত স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞ আয়োজিত হয়েছিল মূলত গুরুর মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য। 'মাহাত্ম্য' শব্দের দ্বারা আমরা বোঝাতে চাইছি শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও দর্শনকে। তাঁর মত হলো ঃ "যত মত তত পথ।" আসলে অদ্বৈতমতই—এক অদ্বয় ব্রহ্মকেই বহু পন্থায় পাওয়া যায়। আর তাঁর দর্শন হলো ঃ "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবেকানন্দ গড়ে তুলেছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। গড়েছিলেন প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠও (যা আজ শাখাপ্রশাখায় সারা গ্রহেই পরিব্যাপ্ত)। আর অদ্বৈতসাধনার জন্যই বিশেষ করে গড়ে তুলেছিলেন এক অদ্বৈতাশ্রম—হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে। এসবই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবদ্দশাতেই করেছিলেন।

এই সবকিছুর অধিদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর বিগ্রহ সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত। মায়াবতীতে তাঁর বিগ্রহ থাকার কথা নয়, নেইও; কিন্তু সেও তো মন্দির—যেখানে বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরনির্মাণে স্বামীজী যাঁদের কাছ থেকে আর্থিক এবং আত্মিক সাহায্যলাভ করেছিলেন বিশেষভাবে তাঁরা ছিলেন বিদেশি এবং শ্বেতকায়—তাঁরাই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'সেবায়েত'। তাঁর অদর্শনের পর তাঁদের নিশ্চিত আগমন ঘটবে—এও তিনি দিব্যচক্ষে দেখে গিয়েছিলেন, যেমন ভক্ত ও রসদ্দারদের আগমন তিনি আগেই দেখতে পেতেন। এমন তিনজন সেবায়েতকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এঁরা হলেন ঃ ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস ওলি বুল ও সেভিয়ার দম্পতি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এঁরা সুপরিচিত।

[ক্রমশ] (দুই)

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

সঙ্কেত ঃ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়

পূর্বকথা ও বাল্যজীবন	— ১ম ভাগ (১৯৯৩ সং)	— লীলাপ্র., ১
সাধকভাব	— ঐ	— লীলাপ্র., ২
গুরুভাব—পূর্বার্ধ	— ঐ	— লীলাপ্র., ৩
গুরুভাব—উত্তরার্ধ	— ২য় ভাগ (১৯৯৫ সং)	— লীলাপ্র., ৪
দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ	— ঐ	— লীলাপ্র., ৫

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, কথামৃত ভবন প্রকাশিত
যথাক্রমে—কথামৃত ১, ২, ৩, ৪, ৫

৩ Life of Ramakrishna—Romain Roland —L.R./R.R.

৪ Ramakrishna and his disciples—Christopher Isherwood —ঈশারউড

৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৮৭ —সমকালীন

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২০০১ —বাণী-রচনা

৭ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৭৫ —লোকমাতা

তথ্যসূচি

২৩ লীলাপ্র., ৩।২৬

২৪ লীলাপ্র., (ক) ২।২০৩ ঃ শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেন ১৩ চৈত্র ১২৭৮—দোলপূর্ণিমার দিন (২৫ মার্চ ১৮৭২)। (খ) ২।২০৯ ঃ ষোড়শী-পূজার পাঁচমাস পরে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে ফিরে যান। (গ) ঈশারউড, পৃঃ ১৪৭ ঃ বলা হয়েছে—১৮৭৩-এর অক্টোবর-নভেম্বরে।

২৫ ঈশারউড, পৃঃ ১৪৭-১৪৮

২৬ লীলাপ্র., ২।২০৪

২৭ ঐ, ২।২২৩

২৮ ঈশারউড, পৃঃ ১৪৭ ঃ বলা হয়েছে—সারদাদেবী ১৮৭৩-এ গেলেন কামারপুকুরে। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রিস্টধর্মসাধনা—'During the next year...'

২৯ লীলাপ্র., ২।২১৮

৩০ ঐ, ২।২২৭-২২৯

৩১ বাণী-রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'

৩২ L.R./R.R., pp. 178-180 ঃ ভক্তদের তালিকা—১৮৭৯-১৮৮৫ দ্রঃ

৩৩ L.R./R.R., p. 181

৩৪ লীলাপ্র., ৪।১৮৩

৩৫ L.R./R.R., p. 177, পাদটিকা ঃ "His preaching may be considered to fall within the period of twelve years from 1874 to Aug. 1886."

৩৬ কথামৃত, ১ম ভাগ, 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত', পৃঃ ৫, প্যারা-২

৩৭ লীলাপ্র., ২।২২৪

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' : একবার ফিরে দেখা

মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*

আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে বাংলার পেশাদার থিয়েটারে এক যুগচেতনা এবং ধর্মবিপ্লবের সূচনা হয়। কাজটা যে খুব সচেতনভাবে হয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় না। অনেকটা কাকতালীয়, কিছুটা বা নাট্যশালার প্রয়োজনে। আজ এই এতদিন পরে তার দিকে ফিরে তাকালে স্বতই মনে হয়, এর পিছনে ছিল সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার লীলারহস্য বা সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বকারণ-কারণের মহিমাপ্রকাশ।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের আরো প্রায় ৪০০ বছর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। তখনকার বাংলার সামাজিক অবস্থাটা কেমন ছিল? সমাজের সর্বস্তরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তখন প্রবল প্রতাপ। নিচুতলার মানুষেরা নিষ্পেষিত, অবহেলিত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। সেই পটভূমিকায়, সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। সেদিন এই মহামানবের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর আচারসর্বস্বতার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠানের পথে না গিয়ে মহাপ্রভু প্রেমধর্ম ও ভক্তিবাদের পথে দেশে একটা ধর্মবিপ্লবের সূচনা করলেন, অনাদৃত অবহেলিত নিপীড়িত মানবাত্মার জয়ঘোষণা করলেন। আচণ্ডালে কোল দিয়ে কবি চণ্ডীদাসের প্রতিধ্বনি করে তিনিও বললেন :

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সামাজিক পরিমণ্ডল এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ কেমন ছিল? একদিকে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত জড়বাদী যুক্তিবাদী কিছু নব্য যুবক, যারা তখনকার দিনে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত, তাদের মিছিল। তারা সনাতন হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সবকিছু নস্যাৎ করে দিতে চাইছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে সবকিছুকে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরদিকে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলন—যাঁকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতশ্রেণির শেষ আদর্শ বলে বর্ণনা করেছিলেন। একদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় নানা আদর্শমূলক প্রবন্ধ রচনার দ্বারা হিন্দু আদর্শকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নানা ধর্মমূলক রচনার নূতনতর ব্যাখ্যায় মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলছেন। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের নানাদিকে একটা ধর্মীয় সংস্কৃতির টানাপোড়েনের যুগ।

এমনই একটা ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' নাটকটি রচনা করেন। ধর্মক্ষেত্রে নানা দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের মধ্যে এরূপ একটি নাটকের বড়ই প্রয়োজন ছিল বলে আজ মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে, সজ্ঞানে ধর্মান্দোলনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটি কিন্তু রচিত বা মঞ্চস্থ হয়নি। হিন্দুধর্মের বিশেষ একটি দিককে আলোকিত করে যুক্তিতর্কের পথকে দূরে সরিয়ে মন্ত্র-তন্ত্র-আচারের চোরাবালি থেকে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের একটা কিছু পরোক্ষ প্রচেষ্টা হয়তো এই নাটক রচনা ও প্রযোজনার পিছনে ছিল। তাই এই নাটক বাংলা রঙ্গালয়ের এক দিকচিহ্ন ছিল বলে আজও স্বীকৃত হয়।

'স্টার থিয়েটার'—আজকের পুনর্নির্মিত রঙ্গালয়টি নয়, এটি ছিল তখনকার কলকাতার ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে—যার আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই। এই মঞ্চে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ বঙ্গাব্দে (২ আগস্ট ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই নাটকে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের পরিচালনা ছাড়া আর অন্য কোন ভূমিকাই ছিল না। নাটকটির সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন বেণীমাধব অধিকারী—নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গীতগুরু। তিনি তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী আহম্মদ খাঁর শিষ্য ছিলেন এবং উচ্চশ্রেণির গায়ক বলে রসিকমহলে স্বীকৃত হতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রামায়েৎ বৈষ্ণব। রঙ্গমঞ্চের ওপর বৈষ্ণবীয় ঢঙে নৃত্যগীত পরিবেশন তাঁর দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়।[১] অনেকে বলেন, গিরিশচন্দ্রের নিকট প্রতিবেশী এবং বিশেষ বন্ধু তৎকালীন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক পরমবৈষ্ণব মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ রচিত অমূল্য গ্রন্থ 'অমিয়নিমাইচরিত' এই নাটকের উৎস। কিন্তু এবিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এরূপ শোনা যায়, 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়দর্শনে ও তার অভূতপূর্ব সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে শিশিরকুমার ঘোষ গিরিশচন্দ্রকে শ্রীচৈতন্যের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় অবলম্বনে 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটকটি লিখতে বলেন।[২] 'নিমাই' চরিত্রের অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী 'আমার কথা' থেকে জানা যায়, শিশিরবাবু নিয়মিত নাটকের মহলায় যোগ দিতেন এবং

* *শিবপুর-নিবাসী বিদগ্ধ লেখক, পূর্বেও 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন।*

বিনোদিনীকে নানা উপদেশ ও শিক্ষাদানে সমৃদ্ধ করতেন।[৩] রসরাজ অমৃতলালের রচনা থেকে আরো জানা যায়, 'বখাটে নট ও অখাঁটি নটীবৃন্দ' দ্বারা এই পবিত্র নাটকটি অভিনীত হওয়ায় তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে খুব শোরগোল পড়ে যায়।[৪] 'Englishman' পত্রিকায় বাজারের নটীদের দ্বারা পূত চরিত্রের অভিনয়ে রূপদান করাকে খুব তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। আবার বিশিষ্ট সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'Reis & Rayyets' পত্রিকায় 'Englishman' পত্রিকার সমালোচনার কঠোর প্রতিবাদ করেন।[৫] তবে একথা ঠিক, পাশ্চাত্যবিদ্যা-অভিমানী নব্য বাংলার যুবক থেকে শুরু করে তিলকধারী বৈষ্ণব পর্যন্ত সকলে এই নাটক দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। রসরাজ অমৃতলালের রচনা থেকে একথাও জানা যায়, এই নাটকাভিনয়ের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়-পাড়ায় সঙ্কীর্তনের দল সৃষ্টি হলো। 'গীতা' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পাঠের পুনঃপ্রচলন হলো আর নব্যশিক্ষিত বাঙালি নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আর লজ্জাবোধ করল না।[৬] এমনই পরিণাম।

এই নাটক দর্শন করতে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে (৬ আশ্বিন ১২৯১ বঙ্গাব্দ) স্টার থিয়েটারে শুভপদার্পণ করেন।[৭] পরবর্তী কালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নবদ্বীপধামের পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন ও আরো বহু মহাত্মা এই নাটকদর্শনে আসেন এবং বাংলার রঙ্গালয়কে তাঁদের পদধূলিদানে ধন্য করেন। বাংলার রঙ্গালয় পরম তীর্থস্থানে পরিণত হয়।[৮] এই সময়কার বহুজনপরিচিত ও বহুচর্চিত বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে একটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমকালীন এক পরমবৈষ্ণব সাধক ছিলেন, তাঁর নাম রাধারমণ চরণদাসদেব। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সাধারণত 'বড়বাবাজী মহারাজ' নামে সমধিক পরিচিত। "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।/ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"—এই অভিনব মন্ত্রের উদ্গাতা তিনিই। গত বছর সারা বাংলায় তাঁর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি গভীর প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে নাটক দেখছেন; মাধাই যখন নিত্যানন্দকে কলসির কানা মারতে উদ্যত, চরণদাসদেব ভাবাবেগে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সেদিন প্রেক্ষাগৃহে তাঁর অলৌকিক শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি যখন ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, তখন উপস্থিত দর্শকসাধারণের মধ্যে যে তাঁকে স্পর্শ করছে, সে-ই পরমানন্দে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করছে। তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলে গিরিশচন্দ্র তাঁর সামনে করজোড়ে অকপটে স্বীকার করেন, নাটক রচনার সময় তাঁর মনে এই দিব্যলীলার ব্যাখ্যা ও বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কিছু অভিমান ছিল। কিন্তু চরণদাসদেবকে দর্শন করার পর ও তাঁর ভাবাভিব্যক্তি নিরীক্ষণ করার পর তাঁর সেই ভুল ভেঙে গেল। তিনি আজ মনেপ্রাণে জানলেন, এই দিব্যলীলার কিছুই তিনি অনুভব করতে পারেননি।[৯]

কথায় আছে, দীপ জ্বালানোর আগে তার সলতে পাকানোর ইতিহাস থাকে। ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ আছে: "Coming events cast their shadows before." গিরিশচন্দ্রের ভাবী জীবনের উন্মেষের কিছু কিছু লক্ষণ বা পত্তন হয়েছিল 'চৈতন্যলীলা'র সময়। জনশ্রুতি আছে, তখন 'চৈতন্যলীলা' নাটকের পূর্ণোদ্যমে মহলা চলছে, দৃশ্যপটাদি অঙ্কন হচ্ছে। একদিন গিরিশচন্দ্র এক চিত্রকরকে বললেন: "দেখ, এই যে তুমি সব আঁকছ-টাঁকছ, তা তোমার বিষয়বস্তুতে ধ্যানধারণা কিরকম? পূজাপাঠ, ধ্যানধারণা একটু-আধটু কর তো?" চিত্রকর উত্তরে বলে: "আজ্ঞে বড়বাবু, সেকথা আর এ পাপমুখে বলি কি করে? আমি নির্জনে চোখ বুজে বসতেই মন ব্যাটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজলেই জগৎসংসার খুঁজতে লাগল। এমন মন নিয়ে কি সাধন-ভজন হয়? হ্যাঁ, তবে বাবু এই যে আপনাদের মুখে তাঁদের কথা শুনছি, আপনাদের কাজ করে দিচ্ছি—এই আমার পূজাপাঠ, এই আমার সাধনভজন।" কী বিশ্বাস! এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক Anatole France রচিত ছোটগল্প 'Our Lady's Juggler'-এর নায়ক Barnaby নামক এক বিদূষকের কথা মনে পড়ে। সে নির্জন দুপুরে গির্জার ভিতরে মাতা মেরির বেদির সামনে নানারকম কসরত দেখাত। মনে ভাবত, দেবী বুঝি এই দেখেই তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে কৃপা করবেন। গির্জার পাদরি তার এই সরলতা এবং ঐকান্তিক বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন।[১০] গিরিশচন্দ্রের এই নাটকও উক্ত চিত্রকরের ধর্মচেতনার, মানসিকতার উত্তরণের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

আরেকদিন গিরিশচন্দ্র সেই চিত্রকরকে বললেন: "ওহে, তোমার গৌরাঙ্গের মহিমার কথা কিছু বল না শুনি।" চিত্রকরটি সবিনয়ে জানাল: "আজ্ঞে, গৌরচন্দ্রের মহিমার কথা আমি আর আপনাকে কী বোঝাব, বড়বাবু?" গিরিশচন্দ্র তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন: "আরে বলই না, একটু শুনি।" চিত্রকর বলতে শুরু করে: "সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে ঘরে ফিরে চানটান সেরে শুদ্ধ হয়ে নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রেঁধে আমার আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে নিবেদন করি। কিছুক্ষণ চোখ বুজে আপন মনে বসে থাকি। তাঁর কথা ভাবি। পরে চোখ চেয়ে সেই মহাপ্রসাদ নিতে গিয়ে দেখি যে, তিনি সত্যিই এসে গ্রহণ করেছেন। খাবারের ওপর তাঁর দাঁতের দাগ দেখতে পাই।" শুনে গিরিশ কিছুটা সংশয়ভরে প্রশ্ন করেন: "বল কি হে?" চিত্রকর উত্তর দেয়: "আজ্ঞে, যা সত্যি তাই বলছি।" গিরিশের মন্তব্য: "তাহলে তো বড়ই ভাগ্যবান তুমি।" চিত্রকর সবিনয়ে বলে: "আজ্ঞে, সবই গৌরের কৃপা।"' গিরিশের প্রশ্ন: "কি করে এমনটা হয় বলতে পার?" চিত্রকরের উত্তর: "গুরুর সান্নিধ্যে, তাঁর চরণ

ছোঁয়ায়।"[১১] গিরিশের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ "গুরু কে? গুরু কোথায়?" এই প্রশ্নের বীজ সেদিন গিরিশচন্দ্রের মনে উপ্ত হয়েছিল—যা কালে মহীরুহে পরিণত হলো দক্ষিণেশ্বরে সেই পরমপুরুষের সান্নিধ্যে এসে। এ যেন সেই—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।" শ্রীভগবানের শ্রীমুখের সেই বাণী নতুন করে প্রমাণিত হলো। গিরিশচন্দ্র তাঁর লেখনী, তাঁর নাট্যসৃষ্টি, তাঁর সহযোগীদের দিয়ে স্টার থিয়েটারে যে-ধর্মযজ্ঞের সূচনা নিজের অজ্ঞাতসারে করেছিলেন, তারই পূর্ণাহুতি হলো কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি—শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন কল্পতরু হয়ে সকলকে কৃপা বিতরণ করেছিলেন। আজও সেদিনটি আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পালন করি তাঁর অহেতুকী কৃপালাভের জন্য।

পরিশেষে, যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদে গিরিশচন্দ্র একের পর এক মর্মস্পর্শী নাটক রচনা করে বঙ্গরঙ্গালয়কে গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন, সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রাতুল চরণে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করি। এই যুগন্ধর পুরুষকে আমরা সভক্তি প্রণাম জানাই—

"দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্যজ্ঞান প্রচার সংসারে।
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।" ❑

সহায়ক গ্রন্থ

১ গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭, পৃঃ ১৯৭
২ ঐ, পৃঃ ২১০
৩ (ক) গিরিশ রচনাবলী—সম্পাদক ঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৪ (ভূমিকা)
(খ) সাজঘর—ইন্দ্রমিত্র, ত্রিবেণী প্রকাশন, পৃঃ ২২৪
৪ গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৯৮
৫ গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫
৬ গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৯৮
৭ (ক) গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২০০১, পৃঃ ৫২
(খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ২।১৩।৪-৭
৮ গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৯৮
৯ লোকপাবন শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাসদেব—বারীন রায়, পাঠবাড়ি আশ্রম, পৃঃ ১২০(ক)
১০ আজ থেকে প্রায় ৫০ বছরেরও আগে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে ইংরেজি পাঠ্যসূচিতে এই ছোটগল্পটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া লেখকের সমগ্র রচনাবলী দ্রষ্টব্য।
১১ (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৫৬, পৃঃ ৯
(খ) রত্নাকর গিরিশচন্দ্র—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আনন্দধারা, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৯

জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

এর আগে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, মহাকাল, বৈদ্যনাথেশ্বর, ওঙ্কার-মান্ধাতা এবং শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার দ্বাদশ তথা শেষ পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর।—লেখক

চারদিকে নীল সমুদ্রের মাথায় সাদা ফেনার মুকুট দিয়ে ঘেরা একখণ্ড সবুজ দ্বীপ—বাসের জানালা দিয়ে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। ভারতের ভূখণ্ড পার হয়ে ১৯ কিলোমিটার দূরের ঐ দ্বীপে যেতে হয় একটি সুগঠিত ব্রিজ পার হয়ে। ব্রিজটি প্রায় ৩ মাইল লম্বা। আর ছোট্ট দ্বীপটি মাত্র ৩৪ বর্গকিলোমিটার, সমুদ্রতল থেকে ২.৭৪ মিটার উচ্চ। ভারতের বহু পুরাণকথায় ও ইতিহাসে এই দ্বীপ অক্ষয় হয়ে আছে তার পুণ্যকাহিনী বুকে ধরে। ভারতের বাইরে অথচ ভারতের সমুদ্রসীমানার মধ্যে এই ভূমির নাম 'রামেশ্বর তীর্থ'।

মাদুরাতে আমাদের আশ্রমে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় সেখান থেকে বাসে ১৭৩ কিলোমিটার পার হয়ে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সামান্য একফালি অংশে এসে দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম 'মণ্ডপম্'। এটি বঙ্গোপসাগরের তীরে। এর ঠিক দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। আর তার মাঝেই 'সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ'। বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখা যাচ্ছিল রামেশ্বর দ্বীপের আরো দক্ষিণ-পূর্বে সেই সিংহল—আধুনিক শ্রীলঙ্কাকে। রামেশ্বর দ্বীপ শ্রীলঙ্কা আর ভারতের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে একটি যোজকমাত্র। ভারত থেকে আগে রেলযোগে রামেশ্বর হয়ে জলপথে শ্রীলঙ্কা যাওয়া যেত। আর তারও আগে রামেশ্বর থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ছিল একটি পুরাণপ্রসিদ্ধ সেতু, যা রামায়ণের পাতায় অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ জানকীকে উদ্ধার করার জন্য সমুদ্রকে শাসন করে হনুমান, নল, নীল, সুগ্রীব প্রমুখের নেতৃত্বে বানরসৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পাথরের সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেই থেকে এই স্থানের আরেকটি নাম 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর'।

বাস এখানে একটু অপেক্ষা করে আবার এগিয়ে চলল। মণ্ডপম্ ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই আমরা ভারতের মূল ভূখণ্ড ছাড়িয়ে সমুদ্রের এক প্রণালীর মধ্যে ব্রিজের ওপর উঠে পড়লাম। বিরাট চওড়া ব্রিজ, নাম 'ইন্দিরা গান্ধী সেতু'। এটির কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। শেষ হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। ঐবছর ২ অক্টোবর সেতুটির উদ্বোধন করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। দুধারে রয়েছে মানুষ চলাচলের রাস্তা। আমরা ব্রিজে উঠেই বাঁদিকে জলের তলায় শ্যাওলাধরা সার সার পাথর দেখতে পেলাম। এই পাথরের সারিই নাকি শ্রীরামের তৈরি সেতুর ধ্বংসাবশেষ। সেতুতে ওঠার পর দুধারে দুই সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য। পূর্বে বঙ্গোপসাগর আর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। দুই সমুদ্রের জল এক হয়ে এই প্রণালীর মধ্যে মিলেমিশে একাকার। আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে চলছিল।

আমরা যাচ্ছি শুধু দৃশ্য দেখতে নয়, স্মরণ করতে, দর্শন ও প্রণাম করতে সেই প্রাচীনতম তীর্থদেবতা—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম রামেশ্বরকে, যিনি স্বয়ং নারায়ণের সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রার্থনায় যুগ যুগ ধরে এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। যাঁর প্রতিষ্ঠা ও সৃষ্টির পিছনে স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়ার অবতার সীতাদেবীর স্পর্শও রয়ে গিয়েছে।

ব্রিজ পেরতেই গাড়ির মধ্যেকার সব সাধু-ব্রহ্মচারী সমস্বরে হাততালি দিয়ে শিববন্দনা শুরু করলেন:
"ত্রিভুবনপালক ত্রিভুবননাশক, রিপুগণসূদক সুখদ শিব হর।
কলিমলনাশক, শিব পঞ্চানন রাবণসেবিত বরদ শিব হর॥
সংসারার্ণব তারক শঙ্কর, সহজানন্দ মহেশ শিব হর॥
রামবরপ্রদ, রামেশ্বর শিব, রাঘবপূজিত রক্ষ্য শিব হর॥"
ভজন চলতে চলতেই আমরা রামেশ্বর দ্বীপে এসে গেলাম। আধুনিক সভ্যতার বিস্তার এখানেও হয়েছে। চারদিকে অনেক বাড়িঘর। এর মধ্যে আমরা 'পাম্বান' বাসস্ট্যাণ্ডে একটু অপেক্ষা করলাম। এখানে আমাদের সঙ্গী হলেন এই দ্বীপে গড়ে ওঠা বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রণবানন্দজী। এখানে জনহিতকর কাজকর্ম করেন বলে তাঁর খুব পরিচিতি। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের দর্শনের সব ব্যবস্থাই তিনি করবেন। আমাদের বাসকে তিনি নির্দেশ দিয়ে নিয়ে চললেন দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে রামেশ্বর-মন্দিরের পথে। পাম্বান থেকে মন্দির ৯ কিলোমিটার। দুপাশে নানাধরনের দোকানপাট, বাড়িঘর। গাড়ির সারি ভেদ করে আমরা এসে পৌঁছালাম সমুদ্রের ধারে। স্থানটির নাম 'অগ্নিতীর্থ'। এখানে সমুদ্র শান্ত। সমুদ্রের সামনেই মূল মন্দিরের পূর্বদ্বারের বিশাল গোপুরম। সমুদ্রের প্রায় ধারেই শঙ্করাচার্যের মঠ। মন্দিরের ছত্রীর ওপরে আচার্য শঙ্কর তাঁর

* *গবেষক-সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।*

চার শিষ্য নিয়ে বসে আছেন—প্রমাণ আকারের জীবন্ত মানুষের মতো মূর্তি। সমুদ্রের পাড়ে কিছুটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে জামাকাপড় ছেড়ে অনেকেই স্নান করতে নেমে গেলেন। সমুদ্রস্নান এখানে খুব আরামের, কোন ঢেউয়ের ভয় নেই। ধীরে ধীরে স্নান সেরে উঠে আসা হলো। এখানে সমুদ্রের একদিকের নাম 'মহোদধি', অন্যদিকের নাম 'রত্নাকর'। পাড়ে উঠে বাঁদিকে বিশাল গোপুরমের পাশ দিয়ে মন্দিরের প্রাচীরে ঢোকার পথে সকলকেই জামা খুলে রাখতে হলো। দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ বড় মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে উর্ধ্বাঙ্গে কোন সেলাইকরা আবরণ থাকা চলে না। শুধু চাদর থাকে। আমরাও সেইভাবে পূর্বদ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

সমস্ত মন্দিরচত্বর এক বিরাট প্রাচীরঘেরা। এই প্রাচীর ৮৬৫ ফুট লম্বা এবং ৬৫৭ ফুট চওড়া। মন্দিরের ছাদকে ধরে রেখেছে ৪৯ ফুট লম্বা অনেক পাথরের বিম। এই সমগ্র ঘেরা জায়গা আবার পরপর তিনটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা পৃথক পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত। আমরা যে-গোপুরমটি পার হয়ে এলাম, পূর্বদিকের সেই তোরণটিই সবচেয়ে উঁচু—১৩০ ফুট। এই গোপুরমটি সপ্তদশ শতকে দলভাই সেতুপতি তৈরি করেন। কাজ শেষ হয় ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে। আর পশ্চিমে বহির্গমনের গোপুরমটি ৮০ ফুট উঁচু। অন্যান্য দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের মতো এই গোপুরমও ৯ তলা উঁচু। মন্দিরের গায়ে রয়েছে অনেক মূর্তি ও নানারকম অলঙ্করণ—যা সত্যই দৃষ্টিনন্দন।

এই দ্বীপ মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিবাহী। জীবনের এক বিষাদঘন সময়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। সীতা উদ্ধারের জন্য অনেক দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। আবার এখান থেকে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি তাঁর বিরাট বানর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন সীতার উদ্ধার এবং দশানন রাবণকে বধ করার জন্য। এই কাহিনী ভারতবাসীর মনকে আজও দিব্য স্মৃতিতে আপ্লুত করে রাখে। রামায়ণ ভারতের সর্বাপেক্ষা আদরণীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম। ভারতের চিরস্মরণীয় বরণীয় চরিত্রগুলির সমাবেশ ঘটেছে এখানে। জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বীর্য, তেজ, সত্যনিষ্ঠা, পতিপ্রেম, সতীত্ব, শরণাগতি—সমস্ত ভারতীয় আদর্শের একত্র সমাবেশ এই মহাগ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্রকে অবলম্বন করে। আজও তাই সমগ্র ভারতবাসী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণী মহাবীর হনুমানের চরণেও শ্রদ্ধাভক্তিতে মাথা নোয়ায়। অবশ্য মহাবীর হনুমান মনুষ্যেতর জীব না ভিন্নশ্রেণির কোন দ্রাবিড় আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতা—তা নিয়েও অনেক মত আছে।

আমরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে পেলাম একটি বিরাট পাথরে খোদিত লাল সিন্দূরলিপ্ত পবনপুত্র মহাবীরের দণ্ডায়মান মূর্তি। দক্ষিণমুখী এই মহাবীরই শ্রীরামের নির্দেশে কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ আনতে গিয়েছিলেন। তাই মন্দিরের অভ্যন্তরে যাত্রাপথের প্রথমেই তাঁর দর্শন। এখানকার পূজারীরা বৈষ্ণব রামায়েত শ্রেণির। এঁরা তুলসীপত্রে মহাবীরের পূজা করেন। এখানেই আছে তাঁর আনীত দ্বিতীয় শিবলিঙ্গ। প্রথমটি মন্দিরের অভ্যন্তরে 'বিশ্বনাথ' নামে পূজিত হচ্ছেন।

আমরা তাঁর চরণে প্রণাম জানালামঃ "অত্যুৎকট-প্রকটিতা তলধৈর্য্যবর্য্য, শ্রীরামকার্য্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ।/ গত্যা বিলঙ্ঘ্য গতবারিধি বারিতীরঃ শ্রীমানসৌজয়তি বায়ুসুতো হনুমান্॥/ তুভ্যং নমঃ সকলমঙ্গলদায়কায়, তুভ্যং নমোঽস্তু পবনানল সম্ভবায়।/ তুভ্যং নমোঽস্তু জগতাং পরমোপকর্ত্রে সর্বার্থদুঃখহরণায় নমো নমস্তে॥" গরুড়তন্ত্রের এই শ্লোকটি আমার জানা ছিল, তাই পুরোহিতদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করলাম মহাবীরের চরণে। এবার প্রবেশ করলাম পশ্চিমমুখে মন্দিরের অন্দরমহলে। সামনেই একটি গ্রানাইট পাথরের বিরাট মণ্ডপ। এদেশের ভাষায় 'সেতুপতি মণ্ডপ'। অপূর্ব কারুকার্যময় স্তম্ভে ঘেরা এই হলটির একটি স্তম্ভে রাজা ভাস্কর সেতুপতির এক অনবদ্য পাথরের মূর্তি খোদাই করা আছে। এই মন্দিরের প্রধান সেবাইত রামনাদ রাজ্যের রাজারা। ভাস্কর সেতুপতি তাঁদেরই একজন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকদের কাছে তিনি অতি পরিচিত। আরেকটু এগিয়ে ডানদিকে মহালক্ষ্মীর মন্দির। খুব প্রাচীন না হলেও দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্পের স্পর্শ এতেও আছে। দেবী মহালক্ষ্মী পদ্মাসীনা, দুধারে দুটি গজ দেবীর মস্তকে মঙ্গলকলস ধরে আছে। নানা গহনা ও পুষ্পসাজে সজ্জিতা দেবীকে প্রণাম জানালামঃ "পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি/ পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মীর্নমোঽস্তুতে।" মাকে প্রণাম জানিয়ে এবার ক্রমে ক্রমে সামনে এগিয়ে যাওয়া। পিছনে ফেলে গেলাম মহালক্ষ্মী-মন্দিরের দক্ষিণে একটি প্রশস্ত হল, যার নাম 'কল্যাণমণ্ডপম্'। এটি দেবী পর্বতবর্ধিনী বা দেবী ভগবতীর মন্দিরের সামনে। এখানে দেবী ও রামেশ্বরের বার্ষিক বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়। এটি জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা ও প্রধান প্রধান উৎসব-অনুষ্ঠান এখানেই সম্পন্ন হয়।

এর পরেই আমরা বিশ্ববিখ্যাত 'তৃতীয় বারান্দা' বা 'থার্ড করিডর'-এর সামনে এসে পড়লাম। এটি একটি দীর্ঘ ঢাকা গলির মতো—লম্বায় ৬৪২ ফুট ও চওড়ায় প্রায় ৪০০

ফুট। এর উচ্চতা ২২ ফুট ৭½ ইঞ্চি। সমগ্র করিডরে ১২১২টি অপূর্ব কারুকার্য করা স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগুলি আবার ৫ ফুট উঁচু টানা বেদির ওপর স্থাপিত। এই বারান্দাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে মুথুরামলিঙ্গ সেতুপতি নির্মাণ করান। তাঁর ও তাঁর দুই মন্ত্রীর পাথরের প্রমাণ আকারের মূর্তি এই বারান্দার পশ্চিম প্রবেশদ্বারের মুখে আছে। আমরা এবার মূল মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। কিছু মানুষ ভিজে কাপড়-জামা পড়ে হাতে একটি বালতি ও দড়ি নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। শুনলাম, মহালক্ষ্মীর মন্দিরের কাছ থেকে সমস্ত মন্দির-চত্বরের মধ্যে ২২টি কুয়ো আছে, আর চত্বরের বাইরে আরো ৩১টি কুয়ো বা চৌবাচ্চার মতো আছে। এগুলিকে খুব পবিত্র গণ্য করা হয়। যাত্রীরা মন্দিরদর্শনের আগে মন্দিরের ভিতরের ঐ ২২টি কুয়োর জল তুলে তাতে স্নান করে তবে বিগ্রহ দর্শন করতে যান। এটি এখানকার একটি বিশেষত্ব। প্রথম কূপটি হনুমান-মন্দিরের দক্ষিণে মহালক্ষ্মী-মন্দিরের পূর্বে। এর নাম 'মহালক্ষ্মী তীর্থ'। এইরকম হনুমান-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে পরপর ৩টি কূপ আছে, এদের নাম যথাক্রমে 'সাবিত্রী', 'গায়ত্রী' ও 'সরস্বতী তীর্থ'। প্রবাদ, এইসব তীর্থে প্রাচীনকালে অনেক বিশিষ্ট যাত্রী স্নান করে বহু পাপ মুক্ত হয়ে পুণ্য অর্জন করেছিলেন। আরো বিশ্বাস, এইসব কূপের জলে স্নান করলে এর কোন ওষধির গুণে শরীর ও মন সুস্থ, পবিত্র হয়। আমি প্রথমেই মহালক্ষ্মী কূপের কাছে স্নানরত এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে মাথায় মুখে দিলাম।

এরপর তৃতীয় বারান্দা পার হয়ে আরেকটা বারান্দাতে হাজির হলাম। এটিও একটি মাথায় ছাদ দেওয়া গলিপথ। এর নাম 'সেকেণ্ড করিডর'। এটি হিরুমালাই সেতুপতির উদ্যোগে ১৬শ শতাব্দীতে তৈরি হয়। তাঁর ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ সেতুপতির দুটি পাথরের মূর্তি দেবী পর্বতবর্ধিনীর মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে আছে। আজও প্রতি শুক্রবার এঁদের ফুলসাজ হয়। দ্বিতীয় করিডরটি লম্বা ও চওড়ায় ২২৪ ফুট ও ৩৫২ ফুট। মাঝের রাস্তাটি প্রায় ১৭ ফুট। এর পরেও আরেকটি ঐরকম বেষ্টনী আছে, যাকে বলে 'ফার্স্ট করিডর'। এটি লম্বা-চওড়ায় যথাক্রমে ১৭২ ফুট ও ১৪১ ফুট। সর্বমোট ৩টি করিডরের দৈর্ঘ্য ৩,৮৫০ ফুট। পৃথিবীতে এত দীর্ঘ সুদৃশ্য পাথরখোদাই কারুকার্যমণ্ডিত করিডর আর নেই। ভেবে আশ্চর্য লাগে, যখন এগুলি তৈরি হয় তখন কোন ব্রিজ ছিল না। অথচ কত দূর থেকে কত কষ্ট করে এত পাথর নিয়ে এসে এই বিশাল স্থাপত্যশিল্প তৈরি করা হয়েছিল। কত অর্থ, কত পরিশ্রম সব সার্থক, আজ সারা পৃথিবীর মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বিখ্যাত বিদেশি স্থপতি ও সমালোচক ফার্গুসন বলেন : "যদি কেউ আমাকে বলে, সারা দক্ষিণ ভারতের মধ্যে দ্রাবিড়শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন কোন্‌টি, তাহলে আমি নিঃসঙ্কোচে বলব—সেটি এই রামেশ্বরম্ মন্দির।"

আমরা দ্বিতীয় করিডরে প্রবেশ করে পশ্চিমমুখে এগিয়ে গেলাম, পিছনে ফেলে গেলাম আরো দুটি প্রাচীন কূপ—'শঙ্খতীর্থ' ও 'চক্রতীর্থ'। সেখানেও স্নানের পালা চলছে। এইবার আমরা একেবারে মূল গর্ভগৃহের চত্বরের প্রায় সামনে এসে গেলাম। এই চত্বরের মধ্যেও ৪টি প্রাচীন কূপ আছে—'গঙ্গাতীর্থ', 'যমুনাতীর্থ', 'গয়াতীর্থ', আর বেশ বড় একটি চৌবাচ্চার মতো—যেটি নন্দীমূর্তির দক্ষিণে—'শিবতীর্থ'। এই জল একটু মাথায় ঠেকিয়ে এগিয়ে যেতেই সামনে দেখা গেল বিরাট নন্দীমূর্তি। মহাদেবের প্রিয় বাহন ও সহচর এই বৃষভেশ্বরের মূর্তিটি চুনসুরকি দিয়ে তৈরি, ১২ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট উঁচু। তিনি পশ্চিমমুখে তাঁর প্রিয় দেবতার দিকে মুখ তুলে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। সারা গায়ে নানা অলঙ্কার। তাঁর পিছনেই অষ্টধাতুর বিরাট ধ্বজদণ্ড, ত্রিশূল-ডমরু বাঁধা। আর নন্দীর দুপাশে দুজন বিখ্যাত শিবভক্ত মাদুরার রাজা বিশ্বনাথ নাইকার ও কৃষ্ণাপ্পা নাইকারের রঙিন মূর্তি করজোড়ে দণ্ডায়মান।

এবার আমাদের শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়া—মূল মণ্ডপ বা মন্দিরের দিকে প্রথম করিডরের প্রবেশপথে। এটি একটি নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বার। এই করিডরের মাপও আগে বলা হয়েছে। আয়তাকার একটি গলিপথের বেষ্টনীঘেরা চত্বর। প্রবেশের মুখেই দুপাশে মহাগণপতি ও ষণ্মুগম্ বা কার্তিকের মূর্তি। বিশেষ পূজার দিন এই মহাগণপতি মন্দিরেই প্রথম বিশেষ পূজা হয়। সুন্দর লাল রঙের নৃত্যরত মহাগণপতি বা সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা ডানদিকের কার্তিকের মন্দিরে এলাম। দক্ষিণদেশে এই 'মুরুগা', 'ষণ্মুগম্' বা কার্তিকের প্রবল প্রতাপ। তিনি পিতার ওপর রাগ করে কৈলাস ছেড়ে এই দক্ষিণদেশে বিন্ধ্যপর্বতের আড়ালে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে দক্ষিণ ভারতের মানুষ তাঁকে তাদের প্রিয় দেবতা মনে করে মহাসম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। যাই হোক, কার্তিক ও গণেশ—শিব-পার্বতীর এই দুই প্রিয় সন্তানকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে তাঁদের আজ্ঞা মনে মনে গ্রহণ করে আমরা মূল চত্বরে প্রবেশ করলাম।

রেলিং দিয়ে ঘেরা পথের মধ্যে লাইন দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে গর্ভমন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম। গর্ভমন্দিরে কারো প্রবেশ সম্ভব নয়। দূর থেকেই রামেশ্বর

জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন করতে হয়। বিরাট উঁচু কালো পাথরের নানা নকশা খোদাই করা দরজার চৌকাঠ ও ছাদের ভিতরের দিক অপূর্ব দক্ষিণী স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল। অনবদ্য এই শিল্পকলা দেখতে দেখতেই আমরা হাজির হলাম গর্ভগৃহের দরজার সামনে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও দিলেন না পূজারীরা। অন্তত ৩০-৪০ হাত কি আরো বেশি দূরে গর্ভমন্দিরের ভিতরদিকে সেই জ্যোতির্লিঙ্গ। চারদিকে বহু সোনা রুপার অলঙ্করণ, ফুলের সাজ। তার মধ্যেই রুপার আবরণে ঢাকা, রুপার সিংহাসনে রাজকীয় সমারোহে সমাসীন রাজরাজেশ্বর শ্রীরামেশ্বর। এখানে তিনি 'শ্রীরামনাথ স্বামী'। রামময়-জীবিতা দেবী জানকীর স্বহস্তে নির্মিত সেই বালির লিঙ্গকে মনে মনে চিন্তা করে প্রণাম জানালাম : "সুতাম্রপর্ণী-জলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈঃ অসংখ্যৈঃ।/ শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্চিতং তং।/ রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি॥" সঙ্গে গঙ্গাজল, বিল্বপত্র ও একটি মালা ছিল। নিজ হাতে সেগুলি নিবেদন করার উপায় নেই। তাই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিভূতিভূষিত পাণ্ডার হাতেই সেগুলি দিতে হলো। তিনি বললেন, ভগবানের শৃঙ্গারের সময় এগুলি অর্পিত হবে। দূর থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে মনে হলো, হাতখানেক উঁচু লিঙ্গমূর্তি, কিছু আবরণ দিয়ে ঢাকা—মাথায় রুপার বিরাট ফণীছত্র, দুপাশে দক্ষিণী ঢঙের দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে। ফুলমালায় চারপাশ সাজানো। এই একমাত্র জ্যোতির্লিঙ্গ, যেখানে নিজের হাতে স্পর্শ করতে পারলাম না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাল করে দর্শন করাও গেল না। শুনলাম, শেষ রাত্রে যখন মঙ্গলারতি হয়, তখন নাকি ওপরের আবরণ সরিয়ে পূজা ও অভিষেক হয়। তবে তখনো দূর থেকেই দর্শন হয়। কিন্তু আমরা তো একটু পরেই ফিরে যাব, তাই এই আবরণে আবৃত শ্রীরামেশ্বরকে দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়েই ফিরতে হলো। ভিড়ের চাপে ও পাণ্ডার তাড়ায় সামনে থেকে সরে এলাম।
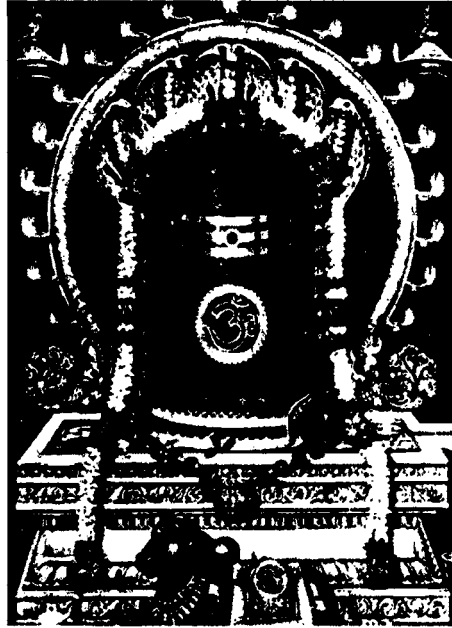
জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীরামেশ্বর

মনে পড়ছিল, শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণ ভারত তীর্থযাত্রায় এসে এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর সব ব্যবস্থা করেন। এই দ্বীপ ও মন্দিরের প্রধান রাজা ভাস্কর সেতুপতি ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য। স্বামীজীর গুরুপত্নী এসেছেন বলে তিনি নির্দেশ দেন জ্যোতির্লিঙ্গের স্বর্ণাবরণ সরিয়ে আসল লিঙ্গে মায়ের পূজার ব্যবস্থা করে দিতে। শ্রীশ্রীমাও ১০৮ সোনার বেলপাতা দিয়ে প্রাণভরে দর্শন-পূজাদি করে বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন : "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।" ত্রেতায় যিনি জনক-নন্দিনী, রামদয়িতা সীতা-রূপে এই বালির লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এই কলিযুগে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণময়ী সারদা-রূপে সেই লিঙ্গকে দর্শন করেন এবং পূর্বলীলাকথা স্মরণ করে অসচেতনভাবে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলে ফেলেন।

চত্বরের মধ্যেই এবার অন্যান্য বিগ্রহের দর্শন শুরু হলো। মন্দিরের সামনেই নাটমন্দিরের গায়ে খোদিত আছে রামায়ণের সেই বিখ্যাত কাহিনী। ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র, পাশে শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ আর জনকদুহিতা সীতা। তাঁদের সামনে আঞ্জনেয় মহাবীর, তাঁর দুই হাতে দুটি লিঙ্গ। তাঁর পাশে সুগ্রীব মাথা নিচু করে ডানহাতখানি মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে যেন রামচন্দ্রকে মহাবীরের এই মূর্তি নিয়ে আসার কথা বলছেন। সুন্দর মূর্তি। সুপ্রশস্ত এই মণ্ডপটিও নানা কারুকার্যময়।

রামেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করার পথে আমরা মূল মন্দিরের উত্তরে এলাম। এখানেই আলাদা একটি ছোট মন্দিরে একটি কালোপাথরের ছোট লিঙ্গ আছে। এটিই মহাবীরের আনীত অন্যতম লিঙ্গ। আমার সঙ্গী এক সাধু এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পুরাণকাহিনী জানতে চাওয়ায় সেই কাহিনী একটু স্মরণ করতেই হলো।

ব্রাহ্মণ সন্তান রাবণকে বধজনিত পাপের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি অগস্ত্য বিধান দেন—সর্বপাপহর সকল মঙ্গলবিধায়ক মহাদেবের পূজা করলে ঐ পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। সেইমতো শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হনুমানকে কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। মহাবীর 'জয় শ্রীরাম' বলে

লাফ দিয়ে চললেন কৈলাসে। সেখানে মহাদেবকেই ধরে বসলেন, তাঁর সঙ্গে মর্ত্যের সাগরতীরে গিয়ে শ্রীরামের পাপহরণ করে তাঁর পূজাগ্রহণ করতে। মহাদেব নিজে যাওয়ার অসামর্থ্য জানিয়ে তাঁর প্রতীক পাঠিয়ে দিলেন—দুটি লিঙ্গমূর্তি হিসাবে। একটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, অন্যটি তো থাকবে। এই ভেবে মহাবীর দুটিই নিয়ে রওনা দিলেন। এদিকে দেবী জানকী সেই সমুদ্রতীরে খেলাচ্ছলে আপনমনেই বালি দিয়ে একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করছিলেন। দেবী মহামায়া আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, তাঁর তো সবকিছু জানা। যা হতে যাচ্ছে—তা তো তাঁরই ইচ্ছায়। তাই বোধহয় লীলাচ্ছলে তিনি এই বালির লিঙ্গটি তৈরি করে রাখলেন—কিছুক্ষণ পরেই এটির প্রয়োজন হবে জেনে। দশাননজয়ী রামচন্দ্রকে স্তুতিবন্দনা করতে দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা ঋষি অগস্ত্যের নেতৃত্বে এসে তাঁকে শিবপূজার জন্য একটি শুভক্ষণও নির্দেশ করেছিলেন। ঐসময়ের মধ্যেই শিবপূজা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু মহাবীর তো গিয়েছেন কোন্ সুদূর কৈলাসে। তাঁর কাছে তো কোন ঘড়ি ছিল না। তাই আসতে আসতে সেই শুভক্ষণটি প্রায় শেষ হয়ে যায় আর কি! চিন্তিত ঋষিকুল রাম-লক্ষ্মণকে তাই বললেন, দেরি হয়ে গেলে পূজার ফল তো আর পাওয়া যাবে না! অগত্যা মা জানকীর স্বহস্তে নির্মিত এই শিবলিঙ্গেই শিবের অধিষ্ঠান প্রার্থনা করে শুভক্ষণের মধ্যেই শিবপূজা শুরু হলো। মা জানকী তখন বোধহয় মুচকি হাসছিলেন, তাঁর খেলার ছলে নির্মিত শিবলিঙ্গই তাঁর পতিদেবতার পাপহরণের সহায়ক হলেন! সীতা ও রামচন্দ্র সেই বালির তৈরি লিঙ্গমূর্তিতেই আগমবিধি অনুসারে শিবপূজা করে তাঁর আবির্ভাব প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মহত্যা বধের পাপ স্খালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র যথাবিধি আত্মসমর্পণ করে শরণাগত হলেন। স্বয়ং নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে দেবী পার্বতী-সহ আশুতোষ শঙ্কর সেই লিঙ্গমূর্তিতেই জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে কলুষমুক্ত করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি এই ঘটনার স্বীকৃতিস্বরূপ এখানে চিন্ময় দেহে নিত্য বিরাজিত থাকার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। বরদান করলেন—এই তীর্থে যাঁরা ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে সমুদ্রতীরে স্নান করবে ও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করবে, তারাও পাপমুক্ত হবে। আর শ্রীরামপূজিত এই লিঙ্গের নাম হবে 'রামেশ্বর-রামলিঙ্গ' এবং এই স্থানটির নাম হবে 'রামেশ্বর তীর্থ'।

রামেশ্বর লিঙ্গ পূজিত হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই মহাবীর আকাশপথে এসে হাজির। তাঁর দুই হাতে দুটি কালোপাথরের শিবলিঙ্গ। সমুদ্রতীরে নেমে তাঁর তো চক্ষুস্থির! সামনেই সমুদ্রতীরে বালির তৈরি একটি লিঙ্গ বিরাজিত। তাতে পূজার সব পুষ্পমাল্যাদি নিবেদিত অর্থাৎ শিবপূজা শেষ! দারুণ অভিমান হলো মহাবীরের। কিন্তু উপায় নেই, ঠিক সময়ে তো তিনি এসে পৌঁছাতে পারেননি, তবুও রামচন্দ্রের কাছে তাঁর অভিমান-দুঃখ জানাতে কসুর করলেন না। তখন লীলাময় রামচন্দ্র হনুমানকে বললেন: "ঠিক আছে, তুমি ঐ বালির শিবলিঙ্গ তুলে দিয়ে ওখানে তোমার নিয়ে আসা লিঙ্গটিকে বসিয়ে দাও। আমরা আবার তাঁকেই পূজা করব।" বীর হনুমান রামচন্দ্রের কথায় খুশি হয়ে সেই বালির লিঙ্গটি টেনে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ঐ বালির লিঙ্গ একটুও ভাঙল না! তখন মহাবীর বিরাট মূর্তি ধরে তাঁর বিশাল লেজটি দিয়ে লিঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে উপড়ে আনতে চেষ্টা করলেন। স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি মহাশক্তি যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কার সাধ্য তাঁকে নষ্ট করে। সেই লিঙ্গের কোন পরিবর্তন সম্ভব হলো না দেখে এবং বিরসমুখে পবননন্দনকে বসে পড়তে দেখে রামচন্দ্র এই আদি লিঙ্গটির সৃষ্টির কথা তাকে বললেন—এটি দেবী জানকীর প্রতিষ্ঠিত, তাই একে অপসারিত করা কারোরই সাধ্য নয়। তবে ভক্তাগ্রণী মহাবীরের ভক্তি ও শক্তির মর্যাদা রাখার জন্য তাঁর আনীত দুটি মূর্তির একটিকে মূল রামেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের উত্তর কোণে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর নাম দিলেন 'বিশ্বনাথ' বা 'হনুমদীশ্বর'। শ্রীরামচন্দ্র আরো বিধান দিলেন—নিত্য রামেশ্বরের পূজার আগে এই বিশ্বনাথের পূজা হবে। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। [ক্রমশ]

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাক বিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাসের ২০ (অথবা ২১) তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাস অনুযায়ী ৬ বা ৭ তারিখে। গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। সম্ভব হলে আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস হয়ে গেলে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয় তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ সরস্বতী নদী

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ এবং পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় দুই পর্বে প্রকাশিত শ্রীমণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী' এক অসাধারণ লেখা। লেখক যেভাবে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক উপগ্রহ চিত্র এবং ভূসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যাথার্থ্য বিচার করে সুদক্ষ হাতে তাঁর প্রবন্ধে প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করেছেন, তা এককথায় অনবদ্য। বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের ওপরও লেখক অত্যন্ত সাহসী এবং তথ্যনির্ভর বক্তব্য পেশ করেছেন। আর প্রবন্ধের সঙ্গে পরিবেশিত চিত্রগুলিও তার স্বাদ বাড়িয়েছে। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সরস্বতী নদী প্রসঙ্গে আরো দু-একটি কথা বলতে চাই।

মহাভারতের যুগের আগেই যে সরস্বতী নদী শুকিয়ে গিয়েছিল, সেকথা আমরা মহাভারতের বনপর্ব (৬।৩) এবং শল্যপর্ব (৩৬।১) থেকে জানতে পারি। সেখানে সরস্বতী নদীর শুষ্ক, মরুময় রূপ। তাই শুধু সে-নদীর অতীত মাহাত্ম্যই বর্ণিত। কিন্তু শল্যপর্বে (৪৭) সরস্বতীমাহাত্ম্যের একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় সনাতন ধর্মসংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল দিক প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনীটি এরকম—

একবার দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ঋষিগণ নানা স্থান থেকে এসে সরস্বতীর তীরে সমবেত হন। তখন সারস্বত মুনি তাঁদের নিয়ে খাদ্যান্বেষণে অন্যত্র যেতে উদ্যোগী হলে স্বয়ং সরস্বতী নদী দিব্যমূর্তিতে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন :

"ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র। তবাহারমহং সদা।
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানদ্যতামিতি ভারত॥"

—পুত্র, এস্থান থেকে তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। আমিই তোমাদের আহারের জন্য সুস্বাদু মৎস্য দেব। তোমরা তা ভোজন কর।

সরস্বতী নদী একথা বললে সারস্বত মুনি ও অপর মুনিগণ সেখানেই রয়ে গেলেন এবং প্রাণ ও বেদধারণ করার জন্য নদী-প্রদত্ত মৎস্য প্রত্যহ ভোজন করতে থাকলেন। আহারের ব্যাপারে যে সনাতন ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে কোন অহেতুক বাছবিচার ছিল না—এই উদারতার দিকটিই এই কাহিনী তুলে ধরেছে।

এবারে বর্তমানে ফিরে আসি। সরস্বতী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলি। গত ১৯৯৯-সালে সরস্বতী নদী পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনটি প্রকল্প গৃহীত হয়—

প্রথম প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, 'আদি বদরি' (যমুনানগর জেলা) থেকে 'পেহোয়া' (যা মহাভারতের 'পিত্রুদক' নামে বর্ণিত) পর্যন্ত অঞ্চলে পুরনো নালাগুলির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন। এই পেহোয়াতে বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ছিল। বারাণসীর গঙ্গাঘাটের চেয়েও অনেক পুরনো ছিল এই সরস্বতীঘাট।

দ্বিতীয় প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, জলসরবরাহকারী নল (piped feeder) দিয়ে শতদ্রু নদীর জল (perennial water) ভাকরার মূল জলাধার থেকে পেহোয়া পর্যন্ত নিয়ে আসা। এই ব্যয়সাধ্য কাজটির (ব্যয় হবে প্রায় ১৪ কোটি ডলার) ৫০% ব্যয় বহন করবে একটি জনদরদি সংস্থা এবং বাকিটা দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পেহোয়া পর্যন্ত নদীতে সারাবছর জল থাকবে।

তৃতীয় প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, সরস্বতীর প্রাচীন জল নির্গমন খাতগুলির নকশা পুনরাবিষ্কার করা এবং ভূগর্ভস্থ জলসঞ্চয়ক-গুলিকে (aquifer and sanctuaries) চিহ্নিত করা—পশ্চিম গাড়োয়ালের বন্দরপুছের হর-কি-দুন হিমবাহ থেকে আরব-সাগরের তীরে প্রভাসপতন পর্যন্ত। এই তিনটি প্রকল্প রূপায়িত হলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় ২০ কোটি মানুষের জলসমস্যা মিটবে।

তন্ময় ধর
নবগ্রাম, হুগলি-৭১২২৪৬

রেইকি : আত্মোন্নতির এক নতুন পথ

'রেইকি' (Reiki) একটি জাপানি চিকিৎসাব্যবস্থা, যা ঊনবিংশ শতকে ডাঃ মিকাও উশুই (Mikao Ushui) ২,৫০০ বছরের পুরনো সংস্কৃত সূত্র থেকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। শব্দগতভাবে 'রেইকি' দুটি জাপানি শব্দের সমষ্টি। 'রেই' (Rei) অর্থে মহাজাগতিক শক্তি (cosmic energy), যা পৃথিবীতে, সৌরজগতে, নক্ষত্রমণ্ডলে—সর্বত্রই বিরাজিত। আর 'কি' (ki) অর্থে, যে সৃষ্টিকর্ত্রী বা পালনকর্ত্রী শক্তি সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি এবং পালন-পোষণ করে থাকে। অর্থাৎ 'রেইকি' একটি শক্তি এবং এটি একটি শক্তিসঞ্চারী চিকিৎসাব্যবস্থা।

রেইকির সৌন্দর্য তার অনায়াসসাধ্যতায়। এটি অনুশীলনের জন্য একমাত্র নিজের হাত ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। এতে কোন ওষুধ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক ব্যবহার করা হয় না। ছোট শিশু থেকে মরণোন্মুখ বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে অনায়াসে রেইকি অনুশীলন করতে পারেন। এর বিশেষ সুবিধা হলো স্ব-চিকিৎসা। একবার শেখা হয়ে গেলে যখন এবং যেখানে খুশি এর অনুশীলন করা যায়। আবার অন্যদের জন্যও এর প্রয়োগ করা যায়, কারণ এটি একটি শক্তিমাত্র। অন্য যেকোন চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রেইকি অনুশীলন চলতে পারে। সাধারণ জ্বর-সর্দি-কাশি থেকে টিউমার, ক্যান্সার পর্যন্ত সবরকম অসুখেই রেইকির উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়।

রেইকি অনুশীলনের জন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। যেকেউ যেকোন অবস্থায় এর অনুশীলন করতে পারেন। রেইকি এমনকি বিশ্বাসেরও প্রতীক্ষা করে না। অনুশীলন করতে করতেই ফললাভ হয় এবং বিশ্বাসও আসে।

মানুষের তিনটি অবস্থা—শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। রেইকি অনুশীলনের সময় প্রথম দৃষ্টি দেওয়া হয় শরীরের দিকে। কারণ, আমরা যে-কাজই করি না কেন—ঘরের, অফিসের বা ধ্যান-জপ—সবই করতে হয় এই শরীর দিয়ে। কিন্তু যদি শরীর সুস্থ না থাকে, তাহলে সব কাজই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সব অনুষ্ঠানই মনে হয় নিরর্থক। আবার যখন মন ভাল থাকে না, তখন রাগ, দুঃখ, আক্ষেপ আমাদের অশান্ত করে তোলে। তখন জীবন বিষময় বলে বোধ হয়। আবার চিকিৎসকরা বলেন, বেশির ভাগ অসুখই সৃষ্টি হয় মনের অ-সুখ থেকে। তাই আজকাল অনেক অসুখই বহু পুরনো, কারণ চিকিৎসা হয় শুধু রোগলক্ষণের, অ-সুখ থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রেইকি অনুশীলনের সময় বাহ্য প্রকাশের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা হয় রোগের মূল উৎসমুখও। যখন রোগীর মনের অভাব, অসুবিধা, অভিযোগগুলিকে জানা যায়, তখন তা সারিয়েও ফেলা যায় এবং শারীরিক প্রকাশগুলিও দূর হয়ে যায়। অনেকসময় এই বাহ্য প্রকাশ এড়ানো যায়, যদি সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তোষ, অসুবিধার প্রতিকার করা যায়। আর যখন শরীর-মন সুস্থ ও পরিশীলিত, তখন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও অনিবার্য। এইভাবেই রেইকি কাজ করে তিনটি স্তরে। শুরু হয় শরীর দিয়ে, কিন্তু চরম লক্ষ্য থাকে আধ্যাত্মিক জাগরণ।

রেইকি চিকিৎসার তিনটি স্তর—প্রথম স্তরে শুধু স্পর্শ করে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে রেইকি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে কাজ করে এবং বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিরও চিকিৎসা করা যায়। তৃতীয় স্তর সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক এবং একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিরাই এই স্তর শেখার জন্য আসেন। এখানে এসেই আমরা বুঝতে এবং অনুভব করতে পারি স্বামীজীর সেই কথা ঃ "ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু/ সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" প্রত্যেকটি স্তরই পৃথগ্‌ভাবে শিখতে হয়।

রেইকি একান্তভাবেই গুরুমুখী বিদ্যা। যিনি শেখান তাঁকে 'রেইকি মাস্টার' বলে। রেইকি শেখার এক অপরিহার্য অঙ্গ হলো 'attunement' বা 'initiation'। কি হয় এতে? আসলে রেইকি একটি শক্তিবিশেষ। এবং সকলের মধ্যেই সেই শক্তি বর্তমান। যেমন আমাদের প্রাণ আছে। আবার অন্যভাবে বলা যায়, আমরা এই মহাজাগতিক শক্তির প্রকাশমাত্র। রেইকি মাস্টার শুধু আমাদের কিছু কিছু শক্তিকেন্দ্রকে খুলে আমাদের মনের বন্ধ জানলা-দরজা একটু খুলে দেন মাত্র, যাতে এই শক্তি আমার ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে আমার মধ্যে আরো বেশি ক্রিয়া করতে পারে।

রেইকি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্নিহিত বোধশক্তি (individualized intelligent energy)। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার মধ্যে ক্রিয়া করে। তবুও কতকগুলি সাধারণ উপকার কম-বেশি সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এটি এক অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দ প্রদান করে, যা মনের শান্তি ও দুর্ভাবনামুক্তিতে সাহায্যকারী। এটি মনঃসংযম করতে সাহায্য করে, একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। রেইকি সমগ্র সত্তার ওপরে কার্যকরী এবং আমাদের অবদমিত কামনা-বাসনাকে প্রকাশ ও শমিত করতে সাহায্য করে। এটি সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটায়। নিয়মিত রেইকির অনুশীলন নিজেদের এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সচেতনতা আনে। যেকোন ধরনের ব্যথা-বেদনা, রক্তপাত ইত্যাদি প্রশমিত করতে রেইকি বিশেষভাবে উপকারী।

Bandana Sengupta
D1/2 Balaji Towers; 54, 10th Avenue
Asokenagar, Chennai-600083

আর্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর মত

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৪১১ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীকনকবরণ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি আর্যদের আদি নিবাস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত বিষয়ে 'ভাববার কথা' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেটি ছাড়াও স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র আরো তিনটি স্থানে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সেগুলি হলো ঃ

(ক) "আর্যগণ সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন—সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এইসব মতামতের সঙ্গে সেখানেই ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না! আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তরমেরুনিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! আমাদের শাস্ত্রে এইসকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে—আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৪০৮, পৃঃ ১৪৬)

(খ) "দ্রাবিড়ীরা মধ্য এশিয়ার এক অনার্য জাতি—আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সবচেয়ে সভ্য ছিল।" (ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০৭, পৃঃ ২০১)

(গ) "আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে আসেন। ক্রমে আর্যগণের এইসকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্যগণই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন।" (ঐ, ৮ম খণ্ড, ১৪০৬, পৃঃ ১৫৭)

আপাতদৃষ্টিতে (ক)-এর সঙ্গে (খ) এবং (গ)-এর বিরোধ আছে বলে মনে হলেও বস্তুত তা নয়। মূল আলোচ্য প্রসঙ্গে (খ) এবং (গ)-এ উল্লিখিত 'ভারত' বলতে স্বামীজী বর্তমান ভারতখণ্ড বুঝিয়েছেন, যার তুলনায় (ক)-এ উল্লিখিত প্রাচীন 'ভারত' ভূখণ্ড অনেক বড় ছিল। স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আর্যরা প্রথমাবধি ভারতবাসী।

স্বামী নিরন্তরানন্দ
বেলুড় মঠ, হাওড়া

সাধারণ স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা

শক্তি মুখোপাধ্যায়*

প্রশ্ন ঃ ***শোনা যায়, সরষের তেল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহলে কী তেল খাওয়া ভাল?***

উত্তর ঃ সরষের তেল যদি নির্ভেজাল এবং খাঁটি হয়, তাহলে কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। তবে অনেক দুর্নীতিপরায়ণ হৃদয়হীন ব্যবসায়ী এমনই স্বার্থান্বেষী যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি করতে কোনরকম দ্বিধা না করে নানারকমের ভেজাল দ্রব্য সরষের তেলে মেশায়। ফলে সরষের তেল অবশ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে 'ক্ষতিকর' আখ্যা লাভ করে। সম্প্রতি ভারতেই কয়েকজন গবেষক দেখিয়েছেন, ফিস অয়েলের মতো রোজ প্রায় ৩ গ্রাম সরষের তেলের ব্যবহার হার্ট অ্যাটাকের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা (প্রথম হার্ট অ্যাটাক যাদের হয়ে গেছে, তাদেরই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে) বা বুকের ব্যথা অনেক কমিয়েছে। খাঁটি সরষের তেলে থাকে উপকারী আলফা লাইনোলেনিক অ্যাসিড। তাছাড়া সবরকম তেলেই যেমন ক্যালরি বেশি থাকে, তেমনি সরষের তেলেও থাকে—প্রতি গ্রামে ৯ খাদ্যক্যালরি। তাই অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড তেল হলেও পরিমাণ কম না করলে শরীরের ওজন বাড়বে এবং তার আনুষঙ্গিক কুফল দেখা দেবে। অন্যান্য তেলের মধ্যে সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরা নারকেল তেল, তালের তেল বা তালশাঁসের তেল দেহে কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে এবং ঘি বা মাখনের মতোই এগুলি ক্ষতিকর। উপকারী অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডবাহী তেলগুলি আবার দুধরনের—মনো এবং পলি আনস্যাচুরেটেড তেল; এদের মধ্যে মনো আনস্যাচুরেটেড তেল হলো—জলপাইয়ের তেল বা অলিভ অয়েল, বাদাম তেল, ক্যানোলা অয়েল বা রেপসিড অয়েল এবং সম্ভবত সরষের তেল। পলি আনস্যাচুরেটেড তেলগুলি হলো সূর্যমুখী ফুলের তেল, ভুট্টার তেল বা কর্ণ অয়েল (corn oil) ও সয়াবিনের তেল। যদিও এই দুধরনের তেলই দেহে মন্দ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে, পলি আনস্যাচুরেটেড তেলগুলিতে রক্তে 'গুড কোলেস্টেরল' বা HDL-C কমাতে পারে (যার আধিক্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল)। মনো আনস্যাচুরেটেড তেলগুলিতে কিন্তু 'গুড কোলেস্টেরল' কমে না। এছাড়া পলি আনস্যাচুরেটেড তেল ব্যবহার করে অন্ত্রে কিছু মানুষের ক্যান্সার হতে দেখা গেছে, তবে তার সম্বন্ধে আজও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আমার মতে, পরিমিত মনো আনস্যাচুরেটেড তেল ব্যবহার করাই ভাল। আমেরিকাতে আমরা ক্যানোলা বা রেপসিড অয়েল ব্যবহার করে থাকি। অলিভ অয়েল বেশ ঘন এবং ক্যালরি-বহুল—তবু পাতলা অলিভ অয়েলও ভাল তেল এবং উপকারী। কিন্তু পরিমাণ সম্বন্ধে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ***অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার সঙ্গে হার্টের রোগ বা প্রেসারের কোন সম্পর্ক আছে কি?***

উত্তর ঃ অবশ্যই আছে। অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ খাওয়া রক্তের উচ্চচাপ (হাইপারটেনশন) ও হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। অনেক ব্লাড প্রেসারের রোগীর রক্তচাপ লবণ খেলে বেড়ে যায় এবং যেসমস্ত ওষুধে শরীর থেকে লবণ প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়, তাদের ব্যবহারে রক্তচাপ আয়ত্তে আসে। বয়স্কদের বা কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীদের রক্তের উচ্চচাপ বেশির ভাগই লবণভিত্তিক (Salt sensitive)। এছাড়া ব্লাড প্রেসারের চিকিৎসাতেও প্রথম ধাপের ওষুধ হিসাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই লবণ-নিষ্কাশনকারী ডায়ুরেটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তখন লবণের সঙ্গে শরীর থেকে জলও মূত্র হয়ে বেশি পরিমাণে বেরিয়ে যায়। ব্লাড প্রেসারের যখন কোন ওষুধ ছিল না, তখন কেবল লবণ খাওয়া বন্ধ রেখে দুধ-ভাত খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। তাই সকলের পক্ষেই বেশি লবণ খাওয়া ভাল নয়; অন্তত যাদের পরিবারে ব্লাড প্রেসারের অসুখ আছে, তাদের প্রথম থেকেই লবণ খাওয়া সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

প্রায় সমস্ত হার্টের অসুখের পরিণতি হার্ট ফেলিওরে। এই অবস্থাতে শরীরে জল জমতে থাকে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং ক্রমশ পা থেকে সারা দেহে জল জমে দেহ ফুলে ওঠে। কিডনি তার স্বাভাবিক ধর্ম ত্যাগ করে প্রস্রাবের সঙ্গে লবণ প্রায় সম্পূর্ণ শুষে নেয়, ফলে জলও দেহে বেশি জমে ওঠে। তাই হার্টের অসুখে, বিশেষ করে যাতে হার্ট ফেলিওরের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বা দেখা দিয়েছে, তাদের পক্ষে লবণ খাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। ডায়ুরেটিক ওষুধ দিয়ে হার্ট ফেলিওরের চিকিৎসা করা হয় এবং ঠিকমতো চিকিৎসায় শরীর থেকে লবণ ও তার সঙ্গে জল বেশি পরিমাণে নিষ্কাশিত হয়ে হার্ট ফেলিওরের কষ্টের উপশম হয়। তাই লবণ খাওয়া, বিশেষ করে রান্নায় বেশি পরিমাণে দেওয়া বর্জনীয়।

প্রশ্ন ঃ ***হার্টের রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে কি কি সতর্কতা নেওয়া উচিত?***

উত্তর ঃ হার্টের রোগ বলতে কোন একটি রোগকে বোঝায় না। অনেক ধরনের হার্টের রোগ হয় এবং তাদের থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যেমন রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ থেকে

* *আমেরিকার সিরাকুজ-নিবাসী ডাঃ শক্তি মুখোপাধ্যায় হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ, 'উদ্বোধন'-এর শুভার্থী।*

অব্যাহতি পেতে গেলে রিউম্যাটিক ফিভার ও তার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ঘেঁষাঘেঁষি করে বেশি লোক একসঙ্গে না থাকা এবং গলার প্রদাহ হলে (যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাল জীবাণু দ্বারা হয়) তাড়াতাড়ি উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা এবং একবার রিউম্যাটিক অসুখ হলে বহু বছর ধরে তার প্রতিষেধক অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসকের নির্দেশমতো ব্যবহার করা রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ প্রতিরোধ করার প্রধান উপায়।

হাইপারটেনশন বা রক্তের উচ্চচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে হার্টের রোগ হওয়া খুবই সম্ভব এবং সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা চালিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত রাখলে হার্টের অসুখ দূরে রাখা অবশ্যই সম্ভব হয়। সুচিকিৎসকের পরামর্শমতো জীবনযাত্রার অদলবদল করে এবং নিয়মমতো ওষুধ ব্যবহার করে রক্তচাপ আয়ত্তে রাখা যায়। এবিষয়ে 'হার্ট, হাইপারটেনশন ও ডায়াবিটিস—কিছু নতুন তথ্য' গ্রন্থটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

করোনারি ধমনির অসুখ থেকে হার্টের রোগ আজকাল খুবই দেখা যায় এবং তার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। হার্ট অ্যাটাক থেকে হঠাৎ মৃত্যু, বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা, হার্ট ফেলিওর, হার্ট ব্লক, হার্টের গতিছন্দের বিকৃতি—এসবই করোনারি ধমনির অসুখ থেকে হতে পারে। তাই যেসমস্ত বিপদসঙ্কেত (risk factor) করোনারি অসুখের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, সেগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থেকে উপযুক্ত প্রতিরোধব্যবস্থা অবলম্বন করলে হার্টের রোগও কম হতে দেখা যায়। সেই বিপদসঙ্কেতগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) যেগুলি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না এবং (২) যেগুলি আমরা অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পারি।

প্রথমেই বলা দরকার, পারিবারিক ইতিহাসে যাদের করোনারি ডিজিজের প্রবণতা আছে তাদের এই বিপদসঙ্কেত বংশগত এবং তার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যেসমস্ত বিপদসঙ্কেত আমরা আয়ত্তে রাখতে পারি, সেগুলি হলো—(ক) রক্তের উচ্চচাপ বা ব্লাড প্রেসারের অসুখ, (খ) কোলেস্টেরল সমস্যা, (গ) ডায়াবিটিস, (ঘ) ধূমপান করা, (ঙ) দৈহিক স্থূলতা এবং শ্রমবিমুখ নিষ্ক্রিয়তা।

উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে 'হার্ট, হাইপারটেনশন ও ডায়াবিটিস—কিছু নতুন তথ্য' গ্রন্থে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়েছে এবং হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করার নির্দেশগুলিও বিশদভাবে বলা হয়েছে। উৎসাহী পাঠককে গ্রন্থটি পড়তে অনুরোধ করছি।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, দেহের ওজন বেশি থাকলে নিয়মিত ব্যায়াম করে ও খাদ্যক্যালরি কমিয়ে তা আয়ত্তে রাখা যায়। কোলেস্টেরল সমস্যার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শমতো জীবনযাত্রার অদলবদল করা ছাড়াও অনেক সময় উপযুক্ত ওষুধের প্রয়োজন হয় এবং সতর্কতার সঙ্গে তার মাত্রা ঠিক করে খেয়ে যেতে হয়, যাতে খালি পেটে রক্তে মন্দ কোলেস্টেরল পরীক্ষা করলে প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নিচে থাকে। এই কোলেস্টেরল সমস্যার আবার অনেকপ্রকার ভেদ আছে। যেমন, কারো ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি ও গুড কোলেস্টেরল কম (Low HDL-C), কারো একটি বিশেষ ধরনের কোলেস্টেরল, যেমন LP(a) বেশি—এসবই সুচিকিৎসকের দ্বারা নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসাব্যবস্থাও সেইমতো বিভিন্ন ধরনের করা হয়।

যাদের বিপদসঙ্কেত (এক বা একাধিক) আছে, তাদের রোজ ১টি করে এনটেরিক কোটেড অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়া ভাল, তাতে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আগে দরকার। রোজ অন্তত ১০ মিনিট করে ৩ বার অর্থাৎ মোট ৩০ মিনিট জোরে হাঁটা দরকার। যাদের অসুবিধা আছে, তাদের পক্ষে সাঁতার কাটা ভাল ব্যায়াম। তার সুবিধা না থাকলে সারাদিনে সক্রিয় থাকাও ভাল—বাগান করা, দোকান-বাজার করা ইত্যাদি নিয়ে।

খাবারের মধ্যে ঘি, মাখন এবং রিফাইণ্ড কার্বোহাইড্রেট যেমন ময়দা, সাদা ভাত, মিষ্টি, বেশি পরিমাণে আলু—এসব কম খেতে হবে। তার বদলে ফাইবারপুষ্ট কার্বোহাইড্রেট, যেমন গম-ভাঙা (লাল) আটার রুটি, শাকসবজি, ফলমূল—এসব উপকারী খাদ্যসামগ্রী খেতে হবে। ভিজানো ছোলা, ডাল, ছাতু, সয়াবিনের আটা ও বাদাম—এসব স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। মাছ (তৈলাক্ত সামুদ্রিক মাছ হলে বেশি ভাল) সপ্তাহে দুদিন এবং মাঠা-তোলা দুধ ও সেই দুধ থেকে তৈরি দৈ ভাল খাবার। মাংস, বিশেষ করে চর্বিযুক্ত হলে এড়িয়ে চলা শুভ। মুরগির মাংসেরও পরিমাণ পরিমিত রাখা দরকার। ডিমের কুসুমও কম খাওয়া ভাল—কোলেস্টেরল সমস্যা থাকলে তা এড়িয়ে চলতেই পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে আজকাল সপ্তাহে ১টির বেশি ডিম খেতে বারণ করা হচ্ছে।

ডায়াবিটিস একটি বংশগত রোগ হলেও ঠিকমতো জীবনযাত্রার অদলবদল (life style modification) করে চললে এবং দেহের ওজন আয়ত্তে রাখলে অনেকসময় তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনমতো এবং সুচিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে—তা ট্যাবলেট হতে পারে কিংবা ইনসুলিন ইঞ্জেকশনও হতে পারে। ডায়াবিটিসে ব্লাড সুগার সুনিয়ন্ত্রিত রাখলে এবং আনুষঙ্গিক জটিলতাগুলি, যেমন ব্লাড প্রেসার ও কোলেস্টেরল সমস্যা আয়ত্তে রাখতে পারলে হার্টের রোগও দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

ধূমপান বর্জন করা হার্টের রোগ প্রতিরোধ করার একটি বিনাখরচের মঙ্গলজনক ব্যবস্থা।

দৈহিক স্থূলতার জন্য ব্লাড প্রেসার, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্বাস অবরুদ্ধ হওয়া এবং হার্ট ফেলিওর—এসবই হতে পারে। তাই হার্টের রোগ প্রতিরোধ করতে হলে দেহের ওজন কমাতেই হবে এবং খাদ্যক্যালরি নিয়ন্ত্রণ করে ও দৈহিক সক্রিয়তা বাড়িয়েই তা করা সম্ভব হবে। ❑

এক নতুন ধাঁচে 'কথামৃত'-নির্দেশিকা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—নির্দেশিকা, ১৮৮২ • সঙ্কলক: ডাঃ শিবনারায়ণ গাঙ্গুলি • প্রকাশক: গ্রন্থকার, ৫৬/১০, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৪০ • মূল্য: ১০০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮+৩৪৭ • প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০২

যে-গ্রন্থের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল নেহাতই ব্যক্তিগত দিনলিপি হিসাবে এবং লেখক "নিজেরই মঙ্গলের জন্য প্রথম লিখতে" শুরু করেছিলেন যে-গ্রন্থের খসড়া, শ্রীম-কথিত সেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' আজ দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন-বেদ। শতাব্দী-প্রাচীন গ্রন্থটির মধ্যেই আজকের মানুষ তাঁদের আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন, খুঁজে পাচ্ছেন তাপিত জীবনের আশ্রয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে আজ অবধি বহু ভক্ত, পণ্ডিত বহুরকমের ভাষ্য, বিশ্লেষণ, অনুধ্যান, বিচার করেছেন এবং এখনো করছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—নির্দেশিকা, ১৮৮২' গ্রন্থটি সেই বিচিত্র চর্চার ধারায় এক নতুন সংযোজন। গ্রন্থ-নাম থেকেই গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়। গ্রন্থকার প্রদত্ত প্রাক্-কথা অনুসারে—"মূল কথামৃত... স্থানভিত্তিক।... পরবর্তী অখণ্ড প্রকাশনগুলিতে [অর্থাৎ উদ্বোধন সংস্করণ] তারিখভিত্তিক উপস্থাপনা রয়েছে। বর্তমান সঙ্কলন কথামৃতের বিষয়-ভিত্তিক পরিবেশন।" বিষয়ভিত্তিক মানে, 'কথামৃত'-এ ধৃত ১৮৮২ সালের যাবতীয় আলোচনাকে 'জীব ও জগৎ', 'ঈশ্বরের স্বরূপ', 'ঈশ্বরলাভের সাধনা' এবং 'আত্মকথা ও পরিবেশ'—এই চার অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা।

উদ্বোধন-সংস্করণে মাস্টারমশায়ের বিবরণীকে শুধু কালানুক্রমিক রূপ দেওয়াই হয়নি, সেইসঙ্গে এক বিস্তৃত নির্দেশিকা, শব্দার্থ, ব্যক্তি ও স্থান পরিচয়, গান ও গল্পের সূচিও যোগ করা হয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এই সংযোজন আধুনিক 'কথামৃত'-পাঠকের এক বড় সহায়। এছাড়াও আছে ডঃ জলধিকুমার সরকার প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মহা-নির্দেশিকা', যেটি 'কথামৃত'-নির্দেশিকা রচনার ক্ষেত্রে একটি দিগ্‌দর্শক। কিন্তু ডাঃ শিবনারায়ণ গাঙ্গুলি এতে সন্তুষ্ট না থেকে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশিকা-গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছেন। ধারণা করাই যায়, 'কথামৃত'-এ বিধৃত পরবর্তী চার বছরের অনুরূপ নির্দেশিকা প্রণয়নের পরিকল্পনাও তাঁর নিশ্চয় আছে।

যেকোন আদর্শ নির্দেশিকাকে প্রাথমিকভাবে তিনটি গুণ অর্জন করতেই হয়: সংক্ষিপ্ততা, সুস্পষ্টতা এবং ব্যবহার-উপযোগিতা। এই প্রাথমিক শর্তের কথা মাথায় রেখে ডাঃ গাঙ্গুলির গ্রন্থটি বিচার করতে গেলে প্রথমেই হোঁচট খেতে হবে। ১৮৮২ সালের বিবরণী মূল 'কথামৃত'-এ আছে ১৩৪ পৃষ্ঠা জুড়ে, আর নির্দেশিকা গ্রন্থটি ৩৪৭ পৃষ্ঠার। আয়তনের এই অসামঞ্জস্যের জন্য মূল দায়ী পুনরুক্তি-প্রবণতা। যেমন, হোমাপাখির গল্প (৫ মার্চ ১৮৮২) প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ১৯), বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা অংশে এই গল্পের উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখানে আবার পুরো গল্পটি উদ্ধৃত (পৃঃ ৩৪৭)। এমন পুনরুক্তি গ্রন্থটিতে বারবার হয়েছে। আবার শ্রীম-র প্রথম দর্শনের পূর্বে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বিস্তৃত বর্ণনা 'ঈশ্বরলাভের সাধনা' অধ্যায়ে সংযোজন করার কোন প্রয়োজন ছিল না (পৃঃ ৭১-৭৩)। যেমন প্রয়োজন ছিল না শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী পত্রটি গ্রন্থের শুরুতে একবার মুদ্রিত করে আবার নির্দেশিকা অধ্যায়ে আগাগোড়া উদ্ধৃত করার (পৃঃ ৩১৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমুদয় আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ের স্বেচ্ছাকৃত ধরাকাটে আটকে রাখতে গিয়ে এই নির্দেশিকার সুস্পষ্টতাও অনেক সময় ব্যাহত হয়েছে। 'রামনাম'-এ অবিচল বিশ্বাস রাখার যে-গল্পটি ঠাকুর (৫ মার্চ ১৮৮২) বলেছিলেন, সেটি 'জীব ও জগৎ' অধ্যায়ে স্থান পেল; কিন্তু সামান্য ভাষান্তরে (৫ আগস্ট ১৮৮২) বলা সেই একই গল্প সঙ্কলক রাখলেন 'ঈশ্বরের স্বরূপ' অধ্যায়ে (পৃঃ ১৮ ও ৫৬)। আবার 'বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা' অধ্যায়ে 'রামনাম' শিরোনামে গল্পটির উৎস হিসাবে দ্বিতীয় দিনের কোন উল্লেখ নেই (পৃঃ ৩০৭)। "আমার একবার খুব বাতিক বুদ্ধি হয়েছিল, তাই গলায় ছুরি দিতে গিছলুম!" (১৪ ডিসেম্বর ১৮৮২)—ঠাকুরের এই সংক্রান্ত স্মৃতিচারণটিও 'জীব ও জগৎ' এবং 'ঈশ্বরের স্বরূপ' দুই অধ্যায়েই সঙ্কলিত (পৃঃ ৪২ ও ৭০)। সিদ্ধান্তগ্রহণে এই অস্পষ্টতা যেকোন নির্দেশিকার ব্যবহারযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করবেই।

অস্পষ্টতা রয়েছে 'বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা'র শিরোনাম নির্দেশেও, অর্থাৎ কোন্ বিষয় কোন্ শিরোনামে যাবে—সেই পরিকল্পনায়। ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে জাহাজে আলোচনা করতে করতে ঠাকুর বলেছিলেন: "ঈশ্বরই সৎ নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ অনিত্য, দুই দিনের জন্য।" এই বাণীটি নির্দেশিকায় 'দুই দিনের জন্য' শিরোনামে স্থান দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ২২৫)। ঐ একই আসরে ঠাকুর প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন: "তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।... খেলা চললে বুড়ির আহ্লাদ। তাই 'লক্ষের মধ্যে দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি'।" এই বাণীটি 'লক্ষের মধ্যে' শিরোনামে রাখলে (পৃঃ ৩০৮) পাঠকের পক্ষে কি করে খুঁজে নেওয়া সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে, পাঠকের সবচেয়ে বড় অসুবিধার কারণ—একটি সালের মধ্যে সঙ্কলক তাঁর অন্বেষণকে সীমিত রাখার

পরিকল্পনা করেছেন। বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনার মধ্যে আবার সাল-বিভাজন কেন? কোন একটি বিষয়ে শুধু ১৮৮২ সালে ঠাকুর কী বলেছেন—সেটুকু আলাদা করে জানার মধ্যে একটা অতৃপ্তি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছেই।

তবে 'কথামৃত' তো অমৃতরসের আধার। এমন এক সুমুদ্রিত গ্রন্থে শিবনারায়ণবাবু সেই রসই আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন একটু অন্য রূপে, অন্য আধারে। তাই নির্দেশিকা হিসাবে এই গ্রন্থের কূটবিচারে না প্রবেশ করে খোলা মনে সেই রস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হলে ভক্ত-পাঠক নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করবেন। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন ঃ "মিছরির রুটি সিধে করে খাও আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।" (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) ❑

চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

Sri Ramakrishna Darshanam *• Published by : Swami Jitatmananda, President, Sri Ramakrishna Ashrama, Dr. Yagnik Road, Rajkot-360001 • Price :(Ordinary)Rs. 150, (Deluxe) Rs. 250 • Pages : 86 • Published in : July 2003*

'Sri Ramakrishna Darshanam' গ্রন্থটি একটি পেপারব্যাক সংস্করণ। ২৫×৩৫ সে.মি. আকারের এই গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ৩৬টি প্রধান প্রধান ঘটনা ও ১২টি অমূল্য উপদেশে সমৃদ্ধ। বহু চিত্রসম্বলিত হওয়ায় গ্রন্থটির একটি আলাদা আকর্ষণ রয়েছে।

এইধরনের চিত্রনির্ভর গ্রন্থ ছাপানো একটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল কাজ বলে পরিগণিত হয়। ইউরোপ, আমেরিকায় ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এইরকম অফসেট প্রিন্টিংয়ের সূত্রপাত হলেও ভারতবর্ষে তার সূচনা হতে আরো দু-তিন দশক লেগে গেছে। বর্তমানে এই ধরনের প্রিন্টিংয়ে ভারতবর্ষের ছাপাখানাগুলি যথেষ্ট দক্ষ। 'Sri Ramakrishna Darshanam' গ্রন্থটি তার ব্যতিক্রম নয়। ৫টি একরঙা ছবি ছাড়াও ৪৩টি বহুবর্ণের ছবি এই গ্রন্থের সম্পদ।

৪৩টি চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে, সেইসঙ্গে মূল্যবান উপদেশাবলীও। হায়দ্রাবাদের চিত্রশিল্পী রামকৃষ্ণ রাও এই ছবিগুলি এঁকেছেন। এই আধুনিকমনস্ক ছবিগুলি একটু 'লম্বাটে'ভাবে বিশেষ শৈলীতে তেলরঙে আঁকা।

আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেওয়ালচিত্র বা ফ্রেস্কো চিত্রের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা দেখেছি। শ্রীচৈতন্যদেবেরও দু-তিনটি সমসাময়িক হাতে আঁকা চিত্র পাওয়া গেছে। আর যিশুর ওপর ইউরোপ-সহ সারা বিশ্বের বহু গুণী শিল্পী বহু উচ্চমানের ছবি এঁকেছেন। তবে যিশুর জীবনচিত্রণ হয়েছে তাঁর দেহাবসানের অনেক শতক পরে—গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি আলোকচিত্র সম্পর্কে আমরা সকলেই পরিচিত। তাছাড়া তাঁর বিভিন্ন অন্তরঙ্গ শিষ্যের চিত্রও আজ সহজলভ্য। তাই চিত্রশিল্পী রামকৃষ্ণ রাওয়ের কাজটা একটু কঠিনই—বিশেষত আগ্রহী পাঠকদের কাছে ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে। আলোচ্য গ্রন্থটির ছবিগুলি নিঃসন্দেহে খুব উঁচুমানের, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতিকৃতিগুলি আরো জোরালো হলে ভাল হতো। চিত্রগুলির স্থানমাহাত্ম্য ও পরিবেশ রচনার উপস্থাপনা দৃষ্টিনন্দন। বিভিন্ন ছবিতে মাধ্যম ব্যবহার করে যা আঁকা হয়েছে তা বলদৃপ্ত ও সহজ-স্বাভাবিক।

কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে চিত্রগুলি আরো প্রাণবন্ত হয়েছে। গ্রন্থটির মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, আশা করা যায়। আধুনিক মানুষ যখন ক্রমশ যন্ত্রমানবে পরিণত হচ্ছে, একাকীত্বের যন্ত্রণায় যখন আধুনিক মানুষ দিশাহারা—তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলী যেন মরুভূমির বুকে মরূদ্যানের মতো। শুধু তাই নয়, এই ধরনের গ্রন্থ মানুষের মনে ভক্তিভাব ও শান্তি সঞ্চারকারীও বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন, যার অভাব এই সময়ে ভারতবর্ষ তথা এই উপমহাদেশে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের প্রকাশ যথেষ্ট সময়োপযোগী। এধরনের উচ্চমানের গ্রন্থ আরো প্রকাশিত হবে—এই আশা করা যায়। গ্রন্থটির সূচনায় পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের বক্তব্যই পুনরুল্লেখ করা যাক—"আশাকরি এই গ্রন্থের ছবি এবং উদ্ধৃতিগুলি ভক্তমণ্ডলীর কাছে আরো আনন্দ বহন করে আনবে। সেইসঙ্গে গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করি।" ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৬৩—১৯২২) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। পূর্ব নাম শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ। জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'রাজা' বলে ডাকতেন। তাই তিনি 'রাজা মহারাজ' নামে খ্যাত। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিধর এই মহাপুরুষের জীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" পরবর্তী কালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষপদে বৃত হন (১৯০১—১৯২২)। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলতেন ঃ "ও বৃন্দাবনের রাখাল।" বস্তুত, তাঁর মধ্যে একাধারে বালকবৎ আচরণের সঙ্গে সঙ্গে একটি মহাসঙ্ঘের নায়কের গুণাবলীর বিকাশ বিস্ময় জাগায়। সমাধিবান এই অধ্যাত্মপুরুষের শক্তি কেমন ছিল? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রাজা আমাদের মনগুলিকে কাদার তালের মতো যেকোন গড়ন দিতে পারে। প্রচ্ছদে বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সমাধিস্থলে নির্মিত নবরত্ন-মন্দির এবং পূজ্যপাদ মহারাজের দুটি মূল্যবান প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি উৎসব

গত ৩-৬ জানুয়ারি ২০০৫ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩ জানুয়ারি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ৪-৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ভক্তসম্মেলন।

■ **উৎসবের সাজসজ্জা** ঃ এই উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠ এক নব সাজে সজ্জিত হয়। জি. টি. রোড থেকে মঠপ্রাঙ্গণের দিকে যেতে প্রথমেই চোখে পড়ে নব-উদ্ঘাটিত কারুকার্যমণ্ডিত বিরাট স্থায়ী তোরণ। তোরণটিতে মোট ৯টি ধর্মের প্রতীক খোদিত আছে—হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদি, পারসি ও শিন্টো ধর্ম। তোরণটির ওপরদিকে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীক। তোরণ ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে চতুর্দিকে নানান বাহারি ফুল যেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছে।

উৎসব উপলক্ষ্যে নির্মিত বিশেষ তোরণ ঃ চালচিত্রে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঘটনাবলি চিত্রায়িত হয়েছে

বেলুড় মঠের মূল প্রাঙ্গণের মধ্যে অস্থায়িভাবে নির্মিত হয় আরো দুটি সুদৃশ্য উৎসব-তোরণ। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের তোরণটিতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ১৩টি ঘটনা দুর্গাপূজার চালচিত্রের ঢঙে প্রদর্শিত হয়। কিছুটা এগিয়ে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সামনে দ্বিতীয় তোরণ। এই তোরণটিকে দেখলে মনে হয় যেন মাটির তৈরি। তার গায়ে গ্রামীণ আলপনা ও নকশা এবং ওপরদিকটি আটচালা ঢঙের। এই তোরণটির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সামনে চন্দ্রমল্লিকার সজ্জা—যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মঠের দক্ষিণপ্রান্তের প্রবেশদ্বারের দুদিকে স্থাপিত হয়েছে দুটি বড় তৈলচিত্র। এগুলিতে ১৯১২ সালে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মঠে আগমন চিত্রিত করা হয়েছে। তৈলচিত্রের মধ্যে একটিতে স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখের শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া এবং অপরটিতে সেই বছরের দুর্গাপূজার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পাশে গঙ্গার ধারে বাঁধা হয় বিরাট মণ্ডপ। অনুষ্ঠান-মঞ্চের ঠিক মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের বড় ছবি। তিনি একটি পর্ণকুটিরে বসে আছেন। পিছনের পটভূমিকায় দেখানো হয়েছে গ্রামের পরিবেশ—কয়েকটি বাড়ি, দীঘি, গাছপালা আর বিরাট নীল আকাশ।

■ **অনুষ্ঠান** ঃ এই মঞ্চেই ৪-৬ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী এবং বর্তমান দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন বিদগ্ধ সন্ন্যাসিবৃন্দ, সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীবৃন্দ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা। বক্তৃতা হয় বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। প্রথমদিন সম্মেলন শুরু হয় সকাল ৯টায়, বাকি দুদিন সকাল ৮.৩০টায়। সকালের এই অধিবেশনের পরে দুপুরে প্রসাদগ্রহণ ও বিশ্রামের পর ৩টা থেকে শুরু হয় বৈকালিক অধিবেশন। বিভিন্ন ভাষণের মাঝে মাঝে পরিবেশিত হয় শ্রীমা সম্বন্ধীয় সঙ্গীত। সন্ধ্যারতির পর প্রতিদিন কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। প্রথম অধিবেশনে স্বাগত-ভাষণ দান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং পরে পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের আশীর্বচনের পর বক্তব্য রাখেন পূজনীয় সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। প্রথম অধিবেশন এবং পরবর্তী অধিবেশনসমূহের কয়েকজন বক্তার মূল বক্তব্য প্রদত্ত হলো—

পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের সম্পূর্ণ ভাষণ এই সংখ্যার ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী বলেন ঃ *আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শ্রীশ্রীমা হলেন এই পরিবার তথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননী। বলরামবাবুর বাড়িতে ১ মে ১৮৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'সঙ্ঘজননী' আখ্যা দিয়ে তাঁর কেন্দ্রীয় অবস্থান চিহ্নিত করেছেন।*

পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন ঃ *শ্রীশ্রীমা মানুষের হৃদয়ের একটি নিভৃত তন্ত্রী স্পর্শ করেছেন। কেবল ভারতে নয়—ভালবাসা ও দয়ার দ্বারা তিনি অন্যান্য অনেক দেশের মানুষকেও আকৃষ্ট করেছেন। যাঁরা তাঁর কাছে*

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সামনে নির্মিত তোরণ, পাশে উৎসব-মণ্ডপ দেখা যাচ্ছে

নিজেদের সমস্যা, এমনকি জাগতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রার্থনা করেন—তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের ডাকে সাড়া দেন। সর্বভূতে, এমনকি জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর সেই অপূর্ব ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বামী প্রভানন্দজী বলেন: *শ্রীশ্রীমা যেখানেই থাকতেন, জায়গাটি জগন্নাথক্ষেত্রের মতো দেখাত। সেখানে পাপী-পুণ্যবান, পুরুষ-নারী, শিশু-বৃদ্ধ—সকলের ছিল সমান অধিকার। তাঁর কাছে যারা আসত, তারা সকলেই তাঁর মাতৃত্বের আস্বাদ পেত।*

তৃতীয় অধিবেশনে স্বামী দেবরাজানন্দজী বলেন: *শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যস্বরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দেখা যায়—(১) ঠাকুরের চোখে তাঁর দেবীত্ব, (২) স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণ কিভাবে তাঁকে দেখেছেন এবং (৩) তিনি নিজেকে নিজে কিভাবে প্রকাশ করেছেন।*

চতুর্থ অধিবেশনের অন্যতম বক্তা স্বামী জিতাত্মানন্দজী বলেন: *শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই—নারী যদি আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হন, যদি তিনি সাধারণ নারীর জৈব মাতৃত্ব অতিক্রম করে বিশ্বমাতৃত্বের স্তরে উন্নীত হন, তাহলে তিনি ইতিহাসকে নিজের পায়ের কাছে নোয়াতে পারেন।*

সপ্তম অধিবেশনে স্বামী গোকুলানন্দজী বলেন: *যারা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যেত, তাদের বিষয়ভোগের প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কেটে যেত। জীবন তখন আর কেবল উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ নয়, তার একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে বলে ধারণা হতো।*

সর্বশেষ অধিবেশনে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী বলেন: *শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব, প্রতি মুহূর্তেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতা—এই দুই বিপরীত ভাবনাকে তিনি কথায়, আচরণে ও কাজে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনকি, তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকেই তাঁর মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।*

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 'নিবোধত' পত্রিকার সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণামাতাজী। তিনি বলেন: *গ্রামবাংলার দরিদ্র বিধবার সব দুঃখটুকুই শ্রীশ্রীমা নিজের জীবনে সহ্য করেছিলেন। পরে ঠাকুরের নির্দেশে তিনি মহানগরীতে থেকেছেন। কলকাতার মানুষ তখন ঠাকুরের ভাষায়, অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। পবিত্রতাস্বরূপিণী মা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো এই পরিবেশে এলেন তাদের পবিত্র করে কোলে তুলে নিতে।*

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, *ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে স্বামীজীর গতিশীল জীবনে নানা বাঁক ছিল—এক একটি বাঁকের মুখে আলোকবর্তিকা ধরে মাতাঠাকুরানী দাঁড়িয়েছিলেন।*

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রাজলক্ষ্মী বর্মা বলেন: *ঠাকুর কৈলাসের হিমাচ্ছাদিত পর্বতের তুল্য নিজের সাধনায় শান্ত, নীরব, একাকী, আত্মশীল। কিন্তু মা যেন সেই হিমালয়ের শীতলতা ও পবিত্রতা বহনকারিণী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর মতো।*

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষদ্বয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ, শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণামাতাজী, কেদারনাথ লাভ (ছাপড়া), ডঃ কমলা জয়া রাও (হায়দ্রাবাদ), বন্দিতা ভট্টাচার্য (কলকাতা), অঞ্জলি মুখার্জি (জে. এন. ইউ.), সুব্রতা সেন (কলকাতা), বারবারা পাইনার (আমেরিকা), পূর্বা সেনগুপ্তা (কলকাতা), ধরমবীর শেঠ (দিল্লি), এম. এস. শশিকলা (হায়দ্রাবাদ), জি. এন. মালিক (রায়পুর) প্রমুখ।

উৎসবের আরো কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য: এই সম্মেলনের নথিভুক্ত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৭,৮৪৮ জন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগদানকারী ভক্তের সংখ্যা ৬,৬৬২ জন; ভারতের অন্য ২১টি রাজ্য থেকে যোগদানকারী ভক্তের সংখ্যা ১,১৫৬ জন এবং বিদেশ—যথা আমেরিকা, রাশিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি থেকে ৩০ জন। বিকাল ৩টার পর সর্বসাধারণের জন্য মঠের গেট খুলে দেওয়া হতো। তখন নথিভুক্ত নন—এমন বহু মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সংখ্যা ছিল ৫৪৪ জন।
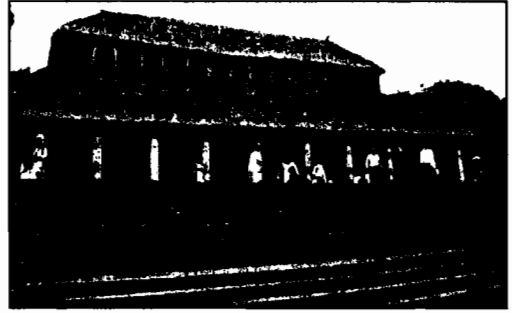
গঙ্গার ঘাটের ওপর শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ঘিরে বিশাল এক পর্ণকুটির

উৎসবের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল সন্ধ্যাবেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর অঙ্গস্বরূপ প্রথম দিন সইদ্ পারভেজের সেতারবাদন, দ্বিতীয় দিন রামকৃষ্ণ মিশন নারায়ণপুরের ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত নাটক এবং তৃতীয় দিনে রাসলীলা অভিনয় পরিবেশিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে এক বিশাল আয়োজন হয়। প্রায় ১,০০০ দূরাগত প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থা, দৈনিক সমস্ত অতিথিদের আহার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিবেদক: স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল, ইটানগর: গত ২৬ নভেম্বর ২০০৪ নতুন ও.পি.ডি. ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ১-৩ ডিসেম্বর আশ্রমের রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১ তারিখ হাসপাতালের সামনে ব্রোঞ্জনির্মিত স্বামীজীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তন ছাত্র গেগং আপাং। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সি. সি. সিংফো একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অরুণাচল প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ বিষয়ে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ছিল এই ত্রিদিবসীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।

রামকৃষ্ণ মঠ, কুচবিহার ঃ গত ২৮ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শ্রীসারদা ভাবানুরাগী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। এই সম্মেলনে ২২৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী ও স্বামী অক্ষয়ানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ-চণ্ডীপুর ঃ গত ১১-১২ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে দুটি পৃথক প্রদর্শনী, ভক্তসম্মেলন, সঙ্গীত, পুরস্কার-বিতরণ, লীলাগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী রমানন্দজী, ডঃ পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ। ১২ তারিখ ১,৫০০ পুস্তক ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদি, রাঁচি ঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪ রাঁচি জেলার বসুকোচা গ্রামে আশ্রম কর্তৃক নির্মিত 'বিসরা আবাস'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী সুহিতানন্দজী। এই আবাসে উপজাতিগোষ্ঠীর পরিবারসমূহের বসবাসের জন্য ৩৯টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর ঃ গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৪ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, গীতি-আলেখ্য, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। এদিন ৪০০ দুঃস্থনারায়ণকে কম্বল প্রদান করা হয় এবং ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, নাটক, যাত্রা, রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে 'ত্যাগব্রত সঙ্কল্প দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ, ধুনিমণ্ডপে ধুনিপ্রজ্বলন ও আরতি করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে ৭ দিন ধরে মেলা চলে। গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ পাঠ, ভক্তিগীতি, কীর্তন, শ্রুতিনাটক, বাউলগান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ তারিখ ২,৫০০ এবং ২৬ তারিখ ১২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

৩ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভজন, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি ও আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী। দুপুরে ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৪ ডিসেম্বর ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বিনাব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরে ৪৭ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এবং বিনামূল্যে তাদের চশমাও দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা ঃ গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী, ডঃ বারিদবরণ মণ্ডল, গুরুপদ মণ্ডল, তরুণ গোস্বামী, কণিকা মুখোপাধ্যায়, চিত্রলেখা গুপ্ত প্রমুখ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী পররূপানন্দজী ও প্রতিমা সেনগুপ্ত। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী রাজীবানন্দজী। প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। 'অমৃতধারা' পুস্তক সকল প্রতিনিধি এবং 'সারদামন্দির গার্লস মাধ্যমিক স্কুল'-এর ১,০০০ ছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ব্যাঙ্গালোর ঃ গত ২৫-২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ মঠের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। একটি জনসভা, দুটি সেমিনার ও একটি স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ ছিল এই ত্রিদিবসীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন, আলং ঃ অরুণাচল প্রদেশ সরকারের শক্তিমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত 'শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক রাজ্যস্তরের এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দশম শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) ঃ গত ২৩-২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, নাটক, প্রতিনিধি সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রতিনিধি-সম্মেলনে ১৫টি সারদা সঙ্ঘ ও ২০টি রামকৃষ্ণ আশ্রমের ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এদিন ২৫০টি অনাথ মেয়েকে বিশেষভাবে খাওয়ানো, ১১০ জন দরিদ্রনারায়ণকে খাওয়ানো ছাড়াও তাদের প্রত্যেককে ১টি করে কম্বল ও ৫০ টাকা প্রদান, ৯ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীকে ২,০০০ টাকা করে প্রদান, ১ জন দন্ত-চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রীকে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৮,০০০ টাকা প্রদান এবং ২টি স্থায়ী আমানত (১ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা) গঠন করা হয়। এছাড়াও ১০ জন দুরারোগ্য রোগীর প্রত্যেককে ৩,০০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উৎসবের ঠিক আগে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩টি পরিবারকে ৩০০ কেজি চাল, ৫৫ কেজি আলু, ৫ লিটার তেল, ৩৩টি শাড়ি, ১১টি ধুতি, ১১টি বালতি ও ৪৪টি চাদর প্রদান করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী হরিনাথানন্দজী (বিধু মহারাজ) গত ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোর ৫টায় ফুসফুসে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। ৯ মাস আগে বুকের ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের চিকিৎসার জন্য তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর অসুস্থতার কারণ ধরা পড়ে। পরবর্তী চিকিৎসার জন্য তাঁকে মুম্বাইয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু ঐ চিকিৎসাও ব্যর্থ হয়। তখন তাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য হায়দ্রাবাদে পাঠানো হয়। অতঃপর ঐ চিকিৎসাও ব্যর্থ হলে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪ হায়দ্রাবাদ হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

আত্মপ্রচারবিমুখ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৮৭ সালে কনখল কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী

ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি রামহরিপুর কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, শান্ত ও মধুর স্বভাবের। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ এক তরুণ কর্তব্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে হারাল। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, ভজন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি, যন্ত্রসঙ্গীতে মাতৃনাম ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে মুকুট চক্রবর্তী, গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং নিত্যরঞ্জন মণ্ডল ও সহশিল্পিবৃন্দ। অভিনীত হয় 'সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর যাত্রাপালা 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র'। সারাদিনব্যাপী উৎসবে ভোর ৪টা ৩০ থেকে রাত্রি ৯টা ৩০ পর্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমবেত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৭ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী'পাঠ, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বভূতানন্দজী। ভূপেন্দ্রনাথ শীলের পরিচালনায় শ্রুতিনাটক 'স্বামী সারদানন্দ' পরিবেশিত হয়।

গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী।

জাতীয় যুবদিবস পালন ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ আলোচনা, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। সকালে ঝামাপুকুর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষার্থিবৃন্দের বৈদিক স্তোত্র এবং সমবেত কণ্ঠে 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠের পর স্বাগত-ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। প্রশ্নোত্তর আসর পরিচালনা ও সমাপ্তি-ভাষণ দান করেন স্বামী ঋতানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের কিশোর বিভাগের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক যোগাসন প্রদর্শনী এবং স্বামীজীর জীবন অবলম্বনে নাটক 'উত্তরণ' মঞ্চস্থ হয়। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক শঙ্কর রায়। প্রতিযোগীদের সকলকে সকালে টিফিন ও দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১০ অক্টোবর ২০০৪ কুইজ, সঙ্গীত, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। কুইজে ১৪টি বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের ১২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী, ফুল্লরা সেনগুপ্ত, সুজাতা চক্রবর্তী, আশিস রায়চৌধুরী, ডাঃ কল্যাণ আশিস মুখার্জি, মধুমিতা কুণ্ডু ও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়। এদিন ১০০ দুঃস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী ঋতানন্দজী।

নবদ্বীপ বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) ঃ গত ১৩ অক্টোবর ২০০৪ সঙ্ঘগীতি, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণী এবং মাতৃস্মৃতি পাঠ, ভক্তিগীতি, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সভায় ভাষণ দেন ডঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা সুমিত্রাপুরীদেবী, যিনি বাল্যকালে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন।

চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কোচবিহার) ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০৪ থেকে নবরাত্রিব্যাপী 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'পাঠ ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। মহাষ্টমীর দিন কুমারী-পূজায় সমাগত প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। গত ২৫ অক্টোবর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৩ অক্টোবর মহালয়ার দিন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে ৩০৭টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

হালিসহর গুডউইল ফ্রেটারনিটি (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৫ অক্টোবর ২০০৪ প্রতিষ্ঠানের সার্ধ শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে সাধক রামপ্রসাদের ভিটায় নবনির্মিত ধ্যানকক্ষে তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্যানকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন ও মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন স্বামী সগুণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী, সংস্থার সভাপতি রতনকুমার ঘোষ ও রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দজী। এদিন প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যায় রামপ্রসাদী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ১৭ অক্টোবর ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী'পাঠ, ভক্তসম্মেলন, আবৃত্তি, গান, নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে শারদ উৎসব পালিত হয়। ভক্তসম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং বার্ষিক পত্রিকা 'উদয়ন' প্রকাশ করেন স্বামী অনঘানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন ৫২ জন দুঃস্থনারায়ণকে বস্ত্র, ২৯ জন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীকে জামা, প্যান্ট ইত্যাদি এবং ২টি ক্লাবকে ১টি করে ফুটবল প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, খোসকদম্বপুর (বীরভূম) ঃ গত ১৭ অক্টোবর ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' থেকে পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন নীলা চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী। এদিন প্রায় ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ২০-২৩ অক্টোবর ২০০৪ বিশেষ পূজা, কুমারীপূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯ অক্টোবর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় পূজার উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন স্বামী অসীমানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তেজপুর (অসম) : গত ১৯-২৩ অক্টোবর ২০০৪ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার কয়েকদিনে ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। দশমীর দিন দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ এবং শোভাযাত্রা সহকারে ব্রহ্মপুত্র নদে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

পূর্ব সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩০) : গত ২০-২২ অক্টোবর ২০০৪ বিশেষ পূজা, পাঠ, কুমারীপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার কয়েকদিনে ১,৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। গত ১১ নভেম্বর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, বীজপুর (বাঁকুড়া) : গত ২৪ অক্টোবর ২০০৪ প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্যামদাসপুর গ্রামে সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপাঠচক্র-এর উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মানসকুমার দে ও শিশিরকুমার ঘোষ। এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী যথাক্রমে শোহরাব আলি খাঁ ও বিজয় ঘোষকে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের পঞ্চম স্থানাধিকারী সৌরভ অধিকারীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৯৫) : গত ২৮ অক্টোবর ২০০৪ বৈদিক মন্ত্রপাঠ সহকারে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তিতে মাল্যদান, সঙ্ঘমন্ত্র পাঠ ও নিবেদিতা বন্দনা, সঙ্ঘ-পরিচালিত পথশিশুদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান, সমবেত ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে বাগবাজার নিবেদিতা উদ্যানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালিত হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণাজী, স্থানীয় পুরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত ও সঙ্ঘের সভানেত্রী নিবেদিতা মজুমদার। পথশিশুদের মধ্যে নতুন পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করেন প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণাজী।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৩১ অক্টোবর ২০০৪ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, কুইজ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। উপস্থিত সকলকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি প্রদান করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সুনামি ত্রাণ

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সুনামির কারণে ক্ষতি হয়েছে

২৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এর সকালে সুনামির প্রবল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে কন্যাকুমারীতে। এই আকস্মিক ঘটনায় প্রায় ১,২০০ পর্যটক বিবেকানন্দ শিলায় অসহায়ভাবে আটকে পড়েন। বিকাল ৩টা নাগাদ সমুদ্র শান্ত হলে উদ্ধারকার্য শুরু হয়। ঐসময় মাছধরার নৌকা ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে সেখানে খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হয়। রাত প্রায় ৮.৩০টা নাগাদ জেলেদের সহায়তায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এই ঘটনায় কন্যাকুমারীর স্নানের ঘাটে স্নানরত ৪০ জন পর্যটক এবং সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের প্রায় ৭০০ মানুষ এখনো নিখোঁজ। এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। তবে সমুদ্রতীরবর্তী রামেশ্বরম ও চেন্নাইয়ের ট্রিপলিকেনে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ভবনগুলির কোন ক্ষতি হয়নি। যদিও স্বামী বিবেকানন্দের কৃপায় শিলার স্মৃতিসৌধের প্রধান ভবনটি অক্ষত আছে, তথাপি পরিকাঠামোর অন্যান্য বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন পূর্ব এবং দক্ষিণদিকের দেওয়াল, বিভিন্নদিকের রেলিং ইত্যাদি। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্টিমার জেটি। এটিকে কার্যকরী করে তুলতে কমপক্ষে ৩ মাস সময় লাগবে। এছাড়া একটি নৌকার কোন খোঁজ নেই। 'পামপুহার শিপিং কর্পোরেশন'-এর ব্যবহৃত উভয় নৌকাই—যা পর্যটকদের রক মেমোরিয়ালে যাতায়াতের কাজ করে, ভালভাবে মেরামত করা প্রয়োজন। সবমিলিয়ে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ১ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্দামানে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ৯টি বিদ্যালয়ও সুনামির অভিশাপ থেকে রেহাই পায়নি। সেখানেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়েছে, পাঠাগারের বই, বিদ্যালয়ের নথিপত্র, টেলিফোন, কম্পিউটারের মতো অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নষ্ট হয়েছে।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী জেলা-সহ সমুদ্রতীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধারকার্য এবং সাহায্যপ্রদান শুরু করেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের চেন্নাই শাখা 'সেবা ভারতী'র সঙ্গে একযোগে চেন্নাই, নাগাপাত্তিনাম ও কেডালুরে ত্রাণকার্য শুরু করেছে। এই সেবাকার্যে যেকোন দান আয়কর সংক্রান্ত ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। যোগাযোগের ঠিকানা : শিবাজী বসু, ৭৬/২ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, ফোন : ২৫৫৫-৮২১৭।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী জ্যোৎস্না সিংহ গত ৩১ আগস্ট ২০০৪ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া-নিবাসী প্রফুল্লকুমার হাজরা গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী ডঃ দিলীপ মালাকার গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের হোজাই-নিবাসী নিতাইচন্দ্র দেবনাথ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হালিসহর-নিবাসী সুধীরকুমার ঘটক গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ❑

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

Supplier of Plants to Different Centres of Ramakrishna Math & Mission and all over India.

KAMAL NURSERY

P. O. Andul-Mouri
Howrah-711302
Phones : 2669-0698, 2669-1165

বাগবাজারের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, ভাষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, খেলাধুলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক রচনায় ঋদ্ধ

ধন্য বাগবাজার

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ◌ পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১,০৩৬

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (৮ জানুয়ারি ২০০৫) মতে তৃতীয় 'বেস্ট সেলার' গ্রন্থ 'ধন্য বাগবাজার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বর্তমানে নিঃশেষের পথে।

"যে-কাজ করার কথা ইতিহাসের কোন গবেষকের কিংবা কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের—একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মীরা তেমন একটা কাজ করে ফেলেছেন, ভাবলেই অবাক লাগে।... কী নেই এই বইয়ে।... নানা দৃষ্টিকোণে লেখক-গবেষকরা তুলে ধরেছেন নানা রঙের বাগবাজারকে, প্রাচীন কলকাতার এই গর্ভগৃহকে।... এককথায় বলতে গেলে, বাগবাজার ওমনিবাস।"

সাপ্তাহিক বর্তমান (১০.০৪.৯৯)

প্রাপ্তিস্থান :
ইউ. বি. আই., বাগবাজার শাখা (দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৪৩১); দে বুক স্টোর; চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ; আদি নাথ ব্রাদার্স; বুক ফ্রেণ্ড, কলেজ স্ট্রিট।

পরিবেশনায় :
রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
ইউ. বি. আই., বাগবাজার শাখা

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

✻

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

✻

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভুমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভুমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন : ২৬৫৪-৫৮৯২
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৪২-০৯৩২
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৬০-১০৮৪
- **শুকদেব সাঁতরা**, গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল-৭১১ ৪০৪
- **সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন : ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্ট : অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন : ২৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়নগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫
  ফোন : ২৬৫৯-১১৪৪
- **দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন : ২৬২৯-০০৮৮
- **বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ বেলাড়ী, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫
- **দীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চককাশী, থানা : বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭
  ফোন : ২৬৬১-৮১১২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন**
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন
  বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন : ২৬৬৮-০০১৪
- **সম্পাদক, উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ**
  উলুবেড়িয়া

জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : (০৩২২৮) ২৭২২১৮
- রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : (০৩২২৭) ২৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬২১০৫
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
  ফোন : (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম : বরুণা (ভুতা), পোঃ ভুতা, থানা : দাসপুর
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬০২৭১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যান্তারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬
- **ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন : (০৩২২২) ২৭০৩৪৬

He is a true hero who performs all the duties of the world with his mind fixed on God.

Sri Ramakrishna

Space Donated By :

A WELL WISHER

যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।

শ্রীমা সারদাদেবী

গোপীনাথ বসুর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

গোপীনাথ বসু

জন্ম—১৩।০৩।১৯৪৩ মৃত্যু—২২।০২।২০০৩

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তোমার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

স্ত্রী, পুত্রদ্বয়, পুত্রবধূদ্বয়, পৌত্র, বীথিকা,
কৌশিক, শৌভিক, চন্দ্রিমা, ইন্দ্রাণী, আদিত্যবর্ণ

মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন। ঠাকুর যে বলে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষদিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হলদিয়া আই. ও. সি. টাউনশিপ-নিবাসিনী লাবণ্য ভট্টাচার্য ৮৬ বছর বয়সে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করেছেন। প্রয়াতার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা জানাই।

নিবেদক
শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য (পুত্র)

লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

চৈত্র ১৪১১ ৩য় সংখ্যা

"নরেনকে ও নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে যায় — মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। ...নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যত বাঁধেন, নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।"

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' ১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 'উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন)ঃ মোট ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ মোট ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা (INR)। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। আমাদের ধারণা, স্থানীয় গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র থেকে বই নিলে আপনার সুবিধা হবে।

'চেক' সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে 'গ্রাহক-নবীকরণ' কিংবা 'পুস্তক ক্রয়' কিংবা 'মায়ের বাড়ির জন্য' কথাটি লিখবেন। টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১

সূচিপত্র

উদ্বোধন ॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা ● চৈত্র ১৪১১ ● মার্চ ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❏ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❏ আলাদা কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication:	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Kolkata-700 003
Periodicity of its Publication:	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Editor's Name	Swami Sarvagananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Name & Address of Individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711 202 West Bengal

Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Gitananda	*Vice-President*	do
Swami Smarananananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	" "	do
Swami Bhajanananda	" "	do
Swami Srikarananda	" "	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda	Trustee	do
Swami Gautamananda	"	do
Swami Mumukshananda	"	do
Swami Prabhananda	"	do
Swami Tattwabodhananda	"	do
Swami Vagishananda	"	do
Swami Vandanananda	"	do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 2005

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ।।

হে সখে, কাঁদছ কেন? তোমার মধ্যেই তো সব শক্তি রয়েছে। হে ভগবন, তোমার ঐশ্বর্যপূর্ণ স্বরূপ জাগ্রত কর। এই সমুদয় ত্রিভুবনই রয়েছে তোমার পাদমূলে। চিরকাল আত্মার শক্তিই জয়ী হয়, জড়ের শক্তি কখনো নয়।

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবণমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।।

আমরা আকাশের নক্ষত্রসমূহ চর্বণ করতে পারি, বলপ্রয়োগ করে ত্রিভুবন উৎপাটিত করতে পারি। আমরা কে, তা কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণের দাস।

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ।।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সাগর মন্থন করে যা পাওয়া গেছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতা যেখানে স্ব স্ব শক্তিপ্রদান করেছেন; যা নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারদের প্রাণের সারাংশ দ্বারা পূর্ণ—সেই অমৃতের পূর্ণপাত্র অধুনা দেহধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে জগতে এসেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর ও মায়ের অনন্য ভূমিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সুষ্ঠু সেবার কারণে শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমন প্রয়োজন ছিল। আবার শ্রীশ্রীমায়ের জীবনও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিনা অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সামাজিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একথা বলা যাইতে পারে। ঠাকুরকে ছাড়িয়া মায়ের চলে না, মাকে ছাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণেরও চলে না। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহা সত্য। আরো গভীরভাবে ইহা অনুভূত হইল যখন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে বলিলেনঃ "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো!" অথবা "এ আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" একই কথার রেশ টানিয়াই যেন পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমা বলিলেনঃ "সে আর কটিকে [ঠাকুর কৃপা] করেছিলেন? তাও কত বেছে।... আমার কাছে পিঁপড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন।" লোকসংগ্রহের এই অদ্ভুত লীলা পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে বিরল। ক্রমশ মা অন্তরাল হইতে সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। একজন অশিক্ষিতা, সরলা গ্রাম্য বালিকার ধীরে ধীরে গগনচুম্বী এক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরের কাহিনী সত্যই রোমাঞ্চকর। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ মায়ের রূপ দেখিয়াছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। কখনো মা সঙ্ঘজননী, কখনো বিন্দুবাসিনী, কখনো বধূ, কখনো বা আলোছায়ায় দোলায়মানা সাধারণ পল্লিরমণী। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মায়ের সকলপ্রকার ভূমিকায় তাঁহার মুখ্যরূপটি ছিল—রামকৃষ্ণগতপ্রাণা, তন্নামশ্রবণপ্রিয়া, তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা। ইহাই মায়ের রামকৃষ্ণ-সাধনা। ঠাকুরের সারদা-সাধনা শুরু হইয়াছিল 'কুটোবাঁধা' কনের সন্ধানপ্রদানের মাধ্যমে। "জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে"—গদাধর বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাগণ হন্যে হইয়া কনের সন্ধান করিতেছিলেন। সেই 'সারদা-সাধনা' আপাত পরিণতি লাভ করিল শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ, মধুরভাব সাধন এবং বেদান্ত-সাধনার শেষে ষোড়শীপূজার মধ্য দিয়া। কিন্তু তাহার পরেও উহা দৃশ্যত কিংবা অদৃশ্যত চলিয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধিলাভ পর্যন্ত। অপরদিকে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা দৃশ্যত শুরু হইয়াছিল যেদিন প্রতিবেশিনীর কোলে চড়িয়া তিনি শিহড় গ্রামে সঙ্গীতের আসরে নিজ স্বামীকে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুই পক্ষের সাধনার মূল লক্ষ্য কিন্তু একটি—শাস্ত্রে যাহাকে বলা হয় 'লোকসংগ্রহ'।

তন্ত্রশাস্ত্র-মতে ষোড়শীপূজা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সকল পূজার শেষে ষোড়শীপূজা হয়। অর্থাৎ ষোড়শীমূর্তিতে সকল দেবীশক্তির সমন্বিত প্রকাশ। 'দুর্গাসপ্তশতী' বা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে দেখা যায়, 'মহাকালী', 'মহালক্ষ্মী', 'মহাসরস্বতী', 'চামুণ্ডা', 'কালী', 'দুর্গা' বা 'পার্বতী' প্রভৃতি শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে। কিন্তু 'দেবী ষোড়শী' বা 'ত্রিপুরসুন্দরী' সকল শক্তির মিলিত প্রকাশ বলিয়া ষোড়শীপূজা সকল পূজা বা বলিতে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষেত্রে সাধনার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্য 'মা'কে ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের চলিত না।

অন্যদিক হইতেও বলা যায়, শক্তি বিনা অবতারের লীলা অসম্ভব। যখনি শ্রীভগবান নরশরীর ধারণপূর্বক ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহার সহিত শক্তিও নারীরূপ ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন—একথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সাধারণ সাধকের ক্ষেত্রে 'শক্তি'র [পুরুষকার ও সাধনসামর্থ্য] প্রয়োজন আছে যদিও, কিন্তু অবতারের ক্ষেত্রে সেই শক্তি মনুষ্যদেহ অবলম্বন করিয়া যোগমায়ারূপে লীলা করিয়া থাকেন। এবং সেই শক্তির আবির্ভাব কেবল ধর্মভীরু সাধকের কল্যাণসাধনের জন্য নহে; পরন্তু তাঁহার পুণ্য কিরণে সন্ন্যাসী-গৃহী, অর্ধ সংসারী-বিদ্যার্থী, সাধক-সাধিকা, পাপী-তাপী সকলেই আলোকিত হইয়া উঠে। অর্থাৎ আমাদের 'মা' সকলের মা। তাঁহার সর্বপ্লাবী মাতৃত্বে কোন বাছবিচার নাই। লোকসংগ্রহের ইহা এক অভূতপূর্ব প্রক্রিয়া, যাহা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ইতিহাসে পূর্বে কখনো ঘটে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিপ্রবণ অন্তরে অনুভূতির সদাসর্বদা অভিপ্রকাশ ঘটিয়াছে "ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য"—এই কথার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে। সংসারের খুঁটিনাটি সবই তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুর ঐ এক স্বরে বাঁধা থাকিত। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংসারী মানুষের তিনি ততটা নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই বলা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কেহ কেহ মন্তব্য করেনঃ "ও তো সংসারেই ঢুকল না, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারের জটিল সমস্যা সে আর কী বুঝবে?" কিন্তু 'মা' সংসার-অরণ্যে মুক্ত হরিণীর ন্যায় বিচরণ করিয়া সমস্যা যত গভীরই হউক না কেন, নিজের উপলব্ধির সাহায্যে

এমন সহজ সমাধান করিয়া দিতেন যে, সংসারী মানুষের নিকট তিনি অল্পকালেই অতি আপনার হইয়াছিলেন, সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থের নিকট মায়ের গ্রহণ-যোগ্যতা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি ছিল, এখনো তাই।

অপরদিকে সন্ন্যাসিগণের নিকট মায়ের গ্রহণযোগ্যতা কি কম ছিল? স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের আচরণের প্রেক্ষিতে সেকথা মনে তো হয়ই না, বরং শ্রীশ্রীমায়ের বাণী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সর্বোচ্চ অনুশাসন বলিয়া ধার্য হইত। মা ছিলেন সঙ্ঘের 'সুপ্রিম কোর্ট'। পূর্ব পূর্ব অবতারে তাঁহাদের শক্তিস্বরূপিণী সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমুখ কাহাকেও কখনো এইরূপ প্রত্যক্ষত প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের এই অনন্য ভূমিকার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন: "ও সারদা, সরস্বতী; ও জ্ঞান দিতে এসেছে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে সমাজের সর্ব স্তরে যে-আলোড়ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় পরিলক্ষিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে। ধর্মক্ষেত্রের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এমনকি জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রভাব প্রবলভাবে পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁহার বক্তৃতায় ('উদ্বোধন', অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃঃ ৯৫১-৯৫৩ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতের অর্থনীতির আদি স্তম্ভস্বরূপ জামশেদজী টাটা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে জাতীয় শিক্ষাসূচিতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে যখনি উচ্চাসন দান করা হইয়াছে, তখনি জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এবারে শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে আরেকটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। আমরা দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা গ্রামে-গঞ্জে মানুষের হেঁসেলের মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া আছেন। মনে হইল আমাদের মাতৃপ্রচার একটা অপ্রতুল বাহুল্যমাত্রই বটে। তিনি স্বয়ং সর্বত্র অনুস্যূত হইয়া গিয়াছেন—সারা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অসম্পূর্ণ কাজ শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যক্ষতায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে তিনি দেবী—সঙ্ঘনেত্রী, অপরদিকে গুরু—জ্ঞানদাত্রী এবং সর্বোপরি মাতা—জগজ্জননী। আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী জগতে আসিয়াছেন ফূর্তি করিবার জন্য নহে—"আমরা তো রসগোল্লা খেতে আসিনি", মা বলিয়াছিলেন। কী অমানুষিক কায়িক পরিশ্রম মাকে করিতে হইত তাহা তাঁহার জীবনীগ্রন্থ কিংবা স্মৃতিকথাসকল পড়িলেই বুঝা যায়। অথচ তাহার মধ্যেই চলিতেছে অবিরাম জপ, সন্তানগণের জন্য নিয়ত কল্যাণচিন্তা; ইহার সহিত রহিয়াছে অবর্ণনীয় সাংসারিক জটিল সমস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের অকল্পনীয় সাধনার ফল প্রেম-প্রস্রবণরূপে তাঁহার জীবদ্দশায় যতটুকু জীবকল্যাণকল্পে প্রবাহিত হইতে পারিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি জমা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে বলিয়া। তাই শ্রীশ্রীমাকে ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাবাই যায় না—ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতেও বটে, ভক্তের দৃষ্টিতেও বটে। ইহা এক অনন্য ভূমিকা। এদিকে অবগুণ্ঠনবতী! কিন্তু কী মহাশক্তির প্রকাশ তাহা অচিন্তনীয়। ইহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাও অনন্য। গণিতের ভাষায় বলিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী যেন একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তিনে এক, একে তিন। অবশ্য স্বামীজীর অনন্য ভূমিকার কথা আলোচনার অবকাশ এখন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেমন মা ভাবিতেন, তেমনি মায়ের কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবিতেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ হইতে যেমন, সাংসারিক দৃষ্টিকোণ হইতেও তেমনি। পত্নীর ইচ্ছাপূর্তির কারণে ঠাকুর মায়ের জন্য ডায়মনকাটা বালা নির্মাণ করিয়া দিলেন। জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ডাকাতবাবার সহিত মায়ের সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে মা বলিয়াছিলেন: "আমি তোমার মেয়ে সারদা।" যখন ডাকাতবাবা দক্ষিণেশ্বরে আসিত, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে তাহাদের জামাই ভাবিয়া যারপরনাই আদরযত্ন করিতেন। এদিকে শ্যামপুকুরে অসুস্থাবস্থায় ঠাকুরকে আনিবার পর সেবার অসুবিধা হইতে লাগিল। মাকে ছাড়া চলে না। কিন্তু থাকিবার ব্যবস্থা নাই। অবশেষে সিঁড়ির ধারে একচিলতে জায়গা মায়ের জন্য নির্দিষ্ট হইল। কাছাকাছি স্নান-শৌচের ব্যবস্থা নাই। অবর্ণনীয় কষ্ট হইবে জানিয়াও মা নির্বিচারে সেবার জন্য সম্মতা হইলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবী সর্বাধ্যক্ষা এই বিন্দুবাসিনী মায়ের মহিমার কথা ঠাকুর স্বমুখে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে একদা বলিয়াছিলেন: "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়,/ কোটি রাম কোটি কৃষ্ণ হয় যায় রয়।" সেই 'অনন্ত রাধার মায়া'কে একটি রক্তমাংসের পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কি কৌশলটাই শ্রীরামকৃষ্ণ করিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের বেশ কিছুদিন পর একদিন পাগলীমামির কন্যা রাধুকে দেখাইয়া অশরীরী শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সশরীরে আবির্ভূত হইয়া শোকসন্তপ্তা পত্নীকে বলিলেন: "এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে (আমি-আমার রাজ্যে) থাক, এটি যোগমায়া।" তাই শ্রীশ্রীমায়ের পরবর্তী চৌত্রিশ বৎসরের জীবনকালে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণই নারীশরীরে জগৎকে মাতৃস্নেহ বিতরণ করিবার জন্য বিরাজিত ছিলেন। [সমাপ্ত] ❑

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত*

॥১॥

দি বেদান্ত সোসাইটি
নিউ ইয়র্ক
১০২ ইস্ট ফিফটি এইটথ্ স্ট্রিট
২ জুলাই ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার শেষ চিঠিখানাতে একটা ক্ষোভের অনুরণন ছিল। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তবে আমার দিক থেকেও দেরি হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। এখানে এসে দেখতে পেলাম যে, সোসাইটি ভেঙে প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—তারা সকলে ঝগড়াঝাঁটি করে বসে আছে। সেসবের নিষ্পত্তি করতে হলো।

তারপরই ক্যালিফোর্নিয়ায় একখণ্ড জমি উপহার পেলাম; এবং গত সপ্তাহে যখন আমি যাত্রা করার প্রস্তুতি নিয়েছি, ঠিক তখনি হঠাৎ করে তুরীয়ানন্দের ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়ার পথ অবারিত হলো। আজ বা কাল তিনি যাবেন। আমি তাঁদের সঙ্গে (স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মিস মিন্নি বুক) ডেট্রয়েট পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু 'মা-ই সব জানেন'—একথা আমি প্রায়ই বলি। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্বস্ব—এমনকি নিজের সত্তা পর্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হয়।

যেভাবেই হোক, যত শীঘ্র সম্ভব আমি যাচ্ছি। উদ্বিগ্ন হয়ো না। প্রতিদিনই আমি আরো বলবান হচ্ছি।

যথার্থই তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ এখানে এখন আমাদের সম্পূর্ণ নিজেদের একটি বাড়ি হয়েছে। দোতলাটি বক্তৃতার জন্য, নিচতলা রান্না ও আহারের জন্য, তেতলাতে আমরা বাস করি এবং চারতলাটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে দুজন রান্নাবান্না ইত্যাদির ভার নিয়েছেন। তাঁদের আমরা সপ্তাহে চার ডলার করে দিই। অভেদানন্দ চাইছেন যে, আমি তোমাকে এখানে আসতে ও থাকতে নিমন্ত্রণ জানাই, কারণ তিনি চান না যে আমি এখনি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যাই। কিন্তু ঐ পরিকল্পনাকে আমি খুব উত্তম বলে মনে করি না, যদিও এর যাবতীয় ব্যয় বহন করতে আমি প্রস্তুত। আমার ডেট্রয়েটে যাওয়াই বরং সবচেয়ে ভাল হবে। মা অনুমোদন করলেই আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাব। উদ্বিগ্ন হয়ো না, সবকিছুই নির্ভর করছে 'তাঁর' ওপর।

॥২॥

মঠ বেলুড়, হাওড়া জেলা
বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ
১৯ ডিসেম্বর ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

মহাদেশসমূহের আরেক প্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছে: 'কেমন আছ?' এতে তুমি অবাক হচ্ছ নাকি? বস্তুত, আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপল, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি; আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে; শুধু কচিৎ দু-একখানি মালবাহী নৌকার দাঁড়ের শব্দে সে-স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।

এখানে এখন শীতকাল চলেছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই মতো। সর্বত্র সবুজ ও সোনালি রঙের ছড়াছড়ি, আর কচিঘাসগুলি যেন মখমলের মতো! আর বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ।

আমি চেয়েছিলাম ভারতে কয়েক মাস বিশ্রাম নিতে এবং তারপর আগামী গ্রীষ্মে আরেকবার ইংল্যাণ্ডে যেতে। নিবেদিতা এখনো ফিরে আসেনি; আশা করি সে শীঘ্রই পৌঁছাবে।

ভ্রমণ ও বিশ্রাম করে একপ্রকার আছি। যেমন আশঙ্কা করেছিলাম পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয়।

সকল ভালবাসা সহ
বিবেকানন্দ

---

* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রদুটি আংশিকভাবে 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র অষ্টম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে (যথাক্রমে ৪৮৩ নং ও ৫০৫ নং পত্র) ভুলক্রমে নিবেদিতাকে সম্বোধন করে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সম্পূর্ণ পত্রদুটি মুদ্রিত হলো।—সম্পাদক

আজ হতে উদ্বোধন শতবর্ষ আগে

চৈত্র ১৩১১
মার্চ ১৯০৫

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সন ১৩১১ সালের ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এমনকি অনেকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অমানুষ যোগবিভূতি সকলই উহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তুমি তাঁহাকে মান? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদূরের ঘটনাবলিও ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পাইতেন; যে—স্পর্শ করিয়া কঠিন কঠিন শারীরিক ব্যাধিসমূহ কখন কখন আরাম করিয়াছেন; যে—দেবতাদের সহিতও তাঁহার সর্ব্বদা বাক্যালাপ হইত এবং তাঁহার বাক্য এতদূর অমোঘ ছিল যে, মুখপদ্ম হইতে কোন অসম্ভব কথা বাহির হইলেও বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলিও ঠিক সেইভাবে পরিবর্ত্তিত এবং নিয়মিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাঁহার কৃপাকণা ও আশীর্ব্বাদ লাভে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষিত এবং বিশেষ সম্মানিত পর্য্যন্ত হইয়াছিল অথবা কেবলমাত্র রক্তকুসুমোৎপাদি বৃক্ষে শ্বেত-কুসুমেরও আবির্ভাব হইয়াছিল ইত্যাদি।

অথবা বলেন যে, তিনি মনের কথা বুঝিতে পারিতেন; যে—তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেক মানবশরীরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মনের চিন্তা, গঠন এবং প্রবৃত্তিসমূহ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইত; যে—তাঁহার কোমল করস্পর্শ মাত্রেই চঞ্চলচিত্ত ভক্তের চক্ষে ইষ্টমূর্ত্ত্যাদির আবির্ভাব হইত অথবা গভীর ধ্যান এবং অধিকারিবিশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বার পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হইত। বিরল কেহ কেহ আবার বলেন যে, কেন তাঁহাকে মানি, তাহা আমিই জানি না; কি এক অদ্ভুত জ্ঞান এবং প্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ যে তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিত-পরিচিত মনুষ্যকুলের ত কথাই নাই, বেদপুরাণাদি গ্রন্থনিবদ্ধ জগৎ-পূজ্য আদর্শসমূহও তাঁহার পার্শ্বে আমার চক্ষে হীনজ্যোতিঃ হইয়া যায়; এটা আমার মনের ভ্রম কিনা তাহা বলিতে অক্ষম, কিন্তু আমার চক্ষু সেই উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিয়া গিয়াছে এবং মন সে প্রেমে চিরকালের মত মগ্ন হইয়াছে, ফিরাইবার চেষ্টা করিলেও ফিরে না, বুঝাইলেও বুঝে না; জ্ঞান তর্ক যুক্তি যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, ডাকিলেও সাড়া দেয় না বা সহায়তা করে না; এইটুকু মাত্র আমি বলিতে সক্ষম—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে অপর মনুষ্য-সাধারণ স্থূল বাহ্যিক-বিভূতি অথবা সূক্ষ্ম মানসিক-বিভূতির জন্যই তাঁহাতে ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে। স্থূলদৃষ্টি মানব মনে করে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহারও রোগাদি আরোগ্য হইবে, তাহারও সঙ্কট বিপদাদির সময়ে বাহ্যিক ঘটনাসমূহ তাহার অনুকূলে নিয়মিত হইবে। স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার মনের ভিতর যে এই স্বার্থপরতার স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয়শ্রেণীমধ্যগত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি মানবও তাঁহার কৃপায় দূরদর্শনাদি বিভূতিলাভ করিবে, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া গোলোকাদি স্থানে বাস করিবে অথবা আরও কিঞ্চিৎ সমুন্নতদৃষ্টি হইলে সমাধিস্থ হইয়া জন্ম, জরাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এইজন্যই তাঁহাকে মানিয়া থাকে। স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধিই যে এই বিশ্বাসেরও মূলে বর্ত্তমান, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ দৈববিভূতিনিচয়ের ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেও অথবা নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধি প্রয়োজনরূপ সকাম ভক্তিও যে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, এবিষয়ে সন্দিহান না হইলেও তত্তদ্বিষয় আলোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার মনুষ্যভাবের চিত্র কথঞ্চিৎ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

সকাম ভক্তি—নিজের কোনরূপ অভাব পূরণের জন্য ভক্তি, ভক্তকে সত্য দৃষ্টির উচ্চ সোপানে উঠিতে দেয় না। স্বার্থপরতা সর্ব্বকালে ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে।... এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর ভিতর যাহাতে ঐ দোষ প্রবেশ না করে, সেবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।... কিন্তু দুর্ব্বল মানব নিজের লাভ লোকসান না খতাইয়া কিছু করিতে বা কাহাকেও মানিতে অগ্রসর হয় না এবং ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন হইতে ত্যাগ শিক্ষা না করিয়া নিজের ভোগসিদ্ধির জন্যই ঐ মহৎ জীবন আশ্রয় করিয়া থাকে।... আমাদের মনুষ্যত্বের অভাবই ঐ প্রকার হইবার কারণ এবং সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনুষ্যভাবের আলোচনাই আমাদের অশেষ কল্যাণকর। [অংশবিশেষ]

সঙ্কলন: রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন: স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা: স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

শ্লোকার্থ: *হে পার্থ, স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তু বা প্রাণীর সনাতন কারণ বলিয়াই আমাকে জানিবে। বিবেকিগণের চেতনায় আমি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকরূপ বুদ্ধি, তেজস্বিগণের অন্তরে আমিই তেজঃস্বরূপ।*

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মই জগতের সকল বস্তুর একমাত্র কারণ। সাধারণত আমরা কোন কারণ কার্যরূপে পরিণত হইলে কারণকে লক্ষ্য করি না। আবার যখন কারণের দিকে লক্ষ্য করি, তখন তাহার কার্য লক্ষ্য করি না। কিন্তু যোগীরা ব্রহ্মকে কার্য ও কারণ-রূপে একসঙ্গেই দেখিতে পান। যেমন ঠাকুর কোশাকুশি চৈতন্যময় দেখিলেন, স্বামীজী কলকাতার সবকিছু চৈতন্যময় দেখিলেন।

মা যখন জগদ্রূপে প্রতীয়মান (প্রকাশিত) হন, ঠিক সেইসময়েও তিনি পূর্ণব্রহ্মই। একস্তূপ মাটির কিয়দংশ লইয়া মূর্তি গড়িলে মূর্তির কারণ মাটির পরিমাণ কিছু কমিয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইলেও ব্রহ্মের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। তাই তাঁহাকে সনাতন বীজ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে যাহার যেরূপ দেখিবার শক্তি হয়, সে ততটুকুই দেখিতে পায়—একস্থানে বসিয়া একজন তাঁহাকে দশভুজারূপে দেখিতেছে, আর তাহার পাশেই তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে, আরেকজন তাঁহাকে জ্যোতিরূপে দেখিতেছে, অন্য একজন হয়তো তাঁহাকে সর্ববস্তুর ভিতর চৈতন্যরূপে দেখিতেছে। যখন ব্রহ্মের পূর্ণ অনুভব, তখন দৃশ্য আর থাকে না—শুধু এক বাক্যমনের অগোচর অখণ্ড বস্তুর অনুভব হয় মাত্র। যতক্ষণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা থাকে, ততক্ষণ সব অনুভবই আপেক্ষিক (relative), নতুবা উহা absolute—অবাঙ্মনসোগোচরম্। এই সর্বপ্রকার অনুভব লইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধব্য, নতুবা ওজনে যে 'কম' পড়িয়া যাইবে!

ব্রহ্ম তাঁহার অনির্বচনীয় মায়াশক্তি দ্বারা জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন মাত্র, কিন্তু তিনি যাহা তাহাই থাকেন।

'বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্'—ইহার মূল তাৎপর্য, জীবের মূল কারণ ব্রহ্ম। চেষ্টা করিলে সব মানুষই কল্পনাতীত শক্তি লাভ করিতে পারে। তাই কাহারও ভিতরে অসাধারণ বুদ্ধি বা শারীরিক শক্তি দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাহা জগৎকারণ অনন্ত শক্তিমান হইতে আসিয়াছে। এইসব শ্লোকের উদ্দেশ্য একটিই, যাহাতে আমরা জগতের সর্বত্রই তাঁহার সত্তা চিন্তা করিতে পারি।

[মন্তব্য: টীকাকার শ্রীধরস্বামী 'বীজ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—নিত্য এবং উত্তরোত্তর সর্বকার্যে অনুস্যূত, তাই ব্রহ্ম বীজস্বরূপ।—সম্পাদক]

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

শ্লোকার্থ: *হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, বলবানগণের অন্তরে আমি কামরাগবর্জিত দেহধারণের উপযোগী সামর্থ্য এবং ধর্মশাস্ত্রের অবিরোধী কামনা (যাহা ধর্মকে বর্ধিত করে)-রূপে আমি প্রাণিগণের মধ্যে বিরাজমান।*

ব্যাখ্যা: জীবের সব শক্তিই ব্রহ্ম হইতে আসে। তবে সাত্ত্বিক শক্তিতেই আমরা ব্রহ্মের প্রকাশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। সিদ্ধ হইয়া গেলে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য সমানবোধ হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে হেয়-উপাদেয় বিচার অত্যাবশ্যক। সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন, যে-শক্তি থাকিলে মানুষ কামনা (কাম) ও আসক্তির (রাগ) বশীভূত না হইয়া মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারে, সেই শক্তিতেই আমার প্রকাশ দেখিবে। যখন হিন্দুধর্ম বিকৃত হইয়া গেল তখন ভগবানের অসীম শক্তি বুঝাইবার জন্য সাম্প্রদায়িক গুরুরা প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ষোলশো স্ত্রীলোককে একসঙ্গে সম্ভোগ করিতে পারিতেন—এমন শক্তিমান ছিলেন। এইসব পাষণ্ড মত যাহাতে সাধককে বিচলিত না করিতে পারে, সেইজন্য ভগবান তাঁহাকে [ঈশ্বরকে] কামরাগবিবর্জিতরূপে দেখিতে বলিলেন।

জীবমাত্রই কামের অধীন। সেই জীব উন্নত হইতে হইতে যখন কামকে দমন করিতে পারে, তখনি সে শিবত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। নিজের পত্নী ছাড়া অন্য কোন নারীসম্ভোগবাসনা যে পরিত্যাগ করে, সে-ই মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই জন্মেই শেষ বয়সে কেহ ইচ্ছা করিলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে অথবা মৃত্যুকালে ভগবদ্দর্শন করিয়া অনাগামী হইতে পারে অথবা সে আবার জন্মলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিবেই করিবে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান গার্হস্থ্য আশ্রমীদের চূড়ান্ত আদর্শের (possibilities) কথা বলিলেন।

[মন্তব্য : 'ভূতেষু ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ'—এই বাক্যের অর্থ অনেকে করিয়াছেন যে, ইহা জায়াপত্যবিষয়ে অভিলাষ, যাহা শাস্ত্রবিধি অনুসারী। ইহা গার্হস্থ্যাশ্রমিগণের পক্ষে প্রযোজ্য হইতেই পারে, কিন্তু যাহারা গার্হস্থ্যাশ্রমী নহে অথবা অনাশ্রমী (বালসন্ন্যাসী), তাহাদের ক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ কী হইবে? স্বামী অপূর্বানন্দজী লিখিয়াছেন : "শ্রীভগবানের বিধান সকল স্তরের মানবের কল্যাণের জন্যই। আমাদের মনে হয়—রাজসিক ও তামসিক ভাবশূন্য সাত্ত্বিক, ধর্মবর্ধক মনোকামনারূপেই ভগবান বিরাজ করছেন; অর্থাৎ ধর্মের পোষক শুভকামনাপূর্ণ হৃদয়ই শ্রীভগবানের আবাসস্থল।"

টীকাকার শ্রীধরস্বামী 'কাম' ও 'রাগ'-এর সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাই কাম; এবং প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশশীলতা জানিয়াও ভ্রমবশত ঐ বস্তু (বা প্রাণী)-র চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাসপূর্বক তাহাকে ভালবাসাই 'রাগ'।—সম্পাদক]

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥১২॥

শ্লোকার্থ : *প্রাণিগণের মধ্যে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক ভাব তাহাদের স্বকর্মবশে উদ্ভূত হয়, জানিবে সবই কিন্তু মূল আমা হইতে সৃষ্ট। তবে প্রাণিগণ যেরূপ ঐসব গুণের বশীভূত, আমি (ভগবান) তেমন নহি, বরং উহারা আমার মধ্যেই বিরাজ করে—আমারই অধীন হইয়া।*

ব্যাখ্যা : পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগতের কারণ। তাই জগতের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ ভালমন্দ উভয়কেই ব্রহ্মরূপে দেখিতে পারেন। যেমন, ঠাকুর পতিতা নারীর মধ্যেও ভগবতীকে দেখিয়াছিলেন। জগতের মন্দ জিনিসে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম আবৃত থাকেন। ভাল জিনিসে বিদ্যা মায়ার সহায়ে ব্রহ্মের একটু আভাস পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহাদের ভিতর সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়—তাহারা সৌন্দর্য, মাধুর্য যেরূপ সম্ভোগ করেন, তমোগুণী লোক তাহা কখনো পারেন না। তাই সাধক দেখিবেন, যেসব জিনিসে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে—তাহাতেই যেন ভগবান আছেন। রজোগুণ ও তমোগুণের মধ্যেও তিনিই আছেন বটে, তবে বেশি লুক্কায়িত অবস্থায়।

'ন ত্বহং তেষু তে ময়িঃ'—রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে ব্রহ্ম থাকিলেও যেহেতু উহারা সাধকের উন্নতির পরিপন্থী, সেইকারণে তিনি ব্রহ্মকে রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে দেখিবেন না ('ন ত্বহং তেষু')। কিন্তু ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; তাই বলিলেন, 'তে ময়ি' অর্থাৎ আমাতে উহারা সব আছে।

সাধক সত্ত্বগুণের প্রকাশে নিজের উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া তাহারই মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব দেখিবার চেষ্টা করিবেন। রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে ব্রহ্ম আবৃত থাকেন। ঠাকুর পতিতার মধ্যে ভগবতীকে দেখিলেন; কিন্তু আমরা তাহা হইতে দূরে থাকিব। যদি কোন কারণে তাহার ভালটুকু দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই এবং তাহার সঙ্কীর্তন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের অন্তরে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি আসক্তি আছে। কারণ, সংসারে goodness বা ভাল আর কোথাও কি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না? তাহা ছাড়া ত্যাগীদের পক্ষে ইহাও একপ্রকারের ইন্দ্রিয়সম্ভোগ। মনে রাখা প্রয়োজন, সিঁড়িতে নাচানাচি করিলে পড়িয়া যাইতেও পারে।

[মন্তব্য : সাত্ত্বিক ভাব কি কি? শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। রাজসিক ভাব যথা—হর্ষ, বিষাদ, অহঙ্কার, জিঘাংসা, যশাকাঙ্ক্ষা, উদগ্র কামনা ইত্যাদি। তামসিক ভাব যথা—শোক, মোহ, আলস্য, নিদ্রা, তীব্র স্বার্থপরতা ইত্যাদি।—সম্পাদক] [ক্রমশ]॥আটাশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রশ্নোত্তরে ধর্ম-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ মাঘ ১৪১১ সংখ্যার পর]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *বেদান্তের ব্যাপারে আমেরিকার আগ্রহ কতটা খাঁটি? ওখানকার বুদ্ধিজীবীরাও কি এসম্বন্ধে আগ্রহী?*

উত্তর ঃ লোকে যদি কোন বিষয়ের সন্ধান পায়, তবেই তাতে তাদের আগ্রহ জন্মানোর প্রশ্ন ওঠে। সকলের তো আর বিষয়টির কথা শোনার বা জানার সুযোগ হয় না। তবে ইদানীংকার একটা ভাল প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই উপনিষদ্ ও গীতা রয়েছে। কেবল আমেরিকা ও কানাডাতেই এইরকম ৮৪টা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছি; বাকি ২৩টি দেশে দিয়েছি ৩১টা প্রতিষ্ঠানে। আমেরিকায় এরকম অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখেছি, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে উপনিষদ্ ও গীতা রয়েছে—কারণ তা তাদের পাঠ্য। এর ওপর তাদের পরীক্ষাও দিতে হয়। ওহিও প্রদেশের ক্লিভল্যাণ্ড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দেখলাম, স্নাতকোত্তর ক্লাসে পড়া হচ্ছে দুরূহতম উপনিষদ্গুলির মধ্যে একটি—'মাণ্ডুক্য'। ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আমি এই উপনিষদ্টির ওপর দুটি বক্তৃতা দিলাম। ছেলে-মেয়েরা চেয়ারে বা মেজেতে অনাড়ম্বরভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে শুনল। বলল যে, পরে কাজে লাগাবে বলে টেপ করেও নিচ্ছে। ওদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ ডেভিড মিলার বছর দেড়েক ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ছিলেন; সেসময়ে তিনি ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ মঠে যেতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার অনুরাগী এবং আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাপন করেন।

তাই বলছিলাম, ওদেশে এমন মানুষ আছেন, যাঁদের সঙ্গে ভারতীয় ভাবনার গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছে; এছাড়া নতুন নতুন মানুষও এই ভাবের সংস্পর্শে আসছেন। তাঁরা এই ভাবনাকে, ভারতের এই বাণীকে আনন্দের সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে, যাদের আবার একটা বড় অংশ সেটি নিয়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়াশোনা আরম্ভ করছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই লোকে অধ্যাপক মিলারের মতো সুযোগ্য শিক্ষকের সাহায্য পায় না। আমি লক্ষ্য করেছি, কখনো কখনো ছাত্রছাত্রীদের বেদান্ত বা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে, তা নেহাতই ভাসা-ভাসা কিংবা অসত্য। তবে এর কারণ এই নয় যে, ইচ্ছা করে বিষয়টিকে বিকৃত করা হচ্ছে; আসলে শিক্ষকেরা সবসময় ঠিক ততটা যোগ্য নন। যাই হোক, এটা ঠিক যে, বেদান্তদর্শন ও ভারতীয় ঋষিদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বিদেশে খুবই আগ্রহ রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ *কেউ যদি যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে বেদান্ত সাধন করতে চান, তবে আমেরিকার সমাজ কি তাঁকে তার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারবে? পাশ্চাত্যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসের ধারা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বা কতটুকু?*

উত্তর ঃ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন যে ঠিক কী—এটা যাঁরা বোঝেন, এমন সব মানুষের মধ্যে এখন ঐধরনের জীবনযাপনের একটা ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, একটা আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করা হলে মানুষ সাগ্রহে তাতে অংশগ্রহণ করে। এটা আরেকবার পরিষ্কার বোঝা গেল যখন শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি শিকাগো থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরের প্রতিবেশি রাজ্য মিশিগানে একটি ৮০ একর বাগিচা কেনার কথা ঘোষণা করল। জমিটি যে-টাউনশিপে অবস্থিত, তার নামটি তাৎপর্যপূর্ণ—'গ্যাঞ্জেস'। এসব ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ যে কত বেশি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন 'গ্যাঞ্জেস'-এ একটি আধ্যাত্মিক সাধনশিবির ও সাধুনিবাস স্থাপন-প্রকল্পের ঘোষণা হল। দেখা গেল, তিন-চারটি রাজ্য থেকে শয়ে শয়ে মানুষ এসে ২৬ জুলাই ১৯৬৯-এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রতিবেশী কালামাজুর ওয়েস্ট মিশিগান ইউনিভার্সিটির কয়েকজন অধ্যাপকও। তাঁরা বললেন, মাত্র প্রায় ৪০ মাইল দূরে সুন্দর এই শিবিরটি হওয়ায় তাঁরা খুশি; কারণ এটি তাঁদের ছাত্র ও শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক উপকারে আসবে।

এইভাবে মানুষ যখন জানতে পারে যে, এইরকম একটা সুযোগ আছে, তখন তারা সাড়া দেয়—বিশেষত তারা, যারা মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপ এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধার ব্যাপারটি বোঝে। যেখানে এবং যখনি আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে আলোচনা বা বক্তৃতা আয়োজিত হয়, তখনি মানুষ সাড়া দেয়। এমনকি হিন্দুদের কতকগুলি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত দর্শনের কথা বাদ দিলেও

সেগুলির নান্দনিক সৌন্দর্যের দিকটি মানুষকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের নিউ অ্যালবানিতে অবস্থিত ভারতচর্চা কেন্দ্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা সরকারের একটি প্রকল্প আছে। ঐ কেন্দ্রের আমন্ত্রণে স্বামী ভাষ্যানন্দ ও আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাঁদের দলটিকে কিছু ভারতীয় আচারপদ্ধতি প্রদর্শন করাতে। এছাড়া 'ভারতবর্ষের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেওয়ারও কথা ছিল। এতে তাঁদের যে-অভিজ্ঞতা হলো, তাতে তাঁরা খুশি বলে জানালেন। এই আগ্রহটি কিন্তু কেবল উত্তেজক কিছু একটা পাওয়ার বাসনা থেকে তৈরি হচ্ছে না। আসলে এইসব আচারপদ্ধতির আধ্যাত্মিক দিক তথা এগুলির অন্তর্লীন ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে অনুভব করার একটা ইচ্ছা এইসব মানুষের আছে; আর সেই ইচ্ছা থেকেই এই আগ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ *আপনি বলছিলেন যে, আমেরিকায় বেশ কিছু ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তাদের প্রশ্নগুলি দেখে কী মনে হয়—তাদের প্রধান সমস্যাগুলি কী?*

উত্তর ঃ এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যা হলো এটা বোঝা যে, দৈহিক বা জৈব সত্তার ওপরে মানুষের অস্তিত্বের কোন মাত্রা আছে কিনা। সমগ্র পাশ্চাত্য ভাবনা জোর দেয় মানুষের জৈব সীমাবদ্ধতার ওপর; অন্যদিকে আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবনা জোর দেয় মানুষের নিজের জৈব সীমা উত্তরণ করার ওপর। আমাদের মত হলো—মানুষ স্বরূপত আধ্যাত্মিক, স্বরূপত দৈবগুণসম্পন্ন। বিদেশের ছেলেমেয়েদের কাছে এই ভাবনার বিশেষ আবেদন আছে। বিষয়টিকে তারা বুঝতে চায় বলে অনেকগুলি প্রশ্নই ছিল বেদান্তের এই ভাবনাকেন্দ্রিক বা মানুষের দৈবস্বরূপকেন্দ্রিক। এই ভাবনা থেকে অনেকগুলি বিষয় উঠে আসে। সবরকম নৈতিক জীবন, সবরকম আধ্যাত্মিক জীবন, সমস্ত সৃজনশীল জীবন ও কর্ম, সমস্ত প্রকৃত শিল্প, জৈব সত্তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত সমস্ত জীবন গড়ে উঠেছে এই নীতির ওপরে যে, মানুষ স্বরূপত দৈবগুণান্বিত; সে অবশ্যই এক আধ্যাত্মিক সত্য সত্তা। অতএব, এই বিষয় নিয়ে অনেকগুলি প্রশ্নই উঠে এল।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার সমাজে, বিশেষত যুবসমাজে একটি ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে; সেটি হলো মাদকাসক্তি। ওখানে সবরকম মাদক জিনিসই চলছে...। এটা ছড়াচ্ছে সিনিয়র থেকে জুনিয়র ছাত্রদের মধ্যে; এমনকি হাই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও এটা এসে গেছে। তাই বহু জায়গায় প্রশ্নোত্তরে এটা একটা প্রধান বিষয় হিসাবে উঠে এল। আমার বিশেষভাবে মনে আছে এমন একদিনের কথা, কারণ সেদিনের অভিজ্ঞতাটা ছিল সত্যিই মনে দাগ কাটার মতো। ব্যাপারটা এইরকম—পিট্সবার্গে কার্ণেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ নভেম্বর ১৯৬৮-তে আমার বলার কথা। সেটি ছিল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষ বক্তৃতা। ওদের কফি হাউসে বক্তৃতা শুরু হলো, সামান্য কিছু শ্রোতা নিয়ে। আলোচনা অল্পস্বল্প এগোতে দেখা গেল, হলের প্রায় অর্ধেকটা ভর্তি হয়ে গেছে। শুরুটা হয়েছিল বৈঠকি ঘরোয়া ভঙ্গিতে, কিন্তু আলোচনা কিছুদূর এগোতেই গোটা পরিবেশটা বদলে গেল। সকলে সাগ্রহে অংশ নিতে আরম্ভ করল। এদিক-ওদিকে যেসব ছাত্রছাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারাও এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং যেমন যেমন আলোচনা চলতে থাকল, তারাও ক্রমশ আন্তরিক ও সিরিয়াস হয়ে উঠল। প্রত্যেকের কাছেই এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

সেখানে এই প্রসঙ্গটা উঠে এসেছিল—মানুষের জীবনে, বিশেষত ধর্মজীবনে মাদকের (সাইকেডেলিক ড্রাগের) ভূমিকা। "বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ড্রাগ নেয়। স্বামীজী, এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কী?"—এই ছিল প্রশ্ন। তখন আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একথাটা বলতে হলো যে, মানুষের শরীর-মনের পক্ষে ড্রাগ খুবই খারাপ। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে ড্রাগ নেওয়ার কোন সম্পর্কই নেই। এর দ্বারা বিশেষ কোন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ড্রাগ-বাবদ কয়েকটা ডলার খরচ করেই আধ্যাত্মিকতা কিনে ফেলা যায় না। মানুষের চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তরের নামই আধ্যাত্মিকতা। তাই আমাদের আমেরিকান যুবসমাজকে মাদকাসক্তির এই কু-অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে—আমি বললাম—আগামী তিন প্রজন্মের মধ্যেই তারা আজকের এই মহাশক্তিশালী সভ্যতার লাগাম ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এইভাবে আমি আমেরিকার যুবসমাজকে সতর্ক করে দিলাম; আর মনে হলো, ব্যাপারটিকে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করল।

আবার তারা বলল—"কেন ড্রাগ নয়? আমেরিকায় আমরা বলি যে, আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন উপায় আবিষ্কার করেছি, যা বুদ্ধ বা যিশুর মতো প্রাচীন ধর্মাচার্যদের কোনদিন জানাই ছিল না।" উত্তরে আমি বললাম—"হতে পারে ওটা নব্য আমেরিকান ধর্ম, কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করি না; কারণ আমরা মানুষের দেহ-মনের ওপর এর প্রভাব জানি। এটা আসলে তোমার দেহ-মনকে ধ্বংস করে দেয়। 'কোমা'র মতো আচ্ছন্ন করে দেয় তোমাকে। তোমাকে অলস করে দেয়। হয়তো তোমার কিছু অনুভূতি হয়; হয়তো এ তোমাকে শরীর-সচেতনতার ঊর্ধ্বে

নিয়ে যায়, কিন্তু সেটা আসলে জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে একটা পলায়ন মাত্র। তাই সবসময় এটার ওপর নির্ভর করো না। ব্যতিক্রমী কিছু মানুষের হয়তো এসব থেকে এককালে কিছু ব্যতিক্রমী অনুভূতি-অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং পরে তারা হয়তো মাদক ত্যাগ করে যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গে যথার্থ ধর্মের পথ ধরেছিলেন। আমাদের কিন্তু এসবের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। নির্ভর করলে দেখা যাবে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ঐ স্তরেই আটকে পড়ে মাদকের দাস হয়ে যাব ও একদিন নিজেদের দেহ-মনের সর্বনাশ করে ফেলব।

এসব আলোচনায় সেদিন ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো সিরিয়াস হয়ে উঠল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল—"আমরা তাহলে কী করব?" অন্যরা বলল—"পিট্সবার্গে একটা বেদান্ত সোসাইটি খোলা যাক; তাতে ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে।" একজন বেদান্তের ওপর প্রকাশিত আমাদের একগুচ্ছ বই কিনে বলল—"আমি একটা লাইব্রেরি খুলতে চাই। আমি চাই, এইসব সুস্থ চিন্তা অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছাক।"

বিষয়টিকে ওদের কাছে এইভাবে পেশ করায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে গভীর প্রতিক্রিয়া হলো, তা লক্ষ্য করলাম। আসলে বেদান্তে আমরা কখনো কাউকে বলি না যে, 'এটা করো না, ওটা করো না'—শুধু এই কারণে যে, অমুক ধর্মে ওসব করায় বারণ আছে। আমরা এমন কোন গোমড়ামুখো অভিভাবক নই, অন্যের আনন্দ পণ্ড করাতেই যার আনন্দ। জিনিসটি যদি উপকারী হয়, আমরা অবশ্যই বলব—'হ্যাঁ'; আর যদি অপকারী হয়, আমরা অবশ্যই বলব—'না'। ড্রাগের প্রভাবে নবীন প্রজন্মের সংবেদনশীল শারীরিক ও মানসিক গঠন চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। এই কারণেই আমরা যারা বেদান্ত-অনুরাগী, তারা আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকাসক্তির ব্যাপারে এত চিন্তিত। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা তেমন কিছু ক্ষতি করবে না; কিন্তু অল্পবয়সিদের ক্ষেত্রে এর ফলাফল বিষবহ। [ক্রমশ]

কোয়ালপাড়া আশ্রম

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার অষ্টাবিংশ পর্যায়ে কোয়ালপাড়া আশ্রম।—সম্পাদক

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে 'কোয়ালপাড়া আশ্রম'। শ্রীশ্রীমা বলতেন : "এ আমার বৈঠকখানা।" তাঁর বহু লীলার সাক্ষী হিসাবে আশ্রমটি কোয়ালপাড়া গ্রাম আলো করে বিদ্যমান।

এই আশ্রমের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় : "১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনকালে জয়রামবাটীর কাছে কোয়ালপাড়া গ্রামে কিছু ছাত্র ও যুবক দেশসেবার উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। অচিরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যদিও তখনো এই আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আশ্রমটি এবং সেখানকার কর্মীদের প্রতি শ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। কলকাতা আসা-যাওয়ার পথে তিনি প্রায় প্রত্যেকবার এই আশ্রমে বিশ্রাম করে যেতেন। এখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তাঁর নিজের ছবিও বসিয়েছিলেন। আশ্রমে সেই ছবির নিত্য পূজা হতো।... স্বদেশি আন্দোলনে কোয়ালপাড়া আশ্রম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিলাতি দ্রব্য বর্জন, বিলাতি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি স্বদেশি প্রচারের কাজে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রবল উৎসাহে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। সুতরাং আশ্রমের ওপরে তখন পুলিশের কড়া নজর এবং নতুন কোন আগন্তুক সেখানে এলে পুলিশ তার নামধাম সব লিখে নিয়ে যেত। মা একদিন তাঁদের বলেন, 'দেখ, তোমরা "বন্দে মাতরম্" করে, হুজুগ করে বেড়িও না; তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।' মায়ের উৎসাহে আশ্রমের কর্মীরা তাঁত ও চরকা কাটায় মন দিলেন। একদিন তাঁরা তাঁদের তাঁতে বোনা একখানি কাপড় শ্রীমাকে পরতে দেন। বোনা ভাল না হলেও মা তা পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সাগ্রহে পরেন।"[১]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন : "কোয়ালপাড়া জয়রামবাটী হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ১৩১৩ সালের বর্ষারম্ভে স্বামী নির্মলানন্দ যখন ধীরানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যান, রাস্তায় কোয়ালপাড়ায় কেদারনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা হয়। কেদার তখন কোয়ালপাড়া ও কোতুলপুর এই দুইটি গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ের সৌম্যমূর্তি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে, তাঁহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। তাঁহাদের উপদেশে কেদার মাকে দর্শন করিতে গেলে মা তাঁহাকে ঠাকুরের ও স্বামীজীর দুইখানি ফটো দান করেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে স্বদেশি ভাবের প্রেরণায় তিনি কোয়ালপাড়ায় তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার ছাত্র কতিপয় বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবক তাঁহার সহযোগী হন। ইঁহারা অনেকেই পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া তাঁহার নিত্যপূজা আরব্ধ হইলে মঠের সূত্রপাত হয়। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিবার পথে মা তথায় স্বহস্তে ঠাকুরের ও নিজের ফটো প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে গৌরী-মা, লক্ষ্মীদেবী ও ব্রহ্মচারী প্রকাশ মার সঙ্গে ছিলেন। মা প্রথমত লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিতে বলিলে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া আপত্তি করেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি গুরুকন্যা, তুমি পুজো করবে না কেন?'
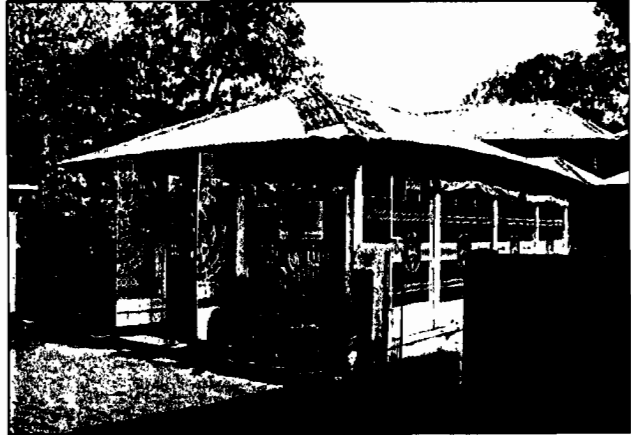
কোয়ালপাড়া আশ্রম

"কেদারের পৈতৃক ভিটায় যে-ঘর ছিল, উহা তিন-চারি বৎসর পরে জগদম্বা আশ্রমে পরিণত হয়। তাঁতশালার আয় হইতে কোয়ালপাড়া মঠের অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহিত হইত এবং সপ্তাহে দুইদিন তরিতরকারি কিনিয়া জয়রামবাটীতে মার সেবার জন্য পাঠানো হইত। সেবকেরাই মাথায় করিয়া দিয়া আসিতেন। মার কাছে যাতায়াতের পথে ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে বিশ্রাম করিতেন। কেহ কেহ কিছু অধিকদিন থাকিয়া প্রত্যহ বা একদিন অন্তর মাকে দর্শন করিতে যাইতেন।"[২]

তৎকালীন আশ্রমের আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখায় : "কোয়ালপাড়ার আশ্রমটি কোতুলপুর হইতে দেশড়াগামী সদর রাস্তার ঠিক উপরে। শ্রীমায়ের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি—জগদম্বা আশ্রম সেখান হইতে সওয়া দুইশত গজ পূর্বে, গ্রামের শেষ প্রান্তে। ঐ বাড়ি নির্জন ও চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। মায়ের বাসগৃহখানি বেশ বড়; উহার মেজে সিমেন্ট করা। পার্শ্বে রান্নাঘর। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখানি বড় ঘরে সাত-আট জন স্ত্রীভক্ত থাকিতে পারেন। দক্ষিণ-পশ্চিমের অপর একখানি ঘরে পুরুষ ভক্তেরা দিনের বেলা দেখা করিতে আসিলে একটু বসিতে পারেন। উহার ভিতরদিকের বারান্দায় ঢেঁকি ইত্যাদি আছে। ঐ বাড়ির দক্ষিণে প্রায় একশত হাত দূরে কেদারবাবুর বাস্তুবাড়ি। শ্রীমা প্রথমে কোয়ালপাড়ায় আসিয়া সেখানেই পদার্পণ করেন। বাড়িতে পূর্বদ্বারী একখানি বড় ঘর; উহার পূর্বে কেদারবাবুদের ছোট ঠাকুরঘর। উত্তরে গরু রাখিবার চালাঘর। চারিদিকে প্রাচীর। বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণে কাঁটাগাছের জঙ্গল; পশ্চিমে একটি ডোবা; উত্তরে কয়েকটা কয়েতবেলের গাছ ও তেঁতুলগাছ। নিকটে অন্য কাহারও বাড়ি নাই।"[৩]
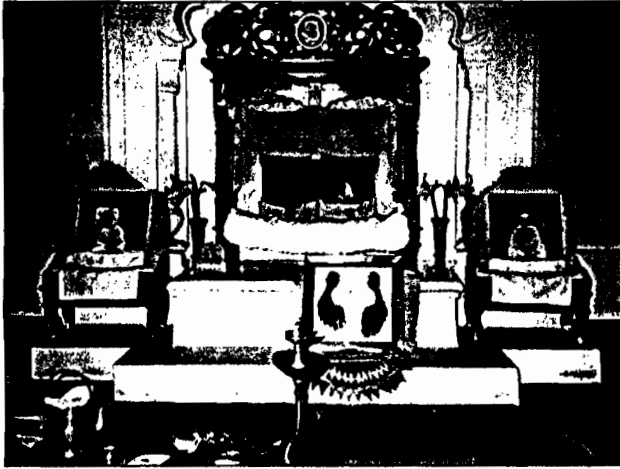
আশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের পট, সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের জীবৎকালে গ্রহণ করা চরণচিহ্ন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা কেদারনাথ দত্ত সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, সমাজসেবী, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, আদর্শবান ও ভক্তিমান পুরুষ। পিতামাতার একমাত্র পুত্র—অবিবাহিত। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য; পরে মায়ের কাছেই সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'স্বামী কেশবানন্দ'। তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায় : "সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ থাকিলেও শ্রীমা গৈরিকধারণের অনুমতি দেওয়া সম্বন্ধে অতি সাবধান ছিলেন। স্বামী কেশবানন্দ মাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া শ্রীমা প্রথমে তাঁহার সন্ন্যাসে সম্মত হন নাই; পরে যখন জানিলেন যে, তিনি মাতার অনুমতি পাইয়াছেন, তখন সানন্দে অনুমোদন করিলেন। কেশবানন্দ স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; হাঁপানিতে ভুগিতেন। তাই তাঁহার জননী ছেলের সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে পুত্রশোক পাইতে না হয়। শ্রীমা সে-বর দিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধা পুত্রের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।"[৪]

আরো জানা যায় : "কেদারনাথের গর্ভধারিণীও ঠাকুর এবং মায়ের ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, কেদারনাথ যখন তাঁহার গর্ভে, তখন তিনি ঠাকুরের দর্শন এবং চরণস্পর্শে ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, এই কারণেই ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরানীর উপর তাঁহার পুত্রের এত ভক্তি।"[৫]

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ কেদারনাথ দত্ত তথা স্বামী কেশবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রসন্নতাবিধানে সবসময় সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল, জয়রামবাটী-কলকাতা যাতায়াতের সময় শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্রামের জন্য কোয়ালপাড়ায় তাঁর বাসোপযোগী একটি বাড়ি যেন নির্মিত হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিজের পৈতৃক ভিটাতে কয়েকখানি ঘর নির্মাণ করেন। এটির নাম 'জগদম্বা আশ্রম'। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই স্বামী কেশবানন্দের জীবনাবসান হয়।

কোয়ালপাড়া আশ্রমের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের অনেক লীলাস্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে থাকতে পারতেন। তাঁর কথায় : "কোয়ালপাড়া হলো আমার বৈঠকখানা। এইসব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ—আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়।"[৬]

কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক, নির্বিচারে সকলকে দীক্ষাদান, আশ্রমের অধিকাংশ সেবক বা কর্মীদের গেরুয়াবস্ত্র দান-সহ সন্ন্যাসদান এবং ঠাকুরের প্রতিকৃতির পাশে নিজের প্রতিকৃতি স্থাপন ও পূজা। এছাড়াও ছোট-বড় অনেক ঘটনা এই কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঘটেছে, যেগুলির উল্লেখ করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে প্রথমাবস্থায় খুব স্বদেশিচর্চা হতো এবং স্বদেশি আন্দোলনের দিকেই সকলের বিশেষ ঝোঁক ছিল। "১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সুরেশ চৌধুরী নামে জনৈক যুবক পুলিশের নজরবন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কোয়ালপাড়া আশ্রমে এসে উপস্থিত হয় এবং দীক্ষার অনুরোধ জানায়। আশ্রমের ওপর তখন পুলিশের কড়া নজর থাকায় আশ্রমাধ্যক্ষ ও অপরাপর সকলে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণামের পর তাকে

চলে যেতে বলেন। মা এই খবর পেয়ে স্বামী ঈশানানন্দকে বলেন, 'আহা, বরদা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বিষ্ণুপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা আমার কাছে ছুটে এসেছে। তুমি যদি আজ রাত্তিরটা গ্রামের কোন লোকের বাড়িতে বা বৈঠকখানায় তাকে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে কাল

জগদম্বা আশ্রম ঃ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে গৃহীত চিত্র

সকালেই আমি দীক্ষা দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব।' তাই-ই হলো। পরদিন খুব সকালে পথের মাঝে নিকটবর্তী পুকুর থেকে সামান্য জল এনে, আসনের অভাবে খড় পেতে তৃণাসনে বসে সুরেশ চৌধুরীকে দীক্ষা দিয়ে মা তাকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন।"[৭]

স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবীদের প্রতি মায়ের নৈতিক সমর্থন বা কৃপা প্রদর্শনের এরকম অনেক ঘটনা আছে। একদা কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু মাকে বলেছিলেন ঃ "মা, স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হতো।" একথা শুনে মা তাড়াতাড়ি বললেন ঃ "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি (ইংরেজ সরকার) কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।"[৮]

কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীমা নির্বিচারে সকলকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন এবং আশ্রমের অধিকাংশ ভক্তকেই সন্ন্যাস দিয়েছেন। সন্ন্যাস দেওয়ার সময় ভক্তকে গেরুয়া দান করলেও বিরজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য তিনি মঠের কোন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সাহায্য নিতে নির্দেশ করতেন। "শ্রীমায়ের দীক্ষিত জনৈক ব্রহ্মচারী গেরুয়া ছাড়িয়া সাদা কাপড় পরিতেছেন শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, 'মাটির ভাঁড়ে সিংহের দুধ টেঁকে না। গেরস্তর অন্ন খেয়ে খেয়ে ওর বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে'।"[৯]

"পুলিশের নজরবন্দি একটি ছেলেকে মা মঠের মধ্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রম থেকে রাধুর বাড়িতে যাচ্ছেন। সঙ্গে সেবক। এমন সময় মাঠের মধ্যে ছেলেটির সঙ্গে দেখা। ছেলেটি আগেই দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিল। মা সেবককে দিয়ে 'দুটি' খড় এবং একটা গ্লাসে করে কাছের পুকুর থেকে একটু জল আনিয়ে ঐ মাঠের মধ্যেই খড় পেতে বসে ছেলেটিকে দীক্ষা দিলেন।"[১০]

কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরের পটপ্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ কেদারবাবু (পরে স্বামী কেশবানন্দ) জয়রামবাটীতে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মা তাঁকে বলেন ঃ "দেখ বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর এবং আমাদের পথের বিশ্রামের জন্য স্থান একটু করেছ, তখন এবার যাবার সময় (জয়রামবাটী থেকে কলকাতা) ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশি করে কি হবে? আমাদের যাকিছু, সবের মূল ঠাকুর—তিনিই আদর্শ। যাকিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।"[১১]

"(১৩১৮ বঙ্গাব্দের/১৯১১ খ্রিস্টাব্দের) অগ্রহায়ণের আরম্ভ (৮ অগ্রহায়ণ)। তখন ভোরে খুব ঠাণ্ডা হইলেও শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় গিয়া পূজা করিতে হইবে। তাই তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই পালকিতে রওয়ানা হইলেন। লক্ষ্মীদিদি, শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকু ও রাধু এবং রাধুর স্বামী মন্মথ ভিন্ন ভিন্ন পালকিতে যাত্রা করিলেন। ছোটমামি, নলিনীদিদি, ভূদেব প্রভৃতি

জগদম্বা আশ্রম ঃ বর্তমান চিত্র। ইনসেটে ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের পট।

অন্যান্য সকলে গোযানে উঠিলেন এবং ব্রহ্মচারী প্রকাশ মহারাজ সকলের তত্ত্বাবধায়করূপে চলিলেন।

"কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীমা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ভক্তবৃন্দ যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছেন। মা আশ্রমে পৌঁছিয়া স্নান সারিয়া আসিলেন এবং বেদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আপনার ফটো স্থাপনপূর্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। তাঁহার

আদেশে কিশোরী মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) হোমাদি করিলেন। পূজাশেষে সকলে প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে কেদারবাবুর মা, লক্ষ্মীদিদি ও নলিনীদিদির সহিত শ্রীমা কেদারবাবুর বাড়িতে পদব্রজে বেড়াইতে গেলেন।"[১২]

কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের পাশে শ্রীশ্রীমায়ের নিজ হাতে নিজের পটপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন : "শ্রীমায়ের অবয়বে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং জগদম্বা। কিন্তু সংসারীর বেশে তাঁকে চেনা সত্যিই কঠিন ছিল। সেজন্যই বোধকরি শ্রীমা অনুগ্রহ করে ভক্তদের শেখাবার জন্য নিজের পটের পূজা কয়েকবার করেছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মা একদিন ঠাকুরের ও তাঁর নিজের ফটোদুখানি পর পর মাথায় ঠেকিয়ে কোয়ালপাড়ায় ঠাকুরঘরে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। ফুল চন্দন দিয়ে তাঁদের পূজা করেন। পরে ব্রহ্মচারী কিশোরীকে দিয়ে হোম করান।"[১৩]

স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন, ১৩১৬ সাল থেকে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত কলকাতায় যাতায়াতের পথে শ্রীশ্রীমা এখানে বিশ্রাম করতেন।[১৪] মাঝে মাঝে বসবাসও করেছেন।

কোয়ালপাড়ায় থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা বহুবার ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। একদিন দুপুরে মা আশ্রমের বারান্দায় বসে আছেন; হঠাৎ দেখেন, ঠাকুর সদর দরজা দিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে বারান্দায় এসে শুয়ে পড়েছেন। মা তাই দেখে শশব্যস্ত হয়ে নিজের কাপড়ের আঁচলখানি পেতে দিতে দিতেই নিজে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কোয়ালপাড়া আশ্রমে প্রবল জ্বরে বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার পর একটু হুঁশ হলেই তিনি যখন শরীরের জন্য ঠাকুরকে স্মরণ করতেন, তখনি ঠাকুরের দর্শন পেতেন।[১৫] আরেকদিন ঠাকুরকে প্রণাম করে ঘরে গিয়ে মা দেখেন, ঠাকুর মেঝেতে শুয়ে আছেন। মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : "সে কি গো, তুমি এমন করে শুয়ে কেন?" উত্তরে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন : "আমার বড় ভাল লাগে।"[১৬]

"কোয়ালপাড়া মঠে প্রথম প্রথম ঠাকুরকে নিরামিষ আতপান্ন ভোগ দেওয়া হইত। কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া মনি-অর্ডারে কিছু টাকা পাঠাইয়া শ্রীশ্রীমা কেশবানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 'এই টাকা দিয়া ঠাকুরের দই-মাছ ভোগ দিয়া তোমরা প্রসাদ পাইবে'।"[১৭]

একদা কোয়ালপাড়া আশ্রমে সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা রাধুকে দিয়ে একটি পত্র লিখিয়ে কেদারবাবুকে পাঠান। পত্রে লেখা ছিল : "শ্রীমান কেদার, ও আশ্রমে আমিই ঠাকুরকে বসিয়েছি। তিনি সিদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অতএব আমি বলছি, ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে; আর যেমন করেই হোক তিন তরকারির কম ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝবে কেমন করে?"[১৮]

কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের এক শিষ্য কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল : "ভক্তদের স্পর্শে যখন কষ্ট হয়, তখন স্পর্শ না করাই উচিত।" উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : "না বাবা, আমরা তো ঐজন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপ-তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?"[১৯]

"কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে একটা দোলনা খাটানো হয়েছিল। অনেকসময় মা ঐ দোলনায় বসে দোল খেতেন, ভক্ত-মেয়েরা দুলিয়ে দিত; কখনো-বা ভক্ত মেয়েদের কেউ দোল খেত, আর মা নিজেই দোল দিতেন। ক্রীড়াচঞ্চল ছোট্ট মেয়ে যেন একটি—সমবয়স্কদের সঙ্গে নির্মল আনন্দে রত।"[২০]

"মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুতে শ্রীমাকে কোয়ালপাড়ায় আকুলভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাই পরদিন সকালে প্রণাম করিতে গিয়া মহীশূরের ভক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রশ্ন করিলেন, 'মা, আপনি আবার ন্যাড়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মতো এরকম কাঁদলেন কেন?' শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'আমি সংসারে আছি—সংসারবৃক্ষের ফল ভোগ করতে হবে। তাই আমার কান্না।' "[২১]

এইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের বহু আনন্দ-অশ্রুর নীরব সাক্ষী কোয়ালপাড়া আশ্রম তাঁর একান্ত নিজস্ব লীলাস্থলরূপে ভক্তদের চিরকাল আকর্ষণ করে। বর্তমানে আশ্রমটি জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধীনে পরিচালিত এবং মঠে রূপান্তরিত। ❑

পথনির্দেশ : কোয়ালপাড়া আশ্রমের ঠিকানা—রামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, গ্রাম : কোয়ালপাড়া, পোঃ দেহয়াপাড়া, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৪১। হাওড়া স্টেশন থেকে সাউথ-ইস্টার্ণ রেলপথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমে বাস অথবা অন্যান্য যানযোগে কোয়ালপাড়া আশ্রমে যাওয়া যায়। আবার কলকাতা থেকে ভায়া জয়রামবাটীর বাসেও যাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

(১) শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪৫২ (২) শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৯৩, পৃঃ ৮৭-৮৮, পাদটীকা (৩) শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪০১, পৃঃ ২৩১ (৪) ঐ, পৃঃ ২৬৬-২৬৭ (৫) সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬১, পৃঃ ২৮৮ (৬) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২০৫-২০৬ (৭) শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬৫ (৮) ঐ, পৃঃ ৪৫৩ (৯) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৬৯ (১০) শতরূপে সারদা, পৃঃ ৩৪৮ (১১) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২০১ (১২) ঐ, পৃঃ ২০৫ (১৩) শ্রীশ্রীসারদা মহিমা—স্বামী প্রভানন্দ, ১৪০৩, পৃঃ ৭৩ (১৪) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৯৮ (১৫) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২২৪ (১৬) শ্রীশ্রীসারদাদেবী, পৃঃ ১৩২ (১৭) ঐ, পৃঃ ৮৪ (১৮) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২১৬ (১৯) শতরূপে সারদা, পৃঃ ৬২৪ (২০) ঐ, পৃঃ ৬১৪ (২১) ঐ, পৃঃ ৩৯৭

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

'কথামৃত'-এর কথা

রথীন দে*

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভুললে চলবে না, যুগটা তখন ছিল পুরোপুরি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমে আপ্লুত। সেইসময়ই কিংবা এর কিছু পরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানেও 'বাঙলা গদ্যের জনক', 'সাহিত্যে নব্যরসের সঞ্চারক'দের প্রভাব অস্বীকার করার কথা নতুনরা কল্পনাও করতে পারতেন না। সেসময়টাই 'কথামৃত'-এর প্রাক্ জন্মলগ্ন। সাহিত্যের আকাশে অখ্যাত কোন এক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেসময়ই রাতের পর রাত লোকচক্ষুর অন্তরালে বিনিদ্র লেখনী চালনা করে চলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাপুষ্ট শ্রীম-র লেখনীমুখে এভাবেই জন্ম নিয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যরীতি—'দিনলিপি সাহিত্য'। জন্ম নিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিতও হয়েছিল অগণিত পাঠকের কাছে এই সাহিত্যরীতির প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা।

বিপুল বিস্ময় আছে তাঁর লিখনপদ্ধতি নিয়েও। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে তিনি যা যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন তা অতি ক্ষুদ্র সাঙ্কেতিক আকারে দিনাঙ্ক-সহ লিখে রেখেছিলেন তাঁর ডায়েরিতে। এইরকম সামান্য কিছু কিছু সঙ্কেত থেকেই দীর্ঘকাল পরে উঠে এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শধন্য একেকটি অবিকৃত স্থিরচিত্র। আজ এতকাল পরে শুধু অনুমানেই বোঝা যায় কাজটা কতটা কঠিন ছিল। কেননা 'কথামৃত' প্রকাশের পর বিপুল কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এই গ্রন্থ পাঠ করেছেন 'কথামৃত'-এর বিভিন্ন দৃশ্যের শত শত সাক্ষী। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শলব্ধ কোন দৃশ্যের উপস্থাপনায় এতটুকু বিচ্যুতি হলে নিশ্চয় তাঁরা তা মেনে নিতেন না।

লীলাবর্ণনার অবিকৃতি রক্ষায় আর যথাযথতার প্রশ্নে কথামৃতকার ছিলেন প্রশ্নাতীতরূপে সতর্ক ও আপসহীন। জেনে অবাক হতে হয়, শুধু 'কথামৃত' লেখার প্রয়োজনেই অসীম যত্ন নিয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন 'সাক্ষ্য আইন'। বর্ণনার অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ত্রুটির কারণেও যে বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যেতে পারে সমগ্র লীলাবিবরণটি, শ্রীম জানতেন সেকথা। তাই মূল 'কথামৃত' (উপক্রমণিকা এবং পরিশিষ্ট অংশ ব্যতীত) রচনাকালে অতি বিশ্বস্ত 'Second Hand Evidence' বা 'Hearsay Evidence'-এর ওপরও এতটুকু নির্ভর করেননি শ্রীম।

প্রসঙ্গত, বি. এ. পাশ করার পর কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল বি. এল. (তৎকালীন আইনে স্নাতক ডিগ্রি) পরীক্ষা দেবেন। তদুদ্দেশ্যে অনেকাংশে প্রস্তুতি নিলেও অর্থের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে তাঁর সেই ইচ্ছা শেষপর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে আদালত-প্রাঙ্গণেও একসময় এই জ্ঞানান্বেষী মানুষটির উপস্থিতি ছিল প্রায় নিয়মিত। আর সেইসব সূত্রে আদালতে সাক্ষ্যদানের রীতিনীতি এবং আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষীর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। এপ্রসঙ্গে তাঁর কথা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক: "আমরা এসব বই ('কথামৃত') লিখেছি কত দেখেশুনে। Law of Evidence (সাক্ষ্য বিধি) আমায় পড়তে হয়েছে। ওরা তো তা জানে না। একটু ভুল যদি বের হয় evidence-এ (সাক্ষ্যে), তাহলে সবটার value (মূল্য) কমে যায়। উকিল বলেন জজকে, 'My Lord, he is not reliable.' ('মহামান্য মহোদয়, এই সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য নয়।') আমরা কত কোর্টে যেতাম। এইসব দেখেশুনে তো হয়েছে এসব। Direct evidence (প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য)-এর যে force (শক্তি), অপরের কাছে শোনা কথার সেই শক্তি থাকে না। তাই তো জজ জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' নিজে দেখলে বা শুনলে জোর হয় বেশি।"[৩]

আলোচনার সুবিধার্থে এপ্রসঙ্গে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের প্রধান নীতিগুলির ওপর সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। সাক্ষ্য আইনের প্রধান নীতি: (ক) সাক্ষ্য সর্বদাই মূল বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (খ) অপরের কাছ থেকে শুনে বলা সাক্ষ্য অর্থাৎ Second hand Evidence বা Hearsay Evidence গ্রাহ্য হবে না। (গ) প্রতিটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে ভাল সাক্ষ্যটি নিতে হবে।[৪]

মনে রাখতে হবে, সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজন (যেমন কেন্দ্র কর্তৃক ১১১-এ, ১১৩-এ, ১১৩-বি, ১১৪-বি এবং রাজ্য কর্তৃক ৭৮-এ প্রভৃতি ধারার ক্ষেত্রে) বাদ দিলে সাক্ষ্য আইনের মূল কাঠামো শ্রীম কর্তৃক 'কথামৃত' রচনার

** নবীন প্রজন্মের সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক, নিউ ব্যারাকপুর-নিবাসী, বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় মাঝেমধ্যে লেখেন।*

সময় থেকে অদ্যাবধি অপরিবর্তিতই আছে। সাক্ষ্য আইনের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে কথামৃতকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই শতকরা একশো ভাগ বিশ্বস্ততা রক্ষার স্বার্থে যাবতীয় শোনা ঘটনা এবং শোনা কথা তিনি সর্বাংশে বর্জন করেছেন মূল 'কথামৃত'-এ। অসীম সতর্কতায় প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে যেন আজও তিনি পাঠকের দরবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছেন যুগাবতারের অপূর্ব যুগলীলার।

এই প্রসঙ্গেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি হলো—আদালতের কাছে সাক্ষ্যদানকারীর সামাজিক সম্মান। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'কথামৃত'-এর কথক শুধু প্রধানশিক্ষকরূপেই বিভিন্ন সময় কর্মরত ছিলেন 'নড়াইল উচ্চ বিদ্যালয়' (যশোহর), কলকাতার 'মডেল স্কুল', 'এরিয়ান', 'মেট্রোপলিটান', 'রিপন কলেজিয়েট স্কুল', 'সিটি কলেজিয়েট স্কুল' প্রভৃতি বিদ্যালয়ে। কখনো কখনো একইসঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানেও তিনি শিক্ষকতা করেছেন। আর এরকম উচ্চশিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির Direct Evidence সাধারণত আদালতও উপেক্ষা করার সাহস দেখান না। একারণেই 'কথামৃত' কেবল নিছক এক ধর্মগ্রন্থ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্ঘটিত কার্যাদি ও ঘটনাবলীর আইনগ্রাহ্য ও আইনস্বীকৃত একমাত্র প্রামাণ্য বিবরণ—প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বয়ানে কোনমতেই যা আর পুনর্লিখিত হতে পারে না। তাই চরম যুক্তিবাদীরাও পারেন না এই গ্রন্থের কোন কথায় অবিশ্বাস করতে।

ফিরে আসা যাক লিখনপদ্ধতি প্রসঙ্গে। যতটুকু বোঝা যায়, ডায়েরির সাঙ্কেতিক লিপিতে শ্রীম দৃশ্যের ক্রমাঙ্ক নির্দেশ করেছেন 'SC' দ্বারা; এইভাবে 'শ্রী' দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং 'I' দ্বারা লেখক নিজেকে বুঝিয়েছেন। 'কথামৃত'-এর প্রতিটি দৃশ্যচিত্রণে হাত দেওয়ার আগে শ্রীম এই সাঙ্কেতিক শব্দগুলিকে নিয়ে ধ্যানে বসতেন। আর ধ্যানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনাটি ধরতে সক্ষম হলে তবেই লেখায় হাত দিতেন, নচেৎ নয়। অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকার আকর থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃশ্যাবতারণা, তাও আবার ঘটনা এবং ঘটনার বর্ণনার মাঝে যদি থাকে কয়েক যুগের প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান—বাস্তবে তাও কি সম্ভব! যেখানে সামান্যতম শব্দবিকৃতিরও অভিযোগ ওঠে না ঠাকুরের অসংখ্য, অগণন একনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলীর কারো মনে! তাই কথামৃতকার শ্রীম সম্বন্ধে 'শ্রুতিধর' বা 'স্মৃতিধর' কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেও মনে হয় না 'কথামৃত'-লিখন সম্পর্কে এই বিরাট বিস্ময়ের কোন ব্যাখ্যা দান করা যায়। একারণেই প্রশ্ন জাগে, ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বচনামৃত অবিকৃতভাবে সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশন এবং ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে অচ্ছেদ্য সেতুবন্ধ নির্মাণ—ব্যক্তিগতভাবে শুধু একক প্রয়াসে কারো পক্ষে করা কি সম্ভব, তাঁর চাপরাশ না পেলে?

আশ্চর্য! রামের জন্মের আগেই রামায়ণ লেখার মতো সবকিছুই যেন ছিল পূর্বনির্ধারিত, মহেন্দ্রনাথ ডায়েরি লিখতে শুরু করেন সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায়। ঐসময় থেকেই স্কুল-কলেজের আলোচনাসভায়, সেনেট হল, টাউন হল-এ প্রদত্ত বিশেষ ভাষণগুলি তিনি তারিখ-সহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে রাখতেন। হয়তো বা কোন ঈশ্বরদত্ত অমোঘ নির্দেশে অন্যান্য বালকোচিত কার্যাপেক্ষা অবালকোচিত এই অনুলিখনই অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল তাঁর কাছে। 'কথামৃত'-এর প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাসের সূচনা যেন তখন থেকেই। সেই শুরু, তারপর দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বছরের অভ্যাস আরো পরিণত করে মহেন্দ্রনাথকে। অতঃপর যুগাবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর যুগলীলার ভাষ্যকারের।

ব্যাবহারিক জীবনে অতি দীনহীন বেশে, নির্লিপ্ত উদাসীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন শ্রীম। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন গুপ্তযোগী। সর্বান্তঃকরণে সন্ন্যাসী হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাঁকে অবস্থান করতে হয়েছিল সংসারাশ্রমে—প্রেম আর ভালবাসার মূর্ত বিগ্রহ, ঔদার্য আর অনাসক্তির উজ্জ্বল প্রতীকরূপে। সাধারণ গৃহীদের কাছে বোধকরি তাঁর উপস্থিতির সত্যই প্রয়োজন ছিল, আর তা ছিল লোকশিক্ষার কারণেই। ঠাকুরের কথায়ঃ "মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে সংসারে রাখেন, নয়তো ভাগবত কে শোনাবে? রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য।"

তাঁর প্রকৃতি আর পদবিতেও ছিল অদ্ভুত সামঞ্জস্য। পদবি ছিল 'গুপ্ত', সংসারে তিনি থাকতেনও অতি গুপ্তভাবে। সকলের মাঝে থেকেও যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে! তাঁর প্রচারবিমুখতার কথা বলতে গিয়ে ব্যাবহারিক জীবনের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, 'কথামৃত'-এই ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য উদাহরণ। এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কথামৃতকারের বর্ণনা অনুযায়ী দিনটা ছিল ৫ জানুয়ারি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার। ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে।

নরেন্দ্রনাথের পিতার পরলোকগমনের পর তাঁর মা এবং অন্যান্য ভাইরা তখন নিদারুণ অর্থকষ্টে কালাতিপাত করছেন। তাই মাতা ও অন্যান্যদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যূনতম কিছু বন্দোবস্ত করার প্রয়োজনে নরেন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে বাড়ি ফিরছেন। একজন বন্ধুর সহৃদয়তায় একশত টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, যার দ্বারা নরেন্দ্রনাথের মা ও ভাইরা মোটামুটিভাবে মাস তিনেক চালাতে পারবেন। নরেন্দ্রনাথ আর ঠাকুরের কথোপকথনেও ঐ সাহায্যকারী অপ্রকাশিতই রয়েছেন 'একজন বন্ধু' ছদ্মনামের আড়ালে। বলা বাহুল্য, ঐ একজন বন্ধুটি আর কেউ নন, 'কথামৃত'-এর প্রচারবিমুখ কথক শ্রীম—মণি, মাস্টার, মণিমোহন, মোহিনীমোহনের মতো 'একজন বন্ধু'ও এখানে তাঁর আরেক ছদ্মনাম।

এই গ্রন্থের অত্যাশ্চর্য অপর এক বৈশিষ্ট্যও নিশ্চয় পাঠকগণ লক্ষ্য করেছেন, শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এর ভাষ্য এতটুকু প্রভাবিত হয়নি কথকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। কারণ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর মোড়কে পাঠকের হাতে 'শ্রীম-কথামৃত' তুলে দেওয়া অথবা পরোক্ষে নিজেকে জাহির করার কোন অভিপ্রায় কথকের ছিল না। এমনকি পূর্ববর্তী অন্যান্য সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদির ভাষ্যও যেখানে ভাষ্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি, ভাষ্যকারের মনের ছাঁচে যেখানে ভাষ্যও নিয়েছে নিজস্ব আদল—সেক্ষেত্রে ভাষ্যদানে 'কথামৃত'-এর কথকের বিস্ময়কর নিরাসক্তি সবিশেষ লক্ষণীয়। সাধারণত যেকোন ঘটনা যখন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে বিবৃত হয়, তখন তা উল্লিখিত হয় উত্তম পুরুষে, কিন্তু এক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষদর্শীর জলজ্যান্ত উপস্থিতিও হারিয়ে গিয়েছে নিরন্তর প্রথম পুরুষের ব্যবহারে, বিভিন্ন নামাঙ্কিত অজস্র চরিত্রের ভিড়ে।

কথামৃতকারের জন্ম যেন 'কথামৃত' রচনার স্বার্থেই। মানবজন্মজনিত স্বাভাবিক কারণে তাঁর মধ্যে যেটুকু আমিত্বের অহমিকা ছিল, ভক্ত আর ভগবানের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে তাও দূর হয়। স্বয়ং ঠাকুরই তাঁকে 'সার্টিফিকেট' দিয়েছেন—এর অভিমান নেই। সত্যিই তাই। কর্মের প্রয়োজনেই যেন টিকেছিল শুধু কর্মের আমিটুকু। তাই দেখি, গদাধর আশ্রম থেকে নিজ স্কুলবাড়িতে প্রত্যাবর্তনকালে আশ্রমবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলছেন : "আমি এখানে খাব না, এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি সেখানে খাব।"[৫] লক্ষণীয়, 'আমার বাড়ি' এখানে এক 'ভক্তের বাড়ি' নামে উল্লিখিত। কেননা, পার্থিব জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে সদা সচেতন কথামৃতকার শ্রীম সর্বাংশে চেষ্টা করতেন 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি শব্দগুলি যেখানে স্থূল অহমিকা প্রকাশ করে, সেখানে সেগুলির প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে। একারণেই কখনো নিজ বাসস্থানটিকে তিনি 'ঠাকুরবাড়ি' বলেও সম্বোধন করেছেন। আবার কখনো আমিত্বের রেশটুকু ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করতে, স্বীয় চেতনা থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অস্তিত্বটুকুও দূর করতে রাত কাটাচ্ছেন বাস্তুহারাদের সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে। 'কাঁচা আমি'র সীমাবদ্ধতার প্রাচীর ভেঙে অসীমের মাঝে অস্তিত্ব হারানোর বাসনাতেই যে মুমুক্ষু মহেন্দ্রনাথের এই আমিত্বলোপের দুশ্চর সাধনা—তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 'কথামৃত'-এর প্রতিটি দৃশ্যাঙ্ক আজও সে-প্রয়াসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আক্ষরিক অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে আত্মহারা, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথায় আত্মবিস্মৃত এই মহাপ্রাণের মানসপটে ছিল না এতটুকু 'আমিত্বরূপ পারদ'-এর প্রলেপ। তাই আর পাঁচটা সাধারণ ভক্তের মনোদর্পণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা সেখানে প্রতিফলিত হয়নি, আধার অনুসারে মনোদর্পণের আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি হয়নি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব। আমিত্বের পারদটুকু না থাকায় নিষ্কলঙ্ক স্ফটিকস্বচ্ছ সেই 'শ্রীম মানসপট'-এ এতটুকু প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ঘটেনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসমূর্তির। শ্রীম-র বর্ণনায় ভগবান তাঁর স্বরূপেই পৌঁছেছেন ভক্তের কাছে—অবিকৃতভাবে। আর আমরাও পরিপূর্ণরূপে আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে পেয়েছি প্রাণের একেবারে কাছটিতে। তা না হলে প্রত্যক্ষদর্শীর মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব চাননি কারো মূলগত ভাব নষ্ট করে তাকে নতুন পথে চালিত করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বৈশিষ্ট্য এখানেই—যাতে নিজ নিজ ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই যেকেউ নিজের পথে পৌঁছাতে পারে স্বীয় লক্ষ্যে। বুঝিবা শুধু এই কারণেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ একা আসেননি, লোকশিক্ষার জন্য সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর লীলাসহচরদেরও (ঠাকুরের কথায় 'কলমির দল')। আর তাঁরা স্বয়ং যেন পৃথক পৃথক ভাবের এক-একটি অনুকরণযোগ্য জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কারণ আর কিছুই নয়, আধারভেদে আপন আপন প্রবণতা ও ভাব অনুযায়ী ভক্তেরা যেন সহজেই গ্রহণ করতে পারেন একেকজন লীলাসহচরের জীবনাদর্শ। সেবক ভাবের মানুষ যেমন আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন লাটু মহারাজের জীবনকে, বাৎসল্যভাবের মানুষ যেমন আদর্শ হিসাবে নিতে পারেন গোপালের মাকে, ভক্তিভাবের মানুষ

যেমন চাইতে পারেন গিরিশচন্দ্রকে, সেইরকমই দীনভাবের বোধকরি আদর্শ দৃষ্টান্ত নাগ মহাশয়।

আর অন্যদিকে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো গুপ্তযোগীকে দেখে সংসারীরা শিক্ষা নিতে পারেন সংসারে থেকেও কিভাবে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করা যায়, কর্মের অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেও কিভাবে সুবিশাল কর্মযজ্ঞে পৌরোহিত্য করা যায়।

যুগে যুগে অবতার ও তাঁর লীলাপার্ষদদের বারেবারে আগমন তো মানুষকে এই যুগোপযোগী শিক্ষাদানের প্রয়োজনেই। আর তাঁর এই লীলাসহচরটির (শ্রীম-র) সেই ভূমিকা তো স্বয়ং যুগদেবতার কথাতেই স্বীকৃত। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি কথামৃতকারকে বলছেন: "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম।"[৬]

বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য হৃদয়বত্তা আর অকৃপণ প্রেমের অপর নাম যেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অপরিসীম তিতিক্ষা আর নিরভিমান কর্মের অপর নাম যেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সম্পূর্ণ অহংশূন্য বিনয় আর নিষ্কলুষ সত্যনিষ্ঠার অপর নাম যেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। স্থূলদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর তাঁর অমৃতবাণী যেন মূর্তিময় জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর এই লীলাসহচরের পরবর্তী জীবনে। আমৃত্যু নিজ জীবন দিয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার। তাঁর সান্নিধ্যে অসংখ্য মানুষের কাছে ঠাকুরের প্রাণস্পর্শী বার্তা হয়েছিল আরো জীবন্ত, আরো প্রাণবন্ত। সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর মাতৃহৃদয়ের কোথায় স্থান ছিল এই মহাপ্রাণের, তা বোঝাতে একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। মা তখন বাগবাজারে। ঘটনাক্রমে সেসময় মাস্টারমশায়ও সেখানে অবস্থান করছিলেন। মাতৃসান্নিধ্য-কল্পে উপস্থিত এক ভক্তের মাতৃদর্শন ও মাতৃপ্রণাম সম্পন্ন হলে মা তাঁকে বলছেন: "মাস্টারমশায়কে প্রণাম করেছ? যাও, নিচে সে আছে। সে মহাপুরুষ লোক, তাকে প্রণাম করে এস।"[৭]

আমরা আরো দেখি, বিশ্ববিশ্রুত পাশ্চাত্য পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ পর্যন্ত 'কথামৃত' পাঠ করে পাশ্চাত্যের অধ্যাত্মমার্গের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের। 'কথামৃত' ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অনুধ্যানের পর রোমাঁ রোলাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ আবেগরুদ্ধ অকপট স্বীকারোক্তি —শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন যিশুখ্রিস্টের ছোট ভাই।[৮] যদিও আমরা সেই পারস্পরিক তুলনায় যাব না। কিন্তু কথামৃতকারের দৃষ্টিভঙ্গি তথা চিন্তাভাবনার স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার দরকার আছে, নাহলে আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ এবং পুঁথি-প্রণেতা অক্ষয়কুমার সেন তিনজনই শ্রীরামকৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এই তিনজনের লেখাই প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকৃত। 'কথামৃত'-এর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। লীলাপ্রসঙ্গের প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও কোন সংশয় থাকা অনুচিত। আর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র স্বীকৃতিকার তো স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। এই কারণে বলা যায়, এই তিনটি গ্রন্থই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অগণিত ভক্ত দ্বারা স্বীকৃতির সীলমোহরপ্রাপ্ত। তথাপি 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'পুঁথি'র তুলনা করলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে। রয়েছে প্রচুর তথ্যপার্থক্যও। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। যেমন—১৮৮৫-র কালীপূজার রাত্রে শ্যামপুকুরবাটীতে প্রাণময় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিমায় ভক্তগণ কর্তৃক জগন্মাতাপূজার ঘটনাটি। কথামৃতকারের বর্ণনায় ঘটনাস্থলে শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রমুখ অনেক ভক্তের উপস্থিতির কথা জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে এপ্রসঙ্গে একস্থানে লীলাপ্রসঙ্গকার বলছেন, সেদিন ত্রিশজন বা ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আরেক স্থানে প্রত্যক্ষদর্শীদের নামও উল্লেখ করছেন এইভাবে: "যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন।" স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত সেদিনের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, এই ঘটনার সূত্রপাত হয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক মূর্তিতে কালীপূজা করার সঙ্কল্পগ্রহণ থেকে। অপরদিকে লক্ষণীয়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ অথবা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে ঘটনার সূত্রপাতকারী হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের উল্লেখ নেই।[৯]

লীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী ঐদিন 'পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি' পূজার পর ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়েছিল এবং ঠাকুরও ঐসকল দ্রব্যাদির কিছু কিছু গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের পায়স গ্রহণের কথা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ পাওয়া যায় না। 'কথামৃত'-এ কিন্তু ভক্তগণ কর্তৃক পায়স আনয়ন ও ঠাকুরের পায়স গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। আবার এপ্রসঙ্গে পুঁথি-প্রণেতার বর্ণনা আরো অনুপুঙ্খ। অক্ষয়কুমার সেন তাঁর গ্রন্থে সুজির পায়সের প্রস্তুতকারিণীরূপে কালীপদ-গৃহিণীকে চিহ্নিত করেছেন। সেদিনের শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজায় নিবেদিত ভোগাদির উল্লেখ করেছেন এইভাবে:

"হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার॥

ফুলকা ফুলকা লুচি সুজির পায়স।
নূতন খেজুর গুড়ে গোল্লা সন্দেশ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপ দীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়স আনে তাঁহার গৃহিণী॥"

পুঁথি-প্রণেতা সুললিত পয়ার ছন্দে আরো লিখেছেন, এরপর ভাবের অবসান হলে ঠাকুর এক ভক্তের নিবেদিত পায়সের পাত্র নিঃশেষে শেষ করেন। পাত্রটিতে ছয় সের পায়স ছিল বলে অনুমান। তারপর সন্দেশ এবং সবশেষে সুমিষ্ট তাম্বুল গ্রহণ করেন ঠাকুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘটনার এতটা বিশদ বর্ণনা অন্য দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[১০]

এখন যদি আবার 'কথামৃত'-এ ফিরে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেদিন জগদ্ধাত্রীতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনার শুভসমাপন হয়েছিল গিরিশচন্দ্র কর্তৃক 'কে রে নিবিড় নীল কাদম্বরী সুর সমাজে' ও বিহারী কর্তৃক 'মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি' স্তবের মধ্য দিয়ে। অতঃপর ভক্তগণ কর্তৃক 'দিনতারিণী, দুরিতহারিণী', 'সকলি তোমার ইচ্ছা' ইত্যাদি প্রায় সাতটি গান গীত হয়। প্রসঙ্গত, এই গানগুলির উল্লেখ 'লীলাপ্রসঙ্গ' বা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে নেই।[১১]

এই তুলনামূলক আলোচনা শেষ করার আগে বোধকরি একথাই বলা সঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী যত ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিন না কেন, শ্রীম-র বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কারণ, স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে তিনি 'চাপরাশ' লাভ করেছিলেন। তিনি যেন রাজার সেই ডঙ্কাবাদক, রাজ-আদেশে রাজবার্তা প্রচার করছেন শহরে, নগরে, পথে, প্রান্তরে। আপামর জনসাধারণের কাছে ঠিক ততটুকুই রাজসমাচার উন্মোচিত করছেন, যতটুকু প্রকাশের অধিকার রাজা তাঁকে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পরও প্রায় ৫০ বছর (১৮৮২—১৯৩২) এই ইহজগতে অবস্থান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃতলীলার ভাষ্যকার শ্রীম। যিশুর শিষ্য বৃদ্ধ 'জন'-এর মতোই অন্তরে-বাহিরে সর্বাংশে শ্রীরামকৃষ্ণময় এই লীলাসহচরের আমৃত্যু প্রতিটি দিন নিঃশেষে ব্যয়িত হয়েছিল উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে সেই পুণ্যস্মৃতির সুধাবর্ষণে। এমনকি আজও, বিশ্বাসহীন এই একবিংশ শতাব্দীতেও সূক্ষ্মদেহে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পালন করে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্পিত সেই গুরুদায়িত্ব। দুরন্ত উত্তাল জীবনসমুদ্রপথে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামকে পাথেয় করে মনুষ্যসমাজের তরণি নিয়ে আজও তিনি সমান গতিতে গতিময়—সঠিক লক্ষ্যের দিকে। [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূত্র

৩ শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—সঙ্কলক : স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮, পৃঃ ২৯১
৪ The Indian Evidence Act, 1872
৫ শ্রীম-কথা—স্বামী জগন্নাথানন্দ, মিত্র ঘোষ, পৃঃ ২৩
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১১।২
৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৪
৮ শ্রীম সমীপে—সম্পাদক ও সঙ্কলক : স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ৪১-৪২
৯ (ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২২।৩
(খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১২শ অধ্যায়, ২য় পাদ, ঠাকুরের দিব্যভাব এবং নরেন্দ্রনাথ
(গ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, ৫ম খণ্ড, ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও শ্রীপ্রভুর কালীপূজা
১০ ঐ
১১ ঐ

সমাধান : শব্দচেতনা ৪৩

পাশাপাশি : (১) কুসুমকুমারী, (৪) জগৎ, (৬) সতীশ, (৭) রাজপুতানা, (১১) সমান, (১২) পুষ্কর, (১৩) নফর, (১৪) আমার, (১৬) বরদামামা, (১৮) বিমলা, (২০) গোলাপ, (২১) সারদেশানন্দ

ওপর-নিচ : (২) সুমতী, (৩) মাদুরা, (৫) গহনা, (৬) সত্য জননী, (৮) জয়া, (৯) তাজপুর, (১০) ক্ষীরকমলা, (১১) সরকার, (১৫) বৌমা, (১৬) বগলা, (১৭) মাস্টার, (১৯) মনন।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

আশিসকুমার ঘোষ, গণেশ মণ্ডল, কিশোরীমোহন কর্মকার, সরোজকুমার দাস, পার্বতী দাস, রমা রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, সুনীতি পাল, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী অপূর্বানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অপূর্বানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি স্বহস্ত-লিখিত এই স্মৃতিকথাটি উদ্বোধন কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর লেখা শ্রীশ্রীমায়ের এক অপূর্ব স্মৃতিকথা 'শতরূপে সারদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সেবক থাকার সুবাদে তিনি শ্রীশ্রীমা ছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গ করেছিলেন। অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এই স্মৃতিকথাটি যেমন একটি মূল্যবান দলিল, তেমন লেখার মাধুর্যেও ভক্তজনের চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।—সম্পাদক

১৯২৬ সালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে ঐ সম্মেলনটি মহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অখণ্ড ভারত ও অন্যান্য দেশের ৯০টি বিভিন্ন প্রধান শাখাকেন্দ্র ও নানা স্থান থেকে শত শত সন্ন্যাসী ও ভক্ত প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। গম্ভীর ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে ঐ অধিবেশন চলেছিল ১ এপ্রিল থেকে আটদিনব্যাপী। তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজও ঐ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত ও স্মরণীয় করার জন্য বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দিনের সম্মেলনে সর্বসমেত তিনটি গভীর চিন্তাপূর্ণ ভাষণে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাব, আদর্শ ও কার্যকলাপ' সর্বসমক্ষে ব্যাখ্যা করেন। ঐসব অধিবেশনে প্রবীণ সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট ভক্তদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়েছিল। একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম ত্রিশ বছরের কাজকর্ম, বাধাবিপত্তি, উন্নতি, প্রসার ইত্যাদি সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করাই ছিল মহাসম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণ, আলাপ-আলোচনা ও উপদেশ দ্বারা ঐ কাজটি সুসম্পন্ন করতে কম সাহায্য করেননি। শেষদিনের অধিবেশনে তিনি সকলকে শ্রীরামকৃষ্ণপাদমূলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ছাদের উপর হইতে তাঁহার ভাবী ভক্তদের ডাকিয়াছিলেন, সেই ডাক সেখানেই শেষ হয় নাই, আজও আকাশে বাতাসে উহা ধ্বনিত হইতেছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত হইতে থাকিবে—'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।' অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে, আরো অনেকে ভবিষ্যতে আসিবে। আমাদের সময় ছিল আধ্যাত্মিকতার জোয়ার—প্রার্থনা, ধর্মালোচনা, ভজন-সঙ্গীত ও ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ—অবিচ্ছিন্নভাবে একটির পর একটি আসিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক ভাবের অমৃত পান করিয়াছি।

"দক্ষিণেশ্বরের উচ্চভাবে পরিপূর্ণ দিনগুলি! আমরা তখন যেন এক স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতাম! তোমরা তাঁহার পরবর্তী ভক্তগণ, তোমাদের অবশ্য অবশিষ্ট অমৃতটুকু পান করিতে হইবে।... স্বামীজী বিশ্বাস করিয়া তোমাদের উপর যে কার্যভার দিয়া গিয়াছেন, সর্বদা তাহা মনে রাখিও। তাঁহার আশ্বাসবাণীর উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিও। এই মহৎ কার্য-সম্পাদনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তিনি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন। শ্রদ্ধাই উৎসাহের উৎসমুখ খুলিয়া দেয় এবং অফুরন্ত শক্তি ও সাহস জোগায়। শ্রদ্ধাবান হও।"* স্বামী অখণ্ডানন্দজীর এই বক্তৃতা সমগ্র সম্মেলনের ওপর বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছিল।

পূজনীয় অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ১৮৯৭ সাল থেকে মুর্শিদাবাদের পল্লিগ্রাম সারগাছিতে আর্তনারায়ণ ও অনাথ বালক-বালিকাদের সেবায় ব্রতী ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ ও নবীন অনেক সন্ন্যাসী ও ভক্তই এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রথম দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিল। তাই সম্মেলনের অধিবেশনের অবসরে অনেক সাধু-ভক্ত তাঁর মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, তাঁর হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণ, কাশ্মীরে কারাবাস ও অনশন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং জনসেবাকার্য সম্বন্ধে শোনার জন্য সমবেত হতো। তিনিও অক্লান্তভাবে সকলের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁর মুখে ঐসব মূল্যবান কথা শুনে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও উপকৃত হয়েছিল; তাই ঐ সম্মেলনে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপস্থিতি সকলের পক্ষেই হয়েছিল বিশেষ উদ্দীপনার উৎসস্বরূপ। সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঙ্গাধর

* বক্তৃতার এই অংশটুকু উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী অন্নদানন্দ লিখিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

মহারাজ ১০-১২ দিন মঠে ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৪-৫ জন অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদ-সহ তিনি মঠবাড়ির ওপরতলায় স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমদিকের বড় ঘরটিতে থাকতেন। মেজেতে ঢালা বিছানা, তাতেই তাঁদের বিশ্রাম ও নিদ্রাদি এবং ঐ ঘরের মেজেতেই তাঁদের জলখাবার ইত্যাদি দেওয়া হতো। পাশাপাশি বসে আনন্দে কতরকমের গল্প করতে করতে তাঁরা খেতেন। সে এক অপার্থিব দৃশ্য! সকলেই বয়স্ক ও পদমর্যাদাবিশিষ্ট। কিন্তু বেলুড় মঠের দ্বিতলে একটি ঘরে তাঁরা এমনভাবে আনন্দে কাটিয়েছেন যে, দেখে মনে হতো, তাঁরা যেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে মিলিত বালক ভক্তবৃন্দ। পূর্বব্যবস্থামতো আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। দিনরাত সর্বক্ষণ ঐ সেবার মাধ্যমে তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে পাওয়ার স্মৃতিটুকু এত দীর্ঘকালের প্রভাবেও ম্লান হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা একমাত্র জীবকল্যাণবাসনা নিয়ে যে জগতে থাকেন, তা-ই পরিস্ফুট হয়েছিল তাঁদের আচরণ ও ব্যবহারাদিতে। ঐ মহাপুরুষদের অনাড়ম্বর ও বৈরাগ্যদীপ্ত জীবন এবং বালকবৎ ব্যবহার সবকিছুই মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা ছিল আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি। তাঁরা ছিলেন মর্ত্যবাসীদের জীবনপথের দিশারি। যখনি কথাবার্তা বলেছেন, কিভাবে লোকের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে—তা-ই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁদের কী গভীর শ্রদ্ধা! স্বামীজী যে-প্রণামমন্ত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলে গিয়েছেন—তা ছিল তাঁর অনুভূতির কথা। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ঐসময়ে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন: "শ্রীঠাকুর এত বড় ছিলেন যে, আমরা তো তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। স্বামীজীও তাঁকে লক্ষভাগের একভাগ বুঝেছেন কিনা সন্দেহ। আবার স্বামীজী এত বড় ছিলেন যে, আমরা তাঁর হাজারভাগের একভাগও বুঝতে পারিনি।" ঠাকুর-স্বামীজীর ওপর এমনই গভীর ছিল তাঁদের শ্রদ্ধা।

মহাপুরুষ মহারাজ প্রায়ই তাঁর গুরুভাইদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁর সেবকদের নিয়োজিত করেছিলেন গুরুভাইদের সেবায়। তাঁদের জন্য বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। গুরুভাইদের যেন কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় তার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি একদিন সকালে সম্মেলনে যাওয়ার আগে ঐ ঘরে এসে হাসতে হাসতে বললেন: "এবার আমরা গঙ্গাধরকে আর সারগাছি যেতে দেব না। সে মঠেই থাকবে, সাধুব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং দেবে, বেদপাঠ শেখাবে আর ঠাকুরের কথা শোনাবে। আমরা তো বুড়ো হয়েছি—আর কদিন!" তা শুনে গঙ্গাধর মহারাজ খুব কাতর কণ্ঠে বললেন: "দাদা! দাদা! মঠে থাকতে তো খুবই ইচ্ছা হয়। আর যেখানেই থাকি না কেন মনটি তো পড়ে থাকে মঠে। এখন তো অনেকগুলি অনাথ বালক নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি—ওদের দুবেলা অন্নসংস্থান করাই মহা সমস্যা। দেখি যদি তার একটা ব্যবস্থা কোনরকমে করতে পারি তো মঠে চলে আসব।" মহাপুরুষজী চুপ করে রইলেন আর কিছু বললেন না।

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ তখনি মহাপুরুষ মহারাজের সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি, কিন্তু তিনি সেসময় থেকে প্রায় প্রতিবছর মঠে আরো বেশিদিন কাটিয়ে যেতেন। বিশেষ করে ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে পূজনীয় শরৎ মহারাজের দেহত্যাগের পর থেকে মহাপুরুষ মহারাজ ও গঙ্গাধর মহারাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল এবং গঙ্গাধর মহারাজ সুযোগ পেলেই বেলুড় মঠে আসতেন। তখন পূজনীয় খোকা মহারাজও বেশির ভাগ সময় বেলুড় মঠে থাকতেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনজন অন্তরঙ্গ পার্ষদকে বেলুড় মঠে একত্রে পাওয়ার সুযোগে সর্£র সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা ও আচরণ দ্বারা বেলুড় মঠকে শ্রীরামকৃষ্ণময় করে রেখেছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ মঠে এলেই তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে মহাপুরুষ মহারাজ খুব নজর রাখতেন এবং ঐ আন্তরিকতা নানাভাবে প্রকটিত করতেন। আমাকেও তিনি তখন গঙ্গাধর মহারাজের ব্যক্তিগত সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। ঐ দুর্লভ সুযোগে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের জীবনের ভিতর দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হতো। গঙ্গাধর মহারাজের দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যেত। তিনিও রাত তিনটার পরে উঠে ধ্যানে বসতেন এবং সকাল পর্যন্ত ধ্যান করতেন। তারপর যখন তিনি বৈদিকসূক্ত, উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী ও স্তোত্রাদি আবৃত্তি করতেন, তখন সৃষ্টি হতো এক দিব্য পরিবেশের। তিনি এমনই তন্ময়ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ করতেন যে, সকলেই মুগ্ধচিত্তে তা শ্রবণ করত। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনের ওপরও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভোরে ঠাকুরঘরে কে যাচ্ছে না যাচ্ছে তা তিনি লক্ষ্য করতেন এবং সকলকেই মঙ্গলারাত্রিকে যোগদান করে ঠাকুরঘরে বসে জপধ্যান

করতে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন: "মঠের যাবতীয় কাজই ঠাকুরের কাজ, তাতে তাঁরই সেবা করা হয়। তোমরা ঘুম কমিয়ে দাও, ধ্যান-ভজন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে কোমর বেঁধে লেগে যাও। আমি বুড়ো হয়েছি—এবয়সেও আমি যতটা ধ্যানজপ ও কাজকর্ম করতে পারি তোমরা তাও পার না—খুবই দুঃখের কথা। তমোভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠেপড়ে লাগ। এবয়সে যদি শুধু ঘুমিয়ে কাটাও তো জীবন বৃথায় যাবে। পরে বৃদ্ধবয়সে চারদিক অন্ধকার দেখবে। আমি আগে আগে সারগাছিতে সারাদিন আশ্রমের মাটি কোপানো থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাজ করতাম, বিকাল ২।৩টার সময় ভিজে ভাত নেবুর রস দিয়ে খেতাম। দিনের বেলা কখনো ঘুমাইনি। সারারাত ধ্যানভজন ও শাস্ত্রাদি পাঠ করে কাটাতাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ঐরকম শিক্ষাই দিয়েছিলেন। রাত তিনটার পর তিনি নিজেও ঘুমাতেন না, আমাদেরও তুলে দিয়ে বলতেন—এইভাবে ধ্যান কর, এইভাবে জপ কর। সাধুর পক্ষে দিনরাতে ৫-৬ ঘণ্টা সুনিদ্রাই যথেষ্ট। তার বেশি শুয়ে থাকলে কুস্বপ্ন ইত্যাদিতে মনকে নিচু করে দেয়। ঘুম ভাঙলেই ভগবানের নাম করে উঠে পড়তে হয়। বাজে গল্প করে সময় কাটানো ঠাকুর কখনো পছন্দ করতেন না। দক্ষিণেশ্বরে গেলে তিনি জপধ্যানের অবসরে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। কখনো অলসভাবে সময় কাটাতে দিতেন না।"

অখণ্ডানন্দজী মহারাজের গঙ্গাভক্তি ছিল অনুপম। গঙ্গাজলকে কোনপ্রকারে কেউ অপবিত্র করলে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ বিরক্ত হতেন। বলতেন: "ঠাকুর গঙ্গাজলকে ব্রহ্মবারি বলতেন। গঙ্গাজলে শৌচ করতে আমাদের বারণ করতেন।"

একদিন মঠের বাঁধানো উঠানে জনৈক ব্রহ্মচারী খড়ম পায়ে দিয়ে যাচ্ছিল। খড়মের নিচে রবার লাগানো ছিল না—খট্‌খট্ আওয়াজ হচ্ছিল। তিনি বসেছিলেন উঠানের দিকে একতলার বারান্দায়। খড়মের খট্‌খট্ শব্দে তিনি ব্রহ্মচারীর সামনে এসে বিরক্তির সুরে বললেন: "এখানে জীবন্ত ঠাকুর রয়েছেন—খট্‌খট্ শব্দে তাঁর খুব কষ্ট হয়। খড়ম ছাড়—নিচে রবার না লাগিয়ে মঠের উঠানে খড়ম ব্যবহার করবে না। আর খুব সাবধানে চলবে যেন কোনরকম বিকট আওয়াজ না হয়।" ব্রহ্মচারীটি তখনি অবনত মস্তকে তাঁর নির্দেশ পালন করল, খড়ম ছেড়ে খালি পায়ে চলে গেল।

আরেক দিনের ঘটনা—জনৈক সন্ন্যাসী পুরনো মঠবাড়ির ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে একটু প্রসাদ খেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্লাসে আলগোছা করে জল খাচ্ছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ বসেছিলেন মঠবাড়ির উঠানের দিকের নিচের বারান্দায়। তিনি ঐ সাধুটিকে কাছে ডেকে বললেন: "অমন করে দাঁড়িয়ে জল খেও না। ঠাকুর আমাদের ঐভাবে জল খেতে বারণ করেছেন, ওতে কঠিন অসুখের সূত্রপাত হয়। বসে জল খাবে।" ঐ সাধুটি তাঁর উপদেশ আক্ষরিকভাবে পালন করেছিলেন।

অখণ্ডানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে থাকাকালীন মঠের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। সব কাজেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ঠাকুরপূজার ভাঁড়ার, চালডালের ভাঁড়ার—সবকিছু তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন ও সুষ্ঠুভাবে কাজের নির্দেশ দিতেন। এদিকে কুটনো কোটা, বাগান করা, গোয়াল দেখাশোনা, শাকসবজি লাগানো ইত্যাদি সব কাজ নিজের হাতে করতেন। সব কাজের ওপর সমান শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাধর্ম তাঁর মধ্যে সবক্ষেত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সব কাজই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, তাঁর পূজা—এই পরম সত্যটি তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর ঐ ব্যবহার ও অনুশীলন মঠবাসী সকলের ওপর বিপুল প্রভাববিস্তার করেছিল।

মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে চলছিল, রক্তের চাপও খুব বাড়ছিল। নানা চিকিৎসাতেও বিশেষ কোন উপকার হচ্ছিল না। শেষে ১৯৩৩ সালের ২৫ এপ্রিল দুপুরে আহারের সময় তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি রোধ ও ডান অঙ্গ অবশ হয়ে গেল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও আরো কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা চলতে লাগল। বিভিন্ন কেন্দ্রে তার পাঠানো হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্র ও দূর দূর স্থান থেকে বহু সাধু ও ভক্ত মঠে সমবেত হলেন। মহাপুরুষজীর আরোগ্যকামনায় বিভিন্ন দেবালয়ে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হলো। প্রায় একমাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা গেল এবং ডাঃ সরকার অবস্থা নিরাপদ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারলেন না, শয্যাশায়ীই রইলেন।

ঐসময়ে সারগাছি আশ্রম থেকে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও এলেন মহাপুরুষজীকে দেখতে। সকালবেলা—তখন মহাপুরুষজীর মুখ ধোয়ানো হচ্ছিল। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁর ঘরে ঢুকেই 'দাদা, দাদা' বলে সামনে এলেন। গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেই মহাপুরুষজী খুব খুশি হয়ে প্রথমে কথা বলার চেষ্টা করলেন। 'ওঁ-আ' প্রভৃতি অস্ফুট ধ্বনিমাত্র বের হলো; কথা বলতে না পারায় মনের দুঃখে তিনি বালকের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল—কান্না কিছুতেই আর থামে না। সকলেই

শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। গঙ্গাধর মহারাজ তখন পাশে বিছানার ওপর বসে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে 'পুরুষসূক্ত', 'দেবীসূক্ত' প্রভৃতি আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। প্রায় একঘণ্টা যাবৎ উপনিষদের বিভিন্ন স্থান থেকে আবৃত্তি এবং ঠাকুর-স্বামীজীর প্রসঙ্গ করার পরে মহাপুরুষজী কতকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

সেসময় গঙ্গাধর মহারাজ অনেকদিন মঠে ছিলেন এবং প্রতিদিনই মহাপুরুষজীর কাছে বসে উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি আবৃত্তি করতেন, পুরনো প্রসঙ্গাদি করে তাঁকে নানাভাবে আনন্দ দিতেন। মঠের সাধুরাও সমবেত হয়ে ঐসব শুনতেন। ফলে মহাপুরুষজীর রোগশয্যা একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সকলেই তাতে বিশেষ উপকৃত মনে করতেন।

মহাপুরুষজী অসুস্থ ছিলেন বলে গঙ্গাধর মহারাজ তখন মঠের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা থেকে আরম্ভ করে ভাঁড়ার, ভোগের ঘর, বাগান, অফিস, ডিস্পেনসারি প্রভৃতি সব ঘুরে দেখা এবং নতুন নতুন কাজকর্মের নির্দেশ দেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। মঠের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি সদাসচেতন ছিলেন। বিশেষ করে মঠের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া যাতে পরিপুষ্ট ও নির্মল হয় তার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না; নিজের আচরণ দ্বারা তাতে বিপুল সাহায্য করতেন। তিনি খুব ভোরে উঠে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ডেকে ডেকে তুলে দিতেন। নিজে ধ্যানে বসতেন এবং সকালে স্তোত্রাদি সুর করে পাঠ করতেন, ভোরবেলা ঠাকুরঘরে যে-ভজন হতো তাতে যোগ দিতেন। সন্ধ্যাবেলাও গঙ্গাজল স্পর্শ করে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতেন এবং আরাত্রিক ভজন শুনতেন—এইভাবে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো মঠের সর্বত্র সকল কাজে তাঁর উপস্থিতি সকলে অনুভব করত। তার ফলে মহাপুরুষজীর অভাববোধ সকলের অন্তর থেকে তিনি সস্নেহ ব্যবহার ও আচরণ দ্বারা মুছে দিয়েছিলেন। মঠবাসী সকলেই তখন মনে করত, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতেই তিনি মহাপুরুষজীর স্থানাভিষিক্ত হবেন। তখন তিনি সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ। তাঁর মধুর সপ্রেম ও সস্নেহ ব্যবহারে তিনি মঠের সাধু-ভক্তদের অন্তর জয় করেছিলেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া অতি সাদাসিধে, কিন্তু রুচিবোধ ছিল খুবই সূক্ষ্ম ও মার্জিত এবং শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি সাধারণত দুধ দিয়ে চা খেতেন না। কাগজিলেবু চাক্‌চাক্ করে কেটে চায়ের ফুটন্ত জলের মধ্যে ছাড়া হতো; তাতে একটু চিনি মিশিয়ে খেতেন এবং বলতেন 'Russian Tea'।

মহাপুরুষজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের সমবেত অনুরোধে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি হলেন। তিনিই তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বলেছিলেন ঃ "না, ওসব আমি হতে পারব না।" পরে ট্রাস্টিদের সকলের অনুরোধকে সঙ্ঘের আদেশ মনে করে তিনি প্রেসিডেন্ট হতে সম্মতি দিলেন। ঐসময়ে মঠে আমি কিছুদিন তাঁর সেবক ছিলাম; তার ফলে তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব বহনের শক্তির জন্য তাঁকে অনেকসময় প্রার্থনারত থাকতে দেখা যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করে তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষের কাজ চালাতেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে অস্ফুটধ্বনি শোনা যেত ঃ "ঠাকুর, তুমি হাত ধরে আমায় চালিয়ে নাও। আমি কিছুই জানি না।" তিনি অনেকসময় ভক্তদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন ঃ "এখানে প্রণাম করতে হবে না। ঠাকুরকে প্রণাম করলেই হবে। তিনিই সব।" তিনি এতটা শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়েছিলেন যে, আমরা শুনেছি —শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী তাঁকে দর্শন দিতেন, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হতো এবং কাজকর্মের নির্দেশ পেতেন। ঐসব দর্শনাদির কথা তিনি বড় একটা বলতেন না—অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে তা প্রকাশ পেত। তিনি খুব রাশভারী মহাত্মা ছিলেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরে তাঁর মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট লোক তাঁকে দর্শন করতে আসত—তার মধ্যে অনেকে ছিল দীক্ষাপ্রার্থী। তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও সপ্রেম ব্যবহারে সকলকে পরিতৃপ্ত করতেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারা একদিনের জন্যও এসেছে—তারাই তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করেছে। তিনি দীক্ষাদি বেশ বাছবিচার করে দিতেন।

গঙ্গাধর মহারাজ মঠে থাকাকালীন শ্রীমতী কমলা নেহেরু কয়েকবার তাঁকে দর্শন করতে আসেন। তখন তিনি কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কমলা নেহেরু মহাপুরুষজীর দীক্ষিতা ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে মহারাজ নিজের মেয়ের মতো ব্যবহার করতেন। একদিন সেবককে বলে বিবিধ সুস্বাদু পদ রান্না করিয়ে নিজে পাশে বসে তিনি 'এটি খাও, ওটি খাও' বলে তাঁকে যত্ন করে খাইয়েছিলেন। কমলা নেহেরু আরেকদিন আসেন তাঁর ভাই, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতিকে নিয়ে। সেদিনও গঙ্গাধর মহারাজ তাঁদের জন্য আলাদা রান্না করিয়ে নিজে দেখাশুনা করে তাঁদের খাইয়েছিলেন। কমলা নেহেরুও তাঁকে পিতার মতো দেখতেন এবং সেরূপ ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি হাসতে হাসতে বালিকার মতো বলেন ঃ "আপনি তো এত খাওয়ান, কিন্তু এখানকার খাওয়াতে আমার কোন অসুখ করে না। খুব তৃপ্তি করে খাই। বাড়িতে তো এত খাই

না।" গঙ্গাধর মহারাজ তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর-স্বামীজীর অনেক প্রসঙ্গও করতেন। উত্তরাখণ্ড ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল কাটাবার ফলে গঙ্গাধর মহারাজ হিন্দি খুব ভাল বলতে পারতেন। তাঁর হিন্দি উচ্চারণও খুব সুন্দর ছিল।

বিহারের ভূমিকম্পের* সংবাদে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন; শোনা যায়, ঐ নিদারুণ সংবাদ শুনে তিনি সেদিন উপবাসী ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সেবা-সাহায্য প্রেরিত হয়। মিশনের সন্ন্যাসিগণ বিধ্বস্ত স্থানে কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করে ঔষধ, পথ্য ও অন্নবস্ত্রাদি অকাতরে দান করতে থাকেন। গৃহহীনদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও ঐ রিলিফের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ব্যাপক ক্ষতির তুলনায় ঐ সাহায্য যথেষ্ট ছিল না। গঙ্গাধর মহারাজ প্রেসিডেন্ট হয়েই বিহারের ঐ ভূমিকম্প-সেবাকার্য পরিচালনা ও পরিদর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জনগণের নিদারুণ দুঃখকষ্টের কথা তিনি যত শুনছিলেন, ততই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠছিল ঐ সেবাকার্যে সাহায্য করার জন্য। ভূমিকম্পে ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সমান ক্ষতিগ্রস্ত—সকলেই দুঃখী, অসহায়! একদিন তাঁর ঘরে সমবেত সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেনঃ "আমি বৃদ্ধ হয়েছি, নইলে নিজের হাতে সেবা করতুম। লোকের নিদারুণ দুঃখবেদনার কথা শুনে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।"

এর কয়েকদিন পরই তিনি কয়েকজন সাধুকর্মী ও সেবক-সহ ঐ ধ্বংসলীলার স্থানে গেলেন এবং মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে মিশনের সেবাকেন্দ্রগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে কর্মীদের সেবাকার্যে উৎসাহ ও নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। প্রতিদিন সকালে-বিকালে তিনি কাজকর্ম পরিদর্শন করতেন। সাক্ষাৎ সঙ্ঘাধ্যক্ষ সেবাকার্য পরিচালনা করতে আসার ফলে কর্মীরা বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছিল এবং দুঃস্থরা পেয়েছিল সান্ত্বনা। তিনি প্রত্যেক স্থানে গিয়ে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খোঁজখবর নিতেন, অভাব-অভিযোগ মেটাতেন। ভূমিকম্পে ঐসব স্থান শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এবং যারা বেঁচেছিল তারা বিশেষ শোকসন্তপ্ত ও অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ সকলের সেবার ব্যবস্থা করেন। মিশনের কর্মীরাও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অক্লান্তভাবে সেবাকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের বিহারের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত স্থান পরিদর্শন নানা দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এতে তাঁর মহাপ্রাণতাই প্রকাশ পায়। তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঐ ভগ্নস্তূপ, হাহাকার ও আর্তনাদপূর্ণ স্থানে বাস করে সেবাকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের অধ্যক্ষতার সময় বেলুড় মঠে স্বামীজী পরিকল্পিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট মন্দির নির্মাণের শুভকার্য আরম্ভ হয়। স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দিয়ে ঐ মন্দিরের নকশা করান, কিন্তু ১৯০২ সালে তাঁর আকস্মিক দেহত্যাগের ফলে মন্দিরনির্মাণ তখনি সম্ভব হয়নি। তার পরে অনেক বছর কেটে গেল; অথচ স্বামীজী যে মহান ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ মন্দিরনির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট পার্ষদদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনেকেই দেহরক্ষা করে শ্রীগুরুপদে মিলিত হয়েছেন। সেজন্য সঙ্ঘের প্রবীণরা সকলে একমত হয়ে ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দ্বারা শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়ে রাখা স্থির করলেন। সেভাবে ১৯২৯ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথিপূজার দিন (১৩ মার্চ) বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণের একপাশে গোলাপবাগানের মধ্যে মহাপুরুষজী যথাবিধি পূজাদি করে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভাবী মন্দিরের নির্মাণ-স্থান তখনো নির্বাচিত হয়নি বলে মঠপ্রাঙ্গণের একপাশেই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৎকালীন জীবিত শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ ভিত্তিস্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় এক অভাবনীয় উপায়ে অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে সাহায্য আসে। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ যখন সঙ্ঘনায়ক, তখন শ্রীমন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ঐ অপ্রত্যাশিত স্থান হলো আমেরিকা। সেখানকার জনৈক ভক্তমহিলা একপ্রকার অযাচিতভাবে মন্দির-নির্মাণের প্রায় সমুদয় ব্যয়ভার (সাত লক্ষ টাকার অধিক) বহন করে নির্মাণকার্য সম্ভব ও সম্পূর্ণ করেন। ঐ ভক্তমহিলাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বেদান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ উক্ত ভক্তমহিলা ও আরেকজন ভক্তমহিলা-সহ একদিন বেলুড় মঠে আসেন মন্দিরের পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজও তখন মঠে এসেছেন ঐ কাজের জন্য। মার্কিন

* ১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে উত্তর বিহারের একাংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল।

মহিলারা তাঁকে দর্শন করে খুবই আনন্দিত হলেন। মন্দিরের স্থান নির্বাচন, নকশা তৈরি, ব্যয়নিরূপণ ইত্যাদির পর মন্দিরনির্মাণের ভার অর্পিত হলো মার্টিন বার্ণ কোম্পানির ওপর এবং ১৯৩৫ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পরই কাজ আরম্ভ হলো। পরবর্তী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের ঈশানকোণে নির্দিষ্ট স্থানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বিশেষ পূজানুষ্ঠানের পর মহাপুরুষজী স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন বিবিধ যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়। এইভাবে স্বামীজী পরিকল্পিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিষ্ঠিত হলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ ঐ মার্কিন মহিলাদ্বয়কে খুবই যত্ন করতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ করে তাঁদের অন্তর আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আপ্লুত করে দিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ তপস্যা, সাধনা ও অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান, অপূর্ব স্মৃতিশক্তি, অত্যাশ্চর্য পর্যবেক্ষণ ও রসবোধ মার্কিন ভক্তদের অন্তর জয় করেছিল। ক্রমে তাঁদের আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সময় এল। স্বামী অখিলানন্দ ও ভক্তদের একান্ত অনুরোধে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মঠের কতিপয় সাধুসহ তাঁদের জাহাজে তুলে দেওয়ার জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন। ঐসময় বোম্বাইয়ে তাঁর কয়েকদিন সেবা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সঙ্ঘাধ্যক্ষের শুভাগমনে বোম্বাই আশ্রম আনন্দমুখরিত হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন বহু ভক্ত নরনারী তাঁকে দর্শন এবং তাঁর মুখে ধর্মোপদেশ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে আশ্রমে সমবেত হতো। তিনিও সকলকে ধর্মপ্রসঙ্গাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করতেন। তাঁর আকর্ষণে দিনের পর দিন ভক্তসংখ্যা বেড়েই চলেছিল, তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে আনন্দ দিতেন।

মার্কিন ভক্তমহিলারা নির্ধারিত দিনে বিদায় নিতে এলেন। তিনিও তাঁদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সাশ্রুনয়নে তাঁরা বিদায় নিলেন, ঐ ক্ষণটি খুবই মর্মস্পর্শী এবং দৃশ্যটি খুবই করুণ ছিল। তিনি তাঁর ভালবাসা ও আশীর্বাদ দ্বারা তাঁদের খুব আপনার করে নিয়েছিলেন। তারপরই তিনি নাগপুর আশ্রমে কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরে এলেন বেলুড় মঠে।

দেখতে দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব সমাগত হলো। বিশ্বব্যাপী ঐ মহোৎসব আয়োজনের জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু-ভক্তদের সম্মিলিত যে-কমিটি গঠিত হয়, তার সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ। ১৯৩৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজার দিন ঐ শুভ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। একবছর ধরে ঐ উৎসব চলে সারা বিশ্বে এবং পরের বছর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিন মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের শততম আবির্ভাবতিথির পূর্বদিন সারগাছি থেকে বেলুড় মঠে শুভাগমন করে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ পরদিন প্রত্যূষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করলেন। পুরনো মন্দিরে ভোর চারটায় মঙ্গলারাত্রিকের পর বেদপাঠ, নিত্যপূজা, দশাবতার ও অন্যান্য ধর্মাচার্যদের পূজাদি আরম্ভ হলো। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হলো স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের লিখিত বাণীঃ "এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটিরে। প্রভুর দ্বাদশবর্ষব্যাপী অমানুষিক তপস্যা, সাধনা, সিদ্ধি, মহাশক্তি ও মহাভাবের অরুণোদয় সুরধুনী ভাগীরথীর বিমল তটে, বিশাল পঞ্চবটী ও নিভৃত বিল্বমূলে। পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উত্তরপার্শ্বে সরকারি বারুদখানার মুক্ততরবারিকর শিখপ্রহরিগণের ভাগ্যোদয়—লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রভুর বিবিধ সাধনপ্রণালী দর্শনে। ঐ শিখপ্রহরিগণের মুখেই প্রভুর প্রথম প্রচার বড়বাজারে মাড়োয়ারি মহলে।... পঞ্চবটীর নিকটে বলীবর্দের পৃষ্ঠাঘাতে 'মেলে রে মেলে রে' রবে বালকের ন্যায় প্রভুর রোদন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পৃষ্ঠে স্ফীত রক্তিমাভ আঘাতের চিহ্ন এবং নবীন তৃণোপরি গুরুভার কাষ্ঠ আকর্ষণে অকস্মাৎ প্রভুর ভূমিতে পতন—ইহাই বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা।... মহিমার দীপ্তালোকে আলোকিত হইবার শুভদিন সম্মুখে। প্রভুর সর্বধর্মসমন্বয় ও কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও রাজ যোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানবজাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে। পরে এমন শুভদিন আসিতেছে, যখন জগতে এক সার্বভৌম শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর 'আহ্বানে' সকলপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদবর্জিত উদ্বুদ্ধ ও সত্যবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ' বাণীর জয়ঘোষণায় রত এবং নবযুগের পতাকামূলে সমবেত হইবে। তখনি প্রভুর আগমনের মাধ্যন্দিন প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে। আজ এই মহা শুভদিনে ধরাবাসী সকলে প্রভুর 'আগমনের' অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হউক—ইহাই আমার আকুল প্রার্থনা। স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!"*

মঠপ্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ। বেলা ৯টার পর থেকে মঠের উঠানের এককোণে কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, গীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদি পাঠ হলো। সারাদিন ভজন-কীর্তন ও প্রসাদ

* পূজ্যপাদ মহারাজের বক্তব্যের এই অংশটি স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সম্পূর্ণ ভাষণটির জন্য 'উদ্বোধন : শতবার্ষিকী সংখ্যা' দ্রষ্টব্য।

বিতরণে মঠ উৎসব-মুখরিত হয়ে উঠল। দলে দলে লোক সঙ্ঘাধ্যক্ষকে দর্শন করতে আসছে, তিনিও অক্লান্তভাবে সারাদিন বহু ভক্তকে দর্শন দিচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন। রাত্রে কালীপূজা এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে মহারাজের উপস্থিতিতে বিরজা হোম হলো। পরে তিনি কয়েকজনকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করলেন।

পরবর্তী রবিবারে সাধারণ উৎসব। বেলুড় মঠে লক্ষাধিক লোকসমাগম হয় এবং শতবার্ষিকী স্মরণে একশো মন চালডালের খিচুড়ি ও একশো মন আলুর তরকারি এবং পরিমিত চাটনি, দই, বোঁদে ইত্যাদি প্রসাদ জাতিবর্ণনির্বিশেষে জনগণের মধ্যে পরিবেশিত হয়। মুহুর্মুহু শ্রীগুরু মহারাজের জয়ধ্বনিতে মঠপ্রাঙ্গণ ও গঙ্গাবক্ষ প্রতিধ্বনিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ ঘুরে ঘুরে উৎসবের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। পঙ্‌ক্তিভোজনের সময় তাঁকে দর্শন করে জনগণ খুবই উল্লসিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—সেসব অগ্রাহ্য করে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব পরিচালনা করলেন।

তারপরেই তাঁর ডায়াবেটিস রোগ বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছে—ধরা পড়ল। আহারাদির খুব ধরাকাট করা হলো। সর্বোপরি তাঁর পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হলো। বেলুড় মঠে থাকলে বিশ্রাম অসম্ভব। সারাদিন বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাঁকে দর্শন করতে আসে—তাদের মধ্যে আবার আছে দীক্ষাপ্রার্থী। তিনি কাউকে বিমুখ করেন না, দরদির মতো সকলের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সুখদুঃখের ভাগী হন—নানা প্রসঙ্গ করে সকলকে আনন্দ ও শান্তি দেন।

মহারাজের সারগাছি যাওয়া স্থির হলো। যাওয়ার পূর্বে একদিন মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের ডেকে তিনি ঠাকুরের অনেক কথা বললেন। সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন ঃ "দেখ, মনটাই সব অনিষ্টের মূল। ঠাকুর বলতেন, মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। মনটাকে সবসময় অন্তর্মুখ করে রাখবার চেষ্টা করো—তাঁর নাম করে, ধ্যান করে, তাঁর বিষয় পাঠ ও অনুধ্যান করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর কাজ করে। এইভাবে মনে সবসময় একটা উচ্চ চিন্তার স্রোত বইতে থাকবে। আমরা ঠাকুরের কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি, সেভাবে সারাজীবন কাটিয়েছি এবং তা-ই তোমাদের বলছি। এসব তাঁরই কথা—আমাদের বানানো কথা নয়। তিনি বাজে কথা, বাজে গল্প, পরনিন্দা-পরচর্চা—এসব আদৌ পছন্দ করতেন না। তোমরা 'কথামৃত'-এ পড়েছ তো, ঠাকুর সবসময়ই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন—ঐশীভাবে থাকতেন। তাঁর জীবনটি পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। স্বামীজী যে মঠ করেছেন, কাজকর্মের প্রবর্তন করেছেন—তারও অর্থ ঐ। মঠ-মিশন সবই ঠাকুরের। যাবতীয় কাজই তাঁর কাজ, তাঁর সেবা। জপধ্যানও তাঁর কাজ, তাঁরই সেবা। আবার ঠাকুরপূজা বা বাগানে কাজ করা, অফিসে কাজ করা—তাও তাঁর কাজ, তাতে তাঁরই সেবা হয়, তিনি প্রসন্ন হন। সেভাবে সব কাজই সমান—তাতে ছোট-বড় ভেদ যেন না থাকে। এইটা ভুলো না।

"অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ কর। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'নাহং নাহং, তুহুঁ, তুহুঁ'। ঠাকুরের কথা মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করবে। তিনিই তো সব করাচ্ছেন—তাঁর শক্তিতেই তো সব হচ্ছে। সাধন-ভজন বল, কাজকর্ম বল—সবকিছু তাঁরই কৃপাতে। তিনি শক্তি দিয়ে যাকে যেমন ইচ্ছে চালাচ্ছেন। তপস্যার অভিমানও ভাল নয়—তাতে ভগবানের সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব পাবে। তোমাদের একমাত্র কামনা হবে—তাঁকে পাওয়া। তিনিই তো চতুর্বর্গ ফল দেওয়ার মালিক। দেখছ তো, তিনি স্বয়ং ভগবান হয়েও কেমন অহংভাবশূন্য হয়েছিলেন। তিনি কখনো নিজের সম্বন্ধে 'আমি' বলতে পারতেন না। তাঁর সবই 'তুহুঁ, তুহুঁ'—সবই 'মা'। 'মা যা করেন।' তিনি মায়ের হাতের যন্ত্র হয়ে ছিলেন। তোমরা ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হয়ে থাকবে। প্রতিদিন প্রার্থনা করবে যে, 'প্রভু, আমার অহংভাব কমিয়ে দাও।' অহং-এর স্থানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর কৃপা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না। ভগবান গীতায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ প্রভৃতি উপদেশ দান করে শেষে উপদেশ দিলেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমারই শরণাগত হও। 'শরণাগতি'র চেয়ে আর বড় কথা নেই। তোমরা বহু ভাগ্যের ফলে ঠাকুরের শরণ নিয়ে তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে আছ। তোমাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ভয় কি? তাঁকে ভুলো না।" বলতে বলতে তিনি খুব গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। সাধুরা একে একে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি ভাবের সঙ্গে সকলের মাথা স্পর্শ করে খুব আশীর্বাদ করলেন।

কিছুদিন পরই তিনি বিশ্রামের জন্য সারগাছি যাবেন। যাওয়ার পূর্বে সকলকে অন্নপূর্ণাপূজায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। আমাকে বিশেষ করে বললেন ঃ "তুমি সারগাছি দেখনি। অন্নপূর্ণাপূজার সময় অবশ্য যাবে—কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসবে।" তাঁর সাদর আমন্ত্রণ স্মরণ করে আমি পূজার দুদিন আগে সারগাছি গেলাম। ট্রেন থেকে নেমেই একটি কুলিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হই। কুলি পথ দেখিয়ে চলেছে। একটু পরেই সে বলল, ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে। বেশ চওড়া কাঁচা রাস্তা। দুদিকে নানাজাতীয় প্রচুর গাছ—জঙ্গলের মতো। বহরমপুর যাওয়ার বড় রাস্তার পাশেই আশ্রমের ফটক। ভিতরে ঢুকেই মনে হলো

যেন মুনিঋষিদের আশ্রম—ফলন্ত বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ, শান্ত ও নির্জন পরিবেশ। ফটকের বামদিকে দাতব্য চিকিৎসালয়। পথের ডানদিকে নয়নাভিরাম ফুলের বাগান, অন্যদিকে সবজির বাগান। আশ্রমের উঠানের পূর্বদিকে দোতলা ঠাকুরঘর। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করে নামতেই জনৈক পরিচিত সাধু আমাকে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি খুশি হয়ে বললেন ঃ "কেমন দেখছ সারগাছি আশ্রম? কত সব ভাল ভাল গাছ লাগিয়েছি—আমি সঙ্গে নিয়ে তোমাকে সব দেখাব। এখন একটু কিছু খাও, বিশ্রাম কর।" এই বলেই তিনি একজন সাধুকে ডেকে আমার থাকার স্থান নির্দেশ করে দিলেন।

সারগাছিতে তিনি অতি দীনভাবে থাকতেন। খালি গা, চটিজুতা পায়ে, হাতে লাঠি নিয়ে বিকালে আমাকে নিয়ে বের হলেন আশ্রম দেখাতে। কতরকম দুষ্প্রাপ্য ও বিরল গাছ তিনি লাগিয়েছেন—কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনেও এসব গাছ নেই। তিনি গাছ দেখিয়ে দেখিয়ে নাম বলে যেতে লাগলেন। একটি গাছ দেখিয়ে বললেন—'পান্থপাদপ'। দেখতে অনেকটা কলাগাছের মতো বেঁটে, বেশ মোটাসোটা। ঐ গাছে ছুরিকাঘাত করলেই জল বেরিয়ে আসে ফিনকি দিয়ে। তিনি বললেন ঃ "মরুভূমিতে এই গাছ খুবই প্রিয়। মরুযাত্রীরা এই পাদপের জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই গাছ কলকাতায় বা আর কোথাও পাবে না। গাছটা ভাল বাড়ছে না, ২-৩ বছর ধরে একরকমই আছে।" তিনি আরো সব গাছ দেখালেন। কতরকমের আমগাছ—তিনি সব নাম বলে যেতে লাগলেন। সব গাছেই বেশ আম ফলেছে। হাসতে হাসতে বললেন ঃ "আমের সময় পর্যন্ত থেকে যাও। খুব ভাল ভাল আম খাওয়াব।" আমি মাথা নিচু করে রইলাম। সব তাঁর নিজের হাতে লাগানো, সব গাছই তাঁর যত্নে বর্ধিত, প্রত্যেকটি গাছকে তিনি ভালবাসেন। গোটা সারগাছি আশ্রমই তাঁর হাতে গড়া। "এইসব গাছপালা সবই কুয়ো থেকে জল দিয়ে বাঁচিয়েছি। এইসব বাড়ি করার সময় কুলিদের সঙ্গে ইঁট বয়েছি। তখন গায়ে শক্তিও ছিল। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতুম।" খুবই আগ্রহভরে তিনি বললেন।

আশ্রমে পূজার আয়োজন চলছে। তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন। সমারোহ করে বেশ বড় পূজা হয়। অনেক লোকজন প্রসাদ পায়।... পূজা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হলো। উঠানজুড়ে বহু লোক প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। 'অন্নপূর্ণামাঈকী জয়', 'দণ্ডীবাবার জয়' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। তাঁকে সকলেই জানে—তিনি প্রায় ৩৭-৩৮ বছর ধরে এখানে আছেন। তাঁকে কেউ বলে 'দণ্ডীবাবা', কেউ বলে 'দণ্ডী ঠাকুর'। খাওয়ার সময় তিনি ঘুরে ঘুরে "আরো খাও, আরো খাও" বলে সকলকে যত্ন করে খাওয়ালেন। তিনি সারাদিন অভুক্ত থেকে এভাবে মায়ের পূজা নির্বাহ করেছিলেন। তাঁর আনন্দময় মূর্তি দশদিকে বিচ্ছুরিত করছিল নির্মল আনন্দ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর তিনি মায়ের প্রসাদ সামান্য খেলেন। বহু লোক তাঁকে প্রণাম করল। মায়ের গান চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত। তিনি শেষপর্যন্ত বসেছিলেন, আর নানা গানের ফরমাশ করছিলেন। ভাবগম্ভীর আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে অন্নপূর্ণাপূজা সম্পূর্ণ হলো।

দুদিন পরেই আমি বেলুড়ে ফিরব। তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। তিনি আরো দিন কয়েক থেকে যেতে বললেন; কিন্তু আমি শতবার্ষিকী অফিসে কাজ করছিলাম, সে-কাজের ক্ষতি হবে বলে তাঁর শেষ অনুরোধটি রক্ষা করতে পারিনি, সেজন্য এখনো অনুশোচনা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মহারাজ, মঠে কবে যাচ্ছেন?" তিনি খুবই গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "দেখ শঙ্কর, দাদা নেই; মঠে গেলেই দাদার জন্য মনটা বড় খারাপ হয়। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। দাদার শরীর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও শরীর গেছে, জেনে রেখো। এখন নেহাত না করলে নয়, তাই কাজকর্ম করছি। মনটা সবসময়ই ঠাকুরকে চায়।" আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। বিদায় নেওয়ার সময় আমার চোখে জল দেখে তিনি খুব স্নেহভরে মাথায় হাত দিয়ে বললেন ঃ "তোমার ভাবনা কি? তুমি দাদার এত সেবা করেছ!" আমার প্রতি এই তাঁর শেষকথা, যা আমার জীবনের অক্ষয় পাথেয় হয়ে রয়েছে।

শেষ যখন তাঁকে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭) শিয়ালদহ স্টেশন থেকে অজ্ঞান অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে রাত বারোটায় বেলুড় মঠে আনা হলো, তখন তাঁর একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সমাধিস্থ মূর্তি দর্শন করলাম। পরদিন বিকাল তিনটার পরে তিনি মহাসমাধিতে চিরমিলিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে বেলুড় মঠ রোমাঞ্চিত হলো। [সমাপ্ত] ❑

তিনি আসবেন

অরুণকুমার ঘোড়ই

ইতোমধ্যে অনেকেই একথাটা জেনে গেছেন
যে, তিনি আসবেন।
প্রথামতো শোনা যাবে কোমল চরণধ্বনি...
আর সাথে সাথে সুরেলা অথচ পরিশ্রমী
কোরাসে বন্দিশ গেয়ে যাবে চারণ কবিরা।
পৃথিবীর তাবৎ বঙ্কিম গলির শিরা-উপশিরা
প্লাবিত হয়ে যাবে এক গভীর প্রেরণায়।
ভয়ের কোটর থেকে মানুষ ধীর পায়ে
এসে জড়ো হবে নীল আকাশের নিচে,
নিত্যদিনের জৈবকর্মের পিছে পিছে
ছুটতে থাকা মানুষজন
আচম্বিতে থমকে দাঁড়াবে কিছুক্ষণ;
মননধারার পরিবর্তন—মন্বন্তর
নিঃশব্দে ঘটে যাবে ভিতর ভিতর।
সর্বনাশের শেষ পেরেকটি না ঠুকে
অকুস্থলের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে
চলে যাওয়া রাস্তায়
ওরা ভিড় জমাবে অসীম আশায়।
এখনো অনেকেরই বিশ্বাস যে, তিনি আসবেন...
তালা ভাঙবেন... সটান ঢুকবেন
অশাসিত চিন্তা ও চলনের লৌহ কারাগারে,
কালো কালো থোকা-থোকা বাদল মেঘের মিনারে
একফালি সোনা রোদ যেমন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
অতিলৌকিক ভালবাসায়—
তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবেন সমস্ত বন্দিদের...
প্রলুব্ধ করবেন উত্তরকালের প্রহরীদের...
চেনা দুঃখকে এড়িয়ে...
অচেনা সুখের প্রতিশ্রুতি দিয়ে
তিনি সকলকে টেনে নিয়ে যাবেন বোধিবৃক্ষের নিচে।

রাসায়নিক বৃষ্টিতে ভিজে...
কিংবা তেজস্ক্রিয় বিকিরণে পুড়ে...
বিশ্বায়নের বিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে
পথ-বেভুল মানবাত্মার উদ্দাম ছৌ-নাচ
তিনি থামাবেন আজ শব্দহীন ছোট্ট ইঙ্গিতে।
মানুষের বিচ্যুতি-জাত বিষ নিজ কণ্ঠে নিতে
কী অম্লান আহ্লাদ তাঁর!
বিশ্বচরাচরের প্রতিটি সত্তার
গহীন গভীরে অন্তর্লীন ফল্গুর মতো
দীপ্তিময় ব্রাহ্মী বিবর্তন
তাঁরই তো প্রিয়তম কর্মসূচি।
সবচেয়ে বেশি রুচি—
হাজার রকমারির মাঝে সর্বত্র 'এক'কে দেখা
হৃদয়-প্রকোষ্ঠে একটা ফুল গুঁজে রাখা
তাঁর চিরকালীন শখ।
বাইরে দর্পণ আর ভিতরে চুম্বক—
বিজ্ঞাপনী চিহ্ন তার অনেকের কাছে
লোকপালী গরিমায় খ্যাত হয়ে আছে।
চলে যাওয়া পথে তাঁর আনন্দদীপ্ত হাওয়ার
প্রেমাচ্ছন্ন—সুষম ঐকতান
লুব্ধ করে শিশ্নোদর-পরায়ণী প্রাণ।
বেজিকাটা খণ্ড খণ্ড সাপ...
মতবাদের বিচ্ছিন্ন সংলাপ...
তিনি পরম যত্নে জুড়বেন;
সার্থকতার সূত্র খুঁজে দেবেন
চলমান অগোছালো সমাজনীতিতে।
মানব-বিবর্তনে এক নবতর মাত্রা জুড়ে দিতে
তিনি আসবেন—এ যে শ্রুতির প্রবচন;
না হলে তো, সৃষ্টি হবে বিকট প্রহসন।
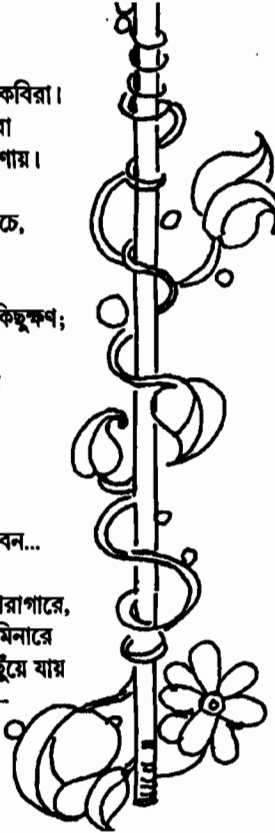
দু পা হেঁটে

সনৎ সেন

দু পা হেঁটে গিয়ে যখন
ভালবাসা এল,
তিনি বললেন আলিঙ্গন কর।

দু পা হেঁটে গিয়ে যখন
দুঃখ এল,
তিনি বললেন হাত পাত।

দু পা হেঁটে গিয়ে যখন
শোক এল,
তিনি বললেন স্থির থাক।

আরো দু পা হেঁটে গিয়ে যখন
মৃত্যু এল,
তিনি বললেন নতজানু হও।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

কালীসাধন ফৌজদার

অনেকেই তো বলা হলো, অনেক অনেক
বিদগ্ধ ব্যাখ্যায় আর ভক্তির আবেগে;
তবু তো তিনিই তিনি, সবেমাত্র এক,
সন্ধিৎসা সীমার ঊর্ধ্বে আজও রন জেগে।

শুধু সে একটি মুখ—অমিত ভাস্বর,
প্রজ্ঞার জীবন্ত মূর্তি মানসলোকের,
অর্কপ্রভ দীপ্রতায় আজিও প্রখর,
অনির্বাণ শিখা জ্বলে শ্রীরামকৃষ্ণের।

মায়ের ঘাট*

(১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ বাগবাজার 'মায়ের ঘাট'-এর নবরূপায়ণ উপলক্ষ্যে)

নন্দিনী মিত্র

তিনি চলেছেন গলিপথ দিয়ে অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে
পবিত্রতাস্বরূপিণী জগজ্জননী মা আমার,
দেহধারিণী পবিত্রতা ধীরে ধীরে
মিশে যায় কলুষনাশিনী স্রোতোধারায়।
আশ্চর্য এই সম্মিলনে রূপ নিল
এক নতুন তীর্থ—'মায়ের ঘাট'।
তৃষিত মানবের শুষ্ক আত্মায় শান্তিবারি সিঞ্চনের
দায় সেদিন এমনি করেই কি
নীরবে বহন করেছিলেন
'জন্মজন্মান্তরের মা'?
হয়তো যুগ যুগ ধরে অগণিত সন্তানের
ব্যাকুল অভিযাত্রা হতে থাকবে
সুরধুনীর কূলে 'একটু জুড়াতে'।
কেননা সেখানে আজও যে বসে আছেন 'সত্যিকারের মা'
যিনি কাউকে ফেরান না।
মহাকালের প্রেক্ষাপটে যা ছিল এতদিন অদৃশ্য কালিতে লেখা
আজ তাই ফুটে উঠেছে
আলোর বিকিরণে, আর,
গঙ্গার শিহরণ জাগানো দুরন্ত হাওয়ায়
মর্মে মর্মে ধ্বনিত হতে থাকে সেই চিরন্তন বাণী—
আর কেউ না থাক, একজন মা আছেন, আর ভয় কি?

---

* সংবাদের জন্য ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"তোমাদের চৈতন্য হোক"

অনির্বাণ কর

আমরা কজন বন্ধু
কেউ শিক্ষক বা লেকচারার, কেউ ব্যবসায়ী
কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, কেউবা ছোটখাট চাকুরিজীবী
আবার সাহিত্যিক হওয়ার পথে পা বাড়িয়েছে কেউ।
আমরা কেউ খুব অভদ্র নই
কেউ ধার্মিক নই ঠিকই
কিন্তু অধার্মিকও এককথায় বলা যাবে না।
স্বার্থের বাইরে যে আমরা কেউ কিছু করি না—
এমনও নয়
তবে কেমন যেন দিন দিন কামনায় ডুবে যাচ্ছি সকলে।

আমরা একদিন সবাই মিলে তাঁর কাছে গেলাম
তখন তিনি কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে
দিনটা যতদূর মনে হয় কোন এক জানুয়ারি মাসের পয়লা তারিখ।
একা একটা ঘরে তিনি পালঙ্কে বসে
একে একে সবাই তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, চরণধূলি নিলাম
পরে বসলাম মেঝেতে পাতা শতরঞ্চিতে।
এটা-ওটা কথার পর সব জানিয়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ
"প্রভু, আমাদের সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি?"
ঠাকুর মৃদু হাসলেন
তারপর ডানহাত তুলে বললেন ঃ
"তোমাদের চৈতন্য হোক।"

এ কি স্বপ্ন? তা হোক না।

প্রভু, যে-কথা হয়নি বলা

অসিত দত্ত

কত ক্ষণ কত রাত্রি ও দিনে জীবনের পথ চলা
কত কত সাথী কত যে সখাকে সে-কথা হয়নি বলা।

মনের মাঝারে অজানা খনিতে কত ভাব চারুকলা
প্রকাশিতে সাধ ছিল তো আমার তবুও হয়নি বলা।

আপন বৃন্তে ক্ষুব্ধ চিত্তে যেন অভিমানী দলা
চারিদিকে সব অবুঝেরা তাই সে-কথা হয়নি বলা।

কেউ বোঝে না তো, বুঝতে চায় না আপন লোকের ছলা
তাই তো তাদের বোঝাতে চাইনি যে-কথা হয়নি বলা।

আশাহত নই, আছি পথ চেয়ে তোমা লাগি পথচলা।
বলব সেদিন তোমাকেই প্রভু যে-কথা হয়নি বলা।

হলো যবে দীক্ষা

বিমান চট্টোপাধ্যায়

বুকে অহং, গর্ব ছিল
ধর্ম ছিল আফিমবাদ
ভণ্ড সে এক শিখিয়েছিল
জোয়ান মনে মিশিয়েছিল
জপের আঙুল নেশার স্বাদ।

সন্দেহ আর প্রশ্ন তুলে
গোঁয়ার ছিলাম দশবছর
ইচ্ছে ছিল ধরব জবর
ঠাকুর তোমার ফাঁকফোকর।

প্রথম পড়া লোকের শুনে
ধন্দে গড়া ছত্র গুণে।

কিন্তু একি! 'জবাব' দেখি!
'জবাব' তো নয়, হীরের খনি!
যতই পড়ি—ভুল বুঝেছি
শূন্যমাঝে ছাদ খুঁজেছি
ঠাকুর-বাণী চোখের মণি।

অ্যাই ভণ্ড—কই হে এস
দেখব তোমায় একশোবার
চমকে উঠে তখন দেখি
সবার আগেই আসন তার।

জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

[পূর্বানুবৃত্তি]

এর আগে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, মহাকাল, বৈদ্যনাথেশ্বর, ওঙ্কার-মান্ধাতা এবং শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার দ্বাদশ তথা শেষ পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর।—লেখক

বিশ্বনাথ-মন্দিরের উত্তরদিকে তাঁর শক্তি দেবী বিশালাক্ষ্মী একটি ভিন্ন মন্দিরে পূজিতা হচ্ছেন। তার পাশেই আছে একটি কূপ। ২২টি কূপের স্নান শেষ হয় এই কূপের জলে স্নান করলে। এর নাম 'কোটিতীর্থ'। প্রবাদ, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাতুল কংস বধের পাপ দূর করার জন্য এখানে এসে রামেশ্বরের পূজার আগে এই কোটিতীর্থের জলে স্নান করেছিলেন। রামেশ্বরের মন্দির-চত্বরের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্বে আরেকটি কূপ আছে। এর নাম 'সর্বতীর্থ'। মন্দির-দর্শন শেষ করে বাইরে আসার পথে যাঁরা এখানে স্নান করছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে এক অঞ্জলি জল নিয়ে মাথায় দিলাম।

মূল রামেশ্বরের মন্দির পরিক্রমা করে দক্ষিণদিকে এসে প্রথমেই পেলাম একটি ছোট মন্দির। এর নাম 'উৎসবমূর্তি মন্দির'। এখানে দেবতাদের উৎসব-বিগ্রহ আছে। ধাতুমূর্তি। উৎসবের সময় এবং নানা অনুষ্ঠানে এই বিগ্রহদের শোভাযাত্রা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে নন্দিকেশ্বরের মূর্তিটি অপূর্ব। চতুর্ভুজ, দুই হাতে পরশু ও মৃগ এবং অপর দুই হাতে বরাভয়। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসা। চত্বরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মন্দিরে দুটি তাম্রনির্মিত নটরাজের সুন্দর মূর্তি আছে। আরেকটি তামার তৈরি নটরাজ মূর্তি আছে থার্ড করিডরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটি মন্দিরে। এটি আকারে খুব বড়। এখানে কয়েকটি অন্য মূর্তিও আছে। তার মধ্যে বিষ্ণুমূর্তি অন্যতম। আমরা প্রথম চত্বরের রামেশ্বর পরিক্রমা শেষ করে বাইরের অঙ্গনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালাম: "বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং/ বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।/ বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং/ বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥"

এরপর এলাম প্রথম প্রাকারের বাইরে দক্ষিণদিকে দেবী পার্বতীর মন্দিরে। এখানে তাঁর নাম 'পর্বতবর্ধিনী'। এই দেবীর বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি শিবের দক্ষিণে অধিষ্ঠিতা। আর দেবীর নামটিও নতুন। পর্বতে বর্ধিত হয়েছেন বলে নাকি এই নাম। তবে তাঁকে 'দেবী অম্বিকামাতা'ও বলা হয়। ইনিই রামেশ্বরের শক্তি। মাদুরাতেও দেবী মীনাক্ষী শিবের ডানদিকে। যাই হোক, আমরা দেবী ভগবতীকে প্রণাম জানালাম: "কৃপাং কুরু মহাদেবি মণিদ্বীপাধিবাসিনী অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকে জগদম্বিকে।/ জয় দেবি জগন্মাতর্জয় দেবি পরাৎপরে।/ জয় শ্রীভুবনেশানি জয় সর্বোত্তমোত্তমে॥" দেবীর মূর্তি ধাতুময়ী। সমস্ত শরীর কাপড় ও ফুল-মালায় ঢাকা, শুধু মুখখানি বের করা আছে। করুণামাখা মায়ের সেই মুখখানিই মনের পটে ধরে নিয়ে বাইরে এলাম। এই মন্দিরে আরেকটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু আছে। সেটি পাথরের অথবা ধাতুর বেশ বড় শ্রীচক্র। সিন্দূর-কুঙ্কুমলিপ্ত এই শ্রীযন্ত্রে ভক্তেরা দক্ষিণা দিলে কুঙ্কুমাভিষেক করতে পারে। আমরা সেখানে শ্রীযন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজরাজেশ্বরীকে প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম।
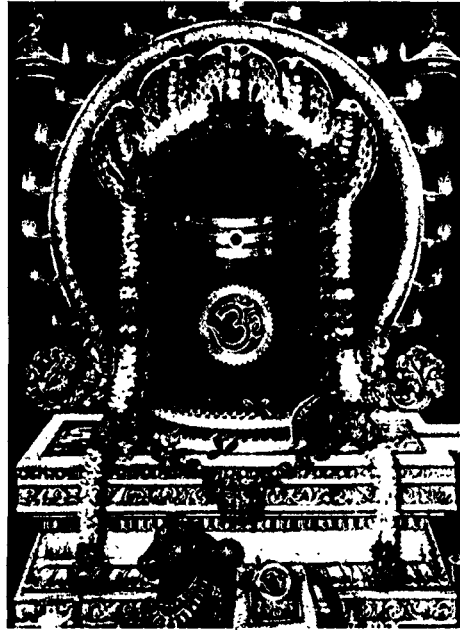
দেবীর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাকার-সংলগ্ন গৃহটি শিব ও দেবীর শয়নমন্দির। প্রতি রাত্রে শৃঙ্গার আরতি শেষে

* গবেষক-সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।

রামেশ্বরের সোনার তৈরি প্রতিনিধি বিগ্রহকে এখানে নিয়ে এসে এবং দেবীর সোনার উৎসব-বিগ্রহকে পাশাপাশি দোলনায় রেখে শয়ন দেওয়া হয়। পরদিন ভোরে দুই বিগ্রহকে আবার যথাবিধি উত্থান করিয়ে নিজ নিজ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে পূজাদি শুরু হয়।

দেবীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সন্তান গণপতি ও উত্তর-পশ্চিম কোণে এক ভক্তের ছোট মন্দির আছে। দেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে একটি নাটমন্দিরের মতো রয়েছে। এর গায়ে পাথরের অপূর্ব মূর্তি খোদাই করা। এঁরা প্রধানত দেবীর সহচরী আবরণদেবী। এঁদের নাম 'আদিলক্ষ্মী', 'সান্ত্বনালক্ষ্মী' (সন্তানলক্ষ্মী), 'গজলক্ষ্মী', 'ধান্যলক্ষ্মী', 'ধনলক্ষ্মী', 'জয়লক্ষ্মী', 'ঈশ্বরীলক্ষ্মী' ও 'বীরলক্ষ্মী'। মণ্ডপের উত্তরদিকে আটটি স্তম্ভে খোদিত দেবীরা হলেন— 'মনোন্মনি', 'মাহেন্দ্রী', 'কৌমারী', 'রাজরাজেশ্বরী', 'লক্ষ্মী', 'কালী', 'চামুণ্ডী' ও 'দ্বারপালিকা'। দক্ষিণদিকের স্তম্ভে আছেন 'দ্বারপালিকা', 'শিবদুর্গা', 'মনোন্মনি', 'বাগীশ্বরী', 'সেতুপতি', 'কদম্বথেবর', 'প্রধানী ভুবনেশ্বরী' ও 'অন্নপূর্ণা'। দেবীর সহচরীদের এই মণ্ডপটির নাম 'শুক্রবার মণ্ডপ'। এখানে শুক্রবার শক্তিপূজার প্রশস্ত দিন। প্রতি শুক্রবার দেবীদের পূজা হয়। এই মণ্ডপের পাশের 'সত্যামৃত তীর্থ' কূপটি ২২টি কূপের অন্যতম।

এবার পশ্চিমের দ্বারপথে দ্বিতীয় করিডর থেকে বাইরে এলাম। প্রথমেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বড় চৌবাচ্চার ধারে এসে দাঁড়ালাম। চারধার বাঁধানো, সিঁড়ি দিয়ে নিচ পর্যন্ত নামা যায়। এর নাম 'সেতুমাধব তীর্থ'। বহু প্রাচীন এই কুণ্ডটির সঙ্গে একটি কাহিনীও জড়িয়ে আছে। এর উত্তরদিকে রাস্তার ওপারে আছে সেতুমাধবের মন্দির। একে 'শ্বেতমাধব'ও বলা হয়।

প্রাচীনকালে মাদুরার রাজা পুণ্যনিধি একবার এই তীর্থে এসেছিলেন ও রামেশ্বর দর্শনের পর শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একটি যজ্ঞ করেন। ভগবান নারায়ণ তাঁর ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য লক্ষ্মীকে একটি অসহায় কন্যার ছদ্মবেশে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। রাজা বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে অনাথা মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতো আদর-যত্নে পালন করতে থাকেন। বিষ্ণু একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে হাজির হন এক বাগানবাড়িতে, যেখানে ঐ কুমারী কন্যা বাস করেন। তিনি ঐ কুমারীর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। কন্যার সহচরীদের মারফত খবর পেয়ে রাজা ঐ বাগানে এসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রামেশ্বরের মন্দিরের এক ঘরে বন্দি করে রাখেন। সেই রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখেন, বিষ্ণু স্বয়ং শৃঙ্খলে বাঁধা আর তাঁর পাশে তাঁরই পালিতা কন্যা লক্ষ্মীরূপে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘুম থেকে উঠে তাঁর পালিতা কন্যাকে যথারীতি তাঁর শয্যাতেই দেখতে পেয়ে পরদিন সকালে কন্যাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেখেন, সত্যিই বিষ্ণু শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা অনুতাপ ও দুঃখে ভেঙে পড়ে অনেক প্রার্থনা করতে বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে বলেন : "ভয় নেই রাজা, তোমার ভালবাসাই আমার এই লৌহশৃঙ্খলের চিহ্ন হয়ে থাকবে। আমি লক্ষ্মীর সঙ্গে এই মন্দিরে তোমার প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে এখানেই থাকব। এই সেতুতীর্থে তুমি যে যজ্ঞ করলে তা সফল হবে। এখানে আমার নাম হবে 'সেতুমাধব'।"

বর্তমানে এই মন্দিরে শ্বেত মার্বেল পাথরের তৈরি নারায়ণের দুই হাত শিকলে বাঁধা, মা লক্ষ্মী পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই এঁকে অনেকে 'শ্বেতমাধব'ও বলে। পাশের 'সেতুমাধব কুণ্ড'-এ স্নান করে এই মূর্তি দর্শন করতে হয়। আমরা যখন দেখতে গেলাম, তখন কুণ্ডের জল সামান্যই আছে। দড়ি-বালতি দিয়ে অল্পই জল উঠছে। আমি একটু জল চেয়ে নিলাম। সেতুমাধবের ভক্তানুগ্রহকারী মূর্তি দর্শন করে আমরা তৃতীয় প্রাকারের সঙ্গমস্থলে এসে পৌঁছালাম। দুপাশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা গলিপথ আধো আলো আধো অন্ধকারে এক মহাবিস্ময়ের ব্যাপার। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এই চৌমাথাটিও অপূর্ব। পূর্ব-পশ্চিমে মন্দিরের দিকে আরেকটি রাস্তা বেরিয়েছে। আমরা এবার বাইরে বেরিয়ে এলাম পশ্চিম গোপুরম দিয়ে। প্রণাম জানালাম শ্রীরামকে : "নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং সীতা-সমারোপিতবামভাগম্।/ পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং, নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥" শ্রীরামের কৃপাতেই তো এই শ্রীরামেশ্বরের অধিষ্ঠান। আর এই তীর্থে মহাবীরেরই তো প্রাধান্য। তাই তাঁকেও প্রণাম : "গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।/ রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽ-নিলাত্মজম্॥"

মূল মন্দির দর্শন সাঙ্গ হলো। এবার আমাদের গাইড প্রণবানন্দজী রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠার আরেকটি কাহিনী শোনালেন। এই মন্দির দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক সাধক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। সাধারণ কুঁড়েঘরে তাঁর সেবা হতো। ভাবের পূজা, কোন ঐশ্বর্য ছিল না। তারপর ঐ শতাব্দীর শেষ থেকে ক্রমশ সিংহল দ্বীপ ও ভারতের মূল ভূখণ্ডের রাজাদের নজরে পড়ল এই দ্বীপভূমিটি। সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহু দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে শ্রীরামনাথস্বামীর মূল গর্ভগৃহ, দেবী পর্বতবর্ধিনী ও বিশ্বনাথের মন্দির তৈরি করে দেন। পঞ্চদশ শতকে রামনাদের রাজা উদয়ন সেতুপতি ও নাগুরের এক ব্যবসায়ী প্রায় ৮০ ফুট উঁচু পশ্চিম গোপুরমটি ও বাইরের প্রাচীর তৈরি করে দেন।

পর্বতবর্ধিনী দেবীর মন্দিরের বেষ্টনী তৈরি করেন মাদুরার এক ধনী ভক্ত। ষোড়শ শতকে থিরুমালাই সেতুপতি দ্বিতীয় করিডরের দক্ষিণাংশ তৈরি করে দেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আজ মন্দির-চত্বরের যে বিরাট চেহারা দেখা যাচ্ছে, তা গড়ে উঠেছে অনেকদিন ধরে।

রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রচলিত যে-কাহিনী আমরা জানি, রাবণবধের পর ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সীতার তৈরি বালির শিবলিঙ্গ শ্রীরামচন্দ্র পূজা করেছিলেন—সেটি ছাড়া শিবপুরাণে আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়। প্রণবানন্দজী সেটিও আমাদের শোনালেন।

রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার অন্বেষণে সমুদ্রতীরে গিয়ে কিভাবে সমুদ্র পার হওয়া যায়—এই চিন্তায় যখন শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, হনুমানাদি সকলে চিন্তান্বিত, সেইসময় হঠাৎ শ্রীরাম পিপাসার্ত হলেন। "উবাচ রাঘব স্তত্র জলার্থী লক্ষ্মণাভবম্।" কপিগণ এই কথা শোনামাত্র সুশীতল জল এনে দিল। রামচন্দ্র হাতে পাত্র নিয়ে পান করতে গিয়েই মনে পড়ল ঃ "তদাচ স্মরণং জাতম্ ন কৃতং দর্শনং ময়া শিবস্য, বানরশ্রেষ্ঠাঃ কথং চ গৃহ্যতে জলম্।" এখনো পর্যন্ত শিবের দর্শন হয়নি, পূজা হয়নি; কিভাবে আমি জল গ্রহণ করব? এই বলে তিনি জল ফেলে দিলেন। তারপর পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা-প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ "আমি যেন সমুদ্র পার হয়ে শিবভক্ত রাবণ—যে অধার্মিক, অত্যাচারী, স্ত্রীহরণকারী—তাকে নিধন করতে পারি। আপনি আমার এই কাজে সহায় হোন।" শ্রীরামের পূজা-প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে শিব সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে জল পান করতে দিলেন ও 'জয় হোক' বললেন। শ্রীরাম তখন শিবকে বললেন ঃ "লোকানাং উপকারার্থং পাবনায় শিবং ত্বয়া।/ স্থাতব্যং অত্র দেবেশ করুণাসাগর প্রভো॥" এই প্রার্থনায় শিব সম্মত হয়ে লিঙ্গরূপেই সেখানে অধিষ্ঠিত হলেন আর "রামেশ্বরশ্চ নাম্না বৈ প্রসিদ্ধো জগতীতলে" —রামেশ্বর নামে পৃথিবীখ্যাত হলেন। প্রণবানন্দজীর বলা এই নতুন কাহিনীটি অভিনব, কিন্তু শিবপুরাণের কথা শুনে না মানার উপায় ছিল না। সবশেষে তিনি জানালেন, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দুটি সমুদ্রতীরে—সোমনাথ ও রামেশ্বর। নদীতীরে তিনটি—বিশ্বেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর ও মহাকাল। পর্বতের ওপরে চারটি—কেদারেশ্বর, মল্লিকার্জুন, ওঙ্কারেশ্বর ও ভীমাশঙ্কর। আর সমভূমিতে তিনটি—বৈদ্যনাথ, ঘৃষ্ণেশ্বর ও নাগেশ্বর।

এরপর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন আরেকটি তীর্থে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয় করে শ্রীলঙ্কার জাফনা থেকে ভারতের মাটিতে এই রামেশ্বরের পাম্বান বন্দরে প্রথম পদার্পণ করেন ২৬ জানুয়ারি। সেদিন এখানের জেটিতেই তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় রামনাদবাসী ও রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির পক্ষ থেকে। সেদিনই তিনি রাজার অতিথিভবনে একটু বিশ্রাম করে রামেশ্বর-মন্দিরে আসেন জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর দর্শনে। মন্দির-দর্শন, পূজা-পরিক্রমার পর তিনি মন্দিরের বহির্দ্বারে একটি বিখ্যাত ভাষণ দেন। বর্তমানে সেই জায়গাটিতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে পাথরের গায়ে সেই ভাষণের কিছু অংশ ইংরেজিতে খোদাই করে রাখা আছে। তার শুরুটা অপূর্ব ঃ "প্রেমই ধর্মের সার কথা। ধর্ম অনুষ্ঠানে নয়—অনুরাগে। যদি কেউ শরীর-মনে পবিত্র না হতে পারে, তবে তার মন্দিরে আসা নিরর্থক। ভগবান মহাদেব সেইসব শুদ্ধ শরীর-মনের অধিকারীদের প্রার্থনা শোনেন।" ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই স্তম্ভটির আবরণ উন্মোচন করেন।

এরপর আমরা যে-বাড়িটিতে স্বামীজী বিশ্রাম নিয়েছিলেন, রাজার অতিথিভবনের সেই একতলার ঘরটিতেও গেলাম। দেওয়ালের গায়ে একটি শ্বেতপাথরের ফলকে সেইদিনের কথা স্মরণ করা হয়েছে। ঘরখানি খুব অযত্নের সঙ্গেই পড়ে আছে। আমরা সেখানে স্বামীজীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে ধনুষ্কোটির দিকে আরেকটি জায়গায় গেলাম। এর নাম 'জটাতীর্থ'। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর রামেশ্বর দর্শনের আগে এই তীর্থে এসে তাঁর বনবাসের সাক্ষী জটা ধুয়ে ফেলেন ও পাপস্খলনের জন্য কিছু অংশ এখানে ছিঁড়ে ফেলেন। সেই থেকে প্রায় ৩০০ বর্গফুট বিস্তৃত এই কুণ্ডটি 'জটাতীর্থ' নামে খ্যাত। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটির নাম 'পাপহরেশ্বর'।

জটাতীর্থে স্বামী প্রণবানন্দ স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় দরিদ্র জেলেদের জন্য 'বিবেকানন্দ কুডেল' নামে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। অবহেলিত দরিদ্র এই জেলেদের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রলোভন থেকে রক্ষা করে তাদের বাসস্থান, শিক্ষা এবং হিন্দু সংস্কৃতি প্রচারের উন্নততর ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এটি কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয়, একেবারে স্বামীজীর আদর্শে দরিদ্রনারায়ণ সেবার একটি নিদর্শন। রামেশ্বর-দর্শনার্থী সকলেরই তীর্থদর্শন সার্থক হবে এমন একটি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ কার্যক্রম দর্শন করলে। অশিক্ষিত জেলেরা তাঁর অনুপ্রেরণায় সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করেছে। সেখানে তাদের ছেলেমেয়েরা বৈদিকমন্ত্র আবৃত্তি করছে, ঠাকুর-স্বামীজীর বাঙলা গান গাইছে, লেখাপড়া করছে—না দেখলে আমাদের ধারণাই হতো না। আমরা সাধ্যমতো এই সেবাযজ্ঞে সাহায্য করলাম।

প্রণবানন্দজীকে বিদায় জানিয়ে আমরা এবার বাসে উঠব। দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি তাঁর পরিচিত এক আশ্রমে করেছিলেন। আহারান্তে সেই আশ্রমের বারান্দায় বসে ভাবছিলাম—এইসব তীর্থদর্শনের বিষয়ে ঠাকুর বলেছেন : "ওরে, যেখানে অনেক লোক অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জানবি। তাঁদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা এইসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সবজায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়তে হয় না—যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, সেইরকম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১৯৯৫, পৃঃ ৬০)

দীর্ঘ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনপর্ব এবং তার অনুপূর্ব বর্ণনা শেষ হলো এই ভারতের শেষ প্রান্তে রামেশ্বর দর্শনের মধ্য দিয়ে। তাই আজ একটু আবেগপ্রবণ হয়ে ঠাকুরের কথাই ভাবছিলাম। সর্বদেবদেবীস্বরূপ ঠাকুরই তো শিবস্বরূপ। তাঁর অঙ্গজ্যোতি থেকেই তো ঠাকুরের আবির্ভাব! তাই তাঁর কথাই বারবার মনে পড়ছিল, তিনি বলেছেন : "গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেইসব খাবার উগ্‌রে ভাল করে চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেইরকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যেসব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জেগে ওঠে সেইসব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়; দেখে এসেই সেসব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই; তাহলে ঐ ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।" (ঐ)

অশেষ কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণ—সদাশিব সর্বমঙ্গলময় যিনি, তিনি যেন আমার তীর্থভ্রমণের দোষত্রুটি দূর করে এর সার স্মৃতিটুকু মনে অক্ষয় করে রাখেন—

"করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাঽপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
তবতত্ত্বং ন জানামি কিদৃশোঽসি মহেশ্বরঃ।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥" [সমাপ্ত] ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি
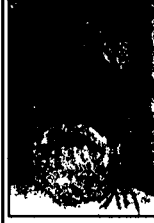
শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যবর্গের মধ্যে দুর্গাচরণ নাগ বা সাধু নাগ মহাশয়কে (১৮৪৬-১৮৯৯) উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বললে বোধহয় ভুল হয় না। আপাত রুক্ষ চেহারার মধ্যে দুটি চোখ অসাধারণ উজ্জ্বল। গৃহী কেন, সন্ন্যাসীরাও নাগ মহাশয়ের তপস্যাকে সম্ভ্রম করে চলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন, পূর্ববঙ্গটা যেন নাগ মহাশয়ের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জের পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের জন্ম। ইচ্ছাশক্তি এবং তপস্যার জোরে নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ নিজ শরীরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ঠাকুরের ইচ্ছায় সফল হননি। তাঁর দীনহীন ভাবের প্রশংসা করে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলেছিলেন : "এরই ঠিক ঠিক দীনতা, একটুও ভান নেই।" সুরেশচন্দ্র মিত্রকে বলেছিলেন : "দেখেছ, লোকটা যেন আগুন, জ্বলন্ত আগুন।"

পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নাগ মহাশয় ঈশ্বরলাভের জন্য গৃহী হয়েও প্রায় সর্বত্যাগী ছিলেন। নিজের সুখে তিনি এতটাই উদাসীন ছিলেন যে, একবার বাড়ি মেরামতের জন্য তাঁর স্ত্রী যখন ঘরামি নিযুক্ত করেছিলেন, নাগ মহাশয় কপালে করাঘাত করে বলেছিলেন : "হায় ঠাকুর! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাখলে? (নাগ মহাশয় সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বলেছিলেন : "তুমি গৃহেই থাক।") আমার সুখের জন্য অপরে খাটবে—এও আমাকে দেখতে হলো!" মাঝে মাঝে ভাবসমাধিমগ্ন হয়ে নাগ মহাশয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন। আবার ভাবাবস্থায় অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতে নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিকে দর্শন করার পর মা তাঁকে স্বহস্তে প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। তখন ভাবসমাহিত নাগ মহাশয় বারবার বলতে থাকেন : "বাপের চেয়ে মা দয়াল।" একবার দেওভোগ গ্রামে এক 'বিশেষ যোগ'-এ গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছায় নাগ মহাশয়ের বাবা বললেন : "তুমি অকর্মণ্য, আমাকে কখনো তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নানাদি করালে না।" নাগ মহাশয় নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানে বসলেন। কিছু পরে গৃহের পশ্চিমকোণে ফোয়ারার মতো জল উঠতে থাকল। নাগ মহাশয় পিতাকে বললেন : "আপনার জন্য মা গঙ্গা নিজেই এসেছেন। স্নান করে নিন।" এবারে প্রচ্ছদে সাধু নাগ মহাশয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হলো।

—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের চার রসদ্দার পাঁচ সেবায়েত

দিলীপকুমার ভারতী*

[পূর্বানুবৃত্তি]

■ ভগিনী নিবেদিতা ■ এখানে এটুকুই বলা যাক, তিনি গুরু স্বামী বিবেকানন্দে ছিলেন আত্ম-নিবেদিতা।

■ মিসেস ওলি বুল ■ স্বামীজী এঁকে বলতেন 'ধীরামাতা'—তাঁর ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য। স্বামীজী প্রায়শই বহু ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ চাইতেন, যেমন সন্তান চায় মায়ের নির্দেশ।[৩৮] তিনি বেলুড় মঠ স্থাপনেই শুধু সাহায্য করেননি, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতাকে আর্থিক-সহ সর্বপ্রকার সাহায্য করে গেছেন। একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন : "আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন। আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ঐখানেই।"[৩৯]

■ সেভিয়ার দম্পতি ■ ১৮৯৬ সালে ইংল্যাণ্ডে এঁদের সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হন। প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে মাতৃসম্বোধন করে বলেন : "ভারতবর্ষে চলুন। আমার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি আপনাদের দেব।" এঁদেরই অর্থানুকূল্যে হিমালয়ের মায়াবতীতে বিবেকানন্দের পরম স্বপ্ন অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা হন আশ্রম-পিতা ও আশ্রম-মাতা। এই আশ্রম অবশ্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ অদ্বৈত আশ্রমের উদ্বোধন হয়, কিন্তু মাত্র দেড়বছর পর ২৮ অক্টোবর ১৯০০ ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের জীবনদীপ আশ্রমেই নির্বাপিত হয়। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেহ ভারতীয় (হিন্দু) পদ্ধতিতে অগ্নিসংকার করা হয়। তারপর থেকে অদ্বৈত আশ্রমের একমাত্র কর্ত্রী হন মিসেস সেভিয়ার। অতএব এক অর্থে শুধু মিসেস সেভিয়ারকেও সেবায়েত বলা চলে।[৪০]

❋ মথুরবাবু ও শম্ভুবাবু কেন রসদ্দার হওয়া সত্ত্বেও সেবায়েত ❋

■ মথুরবাবু ■ 'সেবায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি, সেবায়েত হলেন দেবমন্দিরের পূজারী বা তত্ত্বাবধায়ক। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই মন্দিরের অধিদেবতা যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, তাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তিন বিদেশিনী সেবায়েতের কথাও। তাঁরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরই সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু মথুরবাবু ও শম্ভুবাবু তো ঠাকুরের মর্ত্যলীলা সমাপনের পূর্বেই অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির (বা যে-মন্দিরের অধিদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ) আমরা কিভাবে নির্দিষ্ট করব? এই প্রশ্নটা হয়তো উঠত না যদি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের তত্ত্বাবধানকর্মেও সুদীর্ঘকাল মথুরানাথ প্রত্যক্ষত জড়িত না থাকতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন, মা (জগন্মাতা) তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর জন্য চারজন রসদ্দার পাঠানো হয়েছে এবং পাঁচজন সেবায়েতও যাচ্ছেন—দুজন তো গেছেনই (মথুরবাবু ও শম্ভুবাবু); আরো তিনজন আসবেন, যাঁদের বর্ণ গৌর। অতএব এখানে কালীবাড়ির রসদ্দার বা সেবায়েত বোঝার কোন অবকাশ নেই—সে-প্রশ্নও ওঠে না; কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোন্ মন্দিরের সেবায়েতকর্ম করেছেন মথুরবাবু ও শম্ভুবাবু?

এই প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন উত্তর আমরা পেয়ে যাব যদি স্মরণ করি তিনি 'কার রসদ্দার'—এই বিষয়ে কী বলেছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এ আছে, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫ তিনি মণিকে (শ্রীম) বলেছেন : "তিনি ভক্তের জন্য দেহধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদ্দার।" এর বৎসরাধিককাল আগে ১৮৮৪-র ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন : "তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি—তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।"[৪১]

এই দুই উক্তির সমীকরণ করলে আমরা পাই : (১) তিনিই (অর্থাৎ ঈশ্বর) দেহধারণ করে মর্ত্যে এসেছেন। এবং (২) তাঁর ভৌত দেহের রক্ষা ও পুষ্টির জন্যই রসদ্দার। তবে দেহধারী ঈশ্বর তো একা আসেন না। তাঁর সঙ্গে ভক্তরাও আসেন—একথাও তিনি বলেছেন। অতএব রসদ্দারেরা তাঁর নিকট আগত ভক্তদের সেবার জন্যও রসদ্দারি করেন।

শম্ভুবাবু যদি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য চালাঘর তৈরি করে দেন, তবে তাও তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণেরই রসদ্দারি; কারণ শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী। নেপালের কাপ্তান সেই অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণের রসদ্দার। সুরেন্দ্রনাথ যে বরানগর মঠের জন্য ভাড়া দিতেন, তাও তাঁর রসদ্দারির মধ্যেই পড়ে। কারণ,

* রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কাঁথি-নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে গবেষণারত।

সেখানে যাঁরা থাকতেন তাঁরা তো শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু অন্তরঙ্গ ভক্তই ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন মর্ত্যদেহধারী ঈশ্বরের পার্ষদ। আর মথুরবাবু তো শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলতেন—সবই করতেন।

ঐ একই দিনে (২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫) তিনি রসদ্দারের কথা বলার পরই বলেছেন পাঁচজন সেবায়েতের কথা। সুতরাং সেবায়েত যে সেই দেহধারী ঈশ্বরেরই, এছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ আমাদের নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেই ঈশ্বরের মন্দিরের সেবায়েতের কথাই বলেছেন, তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। সেই দেবতার (দেহধারী ঈশ্বরকেই 'দেবতা' বলা হচ্ছে) অধিষ্ঠান তাঁর জীবদ্দশাতে ছিল দক্ষিণেশ্বরে—রানি রাসমণির কালীবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। দৃশ্যত সেই মন্দির ছিল—"উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে।... ঘরের ঠিক পশ্চিম দিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ (মন্দিরের অধিদেবতা) পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন।"[৪২]

কিন্তু এমন স্থূলভাবে মন্দিরকে চিহ্নিত করলে আমাদেরই ভাবের অব্যাপ্তিদোষ ঘটে, পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পরবর্তী কালে আগত সেবায়েতদের সঙ্গে সামঞ্জস্যও হয় না। অতএব বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন স্বয়ং সেই মন্দির—যেখানে ভক্তেরা, আপামর জনসাধারণ আসতেন দেবতাকে দর্শন করতে এবং তাঁর শ্রীমুখ থেকে কথামৃত শুনতে। তাঁর ভৌত দেহ যখন ছিল না, তখন তাঁর মাহাত্ম্য ছিল এবং রয়েছে। (মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।) মাহাত্ম্যের সঙ্গে তাঁর ভৌত দেহের সমীকরণ করাই যায়। আর মন্দির? মন্দির তো গ্রহব্যাপী।

শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে তাঁর অবস্থানগৃহকে মন্দিরও বলেছেন। প্রতাপ হাজরা কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে এসে থাকতেন। জপধ্যান করতেন আর দালালির চেষ্টা করতেন। নরেন্দ্রনাথ হাজরাকে খুব পছন্দ করতেন। জপ করে কিছু অহঙ্কারও হয়েছিল।[৪৩] শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য একদিন (১ জানুয়ারি ১৮৮৩) তাঁর কাছে আগত ভক্তদের বললেন: "হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।" সকলে হেসে ওঠেন।[৪৪]

'দরগা' শব্দের অর্থ পীরের বা মুসলমান সাধুমহাত্মার কবর-সম্বলিত পুণ্যমন্দির। হাজরাকে ব্যঙ্গ করার জন্য এই তির্যক শব্দপ্রয়োগ, যার অর্থ মন্দিরেরই লক্ষ্যীভূত। 'এখানে' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিষ্ঠানগৃহটি হয়, আবার তিনি স্বয়ংও হন। নিজ দেহকে বোঝাতে প্রায়শ তিনি 'এখানে' শব্দটি ব্যবহার করতেন, অতএব তিনিই মন্দির। 'সেবায়েত' মন্দিরের পূজারী বা তত্ত্বাবধায়ক। আসলে পূজারী তো মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার/দেবীর। অপিচ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক বললে তাঁকে বোঝায়, যিনি দেবতা/দেবীর নিত্য পূজার্চনা এবং মন্দিরগৃহ রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তার ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা হলে তাঁর সেবায়েতেরা তাই করেছেন। সেকারণে মথুরবাবুকে তিনি রসদ্দার এবং সেবায়েত—দুই-ই কেন বলেছেন তা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি দেবতার তুষ্টির জন্য চোদ্দবছর ধরে সবই করেছেন।

■ শম্ভুবাবু ■ কিন্তু শম্ভুবাবুকে ঠাকুর কেন সেবায়েত বললেন? তিনি কেন রসদ্দারের মর্যাদা পেয়েছেন ঠাকুরের কাছে তা বুঝতে অসুবিধা নেই—ছোট রসদ্দার, বড় রসদ্দারের বিন্যাসের প্রশ্নটি সরিয়ে রেখে। মথুরবাবুর মতো তত্ত্বাবধানকর্ম শম্ভুবাবু করেননি। আমাদের মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর যে-মাহাত্ম্যের প্রচার হবে (যা তিনি দিব্যনেত্রে দেখতে পেয়েছিলেন), সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি শম্ভুবাবুকে সেবায়েতের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি, ১৮৭৪ সালে খ্রিস্টধর্মমতে সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ যিশুকে দর্শন করেন এবং তারপর ঘোষণা করেন: "যত মত তত পথ।" 'মত' অর্থে ধর্ম বা সম্প্রদায়। শ্রীরামকৃষ্ণের যদি নিজস্ব কিছু ধর্মমত ছিল বলে স্বীকার করা হয়; তবে এই মহাবাণী, এই ঘোষণাই তাঁর 'মত'—যার দ্বারা সর্বধর্মসমন্বয়ের ঘোষণাই তিনি করলেন। একে আমরা তাঁর মাহাত্ম্যের একটি দিক বলে পূর্বেই চিহ্নিত করেছি। এটি একটি মহা আবিষ্কার। এবং এই আবিষ্কারের সঙ্গে শম্ভু মল্লিকের সামান্য একটু যোগ রয়েছে। তাঁকে সেবায়েতের মর্যাদা বুঝি সেজন্যই দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

শম্ভু মল্লিক ছিলেন কলকাতার সিঁদুরিয়াপটির বাসিন্দা, ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত ধর্মমতের বিশেষ অনুরাগী। অজস্র দানের জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে, তিনি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রাদির একজন সশ্রদ্ধ পাঠক ছিলেন। তিনি বাইবেল এবং যিশুখ্রিস্টের জীবনীও পাঠ করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সেজন্য ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সহজেই এবং নিজের সহজাত প্রেরণায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন।[৪৫]

আগেই বলা হয়েছে, শম্ভু মল্লিক এসেছিলেন ১৮৭২ সালে—মথুরবাবুর মৃত্যুর (১৪ জুলাই ১৮৭১) পর। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দ্বৈতাদ্বৈত ভূমিতে বিচরণ করেন এবং ইসলামধর্মে সাধনাও সম্পূর্ণ করেছেন। ষোড়শীপূজা তখনো বাকি। এরকম একটি কালেই শম্ভুবাবুর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। বলা বাহুল্য, শম্ভুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা দিনে দিনে

গাঢ় হতে থাকে। শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন—স্বামীর কাছে প্রথম আগমন তাঁর। শম্ভুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে অচিরে গুরুর আসনে বসালেন; ডাকতেনও 'গুরুজী' বলে, ঠাকুর নিষেধ করা সত্ত্বেও। তাঁর তো দানের খ্যাতি ছিল; সুতরাং তিনি গুরু ও গুরুপত্নীর জন্য অর্থব্যয় করবেন—এ আর বেশি কথা কি? তিনি ঠাকুরের শিষ্য এবং রসদ্দারের স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

কিন্তু গুরু-শিষ্যের মধ্যে আরেক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে শম্ভুবাবু মাঝে মাঝে বাইবেল পড়িয়ে শোনাতেন; শোনাতেন যিশুখ্রিস্টের পবিত্র জীবনচরিত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণ পাশে ছিল যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বাগানে বেড়াতে যেতেন। যদুনাথ এবং তাঁর মা ঠাকুরকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে নানা অয়েল পেন্টিঙের মধ্যে একটি সুন্দর চিত্র ছিল মা মেরির কোলে যিশুর। বাগানে বেড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানা ঘরেও যেতেন, ছবিগুলি দেখতেন। যদুনাথ বা তাঁর মা না থাকলেও কর্মচারীরা ঘরের তালা খুলে দিতেন এবং ঠাকুরকে বসতে বলতেন।

এরকমই মাঝে মাঝে যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রায় বৎসরাধিককাল। ইতোমধ্যে তিনি ষোড়শীপূজাও করলেন। তারপর একদিন যদু মল্লিকের বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় গিয়ে ঘটে গেল ব্যাপারটা, যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। এদিন তিনি তন্ময় হয়ে যিশুখ্রিস্টের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন আর যিশুর অদ্ভুত জীবন বিষয়ে ভাবছিলেন, যা শম্ভু মল্লিকের কাছে তিনি শুনেছিলেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছবিটিকে তাঁর জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় বলে মনে হলো এবং মানসিক ভাবসমূহ যেন পরিবর্তিত হতে থাকল, জন্মগত হিন্দু সংস্কার সব যেন লোপ পেতে থাকল। তার পরিবর্তে হৃদয়ে বিজাতীয় সংস্কার প্রবল হয়ে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ নতুন ভাবতরঙ্গ রোধে অসমর্থ হয়ে কাতরস্বরে বলে উঠলেন জগদম্বাকে : "মা, আমাকে এ কী করছিস?"

কিন্তু কিছুই হলো না। সমস্ত হিন্দু সংস্কার, দেবদেবীদের প্রতি অনুরাগ সব কোথায় তলিয়ে গেল। পরিবর্তে খ্রিস্টীয় সংস্কার জাগ্রত হলো। ঐ ভাবে বিভোর হয়ে তিনি ফিরে এলেন। তারপর নিরন্তর যিশুর ধ্যানেই মগ্ন থাকলেন, জগন্মাতার মন্দিরে যাওয়ার কথা বিস্মৃত হলেন। এভাবে দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে পঞ্চবটীতে বেড়াতে গিয়ে এক অদৃষ্টপূর্ব সুন্দর দেবমানবকে তিনি দেখতে পেলেন, যিনি ক্রমশ তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। চিনতে পারলেন এবার শ্রীরামকৃষ্ণ, ইনিই প্রেমিক খ্রিস্ট ঈশামসি। তারপর ঈশা শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর শরীরে লীন হলেন। তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারালেন। তাঁর মন "বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল।"[৪৬] এভাবে খ্রিস্টের দর্শন করে তাঁর নিশ্চিত উপলব্ধি (confirmation) হলো—সব পথের শেষ এক বিন্দুতে—অদ্বয় ব্রহ্ম! আর তারপরই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো মহাবাণী : "যত মত তত পথ।" এটি শুধু মহাবাণী নয়, মহা আবিষ্কারও—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে মহা আবিষ্কার। ভৌতবিজ্ঞানে যেমন তত্ত্ব থাকে, আবার বীক্ষণাগারে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেই তত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করলে তবে তা আবিষ্কারের মর্যাদালাভ করে—শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি দীর্ঘ কুড়িবছর ধরে (১৮৫৫—১৮৭৫) নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাঁর শেষ পরীক্ষাটি ছিল খ্রিস্টধর্মে সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অত বড় অধ্যাত্ম-আবিষ্কারের গুরুত্ব যদি মানুষ তখন না বুঝে থাকতে পারে, তবে শম্ভু মল্লিকের ছোট ভূমিকাটির গুরুত্ব অলক্ষ্যে থেকে যাওয়াটা খুব আশ্চর্যের নয়। শম্ভুবাবু যে ঠাকুরকে বাইবেল ও যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তা কোন সচেতনভাবে নয়; কিন্তু মহা উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন হলেন—শম্ভুবাবু যা তাঁকে শুনিয়েছিলেন, সেবিষয়ে।

শম্ভুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত শিষ্য, রসদ্দার তো বটেই। ঠাকুরের খ্রিস্টধর্মে সাধনার বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গুরুর মতো নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুকে তদ্বিষয়ে কী চোখে দেখতেন? শম্ভুবাবু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলে সম্বোধন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে সময় সময় বিরক্ত হতেন; বলতেন : "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু।"

স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি দিয়ে তাঁর গ্রন্থে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : "শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শম্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়।"[৪৭]

আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যে ধর্মবিশ্বাস ("যত মত তত পথ") তাও পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করেছিল খ্রিস্টধর্মে সাধনা করে এবং সেখানে শম্ভুবাবুর কিছু ভূমিকা ছিল। ঠাকুরের উলটে শম্ভুকে 'তুমি আমার গুরু' বলাটার মধ্যে তেমনই মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্যই শম্ভুবাবুকে সেবায়েতের মর্যাদা দিয়েছেন, যদিও তা তিনি কোনদিন খুলে বলেননি।

বস্তুতপক্ষে যে তিনজন রসদ্দারের নাম করেছেন ঠাকুর, তাঁরা কেন রসদ্দার তা আমরা বুঝতে পারি, কারণ ঠাকুর

তাঁদের রসদ্দারির কিছু তথ্য দিয়েছেন—অন্তত মথুরবাবুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে। কিন্তু সেবায়েতদের কোন সংজ্ঞাই তিনি দেননি—এমনকি মথুরবাবু কেন সেবায়েত, সেবিষয়েও কোন ইঙ্গিত তিনি দেননি। তাঁর মাপকাঠিগুলি (yardstick) কীরকম ছিল, তা তিনি বলেননি। জগন্মাতা তাঁকে সবই আগে থেকে ভাবে দেখিয়েছিলেন—একথা তিনি বহুবার বলেছেন। তাহলে দাঁড়ায়, মাপকাঠিগুলি ছিল জগন্মাতারই। এসব কথা নিজের মধ্যে গোপন করে রাখতে চাইলেও কখনো কখনো ঠাকুর তা প্রকাশ করে ফেলতেন। যেমন, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫-র উক্তির এক অংশে : "সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়।"[৪৮] [সমাপ্ত] ❑

উল্লেখপঞ্জী ও টিকা

সঙ্কেত :

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়

পূর্বকথা ও বাল্যজীবন	— ১ম ভাগ (১৯৯৩ সং)	— লীলাপ্র., ১
সাধকভাব	— ঐ	— লীলাপ্র., ২
গুরুভাব—পূর্বার্ধ	— ঐ	— লীলাপ্র., ৩
গুরুভাব—উত্তরার্ধ	— ২য় ভাগ (১৯৯৫ সং)	— লীলাপ্র., ৪
দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ	— ঐ	— লীলাপ্র., ৫

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, কথামৃত ভবন প্রকাশিত
যথাক্রমে—কথামৃত ১, ২, ৩, ৪, ৫

৩ Life of Ramakrishna—Romain Roland —L.R./R.R.

৪ Ramakrishna and his disciples—Christopher Isherwood —ঈশারউড

৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৮৭ —সমকালীন

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২০০১ —বাণী-রচনা

৭ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৭৫ —লোকমাতা

তথ্যসূচি

৩৮ লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮
৩৯ ঐ, পৃঃ ৫৫২
৪০ অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী বিমলানন্দকে একটি চিঠিতে একবার শ্রীশ্রীমা লিখেছিলেন : "মেয়েমানুষের মঠ। মঠে সাবধানে থাকিবে।" (সমকালীন, ৫।৩৩৯ পাদটীকা) স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, শ্রীশ্রীমা 'মেয়েমানুষ' বলতে মিসেস সেভিয়ারকে বুঝিয়েছেন।
৪১ কথামৃত, ৫।পরি.।৯
৪২ ঐ, ১।১।১
৪৩ ঐ, ৩।১৫।১
৪৪ ঐ, ৪।১।৪
৪৫ লীলাপ্র., ২।২২৩, ঈশারউড, পৃঃ ১৪৭
ঈশারউড লিখেছেন : "Shambhu was a devout student of the scriptures of various religions."
৪৬ লীলাপ্র., ২।২১২
৪৭ ঐ, ২।২২৩
৪৮ কথামৃত, ৪।৩১।২

শব্দচেতনা ৪৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি : (১) শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগতপ্রাণ কবি (৪) ঠাকুরের এক পরম ভক্ত, যিনি যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (৬) সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর একদিন এঁর বুকে চরণ রেখে কৃপা করেছিলেন (৮) "পাপ আর পারা কেউ —— করতে পারে না" (১০) শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমায়ের ছোটবেলার আদরের নাম (১১) "ঈশ্বর সাকার —— দুই-ই" (১৩) হুগলি জেলার বেলটে গ্রামে যাঁর বাড়িতে ঠাকুর কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন (১৫) "মানুষকে ভাল বলতেও যতক্ষণ, —— বলতেও ততক্ষণ" (১৭) "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল ——" (১৮) ঠাকুরের এক ব্রাহ্মভক্ত; যিনি সিঁদুরিয়াপটির ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন (১৯) ঠাকুর ভগবানদাস বাবাজির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এই জায়গায় (২২) ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত; হাওড়ার প্রখ্যাত কবিরাজ ছিলেন।

ওপর-নিচ : (১) ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথম ঠাকুরকে এই বলে ঘোষণা করেছিলেন (২) ঠাকুরের দেখা নাটক 'নব বৃন্দাবন'-এ এই বাবু 'পাপপুরুষ' সেজেছিলেন। (৩) নরেনকে ঠাকুর বলেছিলেন '——রূপী নারায়ণ' (৫) রামচন্দ্র দত্তের লেখা ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ (৭) ঠাকুর যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির দর্শনে এসেছিলেন হুগলি জেলার এই স্থানে (৯) ঠাকুর এই তীর্থে গিয়ে ধ্রুবঘাট দর্শন করেছিলেন (১২) ঠাকুর দশমহাবিদ্যা মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন এই স্থানে (১৩) যাঁর গৃহে দেবদেবীর ছবি দেখে ঠাকুর প্রশংসা করেছিলেন (১৪) কামারপুকুরে ঠাকুরের প্রতিবেশী সীতানাথ পাইনদের এলাকা এই পল্লি নামে প্রসিদ্ধ ছিল (১৬) ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহিভক্ত (২) "যে না সয়, সে —— হয়" (২১) ঠাকুর গাইতেন : "তুমি অকূলের ——কর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

গুরুনিন্দা শুনলে পাপ হয়। এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী পার্ষদ সাধু নাগ মহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ)। তিনি তখন ঢাকার নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে। সেখানকার এক প্রতিপত্তিশালী বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসেছেন দেখা করতে। কথা হচ্ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে।

আরে রাখ তোমার রামকৃষ্ণ পরমহংস। অমন অনেক সাধক এদেশে আছেন।

দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁর নামে এসব মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়।

এতে কাজ হলো না। ঐ ব্যক্তিটি আরো উচ্চস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগল।

এবাড়িতে বসে অযথা ঠাকুরের নিন্দাবাদ করবেন না—বলে দিচ্ছি।

বেশ করেছি বলেছি। আরো একশোবার বলব।

ব্যক্তিটি সংযত না হয়ে আরো অভদ্র ভাষায় কটু কথা বলতে লাগল। শান্ত, বিনয়ী নাগ মহাশয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তাঁর চোখ দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হতে লাগল। হাতে জুতো তুলে নিয়ে ঐ ব্যক্তির পিঠে সজোরে আঘাত করতে করতে বললেন—

বেরোও শালা এখান থেকে, এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দা।
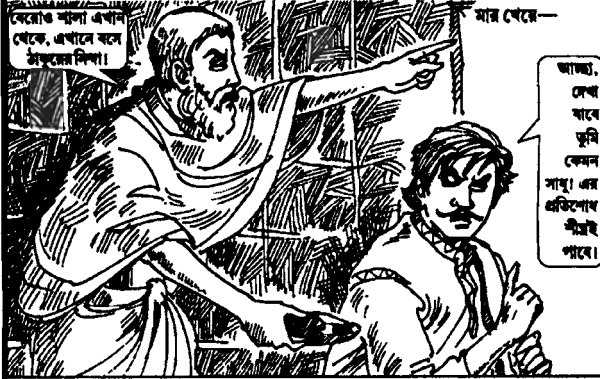
মার খেয়ে—

আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু! এর প্রতিশোধ শীঘ্রই পাবে।

লোকটি চলে গেলে—
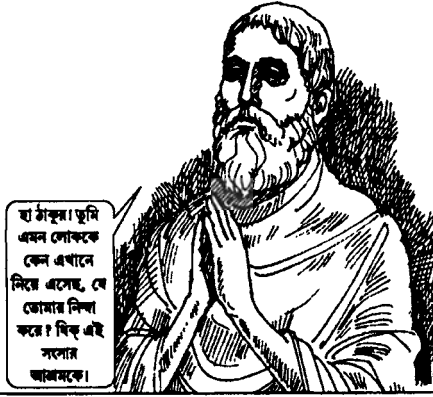
হা ঠাকুর! তুমি এমন লোককে কেন এখানে নিয়ে এসেছ, যে তোমার নিন্দা করে? ধিক্ এই সংসার আশ্রমকে।

কিন্তু সাধুর হাতে জুতোপেটা খেয়ে কিছুদিন পর ঐ পাষণ্ডের চৈতন্য হলো।

মহাশয়, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। সেদিন কেন যে কথা বলেছিলাম, তা কখনোই আমার বলা উচিত হয়নি। আমি এই অপরাধের জন্য লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন, এই যথেষ্ট। আর আমি আপনাকে কি ক্ষমা করব? শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আপনার জন্য তামাক সেজে আনি।

নাগ মহাশয় সৌজন্য দেখিয়ে তাঁকে দুয়ার পর্যন্ত এগিয়েও দিলেন।

রাস্তাটা ভাল নয়, দেখে চলুন।

জাগাও সত্য, ঘুমও সত্য কিংবা দুটোই মিথ্যা!

ঠাকুর বলেন, জ্ঞানীদের কাছে জাগাও সত্য যত,
রাতের স্বপ্ন—নয় সে অলীক, সেটিও সত্য তত।
শোন তবে বলি, এক সে চাষির বেশিবয়সের ছেলে,
চাষি-চাষিবউ ছেলেকে যত্ন করে প্রাণ-মন ঢেলে।
সবার আদরে ছেলেটি তাদের সংসারে হয় বড়,
বিধির বিপাকে একদিন তার ব্যাধি হলো গুরুতর।
চাষিটি তখন খেতের কাজেই ব্যস্ত ছিল ভারি,
একজন এসে বলে : "কাজ থাক, বাড়ি চল তাড়াতাড়ি।
তোমার ছেলের হঠাৎ অসুখ, অবস্থা যায় যায়,
তুমি না গেলে সে রোগা ছেলেটাকে সামলানো বড় দায়।"

কি আর করে সে, বাড়ি ফেরে, কাজে থাক না যতই তাড়া,
এসে দেখে, তার আদরের ছেলে ততক্ষণে গেছে মারা।
চাষিবউ কেঁদে ধুলোয় লুটায়, চোখে ধারা অবিরল,
সবাই অবাক, চাষির দুচোখে নেই একফোঁটা জল।
কাঁদতে কাঁদতে চাষিবউ তার প্রতিবেশীদের কাছে
বলে : "দ্যাখ, ছেলে মারা গেল, তবু ওর চোখে জল আছে?
আমার স্বামীটি কত নিষ্ঠুর, মায়া-দয়া প্রাণে নাই,
একটিমাত্র ছেলের মরণে নাই ভ্রূক্ষেপ তাই।"
বেশ কিছু পরে চাষিবউটিকে চাষি বলে : "শোন, শোন,
ছেলের মরণে খুঁজে পাচ্ছি না কাঁদার কারণ কোন।
গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখি কি, আমি হয়ে গেছি রাজা,
বাবাও হয়েছি সাতটি ছেলের—ফুটফুটে তরতাজা।
ক্রমে বড় হলো, বিদ্যা-ধর্ম করল উপার্জন,
এমন সময় কেন যে জানি না, ভেঙে গেল সে-স্বপন।
এখন বল তো কাঁদব তাহলে কার বা কাদের শোকে?
এক ছেলে? নাকি সাতটি—যাদের দেখেছি স্বপ্নলোকে?"
ঠাকুর বলেন তাই, জাগা-ঘুম—জ্ঞানীদের কাছে সবই সমতুল,
জাগাও সত্য, ঘুমও সত্য, কিংবা মিথ্যা দুটোই, একথায় নেই ভুল।

ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল *(তৃতীয় শ্রেণি)*
ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ ও একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা

২৬ মে ১৮৯০-এ লেখা একটি চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন: " 'ত্যাগ' কাহাকে বলে এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না, কেবল বিলাস, ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে।" স্বামীজী এখানে 'লোকে' বলতে লোকসাধারণকে বোঝাতে চাননি—প্রধানত বোঝাতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ-বেনিয়া সভ্যতায় পুষ্ট হয়ে ওঠা তৎকালীন কলকাতার ধনী বাবুসম্প্রদায়কে। ঐ চিঠি থেকেই জানা যায় স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্য ভোগবাদে মোহিত হওয়া দেশবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে বাঙালি এবং বঙ্গভূমি পবিত্র হয়েছে। এই মহামানব প্রথাগত পুরুষ ছিলেন না—নিছক ঐতিহ্যগতও নয়। দেশে-বিদেশে প্রায় সকলেই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে যাননি। কিন্তু আপত্তিটা ওঠে তখনি যখন ম্যাক্সমুলারের মতো পণ্ডিত এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিদও বলেন: "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ভারতের পুরাতন ধর্মই প্রচার করেছেন মাত্র, (পুরাতন অর্থাৎ) যে-ধর্ম বেদ-ভিত্তিক, বিশেষ করে উপনিষদ্-ভিত্তিক, যা পরে বাদরায়নের সূত্রগুলিতে বিধিবদ্ধ হয় এবং শঙ্কর ও অন্যান্যের ভাষ্যে পুষ্টিলাভ করে।" অথচ, এই 'মাত্র' শব্দটির কারণে এ হেন মন্তব্য আমাদের পুরোপুরি মান্যতা পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐতিহ্য অস্বীকার করেননি—একথা যেমন ঠিক, তেমনি আবার তিনি গতানুগতিক মানুষও ছিলেন না। প্রথানুগত্যের সীমাও ছাড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। মাস্টারমশায় 'শ্রীম' (অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত: ১৮৫৪-১৯৩২) প্রথমবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়ে অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন একথা শুনে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন বই-টইও পড়েন না। তাঁর লেখাপড়া, কথাবার্তা, জীবনযাপন এবং সাধনা—সবই অন্যদের থেকে আলাদা ছিল। বাল্যেও তিনি অন্যরকমভাবেই অঢেল স্বাধীনতায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। সেকালের বহুকাম্য ইংরেজি ভাষাও অজানা ছিল তাঁর। তাই, ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার কোন প্রভাবই তাঁর মধ্যে ছিল না। আবার, সনাতন ধর্মের আনুষ্ঠানিক যে-শাস্ত্রশিক্ষা—তাও ছিল না তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনাও ছিল পূর্ববর্তীদের থেকে আলাদা। সামনে যা পেয়েছেন তিনি, তাকেই হাতে-কলমে পরখ করে দেখেছেন, একেবারে ইসলাম পর্যন্ত। 'গিরিশ-মানস' গ্রন্থে উৎপল দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছেন: "এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরম সৌভাগ্য যে, একজন বিশুদ্ধ মৌলিক চিন্তানায়ক হিন্দুধর্মের সম্মান পুনরুদ্ধারে দাঁড়ালেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে ভারতীয় আত্মমর্যাদাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন।" (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ২য় সং, পৃঃ ৪২)

আমরা এও জানি, গ্রামের এমন এক পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন যে, তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন জমিদারের অত্যাচারে ও ব্রিটিশ সৃষ্ট আদালতের বিচিত্র কারসাজিতে দেরেপুরের প্রায় দেড়শো বিঘা জমি ও পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে কামারপুকুরে চলে এসেছিলেন। এখানে আমরা কেবল এটুকুই মনে রাখতে চাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষেরও মুখপত্র ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায়, গল্পে, এমনকি উপদেশাবলীতেও বাংলার বঞ্চিত সাধারণ মানুষের—বিশেষত কৃষকদের, চিন্তাভাবনার চিহ্নও খানিকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাই পাঠক যদি তাঁকে ব্রিটিশ-সৃষ্ট বণিক-সভ্যতার প্রতিবাদও বলতে চান—বোধকরি ভুল হয় না। যদিও তা তাঁর হিমালয়-সম চরিত্রের কণামাত্রাও প্রকাশ করে না।

মার্ক্সবাদীদের লেখায় ও ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদানের কথা আমরা আগেও পেয়েছি। কলকাতার সিটি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি মূল্যবান প্রবন্ধে লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বসমন্বয়ী জীবনদর্শন, তাঁর ঈশ্বরমুখিনতা এবং সর্বলোকে সমদৃষ্টি পরবর্তী কালের মানুষকে স্বদেশপ্রীতিরও প্রেরণা দিয়েছে। এই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টির সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতারও মেলবন্ধন ঘটেছে। নিজের অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে অন্য সমস্ত জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন—"জীবই শিব" কিংবা "যত মত তত পথ", তখন বাঙালি নতুন স্বদেশি বাণী নতুন করেই শুনতে পেয়েছিল। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, মার্ক্সবাদীদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান এই প্রেক্ষিতেও গ্রহণীয় হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়ার পাট পাঠশালাতেই শেষ হয়। তাই প্রচলিত অর্থে পাণ্ডিত্য বলতে যা বুঝি—তা তাঁর ছিল না। অথচ 'কথামৃত' গ্রন্থখানি তাঁরই অমৃতকথা নিয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছে। শুধু কী তাই! এখানে তাঁর পাণ্ডিত্যের কোন তুলনাই হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মা তাঁকে রাশ ঠেলে দেন। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, একবার সেজোবাবুর (মথুরানাথ বিশ্বাস) ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণেশ্বরে অনেক পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: "অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! (সকলের হাস্য) তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সেসব পড়া বিদ্যা সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফোটে! তাই বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।" একথার পরেই তিনি লৌকিক উপমা দিয়ে আরো বলেছেন: "(কামারপুকুরে) ধান মাপে 'রামে রাম, রামে রাম'

বলতে বলতে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।" সুতরাং এ-জ্ঞান তাঁর পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়। যে-জ্ঞান সরল শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্থির সলিলে সূর্যের প্রতিবিম্বের মতো প্রতিভাত হয়—এ সেই জ্ঞান। যে-জ্ঞান প্রচলিত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যকে সহজেই ম্লান করে দেয়—এ সেই সাধনালব্ধ সহজ চৈতন্যেরই প্রকাশ। এ-জ্ঞানের গোত্রই আলাদা।

বিগত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বুদ্ধের প্রভাব চলেছে। যিশুখ্রিস্টের প্রভাব দুহাজার বছর পরেও অব্যাহত আছে। দেড়হাজার বছর পরেও মহম্মদ আমাদের কত পরিচিত নাম। আর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) এখনো দুশো বছরও পূর্ণ হয়নি। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা এখনি বলার মতো সময়ও হয়নি। তবু এই স্বল্পকালের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ; শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সমগ্র পৃথিবীতে আজ প্রসারিত হয়ে চলেছে। দিকে দিকে কত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; কত সমাজ, সেবাসমিতি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছে। দেশে-বিদেশে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, কত আলোচনা হচ্ছে। নিত্যনতুনরূপে মানুষ যুগোপযোগী ভাবনায় কতভাবেই না তাঁকে পেতে চাইছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অজ্ঞাতভাবেও পৃথিবীর দিকে দিকে আজ ছড়িয়ে পড়ছে—সে-খোঁজ আমরা কজনেই বা রাখতে পারি! শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১ মার্চ ১৯৮৭ বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত আমরা পাই আমাদেরই একজন সাধুর মুখে। তিনি গিয়েছিলেন মস্কোতে। সেখানকার রাশিয়ানরা —অপরিচিত মুখ, এসে তাঁকে জানিয়ে গেল, 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত।' কেউ কেউ এমনও বললে, 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছি।' সেখানে তো শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচার করতে আমরা কেউ যাইনি। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পর্যন্ত দুর্লভ। তথাপি সেস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন যা আমাদের কল্পনাতীত। এই ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব—যা দেখে অবাক হতে হয়। তাঁর সম্বন্ধে বিদেশিরা কত জীবনী ও সমালোচনাগ্রন্থ লিখেছেন এবং পাশ্চাত্যজগতে কোন কোন মনীষী এমন কথাও বলেছেন যে, মানবজাতির ভাবী সুসমন্বিত বিকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।"

আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে পাব কিনা জানি না, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—শ্রীরামকৃষ্ণের মহা আবির্ভাবতিথিটি সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির সুসমন্বিত 'বিকাশ দিবস' হিসাবে পালিত হবে। আজ যদি নাও হয়, কাল অন্তত হবেই। কেননা এই রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত যুযুৎসু বিশ্বে, পৃথিবী নামক গ্রহের সমূহ সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের যোগ্য নির্দেশ এমন করে আর তো কেউ আমাদের দিয়েও যাননি। "জীবই শিব" এবং "যত মত তত পথ"—এই সমস্ত বাণী জন্মলগ্নেই আমাদের বাঁচার নির্ভুল পথনির্দেশ করেছে। মানবসভ্যতার চিরকালীন বিজয়-বৈজয়ন্তীর কাঙ্ক্ষিত ঠিকানাও রয়েছে এখানেই। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে একথা অচিরেই বুঝতে হবে।

রেণুপদ ঘোষ
মোজপুর, হুগলি-৭১২৪১০

ঠাকুরের গর্ভধারিণীর তিরোধানের বয়স এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীর আয়তন প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১১ সংখ্যাটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনাবলীতে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি সংখ্যাটি পড়ে ঋদ্ধ হয়েছি। 'কথাপ্রসঙ্গে'-তে 'মায়ের ম্যানেজমেন্ট' এককথায় অনবদ্য। ঠিক এই ভাবধারায় এবং ভাষায় এবিষয়ে লেখা অন্তত আমি আগে পড়িনি। পূজনীয় সম্পাদক মহারাজকে অভিনন্দন।

শ্রীদিলীপকুমার ভারতী রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের চার রসদ্দার পাঁচ সেবায়েত' এবং শ্রীনির্মলকুমার রায়ের 'কাশীপুর উদ্যানবাটী' ধারাবাহিক-দুটি গবেষণাপ্রসূত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। সাধারণের মনে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় এবং ভুল ধারণা না থেকে যায়, সেজন্য এই দুটি রচনার দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি।

'শম্ভু মল্লিক' অংশে ২৮ পৃষ্ঠায় দিলীপবাবু লিখেছেন : "১৮৭৬-এর মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রামণি দেবীর মৃত্যু হয় ৯৪ বছর বয়সে।" তথ্যপ্রাপ্তি হিসাবে তিনি ক্রিস্টোফার ঈশারউডের গ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ' গ্রন্থের (পৃঃ ১৫১-১৫২) উল্লেখ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ পাই, ঠাকুরের গর্ভধারিণী চন্দ্রামণি দেবীর সম্ভাব্য জন্মসন ১১৯৭ বঙ্গাব্দ (১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ)। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়' অংশে এই তথ্য বিবৃত আছে। গ্রন্থের শুরুতে 'পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা' অংশে তাঁর পরলোকপ্রাপ্তির বছর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ, যখন তাঁর বয়স ৯৪ নয়—৮৫ বছর। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মের সময় তাঁর গর্ভধারিণীর বয়স ছিল ৪৫ বছর এবং তাঁর মৃত্যুকালে ঠাকুর ৪০ বছরের অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু ৮৫ বছরেই হয়েছিল। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনপঞ্জী' অধ্যায়ে (পৃঃ ৯৩২) আছে : "১৮৭৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি (৩ ফাল্গুন ১২৮৩) জননী চন্দ্রামণি দেবীর পরলোক-প্রাপ্তি। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল কর্তৃক সৎকার। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।" এমতেও তাঁর বয়স তখন ৮৫-৮৬ বছর, কখনোই ৯৪ বছর নয়। এছাড়া ৯৪ বছরে মৃত্যু হলে (যখন ঠাকুরের বয়স ৪০ বছর) ঠাকুরের জন্মকালে তাঁর জননীর বয়স ৫৪ বছর হতে হয়, যার সম্ভাব্যতা স্বাভাবিক কারণেই অতি অল্প।

শ্রীনির্মলকুমার রায় 'কাশীপুর উদ্যানবাটী' রচনার শেষ দিকে (পৃঃ ২১) লিখেছেন ঃ "বেলুড় মঠ অধিকৃত এই বাটির বর্তমান আয়তন ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক ৫০ স্কোয়ার ফুট।" একর ও ডেসিমেল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত বর্তমানের অনেকেই বিঘা-কাঠা-ছটাকের পরিমাপ জ্ঞাত নন। তাঁদের সুবিধার জন্য জানাই, ১ বিঘায় ১৪,৪০০ বর্গফুট, ১ কাঠায় (১ বিঘার ২০ ভাগের ১ ভাগ) ৭২০ বর্গফুট এবং ১ ছটাকে (১ কাঠার ১৬ ভাগের ১ ভাগ) ৪৫ বর্গফুট হয়। ১ একরে ৪৩,৫৬০ বর্গফুট যা ৩ বিঘা ½ কাঠার সমান। যাই হোক, আমার বক্তব্য—৪৫ বর্গফুট যখন এক ছটাক, তখন '২ ছটাক ৫০ বর্গফুট' অংশের কোন অর্থ হয় না। ৩ ছটাক ৫ বর্গফুট হতে হয়। যেমন, এক গণ্ডায় ৪টি হওয়ার জন্য ২৬টি মানে ৬ গণ্ডা ২টি—৫ গণ্ডা ৬টি নয়।

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর, আসানসোল-৪

সকলের আছে, শ্রীশ্রীমায়ের নামে কেন ডাকটিকিট হবে না?

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া (আশ্বিন ১৪১১) সংখ্যায় আমার লেখা 'ডাকটিকিটে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলা সহচরগণ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে পাঠকবর্গের কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠি আমি পেয়েছি। ইতোমধ্যে এই প্রসঙ্গে শ্রীনির্মলেন্দু চক্রবর্তীর একটি মতামত 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। আমার লেখায় যেটুকু কম পড়েছিল তা নির্মলেন্দুবাবুর সৌজন্যে কিছুটা পূরণ হলো বলে আমি কৃতজ্ঞ। রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ ব্যক্তিগণ আমার প্রবন্ধের বিষয়ভুক্ত নন বলে তাঁদের কথা উল্লেখ করিনি। ভগিনী নিবেদিতার কথা অবশ্য আলাদা। তবে তাঁর জন্মমাস আমি ভুল করে '২৭ জুন' লিখেছিলাম, হবে '২৭ অক্টোবর'। এজন্য আমি দুঃখিত। প্রসঙ্গত, ফার্মা কে. এল. এম. প্রকাশিত 'ডাকটিকিটের কথা ও কাহিনী' গ্রন্থে 'ডাকটিকিটে বাংলার মুখ' নামক অধ্যায়ে অনেক বাঙালির উল্লেখ পাওয়া যায়।

একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী এবং ডাকটিকিট সংগ্রাহক হিসাবে আমার প্রস্তাব, যাতে ভারতীয় ডাকবিভাগ শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষপূর্তিতে শ্রীশ্রীমায়ের ডাকটিকিট প্রকাশ করেন সেব্যাপারে ভারত সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে কিংবা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে অনুরোধ করুন।

শোভেন সান্যাল
আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি-৭৩৬১২২

সম্পাদকীয় বক্তব্য

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র-সম্বলিত ডাকটিকিট যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন যেমন একটা উপলক্ষ্য ছিল, তেমনি একথা ঠিক যে, শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীও একটি বিশেষ উপলক্ষ্য। পূর্বে যখন ডাকবিভাগ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন, তা করেছিলেন নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে নয়। ঐ টিকিট প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের অনেক সন্ন্যাসী ও ভক্ত কোন কোন পোস্ট অফিসে যত টিকিট ছিল, সব কিনে নিয়েছিলেন নিজের ইষ্টদেবতা ঠাকুর বা স্বামীজীর মুখের ওপর ডেটস্ট্যাম্প পড়ার ভয়ে। আমরা চাই না, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের ওপরও ওরকম ডেটস্ট্যাম্প পড়ুক। তাই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রীশ্রীমায়ের চিত্র-সম্বলিত ডাকটিকিট প্রকাশ করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন' যত্ন করে পড়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রাহকদেরই

'উদ্বোধন' পত্রিকার সমস্ত গ্রাহকের কাছে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে আমার দুটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। কলকাতার বেলেঘাটা-নিবাসী এক প্রবীণ পণ্ডিত মানুষের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। তাঁর দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় বাড়িতে 'উদ্বোধন'-সহ বহু পত্র-পত্রিকা, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদিতে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘজীবী এই মানুষটির পরলোকগমনের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছেলেরা সেগুলি আবর্জনা মনে করে লরি করে বৈঠকখানা বাজারে ওজন-দরে বিক্রি করে দেন। পরে গিয়ে আমি এই অবস্থা নিজের চোখে দেখেছিলাম। অতি সম্প্রতি এখানকার একটি মুদি দোকানেও 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া-সহ বিভিন্ন সংখ্যার পাতা ছিঁড়ে দ্রব্যাদি দিতে দেখে বিস্মিত হই। দোকানদারকে সেগুলি ফেরত দওয়ার অনুরোধ জানিয়েও ফল হয়নি।

আমরা ধরে নিতে পারি, 'উদ্বোধন'-এর সমস্ত গ্রাহকই শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী বা ভক্ত নন, সাধারণ মানুষও আছেন। কিন্তু সামান্য পয়সার বিনিময়ে এগুলি কি বিক্রি না করলেই নয়? পড়ার পর পুরনো কপিগুলি তো স্থানীয় লাইব্রেরিতেও দান করা যায়। বাড়িতে জায়গা থাকলে সেগুলি সংগ্রহ করে গুছিয়ে রাখাও কর্তব্য। বিক্রি করে দেওয়া, যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া কি উচিত?

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। 'উদ্বোধন' হলো ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাব ও বাণী-শরীর। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি পাতায় থাকে শ্রীভগবানের নামগুণগান, মহাপুরুষদের জীবনকথা, বেদ-উপনিষদ্-শাস্ত্রের কথা, বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, গবেষণা, সংবাদ, আলোকচিত্র ইত্যাদি। সুতরাং এটি একটি নিছক পত্রিকা নয়, এটিকে যত্ন করে পাঠ করা এবং রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিটি গ্রাহকেরই।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গাই, হুগলি-৭১২৬১১

দুই বাংলার লোকশিল্পচেতনা : শঙ্খশিল্প

শম্ভু মিত্র*
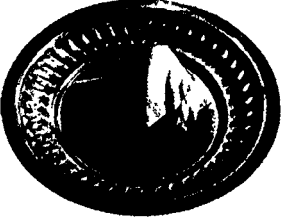
শঙ্খশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পুরাণ ও ইতিহাসে এর নানা উপাদান বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু স্থানে প্রায় দুহাজার বছর আগে শঙ্খশিল্পের প্রচলন ছিল। ওখানে শঙ্খশিল্পীদের 'পারোয়া' বলা হতো। সেসময়কার শঙ্খশিল্পের নানা নিদর্শন তামিলনাড়ুর প্রাচীন শহর কোরকাই ও কায়েলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে। কোরকাই প্রাচীন পাণ্ড্যিয়ান রাজ্যের উপরাজধানী ছিল। 'মাদুরাইক্কাকি' নামে একটি তামিল কবিতায় বলা হয়েছে, কোরকাই শহরে সৃষ্ট বিভিন্ন শঙ্খজাত দ্রব্য গ্রিক ও মিশরীয় ব্যবসায়ী মারফত ছড়িয়ে পড়ত সারা বিশ্বে। তামিল মহাকাব্য 'শিলাপ্পাতিকরম্' (খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত)-এও শঙ্খশিল্পের উল্লেখ আছে। শুধু তামিলনাড়ুর কোরকাইতেই নয়, একই সময়ে দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের নানা স্থানে শঙ্খশিল্প বিকাশলাভ করে। খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতকে মহীশূর, বেলারি, অনন্তপুর, কুড্ডাপা, কুর্নুল, হায়দরাবাদ, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প বিকশিত হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জেমস হরনেল মন্তব্য করেন, মালিক কাফুরের হাতে তিনেভেলি জেলার হিন্দু রাজ্যের পতনের পর শঙ্খশিল্পীরা ঢাকায় চলে আসেন। পর্তুগিজ গবেষক গার্সিয়া দা ওরটা ষোড়শ শতকেই জানান, বহু আগে থেকেই বাংলায় শঙ্খশিল্প একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় বাংলার নারীরা যে শাঁখা পরতেন তা দাক্ষিণাত্য থেকে আমদানি হতো বলে মনে হয় না; স্মরণাতীত কাল থেকেই ঢাকা এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। বোক্কারো নামক আরেক পর্যটকের অভিমতও তাই। প্রখ্যাত ফরাসি পর্যটক তাভার্ণিয়ে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শাঁখারিবাজারে এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করেছিলেন। জেমস টেলর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে লেখেন, ঢাকা শহরের পত্তনের সময়েই শাঁখারিরা ঢাকায় আসেন। জেমস ওয়াইজ মনে করেন, বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই (১১৬০-১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ) শাঁখারিরা ঢাকায় আসেন। হরনেলের চেয়ে ওয়াইজের মত বেশি গ্রহণযোগ্য, কেননা চোদ্দ শতকের অনেক আগে থেকেই বাংলায় শঙ্খশিল্পের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন মিলেছে। তাভার্ণিয়ে জানিয়েছেন, ঢাকা ছাড়া শ্রীহট্ট এবং পাবনাতেও শঙ্খশিল্প চালু ছিল। জেমস ওয়াইজ জানাচ্ছেন, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পূর্ববঙ্গের শঙ্খশিল্পীদের এক-তৃতীয়াংশ থাকতেন ঢাকায়, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকতেন বাখরগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে। উইলিয়ামসন ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে লেখেন, শঙ্খালঙ্কার বঙ্গনারীর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। ওয়াট জানিয়েছেন, ঢাকা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট ও রংপুর এই শিল্পের বিশেষ কেন্দ্ররূপে খ্যাতি পেয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, রংপুর; পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এবং কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলে শাঁখারিরা ব্যবসা করেন।

শঙ্খশিল্পের পৌরাণিক অনুষঙ্গও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবিষয়ে তিনটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। (১) কৃষ্ণ পঞ্চজন নামে এক অসুরকে বধ করতে উদ্যত হলে সে কৃষ্ণের করস্পর্শ চিরকাল পেতে চাইল। তাই বধের পর কৃষ্ণ অসুরের অস্থি দিয়ে নিজের শঙ্খ পাঞ্চজন্য সৃষ্টি করলেন। বধের পূর্বে কৃষ্ণ ঐ অসুরকে বলেছিলেন, সন্ধ্যায় যে-গৃহ নিয়মিত শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হবে, সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ চিরস্থায়ী হবেন; গঙ্গাজলের অভাব হলে শঙ্খবারিই তার পরিপূরক হবে। (২) দেবসভায় আনন্দানুষ্ঠানে শিব-পার্বতীর ডাক পড়ে। অন্য দেবীর গায়ে কত অলঙ্কার শোভা পাবে, অথচ দুর্গা হবেন নিরাভরণা। বিব্রত শিব বিশ্বকর্মার সাহায্য চাইলেন। বিশ্বকর্মা জানালেন, সিন্ধুতলের শঙ্খ ছাড়া অন্য সকল রত্নই অন্য দেবীরা পরে নিয়েছেন। আদেশ পেলে তিনি উৎকৃষ্ট শঙ্খালঙ্কার তৈরি করে দেবেন। শিব তাতেই রাজি। দুর্গার শঙ্খের উজ্জ্বল আলোয় অন্যদের ঝলমলে মণিমাণিক্য ম্লান হয়ে গেল। সেই থেকে বিবাহিতা হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হলো দুগাছি শাঁখা। (৩) পার্বতী শিবের কাছে একজোড়া শাঁখা চাইলে শিব তা দিতে সম্মত হলেন না। অভিমান করে দুর্গা পিত্রালয়ে চলে গেলেন। দুর্গা গৃহে ফিরছেন না দেখে চিন্তামগ্ন শিব শাঁখারির ছদ্মবেশে দুর্গার কাছে শাঁখা বিক্রয় করতে গেলেন। কিন্তু শাঁখা পরার সময় সব শাঁখাই ভেঙে যেতে লাগল। শাঁখারি শিব জানালেন, পতিভক্তির অভাব ঘটেছে, তাই এমনটি হচ্ছে। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দুর্গা শাঁখারিকে ভস্ম করতে চাইলেন। কিন্তু শাঁখারি ভস্ম হলেন না দেখে দুর্গা বুঝতে পারলেন যে, শাঁখারি ছদ্মবেশী শিব ছাড়া আর কেউ নন। এবার শিব দুর্গার হাতে শাঁখা পরিয়ে তাঁকে শিবালয়ে নিয়ে এলেন। তখন থেকে দাম্পত্যসুখের চিহ্নরূপে বিবাহিতা হিন্দুনারী শাঁখা পরে আসছে। এইসব পৌরাণিক কাহিনী বেশ কয়েক হাজার বছরের পুরনো। নানা প্রাচীন গ্রন্থেও এসবের উল্লেখ আছে। ইতিহাস, পুরাণ, প্রাচীন গ্রন্থ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার শঙ্খশিল্পের চল সুপ্রাচীন।

এবার উভয় বাংলার মুখ্য শঙ্খশিল্পকেন্দ্রগুলির কথা বলা যাক। ঢাকা শহরে দীর্ঘদিন ধরেই শঙ্খশিল্পের কেন্দ্র রয়েছে। শঙ্খশিল্প সম্পর্কে যাঁরাই গবেষণা করেছেন, তাঁরা সকলেই ঢাকাকে শঙ্খশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বুড়িগঙ্গা নদী

অধুনা প্রয়াত বিজ্ঞানী, দুর্গাপুরের 'Central Mechanical Engineering Research'-এ কর্মরত ছিলেন; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার উত্তরে প্রায় ৩৫০ গড় দীর্ঘ একটি গলিই ঢাকার শঙ্খশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরব বহন করছে। 'শাঁখারিবাজার' নামে খ্যাত এই গলিটি আগেও পরিচ্ছন্ন ছিল না, এখনো নয়। এখানকার পরিবেশ নোংরা। মোগল প্রশাসন ১৭ শতকে লাখেরাজ জমির প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রমপুর থেকে শাঁখারিদের ঢাকায় আনেন। বাড়ির প্রবেশপথ খুবই সঙ্কীর্ণ। অনুমান করা হয়, অত্যাচারী রাজা বা নবাব তথা বহিঃশত্রুর হাত থেকে সম্পদ ও নারীদের রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। একই কারণে গলির উভয় প্রান্তে বিশাল লৌহদরজা নির্মিত হয়েছিল; এখন সেই দরজা আর নেই। শাঁখারিবাজারে প্রায় দেড়শো বাড়ি আছে। একসময় শঙ্খালঙ্কার ছাড়া এখানে অন্য কিছু বিক্রি হতো না। কিন্তু ক্রেতাদের অনাগ্রহের কারণে শঙ্খালঙ্কারের দোকান কমে মাত্র কুড়িতে দাঁড়িয়েছে। ঔষধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান গজিয়েছে অনেক। শাঁখারিবাজারের গলি যেমন সরু ও নোংরা, বাড়ির ভিতরও তাই। বাড়ির ভিতরে দিনেও আলো জ্বেলে রাখতে হয়। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর। কাজের জায়গা অন্ধকার, নোংরা। চট্টগ্রামে ২ ঘর শাঁখারি (আগে ছিল ৮-১০ ঘর) আছে। এরা ঢাকা থেকে শঙ্খবলয় কিনে এখানে খুচরা বিক্রি করে। একজন শাঁখারি শঙ্খবলয় বিক্রির চেয়ে ঝিনুক বিক্রির দিকে বেশি ঝুঁকেছে। বর্তমানে স্বতন্ত্র জেলা (পূর্বে বরিশালের অন্তর্গত) ঝালকাঠির শঙ্খবণিকরা স্বতন্ত্রভাবে শঙ্খবলয় উৎপাদন ও বিক্রি করে। শহরের এক অতি সঙ্কীর্ণ গলিতে ঝালকাঠির শঙ্খশিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। এখানে ১২ ঘর শাঁখারির বাস। শ্রমিক সংখ্যা ৭০-এর কাছাকাছি। একসময় এখানকার শঙ্খালঙ্কার ভুটান ও মায়ানমারে রপ্তানি হতো। আজ এই শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরা সরাসরি শ্রীলঙ্কা থেকে শঙ্খ আমদানি করে। পূর্বতন বরিশাল জেলার অন্যান্য স্থানেও শাঁখারিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে (এদের সংখ্যা প্রায় ১০০; তার মধ্যে বাটাজোড়েই আছে ৪৫ ঘর)। খুলনাতে আছে ৮ ঘর, পটুয়াখালিতে ৩ ঘর, ভোলায় ২ ঘর। বাটাজোড়ের শঙ্খালঙ্কার একসময় সমগ্র বাংলায় খুব নাম করেছিল, কিন্তু বর্তমানে তার শঙ্খগৌরব অস্তমিত। এরাও শ্রীলঙ্কা থেকে শঙ্খ আনে। দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে শঙ্খশিল্পীদের দিন গুজরান হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্পীদের অবস্থাও তথৈবচ। শঙ্খের কারখানা আছে কলকাতার বাগবাজারের কাছে শাঁখারিপাড়া লেন, জোড়াসাঁকো এবং কেশব সেন স্ট্রিট এলাকায়। কলকাতার বাইরে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাতগ্রামে; বীরভূমের বড়াম, রামপুরহাট, সিউড়ি ও কড়িধ্যায়; বর্ধমানের ঘোড়ানাশ, বাঘনাপাড়া, পাটুলি ও কাটোয়ায়; হুগলির ধনেখালি, দশঘরা, চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরে; মুর্শিদাবাদের ডোমকলে; নদীয়ার রানাঘাট ও নবদ্বীপে; হাওড়ার বাঁটুলে; উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া ও বারাকপুরে শাঁখারিদের মোকাম। বাগবাজারের একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে শাঁখারিদের একটি কর্মস্থল লম্বায় ৬০-৭০ ফুট, চওড়ায় ৩-৩½ ফুট। রাস্তার একপাশে শঙ্খচূর্ণের পাহাড়। অপরপাশে কর্মীদের বাসস্থান। দিনের আলোর প্রবেশ প্রায় নিষেধ। শঙ্খ কাটা হয় শাঁখের করাত দিয়ে। কেউ কেউ বিদ্যুৎ-চালিত গোলাকার করাতও ব্যবহার করেন। একটি প্রমাণ সাইজের শঙ্খ থেকে ৫-৬টি শাঁখা, এমনকি ১০টিও (মেশিনের সাহায্যে) পাওয়া সম্ভব। মেশিনের কাজ তেমন সূক্ষ্ম হয় না। হাতে তৈরি শঙ্খবলয় মেশিনের তুলনায় বেশি টেকসই হয়। মোটা শঙ্খের প্রস্থ ২-২.৫ মি.মি., মাঝারি ০.৬-২ মি.মি., সরু ০.২-০.৫ মি.মি.।

শঙ্খশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো বিশেষ প্রজাতির শঙ্খ, যা মাদ্রাজ উপকূল ও শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়। শঙ্খবলয় বা অলঙ্কার তৈরির জন্য তিতপুটি, রামেশ্বরী, ঝাঁজি, দোয়ানি, মতি-ছালামত, পাটি, গারবেশি, কাচ্চাম্বর, ধলা, জাডকি, কেলাকর, জামাইপাটি, এলপাকারপাটি, নায়াখাদ, খগা, সুর্কিচোনা, তিতকৌড়ি, জাহাজি, গড়বাকি, সুরতি, দুয়ানাপাটি, আলাবিলা শঙ্খ লাগে। কারো মতে শ্রীলঙ্কার তিতকৌড়ি, কারো মতে সুরতি, দুয়ানাপাটি ও আলাবিলা শঙ্খই শঙ্খালঙ্কার নির্মাণে সর্বোৎকৃষ্ট। তিতকৌড়ি শঙ্খের ১৫০টির দাম প্রায় ১২-২৫ হাজার টাকা। বাংলাদেশের শঙ্খ ব্যবসায়ীরা শ্রীলঙ্কা থেকে শঙ্খ আমদানি করে। পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খচাহিদা মেটায় দক্ষিণ ভারত। শঙ্খশিল্পে শঙ্খ ছাড়াও প্রয়োজন শাঁখের করাত। বলয়গুলিকে অলঙ্কৃত করার জন্য তেপায়া টুল, হাতুড়ি, নরুন, কুরা, বিলুনি, একধারা, উকো ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এছাড়া কাজের জন্য লাগে বাঁশের খুঁটি (১৫ ইঞ্চি লম্বা খুঁটির ৮ ইঞ্চি মাটির নিচে এবং ৭ ইঞ্চি মাটির ওপরে থাকে), কাঠের পিঠলা (পিঠ ঠেকিয়ে কাজের সুবিধার জন্য), কাঠের চাকাই, কুরা, ১৪ গিরা টাট-চট, তেলের বাটি, ন্যাকড়া এবং শঙ্খচূর্ণ (নারকেল তেল ও শঙ্খচূর্ণের মিশ্রণ বলয় অলঙ্করণের বিশেষ কাজে লাগে)। শাঁখারিরা দেহের সামনে পাটের টাট পরে নেন। সলই কাঠের গোলদণ্ডে বালি, চাঁচ, ধূপ ও সরষের তেলের মিশ্রণে একপ্রকার খসখসে জমাট বস্তু লাগানো থাকে, যা দুপ্রান্ত থেকে ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়। এই দণ্ডে শাঁখার ভিতরের অংশ ঘষা হয়। এর নাম 'কোলঘষা'। বলয়গুলিকে মসৃণ করার জন্য নানাধরনের রেত বা উকো ব্যবহৃত হয়। যেমন—চারফালি রেত, গোলাকার রেত, মাগুরপিঠা (হাফ রাউণ্ড), তেফলি রেত ইত্যাদি। বুলির (ইস্পাতের সরু বাটালির মতো দেখতে) কলমকাটা (অগ্রভাগের নাম) দিয়ে শাঁখার ওপর খোদাই করে নকশা তৈরি হয়। দেরাল (ড্রিল) দিয়ে শাঁখায় ফুটো করা হয়। বলয় ঝুলিয়ে রেখে কাজ করার জন্য বাঁশের চাঁচ দিয়ে তৈরি ইংরেজি 'A' অক্ষরাকৃতি বাড়ি ব্যবহৃত হয়।

শঙ্খসংগ্রহের পর সমুদ্রশঙ্খের ওপরে এক ধরনের কালো আবরণ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিমাণমতো জল মিশিয়ে যে-দ্রবণ তৈরি হয়, তা দিয়ে নোংরা আবরণ মুছে ঝকঝকে ভাব আনা হয়। এর পরের কাজ হলো কুরা দিয়ে শঙ্খের বাড়তি অংশ ভাঙা। এর নাম 'সংকাটা' বা 'পোনাকাটা'। কুরা হলো হাতললাগানো লোহার হাতুড়ি। এর দুটি ভাগ—চোখাকুরা ও খেতাকুরা। মুখ সুচালো কুরার নাম চোখাকুরা, মুখ ভোঁতা কুরার নাম খেতাকুরা। কুরা দিয়ে পিটিয়ে গ্যারা (শঙ্খের বাড়তি অংশ) ভেঙে ফেলা হয়। এরপর শাঁখের করাত বা বিদ্যুৎ-চালিত গোলাকার করাত দিয়ে শঙ্খের মুখের অংশ ফেলে দেওয়া হয়। এর নাম 'মাঝার দেওয়া'। এরপর ঝাপানির মাধ্যমে শঙ্খের কাটা অংশ পাটায় ঘষে চ্যাপটা করা হয়

এবং করাত দিয়ে শাঁখা কেটে বের করা হয়। কাটার সময় জলের ধারা চলতে থাকে। ফলে শাঁখা গুঁড়িয়ে যায় না। শাঁখা কাটার পর ভিতর ও বাইরে মসৃণ করা হয় যথাক্রমে সলই কাঠের দণ্ড ও পাথর দিয়ে ঘষে। এরপর বাটালির কলমকাটা অংশে দিয়ে ফুল, লতা, ধানের শিষ, মাছ, পাখি ইত্যাদি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে। নকশা করার পর মোম, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং জিঙ্ক পাউডারের দ্রবণের সাহায্যে শাঁখাকে সূক্ষ্মভাবে মসৃণ করা হয়। একই দ্রবণ দিয়ে ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশও ভরাট করা হয়। আগুনের সাহায্যে শাঁখার ওপরের অংশে কিছুটা লাল করা হয়। এর নাম 'মালামতী'।

মজার ব্যাপার হলো, সোনা-রুপার নকশার নানা ক্যাটালগ আছে, শঙ্খের কোন ক্যাটালগ নেই। শিল্পী 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রচনা করেন নন্দিত শিল্পসুষমা। তবে পূর্বের মতো অলঙ্করণে তেমন যত্ন দেখা যায় না। যত্ন মানেই সময়ব্যয়, সময়ব্যয়ের অর্থ শাঁখার দাম বাড়া। ক্রেতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো অল্প দামে শাঁখা কেনা। মূল্যের কথা ভেবেই শিল্পীরা অলঙ্করণে তেমন দৃষ্টি দেন না। অবশ্য একথাও ঠিক, চাহিদার অনুপস্থিতিতে শিল্পীরা সৃষ্টিশীল কারুকর্মের দক্ষতাও হারিয়েছে।

শঙ্খ দিয়ে নানা দ্রব্য তৈরি হয়। হাতের শাঁখা ছাড়াও কানের টপ, খোঁপার কাঁটা, চুলের ক্লিপ, শঙ্খমালা, ঘড়ির চেন, আঙটি, বোতাম, ব্রাস, চুড়ি, ব্রেসলেট ইত্যাদি অলঙ্কারও তৈরি হয়। আতরদানি, ফুলদানি, অ্যাসট্রে, পেপারওয়েট, সেফটিপিনও তৈরি করা হয়। পূজায় জলশঙ্খে গঙ্গাজল রাখা হয়। অন্যধরনের শঙ্খ অর্থাৎ বাদ্যশঙ্খে ফুঁ দিয়ে অশুভ শক্তিকে দূর করা হয়। বাদ্যশঙ্খ শুধু বাংলায় নয়, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে এর মহাসমাদর। যুগভেদে হাতের শাঁখার নানা নাম পাওয়া যায়। আদিযুগে এর নাম ছিল 'গাড়া'। মধ্যযুগে নাম ছিল 'সাতকানা', 'পাঁচদানা', 'তিনদানা', 'সাদাবালা' ইত্যাদি। বর্তমান কালে শাঁখার নাম অজস্র। যেমন—সোনাবাঁধানো, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, সতীলক্ষ্মী, দানাদার, সাদা শাঁখা, শঙ্খবালা, ইংলিশ প্যাঁচ, ভেড়া শঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা, লতাবালা, ধানছড়ি, হাসিখুশি, দার্জিলিং, জয়শঙ্খ, গোলাপফুল, মাজ, আঙুরপাতা, বেণী, উপবেণী, গোলাপবালা ইত্যাদি।

আগে ঢাকা থেকে ভারতের সর্বত্র শঙ্খবলয় যেত। দেশভাগের পর হিন্দুরা অনেকেই দেশান্তরি হয়েছেন। ফলে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র শঙ্খশিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তবে উভয় বঙ্গেই শঙ্খশিল্প রীতিমতো ধুঁকছে। তার অন্যতম কারণ—হিন্দু আধুনিক সধবাদের মধ্যে অনেকেই শাঁখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিল যখন হিন্দু মহিলারা তো বটেই, মুসলিম মহিলারাও অলঙ্কার হিসাবে শাঁখা পরত। বিয়ের সময় মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে মুসলিমরাও শাঁখা ও সিঁদুর পরত। ঢাকার এক শাঁখারি পাকিস্তান আমলে বছরে একশো জোড়া শাঁখা বিক্রি করেছে মুসলিম রমণীর কাছে। এখন হিন্দুদের মধ্যেই শাঁখা পরার চল ক্রমহ্রাসমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম রমণীরা যে শাঁখা পরায় আগ্রহ দেখাবে না, এটাই তো স্বাভাবিক।

সংস্কৃত তথা নানা ভারতীয় সাহিত্যে শঙ্খশিল্প পবিত্রতার প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়েছে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর কথা সকলেই জানেন। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ-সহ বহু বীরের শঙ্খধ্বনির মধ্যে মহাভারতের যুদ্ধ সূচিত হয়েছিল। তামিল মহাকাব্যদ্বয় 'মাদুরাইক্কাঞ্চী' এবং 'শিলাপ্পাধিকরণ'-এ শঙ্খশিল্পের উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে লভ্য। চৌদ্দ শতকে বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যে লিখেছেন: "শঙ্খ কর চুর বসন করহ দূর তোড়ই গজমতি হার রে।" শঙ্খবিষয়ক সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় 'গোপীচাঁদের গান' গ্রন্থে। এটি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শঙ্খপ্রীতির নিদর্শন। চণ্ডীদাস লিখেছেন: "চার ছেইলার মাও হৈলাম তোর দ্যাবের ঘরে।/ দয়া করি চারখানা শাঁখা নাই পিন্ধাইস মোরে।/ শিব বলে, শুন চণ্ডী, দক্ষ রাজার বেটি।/ শাঁখা দিবার না পাইম আমি, ডাক বাপের বাড়ি।" অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি রচিত কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ শিবের কাছে শাঁখার জন্য দুর্গার আবেদন, শিবের শাঁখারি বেশধারণ, অবশেষে দুর্গাকে শঙ্খ পরানোর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'-এ দেবসভায় নাচের সময় বেহুলা যেসব অলঙ্কার পরেছিলেন, তার মধ্যে 'দ্বিভুজে সরল শঙ্খ'ও ছিল। চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর ছয় বধূ 'শঙ্খ ভাঙি অলঙ্কার ফেলাইল দূরে।' শ্রীরায়বিনোদের 'পদ্মপুরাণ'-এও শঙ্খের উল্লেখ আছে: "রতনকঙ্কন সঙ্গে শঙ্খ পরিল রঙ্গে/ হেমমণি তুঙ্গুরী বিরাজে।" 'মনসামঙ্গলকাব্য'-এ অস্ত্ররূপে শঙ্খের উল্লেখ আছে। প্রতি সন্ধ্যায় হিন্দুগৃহে তিনবার শঙ্খধ্বনি করা হয় মঙ্গলের সূচক হিসাবে। পূজায় শঙ্খধ্বনি অপরিহার্য। শঙ্খধ্বনি উদ্দীপনা সঙ্গীত হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শঙ্খ' কবিতায় শঙ্খ কল্যাণ ও বরাভয়ের প্রতীক তথা সর্বশক্তির একীভূত আধার। বুদ্ধদেব বসু 'শঙ্খ' কবিতায় চেয়েছেন অন্যায়, দৈন্য বিদূরিত হোক—"মন্দ্রিত হোক, স্পন্দিত হোক, নন্দিত হোক শঙ্খ।" জীবনানন্দ দাশ শঙ্খের মধ্যে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের চিত্র খুঁজে পেয়েছেন। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দাঙ্গাদুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বিভক্ত বাংলার হতাশার ছবি আঁকতে গিয়ে অতীতচারণায় কবি উদ্বেল হয়ে বলেছেন: "নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক/ এপাড়ার বড় মেজো—ওপাড়ার দুলে বোয়েদের/ ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত।" এমন উদাহরণ অজস্র দেখা যায়। বরিশালে প্রচলিত ছড়ায় আছে: "শঙ্খ পরিতে গৌরাইর মনে বড় সাধ/ করজোড়ে কন শিবের সাক্ষাৎ/ কুচলীনগরে আছে তোমার বাপভাই/ সেইখানে যাইয়া পর শঙ্খ, আমার কিছু নাই।" শেষে শিব নারদকে বলেন: "শঙ্খবণিক হইয়া গৌরাইর মন বুঝিতে যাও।" উত্তরবঙ্গের একটি ছড়ায় দুর্গা শিবকে বলছেন: "দশ হাতে দশজুট শাঙ্খা, কানে মদন কড়ি/ শাঙ্খা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ি।"

মনে রাখতে হবে, "ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কখনোই আধুনিক হওয়া যায় না।"—বলেছেন টি. এস. এলিয়ট। শঙ্খশিল্প দুই বাংলা তথা ভারতের প্রাচীন লোক-ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকার ও আমজনতার। শঙ্খশিল্পীরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, শঙ্খশিল্প ধ্বংসোন্মুখ। শঙ্খশিল্প কখনোই আধুনিকতার পরিপন্থী নয়। যেকোন মূল্যেই এই লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। ❑

দুঃখ-তাপহারিণী মায়ের কথা

মারুফী খান

বাংলাদেশে শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্যবৃন্দ ও তাঁদের স্মৃতিমালা ● সম্পাদক : স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ ● প্রকাশক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩ ● মূল্য : ১৫০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৪+৫৫৬ ● প্রকাশকাল : মে ২০০৪

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা সে যে অমৃত-সমান,/ যে শোনে সে ভাগ্যবান।" বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা যে প্রবলবেগে মানুষের চিত্তকে আলোড়িত করে চলেছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখন শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী "যত মত তত পথ" বাণীর সঙ্গে পরিচিত।

বাংলাদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদবৃন্দকে নিয়ে কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ'। গ্রন্থপ্রণেতা স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ। গ্রন্থটি শুধু সুখপাঠ্যই হয়নি, তত্ত্ব ও তথ্যে হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছে।

স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ দ্বিতীয় যে-কাজটি করে আমাদের দীর্ঘদিনের অতৃপ্তিকে শান্তিময় তৃপ্তিদান করেছেন, সেটি হলো **'বাংলাদেশে শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্যবৃন্দ ও তাঁদের স্মৃতিমালা'**। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর উদ্বোধন কার্যালয় থেকে গত ২৩ মে ২০০৪ পুনরায় প্রকাশিত হয়। ফলে দুই বাংলা শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বাঙালির গৃহই আলোকিত হয়ে উঠবে এমন একটি গ্রন্থের উপস্থিতিতে।

গ্রন্থটি হাতে আসতেই পড়া শুরু করি, কিন্তু পড়া এগোতে পারে না। কারণ, একে তো মায়ের কথা, তার ওপর বাংলাদেশের লোকজনের মুখে বলে যাওয়া স্মৃতিকথা। অনুভব করি দুগাল বেয়ে শুধুই জলের ধারা। এত করুণা, এত দয়া নিয়ে মা এসেছিলেন জগতে? আর তাঁরা কত ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী, যাঁরা তাঁর পাদস্পর্শ করে একটু কাছে যাওয়ার কিংবা থাকার মহা সুযোগ পেয়েছিলেন।

"ভক্তি করে ডাক, সকলকেই পাবে। আমি বলছি, তোমরা ধন্য যে এমন সময় জন্মেছ। তাঁর লীলাখেলা দেখার সময় এখন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখলে সবই সহজ।" (পৃঃ ২৬২)—এই বক্তব্যে কয়েকটি শব্দের ওপর চোখ আটকে যায়। 'সকলকেই', 'আমি বলছি'—দুটি শব্দের মধ্যেই এক আশ্চর্য শক্তি, দৃঢ়তা যেন লুকিয়ে আছে। যাকে বলছেন তার বুঝতে অসুবিধা নেই যে, যিনি বলছেন তিনি সত্যকথাই বলছেন।

" 'ও কী কচ্চ?' আমি বললাম, 'আমার এঁটো বাসন ধুয়ে নিয়ে আসি।' মা বললেন, 'না, আমিই নেব।' আমি বললাম, 'তা কি হয়? আপনি নিলে আমার অকল্যাণ হবে।' তখন মা বললেন, 'দেখ, মার কোলে ছেলে কত হাগে মুতে, আমি তোমার কী করতে পেরেছি বাছা?' " (পৃঃ ১৯৪)—কী অকুণ্ঠ ভালবাসায় ভক্ত সন্তানের সঙ্গে মায়ের কথোপকথন। সৃষ্টির প্রতি কতটা দয়া, প্রেম থাকলে একজন হঠাৎ একথা বলতে পারেন! শ্রীশ্রীমা হলেন সেই অমৃতভাণ্ড, যে-ভাণ্ড কখনো নিঃশেষ হয় না, এ শুধু উপচেই পড়ে!

এই গ্রন্থে বিভিন্ন পর্যায়ে স্মৃতিচারণগুলি পরিবেশন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৮ জন ত্যাগী সন্তানের স্মৃতিচারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৩ জন গৃহী (পুরুষ) ভক্তের স্মৃতিচারণ, তৃতীয় পর্যায়ে ১৫ জন গৃহী (মহিলা) ভক্তের স্মৃতিচারণ, চতুর্থ পর্যায়ে বাংলাদেশের ১০ জন সন্তানকে লিখিত মায়ের পত্রাবলী এবং পঞ্চম পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়। এছাড়া 'পরিশিষ্ট' অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে ২২টি ছোট ছোট মাতৃস্মৃতি। সবটুকু পড়ে মনে হয়, এই মাকে ধরে রেখেই সংসারী কিংবা সন্ন্যাসী, ভাল কিংবা মন্দ—যেই হোন না কেন, এক অপার স্নেহময়ীর বরাভয় লাভ করে জগতে বাস করছে।

" 'তোমার ধর্মপত্নী, ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সংসার কর।' তারপর স্ত্রীকে বললেন, 'দেখ মা, স্ত্রীর কাছে স্বামী সকলের চেয়ে বড়, তুমি তার সেবা করো।' পুনরায় আমাকে বললেন, 'ও যদি তোমার কাছে কোন দোষ করে, তুমি নিজে তার বিচার না করে আমাকে জানাবে।' " (পৃঃ ২৬৯) কী সুন্দর কথা! এ যেন সংসারকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা! এখানেই মন মধুর সুরে বলে ওঠে—"আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" বিশ্বজুড়ে মায়ের কোল পাতা।

পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ৫৫৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনা করা সহজ কাজ নয়। তবে নিশ্চিত বলা যায়, গ্রন্থটি আমাদের পাঠ করা জরুরি। কেন? আমাদের শোক-তাপজর্জরিত দেহ-মন যখন হালহীন ভাঙা নৌকার মতো ভেসে চলে, তখন যদি এই গ্রন্থটি পাঠ করা যায়, তাহলে জীবননৌকায় শুধু হালই ফিরে আসে না, একইসঙ্গে পালেও লাগে হাওয়া। জীবন মিথ্যা নয়, জীবন অবহেলার বস্তু নয়, আবার সংসার-সমুদ্রে ডুবে তলিয়ে যাওয়াও নয়। মায়ের জীবন কত ক্ষুদ্র বাক্যে, অপরূপ বাণীবন্ধনে জানায়—এই পৃথিবী, জীবন, সংসার সবই তাঁর মহালীলা।

" 'মা তোর স্বামী নেই?' আশৈশব সকলের আদরে পালিত হয়েছি, তথাপি আমার মনে হয়েছিল, অমন স্নেহমাখা কথা কখনো শুনিনি।... মা আস্তে আস্তে বললেন, 'অত নিরাশ কেন মা? তুমি তো তুচ্ছ নও।' " (পৃঃ ৪১৩)—কী অকরুণ ভরসায় সন্তানকে মা জানিয়ে দিচ্ছেন: "তুমি তো তুচ্ছ নও।" এখানে মা দুঃখী নারীর জীবনে হাল জুড়ে দিচ্ছেন। আর নারী তাঁর পাদস্পর্শ করে হৃদয়ে শুনতে পাচ্ছে মহাসমুদ্রের কল্লোলধ্বনি। এখানেই মা অনন্যা, অতুলনীয়া।

গ্রন্থটি পাঠকদের নিঃসন্দেহে আশা পূর্ণ করবে। মাকে আমরা যারা চাক্ষুষ দেখিনি, তারা এই গ্রন্থে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব মায়ের শাড়ির আঁচল। আমাদের দুচোখের জলে ভিজিয়ে দিতে চাইব মায়ের নরম পা-দুখানি! আর এই গ্রন্থ পড়তে পড়তে সকলেই অনুভব করবেন, কত সহজে শুধু বিশ্বাস এবং ভালবাসায় স্থান পাওয়া যায় মায়ের ভাবনায়, মায়ের কথায়। তখন মনে হয় জীবন তো তুচ্ছ নয়, বেঁচে থাকা তো নিরর্থক নয়।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন দার্শনিক, বাগ্মী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রচ্ছদ মনোগ্রাহী। মূল্যও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। এমন একটি উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদনের জন্য স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শেষ করি এক বিদেশি সাধুর কথায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "আপনি কেন জয়রামবাটী এসেছেন?" সহাস্যে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: "আমার ব্যাটারি চার্জ দিয়ে নিতে।" মহামূল্য কথা! তাই আমরাও মায়ের কথা জানতে চাই, বুঝতে চেষ্টা করি অন্তত ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাটারি চার্জ করতে। আমরা ধন্য হব, মুক্ত হব। পুণ্যের ছোঁয়ায় পুণ্য এবং পূর্ণ হব।❑

ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল রূপরেখা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ● ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী ● প্রকাশক : নিতাইচন্দ্র ভক্ত, প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯ ● মূল্য : ৭৫ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+২৪০ ● প্রকাশকাল : জুলাই ২০০২ (২য় সং)

সনাতন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারত চিরদিনই উদার, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ভারতীয় জনমানসে আশ্রয় নেয়নি এবং ভারতবাসী কোনদিনই স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনস্ক ব্যক্তিকে সম্মানের আসন প্রদান করেনি। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ভারতবাসীর প্রার্থনা হলো : "সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ"— সকলেই সুখী হোক, সকলেই নীরোগ হোক। তর্পণের মন্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, দেবতা যক্ষ থেকে আরম্ভ করে ক্রুর সর্প পর্যন্ত সকলকেই আপ্যায়িত করা হয়েছে। "নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে, তেষামাপ্যায়নায়েতদ্দীয়তে সলিলং ময়া"— যেসকল জীব নিরাহার এবং যারা পাপধর্মে রত আছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য আমি জলদান করছি—এটি সনাতন হিন্দুধর্মের তর্পণমন্ত্র। শুধু সাধারণভাবে সমগ্র জগতের তৃপ্তি কামনা করেই সাধক তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করেন না, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমগ্র জগতের তৃপ্তি তিনি প্রার্থনা করেন। এই উদার দৃষ্টিই ভারতবাসীর বিশিষ্ট স্বরূপ। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বর্ণবিভাগ, আশ্রমবিভাগ প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দুর বুদ্ধি যেমন গভীর, তেমনই উদার। মহাভারতে বহু শ্লোকে দেখা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত এমন সব ব্যবস্থার আভাস রয়েছে যা বর্তমান যুগের অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবস্থা থেকে কোন অংশে কম নয়। তবে আজকাল অনেকেই বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র নিপুণভাবে চর্চা না করে এবং ঐসকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম না জেনে বেদোক্ত ধর্মব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার নিন্দা করেন—এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। শাস্ত্রকারগণ ছিলেন উদারতার আদর্শ; অথচ কালপ্রভাবে তাঁদেরকেই কূপমণ্ডূক ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাই এই মুহূর্তে প্রতিটি শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্তব্য হলো শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত হয়ে শাস্ত্রনিন্দা এবং শাস্ত্রের কুব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করা।

কর্মকাণ্ডে বেদান্তধর্মের বিশাল ও বিরাট ব্যবস্থা আমাদের যেমন স্তম্ভিত করে দেয়, ভক্তিমার্গে তার ভাববৈচিত্র্য আমাদের যেমন উদ্ভাসিত করে তোলে, জ্ঞানমার্গের উচ্চতম শিখরে তার অনুভবের পরাকাষ্ঠার গর্বে তেমনি আমাদের মস্তক উন্নত হয়ে ওঠে। অনুভূতির কোন্ গভীরতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করলে পরমতত্ত্বকে সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, অনন্তর, অবাহ্য বলে বর্ণনা করা যায় : "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই সেই ব্রহ্ম; সেই পরমতত্ত্ব বলে প্রকাশ করে যায় : "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। নিঃসন্দেহে এটাই অনুভবের উচ্চতম ভূমি, এটাই পরাগতি। অনুভূতির এই সর্বোচ্চ ভূমি ভারতভূমির পূতচরিত্র ঋষিবৃন্দের 'সাক্ষাৎ পরোক্ষ বস্তু'। হিন্দুর সর্ববিষয়ে নৈপুণ্য থাকলেও সাধনশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্রেই বিশেষ অধিকার। অবশ্য অনেকেই অধিকারভেদবাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে না পেরে বেদান্তধর্মের ওপর দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অধিকারভেদবাদই হিন্দুর সাধনশাস্ত্রের মধ্যমণি। যেটি আমাদের গৌরবের বিষয়, আমরা তাকেই দুর্ভাগ্যক্রমে নিন্দা ও কলঙ্কের বস্তু মনে করে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকি।

পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনুভবই হলো পরম পুরুষার্থ। এই অনুভব, এই সাক্ষাৎকার লাভ করার জন্যই সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনা। এই বিশাল দৃষ্টির ফলে হিন্দুরা এক মহাসমন্বয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এতে কোন বিরোধের স্থান নেই। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দের মতে, হিন্দুরা এই বিশালদৃষ্টিপূত সমন্বয় দ্বারা জগতে এক স্বর্গীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণ এই সমন্বয়দৃষ্টির সার্থকতা এবং গভীরতা অধিকাংশ সময়ে উপলব্ধি করতে সমর্থ না হলেও একথা সত্য যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শন সর্বদাই মহাসমন্বয়ের, পরম অবিরোধের মহামন্ত্র উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

'ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার' গ্রন্থে সারস্বতরত্ন ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সর্বসমেত ২০টি প্রবন্ধের মাধ্যমে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এই মূল সূত্রটিকে ব্রাত্য ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এই জ্ঞানতাপসের বিচরণভূমি সত্যই ব্যাপক। ভারতের বর্তমান সাংস্কৃতিক সঙ্কট থেকে তিনি যে-আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তার শেষ পর্বে সমন্বয়ের মহানায়ক আচার্য শঙ্করের চারটি মহাবাক্যের ('তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি') মাধ্যমে গ্রন্থটির সমাপ্তি করেছেন।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আজ ভারতবর্ষ যে সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী যে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন, সেবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতার বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। বিদেশি মনীষীরা ভারতীয়দের ধর্মধৃত সংযত জীবনের জয়গান করে গেলেও আত্মবিস্মৃত ভারতীয়রা সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মতবাদকে আশ্রয় করে নিছক ভোগসুখকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করছেন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, স্বার্থপরের সঞ্চিত বস্তু সত্যই তার নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধের শেষে মনুসংহিতার বাণী উদ্ধৃত করে যে-সাবধানবাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন, সেটি বিশ্লেষণ করলে আজ 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে অমূলক স্পর্শকাতরতা, অযৌক্তিক বিদ্বেষ, অমূলক অনীহা, অজ্ঞতা এবং আত্মবিস্মৃতি-পরায়ণতাকেই সূচিত করে।

গ্রন্থকারের আলোচিত অধ্যায়গুলির মধ্যে 'মৈত্রী সাধনায় হিন্দু সংস্কৃতি', 'মহাগ্রন্থ মহাভারত', 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরস্বতী' ও 'বর্ষাবন্দনা—ঋগ্বেদ হতে রবীন্দ্রনাথ' পাঠকচিত্তে সাড়া জাগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থটি লেখকের একাধিক প্রবন্ধের সঙ্কলন বলে কোন কোন প্রবন্ধ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সর্বশেষে এই সংস্কৃতজ্ঞ সারস্বত সাধকের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায়, ভেদের সঙ্গে অভেদের এই যে সমন্বয়, তাত্ত্বিক অভেদমূলক এই যে অনন্ত প্রাতিভাসিক ভেদ—এটি বেদান্ত ধর্ম, শাস্ত্র এবং দর্শনের এক অভিনব অনুভূতি। জগতে হিন্দুর এটি এক অমূল্য দান। তাই বিদগ্ধমহলে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠ ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবে হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এদিন প্রায় ৩০,৫০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটি শুরু হতে চলেছে ঃ ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষকে **'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'** নামে একটি ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন অ্যাক্টের অধীনে) স্থাপন করার অনুমতি দিয়েছেন। এই ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কেন্দ্র হবে বেলুড় মঠে। বর্তমানে কোয়েম্বাটুরে রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিবন্ধীদের জন্য যে আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (IHRDC)-টি রয়েছে, সেটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়ন, মূল্যবোধ শিক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা (ডিজাসস্টার ম্যানেজমেন্ট) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এর আওতায় আসবে। স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে প্রস্তাবিত গবেষণাকেন্দ্রও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে এটিই হবে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং ৭-১০ জানুয়ারি ২০০৫ বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ৭ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা প্রভৃতি সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ (অখণ্ড)' গ্রন্থটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। রাত্রে যথারীতি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৭-১০ তারিখের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী রমানন্দজী, স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা ঃ গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ আশ্রমের 'সারদা ভবন'-এ সারাদিনব্যাপী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০ যুবপ্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী রাজীবানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী পররূপানন্দজী প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর-পর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, কলকাতা ঃ গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথিতে প্রস্তাবিত ছয়তলা বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পূজ্যপাদ মহারাজজী আশীর্বাণী প্রদান করেন এবং ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র।

রামকৃষ্ণ মঠ, শিকড়া-কুলীনগ্রাম ঃ গত ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ও 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পাঠ ও আলোচনা, বাউলগান, নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। ৮ তারিখ গল্প বলা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রায় ২,৭০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী যোগস্বরূপানন্দজী। তিনদিনের আলোচনাসভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীতরাগানন্দজী। ১০ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের তিথিপূজার দিন দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

ত্রাণ
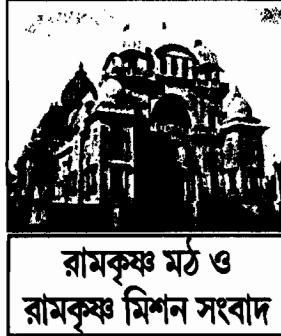
ঝঞ্ঝাত্রাণ ও পুনর্বাসন

রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত ২৯টি পরিবারের জন্য 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' প্রকল্পে ঘর তৈরির পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সুনামি ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারত মহাসাগরে উৎপন্ন সুনামির বিধ্বংসী তাণ্ডবের দিন থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক ত্রাণকার্য শুরু করেছে চেন্নাই ও মাদুরাই (তামিলনাড়ু), কালাডি (কেরালা), পোর্ট ব্লেয়ার (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ) এবং কলম্বো (শ্রীলঙ্কা) কেন্দ্রের মাধ্যমে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রধানত নিম্নলিখিত ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঃ

তামিলনাড়ুতে চেন্নাই মঠ ও মাদুরাই মঠ কর্তৃক চিঙ্গলপট্টু, পাঝাভেরকাড়ু, রয়াপুরম, শ্রীনিবাসপুরম, নাগপট্টিনম, কোলাচেল, নাগেরকয়েল, কুড্ডালোর, কাঞ্চিপুরম, ভিল্লিপুরম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ১২,০০০ পরিবার ও ৬০,০০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে রান্নাকরা খাবার এবং প্রায় ২৫,০০০ কেজি চাল, ১,৬০০ কেজি ডাল, ১,৫০০ কেজি শাকসবজি, ৪০,০০০ কেজি মশলাপাতি, ৬,০০০ প্যাকেট বিস্কুট, ৬৫০ প্যাকেট কলা, পাঁউরুটি ও দুধ, ৫৭,০০০ জামাকাপড় (ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি), ১৮,০০০ বিছানার

চাদর, ১৭,০০০ মাদুর, ১৯,০০০ সেট বাসনপত্র, ৪,০০০ কম্বল, ২,০০০ পানীয় জলের প্যাকেট, ৮,৫০০ প্লাস্টিকের জলপাত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কেরোসিন, স্টোভ, ওষুধপত্র, ত্রিপল ইত্যাদি

মৎস্যজীবীদের নৌকার মালিকানার দলিল হস্তান্তর করছেন সাধারণ সম্পাদক মহারাজ

বিতরণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পুনর্বাসন কার্যের অঙ্গরূপে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ চেন্নাই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৩৩টি নৌকা ও মাছধরার জাল বিতরণ করেন। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুতে পুনর্বাসন
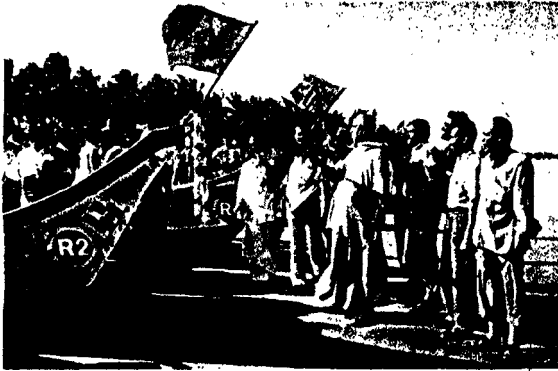
মৎস্যজীবীদের হাতে নৌকা ও মাছধরার জাল তুলে দেওয়ার পর জলে নামার সঙ্কেত দিচ্ছেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ

কার্য বাবদ মিশনের মোট ব্যয় ১০ কোটি টাকারও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ার কেন্দ্র কর্তৃক পোর্ট ব্লেয়ার ও তৎসংলগ্ন ৪৪টি স্থান, হাট-বে, হাড়ু, নীল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ৪০,৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে রান্নাকরা খাবার এবং প্রায় ৬,৫০০ কেজি চাল, ২,০০০ কেজি ডাল, ৯,৪০০ কেজি চিড়া, ১,০০০ কেজি আটা, ৩২০ কেজি মুড়ি, ১,৯০০ কেজি চিনি, ১,৮০০ কেজি গুড়, ১,৪০০ কেজি লবণ, ২,২০০ কেজি গুঁড়ো দুধ, ৩০০ কেজি আলু, ১০ কেজি পিঁয়াজ, ১,২০০ কেজি বিস্কুট, ৯,৩০০ কেজি শিশুখাদ্য, ১,৪০০ কেজি সরষের তেল, ৩,৫০০ বোতল পানীয় জল, ১,১০০ সেট ও ১,২০০ বাসনপত্র, ৩৮,০০০ জামাকাপড় (ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, তোয়ালে এবং মহিলা ও শিশুদের পোশাক), ৩,১৫০টি কম্বল, ৯,৯০০ প্যাকেট মশা মারার ধূপ, ৪,০০০ বিছানার চাদর, ৫১,০০০ জলপরিশোধক ট্যাবলেট, ১,০০০ লণ্ঠন, ৭০০ প্যাকেট ORS লবণ এবং ১,১০০ মশারি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপল, মোমবাতি, ব্লিচিং পাউডার, ওষুধ, রিফাইণ্ড অয়েল, গ্লুকোজ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে পুনর্বাসন কার্যের অঙ্গরূপে অনাথ হয়ে যাওয়া বেশ কিছু শিশুর ভার নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপাতত তাদের মিশনের ছাত্রাবাসগুলিতে রাখা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত অনাথ আশ্রমটির ব্যাপক মেরামতের কাজ শুরু করা হচ্ছে, যেটি এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জনসাধারণের অনুদানের ওপর নির্ভর করে আছে।

কেরালাতে কালাডি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩৫টি পরিবারকে ১৩৫ কেজি ডাল, ৩,৮১৬টি বাসন, ৩৩৫টি প্লাস্টিকের জলপাত্র ও ২৭১টি বিছানার চাদর দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে পুনর্বাসন কার্যের অঙ্গরূপে ১০০ পরিবারকে নতুন নৌকা ও মাছধরার জাল, যন্ত্রসামগ্রী এবং পুরনো নৌকা সারানো বাবদ অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসন কার্যের মোট অর্থমূল্য ৩,৬৮,২০০ টাকা।

শ্রীলঙ্কায় কলম্বো ও বাট্টিকালোয়া কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৮টি শিবিরে প্রায় ১,৫৮,০০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে ৩২,২৭৫ প্যাকেট রান্নাকরা খাবার এবং প্রায় ২৫,৮০০ কেজি চাল, ৮,৪০০ কেজি ডাল, ৩,৮০০ কেজি আটা, ৩৭০ কেজি আলু-পিঁয়াজ, ৫৪৪ কেজি শাকসবজি, ২,৮২৬ কেজি গুঁড়ো দুধ, ৭,৭০০ কেজি চিনি, ১,৬১৮ কেজি বাসনপত্র, ১২,১২৫টি জামাকাপড়, ১,৬২১টি বিছানার চাদর, ৪,৫৩০ সেট প্লাস্টিকের পাত্র, ১৩,০৩১টি পানীয় জলের বোতল এবং ওষুধ (প্রায় ৫০,০০০ টাকার)। এছাড়াও লবণ, বিস্কুট, ভিটামিন খাদ্য, মশারি, লণ্ঠন, ফিনাইল, মশা মারার ধূপ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

সুনামি ত্রাণকার্যের বিস্তারিত বিবরণ ও অনুদান প্রদানের তথ্যাদি পাওয়া যাবে www.sriramakrishnamath.org—এই ওয়েবসাইটে।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল (বাংলাদেশ)ঃ বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ থানার ৬০০ দুঃস্থ নারায়ণের মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

বাগবাজারে 'মায়ের ঘাট'-এর নবরূপায়ণ

একদিন উত্তর কলকাতায় গঙ্গাতীরস্থ একটি স্নানঘাটের প্রায় শেষের ধাপে বসে জপ করছিলেন জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা। একটু দূরে ঘাটের উপরিভাগে এক ভক্ত মাকে জপরতা দেখে সহসা আপন মনে শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক আবৃত্তি শুরু করলেন। যখন তিনি আবৃত্তি করছিলেন—"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি-সুন্দরী...", তখন অকস্মাৎ দেখলেন, মা পিছন ফিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। একদা সেই ঘাটের নাম

ছিল 'দুর্গাচরণ মুখার্জির ঘাট'। এখন জনশ্রুতিতে সেই ঘাটের নাম পরিবর্তিত হয়েছে—'মায়ের ঘাট'। বাগবাজার চক্ররেল স্টেশনের ঠিক উত্তর প্রান্তে এই ঘাট অবস্থিত। ঐ প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণপ্রান্তে নেমে একটু এগিয়ে গেলেই বাগবাজার লঞ্চঘাট। রাত যত গভীর হয়, এই এলাকা ততই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এতদিন দুর্বৃত্তায়নের স্বর্গভূমি ছিল এই মায়ের ঘাট। যে-ঘরে মা স্নান করে উঠে বস্ত্র

পরম পূজ্যপাদ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের রিলিফ মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর আরতি করেন।

পরিবর্তন করতেন বলে শোনা যায়, সেটির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে স্থানীয় রামকৃষ্ণ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা সিদ্ধান্ত নেয়, ভক্ত এবং স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করে ঘাট এবং মায়ের কাপড়ছাড়ার ঘরটিকে সারিয়ে সুন্দর করে তুলবে এবং সমগ্র পরিবেশটিকে সুস্থ রাখবে। এসবের জন্য চাই প্রচুর অর্থ, দক্ষ সংগঠক এবং স্থানীয় মানুষের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা। মায়ের ইচ্ছায় সবই ক্রমে জুটে গেল। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনুদান কিছু সংগৃহীত হলেও এই ঘাটের সংস্করণের আনুমানিক ১৫-২০ লক্ষ টাকা যোগাড় করা ঐভাবে সম্ভব নয় জেনে কেউ একজন তৎকালীন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি প্রস্তাব দেয়। সুদীপবাবু বলেন, যদি রামকৃষ্ণ মিশন (বা তার প্রতিনিধি-স্বরূপ বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ) এই দায়িত্ব নেন, তাহলে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা দেবেন। বেলুড় মঠের তরফে বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ এই দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি পাওয়ার পর ৩১ আগস্ট ২০০২ মহাজাতি সদনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর উপস্থিতিতে সাংসদ সুদীপবাবু ৫ লক্ষ টাকা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধায়ক নগর উন্নয়ন তহবিল (BEUP) থেকে ১½ লক্ষ টাকা দান করেন।

কাজ করতে নেমে রামকৃষ্ণ মঠ কয়েকটি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ঘাটটি কলকাতার বন্দর কর্তৃপক্ষের জমিতে অবস্থিত। তার পাশের জমিটি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের। তার পাশে চিৎপুর রোড এবং কিছু ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। পুরোটাই পরের জমিতে কাজ করতে হবে। এর জন্য যথাবিহিত অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ঘাটটি ভাল করে মেরামতির জন্য হিসাব করে দেখা গেল, ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে (মাননীয় জাহাজমন্ত্রী) আবেদন জানানো হলো। তাঁদের আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মঠের পক্ষে আর অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। উপরন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই ঘাটের সংস্করণ একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে—এই আশায় ৩ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে ঘাটটি সারিয়ে উদ্বোধন করার জন্য চাপ আসতে থাকল। ফলে ২০০৪ সালের ১৭ জুলাই মায়ের বাড়িতে একটি সভা ডেকে কী কী করণীয় তা নির্ধারিত হলো। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, নগর-স্থপতি মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতিনিধি সোমনাথ সেন, পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি শ্যামল সাহা প্রমুখ। তারও আগে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে শ্রীমতী মঞ্জুলিকা দাসের প্রাসাদোপম গৃহে একটি প্রাথমিক সভা হয়েছিল।

মায়ের বাড়ির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিঠি লেখালিখি শুরু হলো এবং কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেল। কলকাতার মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় চিৎপুর রোডের ওপর একটি বড় তোরণ বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রেল কর্তৃপক্ষ দুপাশে সুন্দর বাগান করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে কলকাতা পুলিশ গঙ্গার ধারের বে-আইনি ঝুপড়ি সব ভেঙে

'মায়ের ঘাট'-এর ঈপ্সিত রূপ

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাজে সকলেই স্ব স্ব প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করে কৃতার্থ হয়েছেন। এ যেন চণ্ডীতে বর্ণিত মহাদেবীকে দেবতাদের স্ব স্ব আয়ুধ-প্রদান!

শুভক্ষণ দেখে স্বামী সুদীপ্তানন্দের নেতৃত্বে ১৩ অক্টোবর ২০০৪ কিছু আবর্জনা সরিয়ে 'মায়ের ঘর'-এ মায়ের একটি ছবি রেখে সংক্ষিপ্ত পূজা করে কাজ শুরু হলো। ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঘোষ বললেন, আগে একটা কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অবিলম্বে পৌরসংস্থা কাজ শুরু করল। রেল কর্তৃপক্ষও কাজ শুরু করল। 'মায়ের ঘাট'-এর চাতাল মার্বেল পাথর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। কাপড় ছাড়ার ঘরে সিরামিক টালি বসানো হলো। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ মার্বেল বেদি তৈরি করে মায়ের একটি রিলিফ মূর্তি স্থাপন করলেন। কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ এসে দামি ও সুন্দর আলো লাগিয়ে পুরো এলাকাটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুললেন। রেল কর্তৃপক্ষ সুন্দর বাগান নির্মাণ করে দিলেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেও ৩ জানুয়ারি ২০০৫-এ কাজ শেষ হবে না বুঝে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন স্থির হলো ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫। ঐ দিনটি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। সেদিন সকাল থেকেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া। এদিকে মায়ের বাড়িতে ষোড়শোপচারে পূজা, অন্যদিকে মায়ের ঘাটে

বাগবাজারে 'গিরিশ মঞ্চ'-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন পূজ্যপাদ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ।
আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

ফুলসজ্জা আর সানাইবাদনের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দশোপচারে পূজা ও আরতি। সকাল ১০টায় মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিশাল তোরণের ফলক উন্মোচন করলেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ মায়ের ঘরে ঠাকুরকে অর্ঘ্য দান করে মায়ের রিলিফ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। কলকাতা বন্দরের অধ্যক্ষ ডঃ এ. কে. চন্দ এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে দুটি ফলক উন্মোচন করলেন। অতঃপর সকলে বাগবাজারের গিরিশ মঞ্চে সমবেত হলেন একটি জনসভায়। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ সুধাংশু শীল। এই উন্নয়ন কার্যে সামগ্রিকভাবে মুখ্য সংযোজকের কাজ করেছেন স্বামী সর্বগানন্দজী। সহকারী সংযোজক ছিলেন কমল ঘোষ। ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পিয়ারলেসের কর্ণধার সুনীলকুমার রায়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ১০, ১২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হররূপানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠতীর্থ, বার্ণপুর (বর্ধমান) : গত ৬ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় চারটি পাঠচক্রের সহযোগিতায় 'শ্রীশ্রীশিবস্থান মন্দির'-এ ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী ও স্বামী সুজয়ানন্দজী।

জগৎপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পূর্ব কৃষ্ণপুর (হুগলি) : গত ৬ নভেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও অমরেন্দ্রনাথ আদক। আশ্রমের প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক সহদেব ঘোষ। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। গত ৭-৯ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের প্রত্যেককে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও ছবি প্রদান করা হয়।

বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ৭ নভেম্বর ২০০৪ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, উপস্থিত সকলকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের তৃতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্যামল গুপ্ত ও বালুরঘাটের পৌরাধ্যক্ষ সুচেতা বিশ্বাস।

সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (বাঁকুড়া) : গত ৭ নভেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, স্বামীজীর বাণী পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। এই সম্মেলনে ১৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, হয়বরগাঁও (অসম) : গত ১১ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়

শতাধিক ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং পূজা শেষে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) : গত ১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারদা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে চিত্রপ্রদর্শনী ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে আশ্রমবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ১৬ তারিখ ভাবপ্রচার পরিষদের (বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা) ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন এবং পরিষদের মুখপত্র 'বিবেকায়ন'-এর উদ্বোধন করেন পূজ্যপাদ মহারাজজী। সম্মেলনে ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ১৭ তারিখ ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অমেয়ানন্দজী। অনুষ্ঠানের তিনদিনই উপস্থিত ছিলেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী ও স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) : গত ১১ নভেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'কথামৃতের গান' পরিবেশন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'বরাভয়লীলা' উৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী হরপ্রিয়ানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও বহু ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

মা সারদা সেবাকেন্দ্র, কোঠাবাড়ি (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৯ নভেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন তৎসঙ্গ আশ্রমের স্বামী সদানন্দজী, স্বামী বাসুদেবানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সরদার, মানিকচন্দ্র মণ্ডল, অনুপকুমার মণ্ডল প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাকেন্দ্রের সহ-সম্পাদিকা পুষ্প মণ্ডল। এদিন ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান) : গত ২০ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মায়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং উপস্থিত সকলে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ডিব্রুগড় (অসম) : গত ২০ নভেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮০ জন দুঃস্থ মহিলার মধ্যে কম্বল ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থ সেবায়তন (বীরভূম) : গত ২০ নভেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, ভজন, একাঙ্ক নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। এদিন বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী ও ব্রহ্মচারিণী সারদা। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম) : গত ২০ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে কম্বল, শাড়ি ও চিরুনি প্রদান করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গত ২১ নভেম্বর ২৩২ জন শিশুকে পালস্ পোলিও পরিষেবা প্রদান করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, কটক (ওড়িশা) : গত ২১ নভেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভি.ডি.ও. প্রদর্শনী, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সকালের ধর্মসভায় স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী দীনেশানন্দজী, স্বামী বশিষ্ঠানন্দজী ও স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী এবং বৈকালিক ধর্মসভায় ওড়িশার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বিভিন্ন কেন্দ্রের সম্পাদকগণ ভাষণ প্রদান করেন। দুপুরে ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) : গত ২১ নভেম্বর ২০০৪ মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরের অডিটোরিয়ামে বাৎসরিক 'বৈকালিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী বাসবানন্দজী। পুরস্কার-বিতরণ ও স্মারকগ্রন্থ 'চেতনা' প্রকাশ করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সোসাল সায়েন্স, পিকনিক গার্ডেন (কলকাতা-৩৯) : গত ২১ নভেম্বর ২০০৪ 'সম্প্রীতি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে 'ধর্মের আলোকে সম্প্রীতি' বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু, মৌলানা আবু তালেব, আনসার আলি প্রমুখ। এদিন বিজয়া-দীপাবলী-ইদলফেতর উপলক্ষ্যে শিশু ও কিশোরদের নববস্ত্র প্রদান করেন স্বামী সর্বভূতানন্দজী। পরিবেশিত হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সঙ্গীত।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অমিয়া হোড় গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কৃষ্ণনগর-নিবাসিনী লাবণ্যপ্রভা ভট্টাচার্য গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমানের কালনা-নিবাসিনী শান্তি গাঙ্গুলি গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাওড়ার ভট্টনগর-নিবাসী গোপালচন্দ্র দেব গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান-নিবাসিনী মণ্টুরানি বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বর্ধমানের চাকতেঁতুল-নিবাসী শঙ্করচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা জয়ারানি চট্টোপাধ্যায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন বহরমপুর সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী।❑

গ্রাহকদের উদ্দেশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব

(১) আপনারা সকলেই জানেন, কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য এই বছরে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (by hand) নিলে ৮০ টাকা। এই সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকরা পান ১১টি সাধারণ সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪) এবং ১টি বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৬)।

এই কারণে শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়ে গেলে তার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব হয় না এবং সাধারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বছরে ২টির বেশি ডুপ্লিকেট কপি দেওয়াও সম্ভব হয় না।

(২) কোন সংখ্যা না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ অবধি অপেক্ষা করে উদ্বোধন কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর (পৌষ) সংখ্যা না পেলে জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখের পর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

(৩) ডুপ্লিকেট কপি ডাকে পাঠালে পুনরায় তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইচ্ছা করলে গ্রাহকগণ VPP মারফত ডুপ্লিকেট কপি পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১টি পত্রিকার ক্ষেত্রে ১০ টাকা দিয়ে পোস্ট অফিস থেকে পত্রিকাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে।

(৪) যাঁরা বৃদ্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়ে এসে হাতে হাতে পত্রিকা নিয়ে যেতে অপারক—তাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের মাধ্যমে পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে পত্রিকাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে।

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই বছর একটি নতুন নিয়ম চালু হলো। আপনি বছরের যেকোন মাস থেকেই 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে পারবেন এবং সেই মাস থেকে মোট ১২ মাসের জন্য বই পাবেন। তিনবছরের জন্য গ্রাহক হলেও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে, যেকোন মাসে গ্রাহক হলে সেই মাস থেকেই হিসাব শুরু হবে। অবশ্য, নবীকরণ করার ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে-নিয়ম চলে আসছিল, তা বহাল থাকছেই; শুধু অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে যেকোন মাস থেকে পরবর্তী ১২ মাসের জন্য গ্রাহক হওয়ার পথও খোলা রইল। তবে, পুরনো ব্যবস্থায় (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) কেউ গ্রাহকপদ নবীকরণ করতে চাইলে তাঁকে মার্চ মাসের মধ্যেই তা করতে হবে। ঐ মাসের পরে নবীকরণ করলে পুরনো সংখ্যাগুলি (যথা এপ্রিলে নবীকরণ করলে জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিনটি সংখ্যা) দেওয়া সম্ভব হবে না; সেগুলি তাঁরা আলাদাভাবে ধার্য-মূল্যে কিনে নেবেন। তাই পুরনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, গ্রাহকপদ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য আপনারা অবশ্যই মার্চের মধ্যে নবীকরণ করিয়ে নেবেন।

আশা করি, উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক/গ্রাহিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাব।

বিনীত
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

পীযূষকান্তি রায় স্মরণে

— জন্ম : ১৫ জুন ১৯১৫, কলকাতা। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার জপ্‌সা গ্রাম। শৈশব ও কৈশোর ঢাকা, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড়ে অতিবাহিত।

— শিক্ষা : ঢাকা পোগোজ স্কুল ও জগন্নাথ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

— কর্মজীবন : নিউ দিল্লি (কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ কর্মচারিরূপে ১৯৭৫-এ অবসরগ্রহণ)।

— শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে ১৯৩৬ থেকে বিশেষভাবে জড়িত।

— শ্রীরামকৃষ্ণের দুজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দকে দর্শনের সৌভাগ্যলাভ।

— ১৯৩৭-এ কলকাতায় আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে অংশগ্রহণ। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, স্বামী পরমানন্দ এবং অন্যান্য মনীষীদের দর্শন।

— ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি বেলুড় মঠের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত।

— প্রাক্তন বিপ্লবী, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ (পূর্বাশ্রমে প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত) সম্পর্কে পিতার মাতুল। প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী নির্জরানন্দ (মোহিত মহারাজ) ঢাকা স্কুল কলেজের সহপাঠী ও আমৃত্যু গভীর বন্ধুত্ব।

— নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে দীর্ঘ ৫০ বছরের যোগাযোগ।

— ১৯৬৬-তে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাগ্রহণ ও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ সপরিবার তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য।

— স্বীয় গুরুদেব ভিন্ন শ্রীশ্রীমায়ের কতিপয় সন্ন্যাসী সন্তানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ প্রমুখ।

— ১৯৭০-এ শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাধন্য ভবতারিণী দেবী (বসুমতী মা)-কে বারাণসীতে দর্শন।

— রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

— নিউ দিল্লি চিত্তরঞ্জন পার্কের নতুন বাসভবনে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ১৯৭১-এ শুভাগমন। তাছাড়া সরকারি আবাসে ও চিত্তরঞ্জন পার্কের গৃহে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসীর শুভপদার্পণ। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী গীতানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী বুধানন্দ, স্বামী ব্যোমানন্দ, স্বামী স্বত্যানন্দ, স্বামী অপরানন্দ, স্বামী সত্যব্রতানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ, স্বামী ক্ষমানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী গিরিজেশানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ, স্বামী বোধসারানন্দ, স্বামী তদ্‌গতানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী মুনীশ্বরানন্দ, স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী বীতভয়ানন্দ প্রমুখ।

— ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত নিজ গৃহে নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সচিব স্বামী বন্দনানন্দ দ্বারা নিয়মিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ক্লাস' চিত্তরঞ্জন পার্কে প্রথম প্রবর্তিত।

— সুলেখক, সুবক্তা ও 'শখের গবেষক'। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং সরস গল্প বলার জন্য সকলের প্রিয়। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, ক্রীড়া (ফুটবল ও ক্রিকেট), বিনোদন (চলচ্চিত্র, নাটক, ফটোগ্রাফি, শাস্ত্রীয় ও লঘু সঙ্গীত) এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস বিষয়ে প্রচুর নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্রাদি 'উদ্বোধন', 'Prabuddha Bharata', 'নিবোধত', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'আজকাল', 'দেশ', 'The Statesman', 'সাপ্তাহিক বর্তমান' প্রভৃতি ভারতের অগ্রণী পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত।

— চার দশক যাবৎ 'উদ্বোধন' পত্রিকার উৎসাহী পাঠক ও বহু নিবন্ধের লেখক। 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগের নিয়মিত লেখক।

— শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর ফটোগ্রাফ প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গবেষণা, যা নিবন্ধাকারে 'উদ্বোধন', 'নিবোধত', 'Prabuddha Bharata' ও 'দেশ'-এ প্রকাশিত। পরবর্তী কালে কতিপয় নিবন্ধ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত ও উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

— ১৯৮৭ ও নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রথম ভক্তসম্মেলনে 'ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে 'বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম'-এ ভাষণদান।

— ২০০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন পার্কের নিজ বাসভবনে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন।

বিনয়াবনত

বাণী, ভাস্কর, দেবশ্রী ও দেবজিৎ রায়

নিউ দিল্লি

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভুমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভুমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

সংগ্রহ করুন

পুণ্যপ্রসঙ্গ: বিবেকানন্দ • নিবেদিতা

অমলেশ ত্রিপাঠী
ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৪০.০০

জ্যোতির্ময় বসুরায়
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ বিজ্ঞানানন্দ ৫০.০০

নিমাইসাধন বসু
উইম্বলডনের মার্গারেট ৪০.০০

শাশ্বত বিবেকানন্দ (সম্পা.) ১০০.০০

মৃগেন্দ্রচন্দ্র দাস
মহীয়সী নিবেদিতা ৫০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
নিবেদিতা লোকমাতা
১ম খণ্ড (১ম পর্ব) ১২০.০০
১ম খণ্ড (২য় পর্ব) ১৫০.০০

নিবেদিতা লোকমাতা ২য় খণ্ড ৫০.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৩য় খণ্ড ৭৫.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৪র্থ খণ্ড ৭৫.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত ৬০.০০

ছোটদের জন্য

রথীন্দ্রনাথ মজুমদার
গল্পকার বিবেকানন্দ ২০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৩০.০০

বন্ধু বিবেকানন্দ ৫০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ৩০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১৪৩৫২/২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in
ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত : প্রতি সেট : ২৩৬ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক : শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন : ২৩৫০-১৭৫১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

ফোন : ২৪৭৪-২৩৩৫

৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ	৮০
পূর্ণতার সাধন	১৬
ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা	৩০
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা	৮

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ :
প্রেমিক পুরুষ ১৫
অন্যান্য বই : স্তোত্রমালিকা ৪

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

> There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
>
> **SRI MA SARADA DEVI**

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

> ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
>
> **স্বামী বিবেকানন্দ**

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ফোন : (০১১) ২৩৫৮-৭১১০/৩০২৩
- পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ফোন : (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

অসম

- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ফোন : (০৩৮৪২) ২৬৬৭৮৯, ২৬৭৭৮৯
- রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ, ফোন : (০৩৮৪৩) ২৬২২৭২
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭, ফোন : (০৩৬১) ২৪৭০৯৯১
- রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাঁও
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- পরিমলকৃষ্ণ পাল, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- এম. কে. বুক সেলার্স, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- শান্তিকুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা, ফোন : (০৩৮১) ২২৩০২২২, ২৩৭৫৮৫৮
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যাণ্ড

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী, ফোন : (০৬৭৫২) ২২২৪৭৯, ২২৮৯১৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮, ফোন : (০৬৭১) ২৩০৩৮৯২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- শ্যামল সিন্হা রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩, ফোন : (০৩৬০) ২২৪৫২৭২

বিহার

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ ফোন : (০৬১২) ২৬৭০৮১৫

ঝাড়খণ্ড

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি রাঁচি-৮৩৪০০৮, ফোন : (০৬৫১) ২৫৪-১৯৭০/১০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টিল সিটি
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিষ্টুপুর জামশেদপুর-৮৩১০০১, ফোন : (০৬৫৭) ২৪২৩৭৯৫, ২৪৩০৬৯৯
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- রীতা ভট্টাচার্য, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৬৮৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০ ফোন : (০৫২২) ২৭৮-৭১৯১/৭১৪৩

মধ্যপ্রদেশ

- চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কোয়ার্টার নং ২৮/এস, ওয়েস্টল্যাণ্ড, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি খামারিয়া, জব্বলপুর-৪৮২০০৫, ফোন : (০৭৬১) ২৪৩০২০৬

ছত্তিশগড়

- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- পি. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ও. এন. জি. সি. কে. জি. পি. ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার (পশ্চিম) মুম্বাই-৪০০০৫২, ফোন : (০২২) ২৬৪৯-৪৭৬০, ২৬৪৬-৪৩৬৩
- প্রদীপচন্দ্র পাল, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনি আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- মীরা মিত্র, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনি, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- প্রভাত মুখার্জি, এ/৭, রচনা সোসাইটি বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড বালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : (০২৬৩২) ২৪২৩৭৩ ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৭ ॥

বৈশাখ ১৪১২ ৪র্থ সংখ্যা

"মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত..."

—শ্রীমা সারদাদেবী

১০৭

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।
সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচি (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

১৪১২ বঙ্গাব্দ / ২০০৫-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	৪ বৈশাখ	সোমবার	১৮ এপ্রিল	২০০৫
শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২৯ বৈশাখ	শুক্রবার	১৩ মে	"
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	৯ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	২৩ মে	"
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	৫ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	২১ জুলাই	"
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১৭ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	২ আগস্ট	"
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৩ ভাদ্র	শুক্রবার	১৯ আগস্ট	"
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১০ ভাদ্র	শুক্রবার	২৬ আগস্ট	"
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৭ ভাদ্র	শুক্রবার	২ সেপ্টেম্বর	"
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১০ আশ্বিন	সোমবার	২৬ সেপ্টেম্বর	"
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১৭ আশ্বিন	সোমবার	৩ অক্টোবর	"
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২৭ কার্তিক	রবিবার	১৩ নভেম্বর	"
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৯ কার্তিক	মঙ্গলবার	১৫ নভেম্বর	"
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১৩ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	৯ ডিসেম্বর	"
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	৭ পৌষ	শুক্রবার	২৩ ডিসেম্বর	"
যিশুখ্রিস্ট		৮ পৌষ	শনিবার	২৪ ডিসেম্বর	"
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১১ পৌষ	মঙ্গলবার	২৭ ডিসেম্বর	"
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২০ পৌষ	বৃহস্পতিবার	৫ জানুয়ারি	২০০৬
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৮ পৌষ	শুক্রবার	১৩ জানুয়ারি	"
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৭ মাঘ	শনিবার	২১ জানুয়ারি	"
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১৭ মাঘ	মঙ্গলবার	৩১ জানুয়ারি	"
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৮ মাঘ	বুধবার	১ ফেব্রুয়ারি	"
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	৩০ মাঘ	সোমবার	১৩ ফেব্রুয়ারি	"
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৬ ফাল্গুন	বুধবার	১ মার্চ	"
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২০ ফাল্গুন	রবিবার	৫ মার্চ	"
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৯ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	১৪ মার্চ	"
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৫ চৈত্র	রবিবার	১৯ মার্চ	"
শ্রীশ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	২৪ চৈত্র	শুক্রবার	৭ এপ্রিল	"

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২৩ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	৬ জুন	২০০৫
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৭ আষাঢ়	বুধবার	২২ জুন	"
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	২৩ আষাঢ়	শুক্রবার	৮ জুলাই	"
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	১৭ আশ্বিন	সোমবার	৩ অক্টোবর	"
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৪ আশ্বিন	সোমবার	১০ অক্টোবর	"
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৫ কার্তিক	মঙ্গলবার	১ নভেম্বর	"
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	২৪ কার্তিক	বৃহস্পতিবার	১০ নভেম্বর	"
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	২৯ কার্তিক	মঙ্গলবার	১৫ নভেম্বর	"
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা.	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৯ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২ ফেব্রুয়ারি	২০০৬
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৩ ফাল্গুন	রবিবার	২৬ ফেব্রুয়ারি	"

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	৬, ২০ (এপ্রিল ২০, মে ৪)	কার্তিক—	১১, ২৬ (অক্টোবর ২৮, নভেম্বর ১২)
জ্যৈষ্ঠ—	৬, ১৯ (মে ২০, জুন ২)	অগ্রহায়ণ—	১১, ২৫ (নভেম্বর ২৭, ডিসেম্বর ১১)
আষাঢ়—	৩, ১৭ (জুন ১৮, জুলাই ২)	পৌষ—	১১, ২৫ (ডিসেম্বর ২৭, জানুয়ারি ১০)
শ্রাবণ—	২, ১৫, ৩১ (জুলাই ১৮, ৩১, আগস্ট ১৬)	মাঘ—	১২, ২৫ (জানুয়ারি ২৬, ফেব্রুয়ারি ৮)
ভাদ্র—	১৪, ২৯ (আগস্ট ৩০, সেপ্টেম্বর ১৪)	ফাল্গুন—	১১, ২৫ (ফেব্রুয়ারি ২৪, মার্চ ১০)
আশ্বিন—	১৩, ২৮ (সেপ্টেম্বর ২৯, অক্টোবর ১৪)	চৈত্র—	১২, ২৬ (মার্চ ২৬, এপ্রিল ৯)

সূচিপত্র

উদ্বোধন ॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা ● বৈশাখ ১৪১২ ● এপ্রিল ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

উদ্বোধন ১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 'উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০৲ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০৲ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ মোট ৮০০৲ টাকা (বিমানডাক) ✦ মোট ৪০০৲ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০৲ টাকা (INR)। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫৲ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০৲ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০৲ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০৲ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের **গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর** উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। আমাদের ধারণা, স্থানীয় গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র থেকে বই নিলে আপনার সুবিধা হবে।

'চেক' সাধারণত গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে 'গ্রাহক-নবীকরণ' কিংবা 'পুস্তক ক্রয়' কিংবা 'মায়ের বাড়ির জন্য' কথাটি লিখবেন। টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।। (১০।২।২৬)

(হে ভগবান,) আপনার সঙ্কল্প সত্য। সত্যই আপনাকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়; সৃষ্টির পূর্বে, স্থিতিকালে ও প্রলয়ের পরেও আপনি বর্তমান থাকেন। আপনি আপাতসত্য ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের কারণ; এই পঞ্চভূতের মধ্যে আপনি অন্তর্যামীরূপে বর্তমান রয়েছেন; পঞ্চভূত লয়ে কারণরূপে আপনিই থাকেন। আপনি সত্য ও প্রিয় এবং সমদর্শনের প্রবর্তক। অতএব আমরা এইভাবে সর্বপ্রকারে সত্যস্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হলাম।

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি।। (১০।৩।২৭)

হে আদিকারণ! মরণশীল জীব সর্বদাই মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত হয়ে নানা স্থানে পলায়ন করে, কিন্তু কোথাও অভয় স্থান পায় না। যদি কখনো সৌভাগ্যক্রমে জীব আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় পায়, তবে একমাত্র সেখানেই নির্ভয়ে অবস্থান করতে পারে, কারণ মৃত্যু সর্বদাই আপনার অমৃতময় পাদপদ্ম থেকে দূরে থাকে।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে।। (১০।২।৩৭)

যিনি আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও চিন্তন করতে করতে আপনার পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করেন, তিনি এই জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে আর ফিরে আসেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

বিবেক, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা

যদিও বহু আলোচিত, তথাপি কিছু কিছু কথা কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ উভয়েরই মাঝে-মধ্যে কথঞ্চিৎ চর্বিত-চর্বন করা প্রয়োজন হয়। বলা যাইতে পারে—সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই। অধিকন্তু বর্তমানে যুগচক্র পরিবর্তনের সহিত সামাজিক চালচিত্র যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার প্রেক্ষিতে প্রাচীন শাস্ত্রোদ্ধৃত শব্দগুলির পুনঃসংজ্ঞায়নের প্রয়োজন আছে কিনা তাহাও বিবেচ্য। তবে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণের ক্ষেত্রে 'বিবেক-বৈরাগ্য' বিষয়টি যে নিত্য আলোচ্য, সেব্যাপারে দ্বিমত নাই। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্তবৃন্দের ক্ষেত্রেও এই দুইটি শব্দ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভোগোন্মত্ত সংসারাসক্ত জীব এই শব্দদ্বয় শুনিলে ভ্রূদ্বয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতেই পারেন এই ভাবিয়া যে, এই ব্যক্তি আবার কোথা হইতে আমাদের সংসার-কূপ অপেক্ষা বৃহত্তর সমুদ্রবৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দ নামক হাস্যকর বস্তুর অবতারণা করিল! এবং ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য যে, ঐসকল মানুষ বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে সংসারের সত্যতা এবং ভগবান নামক অলীক কল্পনার অসারতা বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট তৎপর হইয়া উঠেন। অথচ সামান্য বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে, 'বিবেক' ও 'বৈরাগ্য' শব্দদুইটিকে জাগতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনেও একইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জীবনেও এই শব্দদুইটি অত্যন্ত জরুরি। আর ব্যাকুলতা? ইহা সুদুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরলাভ।" (১৪/১২/১৮৮৩) ব্যাকুলতা সকলের হৃদয়ে জাগে না। বিবেক জাগ্রত হইলে বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায়। সুপ্রতিষ্ঠ বৈরাগ্যযুক্ত সাধকের অন্তরে ধীরে ধীরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। আধুনিক মানসিকতায় এই তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করিলে মন্দ হইবে না।

'বিচ্' ধাতু হইতে 'বিবেক' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিচ্ ধাতু পৃথককরণার্থে। অর্থাৎ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পৃথকীকরণে বিচ্ ধাতুর ব্যবহার। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়শ বিবেক এবং বৈরাগ্য শব্দদুটিকে একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"বিবেক বৈরাগ্যের মতো জিনিস নাই", "উপায় বিবেক, বৈরাগ্য আর ঈশ্বরে অনুরাগ", "বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ-অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একেবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়", "বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না" ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ শতমুখে বিবেক-বৈরাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে বিবেক-বৈরাগ্যের ভূমিকা অবিসংবাদিত। যদিও ইহারা পথের শেষ নহে। অথচ সঠিক পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া দুরাশা মাত্র। এই কারণেই স্বামীজী বারংবার বলিতেছেন ঃ "Take care of means"—সঠিক পথটি নির্বাচন কর। ব্যষ্টিজীবনে যেমন ইহা সত্য, সমষ্টিজীবনেও ইহা সত্য। জাতীয় জীবনে যে-জাতি বা দেশ সঠিক পথটি যত দ্রুত নির্ধারণ করিতে পারিয়াছে, সেই জাতি বা দেশ অপরাপর জাতি অপেক্ষা তত দ্রুত উন্নতিসাধন করিয়াছে—ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশ বা জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ এখনো সঠিক নীতি কী হইবে তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অবশ্য ইহা আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা আপাতত ব্যষ্টিজীবনে বিবেকের ভূমিকা কী তাহা বিশ্লেষণ করিব।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতি মুহূর্তেই আমরা দেখি যে, মানুষ প্রবল সংশয়াচ্ছন্ন। কি করিবে, কি না করিবে, কি ছাড়িবে আর কি ধরিবে—কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসিতে পারে না। বাজারে গিয়া কি কিনিবে আর কি কিনিবে না ঠিক করিতে পারে না। সন্তানকে ডাক্তারি পড়াইবে না ইঞ্জিনিয়ার করিবে ভাবিয়া কূল পায় না। চাকরি করিবে, না ব্যবসা করিবে স্থির করিতে পারে না। ধর্মালোচনায় যোগ দিবে, না টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখিবে বুঝিয়া উঠে না। অসংখ্য উদাহরণ আছে যখন মানুষ কোন্ কাজটি ঠিক, কোন্‌টি বেঠিক তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। বিবেকবান পুরুষ এই ঠিক-বেঠিক নির্ধারণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই সিদ্ধান্তগ্রহণে যাহারা যত সফল, সমাজে তাহারা ততই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা সহজ কাজ নহে। ইহাকে শাস্ত্রবিদ্ বলিলেন, কার্য-অকার্য বিবেক। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ "কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" অর্থাৎ কী কর্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম ইহা নির্ধারণ করিতে কবিগণ (সত্যপথাবলম্বী ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ) পর্যন্ত কখনো কখনো বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। আর এই কার্য-অকার্য

বিবেক দিনে একবারমাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইবার কোন অর্থ হয় না, বরং সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই বিবেকবিচার সদা-সর্বদা প্রয়োজন।

বৈরাগ্যের কী প্রয়োজন? সংসারজীবনে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে পান-আহারের ক্ষেত্রে, বিনোদনের ক্ষেত্রে, ভোগসুখের ক্ষেত্রে, পারিবারিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈরাগ্য থাকা দরকার। অভীষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য কোনকিছুর প্রতি আসক্তি না থাকাই বৈরাগ্যের লক্ষণ। অত্যন্ত গবেষণাপ্রিয় বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যসেবী অথবা সঙ্গীতসাধক বা বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির মধ্যে এইরূপ বৈরাগ্য দৃষ্ট হয়। ইঁহারা অধ্যাত্মপিপাসু না হইতেও পারেন; কিন্তু ইহা অনুভব করেন যে, জীবনে সাফল্যলাভ করিতে হইলে বিবেক-বৈরাগ্য চাই।

যাঁহারা চরম আধ্যাত্মিক পরিণতিকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে বিবেক-বৈরাগ্যের অভাব মৃত্যুর নামান্তর বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিবেকের কার্য নিত্য-অনিত্য বিচার। ইহার বিপরীত স্বভাবকে শাস্ত্রে 'প্রমাদ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ carelessness বা অন্যমনস্কতা। সাধকজীবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া 'বিবেকচূড়ামণি প্রকরণ' গ্রন্থে শঙ্করাচার্য ইহাকে মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন।* গীতায় শ্রীভগবান ইহাকে তামসিক ধৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিবেকের অভাবের কারণে লক্ষ্যপথভ্রষ্ট বহু ঋষি-মুনির কাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত রহিয়াছে। দেবতারা পর্যন্ত বিবেকহীন আচরণের কারণে নিকৃষ্ট যোনিপ্রাপ্ত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন—এমন অজস্র উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়; আর আজকের সমাজে যুবক-যুবতীদের সম্মুখে 'বিবেক' শব্দ উচ্চারণ করিবার মতো অভিভাবক বা শিক্ষকের সংখ্যাও ক্রমহ্রাসমান। সুরাসক্তি কিংবা নানাবিধ ড্রাগ গ্রহণ অথবা অশিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে ঠিক বা বেঠিক বোধটি ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে।

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, বিবেক শব্দটি স্বামীজী বর্ণিত চারটি যোগের সহিতই যুক্ত। বস্তুত, বিচার-বিবেক ব্যতীত জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ কিংবা কর্মযোগ—কোনটিই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। আর ইহাও অর্থহীন যে, দিনের মধ্যে কেহ এক ঘণ্টা (কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে) বিচার-বিবেকবান থাকিয়া বাকি সময়ে বিবেকবিহীন থাকিবে। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—বিবেকবান মানুষই যথার্থ মানুষ। বিবেকহীন মানুষ ও পশুতে কোন পার্থক্য নাই। জ্ঞানযোগে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের কথা বলা হইয়াছে। রাজযোগে পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক। ভক্তিযোগে কি করিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, কি করিলে ভক্তির হানি হয়—এই বিবেক। কর্মযোগে সাধকচিত্তে কোন্‌টি কর্ম, কোন্‌টি অকর্ম, কোন্‌টি বিকর্ম—এই বিবেকের সর্বদা প্রয়োগ চলিতে থাকে। বিষয়বাসনার উত্তাল পবনে মনরূপ দীপশিখা এতই চঞ্চল যে, কখন সহসা নির্বাপিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বিচার ও বিবেকের সাহায্যে সেই জ্বলন্ত মনাগ্নিকে রক্ষা করা সাধকের একান্ত কর্তব্য। কারণ, আলো চাই। আলো বিনা জীবন অন্ধকার। তাই বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা শব্দত্রয়ের যথার্থ তাৎপর্য সঠিক অনুধাবন করা জরুরি।

মনে রাখা দরকার, যেকোন ধরনের যুক্তির অবতারণাই বিবেক নহে। 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণ-কারণম্'—শব্দের মহারণ্যে চিত্ত কেবলই ভ্রমণ করিতে থাকে, অভীষ্ট লক্ষ্য কোথায় হারাইয়া যায়! সবকিছুতে সন্দেহ প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনের দোদুল্যমানতাকে 'বিচার' বলিয়া ভুল হয়। শ্রীভগবান গীতায় সঠিক যুক্তিবিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে 'বাদ' আখ্যা দিয়াছেন। 'বাদ' কখনো বিতণ্ডা (লক্ষ্যবিহীন তর্ক) নহে। সঠিক বিবেক-বিচার তাহাকেই বলিতে হইবে, যাহার মাধ্যমে সত্যের উদ্ঘাটন হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য ছিল অর্জুনের হৃদয় হইতে যে সঠিক বিবেক-বিচার লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধার করা। এমন নহে যে, অর্জুন কাপুরুষ ছিলেন কিংবা বিশাল প্রতিপক্ষকে দেখিয়া ভীত হইয়া নানাবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিতেছিলেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সত্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। সুতরাং অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য 'বিবেক' একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিবেক-দীপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গ পেশিশক্তি অপেক্ষা জাগ্রত বিবেকের শক্তি সহস্রগুণ অধিক বলিয়াই জানেন।

বিবেকের স্বরূপ কী? বিচ্ অর্থাৎ পৃথকীকরণের প্রশ্নে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—যে-দুটি বস্তুর মধ্যে পৃথকীকরণ করা হইতেছে, তাহাদের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। যদি সে-জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে কোন্ বস্তু হইতে কোন্‌টি পৃথক করিতেছি তাহা বুঝা যাইবে না। অর্থাৎ সদসৎ বস্তুবিচার বা কার্যাকার্য বিবেক বা ধর্মাধর্ম বিবেক যাহাই বলি না কেন, সর্বক্ষেত্রে সদ্বস্তু ও অসদ্বস্তু কিংবা কার্য ও অকার্য অথবা ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে সম্যক

* "প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ।।" (৩২১)

জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এবিষয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজি মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বামী ভজনানন্দজী একদা (আগস্ট ১৯৭৭) মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, কার্যাকার্য বিবেকের পশ্চাতে ধর্মাধর্ম বিবেক সূক্ষ্মতররূপে বিদ্যমান। বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, অসদ্বস্তু অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝিতে ধর্মাধর্ম বিবেক বা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক সাহায্য করে বটে, কিন্তু সদ্বস্তু বা ব্রহ্মবস্তুর ব্যাপারে এই বিবেক বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে না। সদ্বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার জন্য দৃগ্-দৃশ্য বিবেকের প্রয়োজন। দৃগ্-দৃশ্য বিবেক তাহারই জাগ্রত হইতে পারে পূর্ব পূর্ব বিবেকবিচারে যে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহার ধর্ম কী, অধর্ম কী ইত্যাদি জ্ঞান নাই—তাহার ধর্ম-অধর্মের পারে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। ধর্ম কী, অধর্ম কী তাহা সম্যক জানিয়াই রামপ্রসাদ গান রচনা করিয়াছিলেনঃ "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" অধর্ম আচরণকারী ব্যক্তিকে প্রথমে ধর্মাচরণ শিখিতে হইবে। তাহার পর ধর্ম-অধর্ম ত্যাগের প্রশ্ন। অনৈতিক ব্যক্তি কখনো ধর্মাচারী হইতে পারে না। কারণ, নৈতিকতা ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। নৈতিকতার ভিত্তি কী? অথবা নীতি বা নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন বিশ্বজনীন মাপকাঠি আছে কি? সাধারণত ধর্মের ধারণা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। তথাপি কয়েকটি অনুশীলনীয় সার্বভৌম নীতির উল্লেখ করিয়াছেন মহামুনি পতঞ্জলি। যথা—সত্য (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণতা), অহিংসা (আমার কারণে কাহারো কোনরূপ ক্ষতি হইবে না—এই চিন্তা ও বোধ), ব্রহ্মচর্য (অর্থাৎ পবিত্রতা, বাহিরে অন্তরে), দানব্রত (অপরের দুঃখে সহানুভূতি সহকারে নিজের প্রাপ্তি হইতে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি দান করা) ইত্যাদি। স্বামীজী একটি অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়া বলিলেন, নিঃস্বার্থপরতাই নৈতিকতার ভিত্তি। যে-ব্যক্তি যত বেশি নৈতিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত, সে তত বেশি স্বার্থশূন্য। স্বার্থপরায়ণতা এবং নীতিপরায়ণতা কখনো একত্রে থাকিতে পারে না। যথার্থ নীতিপরায়ণতা আমাদের একটি নৌকায় থাকিতে বাধ্য করে, দু-নৌকায় পা রাখিয়া চলিতে প্ররোচিত করে না। ইহাতে কি আমাদের স্বাধীনতার হানি হয়? অর্থাৎ একই সঙ্গে নীতিপরায়ণ ও বিরোচনী বিষয়-মদ-লালসায় মত্ত হওয়া কি সম্ভব নহে? পৃথিবীতে কোন ধর্মেই এই মতে সমর্থন নাই। কারণ, যুক্তিজাল অবলম্বন করিয়া কোন কোন চার্বাকপন্থী ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেও বাস্তবে ইহা সম্ভব নহে। যেমন দুটি সরলরেখা কখনো একাধিক বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না, তদ্রূপ।

আর নীতিপরায়ণতাই সমাজজীবনের ভিত্তি। প্রায়শই দেখা যায়, নৈতিকতার অভাবে ব্যক্তিজীবনে বা সমষ্টিজীবনে মানুষ ক্রমে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিছু পাইবার বড় আশা ছিল, পাওয়া হইল না। অথবা কিছু মূল্যবান সম্পদ—বহিঃ অথবা আন্তর—পাইয়াছিল, কিন্তু অযত্নে হারাইয়া গেল; কিংবা সুখের জীবনে কাঁটা-স্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল প্রাকৃতিক বিপর্যয়; অথবা আত্মীয়-পরিজন বা বন্ধু-আদি অপর ব্যক্তির অবাঞ্ছিত ব্যবহার! অর্থাৎ জীবন ব্যাপিয়া চলিয়াছে দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা, দ্বেষ এবং ক্ষণিক সুখ, উল্লাস, মরীচিকাবৎ আশা-নিরাশার এক অবিশ্রান্ত মিছিল। পরিশেষে শুরু হয় identity crisis অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাববোধ। অধ্যাত্মসাধক কেহ কেহ ইহার মূল কারণ সম্পর্কে সচেতন থাকেন, সকলে নহে। প্রত্যেক জীবের অন্তরে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার যে অদম্য ইচ্ছা, যে-ইচ্ছা তাহাকে ভাবিতে দেয় না—একদিন সে 'মৃত' বলিয়া ঘোষিত হইবে, তাহার আসল কারণ মানুষের অনন্তত্ব, অন্তরাত্মার শাশ্বত অস্তিত্ব। অবিদ্যার প্রভাবে সেই শাশ্বত চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব ভুলিয়া যখনি জীব স্থান-কালাবদ্ধ হইয়া পড়িল, তখনি তাহার ভিতরে একটি দমবন্ধ করা অবস্থার সৃষ্টি হইল। এবং উহারই বহিঃপ্রকাশ চিত্তের ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা, অসহিষ্ণুতা। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক এই হতাশা-ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধানে মানুষকে সাহায্য করে।

এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবসত্তার অন্তরে অবশ্যই একটি কোন বস্তু আছে যাহা অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। যেমন মানুষের আজন্ম-মৃত্যু একটি অপরিবর্তনীয় 'I'-awareness বা 'আমি'-বোধ থাকে, যাহার শক্তিতে সে কর্ম করিতে পারে। আইনস্টাইন যদি বলেন, "Everything is relative"—সবই আপেক্ষিক, তাহা হইলে বেদান্তী বলিবেন, যিনি এই মন্তব্য করিতেছেন, তিনি আপেক্ষিকতার (relativity) বাহিরে 'absolute frame'-এ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই বলিতে পারেন—"Everything is relative"! নতুবা এটি কথার কথা মাত্র, ইহার কোন মূল্য নাই। এই 'absolute frame' বা নিরপেক্ষ সত্তার শাস্ত্রীয় অভিধা 'দৃক্'। বাকি যাহা কিছু, সবই 'relativistic' বা আপেক্ষিক অর্থাৎ দৃশ্য। সুতরাং দৃগ্-দৃশ্য বিবেক সাধককে তাহার 'স্বরূপ' বুঝিতে সাহায্য করে। এই দৃগেরই শাস্ত্রীয় প্রতিশব্দ 'সাক্ষিচৈতন্য'। [ক্রমশ]

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত*

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

'Godavari House'
Ootacamand
3/10/26

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তোমার ওখানে থাকিবার সুবিধা হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম—তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমাদের সকল রকম কুশল হইবে নিশ্চয় জানিবে।

ধ্যান জপ নিয়মিতভাবে করিয়া যাও, যেরূপ বলিয়াছি। তাঁর কৃপায় মন স্থির হইবে। ধ্যান জপের সময় গৈরিক পরিধান করিতে পার কিন্তু তাহার পর উহা ছাড়িয়া রাখিবে।

ঠাকুরের নিত্যপূজা করিবার যদি বাসনা হইয়া থাকে বেশ ভাল কথা। আমাদের ভক্তির পূজা, অত বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন নাই। ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও ভাবের সহিত প্রার্থনা করিবে তাহা হইলেই হইয়া গেল। মঠ হইতে ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাও আনাইয়া লইতে পার। ভক্তি বিশ্বাসই আসল, পূজা যদি ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে উহা কিছুই নয় জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমার ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা জানিবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী।—শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Ashram
Basavangudi
Bangalore City
25/10/26

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির পার্শ্বেই মায়ের ছবি নিশ্চয় রাখিবে। প্রাণায়াম পার ত একটা করে করে নেবে—নচেৎ ইষ্টমন্ত্র জপে উহার কাজ হইয়া যাইবে। তোমার স্ত্রী যে মন্ত্র পাইয়াছে উহাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জপ করিতে বলিবে—তাহার পর আমি যখন মঠে ফিরিব তখন শুনিয়া যাহা বিধান হয় করিব। আমার ফিরিতে বোধহয় ডিসেম্বর হইবে। আমার শরীর একরূপ চলিয়া যাইতেছে। ইতি।

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রদুটি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী প্রয়াত যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের দুটি পত্র

যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত*
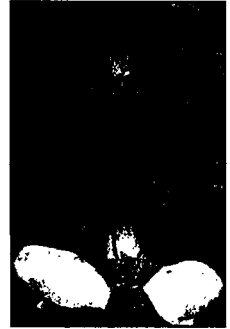
॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ পদভরসা

১৩১৫ সান**
২৬শে বৈশাখ

শুভার্থী
শ্রীরামনান্ ভট্টাচার্য্য

ভাই, যোতীশ, তুমি, আমাদের, স্নেহাশীর্ব্বাদ, নইবে, গতকল্য মধ্যাহ্ন সময়ে, তোমার প্রেরিত কার্ড পত্রিখানি পাইয়া, সমাচার অবগত হইয়াছি, তোমার অসুক যে কি, তাহা না নিখায়, ও অসুকের সম্বাদে বড়ই ভাবিত হইয়া রহিয়াছি, সুস্থতার সমাচার প্রদানে ভাবনা দূর করিবে, শ্রীমত্যা নক্ষি প্রভৃতি সকনেই ভগবানের কৃপায় ফাইন মঙ্গনে আছে, ও আছি, ঠাকুর করুন তুমি কুশনে থাক, তাহা হইনেই আমাদের, পরমানন্দ, অধিক আর কি নিখীব, নক্ষি, বর্তমান মাহার ২রা হইতে কাঁকুড়গাছি, প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে, জানিবে, আর তোমার খবর সত্বর দিবে ইতি

॥২॥

ওঁ নমো রামকৃষ্ণায়

১৩১৭ সান
১০ই পৌষ, প্রাতঃ

শুভাশীর্ব্বাদক,
শ্রীরামনান্ চট্টোপাধ্যায়

ভাই যোতীশ, বোদ্ধদিবসান্তে, তোমার প্রেরিত রিপ্লাই পোষ্টকার্ড পত্রিখানী যথাসময়ে প্রাপ্তে, সাতিশয় পরমাহ্লাদিত হইয়া, সমাচার বিদীত হইনাম, তোমার কাইকপীড়ার জন্য, বড়ই কষ্ট পাইয়াছ, শ্রুত হইয়া, অত্যন্তই ব্যথিত হইনাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাশীর্ব্বাদে, এক্ষনে যে, সুস্থতা নাভ করিয়াছ, তচ্ছ্রবনে, পরম সন্তোষ হইনাম, জানিবে। আর ৬কামারপুকুরের বাটীতে, কেবনমাত্র পূজনীয়া মাসিমাতা আছেন, তাহার পর, সকনেই, এখানে আছে, ও প্রভূকৃপায়, সকনে সারিরীক কুশনে আছেন ও আছি। ঠাকুরের চরণারবিন্দে প্রার্থনা করি, তুমি, মঙ্গনে থাক, কল্যাণীয়া শ্রীমত্যা নক্ষির এবং আমার, মঙ্গনাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, তুমি কেমন থাক, তৎসম্বাদ, মোধ্যে২ পত্রের দ্বারা জানাইনে, সুখি হইব, পরমারাধ্যা শ্রীযুক্তা খুড়িমা, সম্প্রতি উড়িষ্যাপ্রদেশ কোঠারে অবস্থান করিতেছেন, এবং সম্ভবতঃ তথায়, এক্ষণে কিছুদিন রহিবেন, আমরাও আগামী মাহায় একবার দেশে যাইব বনিয়া মানষ করিতেছি, কি, হয়, ঠিক নিখীতে পারিনাম না, কিমধিকং—মিতি

---

* শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, বরিশাল-নিবাসী যতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের পঞ্চম সন্তান নীহাররঞ্জন সেনগুপ্তের স্ত্রী অধুনা বাঁশদ্রোণী-নিবাসিনী আরতি সেনগুপ্তের সৌজন্যে পত্র-দুটি প্রাপ্ত।

** প্রাচীন বাঙলা লিপিতে 'ল'-এর স্থানে 'ন' ব্যবহৃত হতো। উপরে মুদ্রিত পত্রগুলিতে বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।—সম্পাদক

বৈশাখ ১৩১২
এপ্রিল ১৯০৫

সংবাদ ও মন্তব্য।

নিউইয়র্ক বেদান্তপ্রচার সমিতির সম্পাদিকা মিস এল. এফ. গ্লেন মহোদয়া ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদিগকে লিখিতেছেন,—

স্বামী অভেদানন্দ কানাডার অন্তর্গত টরোন্টোনিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক সমিতিতে একটী এবং ঐ নগরীর প্রধান হলে সাধারণ সভায় একটী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই দ্বিতীয় বক্তৃতাটীতে টরোন্টোর শত শত গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন। কিন্তু এই বক্তৃতার পর যখন তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল এবং তিনি যখন বিন্দুমাত্র চিন্তার পর্য্যন্ত সময় না লইয়া সেইসকল জটিল প্রশ্নের অতি সরল ও আশ্চর্য্য সমাধান করিয়া দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এইসকল তত্ত্ব আলোচনার জন্য বসিয়া রহিলেন এবং সকলেই স্বামীজীর পুরোভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার করমর্দ্দনের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় সকল সংবাদপত্রেই এই বক্তৃতার দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি সংবাদপত্র বলেন, "বিগত রজনীতে ভারতাগত স্বামী অভেদানন্দ এখানকার কনজারভেটারি মিউজিক হলে (Conservatory Music Hall) অপূর্ব্ব গভীর তত্ত্বপূর্ণ এক মনোহর বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ এই মহাদেশে হিন্দুদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়া সুপরিচিত এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে নিউইয়র্ক বেদান্তপ্রচার সমিতির কার্য্যভার পরিচালনা করিতেছেন।" আর একটী সংবাদপত্র সরলভাবে লিখিতেছেন,—"বক্তা মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় যেসকল গভীর তত্ত্বরাশি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কতকগুলি শ্রোতা মনে করিলেন, বক্তৃতান্তে প্রশ্নজাল বিস্তার দ্বারা ঐসকল তত্ত্ব অনায়াসে উড়াইয়া দিব, কিন্তু স্বামীজী ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য যেন প্রস্তুত ছিলেন। এই সভ্যতালোকপ্রাপ্ত কানাডায় স্বামীজীর সুস্পষ্ট স্বর, ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ নিপুণতা ও তত্ত্বজ্ঞোচিত ভাবের সম্মুখে এই সকল মতসর্ব্বস্ব বাদিগণের শুষ্ক, অসার, অস্পষ্ট প্রশ্নগুলি যেন ভাসিয়া গেল। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় 'হিন্দুজাতির ধর্ম্মবিজ্ঞান'। ঐ বক্তৃতার দ্বারা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কেবলমাত্র অজ্ঞানপ্রসূত—কানাডাবাসীর এই চিরন্তন ভ্রমবিশ্বাস একেবারে দূর হইল। স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতার কলেজে শিক্ষিত। তিনি জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি অতি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন।"

কানাডা গোঁড়া খ্রীশ্চিয়ানের প্রবল দুর্গস্বরূপ, এরূপ স্থানে এরূপ কৃতকার্য্য হওয়া বেদান্তপ্রচারকার্য্যের শুভ বিজয়চিহ্ন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্বামীজী যে যথার্থই কানাডায় বেদান্তের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কানাডায় অবস্থানকালীন প্রত্যেক ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। আর একটী সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেওয়া গেল,—"স্বামী অভেদানন্দ গত শুক্রবার রাত্রে কনজারভেটারি মিউজিক হলে অগণ্য শিক্ষিত ও চিন্তাশীল শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। টরোন্টোয় তাঁহার চার দিন অবস্থান হয়। স্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই এই কয়দিন তাঁহাকে লইয়া মাতিয়াছিলেন। তিনি ত্রিনীতি কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন ও তথাকার চ্যান্সেলর ও অধ্যক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। অধ্যাপক ক্লার্কের সহিতও তাঁহার আলাপ ও কথাবার্ত্তা হয়। রবিবার রাত্রে তিনি এক সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হন এবং যদিও সংযতাহার বলিয়া সকল সময়ে আহারে যোগ দিতে পারেন নাই, তথাপি যখনই তিনি এইসকল সুহৃৎসম্মিলনে গমন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার প্রতিভা ও বাগ্মিতা এইসকল ভোজগুলিকেই এক বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে।" শিক্ষাবিভাগের ইন্স্পেক্টর এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার জনপ্রিয় অধ্যক্ষপদপ্রার্থী হিউগ্স মহাশয় সাধারণ সভার সভাপতি হইয়া স্বামীজীকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ঐ নগরীর একজন প্রধান মেথডিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য উঠিয়া স্বামীজীরচিত অনেক গ্রন্থের প্রশংসা করেন এবং একজন স্কচ প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্‌রি আগ্রহসহকারে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া সপ্রেম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আতিথ্যসৎকার করেন। টরোন্টোর লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর স্বামীজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার সম্মানার্থ অনেকগুলি ভোজ ও চা-পান সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন,—"সকলেই অভেদানন্দ স্বামীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; ইহা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাই এক মহা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" স্বামীজী টরোন্টো হইতে চলিয়া আসিবার পর তথাকার জনৈক ব্যক্তি লিখিতেছেন,—"আমি অনেকের সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম; সকলেই আপনার সম্বন্ধে একবাক্য—একজন লোকও বিরুদ্ধবাদী নাই; আমার ধারণা, আপনার শুভাগমনে এখানে অনেক মহৎকার্য্যের বীজ রোপিত হইল।" স্বামীজী যাহাতে টরোন্টোয় আরো কিছুদিন থাকেন ও তথায় কালবিলম্বব্যতিরেকে একটা শাখা বেদান্তসমিতি স্থাপন করেন, অনেক ব্যক্তির এবিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই নিউইয়র্কে অন্যান্য অনেকগুলি কার্য্যের কথা থাকাতে তিনি আপাততঃ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিকালে স্বামী নির্ম্মলানন্দ এখানকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। 'ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা'—ইহাই তিনি তাঁহার বক্তৃতার বিষয়রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি এত স্পষ্টভাবে ও ওজস্বিতার সহিত অথচ সরল ও স্বাভাবিকভাবে তাঁহার চিন্তারাশি পরিব্যক্ত করেন যে, তিনি যে সর্ব্বদা বলিতেন—সাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই, তাঁহার একথা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রুকলিনে যে নূতন বেদান্তসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, স্বামী নির্ম্মলানন্দ তাহারও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ বিগত শীতঋতুতে ব্রুকলিনে যে দুইটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে, তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতাটীতে লোক দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। বেদান্তের উপর লোকের এই অপরিসীম অনুরাগের ফলস্বরূপ তথায় নিউইয়র্ক সমিতির শাখাস্বরূপ এক সমিতি খোলা হইয়াছে ও তথাকার 'ঐতিহাসিক সমিতি'র গৃহে একটী ঘর লইয়া উহাতে স্থানীয় সভ্যগণ যোগশিক্ষা করিতেছেন। এই শাখাসমিতির এত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হইতেছে যে, শীঘ্রই উহার স্থায়ী গৃহ হইয়া উহাতে রীতিমতো পৃথক্ বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

সঙ্কলন: রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ
সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩॥

শ্লোকার্থঃ *এই তিন গুণের দ্বারা সমুদয় প্রাণিজগৎ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। তাই ইহাদিগের পর (অর্থাৎ তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া) অব্যয় পরম সত্তা হিসাবে আমাকে কেহই জানে না।*

ব্যাখ্যাঃ জীবাত্মাগণ সকলেই ব্রহ্মের অংশ। জগৎ-লীলা ভোগ করিবার জন্য তাহাদিগকে একটি আবরণে আবৃত করা হইয়াছে। এই আবরণটি তিনগুণে নির্মিত। জীবগণ নিজেকে এই আবরণের সঙ্গে এক করিয়া ফেলে এবং সত্ত্বগুণের বশে ভোগ করিতে এবং রজোগুণের বশে ছোটাছুটি করিতে ও তমোগুণের বশে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়। ইহাই সৃষ্টিরহস্য।

জীব এই আবরণে আবৃত হইয়া স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া এই অতি তুচ্ছ জীবনলীলা সম্ভোগ করিতেছে। কিছুতেই তাহার স্বরূপ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। পরমব্যয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইলেও ব্রহ্মের বিন্দুমাত্র ব্যয় হয় না—সেইজন্য ইহা অব্যয়।

(বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই—ব্রহ্মই রহিয়াছেন। ঠাকুর, স্বামীজী সবই ব্রহ্ম দেখিয়াছিলেন। তবে যে-জগৎ আমরা দেখি তাহা এই মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখি অর্থাৎ দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ মায়ার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া কিরূপে ইহা হয়, কারণ কি ইত্যাদি জানা যায় না।)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪॥

শ্লোকার্থঃ *তাহা হইলে কি তোমাকে কেহ জানিতে পারে না?—এই প্রশ্ন অর্জুনের মনে উদিত হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীভগবান পুনরায় বলিলেন—আমার এই অলৌকিকী গুণময়ী মায়া দুস্তরা। তথাপি অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যথার্থ ভক্ত আমার স্বরূপ জানিতে পারে।*

ব্যাখ্যাঃ দৈবী অর্থাৎ যাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা বোঝা যায় না, জগতের অতীত। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ্যান-চিন্তা করিলে অনুভব করা যায়। গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, দুরত্যয়া = দুঃ (দুঃখেন) অত্যয় (অতিক্রম্য)—যাহা অতিক্রম করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। বহুদিন তত্ত্ববিচার, সৌন্দর্যচিন্তা করিয়া মনকে সূক্ষ্ম করিতে হয়। সেই সূক্ষ্ম মন স্বরূপে দীর্ঘকাল যুক্ত করিয়া রাখিলে মায়ার পারে গিয়া ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করা যায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥১৫॥

শ্লোকার্থঃ *তাহাই যদি হয় তাহা হইলে সকলে তোমার ভজনা কেন করে না?—এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান বলিলেন—মূঢ়, নরাধম, দুষ্কর্মকারিগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া আসুরভাব প্রাপ্ত হয়। তখন আমাকে ভজনা করিবার কথা তাহাদের চিন্তাতেই আসে না।*

ব্যাখ্যাঃ লক্ষ্য করিলে সৃষ্টিতে বৃক্ষলতা হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্বান মনুষ্য পর্যন্ত বুদ্ধির বিবর্তন (evolution) বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভোগ করিবার প্রবৃত্তি তৃপ্ত না হইলে জীবের ভিতরে সাত্ত্বিক গুণের প্রকাশ হয় না। বহু জন্ম ধরিয়া সংসারের বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ভোগেচ্ছা ক্রমে প্রশমিত হইয়া অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই turning point-এ সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে মানব মুক্তির লক্ষ্যে চলিতে শেখে।

[মন্তব্যঃ শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মূঢ় = বিবেকশূন্য ব্যক্তি। অপহৃতজ্ঞান কে? যাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল, তথাপি আসল সময়ে শাস্ত্র কিংবা আচার্য-কর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞান হারাইয়াছেন, অর্থাৎ সাদা বাঙলায়—জ্ঞানপাপী। মানুষের মধ্যে আসুরভাবের বিস্তারিত বিবরণ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান দিয়াছেন। —সম্পাদক]

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥১৬॥

শ্লোকার্থঃ *হে ভরতর্ষভ! আর্ত (রোগী), আত্মজ্ঞানেচ্ছু (জিজ্ঞাসু), ভোগসাধনেচ্ছু (অর্থার্থী) এবং আত্মবিৎ (জ্ঞানী)—এই চারপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার (ভগবানের) ভজনা করে।*

ব্যাখ্যাঃ জীব স্বরূপত ব্রহ্ম, কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষাবশত তাহার বুদ্ধি মলিনতাবৃত। বিবর্তনের শেষদিকে মানুষের যখন

পরোপকার করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহার বুদ্ধি হইতে মলিনতা কমিতে থাকে এবং সে বোধ করে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক এক শক্তি নিশ্চয়ই আছেন। তাহাকে ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি বলা যায়। তখন বিপদে পড়িলে সে উদ্ধারের আশায় ভগবানকে প্রার্থনা করে। ভোগবাসনা তৃপ্তির বা বস্তুলাভের আশায় তাঁহার উপাসনা করে। এইসব উপাসনার ফলে বিপন্মুক্ত হওয়া এবং ভোগপ্রাপ্তি ছাড়াও মানুষের মনে একটা প্রশান্তি-সুখ অনুভূত হয়। তাহার ফলে ভগবান ব্যাপারটি কি তাহা তাহাদের জানিবার (জিজ্ঞাসু) ইচ্ছা হয়। সর্বশেষে মানুষ ভগবানের তত্ত্ব বা স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তখন ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—এইরূপ firm conviction জ্ঞানী বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বোধে বোধ করে। একজন ভগবান আছেন বলিয়া সংস্কার হইয়া রহিল। এই কারণেই অর্থার্থী ও আর্তকেও ভক্ত বলা হয়েছে। নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য বা পরকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য যেসব উপকারমূলক কার্য, তাহা মোটেই পরোপকার নহে। যে-কার্যের দ্বারা কাহারো উপকার করিবার ইচ্ছা, দেখিতে হইবে সেই কার্যে সেই ব্যক্তির উপকার হইতেছে কিনা। এমনকি প্রভুত্বলাভের জন্য দল পাকাইবার উদ্দেশ্যে স্বদলীয় লোককে সাহায্য করা, তাহাও প্রকৃত পরোপকার নহে। এইপ্রকার পরোপকারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। মনের ভিতর অপরের সহিত ঐক্যবুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। মনের ভিতর কোন motive (মতলব) থাকিলে ঐক্যবুদ্ধি হয় না।

ক্ষুদ্র দেবতা কে?—অ-সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট জীবকে দেবতা বলে। যাহারা সাংসারিক সামান্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ হইতে অধিক শক্তিবিশিষ্ট কোন দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দেবোপাসক। যখন স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষায় পাশের জন্য শিবের কাছে কিছু মানত করে, তখন শিব যথার্থ শিব নহেন, পরন্তু দেবতা; কারণ ভক্ত শিবের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি এমনকি মুক্তিদানের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ; সে কেবল শিবকে ঐ তুচ্ছ কাজটি করিতেই সক্ষম বলিয়া মনে করে। মানত নিষ্ফল হইলে সে দেবতার ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং সফল হইয়া গেলেও দেবতার কথা আর শোনে না। বহরমপুরের একটি ছেলে পরীক্ষাপাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজা করিত, কিন্তু সে পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় ছবিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। নির্মল সান্যালের বাবা, কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূজা করিতেন, তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ছবি শ্মশানে পোড়াইতে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭॥

শ্লোকার্থ : *তাঁহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত, একভক্তিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়।*

ব্যাখ্যা : ঈশ্বর কি, তাহা যিনি বুঝিয়াছেন—তিনিই জ্ঞানী। অপরোক্ষানুভূতি হইলে তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুদ্ধচিত্তে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়, যে-বুদ্ধিতে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ব্রহ্মব্যতীত আর কোন বস্তুর সত্তা থাকিতেই পারে না—সেই বুদ্ধিলাভ হইলেই সাধককে জ্ঞানী বলা যায়। জ্ঞানী দেখেন বা বুঝেন যে, আমি ভ্রমবশত নিজেকে 'দেহ' ভাবিয়া অভাবগ্রস্ত, অসম্পূর্ণ মনে করি। কিন্তু তাহা সত্য নহে। জ্ঞানী সাধক দেখেন, এই অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কিছু ভাবিবার, কিছু করিবার, কিছু চাহিবার থাকে না। সেই সাধক 'নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু' এই ভাব লইয়া পরম শান্তিতে দিনযাপন করেন।

ভগবৎ তত্ত্ব না জানিলে ঈশ্বরকে দয়াময়, কৃপাময়, পাপনাশকারী, মুক্তিদাতা বলিয়া মনে হয়। অথবা কখনো নিষ্ঠুর, নির্দয় বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু স্বরূপত তিনি নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ। একটা লোক শীতে খুব কষ্ট পাইতেছিল। এক বাড়িতে আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া আগুনের কাছে গিয়া বসিল; তখন সে বোধ করিল যে, আগুন দয়া করিয়া তাহার কষ্ট দূর করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আগুন তাহার কিছু করিল না। সে নিজে আগুনের কাছে পুরুষকার সহায়ে বসাতে তাহার দুঃখ দূর হইল। ঠিক সেইরূপ ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সহিত যে দূরত্ববোধ আমাদের রহিয়াছে, তাহা দূর হওয়ামাত্র আমাদের 'আমি'র ভিতর দিয়া সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব না জানার জন্য মনে করি, তিনি যেন আমা হইতে এক স্বতন্ত্র বস্তু এবং আমার দুঃখ দেখিয়া তিনি যেন কৃপা করিলেন। জ্ঞানী ঈশ্বরকে নিজের ভিতরে অনুভব করেন, তাই তাঁহাকে 'নিত্যমুক্ত' বলা হইয়াছে। জ্ঞানী ইহাও বোঝেন যে, বিপদ হইতে অব্যাহতি, ভোগপ্রাপ্তি, মুক্তিলাভ, ভক্তিলাভ, জ্ঞানলাভ ঐ এক পরমাত্মা হইতেই আসে। তাই তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'একভক্তি'।

ভগবানের প্রিয়-অপ্রিয় কেহ নাই; কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার নিজের দুরবস্থা ভগবান দিয়াছেন ভাবিয়া ভগবান কাহাকেও ভালবাসেন, কাহাকেও ভালবাসেন না মনে করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীরা দেখেন, যে-ব্যক্তি ভগবানকে যত কম ভালবাসে, ভগবান হইতে সে তত দূরে। উহাই তাহার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। আর জ্ঞানী ব্রহ্মকে সর্বময় এবং নিকটতম বস্তু বলিয়া বোধ করেন এবং সেই বোধে সর্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিচরণ করেন। তাই বুদ্ধিহীন লোক ভাবে—এই লোকটিকে ভগবান বড় ভালবাসেন। মোটকথা, ভগবানের তত্ত্ব না জানিলে মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যেসব চিন্তা করে, তাহা অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। তাই সকলেরই ভগবানের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা উচিত—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

সকলেই আমার প্রিয়, যদি তুমি জ্ঞানী হও তবে তুমি যে আমার প্রিয় তাহা অনুভব করিতে পারিবে।

[ক্রমশ] ॥ উনত্রিশ ॥

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সভাগুলিতে আপনার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে আপনার কী মনে হয়—ভারত ও আমেরিকার যুবসমস্যার প্রধান পার্থক্যগুলি কী কী?*

উত্তর ঃ একটা প্রধান পার্থক্য হলো—আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি তৈরি হয় অনুন্নত অবস্থা থেকে, আমাদের আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা থেকে। এইসব সমস্যা হলো চাকরি পাওয়া, চাকরির সুযোগ তৈরি হওয়া ইত্যাদি। খুব সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পয়সাও এখানে সকলের নেই। আমেরিকায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণ—ভোগ্যপণ্য সেখানে উদ্বৃত্ত। বস্তুত, বর্তমান আমেরিকায় তথাকথিত 'ধনী সমাজ'-এর ধারণার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে উঠেছে। যুবসম্প্রদায়ের অনেকে খুব বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল। তাদের আদর্শবোধ তাদের পরিচালিত করছে আমেরিকার এই ধনী সমাজ হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে।... আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ এক প্রতিবাদ। কখনো কখনো দারিদ্র্যের চেয়ে প্রাচুর্যই অধিকতর ও গভীরতর সমস্যার জন্ম দেয়। সমসাময়িক আমেরিকায় আমি এটি দেখেছি। হাজার হাজার বছরের দারিদ্র্য মানুষের আন্তর সত্তাকে মেরে ফেলতে পারেনি, কিন্তু কয়েকশো বছরের প্রাচুর্য হয়তো সেটা সহজেই করে ফেলবে। আধুনিক মানুষের বেশ ভালমতো এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

ভারতে আমাদের নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। শিল্পপ্রযুক্তির উন্নয়ন, আর্থিক সুযোগসুবিধা লাভ ইত্যাদির মাধ্যমে সেইসব সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবশ্য, এইসব ক্ষেত্রেও সমস্যাগুলির বিশেষত্ব আছে; কারণ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য যে কী, তা আমাদের নিজস্ব দর্শনের সাহায্যে খুব একটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। এখনো আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো কেবলই 'চালকলা-বাঁধা', অর্থাৎ সে-শিক্ষা উপার্জন-কেন্দ্রিক। আবার, শুধুই অর্থ রোজগারের উপায়মাত্র হওয়ায় এই শিক্ষা মানুষের অন্তরের কিছু কিছু উচ্চতর প্রেরণা বা আকুতির কণ্ঠরোধ করে। ফলে আচার-ব্যবহারে আমরা হয়ে পড়ি দিশাহীন। আমরা কেবল পথই হাঁটি, যদিও জানি না কোথায় চলেছি। কোন মানুষের পরিপূর্ণ শক্তি থাকলেও তার যদি কোন সদ উদ্দেশ্য না থাকে, উচ্চতর লক্ষ্য না থাকে, তবে সে সেই শক্তিকে প্রকাশ করে ধ্বংসাত্মক পথে। ভারতের বর্তমান যুবসমাজের বিপথগামী কার্যকলাপের কারণ অনেকটাই এই লক্ষ্যহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা—যা ইতোমধ্যেই সমাজের উচ্চতর স্তরেও ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। এর কারণ হলো, এই যুবসমাজকে উচ্চতর কোন আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। এমনিতে কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য পাওয়া যায়। এখন এইসব উচ্চ ভাব যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তবেই আমরা আমাদের সার্বিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারব ও অধিকতর আর্থিক উন্নয়নের পথে এগোতে পারব। তখন আমরা প্রগতির লক্ষ্যে মানুষের যে-জয়যাত্রা, তাতে সামিল হতে পারব—শুধু আর্থিক দিক দিয়েই নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও। একদিন আমরা ঠিকই এইসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব, কারণ আমাদের শুধু রোগই নেই, সেইসঙ্গে তার প্রতিকারও আছে। ভারতবর্ষ সৌভাগ্যবান, কারণ তার রোগের সঙ্গে সঙ্গে সে-রোগের প্রতিকারটিও জানা আছে।

সেই প্রতিকারটি আছে আমাদের দর্শন ও অধ্যাত্ম-ভাবনায়। কিন্তু এইসব ভাব-ভাবনাকে প্রায়ই এমনভাবে পেশ করা হয় যে, তা আমাদের যুবমানসকে স্পর্শ করতে পারে না। এসব ভাব আমাদের পরিবেশন করতে হবে যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে—স্বৈরাচারীর হুকুম জারির মতো করে নয়। ভারতে আমি নিজে দেখেছি, ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিসম্মত দার্শনিক দিকগুলি তুলে ধরলে তারা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়; কিন্তু কেবল 'এটা করো, ওটা কোরো না' বললে তা হয় না। আধুনিক যুবসমাজ কখনোই ঐরকম চাপিয়ে-দেওয়া বিধিনিষেধে সাড়া দেবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বর্তমান সমস্ত যুব-আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো একচ্ছত্র-কর্তৃত্ব-বিরোধিতা। তবে হ্যাঁ, আমাদের আছে এমন একটি দর্শন, যা জগৎ-বহির্ভূত কোন 'প্রভু' বা শাসকের আজ্ঞাধীন নয়, যা দাঁড়িয়ে আছে কেবল যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয়ের ওপর ভর করে। যুবসম্প্রদায়ের কাছে কীভাবে এই দর্শন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? ভারতে এটাই আমাদের সমস্যা। সঠিক খাদ্য আমাদের আছে, কেবল বুভুক্ষু মানুষের কাছে তা ঠিকমতো পৌঁছে দিতে হবে। অন্যদিকে, অপরাপর দেশে খাদ্যটাও কিন্তু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমাদের

এই যে খাদ্য, তা উচ্চতর গুণসমৃদ্ধ; এই খাদ্য মানব-ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে।

প্রশ্ন ঃ *আমেরিকার যুব-বিক্ষোভগুলির মধ্য দিয়ে নতুন একটা জাগরণের চেয়েও কি বেশি করে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠছে?*

উত্তর ঃ এটা মূলত একটা হতাশা; আর সামান্য কিছুটা জাগরণ। হতাশাটাই ক্রমশ বড় হয়ে ফুটে উঠছে। আসলে, জাগতিক দিক দিয়ে অতি-উন্নত সমাজ প্রায়ই মানুষের কিছু কিছু মূল্যবান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে ফেলে বা অপচয় করে। এর ফলে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জীবনে কখনো কখনো এই জগতের ব্যাপারে একটা অবসাদ এসে উপস্থিত হয়—যেটি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ৭৫ বছর আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন! পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন সভ্যতার যাত্রাপথে কখনো কখনো জগৎ-ব্যাপারে এই অবসাদ, এই ক্লান্তিকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এখন কতকটা এইরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে। বিশেষত যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় এটা খুব বেশি করেই দেখা যাচ্ছে। ভাবটা হলো—এতসব কীসের জন্য? এত সম্পদ, এত ক্ষমতা, প্রযুক্তির এত উন্নতি—এসব আসলে কীসের জন্য?... কোথায় হারিয়ে গেল মানুষের আসল স্বরূপ? আসল মানুষটা আজ কেমন আছে?—এইসব প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে।

এইভাবে মানুষের মনে তৈরি হচ্ছে জীবনের গভীরতর অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে বের করার এক মৌলিক তাগিদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এইসব আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনমূলক লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারার উপযুক্ত কোন দর্শন ওদেশে নেই। এই কারণে আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত এক ঘটনা—সেটি ড্রপ-আউট (drop-out)-দের কেন্দ্র করে। এটি হালের একটি শব্দ। তারাই 'ড্রপ-আউট'—যারা সমসাময়িক সমাজব্যবস্থাকে বিশ্বাস করে না, সে-সমাজে বসবাস করে না। অনেক কমবয়সী ছেলেমেয়েই আজ ড্রপ-আউট। তারা তাদের সমাজে থেকে সুখী নয়। কিন্তু ড্রপ-আউট হয়ে অর্থাৎ একটা সমাজব্যবস্থা থেকে 'ড্রপ' করে বা বেরিয়ে এসে তারা কোন্ ব্যবস্থায় ঢুকছে? কোন ব্যবস্থাতেই নয়—কেবল উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের নাম 'হিপি'। ওরা আমেরিকান সমাজের অন্তর্গত নয়। তাহলে কীসের অন্তর্গত? এর উত্তর ওরা জানে না; আর তাই ওরা সমাজের কাছে একটা সমস্যা; সমস্যা নিজেদের কাছেও। ওদের কেউ ভিড়ছে অপরাধজগতে, কেউ ড্রাগের নেশায়, কেউ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে—কখনো বা হিংস্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। অল্প কয়েকজন কেবল উচ্চতর কোন আধ্যাত্মিক চিন্তার পথ ধরছে। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজের, বিশেষ করে আমেরিকান সমাজের এটি একটি সমস্যা।

আমেরিকার অনেক সভায় একথা বলেছি যে, ভারত বহুকাল আগে এই ড্রপ-আউট বা ইচ্ছাকৃত সমাজচ্যুতির সমস্যার কথা ভেবেছে ও তার জন্য ব্যবস্থা রেখেছে। ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকজন পুরোধাপুরুষই ছিলেন ড্রপ-আউট। আমি এতদূর বললাম যে, বুদ্ধ নিজেই ছিলেন একজন ড্রপ-আউট! কথাটা ওদের কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আসলে, বুদ্ধ সমসাময়িক ভারতীয় সমাজকে পছন্দ করেননি। তিনি কী করলেন? তাঁর এই সমাজ-প্রত্যাখ্যান-মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করার উপযুক্ত নিজস্ব একটি গঠনমূলক পথ ছিল। ভারতের বুকে তিনি জন্ম দিলেন অসামান্য শক্তিধর এক নবজাগরণের, যা ক্রমে সমগ্র এশিয়াতেই তার প্রভাব বিস্তার করল। ড্রপ-আউটদের মধ্যে এইরকম অনেক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

যেটা দরকার সেটা হলো, ড্রপ-আউটদের শক্তি ও সামর্থ্যকে উপযুক্ত খাতে যথাযথভাবে বিকশিত হতে দেওয়া। আমি নিজেই একজন ড্রপ-আউট—একথা বহু ভাষণে বলেছি। সামাজিক দৃষ্টিতে আমি একজন ড্রপ-আউট। তবে, সমাজের জন্য আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে, আর আমার নিজস্ব এমন একটা পথ আছে যেটার মাধ্যমে আমি আমার ড্রপ-আউট মানসিকতাকে প্রকাশ করতে ও যথার্থভাবে গঠনমূলক করে তুলতে পারি। আমেরিকান ঐতিহ্যে কিন্তু এইসব ব্যবস্থা নেই। ড্রপ-আউট তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তবে আমি নিশ্চিত যে, অন্যান্য সভ্যতার সাহায্য নিয়ে আমেরিকাও তার এইসব নতুন ও মহাশক্তিশালী প্রবণতাকে গঠনমূলক ধারায় প্রকাশ করার রাস্তা বের করে নেবে। এইভাবে আমরা সমস্যাগুলি নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছি। ছাত্রছাত্রীরাও এই ধরনের আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। কখনো কখনো এক ঘণ্টার বক্তৃতার পর তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলেছে। ওখানে এইসব বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ আছে। এসব ভাব ওদের কাছে নতুন। [ক্রমশ]

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪৪

পাশাপাশি ঃ (১) ভাববার কথা, (৬) তত, (৮) লাহোর, (৯) জগমোহন, (১০) মান, (১৩) এস, (১৪) পরিব্রাজক, (১৬) চরম, (১৭) নব, (২১) ভারতের দান।

ওপর-নিচ ঃ (১) ভারত, (২) বাঘা, (৩) কর্মযোগ, (৪) অচলানন্দ, (৫) দ্বারকাদাস, (৭) তপন, (৯) জন, (১০) মানসচক্ষে, (১১) কূপমণ্ডুক, (১২) ঝোঁক, (১৩) এডেন, (১৫) জয়পুর, (১৮) বসন, (১৯) সার।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

রুণা রায়চৌধুরী, অলক পাল চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ি

অরিন্দম দাস

তথ্যনিষ্ঠ গবেষক নির্মলকুমার রায়ের অকস্মাৎ প্রয়াণে 'মাতৃতীর্থপরিক্রমা'র মতো আকর্ষণীয় বিভাগটি বন্ধ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কা করে 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও নির্মলবাবু চলে যাওয়ার ফলে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণীয় নয়, তথাপি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে এই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিন্দম দাস। শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানের বর্ণনা প্রকাশ এখনো অনেক বাকি আছে। এবারে উনত্রিংশতম পর্যায়ে 'নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ি'তে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান ও তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলির বিবরণ দিয়েছেন অরিন্দম দাস।—সম্পাদক

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তথা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' যাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিল, সেই অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অর্পিত জগৎকল্যাণব্রতের গুরুদায়িত্ব আপন আপন স্কন্ধে ধারণ করে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবী এবং প্রধান বাণীবাহক স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যা ও অনুভূতি-সঞ্জাত অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে তরুণ সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যের মাটিতে পা রেখেছিলেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষপাদে। ভোগজর্জর পাশ্চাত্যবাসীকে তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে আমন্ত্রণ জানাবেন শান্তি, মৈত্রী ও করুণার অমৃত আস্বাদনের জন্য। আর ঠিক সেইসময় প্রাচ্যের মাটিতে সেই অমৃতভাণ্ডার স্থাপন করে নিখিল বিশ্বের চিরদগ্ধ চিত্তে প্রেমৈকবিন্দু সিঞ্চনের অঙ্গীকার গ্রহণ করে অগ্নিতপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী।

১৯৩৬ সালে গৃহীত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ির চিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছিল তীব্র বৈরাগ্যের অগ্নি। জীবনধারণই তখন অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। "তোমার মরা হবে না, তোমায় থাকতে হবে।"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৈববাণী তাঁর কর্ণে বারংবার ধ্বনিত হলেও কিছুতেই নির্বাপিত হচ্ছিল না শোকের তীব্র দহনজ্বালা। ইতোপূর্বে কাশীবাসকালে এক নেপালী সন্ন্যাসিনী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন পঞ্চতপা মহাব্রত করার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কিছুকাল পর থেকে এক শ্মশ্রুমণ্ডিত সন্ন্যাসীও তাঁকে বারবার ঐ একই কথা বলে আসছিলেন। অবশেষে পঞ্চতপা করার সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রীশ্রীমা। সেটি ছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই)। তাঁর নিজের কথায়ঃ "যেদিন পঞ্চতপা করব, সেদিন যখন এল, আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল—খালি ভয় হতে লাগল, কি করে আগুনের ভেতর সেঁধুব! বুঝে দেখ কী ব্যাপার! পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারটে ঘুঁটের আগুনের বেড় মোটা করে গোল করে রাখা হয়েছে—দাউদাউ করে জ্বলছে, আমার মাথার ওপর ঠিক দুপুরের সূর্যি—দারুণ গরমি কাল। গঙ্গায় নেয়ে এসে কি করে আগুনের ভেতর ঢুকব তাই ভাবছি, মেয়ে যোগেন (যোগীন-মা) সাহস দিয়ে বললে, 'মা, ঢুকে পড়—ভয় কি?' তার কথায় সাহস পেয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করে ঢুকলুম, মাঝখানে গিয়ে বসলুম—সন্ধ্যে পর্যন্ত রইলুম। এইরকম পাঁচ পাঁচদিন করলুম। শরীরটা পোড়া কাঠ হয়ে গেল, তবে গিয়ে মনের আগুন নিবল।"[১]
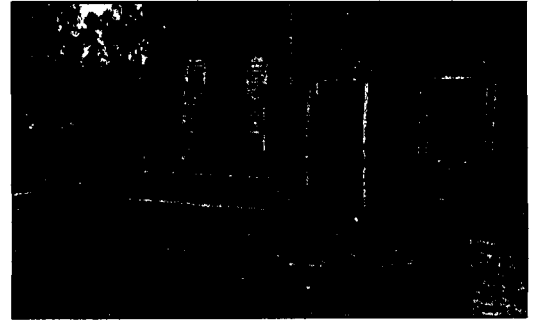
এই ছাদেই শ্রীশ্রীমা পঞ্চতপা করেছিলেন। *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

জনৈক সন্ন্যাসী পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "আপনার অতশত করবার কী দরকার?" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেনঃ "বাবা, কেন জান? তোমাদের জন্যে। ছেলেরা কি অত করতে পারবে? দেখছ না—গোলাপ কেমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুচ্ছে। তাই সব করতে হয়। আমি আর কী করেছি? ঠাকুর কত বেশি করেছেন!"[২]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রখ্যাত জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখছেনঃ "পঞ্চতপার ফলে প্রাণের জ্বালা নিভিলেও শরীরধারণের প্রয়োজন তাঁহার নিকট তখনো চূড়ান্তরূপে প্রতিভাত হয় নাই। আরেক অভিনব দর্শনের ফলে উহারও বিলম্ব হইল না।"[৩] সেই 'দর্শন'-এর কথা শ্রীশ্রীমা স্বয়ং জানিয়েছেনঃ "সেদিন পূর্ণিমা—চাঁদ উঠেছে। আমি ঐ সিঁড়ির ওপরে (নীলাম্বরবাবুর বাড়ির সামনে ঘাটের সিঁড়ি) বসে গঙ্গা

দেখছি। দেখি কি, পেছন থেকে ঠাকুর এসে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গঙ্গায় গিয়ে মিশে গেলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে লাগলুম। কোথা থেকে অমনি নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গার ধারে এল আর দুহাতে সেই জল নিয়ে ছিটোতে লাগল। ওমা, দেখি কি, গোনা যায় না—এত লোক কোত্থেকে এসে নরেনের হাতের জল পেয়ে মুক্ত হয়ে যেতে থাকল! ঐ দেখার পর থেকে কদিন আর গঙ্গায় নামতে পারিনি।"[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের এই অপূর্ব দর্শনটি হয়েছিল, ঠিক সেইসময়ে আমেরিকার বিশ্বধর্মমহাসভায় 'জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য' স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটছে। এই দর্শনের পরই শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যনেত্রে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যে আগমনের তাৎপর্য এবং সে-লীলায় তাঁর ও স্বামী বিবেকানন্দের অবিসংবাদী ভূমিকাগ্রহণের গুরুত্ব।

এই ঘরেই শ্রীশ্রীমা বাস করেছেন *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

শ্রীশ্রীমায়ের এমন বহু দিব্য লীলার সাক্ষী এই পবিত্র উদ্যানবাটীর মালিক ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। তিনি পেশায় ছিলেন উকিল, থাকতেন কলকাতার বিডন স্ট্রিটে নিজস্ব বাড়িতে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি, পরে সেখানকার রাজস্ব সচিব এবং তারও পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে তিনি এই বাগানবাড়ির মৌরসী পাট্টা লাভ করেন।[৫]

আলমবাজার থেকে এখানে মঠ স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য কয়েকবার এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট প্রায় দেড়বছর[৬] এবাড়িতে বসবাস করেছেন। প্রথমবার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি প্রায় ছয়মাস এবাড়িতে ছিলেন। এই কালেই স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রকৃতিং পরমাম্' স্তোত্রটি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেয়ে শোনান। শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন : "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" এসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের সেবক ছিলেন স্বামী যোগানন্দজী। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী। স্বামী অদ্ভুতানন্দজীও এসময়ে কিছুদিন এখানে বাস করেন। এই বছর ১১ জুলাই রথযাত্রার দিন শ্রীম 'কথামৃত'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করে শ্রীশ্রীমাকে শোনান এবং তাঁর অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করেন। শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ৩০ অক্টোবর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। এবাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সাধু নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন : "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।" সম্ভবত এটি ছিল নাগ মহাশয়ের প্রথম মাতৃদর্শন।[৭]

এই বাড়িতেই একদিন শ্রীশ্রীমা সন্ধ্যার পর ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন। ক্রমে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হন। বহুক্ষণ পর অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে এসে তিনি বলতে থাকেন : "ও যোগেন! আমার হাত কৈ, পা কৈ?" যোগীন-মা ও গোলাপ-মা তাঁর হাত-পা টিপতে থাকলে বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর দেহবোধ ফিরে আসে। তিনি স্বয়ং একবার বলেছেন : "এইসময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি—এইসব জ্যোতিতে মন লীন হতো। আর দু-চার দিন থাকলে দেহ থাকত না।"[৮] বলেছেন : "আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম। কী শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল।"[৯]

শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসে, অবস্থান করেছিলেন জগদ্ধাত্রীপূজার কয়েকদিন আগে পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস। এই কালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চতপা অনুষ্ঠান। আবার এবছর জুলাই মাসে তাঁর কাছে মহামন্ত্র লাভ করেছিলেন কালীকৃষ্ণ—পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী। তিনি এখানে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দুরাত্রি বাস করেছিলেন। তাঁর বিদায়কালীন দৃশ্যটি অপূর্ব—তাঁর নিজের কথায়—"সন্ধ্যাবেলা, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, টিপটিপ করে জল পড়ছে।... বিদায় নিয়ে পাশের খেয়াঘাটে চড়লুম। বরাহনগর ঘাটে পাড়ি মারবার জন্য নৌকা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ির সুমুখ দিয়ে উত্তরদিকে চলল। সন্ধ্যায় আলো-আবছায়ায় মায়ের ঘরের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম, মা ছাদের ওপর থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।"[১০]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজা পর্যন্ত প্রায় তিনমাস শ্রীশ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ছিলেন। এই কালের কোন ঘটনা বিশেষ জানা যায় না। এরপর তিনি এবাড়িতে আসেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এবছর তিনি তিনদিন এবাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন—২৮ মার্চ, ১২ নভেম্বর এবং ২০ ডিসেম্বর। ২৮ মার্চ (১৫ চৈত্র ১৩০৪) ছিল বাসন্তীপূজার ষষ্ঠী। মঠবাসীদের আমন্ত্রণে তাঁর আগমন হয়েছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখছেন : "তাঁহার সঙ্গে আসিলেন স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (স্বামী ধীরানন্দ) এবং গোলাপ-মা। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র মঠে

মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল এবং শ্রীশ্রীমা অবতরণ করিলে সন্ন্যাসীরা তাঁহার শ্রীচরণ ধুইয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে ঠাকুরঘরের দালানে বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। ক্রমে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া গেলে তিনি পূজার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন; পূজাশেষে তিনি ভোগনিবেদন করিলেন, ওপরে ঠাকুরকে শয়ন দিলেন।"[১১] বিকাল ৪টার সময় নৌকা করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীমা পাশে মঠের নিজস্ব ভূমিখণ্ডে পদার্পণ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মতে, এটি ছিল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের কোন এক দিন। কিন্তু স্বামী প্রভানন্দজী মঠের ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, দিনটি ছিল ২৮ মার্চ।
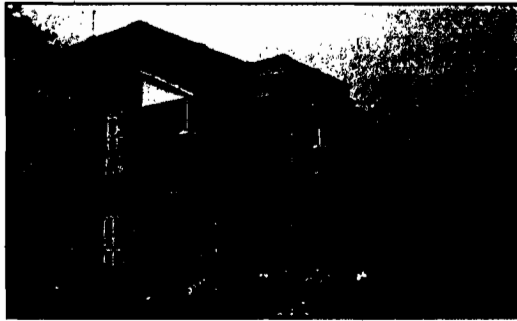
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ি—এখন যেমন *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

এই বছর ১২ নভেম্বর শ্যামাপূজার আগের দিন শ্রীশ্রীমা তাঁর নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ নৌকাযোগে এই বাড়িতে আসেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি মঠের নতুন জমিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বহস্তে পূজা করে এখানে আবার ফিরে আসেন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করে বিকালে নৌকাযোগে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী এবং সারদানন্দজীর সঙ্গে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। ২০ ডিসেম্বরের কোন বিশেষ ঘটনার কথা জানা যায় না। সম্ভবত এদিন মঠের নতুন জমিতে পদার্পণকালে কোন এক সময় শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন।

এরপরে শ্রীশ্রীমা এবাড়িতে আসেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন (১৮ অক্টোবর)। এবছর স্বামীজীর উদ্যোগে বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিনগুলিতে শ্রীশ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থান করে ২৩ অক্টোবর কলকাতায় ফিরে যান। প্রসঙ্গত, ততদিনে মঠ বেলুড়ের নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপরে বেলুড়ে এলে শ্রীশ্রীমা নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে আর বসবাস করেননি। তিনি মঠের উত্তরে লেগেট হাউসে বসবাস করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এগারো মাস (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮—২ জানুয়ারি ১৮৯৯) অবস্থান করেছিল ৪৮নং লালাবাবু সায়র রোডে নীলাম্বরবাবুর এই বাগানবাড়িতে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িতেই স্বামীজী 'খণ্ডন ভববন্ধন' আরাত্রিক স্তোত্রটি রচনা করেছিলেন।[১২]

প্রথমে এই বাগানবাড়িটি ছিল একতলা, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কিছু কাল পরে দোতলায় একটি ঘর ও সিঁড়ি নির্মিত হয়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা যখন এবাড়িতে প্রথম আসেন, ততদিনে দোতলার ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য এই বাড়িটি ভাড়া পাওয়া যায়নি। হয়তো সেসময়ে বাড়িটিতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ চলছিল। সম্ভবত এই সময়েই বাড়ির পশ্চিমদিকে 'L' আকারে সংলগ্ন একটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একতলা বাড়ি তৈরি হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এরই ছাদে শ্রীশ্রীমা পঞ্চতপা করেছিলেন। ইদানীং দোতলায় যে-ঘরটি 'শ্রীমায়ের ঘর' বলে পরিচিত, সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠ অধিগ্রহণ করে এই ভবনটির সংস্কারসাধন করেন। নবসংস্কৃত এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সবুজের বিপুল সমারোহে, নানা বর্ণময় পুষ্পের মনোরম আলপনায় অলঙ্কৃত উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করলেই এর শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশ মনকে সহজেই ঋতপথে আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান ও তপস্যা-পূত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পশ্চিম তটে আজও সগৌরবে বিদ্যমান নীলাম্বরবাবুর এই বাগানবাড়িটি। সর্বসাধারণের জন্য এর প্রবেশদ্বার খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। ❑

পথনির্দেশ : ঠিকানা—নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ি, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া। বাগবাজার বা কুঠিঘাট থেকে লঞ্চ বা নৌকা-যোগে বেলুড়ে নেমে কিছুটা এগিয়ে গেলে বামদিকে পড়বে এই উদ্যানবাটীর সদর দরজা। জি. টি. রোড থেকেও এখানে আসা যায়। বেলুড় মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ('পল্লিমঙ্গল'-এর সামনের) ফটক থেকে লঞ্চঘাটের দিকে যেতে অথবা মঠের পশ্চিমদিকের প্রধান ফটকের ডানদিক দিয়ে যে-রাস্তাটি লঞ্চঘাটের কাছে গেছে, সেই পথে গেলে ডানদিকে এই বাগানবাড়িটি পড়বে।

তথ্যসূত্র

(১) শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সঙ্কলক ও সম্পাদক), ২য় খণ্ড, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ২৭৭ (২) ঐ, পৃঃ ২৭৮ (৩) শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩শ সং, পৃঃ ১৩৬ (৪) শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬ (৫) দ্রঃ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা—স্বামী প্রভানন্দ, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৭৮ (৬) শ্রীশ্রীমা একবার বলেছিলেন : "আর [গিরিশবাবু] আমাকে দেড়বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়িতে।" অর্থাৎ যতবার তিনি এখানে এসে বসবাস করেছেন, প্রতিবারই বাড়িভাড়ার অর্থ যোগাতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ৮ম সং, পৃঃ ৩৯) (৭) দ্রঃ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১১৯ (৮) শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৫৩ (৯) ঐ, পৃঃ ৬৪ (১০) অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ৫৬ (১১) শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৪২ (১২) আরাত্রিক স্তব—স্বামী সর্বগানন্দ, কার্ত্তিক ১৪১০, পৃঃ ৭

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ধম্মপদ

বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য*

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা

'ধম্মপদ' পালিভাষায় রচিত বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর সঙ্কলন। এইসকল গাথাকে তাঁর অমৃতবাণী বলে ধরা হয়। এই পদগুলি করুণাময় বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলি প্রদত্ত হয়েছিল। মানুষের অধ্যাত্মজীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, যার সমাধান এগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে না। গভীর মনোযোগ দিয়ে এগুলি পাঠ করার সময় মনে হয়, আড়াই হাজার বছরেরও আগে সেই ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা পুরুষ আমাদেরই অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি, বিঘ্নসমূহ আবিষ্কার করে সেগুলি মোচন করার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। মানবজীবনের চিরন্তন রহস্যগুলির উদ্ঘাটন ও তাদের সুচিন্তিত সমাধান ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মানবপ্রকৃতি দেশকাল-নিরপেক্ষ। সেজন্যই অতীতেও 'ধম্মপদ' মানুষকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, বর্তমানেও সেভাবেই প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতেও তা-ই করবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'গীতা'র যে-স্থান, পালি সাহিত্যে 'ধম্মপদ'-এর সেই স্থান। এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। 'গীতা' মূলত ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। 'ধম্মপদ'ও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণীর সর্বজনীনতা সন্দেহাতীত।

আধুনিককালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে 'ধম্মপদ' গ্রন্থটির প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস অনেকখানিই জানা গিয়েছে। সকলেই জানেন, 'গীতা' গ্রন্থটি 'মহাভারত'-এর ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। 'ধম্মপদ'ও তেমনি বৌদ্ধ 'ত্রিপিটক'-এরই অংশবিশেষ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি 'নিকায়' বা অংশ আছে। তার পঞ্চমটির নাম 'খুদ্দকনিকায়'। খুদ্দকনিকায় ষোলটি গ্রন্থের সমষ্টি। তার দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'ধম্মপদ'। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীর ও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে, যদিও মনে হয় এটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ। কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে, বলা যায় না। প্রাচীনকালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত—এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই 'ধম্মপদ' সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালিসাহিত্যেই 'ধম্মপদ' গ্রন্থটি আবহমান কাল সুরক্ষিত আছে। তার পালি রূপটিই এযুগে সুপরিচিত।

দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর 'ধম্মপদ' জনচিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তাঁদের পর থেকে 'ধম্মপদ' সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা ধীরগতিতে হলেও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফলে গীতার মতো 'ধম্মপদ'-এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি বিরাট আশার কথা, সন্দেহ নেই।

'ধম্মপদ' মোট ৪২৩টি গাথায় সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি গাথাই কোন ঘটনা বা কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক গাথাও আছে। সেইজন্য মোট ২৯৯টি কাহিনী পাওয়া যায়। 'ধম্মপদ' বিশ্বসংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্যও এর দ্বারা পুষ্ট হয়েছে।

অপ্রমাদই হলো ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূলনীতি। এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে। 'ধম্মপদ'-এর অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিল।

বর্তমান যুগে গাথাগুলির অনুশীলন যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা কিছু গাথার আলোচনা করলেই পরিস্ফুট

** দক্ষিণ কলকাতা-নিবাসিনী, গবেষিকা ও সুলেখিকা, 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকার পরিচিত নাম।*

হবে। মানুষের কল্যাণে, মানুষের চরিত্রগঠনে, জীব-জগতের মঙ্গলসাধনে গাথাগুলির অপরিহার্যতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেকটি 'বগ্‌গো' [বর্গ] থেকে এক বা একাধিক গাথা আলোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের এই উপদেশগুলি মানবকল্যাণে বিশেষত বর্তমান যুগে কতটা প্রযোজ্য।

'যমকবগ্‌গো'-এর চতুর্দশ গাথায় বুদ্ধদেব বলছেন ঃ

"যথা'গারং সুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্‌ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্‌ঝতি।"

—সু-আচ্ছাদিত গৃহে যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে না, তেমনি সাধনাপূত চিত্তে বিষয়বাসনা প্রবেশ করে না।

এই গাথা থেকে আমরা শিক্ষা পাই, চিত্তকে বাসনামুক্ত করার পথ হলো সাধনা। একাগ্রচিত্তে সাধনা করলেই চিত্ত বাসনামুক্ত হয়। বাসনাই মানুষকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেয়, সুতরাং দুঃখমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করার পথ হলো সাধনায় রত হওয়া। এর দ্বারা চিত্ত সু-আচ্ছাদিত গৃহের ন্যায় সুরক্ষিত হয়।

'অপ্‌পমাদবগ্‌গো'-এর প্রথম গাথায় পাওয়া যায়—

"অপ্‌পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্‌পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা।"

—অপ্রমাদ অমৃতলাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর, আর যারা প্রমত্ত তারা মৃতসদৃশ।

আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধের এই 'অপ্রমাদ' কথাটির মধ্যে তাঁর সমস্ত উপদেশের সারবস্তু লুকিয়ে আছে। জঙ্গলে হাতির পায়ের বিরাট ছাপের মধ্যে যেমন জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীর পায়ের ছাপ এঁটে যায়, তেমনি বুদ্ধের এই একটি কথার মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশ ধরা আছে। মানুষ যখন অপ্রমত্ত হয়ে অর্থাৎ জেনেশুনে সব কাজ করে, তখন তার পদস্খলন হয় না; না জেনে, না বুঝে করার ফলেই মানুষ অন্যায় কাজ করে। তাই বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন 'অপ্‌পমাদেন সম্পাদেথ' অর্থাৎ যাকিছু করবে তা অপ্রমত্ত হয়ে করবে, জেনে-বুঝে করবে।

'চিত্তবগ্‌গো'-এর তৃতীয় গাথায় দেখা যায়—

"দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো,
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।"

—দুর্দমনীয়, লঘু, যথেচ্ছগামী চিত্তের দমন সাধু বা মঙ্গল। দমিত চিত্ত সুখাবহ হয়। এখানেও দেখছি, চিত্তশোধনেরই উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের বোধিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে-উপদেশ তাঁর মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'জরাবগ্‌গো'-এর নবম গাথায়—

"গহকারক! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসঙ্খিতং;
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।"

—গৃহকারক, এখন আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি। তুমি পুনরায় গৃহনির্মাণ করতে সমর্থ হবে না। তোমার সমুদয় বরগা ভগ্ন এবং গৃহকূট বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমার সংস্কারমুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করেছে।

এখানেও বুদ্ধদেব চিত্তের পরিশুদ্ধির কথাই বলেছেন। সাধনার মাধ্যমে তিনি চিত্তকে সংস্কার ও তৃষ্ণামুক্ত করতে পেরেছেন, তাই তাঁর আর জন্মলাভ হবে না—একথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, চিত্তকে সম্পূর্ণ নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার একমাত্র পথ একনিষ্ঠ সাধনা।

বুদ্ধদেবের গাথাগুলিতে কোন দেব-দেবীর উল্লেখ নেই, ঈশ্বরের কথাও নেই। মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে সে তার চিত্তকে নির্মল ও কলুষমুক্ত করে নির্বাণলাভের মাধ্যমে চিরশান্তি পেতে পারে ও পুনর্জন্ম রোধ করতে পারে—বুদ্ধদেব তাই জানিয়েছেন এবং চিত্তকে নির্মল ও পবিত্র করার উপায় নির্দেশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন গাথার মাধ্যমে। এভাবে মানুষকে তিনি অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছেন।

'বুদ্ধবগ্‌গো'-এর পঞ্চম গাথায় বুদ্ধগণের একটি অনুশাসন পাই। এগুলিতে চিত্তের পবিত্রতাসাধনের কথাই বলা হয়েছে। গাথাটি হলো—

"সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং।"

—সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশলকর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) ও স্বীয় চিত্তের পবিত্রতাসাধন (সমাধি) হলো বুদ্ধদেবের অনুশাসন।

'সুখবগ্‌গো'-এর ষষ্ঠ গাথায় বলা হয়েছে—

"নত্থি রাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোসসমো কলি,
নত্থি খন্ধসমা দুক্‌খা নত্থি সন্তিপরং সুখং।"

—রাগের সমান অগ্নি নেই, দ্বেষের সমান কলি (পাপ) নেই। পঞ্চস্কন্ধসদৃশ [কামনার মতো] দুঃখ নেই, শান্তির চেয়ে উত্তম সুখ নেই।

ঐ বগ্‌গোরই অষ্টম গাথায় পাই—

"আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং,
বিস্‌সাসপরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং।"

—আরোগ্য পরম লাভ; সন্তোষ পরম ধন। বিশ্বস্ত লোকই পরম আত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

উপরি উক্ত গাথাদুটিতেও চিত্তসংশোধনের উপদেশই পাওয়া যায়। আরেকটি গাথায় মানুষকে চিত্তবৃত্তি সংযমের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেব এই উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষেও এই উপদেশ খুবই মঙ্গলজনক। গাথাদুটি 'ভিক্খুবগ্গো'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় গাথা।

"চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো।"

—চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), শ্রবণসংযম হিতকর, ঘ্রাণসংযম হিতকর ও জিহ্বাসংযম হিতকর।

"কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো;
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্খু সর্ব্বদুক্খা পমুচ্চতি।"

—কায়িক সংযম সাধু, বাচনিক সংযম সাধু, মানসিক সংযম সাধু, সর্বসংযম সাধু অর্থাৎ হিতকর। সর্বথা সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়।

এই গাথাদুটিতে বুদ্ধদেব দেখা, শোনা, ঘ্রাণগ্রহণ, স্বাদগ্রহণ, মানসিক, কায়িক, বাচিক, কর্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সংযত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ এভাবে সর্ববিষয়ে যদি নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাহলেই সে দুঃখবিমুক্ত হতে পারবে।

গাথাগুলির আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখলাম, বুদ্ধদেব বলছেন—মানুষ নিজেই নিজের চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারে কেবল নিজের চেষ্টার মাধ্যমে—এর জন্য কারো সহায়তা, এমনকি দেবদেবীর কৃপারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ একথা জানে না বলেই দুঃখ পায় ও হাহাকার করে। 'ধম্মপদ'-এর গাথাগুলিতে এইভাবে মানুষকে সুখ ও শান্তিলাভের পথনির্দেশ দিয়ে মানুষকেই সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন করুণাময় বুদ্ধ। যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষই এই গাথা-গুলির উপদেশ অনুশীলন করে শান্তি লাভ করতে পারে। বর্তমানের এই হিংসা, দ্বেষ ও হানাহানির পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করতে হলে বুদ্ধদেবের এই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ❑

ঈশ-বন্দনা

স্বামী নির্মুক্তানন্দ*

সম্মুখে প্রণাম তোমায় পশ্চাতে প্রণাম।
দক্ষিণে প্রণাম তোমায় বামে প্রণাম॥
ঊর্ধ্বে প্রণাম তোমায় নিম্নে করি প্রণাম।
দশদিক ব্যাপিয়া আছ তোমাকে প্রণাম॥
মহান হইতে হও তুমি সুমহান।
কে বর্ণিবে মহিমা তব ওহে ভগবান॥

মুনি ঋষি মানে হার বর্ণিতে তোমায়।
বর্ণিবারে জীবের বৃথা চেষ্টা এ-ধরায়॥
তুমি নাহি করিলে দয়া ওহে কৃপাময়।
বৃথা চেষ্টা মানবের হয় শক্তিক্ষয়॥
বর্ণিবারে তোমার মহিমা হে শক্তিমান।
দাও প্রীতি, শক্তি দাও ভক্তি সুমহান॥

* স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত নবতিপর সন্ন্যাসী, অধুনা বেলুড় মঠ-নিবাসী।

সমাপ্তি

ধর্মদাস গুপ্ত

অন্তহীন সময়ের মুক্ত পারাবারে।
চেতনার সাথে শেষ সুপ্ত অভিসারে॥
যেতে হবে একদিন সব গ্রন্থি ছিঁড়ে।
মিশে যাব অগণিত পথিকের ভিড়ে॥
তবুও কখনো কোন ছায়াঘেরা সাঁঝে।
যখন বাতাসে শুধু আগমনী বাজে॥
তখন হয়তো এক নিভৃত পল্লির ঘরে।
সেখানে একাকী বধূ দীপ দেয় দ্বারে॥
মানুষ যেখানে বাঁধা মন্দ ও ভালয়।
সেখানে এসেছি ফিরে নতুন আলোয়॥
পিতঃ মোরে দিও শুধু এই অধিকার।
কর্ম হোক অমৃতের বিপুল আধার॥
চাই না মোক্ষ আজি এই বর দিও।
তোমারি সৃষ্টি হোক সবচেয়ে প্রিয়॥

তোমার প্রকাশ প্রিয়

আর্যকুমার পালিত

একটি বিন্দু বৃষ্টি যেমন নীলাকাশের অসীম ছবি ধরে
তৃণলতার শ্যামল পাতার 'পরে,
যেমন করে হাওয়ায় ভাসা মলিন মেঘের একটুখানি তরী
প্রোজ্জ্বল হয় দিনের সূর্য ধরি,
পান্না যেমন প্রমূর্ত হয়, কোন্ গভীরের লীলায় আত্ম ভোলে,
রত্ননিলীন কোন্ রহস্য তোলে,
বাতাস যেমন সুপ্তি নিথর কোন্ শিখরের স্বপ্নের সুর আনি,
বলে নীরব নির্বিচলের বাণী,
তেমনি করে আমার গানের গোলাপ আনে, তোমার প্রকাশ প্রিয়,
বচনে মোর অনির্বচনীয়।
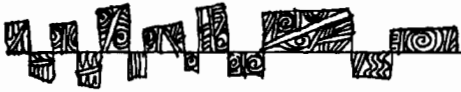
সেই অভিসার

মঞ্জুভাষ মিত্র

"চান্দনি রজনী উজোরলি গোরি।"

দুঃখ আজকে কেন এমন করে সুখের ঘরে দরজা আঁটা
বিষম কাঁদায় ভয়ের বাধায় ব্যাহত হলো তোমার হাঁটা
আকাশ ঘিরল ঝড় বাদলের তীক্ষ্ণ প্রখর ছন্দধ্বনি
চোখের পাতা কাঁদছে তোমার শুনছ কি ঐ বার্তাখানি
পায়ে-চলা-পথ ব্যথায় রুদ্ধ আজ যাবে আর কার কাছে
হায়রে তোমার জীবনস্বপ্ন সাগরতীরে পড়ে আছে।

"হরি অভিসার-রভসরসে ভোরি॥"

সাত ঘরের সালতামামি

স্বপনকুমার মিশ্র

ঘর ঘর ঘর
দুঃখেরই গহ্বর,
মরবি কেন ডরে ডরে
চিৎসায়রে মর।
ঘর ঘর ঘর
পুতুলখেলার ঘর,
বাপের বাড়ি যেতেই হবে
তত্ত্ব যোগাড় কর।
ঘর ঘর ঘর
চোরাবালির ঘর,
সর্বস্বান্ত করবে তোরে
সময় বুঝে সর।
ঘর ঘর ঘর
গগনতলে গড়,
ঘাসের চাদর নে না পেতে
মাধুকরী কর।
ঘর ঘর ঘর
দেখবি যদি বর,
তেলে ভরা প্রদীপ জ্বেলে
নিশিযাপন কর।
ঘর ঘর ঘর
কেউ নয় তোর পর,
সবার মাঝে দেখ নিজেকে
অমর নির্জর।
ঘর ঘর ঘর
প্রেমেরই নির্ঝর,
আপন সত্তা বিলিয়ে দিয়ে
বিশ্বভুবন ভর।

ভগ্ন রাজপ্রাসাদ

সুব্রত ব্রহ্মচারী

হৃদয়ে আমার ধূ-ধূ মরুভূমি আঁকা
কুয়াশায় ঘেরা পৃথিবীটা অস্পষ্ট
ওঠা আর নামা ভাঙাচোরা সিঁড়ি বেয়ে
রোজ রোজ আমি জমাই কেবলই কষ্ট।

হৃদয়ে আমার ভগ্ন যে রাজপ্রাসাদ
ঝাড়বাতিগুলো খুলে খুলে গেছে পড়ে
রাতের আঁধারে দুর্গের হেথা-সেথা
আমারই আত্মা ঘুরে ঘুরে শুধু মরে।

আমি খুঁজে ফিরি পরশপাথর বুকে
জঞ্জাল ঘেঁটে এমনি নিত্যদিন
পাঁজরে পাঁজরে ঘুণধরা—নোনা ঠোঁটে
হিসাব কষিনি—জমে গেছে কত ঋণ।

আলো চাই—আলো। নক্ষত্র ভরে ভরে
হৃদয়ে আমি সাজাই কেমন করে?
হৃদয়ে আমার ভগ্ন যে রাজপ্রাসাদ
ঝাড়বাতিগুলো খুলে খুলে গেছে পড়ে।

আলোর দিশারি

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

কুয়াশার মতো
মাঝে মাঝে অবগুণ্ঠিত হয়
আমার সকাল।
চলমান কিছু আলোর স্ফুলিঙ্গে
আবেশিত হই, ভেসে যাই।
কুয়াশায় ডুবতে ডুবতে
সাঁতার কাটতে কাটতে
শ্বাসের ভাঁড়ার ফুরনোর আগে
দেখি বিন্দু বিন্দু আলোগুলি
কখন সূর্য হয়ে
আকাশে দীপ্ত হয়ে ওঠে।
কুয়াশার চাদর ভেদ করে
এক উজ্জ্বল আলোতে দেখি
সব মত, সব পথ
আলো, আঁধারকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
তোমাতে লগ্ন হয়ে গেছে।
হে আলোর দিশারি
তোমাকে প্রণাম।

অকৃতজ্ঞ

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি আমায় চক্ষু দিয়েছ দেখতে,
শ্রুতি দিয়েছ শুনতে,
হাত-পা দিয়েছ কাজ করতে।
কিন্তু আমি ভাবি, এগুলো দেওয়া তো তোমার কর্তব্য;
এতে তোমার মহানুভবতা কোথায়?

তুমি আমায় খাদ্য হিসাবে দিয়েছ
কত ফল-মূল আর ফসল।
কিন্তু আমি ভাবি, চাষ-আবাদ তো মানুষের আবিষ্কার;
এর মধ্যে তোমার অবদান কোথায়?

তুমি আমায় ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করলে।
সুস্থ হয়ে আমি ভাবি, ডাক্তার আমায় বাঁচিয়েছে,
ভগবান নয়।
ভগবানকে ধন্যবাদ দেব কেন?

তুমি আমায় চাকরি দিলে।
আমি সবাইকে বলি, 'এই কি একটা চাকরি?'
বেতন কম, বোনাস নেই, নেই কোন উপরি;
এমন চাকরি না থাকলেই বা ক্ষতি কি?

কিছুদিন পর অফিসটা গেল বন্ধ হয়ে;
চাকরি হারিয়ে আমি হয়ে গেলাম বেকার।
তখন কেঁদে বলি—
'ঠাকুর, তুমি আমার মুখের অন্ন কেড়ে নিলে।'

তোমার জন্য এই ছড়া

সিদ্ধার্থ সিংহ

কোকিল নাকি গান শোনাবে গাক,
দূরে বসেই তালিম নেবে কাক।

হরিণ না হয় প্রথম হলো দৌড়ে,
পাল্লা দিয়ে ছুটবে শামুক গৌড়ে!

বাঘরা যদি দাপায় গোটা বন,
দখল করতে খ্যাঁকশিয়ালের পণ।

ওরা লড়ছে বনের মধ্যে, তুমি?
তোমার জন্য রয়েছে আকাশ- ভূমি।

অনির্বাণ অনিঃশেষ এক দীপশিখা ঃ বরানগর মঠ

আরতিকুমার বসু*

◆ এযুগের চলমান বিগ্রহ ◆

সময়টা ভারত ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। পরাধীন দেশ। চারিদিকে চরম হতাশা। পরানুকরণে পরগাছাবৎ অস্তিত্ব। ধর্মের নামে জাতিভেদ আর লোকাচারের হাজারো বেড়াজাল। অজস্র অমানবিক কুসংস্কার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র লুণ্ঠিত। গরিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধারণ নিপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট। পরাধীনতার গ্লানিতে জর্জরিত, আত্মমর্যাদাহীন প্রবল স্রোতে ভাসমান পালছেঁড়া হালভাঙা নোঙরহীন এক রাষ্ট্রতরণি।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবি বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ এবং তাতে সাড়া দেওয়ার (response) মধ্য দিয়েই বিভিন্ন জাতির প্রাণশক্তির পরীক্ষা হয়। প্রবল আঘাতের ফলে বহু সভ্যতা যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি আঘাতে সাড়া দেওয়ার মতো যোগ্য মানুষের সাহায্যে বহু সভ্যতা নবজীবনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে। সৌভাগ্য-ক্রমে এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ এক সন্ধিক্ষণে বহিরাগত এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেই বহু যোগ্য মানুষ এগিয়ে এসেছেন। এটাকেই বলা হয়েছে ভারতীয় নবজাগরণের কাল। হতে পারে এটা অতিকথন—এই বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু বহুবিধ সংস্কারমুখী আন্দোলন, শিক্ষা-দীক্ষায় বিপুল পরিবর্তনের ফলে সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার যে বিশাল ঢেউ উঠেছিল—এটা কেউই অস্বীকার করছেন না। এর একপ্রান্তে রয়েছেন মিল, বেন্থাম, হেগেল, কাণ্ট, ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় নিষিক্ত নগরসভ্যতার অভিজাত প্রতিনিধিরা এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ গুরুর মতো মনীষীরা। এঁরা এই চ্যালেঞ্জে একরকমভাবে সাড়া দিয়েছেন। আরেকদিকে উপেক্ষিত অবহেলিত মূঢ় মূক বৃহত্তর জনমানসের যে-প্রতিবাদ, তারই প্রতিনিধি শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন আমদানিকৃত ঐতিহ্য নয়, নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে শিকড়ের সন্ধান করেছেন তিনি।

'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা'য় তাঁর প্রবল অনীহা। দোলাচল চিত্তবৃত্তিতে তিনি ভোগেন না। 'আত্মপরিচয়ের সঙ্কট' নামক বস্তুটি তাঁর অজ্ঞাত। আপন ঐতিহ্যের স্বীকরণে শুধু নয়, নতুন নতুন ভাবগ্রহণে তিনি সদাই তাঁর মনের সব জানলা-দরজাগুলি খোলা রাখেন। কোন মানুষ বা ধর্ম তাঁর কাছে ত্যাজ্য নয়, কেউ অচ্ছুত নয়। নরেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নটী বিনোদিনী বা রসিক মেথর—কেউ পর নয়। সবাই আপন; সব মতকেই সব পথকেই তিনি পরখ করেন, যাচাই করেন একজন বিজ্ঞানীর মতো। আদ্যন্ত এক মৌলিক মানুষ। সত্যনিষ্ঠ। ভাসা ভাসা কোন কথা বলেন না। তাই ঈশ্বর আছেন কিনা নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন—শুধু আছেন কিরে, দেখেছি। তুই চাইলে তোকেও দেখাতে পারি। সবাইকে মাথা উঁচু করে তিনি দাঁড়াতে বলেন। 'মান হুঁশ' হওয়ার পরামর্শ দেন। অর্থাৎ আত্মশ্রদ্ধা এবং স্বকীয় স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ, বিত্তের অহমিকা, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার বা অহংবোধ—যা মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের পাঁচিল তোলে, তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সকলের কাছে ছুটে ছুটে যান তিনি। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমাজে পতিত মানুষজন—সকলের কথা তিনি শুনতে চান। নিজের কথা বলেন। কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে ডাকেন ঃ "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" তিনি মেলাতে চান। গ্রামকে শহরের সঙ্গে। মানুষকে মানুষের সঙ্গে। সেখানে জাতের নামে বজ্জাতি নেই। ধর্মের নামে একদেশদর্শিতা নেই। ঈশ্বর-আল্লা-গড। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

ধর্মই এদেশের প্রাণ, ধর্মকে ধরেই এদেশকে জাগতে হবে। সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভোলেন না, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মথুরবাবুকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে সেবাকাজের সূচনা করেন। গিরিশচন্দ্রকে বলেন ঃ "নাটক ছেড়ো না; ওতে লোকশিক্ষা হয়।" তাঁর কথাগুলি বানানো ফাঁপানো নয়—সোঁদা মাটির গন্ধে মেশা গল্প, গান, প্রবচন, চিত্রকল্প পণ্ডিত থেকে মূঢ় সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য। হাজার হাজার বছরের লোকায়ত জীবনের তরঙ্গপ্রবাহ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সাধনা তাঁর জীবনচর্যায় ঝলমল করে ওঠে।

সামাজিক আপত্তি বা চোখরাঙানির তোয়াক্কা করেন না তিনি। তিনি নিজেই প্রতিবাদী। সমাজে অবহেলিত এক কামারনির হাত থেকে উপনয়নের ভিক্ষাগ্রহণ, জাতে কৈবর্ত রানি রাসমণির মন্দিরে পূজারীর ভার গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণকুলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই। অবলুপ্ত নারীত্বের

* দুর্গাপুর-নিবাসী সাহিত্যসেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী।

মর্যাদাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্যই এক নারীকে গুরুপদে বরণ এবং অপর এক নারীকে জগন্মাতা-জ্ঞানে পূজা করেন। মুদ্রাশাসিত সমাজে তিনি অকুতোভয়ে ঘোষণা করেন ঃ "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" দাসত্বের প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার ঃ "অত পাশ করা, কত ইংরেজি পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুটজুতার গোঁজা দুবেলা খায়।" ধর্মকে মামলা-মকদ্দমা অথবা জাগতিক বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার সোপান বলে মনে করেন না। সিদ্ধাই তাঁর কাছে পতিতা নারীর বিষ্ঠাতুল্য। তাঁর দর্শনকথা স্মর্তব্য। তিনি বলেন ঃ "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?" জীবে দয়ার কথা বলতে বলতে বলে ওঠেন ঃ "দূর শালা কীটানুকীট! তুই দয়া করবার কে? দয়া নয় দয়া নয়! সেবা... শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন যুগের চলমান এক বিগ্রহ। এক মহাযুগচক্রের সারথি। তাঁর এক বাহু শ্রীশ্রীমা, অপর বাহু নরেন্দ্রনাথ। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর অনুরোধ ঃ "এ আর কী করেছে, তোমাকে আরো বেশি করতে হবে। দেখছ না, কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে।" 'কলকাতা' তো শুধু কলকাতাতেই নেই—আবিশ্ব এক কলকাতা। নরেন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত মোক্ষ এবং নির্বিকল্পের সাধনভূমি থেকে টেনে নামান মর্ত্যের ধূলি-ধূসরতায়। সহস্রবাহু মহীরুহ হতে হবে তাঁকে। নিজের হাতে অনুজ্ঞাপত্র লেখেন ঃ "নরেন শিক্ষে দেবে।" দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটী যার সুতিকাগৃহ। বিশেষ করে কাশীপুরে তাঁর মর্ত্যলীলা অবসানের শেষ কয়েক মাসে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের ত্যাগ-তপস্যা অর্থাৎ তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করা দরকার—ফাঁক রাখেন না কোথাও। নরেন্দ্রনাথকে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের নেতা নির্বাচন থেকে গেরুয়াপ্রদান। নিজের স্বরূপ উন্মোচন। মহাসমাধির কয়েকদিন আগে নরেন্দ্রনাথকে সাধনলব্ধ ক্ষমতা অর্পণ। তাঁর কথায় ঃ "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি।"

যোগ্য পাত্রেই তিনি যথাসর্বস্ব অর্পণ করেন। কিন্তু সেটি ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এককভাবে নয়, গেরুয়াপ্রাপ্ত সকলকেই হয়ে উঠতে হবে মহা মহা শূর। মাটির গভীরে শিকড়ের ঘন বিস্তার না থাকলে মহীরুহ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আর তার জন্যই বরানগর মঠ।

◆ বরানগর মঠের ত্যাগ-তপস্যা ◆

বরানগরে পরামাণিক ঘাটের রাস্তায় মুনশিদের একটা পুরনো বাড়ি। "যার নিচের তলাটার ভিতর বাড়ির দিকে বহুকালের আবর্জনায় ও জঙ্গলে এমন ভরে গেছল যে, তা শিয়ালের ও সাপের বাসা হয়েছিল। কেউ ভয়ে সেদিকে যেত না। প্রবাদ আছে, বহুকাল পূর্বে টাকির দুর্দান্ত জমিদারদের আমলে সেখানে কত নরহত্যা হয়েছে। সেজন্য ওকে ভূতের বাড়ি বলত ও কেউ ভাড়া নিত না।" নরেন্দ্রনাথ এই ভূতের বাড়িই ১০ টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন। কারণ, এর থেকে আর কোন উন্নততর বিকল্প তাঁদের সামনে ছিল না। সর্বোপরি অনুরাগ ও ব্যাকুলতার তীব্রতা সম্ভব-অসম্ভবের ভেদরেখা মুছে দিয়েছিল। এর একতলাটা আর ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। মঠ "মুনশিদের ঠাকুরবাড়ির পশ্চাৎ (পশ্চিম) ভাগের ভগ্ন জীর্ণ বাড়ির উপরতলায় ভিতরের অংশে ছিল।" এই পোড়ো বাড়ি, যাকে পরবর্তী কালে 'মঠবাড়ি' বলা হয়—তার টুকরো টুকরো বিবরণী ধরা আছে 'কথামৃতকার' শ্রীম, নরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ বসু, স্বামীজী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ এবং সর্বোপরি স্বামীজীর স্মৃতিচারণ, চিঠিপত্র এবং জীবনীমূলক গ্রন্থে।

এখানেই শাস্ত্রমতে বিরজা হোম করে নরেন্দ্রের নেতৃত্বে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এই তরুণ তাপসদল। সকলেরই যে একসঙ্গে দীক্ষা হয়েছিল তা নয়। কেউ এসময় তীর্থ পরিভ্রমণে ছিলেন বা প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু বছর দু-তিনের মধ্যে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক পাঁচবছরের দুশ্চর তপস্যার ফলে যে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের জন্ম দিল তা এক অপরূপ রূপকথা।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, দেহবোধ, লোকাপবাদ, মান-অপমানকে অগ্রাহ্য করে অতঃপর গুরুর আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করতে তাঁরা যে দুশ্চর সাধনা করলেন, তা এককথায় অচিন্তনীয়। তাঁদের গুরু দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে মায়ের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় এমনভাবে মাটিতে মুখ ঘসে কাঁদতেন যে, লোকে ভাবত শূলবেদনা উঠেছে। তাঁর মাথায় জটা হয়ে গিয়েছিল। নিশিদিন অন্তহীন বিরহ আর আর্তিতে দেহে অসহ্য উত্তাপ। খাওয়ার কথা মনে থাকত না। ভাগনে হৃদয় কোনরকমে দু-এক গ্রাস খাবার তুলে দিতেন মুখে। আর বরানগর মঠের এইসব তরুণ তাপসেরা! স্বামীজীর কথায় ঃ "এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সেসব কী দিনই গেছে! সে-কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!"

সাধনা যে এরকম একটা স্তরে যেতে পারে তা সবকালেই শুধু সাধারণ মানুষ কেন, তাবড় পণ্ডিতদেরও বুদ্ধির অগম্য। তারই পরিণাম হিসাবে ঠাট্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ অপবাদ এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে এই তরুণ তাপসদলকে। স্বামীজীর কথায়ঃ "যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবকমাত্র ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদের পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।"

যারা এতদিন বহুতর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছিল, কবে কেমন করে একদিন তারা গুণগ্রাহীতে পরিণত হলো—এ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আশ্চর্য এক ইতিকথা। কিন্তু সেই ইতিকথার আগের কথাটা লোকগুরু হয়ে ওঠার জন্য নির্ভেজাল এক কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। মঠ-বাসিন্দাদের জামাকাপড় বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। পরনে কৌপীন ও একখণ্ড গেরুয়া বহির্বাস। দু-একটি ধুতি ও চাদর যিনি যখন বাইরে বেরোতেন পরে নিতেন। জুতোর বালাই ছিল না—চলাফেরা নগ্নপদে। সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব কালেই। দুটো বড় মাদুরে গাদাগাদি করে শুতেন। মাথার বালিশ ইঁট। মশারি নেই মাথায়। ভনভন করছে মশা। প্রচণ্ড শীতেও কোন কাঁথা বা চাদর ছিল না। গা গরম রাখার জন্য ডন-বৈঠক বা পরস্পর কুস্তি করে নিতেন। অনেক পরে অবশ্য সুরেশবাবু একটি বড় মশারি এবং কয়েকটি ছোট বালিশ দিয়েছিলেন। সবকিছুরই দৈন্যদশা। অদম্য শুধু মানসিক বল।

পরম লক্ষ্যের পথে তাঁরা পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে চান না, দেখতেও পান না। কথামৃতকার শ্রীম মাঝেমধ্যেই এই বরানগর মঠে আসতেন। সুরেশবাবুর মতো তিনিও মনে করতেন, গৃহী ভক্তদের এটা একটা জুড়াবার জায়গা। শ্রীম-র উক্তিঃ "বরাহনগরের মঠ।... শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন।... কখনো কখনো নির্জন বৃক্ষতলে, কখনো একাকী শ্মশানমধ্যে, কখনো গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনো বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ-ধ্যানে দিনযাপন করেন। আবার কখনো ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সঙ্কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠে ভগিনী দেবমাতাকে বলেছিলেনঃ "We were so full of ardour in those days, we did not care what we had or what we did not have... in our hearts was burning a fire of renunciation which the master had Lighted and we were blissful even in our poverty."

একইসঙ্গে পর্যটনস্পৃহাও স্ফুরিত হয়েছিল প্রবলভাবে। একমাত্র শশী মহারাজ ঠাকুরসেবার জন্য মঠ থেকে কোথাও যেতে চাননি। বাকি সকলেই অল্পবিস্তর পরিব্রাজকরূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যার বহমান ধারাকে পুষ্ট করেছেন। অপরদিকে দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মিক পরিচয়ের জন্যও এটার প্রয়োজন ছিল। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সমন্বয়ে আগামী দিনে তাঁরা যে-কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, এটা ছিল তারই প্রস্তুতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ একঘেয়ে ভাব পছন্দ করতেন না। তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে শিষ্যরাও শুধু জপ, ধ্যান, বৈরাগ্যসাধন নয়, সময়ে সময়ে তাঁরা মেতে উঠতেন উদ্দাম তর্ক, বিতর্ক, শিল্প-সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন আলোচনায়। গীতা, উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরুষদের জীবনীমূলক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রসঙ্গে পাঠ এবং আলোচনা চলত। এমনকি সেখানে পাশ্চাত্য দর্শন, কান্ট, মিল, হেগেল, স্পেনসারও উপেক্ষিত ছিলেন না। সেইসঙ্গে উচ্চস্তরের সঙ্গীত বা স্তোত্র রচনার মতো সৃজনমূলক কর্মেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না তাঁরা।

আসলে সবটা মিলিয়ে এ এমন এক ধরনের তপস্যা, যার শিকড় প্রোথিত ছিল মাটির গভীরে, যা ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে পল্লবিত হবে বিশ্বময়। এ তারই এক মহান সূচনা। এসম্পর্কে স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দের উক্তিঃ "সেসব কি গুলজারের দিনই গিয়াছে, এক মিনিট হাঁফ ছাড়িবার জো ছিল না, দিনরাত বাইরের লোক আসা-যাওয়া করিতেছে। পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন—ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, কিন্তু স্বামীজী এক মুহূর্তও কাতরতা, বিরক্তি বা ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতেন না। কি আধ্যাত্মিক বিদ্যা, সাধারণ বিদ্যা—তিনি সর্বদা সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।... তিনি দেখাইতেন যে... দেশকে উপেক্ষা করিয়া দেশবাসীর প্রাণের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রকে দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য।"

আরেক দিক থেকে সেবাভাবেরও চরম বিকাশ ঘটে এই সময়ে। তরুণ তাপসগণ কে আগে মধ্যরাতে বা অপরে জেগে ওঠার আগে পায়খানা পরিষ্কার করে জল ভরবেন বা হাণ্ডা মাজবেন তা নিয়েও ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। সমবেত সাধন-ভজন করতে গিয়ে তাঁদের হৃদয়ের এত প্রসার ঘটেছিল, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে। এটা শুধু গুরুভাইদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিদিনই তা সীমাকে অতিক্রম করছিল। এপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর প্রথম যুগের জীবনীকার প্রমথনাথ বসু লিখছেন : "আরো একটি জিনিসের অঙ্কুর এখন হইতে দেখা গিয়াছিল। সেটি হইতেছে সেবাধর্ম।... এইসকল সন্ন্যাসীরা নিজেরা না খাইয়াও ক্ষুৎকাতর দরিদ্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে আহার করাইতেন এবং গৃহী গুরুভ্রাতাদিগের পীড়া বা বিপদের সময়ে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমনকি কুষ্ঠরোগীর পর্যন্ত সেবা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।"

যত দিন যেতে লাগল মঠের ত্যাগ-তপস্যা, পূজার্চনা, পরোপকার বৃত্তি, ঠাকুরের জন্মতিথি বা তিরোভাব দিবসের উৎসব, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, শ্যামাপূজা, সঙ্কীর্তন শুধু স্থানীয় নয়—বৃহত্তর জনসমাজকেও কাছে টেনে আনল। এলেন স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দ। আরেক দল কলেজ-পড়ুয়া কথামৃতকার মাস্টার মশায়ের কাছে প্রেরণা পেয়ে মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে স্বামীজীর শিষ্যত্ব লাভ করে পরবর্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

◆ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ ◆

কবেই শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে এই মঠের। কালের কপোলতলে জীর্ণ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত সেই মঠবাড়ির কিছুমাত্র অস্তিত্ব নেই। তবুও অতন্দ্র প্রহরীর মতো মঠবাড়ির প্রবেশপথের দুটি থাম মহান এক অধ্যায়ের সাক্ষ্য হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭৩-এ কতিপয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীর আগ্রহে ও চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে ঐতিহাসিক এই মঠবাড়ির কিছু পরিমাণ জমি। বহুলাংশই বেদখল। ১৯৭৪-এ 'বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি' নাম দিয়ে কিছু কিছু সেবামূলক কাজ শুরু করেন তাঁরা। একাজে তাঁরা মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। আরো কিছুকাল পরে থামদুটি-সহ একটি একতলা বাড়ি সংগৃহীত হয়েছিল। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপূজা, ধর্মীয় আলোচনা এবং বিনা খরচে কোচিং সেণ্টার চালু হয়। তারও আগে তদানীন্তন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি ২০০১ সালে 'সংরক্ষণ সমিতি'র অনুরোধে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ বরানগর মঠ অধিগ্রহণ করেছেন।

ত্যাগ-তপস্যাপূত বরানগর মঠের যজ্ঞাগ্নির পবিত্র শিখা ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে। এ এক অনিঃশেষ অনির্বাণ দীপশিখা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সন্তাপে দীর্ণ প্রাণ যেখানে ছায়া পাবে, জ্বালা জুড়াবে, বুকে পাবে বল। আবিষ্কার করবে ভারতাত্মাকে। স্বামী প্রভানন্দের প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণে : "মাত্র নয় দশকের মধ্যে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আবিশ্বে ছড়ানো ১৯২টি ছোট-বড় কেন্দ্র, একই ভাবাদর্শ অনুকরণ করে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার অননুমোদিত কেন্দ্র, যা রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের তালিকাভুক্ত নয় অথচ প্রত্যেকটি কেন্দ্রই রামকৃষ্ণ-ভাবস্রোতের ছোট-বড় এক-একটি শক্তি-আবর্ত। এদের ছত্রছায়ায় ক্রমবর্ধমান একটি আদর্শপ্রিয় মানবগোষ্ঠী রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বিজয়কেতন হাতে নিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল এক মহান ভবিষ্যৎকে আবাহন করে এগিয়ে চলেছে। বিজয়কেতনে জ্বলজ্বল করছে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্র। বৌদ্ধিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এককথায় সর্বস্তরে এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। এই মহান আন্দোলনের জয়যাত্রায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বরানগর মঠ।"

◆ উপসংহার ◆

বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ২০০১ সালে এই মঠ অধিগ্রহণ করার পর থেকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এক বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। নিত্য-নতুন সেবামূলক কর্মপরিধির বিস্তার ঘটছে। নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-প্রার্থনা, সাপ্তাহিক আলোচনায় ভক্তসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আসছেন দূরদূরান্তের মানুষ। সবাই চাইছেন এই ত্যাগ-তপস্যাদীপ্ত স্থানে বসে এর উত্তাপ এবং ভাবঘন শিহরণ অনুভব করতে। কিন্তু পরিসর খুবই সঙ্কীর্ণ। ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, যত দিন যাবে এরকম একটা সাধনলব্ধ ভূমিকে সংরক্ষণ করতে না পারাটা আমাদের পক্ষে জাতীয় লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আশ্রমের আশু লক্ষ্য প্রাচীন বাগানবাড়ি তথা মঠের যে বিস্তৃত সীমানা ছিল, সেটা পুনরুদ্ধার করা। একইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের অনুসারী এই মঠকে গড়ে তোলা অর্থাৎ সেবাযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করা। তাই স্থানীয় থেকে দূরাগত সমাজের সকল স্তরের মানুষ, প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসন যদি এই মহান সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করেন, তবে সেই অনির্বাণ ত্যাগবহ্নির পবিত্র স্পর্শে সকলেই ধন্য, কৃতকৃতার্থ হবে। ❑

(১) পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ
(২) যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড
(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, অখণ্ড, উদ্বোধন সংস্করণ
(৪) রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা—স্বামী প্রভানন্দ
(৫) লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের হোমকুণ্ড : বরানগর মঠ—স্বামী বিমলাত্মানন্দ

দুবাই, আবুধাবি ও এথেন্সে কিছুদিন

স্বামী গোকুলানন্দ*

১৯৯৮ সালে জন ম্যানেট্টা নামে এক গ্রিক ভদ্রলোক সুদূর এথেন্স থেকে দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে আসেন। তিনি একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী। তিনি আমাকে এথেন্স যেতে অনুরোধ করেন। আমি উত্তরে জানাই, ঠাকুরের ইচ্ছা হলেই যাওয়া সম্ভব। ২০০২ সালের শেষদিকে ঐ ভদ্রলোক এথেন্সের বেদান্ত স্টার্ডি সার্কেলের পক্ষ থেকে আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠান। গ্রিসের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতও সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। বেলুড় মঠের অনুমতি পেয়ে জন ম্যানেট্টা ও মিঃ ব্যানার্জির (ভারতীয় রাষ্ট্রদূত) সঙ্গে যোগাযোগ করি এথেন্স কিভাবে যাব তা জানার জন্য। তাঁরা জানান, এথেন্সে যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক রুট হলো দুবাই হয়ে যাওয়া। দুবাই যাওয়ার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না, সরাসরি এথেন্স যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু বলা হয়, যাকিছু হয় তা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়। যখন দুবাই হয়ে যাওয়া স্থির হলো তখন আমার মনে এল দুবাই-বাসী পরিচিত ভক্ত প্রভাত মজুমদার ও তাঁর স্ত্রীর কথা। আমি তাঁদের এবং আরেকজন ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কিন্তু হতাশ হলাম যখন তাঁরা বললেন : "মহারাজ, আপনি দুবাই এলে আপনাকে হোটেলেই থাকতে হবে এবং সেটা আমাদের কাছে খুব দুঃখজনক। আপনি একজন সাধু। এখানে আমরা সাধুদের আসতে দেখি না। সম্ভবত আপনাকে গেরুয়া কাপড় পরে এখানে আসতেও দেওয়া হবে না।" উত্তরে জানালাম, সেটা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে আমি ওদেশে যাব না। যে-দেশেই আমি গিয়েছি, গেরুয়া কাপড় পরেই গিয়েছি। আমি গেরুয়া বস্ত্রে কুয়েতেও ঘুরে এসেছি।

তখন আমি গ্রিসে আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীব্যানার্জিকে একটা পত্র লিখে দুবাই যাওয়ার সমস্যার কথা জানিয়ে জানতে চাই তিনি এব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবেন কিনা। উত্তরে তিনি জানান : "আমি আমার সহযোগী আবুধাবির রাষ্ট্রদূত মিঃ সিংকে লিখছি এবং আপনি যাতে গেরুয়া বস্ত্রে দুবাই যেতে পারেন, সেজন্য বিশেষ প্রবেশ অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করছি।" অনুমতি পাওয়া গেল। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আশীর্বাদে দিল্লি থেকে রওনা দিয়ে ২৭ জুন সকাল ৭টায় দুবাই পৌঁছালাম। একজন প্রোটোকল অফিসার একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে লেখা ছিল : "Welcome to Swami Gokulananda." সেজন্য আমাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই প্রভাত মজুমদারের সঙ্গে দেখা। মোটরে ১০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম তাঁর বাড়িতে। প্রথম রাতটা এই বাড়িতেই কাটালাম। প্রসঙ্গত, ভারতে থাকতে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের ভক্ত শিখা দত্ত, যিনি এখন আবুধাবিতে থাকেন, আমাকে অনুরোধ করেন : "মহারাজ, আপনি যখন দুবাই আসছেন, আপনাকে আবুধাবিও ঘুরে যেতে হবে।" তাঁর অনুরোধ রাখতে আবুধাবিতেও যাওয়া ঠিক হলো। আবুধাবি রাজধানী শহর। দুবাইতে প্রথমদিন প্রভাত মজুমদারের সঙ্গে ওমান সীমান্তের কাছে 'হাট্টা' গেলাম, যেখানে মরুভূমি পর্বতের সঙ্গে মিলেছে। সেদিন 'মামজার সমুদ্রতট', 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং', 'ঝুমেরা বীচ', 'হেরিটেজ ভিলেজ' ও 'বুর্জ-অল-আরব'ও দেখে নিলাম। 'বুর্জ-অল-আরব' এক সুউচ্চ টাওয়ার, যার আকৃতি জাহাজের মতো এবং সেটি Arabian Gulf-এর থেকে ৩২১ মিটার উঁচু। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মজুমদার-দম্পতি সৎপ্রসঙ্গের আয়োজন করেন।

২৮ জুন সকালে সত্যজিৎ দত্ত ও তাঁর ছেলে সন্দীপ গাড়ি নিয়ে আসে এবং আমরা সকলে ৯.৩০টা নাগাদ আবুধাবির উদ্দেশে রওনা দিয়ে বেলা ১১.৪৫টা নাগাদ সেখানে পৌঁছাই।

আবুধাবি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE)-র রাজধানী এবং সাতটা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়। নীল জলের Arabian Gulf-এর তীরে এটি একটি আধুনিক শহর। ১৯৫৮ সালে তেলের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে আবুধাবির প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এখানে সাংস্কৃতিক চর্চা, ক্রীড়া এবং বিনোদনেরও অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। 'আরবি' এই দেশে সরকারি ভাষা, ইংরেজিও অনেক মানুষের কথ্য ভাষা। এখানে মুসলিম জন-সংখ্যাই বেশি। এদের মধ্যে ৮৪% সুন্নি এবং ১৬% শিয়া।

২৮ জুন সন্ধ্যাবেলা শিখা দত্তের বাড়িতে সৎপ্রসঙ্গের আয়োজন হয়। তারপর উপস্থিত সকলকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়। ২৯ জুন সকালে প্রাতরাশ সেরে সত্যজিৎ, রীতা, মিস আর্য ও আমি আবুধাবি ছেড়ে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা হই। ওখানকার এক কৃষ্ণমন্দিরও দর্শন করি। তখন সেই মন্দিরে পূজা চলছিল।

দুবাই এক বৈপরীত্যের শহর। পুরনো ও নতুন, প্রাচীন ও আধুনিক, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন এই শহরকে বিশেষত্ব দিয়েছে এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দুবাইয়ের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ এবং আয়তন ৩৫ বর্গ কিলোমিটার। দুবাই খুবই নিরাপদ। একদিকে যেমন পর্যটকরা এখানে আসে ছুটি কাটাতে, অন্যদিকে অনেকে আসে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আকর্ষণে। অনেক মহিলা আসেন করমুক্ত স্বর্ণালঙ্কার কেনার জন্য। দুবাইকে সোনার শহরও বলা হয়। দুবাইবাসীর পারস্পরিক আরবি-আতিথ্য সকলকে মুগ্ধ করে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত। দুবাই ক্রীকের তীরে গড়ে ওঠা এই শহরে এসে মিলিত হয়েছে নানা জাতের মানুষ। এই শহরকে বলা যায় বালি, সমুদ্র, সূর্য এবং নয়নবিমোহন দ্রব্যের মিলনকেন্দ্র। অনেকের মতে, দুবাইয়ের মরুভূমি বিস্ময় উদ্রেককারী এবং মনোমুগ্ধকর। মরুভূমিতে উটের পিঠে ভ্রমণ, ক্যাম্প করে থাকা, sand-skiing

---

* *দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, সুলেখক সন্ন্যাসী।*

ইত্যাদি উপভোগ করা যায়। দুবাই শহর থেকে মরুভূমির দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার।

৩০ জুন দুপুর পৌনে দুটোর সময় এথেন্স পৌঁছাই। ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীব্যানার্জি, তাঁর স্ত্রী এবং জন ম্যানেট্টা ফুল দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। জন ম্যানেট্টা ১৯৫৩ সালে ভারতে এসেছিলেন পরম পূজ্যপাদ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিতে। শ্রীব্যানার্জি আমায় বললেন ঃ "মহারাজ, যদিও আমাদের বাড়িতে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, কিন্তু যেহেতু জন ম্যানেট্টাই প্রথমে আপনাকে এখানে আমন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন, আমি প্রস্তাব দিই আপনি তিনরাত্রি ওঁর বাড়িতেই থাকুন।" এই প্রস্তাব আমি খুশি মনেই মেনে নিই। জন ম্যানেট্টার বাড়িতে একটা ছোট ঠাকুরঘর আছে। ইতোমধ্যে মার্গট ও জেরহার্ড নামে এক দম্পতি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে ওঁর বাড়িতে আসেন। পরদিন শ্রীমতী নোটা জিওজিনো পরিচালিত 'হেলিয়ানটয়েস যোগ সেন্টার'-এ গিয়ে 'মানসিক চাপ জয় করতে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে হলো।

২ জুলাই আমরা 'ডেল্ফি'র উদ্দেশে রওনা হই। এখানেই প্রাচীন গ্রিসের বিখ্যাত মহিলা দৈবজ্ঞ পাইথিয়া থাকতেন। বলা হয়, তিনি ভাবাবেশে দৈববাণী শুনতে পেতেন। কেউ তাঁর কাছে কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রশ্ন করলে তিনি সে-প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁকে বলা হতো 'অ্যাপোলোর মুখপাত্র'। এমনকি রাজারাও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করতেন। যুদ্ধ, বিবাহ, যাত্রা, বাণিজ্য ইত্যাদি সব ব্যাপারেই লোকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মেনে চলত।

সেখান থেকে আমরা এক কনভেন্টে যাই এবং সেখানকার মঠাধিকারিণীর সঙ্গে চিত্তাকর্ষক আলোচনাও হয়। তিনি খুব সদাশয়া, আমাকে 'A night in the desert of the holy mountain' গ্রন্থটি উপহার দেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এখনো এথেন্সে অনেক প্রাচীনপন্থী সাধু আছেন, যাঁরা খুব সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন। আমি পুরুষ এবং মহিলাদের একটি করে মঠ পরিদর্শন করি। মহিলা মঠের অধ্যক্ষাকে প্রশ্ন করি ঃ "আপনি কি আমায় দয়া করে জানাবেন, আপনাদের মঠে টি.ভি. আছে কিনা।" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "না না, টি.ভি. বা ঐজাতীয় কোনকিছুই নেই। এমনকি আমরা কোন পত্রিকাও পড়ি না, কারণ বহির্জগতের আকর্ষণ থাকলে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।" ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল যখন কয়েক বছর আগে রোমের বেনেডিক্টিন মোনাস্ট্রিতে যাই। কনভেন্ট থেকে আমরা বিখ্যাত ডেল্ফিতে যাই। ফেরার পথে 'হোসিওস লুকাস মনাস্ট্রি' দেখে আসি।

পরদিন ৩ জুলাই একজনের সঙ্গে অগোরা পুরনো বাজারে যাই। একসময় আমাকে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি বিখ্যাত সব দার্শনিকদের বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। আমাকে জানানো হলো, এই বাজারেই এক কারাগারে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়। সক্রেটিস ঘুরে ঘুরে জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে তরুণদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁকে ভুল বোঝা হয় এবং বন্দী করা হয়। সেই জায়গাটিও দেখলাম। তাঁর জন্ম এথেন্সে এবং তিনি এখানেই থাকতেন। বেশভূষায় এবং জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন সাধারণ, সংযমী। পড়ানোর সময় তিনি শ্রোতাদের প্রশ্ন করতেন এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে তিনি তাদের অপূর্ণতা বুঝিয়ে দিতেন। তরুণদের কাছে জনপ্রিয় হলেও অনেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর প্রথাবিরুদ্ধ মতামতের জন্য তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। প্রভাবশালী এথেন্সবাসীদের মধ্যে তাঁর অনেক শত্রু ছিল। ধার্মিক ঐতিহ্যকে অসম্মান দেখানো এবং তরুণদের বিপথগামী করে তোলার অভিযোগে তাঁর বিচার হয়। স্বীয় পক্ষ সমর্থনে সক্রেটিস বলেছিলেন, জীবন ঠিক পথে পরিচালনার জন্য সত্যের সঠিক ধারণা অপরিহার্য। জুরিদের রায়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি শান্তভাবে হেমলক বিষপানে দেহত্যাগ করেন।

তরুণ অবস্থায় প্লেটো সক্রেটিসের সংস্পর্শে আসেন। সক্রেটিসের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শেষ বয়সে সক্রেটিসের কথা লিখতে গিয়ে লেখেন ঃ "এটা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, তাঁর জীবৎকালে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।" প্লেটো তাঁর 'Phaedo' গ্রন্থে সক্রেটিসের মৃত্যুর মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন।

এবার এথেন্সের কথায় আসা যাক। এথেন্স গ্রিসের রাজধানী। এর অতীত খুবই মহিমময় এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে পূর্ণ। একসময় এই শহর পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। গ্রিসের বিদ্যার দেবী এথেনার নাম অনুসারে এথেন্স নামের উৎপত্তি। এখানকার অধিবাসীরাই অলিম্পিক খেলার গোড়াপত্তন করে এবং গণতন্ত্রের ধারণার সূত্রপাতও হয় এই শহরে। শিল্প, নাটক, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য গ্রিকদের অবদান অনস্বীকার্য। এথেন্সের তিনদিকে তিনটি পর্বত—মাউন্ট পারনিথা, মাউন্ট পেনডেলি ও মাউন্ট হাইমেট্রোস। এথেন্সের ভিতরেও কম করে আটটা পাহাড় আছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অ্যাক্রোপোলিস এবং লাইকাভিট্রোস। এই দুই পাহাড় শহরের প্রায় সব জায়গা থেকেই দেখা যায়। অ্যাক্রোপোলিসের নিচে 'প্লাকা' নামে একটা খুব পুরনো এবং খুব সুন্দর জায়গা আছে যেখানে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। আমি একদিন শ্রীব্যানার্জির ছেলের সঙ্গে প্লাকা গিয়েছিলাম। সেখানে এক কাপ কফির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ১২০ টাকা।

এথেন্সে আসার কোন মানেই হয় না যদি না অ্যাক্রোপোলিসে যাওয়া যায়। এথেন্সে রওনা হওয়ার আগের দিন আমি যখন পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজকে ফোন করি, তখন উনি আমাকে ওনার 'A Pilgrim looks at the way' গ্রন্থে এথেন্সের ওপর অধ্যায়টি পড়তে বলেন। সেই গ্রন্থ পড়ে আমি জানতে পারি, মহারাজ ১৯৬১ সালে আমাদের বিদেশ মন্ত্রালয়ের আমন্ত্রণে রোম এবং অন্যান্য জায়গার সঙ্গে

এথেন্সও ভ্রমণ করেন। ১১ এপ্রিল মহারাজ এথেন্স পৌঁছান। পরদিনই উনি অ্যাক্রোপোলিস দর্শন করেন। অ্যাক্রোপোলিস গেলে নব্য প্রস্তর যুগের গ্রিক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। অ্যাক্রোপোলিসের দক্ষিণ ঢালে বিশাল থিয়েটার—'Theatre of Dionysos' বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশ্বের প্রাচীনতম এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম

গ্রিকদেবী আফিয়ার মন্দিরের সামনে লেখক, জন ম্যানেট্টো ও ভক্তবৃন্দ

শতাব্দীতে। অনুমান করা হয়, একসঙ্গে ১৭,০০০ দর্শক অভিনয় দেখতে পারত।

৪ জুলাই সন্ধ্যাবেলা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীব্যানার্জি তাঁর বাড়িতে 'Work is Worship' বিষয়ে আমাকে বলতে বলেন। সেদিন ছিল স্বামীজীর মহাসমাধির দিন। ৫ জুলাই আমি মেট্রো রেলে ২০০৪-এর অলিম্পিক স্টেডিয়ামের নিকটবর্তী স্টেশনে যাই। দূর থেকেই স্টেডিয়াম দেখি। সন্ধ্যাবেলা জন ম্যানেট্টোর বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁদের বেদান্ত স্টাডি সার্কেলে 'নতুন সহস্রাব্দে বেদান্তের ভূমিকা'র ওপর আমাকে বলতে হয়।

জন ম্যানেট্টো গ্রিক ভাষায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং চারটি যোগও রয়েছে। তাঁর কাছে আমি জানতে চাই কি করে তিনি বেদান্তের কথা জানতে পারেন। উত্তরে তিনি বলেন ঃ "১৯৪৯ সালে আমি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ছিলাম। তখন একদিন স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থটির ফরাসি তরজমা পড়ার সুযোগ হয়। গ্রন্থটি পড়ে আমি তৃপ্তিলাভ করি ও প্রেরণা পাই। এরপর আমি 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ' এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী পড়ি। পরবর্তী কালে আমি 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার সংস্পর্শে আসি।" ১৯৫৩ সালে জন ম্যানেট্টো প্রথম ভারতে আসেন। মাদ্রাজ ও বোম্বে হয়ে তিনি বেলুড় মঠে আসেন। সে-যাত্রায় তিনি স্বামী কৈলাসানন্দজী, স্বামী স্বাহানন্দজী, স্বামী বুধানন্দজী এবং স্বামী শাশ্বতানন্দজীর সান্নিধ্যে আসেন। শাশ্বতানন্দজী সেইসময় বেলুড় মঠের সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি জন ম্যানেট্টোকে 'গৌড়পাদ' পড়তে বলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি 'মাণ্ডুক্যকারিকা' পড়তে শুরু করেন। জন ম্যানেট্টো পরম পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, স্বামী মাধবানন্দজী এবং ভরত মহারাজকেও দর্শন করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর, উদ্বোধন কার্যালয় ও অদ্বৈত আশ্রমেও যান। তদানীন্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নির্দেশে তিনি ব্যাঙ্গালোরে যান স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিতে। ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই তিনি দীক্ষালাভ করেন। (প্রসঙ্গত, যেদিন তাঁর দীক্ষাগ্রহণের পঞ্চাশবছর পূর্তি হলো, সেদিন আমি ওঁর কাছেই ছিলাম।) দীক্ষার পর ২ আগস্ট বিদায় নেওয়ার সময় তিনি যতীশ্বরানন্দজীকে বলেন ঃ "মহারাজ, আমার বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে—জানি না আবার কবে ভারতে আসতে পারব।" উত্তরে মহারাজ বলেন ঃ "আমার কাছে যাওয়াও নেই, আসাও নেই। আমি দেখি এক অনন্ত মহাসমুদ্রে আমরা সকলে ভাসছি।" এই কথা বলে তিনি জন ম্যানেট্টোকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর আর কোনদিন তাঁদের দুজনের দেখা হয়নি।

গ্রিসের প্রাচীন স্টেডিয়াম

৭ জুলাই আমরা গাড়ি করে নিকটবর্তী Aegina দ্বীপে যাই এবং সেখানে বাতানুকূল নৌকাতে চড়ি। ৮ জুলাই আমরা কেবল রেলে চেপে লাইকাভিট্টোস পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পুরো এথেন্সের সামগ্রিক দৃশ্য উপভোগ করি। ৯ তারিখ আমি শ্রীব্যানার্জি, জন ম্যানেট্টো ও অন্য সকলকে বিদায় জানিয়ে ফিরতি পথে দুবাই রওনা হই। তাঁরা সকলে আমাকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে আসেন। এথেন্সে থাকাকালীন আমি দুটো গ্রিক শব্দ শিখেছিলাম। সকালবেলা 'Good Morning'-এর জায়গায় বলতাম 'Kali Mera'(কালি মেরা) এবং লেকচারের শেষে বা অন্যত্র 'Thank you' না বলে বলতাম 'Aforesto' (অ্যাফরেস্তো)।

দুবাইতে দ্বিতীয়বার প্রবেশের জন্যও আমার বিশেষ অনুমতিপত্র ছিল। সেজন্য কোন অসুবিধা হয়নি। এক মুসলিম মহিলা কর্মচারী বিমানবন্দরে আমার পোশাকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি ভাবলাম, কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা না হয়। তিনি শুদ্ধ ইংরেজিতে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে এসে বললেন ঃ "সবকিছু ঠিক আছে।" তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম।

১০ জুলাই প্রায় ভোর ৪.৩০টায় স্নান সেরে দুবাইকে বিদায় জানিয়ে প্লেনে উঠলাম। সকাল ৯টায় দিল্লি পৌঁছালাম। দুবাই, আবুধাবি ও এথেন্স ভ্রমণের মধুস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে থাকল। ❑
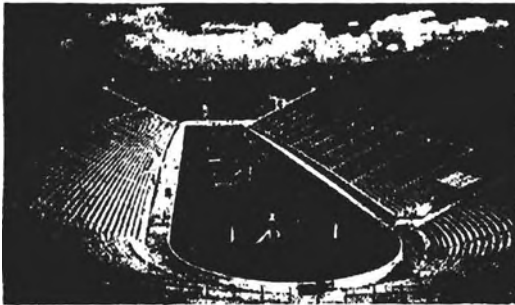
মৌলভি সাহেবের ঠাকুরদর্শন

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ*

পটভূমিকা

তিনি সেই 'মৌলভি', যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে একাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর নাম গিরীশচন্দ্র সেন। কোন মুসলিম বিদ্যালয়ে না পড়েও তিনি নিজের উজ্জ্বল প্রতিভার জন্য 'মৌলভি', 'মৌলানা' ইত্যাদি নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কোরান-সমেত অসংখ্য মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করে তিনি এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। আবার অন্যদিকে, ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ প্রচারকরূপে এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এ হেন ভগবদ্-প্রেমিকের দীর্ঘ জীবনকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—বাল্য এবং কৈশোর জীবন, কৈশোরোত্তর জীবন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গ, অনুবাদ ও সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি এবং বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১) বাল্য ও কৈশোর জীবন

গিরীশচন্দ্র সেন ১৮৩৪ (মতান্তরে ১৮৩৫) সালের ১ মে বর্তমান বাংলাদেশের পুরনো ঢাকা (বর্তমানে নরসিংদী, মতান্তরে নারায়ণগঞ্জ) জেলার মহেশ্বরদী পরগনার পাঁচদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাধবরাম সেন এবং মাতার নাম জয়কালী সেন। পিতামহ রামমোহন সেন সেযুগে নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। অতীব সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি বাল্যকালেই বহু ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ঢাকার পোগেজ স্কুল, ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। স্কুলের গণ্ডির বাইরে তিনি নানাভাবে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। যেমন—তাঁর পিতৃদেব শেখ সাদীর 'পান্দেনামা' স্বহস্তে লিখে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কাজী মৌলভিআব্দুল করিমের নিকট 'রোক্কা আতে আলমগিরি' অধ্যয়ন করেন। আবার ঢাকার বিখ্যাত মৌলভি আলিমুদ্দিনের কাছে তিনি কোরানপাঠের শিক্ষালাভ করেন। অপরদিকে সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকায় বাল্যকালেই তিনি সেই ভাষা আয়ত্ত করে সংস্কৃতে লিখিত 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'রঘুবংশম্', 'কুমারসম্ভবম্', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। প্রখর মেধাশক্তির বলে তিনি পড়াশুনাতে বরাবর ভালই ফল করতেন। ঠিক এই কারণে কিশোর বয়সেই মাতৃভাষা বাঙলা ছাড়া উর্দু, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই বয়স থেকে তিনি সুন্দর বক্তৃতাও দিতে পারতেন।

(২) কৈশোরোত্তর জীবন

গিরীশচন্দ্র ২২ বছর বয়সে ব্রহ্মময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর সাধারণ পাঠাভ্যাস ছিল। তাই গিরীশচন্দ্র তাঁর শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।

গিরীশচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণির শিক্ষকরূপে। পরে তিনি ময়মনসিংহের জেলা স্কুলে 'পারসি পণ্ডিত'-রূপে কাজ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তরে গেলেও সর্বত্র একনিষ্ঠ এবং আদর্শ কর্মী হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। ১৮৭৬ সালে তিনি লখনৌয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলভি আহসান আলির কাছ থেকে 'দীওয়ান' পাঠ করেন এবং তাঁর কাছে আরবি ব্যাকরণে পারঙ্গম হন। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপুরুষ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ময়মনসিংহে পদার্পণ করলে গিরীশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষালাভ করেন (মতান্তরে ১৮৭১ সালে ময়মনসিংহে তিনি ব্রাহ্মনেতা অঘোরনাথের কাছে দীক্ষালাভ করেন)। তারপর ১৮৭৪ সালে তিনি প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। সমাজের কাজের জন্য পূর্বতন ত্রিপুরার সরাইলের কালীকচ্ছ গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের শিক্ষাবিদ্ ও সুলেখক অধ্যক্ষ দ্বিজদাস দত্ত (১৮৪৯-১৯৩৫) তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্রচারার্থে গিরীশচন্দ্র সেইসময় কলকাতায় এলে ভারত আশ্রমে থাকতেন। তিনি মহিলাদের সার্বিক উন্নতির জন্য ১৮৯৫ সালে 'মহিলা' নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেই সম্পাদক এবং প্রকাশক ছিলেন। সেইসময়ে তিনি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

(৩) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ

গিরীশচন্দ্র কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের কর্মীদের সঙ্গে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন ১৮৭৪ সালে। এরপর বারবার যাতায়াতে ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সঙ্গে নানা স্থানে যেতেন। এমনকি তিনি ঠাকুরের স্টিমার

** অধুনা স্বামী ব্রহ্মানন্দ-জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামস্থ রামকৃষ্ণ মঠের কর্মী সন্ন্যাসী।*

ভ্রমণেও সঙ্গী হয়েছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলস্বরূপ তিনি ঠাকুরের ১৮৪টি বাণী সংগ্রহ করে ১৮৭৮ সালে ঠাকুরের জীবদ্দশায় 'শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৮৭ সালে পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে, এটিই ঠাকুরের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। ঠাকুরের সমাধির বাহ্য রূপ, ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বপূর্ণ বাক্যালাপ, হাস্যরসিকতা ইত্যাদি উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়। জনশ্রুতি আছে, উক্ত পুস্তকটি বর্তমান বাংলাদেশের শেরপুর শহরের চারু প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যার অস্তিত্ব কালের চক্রে এবং দেশবিভাগের ফলে অবলুপ্ত হয়েছে।

গিরীশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহের অন্তিম সময়ে এবং শ্মশানভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—যা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

(৪) অনুবাদ ও সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের পরামর্শে গিরীশচন্দ্র সেন বাঙলা অনুবাদসাহিত্যে অবতীর্ণ হন এবং তাতে তাঁর ব্যুৎপত্তির জন্য অল্পদিনের মধ্যে সাহিত্যজগতে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি কোরান, হাদিশ সমেত বহু মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৮১-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ বছরে তিনি কোরানের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তার আগে এই মহান কাজের জন্য কেউ সৎসাহস দেখাননি। তাই ১৮৮১ সালে প্রথম খণ্ড (পারা) প্রকাশের পর সমগ্র বাঙালি মুসলিম জাতির মধ্যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ সেই সময়ের গণ্যমান্য মুসলিম নাগরিকবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁদের সংস্থার পক্ষ থেকে গিরীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ইংরেজি অভিনন্দনপত্রের বঙ্গানুবাদ—

"কোরআন গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয়েষু
কলিকাতা,

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রথম খণ্ড পাঠ করিলাম এবং মূল গ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য অনুবাদের তুলনা করিলাম। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কিরূপে এতাদৃশ উদার অনুপূর্বক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষত যখন আরবতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্য অন্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন।

আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মুসলমান। আপনি নিস্বার্থভাবে জনহিতসাধনের জন্য যে এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্ট সহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদিগের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।

কোরআনের উপরি উক্ত অংশের অনুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা অনুবাদক সাধারণ সমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সক্ষম হইলেন, তখন সেইসকল লোকের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাহার উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা উচিত।

পরিশেষে আমাদিগের ক্ষুদ্র ও বিনীত বক্তব্য যে, আমরা বোধকরি এই পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারিলে অল্পশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সহিত আপনার বশীভূত ভৃত্য
আহমদোল্লা
কলিকাতা মাদ্রাসা ভূতপূর্ব উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিধারী
২রা মার্চ ১৮৮২ আবদোল আলা
*কলিকাতা আবদোল আজিজ।"**

১৮৮১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের শেরপুরের চারু প্রেস থেকে কোরানের প্রথম খণ্ড (পারা) প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতার বিধান যন্ত্র থেকে প্রতি মাসে একটি করে 'পারা' প্রকাশিত হতে থাকে। সেইসময় বইয়ের দাম ছিল চার টাকা। বইয়ের লেখক হিসাবে গিরীশচন্দ্র নিজের নাম গুপ্ত রেখেছিলেন। অনেকের অনুরোধও তাঁকে টলাতে পারেনি। নিজের নাম প্রকাশের বিষয়ে তিনি সর্বদা মৌন থাকতেন। যে-গ্রন্থ লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই কোরানের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

"আমি আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন শরীফ অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। এবিষয়ে আমি কোন কোন মুসলমান বন্ধু কর্তৃকও বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হই। কোরআন অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে এবং স্বীয় কর্তব্যানুরোধে ঈশ্বরকৃপায় আমি এখন কোরআন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি।"

প্রচলিত ভাষায় করা তাঁর কোরানের বঙ্গানুবাদের দুটি নমুনা নিম্নরূপ—

(১) "কলেমা তাইয়্যাবার"-এর অনুবাদ হলো—"পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নেই। মোহম্মদ তাঁহার ভৃত্য।"

(২) "সুরা এখলাস" (মক্কায় অবতীর্ণ)

দ্বাদশাধিকতম অধ্যায়, ৪ আয়াত, ১ রুকু

[দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।]

"তুমি বল, (হে মহাম্মদ) তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, নিষ্কাম ঈশ্বর। তিনি জাত নহেন এবং জন্মদানও করেন নাই। এবং তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই।"

---

* কোরান শরীফ—মৌলভি ভাই গিরীশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৮। ভাষা এবং বানান অপরিবর্তিত।

গিরীশচন্দ্র সেন ইসলাম শাস্ত্র বঙ্গানুবাদের জন্য তথা ইসলামপ্রীতির জন্য 'মৌলভি', 'মৌলানা' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।* একমাত্র প্রতিভার জোরে তিনি এসব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে কোন মুসলিম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে হয়নি।

তিনি অনুবাদসাহিত্য সৃষ্টির আগে নানাবিধ মৌলিক সহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন ১৮৬৯ সালে সহধর্মিণীর নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ব্রহ্মময়ী চরিত' নামে জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। অনেকের মতে, বাঙলা সাহিত্যে এটিই প্রথম জীবনীমূলক গ্রন্থ। তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভারকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মুসলিম সাহিত্যসম্ভার এবং বিবিধ গ্রন্থাবলী।

প্রধান গ্রন্থসমূহ—

(১) **মুসলিম সাহিত্যসম্ভার ঃ** (ক) সম্পূর্ণ সঠিক কোরআন শরীফ (১৮৮১-১৮৮৬) *(মূল গ্রন্থ থেকে তিনটি তকসীরের টিকাসহ বাঙলা অনুবাদ)।* (খ) প্রবচনাবলী *(আরবি থেকে অনুবাদ)*। (গ) হাদিশ বা মেসকাত্ মসাবিহ (১৮৯২-১৮৯৮)। (ঘ) মহাপুরুষ চরিত—১ম (১৮৮২-১৮৮৬) *(মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা, দাউদের জীবনী, আদি বাইবেল, কোরআন শরীফ, পারস্য পুরাবৃত্ত, মেরাজেল নবয়ুত, জামেও ওয়াহিদ, খোলাস তোল, আম্বিয়া ইত্যাদি থেকে সঙ্কলিত)।* (ঙ) মহাপুরুষ চরিত—২য় (১৮৮৫—১৮৮৭) *(মহাপুরুষ মুহাম্মদের জীবনচরিত)*। (চ) এমান হাসান ও হোসায়নের জীবনী (১৯০৯) *('রওজতোশ শোহদা' নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে)।* (ছ) চারিজন ধর্মনেতা (১৯০৯) *(মহাপুরুষ মুহাম্মদের প্রথম খলিফা চতুষ্টয়—আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর জীবনবৃত্তান্ত)*। (জ) চারিটি সাধ্বী মুসলমান নারী (১৯০৯) *(বিবি খাদিজা, ফাতেমা, আয়েশা ও তপস্বিনী রাবেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ 'মেরাজুল নবওয়াত' এবং 'তেজকরতোল আউলিয়া' থেকে সঙ্কলিত)*। (ঝ) তাপসমালা (১৮৮০-১৮৯৬) *(৯৬ জন মুসলমান তপস্বীর জীবনবৃত্তান্ত। মহামান্য মৌলানা শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার বিরচিত 'তেজকরতোল আউলিয়া' নামক মূল পারস্য গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত)*। (ঞ) মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপরবর্তী ইসলাম ধর্ম (১৯০৬) *(মহাপুরুষ মুহাম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোরআন হাদিশ প্রভৃতি থেকে সঙ্কলিত তদীয় ধর্মের সারসংগ্রহ ও সমালোচনা)*। (ট) হাফেজ—১ম (১৮৭৭) *(মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজ প্রণীত 'দেওয়ান হাফেজনামা' মূল পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)*। (ঠ) মহালিপি (১-১০) (১৯০৮) *(পরম সাধু মখদুস শরফোদ্দিন আম্মদ মনিরী কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মূল শততম পত্রাবলীর ভিতর দশটির বঙ্গানুবাদ)*। (ড) নীতিমালা (১৮৭৭) *(কিসিয়ামে সাদতের উর্দু অনুবাদ 'আকসিক হেদায়েত' গ্রন্থের অনুবাদ)*। (ঢ) তত্ত্বরত্নমালা (১৮৮২—১৮৮৭) *(মস্তে কোওয়র ও মৌলভি জালাউদ্দিন রুমী প্রণীত 'মসনবী' নামক পারস্য গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত)*। (ণ) দরবেশী (১৮৭৮-১৯০১) *('কিসিয়াতে সাদত' প্রভৃতি মূল মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র থেকে সঙ্কলিত মোসলমান সাধকদের বৈরাগ্যতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর বিশেষ বিবরণ)*। (ত) ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য (১৮৭৫) *('কিমিয়াতে সাদত' ও 'তেজকরতোল আউলিয়া' নামক গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত)*। (থ) তত্ত্বকুসুম (১৮৮১) *('গোৎসানে আস্রার' নামক মূল পারস্য গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত)*। (দ) কোরানের রচনাবলী।

(২) **বিবিধ গ্রন্থাবলী ঃ** (ক) শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৮৭৮, পরবর্তী ১৮৮৭) *(পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সর্বপ্রথম জীবনী ও উক্তি-সংগ্রহ)*। (খ) কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত (১৮৯৭) *(কোচবিহার বিবাহ বিষয়ে যেসকল অপপ্রচার করা হয়, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার খণ্ডন।* (গ) ব্রহ্মময়ী চরিত (১৮৬৯) *(সহধর্মিণীর জীবনী)*। (ঘ) সতী চরিত *(রানী শরৎকুমারীর জীবনী)*। (ঙ) আত্মজীবনী (১৯১৩)। (চ) পাঞ্জাবে ধর্মপ্রভাব ('ধর্মতত্ত্ব'-এ ১৯০৫ সালে প্রকাশিত)। (ছ) ব্রহ্মদেশ ও বৌদ্ধধর্ম। (জ) তহফতুল সোহাদিন *(রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত মূল গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ)*। (ঝ) তত্ত্ব সন্দর্ভমালা (১৯১৫) *(ধর্মজীবনের পত্তনভূমি)*। (ঞ) ভারতে ইংরেজী শাসন (১৯০৫)। (ট) মহিলা পত্রিকা (১৮৯৬ সাল, মতান্তরে ১৮৯৫ সাল থেকে প্রকাশিত)।

(৫) বিবিধ প্রসঙ্গ

ঢাকা শহরে গিরীশচন্দ্র সেন ১৯১০ সালের ১৫ আগস্ট দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহাবসানের পরে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নানা ধর্মের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া বহু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কোচবিহারের রাজপরিবারের কাহিনী (বিবাহ বিষয়ক)।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র সেনের এক বিশেষ স্থান ছিল। ঠাকুরের ত্যাগময় এবং বৈরাগ্যময় জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ঠাকুরের জীবনধারাকে নিজের জীবনে প্রতিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ভৌগোলিক স্থান হিসাবে ঢাকা ও দক্ষিণেশ্বরের দূরত্ব অনেক, কিন্তু গিরীশচন্দ্র সেন সেই দূরত্ব অবলীলায় অতিক্রম করে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই তাঁর মানবজন্ম সার্থক। ধন্য গিরীশচন্দ্র সেন। ❑

আকরগ্রন্থ

(১) বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ—স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ, পৃঃ ৩৮৮ (২) শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা—সঙ্কলক ঃ কালীজীবন দেবশর্মা, ১ম খণ্ড (৩) নবাঙ্কুর, ২০০১ (সাহিত্য পত্রিকা), পৃঃ ৩৩, লেখক—শেখ শাহবাজ রিয়াদ, বাংলাদেশ।

* মৌলানা ভাই গিরীশচন্দ্র সেন—রঞ্জিতকুমার সেন, পৃঃ ৪০

কর্মযোগের আদর্শ প্রতিমা শ্রীমা

স্বামী অমৃতত্বানন্দ*

সূর্য ও তার কিরণের মতো কিংবা চন্দ্র ও তার জ্যোৎস্নার মতো রামকৃষ্ণাভিন্না শ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন রামকৃষ্ণ-ভাবানুরঞ্জিতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরব্ধ কাজের শেষটুকু করার জন্য তাঁকে 'রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা' হয়ে মর্ত্যধামে থাকতে হয়েছিল সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর; তিনি যে রামকৃষ্ণ-মতানুসারীই হবেন তা স্বতঃসিদ্ধ। তাহলেও শ্রীমায়ের বাণী ও জীবনের মধ্যে যে এক অনাবিল প্রশান্তবাহিতা এবং স্বচ্ছসুন্দর সতেজ ভাব বিদ্যমান ছিল, যে অমল মাতৃস্নেহমণ্ডিত সত্যদীপ্তি ছিল—তা অনুধ্যান করা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য, কর্মযোগের বাস্তব রূপ হলেন শ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়।" " 'আমি' 'আমার'—এটি অজ্ঞান। 'হে ঈশ্বর, তুমি ও তোমার'—এটি জ্ঞান।" "সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে—যেন কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।" "সংসারে থাক, যেমন বড়-মানুষের বাড়ির ঝি" ইত্যাদির বাস্তব উদাহরণই তো শ্রীমা। কখনো তিনি তপস্যা করতে ঘরের বাইরে গেলেন না, গৃহের সকল কাজকেই সাধনার অঙ্গ করে নিরন্তর ঊর্ধ্বশিখা প্রদীপের মতো তিনি ঈশ্বরভাবনায় মনকে কাম-কাঞ্চনের ঊর্ধ্বে তুলে রাখলেন। ভগবানকে, অদ্বৈতবোধকে নিজ জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে স্বয়ং সর্বশক্তিময়ী বিশ্বেশ্বরী মা-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন—যাঁকে পূজা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সুতরাং শ্রীমায়ের বাণীর আলোকে কর্মযোগ যেভাবে রূপায়িত তা হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত আবশ্যক। স্বামী প্রেমানন্দ কাশী থেকে ১৯১৭ সালে স্বামী অচলানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "পূজনীয়া শ্রীমা এই কর্মযোগের জীবন্ত জ্বলন্ত পূর্ণ আদর্শ।" স্বামী মাধবানন্দজী লিখেছেন ঃ "শ্রীসারদাদেবী সত্য সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন এবং তাঁহারও জীবন আশৈশব কর্মময় ছিল। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এজগতে কর্ম করিতে করিতেই শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে—উপনিষদের এই উপদেশ যেন শ্রীসারদাদেবীর জীবনে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। আর দেখিতে পাই যে, তাঁহার ঐ কর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরার্থেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি আজীবন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কায়িক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালে তিনি উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া জয়রামবাটী অঞ্চলে কত লোকে সারদাদেবীকে গঞ্জনা দিয়াছে, একসময়ে তাঁহাকে দারুণ অভাবের মধ্য দিয়াও যাইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি ঘুণাক্ষরেও উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারই যত্নে লালিত ভ্রাতাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে তিনি কম কষ্ট পান নাই; বিশেষত শেষজীবনে তাঁহার আজন্ম পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু ও তাহার স্বামিশোকে বিকৃতমস্তিষ্ক জননীর হস্তে তিনি অকারণে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসকলের মধ্যেও তাঁহার উদারতা ও চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয় নাই। এই দুঃখময় সংসারে কিভাবে জীবনযাপন করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে, তিনি তাহাই নিজ দোষদৃষ্টিরহিত জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'।" (শতরূপে সারদা, সম্পাদনা ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১৩৯২, পৃঃ ১৯৩) গীতায় 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ' বলে যে উচ্চ অবস্থার কথা বর্ণিত আছে, তাতে শ্রীমা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন বলেই সহজেই বলতে পেরেছিলেন ঃ "সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। আমি যখন জয়রামবাটীতে ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম। কোথাও কারো বাড়ি যেতুম না।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১৪০১, পৃঃ ৭) "কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে, এক দণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।" নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি তোদের বয়সে কত (কাজ) করেছি।... এসব করেও রোজ একলক্ষ জপ করতুম।"

প্রথমেই মানুষ নিষ্কাম হতে পারে না, কর্ম করতে করতে নিষ্কাম ভাব আয়ত্ত হয়। কর্মযোগের প্রথম স্তর তাই সকাম হয়, স্বাভিমানে কৃত হয়; তাহলেও ধীরে ধীরে বিচার ও প্রার্থনায় তা কাটতে থাকে। "খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলব, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম—কোন হুঁশ থাকত না।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪০১, পৃঃ ৮৮)

এ-ই হলো পথনির্দেশ—কর্ম ও জপ-ধ্যান পাশাপাশি চলবে, নতুবা হৃদয়ে ভাব আসবে কোথা থেকে?

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর হাসপাতাল চালানো, বই বিক্রি করা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি কাজ সাধুর পক্ষে সঙ্গত নয়—এসকল কাজ ঠাকুর করতে বলেননি বা আমাদের

** রামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর (বাংলাদেশ)-এর অধ্যক্ষ।*

অধ্যাত্মশাস্ত্রেও ঐসকল কাজ অধ্যাত্মসাধনার সহায়ক বলে কোন নির্দেশ নেই। নিষ্কামভাবে পূজা, জপ-ধ্যান, কীর্তন, তীর্থযাত্রা, উপবাসাদিরই নির্দেশ রয়েছে; সুতরাং ঐসকল সেবামূলক কাজ ঈশ্বরবিমুখ করে। এসব কথা শ্রীমাকে জনৈক সাধু নিবেদন করলে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন ঃ "কাজ করবে না তো দিনরাত কী নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায়। ঠাকুরের কথা বলছ—তাঁর আলাদা কথা, আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর জোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছ বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?... ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।" (ঐ, পৃঃ ২৬১)

একেবারে স্পষ্ট কথা। যুগোপযোগী কথা। সেকাল নেই—যেকালে সাধু ও ব্রহ্মচারীদের পবিত্র জীবনোপায় ছিল মাধুকরী ভিক্ষা এবং সমাজের গৃহস্থগণ সে-দানকে অবশ্যকরণীয় পুণ্যকর্ম বলে জানত। যেযুগে শ্রীমায়ের আবির্ভাব, সেযুগে এ হেন সমাজভাবনা অন্তর্হিত, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও আশ্রম-সন্ন্যাস অবলুপ্ত; অধ্যাত্ম-ভাবনার ক্ষেত্রেও নানাধরনের পরিবর্তন সমাজ-ভাবনাকে প্রাচীন সমাজচেতনা থেকে ভিন্নমুখী করেছে। কর্মব্যতিরিক্ত ঈশ্বরভাবনাময় জীবন পরিত্যক্ত হওয়ায় সন্ন্যাসীদেরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। শ্রীমায়ের ঐ উক্তি তাই যুগবাহিত সত্যের আবরণহীন প্রকাশ। আরো কথা হলো—মঠের কার্যধারার প্রতি আপসহীন সমর্থন—"মঠ এমনিভাবেই চলবে, এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।"

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযোগ সম্পর্কিত বিতর্কের কথাটি এসে পড়ে। কথামৃতকার মাস্টার মহাশয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদপুষ্ট, তাঁর বাড়িতে শ্রীমা কয়েকবার বাসও করেছিলেন। তিনি কর্মযোগ প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ মন্তব্য করে ফেলতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তা জানতেন। কাশীতে একবার এঁরা সকলে অবস্থান করছিলেন। শ্রীমা একদিন কাশী সেবাশ্রম ঘুরে সব দেখেশুনে প্রসন্ন হয়ে বলেন ঃ "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" এরপর তিনি জানতে চাইলেন, প্রথমে কার মাথায় এই ভাব এসেছিল আর কিভাবে সে-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলো। সব শুনে বললেন ঃ "স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" গৃহে ফিরে তিনি সেবাশ্রমের অধ্যক্ষকে দশ টাকা অনুদান পাঠান। জনৈক ভক্ত তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" শ্রীমা ধীরভাবে বললেন ঃ "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।" শ্রীমায়ের এই অভিমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদিত হলে তিনি তা স্বামী শিবানন্দকে বললেন। ঠিক তখনি মাস্টার মহাশয় অদ্বৈত আশ্রমে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল, সাধন-ভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ না করে সমাজসেবায় ব্রতী হওয়া ঠাকুরের ভাবের অনুকূল নয়। ব্রহ্মানন্দজী তা জানতেন, তাই তাঁকে আসতে দেখে কয়েকজন ভক্ত-ব্রহ্মচারীকে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে বললেন ঃ "মা বলেছেন, সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; আপনি কি বলেন?" মাস্টার মহাশয়কে দেখে সকলে একযোগে প্রশ্ন করতে লাগল, মহারাজও তাতে যোগ দিলেন। তখন মাস্টার মহাশয় হাসতে হাসতে বললেন ঃ "আর অস্বীকার করবার জো নেই।" (ঐ, পৃঃ ২১০) কিন্তু এইদিনের এই স্বীকৃতি সাময়িক আনন্দ উচ্ছ্বাস বলে মনে হয়, কারণ ১৯১২ সালের এই ঘটনার পর ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডে 'শ্রীরামকৃষ্ণ, কর্মযোগ, নরেন্দ্র ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর পূর্ব মতই মুদ্রিত দেখা যায়।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমা একদিন স্থানীয় সেবাশ্রমের দ্বারা পরিচালিত আশ্রম দেখে বলেছিলেন ঃ "এই অনাথা বুড়িদের সেবা করলে নারায়ণসেবা করা হয়। আহা, এইসব ছেলেরা কী কাজই করছে!" অন্য সময়ে বলেছিলেন ঃ "সবই তাঁর ইচ্ছা, মা! কোথা থেকে কী করছেন, তিনিই জানেন।" সেবা যে 'নারায়ণেরই সেবা' তার দেবীনির্দেশ এখানে পাওয়া গেল—"এসবই তাঁর ইচ্ছা—তিনিই করাচ্ছেন।" সেবাকাজ যে ঈশ্বর-অনুমোদিত সাধন তা পরিষ্কার হলো। প্রকৃতপক্ষে এ হলো নবযুগের সাধন, তপস্যা।

জয়রামবাটীতে একদিন জপধ্যান প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন ঃ "সবসময় জপধ্যান করতে পারে কজন? মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার ঐসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।" (ঐ, পৃঃ ২৬১)[১]

এরই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, মা চাইতেন—কর্ম যোগে পরিণত হোক, তাঁর ছেলেরা যেন আসক্ত হয়ে সংসারে জড়িয়ে না পরে। তাই স্বামী তন্ময়ানন্দকে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন ঃ " 'টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস!' কোথায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের নাম করবে, না কেবল কাজ! আশ্রম হলো দ্বিতীয় সংসার! লোকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে আসে; কিন্তু এমন মোহ ধরে যায় যে, আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় না।" (ঐ, পৃঃ ২৬২)

আবার সেবাকার্যের সংশয়স্থলে তিনি সমাধান দিয়েছেন উদার অনাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে। কোয়ালপাড়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থশালী ব্যক্তিগণও ঔষধ নিতে আসে দেখে আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমায়ের নির্দেশ চাইলেন। মা বললেন ঃ "যে অর্থী—সে-ই দরিদ্র ধরে নিতে হবে, সুতরাং ঔষধালয়ের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে।"

---

১ "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" (গীতা, ৩।৬)

কর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংস্রব যেন না থাকে, তা যেন ঈশ্বরকেন্দ্রিক হয়—সেব্যাপারে শ্রীমা বলেছিলেন : "দেখ, তোমরা 'বন্দে মাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িও না; তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতো কাটি। তোমরা কাজ কর।" (ঐ, পৃঃ ২৬২) একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, আশ্রমকে ভগবন্মুখী করার জন্য স্বয়ং স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পট স্থাপন করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে দিলেন।

যখন প্রয়োজন হয়েছে, নিজেও অগ্রবর্তী হয়ে সেবা করেছেন। বাল্যকালে দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের পাতে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য নিজহস্তে পাখার হাওয়া করেছেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞানের পাঁচড়া, নিজ হাতে খেতে পারেন না; শ্রীমা তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন, এঁটো পাত পরিষ্কার করেছেন। এধরনের সেবা তিনি আজীবন করে গেছেন।

সংসারের কর্তব্যকর্মগুলি অনাসক্তচিত্তে এবং নিরভিমানে স্বয়ং অনুষ্ঠান করে তিনি আমাদের কর্মযোগের বাস্তব দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলতেন : "যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।" অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন অন্য কাউকে ভালবাসা মানেই আসক্ত হওয়া, আর তাতে দুঃখই আসবে—যোগ হবে না। তাছাড়া ভগবানে ভালবাসাই ভক্তি। তিনিই নিত্য। অনিত্য মরণশীল ব্যক্তিকে ভালবাসা তাই ভক্তি নয়। ভক্তি মোক্ষের কারণ, আসক্তি বন্ধনের।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো তিনিও বলতেন : "যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জনে সাধন করা খুব দরকার।... ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক-রকম চিন্তা আসতে পারে।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৪০)

"সংস্কার ও কর্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তু-ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।" (ঐ, পৃঃ ১৪২)

"প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো।" (ঐ, পৃঃ ১০৩)

"বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়।... একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।" (ঐ, পৃঃ ১৮৫) তাই প্রার্থনা হিসাবে 'নির্বাসনা' প্রার্থনাকেই শ্রীমা শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করেছিলেন।

কর্মযোগ সম্পর্কে শ্রীমায়ের ছিল নির্মোহ দৃষ্টি। স্বামী তন্ময়ানন্দ একবার তাঁকে বলেন : "মা, আপনি যার গুরু তার আবার সাধন-ভজন কি দরকার?" উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন : "তা বটে, তবে কি জান, ঘরে রাঁধবার সব জিনিস আছে; রান্না করে খেতে হয়। যে যত সকালে রাঁধবে, সে তত সকালে খেতে পাবে। কেউ সকালে খায়, কেউ সন্ধ্যায়, কেউ কুঁড়েমি করে রাঁধবার ভয়ে উপোস দেয়।" নিজেই এই কথার তাৎপর্য বলেছেন : "যে যত বেশি সাধন-ভজন করবে, সে তত শিগগির দর্শন পাবে। না করে শেষে পাবেই, নিশ্চয় পাবে। কিন্তু যে সাধন-ভজন না করে কেবল হইচই করে কাটাবে, তার দেরি হবে। সাধন-ভজন করবার জন্য সংসার ছেড়েছ। সর্বদা সাধন-ভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।" এটিই আসল কথা। সর্বদা সাধন-ভজন করা সাধারণের শরীর-মনের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সকল কাজ তাঁরই ভেবে ফলাকাঙ্ক্ষা ও অভিমান ত্যাগ করে করতে হয়।

আবার শারীরিক যোগ্যতা বুঝে তিনি ব্যবস্থা করেছেন। স্বামী তন্ময়ানন্দকেই বলেছেন : "তুমি বেশি কঠোরতা করো না, তোমার শূলবেদনা, খাওয়ার বিষয়ে নজর রাখবে। এ রোগ মারাত্মক নয়, কষ্টদায়ক।" আশ্রমের পিতলের হাঁড়ি মেজে মেজে তাঁর হাতে হাজা হয়েছে শুনে বলেছিলেন : "তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি ডহরকুণ্ডুতে যাও, যতটা পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানভজন করবে।"

বস্তুত, শ্রীমা কাজ আর জপধ্যানে কোন তফাত দেখতেন না, আবার ভেদও করতেন। মনের ভাববৈচিত্র্যই এই পরস্পর-বিরোধী কথার উৎস। আশ্রমের কাজকে জপধ্যানের বিঘ্ন যারা মনে করত, তাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টিকে পূর্ণ করার জন্যই তিনি বলতেন : "সকাল সন্ধ্যায় বসবে। আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে জপধ্যান করবে। কাজ আর কার? কাজ তো তাঁরই।" (ঐ, পৃঃ ৩৫১) আর যারা কাজের তোড়ে ভগবানকে ভুলতে বসেছে, বৈরাগ্য ভাবনার অভাবে বহির্মুখী হয়ে যাচ্ছে—তাদের বলতেন : "ভজনের অন্তরায় বাইরে বেশি থাকে না, ভিতরেই থাকে, ওসব ঠাকুরের নাম করতে করতে একটা একটা করে পড়ে যাবে। কাজ করে যাও, রইল কি গেল—সেদিকে তাকিও না।" "ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তায় পাপ কাটে।" "সব সয়ে যেতে হয়, কারণ কর্মানুসারে সব যোগাযোগ হয়। আবার কর্মের দ্বারা খণ্ডন হয়।"

"তুমি একটি সৎকাজ করলে, তাতে তোমার পাপটুকু কেটে গেল।" শাস্ত্রেও বলা আছে : "ধর্মেণ পাপমপনুদেতি।" (মনুসংহিতা) কর্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে শ্রীমা বলেছেন : "ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্মেই ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।"

"তার কাছ থেকে যে আবার বাসনা, কর্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তিলাভ করে, কেউ বা নিচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মতো সৃষ্টি চলছে। যে-জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম।" (ঐ, পৃঃ ১৮৮-১৮৯)

খুবই আশ্বাসের ও বাস্তব কথা : "চিরদিন সুখী থাকবে না, সব জন্ম কারো দুঃখে যাবে না; যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ হয়।"

"যখন জীবের সুসময় আসে তখন ধ্যানচিন্তা আসে; কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি, কু-যোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি, কালে সব আসে। তিনিই তাঁর ভিতর দিয়ে কার্য করেন।"

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের চৌকশ হওয়া দরকার, কারণ তাঁদের নানাবিধ লোকসেবাকর কাজ সাধন হিসাবে করতে হয়। এসকল কাজে যেমন ভগবৎসেবার ভাব রাখতে হয়, তেমনি সর্ববিষয়ে সজাগ দৃষ্টি ও ক্ষিপ্র কর্মকুশলতারও প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই যোগীন মহারাজকে (স্বামী যোগানন্দ) বলেছিলেন: "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানি কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে যে, তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি?... কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর যেসব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত গ্রহণ না করে চলে আসবিনি।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, ১৪০৪, পৃঃ ১৫৮-১৫৯) কোন ব্রহ্মচারী রাধুর পথ্য তৈরি করে আনার সময় অসাবধানতাবশত ফেলে দেওয়ায় শ্রীমাও তদ্রূপ বলেছিলেন: "আমার এখানে কাজকর্মে চৌকশ লোক চাই। 'গাছতলার সাধু' দিয়ে আমার কাজ হবে না। আবার হুজুগে পড়েও অনেকে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলে। কিন্তু মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২৭৫)

সর্বোপরি ছিল শ্রীমায়ের অসীম মাতৃস্নেহ, সকল সৃষ্টিতে তাঁর অমানবসুলভ সন্তানদৃষ্টি। সেই স্নেহপ্লাবনে আগত নরনারীদের বেদনায় তিনি সমব্যথী হয়ে উঠতেন ও গভীরভাবে তাদের বেদনাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নিতেন, প্রয়োজনীয় সাহায্য সাধ্যমতো করতেন, ভরে উঠত তাদের চিত্ত। এজন্য তিনি সবরকম কাজে অগ্রণী হতেন। এঁটো পরিষ্কার, বিছানার চাদর ধুয়ে দেওয়া, রান্না করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সংগ্রহ করা, এমনকি অসুস্থ ব্যক্তির মল পরিষ্কার করে দেওয়া—এককথায়, যখন যেখানে যেভাবে যেরকম সেবার প্রয়োজন হয়েছে—মা তখন সেখানে সেভাবে সেবা করেছেন পরম স্নেহে, অনন্ত দরদমাখা হৃদয়ে, নিরহঙ্কারে, দীন মনে, অযাচিত করুণায়। তাই তিনি আমাদের কর্মযোগের আদর্শ প্রতিমা।

এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনাসক্ত কল্যাণদৃষ্টি, ব্যাবহারিক কুশলতা ও ভগবদ্দৃষ্টি নিয়ে সংযত সাধনকর্মই কর্মযোগ বলে শ্রীমায়ের অভিমত বলে মনে হয়। এর দ্বারা যে সাধক ঈশ্বরলাভ করে ধন্য হবে তা বলাই বাহুল্য। ❑

শব্দচেতনা ৪৬

ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি: (১) ভগিনী নিবেদিতার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ (৪) স্বাধীনতার প্রাক্কালে নিবেদিতা বলতেন: "—— ভারত স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ার হচ্ছে মাত্র, এখনো দৌড় শুরু হয়নি।" (৭) নাগপুরে গিয়ে নিবেদিতা যে-বিচারপতির গৃহে অবস্থান করেন (৯) নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ আরেক ভগিনী (১০) নিবেদিতা এঁর ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন (১২) স্বামীজীর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তা নিবেদিতা যেন এটাই লাভ করেছিলেন (১৪) নিজের দেশে তিনি এই স্কুল স্থাপন করেন (১৫) গুজরাটের এই শহরে নিবেদিতা 'এশিয়ার ঐক্য ও স্বামীজী' বিষয়ে বক্তৃতা দেন (১৮) '——চন্দ্র দত্ত' নিবেদিতার প্রথম গ্রন্থটি ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন (১৯) এই শিল্পী নিবেদিতার গ্রন্থের চিত্র অলঙ্করণ করতেন।

ওপর-নিচ: (২) "ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে/ সেবিকা, বান্ধবী, —— তুমি একাধারে" (৩) জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার নিয়ে নিবেদিতা বক্তৃতা দেন '—— সোসাইটি'তে (৫) আমেরিকার এই হিতৈষী বান্ধবী নিবেদিতাকে আর্থিক সাহায্য করেন (৬) জনৈকা পারসি মহিলা, যাঁকে নিবেদিতা বেলুড় মঠ দেখাতে নিয়ে যান (৮) জগদীশচন্দ্র বসু বলতেন: "—— ও অবসন্ন বোধ করিলে আমি নিবেদিতার আশ্রয় লইতাম।" (১১) নিবেদিতা বক্তৃতা দিতেন '—— বসু ভবন'-এর অধিবেশনে (১৩) অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ এখানে (১৫) বিদ্যালয়ের মেয়েদের নিবেদিতা '—— মেয়ে' বলে সম্বোধন করতেন (১৬) বিপ্লবী 'ঘোষ', যিনি নিবেদিতার সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করেছেন (১৭) ছোটবেলায় নিবেদিতার এই বিদ্যার প্রতিও অনুরাগ জন্মায়।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
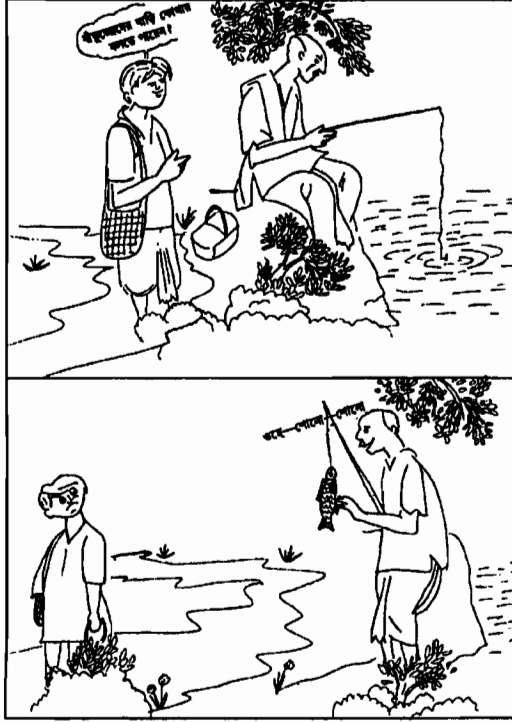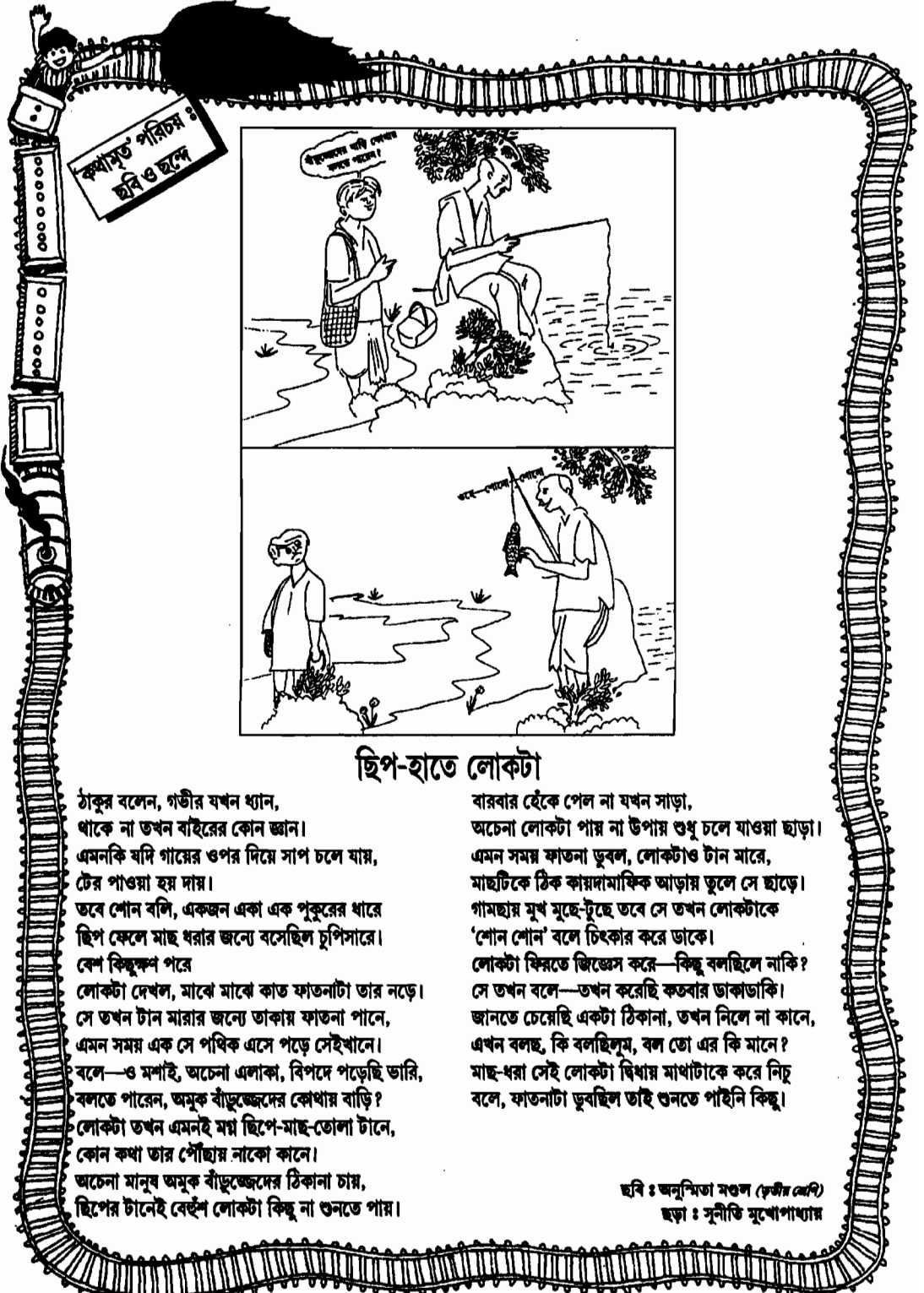
ছিপ-হাতে লোকটা

ঠাকুর বলেন, গভীর যখন ধ্যান,
থাকে না তখন বাইরের কোন জ্ঞান।
এমনকি যদি গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে যায়,
টের পাওয়া হয় দায়।
তবে শোন বলি, একজন একা এক পুকুরের ধারে
ছিপ ফেলে মাছ ধরার জন্যে বসেছিল চুপিসারে।
বেশ কিছুক্ষণ পরে
লোকটা দেখল, মাঝে মাঝে কাত ফাতনাটা তার নড়ে।
সে তখন টান মারার জন্যে তাকায় ফাতনা পানে,
এমন সময় এক সে পথিক এসে পড়ে সেইখানে।
বলে—ও মশাই, অচেনা এলাকা, বিপদে পড়েছি ভারি,
বলতে পারেন, অমুক বাঁড়ুজ্জেদের কোথায় বাড়ি?
লোকটা তখন এমনই মগ্ন ছিপে-মাছ-তোলা টানে,
কোন কথা তার পৌঁছায় নাকো কানে।
অচেনা মানুষ অমুক বাঁড়ুজ্জেদের ঠিকানা চায়,
ছিপের টানেই বেহুঁশ লোকটা কিছু না শুনতে পায়।

বারবার হেঁকে পেল না যখন সাড়া,
অচেনা লোকটা পায় না উপায় শুধু চলে যাওয়া ছাড়া।
এমন সময় ফাতনা ডুবল, লোকটাও টান মারে,
মাছটিকে ঠিক কায়দামাফিক আড়ায় তুলে সে ছাড়ে।
গামছায় মুখ মুছে-টুছে তবে সে তখন লোকটাকে
'শোন শোন' বলে চিৎকার করে ডাকে।
লোকটা ফিরতে জিজ্ঞেস করে—কিছু বলছিলে নাকি?
সে তখন বলে—তখন করেছি কতবার ডাকাডাকি।
জানতে চেয়েছি একটা ঠিকানা, তখন নিলে না কানে,
এখন বলছ, কি বলছিলুম, বল তো এর কি মানে?
মাছ-ধরা সেই লোকটা দ্বিধায় মাথাটাকে করে নিচু
বলে, ফাতনাটা ডুবছিল তাই শুনতে পাইনি কিছু।

ছবি ঃ অনুস্মিতা মণ্ডল *(তৃতীয় শ্রেণি)*
ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ।

পিঁড়ি দাও

পিঁড়ি দাও

চারজন তরতাজা যুবক (পরে এঁরা স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী সহজানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ) বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তোমরা এসেছ। শুনেছি তোমরা নাকি স্বদেশি কর। এসেছ বেশ হয়েছে। শীতলবাবু বাড়িতে ফুলের টব রেখেছেন। বালীতে ওনার বাড়ি, নৌকা করে নিয়ে এস তো।

শীতলবাবুর বাড়িতে—

শোন বাবারা, এই টবগুলো নিয়ে যাও। ও হ্যাঁ, কিছু দেবদারুর ডালও লাগবে সাজানোর জন্য। মঠের গাছ থেকে পেড়ে রেখো।

মঠে ফিরে দেবদারু গাছের ডাল পাড়তে গিয়ে—

ওরে সর্বনাশ! কী লাল পিঁপড়ে।

দেখ কাণ্ড। পিঁপড়ের কামড় সহ্য করতে পারে না, এরা নাকি দেশ স্বাধীন করবে।

বাবুরাম মহারাজ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে চারজনের একজন (স্বামী সত্যানন্দ) গাছে উঠে দেবদারুর ডাল কেটে নিচে ফেললেন। যখন তিনি নামলেন—সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে ভর্তি।

সত্যিই এত পিঁপড়ে ছিল? আমি তো বুঝতেই পারিনি।

এই তো চাই। চলে আয় তোরা। স্বামীজী বলতেন : আমার এমন কয়েকটা ছেলে চাই যারা কুমিরের মুখে লাফিয়ে পড়তে বললে লাফিয়ে পড়বে।

• চিত্ররূপ : সৌরীশ মিত্র •

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা কার্তিকেয়ন, সানিয়া

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*

এথেন্স অলিম্পিকে জাতীয় ব্যর্থতা ভুলে ভারতবাসী আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর এই স্বপ্ন দেখার বা স্বপ্ন বেচার অঙ্গীকার নিয়ে অভিষ্টসাধনে ব্রতী একদল তরুণ তুরকি ভারতীয় ক্রীড়াবিদ। দীর্ঘদিনের অচলায়তন ভেঙে, যাবতীয় নেতিবাচক সংস্কার ঝেড়ে ফেলে এরাই পারে নতুন শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গৌরবময় অবস্থান তৈরি করতে। গত প্রায় অর্ধশতক জুড়ে বিশ্ব হকিতে ভারত তার সাফল্য ও গরিমা-মণ্ডিত অধ্যায় রচনা করে যে 'মিথ'-এর জন্ম দিয়েছিল, তা বর্তমানে এক বিস্মৃতপ্রায় রূপকথা হয়ে গেছে। এই প্রজন্ম মনে করে, তাদের জীবদ্দশায় আর হকির কোন বিশ্বমঞ্চে ভারতীয়দের গর্বিত পদসঞ্চার দেখবে না। বরং টেনিস, দাবা, শুটিং, এমনকি ধনীদের খেলা বলে এদেশে অপাঙ্‌ক্তেয় মোটর রেসিং, বিলিয়ার্ডস, স্নুকার বা গলফে ভারতীয় বিপ্লবের অঙ্কুরোদ্গম ঘটার ইঙ্গিত ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভারতীয় ক্রীড়াজগতের নতুন স্বপ্নসন্ধানী নারায়ণ কার্তিকেয়ন

নারায়ণ কার্তিকেয়ন, সানিয়া মির্জা, পেন্টাইয়া হরিকৃষ্ণ, হরিশঙ্কর রাই বা পঙ্কজ আদবানির নাম একবছর আগেও এদেশের সমাজ-মানসে তেমন রেখাপাত করেনি। আর ২০০৫-এর গোড়ায় তারাই এদেশের ক্রীড়ামোদী মানুষের কাছে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী নাম, ভবিষ্যতের আলোক-দর্শিকা এবং তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নমন্থনের রূপকার। বিশেষ করে বলতে হয় কার্তিকেয়ন আর সানিয়া মির্জার কথা। এমন দুটি ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতবর্ষের পতাকাবহনের গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, যে-দুটি খেলায় দেশের ন্যূনতম ঐতিহ্য ও সাফল্য নেই, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মনে বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নেই। মিডিয়ার একাংশের কাছেও ব্রাত্য হয়ে থাকা সেই দুটি খেলায় ভারতবর্ষের মানুষের মনোযোগকে আকর্ষণ করতে পারাটাই এই দুই ক্রীড়াবিদের প্রধান কৃতিত্ব।

সানিয়া মির্জা—বিশ্ব টেনিসে ভারতীয় চ্যালেঞ্জ

ফর্মুলা ওয়ান মোটর রেসিং শুধু গতির লড়াই নয়, স্নায়ু টানটান করা এক অ্যাডভেঞ্চারও বটে। জীবনকে বাজি রেখে খেলার নাম 'ফর্মুলা ওয়ান'। এই রেসে গাড়ি এবং তার চালককে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয় গতি, শক্তি, বিচক্ষণতা, সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির। ঘণ্টায় ৩০০-৩৫০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাতে হয় ট্র্যাকে বিপজ্জনক সব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। ৩০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় কমপক্ষে ৫৮টি ল্যাপের মাধ্যমে। সারা বছরে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে এরকম ২০টি রেস হয়ে থাকে। আর এই রেসকে কেন্দ্র করে সেইসব শহর তথা দেশে যেন একটা বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। এককথায় মোটর রেসিং বা ফর্মুলা ওয়ান নিছকই একটি খেলা নয়, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ সোপানও বটে।

এ হেন একটি কষ্টসাধ্য ও প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং খেলায় চেন্নাইয়ের যুবক নারায়ণ কার্তিকেয়নের প্রবেশ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। ফর্মুলা ফোর থেকে শুরু করে একের পর এক ধাপ সসম্মানে অতিক্রম করে স্বপ্নমোহিত ফর্মুলা ওয়ানে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছেন নারায়ণ। ফর্মুলা ওয়ানে ঢুকে পড়াটাই এক শিহরণ উদ্রেককারী ঘটনা। অনেকটা বিশ্বকাপ ফুটবলে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। ব্রিটিশ গ্রাঁপ্রি চ্যাম্পিয়ন নারায়ণের শুরুটা অবশ্য তেমন আশাপ্রদ হয়নি। মেলবোর্ণে মরশুমের প্রথম রেসে পঞ্চদশ স্থান পেয়েছেন তিনি। তবে রেসটা যে শেষ করতে পেরেছেন, এটাই ভবিষ্যতের পক্ষে আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। বহু ওজনদার র‍্যালিস্ট জীবনের প্রথম ফর্মুলা ওয়ান রেসে ঘাবড়ে গিয়ে স্নায়বিক শক্তি ও মনঃসংযোগ ঠিক রাখতে না পেরে রেস থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। তবে মেলবোর্ণে মূল রেসে নামার আগে বার্সিলোনায় যে টেস্ট ড্রাইভ হয়েছিল, সেখানে কার্তিকেয়নের পারফরমেন্স দেখে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি কিংবদন্তি ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ান মাইকেল শ্যুমাখার। শুধু তিনিই নন, আরো অনেক পোড়খাওয়া মোটর রেসিং ড্রাইভার তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর টিম জর্ডনের ম্যানেজমেন্ট স্বপ্ন দেখছেন, কার্তিকেয়নের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী ইউনিট ভবিষ্যতের ফেরারি, বি. এম. ডব্লু, মার্সিডিজের মতো নামজাদা দলগুলিকে পিছনে রেখে একনম্বর দল হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যেই এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করেছেন কার্তিকেয়ন। মরশুমের দ্বিতীয় রেস মালয়েশিয়ান গ্রাঁপ্রিতে

** তরুণ ক্রীড়া-সাংবাদিক, 'উদ্বোধন'-এর ক্রীড়াবিভাগের নিয়মিত লেখক।*

তিনি নিজেকে আরো কয়েক ধাপ ওপরে তুলে এনেছেন। পেয়েছেন একাদশ স্থান। চমকিত হয়েছে গোটা দেশ।

ঘাউস মহম্মদ, নরেশকুমার, রমানাথন কৃষ্ণণ, বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণণ, লিয়েণ্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতির হাত ধরে ভারতীয় পুরুষ দল আন্তর্জাতিক টেনিস সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে। তিনবার ডেভিস কাপ ফাইনাল খেলেছে ভারত। রমানাথন ও রমেশ কৃষ্ণণ, বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, লিয়েণ্ডার পেজ-মহেশ ভূপতিরা পেশাদার ট্যুর সার্কিটেও বহু সাফল্য এনে দিয়েছেন। লিয়েণ্ডার অলিম্পিক পদকও দিয়েছেন দেশকে। তবুও কোথায় যেন একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। আর সেই শূন্যতা থেকে জন্ম নিয়েছিল একরাশ হতাশা। কী সেই শূন্যতা ও হতাশা? পুরুষদের তুল্যমূল্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও এদেশের মহিলারা বিশ্বটেনিসে তেমনভাবে দাগ কাটতে না পারার যন্ত্রণা থেকেই এই হতাশার জন্ম। টেনিসে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হতে গেলে দুক্ষেত্রেই সাফল্য আবশ্যক। সানিয়া মির্জার আগমনের আগে কোন ভারতীয় নারী আন্তর্জাতিক সার্কিটে সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে পারেননি।

অতীতে সুশান দাস, অমৃতা আলুওয়ালিয়া, নিরুপমা মানকাড়, কিরণ বেদিরা এশীয় স্তরে মোটামুটি পারফরমেন্স করলেও পেশাদার সার্কিটে হালে পানি পাননি। সাম্প্রতিক কালে নিরুপমা বৈদ্যনাথন একবার 'ওয়াইল্ড কার্ড' নিয়ে গ্র্যাণ্ড স্লাম টুর্ণামেণ্টে খেলার সুযোগ পেলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডের বেশি এগোতে পারেননি, আর সার্কিটেও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেননি। সেদিক থেকে সানিয়া মির্জার উত্থান ভারতীয় টেনিসে অনেকটা 'ভিনি ভিডি ভিসি'-র মতো। ২০০৩-এ জুনিয়র উইম্বলডনে রুশ তরুণী ক্রেবানোভার সঙ্গে ডাবল্‌স চ্যাম্পিয়ন হয়ে সার্কিটে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের এই তরুণী। তার পর থেকেই সানিয়ার পারফরমেন্সের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। সেবছরই হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান গেমসে চারটি সোনা জিতে তিনি গেমসে সেরা ক্রীড়াবিদের স্বীকৃতি পান। আর ২০০৪-এ বিশ্বের নানা প্রান্তে আই. টি. এফ. পরিচালিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জার ও স্যাটেলাইট টুর্ণামেণ্টে জয়ধ্বজা উড়িয়ে তিনি এবছরের গোড়াতেই ডব্লু. টি. এ. পেশাদার সার্কিটে নিজের গৌরবময় স্থান করে নিয়েছেন।

ভারতের নতুন তারকা
পঙ্কজ আদবানি

সোনার ছেলে হরিশঙ্কর রাই
আলোকচিত্র : বি. বি. সাহা

আর কী চমকপ্রদ শুরুটাই না করেছেন সানিয়া! মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠে বিশ্ববন্দিতা সেরেনা উইলিয়ামসের কাছে হারলেও তাঁকে ও বিশ্বটেনিস সমাজকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, তিনি থাকতেই এসেছেন লম্বা রেসের ঘোড়া হয়ে। তার প্রমাণ পরবর্তী সময়ে হায়দ্রাবাদ ওপেনে তাঁর চেয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা তারকাদের ধরাশায়ী করে খেতাব জিতে নেওয়া। হায়দ্রাবাদের পর দুবাই ওপেনেও অব্যাহত ছিল 'সানিয়া ম্যাজিক'। গতবারের ইউ. এস. ওপেন-জয়ী রুশ তারকা স্বেতলানা কুজনেৎসোভা পর্যন্ত বশীভূত সানিয়া ম্যাজিকে। পায়ের চোটের কারণে শেষ চারে উঠতে না পারলেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এই পারফরমেন্সের জোরে অনেকটাই উঠে এসেছেন সানিয়া। আর এবছরের শেষে প্রথম তিরিশ জনে চলে আসাটা তাঁর লক্ষ্য, যা এখন আর অবাস্তব কল্পনা বলে বোধ হচ্ছে না।

বিশ্ব জুনিয়র দাবা চ্যাম্পিয়ন
পি. হরিকৃষ্ণ

কার্ত্তিকেয়ন, সানিয়া ছাড়াও আরো তিন তরুণ ক্রীড়াবিদের নাম করতে হয়, যাঁরা আপন কীর্তিশোভায় ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছেন ভারতবর্ষের। পি. হরিকৃষ্ণ অবশ্য তিন-চারবছর ধরেই এই ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে আসছেন, তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি গত অক্টোবরে রচিত হয়েছে। বিশ্ব জুনিয়র দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে হরিকৃষ্ণ তাঁর আদর্শ বিশ্বনাথন আনন্দকে ছুঁয়েছেন। এই মুহূর্তে বিশ্বদাবায় সিনিয়র ও জুনিয়র—দুক্ষেত্রেই একনম্বর দাবাড়ুদ্বয় ভারতীয়, এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কী হতে পারে! ভারত সভ্যতার ঐতিহ্যসঞ্জাত খেলা দাবায় ভারতীয় সাফল্য ও গৌরব অবশ্যই বাড়তি মাত্রাবহ। আর অ্যাথলেটিক্সে এক বঙ্গতনয় হরিশঙ্কর রাই দিনের পর দিন আরো উঁচুতে নিজের অবস্থানকে তুলে ধরছেন। হাইজাম্পার হরিশঙ্কর গত বছরের শেষ পর্বে সিঙ্গাপুরে এশিয়ান অলস্টার মিটে ২.২৫ মিটার লাফিয়ে তারকাখচিত এই মিটের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিনিয়ার পর্যায়ে এত বড় সাফল্য পাওয়ায় হরিশঙ্করকে নিয়ে আগামী এশিয়াডের লক্ষ্যে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়ে গেছে। পঙ্কজ আদবানি মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রীড়াবিদ-রূপে একই সময়ে বিলিয়ার্ডস এবং স্নুকারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ❑

প্রসঙ্গ 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী'

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় 'ইতিহাস' বিভাগের গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী' সত্যিই চিত্তাকর্ষক। এমন সুন্দর একটি প্রবন্ধ পড়তে পাওয়ার জন্য 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক মহারাজকে অনেক ধন্যবাদ। সম্পূর্ণ গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ যে মনকে এতখানি আকৃষ্ট করতে পারে তা এই প্রথম অনুভব করলাম। সরস্বতী নদীখাতের যে চারটি রাস্তার বর্ণনা এই প্রবন্ধে পেলাম, 'অ্যাটলাস' দেখে তা বোঝার চেষ্টা করলাম। এ এক বিমোহিত করা উপলব্ধি। ঠিক এমনই যমুনা নদীর তিনবার রাস্তা পরিবর্তনের মানচিত্র-সহ বর্ণনা থাকলে খুব ভাল হতো।

সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া নদীবক্ষে ড্রিল করে পাওয়া স্বাদু জলের আইসোটোপ পরীক্ষায় যদি একথা স্পষ্ট হয় যে, সেই জল হিমালয়ের হিমবাহ থেকে আসা এবং সেই জল ৮ থেকে ১৪,০০০ বছরের পুরনো, তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে—সরস্বতী নদীসভ্যতা যদি কখনো থেকে থাকে, তাহলে তা ৬ থেকে ১২,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। কিন্তু এই সময়কালের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা পেয়েছি কী? বিভিন্ন ইতিহাস ও বিশ্বকোষ গ্রন্থে যেসমস্ত Cradles of Civilization-এর নজির আমরা পাই তা হলো—(১) নাইল (নীল নদ) নদীসভ্যতা, ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ; (২) টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীসভ্যতা, ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ; (৩) ইন্দাস (সিন্ধু) নদীসভ্যতা, ২,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং (৪) হোয়াং হো নদীসভ্যতা, ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সরস্বতী নদীর মোট চারবার পরিবর্তিত রাস্তা অনুসরণ করে সেইসব আলাদা আলাদা সময়কালের নদীতীরবর্তী সভ্যতার মাটির নিচে চাপা পড়ে যাওয়া লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষ অথবা অন্য কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেসকলের সবিশেষ বর্ণনা-সহ আরেকটি এমনই গবেষণামূলক প্রবন্ধ ভবিষ্যতে উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে আন্তরিক অনুরোধ জানাই।

বৈদিক যুগের পুণ্যতোয়া নদী সরস্বতী দেবী-রূপে সর্বত্র পূজিতা, ঋগ্বেদে তাঁর নাম ও স্তুতিসহ ৪৫বার উল্লেখ রয়েছে, অথচ হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে গঙ্গাজল অপরিহার্য। দেবী গঙ্গার ধরায় অবতরণ মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্য। মৃতের আত্মার শান্তি- কামনায় অস্থি গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা আজও প্রচলিত। এমনকি সঙ্গমের তিনি নদীর নামের বিন্যাস এইভাবেই—প্রথমে গঙ্গা, পরে যমুনা এবং তারপর সরস্বতী। এই নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়।

গৌতম ভট্টাচার্য
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-৭২২১২২

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী' অত্যন্ত সমৃদ্ধ রচনা। এই প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা মনে জাগছে। আমি হুগলি জেলার এক তীর্থস্থান 'ত্রিবেণী'র কাছে থাকি। ছেলেবেলা থেকে আমরা পড়েছি ও জানি, এলাহাবাদের কাছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যুক্ত হয়েছে এবং গঙ্গা-যমুনা দৃশ্যমান, সরস্বতী লুপ্ত। তাই এলাহাবাদের প্রয়াগ 'যুক্ত ত্রিবেণী'।

কিন্তু হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী মুক্ত হয়েছে এবং গঙ্গা-সরস্বতী দৃশ্যমান, যমুনা লুপ্ত। তাই এই ত্রিবেণীকে 'মুক্ত ত্রিবেণী' বলা হয়। কবি লিখেছেন :

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিহারী রঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থবরদ বঙ্গে।"

ত্রিবেণীতে সরস্বতী নামে নদী রয়েছে, যা আদিসপ্তগ্রাম (সাতগাঁ), দেবানন্দপুর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। এই সরস্বতীর সঙ্গে প্রবন্ধে উল্লিখিত সরস্বতীর কী যোগাযোগ, প্রবন্ধকারের কাছে তা জানতে চাই। এব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
ব্যাণ্ডেল, হুগলি-৭১২ ১২৩

প্রসঙ্গ 'মায়ের ম্যানেজমেণ্ট'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১১ সংখ্যায় 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে প্রকাশিত 'মায়ের ম্যানেজমেণ্ট' লেখাটি পড়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছি। আধুনিক যুগের তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঠিক এধরনের লেখারই প্রয়োজন ছিল। বর্তমান প্রজন্ম যে মহাপুরুষদের জীবনী বা ধর্মীয় আলোচনা পড়তে চায় না, তার অন্যতম কারণ হলো বেশির ভাগ লেখায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তো থাকেই না বরং থাকে কিছু দুর্বোধ্য, দার্শনিক ও ধর্মীয় শব্দ, যা ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে 'uninteresting' ও 'boring' লাগে। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে মায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষ করে management-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি মায়ের administration, job-distribution, communication, man-material-money management, management philosophy, strict observance of rules, reasoning, perfection, work ethics, patience, selflessness প্রভৃতি গুণাবলি উদাহরণ সহকারে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন, আমাদের মা কী দারুণ management expert ছিলেন।

এই আলোচনাকে সম্প্রসারিত করতে সম্পাদক মহারাজের অনুমতিসাপেক্ষে মায়ের আরো কয়েকটি managerial quality-র point জুড়ে দিতে চাইলে আশা করি ছন্দপতন ঘটবে না।

মায়ের Leadership Quality : যেসময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন Ramakrishna Incorporation-এর entrepreneur-cum-promoter ঠাকুর 'catch them young' নীতি চালু করে নরেন, রাখাল, লাটু প্রভৃতি কাঁচা হীরের টুকরোগুলিকে ঘষে মেজে 'কাটিং' করছিলেন। সেইসময় তাঁদের রাত জেগে সাধন-ভজনে যাতে ঘুমের আবেশ না আসে সেজন্য ঠাকুর তাঁদের রাতের খাবারের পরিমাণে rationing করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা তা

মানতেন না, সকলকে তাঁদের বরাদ্দের বেশি খেতে দিতেন। ছেলেদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে মায়ের কাছে অনুযোগ করলে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছিলেন: "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" এই কথার মাধ্যমে মা ঠাকুরের team-কে নিজে adopt করে team member-দের যেভাবে protection দিলেন তা এক অসাধারণ leadership quality-র উদাহরণ। ঐ কথা শুনে ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, সব ব্যাপারে আর তাঁর নাক গলাতে হবে না। কোম্পানিতে একজন দায়িত্বশীল Manager এসে গেছে!

মায়ের Decision making: সুদক্ষ ম্যানেজার তাদেরই বলা হয়—যারা দ্রুত, নির্ভুল ও আইনানুগ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কলকাতায় যেবার প্লেগ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছিল, সেবার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুরা সেবাকাজে নেমে প্রতি পদে অর্থের অভাব উপলব্ধি করছিলেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় ব্রতী স্বামীজী বিচলিত হয়ে মঠ বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গুরুভাইরাও তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করতে পারছিলেন না বা অন্য কোন পথও দেখাতে পারছিলেন না। হয়তো বেলুড় মঠ বিক্রিই হয়ে যেত, কিন্তু বাধ সাধলেন স্বয়ং মা। তিনি স্বামীজীকে বললেন: "সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠস্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?" কী মোক্ষম যুক্তি! কী মারাত্মক legal acumen! অতি বড় legal consultant-ও সেই মুহূর্তে ঐরকম decision দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ—তাও আবার স্বামীজীর মতো মহা যুক্তিবাদীকে! তারপর মা তাঁর যুক্তির সমর্থনে যা বললেন তা এককথায় তাঁর managerial far sightedness-এর সাক্ষ্য দেয়। স্বামীজীকে মা বললেন: "বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।" মায়ের এই decision শুনে স্বামীজী লজ্জিতভাবে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

মায়ের Trouble shooting: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ঘোরতর সমস্যা সমাধানেও মা ছিলেন একজন সুদক্ষ ম্যানেজারের মতো সিদ্ধহস্ত। সেইসময়ে যাঁরা সঙ্ঘে যোগ দিতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অতীতে ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী। সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারী ও সদস্যদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখত। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এক সভায় মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের তথাকথিত যোগসাজশের ব্যাপারে তির্যক মন্তব্য করেন। ঐ যোগসাজশ যে রাষ্ট্রদ্রোহিতারই নামান্তর তা বলতেও তিনি ছাড়েন না। এই অবস্থায় মিশন কর্তৃপক্ষ খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন। কেউ কেউ রাজরোষ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঐসব যুবকদের বহিষ্কার করার পরামর্শ দিলেন। মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এক ঘোরতর সঙ্কটের সামনে এসে উপস্থিত হলো। মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন মাদ্রাজে। সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজী উপায়ান্তর না দেখে মাকে সব জানালেন। মা সব কথা ধীরভাবে শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: "ওমা! এসব কী কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।" মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেন। সুখের বিষয়, ঐ আলোচনার পর কারমাইকেল তাঁর পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং ঐ বক্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। সুপার ম্যানেজার মা এমনভাবে পরামর্শ দিয়ে সেই গভীর সঙ্কটের সমাধান করলেন, যা মিশনের অনেক শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত ব্যক্তি ধারণাতেও আনতে পারেননি।

মায়ের Time Management: আধুনিক ম্যানেজমেন্টের পাঠক্রমে সময় সদ্ব্যবহারের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মা বিশাল সংসারের মধ্যে থেকে, উদয়াস্ত সমস্ত কাজ সেরেও প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক জপ করতেন। ভাবলেও অবাক হতে হয়। মাঝে মাঝে ভক্তরা মাকে বলত: "মা, আমাদের কিছুই হচ্ছে না। ধ্যান-জপ করি, কিন্তু তাতেও কোন আনন্দ পাই না।" মা বলতেন: "একথা অনেকেই এসে বলে আমাকে, কিন্তু তারা রোজ দশ-পনেরো হাজার জপ করুক দেখি, তখন কেমন আনন্দ না পায় দেখব।" মায়ের কাছ থেকে মন্ত্রপ্রাপ্ত অনেক সন্তান সম্পর্কে তিনি আক্ষেপ করে বলতেন যে, তারা কিছুই (জপ-তপ) করে না। তাই শরীর অসুস্থ হলেও রাত জেগে তিনি জপ করতেন তাদের মঙ্গলের জন্য। আবার সারাদিন কত শত কাজের মধ্যেও তিনি জপ করতেন। কিন্তু কীভাবে তিনি এই অসাধ্যসাধন করতেন? প্রাক্তন সঙ্ঘাধ্যক্ষ মাধবানন্দজীকে মা বলেছিলেন: "বাবা, আমরা তো মেয়েমানুষ। সংসারের কাজ তো ছাড়া যাবে না। এই জল দিয়ে ভাতের হাঁড়িটা চাপালাম। চাল ফুটতে লাগল। সেই ফাঁকে একটু জপ করে নিলাম। আবার ডালের জল চাপালাম। গরম হতে লাগল। আবার একটু জপ করে নেওয়া গেল। একটু পরে ডাল ছেড়ে আবার জপ। এইরকম আর কী বাবা।" কী অসাধারণ time management-এর উদাহরণ!

এরকম আরো কত managerial quality যে মায়ের মধ্যে ছিল তা ভক্তরা বিচার-বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আজকের careerist ছেলেমেয়েরা যে Management পড়ে, তার practical application মায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। অথচ মায়ের পড়াশুনা ছিল 'ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য-কুবাক্য' পর্যন্ত। অবশ্য যিনি স্বয়ং সরস্বতী-স্বরূপা ছিলেন, তাঁর কাছে সব বিদ্যাই ছিল বশীভূত।

মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর জীবন ও বাণী অনুশীলন করে সংসার ও কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারি এবং তাঁর School of Management থেকে যেন তাঁর কৃপায় একটা Diploma অর্জন করি।

কল্যাণ গুহরায়
পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

প্রসঙ্গ ঃ জল ও সচেতনতা

আনন্দময় মান্না*

জল জীবজগতে অপরিহার্য বলে জলের অপর নাম 'জীবন'। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ কারোরই জল ছাড়া চলে না। আমাদের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে তৈরি, যাদের মধ্যে সঙ্ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আমরা জীবনধারণ করতে পারি। এই কোষগুলির প্রধান উপাদান জল। উদ্ভিদের এক আবশ্যকীয় কাজ সালোকসংশ্লেষ জল ব্যতীত সম্ভব নয়। পৃথিবীর জীবমণ্ডলে মোটামুটিভাবে কয়েক লক্ষ উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী আছে। এদের পুষ্টির জন্য সর্বপ্রধান উপাদানগুলি হলো মাটি, বাতাস, জল, আলো ও তাপ। উদ্ভিদের মধ্যে যেমন অ্যালজি, ফাংগাই থেকে শুরু করে বড় বড় গাছ বর্তমান, তেমনি প্রাণীদের মধ্যে আছে এককোষী প্রোটোজোয়া থেকে বহুকোষী মানুষ পর্যন্ত। এরা সব পরস্পর এক অলক্ষ্য সূত্রে আবদ্ধ। এসবের সংমিশ্রণই আমাদের 'ইকোসিস্টেম'।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোজনের ফলে জলের উৎপত্তি। জলের বহুবিধ গুণ আছে, যার অনেকগুলি সম্ভবপর হয়েছে জলে হাইড্রোজেন আবদ্ধ থাকার কারণে। জল একটি অনবদ্য দ্রাবক পদার্থ, তার জন্য জীবদেহের পরিপাকজাত দ্রব্য ও পরিত্যক্ত পদার্থের পরিবহনে এটি এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। অন্যান্য তরলের তুলনায় জলের ডাই ইলেকট্রিক স্থিরাঙ্ক বেশি হওয়ার ফলে আয়ন আকারে বর্তমান অনেক দ্রব্য জলে সহজেই বিযুক্ত হয়। তাই এর কার্যকারিতা অনেক। জলের তাপধারণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় ভৌগোলিক অঞ্চলের তাপমাত্রার ভারসাম্য সুস্থিত করার প্রভাব জলের অনেক বেশি, সেই কারণে জলজ জীবরা অপ্রত্যাশিত তাপ পরিবর্তনের সঙ্ঘাত থেকে রক্ষা পায়। জলের বাষ্পীকরণের তাপও অনেক, সেটাও ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর প্রভাববিস্তার করে। তাপমাত্রার সঙ্গে জলের ঘনত্বের পরিবর্তন জলজ প্রাণীদের রক্ষা করে। জলের উল্লম্ব সঞ্চলন এর রাসায়নিক ও জৈব বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

এইসব নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য জলের গুরুত্ব অসীম। বাতাস ছাড়া মানুষ পাঁচ মিনিট এবং জল ছাড়া মানুষ পাঁচদিন বাঁচতে পারে না। বাতাস যেমন আমরা প্রকৃতিতে অনায়াসে পাই বলে তার জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হই না, তেমনি সাধারণ ধারণায় জলকেও প্রকৃতির দান হিসাবে পাই বলে এর গুরুত্ব অনেকেই দেন না। কিন্তু যদি আমরা একটু গভীরে তলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রায় ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ স্থল এবং ৭১ ভাগ জল। মোট জলের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার কিউবিক কিলোমিটার, তার মধ্যে মহাসাগরের অপেয় জল ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার কিউবিক কিলোমিটার। দেখা যাচ্ছে, ১৫ হাজার কিউবিক কিলোমিটার জল আমাদের দৈনন্দিন কাজে লাগে। লক্ষণীয়, পৃথিবীতে প্রায় ৬২৫ কোটি লোকের বাস।

গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, চাষবাস, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল, বিমানবন্দর, স্টেশন প্রভৃতি নানা জায়গায় ও কাজে জল লাগে। এর অনেকটাই দূষিত জল হিসাবে নির্গত হয়। পুকুর, নদনদী, খালবিল, হ্রদ ইত্যাদি ছাড়াও আমরা ভূগর্ভস্থ জলই বেশি ব্যবহার করছি। ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ জল টেনে তোলায় এবং ভূগর্ভে ততটা পরিমাণ জল পরিপূরণ না হওয়ায় ক্রমশ জলস্তর নেমে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, ভারত সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রক এবিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল সংস্থা দিল্লিতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে নতুন টিউবওয়েল বসানো বন্ধ করে দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে জলসঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় মানুষ এখন ব্যবহৃত দূষিত জলকে পরিশোধন করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। প্রকৃতির আদি ও অকৃত্রিম চক্রবৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে কৃত্রিম উপায়ে ব্যবহৃত দূষিত জলকে শোধন করার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে।

আমাদের চারপাশের পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানগুলির মধ্যে চক্রের মাধ্যমে পারস্পরিক বিনিময় অবিরাম ঘটে চলেছে। এই চক্রাকার আবর্তনই জীবজগতের ধারক ও বাহক। নিচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটি বোঝা যাবে।

পৃথিবীতে জীব ও জীবনের বিকাশের উপাদানগুলির মধ্যে অবিরাম চক্রাকার পরিবর্তন চলছে, একে 'জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র' বলে। জীবনের বিকাশসাধনে অত্যাবশ্যক মৌলবস্তুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জীব এই মৌলগুলি মাটি, জল ও বায়ু থেকে সংগ্রহ করে। মৃত্যুর পর এবং মলমূত্রের মাধ্যমে ঐ মৌলগুলি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। জীবজগৎ ও তাদের পরিবেশের মধ্যের সামগ্রিক সম্পর্কজালে ঐসমস্ত মৌল পদার্থগুলির চক্রাকার পরিবর্তন নিত্য ঘটে চলেছে।

পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জলের আবর্তন হচ্ছে 'জলচক্র'। জলচক্র আছে বলেই জীবজগতের নানা প্রয়োজনে জলের খরচ হওয়া সত্ত্বেও জলের ভাণ্ডার নিঃশেষ হচ্ছে না। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের এবং অভ্যন্তরের জল নিয়ত খরচ হওয়ার ফলে একসময় ভাণ্ডার নিঃশেষ হতো, যদি না জল বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরে আসত। সূর্যকিরণের ফলে

** অধুনা সোনারপুর-নিবাসী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্যার গবেষক-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক।*

মহাসাগর থেকে শুরু করে ছোট জলাশয়ের জল, উদ্ভিদ— এসবের বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত জলকণাগুলি মেঘের আকারে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় এবং তারাই আবার যথাযথ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এইভাবে চক্রের আবর্তন ঘটে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে তা খাদ্যশৃঙ্খলার মাধ্যমে জীবদেহের মধ্যে আসছে এবং তা আবার নিষ্প্রাণ জীবজগতের বিয়োজনে আবহমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। প্রাণিজগৎ শ্বাসপ্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। সবরকম জ্বালানির দহনেও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। একে 'কার্বন চক্র' বলে।

আবহমণ্ডলের শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন। এছাড়া পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এবং উপরিভাগের শিলাতে অক্সাইড এবং কার্বনেট-রূপেও বদ্ধ অবস্থায় অক্সিজেন বর্তমান। জীবজগৎ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ দ্বারা অক্সিজেন তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলের ওজোনও নানাবিধ বিক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে, এটাই 'অক্সিজেন চক্র' নামে পরিচিত।

সবরকম জীবের নাইট্রোজেন আবশ্যক। বায়ুমণ্ডলে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন। যদিও বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গৃহীত হয় না, উদ্ভিদ মাটি ও সারের নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে তাদের বিকাশ ঘটায়। প্রাণিজগৎ উদ্ভিজ্জগৎ থেকে নাইট্রোজেন পায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবননাশে ঐ নাইট্রোজেন ফাঙ্গাস, জীবাণু দ্বারা মৌলিক বা যৌগিক অবস্থায় আবহমণ্ডলে ফিরে আসে। একে 'নাইট্রোজেন চক্র' বলে।

জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উপাদান হলো ফসফরাস। শিলা ও পলিজ অবক্ষেপই এর সঞ্চিত ভাণ্ডার। উদ্ভিদের বিকাশে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ থেকে জীবজগতে এর অনুপ্রবেশ ঘটে খাদ্যের মধ্য দিয়ে। নশ্বর জীবজগতের বিয়োজন থেকে এবং নদীবাহিত পলিমাটি থেকে ফসফরাস আবার পৃথিবীতে সঞ্চিত হয়। সমুদ্রের উপকূলে বিচরণকারী পাখিরাও ফসফরাস চক্রের ধারক ও বাহক। এরা সমুদ্র থেকে স্থলভাগে ফসফরাস প্রতিস্থাপন করে।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এদের মধ্যেই চক্রাকারে পরিবর্তিত হচ্ছে জীবজগতের বিকাশের কারণগুলি। সালফার তার ব্যতিক্রম নয়। মাটি সালফারের সঞ্চিত ভাণ্ডার। এথেকেই উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ ব্যাকটিরিয়া মারফত সালফার গ্রহণ করে। কয়লা ইত্যাদি অশ্মীভূত জ্বালানির দহন থেকে আবহমণ্ডলে ফসফরাস আসে এবং তা আবার বৃষ্টিতে সালফেট বা সালফিউরিক অ্যাসিড হিসাবে ভূপতিত হয়ে এর ভাণ্ডারকে সম্পূরণ করে।

ওপরের তথ্যগুলি থেকে দেখতে পাওয়া যায়, প্রকৃতিতে নিয়ত চক্রাকারে খেলা চলছে এবং তারই ফলশ্রুতি আমাদের ও পৃথিবীর অস্তিত্ব। আবার আমরা এও দেখছি, জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন বাতাস ও জল—যা আমরা প্রকৃতির দান হিসাবে পাই। চাইলেই পাই বলে আমরা জলকে গুরুত্ব দিই না; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জলের ভাণ্ডারও ক্ষীয়মাণ। লোকসংখ্যা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে—একসময় জলের হাহাকারও দেখা দিতে পারে।

ব্যবহার করার পর জল দূষিত হয়। কি কাজে জল ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর দূষণের প্রকারভেদ নির্ভর করে। গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত জলে মানবদেহ-বর্জিত পদার্থ ছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ ও থালাবাসন পরিষ্কার করার সাবান বা অন্যান্য পরিমার্জক, শহরের রাস্তার নিকাশি জলে নানা ধরনের জৈব ও অজৈব দূষক, কলকারখানার নিকাশি জলে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, চাষের জমি থেকে নির্গত অতিরিক্ত জলে নানা রাসায়নিক সার, কীট ও আগাছানাশক রাসায়নিক দ্রব্য, পশুপালন এলাকা-নিঃসৃত জলে নানারকম রোগজীবাণু-সহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে। ময়লা দূষিত জল নির্গত হওয়ার সময় তাতে নানা আকারের বর্জ্যপদার্থ মিশে থাকে। এই ময়লা জল যদি কোন কাজে না লাগানো হয়, তাহলে জল খরচের সঙ্গে সঙ্গে জলের ভাণ্ডার কমে যাবে। তাই এই ব্যবহৃত দূষিত জলকে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবজগতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপারে আজকাল আমাদের দেশেও নজর দেওয়া হচ্ছে। বিদেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে এই কর্মসূচি অনেক বছর আগে থেকেই চলছে।

এই কর্মসূচির প্রধান কাজ হলো ব্যবহৃত দূষিত জলকে দূষণমুক্ত করা। তিনটি পর্যায়ে এই কাজ হয়। প্রথমটিকে বলে প্রাথমিক স্তরের পরিচর্যা। এতে জলের বড় বড় আবর্জনাগুলি ছেঁকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দূষিত জল বড় আবর্জনা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে গ্রিট চেম্বার বা পাথরকুচি, কাঁকর ও বালির স্তরের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে জল থেকে সমস্ত কঠিন পদার্থ বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তী অবস্থায় জলকে অভিকর্ষীয় অবক্ষেপণ আধারে রেখে থিতিয়ে নেওয়া হয়। এই থিতানোর কাজে সাহায্যের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়, যা তাড়াতাড়ি জলে প্রলম্বিত দ্রব্যকে থিতিয়ে দিয়ে দলা পাকিয়ে পিণ্ডে পরিণত করে। দূষিত জলে প্রলম্বিত বস্তু পিণ্ডে পরিণত হওয়ার পর সহজেই আলাদা করে নেওয়া হয়।

ওপরের আপাত পরিষ্কার জলকে দ্বিতীয় স্তরে পরিচর্যা করার যন্ত্রে ফেলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নুড়ি এবং চূর্ণ করা শিলার ওপর ঐ জলকে স্প্রে করা হয়, যাতে ঐ জল নুড়ি ও চূর্ণ করা শিলার ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ার সময় অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি জৈবিক জারণ করে চড়চড় করে বেড়ে ওঠে। ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি ঐ জলের মধ্যকার ঘোলা ও দ্রবীভূত দ্রব্যের জৈবিক জারণ ঘটিয়ে কার্বন ডাই

অক্সাইড ও জলে রূপান্তরিত করে। ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি থিতিয়ে যাওয়ার পর ওপরের পরিষ্কার জলকে তৃতীয় পর্যায়ের পরিচর্যা করার যন্ত্রে ফেলা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে জলকে জীবাণু ও রোগজীবাণু-মুক্ত করা হয়। সাধারণত ক্লোরিন সহযোগে বা আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি পাঠিয়ে এটি করা হয়। ক্লোরিন যে জলকে শুধু রোগজীবাণুমুক্ত করে তাই নয়; তার স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ দূর করে, অ্যালজি, প্রোটোজোয়া, ফাঙ্গাস নিয়ন্ত্রণ করে। তারপর এই শোধিত জল আবার জীবজগতের কাজে লাগানো হয়।

যত দিন যাচ্ছে তত উন্নততর শোধনপ্রণালীর উদ্ভব হচ্ছে, তবে কার্যপ্রণালী মোটামুটি একই। যন্ত্রপাতির উন্নতি করে কম সময়ে বেশি পরিমাণ দূষিত জলের শোধন করা হচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং উন্নততম জলশোধন যন্ত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে তাহে লেক-এ ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর শোধিত জল আমেরিকা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পানীয় জলের মানের সমতুল। এছাড়া লস এঞ্জেলসের কাউন্টি স্যানিটেশন ডিস্ট্রিক্টস রিক্লেমেশন প্ল্যান্ট, ক্যালিফোর্নিয়ার ইরভিন র‍্যাঞ্চ ওয়াটার, ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গে দূষিত জলশোধন যন্ত্র ছাড়াও বহু জায়গায় দূষিত জলশোধনের ব্যবস্থা আছে।

ইংল্যাণ্ডের মোট জল সরবরাহের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নদী থেকে নেওয়া হয়—যেখানে দূষিত জল মিশছে। এজন্য সেইসব জল সরবরাহ করার আগে শোধন করে নেওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশে জল শোধন করে ব্যবহার করার প্রচলন বেশি। শোধিত জল শোধন করার মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন চাষ, পশুচারণ ক্ষেত্র তৈরি, আঙুরের খেত, বনসৃজন, ল্যাণ্ডস্কেপ সিঞ্চন, গল্ফ খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, পার্ক, বাগান, খনি থেকে তোলা আকর ধোওয়া, রাস্তা তৈরি, আগুন নেভানো ইত্যাদি। মেলবোর্নের ওয়েরিবি সুয়েজ ফার্ম, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কোপ্রানাপ্রা পাস্টোরেল কোম্পানি, এডিলেডের বলিভার সুয়েজ ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট, ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আরারাত, ডারউইন ও ওয়াঙ্গারাট্টা, নিউ সাউথ ওয়েলসের ডুঙ্গগ, ব্রোকেন হিলের জলশোধন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুরের জুরং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের দূষিত জলশোধন বহুদিন আগে থেকেই চলে আসছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দূষিত জল শোধন করে পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে। কুয়েতে চাষের কাজে, কাতার ও আবুধাবিতে বনসৃজন, মরুভূমির সঙ্কোচন প্রভৃতি কাজে দূষিত জল শোধন করে পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌদি আরবের মক্কাতে, জেড্ডায় বুরাইদা, রিয়াধ, আলরস ইত্যাদি স্থানে; ইরাকের বাগদাদে; মিশরের কায়রোতে দূষিত জল শোধন করে পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্থানে জলশোধন যন্ত্র বসেছে। কলকাতার ধাপার দূষিত জলশোধন যন্ত্র-সহ বিভিন্ন শহরে এর সম্প্রসারণ হচ্ছে।

এই দূষিত জলশোধন করে পুনর্ব্যবহার যত বাড়বে তত জলের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেটাই এখন আশু প্রয়োজন। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদের বিষয় ঃ স্বামী প্রেমানন্দ (১৮৬১-১৯১৮)। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছয়জনকে 'ঈশ্বরকোটি' বলে নির্দেশ করেছিলেন। বাবুরাম ঘোষ ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁদের অন্যতম। বাকিরা হলেন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ,

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ। হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম মহারাজের জন্ম। ঠাকুর বলতেন ঃ কিন্তু "বাবুরাম আমার দরদি।" কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্ব ভাগবতী তনু যার-তার স্পর্শ সহ্য করতে পারত না। কিন্তু বাবুরামের "হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ"। তাই ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় বাবুরামের সেবাই একমাত্র ঠাকুরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। বাবুরামের অন্তরে ঠাকুর যে নিত্য প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, সেই ধারায় বহু যুবক ভেসে গিয়েছিল। অর্থাৎ তাদের অন্তরে বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তির উদয় হয়ে ত্যাগব্রত অবলম্বনে সাহায্য করেছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন, পুরুষোচিত দেহগঠন, অক্লান্ত পরিশ্রম, সর্বোপরি ভক্তের সেবার জন্য অনন্যসাধারণ আকুতি—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত। বেলুড় মঠের সহাধ্যক্ষ ছিলেন বাবুরাম মহারাজ। সঙ্গীত, সাধন, কর্ম, শাস্ত্রপাঠ, পূজার্চনা, বাগান ও পশুপালন, বাস্তু সংরক্ষণ—কী ছিল না তাঁর নজরে। আদিকালে যখন আর্থিক কিংবা সাংগঠনিক দিক দিয়ে সঙ্ঘ দুর্বল অবস্থায় ছিল, তখন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজই হাল ধরেছিলেন। বস্তুত, শ্রীশ্রীঠাকুরের 'হ্লাদিনী শক্তি'র ক্রিয়াত্মক রূপটি কেমন হতে পারে, বাবুরাম মহারাজকে দেখলে কিছুটা বোঝা যেত। শ্রীশ্রীমা স্বামী প্রেমানন্দকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। আর মায়ের সম্পর্কে বাবুরাম মহারাজের সেই অসামান্য উক্তি শিহরণ জাগায় ঃ "যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।—অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা।—আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন।... আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে!—মা! মা! জয় মা!" মা জীবিত থাকতেই বাবুরাম মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেছিলেন। মা খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন ঃ "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন।"—সম্পাদক

রস-মানস-অভিভূতি ঃ বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোকে

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়*

কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে অনুভূতি বা বোধ বা উপলব্ধি কি করে হয়? হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে; বাস্তব-স্পর্শে, শ্রুতি-মাধ্যমে বা দৃষ্টিলাভে শরীরে যে-তরঙ্গ সৃষ্ট হয় তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এসে কম্পন জাগায়। মস্তিষ্ক তা বিবেচনা করে জ্ঞান এনে দেয়। এই হলো আধুনিক 'সাইকোলজি' বা মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের অভিমত। এই মতে, মস্তিষ্কেরই বিভিন্ন অংশে শোনার, দেখার বা স্পর্শের ইন্দ্রিয়প্রেরিত কম্পন বিচার করার পৃথক পৃথক স্থান আছে। মস্তিষ্কই ব্যক্তির মনের কাজ করে, মন বলে মস্তিষ্ক-ভিন্ন পৃথক কোন বস্তু নেই।

অধ্যাত্মতাত্ত্বিক দার্শনিকেরা কিন্তু বলেন—না, বিচার করে মন; সেও দেহেরই অঙ্গ, তবে তা স্থূলদেহ নয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আপাতদৃষ্টিতে নিরবয়ব। সাইকোলজি হলো শারীরবিজ্ঞান-আশ্রয়ী বাস্তব প্রমাণনির্ভর; তাই তারা মনকে খুঁজে পায় না। ইয়েল সাইকোলজিক্যাল ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর স্ক্রিপচার[১], স্বামী অভেদানন্দ[২], ডঃ রাধাকৃষ্ণণ[৩], ডঃ থমসন[৪] বলেছেন—না, মন দেহেই আছে; আত্মার বা ত্রিগুণাশ্রিত জীবাত্মার বা soul-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইন্দ্রিয়প্রেরিত ঐ তরঙ্গকে, মস্তিষ্কে আগত কম্পনকে বিচার করে মনই জ্ঞান জাগায়।

প্রশ্ন করি বিজ্ঞানীকে, তুমি তো মানুষের অনুরূপ 'রোবো' (Robot) তৈরি করেছ। সেই রোবো বা যন্ত্র-মানব অঙ্ক কষতে পারে, যুদ্ধ করতে পারে, পাত্র-পাত্রীর যৌটক বিচার করতে পারে—এমন কত কী। রোবোর যন্ত্র-দেহে নার্ভ বা স্নায়ুর মতো সংবেদনবাহী বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রেখেছ, মস্তিষ্কের জায়গায় কম্পিউটার রেখেছ—মনের কাজ করার জন্য। তাই তোমার দৃষ্টিতে মন হলো প্রকৃতি-সৃষ্ট অপূর্ব মননক্ষম ও কর্ম-নির্দেশক্ষম যন্ত্র, সেটা মানবদেহের মস্তিষ্কই। আলাদা কোন দেহের প্রত্যঙ্গ নয়। দার্শনিক মনস্তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকদের আপত্তির সূত্র এখানে। রোবোর কম্পিউটারকে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কি করে করতে হবে, তা আগে থেকেই শিখিয়ে রাখতে হয় নাকি? ঠিক তাই। কেন? কারণ, কম্পিউটার নিজে পূর্বজ্ঞাত ক্ষেত্রে বা প্রশ্নে কি করণীয় বা কিভাবে করণীয় তা জানে এবং করে। নতুন, অজানিত ক্ষেত্রে বা প্রশ্নে কি করণীয়, তা স্থির করতে পারে কি? মানুষ পারে; তার কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্কের ওপরে আছে মন, বুদ্ধি, আত্মার সমবায়। একেই এককথায় বলা হয় মন। এ-ও জড়দেহেরই অঙ্গ বটে, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম, নিরবয়ব।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক (Psychologist) তর্ক তোলেন, যাকে পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর-রূপে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে দেহের অঙ্গ বলি কি করে? তাঁরা ভুলে যান চুম্বকেরই অঙ্গ চৌম্বক শক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি, আলোকতরঙ্গমালার অনুষঙ্গী অতি-বেগুনি (Ultra violet) রশ্মি, লাল উজালা (Infra red) রশ্মি, শ্রবণপারের (Ultrasonic) শব্দ—এদেরও তো দেখা বা শোনা যায় না! এরাও একই অঙ্গীভূত।

তাহলে আমি যা দেখি, যা শুনি তা দৃশ্য বস্তুর বা শ্রুত বস্তুর আলোকতরঙ্গ বা শব্দতরঙ্গ যখন মস্তিষ্কে এসে কম্পন জাগায়, তাকে বিশ্লেষণ করে মন; বলে দেয় কি দেখলে বা কি শুনলে। মনের অনুষঙ্গী আত্মা, বুদ্ধি, চিত্ত—এরাও সর্বদেহে আছে; বলে দেয়, কৃত্য নির্দেশ দেয়। মনে আনন্দ, নিরানন্দ, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভ (emotion) সৃষ্টি করে। এগুলি মানস অভিভূতি অর্থাৎ মানসিক অবস্থা। আরেক প্রকার মানস অভিভূতিও আছে, যা মনকে প্রভাবিতই শুধু করে না, যেন বেঁধে ফেলে, আকৃষ্ট করে, আপ্লুত করে। তখন প্রেম জাগে। তখন সেই মানস অবস্থাতে অনুভূত হয় 'রস'। রস একপ্রকার নিশ্চিন্ত ভাবসমাধি, আনন্দপ্লবতা। এই রস হলো অনুভূতির গভীরতম পরিণত স্থায়ী বিকাশ। রস রসিককে বিবর্তিত করে এনে দেয় গভীর বিশ্বাস।

রসের বিভিন্ন প্রকার পর্যায় আছে। এইসব রসের উৎপত্তির পশ্চাতে ঐ অভিভূতি, ইচ্ছা ও অনুভূতিরই সংগঠনী অংশ অবশ্য আছে। (১) বুদ্ধিমূলক বা যুক্তিমূলক (Intellectual sentiments) রস, যার আদর্শ যুক্তিনির্ধারিত সত্য; সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ এবং তার প্রাপ্তিতে প্রেমানুভূতি। এই সত্য প্রেমের রসিকরা তো সর্বজনবিদিত, যেমন—প্লেটো, সক্রেটিস, শঙ্করাচার্য, আধুনিক দার্শনিক কবি ও বৈজ্ঞানিক। এঁরাও সত্যসন্ধানী; সত্যজ্ঞান প্রার্থনা দ্বারা প্রাপ্তির রস-মুগ্ধ। (২) কান্তরস বা সৌন্দর্যরস (Aesthetic sentiment), যার মূলে প্রধানত ইন্দ্রিয় মাধ্যমে অবগতি থাকলেও সে-অনুভূতিতে স্বার্থসম্পর্ক নেই, আছে বিস্মিত শ্রদ্ধা। বিরাটকে দেখে, সুন্দরকে দেখে যে-আনন্দ অনুভূতি,

---

** মূলত ফলিত রসায়নবিদ্, বর্তমানে নবতিপর অধ্যাপক কানাইলাল মুখোপাধ্যায় দুটি মহাবিদ্যালয় (হুগলির রাধানগরে রাজা রামমোহন রায় কলেজ ও বাঁকুড়ার শালডিহা কলেজ)-এর প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।*

তা হলো কান্তরসের নিদর্শন। (৩) ইচ্ছামূলক বা নৈতিক আদর্শমূলক বলা যেতে পারে শীলরসকে (Moral sentiment)। এই রসের অবলম্বন চরিত্রদাঢ্য, সততা, নির্ভীকতা, বীরত্ব, পবিত্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা। এইসব গুণের প্রতি শ্রদ্ধা সাংসারিক পাটোয়ারি বুদ্ধিকে ভুলিয়ে দেয় এবং এই রসের রসিককে আদর্শ পথে চালিত করে।

সাহিত্য বিচারে রসকে আরো বিভক্ত করে দেখা হয়েছে। সেখানে রয়েছে নবরস: আদি, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। এরা অধিকাংশই তাৎক্ষণিক, সাময়িক, অস্থায়ী মানস-প্রতিক্রিয়া, যেন একটি আবির্ভাব।

এইসব রকমের রস বা মানসমুগ্ধতা ছাড়াও এমন একটি রস আছে, যার নাম 'অধ্যাত্মরস' (Spiritual sentiment)। এই রস সাধারণত ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোন এক অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত শক্তির বা সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে গঠিত। এই বৃত্তি মানুষের মনেই সম্ভব। অপ্রাকৃত বা অবাস্তব তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তত্ত্বানুভূতি-প্রচেষ্টা সকল জীবের মধ্যে শুধু মানুষের মধ্যেই কিছু কিছু আসে। তাঁরা এই রসে বিভোর হয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন: "Man is more than a physical being. Psychology is not a mere extension of physiology. There is a part in man's nature which is not merely objective; it is this non-objective aspect which gives man his uniqueness in the world of nature. Man is not merely a creature of instinct, not merely a creature of mind." [মানুষ শুধু জড়বস্তুর সমাবেশে গঠিত একটি জীব নয়, তার মন আছে। এই মনকে শারীরবিজ্ঞান দিয়ে পুরো বোঝা যাবে না। মানবপ্রকৃতি গঠনে শুধুই বাস্তব প্রণিধেয় অংশ নেই, আছে অপ্রত্যক্ষ মনশ্চৈতন্য অংশও এবং এখানেই জীবজগতের মধ্যে মানুষের পৃথক বিশেষত্ব।] অন্য জীবের মতো মানবপ্রকৃতি শুধু জন্মগত সংস্কার-বশংবদ নয়, সে তার সংস্কারাবদ্ধ মনকেও অতিক্রম করতে পারে এবং করে; প্রজ্ঞান স্তরে তার সমুচিত জীবনকর্মধারার ও উদ্দেশ্যের মীমাংসারও সন্ধান করতে পারে। তাই আজ থেকে পাঁচহাজার বছরেরও আগের জিজ্ঞাসা, যা আজও চিরন্তন: "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।/ অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্?" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ১।১)—ব্রহ্মই কি জগৎকারণ, ব্রহ্মবাদিগণ বলুন। আমরা কোথা থেকে জন্ম নিলাম, জীবন পেলাম, কোথায় থাকি, কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করি? এইরকম চিন্তাধারা কিছু মানুষের আসেই—তার জীবনের কারণ কি, উদ্দেশ্য কি, কেউ নিয়ন্ত্রক আছে কিনা।

এই অধ্যাত্মরসও চিন্তাশীল জন্তু মানবের মানসপ্রক্ষোভ থেকে উদ্ভূত এক অনুভূতি। কেননা এর কারণ বা উৎস ঔৎসুক্য বা ভয় বা বিস্ময় বা ভালবাসা; এবং তাদেরই বিবর্তনে পাওয়া প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক রসে তাই দেখা যায় বুদ্ধিমূলক বিস্ময়, কৌতূহল, শীলরসের শ্রদ্ধা, ভক্তি, কান্তরসের সৌন্দর্য, আকর্ষণ ইত্যাদির এক সম্মিলিত প্রকাশ। আধ্যাত্মিক রস তাই সর্বান্তর্ভাবী এবং অনুভূতি-সাপেক্ষ।

এই রসের রসিকেরা অধিকাংশই ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাঁদের বলা হয় 'আস্তিক'। বাকিরা যাঁরা অবশ্য সংখ্যালঘু, 'নাস্তিক'। এঁদের মধ্যে অধ্যাত্মগবেষকও আছেন। তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার যুক্তি খুঁজে পান না, এটাই তাঁদের বিশ্বাস। এঁদেরও বিশ্বাসীই বলতে হবে, তবে তা ঈশ্বরের অনস্তিত্বে।

এই দুই শ্রেণিরই বাইরে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বলে বটে যে তারা আস্তিক, অর্থাৎ একজন বিশ্ববিধাতা ও তাঁর জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাদের আচার-আচরণ তা অপ্রমাণ করে। তারা প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদী। তারা পদে পদে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে; শুধু সকলের সঙ্গে মত মিলিয়ে নিজেদের আস্তিক বলে প্রচার করে থাকে। তারা কখনো রস-সমুদ্রে অবগাহন করেনি। তাদের স্থান 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। তারা অরসিক; তাদের কোন জীবনাদর্শে আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই; তারা সংশয়াকুল।

সাধারণ কর্মজীবনে যেমন, অধ্যাত্ম-রসিক ব্যক্তির জীবনেও তেমন জীবনপথবর্তিকা হয়ে আসে বিশ্বাস, অনুভূতির নিশ্চয়তা ও সত্যতাবোধের অপূর্ব পরিণতি। এই পরিণতির কারণ সেই অবগতি; জেনেছি, বুঝেছি বা পূর্ব প্রত্যয়ের স্মৃতি থেকে বা শাস্ত্র ও বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির অভিজ্ঞতার, অভিভাবন (suggestion) বা শিক্ষা থেকে। এই অবগতিই পরে পর্যবসিত হয় একটি দৃঢ় প্রত্যয়ে, বিশ্বাসে। এই যে বিশ্বাস, এটি একটি মানসপ্রতিক্রিয়াই তো। এই বিশ্বাসই একটা কঠিন দৃঢ় আশ্রয় হয়, একটি শক্তির উৎস হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কর্ম করতে গেলে আগে একটা বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে-ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে একঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথম চাই। ঘড়া মনে করে সেইসঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার

কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরো বাড়ে। এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি,—সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৯৯৬, পৃঃ ১০৭২) এই হলো পরমহংসদেবের অনবদ্য গল্পচ্ছলে সাধনার ক্রমপর্যায়ের সহজ বর্ণনা। প্রথমে বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, তারপর আনন্দ, প্রত্যাশার বৃদ্ধি এবং খুঁজে পেয়ে মিলন-আনন্দের সামিল হয়ে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত'-এর আরেক জায়গায় বলেছেন ঃ যখন পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়? মহাদেব বললেন, বিশ্বাসই এর খেই। খেই গুরুর বাক্যে অচল ও অটল বিশ্বাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না।

আজকের যুগে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসার বড় প্রতিবন্ধক বস্তু-বিজ্ঞান প্রীতি। বিজ্ঞানেও সত্যানুসন্ধান চলছে ঠিকই, জ্ঞানের পরিধিও বেড়েই চলেছে। কিন্তু আজকের লব্ধ জ্ঞানের ভুল পরের দিন সংশোধিত হয়ে আরো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ও হবে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তথ্য অনবরত পরিবর্তনশীল। এই হলো ইতিহাসের শিক্ষা। ওদের জ্ঞান অভিযানের তাই শেষ নেই। কিন্তু ধর্মে যেন শেষকথা বলা হয়ে গেছে। এখানেই বিজ্ঞানীদের আপত্তি। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞানের মত-সমর্থনকারী কোন বাস্তব নিদর্শনও ধর্মসিদ্ধান্তে নেই। ধর্মের 'বিশ্বাস' তো জ্ঞান-অভিযানের গবেষণার ফল। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কদের মতে, অপ্রাকৃত, অবাস্তব ক্ষেত্রে ঐ জ্ঞান অভিযান, ওটা ভুল নয় কি? তবে এই প্রসঙ্গে কাণ্ট বলেছেন ঃ "That the human mind will ever give up metaphysical researches entirely is as little to be expected as that we should prefer to give up breathing to avoid inhaling impure air. Man must have and will have some religion." [মানুষের মন কোন একদিন অতিপ্রাকৃত তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন ও গবেষণা ছেড়ে দেবে—এ ভাবাই যায় না। যেমন ভাবা যায় না যে, পাছে দূষিত বায়ু ঢুকে পড়ে, তাই মানুষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ছেড়ে দেবে।] ব্লেক বললেন ঃ "If he has not the religion of Jesus, he will have the religion of Satan." [যদি মানুষ যিশু-কথিত ধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে শয়তানের ধর্ম গ্রহণ করতেই হবে।] তাই কোন না কোন ধর্ম নিয়ে, একটি বিশ্বাস নিয়ে জীবনের সকল কর্ম করতেই হয়। এইভাবে অধ্যাত্ম ধর্মজিজ্ঞাসাও একদিন না একদিন জীবনে আসবেই। তাকে তখন একটা বিশ্বাস নিয়ে শক্তির আধাররূপে গ্রহণ করে একটা পথ ধরে চলতেই হবে। সব ধর্ম যদিও বহিরঙ্গে এক নয়, কিন্তু সব পথই একদিকে নিয়ে যায়। সব পথেই ঠিক ঠিক ভাবে চললে পরম সত্য আপনিই একদিন ধরা দেয়। ধর্মীয় রসে সঞ্জীবিত থেকে, বিশ্বাসকে খুঁটি করে ধরে চললে জীব জীবনরহস্যের যে সত্য "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ... অপিহিতং মুখম্"—হিরণ্ময় পাত্র, অর্থাৎ মন-ভোলানো, চোখ-ঝলসানো জ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত, তা অপাবৃত, অপনীত হয়; অর্থাৎ সমাধান আপনি উদ্ভাসিত হয়; জিজ্ঞাসু জ্ঞানলাভ করেন। (ঈশ উপনিষদ্, ১৫) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।৬)—ব্রহ্মরূপ পরমানন্দকে জানতে পারেন। তখনি হয় মানুষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি, পরমানন্দ। তখনি তাঁর অনুভব হয় "যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ" (ঐ, ২।৭)—জগতের স্বয়ং কর্তা তিনিই পরমানন্দ, কারণ, তিনিই রসাধারের মতো আকর্ষণ করেন। "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (ঐ, ৩।৬)—এই আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্গ-অধ্যুষিত জগৎ হয়েছে। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি।" (ঐ)—এরা আনন্দে সঠিক জীবনযাপন করে এবং শেষজীবনে পরম আনন্দেই সমাধি হয়। এটাই জগদীশ্বরের বিধান। আজ থেকে বোধহয় ৫,০০০ বছর আগে উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা সমাধানে যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু তা হলো এই অনুভূতি। এই অনুভূতিই সর্বশ্রেষ্ঠ রস। "রসো বৈ সঃ যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্।"—তিনি স্বয়ং কর্তা, তিনিই রসস্বরূপ। এই মানস অভিভূতিই পরম আনন্দ, কারণ, তিনি সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। ❑

তথ্যসূত্র

১ New Psychology by E. W. Scripture of Yale University:
"Motion produces nothing but motion. How is it for mechanical activities of the brain cells to produce consciousness?... It is not metaphysics,... it is the science of the psyche or the soul and its foundation is truth. True psychology tells us that what we call the physical body is the dwelling house of the soul."

২ Our relation to the absolute—Swami Abhedananda, 1st Edn., p. 81

৩ S. Radhakrishnan's Recovery of Faith, paperback edn. 1955, p. 156

৪ Dr. Thomson of Roosevelt Hospital, New York: "Does the brain feel? No, the brain does not feel. We feel, the individual, the personality feels, feels certain conditions such as joy, grief, love, hatred, anger, fear, pride." (Our soul that is bound by desire. ...)

অনবদ্য অনুবাদে আচার্য শঙ্করের স্তোত্রাবলী

দেবপ্রসাদ পতি

সমন্বয়ের প্রতীক আচার্য শঙ্কর এবং মণিরত্নমালা ও স্তোত্রাবলী • লেখক : ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী • প্রকাশিকা : উষাদেবী চক্রবর্তী, ঋষিধাম, পোঃ দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৪৮ • মূল্য : ১০০ টাকা • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৪+১৮৮ • প্রকাশকাল : ২০০২

জগতের ধর্মগুরু আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর **'সমন্বয়ের প্রতীক আচার্য শঙ্কর এবং মণিরত্নমালা ও স্তোত্রাবলী'** মূল্যবান গ্রন্থটি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ আকর।

ভগবান শঙ্করের জীবনী, শিষ্য-চতুষ্টয়, দার্শনিক প্রজ্ঞা, অধ্যাত্মসাধনা ও সাহিত্যিক ঐশ্বর্য লেখক সুষ্ঠুভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। শঙ্করাচার্যের সুখশ্রাব্য ও হৃদয়গ্রাহী 'গঙ্গাস্তব', 'নির্বাণষ্টকম্', 'ভবানীস্তোত্রম্', 'মণিরত্নমালা'র সুললিত বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

অধ্যাপক ডঃ চক্রবর্তী ধর্মসাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ধর্মগুরুর সুনির্দিষ্ট সংবিধান রচনার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শঙ্কর-প্রবর্তিত বেদান্ত-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ব্রহ্মচেতনা ও কর্মসাধনার প্রকাশ তা লেখক যথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন।

শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় শক্তিই ভারতকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরবশ্যতা থেকে যে আত্মরক্ষার সামর্থ্য দিয়েছিল তা সংস্কৃত সাহিত্যে নিষ্ণাত সুলেখক অধ্যাপক চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যের বহুমুখী প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করে তিনি বর্তমান প্রজন্মের গবেষকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর পাবনী ভক্তিধারায় ভারত সমৃদ্ধতর হয়ে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে যুগে যুগে পরিত্রাণ পাবে—লেখকের এই চিন্তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থটির মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রচ্ছদ—সবই দৃষ্টিশোভন। এর বহুল প্রচার সকলের কাম্য। ❑

শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় • লেখক : অধ্যাপক বলরাজ মাধোক • প্রকাশক : অজিতকুমার বিশ্বাস, জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ, ২৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬ • মূল্য : ৬০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৪ • প্রকাশকাল : জন্মাষ্টমী ২০০০

'ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থটি ভারতীয় জনসঙ্ঘের নেতা অধ্যাপক বলরাজ মাধোক প্রণীত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ও কর্মের মূল্যায়ন। গ্রন্থটির বাঙলায় অনুবাদ করেছেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ (১৯০১-১৯৫৩) ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী, প্রতিবাদী, সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব—যাঁর যথাযথ সামগ্রিক মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। বলরাজ মাধোক তাঁকে জেনেছিলেন রাজনীতির সূত্রে, কিন্তু যতটুকু জেনেছিলেন তা-ই তথ্য দিয়ে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ জনজীবনে প্রাথমিকভাবে পরিচিত ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে। ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম পথিকৃৎ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র তিনি। তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও মানবসেবা একইসঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতের মানুষ সাধারণভাবে তাঁকে জানে স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে, যিনি কংগ্রেসের নেতাদের ভারতভাগের বিষময় ফল সম্পর্কে বারংবার সচেতন করে-ছিলেন, হিন্দু বাঙালিদের বাঁচিয়েছিলেন পাকিস্তানের হাত থেকে। জিন্না চেয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং বেশ কিছু কংগ্রেস নেতার এই প্রস্তাবে সম্মতিও ছিল। যখন দেখা গেল, কংগ্রেসের নেতারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ মেনে নিয়েছেন এবং তা আর কোনমতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, তখনি শ্যামাপ্রসাদ দাবি তুললেন ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করতে হবে। সে-আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেন তাঁর যুক্তি মেনে নিতে। এটাই ছিল রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আজও যাঁরা শ্যামাপ্রসাদের কর্মযজ্ঞের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম অথবা বুঝেও তার কদর্থ করতে আগ্রহী, একমাত্র তাঁরাই শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে মনে করেন। অথচ ইতিহাসের তথ্যবিচার যদি সত্যসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ওঠা উচিত। এটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, এখানে তার সুযোগ নেই।

মূলত স্বাধীনতার পরে শ্যামাপ্রসাদের কীর্তিকাহিনী এই গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে শ্যামাপ্রসাদের কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর বাকি ১৪টি অধ্যায়ে তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান (১৯৪৭) থেকে কাশ্মীরে তাঁর অকালমৃত্যু (১৯৫৩) পর্যন্ত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কয়েকজন বিশিষ্ট অকংগ্রেসী ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার জন মাথাই, স্যার সম্মুখম চেট্টি, ডঃ আম্বেদকর এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদকে দেওয়া হয়েছিল শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি (১৯৪৮) তিনিই তৈরি করেন। এর আগে ১৯৪১ সালে বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছিলেন এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) কথা প্রথম তথ্যসহ প্রকাশ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সরকারি ক্ষেত্রে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, সিন্ধ্রী সার কারখানা, ব্যাঙ্গালোরে বিমান কারখানা শ্যামাপ্রসাদের শিল্পোদ্যোগের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হিসাবে তাঁর বিশেষ সাফল্য দেখা যায় কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও পূর্ববঙ্গের প্রশ্নে

সরকারি নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে এগিয়ে এলেও নেহরু নিজের মতো করে কাশ্মীর প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন, যার ফলে ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চরমে পৌঁছালেও নেহরু কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্যামাপ্রসাদ এই বিষয়-গুলিতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। প্রধানত এই ক্ষেত্রে নেহরুর দুর্বল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ১৯৫০ সালে তিনি মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দেন।

এর পর শ্যামাপ্রসাদ হয়ে উঠলেন অকংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীদের নেতা। তিনি সেসময় তাঁর নিজের দল হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ও কাজকর্মে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং অবশেষে হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেন। লোকসভায় তিনি তাঁর পরিচিতি ও যোগ্যতার দরুন দ্রুত উত্তর ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতা হয়ে ওঠেন। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫২ সালে শ্যামাপ্রসাদ 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নেহরু-নীতির প্রধানতম সমালোচক হিসাবে গণ্য হন।

ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তিনি একটি সুসংগঠিত সর্বভারতীয় বিরোধী দল হিসাবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় মর্যাদার সঠিক মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করে এবং সমাজে সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করে তিনি ভারতে গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কারোর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা অপেক্ষা দেশের সামগ্রিক স্বার্থই যে নীতিনির্ণয়ের মাপকাঠি হওয়া উচিত—একথাটাই শ্যামাপ্রসাদ বলতে চেয়েছিলেন। বিশেষ মতবাদ বা 'ইজম্'-এর দাসত্ব করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। লোকসভায় তিনিই ছিলেন অঘোষিত 'বিরোধী দলনেতা'। তাঁর স্পষ্টবাদিতা, যুক্তিপ্রবণতা, বাগ্মিতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও গভীর দেশপ্রেম সকল দলের প্রশংসা পেয়েছিল। লোকসভায় তাঁর বক্তৃতাগুলি মন দিয়ে পড়লে দেখা যাবে, তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকলকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি ছিল তাঁর সহজাত ভালবাসা। তিনি বরাবরই বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য প্রণীত নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁকেই বিনাবিচারে আটক অবস্থায় কাশ্মীরের জেলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। স্বাধীন ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম রাজনৈতিক শহীদ।

সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তনের ভারতীয় আদর্শ শ্যামাপ্রসাদের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল। তাঁর শেষজীবনের রাজনৈতিক সংগ্রামে বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক মাধোক। তাঁর সেসব দিনের স্মৃতি তিনি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন, মানমর্যাদা ও স্বার্থরক্ষা—এই দুটি ছিল শ্যামাপ্রসাদের শেষজীবনের প্রধান বিষয়। সংখ্যালঘুদের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পাকিস্তান সরকার আইনত বাধ্য ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনদিনই ব্যাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। শ্যামাপ্রসাদের প্রতিবাদ ছিল এখানেই। তিনি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অভিমত। কোন্ পরিস্থিতিতে শেখ আবদুল্লার কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যু ঘটল তা আজ পর্যন্ত রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনী লিখতে বসে গ্রন্থকার বলরাজ মাধোক অনেক মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজনীতির শৈশবাবস্থায় যে-প্রশ্নগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অতি অল্প সময়ে স্বাধীন ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শ্যামাপ্রসাদকে দেখা গেছে, প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে এবং পরে সংসদে বিরোধী নেতা হিসাবে। তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনসঙ্ঘের নেতা অধ্যাপক মাধোক হয়তো কয়েক জায়গায় স্বাভাবিক কারণেই তাঁর দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সাহস, কর্মশক্তি, সংগঠনশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, সততা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও সর্বোপরি নিখাদ দেশপ্রেমের মাধ্যমে রাজনীতিতে এমন এক জায়গায় উঠে এসেছিলেন, যেখানে তিনিই যে নেহরুর বিকল্প হিসাবে গ্রহণযোগ্য নেতা ছিলেন তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এটিই হলো অধ্যাপক মাধোকের বক্তব্য যার সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করবেন, অন্তত যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় ক্ষুদ্রতা ও আক্রোশে আচ্ছন্ন হয়নি। যে-সময়ের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে, তার পর অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দিতে পারলে আজকের ভারতীয় রাজনীতি তার বিষময় ফল থেকে কিছুটা মুক্তিলাভ করবে।

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের কর্ম-কাণ্ডের কথা বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে—এটাই বোধহয় অনুবাদকের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে আরো নিবিড় ও সত্যনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন যে রয়েছে সেকথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোচ্য গ্রন্থটি থেকে। বিবেকানন্দের কর্মযোগ, সৎসাহস ও দেশপ্রেম যেসকল দেশনেতার মানসিক গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ। ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে তাঁদের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু দুজনের নেতৃত্বের মধ্যে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও দেশের সামগ্রিক স্বার্থে উচ্চতর রাজনৈতিক প্রশ্নে চরম স্বার্থত্যাগ দেখা গেছে তা আজ অত্যন্ত দুর্লভ। এই গুণগুলি না থাকলে যেকোন রাজনৈতিক নেতা তাঁর যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও দলীয় রাজনীতির দক্ষতা সত্ত্বেও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠতে পারেন না এবং তাঁকে দিয়ে দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনও অসম্ভব। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সুলিখিত বঙ্গানুবাদ এখন অনেককেই নতুনভাবে ভাবতে শেখাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।—সম্পাদক

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কোয়েম্বাটুর ঃ গত ১-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জনসভা, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, স্মারকগ্রন্থ-সহ কয়েকটি গ্রন্থ ও সিডি প্রকাশ, আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষাকার্যে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী ও ইউনিফর্ম প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বাঁকুড়া ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সাধুনিবাসের নবনির্মিত সংযোজিত অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম, চেন্নাই ঃ গত ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ছাত্রাবাসের শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি উৎসব আয়োজিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিডি ও একটি বিশেষ পোস্টাল খাম প্রকাশ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। অনুষ্ঠানে ১৬৬ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ, ব্যাঙ্গালোর ঃ গত ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিদ্যার্থী মন্দিরম্' (স্টুডেন্টস হোম)-এর হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, রাজমুন্দ্রি ঃ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জগরামপল্লি গ্রামে আশ্রম পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের মূল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক ঃ গত ১২-১৬ মার্চ ২০০৫ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র, 'চণ্ডী' ও 'পুঁথি' পাঠ, প্রভাতফেরি, ভজন, নাটক, ভক্তিগীতি, পুতুলনাচ, বাউল গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও পূর্বা সেনগুপ্ত।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ) ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ. জি. সি.)-এর অধীনস্থ 'ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' (NAAC) বেলুড় কলেজকে (বিদ্যামন্দির) A+ (৯০-৯৫%) গ্রেডের কলেজরূপে সম্মানিত করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্যামন্দিরই এই সম্মানের প্রথম অধিকারী হলো। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে-দুটি কলেজ এই স্বীকৃতি অর্জন করেছে, বিদ্যামন্দির তাদের একটি। অপরটি মেদিনীপুর মহাবিদ্যালয়। সারা ভারতে 'ন্যাক' অনুমোদিত ২৩৯৬টি কলেজের মধ্যে যে ২৮টি কলেজ A+ গ্রেড লাভ করেছে, বিদ্যামন্দির তাদের অন্যতম।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ আশ্রম, ময়মনসিংহ (বাংলাদেশ) ঃ গত ১৭-২১ ডিসেম্বর ২০০৪ বিশেষ পূজা, পাঠ, সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, যাত্রাপালা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, চিত্র প্রদর্শনী, রক্তদান শিবির, কৃতি ছাত্রছাত্রীদের 'মেধা পুরস্কার ২০০৪' প্রদান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শুভেচ্ছা পুরস্কার বিতরণ, নরনারায়ণসেবা, পিঠা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, পিঠার গান পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৭ তারিখ ১৫০টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের এবং 'শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী কুঠির'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-এর অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনভিত্তিক চিত্রপ্রদর্শনী ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী জনাব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন ও ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহ্ আলম বকশী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী অক্ষরানন্দজী, স্বামী অমৃতত্বানন্দজী, স্বামী স্থিরানন্দজী, স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দজী, স্বামী ভার্গবানন্দজী, জনাব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন, জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু, অধ্যাপক মোহা. আমিরুল ইসলাম, বিশপ ফ্রান্সিস এ. গোমেজ, ডঃ মারুফী খান, জনাব কোহিনুর মিয়া, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, সবিতা বিশ্বাস, জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, মলয়কুমার সাহা, ডঃ মোছাঃ নাজমানারা খাতুন এবং জনাব দেলোয়ার হোসেন খান দুলু। ১৮ তারিখ বৈকালিক আলোচনাসভায় স্বাগত ভাষণ দেন জ্যোৎস্নালতা দে।

ঢাকায় মন্দির উদ্বোধন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাস্তুযজ্ঞ, আমন্ত্রণ ও অধিবাস ইত্যাদির মাধ্যমে মহাসমারোহে শুরু হয়েছিল পূজানুষ্ঠান। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আশ্রম-প্রাঙ্গণে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের
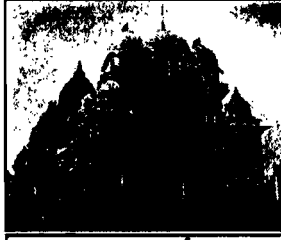
নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, ঢাকা

নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি

অপর সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, কয়েকজন অছিসদস্য সহ প্রায় ১০০-র বেশি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। এই উপলক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি আশ্রম-প্রাঙ্গণে নির্মিত বিশাল মঞ্চে নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়। কলকাতা থেকে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ বক্তা, হৈমন্তী শুক্লা প্রমুখ শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে হিন্দু-মুসলমান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসীন *(বামদিক থেকে)* স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজ।

নির্বিশেষে বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেন। ঢাকা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজীর প্রতি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের অপরিসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন একটি লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাজপথে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত নরনারীর প্রভাতফেরি সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চারদিন ধরে প্রত্যহ দুপুর ও রাত্রে গড়ে ২৫,০০০ মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রশাসনের প্রশংসনীয় সহযোগিতা এবং দূর দূর স্থান থেকে আগত সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবকের ঐকান্তিক সেবা অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। পূর্বে একটি ঠাকুরঘর ছিল, যেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ দীক্ষাদানও করেছিলেন—সেই বাড়ির পাশেই এই দৃষ্টিনন্দন মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছেন স্বেচ্ছাসেবক ঢাকা-নিবাসী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তিটি নির্মাণ করেছেন কলকাতার সল্ট লেক-নিবাসী শিল্পী গৌতম

ঢাকার রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের প্রভাতফেরি

পাল। এই উপলক্ষ্যে স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দজী লিখিত 'বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর শিষ্য ও সমকালীন অনুরাগিবৃন্দ' গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী (রামচন্দ্র মহারাজ) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ গুরুতরভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাঙ্গালোরের এক হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বিগত কয়েক বছর যাবৎ তিনি ডায়াবিটিস ও হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬০ সালে ব্যাঙ্গালোর মঠে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি পোনামপেট কেন্দ্রে ৭ বছর এবং বেলগাঁও আশ্রমে ৫ বছর (আমৃত্যু) অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সময় থেকেই বেলগাঁও কেন্দ্রটিকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে গড়ে তোলেন। তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন। তাছাড়া তিনি কন্নড় ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর ভদ্র ব্যবহার, প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব ও দক্ষ বাগ্মিতায় মুগ্ধ কর্ণাটকের বহু বন্ধু ও অনুরাগী তাঁর জীবনাবসানে গভীর শোক পেয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ একজন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সক্রিয় সদস্যকে হারাল। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করা হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কলকাতা-৯): গত ২১ নভেম্বর ২০০৪ তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ

কর্তৃক তিলজলা হাই স্কুলে পরিষদের ষাণ্মাসিক অধিবেশন আয়োজিত হয়। এই অধিবেশনে বৈদিক প্রার্থনা, উদ্বোধনী সঙ্গীত, স্বাগত ভাষণ, ১৬টি সদস্য আশ্রমের প্রতিবেদন পাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশ্রমসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী ও স্বামী পূতানন্দজী। এদিন ২০০৪-২০০৬ সালের জন্য পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী বোধসারানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ, রাণাঘাট (নদীয়া) ঃ গত ২১-২৮ নভেম্বর ২০০৪ রক্তদান-শিবির, ভক্তিগীতি, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, নাটক, বেদ ও 'গীতা' পাঠ, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গীতি-আলেখ্য, গল্পবলা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৪৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। যুবসম্মেলনে ১৫২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং 'গোষ্ঠী আলোচনা'ও সম্পন্ন হয়।

বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া) ঃ গত ২৬ নভেম্বর ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও কাজল বৈতালিক। অংশগ্রহণকারী ৬০০ যুবপ্রতিনিধিকে 'স্বামীজী ও তাঁর বাণী' পুস্তিকা ও ছবি প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কল্যাণী (নদীয়া) ঃ গত ২৬ নভেম্বর ২০০৪ 'মায়ের কথা' পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী ও ডঃ তাপস বসু। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সাধনকুমার মজুমদার। প্রশ্নোত্তর-পর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী। প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (অসম) ঃ গত ২৭-২৮ নভেম্বর ২০০৪ পতাকা উত্তোলন, আলোচনা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে ষাণ্মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯টি আশ্রমের ৬৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভাষণ ও উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী উদ্গীথানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী প্রমুখ।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ২৭-২৮ নভেম্বর ২০০৪ পরিষদের নির্দেশাবলি, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী, সাংগঠনিক দিক, বিভিন্ন আশ্রমের কার্যাবলি ও সমস্যাদি বিষয়ে আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর)-এর সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সাঁইথিয়া (বীরভূম) ঃ গত ২৮ নভেম্বর ২০০৪ অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে ক্যুইজ, প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২০টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, আগরতলা (ত্রিপুরা) ঃ গত ২৮ নভেম্বর ২০০৪ কোনাবনস্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মঠে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১০২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এবং স্বামী সত্যবোধানন্দজী ভাষণ প্রদান করেন।

মনসুকা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৮ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী, স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, সুনীত চক্রবর্তী, তরুণ গোস্বামী, গোপেন্দ্র চৌধুরী, অরিন্দম দাস ও অমিতাভ মৈত্র। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অরুণ বেরা ও গণপতি সামন্ত। উপস্থিত সকলকে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের পক্ষ থেকে স্বামীজীর বই এবং নিবেদিতার বই ও ছবি প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় কুষ্ঠরোগী ও সমাজব্যবস্থার ওপর একটি নাটক পরিবেশিত হয়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৯৫) ঃ গত ২ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেদমন্ত্র পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 'বিবেকানন্দ হল'-এ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ সুব্রতা সেন।

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা মন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ৩-৪ ডিসেম্বর ২০০৪ যথাক্রমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৪ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উভয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

চুঁচুড়া সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি) ঃ গত ৪-৫ ডিসেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, দুঃস্থ-নারায়ণদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। দ্বিতীয়দিন ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ৪-৫ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যাণ্ডেলের বিল-এ যথাক্রমে বার্ষিক ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ২১টি সদস্য আশ্রমের ৪৪ জন প্রতিনিধি বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী, স্বামী

বীতরাগানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। ২৮০ জন প্রতিনিধি যুবসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী অনঘানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। ৪ তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বিশেষ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঠচক্রে ২০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী নিখিলেশানন্দজী। অনুষ্ঠান-শেষে ৬০ জন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, কোঠার (ওড়িশা) ঃ গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ৯৪ বছর আগে শ্রীশ্রীমা এই তারিখে পালকিতে চড়ে কোঠারে এসেছিলেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও গীতবাদ্য সহযোগে তাঁর চিত্রপট পালকিতে সাজিয়ে আনা হয়। গ্রামের মহিলারা জলপূর্ণ কলস-সহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্মৃতিসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী, স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী, সৌরবেন্দু কর, নরেন্দ্র বারিক, সুমিত্রা কর প্রমুখ। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে সেবার দুদিন ধরে সরস্বতীপূজা হয়। এদিন রামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বরের পক্ষ থেকে ১৯০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে লেখার সামগ্রী-সহ স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়। এদিন প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হিন্দমোটর লোকমাতা নিবেদিতা সেবা সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে কোতরং ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় (প্রাথমিক) প্রাঙ্গণে 'নিবেদিতা জন্মোৎসব-২০০৪' পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। এদিন ৯০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নতুন পোশাক ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনা, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী ও কতিপয় যুবপ্রতিনিধি। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে স্বামীজীর বই ও ছবি প্রদান করা হয়। এদিন ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কম্পিউটার সেণ্টার'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

সারদা সেবাসঙ্ঘ, শিবপুর (হাওড়া) ঃ গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর বিষয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) ঃ গত ১১ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফুলঝরণ গ্রামে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 'পার্বতী গিরি বাল নিকেতন (অনাথ আশ্রম)'-এর অধ্যক্ষা ও প্রখ্যাত সমাজসেবিকা বসন্তকুমারী পাণ্ডা। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদিন জঙ্গলের মধ্যে বসবাসকারী কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ১২৫টি শাড়ি ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বাদুড়িয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, অঙ্কন, কবিতা ও বাণী আবৃত্তি, গল্পপাঠ, কুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের শাখা 'সারদা সমিতি, বাদুড়িয়া' কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। পুরস্কার বিতরণ ও ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন স্বামী বীতরাগানন্দজী।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে বস্ত্র ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ড্রেস এবং পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সৎপ্রভানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুদিন চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বেলাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও বেলাড়ি আশ্রমের ব্রহ্মচারী বৈরাগ্যচৈতন্যজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিদ্যানন্দজী ও আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দজী।

ওড়াহার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মুর্শিদাবাদ) ঃ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ ভক্তিগীতি, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেদান্ত সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা আত্মহৃদয়াপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা মুক্তহৃদয়াপ্রাণাজী। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০০ প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর (ত্রিপুরা) ঃ গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ আলোচনা, পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ'-এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭টি আশ্রমের ১৪৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও স্বামী উদ্গীথানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ,

'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ৪৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। গত ১৯-২২ ডিসেম্বর ২০০৪ 'শ্রীমা সারদা মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। মেলার মুক্তমঞ্চে বিভিন্ন দিনে সঙ্গীত, নৃত্য, বাউলগান, নাটক, ম্যাজিক, আদিবাসী লোকনৃত্য, ঝুমুর গান, চিত্র ও ফল-ফুল-সবজি প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি) ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'সারদা-পুঁথি' পাঠ, স্বরচিত প্রবন্ধ, গান ও কবিতা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী এবং স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৩৩ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ আবৃত্তি, গল্পবলা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, অঙ্কন, দৌড়, যোগাসন ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ কর্তৃক আয়োজিত তুফানগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার 'বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন ২০০৪-৫' অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১৭টি বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা) ঃ গত ১৯-২২ ডিসেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, গান, আবৃত্তি, কুইজ, প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী উদ্গীথানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৪২ জনকে কম্বল, ২৫৬ জনকে ধুতি ও শাড়ি প্রদান করা হয় এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৩৩ জন রক্তদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পানিসাগর (উত্তর ত্রিপুরা) ঃ গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে তিনি ভাষণ দেন।

শ্রীসারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-২৯) ঃ গত ২৩-২৫ ডিসেম্বর ২০০৪ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ২৩ তারিখ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 'বিবেকানন্দ হল'-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্বামী প্রভানন্দজী প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন। স্বাগত-ভাষণ দেন সোমা সিনহা এবং শ্রীসারদা সঙ্ঘের জন্ম-ইতিহাস পাঠ করেন মঞ্জু মুখার্জি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কুমকুম দত্তগুপ্ত। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভানেত্রী স্নেহময়ী মহাপাত্র, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণাজী, ডঃ মারুফী খান, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, দীপক গুপ্ত প্রমুখ। সারা ভারত থেকে ১৬৬ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, মুরারই (বীরভূম) ঃ গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী, বিশ্বনাথ দত্ত, নিত্যরঞ্জন দত্ত, কানাই সাউ, রতনচন্দ্র দত্ত, সুব্রত মুখার্জি ও রেণুকা সাউ। ২৫ তারিখ ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা (ওড়িশা) ঃ গত ৮ নভেম্বর ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় বস্তি অঞ্চলের ২৭ জন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে সাপ্তাহিক রেশন প্রদান কার্য শুরু এবং কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন অসহায় মহিলাদের স্বরোজগার যোজনায় মোমবাতি তৈরি ও বিপণন এবং স্থানীয় রাজস্থান সেবাসদন হাসপাতালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার শুভারম্ভ হয়। এসমস্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী।

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠচক্র (হুগলি) ঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪ শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল 'কীটনাশক ব্যবহারের কুফল'। প্রায় ১৫০ জন শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম ভূমি-অধিকর্তা (পি. পি. অ্যাণ্ড কিউ. সি.) ভূপেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সভাপতিত্ব করেন চণ্ডীতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি চায়না চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সভাপতি মিহির চট্টোপাধ্যায়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী বেলারানী নাগ গত ১১ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য গত ১২ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী স্মৃতি রায়চৌধুরী গত ১২ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, খড়্গপুর-নিবাসী রামপ্রসাদ মাঝি গত ১৫ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কল্যাণী-নিবাসী গোপালচন্দ্র দাস গত ১৬ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের বঙ্গাইগাঁও-নিবাসী নেপালচন্দ্র রায় গত ১৯ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চন্দননগর-নিবাসী গোপালচন্দ্র ঘোষ গত ২১ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।❑

রামকৃষ্ণ মঠ

ধনতলী, নাগপুর-৪৪০ ০১২

ফোন: ২৫২৩৪২২, ২৫৩২৬৯০
ফ্যাক্স: ২৫৩৭০৪২

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন মন্দির

একটি আবেদন

প্রিয় ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ,

নাগপুরের ধনতলীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ বিগত ৭৪ বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে। মধ্যভারতে এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন মন্দিরের পুরনো বাড়িটি ও তার সংলগ্ন উপাসনালয়টিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। জীর্ণতার জন্য এগুলির স্থানে নতুন মন্দিরাদি নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া ক্রমবর্ধমান ভক্তসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান উপাসনাকক্ষটিও বড়ই অল্পপরিসর। তাই আমরা স্থির করেছি, অনেক বড় আকারে একটি মন্দির ও একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হবে। এগুলির বিবরণ এইরূপ—

মন্দিরের আয়তন ১১৭´×৫৮´
মন্দিরের উচ্চতা ৬৭´
গর্ভমন্দির ১৮´৬˝×১৮´৬˝
উপাসনাকক্ষ (৫০০ ভক্তের জন্য) ৬৭´×৪০´
দুদিকের বারান্দা প্রতিটি ৬৭´×৫´
মন্দিরের ভিত্তি তথা অডিটোরিয়াম ৯১´৬˝×৯১´

সমগ্র প্রকল্পটির জন্য খরচ হবে ৩ কোটি টাকা (৩,০০,০০০,০০ টাকা), যার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করছি। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গৃহীত এই প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ইতি
ভগবদ্‌পদাশ্রিত আপনাদের
স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ
অধ্যক্ষ

অনুদান ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট বা চেক-এ 'রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর'-এর নামে পাঠানো যেতে পারে। অনুদান আয়কর আইনের ৮০জি ধারাবলে করমুক্ত। বিদেশি মুদ্রায়ও অনুদান গ্রহণ করা হবে।

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

‘উদ্বোধন’-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর-৭১২৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
  কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন : ২৬৭৩-৯২০৮
- **হারিট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ হারিট-৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুন্তুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ** (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
  পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন : ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯
  ফোন : ২৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**, (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
  উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন : ২৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
  ফোন : ২৬৬৩-৭০৪৬
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
  ফোন : ২৬৮৪-৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটি, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- **শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র**
  গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬
  ফোন : ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- **জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র**, প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
  জনাই-৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-২৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ৪/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
  ফোন : ২৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**, তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ কুমরুল (তারকেশ্বরের নিকট)
  পিন-৭১২৪১০, ফোন : ২৬৬৪-৯৮১৬
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, বগুলা-৭৪১৫০২
- **নব রামকৃষ্ণ অপেরা**, বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, সি/২০, পোঃ তাহেরপুর
- **ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল**, ‘সারদা ভবন’
  ফুলিয়া-৭৪১৪০২, ফোন : ০৩৪৭৩-২৩৪০০২

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  শিক্ষাগার রোড, হাটতলা, পিন : ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার পীঠ**, ‘রাণুভিলা’, পোঃ বড়বাগান, সিউড়ি-৭৩১১০৩
  শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বোলপুর, ফোন : ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪
- **সর্বমঙ্গলা বুক স্টল**, প্রযত্নে রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র
  পোঃ রামপুরহাট, ফোন : (০৩৪৬১) ২৫৮৩৬৮

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩, ফোন : ০৩৪৮২-২৬৫৪০৭
- **দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬
- **অশোক দাস**, ৩৪, দৈহাট্টা রোড, পোঃ খাগড়া
  পিন-৭৪২১০৩, ফোন : (০৩৪৮২) ২৫০৩৩৩

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামহরিপুর-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  ‘অঙ্কন’, স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, সারেঙ্গা-৭২২১৫০
- **কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩, ফোন : (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮

পুরুলিয়া

- **পুরুলিয়া বুক ডিপো**, হাটতলা, ফোন : (০৩২৫২) ২২৭২৯-২২৬৫১৩

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।
শ্রীরামকৃষ্ণ

*

তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মুক্তিলাভ হোক। জন্ম-মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।
শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি। দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। **স্বামী বিবেকানন্দ**

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
স্বামী বিবেকানন্দ

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই বছর একটি নতুন নিয়ম চালু হলো। আপনি বছরের যেকোন মাস থেকেই 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে পারবেন এবং সেই মাস থেকে মোট ১২ মাসের জন্য বই পাবেন। তিনবছরের জন্য গ্রাহক হলেও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে, যেকোন মাসে গ্রাহক হলে সেই মাস থেকেই হিসাব শুরু হবে। অবশ্য, নবীকরণ করার ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যে-নিয়ম চলে আসছিল, তা বহাল থাকছেই; শুধু অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে যেকোন মাস থেকে পরবর্তী ১২ মাসের জন্য গ্রাহক হওয়ার পথও খোলা রইল। তবে, পুরনো ব্যবস্থায় (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) কেউ গ্রাহকপদ নবীকরণ করতে চাইলে প্রতিবছর মার্চ মাসের মধ্যেই তা করতে হবে। সুতরাং এই মাসে (এপ্রিল) কেউ গ্রাহক হলে বা গ্রাহকপদ নবীকরণ করলে পুরনো তিনটি সংখ্যা (জানুয়ারি—মার্চ) নিঃশেষিত হওয়ার কারণেও পাওয়া সম্ভব হবে না। তাকে এপ্রিল (২০০৫) থেকে মার্চ (২০০৬) পর্যন্ত গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন

সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২)
জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পরিচালিত ১৫১ শয্যার ইণ্ডোর ও ২০টি বিভাগসম্পন্ন আউটডোর—যেখানে ক্যান্সার, টিবি, মানসিক রোগী সমেত গড়ে প্রতিদিন ৮০০ রোগীর সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক চিকিৎসা চলছে। আছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, ফ্রি নার্সিং ট্রেনিং, গোশালা, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত সাহায্য সমেত আরো নানা প্রকল্প। এই সেবাদান সম্পূর্ণ নিঃশুল্কভাবে শুধু মহান সহৃদয় ভক্তদের নিঃস্বার্থ দানে কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই এখনো ঈশ্বরেচ্ছায় সুসম্পন্ন হচ্ছে।

হাসপাতালের উন্নতিকল্পে নতুন ৫টি অস্ত্রোপচার কক্ষ তৈরি হচ্ছে। অসহায় মানুষের সেবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ আবাসিক ও নিঃশুল্ক নার্সিং স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ৯৫ জন। দীর্ঘকাল পূর্বে তৈরি একটি ছাত্রাবাস ভেঙে পড়েছে। ছাত্রীদের উপযুক্ত বাসস্থানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি হোস্টেল তৈরি করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহপূর্বক এই প্রস্তাবিত হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

এই মিশন-চত্বরেই আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব মন্দির। কিন্তু লবণাক্ত আবহাওয়ার জন্য প্রায় ভেঙে পড়া মন্দিরেরও আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত তিনটি অত্যন্ত জরুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সকল সহৃদয় সুধীজনের নিকট যথাসাধ্য সাহায্যের সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

নার্সিং হোস্টেল	৪২ লক্ষ টাকা
অস্ত্রোপচার কক্ষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি	৪০ লক্ষ টাকা
মন্দির সংস্কার	১৫ লক্ষ টাকা

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **"Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban"**—এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন।

সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

এই পুণ্যভূমিতে মনোরম পরিবেশে সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত আর্মি/সিভিল চিকিৎসক ও নার্সিং পদাধিকারীদের কাছে সেবাকার্যে যোগ দিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নার্সিং স্কুলে ভর্তির জন্য Prospectus ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়।

বিনীত নমস্কারান্তে
স্বামী সুপ্রকাশানন্দ
অধ্যক্ষ

LIBRARY

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৭

জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ ৫ম সংখ্যা

১০৭ তম বর্ষ ※ উদ্বোধন কার্যালয় ※ কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল‹

সূচিপত্র

উদ্বোধন

॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ | ৫ম সংখ্যা ● জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ ● মে ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১২)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১২/সেপ্টেম্বর ২০০৫ (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ক্রেতারা ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা উদ্বোধন অফিসে এসে জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৩ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।
  - প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে, তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। গ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবশ্যই গ্রাহকের 'অনুমতিপত্র' সঙ্গে আনবেন।
  - যদি কারো ক্যাশমেমো/রসিদ/মানি অর্ডার প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে, নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।
- ৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ১০ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ২০ অক্টোবর ২০০৫ বৃহস্পতিবার কার্যালয় খুলবে।

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি

বিগত ২৫ এপ্রিল ২০০৫ অপরাহ্ণ ৩টা ৫১ মিনিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজনীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং তাঁর অসংখ্য দীক্ষিত সন্তান ও ভক্ত শোকস্তব্ধ হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ ৭৯ বছরের সঙ্ঘজীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসেও যেন একটি যুগের অবসান হলো। তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯২৬ সালে। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিনে, ১৯০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর কেরলের ত্রিক্কুর গ্রামে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ মাত্র ১৭(+) বছর বয়সে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। বাড়িতে নাম ছিল 'শঙ্করন্' বা 'শঙ্কর'। সঙ্ঘে যোগদান করার পর ১৯২৯ সালে তিনি স্বীয় দীক্ষাগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ) মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর নতুন নামকরণ হয় ব্রহ্মচারী যতিচৈতন্য। ১৯৩৩ সালে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজই তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করেন। সাধুজীবনের প্রাথমিক পর্বে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহাশীর্বাদ লাভ

করেছিলেন। বেলুড় মঠে এসে তিনি প্রাণ-মন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দুজন সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী শিবানন্দজী ও স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের সেবা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চারজন সন্ন্যাসী পার্ষদ—স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এবং একজন গৃহী পার্ষদ শ্রীম (মাস্টার মহাশয়)-কে দর্শন করেছেন। ১৯৩৯ সালে মহারাজকে রেঙ্গুনে (বর্তমানে ইয়াঙ্গন) যেতে হয়। উপনিষদ্ ও বিবেকানন্দে সুসম্পৃক্ত স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর অসাধারণ বক্তৃতার খ্যাতি তখন রেঙ্গুন ও বর্মায় (বর্তমানে মায়ানমার) ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইসময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে টালমাটাল অবস্থা। তিনবছর পরেই ১৯৪২ সালে তিনি করাচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নিয়ে যান। ঐসময়ে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। করাচির মানুষের কাছে তিনি খাদ্যশস্য ভিক্ষা করে রেলের মালগাড়িতে ধরবে না বলে জাহাজে করে কলকাতায় ত্রাণ পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে দিল্লি মিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর বক্তৃতা শুনতে ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ভবিষ্যৎ দেশনেতৃবৃন্দ প্রায়ই আসতেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহ স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, দিল্লিতে তিনি পূজনীয় মহারাজের বক্তৃতা শুনতে ছুটে ছুটে আসতেন এবং অধিকাংশ দিনই অডিটোরিয়ামে বসার জায়গা না পেয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন। ১৯৬১ সালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদকরূপে কার্য করেন। এরই মধ্যে প্রায়ই বিদেশে গিয়ে বেদান্ত এবং স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাজেও তিনি ছিলেন অক্লান্ত। পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের অন্তত ৫০টি দেশে ভ্রমণ করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও উপনিষদের বাণী প্রচার করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি হায়দ্রাবাদ মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পরেও ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ আশ্রমটি নিজের হাতে গড়ে তোলেন। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট দেশেও তিনি নিয়মিত বক্তৃতাসফর করতেন।

ভারতের 'আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দূত' হিসাবে পরিচিত স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও বিদেশে বহুবার বহু কনফারেন্স ইত্যাদিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। বেদান্তের সাম্যবাণী প্রচারের জন্য তিনি ইসলামিক দেশগুলিতেও ভ্রমণ করেছেন। সেইসব বক্তৃতার অধিকাংশ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিজের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় বিদ্যাভবন পূজনীয় মহারাজের বহু বক্তৃতার অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট এবং সিডি প্রকাশ করেছেন। ১৯৮৭ সালে তিনি 'ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় সংহতি পুরস্কার' এবং ১৯৯৯ সালে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' গ্রহণ করেন।

সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হন। শেষবয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মনের দিক থেকে নিজের এই অসুস্থতাকে তিনি মোটেই আমল দিতেন না। সম্প্রতি ম্যালিনা এবং রক্তে হিমোগ্লোবিন ও প্লেটলেটের অল্পত্বের কারণে তাঁর অসুস্থতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও তিনি স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার পুনঃসংস্কার ও বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অপ্রতিরোধ্য মনোবলে যোগদান করেন। আরো অনেকের মতোই ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালাম তাঁর সঙ্গে বেলুড় মঠে দেখা করে আসেন। ডঃ কালাম মহারাজের অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রমাণ পেয়েছেন বহুবার। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন পূজনীয় মহারাজের গুণমুগ্ধ। বিগত ১২ মার্চ ২০০৫ শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজায় বিবিদিষু ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দানের পরেই তাঁর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ে। তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল মানুষের কাছ থেকে শোকবার্তা বেলুড় মঠে আসতে থাকে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম গুরুত্বসহকারে এই সংবাদ প্রচার করে। ২৬ এপ্রিল ২০০৬ লোকসভা ও রাজ্যসভায় পূজনীয় মহারাজের স্মরণে প্রশ্নোত্তরপর্বের আগে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ঐদিন সকালে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বেলুড় মঠে গিয়ে পূজনীয় মহারাজের চরণে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে আসেন। বিগত ৭ মে ২০০৫ বেলুড় মঠে আয়োজিত ভাণ্ডারায় অগণিত ভক্ত নরনারী উপস্থিত হয়ে স্মৃতিসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করেন। পূজনীয় মহারাজের প্রয়াণে সঙ্ঘ তথা ভক্তমণ্ডলী ও সমাজের যে ক্ষতি হলো তা পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করি। ❑

খন্তী পরমং তপো তিতিক্‌খা
নিব্‌বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্‌বজিতো পরূপঘাতী
সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো। (বুদ্ধবগ্‌গো, ৬)

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, তপস্যা ও নির্বাণ—এই গুণাবলিই [মনুষ্যজীবনের] পরম লক্ষ্য। এর মধ্যে কোন একটির হানি হলে শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

তণ্‌হায় জায়তে সোকো তণ্‌হায় জায়তে ভয়ং,
তণ্‌হায় বিপ্‌পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং। (পিয়বগ্‌গো, ৮)

তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনা থেকেই শোকের জন্ম হয়, তৃষ্ণা থেকেই আসে ভয়; তৃষ্ণামুক্ত ব্যক্তির শোক ও ভয় থাকে না।

সীলদস্‌সনসম্পন্‌নং ধম্মট্‌ঠং সচ্‌চবেদিনং,
অত্তনো কম্মকুব্‌বানং তং জনো কুরুতে পিয়ং। (ঐ, ৯)

যিনি ধার্মিক, কর্মে যাঁর নিষ্ঠা রয়েছে, যিনি সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সত্যবাদী—তিনি সর্বদা সকলের প্রিয় হন।

ছন্দজাতো অনক্‌খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া,
কামেসু চ অপ্‌পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধং সোতো' তি বুচ্চতি। (ঐ, ১০)

যাঁর চিত্ত বাসনাশূন্য, জ্ঞানালোকে যাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত, নির্বাণমুখী সেই মহৎ ব্যক্তিকে 'উর্ধ্বস্রোতা' বলা হয়।

ধম্মপদ

বিবেক, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঈশ্বর নিত্যসাক্ষী। তিনি সবকিছু দেখিতে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহেন। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বহুবার উচ্চারণ করিয়াছেন। তথাপি "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্", অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তি আমার [ঈশ্বরের] উপর মানুষভাব আরোপ করিয়া আমাকে [ঈশ্বরকে] অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কারণ সে ঈশ্বরের নিত্যসাক্ষীত্ব ভুলিয়া যায়। কেমনতর সাক্ষী তিনি? সমুদ্রের বেলাভূমিতে উপবিষ্ট দর্শক যেমন নির্লিপ্তভাবে লক্ষ-কোটি জলতরঙ্গ দেখিতে থাকে এবং ঐসকল তরঙ্গের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের দ্বারা তাহার মন যেমন বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না, তদ্রূপ। স্বরূপত জীবচৈতন্যও ঐরূপ সাক্ষিবৎ। উহাই দৃক্। এবং এই দৃগ্-দৃশ্য বিবেকই সাধকের কৈবল্যলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মহামুনি পতঞ্জলি নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে যাহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যানুভব বলা হইয়াছে, কিংবা যোগদর্শনে যাহাকে কৈবল্যলাভ বলা হইয়াছে, ঐ অবস্থাপ্রাপ্তির আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা—এ-প্রশ্ন উঠিতেই পারে। আধুনিক কালের অনেক মনীষীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাঠক বলিতেই পারেন যে, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে ভরা এই জগতের নানান সুখানুভূতির মধ্য দিয়াই যদি আমরা অনন্তের আস্বাদন করিব ভাবি, তাহাতে ক্ষতি কী?

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে পড়িতেছে। একটি যুবক তাহার এক বৈরাগ্যবান বন্ধুকে প্রশ্ন করিয়াছিল ঃ "তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে নাকি? তাহা হইলে আমরা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে।" অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির ধারণা—'স্বাধীনতা'র অর্থ যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা কিংবা সমাজে যথেচ্ছাচারী হইয়া ভ্রমণ করা অথবা পরস্বাপহরণ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করা কিংবা আরেকটু অগ্রসর হইয়া সত্যমিথ্যার পারে গিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ কোথাও দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে আরূঢ় হইয়া যাহা মন চায় তাহাই করা। ইহা যে পরাধীনতার নামান্তর সেকথা বুঝাইবার জন্য অতি দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, যাহাকে আমরা স্বাধীনতা বলিয়া ভাবিতেছি, তাহা স্বাধীনতা নহে। পরনির্ভরতা আমাদের পদে পদে অনুভূত হয়। সমুদ্রের মধ্যে একটি জনমানবশূন্য উন্মুক্ত দ্বীপে কাহাকেও প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীসহ একাকী ছাড়িয়া দিলে সেখান হইতে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে চাহিবে। কারণ, তাহার জীবন অপর অনেকের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা নহে বরং সে সীমিত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সুখ-দুঃখের পারে যাওয়া তাহার পক্ষে কখনো সম্ভব নহে। অন্তরে তাহার চন্দ্রাভিলাষ, কিন্তু পদদ্বয় ভূমিতে! বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষ অত্যন্ত সীমিত এলাকায় বিচরণ করে। তাহার চক্ষু সব আলো দেখিতে পায় না (অতিবেগুনি বা অবলোহিত ইত্যাদি), তাহার কর্ণ সব শব্দ শুনিতে পায় না। তাহার নাসিকা সকল গন্ধ অনুভব করে না। এবং জীবনে চলার পথে আরেকটি বস্তু সর্বদা তাহাকে তাড়া করিতেছে, উহা 'ভয়'। স্বামীজী বলিলেন, সমগ্র বেদ-উপনিষদের পরম শিক্ষাই হইল এই 'অভয়'-প্রতিষ্ঠা—যেখানে মানুষ সত্যসত্যই স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা অনুভব করিবে।

যাহা হউক, ক্রমে আমরা বৈরাগ্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। আধ্যাত্মিক জীবনে বৈরাগ্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ, সেকথা বলিতে হইবে না। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, সংসারজীবনেও বৈরাগ্য অত্যন্ত জরুরি। সুস্থ এবং সুষ্ঠু সাংসারিক বা সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান অতি উচ্চে। জানিয়া বা না জানিয়া মানুষ এই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। সে-কথায় আসিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক জীবনে বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা কতটা, সে-ব্যাপারে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করা দরকার।

ভর্তৃহরি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিয়া-ছিলেন ঃ "ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং, মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে জরায়া ভয়ম্। শাস্ত্রে বাদিভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং, সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং, বৈরাগ্য-মেবাভয়ম্॥" অর্থাৎ আহারাদি ভোগনিরত ব্যক্তির রোগের আশঙ্কা থাকে (ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল, হাইপার-টেনশন, হাইপার প্রেসার, সেরিব্রাল কিংবা কার্ডিয়াক ফেলিওর ইত্যাদি), অভিজাত কুল বা পরিবার (পূর্বে দত্ত পরিবার, ঠাকুর পরিবার কিংবা অমুকের শিষ্যপরম্পরা ইত্যাদি যেমন ছিল, বর্তমানে উহাই

দলভিত্তিক হইয়াছে, অমুক দলের লোক কিংবা টাটা গ্রুপ বা অমুক MNC-র কর্তা ইত্যাদি)-ভুক্ত ব্যক্তির তথা হইতে স্খলনের ভয় থাকে। প্রচুর ধনসম্পদ থাকিলে কর (ট্যাক্স)-এর ভয়ে মানুষ অস্থির হয়। মানী ব্যক্তি সর্বদা ভীত থাকে কেহ তাহাকে অপমান করিবে কিনা ভাবিয়া। বলবান ব্যক্তির শত্রু অনেক। এবং রূপবানের (বা রূপবতীর) ভয়—বার্ধক্যে তাহার সকল রূপ হারাইয়া যাইবে। যাহার রূপের অহঙ্কার আছে, সে সর্বদা দীর্ঘদিন নিজের রূপকে অটুট রাখিতে চাহে। আরো আছে, শাস্ত্রজ্ঞ বা জ্ঞানী ব্যক্তির ভয়—তাহার যুক্তি হয়তো অপর কেহ খণ্ডন করিবে। যাহার বিদ্যা, কলা, সঙ্গীত-নৃত্যাদি কিংবা ক্রীড়া, এমনকি রন্ধনাদি গুণ আছে, তাহার ভয়—কোন খল ব্যক্তি তাহার গুণের অপব্যবহার করিবে। সর্বাপেক্ষা ভয়ের ব্যাপার হইল, যে জন্মিয়াছে, তাহার মৃত্যু ঘটিবে। অর্থাৎ ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি কাহারো নাই। তাহা হইলে উপায় কী? মুনি বলিলেন, বৈরাগ্যই একমাত্র উপায়। বৈরাগ্যবান ব্যক্তিই বিবেকানন্দ-প্রশংসিত 'অভীঃ' মন্ত্রের মূর্ত রূপ প্রকট করিতে সমর্থ। বেদান্তের সর্বোচ্চ শিক্ষাই হইল 'অভয়'-এ প্রতিষ্ঠালাভ করা। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির..." ইত্যাদি। ভীত অন্তরে মানুষ কখনো শির উচ্চে রাখিতে পারে না। এক অবস্থায় তাহার শির উচ্চ থাকিতে পারে বটে, অন্য অবস্থায় শির ভয়ে নত হইয়া যায়। সর্বাবস্থায় শির উচ্চ রাখিবার মন্ত্রই স্বামীজীর নিকটে আমরা পাইয়াছি। বস্তুত, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' মন্ত্রের প্রাথমিক শর্তই হইল অভয়ে প্রতিষ্ঠা। কঠোর তিতিক্ষাপরায়ণ, ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী, বৈরাগ্যবান মনুষ্যশ্রেণি এবং সংসারাবদ্ধ মোহগ্রস্ত অথচ সংসারের সুখভোগে বিরক্ত শ্রেণির মধ্যে এই মন্ত্র একটি সেতুর ন্যায় কাজ করে। বনবিহারী কিংবা হিমালয়ের গিরিকন্দরে তপস্যারত অন্তর্মুখী সাধককে যেমন এই মন্ত্রের সাহায্যে স্বামীজী সমাজের কল্যাণের জন্য টানিয়া আনিয়াছেন, তেমনি সংসারী জীবকেও শিখাইয়াছেন সংসারে থাকিয়াই কেমন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হয়—'পাঁকাল মাছ'-এর ন্যায়।

ইহা তো বড় কথা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক কাজকর্মেও অহরহ বৈরাগ্য প্রয়োজন হয়। ছাত্রাবস্থায় টেলিভিশন পড়াশোনার ক্ষতি করিতেছে বুঝিলে ছাত্রছাত্রীর টেলিভিশন-বৈরাগ্য অবশ্যই অবলম্বনীয়। যাহার রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহার নানাবিধ খাবারের প্রতি বৈরাগ্যের প্রয়োজন। যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করিতে চাহে, বৈরাগ্য যে তাহার অতীব সহায়ক সে-কথা বলিতে হইবে না। সংসারে শান্তি বজায় রাখিবার কারণেও পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা এবং অপর সকল আত্মীয়মহলেও নানাবিধ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হয়। সন্তানের শিক্ষার জন্য পিতামাতাকে সংযত জীবন আচরণ করিতে হয়, যাহার ভিত্তি বৈরাগ্য। কেহ হয়তো অত্যন্ত মেধাবী বলিয়া ফাইনাল পরীক্ষায় পাশের পূর্বেই বহুবিধ চাকরির আহ্বান পাইল। তখন তাহার বিবেক-বৈরাগ্যই অবলম্বনীয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী একদা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, একজনের তেলেভাজা-প্রিয় এক বন্ধু ছিল। এক রাত্রে ঐ বন্ধুর সম্মুখে এক থালা তেলেভাজা দেওয়া সত্ত্বেও সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঐ তেলেভাজা খাইল না। পরে জানা গেল, সেই রাত্রে সে এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে এবং সেখানে পোলাও-কালিয়া ইত্যাদি অনেক কিছু থাকিবে। অর্থাৎ বৈরাগ্যের অর্থই হইল বৃহৎকে পাইবার নিমিত্ত ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করা। বৈরাগী সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী হইয়া ক্ষুদ্র সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়াছেন কেন? সর্ববৃহৎ ব্রহ্মসুখ পাইবেন বলিয়া। যাহারা সেকথা ধারণা করিতে পারে না, তাহারা অন্তত এটুকু বুঝিতে পারে যে, নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মে বৈরাগ্য এই কারণেই দরকার—ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করিলে সংসারেও বৃহৎ সুখ লাভ করা সম্ভব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, মনটা তো বায়ুর ন্যায় চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা তো অসম্ভব! ভাবিলে বিস্ময় জাগে, কে এই প্রশ্ন করিতেছেন—যিনি দ্রুপদরাজের রাজসভায় শত কোলাহলের মাঝেও মনকে গুটাইয়া লইয়া একমাত্র মৎস্যচক্ষুই দেখিয়াছিলেন, সেই অর্জুন! শ্রীকৃষ্ণ অশেষ স্নেহে পূর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের ঐ রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উত্তর দিলেন ঃ "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই এই কাজটি করিতে হয়। পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছিলেন ঃ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" অর্থাৎ মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই শব্দের উপর অশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। জনৈক ভক্ত "মন যে আমার বশে নয়"—বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন ঃ "সেকি! অভ্যাসযোগ। অভ্যাস কর। দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যাবে। মন যেন

ধোপা ঘরের কাপড়।... যারা সংসারে আছে তাদের পনেরো আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত।" অন্যত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন ঃ "বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একেবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়—তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাইরের ত্যাগও করতে হয়। কলকাতার লোকদের বলবার জো নাই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বলতে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৫৬) আরেক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ "বৈরাগ্য মানে কী? না, ঈশ্বরেতে বিশেষ অনুরাগ এবং সংসারে বীতরাগ, ইহাই বৈরাগ্য। একটিকে ছাড়িয়া দিয়া সাথে সাথে অপর একটি ভাববস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবেই। নতুবা মনের স্বভাবেই সে, যে-বস্তুটি (সংসারটি) ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পুনরায় সেই বস্তুকে অনিবার্যভাবেই আঁকড়াইয়া ধরিবে।"

যে অভয়-প্রতিষ্ঠার কথা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, স্বামীজী যে 'অভীঃ' মন্ত্রের বাণী শুনাইয়াছেন, সেই প্রেক্ষিতে স্বামী ভজনানন্দজী চমৎকার যুক্তির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, নৈতিক মূল্যবোধ মনুষ্যজীবনের চরমোদ্দেশ্য হইতে পারে না। একদিকে যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধকে অতিক্রম করিয়া মানুষের উচ্চতর সত্তাকে অনুভব করার শিক্ষা যেমন জরুরি, অপরদিকে তেমনি স্বামীজীকে ঠাকুরের সেই শিক্ষাটি—"যো কুছ্ হ্যায় সো তূহী হ্যায়" মনে রাখাও অত্যন্ত জরুরি। নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন, আমায় এমন করিয়া দিন যে অহর্নিশ সমাধিতে ডুবিয়া থাকিব, মাঝে মাঝে নামিয়া সামান্য আহারাদি করিব, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, সমাধি অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে। পরে বলিলেন ঃ "তুই নিজেই তো গান গাস, 'জো কুছ হ্যায় সো তূহী হ্যায়!' " এই বিশ্বচরাচরে "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে"—ইহাকে ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। এবং পতঞ্জলির মতে সেই অবস্থায় পৌঁছাইবার উপায় 'পরবৈরাগ্য'। সাধারণভাবে বৈরাগ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'পরবৈরাগ্য' উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই বর্তমানে উহা আমাদের আলোচ্য নহে। বরং প্রাথমিক পর্যায়ের বৈরাগ্য-প্রসঙ্গে কয়েকটি স্তরের কথা পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে, যথা—'যতমান', 'ব্যতিরেকী', 'একেন্দ্রীয়' এবং 'বশীকার বৈরাগ্য'।

ধর্মজীবন যাপনে আগ্রহী গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলের জীবনেই বৈরাগ্যের এই মনস্তাত্ত্বিক স্তরবিশেষ প্রকটিত হইতে থাকে। যথা 'ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিব' সঙ্কল্পপূর্বক চলিলে উহাই যতমান বৈরাগ্যের প্রকাশ। ইহা প্রাথমিক অবস্থামাত্র। এই অবস্থায় কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ কতটা হ্রাস পাইল ইত্যাদির বিচার নাই। পরবর্তী স্তরে সাধকের মনে পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ানুরাগের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব আসে এবং গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ ও শব্দের কোন্‌টিতে এখনো আসক্তি আছে, সেই বিচারক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতিরেকী বৈরাগ্যের অবস্থা। যখন বাহ্যেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং মনের মধ্যে (মনই তখন একমাত্র ইন্দ্রিয় বলিয়া একেন্দ্রিয়) শুধু ঔৎসুক্যবশত রূপ-রসাদির প্রতি মন ধাবিত হয়, তখন উহা একেন্দ্রিয় বৈরাগ্যাবস্থা। বশীকার বৈরাগ্য অতি উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠতর অবস্থা। এই অবস্থায় যোগীর চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সকল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই চরম উপেক্ষাশীল হইয়া পড়ে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক—তিন লোকের প্রতিই তাঁহার চরম অনীহা প্রকাশ পায়। ইহার পরবর্তী অবস্থাই "তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।১৬) অর্থাৎ পরবৈরাগ্য। ভাষ্যকার ব্যাসদেব এই বৈরাগ্যকে জ্ঞানের সঙ্গে সমীকরণ করিয়াছেন—"জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্।"

স্বামী ভজনানন্দজী বৈরাগ্যের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মানুষের মনের আসক্তি বা নিরাসক্তি ব্যাপারটি মূলত কিসের উপর আধারিত থাকে? তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা (আসক্তি) 'ইচ্ছা' বা will-এর উপর আধারিত থাকে। এবং এই 'ইচ্ছা' ব্যাপারটি মানুষকে কখনো বদ্ধ করে, কখনো বা মুক্ত করে। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" (অমৃতবিন্দু উপনিষদ্, ২)—মনই মানুষের বন্ধনের কারণ। আর মনের মধ্যে 'ইচ্ছা'ই বলবতী; যদিও 'অহং' ব্যতীত এই 'ইচ্ছা'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সামান্য পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়, মনের মধ্যে অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতে থাকে। সেগুলি আর কিছুই নহে, উহারা 'সঙ্কল্প'। এই সঙ্কল্পের আবির্ভাব বা তিরোভাব তেমন ক্ষতিকারক নহে, যদি না উহা 'ইচ্ছা'র সহিত মিলিত হয়। সঙ্কল্প যখন 'ইচ্ছা'য় পরিণত হয়, তখনি মানুষ সেই ইচ্ছার তাড়নায় অন্ধের মতো ছুটিতে থাকে এবং ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলপ্রাপ্তির দ্বারা সুখ ও দুঃখের সামিল হয়। [ক্রমশ]

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র

হেমচন্দ্র দত্তকে লিখিত*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ
৭।৭।১৭

প্রিয় হেমচন্দ্র

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম[।] তোমায় মনে করিতে পারিয়াছি[,] তবে খুব স্পষ্ট নয়[।] যাই হোক যেরূপ আমি তোমাকে ধ্যানাদি করিতে বলিয়াছি তুমি তাহাই করিও[,] প্রভুর কৃপায় শান্তির পথে অগ্রসর হইবে নিশ্চয়ই। প্রার্থনার বল অসীম[।] প্রাণের সহিত তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে২ ধ্যান আপনা হইতেই আসিবে এবং হৃদয়ে শান্তির আভাস পাইবে। বাবুরাম মহারাজের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হইয়াছিল[।] Calvert সাহেব Medical College-এর Principal, তিন দিন আসিয়াছিলেন। এখন প্রভুর কৃপায় জীবনের আশা হইয়াছে[।] তিন দিন ২৬।২৭।২৮ জুন তাহা বড় ছিল না[।] যা হোক দয়াল প্রভু ভক্তপ্রতিপালক, ভক্তরক্ষক বোধহয় তাঁকে এযাত্রা রক্ষা করিলেন[।] এখনও অতিশয় দুর্ব্বল[,] পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়[।] ২/১টা কথা কহিলেই একেবারে কাতর হইয়া পড়েন[।] ডাক্তার কথা কহিতে একেবারে মানা করিয়াছে। আমার ৺পুরী যাবার এখনও স্থির হয় নাই। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তুমি জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী—
শিবানন্দ

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত**

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

'Godavari House'
Ootacamand
S. India
11.9.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার ৫/৯ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি[,] খোকাটী শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠুক ও তোমাদের মনে শান্তি হউক। সংসারে এইরূপ হইয়াই থাকে[,] এসব ধীরভাবে তাঁর দিকে তাকাইয়া সহ্য করিতেই হইবে। তবে বুদ্ধিমান জীব এইসব জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রাণপনে চেষ্টা করে (তাঁকে অবলম্বন করিয়া) সংযত হইবার জন্য। তুমি যখন জন্মান্তরের সৌভাগ্যফলে আমাদের কাছে ঠাকুরের ইচ্ছায় আশ্রয় লইয়াছ[,] তখন সংসারে কি করিয়া থাকিলে কতকটা সুখে থাকতে পার আমরা নিশ্চয় তাহা বলিব। সংযম একমাত্র উপায় ও ঠাকুরের নাম রূপ ধ্যান, পূজা এবং যে কর্ম করিতেছ তাহা ঠিক২ করা এবং সংসারের অন্য সব কর্তব্যকার্য যাহা আছে তাহা করা, ঠাকুরের কাছে অন্তরের সহিত বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বিচার ও পবিত্রতা অর্থাৎ সংযম এই সকলের জন্য প্রার্থনা করা। স্ত্রীর সহিত এক বিছানায় শোয়া উচিত নয়[,] এবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। Determination খুব চাই। Struggle করিতেই হইবে[,] তবে তাঁর কৃপায় জয়ী হইবে ভয় নাই। Struggle is life[,] যেখানে struggle নাই there is death (স্বামীজি)। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে[,] স্ত্রীকে ... খোকার মাথায় ঠাকুরের নাম করে[,] আমার নাম করে আশীর্ব্বাদ করিবে[।] সে শীঘ্র [আরোগ্য?] হইয়া উঠুক। আমার শরীর মন্দ নাই[।] এখানে বোধহয় এই Septr মাসটা থাকিতে পারি[,] Octr-এর প্রথম সপ্তাহে যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো বাংলোর [ব্যাঙ্গালোর] মঠ যাইতে পারি[,] না হয় মাদ্রাজ। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* ঢাকার নিকটবর্তী মীরকাদিম পোস্ট অফিসের অন্তর্বর্তী আবদুল্লাপুর জুনিয়ার স্কুলের সহ-প্রধানশিক্ষক।

** শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রদুটি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী প্রয়াত যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

স্বামী সারদানন্দকে লিখিত দুটি পত্র*

॥১॥

ওঁ

কাশী সেবাশ্রম
সন ১৩২৪ । ২০ বৈশাখ

শ্রীচরণেষু
সংখ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বক
সবিনয় নিবেদন

আপনার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তে আনন্দিত হইলাম। আমার আর এখন পথ্যাদি সম্বন্ধের কোন কষ্ট নাই[,] আপনার শ্রীচরণ কৃপায় সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। চন্দ্র মহারাজ আমার জন্য বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিতেছেন এবং মঠের সকলেই আমার কষ্ট নিবারণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। আপনার পত্র পাইয়া চন্দ্র মহারাজ আরও বিশেষরূপে যত্ন করিতেছেন।

আমার এসমস্ত কষ্ট দূর হইবার জন্য আপনি দয়া করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ত করিয়াছেন। কিন্তু আমার যে প্রার্থনা তাহা দয়া করিয়া পূর্ণ করুন। পীড়ার যন্ত্রণা আর কত কাল যে সহ্য করিব। আপনি এ দাসের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করুন যেন আমি শীঘ্র২ চিরশান্তি সুখের অধিকারি হইতে পারি—ইহাই দাসের একমাত্র আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা। আপনাদের কৃপাব্যতীত আমার কোন উপায় নাই[,] দাসকে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ দেন—এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

কোয়ালপাড়া[র] বিষয় পূজনীয় মহারাজের নামে লেখাপরা হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বাকী এখানকার মঙ্গল, আপনার শ্রীচরণ কুশলসংবাদে আহ্লাদিত করিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি
শ্রীচরণদাস
সান্দ্রানন্দ

॥২॥

THE HINDU TEMPLE
2963 WEBSTER ST.
SAN FRANCISCO, CALIF., U. S. A.
শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শ্রীচরণকমলেষু—
Jan 18, 1917

পূজনীয় শরৎ মহারাজ,

আমার গত পত্রে Mrs. Petersen-এর মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছি। ২৪শে ডিসেম্বর ১০।৪৫ মিনিটের সময় আমি প্রাতঃকালীন রবিবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় মৃত্যু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করিয়া তাঁহার অভয়পাদপদ্মে গ্রহণ করিবেন।

গতকল্য ৯ ডলার ৫০ সেন্ট (£1–19–0) একটী M.O. আপনার নামে পাঠাইয়াছি। আপনি যেরূপ fund-এ দান আবশ্যক বিবেচনা করেন করিলে বাধিত হইব। Mrs. Petter-র দরুণ Dr. ললিতমোহন পালের নিকট হইতে ২৫ ডলার পাইয়াছেন কি?

এখানকার কার্য্য উত্তরোত্তর সব দিক ক্রমশঃ ঠিক হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়াছি। ৩ বৎসরের General Report যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ দুইজনে Los Angeles-এ বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতেছে—এ সংবাদ বোধ হয় পূর্ব্বে পাইয়া থাকিবেন।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে আমার সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া কৃতকৃতার্থ করিবেন। আশা করি শ্রীশ্রীমা ভাল আছেন।

আপনার ও মঠস্থ সকলের কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

নববর্ষে আপনি আমার বিশেষ প্রণাম জানিবেন ও সকলকে যথাযোগ্য ভালবাসা ও অভিবাদনাদি দিয়া সুখী করিবেন।

ইতি দাস
প্রকাশানন্দ

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ও পার্ষদগণের যেসব পত্র অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির যেরকম একটি আধ্যাত্মিক মূল্য রয়েছে তেমনি ঐসব পত্র এক-একটি ঐতিহাসিক দলিলও বটে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস প্রথমাবধি অনেকটাই রচিত হয়েছে এইসব পত্রাবলির ভিত্তিতে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ যখন সঙ্ঘের কর্ণধার, তখন তাঁর কাছে নানাধরনের চিঠি আসত—যেগুলি ব্যক্তিগত কিংবা সঙ্ঘের কর্মসূচি সংক্রান্ত। সেইরকম দুটি অপ্রকাশিত পত্র ওপরে মুদ্রিত হলো। স্বামী সান্দ্রানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শেষজীবনে রোগাদির কারণে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে পূজনীয় সারদানন্দজীর এক মন্ত্রশিষ্যের নামও স্বামী সান্দ্রানন্দ হয়েছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহকারীরূপে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
মে ১৯০৫

স্বামীজির স্মৃতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন] [ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত।

২২শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সাল। ১০ই মাঘ শনিবার।

সকালে উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটস্থ বলরামবাবুর বাটীতে স্বামীজির কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজি বলিতেছেন, "চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness death. আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত। Pure, pure by nature. আমরা কি কখন পাপ করিতে পারি? অসম্ভব। এইরকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই ত দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।"

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজি। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই, এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জান্তেই পাই না। Positive কিছু শেখান হয়নি। হাত পা-র ব্যবহার ত জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্ব্বলতা। জেনেছি যে, আমরা বিজিত, দুর্ব্বল, আমাদের কোন বিষয়ের স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের যত কিছু problems ক্রমশঃ আপনা আপনিই solve হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। সব দোষ শুধরে যাবে। তাও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে। দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পোরাবার জন্যে কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন ও ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে। এসব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজি। অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন। রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজি। ভিখিরীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরী কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন। মহাশয়, majority-র কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজি। Majority-রা ত fools, men of common intellect. মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority-রা চলে। এদেরই আদর্শ করে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজসংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজসংস্কার মানে ত বিধবার বিয়ে আর স্ত্রীস্বাধীনতা বা ঐরকম আর কিছু। তোমাদের দুই এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ ত? দুই চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হলেই হল, আর যারা মরে মরুক!

প্রশ্ন। তা হলে কি কোন সমাজসংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজি। দরকার আছে বইকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্চে রোগের কারণকে নির্ম্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে intermarriage-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্ব্বলতা এসেছে।

২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সাল। ১১ই মাঘ রবিবার।

বাগবাজার বলরামবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজি উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ আদি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজি পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। বারাণ্ডাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের ও উত্তর দিকের বারাণ্ডাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজি কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজি সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্‌ফিস্ করিয়া দুই একজনকে স্বামীজির গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজি নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজি। কি বলছ মাষ্টার বল না? ফিস্‌ফিস্ করছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধে ক্রমে অতঃপর স্বামীজি "যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে" গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছেন, সত্যই তাঁহারা সিঁড়ি হইতে যেন গানটী বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে মনে করিলেন। গান শেষ হইলে স্বামীজি মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হয়েছে ত? আর গায় না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। voiceটা roll করে।"

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ
সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥

শ্লোকার্থ ঃ *এই চতুর্বিধ ভক্ত সকলেই মহান এবং আমার প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ, জ্ঞানীকে আমি আত্মস্বরূপ মনে করি। আমাতে (বাসুদেবে) সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী সর্বদাই 'পরম-গতি' মনে করিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ যেকোন কার্য উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের চিন্তা করাই সর্বোত্তম সাধন। ভগবানের চিন্তার উপলক্ষ্য যাহাই হউক না কেন, মানুষকে তাহা ক্রমে ক্রমে মুক্তির দিকে লইয়া যায়। তবে জ্ঞানী এই জন্মেই মুক্তিলাভ করেন। কারণ, মুক্তিস্বরূপ ব্রহ্মকে তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন। কিন্তু অপর তিনজন ক্রমে ক্রমে যোগ্যতা লাভ করিয়া মুক্ত হন। ভগবদ্বুদ্ধি স্থির থাকিলে ইঁহারাও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। পুরাণে আর্তভক্তের উদাহরণ গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। গজ পূর্ব সংস্কারে ভগবানকে স্মরণ করায় ভগবান নিজে আসিয়া গজকে কচ্ছপের হাত হইতে মুক্ত করিলেন এবং নিজে দর্শন দান করিয়া তাহাকে জীবন্মুক্ত করিলেন। ধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য শ্রীহরির উপাসনা করিয়া কাঁচ খুঁজিতে কাঞ্চন পাইলেন। তখনি তাঁহার ভক্তিমুক্তি লাভ হইল। জিজ্ঞাসু পথে আসিয়া পড়িয়াছে—চলিতে থাকিলেই মুক্ত হইয়া যাইবে, ইহাই শ্রীভগবান আশ্বাস দিতেছেন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥১৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *বহুজন্মের সাধনের ফলে শেষ জন্মে 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে' (অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন)—এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী আমাকেই নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভগবানের নাম করিতে করিতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে গত হইলেও মুক্তি হয়। কিন্তু জীবিত থাকিয়া মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ। ভগবানের কোন রূপ দর্শন করিলে এত আনন্দ হয় যে, সাধারণত মানুষের স্নায়ুতে তাহা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহারা অনেক জন্ম ধরিয়া দেহ মন শুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করেন এবং ঐসঙ্গে ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যেও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি বিরাটভাব সকলের অনুভব হয় না। অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের সংখ্যা খুবই কম। বাকি সাধকবৃন্দ ভগবানের কোন বিশেষ মূর্তির অনুভব লইয়াই জীবন কাটাইয়া যান।

[মন্তব্য ঃ এখানে 'বাসুদেব' শব্দের অর্থ পুরুষোত্তম পরমাত্মা। সেই বাসুদেবই এই বিশ্বচরাচর হইয়াছেন—এইরূপ সর্বাত্মক দৃষ্টি জগতে অতি দুর্লভ। ইহাকেই শাস্ত্রে "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন — "সর্বভূতাধিবাসশ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি/ সর্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ।" অর্থাৎ সর্বভূতের অধিষ্ঠান, সকলের অনুগ্রাহক সর্বাতিশায়ী আমিই সেই বাসুদেব।—সম্পাদক]

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥২০॥

শ্লোকার্থ ঃ *পুত্র, অর্থ ও স্বর্গাদি লাভের কামনার দ্বারা যাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি অভিভূত হইয়াছে, তাঁহারা জপ, উপবাস ইত্যাদি তপস্যা বা নিয়মপালনপূর্বক নিজ নিজ স্বভাবানুসারে (বাসুদেব ভিন্ন) অন্যান্য দেবতার ভজনা করেন।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ তো স্বরূপত ব্রহ্ম। কিন্তু মহামায়ার মায়ায় আবৃত হইয়া সে নিজেকে অত্যন্তই ক্ষুদ্র বোধ করে। নিম্নশ্রেণির জীবের খাদ্য অন্বেষণেই জীবন কাটিয়া যায়, আরেকটু উন্নত হইতে ভাল খাদ্য চাহে—এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে থাকে। ক্রমে মনুষ্যজন্মপ্রাপ্ত হইয়া সে এত ব্যস্ত থাকে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত আর কোনদিকে মন দিবার তাহাদের অবসর হয় না। আরেকটু উন্নত হইলে ঝড়, বন্যা, মহামারী, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব দেখিয়া মনে মনে ভাবে, অত্যাচারী রাজা বা জমিদার কিংবা ডাকাতের ন্যায় শক্তিশালী এইসব সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষরা উৎপাত করিয়া থাকেন। তাই সেই অজ্ঞ লোকেরা ঐ শক্তিশালী পুরুষগণকে দেবতা (অর্থাৎ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন) জ্ঞান করিয়া তাহাদের তুষ্ট করিবার জন্য পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে। আমরা

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিত ধার্মিক লোক সত্যসত্যই বিশ্বাস করে, পাঁঠা খাইতে দিলে মা কালী, গাঁজা খাইতে পাইলে শিবঠাকুর খুশি হইয়া তাহাদের অভীষ্ট সাধন করিয়া দিবেন। যেমন আজকাল খোশামোদ করিয়া এবং ঘুষ দিয়া লোকে শক্তিশালী লোকের দ্বারা অনেক স্বার্থ সাধন করিয়া লয়—তদ্রূপ। দেবোপাসনা উপরি উক্ত ক্রিয়ারই একটি সংশোধিত সংস্করণমাত্র।

পৃথিবীর সব দেশেই ভগবৎ উপাসনা প্রচলিত আছে। কিন্তু জগৎ অজ্ঞলোকে পরিপূর্ণ। সম্প্রদায়ের ভয়ে নানাপ্রকার উপাসনা করিলেও অজ্ঞলোকেরা ঐ দেবতাদিগেরই তোষামোদকারী মাত্র। সব দেশেই মানুষকে এইকথা বহুবার আচার্যপুরুষগণ বুঝাইয়াছেন যে, দেবতাদিগের উপাসনা করিলে বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু যেকোন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাক্ষাৎ ভগবান বাসুদেবকে ডাকিলেও সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপাসনাও স্থায়ী ফল প্রদান করে। অজ্ঞলোক ভগবানের বিরাট শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিতেও পারে না। তাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ভগবানে ভক্তি দেখাইলেও ভগবানকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া অতি ক্ষুদ্রাকারে তাহার স্বার্থসাধনোপযোগী করিয়া লয়। যে-ব্রাহ্মণেরা গীতা মুখস্থ করিয়া রাখে, তাহারা জানে 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং...' (অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, বারি—যাহা ইচ্ছা তাহার সাহায্যেই আমার উপাসনা ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত করিলে, তাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি), কিন্তু কার্যকালে মহিষ বলি দিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিতে চায়!

মহম্মদ বহুদেবদেবী পূজাকারীদের মূর্খতা কিছুতেই দূর করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কঠিনভাবে শাসন করিয়া বহুদেবপূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সারা দেশকে মুক্তিলাভের জন্য উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভূত-প্রেতের পূজায় শক্তিক্ষয় করিতে ত্রুটি করে নাই! মানুষের স্বভাব এরূপই বটে। এইপ্রকারেও উপাসনা করিতে করিতে মানুষের উন্নতি হইবে—এই ভাবিয়া ভারতীয় মহাপুরুষগণ এইরূপ দেবতাপূজাতে বাধা দেন নাই। তবে কোন কোন বুদ্ধিমান লোক ভগবানের তত্ত্ব বুঝিয়া সর্বপ্রকার স্বার্থসাধনের জন্যও কেবল ভগবানকেই উপাসনা করিয়া থাকে। ভগবৎ উপাসনার ভান করিয়া কেহ কেহ ভগবানের কোন বিশেষ মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়। ঐ মূর্তি ব্যতীত অন্য মূর্তি কেহ পূজা করিলে তাহাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে এবং তাহারা যে মুক্তি পাইবে না—এই বিষয়ে তাহাদের বুঝাইতে সচেষ্ট হয়। (ইহা বাহ্যত ভগবৎ উপাসনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতা উপাসনাই বটে।)

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥২১॥

শ্লোকার্থ ঃ *যে যে ভক্ত যে যে দেবতাবিশেষকে বা দেবমূর্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করে, সেই দেবমূর্তিতে আমি তাহাকে অচলা ভক্তি প্রদান করি।*

ব্যাখ্যা ঃ যাহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়, তাহাকেই লোকে ভালবাসে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন দেবতার উপাসনা করে, সেই দেবতার উপর তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

[**মন্তব্য ঃ** পাঠান্তরে আছে, 'তস্য তস্যাচলাং ভক্তিং...', অর্থাৎ তাহাকে আমি অচলা ভক্তি প্রদান করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, ভক্ত ঈশ্বরের দিকে এক পা অগ্রসর হইলে ঈশ্বর দশ পা ভক্তের দিকে অগ্রসর হইয়া আসেন। এবং বিভিন্ন মূর্তিতে সেই এক পরমেশ্বরই প্রকাশমান—একথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।—**সম্পাদক**]

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২॥

শ্লোকার্থ ঃ সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধ্য দেবতার উপাসনা করে এবং সেই দেবতার মাধ্যমে একমাত্র কর্মফলদাতা আমারই দ্বারা বিহিত কর্মফল বা কাম্যবস্তু লাভ করে।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তিমান শ্রীহরি বিদ্যমান আছেন। মানুষের অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইলেই তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু মানুষের এই সত্য বুঝিবার শক্তি নাই, তাই তাহারা বাহিরের কোন শক্তিশালী পুরুষের সহায়তায় বাসনাসিদ্ধির চেষ্টা করে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহাদের বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহা ভগবানেরই বিধান। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ দেখেন—তিনিই কর্ম, তিনিই কর্মফল, তিনিই কর্মফলদাতা আবার কর্মফলের ভোক্তাও তিনি। [ক্রমশ]॥ত্রিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ আষাঢ় ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **স্নানযাত্রা**
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
৭ আষাঢ়, বুধবার
(২২ জুন ২০০৫)
রথযাত্রা
আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া
২৩ আষাঢ়, শুক্রবার
(৮ জুলাই ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ ৩, ১৭ আষাঢ়
শনিবার, শনিবার
(১৮ জুন, ২ জুলাই ২০০৫)

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *আমেরিকার সভ্যতা কি সত্যিই পতনের পথে চলেছে? আর তা-ই যদি হয়, তবে কীভাবে তার গৌরবময় পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব? এবিষয়ে বেদান্তই বা কী ভূমিকা পালন করতে পারে?*

উত্তর ঃ আমেরিকায় এমন অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা বর্তমান আমেরিকান সভ্যতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। এমনকি প্রেসিডেন্ট নিক্সন-সহ অনেক রাজনৈতিক নেতাও আমেরিকার সমাজকে 'অসুস্থ' বলেন। হ্যাঁ, ঐ সমাজ আজ অসুস্থ। কিছু অসুস্থতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ তা না হলে আর কী করে সে-সমাজের অপরাধপ্রবণতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ড্রাগ-বিস্ফোরণ, যুববিদ্রোহ ইত্যাদি এবং সার্বিক সামাজিক অসন্তোষ ব্যাখ্যা করা যায়? আসলে, এগুলি হচ্ছে গভীর কোন অসুখের বিপজ্জনক কিছু বহির্লক্ষণ। সমস্যা হলো—অসুখটা ধরা ও তার প্রতিকার করা। আধুনিক সভ্যতার মর্মস্থলে যে 'মানব উৎকর্ষ' বা 'হিউম্যান এক্সেলেন্স'-এর ধারণা আছে, তাকে সামগ্রিকভাবে আরো গভীর করতে হবে; এবং এটাই আলোচ্য সমগ্র সমস্যাটির মূল ভিত্তিভূমি। এইসব বহির্লক্ষণ আসলে 'ফল'মাত্র। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে 'মূল'টিকে। মানুষ আসলে কী? সে স্বরূপত কী? এইসব বিষয়ের সঠিক সন্ধান যদি আমরা না করি, এসবের সঠিক উপলব্ধি যদি আমাদের না হয়, তবে বাইরের কোন প্রলেপে কাজ হবে না। এখানে-ওখানে কিছু জোড়াতালি দিয়ে এ-সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

আর ঠিক এখানেই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে বেদান্ত এক মহান ভূমিকা লাভ করতে চলেছে—যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত এক সুগভীর দর্শনরূপে। এবারের সফরকালে অনেক বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকের সঙ্গে 'বেদান্ত ও আধুনিক ভাবনা' বিষয়ে আলোচনা করেছি। বেদান্ত যে কত অসাধারণ, কত মহান, তা যখন তাঁরা জানতে পারেন, তখন তাঁরা এর সামনে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন।

ওখানে ওঁদের বলেছি যে, ভারতে আমরা এই সুগভীর মানব-দর্শন আবিষ্কার করলেও নিজেরা আজ পর্যন্ত এটির সম্যক্ ব্যবহার করে উঠতে পারিনি। আমাদের এখনো এর কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক দিককে জীবনে রূপায়িত করা বাকি রয়েছে। ঘটনা হলো, আমাদের তুলনায় পাশ্চাত্যের মানুষের দক্ষতা বেশি, শক্তি বেশি। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলেছেন, এই সুগভীর মানব-দর্শনকে ভারতে আমরা যতটা ব্যবহার করতে পেরেছি, পাশ্চাত্য সম্ভবত তার থেকেও ভালভাবে এটিকে ব্যবহার করতে পারবে। বস্তুত, যে-যুগে আমরা বাস করছি, সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি তাদের নিজেদের মধ্যে ভাবের সুন্দর আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিত্যনতুন ও অসামান্য সব উন্নয়ন ঘটাচ্ছে ও ঘটাবে। ভারতীয় ভাবাদর্শের মূল উপাদান—বেদান্তের সংস্পর্শে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় আসছে এক বিশাল পরিবর্তন, বিশাল অগ্রগতি। এই বেদান্তদর্শন আধুনিক বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষের সসম্ভ্রম মনোযোগ আকর্ষণ করে। সর্বত্র আমি এটি দেখেছি—তা সে চেকোস্লোভাকিয়া বা কিউবার মতো কমিউনিস্ট দেশেই হোক কিংবা আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্সের মতো পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেই হোক। বেদান্তের রাজকীয় মহিমা উপলব্ধি করলে চিন্তাশীল মানুষ তার সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়। এই দর্শন এতটাই যুক্তিসিদ্ধ, এতটাই প্রয়োগকুশল, এতটাই সর্বজনীন।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল অধ্যাপক ও ছাত্রের কাছে বেদান্ত নিয়ে বলছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম 'সান মার্কস ইউনিভার্সিটি'। এটি একটি ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়; দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। দুর্ভাগ্যবশত ছাত্র-বিক্ষোভের জন্য বিগত ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি ওখানে গিয়েছিলাম আগস্ট ১৯৬৯-এ। সেখানে বেদান্ত নিয়ে আধঘণ্টা বললাম। তারপর বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক উঠে ভাষণের ওপর মন্তব্য করে আমাকে বললেন ঃ "স্বামীজী, এইমাত্র আপনি যা বললেন, তা কী অদ্ভুত দার্শনিকতাপূর্ণ, যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত! আপনি কি বলতে চান যে, এই দর্শন ভারতে বহু যুগ আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল? এ তো অবাক-করা ব্যাপার!" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, এটি ভারতে চারহাজার বছরেরও আগে তার পূর্ণ রূপ পেয়ে গিয়েছিল।"

আসলে, ভারতের এই অমিত শক্তিধর দার্শনিক অবদানকে পশ্চিম এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। সর্বত্র আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে মানুষ যখন এটি সম্বন্ধে জানতে পারে, তখন এর সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে। আমেরিকায় ও অন্যত্র বহু জায়গায় আমার সুযোগ হয়েছিল পণ্ডিত, অধ্যাপক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বেদান্তদর্শন আলোচনার। দেখলাম, একবার তাঁদের কাছে এর ব্যাখ্যা করলে তাঁরা সত্যিই এই সুগভীর দর্শনের তারিফ করেন—যে-দর্শনের সত্যসমূহ যুক্তিনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও পরীক্ষার মুখে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এইসব চিন্তাবিদের কাছে ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের এই সংজ্ঞাটির বিশেষ আবেদন আছে ঃ "মানুষের মধ্যে আগে থেকেই যে-দেবত্ব আছে, ধর্ম তারই প্রকাশ।" নৈতিকতা বলুন, অপরের জন্য সহমর্মিতা বলুন, নিজেকে উৎসর্গ করার প্রবণতা কিংবা সেবার মনোভাবই বলুন—এসমস্তই আসে মানুষের অন্তর্নিহিত যে-দেবত্ব, তার প্রকাশের পার্শ্বফল বা 'বাই-প্রোডাক্ট'রূপে। মানুষের বৃদ্ধি শুধু তার দৈহিক স্তরে হলে কখনো কখনো সে হয়তো বেশ ভালই থাকে, কিন্তু কখনো কখনো সে আবার নিজের ও অন্যদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতেও পারে। এমনকি সে

উৎপীড়ক-স্বভাবও হয়ে উঠতে পারে, কারণ জৈব বা দৈহিক স্তরে সেটাই মানুষের স্বভাব। বেদান্ত মানুষের উচ্চতর তথা গভীরতর সেই স্বরূপের কথা বলে, যার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে নতুনতর ও বিশুদ্ধতর শক্তির উদ্বোধন ঘটে। এই শুদ্ধশক্তির সহায়ে মানুষ তার জৈব স্তরে উদ্ভূত অন্যান্য শক্তিগুলিকে পরিচালন ও পরিশোধন করার শক্তি অর্জন করে। আধুনিক সভ্যতার দরকার এমনই এক পৃথক শক্তিভাণ্ডার যার সাহায্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা উন্মুক্ত শক্তিগুলিকে সংহত, সৃজনশীল ও উপকারী করে মানুষের সামূহিক কল্যাণে নিয়োগ করা যায়। এইসব কারণে বেদান্তকে আধুনিক বিজ্ঞানভাবনার আলোকে ও আধুনিক সমাজ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন ও প্রচার করলে তা চিন্তাশীল মানুষের কাছে তার স্বকীয় অনিবার্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন ঃ *জাগতিক ব্যাপারে ক্লান্তি বা অবসাদের জন্যই কি সাধারণ আমেরিকানরা যথাযথ আধ্যাত্মিক সাধনার পথে আসছেন বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করছেন।*

উত্তর ঃ আমেরিকার মানুষের পক্ষে যথাযথ ধর্মের সন্ধান পাওয়া বা যথার্থ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ খুব কমই। তাই তারা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক আমেরিকানদের জন্য এধরনের আধ্যাত্মিক খাদ্য প্রদানের ক্ষমতা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলির মোটেই নেই। এবং তারা উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সুযোগ বা পরিবেশও দান করে না। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারধারা গত তিন শতক ধরে নানান সংস্কার করতে গিয়ে খ্রিস্টধর্মের উচ্চতর দিকগুলিকেই ধুয়েমুছে 'সংস্কার' করে নিজেদের কেবল Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association)-তে নামিয়ে এনেছে। একথা আমি বহু সভায় বলেছি। সেইসঙ্গে এটাও বলেছি যে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে Y.M.C.A খুবই মহান, কিন্তু খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা তার চেয়ে মহত্তর। ওদেশে চার্চগুলি অবশ্য মাঝেমধ্যেই লোকে ভর্তি থাকে। এর কারণ—চার্চগুলি তাদের কর্মপন্থার পরিবর্তন করেছে। আধ্যাত্মিক খাদ্য পরিবেশনের পরিবর্তে আজ তারা কিছু সামাজিক কাজকর্মের কথাও বলছে বা ঐধরনের কাজ করছে। ... চার্চের ক্রিয়াকলাপের বেশির ভাগটাই এইরকম—যাকে তারা বলে 'সামাজিক কাজ' বা 'সমাজ-সংযোগ'। অনেক সভায় আমায় বলতে হয়েছে যে, লোকে চার্চে আসে আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির আশায়, অথচ চার্চগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি তা না হয়, তবে তাদের আর সার্থকতা কী? মানুষকে অন্যান্য পরিপুষ্টি দিতে ও তাকে অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত করতে তো কতই সংগঠন আছে। কিন্তু চার্চগুলি যদি তার আত্মার প্রয়োজন না মেটায়, তবে মানুষটা ভিতরে ভিতরে অপূর্ণ থেকে যায়। এমনকি ক্যাথলিক চার্চগুলিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তারাও আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে উত্তরোত্তর আরো বেশি করে সামাজিক কাজকর্মে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে।

আমেরিকায় মানুষের আজ যা দরকার তা কোন সামাজিক কার্যকলাপ নয়; দরকার আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি—যাতে সে গভীরভাবে পরিতৃপ্ত বোধ করতে পারে। এটা গাছে জল দেওয়ার মতো। অনেক বক্তৃতায় আমি বলেছি—"গাছে জল দিতে হলে লোকে ফুলফলে জল দেয় না; জল দেয় মূলে—তাতেই সমগ্র গাছে জল দেওয়ার কাজ হয়।" সেইরকম, মানুষেরও আমূল পরিপুষ্টি বলে একটি ব্যাপার আছে, আর সেটিই ধর্ম; যে-ধর্ম কোন সম্প্রদায়গত বস্তু নয়, যে-ধর্ম আসলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা। ওটি দিতে পারলে অন্য সবকিছুর ব্যবস্থা আপনিই হয়ে যায়। আমেরিকায় অল্প কয়েকটি সংগঠন আছে, যেগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাদের কাজকর্মও ক্রমশ কমে যাচ্ছে; কতকগুলিকে বন্ধ করেও দেওয়া হচ্ছে। এইসব সংগঠনও কিন্তু একটা প্রতিবাদ; অত্যধিক জাগতিক আসক্তি ও তা থেকে উৎপন্ন অবসাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পেণ্ডুলাম যেমন একদিক থেকে দুলতে দুলতে অপরদিকে চলে যায়, এও তেমনি সামাজিক পেণ্ডুলাম বা দোলকের দুলতে দুলতে অপর এক প্রান্তসীমায় চলে যাওয়া। অতীতে মানুষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় জায়গাতেই দোলকের এই দুটি 'প্রান্ত'কে (অর্থাৎ আসক্তি ও উপেক্ষা) নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু গীতায় বা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে যে-বেদান্ত পাওয়া যায়, তা এই শেষোক্ত 'প্রান্ত'টিকে অনুমোদন করে না।

আমার যে-তিরিশটি বক্তৃতার বিষয়তালিকা ওদেশে বিতরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটিকে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করেছিল; সেটি হলো—'শিল্পযুগে আধ্যাত্মিক জীবন'। গীতার শিক্ষা হলো ঃ কাজের মধ্যে থেকেও তোমার নিজের আধ্যাত্মিক স্বরূপ উপলব্ধি কর। এ-ই হলো এযুগের উপযুক্ত পদ্ধতি, এ-ই হলো ব্যাবহারিক আধ্যাত্মিকতা। আমেরিকানদের আজ এটাই প্রয়োজন। সেইসঙ্গে দরকার মাঝেমাঝে আধ্যাত্মিক শিবিরের মাধ্যমে গভীরতর কোন উপলব্ধি অর্জন। আর তাতেই আসবে অন্তরের মহান পরিপুষ্টি। তাদের যখন এই অভিজ্ঞতা হয়, তখন তারা বলে—এ এক অসামান্য উপলব্ধি।

ভারতবর্ষেও এটি সত্য। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের অনেকে ধর্ম বলতে সেটাই বোঝে, যেটা তারা তাদের মা-ঠাকুমা বা পাড়া-প্রতিবেশীদের করতে দেখেছে—সকালে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করা, মন্দিরে যাওয়া, ফুল দেওয়া ইত্যাদি। এধরনের ব্যাপারে যুবসম্প্রদায় আস্থা হারাচ্ছে; বিশেষত যখন তারা এইসব মানুষের কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণমাত্রও দেখছে না। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, প্রকৃত ধর্ম হলো নিজের আন্তর সত্তার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সত্যকার আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিলাভ—তখন তারা বোঝে, এটি একটি অসাধারণ ব্যাপার। তখন তারা আরো বেশি করে এই উপলব্ধি লাভ করতে চায়। ভারতেও আজ আমাদের প্রয়োজন ধর্মের প্রতি এই উপলব্ধিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—এই আন্তর সংযুক্তির অনুভব। আজ এইসব বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন, এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা এধরনের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। এমনকি আমরা সাধারণভাবে যাঁদের 'ধার্মিক' বলে ভাবি না, তাঁরাও আজ এগুলি বুঝতে চাইছেন, উপলব্ধি করতে চাইছেন।

[ক্রমশ]

মিনার্ভা থিয়েটার

অরিন্দম দাস

শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন অধুনা-প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন অরিন্দম দাস। এবার ত্রিংশতম পর্যায়।—সম্পাদক

"মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন; আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী মা আমার এই দেশের রঙ্গালয়ে কোন পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না, সে-দয়ার পাত্রপাত্রী নাই, সে-দয়া বিচার করে না, ব্যাবহারিক জগতের কোন বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"[১]—লিখেছেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাস্তবিক তাই। পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা বঙ্গরঙ্গালয়ের নামী-অনামী বেশ কিছু অভিনেত্রীকে নির্দ্বিধায় আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়ে শুধু তাদেরই স্নেহ ও মর্যাদা দান করেননি—বঙ্গরঙ্গমঞ্চকেও পবিত্রীকৃত করেছেন সেখানে বারংবার পদার্পণ করে। স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র অভিনীত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসে রঙ্গমঞ্চকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি ও কৌলিন্য দান করেছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা পরবর্তী কালে অন্তত ন'বার শুভাগমন করেছেন বঙ্গরঙ্গালয়ে। ধন্য হয়েছে রঙ্গভূমি, ধন্য হয়েছেন শিল্পিকুল।

শ্রীশ্রীমা প্রথম রঙ্গালয়ে আগমন করেন সম্ভবত উনিশ শতকের শেষ পর্বে উত্তর কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে (৬ নং বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬) গিরিশচন্দ্র লিখিত ও অভিনীত 'দক্ষযজ্ঞ' দর্শন উপলক্ষ্যে। 'সম্ভবত' বলার কারণ, শ্রীশ্রীমায়ের এখানে আগমনের তারিখ এবং স্থানটি যে মিনার্ভা থিয়েটার, সেসম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য তাঁর কোন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর গ্রন্থে একটি পাদটীকায় শুধু জানিয়েছেন: "দক্ষযজ্ঞ অভিনয় দর্শনে মা ভাবাবিষ্টা হইয়াছিলেন।"[২] সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণ, 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে 'দক্ষ' গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের কাল এবং শ্রীশ্রীমায়ের কলকাতায় বসবাসের সময় হিসাব করে আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, সময়টি ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ এবং স্থান—মিনার্ভা থিয়েটার।[৩]

তবে দ্বিতীয়বার অভিনয় দর্শন উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের মিনার্ভা থিয়েটারে আগমনের কথা তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বহু অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, তারিখটি ২৫ জানুয়ারি ১৯০৫, বুধবার।[৪] সেদিন অভিনীত হয়েছিল ভক্তিভাবের নাটক—'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'। ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে তাঁরই লেখা এই নাটকটি দেখতে যান। এই সম্পর্কে আশুতোষ মিত্র লিখেছেন: "একদিন গিরিশচন্দ্র শ্রীমাকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যান এবং রয়েল বক্সটি তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দেন। বড় হাতপাখার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' অভিনয় হইতে থাকে। গিরিশচন্দ্র 'ভণ্ড সাধক'রূপে দেখা দিলেন। যখন থাকমণিকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবেনই শিখাইবেন বলিলেন, শ্রীমা হাসিতে হাসিতে মন্তব্য করিলেন, 'এবয়সে আর কেন?' আবার বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেম দৃষ্টে 'আহা! আহা!' করিলেন।"[৫]

মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীশ্রীমা তৃতীয়বার আগমন করেন ১ মার্চ ১৯০৫ গিরিশচন্দ্র লিখিত ও অভিনীত সেকালের আরেক মঞ্চসফল নাটক 'জনা' দর্শন করতে।[৬] এপ্রসঙ্গে ডাঃ

বিস্মৃতির আড়ালে মিনার্ভা থিয়েটার • আলোকচিত্র: ডি. ডি সাহা

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "গিরিশ একদিন মাকে 'জনা' অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। গিরিশ নিজে হইতেন বিদূষক। বিদূষক দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা হাসছেন যে, কেমন দেখছেন?' মা উত্তরে বলিলেন, 'যা দেখছি, তা তো ওরই চরিত্র। আমি তো জানি, ওর ঐরকমই বিশ্বাস—ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। আবার বকেও।' "[৭]

শ্রীশ্রীমা চতুর্থবার মিনার্ভা থিয়েটারে আসেন ২২ এপ্রিল ১৯০৬ গিরিশচন্দ্র লিখিত ও অভিনীত বিখ্যাত নাটক 'চৈতন্যলীলা' দেখতে।[৮] এসম্পর্কে আশুতোষ মিত্র লিখেছেন: "পূর্বরাত্রে শ্রীমা 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের বন্দোবস্তে তাঁহার বসিবার জন্য রয়েল বক্স ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বহুদিন পরে মাত্র সেই রাত্রের জন্য 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে। 'জগাই'—অর্ধেন্দুশেখর এবং 'মাধাই'—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসরগ্রহণ করিলেও ভূষণ[কুমারী] শ্রীমার জন্য বিনা বেতনে 'নিমাই'রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন, আর 'নিতাই'-রূপে সুশীলা[বালা]। অভিনয়ের পূর্বে এই দুইটি অভিনেত্রী শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যান। ঐবিষয় আলোচনা করিতে করিতে শ্রীমা বলিতেছেন, 'মেয়েটিকে [ভূষণকুমারী] দেখলুম ভক্তিমতী—ভক্তি না থাকলে কি হয় গা? নিমাই—তা ঠিক নিমাই—কে বলবে, মেয়েমানুষ?' আবার জগাই-মাধাইয়ের বিষয় বলিতেছেন, 'ওদের মতো ভক্ত কে? রাবণের মতো ভক্ত কে? হিরণ্যকশিপুর মতো ভক্ত কে? এই যে গিরিশবাবু ঠাকুরকে কত গাল দিতেন; তা ওঁর মতো ভক্ত কে? এঁরা সব ঐভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা? ভক্তি কি এমনি হয়?' "[৯]

এরপর শ্রীশ্রীমা মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়েছিলেন 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনয় দেখতে। এটি ছিল তাঁর পঞ্চমবার আগমন। স্বামী শান্তানন্দ সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখছেনঃ "সেদিন ছিল ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনোপলক্ষ্যে থিয়েটার সকাল সকাল আরম্ভ হবে বলেই আমরা সব তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।... আজ সন্ধ্যে ৬টায় হবে থিয়েটার আরম্ভ।

"আগে থেকেই গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমার বসবার সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমার জন্য Box প্রস্তুত ছিল। একটি বক্সে শ্রীশ্রীমা ও অন্য পাশে আমরা সব বসেছিলাম। আমি ছিলাম ঠিক শ্রীশ্রীমার কাছের বক্সেই। সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্ডবগৌরব' ও 'রঙ্গরাজ'। প্রথমেই পাণ্ডবগৌরব আরম্ভ হলো। থিয়েটার যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, গিরিশবাবু তার জন্য ব্যস্ত। শ্রীশ্রীমা এসেছেন আজ তাঁর অভিনয় দেখতে, কত আনন্দ তাঁর!

"পাণ্ডবগৌরবে গিরিশবাবু করছিলেন কঞ্চুকীর অভিনয়। ... শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে সব দেখে যাচ্ছেন, কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছেন না।... দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে কথা বলতে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।' গিরিশবাবুর অভিনয়ের সময় মাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যাচ্ছিল।... দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র একত্র হলো। তখনি হলো উর্বশীর মুক্তি। দেবীর সহচরী যোগিনীগণ তখন গান ধরছেন—'হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে...'।

"এতক্ষণ শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে দেখছিলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীরভাবে মগ্ন হয়ে স্থির হয়ে গেলেন। এইভাবে সমাধিতে শ্রীশ্রীমা অনেকক্ষণ ছিলেন।

"পাণ্ডবগৌরবের শেষপর্যন্ত অভিনয় শ্রীশ্রীমা দেখলেন। তখন অনেক রাত হয়েছে। সেজন্যে 'রঙ্গরাজ' অভিনয় না দেখেই ফিরবার জন্য উঠে পড়লাম আমরাও। উদ্বোধনে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দেড়টা।"[১০]

১২ জুলাই ১৯১০ মিনার্ভা থিয়েটারে কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যার্থে আয়োজিত এক বিশেষ অভিনয়-রজনীতে অভিনীত হয় 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' এবং 'জনা'। এই উপলক্ষ্যে ষষ্ঠবারের জন্য মিনার্ভা থিয়েটারে পদার্পণ করেন শ্রীশ্রীমা। বলা বাহুল্য, নাটক-দুটি তাঁর এবার দ্বিতীয় দর্শন। এরপরেও তিনি আরেকবার 'জনা' দেখেছিলেন, তবে সেটি বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের দেখা নাটক-গুলির যে-তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে 'কালাপাহাড়' অন্যতম। গিরিশচন্দ্র রচিত নাটকগুলির মধ্যে এটিই শ্রীশ্রীমায়ের দেখা সর্বশেষ নাটক। অবশ্য ততদিনে গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত হয়েছেন। তবে শ্রীশ্রীমা কবে, কোথায় এবং কার সঙ্গে এই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না। নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শ্রীশ্রীমা এই নাটক দেখেছেন 'মনোমোহন থিয়েটার' (৬৮ নং বিডন স্ট্রিট)-এর উদ্বোধনের (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫) 'অনেক পরে'।[১১]

অষ্টমবার শ্রীশ্রীমা নাটক দেখতে আসেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। তারিখটি অজ্ঞাত। এদিন তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে এসেছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'রামানুজ' নাটক দেখতে। তাঁর অন্যতমা সঙ্গিনী সরলাদেবী—পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা লিখেছেনঃ "সেদিন 'রামানুজ' অভিনয় ছিল। মা, যোগেন-মা ও গোলাপ-মাকে অপরেশবাবু তিনতলার বিশেষ আসনে বসাইলেন। মা হৃষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। একটি দৃশ্য ছিল—রামানুজকে তাঁহার গুরু দীক্ষাদানের সময় বলিতেছেন, 'এই মন্ত্র তুমি কাউকে বলবে না। যে এই মন্ত্র শুনবে, সে-ই মুক্ত হয়ে যাবে; কিন্তু তোমাকে নরকভোগ করতে হবে।' মহাপ্রাণ রামানুজ ইহা শুনিয়াও লোককল্যাণ কামনায় উচ্চৈঃস্বরে সেই সিদ্ধমন্ত্র সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। ঐ দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতে মা একেবারে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। রামানুজের ভূমিকায় তারাসুন্দরী অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ দৃশ্যের পর তিনি মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। কিন্তু মা তখন একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। গোলাপ-মা মাকে কয়েকবার জোরে জোরে ডাকার পর তাঁহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান আসিলে তারা[সুন্দরী] তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মা কিন্তু তারাকে প্রকৃত রামানুজ-জ্ঞানে কোলে

বসাইয়া চুম্বন করিলেন। গোলাপ-মা বলিতে লাগিলেন, 'আহা, তারার কী ভাগ্য! তারার কী ভাগ্য!' অভিনয় শেষ হইবার পর সকল অভিনেত্রীই মাকে প্রণাম করিল, মাও সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহারা ইহার পরেও মাঝে মাঝে উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করিতে আসিতেন।"[১২]

প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ থাকতেন বাগবাজারে অধুনালুপ্ত ২৭ নং হরলাল মিত্র স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে। তিনি শ্রীশ্রীমাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর একান্ত আগ্রহে তাঁরই লেখা 'কিন্নরী' গীতিনাট্য দেখতে শ্রীশ্রীমা শেষবারের মতো পদার্পণ করেন মিনার্ভা থিয়েটারে। দিনটি ছিল ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ (২২ ভাদ্র ১৩২৫), রবিবার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের) ১২ কার্তিক কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (বিধান সরণি) নির্বাক চলচ্চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।[১৩] শ্রীশ্রীমায়ের চলচ্চিত্র দর্শন এই একবারই ঘটেছিল। তবে সেদিনের কোন বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সিনেমা হলটির নাম কী? কালীশ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ম্যাডান কোম্পানি শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও বিধান সরণির মোড়ের কাছে 'ক্রাউন' ও 'কর্ণওয়ালিস' নামে দুটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। পরে এ-দুটির নাম হয় যথাক্রমে 'শ্রী' এবং 'উত্তরা'।[১৪] এছাড়া এই অঞ্চলে আর কোন সিনেমা হল ছিল না। সুতরাং শ্রীশ্রীমা যে এ-দুটির মধ্যে একটি সিনেমা হল-এ এসেছিলেন—এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। কিন্তু সেটি কোন্‌টি? আমাদের ধারণা—'উত্তরা', যার পূর্বনাম ছিল 'কর্ণওয়ালিস'। তবে এবিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। কালীশ মুখোপাধ্যায় আরো জানিয়েছেন, বাঙলায় সর্বপ্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' মুক্তি পায় কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর। তারও আগে ম্যাডান কোম্পানির ম্যানেজার রুস্তম বম্বে থেকে হিন্দি চিত্র আনিয়ে বাঙলা টাইটেল সংযোগ করে দেখাতেন। সেকালের বিখ্যাত হিন্দি চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাদাভাই ফালকে প্রযোজিত 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম', 'কালীয়দমন', 'লঙ্কাদহন' প্রভৃতি।[১৫] সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, শ্রীশ্রীমা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যে-চলচ্চিত্রটি দেখেন, সেটি বাঙলা টাইটেল সংযোজিত হিন্দি চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম'। দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'উত্তরা' প্রেক্ষাগৃহটি মোটামুটি অবিকৃত থাকলেও সেটি এখন 'শপিং সেন্টার'-এ পরিণত হয়েছে।

আনন্দরূপিণী শ্রীশ্রীমা এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গরঙ্গালয়ে পদার্পণ করে যেমন নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছেন, তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির এই পীঠস্থানকে তার প্রার্থিত সম্মান ও গৌরব দানে ধন্য করেছেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা থিয়েটারে বর্তমানে কোন অভিনয় প্রদর্শিত হয় না। নানা সমস্যায় জর্জরিত এই বিখ্যাত নাট্যশালাটি শুধু দাঁড়িয়ে আছে অতীত গৌরবের নীরব সাক্ষী হিসাবে। যাঁর পবিত্র পাদস্পর্শে তার শরীর একসময় বারবার স্পন্দিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত—তাঁর দুঃসহ অনুপস্থিতিতেই বোধ করি সে আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নাট্যসমাজ থেকে। ❑

পথনির্দেশ : ঠিকানা—৬ নং বিডন স্ট্রিট (বর্তমানে স্বামী অভেদানন্দ সরণি), কলকাতা-৭০০০০৬। উত্তর কলকাতায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ এবং বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে পশ্চিমদিকে বিডন স্ট্রিট ধরে কিছুটা এগোলে বাঁদিকে রাস্তার ওপরেই পড়বে মিনার্ভা থিয়েটার।

তথ্যসূত্র

(১) উদ্ধৃত : পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস, ক্যাম্পার্স—কেশব একাডেমি, কলকাতা-৬, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮০; (২) শ্রীশ্রীসারদা দেবী, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১০ম সং, পৃঃ ১৫২; (৩) পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়, পৃঃ ৪০; (৪) ঐ, পৃঃ ৪৪; (৫) শ্রীমা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫১, প্রকাশক : সন্তোষকুমার ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ ৫৭; (৬) পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়, পৃঃ ৪৭; (৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, প্রকাশক : যতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, জুন ১৯৫৩, পৃঃ ৭৭-৭৮; (৮) পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়, পৃঃ ৫৬; (৯) শ্রীমা, পৃঃ ১৯৩-১৯৪; (১০) মাতৃদর্শন, ১ম সং, পৃঃ ৩০-৩২; (১১) পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়, পৃঃ ৭৪; (১২) মাতৃদর্শন, পৃঃ ৭৪-৭৫; (১৩) দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদাদেবী, পৃঃ ১৫২; (১৪) দ্রঃ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, রূপমঞ্চ প্রকাশিকা, ১ম সং, পৃঃ ৩৩; (১৫) ঐ, পৃঃ ২৫।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সমাধান : শব্দচেতনা ৪৫

পাশাপাশি : (১) অক্ষয়কুমার সেন, (৪) রতন, (৬) তারক, (৮) হজম, (১০) সারু, (১১) নিরাকার, (১৩) নটবর, (১৫) মন্দ, (১৭) কমল, (১৮) রজনী, (১৯) কালনা, (২২) শশীভূষণ সান্যাল।

ওপর-নিচ : (১) অবতার, (২) কুঞ্জ, (৩) নর, (৫) তত্ত্বসার, (৭) কয়াপাট, (৯) মথুরা, (১২) কাশীপুর, (১৩) নন্দলাল, (১৪) বণিক, (১৬) চুনীলাল, (২০) নাশ, (২১) ত্রাণ।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন :

রমা রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ মাণ্ডি, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়*

(২৪ মে কাজি নজরুল ইসলামের জন্মদিবস স্মরণে প্রকাশিত)

○ উন্মেষ পর্ব ○

কাজি নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি এক অন্তর্লীন অধ্যাত্মপ্রবাহে পূর্বাপর মগ্ন ছিলেন এবং তাঁর জীবনের বহুবর্ণ কর্মপ্রবাহে বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর দ্রোহচেতনার নিরিখে মনে হতে পারে, ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ তথা নাস্তিকতা নজরুল-সাহিত্যের অন্যতম বনিয়াদি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু নিবিড় দৃষ্টিপাত প্রমাণ করে ঈশ্বর নয়, ধর্ম-ব্যবসায়ীরাই ছিলেন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। ধর্মের লোকায়ন উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনের সেই অনুষঙ্গ, ধর্ম-সমন্বয়ের সেই মহান চেতনা ছোট বয়স থেকেই নজরুলের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল।

যেকোন মানুষের বেড়ে ওঠার পিছনে পরিবারের নিয়ামক ভূমিকা থাকে। সম্রাট শাহ আলমের আমলে নজরুলের পূর্বপুরুষরা কিছু লাখেরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি পেয়ে হাজিপুর থেকে চলে আসেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। এখানে তাঁরা কাজির কাজে নিযুক্ত হন। সেসময়ে কাজিরা ছিলেন বিচারব্যবস্থার একটি প্রধান স্তম্ভ। কাজি পরিবার এই গুরুদায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করতেন। ধর্ম ও অর্থের দ্বারা প্ররোচিত হতেন না। একারণেই নজরুলের বাবা কাজি ফকির আহমদ নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিলেন, তবু সততা ও ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। ফারসি ভাষার চর্চাও তিনি অল্পস্বল্প করতেন। তাঁর ভাই কাজি বজলে করিম ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর লেটোগানের বড়সড় একটি দলও ছিল। মোটের ওপর চুরুলিয়ার কাজি পরিবার ছিল ধর্মনিষ্ঠ ও সংস্কৃতিমনস্ক।

এই ধারা নজরুলের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। ছোট বয়সে তাঁর নাম ছিল 'দুখুমিয়া'। 'তারাক্ষেপা' নামেও অনেকে ডাকত। প্রাণচঞ্চল বালকটির মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্পৃহা যেমন জাগ্রত ছিল, তেমনি ছিল ধর্মভাব। হিন্দু-মুসলমান ভেদজ্ঞান তাঁর ছিল না। কোরান শরিফের পাশাপাশি রামায়ণ-মহাভারতও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করতেন। তাঁর ধর্মচেতনার উৎসকথা আমরা জানতে পারি তাঁর বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ঃ

"বাল্যকাল থেকেই নজরুলের একটা ধর্মোন্মাদনা ছিল। এই উন্মাদনার বশে তিনি কখনো হিন্দু, কখনো মুসলমান ধর্মের মহান ভাবকে নানারকম কঠোর আচরণের মাধ্যমে লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ির পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড়, আর দক্ষিণে রয়েছে পীরপুকুর। এই পীরপুকুর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, হাজি পালোয়ান নামে এক শক্তিমান ফকির ঐ দিঘিটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাই তাঁর নামে পীরপুকুর হয়েছে। এই পুকুরের পূর্বপারে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। ছেলেবেলায় নজরুল ঐ মসজিদের ও হাজি পালোয়ানের মাজারে [মহৎ লোকের কবর] খাদেম ছিলেন। খাদেম-এর মানে সেবাইত। সেই বাল্যকালে নজরুল ইসলাম যে কত নিষ্ঠার সঙ্গে, আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে ধর্মাচরণ করতেন, তা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মুখে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিছুদিন মসজিদে এমামতি (নামাজে নেতৃত্বদান)-ও করেছিলেন। হাজি

** শ্রীরামপুর-নিবাসী, কবি নজরুল বিষয়ে গবেষক, সরকারি কর্মী।*

পালোয়ানের মাজারে যখন সেবাইত ছিলেন, তখন তিনি হাজির দর্শন এবং কথা শুনতে পেতেন। একথা কবিকে তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে বলতে শুনেছি।"[১]

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে ধর্মচেতনার অনুষঙ্গ যাঁরা মেলাতে পারেন না, তাঁরা যদি কবির বালক বয়সের এই ঘটনাগুলি মনে রাখেন তবে কোনরকম সংশয় তৈরি হওয়ার কথা নয়। ভারতবর্ষের মাটি বহু সাধকের চিরায়ত সাধনার ভূমি। এখানে মানুষের সংস্কারে মিশে থাকে ধর্মবোধ, কারো কারো মধ্যে তা জারিত হয় বৃহত্তর অনুভবের ভূমিতে। নজরুলের মধ্যে বৃহত্তর এই অনুভব কাজ করেছিল জন্মাবধি। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা কোনরকম পথভ্রষ্ট প্রতিভার ফসল নয়, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক এক দৈবী প্রণোদন।

মাত্র ৯ বছর বয়সে নজরুল তাঁর বাবাকে হারান (৮ এপ্রিল ১৯০৮)। স্বাভাবিকভাবেই সংসারের চাপ এসে পড়ে কাঁধে। মা জাহেদা খাতুনকে সাহায্য করার দায়বদ্ধতা কাজ করেছিল বালক নজরুলের মধ্যে। তিনি কাকা বজলে করিমের দলে নাম লিখিয়ে নেমে পড়েন লেটোর আসরে। লেটো হলো একপ্রকার লোকনৃত্যগীত। নৃতুক্ বা নর্তুক > নটুঅ/নাটুঅ > নাটুয়া > নেটো > লেটো—এই পর্বানুক্রম। লুটো, লোটো, ভাঁড়যাত্রা নামেও এর পরিচিতি আছে। তরজা জাতীয়, হাস্যরসপ্রধান ও ধর্মাচারবর্জিত গীতিবহুল এই পালাগানে নজরুল খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের অফুরান রসদ। লেটো গানের শক্ত জমি তাঁকে পরবর্তী জীবনে লোকাশ্রয়ী কবি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

নজরুল যে আজও মানুষের এত কাছের লোক, তার নানা কারণ আছে। অন্যতম একটি কারণ হলো পৌরাণিক জ্ঞানের গভীরতা ও সাহিত্যে তার প্রয়োগ। লেটোপর্বেই এই অনুশীলন শুরু হয়েছিল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"কবির লেখা কাব্য, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি পড়লে দেখা যাবে, তাঁর মধ্যে গ্রিক, রোমান, মুসলিম, হিন্দু প্রভৃতি পৌরাণিক জ্ঞানের গভীরতা কত ছিল। গানের মধ্যে যোগিজীবনের কথা, তাঁদের সাধনার গোপন তত্ত্বের ইঙ্গিত কত সহজভাবে দিয়েছেন। এই অভ্যাসটা এসেছে কবির লেটোর দল থেকে। কথকরা যেমন পৌরাণিক উপমা, প্রবাদবাক্য, প্রচলিত উদাহরণমূলক গল্প দ্বারা বিষয়কে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন, নজরুলের লেখাও সেই ধারায় এসেছে ঐ লেটোর দল থেকে। পড়াশোনার সঙ্গে চাই অনুভূতি, বেগবান আবেগ, সর্বতোমুখী দরদ ও চাই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি। এসবকটা গুণই কবি নজরুলের বাল্যকাল থেকে ছিল। যেখানে কথকতা হতো, কীর্তন হতো, যাত্রাগান হতো, মৌলবিরা কোরানের ব্যাখ্যা মিলাতসরিফ করতেন, সেখানে বালক দুখুমিয়া গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। অন্যান্য বালক ও বালিকারা দুষ্টামি করত, কিন্তু কবি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন।

"বালককাল থেকেই ধর্ম-প্রবণতা তাঁর মধ্যে প্রখর গতিতে ফল্গুধারায় প্রবাহিত হতো। শুনেছি বাল্যকালে তিনি কঠোর উপবাসের ভিতর দিয়ে নামাজের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টা করতেন।"[২]

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুলের ছোট বয়সের বন্ধু ছিলেন না। কিন্তু তিনি নজরুলের থেকে মাত্র ৬ বছরের (জন্ম ১৯০৫) ছোট ছিলেন। তাই দুজনের অন্তরঙ্গতা ছিল। কবির জীবনী লেখার সময়ে চুরুলিয়ার প্রাচীন মানুষজনের কাছে তিনি অনেক কথা জেনেছিলেন। কবির কিশোর বয়সের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও নানা কথা শুনেছিলেন। এইসব কারণে নজরুলের উন্মেষকালের ভাবচিত্রটি তিনি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। নজরুলের ধর্মচিন্তা নিয়ে নানা মহলে চাপান-উতোর থাকলেও প্রাণতোষবাবুর বক্তব্যকে কেউ ফেলে দিতে পারেননি। তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও বুঝতে পারি, নজরুলের ধর্মচিন্তা জীবনের কোন একটি পর্যায়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোন ব্যাপার নয়। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অধ্যাত্মবাদের প্রতি সক্রিয় আকর্ষণ ছিল। শাস্ত্রপাঠ, উপবাস, নামাজ পাঠ, খাদেমি, এমামতি, মিলাতসরিফ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন।

○ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ○

১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন সর্বধর্মসমন্বয় আন্দোলনের মহান চেতনা। নজরুল যখন জন্মগ্রহণ (২৪ মে, ১৮৯৯) করেন, স্বামীজী ততদিনে গোটা পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভারত জেগে উঠেছে নতুন করে। পাশাপাশি আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে ১৮৮৫ সালে। সেটি হলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক গণ-আন্দোলন। এই ঘটনা-দুটি বালক নজরুলকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, এমন নয়। কিন্তু তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অভিমুখ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তাঁর জন্মগ্রহণের সমসময়ে

ভারতবর্ষব্যাপী যে ভাবপ্রবাহ চলেছিল, তার প্রভাব প্রথমে পরোক্ষভাবে এবং পরে প্রত্যক্ষ অভিযোজনে তাঁকে চালিত করে।

লেটোপর্বেই তাঁর এই ভাবচেতনা আমরা দেখতে পেয়েছি। বাংলার গ্রামে গ্রামে জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি সহজ অবস্থান আছে। ভেদবুদ্ধির প্রখরতা থাকলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার বীভৎসতা নেই। লেটো গানে বাংলার লোকায়ত জনসমাজের চিত্র ফুটে উঠত। তবে বেশির ভাগ লেটো গানই ছিল শ্লীলতাবর্জিত, মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবেশিত। ফলে আমাদের জাতিসত্তার মূল সুরটি তাতে ফুটে উঠত না। নজরুলের চাচা কাজি বজলে করিম লেটো গানকে পরিশীলিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে নজরুল লেটো গান ও পালায় পূর্বাপর রুচিশীলতার পরিচয় দেন। আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান জনসমাজের ধর্মীয় চেতনাকে একজায়গায় নিয়ে এসে ভেদবুদ্ধির সীমারেখা তিনি মুছে দেন। নজরুল অসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন। ছোটবয়সেই নানাধরনের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় আন্দোলন তাঁর মনে পরোক্ষ প্রভাব ফেলে থাকবে—এমন অনুমান অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। হাজি পালোয়ান নামের শক্তিমান সাধুটির অখণ্ড ভাবচেতনাও তাঁকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। পাশাপাশি হিন্দু পুরাণ ও কাব্যাদি এবং ইসলামি ঐতিহ্যের মূল সুর তাঁর হৃদয়ে এক সমন্বয়ী ধর্মপ্রবাহ সঞ্চার করেছিল।

নজরুল যে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করেছিলেন এবং যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে তা শুনেছিলেন, তাঁর পালাগানে তার পরিচয় আছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন 'দাতা কর্ণ', 'যুধিষ্ঠির' ও 'শকুনি বধ'। রামায়ণ অবলম্বনে লিখেছিলেন 'মেঘনাদ বধ'। এই পালাটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষারীতির প্রভাবও আছে। মহাকবি কালিদাসকে নিয়ে 'কবি কালিদাস' এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাট আকবরকে নিয়ে 'আকবর বাদশা' পালা লিখেছেন। এছাড়া 'রাজপুত্র' নামে একটি লেটো নাটক ও 'চাষার সঙ', 'ঠগপুরের সঙ' প্রভৃতি প্রহসন লিখেছেন।

নজরুলের লেটো গানের হাতেখড়ি তাঁর চাচার কাছে হলেও ওস্তাদ শেখ চাকর গোদার কাছেও নজরুল অনেক কিছু শিখেছিলেন। গোদাকে তিনি গুরু বলে মানতেন এবং তাঁর দলে যোগ দিয়ে বেশ কিছু পালাগান লিখেছেন। পালাগানের শুরুতে ঈশ্বর ও গুরুবন্দনার রীতি চালু আছে। 'আকবর বাদশা' পালার শুরুতে গুরু গোদার আদেশে নজরুল এই বন্দনাগানটি লিখেছিলেন ঃ

"সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারীতালা,
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে আলা,
সকল পীর আর দেবতা কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোয়া কর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ ওজালা
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারীতালা
তোমারই ওগো বারীতালা।"[৩]

একজন মুসলমান পালাকার বারীতালা বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বন্দনা করবেন এবং বিশ্বনবী হজরত মহম্মদের নামে দরুদ (প্রার্থনাসূচক মন্ত্রোচ্চারণ) পড়বেন—এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। পীর-পয়গম্বরদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু হিন্দুর দেবতাকুলের উদ্দেশেও তিনি বন্দনাগীতি গাইবেন এবং তাঁদের কাছেও শক্তি প্রার্থনা করবেন—এমন সহজিয়া তত্ত্বটি বড় সহজ নয়। হিন্দুপ্রধান গ্রামের একপ্রান্তে থাকেন মুসলমান, মুসলমানপ্রধান গ্রামে হিন্দুও প্রান্তবাসী। সমাজের এই অচলায়তনের মাঝে দাঁড়িয়ে নজরুল কেমন করে লিখলেন এমন সর্বধর্মসমন্বয়ী বন্দনাগীতি, তা ভাবলে অবাক হতে হয় বৈকি! ছোটবয়সের অধ্যাত্মচেতনা এবং শক্তিপ্রবাহের (হাজি পালোয়ানের দর্শন, কণ্ঠস্বর শ্রবণ ইত্যাদি) কথাও মনে আসে। নজরুল-চরিতকার আজহারউদ্দিন খানও লিখেছেন ঃ

"শোনা যায় ঐসময় (বালক বয়সে) কাবার উপবাস ও নামাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টা করতেন। পীরের খাদেম হয়েও তিনি ঐবয়সেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ভাগবত তন্ময়চিত্তে পড়তেন। কাছাকাছি যেসব সাধুসন্ত থাকতেন, তাঁদের আস্তানা আখড়ায় গিয়ে সাধনভজন লক্ষ্য করতেন এবং সেগুলি তখন থেকেই নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি উধাও হয়ে যেতেন, আউল-বাউল-সুফি-দরবেশ-সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুদিন থেকে আবার বাড়ি ফিরতেন। চালচলনে উদাসীনতা দেখে প্রতিবেশীরা কবিকে ডাকত 'তারাক্ষ্যাপা' বলে এবং মাঝে মাঝে 'নজর আলি' বলেও ডাকত।"[৪]

অধ্যাত্মচেতনার এই প্রবাহ নজরুলকে মহত্তর অনুভবে প্রাণিত করেছে। যেসময়ে সামাজিক ক্লেদ ও গ্লানি চটুল লেটোগানের বিষয় হতো, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একজন

কিশোর কিভাবে লেটোর আসরের মুখ ফিরিয়ে দেন সুগভীর আত্মবোধে? পরমশক্তির কৃপা তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে ঐ বয়সে লেখা সম্ভব হয়েছিল গভীর অধ্যাত্মমূলক গান।

○ আধ্যাত্মিক গভীরতা ○

'চাষার সঙ' প্রহসনে এমন একটি গান—

"চাষ কর দেহজমিতে হবে নানা ফসল এতে·
নামাজে জমি 'উগালে' রোজাতে জমি 'সামালে'
কলেমায় জমিতে মই দিলে চিন্তা কী হে এই ভাবেতে।।
লা ইলাহা ইলাল্লাতে বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে আর রইবি সুখেতে॥
নয়টা নালা আছে তাহার ওজুর পানি সিয়াত যাহার,
ফল পাবি নানা প্রকার ফসল জন্মিবে তাহাতে॥
যদি ভাল হয় হে জমি হজ জাকাত লাগাও তুমি
আরও সুখে থাকবে তুমি কয় নজরুল ইসলামেতে॥"[৫]

এটি একটি লৌকিক পদ, যাতে কৃষিকাজের বর্ণনা রূপকার্থে শাস্ত্রানুষঙ্গে এসেছে। নজরুল এমন বর্ণনা সরাসরি কৃষিবচন হিসাবে অন্য ঢঙেও লিখেছেন—

"জীবনযাপন করিতে চাষ কর বিধিমতে
রবে যদি সুখেতে পৃথিবী মাঝার॥
জমি উগালে সামালে বীজ ফেলাও কুতূহলে
পাবে তবে সেই ফসলে মেহনতের সার॥
লাগাও ধান প্রধান ফসল তরকারি কলাই সকল
দাও সময়মতো জল যাতে প্রাণ বাঁচে তার॥
অরি হতে ফসলে রক্ষা কর সকলে;
নজরুল ইসলাম বলে নইলে বাঁচা হবে ভার॥"[৬]

লক্ষণীয়, প্রথম পদের প্রেক্ষিতে কৃষিকাজের বর্ণনামূলক দ্বিতীয় পদটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় গভীরতা লাভ করেছে। প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্য 'চর্যাপদ'-এ এমন প্রকরণ আমরা দেখেছি। বাউল গানে দেহতত্ত্বের যে দার্শনিক আদর্শ দেখা যায়, 'চাষার সঙ'-এর গানটিতে সেই আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। দেহকে আশ্রয় করেই আত্মতত্ত্ব বিকশিত হয়। তাই দেহজমিতে চাষ করার কথা বলা হয়েছে। নামাজ ও রোজায় জমি প্রস্তুত করে কলেমায় মই দিলে (জমির ঢেলা ভাঙার জন্য 'মই' দেওয়া হয়) অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠ হয়ে দেহজমি চাষ করলে মানুষের মুক্তির পথ প্রসারিত হবে। 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ' মন্ত্রে বীজ ছড়ালে ঈমান বা বিশ্বাসরূপ মানবিক ফসল যে ফলবেই তাতে সন্দেহ নেই। নামাজ পড়ার আগে ওজুর পানিতে হস্তপদ প্রক্ষালন করতে হয়। দেহের নবদ্বার পবিত্র পানিতে প্রক্ষালন করলে নানারকম শুভফল লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা। জমি অর্থাৎ আধার ভাল হলে হজ (পবিত্র মক্কা শরিফ দর্শন) ও জাকাত (উপার্জনের এক অংশ দান) নিষ্ঠাভরে করতে পারলে মুসলমান ইসলাম-নির্দিষ্ট পথে যে পরম সুখের সন্ধান পাবে, সেবিষয়ে পদকর্তা নজরুল ইসলাম নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

কেবল ইসলামী ঐতিহ্যই নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গও গভীর অধ্যাত্মবোধে তিনি তুলে এনেছেন এই পদে। 'প্রেমের ছলনা' নামে রচনাটিতে দেখা যায়—

"বুঝলাম নাথ এতদিনে যুবকের ছলনা হে
কোথা শিখিলে এ প্রণয় আমারে বল না হে
তোমার হিয়া কঠিন অতি জান না শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রণয়-বাতি. আর বাতি জ্বেল না হে।
এইরূপে কত কামিনী মজায়েছেন গুণমণি,
কপালদোষে বিরহিনী তোমার আর হলো না হে।
বিরহ জ্বালায় মরিলাম আর জ্বালায়ো না বাঁকা শ্যাম
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম মেরো না ললনা হে॥"[৭]

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, মাত্র এগারো-বারো বছর বয়সেই নজরুল দেহতত্ত্বের উচ্চ দার্শনিক ভাবের গান লিখছেন, আবার শ্রীমতী রাধার ঈশ্বরবিরহের কথাও লিখছেন! প্রথম গানে মনে পড়ে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের সুবিখ্যাত পদটির কথা। পদটি হলো—

"মন রে, তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

মানবজমিন আবাদ করতে হয় ঈশ্বরীয় অনুভবের লক্ষ্যে। ঈশ্বরের নামবীজ ঠিক ঠিক রোপণ করলে শ্রীরাধার মহান অনুভবের শরিক হওয়া যায়। 'প্রেমের ছলনা' যদিও হালকা চালে লেখা তবু কৃষ্ণবিরহিনী রাইয়ের আকুল আর্তি, গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অমেয় আকর্ষণকথা কিশোর পালাকারের কলমে ফুটে উঠেছে। ছোট বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে শুভবোধ ও বিবেকীচেতনা এমনই জাগ্রত ছিল যে, মরমি সাধকের ভঙ্গিতে অনাবিল ভাষায় লিখতে পেরেছেন ঃ

"নজরুল ইসলাম বলে কর ভাই বন্দেগী
খোয়াইওনা আজম গোনাতে জিন্দেগী
শারমেন্দাগী হবে হাশরের মাঝে।"[৮]

অবিবেকী কাজের স্রোতে পাপের পথে অগ্রসর হলে জীবন যে লজ্জাকর হবে, সেকথা স্মরণে রেখে ঈশ্বরের বন্দনার পথ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এখানে নজরুল যেন গ্রামের

এক অখ্যাত কিশোর নন—একজন প্রাজ্ঞ উপদেশক, যিনি শক্তি পেয়েছিলেন পরম করুণাময়ের কাছে।

নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা অতএব বায়বীয় কোন ব্যাপার নয়। পুরাণ-মহাকাব্য-ইসলাম, ইতিহাস ও জাতীয় জনজীবন এবং ফকির হাজি পালোয়ানের শক্তিপ্রবাহ তাঁর প্রতিভা উন্মেষে সাহায্য করেছিল। বন্ধু-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনের প্রথম পাদে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন নজরুলকে। সন্ন্যাসী-ফকিরদের জন্য তাঁর তীব্র আর্তি তিনি দেখেছেন। পরম ভালবাসায় শৈলজানন্দ লিখেছেন ঃ

"আমি সেই নজরুলকে চিনি—যে-নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তীপুজোর সময় ভাঙা একটা পাঁচিলের উপর বসে যাত্রাগান শুনছে। যে-নজরুল লেটোর দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে। যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ পড়ছে, মহাভারত পড়ছে।"[৯]

যিনি প্রকৃত ধর্মপথযাত্রী তিনি গোষ্ঠীবদ্ধ হবেন না, হবেন উদার, ধৈর্যশীল, পরার্থপর ও ক্ষমাসুন্দর। এই গুণগুলি বালক বয়স থেকেই নজরুলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। শৈলজানন্দ লিখেছেন ঃ

"আমার সৌভাগ্য, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম এমন একটি মানুষকে—ঠিক যেসকল মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র, অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য, অবিশ্বাস্য রকমের হৃদয়ের উদারতা, বিদ্বেষ-কালিমামুক্ত অপাপবিদ্ধ একটি পবিত্র মন। তার নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতো একটি আপনভোলা প্রকৃতি।"[১০]

এমন প্রকৃতি ছিল বলেই উত্তরজীবনে নজরুল ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, গরিব-গুর্বোদের জন্য কলম ধরেছিলেন শক্ত হাতে। জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সন্তানজ্ঞানে, লিখেছেন ইসলামি সঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বন্দনায় মুখর হয়েছেন প্রাণের উদ্দীপিত প্রজ্ঞায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাদের ভিন্নমার্গ উত্তরসুরিদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা ক্রমান্বয়ে সেই অমেয় সত্যের পরিচয় পাব। [ক্রমশ]

তথ্যসূচি

১ কাজি নজরুল, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ৩য় সং, ১৯৭৭, পৃঃ ২
২ ঐ, পৃঃ ৩
৩ ঐ, পৃঃ ১১
৪ বাঙলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃঃ ২৮
৫ নজরুল-জীবনী—ডঃ অরুণকুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, ২০০০, পৃঃ ১০
৬ ঐ, পৃঃ ১০-১১
৭ ঐ, পৃঃ ১১
৮ নজরুলের জীবন ও সাহিত্য—ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃঃ ৩০
৯ টুকরো কথা, রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত ৭০তম নজরুল জন্মজয়ন্তী স্মারকপত্র, পৃঃ ১৯
১০ ঐ, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, নিউ এজ., ১৩৬৭

নদীর নাম হিরণ্যবতী

গায়ত্রী সেনগুপ্ত

ছোট এক স্রোতস্বিনী হিরণ্যবতী
বয়ে চলে নির্জন এক বনভূমির পাশ দিয়ে।
কুশীনগরে শিষ্যদের সাথে পদব্রজে আসছেন অসুস্থ তথাগত।
ক্লান্ত তথাগতের শেষশয্যা পাতা হলো
এক শালতরুর তলে।
প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বললেন ঃ
"তৃষ্ণার্ত আমি। আমাকে জল দাও।"
ত্বরায় আনন্দ গেলেন নদীতে জল আনতে।
হিরণ্যবতীর ধুলোকাদা ভরা জল দেখে
অশ্রুসজল হলো তাঁর দুটি চোখ।
কেমন করে এই জল পান করবেন মুমূর্ষু তথাগত।
তথাগতকে স্মরণ করে নদীতে নামলেন আনন্দ।
বিস্ময়ে দেখলেন হিরণ্যবতীর স্বচ্ছ জল তাঁকে আহ্বান করছে।
সেই নির্মল জল পান করে তথাগতের তৃষ্ণা দূর হলো।
অন্তিম ডাকের অপেক্ষায় শান্ত সমাহিত নয়নে
প্রতীক্ষ্যমাণ সেই মহামানব।
নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ ঈষৎ উজ্জ্বলতর হলো।
শোকাকুল শিষ্যদের প্রতি উচ্চারিত হলো তাঁর অন্তিম বাণী ঃ
"পৃথিবীতে যাকিছু জন্মায় তার ক্ষয় হয়।
আমার ধর্মই তোমাদের পথ দেখাবে।"
"বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় চ"
সেই অমৃতময়ী বাণীর বিশ্ববরেণ্য কায়ারূপ
মহানির্বাণ লাভ করলেন।
পুণ্যতোয়া হিরণ্যবতীর নির্জন তটভূমিতে দাঁড়িয়ে
আজও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ
স্মরণ করে মহাযোগী ভগবান বুদ্ধকে।
আজও প্রাণে বাজে ঃ
"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি..."

তোতা কাহিনী

অশোককুমার ঠাকুর

একটি তোতা কিনেছিলাম
নাম শা'জাহান
সন্ধ্যে হলেই গলা ছেড়ে
দিত সে আজান।
আদর করে শিখাই তারে
কেষ্ট নাম ধর
অমনি সে উঠত ডেকে
আল্লা হো আকবর।
কী বিপদ! হিঁদুর ঘরে
বেআদব সে-পাখি
শা'জাহান পালটে নাম
বিষ্ণুপদ রাখি।
অভিমানে কয় না কথা
খায় না ছাতু লঙ্কা
মরেই যাবে এই ভয়েতে
জাগল মনে শঙ্কা।
মা তখন বলল ডেকে
শা'জাহানই থাকুক
কৃষ্ণ যিনি আল্লা তিনিই
যা খুশি সে ডাকুক।
দিন গড়িয়ে বছর গেল
রইল শা'জাহান
ভুলল না সে আল্লা নাম
কিংবা সে-আজান।
সন্ধ্যে হলেই শা'জাহান
ডাকে খোদার ডাক
মা তখন ঠাকুরঘরে
বাজায় কাঁসর শাঁখ।
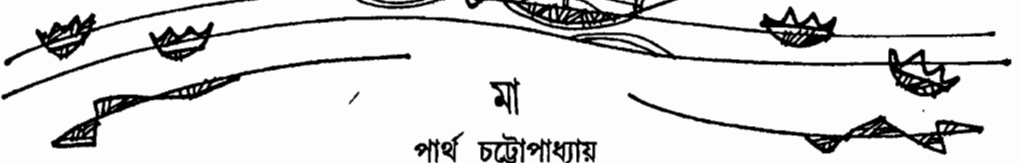
মা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রাণের ভেতর প্রাণ হয়ে যে
খুব গোপনে থাকে।
আমার মনের ভেতর মন হয়ে যে
স্নেহ-জ্যোৎস্নায় ঢাকে॥

মনে মনে সুরের ভেলায়
তোমারই জন্য চলা।
জীবন থেকে জীবন শেষে
তোমারই কথা বলা॥

তুমি আমার জীবনবৃত্তে
আলোর উৎসভূমি।
আঁধার মুছে আলোক কর
তুমি কেবল তুমি॥

নিষাদ

তন্ময় ধর

আমি নিষাদ।
একতম নিষাদ আমি।
আমার অতিতৃষ্ণায় এজগৎ
বিশাল, বিশালতম—

... জ্যোতির্লোক তার মস্তক
নভস্থল নাভিদেশ,
জললোক মুখমণ্ডল,
তপোলোক ললাট,
দিনরাত্রি দৃষ্টিপথ।
সুব্যাপ্ত ব্রহ্মস্থান তার ভ্রূবিকাশ...

—ছিঁড়ে যাওয়া সূর্যকুণ্ডল থেকে
অন্ধ অন্ধকারে
আমি শুধু এগিয়ে চলেছি।
জন্ম নয়, পিপাসা নয়,
স্বপ্ন নয়, দেশকাল নয়,
তীর্ণ অমরতার পথে
শুধু অনন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠায় চলেছি।
এস, হাত ধর, এ অমৃত আত্মার।

হে যতিবর

(পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী স্মরণে)

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেম প্রচারি', হে মুক্তকর্মবন্ধ
জপি রামকৃষ্ণ নাম অবিনাশী
পরমানন্দে গুরু রঙ্গনাথানন্দ
ভূলোক তেয়াগীয়া হলে কি দ্যুলোকবাসী॥

যারা মুক্ত-দুখরাত্রি রামকৃষ্ণ-পথযাত্রী
রামকৃষ্ণ প্রেমস্রোতে যারা গেল ভাসি—
দিশারি তাদের তুমি, ধন্য হলো মরভূমি
বক্ষে তোমারে ধরি হে মহাসন্ন্যাসী॥

ভুবনের কোণে কোণে আচণ্ডালে জনে জনে
করাইলে স্নান সবে জ্ঞানের ধারায়
শুদ্ধচিত্ত কত ভক্ত রামকৃষ্ণে অনুরক্ত
হে প্রেমিক, তোমার চরণ পূজিছে জগদ্বাসী॥

হে মৃত্যুঞ্জয়ী স্বামী রামকৃষ্ণ অনুগামী
প্রেমঋদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ জীবন-উদাসী
"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" স্থির জানি
বিশ্ব আজি রামকৃষ্ণ-কৃপা অভিলাষী॥

হৃদয় জুড়ে বৈরাগী এক

সোমনাথ ভট্টাচার্য

বৈরাগী এক হৃদয় জুড়ে থাকে
ঘর ভুলিয়ে, পথ ডেকে নেয় তাকে।
ধুলোর পথে মূলেই যে তার বাস
মন যেন তার কুসুমসঙ্কাশ।

কান্না-হাসি একটি তারে গেঁথে
বাজিয়ে চলে পরম আনন্দেতে।
ভুলেও কিছুই কুড়োয় না সে, তাই
ছাইকে করে সোনা, সোনাকে দূর-ছাই।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ দিলেও বাদ
অন্তরে তার পূর্ণেরই আস্বাদ।

কবে তোমার নূপুর হব

অমরেন্দ্র গণাই

ফুলের মতো কবে আমি উঠব ফুটে বিজন ভুঁয়ে,
মলিনতা ঘুচিয়ে দেব তোমার চরণকমল ছুঁয়ে।
কবে তোমার নূপুর হব,
আঘাত যত বুকে সব,
দিক্-সীমাতে আকাশ যেমন প্রণাম করে নুয়ে নুয়ে।

যা আছে সব নিলাজ নিঠুর ভাঙতে হবে আঁধার ঘরে;
দুঃখ-কুসুম আছে যত দাও না আমায় সাজি ভরে।
প্রতি ফুলের কাঁদন দিয়ে,
উঠবে বাঁধন উচ্ছ্বসিয়ে
কবে তোমার নূপুর হব সব কালিমা ধুয়ে ধুয়ে।

অলঙ্করণ : সৌরীশ মিত্র

'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়*

[পূর্বানুবৃত্তিঃ গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার পর]

॥ সিদ্ধাইয়ের জন্য সাধন। ছিঃ ॥

ঠাকুর আপন খেয়ালে চলেছেন পোস্তার দিকে। দৃক্‌পাতহীন। বাঁধের বাঁধনে ছলকাচ্ছে জোয়ারের জলে ভরভর্তি গঙ্গা। চাঁদনির ঘাটের রানায় বসে বিষয়ীরা নধর অঙ্গে তেল ডলছেন—বাঁচতে হবে, আরো বাঁচতে হবে। মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, ফুলকো নুচি, ঝোলা গুড়। তারপর। ঐ যে খাটে চাপিয়ে নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাচ্ছে—হরি বোল। কথামৃতের বাণীই বেশ রসিয়ে বলব।

মানুষের চারটে ধরন—চার থাকের মানুষ। চাররকমের স্বভাব। বুঝলে কিছু? বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত আর নিত্য। দাঁড়াও, আরেকটু সহজ করে বোঝাই। ধর, সংসার হলো জাল, আমরা হলুম মাছ আর ঈশ্বর হলেন জেলে।

জাল ফেলছেন জেলে। মজার জেলে সেই ঈশ্বর। প্রকৃত জেলে যখন পুকুরে জাল ফেলে, দৃশ্যটা একবার ভাব। কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হতে চায়। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা করে, সকলেই পালাতে পারে না দুচারটে মাছ ধপাঙ্ শব্দ করে পালায়; তখন লোকেরা বলে—ঐ, ঐ বড় মাছটা পালিয়ে গেল। এই দু-চারটে লোক, যারা সংসারের জাল ছিঁড়ে পালাতে পারে, তারা হলো মুক্ত জীব। কতকগুলো মাছ স্বভাবত এত সাবধান যে, কখনো জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্য জীব কখনো সংসার-জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে। এই বোধ নেই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। জালে পড়েই জালসুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মেরে একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নেই, বরং আরো পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধ জীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে, হেথায় বেশ আছি। বদ্ধ জীব সংসারে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়। ভাল লাগে না।

বদ্ধ জীবের—সংসারী জীবের কোনমতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না। এদের সব উটের স্বভাব। বুঝলে (উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে), উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল। আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল।

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। আচ্ছা, একটু সংযম! তা হবে না। বছরে বছরে সেই মেয়ে। একটা মেয়ে, দুটো মেয়ে, তিনটে, চারটে। শেষ নেই। বেপরোয়া। এরপর মামলা, মকদ্দমা। যত উকিলের শ্রীবৃদ্ধি!

দুটো পয়সা হলো কি হলো না, টনটনে অহঙ্কারের ধনুষ্টঙ্কার। সে দেখে কে? কোলা ব্যাঙ কোথা থেকে একটা টাকা পেয়েছিল। আর যায় কোথায়! গর্তের ভিতর টাকা। ব্যাঙ বসে আছে পাহারায়। হঠাৎ একটা হাতি সেই গর্তটা ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে, ব্যাঙ বেরিয়ে এল। ভীষণ ক্রুদ্ধ। হাতিটাকে লাথি দেখাচ্ছে আর বলছে, তোর এত বড় আস্পর্ধা! আমাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছিস! মারব ক্যাঁত করে লাথি।

একদিন একজন বড়মানুষ এসে বলে কি! মশাই, নাম শুনে এলুম। একটা মকদ্দমায় ফেঁসে গেছি। যাতে জিত হয়, সেইরকম একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি বললুম, এইরে, তুমি ভুল শুনেছ বাপু। মামলা-মকদ্দমার জন্যে অচলানন্দ।

'অচলানন্দ তীর্থাবধূত। হুগলি জেলার কোতরং-এ বাড়ি। পূর্বাশ্রমের নাম রামকুমার। কোন মতে রাজকুমার। তিনি ছিলেন তান্ত্রিক। বীরভাবের সাধক। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, কিছুদিন থাকতেন। পঞ্চবটীতে সাধনা করতেন।

নরেন্দ্রনাথের কৌতূহল। জিজ্ঞেস করছেন, ঘোষপাড়া আর পঞ্চনামী—এই সম্প্রদায়ভুক্ত যারা, তারা কিভাবে সাধন করে?

ঠাকুর বলছেন, তোর আর এসব কথা শুনে কাজ নেই। কর্তাভজা ঘোষপাড়া, পঞ্চনামী আবার ভৈরব-ভৈরবী—এরা ঠিক ঠিক সাধনা করতে পারে না। পতন হয়। ওসব পথ নোংরা পথ, ভাল পথ নয়। শুদ্ধ পথ দিয়েই যাওয়া ভাল। কাশীতে আমায় ভৈরবীচক্রে নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় আবার কারণ পান করতে বললে। আমি বললাম, 'মা, আমি যে কারণ ছুঁতে পারি না।' তারা বেশ খেতে লাগল। ভাবলাম, এইবার বুঝি জপ-ধ্যান করবে। তা নয়, মদ খেয়ে নাচতে আরম্ভ করলে।

* স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক।

কি জান, আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব এতে কোন বিপদ নেই। স্ত্রীভাব, বীরভাব—বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি,—শেষ এই বুঝেছি—তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক-একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি। আর ভক্তিই সার।

শোন না, আমার যে সন্তানভাব। অচলানন্দ এসেছে। কদিন থাকবে। খুব কারণ করত। একদিন আমার সঙ্গে ঘোর তর্ক—তন্ত্রে আছে, তুমি শিবের কলম মানবে না কেন? তিনি সন্তানভাবও বলেছেন—আবার বীরভাবও বলেছেন। খুব রেগে গেছে।

আমি বললাম, কে জানে বাপু, আমার ওসব ভাল লাগে না। আমার সন্তানভাব।

তবু তর্ক। কেন তুমি মানবে না। সন্তানভাব আবার কি? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন। তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবেরও সাধন আছে। পরিবার ছিল, ছেলেপুলে ছিল। খবর-টবর নিত না। আমায় বলত, ছেলে ঈশ্বর দেখবেন, এসব ঈশ্বরেচ্ছা। আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। বলি, ছেলেদের দেখে কে? ছেলেপুলে, পরিবার সব ত্যাগ করেছি—টাকা রোজগারের ছুতো নয় তো! কিগো! লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এসে পড়বে।

এ কি হীনবুদ্ধি বলত—মকদ্দমা জিতব, খুব টাকা হবে, মকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব—এর জন্যে সাধন! টাকা? টাকায় কি হয়? খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু-ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরিব পড়লে তার উপকার হয়। এইসব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্যভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্যে টাকা নয়।

পঞ্চ ম-কার তন্ত্রমতে কেন সাধন করে? সিদ্ধাইয়ের জন্যে। কি হীনবুদ্ধি বল তো! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কী হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণবারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মকদ্দমা জেতা! এই সাধনের কী অর্থ?

[ক্রমশ]

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের বিষয় ঃ বলরাম বসু। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলরামের (১৮৪২-১৮৯০) বাটীতে (বাগবাজার, কলকাতা) শ্রীশ্রীঠাকুর কম করেও একশোবার পদার্পণ করেছেন। বলরামের প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম বসু বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। বলরামের পিতামহ রাধামোহন কলকাতায় যে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জীউয়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সূত্রে ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'শ্যামবাজার'। বৃন্দাবনেও তিনি নির্মাণ করেছিলেন 'কালাবাবুর কুঞ্জ'। শ্রীজগন্নাথের সেবা ছিল বলে ঠাকুর বলতেন, বলরামের অন্ন খুব শুদ্ধ। গৃহে সকলেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। রামদয়াল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ঠাকুরকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল, এমন মিষ্টি ব্যবহার এবং পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইনি অবশ্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবকলেবর। বলরামকেও ঠাকুর একবার ভাবসমাহিত অবস্থায় দেখেছিলেন শ্রীচৈতন্যের হরিসঙ্কীর্তন দলের মধ্যে।

বলরামের সেবাধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদ্দার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে।..." বাগবাজারের বাটীতে প্রতি রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথের রথ টানা হতো। ১৮৮৩ সালের উল্টোরথের দিন ঠাকুর প্রথম ঐ বাড়ির দোতলার বারান্দায় রথ টেনেছিলেন। সেই রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথের যে-বিগ্রহটি রাখা হয়েছিল, সেই মূল বিগ্রহ এখন কোঠারের মন্দিরে বিরাজিত। ওড়িশার কোঠারে তাঁদের জমিদারির প্রধান কাছারিবাড়ি অবস্থিত ছিল। এখন সেই মন্দিরটি পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ির দরজা ভক্তদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত। ঠাকুর সেখানে রাত্রিবাস করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর ত্যাগী শিষ্যবৃন্দ যখনি প্রয়োজন মনে করতেন, বলরাম বসুর বাটীতে রাত্রিবাস করতেন। ঐ বাড়িতেই প্রথম মিশন গঠন হলো ১৮৯৭ সালের ১ মে। ঐদিন সভায় নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল। শ্রীশ্রীমাও বহুদিন এই বাড়িতে বাস করেছেন। উদ্বোধন-গৃহ নির্মাণের আগে কলকাতায় মায়ের মূল বাসস্থান এই বলরাম-মন্দির ছিল বললে ভুল হয় না।

কৃষ্ণরাম বসুর আদি বাসস্থান হুগলির আঁটপুর-তড়া অঞ্চলে। সেখানেই পরবর্তী কালে বাবুরাম মিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়। বলরামের এই শ্যালকই পরবর্তী কালে 'স্বামী প্রেমানন্দ' নামে সুপরিচিত হন। বলরামের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও তিনি জীবনযাপনে কঠোরী ছিলেন। মিতব্যয়ী বলরামের যুক্তি ছিল অন্যরূপ। যদি নিজের বিলাসিতা খর্ব করে সেই অর্থে যৎকিঞ্চিৎ সাধুসেবা করা যায়, তাতেও গৃহস্থের কল্যাণ হবে—এই মানসিকতা নিয়েই তিনি তিতিক্ষাপরায়ণ জীবনযাপন করতেন। বলরামবাবুর শেষ অসুখের সময় স্বামী বিবেকানন্দ কাশী থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ মহারাজও তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।—সম্পাদক
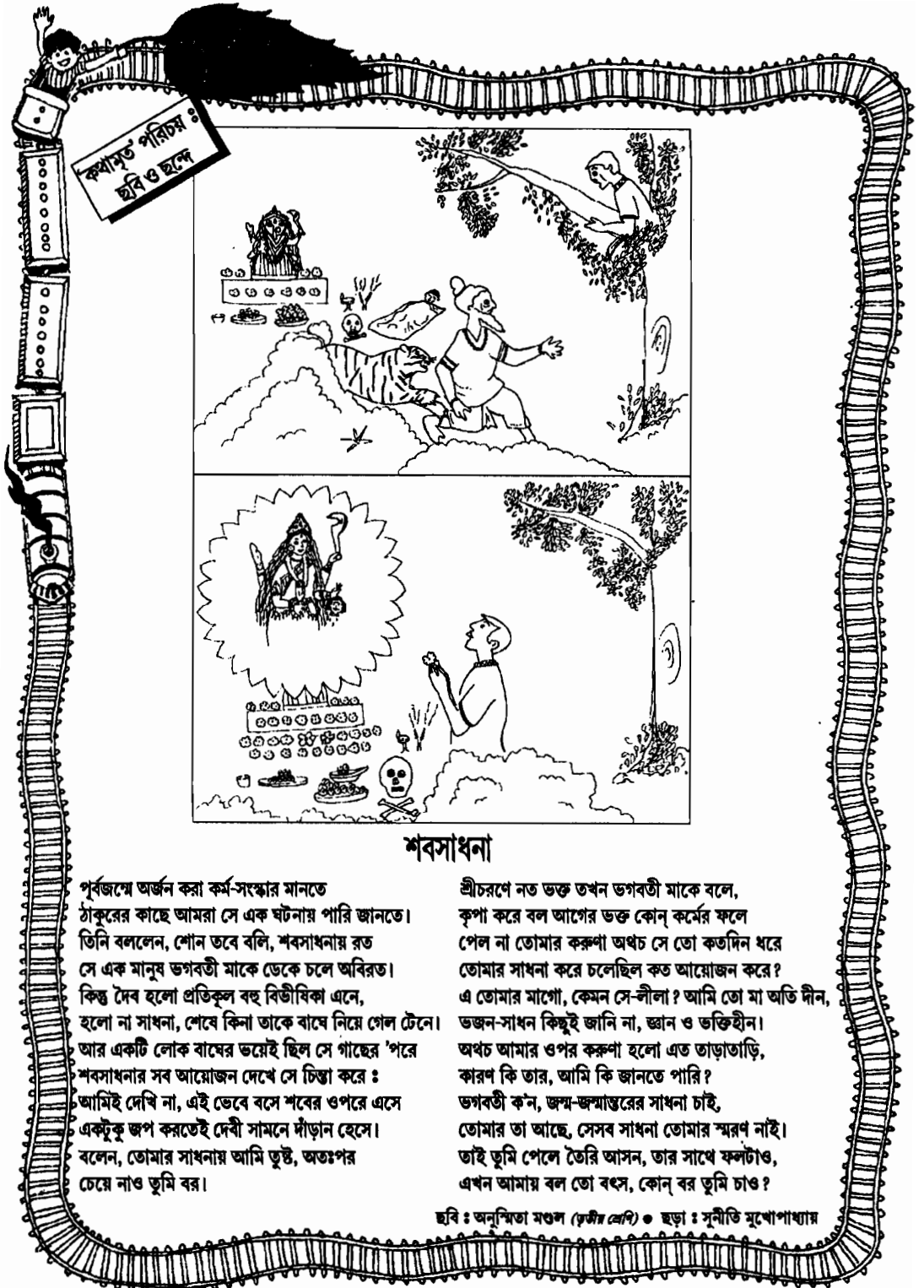
শবসাধনা

পূর্বজন্মে অর্জন করা কর্ম-সংস্কার মানতে
ঠাকুরের কাছে আমরা সে এক ঘটনায় পারি জানতে।
তিনি বললেন, শোন তবে বলি, শবসাধনায় রত
সে এক মানুষ ভগবতী মাকে ডেকে চলে অবিরত।
কিন্তু দৈব হলো প্রতিকূল বহু বিভীষিকা এনে,
হলো না সাধনা, শেষে কিনা তাকে বাঘে নিয়ে গেল টেনে।
আর একটি লোক বাঘের ভয়েই ছিল সে গাছের 'পরে
শবসাধনার সব আয়োজন দেখে সে চিন্তা করে :
আমিই দেখি না, এই ভেবে বসে শবের ওপরে এসে
একটুকু জপ করতেই দেবী সামনে দাঁড়ান হেসে।
বলেন, তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট, অতঃপর
চেয়ে নাও তুমি বর।

শ্রীচরণে নত ভক্ত তখন ভগবতী মাকে বলে,
কৃপা করে বল আগের ভক্ত কোন্ কর্মের ফলে
পেল না তোমার করুণা অথচ সে তো কতদিন ধরে
তোমার সাধনা করে চলেছিল কত আয়োজন করে?
এ তোমার মাগো, কেমন সে-লীলা? আমি তো মা অতি দীন,
ভজন-সাধন কিছুই জানি না, জ্ঞান ও ভক্তিহীন।
অথচ আমার ওপর করুণা হলো এত তাড়াতাড়ি,
কারণ কি তার, আমি কি জানতে পারি?
ভগবতী ক'ন, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই,
তোমার তা আছে, সেসব সাধনা তোমার স্মরণ নাই।
তাই তুমি পেলে তৈরি আসন, তার সাথে ফলটাও,
এখন আমায় বল তো বৎস, কোন্ বর তুমি চাও?

ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল *(তৃতীয় শ্রেণি)* ● ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

একদিন কী দেখলুম জান? দেখলুম, বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন দলের উদ্দাম হরিনামসঙ্কীর্তন। তার মধ্যে বলরামকে দেখলুম। নইলে মিছরি, এসব দেবে কে?

কেশবচন্দ্র সেনের দক্ষিণেশ্বরে একদিন মুড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ।
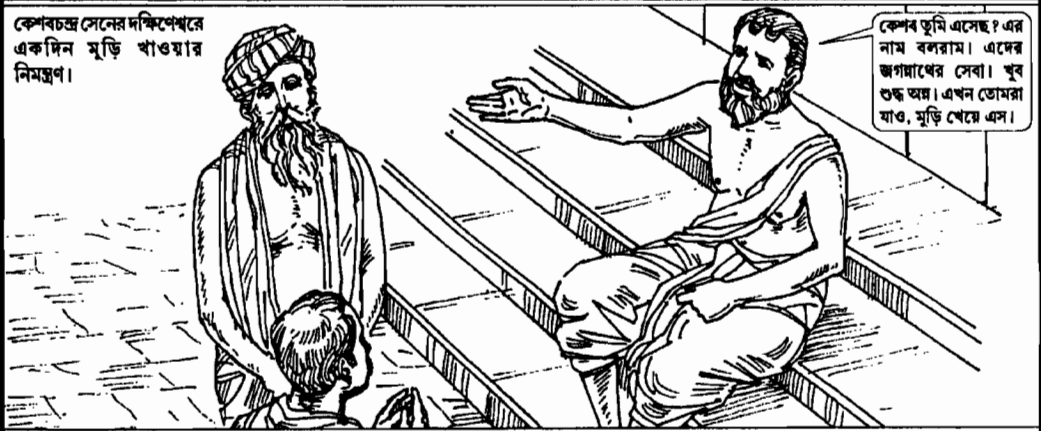
কেশব তুমি এসেছ? এর নাম বলরাম। এদের জগন্নাথের সেবা। খুব শুদ্ধ অন্ন। এখন তোমরা যাও, মুড়ি খেয়ে এস।

সকলে মুড়ি খেতে গেল।

কিগো বলরাম, তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

আচ্ছা, ভগবান কি আছেন?

হ্যাঁগো, ভগবান শুধু আছেন তাই নয়, নিজের ভেবে কেউ ডাকলে তিনি দর্শন দেন। নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি যে মমত্ব, সেইভাবে ডাকতে হয়।

চিত্ররূপ ঃ সৌরীশ মিত্র

মাতৃসান্নিধ্যে রমণীমোহন চৌধুরী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোকবর্তিকার তুল্য। তিনি যেমন আমাদের মনে শুভচিন্তার বীজ বপন করেছেন, তেমনি আমাদের চেতনাকে শিক্ষা-সংস্কারে উদ্দীপিত করেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির সত্যতা সহজেই লক্ষিত হয় যদি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সঠিকভাবে অনুধ্যান করা যায়। তিনি তাঁর রূপৈশ্বর্য গোপন করেই ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই তাঁর কর্মকাণ্ড বুঝে উঠতে পারেন না; কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—কত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনচর্যায় তিনি যেমন সমাজসংস্কার সাধন করেছেন, তেমনি শিক্ষাব্রতীর ভূমিকা নিয়েছেন, আবার কখনো দেশের স্বাধীনতায় বিপ্লবীদের প্রেরণাদাত্রী হয়েছেন। এই নিবন্ধে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান রমণীমোহন চৌধুরীর স্মৃতিকথার ভিত্তিতে এক চালচিত্র রচনা করব এবং দেখব কেমন করে তিনি তাঁর নিরলস শ্রম ও সাধনা দিয়ে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। বস্তুত, রমণীমোহনের জীবন শ্রীশ্রীমায়ের চিন্তা-চেতনারই রূপায়ণ। স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে মানুষ হলেও শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভের ফলে তিনি যেমন জীবনপথের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, তেমনি বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি তাঁর পরামর্শ, শ্রম ও সহযোগিতা উজাড় করে দিয়েছেন।

রমণীমোহন চৌধুরীর আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার মলিয়াইস গ্রামে। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে এক জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকা থেকে আই. এ. পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ সালে এম. এ. (দর্শন) পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কলেজে পঠনকালেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভ করেন। সেই ঘটনা তাঁর নিজের কথায় ঃ

১৯১৫ সাল এপ্রিলের শেষের দিক। তখন আমি কলেজে পড়ি। হঠাৎ মনে উদয় হলো, দীক্ষা নিতে হবে। বাড়িতে ধর্মাচরণের শিক্ষা ছিল। বাবা-মাও ছিলেন বিশেষ ধার্মিক—ন্যায়নিষ্ঠ। আমরাও সেই শিক্ষায় বেড়ে উঠেছিলাম। দীক্ষার প্রবণতা ক্রমশই মনে দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল। আই. এ. পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলাম। স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম। ছায়া সিনেমার কাছে একটা বাসাও যোগাড় হলো। বাসা না বলে তাকে মেস বলাই ভাল। জগন্নাথ নামে আমারই সমবয়সি এক যুবকও সেই মেসে থাকত। ফলে সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার সঙ্গে। আমি স্কুলে পড়াশোনাকালেই ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম শুনেছিলাম; স্বামীজীর দু-একখানা বইও পড়ার সুযোগ হয়েছিল। স্কুলের মাস্টার মশাই যতই শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলতেন, তাঁদের [শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর] প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত। ভাবতাম, আমাদের মতো ছেলেদের কি শ্রীশ্রীমা দীক্ষা দেবেন? আমরা হয়তো তাঁর মন্ত্র গ্রহণের যোগ্য নই। নিজেকে অযোগ্য ভেবে যন্ত্রণায় অধীর হয়েছি। তখন ঠিক করলাম, কাশীর গম্ভীরানাথের কাছে গিয়ে দীক্ষা নেব। আমাদের আত্মীয়ের তিনি গুরু ছিলেন। কাশী যাব সব ঠিকঠাক। পরের দিন সংবাদ পেলাম, গম্ভীরানাথ দেহ রেখেছেন। কাশী যাওয়া আর হলো না, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার মাত্রা কিছু কমল না। আমার মনের অবস্থা দেখে মেসের বন্ধু বললেন, 'তুমি যদি দীক্ষাই নিতে চাও তো সোজা জয়রামবাটী যাও—সেখানে শ্রীশ্রীমা রয়েছেন। তাঁর কাছে দীক্ষা নাও—শান্তি পাবে।'

* *উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, গবেষক।*

আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, জয়রামবাটী কোথায় ভাল জানি না। মেসের বন্ধু ঐ অঞ্চলের ছেলে। তার কাছ থেকে রাস্তার হদিশ জেনে যাত্রা করলাম। রাত্রে হাওড়ায় ট্রেনে চেপে ভোরবেলা বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামলাম। এবার হাঁটাপথ। জানি না কত দূর। বন্ধু বলেছিল, বিষ্ণুপুর থেকে হেঁটে ঘণ্টা দু-তিন লাগবে। আমি হাঁটতে আরম্ভ করেছিলাম। তখনো জানি না, কোথায় যাচ্ছি বা কার কাছে যাচ্ছি? কেমনই বা তিনি?

অজানা-অচেনা পথে একাকী হেঁটে চলেছি। পথ যেন শেষ হতে চায় না! দুপুরবেলা জয়রামবাটী গ্রামে এসে পৌঁছালাম। লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, শ্রীশ্রীমা এখানেই আছেন। অবশেষে মায়ের বাড়িতে হাজির হলাম। তখন বাইরের কেউ ছিল না। মায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে থাকলাম। কী আশ্চর্য! কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। একাকী বসে আছি—এমন সময় এক যুবক মায়ের ঘর থেকে বাইরে এসে আমাকে বললেন, 'যাও, যাও শিগ্‌গির স্নান করে এস! মা সকাল থেকে বলছিলেন—আজ একটি ছেলে আসচে। মা পূজা শেষ করে আসনে বসে আছেন।' আমি আর দ্বিরুক্তি না করে পুকুরে স্নান সেরে মায়ের কাছে গেলাম। মা ঠাকুরঘরে আসন পেতে ফুল, হরীতকী সমস্তই যোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাকে পাশের আসনে বসতে বললেন। আমি বসলাম। মা প্রথমে আমাকে ঠাকুরকে প্রণাম করতে বললেন, তারপর আমাকে মহামন্ত্র দিয়ে কৃতার্থ করলেন। আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণিপাত জানালে আমাকে চুমা খেয়ে বললেন, 'বাবা, আশা পূরণ হয়েছে তো? তুমি যে ঘরের ছেলে, বাইরে গেলে হবে কেন?' মায়ের কণ্ঠে ঐ কথা শুনে আঁতকে উঠলাম। দেখলাম—অন্তর্যামিনীর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। আনন্দে-বিস্ময়ে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।[২]

রমণীমোহন চৌধুরী

এরপর শুরু হয় রমণীমোহনের কর্মজীবন। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে তিনি প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন বীরভূমের লাভপুরে। সেখানে অবস্থানকালে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তারাশঙ্করের জীবদ্দশা পর্যন্ত সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তারাশঙ্করের " 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রজনীবাবু রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত এক ব্যক্তি। তাঁর বাড়ির দেওয়াল-আলমারিতে 'রামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে শুরু করে বিবেকানন্দের 'বীরবাণী', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি বইগুলি সারি সারিভাবে সাজানো। সীতারাম পাল নামে এক শিক্ষককে তিনি বলেছেন বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা—'ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতবাসী আমার ভাই।' তারাশঙ্করের স্বগ্রামে—যাদবলাল হাইস্কুলে রমণীমোহন চৌধুরী নামে এক স্কুল ইন্‌স্পেক্টর আসেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ আদর্শে দীক্ষিত, লাভপুর স্কুলেও তিনি তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। বাস্তবে রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত এই রমণীবাবুকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর তাঁর রজনীবাবু চরিত্রটি নির্মাণ করেন।"[৩] লাভপুরের পাঠশালাকে স্থায়িত্ব দেওয়া ও সমাজের নিম্নবর্ণের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগে রমণীবাবু দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। লাভপুরে নির্বিঘ্নেই দিন কাটছিল রমণীবাবুর। হঠাৎ ঝড় উঠল। গ্রামীণ দলাদলিতে রমণীবাবুর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে তাঁর কি করণীয় তা নির্ধারণের জন্য তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাত্রা করলেন। শ্রীশ্রীমা তখন বাগবাজারে। মাতৃসান্নিধ্যে হাজির হয়ে লাভপুরের সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানান। মা তাঁকে বলেন ঃ "বাবা, তোমার তো কিছুই অভাব নেই; তুমি দেশে যাও। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের একটু আলো দেখাও। ওরা বড় অসহায়।"[৪]
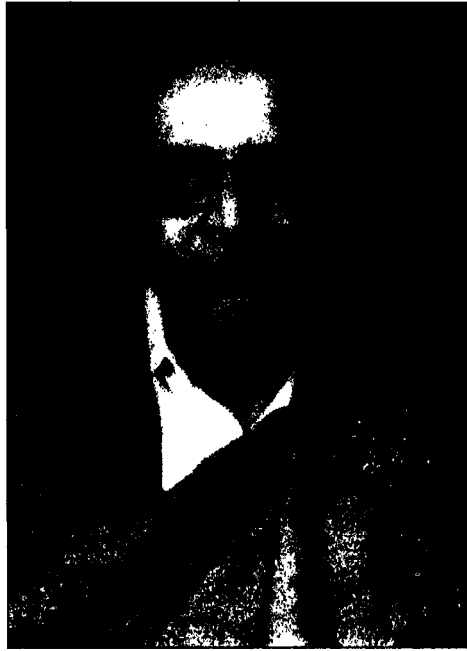
সময় ১৯১৯-১৯২০ সাল। মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে রমণীবাবু কর্মজীবনে ইস্তফা দিয়ে যাত্রা করলেন জন্মভূমি মলিয়াইস গ্রামের অভিমুখে। সেখানে গিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। অবশেষে বিদ্যালয়

স্থাপন করলেন, ছাত্র সংগ্রহ করলেন এবং নিজে সেখানে শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। গ্রামে এক নতুন প্রাণের জোয়ার এল। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বেড়া ভেঙে গ্রামের দুঃস্থ-অভাবী ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো পেল। ধীরে ধীরে সেই পাঠশালার কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছে। বহু কৃতি সন্তানের ধারক ও বাহক সেই বিদ্যায়তন। রমণীবাবু মলিয়াইস গ্রামে বেশিদিন অবস্থান করেননি। যখন দেখলেন, বিদ্যালয়টির যথাযথ অগ্রগতি হয়েছে, বিদ্যার্থীর সংখ্যা ভালই এবং স্থানীয় শিক্ষকরা নিষ্ঠার সঙ্গেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন—সেইসময় তিনি তাঁদের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করে বিদায় নিলেন। ইত্যবসরে তিনি বিবাহ করেছেন—সংসারের দায়িত্ব বেড়েছে। তিনি চাইলেন একটি স্থায়ী চাকরি। পেয়েও গেলেন তৎক্ষণাৎ—সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ। সেই মুহূর্তে তিনি ছুটলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। মায়ের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। তথাপি স্নেহের রমণীমোহনকে কাছে ডেকে তাঁর কর্মপ্রয়াস নিখুঁতভাবে জানলেন। তারপর রমণীবাবু নতুন চাকরির সংবাদ জানিয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মা রমণীবাবুর সমস্ত কথা শুনে খুশি হলেন এবং বললেন : "বাবা, তোমার সংসার হয়েছে—এবার চাকরিতে যোগ দাও। এতেও তো তুমি ছেলেদের গড়ে তুলতে পারবে।" মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রমণীবাবু কাজে যোগ দিলেন। দীর্ঘ ত্রিশবছরেরও বেশি তিনি সরকারি বিদ্যায়তনে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৫১ সালে হেয়ার স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন।[৫]

চাকরি জীবনে ছেদ পড়লেও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ও প্রেরণা তাঁর ওপর নিয়তই ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে তিনি ১৯৫২ সালে বসবাস শুরু করলেন হুগলি জেলার ডানকুনিতে। ক্রমে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুললেন। গড়ে তুললেন 'রামকৃষ্ণ পাঠচক্র'। ধীরে ধীরে স্থানীয় বাসিন্দারা রমণীবাবুকে অনুরোধ জানালেন মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার। কারণ, সেসময় ডানকুনির চার-পাঁচ মাইল এলাকার মধ্যে কোন গার্লস স্কুল ছিল না। রমণীবাবুর স্মরণ হলো শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি। তিনি বলেছিলেন : "দেখো বাবা, ঠাকুর বলতেন অন্নদানের চেয়ে শিক্ষাদান বড়। এখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা খুবই দরকার; নইলে কোন সেবাকাজই সুষ্ঠুভাবে হবে না।" রমণীবাবু প্রতিবেশীদের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। শুরু হলো বিদ্যালয় তৈরির প্রয়াস। এই উদ্যোগে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। সেখানে তিনি মায়ের নির্দেশ মেনেই 'সবাইকে মান্য করে' ও 'সকলের অনুমতি নিয়ে' কয়েক বছরের মধ্যে একটি সার্থক বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুললেন। স্থানাভাবে প্রথমে নিজের বাড়িতেই পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের পড়ানো শুরু করেছিলেন এবং তিনি নিজে সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগেরই সাকার মূর্তি অধুনার 'ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম'। বিগত ২০০২ সালে এই বিদ্যায়তন তার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে।[৬]

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য কৃতী সন্তান রমণীমোহন ১৯৭৩ সালে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে করতে সজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর নামের বীজ যেখানে বপন করেছেন, সেখানেই তা মহীরুহের আকার ধারণ করে সহস্র জীবনে করুণা বিতরণ করে চলেছে। ❑

তথ্যসূত্র

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৭, পৃঃ ৯২
২ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৯৬, পৃঃ ১৩৪ এবং রমণীমোহন চৌধুরীর মধ্যম পুত্র পবিত্র চৌধুরী ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রণব চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৩ সাপ্তাহিক বর্তমান, মার্চ ২০০১, পৃঃ ৩৮
৪ পবিত্র চৌধুরী ও প্রণব চৌধুরী-প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রাপ্ত।
৫ ঐ
৬ ঐ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।—সম্পাদক

ধূমকেতু ঃ সৌরজগতের এক বিস্ময়

বৈদ্যনাথ বসু*

নির্মল রাতের আকাশে আমরা নানারকমের জ্যোতিষ্ক দেখতে পাই—নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্রহ-উপগ্রহ, উল্কা ইত্যাদি এবং কখনো কখনো ধূমকেতু। ধূমকেতু কিন্তু অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের মতো রোজ রোজ দেখা যায় না। কোন ধূমকেতু যদি চলার পথে কখনো পৃথিবীর কাছে চলে আসে, তবেই আমরা সেটিকে কিছুদিনের জন্য দেখতে পাই। কিন্তু ধূমকেতুর পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আসার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কখন কোন্ ধূমকেতু পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আসবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অজানা থাকে। শুধু অল্প কয়েকটি ধূমকেতুর কথা জানা গেছে, যেগুলি কয়েক বছর পর পর পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আসে এবং তখন কিছুদিনের জন্য আমরা তাদের আকাশে দেখতে পাই।

এরকমই একটি বিখ্যাত ধূমকেতু হলো 'হ্যালির ধূমকেতু' (Halley's Comet), যেটি ৭৬ বছর অন্তর পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আসে এবং পৃথিবীর মানুষকে সচকিত করে দিয়ে যায়। গত শতাব্দীতে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের পরিমণ্ডলে এসেছিল ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে। বিশেষ কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে এই ধূমকেতুটি ২০৬২ সালে আবার আমাদের কাছে আসবে বলে আশা করা যায়। গত শতাব্দীর শেষ দশকে এসেছিল দুটি উজ্জ্বল ধূমকেতু—'ধূমকেতু হায়াকুতাকে' (Comet Hayakutake, 1995-1996) এবং 'ধূমকেতু হেল-বপ' (Comet Hale-Bopp, 1996-1997)। তখন এই ধূমকেতুগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ধূমকেতু হায়াকুতাকে ছিল বেশ উজ্জ্বল, খালি চোখে খুব ভাল দেখা গেছে। কিন্তু পৃথিবীর আকাশে তার উপস্থিতি ছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য, সে যেন তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ার জন্য ছিল ব্যগ্র। ধূমকেতু হেল-বপও এসেছিল আমাদের কাছে অনেক আশার বাণী নিয়ে। বলা হয়েছিল, এটি হবে শতাব্দীর সেরা ধূমকেতু। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি, এটিও চলে গেছে আমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রেখেই। হেল-বপ আরেকবার প্রমাণ করল, ধূমকেতু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সবসময় মেলে না।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধূমকেতু মানুষের মনে রহস্য রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছে। এর মূল কারণ দুটি। প্রথমত, ধূমকেতুর আবির্ভাব হয় হঠাৎ; কোন পূর্বসঙ্কেত ছাড়াই এরা পৃথিবীর পরিমণ্ডলে চলে আসে। দ্বিতীয়ত, প্রথম দেখার পর থেকে ধূমকেতুর আকৃতি এবং গঠন অনবরত বদলাতে থাকে। আকাশের অন্য কোন জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে এটা ঘটে না। এভাবে ধূমকেতুটি কক্ষপথে চলতে চলতে পৃথিবীর পরিবেশে কিছুদিন থেকে বিস্তর বৈভব প্রদর্শন করে আবার ধীরে ধীরে গ্রহজগৎ থেকে দূরে, বহু দূরে চির অন্ধকার এবং শীতলতার রাজ্যে প্রবেশ করে।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক দার্শনিকগণ ধূমকেতুকে মনে করতেন পৃথিবীর আবহাওয়ার কোন ব্যাপার। এই ভুল ধারণা ইউরোপীয়ানদের মধ্যে (ভারতীয়দের মধ্যে নয়) প্রায় দুহাজার বছর প্রচলিত ছিল। এই ভ্রান্তির নিরসন করেন ডেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) ১৫৭৭ সালে। ঐবছর পৃথিবীর আকাশে এক বিশাল ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। এই ধূমকেতুটি বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করে টাইকো ব্রাহে বুঝলেন, ধূমকেতুরা মহাকাশের জ্যোতিষ্ক, আবহাওয়ার কোন ব্যাপার নয়।

প্রাচীনকালে ধূমকেতু সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা ভ্রান্তিজনিত ভয় ছিল, কারণ ধূমকেতুর আসল পরিচয় এবং প্রকৃতি তাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আবার এটাও দেখা গেছে, ঘটনাচক্রে ধূমকেতুর আবির্ভাবের সাথে কখনো কখনো এসে গেছে যুদ্ধ, মহামারী, রাজার মৃত্যু প্রভৃতি বড় দুর্ঘটনা। তাই ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের ভয় এবং কৌতূহল ছিল স্বাভাবিক। আজকাল অবশ্য ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের যে কৌতূহল তা প্রধানত বিজ্ঞানবিষয়ক।

ধূমকেতুর পর্যায়কাল

পর্যাবৃত্ত ধূমকেতুদের কম বেশি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়কাল থাকে। কিন্তু সব ধূমকেতুই পর্যাবৃত্ত নয়। পর্যাবৃত্ত ধূমকেতুরা দীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথ ধরে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। যেসব ধূমকেতু অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে, তাদের কোন নির্দিষ্ট পর্যায়কাল হয় না। তারা একবার পৃথিবীর পরিমণ্ডলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে মহাকাশে হারিয়ে যায়, আর কখনো ফিরে আসে না। হেল-বপ ধূমকেতুটি পর্যাবৃত্ত এবং এটির পর্যায়কাল ৩,০০০ বছরের কিছু বেশি বলে জানা গেছে; অর্থাৎ এটি দীর্ঘ পর্যায়কালযুক্ত ধূমকেতুর উদাহরণ। যেসব ধূমকেতুর পর্যায়কাল ২০০ বছরের বেশি, তাদের বলা হয় দীর্ঘ পর্যায়কালযুক্ত ধূমকেতু। মাত্র ৭৬ বছর পর্যায়কালযুক্ত হ্যালির ধূমকেতু সে-হিসাবে হ্রস্ব পর্যায়কালযুক্ত ধূমকেতু।

প্রাক্তন প্রধান, ফলিত গণিত বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, এম. পি. বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ।

আমরা বলতে পারি, হ্যালির ধূমকেতুটি এক ব্যক্তির জীবৎকালে গড়ে একবার দেখা দেয়। কিন্তু মানবসভ্যতার কোন্ স্তরে হেল-বপ আগের বার এসেছিল? ইতিহাসের বিচারে বলা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ১,০০০ বছর আগে, অথবা গ্রিকরা যখন ট্রোজাস যুদ্ধে জীবনপণ লড়াই করছিল, তখন হেল-বপ ধূমকেতুটি একবার সেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে এবং সম্ভবত যোদ্ধাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে চলে যায়।

ধূমকেতুর পর্যায়কাল সাধারণত খুব দীর্ঘ হয়। এমন বহু ধূমকেতুর কথা জানা গেছে, যাদের পর্যায়কাল হেল-বপ-এর থেকে অনেক গুণ বেশি। এমন একটি ধূমকেতু হলো 'কহুটেক' (Kohutek)। জানা গেছে এটির পর্যায়কাল প্রায় ৭৬,০০০ বছর। এটি এসেছিল ১৯৭৪ সালে।

হ্যালির ধূমকেতুর চিত্র

ন্যূনাধিক ৫০টি ধূমকেতুর কথা আমরা জানি, যাদের পর্যায়কাল ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এগুলির কক্ষপথের অপসূর (Aphelion) দূরত্ব বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি এবং এগুলির কক্ষতলও ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) কাছাকাছি থাকে। এই ধূমকেতুগুলিকে বলা হয় বৃহস্পতির পরিবার-ভুক্ত, কারণ এগুলির কক্ষপথ নির্ধারিত হয়েছে বৃহস্পতির প্রবল টানে আগের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতির ফলে। এই পরিবারেরই একটি ধূমকেতু 'এঙ্কি' (Encke), যার পর্যায়কাল মাত্র ৩.৩ বছর। এটি সবচেয়ে ছোট ধূমকেতু।

ধূমকেতুর গঠন ও আকৃতি

ধূমকেতুর শরীরের মূল অংশটি হলো এর 'নিউক্লিয়াস'। নিউক্লিয়াসটি আকারে ছোট, সাধারণত এর ব্যাস হয় ১০ থেকে ৫০ কিলোমিটারের মতো। এটি মহাজাগতিক ধূলি-বিজড়িত নানারকম গ্যাসের জমাট বরফ দিয়ে তৈরি। ধূমকেতু যখন সূর্যের আকর্ষণে ক্রমশ তার কাছাকাছি আসতে থাকে, তখন সূর্যের তাপে নিউক্লিয়াসের কঠিন বরফের উপরিভাগ থেকে বাষ্পীভবন এবং উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয়ে নিউক্লিয়াসকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ধূমকেতুটি যতই সূর্যের কাছে আসতে থাকে ততই অধিকতর তাপের ফলে ক্রমশ এই গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এক বিশালায়তন গ্যাসের আবরণ নিউক্লিয়াসকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে ফেলে। গ্যাসের এই আবরণকে বলা হয় 'কোমা' (Coma)। কোমার আকার সাধারণত খুব বড় হয়। কোন কোন ধূমকেতুর ক্ষেত্রে কোমার ব্যাস কয়েক লক্ষ কিলোমিটার বা তারও বেশি হতে দেখা গেছে।

নিজের কক্ষপথ ধরে ধূমকেতু যখন সূর্যের আরো কাছে, অনুসূর (Perihelion) অবস্থানের কাছাকাছি চলে আসে তখন কোমার গ্যাসের ওপর সূর্যের তাপ প্রখরতর হয় এবং তীব্র বিকিরণের চাপে গ্যাস এবং ধূলিকণা সূর্যের বিপরীত দিকে জেটের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ধূমকেতুর শরীরের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অংশটি অর্থাৎ এর পুচ্ছটির সৃষ্টি হয়। বাস্তবিকপক্ষে, সব ধূমকেতুতেই দুটি পুচ্ছের উদ্ভব হয়, যদিও প্রতি ক্ষেত্রে দুটি পুচ্ছকে আলাদাভাবে স্পষ্ট দেখা যায় না। এরকম ধূমকেতুর উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হলো ধূমকেতু 'মারকস' (Markos), যেটি ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে অতি উজ্জ্বলরূপে খালি চোখে কলকাতার আকাশে অনেকদিন ধরে দেখা গেছে।

প্রশ্ন হলো, ধূমকেতুর দুটি পুচ্ছ কেন এবং কীভাবে তৈরি হয় এবং এদুটির বৈশিষ্ট্য কী? আগেই বলা হয়েছে, ধূলিবিজড়িত নানাজাতীয় বরফের উপাদানে ধূমকেতু গঠিত। প্রথমে প্রখর সূর্যতাপে বরফ গলে ধূলিকণা এবং গ্যাস নির্গত হয়। এই নির্গত পদার্থ পরে বিকিরণজনিত চাপের ফলে সূর্যের বিপরীত দিকে প্রলম্বিত হয়ে একটি পুচ্ছ তৈরি করে। এই পুচ্ছটিই প্রথমে তৈরি হয় এবং এটির উপাদানে গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা থাকায় এটিকে ধূলিপুচ্ছ (Dust tail) বলা হয়। সাধারণত ধূলিপুচ্ছটি আকাশে কিছুটা বক্রভাবে প্রলম্বিত হয়। এর কারণ ধূলিপুচ্ছের গ্যাস এবং ধূলিকণার ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পুরোপুরিভাবে কাজ করে।

ফলে সূর্যের নিকটবর্তী অংশের পদার্থ নিয়ে দূরবর্তী অংশের পদার্থ অপেক্ষা ধূমকেতুটি অধিকতর বেগে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ সূর্যের নিকটবর্তী অংশটি দূরবর্তী অংশের তুলনায় বেশি এগিয়ে যায়, ঠিক যেমন সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি তাদের কক্ষপথে দূরের গ্রহগুলি অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলে। এভাবে পুচ্ছের নিকটবর্তী অংশগুলির এগিয়ে আসা এবং দূরবর্তী অংশগুলির অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকার ফলে সমগ্র পুচ্ছটি একটু বক্রভাব প্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ধূলিপুচ্ছটি সামগ্রিকভাবে কেপলারের সূত্র মেনে চলে। এই হিসাবে ধূলিপুচ্ছকে 'কেপলারীয় পুচ্ছ' (Keplerian Tail) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে।

ধূমকেতুর দ্বিতীয় পুচ্ছটি তৈরি হয় আয়নিত গ্যাসের দ্বারা। তীব্র সূর্যরশ্মি বিকিরণের ফলে কোমার গ্যাস অংশত আয়নিত হয়ে যায়। আবার সূর্যের দেহ থেকেও অনবরত সৌরবায়ু (Solar Wind) নির্গত হতে থাকে। তার সৌরকণাগুলিও আয়নিত এবং এগুলি যখন তীব্রবেগে সূর্যের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সৌরদেহের চৌম্বকক্ষেত্র সঙ্গে করে টেনে নিয়ে আসে। এই চৌম্বকশক্তি এবং আয়নিত সৌরকণা একত্রে কোমার আয়নিত গ্যাসকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তীব্রবেগে সূর্যের বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ ও ঋজু আয়নপুচ্ছের জন্ম দেয়। আয়নপুচ্ছের ওপর প্রযুক্ত বল প্রধানত চৌম্বকশক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, এখানে মহাকর্ষীয় শক্তির ভূমিকা গৌণ। এজন্য আয়নপুচ্ছটি স্বাভাবিকভাবেই হয় দীর্ঘ এবং ঋজু, বক্রতার কারণ এখানে প্রায় অনুপস্থিত। মূলত চৌম্বকশক্তির প্রভাবে আয়নপুচ্ছের সৃষ্টি হয় বলে এটিকে 'চৌম্বকপুচ্ছ'ও (Magnetic Tail) বলা যায়।

ধূমকেতুর মূল উপাদান

প্রশ্ন হলো, কি কি রাসায়নিক উপাদানে ধূমকেতুর শরীর গঠিত। অর্থাৎ ধূমকেতুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এর মূল উপাদান সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে আসা যায়? দূরবর্তী কোন বস্তুর উপাদান জানার উপায় হচ্ছে তার বর্ণালির বিশ্লেষণ করা। ধূমকেতুর উপাদানও আমরা জানতে পারি তার গ্যাসের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে। বর্ণালির এক-একটি রেখা কোন নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ বা কোন যৌগ বা অণুর অস্তিত্বের নিদর্শন। কাজেই রেখাগুলির পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ দ্বারা বস্তুটির উপাদান জানা যায়। ধূমকেতুর শরীরের মূল অংশ নিউক্লিয়াসের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি না, কারণ এটি কোমার গভীরে অদৃশ্য থাকে। কাজেই বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কোমা বা পুচ্ছের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং তা থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান সম্বন্ধে। এভাবে বহু বছর যাবৎ বহু ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ধূমকেতুর উপাদান সম্বন্ধে যা জানা গেছে তার সারাংশ নিম্নরূপ :

(১) OH, NH, NH_2 প্রভৃতি যৌগ।

(২) CN, CH, CO, CO_2, CS, C_2, S_2, H_2O এবং NH_3 প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল অণুসকল।

এছাড়া আয়নপুচ্ছের বর্ণালিতে প্রধানত যেসব আয়নিত অণু দেখা যায়, সেগুলি হলো—

CO^+, CO_2^+, N_2^+, H_2O^+, C_2^+, CH^+ এবং OH^+।

আবার ধূমকেতুটি যদি সূর্যের খুব কাছে আসে, তাহলে খর সূর্যতাপে ধূমকেতুর মধ্যে ধাতব অণুরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তাদের নিজস্ব বর্ণালি বিস্তার করে। এই বর্ণালি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে Na, K, Ca, Cr, Mg, Fe, Ni, Si, Co, Cu ইত্যাদির অস্তিত্ব।

নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্ব

বর্ণালি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধূমকেতুর গ্যাসীয় উপাদান আমরা জেনেছি। এবারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে—ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের গঠনে মূল পদার্থ কি কি? বর্ণালিতে দৃষ্ট গ্যাসসমূহ নিউক্লিয়াসের বাষ্পীভূত পরিণতি। এর থেকেই আমাদের নিউক্লিয়াসের আদি উপাদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। নিউক্লিয়াসের গঠন সম্বন্ধে প্রধানত দুটি তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটিকে বলা হয়েছে 'Gravel Bank Model'। এটির মূল প্রবক্তা এইচ. এ. নিউটন (H. A. Newton), পরে আর. এ. লিটলটন (R. A. Lyttleton) এবং বি. ওয়াই. লেভিস (B. Y. Levis) দ্বারা সংশোধিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান ধূলি, বালি এবং কাঁকড়ের মিশ্রণ এক পদার্থ, যা একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে কক্ষপথে চলতে থাকে। নিউক্লিয়াসের মূল গঠনের দ্বিতীয় তত্ত্বটির প্রবক্তা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেড হুইপ্‌ল (Fred Whipple)। এই তত্ত্ব-মতে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস একটি 'Dirty *Snowball Model*'। এই মডেল অনুযায়ী ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান ধূলি-ময়লা মিশ্রিত জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য কার্বন যৌগের জমাট বরফ। অর্থাৎ মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি যেসব উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে বিদ্যমান, ধূমকেতুর শরীরও মূলত সেইসব উপাদানেই গঠিত। ধূমকেতু যখন সূর্যের

কাছে আসে তখন সৌরতেজে এইসব জমাট বরফ গলে গিয়ে নানারকমের গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই উৎপন্ন গ্যাসের দ্বারা প্রথমে কোমা এবং পরে দুটি পুচ্ছের উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর তথ্যনির্ভর এবং যুক্তিসম্মত, অতএব গ্রহণযোগ্য? ১৯৮৬ সালে যখন হ্যালির ধূমকেতু এসেছিল, তখন 'ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি' 'জিয়োট্টো' (Giotto) নামে একটি মহাকাশযান পাঠিয়ে হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। এই পর্যবেক্ষণের ফল বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, হুইপলের তত্ত্বটিই ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মডেলরূপে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ধূমকেতুর উৎসস্থল

ধূমকেতুর উৎস কোথায়? তারা কোথা থেকে আসে আবার ফিরে যায়? সেখানে কতগুলি ধূমকেতু থাকার সম্ভাবনা? এইসব প্রশ্নের একটি যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর পাওয়া যায় বিখ্যাত ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জান ওর্টের (Jan Oort) প্রদত্ত তত্ত্ব থেকে। ওর্টের মতে, সৌরজগতের হিমশীতল প্রত্যন্ত অংশে, পৃথিবী এবং সূর্য থেকে বহুদূরে, এক থেকে তিন আলোকবর্ষের মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রায় দশহাজার কোটি ধূমকেতু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই বিশাল ধূমকেতুপুঞ্জের নাম দেওয়া হয়েছে 'ওর্ট ক্লাউড' (Oort Cloud)। বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহমণ্ডলী এবং সূর্যের প্রতিবেশী কোন নক্ষত্রের টানে কখনো কখনো এক একটি ধূমকেতু তার প্রিয় আবাস ছেড়ে কক্ষপথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং সূর্য-পরিক্রমা কালে পৃথিবীর আকাশে আবির্ভূত হয়। আমরা তখন কিছুদিনের জন্য একটি অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।

ওর্ট তত্ত্বের প্রায় সমসাময়িক কালে বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গেরার্ড কাইপার (Gerard Kuiper) ধূমকেতুর উৎস বিষয়ে অপর একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। কাইপারের মতে, ধূমকেতুরা সৌরজগতের এমন একটি অঞ্চলে রয়েছে যার অবস্থান ওর্ট ক্লাউডের তুলনায় সূর্যের অনেক কাছে। কাইপার তত্ত্বে ধূমকেতু-অধ্যুষিত এই অঞ্চলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কাইপার বেল্ট' (Kuiper-Belt)। সূর্যের গ্রহপরিবারের বাইরে খানিকটা দূরে এই কাইপার বেল্টের অবস্থান কল্পিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধূমকেতুর কক্ষপথ এবং পর্যায়কাল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, তারা পৃথিবীর আকাশে আসে সৌরজগতের বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে। এজন্য ধূমকেতু-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কাইপার বেল্ট নয়, ওর্ট ক্লাউডই ধূমকেতুর সত্যিকারের আবাসস্থল।

ধূমকেতুর ভাঙন ও বিনাশ

আগেই বলা হয়েছে, সূর্যের কাছে আসার সময় এবং পরে চলে যাওয়ার সময় ধূমকেতুর বাইরের গঠনের ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে। শুধু তাই নয়, সূর্যের কাছে এসে প্রচণ্ড সৌরতাপ এবং বিকিরণজনিত চাপের ফলে ধূমকেতুর শরীরে ভাঙন দেখা দেয়। যে-সূর্য ধূমকেতুকে একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন জ্যোতিষ্কের সৌন্দর্য দান করে,
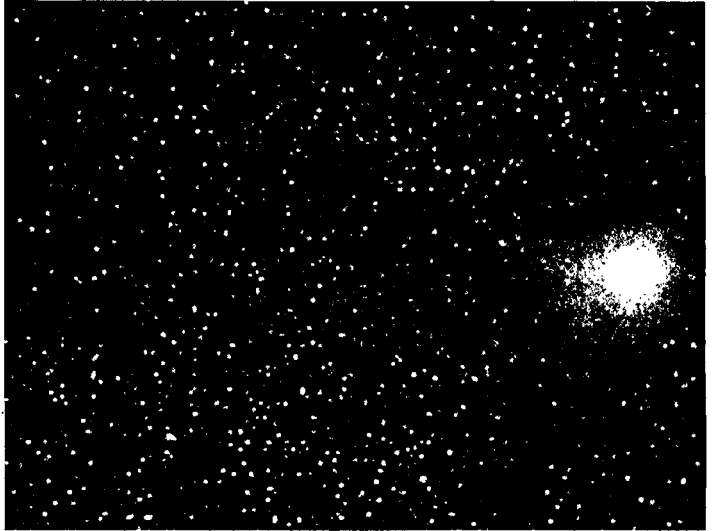
মহাকাশে দৃশ্যমান আরেকটি ধূমকেতুর চিত্র

সেই সূর্যই আবার ধূমকেতুকে ক্রমশ বিনাশের পথে ঠেলে দেয়। নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠতল থেকে বাষ্পীভবনের ফলে যে বিশালায়তন গ্যাস নির্গত হয়ে কোমা ও পুচ্ছের সৃষ্টি করে, সেই গ্যাস আর কখনো পিতৃভূমিতে (Parent body) ফিরে যায় না। এই পুরো গ্যাস এবং ধূলিময়লা ধূমকেতুর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। ফলত, ধূমকেতু যখনি সূর্যের কাছে আসে, তখন তার শরীরের কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সে মৃত্যুর দিকে এক পা এগিয়ে যায়। এজন্য হ্রস্ব বা নাতিদীর্ঘ পর্যায়কালযুক্ত ধূমকেতুরা স্বল্পায়ু হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, হ্যালির ধূমকেতু আর ২০-

২৫ বার সূর্যের কাছে এলেই তার অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে। অর্থাৎ হ্যালির ধূমকেতুর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল আর কম-বেশি ২,০০০ বছর। এভাবে ক্রমশ ক্ষয় হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ছাড়াও কোন কোন অবস্থায় আবার ধূমকেতু আচমকা দ্রুত মৃত্যুর হাতছানি পেতে পারে। ধূমকেতুটি যদি সূর্যের বিপজ্জনকভাবে কাছে আসে, তবে প্রচণ্ড সৌরতাপের ফলে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি টুকরো আবার পরে এক-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ধূমকেতুর জন্ম দেবে, কিন্তু তারাও হবে স্বল্পায়ু। সাম্প্রতিক কালে বিশাল এবং অতি উজ্জ্বল দুটি ধূমকেতুর অনুরূপ পরিণতি হতে দেখা গেছে। ১৯৬৫ সালে 'ইকেয়া-সেকি' (Comet Ikeya-Seki) এবং ১৯৭৬ সালে 'ওয়েস্ট' (West)—এই ধূমকেতু-দুটি সূর্যের অতি সান্নিধ্যের ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

হ্যালির ধূমকেতুর অপর একটি চিত্র

ধূমকেতু থেকেই কি পৃথিবীতে জীবনের বীজ এসেছে?

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, ধূমকেতুর পরিত্যক্ত গ্যাসের মধ্য দিয়েই হয়তো মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে জীবনের বীজ প্রেরিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, ধূমকেতুর উপাদানে রয়েছে কতকগুলি সরল ও জটিল জৈব মৌল এবং অণু—যেগুলি জীবনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জন্য অপরিহার্য। এইসকল অণু প্রথমে ধূমকেতু থেকে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে তার কিছু অংশ পৃথিবীর আবহাওয়া অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, সুদূর অতীতে এভাবেই হয়তো ধূমকেতুর পরিত্যক্ত গ্যাসের পথ বেয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল আদি জীবনের বীজ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এবং তাঁর সহকর্মী এন. সি. বিক্রমসিংঘে (N. C. Wickramsinghe) এরকম একটি তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁরা নানা তথ্য এবং যুক্তির সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এভাবে ধূমকেতুর ভস্মাবশেষ ধরে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত হওয়া অসম্ভব নয়। এই তত্ত্বটি এরিক ভন দানিকেনের (Eric Von Daniken) মতবাদ থেকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। অবশ্য হয়েলের তত্ত্বটি যদিও চমৎকার ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য, কিন্তু তত্ত্বটি অত্যন্ত বিতর্ক-সাপেক্ষ এবং এখনো পর্যন্ত এর স্বপক্ষে কোন অভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি।

ধূমকেতুরা সৌরজগতের আদি ইতিহাসের সাক্ষী

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ধূমকেতুরা সৌরজগৎ সৃষ্টির আদিমতম উপাদানের সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই ধূমকেতুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৌরজগতের আদিযুগের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব। এর কারণ হলো, গত প্রায় ৪৫০ কোটি বছরে (এটি সূর্যের আনুমানিক বয়স) ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের উপাদানগত এবং ভৌত অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা জানি, চাপ এবং তাপের প্রভাবে পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে, তার প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। কিন্তু ধূমকেতুরা সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাপ ও চাপের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে। কারণ, ধূমকেতুর ভর কম হওয়ায় চাপের প্রভাব নগণ্য। আবার সৌরজগতের সুদূর হিমশীতল প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানের ফলে ধূমকেতুরা সূর্য বা অন্য কোন নক্ষত্রের তাপের প্রভাব থেকে মুক্ত। ফলত, ধূমকেতুর কোন উপাদানগত বা ভৌত পরিবর্তন প্রায় হয়নি। ধূমকেতুতে আমরা পাই সেই আদি এবং অকৃত্রিম পদার্থের সাক্ষ্য, যার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল গোটা সৌর পরিবার। পরবর্তী শত শত কোটি বছরে গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য ইত্যাদিতে তাপ ও চাপের প্রভাবে উপাদানগত ও ভৌত পরিবর্তন হয়েছে এবং এদের মধ্যে আদি পদার্থের গুণগুলি হারিয়ে গেছে। কিন্তু ধূমকেতুতে রয়ে গেছে সেই আদি বস্তুর সঠিক পরিচয়। এজন্য বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর মধ্যে সৌর-জগতের আদি ও অকৃত্রিম ইতিহাসের ছোঁয়া খুঁজে বেড়ান। ❑

ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় বা বারাঠাকুর

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়*

কথায় বলে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার ৩,৩২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ব্রত, পার্বণ, লৌকিক দেবদেবীর পূজার কথা ধরলে সংখ্যাটা যে কোথায় দাঁড়াবে তার হিসাব কে করবে।

মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে যেমন বাংলার গ্রামীণ সমাজে ঘরে ঘরে আরম্ভ হয় 'মাঘমণ্ডল ব্রত', তেমনি দক্ষিণবঙ্গে বহুপূজিত লৌকিক দেবতা হলেন 'বারাঠাকুর'। আনন্দের কথা, এইসব লৌকিক দেবদেবীপূজার মধ্য দিয়ে বাংলার বিলীয়মান লোকশিল্পের ধারা আজও ক্ষীণভাবে হলেও প্রবাহিত।

বারাঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উল্টে রাখা ভাঁড় বা ঘটের আকৃতির ওপর চোখ, মুখ আঁকা হয়। প্রধানত আঁকাই হয়, কোন কোন স্থানে উৎকীর্ণও করা হয়। একে 'মুণ্ডমূর্তি' বলা যেতে পারে। সাধারণত একজোড়া মুণ্ডমূর্তি একত্রে পূজা করা হয়। এই ধরনের মূর্তিশিল্পীদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—কুম্ভকার, সূত্রধর ও পটুয়া। সূত্রধর ও পটুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে সূত্রধর সম্প্রদায় দারু-ভাস্কর্য ও পুতুল তৈরিতে দক্ষ। আর পটুয়াশিল্পীরা পটশিল্প অবলুপ্তির পথে যাওয়ার পর মৃৎশিল্পীর পথ ধরেছেন।

বারাদেবতার মুণ্ডমূর্তি কুম্ভকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেহেতু তাঁদের সৃষ্টির প্রধান হাতিয়ার চাকা বা চাক, তাই তাঁদের চিন্তা, কল্পনা, ভাবনা, দক্ষতা, স্বপ্ন, সৃজনশীলতা কুমোরের চাকার ঘূর্ণনে আবর্তিত অর্থাৎ কোনকিছু তৈরির সময় চাকার সাহায্যে তার কিছুটা অংশ গড়ে নেওয়া হয়। বারামূর্তি এর পরিচিত উদাহরণ। ঘটের অনুরূপ মুণ্ডমূর্তির উপরিভাগ উঁচুদিকে অনেকটা বাড়ানো ও বৃক্ষপত্রের আকৃতিতে গঠিত। এই অংশটিই দেবতার মুকুট। মুকুটের ওপর প্রধানত লতাপাতার ধরনে অলঙ্করণ করা থাকে। গঠন, চোখ-মুখের অঙ্কনশৈলী ও রঙ ব্যবহারের রীতিতে আদিম সারল্য প্রতীয়মান।

এবার বারাঠাকুর পূজার কথা বলা যাক। বারাঠাকুরের উল্লেখ কোন শাস্ত্রে নেই। তাই সহজেই অনুমান করা যায়, ইনি শাস্ত্রীয় দেবতা নন, সম্পূর্ণভাবেই লোকদেবতা—যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই পৌরোহিত্য করেন এবং তা শাস্ত্রীয় অন্যান্য পূজাবিধিরই অনুরূপ। বারাঠাকুরের পূজা গৃহমধ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। সুন্দরবন অঞ্চলে উন্মুক্ত টাঁড় বা মাঠের মধ্যে, গাছতলায় বা জলাশয়ের ধারে এই পূজা হয়। ইনি বছরে একবারই পূজা পান এবং এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর বিসর্জন হয় না।
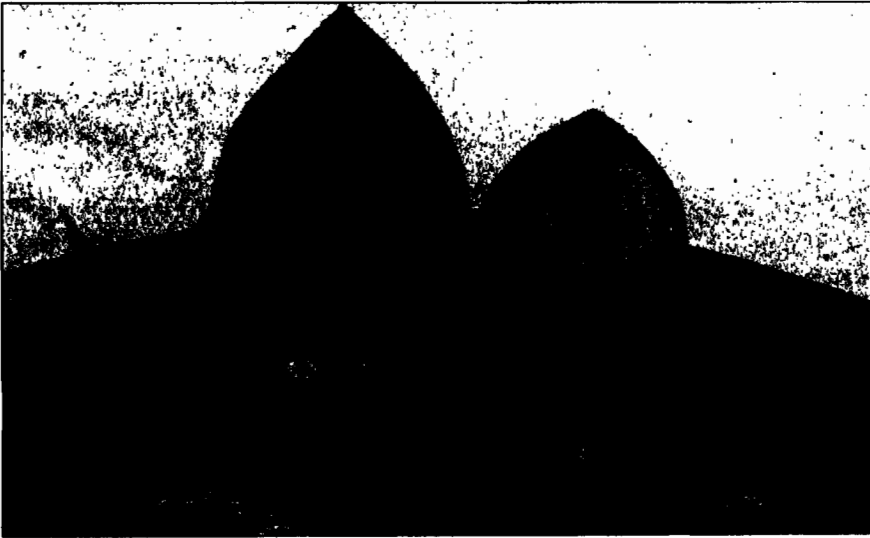
দক্ষিণ রায় ও নারায়ণী ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের মতে, দুটি মূর্তির একটি ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতীক, যিনি শিবানুচর বা শিবপুত্র এবং অপরটি নারায়ণীর প্রতীক, যিনি দক্ষিণ রায়ের মা। দক্ষিণ রায়ের পূজার উৎপত্তি দক্ষিণবঙ্গের বনাঞ্চলে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বারা দক্ষিণ রায়ের কাটা মুণ্ড। আবার বারা গণেশের মুণ্ড—এমন ধারণাও প্রচলিত আছে।

** দক্ষিণ কলকাতা-নিবাসী, পেশায় চারুশিল্পী ও প্রাবন্ধিক।*

মধ্যযুগের কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল কাব্য'-এ দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর যুদ্ধের বর্ণনাতে বারা দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

"বড় খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার॥
কাটা মুণ্ড বারাপূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে॥"

কবি হরিদেবের 'রায়মঙ্গল কাব্য'-এ পাওয়া যায়—

"আশ্চম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা
দক্ষিণে পড়িয়া তাই হইল দেবতা॥"

'বারা' শব্দের অর্থ ঘট। মনসা, শীতলা, চণ্ডী, চামুণ্ডা প্রভৃতির ঘটকেও বারা বলা হয়। কিন্তু দক্ষিণ রায়ের পূজা অধিক প্রচলিত হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বারা বলতে দক্ষিণ রায়ের বারা বোঝায়। আবার অন্যধরনের যুগ্মমুণ্ড মূর্তিও দেখা যায়। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এর একটি দক্ষিণ রায়ের, অপরটি কালু রায় বা কালু গাজীর প্রতীক।

দক্ষিণবঙ্গের অনেক অঞ্চলে বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে একটি বারার পূজাও হয়ে থাকে। কালু গাজীর বারা প্রতীক ছাড়াও সাবেক পদ্ধতিতে আঁকা পটও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে গাজীর পট প্রায় লুপ্ত একটি শিল্প।

প্রতিবছর পৌষমাসের শেষে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র কুম্ভকার মৃৎশিল্পীরা প্রচুর পরিমাণে বারামূর্তি তৈরি করেন। মাঘ মাসে প্রধানত দিনের বেলায় বারাপূজার চল আছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে রাত্রিবেলাও পূজা হয়। মূর্তিদুটি মাটির বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং উক্ত বেদিটি খেজুর পাতা দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়। দেবতার কাছে হাঁস, ছাগ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয় এবং মদ, আমিষ নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। এধরনের পূজার আঞ্চলিক নাম 'জাঁতাল'।

বারা কিন্তু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতীক নন বলেই অনুমান। বারা যে দক্ষিণ রায় নন—এর সমর্থনে অনেক যুক্তি বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা হলেও তাঁর মূর্তি-পরিকল্পনায় কিন্তু আদিম রূপকল্পের পরিচয় নেই। অমিয় বসু সম্পাদিত 'বাংলায় ভ্রমণ' (১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ, ১৯৪০) গ্রন্থে পাওয়া যায়—"দক্ষিণ রায়ের মূর্তিটি যোদ্ধ বেশধারী ও অতি বীরত্বব্যঞ্জক। ইহার পরিধানে কষায় বস্ত্র, গলে উত্তরীয়, মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, প্রকোষ্ঠে (কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত দেহাংশ) সুবর্ণ বলয়, পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ তূণীর ও ধনু, হস্তে মালিকা ও উন্মুক্ত কৃপাণ এবং কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। এইরূপ বীরবেশধারী বিগ্রহ বাংলার আর কোথাও নাই। দেখিলে মনে হয়, সুন্দরবনের দেবতার এই অপরূপ রূপসজ্জা স্থানোপযোগী বটে। এই দেবতার স্বতন্ত্র কোন ধ্যান নাই। গণেশের ধ্যানে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।"

অপরপক্ষে বারার দুটি মুণ্ডের মধ্যে নারায়ণী বারাটিতেও গালপাট্টা দেখা যায়। এই অস্বাভাবিকতার কারণ হিসাবে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন ঃ "তাঁর সহদেবতা নারায়ণীর মূর্তি থেকে ধরা যায় ইনি কোন কৌম পুরুষ দেবতা। আদিম যুগে বহু লোক গোঁফ কাটত, কিন্তু দাড়ি বা গালপাট্টা রাখত। সেই যুগে কল্পিত কোন দেবতা দক্ষিণ রায়ের পাশে বসেছেন বা দুজনে ছিলেন, দক্ষিণ রায়ের মধ্যে একজন মিলিয়ে গেছেন, অপর দেবতাটি তাঁর গালপাট্টাসহ স্বরূপ বজায় রেখেছেন, সে-কারণে নারী বলে অভিহিত হয়েও তাঁর মুখে গালপাট্টা।" নারায়ণীকে তান্ত্রিক দেবীও বলা হয়েছে। একসময় দক্ষিণ বাংলায় তান্ত্রিকদের খুব প্রাধান্য ছিল। কালক্রমে দক্ষিণ রায় ও লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের একটি মিশ্রণ ঘটে ও দুই দেবতা একত্র হয়ে যান। আবার সাঁওতাল মুণ্ডারা 'বারেয়া' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করে, যার অর্থ দুই। অবশ্য 'বারেয়া' শব্দ থেকেই যে বারা শব্দ এসেছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আবার কোন কোন গবেষকের মতে, 'বারা' অর্থে পানপাত্র, বৈদিক সোমপাত্র, তান্ত্রিক শ্রীপাত্র। চতুর্দিক ঘেরা সামান্য উঁচু বেদিকেও বারা বলা হয়।

সবদিক বিচার করে বারা দক্ষিণ রায় নন বলেই ধারণা। বারামূর্তিতে তো বটেই, দুটি ঘটের একত্রে পূজার মধ্যেও আদিমতার প্রকাশ।

একসময় শহর কলকাতায় বারুইপুর ও সুন্দরবন অঞ্চল থেকে আসা গায়কদের গলায় দক্ষিণ রায়ের গান শোনা যেত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে আর তাদের দেখা মেলে না। বারুইপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম ধপধপিতে দক্ষিণ রায়ের পাকা মন্দির রয়েছে। মূর্তিটি বেশ বড়, নিত্যপূজা হয়। প্রতি শনি ও মঙ্গল বার প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। মূর্তির হাতে ও পাশে সাজানো অস্ত্রের মধ্যে বন্দুকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মূল মূর্তি ছাড়াও বেশ কিছু ছোট মূর্তি চোখে পড়ে। মানসিক করে ভক্তরা এগুলি দিয়ে গেছে। এই মূর্তির স্থানীয় নাম 'ছলন' মূর্তি।

বারুইপুর থানার অপর একটি গ্রামের নাম 'দক্ষিণ রামনগর' (কামারপাড়া)। এই গ্রামের কয়েকটি স্থানে গাছতলায় বারাঠাকুরের যুগ্মমূর্তি দেখা যায়। দক্ষিণ শহরতলির একটি মাটির হাঁড়ি-কলসির দোকানে বারামূর্তি বাস্তুদেবতা-রূপে বিক্রি হতে দেখা যায়। ❑

এই সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য শ্রীমৎ স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *(ক) পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর একটি শিশু শিক্ষার মাধ্যমে নিজের অভিপ্রেত 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব' লাভ করে। কিন্তু কেউ পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভের চেষ্টা করে না। ফলে আমরা পাই অনমনীয় আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষ। এরা স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যায়নে অক্ষম। একজন পরিণত মানসিকতার বিকশিত ব্যক্তিত্বের মানুষ গড়ে তোলার পিছনে পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কী কর্তব্য হওয়া উচিত?*

(খ) যার আছে সে ত্যাগ করতে পারে, যা নেই তার আবার ত্যাগ কি? কোন বস্তু বর্জন করতে হলে তা আগে অর্জন করতে হবে।—এই কথার ব্যাখ্যা দিলে বাধিত হব। ***—ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, সাঁকরাইল, হাওড়া***

উত্তর ঃ (ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশসাধন করা। শিক্ষা বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করে, সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ করে। যা তা না করে, মানুষকে স্বার্থপর ও দুর্বিনীত করে—তা আর যাই হোক শিক্ষা নয়। এরকম মানুষকে শিক্ষিত না বলে ডিগ্রিধারী বলা যেতে পারে। শিক্ষা কী, আর শিক্ষা কী নয়—এসম্বন্ধে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য স্বামীজীর 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর 'নূতন ভারত গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা' গ্রন্থ-দুটি অবশ্যপাঠ্য।

(খ) "ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩.১২.১৮৮১) "সংসার ভোগের স্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়।" (ঐ, ৯.১১.১৮৮৪) "যাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার।" (ঐ, ৩.৮.১৮৮৪) "কি জান, ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, দিন কাটুক—তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।" (ঐ, ২৪.৫.১৮৮৪)

প্রশ্ন ঃ *ত্রিগুণাত্মক এই পৃথিবী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে বাঁধা জীব। এই তিন গুণের প্রকারভেদ ও তীব্রতা জীবের মধ্যে নির্ধারিত হয় তার প্রারব্ধ ও পূর্ব জন্মের কর্মসংস্কৃতির দ্বারা। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকারভেদ জীবের মধ্যে কি করে হয়েছিল? তখন তো প্রারব্ধ বা পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মসংস্কৃতি ছিল না?*—***তাপসরঞ্জন ঘোষ, জামশেদপুর-৮৩১ ০০৫***

উত্তর ঃ সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। কী করে কী হয়—তার হিসাব সৃষ্টির ভিতরে থেকে বোঝা যায় না। সৃষ্টির বাইরে গেলে আর এপ্রশ্নই থাকে না। বীজ আগে, না গাছ আগে—এপ্রশ্নের উত্তরও সেইরকম।

প্রশ্ন ঃ *রসিক ঠাকুর বৈষ্ণব দোঁহা উল্লেখ করে বলতেন ঃ "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।"—এর অর্থ কি দয়া করে জানালে আনন্দিত হব।* ***—বিপ্লবকুমার রুদ্র, লেকটাউন, শিলিগুড়ি***

উত্তর ঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সবই শক্তির অধীনে। মায়া শক্তিকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মের জীবভাব ধারণ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—"শক্তিরই অবতার", শক্তির লীলাতেই অবতার। পূর্ণব্রহ্ম যখন লীলায় নিজ শক্তিকে অবলম্বন করে অবতাররূপ ধারণ করেন, তখন "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। শ্রীরাধা সেই শক্তি, যাঁর লীলাতে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণব্রহ্ম রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, কালো জামের মতো অসংখ্য কৃষ্ণ গাছে ফলে রয়েছে অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ *বিভিন্ন দেবদেবীর যেমন কালী, দুর্গা, শিব বা বুদ্ধদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণাম করি এবং জপতপ করার সুযোগ পেলে তাও করি। আমার জানতে আগ্রহ হয়, জপ করার সময় ঐ দেব বা দেবীর মধ্যেই ইষ্টকে স্মরণ করব, নাকি ইষ্টের মধ্যেই ঐ দেব বা দেবীকে স্মরণ করব?* ***—মানিক পাল, দুর্গাপুর-৭১৩ ২১৩***

উত্তর ঃ পরমাত্মাই বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ ধারণ করেছেন। আমার ইষ্টদেবতাই ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে বিরাজিত আছেন—এই ভাব অন্তরে রেখে আমরা বিভিন্ন মন্দিরে দেবদর্শনে যাই। সুতরাং যেভাবে ভাবলে ইষ্টদেবতার ধ্যানের সহায়তা হয়, সে-ভাবেই ধারণ করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ *সমাজে যেভাবে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও অত্যাচার বেড়ে চলেছে তাতে যুবসমাজ কিভাবে স্বামীজীর আদর্শে তাদের জীবনকে গড়ে তুলবে? দয়া করে বাস্তবসম্মত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ধন্য হব।*

—বাসুদেব মিশ্র, পাড়া, পুরুলিয়া-৭২৩ ১৫৫

উত্তর ঃ সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল কখনোই থাকে না। প্রাচীনকালেও মুনি-ঋষিদের তপোবনে রাক্ষস-দানবের উৎপাত ছিল। সাধকের জীবনের সামনে বহু প্রলোভন ও ভয়ের বস্তু আসত। তার মধ্যেই তাঁদের সাধনা চলত। তুমি যদি সঙ্কল্প কর স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে চরিত্রগঠন করবে, তাহলে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে তোমাকে অহরহ সংগ্রাম করতেই হবে। সবচেয়ে ভাল জিনিসটি পেতে গেলে সহজে কি তা পাওয়া যায়? তার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে তো হবে। সব অবস্থা অনুকূল হলে চরিত্রগঠন করব—এরকম ভাবা, আর সমুদ্রে ঢেউ থামলে স্নান করব—ভাবা একইরকম নয় কি? এখনো অনেক চরিত্রবান মানুষ তৈরি হচ্ছেন দেখে নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হবে। গীতায় (৬।৫) ভগবান বলেছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।/ আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"—মানুষ বিবেকযুক্ত মন দ্বারা আপনিই আপনাকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে। (যোগারূঢ় করবে); কখনো নিজেকে বিষয়াসক্ত করবে না। কারণ, শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী, মুক্তির হেতু এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু, বন্ধনের কারণ।

প্রশ্ন ঃ *মানবজীবনে 'মায়া' ও 'সংস্কার'—এই দুইপ্রকার প্রারব্ধাবশেষের প্রভাব অপরিসীম। কিভাবে আমরা এই দুইপ্রকার ভোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি? কৃপা করে তার উত্তর দিলে ধন্য হব।*

—নারায়ণ বৈদ্য, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর ঃ গীতাতে ভগবান বলেছেন, ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী আমার এই মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যারা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে আমারই ভজনা করে, তারাই কেবল এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।

পাশাপাশি ঃ (১) গৃহত্যাগী বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীর এই তপস্বীর আশ্রমে গিয়েছিলেন (৪) বুদ্ধদেব এই ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন (৬) ত্রিকালজ্ঞ এই ঋষি বুদ্ধদেবের 'সিদ্ধার্থ' নামকরণ করেছিলেন (৭) বুদ্ধ-জননী (১১) দশবলে বলীয়ান বুদ্ধদেব (১২) "—— শরণং গচ্ছামি" (১৪) "বুদ্ধং —— গচ্ছামি" (১৫) বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি (১৬) "বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ, আবার সার্থক হোক মোহ ——" (রবীন্দ্রনাথ) (১৭) মহাযোগী বুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গকারী দেবতা।

ওপর-নিচ ঃ (২) বুদ্ধদেবের এক জ্ঞানবান শিষ্য, যাঁকে তিনি সঙ্ঘে স্থান দিয়েছিলেন (৩) বুদ্ধদেবের পদার্পণে বৈশালীতে যে-রোগ দূর হয়েছিল (৫) বৈশালী এদেরই দেশ (৬) "চিত্ত তব পরিশুদ্ধ করিও নিয়ত, জানিও বুদ্ধের হয় এ ——" (আম্রপালীর উদ্দেশে বুদ্ধদেব) (৮) শিক্ষাজীবনের শুরুতে বুদ্ধদেবের এক সহপাঠী (৯) শাক্যবংশের যে-উৎসবে সিদ্ধার্থ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীব জীবকে বিনাশ করছে (১০) অবিদ্যা না থাকলে এর উদ্ভব হতে পারে না (বৌদ্ধদর্শন) (১৩) "কিসেরই বা সুখ, কদিনের প্রাণ? ঐ উঠিয়াছে —— গান" (রবীন্দ্রনাথ) (১৪) দুঃখনাশের জন্য সাধককে —— ও বাক্ সংযত করতে হয় (১৫) 'দুঃখের কারণ পরম্পরা'কে বলা হয় 'দ্বাদশ ——'।

● সহকারী গ্রন্থ ঃ **জগতের ধর্মগুরু** (প্রকাশক ঃ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর); **ভারতীয় দর্শন** (প্রকাশক ঃ অরুণ পুরকায়স্থ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-৯, ১ম সং)।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ভক্তদের সচেতন হওয়া জরুরি

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সাফারি স্যুট পরিহিত মোটামুটি বিশিষ্টদর্শন এক ব্যক্তি বাড়িতে এসে হাজির। দোহারা চেহারা, মানানসই গোঁফ, গায়ের রঙ চাপা। হাতে কিছু কাগজপত্র। ঘরে ঢুকে মেট্রো রেলের ডেপুটি ম্যানেজার (রিক্রুটিং) আশিস চট্টোপাধ্যায় বলে নিজের পরিচয় দিলেন। জানালেন, পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা পেয়েছেন এবং বাঁকুড়ার সোমসারে নাকি তাঁদের একটি ভক্তমণ্ডলী আছে। পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তা, আমেরিকার বোস্টন-প্রবাসিনী ওঁর চিকিৎসক দিদি উক্ত কেন্দ্রের প্রধান ব্যয়ভার বহন করেন। ওঁরা নাকি প্রত্যেক বছর 'শারদীয় উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত রচনা থেকে ৬টি বেছে নিয়ে লেখকদের সম্মান-পুরস্কারও দিয়ে থাকেন। এবারে (২০০৪) আমার লেখা 'মনে হয় অবক্ষয় শব্দটি একটি অজুহাতমাত্র' প্রবন্ধটি ওঁদের পছন্দের অন্যতম। আমার ঠিকানা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সংগৃহীত হয়েছে জানালেন। বাকি পাঁচজনের ঠিকানা নাকি বরুণ মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ) এবং তরুণ মহারাজ (স্বামী বলভদ্রানন্দ) সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত সন্ন্যাসীদের নামের একটি তালিকাপুস্তিকা দেখিয়ে বলেন, সন্ন্যাসীরা প্রয়োজনবোধে সবসময়ই ওঁকে ডাকেন। উল্লেখ্য, সন্ন্যাসীদের কথা উনি তাঁদের ডাকনাম ধরেই বলছিলেন। ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ফটোর সঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ফটো দেখে আমাদের তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত বুঝে নিয়ে ব্যক্তিটি অতি দ্রুত আমার এবং স্ত্রীর সঙ্গে রামকৃষ্ণাত্মীয়তা গড়ে তুললেন। একসময় চা পানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের পত্রিকা 'সমাজবাদী ভাবনা'তে মেট্রো রেলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য তিনি 'রেট কার্ড'ও নিলেন।

কথায় কথায় ব্যক্তিটি বলেন, গোপন সার্কুলারের মাধ্যমে রেল 'বিহারি ঢুকিয়ে চলেছে' দেখে ওঁরা সেই ফাঁকে বাঙালি ছেলেমেয়েদের ঢোকাতে চেষ্টা করছেন। যেহেতু আমাদের ওঁর খুব ভাল লেগেছে, তাই আমরা কারো জন্য সুপারিশ করলে উনি সেটি রাখবেন। কাগজপত্র দেখিয়ে বলেন, কয়েকজন মহারাজও নাকি কারো কারো চাকরির জন্য সুপারিশ করেছেন। নিজের বাড়ির ফোন নম্বর দিলেন। আমাদের এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তির ছেলের কথা বলায় উনি সে-রাত্রেই সেই ছেলেটিকে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। রাত নটা নাগাদ উনি আমাকে ফোন করে জানান যে, ওঁর টেলিফোন একমুখী হয়ে পড়েছে—করা যাচ্ছে, কিন্তু আসছে না। উনি ছেলেটিকে ফোন করবেন কিনা জিজ্ঞাসিত হলে আমি সম্মতি দিলাম।

পরদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ছেলেটির বাবা আমাকে ফোন করে বলেন যে, এক ভদ্রলোক রাতে তাঁদের টেলিফোন করেছিলেন এবং অফিস থেকে ছেলেটিকে ফোন করে ডেকে নেবেন বলেছেন। কিন্তু সকালে তিনি ট্যাক্সি করে এসে ইউনিয়নকে ঘুষ দিতে হবে বলে দশহাজার টাকা এবং ছেলেটিকে নিয়ে গেছেন। আমি হতবাক! কারণ, এদিন যা ঘটেছে তা আমার অজ্ঞাতে। উল্টে ভয় পেয়ে গেলাম—ছেলেটি কিডন্যাপড হয়ে গেল নাকি! প্রায় বেলা দুটো নাগাদ ছেলেটি রাজাবাজারের এক PCO থেকে ফোন করে আমাকে জানায় যে, সেই ব্যক্তি তাকে একটি জেরক্সের দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে একটু আসছি বলে প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো আর ফিরছে না। আমি ছেলেটিকে তার বাড়িতে ফিরে যেতে বলি। ঠাকুরের কথা তখন মনে পড়ল—"ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?"

কিল খেয়ে কিল হজমই করেছিলাম। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী কয়েকজন বন্ধু ঘটনাটি জেনে মন্তব্য করলেন 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী'তে প্রকাশের জন্য। এতদিনে হয়তো অন্য কোন নামে মেট্রো রেলের ঐ ডেপুটি 'রিক্রুটিং' ম্যানেজারটি আরো কতজনকে বোকা বানিয়ে ফেলেছে! ভক্তমণ্ডলীর সাবধানতার জন্য তাই এই পত্রলিখন।

অসীমকুমার চৌধুরী
কলকাতা-২৬

মধুর স্মৃতি

মায়ের বাড়ি আর দক্ষিণেশ্বর—এই দুটি তীর্থস্থান সারাজীবন ধরে আমার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে আছে। প্রার্থনা করি, এই পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার মুহূর্তেও সজ্ঞানে যেন এই দুই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্মরণ করতে করতে চোখ বুজতে পারি।

আসলে কাঁচা মাটিতে যে-ছাপ একবার গভীরভাবে পড়ে যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে হতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। এই তত্ত্ব কারো অজানা নয়। এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মায়ের বাড়ি দর্শন এইবারই আমার প্রথম নয়, যদিও বহুকাল বাদে চির আকাঙ্ক্ষিত দর্শন একটা লেখাকে উপলক্ষ্য করে!

আমার বাবা সরকারি চিকিৎসক ছিলেন। পোস্টিং কলকাতার বাইরে হলেও বছরে একবার তো বটেই, কোন বছরে বার দুইও সরকারি কাজে অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য তাঁকে কলকাতায় যেতেই হতো। সেসময়ে তিনি আমাদেরও নিয়ে যেতেন। থাকারও অসুবিধা ছিল না। আমার দাদু সেকালের এল. এম. এফ. ডাক্তার ছিলেন, বাড়ি ছিল নারকেলডাঙা মেন রোডে। যাই হোক, সরকারি কাজ শেষ হওয়ামাত্রই বাবা আমাদের একদিন মায়ের বাড়ি, অন্যদিন দক্ষিণেশ্বর নিশ্চয়ই নিয়ে যেতেন। বাবার সঙ্গে বেলুড় গেছি কচিৎ। কারণ, তাঁর হাতে সময় থাকত না।

কাজেই আমার শৈশবকাল অর্থাৎ ৫-৬ বছর বয়স থেকেই মায়ের বাড়িতে যাতায়াত। এখন ৭০। তখন মায়ের বাড়ি অন্যরকম ছিল। উদ্বোধন অফিসও তখন ঐ বাড়িতেই ছিল। বাবা

কোন না কোন বই কিনতেনই সেখান থেকে। তাই আরো মনে আছে। সেই বয়সের আরেকটা কারণে মায়ের বাড়িকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। খুবই ছেলেমানুষি কারণ, আজ বুঝি। কিন্তু সে-বয়সে আমার কাছে কারণটা মহামূল্যবান আর বিস্ময়ের মনে হয়েছিল। একবার বাবা আমাদের মায়ের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সম্ভবত মায়ের জন্মতিথি বা অন্য কোন উৎসব ছিল। প্রচুর ভিড়। মহারাজ বাবাকে দুপুরে প্রসাদ পেয়ে যেতে বললেন।

তখন মায়ের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই সিঁড়ি বরাবর একচিলতে সরু বারান্দা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, লাল রঙের সিমেন্ট করা। বারান্দাটা মায়ের ঘরের ঠিক সামনেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকের একটি ঘরের সামনে দিয়েও চলে গিয়েছিল ঐ একই L-shape বারান্দা। ডানদিকে সম্ভবত প্রথম ঘরটিতেই আমরা বসেছিলাম প্রসাদ পেতে। পাতে যখন মাছ পড়ল, চমকে উঠেছিলাম প্রচণ্ডভাবে। কারণ তখনো পর্যন্ত এই জ্ঞানই ছিল যে, ঠাকুরের ভোগ কখনো আমিষ হয় না। কাজেই খুশিতে সেই মুহূর্তে যা মনে হয়েছিল, আজও এই শেষ বয়সেও তা স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয়েছিল—বাঃ! ঐ ঠাকুর তো বেশ ভাল। মাছ খায়। এ আর ঠাকুরবাড়ি কোথায়? এ তো আমাদের নিজেদের বাড়ি! সেদিনের শিশুমনে এই জীবনের আসল সত্যটা অজান্তেই জেগে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা মিলিটারিতে যোগ দেন। আমরা তখন বছর-দুই কৃষ্ণনগরে থাকি। তারপর আমার বিবাহ হয় লণ্ডনে। আজও আমাদের স্থায়ী ঠিকানা লণ্ডন। ফলে প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য কলকাতা গেলেও মায়ের বাড়ি যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কেউ কখনো নিয়ে গেলে দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়ে নিয়ে যেতেন। কেন জানি না কখনোই বাগবাজারে নিয়ে যাননি। জীবনে আর কখনো ঐ বাড়িটির দর্শন ভাগ্যে হবে কিনা জানি না, তবু ঐ মায়ের বাড়ি—ভালবাসার বাড়িটি দর্শন করতে খুব ইচ্ছা করে।

তৃপ্তি বসু
বৎসোয়ানা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

আনুমানিক ১৯৪৭ সালের ঘটনা। আমার পিতৃদেব রাখালচন্দ্র সরকার (স্বামী অভেদানন্দজীর শিষ্য) এবং আমার মা উমাচণ্ডী সরকার (স্বামী বিরজানন্দজীর শিষ্যা) একদিন বেলুড় মঠে আমেরিকার হলিউড বেদান্ত সোসাইটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভবানন্দ এবং ক্রিস্টোফার ঈশারউড ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্বামী প্রভবানন্দ পূর্বাশ্রমে (অবনী ঘোষ) আমাদের আত্মীয় ছিলেন। উনি আমার পিতাকে বলেন: "রাখালবাবু, আপনারা তো বেশ দেখছি। একজন কালীপ্রসাদের শিষ্য ও [আর] একজন কালীকৃষ্ণের শিষ্যা।" সেইসময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী বিরজানন্দজী, যাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। তিনি আরো বলেন: "দেখুন রাখালবাবু, স্বামী বিরজানন্দের মতো এত বড় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সারা পৃথিবীতে মেলা ভার।" এই কথাটি আমার পিতৃদেবের মনে ভীষণ দাগ কাটে। তিনি মনস্থ করেন, আমার দুই দিদি ও আমার দীক্ষা ওঁর কাছে নেওয়াবেন। দিন স্থির হয়। দীক্ষার দিন আগতপ্রায়। এমন সময় আমি টাইফয়েডে আক্রান্ত হলাম। দীক্ষা নেওয়া হলো না বলে মন ভারাক্রান্ত। নির্দিষ্ট দিনে আমার দুই দিদির দীক্ষা হয়ে গেল। নীরব কান্না ছাড়া আমার আর কোন উপায়ান্তর রইল না।

আমরা হাওড়া জেলার বাগনান থানার বরুন্দা গ্রামনিবাসী। একদিন আমার অগ্রজ গুরুদর্শনের জন্য বেলুড় মঠে গেছেন। বিরাট লাইন দিয়ে এক এক করে দর্শন হচ্ছে। আমার দাদা প্রণাম করতে যাবেন, এমন সময় মহারাজ ইঙ্গিতে পাশে অপেক্ষা করতে বললেন। সকলের দর্শন শেষে মহারাজ আমার অগ্রজকে বলেন: "তোমার ভাইকে চিন্তা করতে নিষেধ করো। আমি ওকে দীক্ষা দেব। আমি এখন বেশ কিছুদিন বেলুড়ে থাকব।" মহারাজ বেশির ভাগ সময় শ্যামলাতালে থাকতেন। দর্শনার্থী যে আমার অগ্রজ, তা উনি জানলেন কেমন করে? এটাই আমার আশ্চর্য লাগল। একথা শুনে আমার পিতৃদেব চোখের জল রোধ করতে পারেননি। উনি বললেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে সর্বজ্ঞ—এটাই তার প্রমাণ। যথারীতি ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে আমার দীক্ষা হয়। এখন জীবনসায়াহ্নে এসে তাঁর কথা মনে পড়ে: "জানবে, গুরু সবসময় তোমাদের সাথে আছেন।"

শুভ্রাংশু সরকার
ব্রিজধাম হাউসিং কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০ ০৪৮

জরথুস্ট্রীয় ভাবনায় শাশ্বত চরিত্র

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম জরথুস্ট্রীয় ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বাঙালির মধ্যে এই ধর্মের ধারণা নেই বললেই চলে। ২০০৪-এর আগস্ট মাসে 'Times of India' পত্রিকায় 'The Eternal Nature of Zorastrian Thought' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক Burjar H. Antia। লেখাটির মূল বক্তব্য নিজের মতো লিখলাম। আশাকরি পাঠকবৃন্দ পড়ে আনন্দ পাবেন।

জরথুস্ট্র এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তিনি হলেন 'আহুরা মাজ্‌দা'। জরথুস্ট্র একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন। আহুরা মাজ্‌দা হলেন সেই কেন্দ্রীভূত বৃত্ত, যাঁর মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছে। তিনিই হলেন সমস্ত শুভ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই তাই সর্বোচ্চ প্রশংসা ও মহিমার অধিকারী। তিনিই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক ঈশ্বর। কবি লর্ড টেনিসনের মতে, জরথুস্ট্রের চিন্তাধারা ছয়হাজার বছরের প্রাচীন। তিনি বলেছেন: "যে-ঈশ্বর সর্বকালেই আছেন, তিনি প্রেমময়। এক ঈশ্বর, এক বিধি, এক সত্তা আর বহু দূরের এক দৈবীসত্তা, যার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছে।"

জরথুস্ট্রের প্রাথমিক ও মুখ্য ধর্মীয় শিক্ষা ও উপদেশসমূহ 'গাথা'য় লিপিবদ্ধ আছে। যেমন ভাল ও মন্দের মধ্যে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, একেশ্বরবাদ, 'আশা'র নিয়ম প্রকরণ, অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ, পরিশ্রমী জীবনযাপন, ঈশ্বরিক বিচার-ব্যবস্থা। এছাড়াও সৃষ্টির রহস্যকথা, মনঃশক্তি ইত্যাদি।

'আশা'র শাশ্বত নিয়ম প্রকরণের অর্থ হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যায়পরায়ণতা বা নিরপেক্ষতা। 'আশা' গুরুত্ব আরোপ করেছে—সত্য, যথার্থতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, সঙ্গতি, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, বদান্যতা প্রভৃতির ওপর।

যথার্থতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা থেকেই উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়। অযথার্থতা আর বেনিয়ম থেকেই একজন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার নিজের কর্মের ওপর, যা অপরিবর্তনীয় কার্য ও কারণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের কৃতকর্ম, ভাবনা ও বাক্যের ওপরই সুখ ও দুঃখ নির্ভর করে এবং তার দ্বারা তথাকথিত স্বর্গ ও নরক স্থিরীকৃত হয়। আমরা যে-মুহূর্তে কোন কর্ম সম্পাদন করি তা পরিবর্তনের অতীত কার্য ও কারণের আইনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। 'নভজ্যোত'-এর নামে নবজাতকের দীক্ষাস্নানের পরে সে পিতামাতা ও শিক্ষাদাতার প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। সে যত বড় হতে থাকে, তার দায় ও দায়িত্বের পরিধিও প্রসারলাভ করতে থাকে এবং তা গোষ্ঠী, সমাজ, এমনকি দেশকেও স্পর্শ করে। তার ওপর প্রদত্ত দায়দায়িত্ব অবশ্যই তাকে পালন করতে হয়। তাই যে সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তির সাধনা করতে যায়, সে কি করে দায়দায়িত্ব পালন করবে?

জীবনের গতি অবশ্যই বেগবতী ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হতে হবে—যা সে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে আহুরা মাজ্দার কাছে। মানুষকে তাই বৈরাগ্যসাধনের মাধ্যমে মুক্তির কামনার পরিবর্তে পরিবার-পরিজনসহ জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে হবে আর অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জন্য, উদ্দেশ্যসাধক এক ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য একসঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

জরথুস্ত্রের মত অনুসারে মানুষের জীবনে তিনটি উচ্চ ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রত্যক্ষীকরণ রয়েছে। সেগুলি হলো: 'হু-মাতা', 'হু-খ্‌তা', 'হু-ভর্স্‌তা' অর্থাৎ সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য এবং সৎ কর্ম। এই ত্রয়ী ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই জরথুস্ত্রের প্রবর্তিত ধর্মবোধ দাঁড়িয়ে আছে। জরথুস্ত্রের ধর্মীয় উপদেশে বিশেষ করে প্রাণীকুলের প্রতি করুণার কথা বলা হয়েছে। আর স্বভাবতই জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচারকে সেখানে পাপকর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'জিন্দ-আবেস্তা'র ব্যাখ্যাকার স্যামুয়েল লেইয়িং এইভাবে জরথুস্ত্রের ধর্মমতের মুখ্য বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন: "এটা স্পষ্ট যে, এই সহজ ও মহত্তম ধর্মটি হলো অত্যাধুনিক চিন্তাধারাসমৃদ্ধ এক দ্রুত ও মানুষের খুব নিকটবর্তী মানসিকতা। বিজ্ঞানসাধক হাক্সলে, দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার, কবি টেনিসন সম্ভবত সকলেই এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। এই ধর্মবিশ্বাসের জন্য পারশিদের বিচলিত হওয়ার কিছু নাই,... যেমন কিনা গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উদ্ভাবন করার সময় বোধ করেছিলেন।... তাদের পক্ষে এমন কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি, যা নোহ-র মহাপ্লাবন অথবা বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।"

জরথুস্ত্রীয় নীতিকথা এমনই সরল ও সম্পূর্ণ যে, এর ধর্মীয় রীতি প্রকরণ মহৎ ও যথাযথ। এর পরিচ্ছন্নতা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধর্মমত সর্বকালেই বিজ্ঞান দ্বারা অনাক্রম্য, এর নীতিশাস্ত্র অভেদ্য ও সমস্ত ভূখণ্ডে ও সমাজের সকল শ্রেণিতে গ্রাহ্য।

মহাত্মা ঈশ্বর-দূত জরথুস্ত্র শুধু একটি সময়সীমার জন্য নয়, একটি মানুষের জন্য নয়, বরং সর্বকালে সমস্ত মানুষের জন্য এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এই মহান উপদেশাবলি রেখে গেছেন।

অরুণ মৈত্র
নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩ ১৬৫

প্রসঙ্গ 'স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি' রচনাটির ১৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখা হয়েছে: "১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে উত্তর বিহারের একাংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল।" তারিখটি হবে ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪। সময় দুপুর ২টা ১৩ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড।

ক্ষিতীন্দ্রলাল বসু
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৯

প্রসঙ্গ 'সাধারণ স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা'

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪১১ সংখ্যায় 'স্বাস্থ্য' বিভাগে ডাঃ শক্তি মুখোপাধ্যায় 'সাধারণ স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা' রচনায় একটি গ্রন্থ 'হার্ট, হাইপারটেনশন ও ডায়াবিটিস—কিছু নতুন তথ্য' সংগ্রহ করতে লিখেছেন। গ্রন্থটি কোথায় পাওয়া যায় সেবিষয়ে ডাঃ মুখোপাধ্যায় যদি আলোকপাত করেন তবে উপকৃত হব।

হীরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
গল্ফ গ্রিন আর্বান কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০ ০৯৫

লেখকের উত্তর

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশক 'সাহিত্যম' এবং লেখক ডাঃ শক্তি মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকের ঠিকানা: ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

স্বাস্থ্যবিষয়ক আরো তথ্যের জন্য আমাদের কয়েকজন পাঠক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জেনে আমি আনন্দ পেয়েছি।

ডাঃ শক্তি মুখোপাধ্যায়
সিরাকিউজ, নিউ ইয়র্ক-১৩২২৪

ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ ১৪১২ সংখ্যার ২৮৬ পৃষ্ঠার ২য় কলামের ৩০ পঙ্ক্তিতে 'স্বামী সুবোধানন্দ'-এর স্থানে স্বামী অদ্ভুতানন্দ হবে।

দূরকে করেছ নিকট

জোয়ান রায়নে (দয়া)*

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'The Vedanta Kesari-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৫৪) এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।—সম্পাদক

তিনবছর পূর্বে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এবং অদ্যাবধি অব্যাহত থাকা তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে, শ্রীশ্রীমা একজন পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তের মনেও কী গভীর রেখাপাত করেছেন—যদিও তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা আজও কোন নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপ অনুমান করার ক্ষেত্রে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনো প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্বে সীমাবদ্ধ এবং আমার পূর্বের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলে সেই পর্বটির বর্ণনাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব অতীতের কিছু ঘটনা স্মরণ করে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব, আমি যখন প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থ পাঠ করি, তখন সেটি কেন আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

জর্জ বার্ণার্ড শ যথার্থই বলেছেন, উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা কোন বস্তু সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করে থাকি, গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে সেই বস্তু সম্বন্ধে তেমন কোন ধারণালাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। সেই কারণেই বোধকরি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী-সম্বলিত গ্রন্থ পাঠ করে আমি তেমন কোন গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারিনি, যা আমাকে তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে পারে এবং তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তত একটিও সঠিকভাবে অনুধাবন করার মানসিকতা অর্জনে সাহায্য করতে পারে। বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

আমি এক খ্রিস্টান পরিবারে প্রতিপালিত। মাতৃরূপে দেবতার আরাধনা করার কোন ধারণা খ্রিস্টান মতবাদে নেই। কুমারী মেরি কোনমতেই হিন্দুদের দিব্যজননী অথবা দেবীরূপের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না। আবার হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন রূপ। যেমন তারা, কালী, দুর্গা, পার্বতী প্রভৃতি। তাঁদের আবার নির্দিষ্ট প্রতীকও আছে। বেদান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমরা, এই পাশ্চাত্যবাসীরা, যতই গভীরভাবে 'চণ্ডী' অথবা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করি না কেন, আমরা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। ভগবানকে বহুরূপে কল্পনা করার জন্য আমাদের মনের আদৌ কোন প্রস্তুতি নেই। আমাদের অধিকাংশের কাছে ঈশ্বর হলেন একজন ব্যক্তিস্বরূপ অথবা একটি আদর্শবিশেষ। সেই কারণেই আমরা যখন গ্রন্থে পাঠ করি যে, এযুগে ঈশ্বর দিব্যজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন, তখন বিষয়টি আমাদের কাছে কিছু মানুষের কল্পনাপ্রসূত বলেই বোধ হয়। অতি স্বাভাবিক কারণে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে প্রথম কোন গ্রন্থ পাঠ করার সময় অন্যান্য পাশ্চাত্য ভক্তদের মনে যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, আমারও ঠিক তাই হয়েছিল।

আমার মনে তখন বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যসত্তাটিকে সরিয়ে রেখে আমরা যদি তাঁর লৌকিক আচার-আচরণগুলি প্রত্যক্ষ করি, তাহলে একজন সাধারণ মানুষের এই ধারণা হয় যে, তিনি ছিলেন এক রক্ষণশীল বাঙালি নারী—যাঁর জীবনধারা, মূল্যবোধ এবং ব্যবহার ছিল অধিকাংশ হিন্দু গৃহবধূর মতো। একজন হিন্দু শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করলে তাঁর সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। তাঁর পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের জাগতিক দিকগুলি অনুধাবন করা অতি সহজ। কারণ, একজন হিন্দু হিসাবে তিনি পূর্ব থেকেই বাঙালি পরিবারের পটভূমিকা, পরিবেশ, গার্হস্থ্য কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যগ্রূপে ওয়াকিবহাল। তিনি যদি তাঁর পরিবারের মা, পত্নী অথবা ভগিনীর দৈনন্দিন জীবনধারার কথা চিন্তা করেন, তাহলে অতি সহজেই তাঁর নিকট শ্রীশ্রীমায়ের লৌকিক জীবনের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দুদের সামাজিক চিত্রটি (তা আবার পঞ্চাশ বছর পূর্বের) অতি অস্পষ্ট, ধারণার অতীত। এমতাবস্থায় একজন জীবন্ত রক্তমাংসের চরিত্রকে বিদেশি অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে চিত্রিত করা যেকোন বিদেশির পক্ষে এক দুঃসাধ্য কর্ম। এব্যাপারে যাবতীয় তথ্য উপস্থাপনের দায় কিন্তু সেই লেখকের। তাঁর কোন বিদেশি বন্ধু তাঁকে

* *ইংল্যাণ্ড-নিবাসিনী জনৈক মহিলা ভক্ত, অধুনা প্রয়াতা।*

এব্যাপারে কোনরকম সাহায্য করতে অক্ষম। অতএব আমার সেই পুঁথিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আজ আমি এমন এক জীবন্ত দেবীচরিত্র চিত্রণের প্রয়াসী, যাঁর প্রতি আমি অতি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকর্ষণবোধ করে থাকি এবং যাঁর একটি চিত্র আমি আমার নিজের মতো করে আমার হৃদয়ে অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছি।

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমি যেটুকু গ্রন্থে পাঠ করেছি, তার থেকে তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদসমূহ সম্বন্ধে আমি কতটুকু জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছি? তাঁর পবিত্রতা, করুণা, তিতিক্ষা এবং গভীর প্রেমের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি যে এসকল গুণাবলির জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু তবু কোন এক অদৃশ্য কারণে তাঁর চরিত্রের এই মহান দিকগুলি আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। আমি আমার কল্পনায় এমন এক দেবীচরিত্রের অনুসন্ধান করছিলাম, যাঁর রূপটি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে এবং যাঁকে আমি অতি নিকট থেকে ভালবাসতে পারব। অপ্রকাশ কোন রূপকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই শ্রীশ্রীমা আমার নিকট একটি তত্ত্বস্বরূপ, এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

দেবতার শরীরগ্রহণ সম্বন্ধে আমি দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। সাধারণভাবে আমার মনে হয়, অবতাররূপে আবির্ভূত দেবতার তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে—তাঁর দিব্যসত্তা, শিক্ষা ও বাণী এবং সর্বশেষে তাঁর দৈনন্দিন আচরণ। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি ভক্তদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জাগতিক সত্তারূপে অবতাররূপী ভগবানের আচরণে প্রতিফলিত শিক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিকট ঐ দিব্য আদর্শ বাস্তব ও সত্যরূপ ধারণ করে। এককথায় বলা যেতে পারে, যেকোন দিব্যসত্তার বৈশিষ্ট্য ত্রিমাত্রিক। দুঃখের বিষয়, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করে আমি ঐ তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনরকম ধারণালাভ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি যখন প্রথম কোন গ্রন্থ পাঠ করি, আমাকে এজাতীয় কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রধানত তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে একটি তাৎক্ষণিক ধারণা জন্মলাভ করে। আমি যখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করি, তাঁর আনন্দগভীর মানবিক গুণগুলি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে; যেমন—তাঁর স্পষ্টবাদিতা, তাঁর রসবোধ, তাঁর বাস্তব বুদ্ধি, তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা প্রভৃতি। এগুলি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অতি সামান্য ঘটনার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে আবার অন্যরকম। তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণবোধ করার পূর্বে তাঁকে ঠিক এভাবে এক মানবিক সত্তারূপে গ্রহণ করার জন্য আমাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ, তাঁর জীবনে এজাতীয় মহিমময় গুণাবলির কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সেগুলি ছিল প্রচ্ছন্ন, একটি ঘেরাটোপে আবৃত। তাঁর মুখনিঃসৃত আধ্যাত্মিক উপদেশ-সমৃদ্ধ বাণীগুলির যেটুকু নথিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে তাঁকে মানবীরূপে ধারণা করতে আমি আদৌ সফল হইনি।

মাস্টার মহাশয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'বসওয়েল'। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে এমন কোন প্রতিভাবান প্রতিবেদক উপস্থিত ছিলেন না। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে তাঁর লৌকিক জীবনের পরিচয়লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি সেইসকল মৌনী মহাত্মাদের অন্যতমা, যাঁর পরিচয়লাভ করতে হলে তাঁকে দর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব লেখনীর সাহায্যে তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা প্রদান করা অসম্ভব। বারবার আমি শুনেছি যে, একমাত্র অধ্যাত্মভাবেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, যেকেউ তাঁর সান্নিধ্যে এলে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটে, উদ্বেগ থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে তাঁর সংস্পর্শলাভই যথেষ্ট, কোনরকম বাক্যবিনিময়ের প্রয়োজন নেই অথবা তাঁর সম্বন্ধে ধারণালাভ করতে হলে তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে ইত্যাদি। এত কিছু শ্রবণ করার পরও একথা সত্য যে, তাঁর সম্বন্ধে আমি কণামাত্র ধারণালাভ করতে সক্ষম হইনি এবং আমার কাছে তিনি এক প্রাণহীন বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নন। অতএব আমি স্থির করলাম, তাঁর সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল মনে স্থান দেব না। প্রায় দুবছর আমি তাঁকে কেন্দ্র করে যাবতীয় চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু আমি চেষ্টা করলে কি হবে, আমার অনুসন্ধিৎসু মন তো স্থির থাকতে পারল না। অল্পদিনের মধ্যেই আমি অনুভব করলাম, আমার অবচেতন মনে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানলাভ করার এক অদম্য স্পৃহা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করছে। অবশেষে সে-সুযোগ এল, যখন আমি কলকাতায় গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকজন শিষ্যের সাক্ষাৎলাভ করলাম। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারলাম, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে এসে তাঁর সম্বন্ধে একটি ধারণালাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মনে হলো, আমি যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় এতদিন

অতিবাহিত করছিলাম। চকিতে আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল যে, সম্ভবত এইসকল প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিই শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে আমাকে তাঁর সম্বন্ধে এক সঠিক উপলব্ধিলাভে সাহায্য করতে পারেন, ঠিক যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি লাভ করেছি 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে। অতঃপর আমি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অতি খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের নির্দয়ভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললাম।

আমার প্রশ্ন ছিলঃ "শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল?" "তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমা কেমন ছিল—অতি দ্রুত না ধীরে ধীরে?" "তিনি মৃদুভাবে হাসতেন না উচ্চৈঃস্বরে?" "ঘরে প্রবেশ করে প্রথম তিনি উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে কী বলতেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব মামুলি প্রশ্নের উত্তরও হতো অতি সাধারণ মানের; তবু সেই উত্তরগুলি আমার হৃদয়ে এক পরম স্বস্তি প্রদান করত। আবার কখনো কখনো লক্ষ্য করতাম, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কোন আকর্ষণীয় হৃদয়স্পর্শী অথবা মজার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আমার প্রশ্নজালে আবদ্ধ সেই হতভাগ্য ভক্তগণ প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। সেই অভূতপূর্ব বর্ণনাগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন কতগুলি মহিমময় দিক উন্মোচিত করেছিল, যেগুলি সম্বন্ধে এযাবৎ আমার মনে কখনো কোন প্রশ্ন জাগেনি। সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলিই শ্রীশ্রীমায়ের মানবীচরিত্র সম্বন্ধে আমার মনে একটি চিত্র অঙ্কন করে নিতে প্রভূত সাহায্য করল।

আমার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যাঁরা পরম ধৈর্য্যসহকারে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন— তাঁদের সঙ্গে আমার ঠিক কিজাতীয় আলোচনা হয়েছিল, সেগুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করার পূর্বে আমি অপর একটি বিষয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। শ্রীরামকৃষ্ণের কালের সামাজিক প্রথা, প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা ছিল না। প্রশ্ন হলো, সেগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও 'কথামৃত'-এ বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণের মহান রূপটির প্রতি পাশ্চাত্যবাসীরা কী কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক প্রবল আকর্ষণ বোধ করে থাকেন? কেন আমাদের এমন বোধ হয় যে, তিনি আমাদের অতি আপনজন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণের 'বসওয়েল' মাস্টার মহাশয়ের লেখনশৈলীর মধ্যে। তাঁর মধ্যে নাট্যকারসুলভ স্বাভাবিক উপাদানের ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন, কীভাবে অতি সাধারণ, সহজ, সরল ভাবের সাহায্যেও একটি চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ণ করা সম্ভব। যেকোন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে-দৃশ্যটিকে অর্থহীন বলে খারিজ করে দিতে পারেন, সেই দৃশ্যটির মধ্যেও অসাধারণত্বের সন্ধানলাভ করার মতো এক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তাঁর ছিল। মাস্টার মহাশয় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের আক্ষরিক উপস্থাপনার ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নিকট এত জীবন্ত এবং বাস্তব হয়ে উঠেছেন। তাঁর অধিকাংশ আলাপচারিতাই ছিল একেবারে সাধারণ মানুষের বোধ-উপযোগী সহজ সরল ভাবসমৃদ্ধ। সেই কারণেই আমাদের মতো অতি সাধারণ পাঠকের মধ্যেও তা বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর সেই অতি সহজবোধ্য কথাগুলির মধ্যে নিত্য প্রকাশ পেত দুঃখ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিশুসুলভ আনন্দ, মৃদু পরিহাস, অন্তরঙ্গজনের জন্য গভীর স্নেহ-ভালবাসা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কঠোর আপাত ভর্ৎসনাসূচক মতবাদ, যাবতীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নির্দয় কশাঘাত প্রভৃতি লৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলি। আবার এগুলি ছিল তাঁর সুগভীর অধ্যাত্ম শিক্ষাদানেরও অঙ্গস্বরূপ। এমন মানুষ বোধকরি একটিও নেই, যাঁর হৃদয় এই প্রেমিক মানুষটি স্পর্শ করতে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার ইনিই সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি ভক্তদের গৃহে যাওয়ার কালে নিজের মুখশুদ্ধির কৌটাটি সঙ্গে নিতে ভুলতেন না; ইনিই সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি কলকাতার পথ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে যাওয়ার সময় গাড়ির এ-জানালা ও-জানালা দিয়ে মুখ বের করে শিশুর মতো কলকাতার দৃশ্যাবলি উপভোগ করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আসনে বসে পড়ে বলে উঠতেনঃ "আমি জল খাব।" তাঁর হাত ভেঙে গেলে তিনি সকলের নিকট অতি সরলভাবে অভিযোগ করতেন, শিশুর মতো ক্রন্দন করতেন। বারবার তিনি সকলকে প্রশ্ন করতেন, তাঁর ভেঙে যাওয়া হাতটা পুনরায় সেরে উঠবে কিনা। আপাতদৃষ্টিতে এজাতীয় ঘটনাগুলি হয়তো গভীর তাৎপর্যবিহীন, কিন্তু তবু এগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের অনেক নিকটজন করে তোলে।

আমি এজাতীয় আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। একদিন এক আলোচনাকালে প্রতাপ হাজরার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে জনৈক নবাগত ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেনঃ "আপনি এঁর কাছ থেকে অনেক শিখেছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ "না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৪৭) অথবা সেইদিনের কথা স্মরণ করা যাক—ডাক্তার (মধু ডাক্তার) যখন তাঁর ভাঙা হাত সেরে যাবে এবং যন্ত্রণার

উপশম হবে বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন ঃ "আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর (মল্লিক) বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা। তারপরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো।" (ঐ, পৃঃ ৬৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যখনি অনুধ্যান করার চেষ্টা করি, অসংখ্য আনন্দদায়ক বাণী আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সেগুলিকে আমার এক অমূল্য সম্পদ বলে বোধ হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন; অন্যদিকে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে আমার এরূপ কোন কিছুই বোধ হয় না। যদি পূর্ববর্ণিত বাঙালি ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সৌভাগ্য না ঘটত, যদি তাঁরা কৃপা করে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নিতান্ত মামুলি ঘটনাগুলিও ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা না করতেন, তাহলে শ্রীশ্রীমা আমার এই সাধারণ বোধবুদ্ধির অতীত এক দুর্জ্ঞেয় সত্তারূপেই চিরকাল বিরাজ করতেন। বর্তমানে আমি অন্তত এটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, তাঁর ছিল প্রখর রসবোধ; তাঁর আচার-আচরণ ছিল অতিমাত্রায় সহজ-সরল এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত সংস্কারগুলি তিনি প্রয়োজনবোধে মেনে চলতেন।

এসম্বন্ধে একটি কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। ভগিনী নিবেদিতার একটি খুব প্রিয় কুকুর ছিল। একদিন তিনি কুকুরটিকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিয়ে আসেন, তাঁর ইচ্ছা শ্রীশ্রীমা কুকুরটিকে একটু আদর করেন। সকল জীবের প্রতি অকৃপণ করুণার অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও সেকালের সামাজিক রক্ষণশীলতাকে মর্যাদা দিয়েই শ্রীশ্রীমা কুকুরটিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকেন, আদর করা তো দূরের কথা। নিবেদিতা তখন শ্রীশ্রীমাকে বলেন ঃ "মা, পাশ্চাত্যে বলা হয়, একজনকে ভালবাসতে হলে তার কুকুরটিকেও ভালবাসতে হবে। সুতরাং আপনি যদি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসেন, তাহলে আমার কুকুরটিকে একটু আদর করুন।" একথায় শ্রীশ্রীমা প্রতিবাদ করে ওঠেন ঃ "নিবেদিতা, আমি তোমাকে সত্যসত্যই ভালবাসি। বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

আরেকটি ঘটনার কথা বলি। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। একটি বিড়াল সেখানে নিত্য উপদ্রব করত, নিঃশব্দে রান্নাঘরে প্রবেশ করে খাবার চুরি করে খেত। জনৈক শিষ্য (ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ) ঐ বিড়ালটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। একদিন তিনি বিড়ালটিকে আছাড় মেরে বাড়ির বাইরে ফেলে দিলেন। এই ঘটনায় শ্রীশ্রীমা খুবই কষ্ট পান। বিড়ালটিকে কদিন আর দেখা গেল না। শ্রীশ্রীমা নিত্য বিড়ালটির জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করেন। অনাহারে হয়তো বিড়ালটির মৃত্যুই ঘটে গেল—এই আশঙ্কায় তিনি শিষ্যকে বললেন ঃ "চুরি করা তো ওদের ধর্ম বাবা; কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে?" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪০১, পৃঃ ২৮১) অবশেষে বিড়ালটি ফিরে এলে তিনি শান্তিলাভ করলেন। তখন তাঁর কী আনন্দ!

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের এরূপ আরো বেশ কিছু মধুর মুহূর্ত আমি আমার স্মৃতিপটে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। একদিন তিনি তাঁর জনৈক গৃহী সন্তানের যুবতী বধূকে ছাদে নিয়ে গিয়ে গোপনে মিষ্টান্ন খাওয়ালেন। আবার তিনি তাকে একথা সকলের নিকট গোপন রাখার নির্দেশ দিলেন, কারণ একথা জানলে সকলে তাকে ঈর্ষা করতে পারে। আমার মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশে প্রায় পঁচিশ মাইল পথ পদব্রজে আসা এক যুবক স্কুলশিক্ষকের প্রতি তাঁর আচরণের কথা। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নিজের হাতে তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করলেন। তারপর স্বহস্তে রান্না ও পরিবেশন করে তাকে পেট ভরে খাওয়ালেন। সন্তানের প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীশ্রীমা গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে এলেন এবং যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, ততক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

জনৈক ভক্ত (নিবেদিতা) তাঁকে একবার বলেন ঃ "মাতৃদেবী আপনি হন আমাদিগের কালী।" শ্রীশ্রীমা বলে উঠলেন ঃ "না বাপু, আমি কালীটালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।" (ঐ, পৃঃ ৩৬৯)...

শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের কী গভীর ভালবাসতেন, সে-সম্বন্ধে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এক ভক্তকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন, সুখ ও দুঃখকে জীবনে সমানভাবে গ্রহণ করো। কারো দুঃখকষ্টের কথা শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। জনৈক গৃহী সন্তানের যুবতী স্ত্রীর অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি প্রবলভাবে ক্রন্দন করতে করতে যোগীন-মাকে বলেন ঃ "যোগীন, বউমার মৃত্যু হয়েছে।" তারপর ঠাকুরের পটের সামনে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা করেন, আমার বউমার যেন এই শেষ জন্ম হয়। তাকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দিও। তাকে যেন আর দেহধারণ করতে না হয়।

এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে। তার সবগুলির উল্লেখ করার অবকাশ এখানে নেই। এজাতীয় ঘটনাগুলি শুনেই আমি ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমাকে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করার মতো শিক্ষালাভ করি এবং এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়েই তিনি আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন।

হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীশ্রীমায়ের অমূল্য বাণীগুলি প্রকাশলাভ করা সত্ত্বেও কেন আমি তাঁর জীবনের এজাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র মামুলি ঘটনাগুলির প্রতি এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করলাম? প্রশ্নটি অতি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নেই। কিন্তু যেকোন মহাত্মার মানবিক, প্রেমিক রূপটিই অধিকাংশ মানুষের মতো আমাকেও সর্বপ্রথম আকর্ষণ করে, তারপর আকর্ষণ করে তাঁর বাণীগুলি। এই মহাত্মাগণের বারবার অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্য কী? যুগ যুগ ধরে তাঁদের শরীরধারণের উদ্দেশ্য হলো—শুধু বাণী বিতরণের মধ্য দিয়েই নয়, পরন্তু তাঁদের জীবনের আদর্শস্থাপনের মাধ্যমে সেই শাশ্বত সত্যটিকে যুগোপযোগীভাবে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। যেকোন দিব্যসত্তার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যও আমাদের নিকট অশেষ মূল্যবান, যদি সে-সম্বন্ধে প্রকৃত অনুধাবন করে আমরা সেই আদর্শ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণালাভ করতে সক্ষম হই এবং তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করি। ওপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে বিধৃত এই ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপনের ধারণাটি আমাদের জীবনে, বিশেষত আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করার প্রাক্কালে বিশেষভাবে অনুভব করা প্রয়োজন। আমাদের অভীষ্ট আদর্শের স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণালাভ করতে ব্যর্থ হলে আমাদের পক্ষে তাঁকে জীবন্ত ও সত্যরূপে গণ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্য প্রয়োজন তাঁকে সকলকিছু থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিতকরণ।

এপ্রসঙ্গে আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মরণ করতে চাই। তিনি বলেছেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতি সামান্য ব্যক্তির মধ্যেও তিনি অধিকতর মাত্রায় মহত্ত্বের সন্ধানলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন মহান ব্যক্তি কিভাবে আহার গ্রহণ করেন, তাঁর বেশভূষা কেমন হয় অথবা তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন—এগুলি জানার জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। কথাগুলি অনুধাবনযোগ্য। আমরা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যদি শুধু গ্রন্থেই পাঠ করি যে, তিনি সাহসী, বুদ্ধিমান, অতি উচ্চ ভাবসম্পন্ন, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ একজন 'অসফল' আইনজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তিনি জীবনের এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন যে, তিনি 'জাতির জনক' আখ্যা লাভ করেছিলেন, তাহলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কী ধারণালাভ করতে সক্ষম হব?

আমি সবিনয়ে অনুরোধ করছি, পাঠক যেন এমন মনে না করেন যে, এইসকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণ দিয়ে এবং সেগুলির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে আমি শ্রীশ্রীমাকে আমাদের মতো সাধারণ পর্যায়ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করছি অথবা তাঁর সেই সহজ সরল মন্তব্যগুলিকে প্রাধান্য প্রদান করে আমি তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করছি। তাঁর যেকোন বাণী আমার নিকট অমূল্য রত্নস্বরূপ; আর তাঁর অধ্যাত্মমহিমা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করার দুঃসাহস আমার নেই। আমার জীবনের একমাত্র সাধনা হলো শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মাহাত্ম্যগুলি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব জ্ঞানলাভ করা এবং সেই জ্ঞানের আলোকে তাঁর প্রতি আমার ভক্তিভাবের উন্মেষ ঘটানো। আমি যে সঠিক পথেই চলেছি এবং তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য ধারণালাভ করতে সক্ষম হয়েছি, তার জন্য আমি তাঁর পূর্বোল্লিখিত ত্যাগী ও গৃহী সন্তানগণের নিকট অশেষ ঋণী; কারণ তাঁরা কৃপা করে আমারই কল্যাণের জন্য তাঁদের নিজ জীবনের উপলব্ধ নানা ঘটনা আমার নিকট ব্যক্ত করেছেন। এই মহিমময় কৃপালাভের জন্য আমি তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি ধন্য, কারণ আমি এখন আমার জীবনের একটি অবলম্বনের সন্ধানলাভ করেছি। শ্রীশ্রীমা এখন আমার হৃদয়ে এবং জীবনে নিত্য বিরাজমান। আমি আমার জীবনে আরো আরো গভীর উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকা-নিবাসী শিক্ষক অসীম ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ১০০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগারকে 'উদ্বোধন' উপহারস্বরূপ দিতে সম্মত হয়েছেন। ইচ্ছুক বিদ্যালয়/গ্রন্থাগারের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ নিকটবর্তী গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের মাধ্যমে 'উদ্বোধন' পত্রিকা দপ্তরে দরখাস্ত জমা করলে তা বিবেচনা করা হবে। বিদ্যালয়ে কোন্ শ্রেণি থেকে কোন্ শ্রেণি পর্যন্ত আছে, ছাত্র ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা কত, তা উল্লেখ করবেন।—সম্পাদক

সাঙ্গীতিক ইতিহাসের রূপরেখা

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-কথা (৩য় খণ্ড) ● লেখক : অপূর্বসুন্দর মৈত্র ● প্রকাশক : গ্রন্থকার, ৪/২ মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫ ● মূল্য : ২৫ টাকা ● পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১০+১৫৮ ● প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯৫

ইতিহাস কখনো থেমে থাকে না। তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি, শিল্প, দর্শন, কলাসাহিত্য, সঙ্গীত, জ্ঞানবিজ্ঞানের চালচিত্র ও তার ক্রমিক বিবর্তনের সাক্ষ্য।

ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশের ধারা বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। এই অতি প্রাচীন সাঙ্গীতিক ইতিহাসের উৎস এবং যুগে যুগে তার ক্রমবিবর্তন ও পরিমার্জনের একটি রূপরেখা বিধৃত করেছেন অপূর্বসুন্দর মৈত্র তাঁর 'সঙ্গীত-কথা' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি স্বতন্ত্র; অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ওপর তৃতীয় খণ্ডটি নির্ভরশীল নয়। যদিও গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের পর্যালোচনা, তথাপি গ্রন্থটিতে ভারতীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য রীতিতে ব্যবহৃত স্বরলিপি এবং ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল, মাত্রা ও লয় সম্পর্কে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় দুটি অধ্যায়ও রয়েছে।

লেখক তাঁর গ্রন্থটিতে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রবহমান ধারাটিকে মূলত তিনটি যুগ বা কালের মধ্যে সীমায়িত করেছেন (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)। তবে এভাবে সঙ্গীত-ইতিহাসের কাল বিভাজনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ মহলে যে নানা মত দেখা যায়, সেসম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। তাই গ্রন্থের সূচনায় তিনি স্বীকার করেছেন : "সঙ্গীতের অগ্রগতির প্রবাহ নদীর জলস্রোতের মতোই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবেই প্রবহমান, যাকে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে ধরা যায় না বা দেখানো যায় না।... তবু যেমন মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসকে কালের পরিধিতে বেঁধে বিভক্ত করা সঠিক না হলেও মানবপ্রগতি অনুধাবন করার কাজে বিভাগের উপযোগিতা মেনে নিতে হয়, তেমনি সঙ্গীতের ইতিহাসকেও সম্ভাব্য, সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে ভাগ করে নিরীক্ষণ করতে হয় অগ্রগতির স্বরূপটি জানার জন্য, তার গতিপ্রকৃতি বুঝে নেওয়ার জন্য।" (পৃঃ ৮-৯)

শ্রীমৈত্র প্রাচীন যুগের কাল সীমায়িত করেছেন প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। এই সীমারেখার পশ্চাতে লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন সঙ্গীতের প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', তারপরই মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' ও শার্ঙ্গদেব রচিত সুবিদিত প্রামাণ্য গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নাকর'। শার্ঙ্গদেবের সময়কাল ১২১০-১২৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ত্রয়োদশ শতকে রচিত 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে ভরত ও মতঙ্গের প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন ও আলোচনা করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া যেতেই পারে, ত্রয়োদশ শতকেও প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাটি প্রায় অব্যাহত ছিল।

এই প্রাচীন যুগের সঙ্গীতের আলোচনায় লেখক ক্রমপর্যায়ে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সিন্ধুসভ্যতার জন্ম ও বিকাশলাভের পটভূমিতে সাঙ্গীতিক স্বরের উদ্ভব এবং ক্রমশ বৈদিক ও তার পরবর্তী ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, আরণ্যক, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগে এই সাঙ্গীতিক স্বরের বিকাশ ও তার গায়নরীতির ক্রমবিবর্তন ও পরিমার্জনের ঔপপত্তিক ব্যাখ্যা যথাযথভাবেই করেছেন। এই পর্বের আলোচনায় লেখক একজায়গায় মন্তব্য করেছেন : "ঔপনিষদিক যুগে সঙ্গীতের ধ্যান-ধারণায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাগলেও তার উপাদানের উন্নয়ন এবং ব্যবহারের অভিনবত্ব লক্ষিত হয় না।" (পৃঃ ২২) তাঁর মতে, বৈদিক যুগে আমরা যে স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা ও তান-সম্বলিত 'মণ্ডল' তথা 'স্বরমণ্ডল'-এর পরিচয় পাই, তার গঠন ও সাঙ্গীতিক উপযোগিতা কিরকম ছিল তার কোন নির্দিষ্ট ধারণা আমরা পাই না। বৈদিক শ্রুতি সম্পর্কে আলোচনায় লেখক বলেছেন, বেদ-উপনিষদের যুগে স্বল্পসংখ্যক শুদ্ধ স্বরে সঙ্গীতক্রিয়া সাধিত হতো এবং বেদগানে কোমল স্বরের ব্যবহার ছিল না। কোমল স্বরের আবিষ্কার হয়েছিল বৈদিক যুগের বহু শত বছর পরে শ্রুতির সাহায্যে।

বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের সংস্কৃতি ক্রমশ পরিমার্জিত আকার লাভ করে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে প্রবেশ করার পথে। রামায়ণ-মহাভারতকে কেন্দ্র করে যে পৌরাণিক যুগের উদ্ভব, তার সূচনা হয়েছিল বৈদিক যুগের শেষভাগ অথবা বৈদিক যুগের অব্যবহিত পর থেকেই। এই পর্যায়ে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বৈদিক সভ্যতা ছিল কৃষি ও গ্রাম-ভিত্তিক। ফলত, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রাম্য সারল্যে লালিত হয়েছিল এবং একইভাবে বৈদিক সংস্কৃতিজাত সঙ্গীতও ছিল সহজ, সরল ও বহুলাংশে প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত তথা পৌরাণিক যুগে নগরসভ্যতার নানা রূপ সমাজে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল এবং এমন কিছু সাংস্কৃতিক রুচি ও প্রবণতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, যাকে ঠিক বৈদিক সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি বলা যায় না। এর প্রতিফলন ঘটেছিল সাঙ্গীতিক অবয়বের মধ্যেও।

রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞের পাশাপাশি লব-কুশের রামায়ণগান একটি সুবিদিত ঘটনা। এছাড়া মহাভারতের বিরাট পর্বে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের উত্তরাকে নৃত্য-গীত শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও উন্নত সঙ্গীতধারার পরিচয় বহন করছে।

প্রাচীন যুগের শেষ পর্বে তথা খ্রিস্টীয় শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তনের পরিচয় বহন করছে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি। এই 'নাট্যশাস্ত্র' প্রধানত নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের শাস্ত্র। ভরত এই গ্রন্থে সঙ্গীতের যেসব উপাদানের ও তার উপযোগিতার কথা বলে গেছেন, তার মূল্য আজও অপরিসীম এবং একইভাবে সঙ্গীত-জগতে সমাদৃত। শ্রীমৈত্র নাট্যশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি যথাসম্ভব তুলে ধরেছেন।

বৈদিকোত্তর যুগের সঙ্গীতধারাটি ধীরে ধীরে নবরূপায়ণের দিকে অগ্রসর হয়ে মার্গ তথা আঞ্চলিক ও লৌকিক সঙ্গীতের রূপ নিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দিঙ্‌নির্ণয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্র এই যুগের আকর সঙ্গীতগ্রন্থগুলি, যথা— 'বৃহদ্দেশী', 'চর্যাপদ', 'গীতগোবিন্দ' ও 'সঙ্গীতরত্নাকর' সম্পর্কেও যথাযথ আলোচনা করেছেন। তিনি আলোচনা

প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ "ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের পর সঙ্গীতরত্নাকরই প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, প্রামাণিক ও বৈজ্ঞানিক।" (পৃঃ ৫২-৫৩) এই বক্তব্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় যখন সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বর-গতাধ্যায়'-এ দেখতে পাই কিভাবে শার্ঙ্গদেব চল-বীণা ও অচল-বীণার সাহায্যে বাইশ শ্রুতির অবস্থান নির্ণয় করেছেন—যার মূল্য বর্তমান যুগের সঙ্গীতজ্ঞ, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাছেও অপরিসীম।

ত্রয়োদশ শতকে রচিত সঙ্গীতরত্নাকরের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যযুগের সূত্রপাত, লেখকের মতে, চতুর্দশ শতক থেকে শুরু হয়ে সীমায়িত হয়েছে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। এই পর্বের আলোচনায় শ্রীমৈত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেটি হলো—এই পর্বে (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ) যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান ও অধিকাংশ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন দক্ষিণ অথবা পূর্ব ভারতের অধিবাসী। এর কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা, অরাজকতা এবং উপর্যুপরি বৈদেশিক শক্তির ভারত-আক্রমণ উত্তর ভারতে শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ গঠন করেনি।

এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীতগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্কটমুখীর 'চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা', যেখানে তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত ১২টি স্বর থেকে গণিতের সাহায্যে ৭২টি ঠাটের উদ্ভব দেখিয়েছেন। এর অবদান ভারতীয় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আজও অপরিসীম।

এছাড়াও এই যুগে বিশেষরূপে উল্লেখ্য কতিপয় সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম হলেন মৈথিলী কবি পণ্ডিত লোচন ও বিকানীর-রাজ অনুপসিংহের রাজসভার সঙ্গীতগুণী পণ্ডিত শ্রীনিবাস।

পণ্ডিত লোচন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে জনক ও জন্য রাগের দিঙ্‌নির্দেশ আমরা যেমন পাই, তেমনি পণ্ডিত শ্রীনিবাস রচিত 'রাগতত্ত্ববিরোধ' গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ধারিত স্বরবিভাজন পদ্ধতির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। শ্রীমৈত্র মন্তব্য করেছেন ঃ "মধ্যযুগের একজন সঙ্গীতশাস্ত্রীর পক্ষে এমন সূক্ষ্ম বিচার কৃতিত্বের পরিচায়ক ও বিস্ময়কর। শ্রীনিবাসকে তাই আমরা শুধু মধ্যযুগের সঙ্গীতশাস্ত্রীদের শেষ প্রতিনিধি বলেই মনে করব না, মনে করব মধ্যযুগের সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক যুগের সঙ্গীতের সংযোগকারী সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে।" (পৃঃ ৭১)

মধ্যযুগের এই সময়কালেই মোগল বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতে পারস্যদেশীয় সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রাচীন হিন্দুসঙ্গীতের আদলটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বিশেষত আমীর খসরুর দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নবরূপায়ণ সম্ভব হলেও তার ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার দেখা যায় সম্রাট আকবর এবং তাঁর পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে। কিন্তু একইসঙ্গে শ্রীমৈত্র স্মরণ করিয়েছেন যে, হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীন ধারাটি দাক্ষিণাত্যে বরাবরই মুসলমান প্রভাবমুক্ত হয়ে অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তী আধুনিক যুগে তথা ইংরেজ শাসনকালেও এই ধারাটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় এবং তারই প্রেক্ষাপটে সূচিত হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যবিস্তার ও প্রসার। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাকেই শ্রীমৈত্র সূচিত করেছেন ভারতীয় সঙ্গীতের আধুনিককালের সূত্রপাত হিসাবে।

এই পর্বের আলোচনায় লেখক মন্তব্য করেছেন যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত কিছু সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রীর উদ্ভব হয়—যাঁরা তাঁদের পূর্বতন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সঙ্গীত-সিদ্ধান্তগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থটি, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ইংরেজি Staff Notation পদ্ধতির সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক রূপটি ভালভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। এছাড়াও তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ব্যাবহারিক দিকগুলির প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে পূর্ববর্তী অনেক ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে স্বীয় যুক্তিবলে খণ্ডন করেছেন।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতশাস্ত্রী হলেন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, যাঁর অবদান ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসে নতুন করে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। এরপরই উল্লেখ করতে হয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নাম। তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' গ্রন্থটিতে যে শুধু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অন্বেষণ করেছেন তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতের গতি-প্রকৃতি ও তার সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্বন্ধের পরিচয় তথ্য ও প্রমাণ সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীমৈত্র উনবিংশ শতাব্দীর তথা আধুনিক কালের এই সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা-কালে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থটির শেষ দুটি অধ্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত স্বরলিপি পদ্ধতি এবং তাল, মাত্রা ও লয় সম্পর্কেও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় আলোকপাত রয়েছে। স্বরলিপি পদ্ধতির রূপ কি হওয়া উচিত এবং স্বরলিপি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি সেসম্পর্কে আলোচনাটি পড়তে ভাল লাগে। তবে লিপিবদ্ধ সঙ্গীতের অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য অনেকাংশে সঠিক মেনেও একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাতখণ্ডেজী তাঁর স্বরলিপি পদ্ধতি দ্বারা শুধু যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অতুলনীয় সম্পদকে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাই নয়, একই সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতধারার ক্ষীয়মাণ স্রোতটিকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন তাঁর অসামান্য গ্রন্থকীর্তি 'ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি' ও 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকা' রচনা করে। ভারতীয় সঙ্গীত তাঁর এই লিপিবদ্ধ সঙ্গীত চিরকাল স্মরণ করবে এবং ভাবিকালের কথা চিন্তা করে একথা বলা যেতেই পারে যে, স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শ্রীমৈত্র ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসের এই রূপরেখা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি সঙ্গীতবিদগ্ধ মহলে, বিশেষত সঙ্গীতশিক্ষার্থী গবেষক, সঙ্গীত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে একটি অন্যতম সঙ্গীত-ইতিহাস সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হওয়া উচিত। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই আরেকটু উচ্চমানের হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। মুদ্রণপ্রমাদ বিশেষ কিছু নেই। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠ ঃ গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনে হাজার হাজার ভক্ত মঠে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ২৪,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী।

গত ২০ মার্চ ২০০৫ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩৪,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (সারদাপীঠ), বেলুড় ঃ গত ১৮-১৯ মার্চ ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং বিবিধ প্রয়োজনে নির্মিত 'হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কাটিহার (বিহার) ঃ গত ১৮-২০ মার্চ ২০০৫ ভক্তিগীতি, বাউলগান, 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা, যাদুবিদ্যা প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব এবং আশ্রমের বিদ্যামন্দির ও শিশুমন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ও ২০ তারিখ যথাক্রমে শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরের পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী ত্যাগাত্মানন্দজী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। ২০ তারিখ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিহার সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী রামপ্রকাশ মাহাতো। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী ত্যাগাত্মানন্দজী ও আশ্রম-সম্পাদক স্বামী পরাশরানন্দজী।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর (বাংলাদেশ) ঃ গত ৪ মার্চ ২০০৫ প্রস্তাবিত ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। গত ৫ মার্চ ২০০৫ পূজ্যপাদ মহারাজজী কোচনাতে স্থাপিত আশ্রমের নতুন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

দেহত্যাগ

পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ সংবাদের জন্য ৩১৫-৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বামী মৃদানন্দজী (কৃষ্ণান মহারাজ) গত ৪ মার্চ ২০০৫ বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে ত্রিচুর মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি উচ্চ ডায়াবিটিস রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৬ সালে ত্রিচুর মঠে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ভিন্ন তিনি চেন্নাই মঠ ও কালাডি আশ্রমের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি মালয়ালাম ভাষায় 'প্রবুদ্ধকেরালাম্' পত্রিকার সম্পাদক এবং ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ত্রিচুর মঠের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে তিনি ত্রিচুর মঠেই শান্তিপূর্ণ অবসর জীবন যাপন করছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মহারাজজী এই ভাষায় লিখতে ও কথা বলতেও পারতেন। তিনি মালয়ালাম ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দশটি উপনিষদ্‌, ব্রহ্মসূত্র এবং আরো কিছু শাস্ত্রের অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন সরল, তপস্বী ও আত্মপ্রচারবিমুখ স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৯ মার্চ ২০০৫ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ সারদা স্বনির্ভর সমিতি, বাদে খাঁটুরা (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সঙ্গীত ও বাণী পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহায়তায় বাদে খাঁটুরা বহুমুখী সেবাকেন্দ্রে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল। ৬১২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থ সেবায়তন (বীরভূম) ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সহযোগিতায় শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রতিযোগীদের প্রত্যেককে 'আমি মা, সকলের মা' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, কটক (ওড়িশা)ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ প্রবন্ধ পাঠ, পুরস্কার ও পুস্তক বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্ত ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী ও স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'বেদ' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী কৌশিকানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সহ-সম্পাদক অধ্যাপক কমলকুমার মান্না। দুপুরে ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, বহিচাড় (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, পাঁচালি গান, ভক্তিগীতি, ভিডিও প্রদর্শন, নৃত্যানুষ্ঠান, গীতি-আলেখ্য, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী, পরমানন্দ সাহু এবং আশ্রমের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপাঠী। ২৭ তারিখ ৭,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

নাগভবন (কলকাতা-৬)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ সানাইবাদন, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি, পালাকীর্তন, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ সাধুভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে ২০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ সানাইবাদন, মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্র ও 'চণ্ডী' পাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, পদাবলি কীর্তন, চিত্র-প্রদর্শনী, নাটক, নৃত্য, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দজী, স্বামী শ্রদ্ধাময়ানন্দজী, স্বামী বীরানন্দজী ও সুনীল দেবনাথ। স্বাগত ও সমাপ্তি-ভাষণ দেন সম্পাদক অলোককুমার ঘোষ। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত বসে এবং ১০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ পান। গত ১২ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। গত ১৬ জানুয়ারি চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১৭১ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয় এবং ১০০ জনকে চশমা প্রদান ও ৬৮ জনের ছানি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বদনগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলি)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও কবিতা পাঠ, প্রভাতফেরি, বস্ত্রবিতরণ, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী কৌশিকানন্দজী।

শ্রীশ্রীমা করুণাময়ী কালীমন্দির, টালিগঞ্জ (কলকাতা-৮২)ঃ গত ১-৮ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, নগর-সঙ্কীর্তন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু উৎসব' ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১ তারিখ ১,২০০ ভক্ত বসে এবং ৯,৫০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নবদ্বীপ (নদীয়া)ঃ গত ২-৩ জানুয়ারি ২০০৫ সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৩ তারিখ দুপুরে ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দক্ষিণ বারাসত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ২-৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, বাউল ও মাতৃসঙ্গীত, দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন নীরদবরণ সাহা। এদিন প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (বীরভূম)ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বীরনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া)ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। সান্ধ্যসভায় ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৃপানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, হয়বরগাঁও (অসম)ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী থেকে পাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রসাদ পান। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ 'স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন'-এ ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে স্বামীজীর জীবনীপাঠ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, জপ-ধ্যান, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, পুরস্কার-বিতরণ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়। ভাষণ দেন স্বামী বাসবানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। ভাষণ প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার)ঃ গত ৩-৪ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী প্রমুক্তানন্দজী। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ 'স্বামীজী ফ্রি কোচিং সেণ্টার'-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ পাঠচক্র ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা)ঃ গত ৩-৪ জানুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (বাঁকুড়া)ঃ গত ৩-১০ জানুয়ারি ২০০৫ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং মালাগাঁথা, শঙ্খবাদন ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পাঠ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ৩ তারিখ প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১০ তারিখ 'সারদা সার্ধ শতবার্ষিকী সভাগৃহ' ও 'নিবেদিতা কলাকেন্দ্র'-এর উদ্বোধন, সোসাইটির মন্দির-সংলগ্ন রাস্তার 'সারদা সরণি' নামকরণ এবং ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পাঠচক্র ও মহিলা গোষ্ঠী গঠন এবং ছাত্রীবৃত্তি প্রদান শুরু হয়েছে।

শ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, রামগড় ক্যান্টনমেন্ট (ঝাড়খণ্ড)ঃ গত ৪ জানুয়ারি ২০০৫ গণেশবন্দনা, আবৃত্তি, গুজরাটি ডাণ্ডিয়া নৃত্য, ভক্তিগীতি, বাউল গান, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বিমোক্ষানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের সম্পাদিকা মীরা ঘোষ। এদিন সঙ্ঘের তরফে সুনামি ত্রাণে ১১,৫০০ টাকা স্বামী বিমোক্ষানন্দজীর হাতে তুলে দেন সঙ্ঘের সভানেত্রী তনুশ্রী মিত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ, বালি (হাওড়া)ঃ গত ৪ ও ৯ জানুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ, দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বীরানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে সুনামি ত্রাণে ৪,২৫০ টাকা বেলুড় মঠে প্রদান করা হয়।

পূর্ব কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-১০)ঃ গত ৭-১০ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, কথা ও সুরে মহাভারত পরিবেশন, নাটক, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুখানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী, অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ চিন্ময়কুমার ঘোষ ও তরুণ গোস্বামী। ৯ তারিখ ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বেলুড় মঠের সুনামি ত্রাণ তহবিলের জন্য ১০,০০১ টাকার একটি চেক স্বামী সনাতনানন্দজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৭-৯ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, শ্রুতিনাটক, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী, নৃত্য ও গীতে সারদাঞ্জলি, নাটক, ছাত্রসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, শ্যামল সেন, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, মৃণালেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীব সরকার। প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৪৯০টি কম্বল, ১০টি মশারি ও ৮টি চাদর বিতরণ করা হয়। গত ৭ তারিখ 'শিবানন্দ সভাগৃহ'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স (কলকাতা-৩৯)ঃ গত ৮-৯ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, সেতারবাদন, নৃত্য, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ কলকাতার পিকনিক গার্ডেনে সারাদিনব্যাপী রাজ্যস্তরে 'বর্তমান সামাজিক সঙ্কট নিরসনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ৮ তারিখ ২৫০ জন এবং ৯ তারিখ ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী, স্বামী মথুরেশানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী, পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ তাপস বসু, মহিলা কমিশনের সদস্যা ডঃ মীরাতুন নাহার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ৮-৯ ও ১২ জানুয়ারি ২০০৫ অঙ্কন, আবৃত্তি, গল্পবলা, ক্যুইজ, ফুটবল ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ১০/১২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, অশ্বিনীনগর (কলকাতা-৫৯)ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ শঙ্খবাদন, মঙ্গলাচরণ, ধ্যান, ভজন, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী আত্মবোধানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। ২৩৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ বেদপাঠ, প্রভাতফেরি, পূজা, কথায় ও সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শ্রুত্যানন্দজী, কাজলচন্দ্র দাশ প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন ১০০ দুঃস্থ ছাত্রকে বিদ্যালয়ের পোশাক এবং দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ২১টি শাড়ি, ২৬টি ধুতি, ৪টি চাদর ও ১০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

দাঁইহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বর্ধমান)ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বেলুড় মঠের সুনামি ত্রাণ তহবিলের জন্য ভক্তদের কাছ থেকে এদিন অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, আদ্রা (পুরুলিয়া)ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, উপস্থিত সকলকে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি ও বই প্রদান, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব ও ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী, স্বামী আপ্তেশ্বরানন্দজী, স্বামী বিশ্বদেবানন্দজী ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ জাতীয় যুবদিবসে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভাস্করানন্দজী ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘোঁজা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৯-১৩ জানুয়ারি ২০০৫ যুবসম্মেলন, বসে আঁকো, আলোচনা, বস্ত্রবিতরণ, নাটক, সানাইবাদন, 'গীতা' পাঠ, কীর্তন, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা, ওষুধ প্রদান ও ই. সি. জি. করা, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য প্রদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। ৯ তারিখ যুবসম্মেলনে ২০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলকে 'আমি মা সকলের মা' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক শ্যামল সরদার। ১১ তারিখ ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১৩ তারিখ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৮৬ জন রক্তদান করেন।

শ্রীশ্রীসারদা সঙ্ঘ, সোদপুর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১০ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী। দুপুরে শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ মঙ্গলারতি, বেদ ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, হরিনাম, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, স্বামীজীর কবিতা আবৃত্তি, যেমন খুশি সাজো, যোগব্যায়াম প্রদর্শন, অঙ্কন, বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, লোকনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী শিশির, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ শাসমল, সুশীল বেরা, রবীন্দ্রনাথ মাল, সুকুমার সামন্ত ও তুফান বেরা। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে ৩০টি ধুতি, ৪০টি শাড়ি, ২০টি সোয়েটার, ৮০টি উলের চাদর, ৫০টি কম্বল, ৪০টি ছাতা, ৫০টি মহিলাদের পোশাক, ৩০ সেট শিশুদের পোশাক এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০টি খাতা ও কলম বিতরণ করা হয়।

ডোমজুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (হাওড়া)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ ক্যুইজ, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (হুগলি)ঃ গত ১২ জানুয়ারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সঙ্ঘগীতি ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, স্বামীজীর কবিতা ও তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনা ছড়া করে আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন এই কেন্দ্রের সভাপতি, সহ-সম্পাদক ও সদস্য যথাক্রমে সুব্রতকুমার পাল, সুকুমার সাঁতরা ও অনুপ বাঙাল।

হাড়মাসড়া বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (বাঁকুড়া)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, দুপুরে নরনারায়ণসেবা, দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মহাসমারোহে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়।

পাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ সমবেত কণ্ঠে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সুনামি-আক্রমণে বিগতপ্রাণ মানুষদের আত্মার শান্তিকামনায় এবং সুনামি-দুর্গত মানুষদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনায় এক মিনিট নীরব প্রার্থনা, কবিতা আবৃত্তি, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন ব্রহ্মচারিণী সারদাচৈতন্য, স্বামী আনন্দগিরিজী ও সম্পাদক শঙ্করকুমার সরকার। এদিন দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৭০টি কম্বল ও ৭টি শাড়ি বিতরণ করেন স্বামী আনন্দগিরিজী।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা-৩৩)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন, আলোচনা, স্থানীয় এম. আর. বাঙুর হাসপাতালের শিশুবিভাগে ৫০ জন শিশুর মধ্যে ফল, মিষ্টি, কেক বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালিত হয়। সন্ধ্যায় সুইস পার্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্রে এক অনুধ্যানসভা আয়োজিত হয়। এই সভায় কেন্দ্রের ছাত্র ও যুব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

আবাডাঙা গোপেশ্বর হাই স্কুল (বীরভূম)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক পিনাকীকুমার ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক উৎপলকুমার দাস। অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের 'যুবনায়ক বিবেকানন্দ' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, ধানবাদ (ঝাড়খণ্ড)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ 'মার্চ ফর বেটার ইণ্ডিয়া' নামক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ক্যুইজ, যেমন খুশি সাজো, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ধানবাদের প্রায় সব স্কুলের ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, মণ্ডলগ্রাম (বর্ধমান)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, বিবেক পরিচিতি পরীক্ষা, স্বাস্থ্যশিবির প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। বিবেক-পরিচিতি পরীক্ষায় ১৭০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্যশিবিরে ২১০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। পরদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেন।

বিশ্ববিবেকতীর্থ, অরবিন্দ নগর (কলকাতা-৩২)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ স্বামীজীর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ 'কলকাতা লায়ন্স নেত্র নিকেতন'-এর

সহায়তায় ১০৩ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ১৩ জনের ছানি অস্ত্রোপচার হবে বলে সনাক্তকৃত হয়।

পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (হাওড়া) ঃ গত ১৫-১৬ জানুয়ারি ২০০৫ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ক্যুইজ, আবৃত্তি, অঙ্কন, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, চিত্রপ্রদর্শনী, পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অকল্মষানন্দজী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন কমল মুখোপাধ্যায়। চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সভাপতি তরুণকান্তি ব্যানার্জি।

মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিষদের সমগ্র এলাকাব্যাপী ৭টি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। এই অনুষ্ঠানে ২৫০টি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী এবং আশ্রমের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী শিবনাথানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, চকচণ্ডীনগর (হুগলি) ঃ গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সৎপ্রভানন্দজী, বৈদ্যবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সচ্চিদানন্দজী, সমীরকুমার নিয়োগী ও ডঃ অলোককুমার মুখোপাধ্যায়। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন যুবপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, সুবিনয় দে, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রমুখ। সকল প্রতিনিধিকে 'বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত ও গ্রামবাসী বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

শ্রীসারদা সেবা প্রতিষ্ঠান, ময়নাগড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এক দাতব্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১০৩ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ৭২ জনকে ওষুধ প্রদান, ৫৬ জনের 'ব্লাডসুগার' পরীক্ষা এবং ৩৮ জনের ই. সি. জি. করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সেখসরাই (বালাসোর) ঃ গত ১০ জানুয়ারি ২০০৫ পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ১০০ দুঃস্থ-নারায়ণের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী। তাঁদের সকলকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৫ স্বেচ্ছায় রক্তদানশিবিরে ২২ জন রক্তদান করেন। গত ২২ জানুয়ারি ২০০৫ কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে আশ্রম পরিচালিত 'মানবিক বিকাশসাধন ও স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্প'-এর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ আবাসিকের উদ্দেশে 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দজী ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অমিতা বারিক গত ৩০ অক্টোবর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-নিবাসী স্বামী শিবেশানন্দজী মহারাজ গত ৬ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি উক্ত আশ্রমের সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, আসানসোল-নিবাসিনী কনক ভট্টাচার্য গত ১০ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার বেহালা-নিবাসী জগদীশচন্দ্র গাঙ্গুলি গত ১২ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অনুভূতি বসু গত ২২ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ছিলেন 'পেরেন্টস ওন ক্লিনিক ফর ডেফ চিলড্রেন'-এর প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, জনেন্দুকুমার রায় গত ২২ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, অসমের করিমগঞ্জ-নিবাসিনী মিলনশশী মজুমদার গত ২৩ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, তরুলতা সরকার গত ২৩ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান জেলার বিরুডিহা-নিবাসিনী বীনা লাহা গত ২৭ নভেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর-নিবাসী বিধুভূষণ দত্ত গত ৪ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, নদীয়ার চাকদহ-নিবাসিনী সুরমা চক্রবর্তী গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সল্ট লেক-নিবাসী সুবল করগুপ্ত গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার বেহালা-নিবাসী গোপাললাল মুখার্জি গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বেলঘরিয়া-নিমতা নিবাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ❑

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি

পোঃ টাকি, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৯

ফোন ঃ (০৩২১৭) ৪৭২২৫

একটি আবেদন

এতদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী, প্রাক্তন ছাত্র ও সহানুভূতিশীল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি, উত্তর ২৪ পরগনা** একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদপুষ্ট, তাঁহার কৃপাধন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত দ্বারা ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। প্রায় ৭৪ বছর বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাধ্যমে একটি নামী হাই স্কুল, ৩টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি ছাত্রাবাস, ১টি ডিস্পেনসারি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির-সহ আশ্রমটি এক সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "যখন যেমন তখন তেমন।" এই কথা স্মরণ করিয়া আগামী ২০০৬ সালে আশ্রমের আসন্ন প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রাক্কালে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতির কথা ভাবা হইয়াছে।

এতদুপলক্ষ্যে কিছু উন্নতিমূলক কার্য করিবার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। কার্যগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রকল্পের বিবরণ	আনুমানিক ব্যয়
একটি পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর	৩ লক্ষ টাকা
জীর্ণ ছাত্রাবাসের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	২ লক্ষ টাকা
খেলাধূলার মাঠ সংস্কার ও ব্যায়ামাগার	১ লক্ষ টাকা
কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা চালু করা	২ লক্ষ টাকা
মন্দির সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
আশ্রমগৃহ সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রকল্প	১০ লক্ষ টাকা
	মোট ২০ লক্ষ টাকা

উপরি উক্ত প্রকল্পে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেক বা ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **"Ramakrishna Mission Ashrama, Taki"**—এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ

সম্পাদক

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত**
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া**
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩১৪৫
- **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী-৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুর্খা
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ২৫৯২-১২৩০
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া
  বারাসত-৭৪৩ ৭০১, ফোন ঃ ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন ঃ ২৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ঃ ২৫৫৩৯২
- **অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা**
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন ঃ ২৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-২৬০৪৫০
- **দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশত-৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুর্খা**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর-৭৪৩ ৩৫২

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে নবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

"যোগীন কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী
অর্জুন—-ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের
জন্য ভগবানের নরলীলার
সাথী হয়েছে।"

-শ্রীমা সারদা দেবী

১০৭ তম বর্ষ ※ উদ্বোধন কার্যালয় ※ কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১২)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১২/সেপ্টেম্বর ২০০৫ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা উদ্বোধন অফিসে এসে জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৩ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।**
  - প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা **থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, **নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে,** তাঁদের **বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।** গ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবশ্যই গ্রাহকের **'অনুমতিপত্র'** সঙ্গে আনবেন।
  - **যদি কারো ক্যাশমেমো/রসিদ/মানি অর্ডার প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে, নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ১০ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ২০ অক্টোবর ২০০৫ বৃহস্পতিবার কার্যালয় খোলা থাকবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

বিগত ২৫ মে ২০০৫ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ১৯৯২ সালে তিনি সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গত ২৫ এপ্রিল ২০০৫ পরম পূজ্যপাদ ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ অস্থায়ী সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে এতদিন কার্যভার পরিচালনা করছিলেন।

অধুনা বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়পুর গ্রামে পূজনীয় মহারাজের জন্ম ১৯১৬ সালে। কিশোর বয়সেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পূজনীয় কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ)-এর দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজীকে তিনি দর্শন করেছিলেন।

ভুবনেশ্বর মঠে ১৯৩৯ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের পর পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে নিজ গুরুর নিকটে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করে তাঁর নতুন নামকরণ হয় 'ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য'। ১৯৪৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী তাঁকে সন্ন্যাসদীক্ষা দান করেন।

ভুবনেশ্বর মঠে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী তাঁর জীবনের বুনিয়াদ গড়ে তোলেন স্বামী নির্বাণানন্দজী (পরবর্তী কালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ)-র সান্নিধ্যে। যখন পূজ্যপাদ সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী এবং সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী (স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্য) ভুবনেশ্বর মঠ পরিদর্শনে যান, স্বামী গহনানন্দজী তাঁদের সেবা করে ধন্য হন। ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে কর্মরত ছিলেন। কলকাতার এই আশ্রমটি উত্তরাঞ্চলের মায়াবতীতে অবস্থিত অদ্বৈত আশ্রমের শাখাকেন্দ্র। এই দশ বছরে তিনি বেশ কয়েকবার মায়াবতীতে হিমালয়ের কোলে গিয়ে সাধনভজনে ব্যাপৃত ছিলেন। শিলং আশ্রমে থাকাকালীন (১৯৫৩-১৯৫৮) তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য স্বামী সৌম্যানন্দজীর সান্নিধ্যে নিজের সন্ন্যাস-জীবনকে আরো আদর্শানুগ করে তুলেছিলেন। এই সময়ে তিনি বন্যাত্রাণ এবং অন্যান্য দুর্গতত্রাণে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আর্তনারায়ণের সেবা করার আরো বড় সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন যখন তাঁকে কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের অধীনে 'শিশুমঙ্গল'-এ সহ-সম্পাদকরূপে নিয়ে আসা হলো। পাঁচবছর পর স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। 'শিশুমঙ্গল'-এর নাম পরে পরিবর্তিত হয়ে হলো 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান'। দীর্ঘ ২২ বছর এই হাসপাতালের অধ্যক্ষরূপে কার্যভার পরিচালনা করার সময়ে তিনি এই হাসপাতালে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ৩৩টি গ্রামে চলমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে তিনি স্বাস্থ্য-সচেতনতা, চিকিৎসা এবং রোগ-নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শুরু হয় গঙ্গাসাগর মেলায় স্বাস্থ্যশিবির। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও ব্যাপক স্বাস্থ্যপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'অছি' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। যখন ১৯৭৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক যখন নির্বাচিত হলেন, তখন একইসঙ্গে সেবাপ্রতিষ্ঠানেরও সম্পাদকের কার্যভার অম্লানবদনে সুসম্পন্ন করতেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এইভাবে কার্যভার বহন করার পর তিনি বেলুড় মঠে চলে আসেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক-রূপে নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯২ সালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ, কাঁকুড়গাছিরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষরূপে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছেন। চলেছে অবিরাম মন্ত্রদীক্ষা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস ছাড়াও তিনি আমেরিকা ও কানাডায় গিয়ে অসংখ্য ধর্মপিপাসুর তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে কাদা, নদী পেরিয়ে ব্যক্তিগত সকল কষ্ট উপেক্ষা করেও অশিক্ষিত, বঞ্চিত মানুষের কাছে গিয়ে ঠাকুরের মন্ত্র ও বাণী শুনিয়েছেন। পূজনীয় মহারাজের যোগ্য নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবার্তা বহন করে দিগ্‌দিগন্তে, দুর্গম অঞ্চলে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্ত্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী।
প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমললোচনা॥
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
দুর্গার্দ্ধাংশস্বরূপা সা গুণেন তেজসা সমা॥
কোটিসূর্যসমাজুষ্ট-পুষ্টজোজ্জ্বলবিগ্রহা।
প্রধানা সর্বশক্তীনাং বলা বলবতী পরা॥
সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ॥
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী।
সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ॥

বিশ্বচরাচর ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস করতে সমর্থা সেই মহাশক্তিরূপিণী কালী কেমন? প্রকৃতির প্রধান অংশরূপিণী মহেশ্বরী কালী কমলনয়না। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে দুর্গার ললাট থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি দুর্গার অর্ধাংশরূপিণী হলেও গুণে ও তেজে তাঁরই সমান। তিনি কোটি সূর্যের সমান উজ্জ্বল বিগ্রহধারিণী, সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধান বলস্বরূপা ও পরম বলবতী। তিনি সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন এবং নিজে পরমযোগরূপিণী। তিনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা এবং তেজ, বিক্রম ও গুণে কৃষ্ণের সমান। এই সনাতনী দেবী নিত্য কৃষ্ণচিন্তার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। তিনি নিঃশ্বাসমাত্রেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করতে সমর্থা।

দেবীভাগবতম্, ৯।১।৮৭-৯১

বিবেক, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

লক্ষণীয় ইহাই যে, বৈরাগ্যের এই স্তরগুলি কর্মযোগী, ভক্তিযোগী এবং জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কর্মযোগীর অবলম্বনীয় নিষ্কাম কর্মের পথ গীতার সর্বত্রই প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু উহার শেষ লক্ষ্য কোথায়? কেহ হয়তো বলিবেন চিত্তশুদ্ধি। শ্রীশঙ্করাচার্য যেন বলিতে চাহেন: এহো বাহ্য, আগে কহ আর। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানধারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে গুরুদত্ত মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাধিতে মগ্ন হওয়াই কর্মযোগীর পরম লক্ষ্য। গীতায় ইহাকেই শ্রীভগবান 'কর্মসমাধি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (দ্রঃ গীতা, ৪।২৪) অর্থাৎ কর্মযোগীর বৈরাগ্য অবলম্বন করা অপরিহার্য।

ভক্তিযোগীর ক্ষেত্রেও বৈরাগ্য অবশ্য-অবলম্বনীয়। ভক্তিসূত্রে নারদ বলিয়াছেন: "যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি..." অর্থাৎ যে নির্জন স্থান পছন্দ করে, যে লোকসংসর্গ বা মানুষের সম্পর্ক ত্যাগ করে, সেই ভক্ত নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত হয়। "যঃ কর্মফলং ত্যজতি"—যে কর্মফল ত্যাগ করে...। "অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্" অর্থাৎ অভিমান, দম্ভ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে...। ভক্তিশাস্ত্রেও দেখা যাইতেছে, সর্বত্র বৈরাগ্যের কথাই বিধৃত হইয়াছে। শেষে বলিতেছেন: "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্"—ভক্ত নিজের অন্তরে কাম-ক্রোধাদি সকল মনোবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রায়শ বলিতেন: "মোড় ঘুরিয়ে দাও।" এখানেও বৈরাগ্য অপরিহার্য। কারণ, বৈরাগ্য না থাকিলে মোড় ঘুরাইবার কোন প্রয়োজনবোধই থাকে না, নিরন্তর রূপ-রসাদির প্রলোভনে মন ইন্দ্রিয়সুখের অভিমুখেই ছুটিতে থাকে।

বৈরাগীর আরেকটি ভয় আছে। বিচিত্র এবং মহা-আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ডুবিয়া গিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে। "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।" সামাজিক নিয়ম-কানুনের ব্যাপারেও যেরূপ, পূজা-পার্বণ-ব্রত-তপস্যার ব্যাপারেও সেইরূপ বন্ধন আসিয়া সাধককে বিভ্রান্ত করে। নানা আড়ম্বর করিয়া শেষে প্রাপ্তি কিছুই হইল না, মনে হইল পর্বত একটি মূষিক প্রসব করিল! এই অবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন জরুরি। কারণ যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনের পশ্চাতে বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতাই মূল স্তম্ভস্বরূপ।

জ্ঞানযোগীর জন্য প্রাথমিক শর্তই হইল 'ইহামূত্রফল-ভোগবিরাগ'। ইহ = ইহকাল। অমূত্র = পরকাল। জ্ঞানীর দুই স্তরেই ফলের প্রতি বিরাগ বা বৈরাগ্য থাকিবে। জ্ঞান-পথিক স্বস্বরূপানুসন্ধানে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন: "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা।" (১৫।৩) বৈরাগ্য বা অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে ছিন্ন করিয়াই ইষ্টপথে অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্বের সকল ধর্মেই এই বৈরাগ্য এবং অনাসক্তির প্রশংসা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ এই অনাসক্তির কথা অসংখ্যবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া এবং বৈরাগ্য-সাধন করিতে গিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করেন: 'আচ্ছা, জগতের বিষয়ের প্রতি মনে অনাসক্তি ভাব অবলম্বন করিয়া আমার প্রাপ্তি কী হইল?' জ্ঞানিপুরুষ এই প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে না চাহিলেও সাধারণ মানুষের এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। বস্তুত, প্রশ্নটির উত্তর এতই সহজ যে, মন সহজে তাহা মানিয়া লইতে চাহে না। মানুষ স্বরূপত 'পূর্ণ'। বাহ্য কিংবা মানসিকভাবে সবকিছু ত্যাগ করিলেও অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে কখনো দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে না—কারণ, উহাই আমাদের স্বরূপ। অতএব 'কী পাইলাম'—প্রশ্নটি অ-জ্ঞানী করিলেও জ্ঞানী জানেন, 'আমার প্রাপ্তব্য যেমন কিছুই নাই, তেমনি অপ্রাপ্তও কোন বস্তু নাই।'

"বিবেক-বৈরাগ্যের ন্যায় জিনিস নাই"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। কিন্তু তৎসহ ইহাও বলিতেন: "অনুরাগ বিনে কি চাঁদ গৌর মিলে?" অনুরাগ ও ব্যাকুলতা—এই দুটি পরম প্রাপ্তির জন্য সাধকের motive force বা সঞ্চালিকা শক্তি। এই ব্যাকুলতার প্রসঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রে ভূয়োভূয় পাওয়া যায়; জ্ঞানপথেও ইহা অত্যাবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; যোগশাস্ত্রেও ইহাকে পৃথগ্‌ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে এবং কর্মযোগীর ব্যাকুলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে স্মরণ করিয়া এই ব্যাকুলতা কী বস্তু তাহা বেশ সহজে অবগত হওয়া যায়। মনে করি একটি বৈদ্যুতিক রেলগাড়ির কথা। স্টেশনে গাড়িটি দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সবুজ বাতি জ্বলিতেছে অর্থাৎ তাহার বৈরাগ্যের অভাব নাই, কোন পিছুটান নাই, কেহ গাড়ির চাকায় অর্থাৎ পায়ে বেড়ি বাঁধে নাই। তাহার

বিবেকও স্বচ্ছ, অর্থাৎ কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, কখন যাইবে, কেনই বা বর্তমান স্টেশন (অনিত্য জানিয়া) ছাড়িয়া পরবর্তী স্টেশনে যাইবে—সবই তাহার জানা। অথচ দেখা গেল বিদ্যুৎ নাই অর্থাৎ সহসা লোডশেডিং হইয়াছে। অতএব গাড়ির স্থাণুবৎ ঐস্থানেই রহিয়া যাওয়া। এই বিদ্যুৎকে ব্যাকুলতা বলিলে মন্দ হয় না। উহা না থাকিলে সম্মুখে অগ্রসর হইবার শক্তি (বা ইচ্ছাশক্তি)-র অভাব ঘটে। ইহা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনে নহে, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, কি ছাত্রজীবনে, কি ক্রীড়াজগতে, কি রাজনীতিতে, কি প্রশাসনে, কি ব্যবসায়ে। অর্থাৎ সাধারণ সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যও বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজকাল এই বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আমাদের শহুরে জীবন তো বিদ্যুৎ বিনা অচল। পাশ্চাত্য দেশে সকল মানুষের জীবনযাত্রা নির্ভর করে এই বিদ্যুতের উপর। অতএব বাহ্য ও আন্তর উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ দরকার। আন্তর বিদ্যুৎ-ই ব্যাকুলতা। বরং বাহ্য বিদ্যুৎ না থাকিলেও জীবন চলে, কিন্তু আন্তর বিদ্যুৎ (ব্যাকুলতা) না থাকিলে জীবন অচল। মনে করুন, আপনার এলাকায় ট্রান্সমিটারটি পুড়িয়া গিয়াছে। উহা তৎক্ষণাৎ সারাইবার জন্য যদি 'ব্যাকুলতা' না থাকে তাহা হইলে বাহ্য জীবনগতিই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। এই আন্তর ব্যাকুলতাকেই 'আন্তর বিদ্যুৎ' বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। এই ব্যাকুলতা দেখিলে বোঝা যায় অধ্যাত্মজীবন শুরু হইয়াছে।

'নারদীয় ভক্তিসূত্র'-এ দেবর্ষি বলিতেছেনঃ "তদ্‌ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি"—যদি ক্ষণেকের জন্য ঠিক ভক্ত তাহার ইষ্টকে বিস্মৃত হইয়া পড়ে, পরমুহূর্তেই তাহার পরম ব্যাকুলতা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে। জ্ঞানপথে সাধকের যেমন 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ'-এর প্রসঙ্গ পাইয়াছি, সদানন্দ যোগী তাঁহার 'বেদান্তসারঃ' গ্রন্থে তেমনি মুমুক্ষুত্বের কথা বলিয়াছেন। মুমুক্ষুত্ব কী? যে-ব্যক্তি সত্যই মোক্ষের অধিকারী, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? "জননমরণাদি সংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব... অভিগচ্ছেৎ"—অর্থাৎ কাহারো মস্তকে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড বাঁধা থাকিলে সেই ব্যক্তি যেমন নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে, সংসারানলে দগ্ধ-শির মুক্তিকামী ব্যক্তি সেইরূপ সদ্গুরুর সকাশে সঠিক পথের অন্বেষণে ছুটিতে ছুটিতে গিয়া উপনীত হয়! যোগদর্শনে পতঞ্জলি মুনি একটি সূত্রে বলিয়াছেনঃ "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।" অর্থাৎ যাহার মধ্যে তীব্র সংবেগ (বা তীব্র ব্যাকুলতা) জন্মিয়াছে, তাহার কৈবল্য মুক্তি প্রতিষ্ঠা অবিলম্বেই ঘটিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ বলিতেনঃ "অরুণোদয় হলো তো এইবার বোঝা গেল এইবার সূর্য উঠবে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখিতে গিয়া শঙ্করাচার্য একটি অসাধারণ উপমা দিয়াছেন। গীতার দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছেঃ "তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ/ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানজ তমসায় নিমগ্ন, তাহাদের অনুকম্পা করিয়া আমি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞানদীপের দ্যুতি বা প্রভার সাহায্যে সেই অন্ধকার দূর করিয়া থাকি। কীভাবে? জ্ঞানদীপটিই বা কী? অপূর্ব উপমাসহকারে ভাষ্যকার বলিলেন, ভক্তিজনিত চিত্তপ্রসাদ (মনের প্রসন্নতা) ঐ দীপের তৈল। জ্ঞানদীপের শিখাটি কী? অন্তরের বিবেকবোধ। ব্রহ্মচর্যাদি সাধন-জনিত সংস্কার হইতে উদ্ভূত প্রত্যয় বা প্রজ্ঞা সেই দীপের বর্তি বা সলতে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগজনিত মানসিক গতি ঐ প্রদীপের প্রজ্বালন-নিমিত্ত প্রাথমিক বায়ু (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অম্লজান), বিরক্ত (বৈরাগ্যপ্রবণ) অন্তঃকরণ ঐ প্রদীপের আধার। কোন্‌ গৃহে ঐ দীপ জ্বলিবে? সেই চিত্ত-গৃহেই এই দীপ জ্বলিতে পারে, যাহা বিষয়চিন্তা এবং রাগ ও দ্বেষ দ্বারা কলুষিত নহে। ঐ দীপের দ্যুতি বা প্রভা কোন্‌টি? সাধকের সদাবিদ্যমান একাগ্রতা এবং ধ্যানসহায়ে উৎপন্ন জ্ঞানই ঐ দীপের ছটা। এবং এই দীপের সাহায্যে কে জীবের মোহান্ধকার বিনাশ করেন? তিনি তাহার ইষ্ট, ভগবান। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও এইরূপ জ্ঞানদীপের কথা বলা হইয়াছে। সেই 'জ্ঞানদীপ্তি' (২।২৮) যদি ব্যাকুল সাধকের অন্তরে একবার প্রজ্বালিত হয়, তাহা কখনো নির্বাপিত হয় না। বিভিন্ন মন্দিরাদিতে আমরা দেখিতে পাই, একটি 'অনির্বাণ শিখা' (প্রদীপশিখা) একটি কুলুঙ্গি বা গুহার ন্যায় কক্ষে জ্বলিতেছে। উহা প্রতীকী—যাহার তাৎপর্য ইহাই যে, উহা সাধকের অন্তরে 'জ্ঞানদীপ্তি'-রূপে 'আবিবেকখ্যাতি' অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

বিবেক, বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতার কিছু প্রত্যক্ষ ফল আছে। অবশ্য এইসব ফল 'অবান্তর (যাহা প্রকৃত লক্ষ্য নহে) ফল', যাহাকে ইংরেজিতে by-product বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈরাগ্যপ্রবণ ব্যক্তির চিত্তের সন্তোষ সহজে বিনষ্ট হয় না। এই সমাজে কেহই তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। তাহার স্বার্থে আঘাত লাগিলেও সেই আঘাত তাহাকে টলাইতে পারে না, কারণ তাহার স্বার্থবোধ কম।

অবশ্য কিছু আপাত-বৈরাগী সবসময়েই চোখে পড়ে যাহারা জগতের সর্ববিষয়ে উদাসীন, সংসারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে না, পড়াশোনায় মন নাই, চাকুরি-ব্যবসায়-কৃষিকার্যাদি সর্বব্যাপারে উদাসীন, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখে পরম উদাসীন। যদি দেখা যায়, এইপ্রকার 'সংসার-উদাসী' ব্যক্তি স্বার্থ-সচেতন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহা বৈরাগ্যের একটি কৃত্রিম আবরণমাত্র। স্বামীজী বলিতেন, তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে সত্ত্বের ছদ্মবেশে!

যথার্থ বিবেকী ব্যক্তির একটি স্বাভাবিক intuition বা স্বজ্ঞা থাকে। সে সহজেই মানুষ চিনিতে পারে। তাহার সংসার-জীবন মোটামুটি নির্ভুল হয়। আর ব্যাকুলতার অবান্তর ফল কীরূপ? স্বামী ভজনানন্দজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯৭৭) কয়েকটি লক্ষণ ও ফলের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমত ব্যাকুলতাই সাধকের গৃহী বা সন্ন্যাসীর জীবনে পরিচালিকা শক্তি। দ্বিতীয়ত, বিবেকযুক্ত ব্যাকুলতা মানসিক শক্তিকে উচ্চতর লক্ষ্যে প্রযুক্ত করে। তৃতীয়ত, ব্যাকুলতা থাকিলে 'অনাসক্তি' সহজলভ্য হয়। চতুর্থত, মনের যাবতীয় উদ্ভিন্ন গতিকে একত্রিত করিবার সহজ পন্থা ব্যাকুলতা। পঞ্চমত, ব্যাকুলতায় সময় সংক্ষেপ হয়। "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" —যাহারা তীব্র সংবেগশীল, তাহাদের কৈবল্যপ্রাপ্তির বিলম্ব নাই। ষষ্ঠত, লোকনিন্দার কোন ভয় থাকে না।

ভারতবর্ষে অগণিত সাধক-সাধিকার জীবন পর্যালোচনা করিলে এই ব্যাকুলতার ভূয়ো নিদর্শন মিলিবে। প্রথমেই মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবেগমথিত অতিলৌকিক ব্যাকুলতার বিস্ময়কর চিত্র। সন্ধ্যাকালে শঙ্খ বাজাইয়া দেবালয়ে দেবার্চনা শুরু হইবে। সেই শঙ্খধ্বনি শুনিয়া কে যেন আধো-অন্ধকারে পঞ্চবটীতলে গঙ্গাতীরে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, মা, আরো একটা দিন চলে গেল, তুই দেখা দিলিনি! বিরহ-অগ্নিতে দেহ পুড়িয়া খাক্ হইতেছে, অঙ্গের বস্ত্র পুড়িয়া যাইতেছে, এমনকি অঙ্গে যতটুকু গঙ্গামাটি লাগিয়াছিল তাহাও পুড়িয়া লাল হইয়া গিয়াছে। কেবল একমাত্র লক্ষ্য তাঁহার—'মা দেখা দে।' ব্যাকুলতার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি তুলসীদাসের জীবনে। বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় জীবনে ব্যাকুলতাই ছিল তাঁহার মূলধন। মীরাবাঈ চরিত্রে এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে এমন স্তরে তুলিয়াছিল, যেখানে শক্তিশালী গরল পরিণত হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতে। বৌদ্ধ শ্রমণ মিলারেপার জীবনে ব্যাকুলতার তীব্রতা স্বয়ং মৃত্যুকেও যেন ত্রস্ত করিয়া তুলিত। সাধক রামপ্রসাদ কিংবা তন্ত্রসিদ্ধ বামাক্ষেপার জীবন পর্যালোচনা করিলেও এই ব্যাকুলতার প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে একটি সংগঠন নির্মাণ করিয়া যেন যন্ত্র চালাইয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি জগতে প্রচার করিবেন বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরের যে-ব্যাকুলতা, তাঁহার বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার পত্রাবলিতে—যাহা পাষাণ হৃদয়কেও গলাইতে সক্ষম। ধর্মরাজ্যে কেবল নহে, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ব্যাকুলতার সাক্ষ্য আছে। ভাবিলে বিস্ময় জাগে, কী প্রচণ্ড ব্যাকুল হইয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজ গৃহবন্দি অবস্থায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কী পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া কাবুলের পথে চলিয়া গিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের প্রতিযোগিতামূলক সমাজে দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ব্যাপারেও কখনো কখনো যে-ব্যাকুলতা দেখা যায়, তাহাও বিস্ময় জাগায়। এমনকি 'গিনেস বুক'-এ নাম তুলিবার জন্য কী ব্যাকুলতা! সংবাদপত্রে ঐপ্রকার সংবাদ পড়িয়া কোন প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেনঃ "আহা, ঐ ব্যাকুলতা লইয়া সে যদি ঈশ্বরকে ডাকিত, অধ্যাত্মরাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিত! কিন্তু তাহার কপাল মন্দ। সত্য বস্তু ছাড়িয়া সে মিথ্যাকে লইয়া আনন্দ করিতে চাহে।"

অধ্যাত্মরাজ্যের স্পর্শমণি এই ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ "ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" যতক্ষণ ভোগের বাসনা আছে, ততক্ষণ এই ব্যাকুলতার উৎসমুখ বন্ধ থাকে। ভোগবাসনা গেলেই যেন প্রাণ আটুবাটু করে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য উপমা। "সেই যে আছে—একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? গুরু বললেন, 'এস আমার সঙ্গে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।' এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলেন! খানিকক্ষণ পরে শিষ্যকে ছেড়ে দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার প্রাণটা কিরকম হচ্ছিল?' সে বললে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল!' ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই।" বস্তুত, যাহার অন্তরে ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, বৈরাগ্য-বিবেক তাহার সহজসাধ্য হইয়া যায়। তাহার অন্তরে জাগিয়া ওঠে শিশুর সারল্য। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"—সেই মহাত্মা সচরাচর যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন না। যে-বংশে এইরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, তাহার "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—তাহার কুল পবিত্র, রত্নগর্ভা তাহার জননী। [সমাপ্ত] ❑

স্বামী বিবেকানন্দের চারটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত*

॥১॥

বেদান্ত সোসাইটি
১০২ ইস্ট, ফিফটি এইটথ স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক
১৫ জুন ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

প্রতিদিনই আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে; শুধু অসুবিধা এই যে, নিউ ইয়র্ক ঘুমের পক্ষে বাজে জায়গা। আমাদের পুরনো বন্ধুদের একত্রিত করার জন্য এবং কাজের একটা রূপদান করার জন্য আমি বেশি না হলেও কিছুটা কাজকর্ম করছি।

এখন সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এই কাজ শেষ করব এবং তারপরেই এক, দুই বা ততোধিক সপ্তাহের জন্য প্রকৃত বিশ্রাম নিতে প্রস্তুত হব।

হায়! নিউ ইয়র্কের চেয়ে ডেট্রয়েটেও মোটেই সুবিধা হবে না। কেননা সেখানেও অনেক পুরনো বন্ধু আছেন। যাদের সত্যিকারের ভালবাসা যায়, সেইসব বন্ধুদের এড়ানো কি সম্ভব?

তোমার কাছে গেলে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়ই পাব, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকব কি করে? আবার সেই চিরন্তন সাক্ষাৎদান এবং সাক্ষাৎ করা ও বকবকানি? নিউ ইয়র্ক থেকে আট কি দশ ঘণ্টার দূরত্বে (রাতের গাড়ি আমি এড়াতে চাই) যাওয়ার মতো আর কোন জায়গার কথা কি তুমি জান, যেখানে আমি নিরিবিলিতে থাকতে এবং লোকসমাগম থেকে মুক্তি পেতে পারি? (ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন।) লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে আমি এই মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত। এই কথা এবং অন্য সবকিছু ভেবে দেখো; এর পরেও যদি মনে কর যে, ডেট্রয়েটেই আমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা হবে, তবে আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

যথার্থই তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ আমিও একটা নিরিবিলি জায়গার কথা ভেবেছি।

॥২॥

বেদান্ত সোসাইটি
১০২ ইস্ট, ফিফটি এইটথ স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক
২০ জুন ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার অপূর্ব সুন্দর চিঠিখানির উত্তর দিতে আমার দুদিন দেরি হয়ে গেল। তোমার কথামতো—আমি নিশ্চিত যে, মা-ই পথ বলে দেবেন। খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহে আমি ডেট্রয়েটে যাব। যদি কোন কারণে আমার দেরি হয় তবে দুশ্চিন্তা করো না। তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি এই দেশ ছেড়ে যাব না। এটা একান্ত জরুরি।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে মা আবার সদয়া হয়েছেন এবং চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে। তুমি কি আমার বন্ধু মিস মুলারের কথা শুনেছ? শোন এবার, ভারতে তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং লোকে বলে, ইংল্যাণ্ডে আমার ক্ষতিসাধন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আজ সকালে তাঁর একটি চিঠি পেয়ে জানলাম যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নাকি বিশেষ উদ্গ্রীব।

তাঁর দলত্যাগ আমার পক্ষে ভীষণ মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল, কেননা তাঁর প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি ছিল এবং তিনি ছিলেন একজন বড় সহায়িকা ও কর্মী। তাঁর প্রচুর পার্থিব সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে, কিন্তু আমারই মতো তিনি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে পড়েন। এখন অবশ্য তাঁর বার্ধক্যের ভাল দোহাই আছে, আমার তো কিছুই নেই। জুন মাসের শেষের দিকে

* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।—সম্পাদক

তিনি আসতে চান। আমি চাই তিনি আরো আগেই আসুন। এখনি তাঁকে একথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। সম্ভব হলে আমিও কোন নিরিবিলি শহরতলিতে অপেক্ষা করব। কিন্তু যে করেই হোক আমি ডেট্রয়েটে আসছি।

সকল ভালবাসা-সহ
বিবেকানন্দ

॥৩॥

বেদান্ত সোসাইটি
১০২ ইস্ট, ফিফটি এইট্থ স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক
২৭ জুন ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমার এই মুহূর্তের পরিকল্পনা এইরকম। আমার বইগুলির কাজ শেষ করার জন্য আমাকে আর কয়েকদিন নিউ ইয়র্ক থাকতে হবে। 'কর্মযোগ'-এর আরেকটি সংস্করণ ও লণ্ডনের বক্তৃতামালা একটি পুস্তকের আকারে আমি ছাপাতে চলেছি। মিস ওয়াল্ডো সেগুলি সম্পাদনা করছেন এবং মিঃ লেগেট প্রকাশ করবেন।

যদি আমাকে এদেশে আরো কয়েক সপ্তাহ থাকতে হয় তাহলে আমি ভাবছি, তোমার পক্ষে ভাল হবে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া ও বায়ু পরিবর্তন করা। নিউপোর্ট হলো সমুদ্র উপকূলের একটি বিশিষ্ট স্থান—নিউ ইয়র্ক থেকে চার ঘণ্টার রাস্তা। আমি সেখানে আমন্ত্রিত। এই সপ্তাহে আমি সেখানে যাব এবং প্রতিশ্রুত শান্ত পরিবেশ, অবসর ও স্বাধীনতা পাব। তোমার জন্য একটি জায়গা পেতে চেষ্টা করব এবং পেলেই তারযোগে তোমাকে জানাব।

আমি নিশ্চিত যে, ডেট্রয়েটে তোমার বিশ্রাম নেওয়া হবে না। মাঝে মাঝে একটু স্থান পরিবর্তন ও নির্জনতা মানুষের প্রাণশক্তিকে সতেজ করার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট উপাদান।

বেশ, যদি তুমি মনে কর যে, ডেট্রয়েটেই তুমি আরো ভাল বিশ্রাম ও শান্ত পরিবেশ পাবে তবে একছত্র লিখে জানালে আমি চলে আসব। নিউ ইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট মাত্র সতেরো ঘণ্টার পথ এবং এই যাত্রার ধকল সইবার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার আছে। আমার যাওয়ার এখন কোন বাধা নেই; শুধু আমি যথার্থই চাই যে, তুমি অন্ততপক্ষে কয়েক সপ্তাহের জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ বিশ্রাম নাও।

ব্যয়ের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না। মা সেটি যথেষ্ট যুগিয়েছেন এবং যতদিন আমি স্বার্থগন্ধহীন থাকব ততদিন যোগাবেন।

সবকিছু খুঁটিনাটি বিবেচনা করে তোমার সুবিধামতো যত শীঘ্র পার জানিও।

যে করেই হোক, আমি নিউপোর্টে যাচ্ছি শুধু স্থানটি কেমন দেখতে। সেখানে গিয়েই আমি এসম্পর্কে তোমাকে সবকিছু লিখব।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

॥৪॥

৬ প্লেস দ্য জেতাৎ ইনি
প্যারিস
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার চিঠিখানা খুবই আশ্বাসব্যঞ্জক। এবারের গ্রীষ্মে তোমার উপকার হয়েছে জেনে আমি অত্যন্তই আনন্দিত। তাহলে, নিউ ইয়র্ক নগরটি তোমাকে মুগ্ধ করেনি!

কিন্তু প্যারিস শহর আমাকে খুবই মুগ্ধ করছে। মঁসিয়ে জুল বোয়া নামে একজন ফরাসি মনীষীর সঙ্গে আমি এখন বাস করছি; তিনি আমার রচনাবলির একজন গুণমুগ্ধ পাঠক।

তিনি ইংরেজি খুব অল্পই বলেন; ফলে আমাকে দুলকি চালে দুর্বোধ্য ফরাসিতে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং তিনি বলেছেন যে, আমি নাকি এতে বেশ সফল হচ্ছি। লোকে যদি ধীরে ধীরে [ফরাসিতে] কথা বলে তবে আমি এখন বুঝতে পারি।

আগামী পরশু আমি ব্রিটানীতে যাচ্ছি; সেখানে আমার আমেরিকান বন্ধুরা সমুদ্রের হাওয়া... উপভোগ করছেন।

মঁসিয়ে বোয়ার সঙ্গে ছোটখাট একটি ভ্রমণে আমি বেরচ্ছি। তারপর কোথায় যাব জানি না। তুমি কি জান যে, আমি উৎকট ফরাসিভাবাপন্ন হয়ে উঠছি? আমি ব্যাকরণও শিখছি এবং এই কাজে কঠিন আয়াস করছি। আশা করি, কয়েক মাসের মধ্যেই আমি রীতিমতো একজন ফরাসি হয়ে উঠব, তবে ইংল্যাণ্ডে বাস করার ফলে ততদিনে ঐ ভাষা ভুলে যাব।

আমি সবল, সুস্থ ও পরিতৃপ্ত [আছি]—কোন মানসিক অবসাদ নেই।

এখন বিদায়
বিবেকানন্দ

আজ হতে শতবর্ষ আগে
উদ্বোধন

আষাঢ় ১৩১২
জুন ১৯০৫

যোগি-দর্শন।

(শ্রীহরিপদ মিত্র।)

ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধের দ্বারা স্বামীজির সহিত আমার কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ ও তদ্দ্বারা আমার স্বভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের অনেক পরিবর্ত্তন হয়, উদ্বোধন পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। তাঁহার বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে নানা উপদেশও স্মৃতি ও ডায়েরী হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী পাঠ করিয়া সহজে কোন বিষয় বিশ্বাস হইত না। অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কোন বিষয় শুনিলে বা পড়িলে তাহা ঠাকুরমার গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। স্বামীজির ন্যায় অসামান্য মহাপুরুষের সঙ্গলাভে যদিও একঘেয়ে বুদ্ধি অনেকটা দূর হইয়াছিল, তথাপি যখন স্বামীজির 'রাজযোগ ও পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ' পড়িলাম, তখন উহার মধ্যে কথিত ব্যাপারগুলি এত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল যে, বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হইল না। একদিকে মন বলিতে লাগিল, আমি এগুলি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া যে এগুলি মিথ্যা, তাহা কখনই হইতে পারে না, সত্য হইলেও হইতে পারে। অপরদিকে আবার ঐগুলি এত অসম্ভব ও প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ বোধ হইল যে, সহজে কোনমতে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

আমার চিত্ত এইরূপ সন্দেহদোলায় দোলায়মান, এমন সময় জনৈক যোগীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার কয়েকটী অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়।...

তখন আমি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছি। আমার জনৈক মান্দ্রাজী বন্ধু পূর্ব্বে নাসিকে এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন, সম্প্রতি বদলি হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি নাসিকে অবস্থানকালে হনুমানানন্দ নামক জনৈক যোগীর সহিত পরিচিত হন... আমার বন্ধু যোগবিভূতি সম্বন্ধে আমার মনের সংশয় অবগত হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর যোগী সন্ন্যাসীর প্রতি আমার পূর্ব্বের ন্যায় অবিশ্বাস ছিল না। সুতরাং আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলাম।...

আমাকে দেখিয়াই স্বামীজি [হনুমানানন্দ] উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার আসনের নিকট বসাইলেন ও বলিলেন, "কেঁও বাবা আচ্ছা হো, হাম বহুৎ খুস হুয়া, বহুৎ রোজ পিছে আজ বাঙ্গালী লোক দেখা।"... দেহ শীর্ণ কিন্তু চক্ষু উজ্জ্বল—দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়।... তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল যে, শরীরটার উপর যেন তাঁহার বিশেষ খেয়াল নাই।...

তাঁহার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমি তাঁহাকে স্বামীজির কথা বলাতে তিনি পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আমারও পরম আনন্দ হইল। দেখিলাম, যদিও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ নহেন, তথাপি তিনি একজন প্রকৃত যোগী পুরুষ।... তিনি আমার নিকট হইতে স্বামীজির গ্রন্থাবলী লইয়া পরম আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। ক্রমশঃ দেখিলাম, তিনি হঠযোগে কৃতকার্য্য হইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিতেছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে যেসকল উপদেশ দিতেন, তাহা স্বামীজির উপদেশের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত। ভগবৎপ্রসঙ্গে ভাবে গদগদ হইয়া সময় সময় এত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার আসন পর্য্যন্ত সিক্ত হইত। তিনি বলিতেন, হঠযোগ গুরুর নিকট শিখিতে হয়। উহা অভ্যাস করিতে হইলে উর্দ্ধরেতা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।... অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি এই মাত্র বলিতেন যে, এগুলি কিছুই অসম্ভব নহে। তবে যাহাদের ঐরূপ সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহাদের সাধারণকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সিদ্ধি প্রদর্শন করা উচিত নয়।

একদিন আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া তাঁহার যোগশক্তি দেখিবার জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে দেখিলাম। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও আমাদের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত তিনি স্বীকৃত হইলেন। পরদিন প্রাতে ছয়টার সময় দশ-বার জন গ্রাজুয়েট বন্ধু মিলিয়া (আমাদের মধ্যে এল্, এম্, এস্‌ও ছিলেন) যোগি-দর্শনে যাত্রা করিলাম। তিনি প্রথমতঃ নানাপ্রকার আসনাদি করিয়া দেখাইলেন যে, শরীরের সমুদয় স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত। আমাদের ডাক্তার বন্ধুটী ত দেখিয়া অবাক্। তিনি ইচ্ছাক্রমে যকৃতের স্থানে প্লীহা ও প্লীহার স্থানে যকৃৎ লইয়া যাইতে পারিতেন। গুহ্যদ্বার দ্বারা দু-এক কলসী পর্য্যন্ত জল আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিতেন; এক টুকরা চব্বিশ হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মলমল কাপড় লইয়া সমুদয় গলাধঃকরণ করিয়া পাকস্থলী ধৌত করিতেন; কুম্ভকের দ্বারা আসন ছাড়িয়া ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত শূন্যে উঠিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ অশেষবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়াসকল আমাদিগকে দেখাইলেন ও অবশেষে বলিলেন যে, এইসকল ক্রিয়া কেবল শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য, হঠযোগের দ্বারা রাজযোগের সহায়তা হইয়া থাকে মাত্র।

তিনি কাহারও নিকট অর্থাদি গ্রহণ করিতেন না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সহরে বেড়াইবার জন্য আনিতে পারি নাই। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাতেই তাঁহার একরূপ বেশ অধিকার ছিল। ইঁহার সহিত সাক্ষাতের পর যোগশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সংশয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি হরিদ্বারে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪॥

শ্লোকার্থঃ *কিন্তু অল্পবুদ্ধি (অল্প মেধস) সেই দেবতা-উপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল সীমিত অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। দেবোপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। আমার ভক্তগণ মোক্ষস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয় এবং সেই অল্পবুদ্ধি মানবসকল আমার পরম-স্বভাব জ্ঞাত হইতে না পারিয়া আমাকে প্রাকৃত মানব (সাধারণ মানুষ) বলিয়াই ধারণা করে।*

ব্যাখ্যাঃ ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন ঠিক মানুষের মতোই ব্যবহার করেন। পরবর্তী কালে ভক্তদের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে অতিপ্রাকৃত অনেক ঘটনা সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ বলিয়া থাকেন, কারণ জনসাধারণ ইহজীবনে ঐশী সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ত্যাগীদের বাসনাত্যাগ কিংবা ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি শক্তির কথা একদম বুঝিতে পারে না। ত্যাগীদের মধ্যে যাহারা দীর্ঘ জটা ধারণ করেন, শীত-গ্রীষ্মে উলঙ্গ হইয়া বেড়ান তাহারা তাঁহাদিগকেই শক্তিশালী পুরুষ মনে করে। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে ত্যাগ, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহার ফলে অবতারের প্রকৃত তত্ত্ব মানুষের কাছে প্রধানত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে সমাধি, উর্জিতা ভক্তি প্রভৃতি অসাধারণ ভাবসকল প্রকাশ করিলেও তাঁহার সমসাময়িক অতি অল্প লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ আমেরিকায় সম্মানলাভ করিলেন, যখন শ্বেতকায় (বিদেশীরা) 'দেবতা'-শিষ্যদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন; তখন লোকে ভাবিল, শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার অনুকরণে ভারতে বিশেষত বঙ্গদেশে ঠাকুরের অভিনয় করিয়া কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতদের পর্যন্ত অভিভূত করিতেছেন। এইসব দেখিয়া আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতেছি ভগবানের, বিশেষত তাঁহার অবতারের প্রকৃত শক্তির কথা মানুষ একেবারেই বুঝিতে পারে না। তাই তাহারা কোন এক শক্তিশালী পুরুষের পূজা করিয়া তৃপ্ত হয়।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫॥

শ্লোকার্থঃ *ত্রিগুণাত্মিকা যোগমায়ার শক্তিতে সমাচ্ছন্ন বলিয়া আমি (ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ) সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। অতএব মোহান্ধ মানুষ জন্মমরণরহিত আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না।*

ব্যাখ্যাঃ আমরা অবিদ্যা মায়ায় আবৃত। সেই মায়ার ওপরে আমাদের কোন হাত নাই। মায়াধীশ ভগবান নিজে আমাদের মতো সাজিয়া আসেন—ইহাও তাঁহার সেই মায়াশক্তি। ইহাকে বলা হয় 'যোগমায়া', যাহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার আবরণ। মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে যোগমায়া আবৃত ব্রহ্মকে একটু একটু বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধ না হইলে বুঝাই যায় না। এই যোগমায়ার কারণেই ভক্তেরা ভগবানের উপর আকর্ষণ অনুভব করেন। অ-ভক্তেরা অবতারকে সাধারণ লোকের ন্যায় জ্ঞান করেন। তথাকথিত ভক্তদের মধ্যেও সকলে তাঁহাকে সর্বব্যাপী শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া কিছুই বুঝেন না। বড় জোর একজন important লোক মনে করেন।

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুই কোথাও নাই। আমাদের দৃক্‌শক্তি (power of knowing things) অবিদ্যার আবরণে সম্পূর্ণ আবৃত। কিন্তু দৃক্‌শক্তি লুপ্ত (annihilated)

নহে—ধ্বংস হয় না। অবিদ্যা আবরণের ভিতর দিয়া সেই দৃক্‌শক্তির সাহায্যে আমরা ব্রহ্মকে অস্পষ্টভাবে জগৎ-রূপে দেখি। তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিলে আমরা পূর্বে যাহা জগৎ বলিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাই তখন চৈতন্যময় দেখি। তখন বিষ্ঠা ও চন্দন একবোধ হয়—সাধু ও পাপী একবোধ হয়। যেমন মোমের বাগান—বাগানে গাছ, ফুল, ফল সবই দেখা যাইতেছে, কিন্তু মোম ছাড়া আর কিছুই নাই—এরূপ বোধ হয়। তখন এটিকে বলে 'পাকা আমি'। সেই সময়ে আমাতে শুধু একটু আবরণ থাকে—তাহাকে বলে বিদ্যার আবরণ। এই আবরণ খুলিয়া গেলে যে-অবস্থা হয়, তাহাই বাক্য-মনের অগোচর। 'গীতা'য় ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্বাণ' (২।৭২) বলিয়া শ্রীভগবান বর্ণনা করিয়াছেন।

[**মন্তব্য ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণও স্বমুখে নিজের লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'যোগমায়া'র উল্লেখ করিয়াছেন। ফুলুই শ্যামবাজারে (হুগলি) সেই সাতদিন ধরিয়া কীর্তনে মানুষের ঢল—ইহাকে যোগমায়ার আকর্ষণ বলিয়া ঠাকুর নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমায়ের জীবনে দেখি, 'রাধু'কে ঠাকুর দিব্যদর্শনে যোগমায়া বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' মায়ারই এক বিশেষ প্রকাশ এই যোগমায়া বা চিৎ শক্তি।—সম্পাদক]

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥২৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *হে অর্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান (এই তিন কাল এবং তৎ-মধ্যবর্তী সময়) এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে জানি। অতএব আমি সব প্রাণীকেই জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না।*

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুই নাই। ব্রহ্ম একটি জ্ঞানময় সত্তা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টির সমস্ত জিনিস তাঁহার মধ্যেই নিহিত। জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মায়ার প্রভাবে তাহার দৃক্‌শক্তি নিজেকে জানিতে অসমর্থ হইয়া অনাত্ম বস্তুর দিকেই সর্বদা নিবদ্ধ হইয়া আছে। বিষয়-বাসনা কমিলে মায়া একটু হালকা হয়, তখন ক্রমশ শুদ্ধ বস্তুর দিকে জীব একটা আকর্ষণ অনুভব করে। সেই আকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি হইলে জীবের ভিতরে আত্মদর্শনের শক্তি জাগ্রত হয়। জীব ও ব্রহ্মে ইহাই পার্থক্য।

সেই দৃক্‌শক্তির সাহায্যে যখন অন্যান্য বিষয় জানা যায়, তখন সেই অন্যান্য বিষয়ও ব্রহ্মরূপেই আবির্ভূত হয়। সব চৈতন্যময় বোধ হয়।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥২৭॥

শ্লোকার্থ ঃ *হে পরন্তপ (যিনি শত্রুকে দহন করেন, অর্জুনের অন্য নাম), প্রাণিগণ যে-মুহূর্তে সৃষ্ট হয়, তখনি ইচ্ছা, দ্বেষ এবং তজ্জাত শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বজনিত মোহ তাহাকে হৃতজ্ঞান করিয়া ফেলে। (অতএব জীব আমাকে জানিতে পারে না।)*

ব্যাখ্যা ঃ জীব মায়াতে আবৃত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। তখন সে দেখে, সে যেন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারী একটি জীব হইয়াছে। দেহ-মনের কতকগুলি জিনিস সুখদায়ক এবং কতকগুলি দুঃখদায়ক বোধ হয়। দুঃখ দূর করিয়া সুখ পাইবার চেষ্টা করাই জীবনের লক্ষণ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখের আর শেষ নাই—তাই জীবকে লক্ষ লক্ষবার জন্মাইতে হয়, মরিতে হয়।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥২৮॥

অর্থ ঃ *কিন্তু যেসকল পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা দৃঢ়ব্রত। তাহাদের দ্বন্দ্বমোহাদি হইতে মুক্তি হইয়াছে। তাহারা আমারই ভজনা করিয়া থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ এইরূপে সুখের আশায় বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। তখন সে জানিতে পারে, সুখলাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা এই যে, নিজের সুখলাভের চেষ্টা অপেক্ষা পরকে সুখী করিবার চেষ্টা করিলে বেশি সুখলাভ হয়। এই পরহিতচিকীর্ষা হইতে দেহাত্মবুদ্ধি কমিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে সমষ্টিচৈতন্যের দিকে মনে একটা খুব আকর্ষণ বোধ হয়। কেবল তখনি জীব ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

'অন্তগতং পাপং' এবং 'Self Expansion' একই কথা।

সংসারে মানুষ নিজের সুখের জন্যই সব চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই স্থায়ী সুখ পায় না। তখন অপর একজনকে প্রিয় ভাবিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহারই সুখ-দুঃখে ভাগী হয়—এইরূপে স্ত্রী-পুত্র কিংবা আত্মীয়-স্বজনে, দেশে তথা মানবজাতিতে প্রিয়বুদ্ধি হইতে হইতে সমগ্র জীবজন্তুতে প্রিয়বুদ্ধি হইলেই স্বভাবতই সমষ্টিচৈতন্যের দিকে মন প্রধাবিত হয়। যে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক, সে কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে কষ্ট দিবে না; এমনকি নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।/ পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥"

[ক্রমশ] ॥একত্রিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *আত্ম অহঙ্কার বা বদান্যতার ভাবে নয়, স্বাভাবিকভাবে ভারত পাশ্চাত্যকে এবং পাশ্চাত্য ভারতকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?*

উত্তর ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক এই মহান কাজটিরই সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন—সুদৃঢ় ভিত্তিতে। ভারতবর্ষকে তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন যে, জগতে এমন কোন সংস্কৃতি নেই, যা নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর। প্রত্যেক সংস্কৃতিই এক-একটি 'সাংস্কৃতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা' মাত্র; আর তাই আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষকে তিনি বললেন, ভারতীয় সংস্কৃতি অনেক দিক দিয়ে মহান, কিন্তু একেবারে নিখুঁত নয়। এই সংস্কৃতির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে, এবং তার ফলেই আবার মানুষের জীবনের অপর কয়েকটি দিক রয়ে গেছে উপেক্ষিত। মানুষের অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নিজেকে বিশেষভাবে নিয়োগ করেছে বলে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে—আমাদের বহির্জীবন উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়ে রয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি সর্বক্ষেত্রেই মানুষের বহির্জীবনের; যেখানে পাশ্চাত্যে ব্যাপারটি উলটো। তাদের অন্তর্জীবন উপেক্ষিত; বহির্জীবন বিশেষ সমৃদ্ধ।

অনেকগুলি প্রশ্নোত্তরপর্বে এই বিষয়টি উঠে এসেছিল। ওঁরা বললেন, "স্বামীজী, আপনার কি মনে হয় না যে, ভারতে আপনাদের নিজস্ব সমস্যা রয়েছে?" উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের বড় বড় সমস্যা আছে; কিন্তু আপনাদের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষে আমাদের সমস্যার পার্থক্য হলো, আমাদের একটি 'আত্মা' আছে—শুদ্ধ, পবিত্র ও শক্তিশালী আত্মা। আমরা তার প্রকাশের উপযুক্ত একটি সুস্থ-সবল 'দেহ'-এর সন্ধানে আছি। আমাদের পূর্বতন দেহ ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং ভারতবর্ষের অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ আত্মাকে ব্যক্ত করার অনুপযুক্ত। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে এমন একটি রাষ্ট্রীয় দেহ গড়ে তোলার, যা হবে সুস্থ ও শক্তিশালী। পাশ্চাত্যে আপনাদের একটি সুন্দর দেহ আছে, এবং আপনারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন অন্তরাত্মাকে। আপনাদের কি মনে হয় না যে, দেহ খুঁজে বের করার চেয়ে আত্মা খুঁজে বের করা অনেক কঠিন?" ওঁরা বললেন, "হ্যাঁ।"[১]

বাস্তবিকই, আত্মা খুঁজে বের করার চেয়ে দেহ খুঁজে বের করা সহজ। দুটি প্রজন্মেই উপযুক্ত আকারের যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলে আমরা আর্থিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারি। এর মধ্যে কোন রহস্য বা দুরূহ যাদুশক্তির ব্যাপার নেই। এর জন্য পাশ্চাত্য সাহায্যও পাওয়া যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, এটিই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের বাস্তব অবস্থা। তাই তিনি ভারতবর্ষকে বলেছিলেন, তোমার রয়েছে অনন্ত আত্মা; তাকে এখন একটি সুন্দর দেহ প্রদান কর। মানুষের আত্মমর্যাদার ওপর জোর দাও। জাতপাতের দিকে তাকিও না; যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা এইসব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে 'ভারতীয়' ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হতে দাও। মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, তার প্রকাশের পথ খুলে দাও। আর্থিক অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন—সব আসবে। ভারতকে কী মহান বাণীই না তিনি শুনিয়েছেন! আমাদের, ভারতবাসীদের তিনি বলেছেন, এসব রূপায়িত করতে পাশ্চাত্যের সাহায্য নাও। পাশ্চাত্যের পদপ্রান্তে বসে শেখ। বিনয়ের সঙ্গে শেখ—পাশ্চাত্যের কী শিক্ষা দেওয়ার আছে। আসলে, তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, একটি রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসাবে ভারতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারাকে নিজের মতো করে গ্রহণ করার বা আত্তীকরণের মাধ্যমে—অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে নয়। ভারতের কাছে এ-ই ছিল তাঁর মহান বাণী।

অন্যদিকে, তিনি সাধারণভাবে পাশ্চাত্যকে এবং বিশেষভাবে আমেরিকাকে বলেছিলেন—তোমরা এক অতি-উন্নত সমাজ গড়ে তুললেও ভিতরে ভিতরে বিপন্ন বোধ করছ; তোমাদের অন্তর্জগৎটা খাঁ-খাঁ করছে। এবিষয়ে তোমাদের দেওয়ার মতো ভারতের কিছু আছে। তোমাদের বিশাল উন্নতি ও প্রাচুর্য ভিতরের মানুষটাকে শক্তিশালী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যাপারটি ভারতের কাছে শেখ—মুক্তমনে। এইভাবে, স্বামীজীর অনুসরণে বর্তমান যুগে ভাব-ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা জগৎ জুড়ে গড়ে তুলব এমন একটি সংস্কৃতি, যা হবে কেবল প্রাচ্যের নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়—হবে এক সর্বাঙ্গীণ মানব-সংস্কৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ অবদান হলো ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমতা, তাদের সংস্কৃতির সমতা এবং উভয় সংস্কৃতির পারস্পরিক ভাববিনিময় ও ভাব-আত্তীকরণের মাধ্যমে আমাদের এযাবৎকালের বিভিন্ন জাতিগত ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্য থেকে একটি পরিপূর্ণ মানব-সংস্কৃতি গড়ে তোলা। তিনি যা বলেছিলেন, তা আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—সকলেরই কাছে বিশেষভাবে শিক্ষণীয় হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "নিজেদের শেখাও, প্রত্যেককে শেখাও—তাদের আসল স্বরূপ কী। ঘুমন্ত আত্মাকে ডেকে তোল—দেখ, কেমনভাবে তিনি জাগেন। শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, উৎকর্ষ আসবে, পবিত্রতা আসবে; যাকিছু
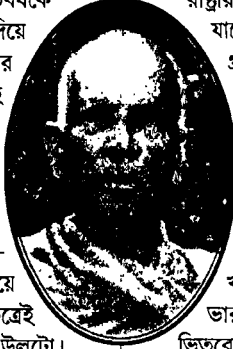
১ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এখানে 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা বা তার নিজস্ব মনকে বোঝাতে। ইংরেজি 'soul' শব্দটিরও লক্ষ্য সেটিই। তাই বর্তমান আলোচনায় 'আত্মা'কে তার সনাতন শাস্ত্রীয় ব্যঞ্জনায় গ্রহণ না করে মূল রচনার 'soul'-এর নিকটতম বাঙলা প্রতিরূপ বলে ভাবা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, স্বামীজীর বাণীতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'soul' শব্দটির ক্ষেত্রেও এটি সত্য।—**অনুবাদক**

মহান ও মহিমময়, সেসবই আসবে—তখন, যখন এই ঘুমন্ত আত্মা আত্মসচেতন কর্মপ্রেরণায় জাগ্রত হয়ে উঠবেন।"

এইভাবেই একদিন দূরীভূত হবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মানুষের সেইসব অপূর্ণতা ও সুপ্ত চাহিদা, যেগুলি তাদের ব্যক্তিত্বকে করে রেখেছে অবিকশিত ও অসম্পূর্ণ। বেদান্ত কিন্তু মানুষকে তার সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। বেদান্তের বাণী ভারতে যেমন, আমেরিকাতেও তেমনই প্রাসঙ্গিক। এটি অসাধারণ একটি ভাব, যাকে আসন্ন দশকগুলিতে রূপায়িত করতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বোধহয় ২০০০ সালের আগেই এই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে যাবে, কারণ যুদ্ধোত্তরপর্বে এ-কাজটি খুব নিবিড়ভাবেই চলছে।[২] আমাদের সব চিন্তাভাবনা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তে। মানুষও সারা পৃথিবী ঘুরছে। আমেরিকায় আজ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭,০০০।[৩] তাঁরা কী করছেন? আমেরিকার যা শ্রেষ্ঠ বস্তু দেওয়ার আছে, তা নিয়ে তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরছেন, কেউ কেউ থেকে যাচ্ছেন। যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা সঙ্গে করে আনছেন মহাশক্তিধর সেই গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির উদ্যমী বাণী, যার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন; সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন সেই প্রমিথিয়ান স্ফুলিঙ্গ, যা ভারতীয় আত্মাকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলবে তার নিজস্ব আগ্নেয় দীপ্তিতে। বস্তুত, এই প্রক্রিয়াটি ভারতকে ইতোমধ্যেই দারুণভাবে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। একইভাবে, আমেরিকানরা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ এ-দেশটিকে তার আধ্যাত্মিক পশ্চাদ্‌পটে আবিষ্কার করেন ও সেই আধ্যাত্মিকতার কিঞ্চিৎ স্পর্শ বহন করে দেশে ফিরে যান। আমাদের নিজেদের দিক থেকেও পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের কাজ চলছে। ভারতকেন্দ্রিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও একইভাবে সেখানে কাজ করছে।

এইভাবেই বর্তমান কালে চলছে এক অসাধারণ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধর্ম-সংস্কৃতির জগৎ থেকে সমস্ত একক-অধিকারের ভাব বিদায় নেবে। আরো বেশি করে গড়ে উঠবে মানবীয় বন্ধন, যা যুক্ত করবে পাশ্চাত্যের শক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের শক্তি অর্থাৎ অন্তর্মুখী জীবন ও আধ্যাত্মিকতাকে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সামনে এই আদর্শ ও পরিকল্পনাকেই স্থাপন করে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ *এইমাত্র আপনি আমেরিকায় পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বললেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবটি প্রকাশ পায়? সেই প্রকাশ বা অভিব্যক্তির গুণগত মানটিই বা কীরকম? এবিষয়ে আরো অগ্রগতি আনা কীভাবে সম্ভব?*

উত্তর ঃ এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। বেশির ভাগ ভারতীয় ছাত্রছাত্রী—সত্যি কথা বলতে কী—বৈদেশিক যোগাযোগের (Foreign Services) আধিকারিগণ-সহ বিভিন্ন পেশার ভারতীয়দের বৃহত্তর অংশ দৈহিকভাবে ভারতীয় হলেও মানসিকভাবে নন। তাঁদের ভিতরে ভারত দেশটা আছে অতি অল্পই। তাঁদের অনেকেই নিজেদের এই ত্রুটিটা বুঝতে পারেন কেবল পাশ্চাত্যে গিয়েই, কারণ পাশ্চাত্য তাঁদের ভারতীয় অধ্যাত্মসম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। সেখানকার মানুষ জানতে চান ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে; কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়রা অনুভব করেন, বিদেশিদের দেওয়ার মতো তাঁদের কিছুই নেই! আর তখন এইসব ভারতীয় বুঝতে পারেন যে, দেশে তাঁরা যে-শিক্ষা পেয়ে এসেছেন, তা পর্যাপ্ত ছিল না। সাধারণভাবে বলতে গেলে এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা যে-শিক্ষা পাই, তা আমাদের আপন সংস্কৃতিকে একটু গভীরভাবে বোঝার মতো কোন অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে না। আমেরিকায় আমি কিছু এইধরনের ভারতীয় যুবক-যুবতী দেখেছি, যাঁদের মধ্যে কখনো কখনো নিজেদের দেশ বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা কুণ্ঠা বা একটা হীনম্মন্যতা কাজ করে। ভারতীয় বলে যেন তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থী! এঁরা কিন্তু ক্রমশ উপলব্ধি করছেন যে, অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমেরিকানদের একটা ব্যর্থ কার্বন-কপি হয়ে ওঠার চেয়ে একজন ভারতীয় হয়ে ওঠা অনেক ভাল, তা সে ভারতীয়ত্বে যত অসম্পূর্ণতাই থাক না কেন। তার কারণ, আমেরিকার লোকেরা কখনোই ঐ কার্বন-কপি আমেরিকানকে শ্রদ্ধা করে না। ধীরে ধীরে প্রবাসী ভারতীয়দের এই চেতনাটা আসছে। তবে, সময় লাগবে অবস্থা বদলাতে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই এমন হতে হবে যে, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা অন্তত কিছুটাও ধারণা করে উঠতে পারে। সব খুঁটিনাটি জানার তাঁদের দরকার নেই। মানুষের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে কেন্দ্র করে যে একটি যুক্তিঋদ্ধ দর্শন আছে, সে-দর্শনের ব্যাবহারিক কিছু দিককে যে ইতোমধ্যেই রূপায়িত করা হয়েছে এবং বাকিগুলিকে বর্তমান কালে রূপায়িত করতে হবে, সেই প্রায়োগিক দিকগুলি যে বিশ্বের সর্ব অংশেই প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য, আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে আমাদের সে-কাজ সুসমন্বিতরূপে সমাধা করতে সাহায্য করবে—ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত মানবদর্শনের এইসব মূলতত্ত্ব অতি অবশ্যই ভারতের সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। এই অন্তর্বলে বলীয়ান হয়ে তাঁদের পাশ্চাত্য-বন্ধুদের সাহায্য করার ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা যখন বিদেশে উপস্থিত হবেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকে হয়ে উঠবেন বিদেশে ভারতবর্ষের এক-একজন যথার্থ প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত। শুধু তা-ই নয়, পাশ্চাত্য জীবনসংস্কৃতির প্রাণবন্ত দিকগুলিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে ভারতবর্ষের কাছেও তাঁরা পাশ্চাত্যের এক-একজন যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াবেন। আর এইভাবেই তৈরি হবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সোনালি মেলবন্ধন। তবে, সেটা এখনি হচ্ছে না। এমনকি, বৈদেশিক সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ভারপ্রাপ্ত মানুষেরাও এবিষয়ে অতি অল্পই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এবং সে-কারণেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও যৎসামান্য। [ক্রমশ]

২ মনে রাখতে হবে, পূজনীয় মহারাজজীর এই বক্তব্যের সময়কাল ১৯৭০। তার ৩০ বছর পরে ২০০০ সালের মধ্যেই আধুনিক বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আন্তর্বিশ্ব ভাববিনিময় প্রক্রিয়া কী অবিশ্বাস্য বেগ অর্জন করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।—অনুবাদক

৩ বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৭৫,০০০।—অনুবাদক

মাহেশ

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

> শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন অধুনা-প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার একত্রিংশতম পর্যায়।
> —সম্পাদক

হুগলি জেলার মাহেশের বিখ্যাত রথযাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতো একদা আগমন ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীরও। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বলরাম বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী রাধারানি দেবীর আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমায়ের এই রথযাত্রা দর্শন হয়েছিল। কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র ফাল্গুনী বসুর সূত্রে জানা যায়, মাতৃদর্শনে উদ্বোধন বাড়িতে গৌরী-মার সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন রাধারানি দেবী। উদ্দেশ্য—মাহেশের রথ দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ! তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অত্যন্ত স্নেহধন্যা, গৌরী-মার পূর্বপরিচিতা। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীমা উৎফুল্ল হন এবং স্নেহ-সম্ভাষণে কাছে টেনে নেন। মাহেশে রথযাত্রা দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি বলেন, রাধিও ঝোঁক ধরেছে মাহেশে রথ দেখতে যাওয়ার, দেখা যাক ঠাকুর কী করেন!

মাহেশের রথ

এই রথযাত্রার প্রবর্তক কৃষ্ণরাম বসুর আদি বাড়ি কলকাতার শ্যামবাজারে। এখানে আজও দামোদর বিগ্রহের নিত্যপূজা ও আরাধনা হয়। এবাড়িতে একদা শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ঘটেছিল। (দ্রঃ 'উদ্বোধন', ১০৬তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১১, পৃঃ ২৫৪-২৫৫) শ্যামবাজারের বসু পরিবারেরই এক মহল ছিল হুগলি জেলার মাহেশে। মাহেশের যে-রথ তিনশো বছর অতিক্রম করে আজও বিরাজ করছে তা এই বসু পরিবারেরই এক অক্ষয় কীর্তি!

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন ঃ "রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মাতাঠাকুরানি একদিন শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। মাহেশে জগন্নাথদেবের সেবাপ্রতিষ্ঠা করেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত কমলাকর পিপলাই চক্রবর্তী; কিন্তু জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ব্যবস্থা কলিকাতার কৃষ্ণচন্দ্র বসুদের, তাঁহাদেরই আগ্রহে মাতাঠাকুরানি সেখানে গিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করেন।

"যাত্রার প্রাক্কালে লেখিকাকে (দুর্গাপুরী দেবী) মা ডাকিয়া পাঠাইলেন। একখানি মোটরগাড়িতে ছোটমামি, রাধারানি, নিতাইবাবুর মা এবং লেখিকাকে লইয়া মাতাঠাকুরানি মাহেশে যাত্রা করেন। গণেন্দ্রনাথ সেবকরূপে গাড়ির সম্মুখভাগে রহিলেন। মা রথ দেখিতে যাইতেছেন শুনিয়া আরো বহু ভক্ত নরনারী নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি যানে তথায় চলিলেন।

"জগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ বসুদের প্রশস্ত বাটীতে মাতার বসিবার ব্যবস্থা হইল। তথায় পৌঁছিয়া মা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। অদূরে জগন্নাথের সুসজ্জিত রথ, চারিদিক হইতে বিপুল জনস্রোত আসিয়া তথায় মিলিত হইয়াছে এবং রথক্ষেত্র যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে গৌরী-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা, হরির মা প্রভৃতি ভক্তিমতী মায়েরা এবং অনেক গৃহী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সন্তানও সারদানন্দজীর সঙ্গে নৌকাযোগে আসিয়া সেই স্থানে মিলিত হইলেন।

"মাতাঠাকুরানি কি করিয়া নির্বিঘ্নে রথরজ্জু টানিতে পারিবেন, কর্তৃপক্ষ তখন তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মাতার নির্দেশে মায়েরা জগন্নাথদেবের স্তবপাঠ করিলেন। অতঃপর সন্তানগণ মাতাঠাকুরানি এবং নারীভক্তগণকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহত্রয়ের (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা) উদ্দেশে প্রণাম এবং ফল নিবেদন করিবার পর রথটানা আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে বিশাল জনতার কণ্ঠনিঃসৃত 'জগন্নাথ মহাপ্রভু কী জয়' ধ্বনির মধ্যে রথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মা বিশ্রামকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় কিছুক্ষণ ভজনগান হইবার পর প্রসাদের ব্যবস্থা হইল। বসুপরিবারের এবং সেবায়েতদিগের আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন।"[১]

শ্রীশ্রীমায়ের মাহেশের রথদর্শন প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন ঃ "একবৎসর রথযাত্রার সময়
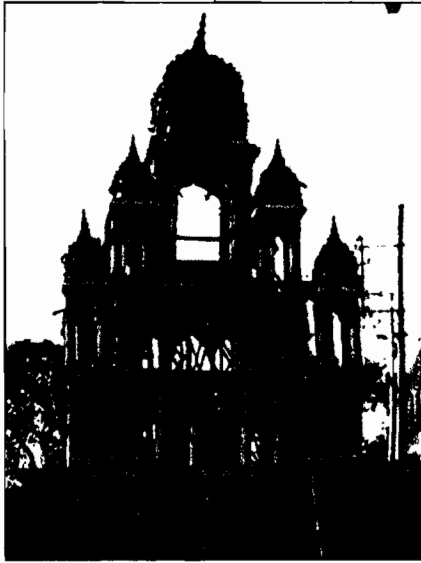
শ্রীশ্রীমা গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাহেশে গমন করেন; এবং প্রায় সমস্ত দিন তথায় থাকিয়া, প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ও রথরজ্জু ধরিয়া টানিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐদিন রাধু ও নিতাইবাবুর মা মার সঙ্গে মোটরগাড়িতে এবং যোগীন-মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তেরা নৌকাযোগে মাহেশে গিয়াছিলেন।"[২]

মাহেশে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা পরম ভাগবত ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং জগন্নাথদেবের প্রথম সেবাইত হলেন কমলাকর পিপিলাই চক্রবর্তী। এপ্রসঙ্গে জানা যায়ঃ "শ্রীপুরীধামে গমন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিতে ধ্রুবানন্দের বড়ই বাসনা হয়, কিন্তু পুরীর সেবক বা পাণ্ডাগণ তাঁহাকে নিষেধ করেন। ইহাতে তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন। শেষে নিদ্রাকালে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েন, 'ধ্রুবানন্দ! তুমি গঙ্গাতীরে মাহেশে গমন কর, তথায় আমায় দেখিতে পাইবে ও তোমার মনোমতো সেবা করিবে।' ধ্রুবানন্দ আদেশ পাইয়া আক্না মাহেশে আগমন করেন (হুগলি জেলার মহকুমা শ্রীরামপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে উক্ত মাহেশ গ্রাম) এবং গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুমূর্তি ভাসমান দেখিয়া অতীব আনন্দ সহকারে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঐ স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল। ধ্রুবানন্দ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া প্রভুর সেবাপ্রকাশ করেন এবং পুরীধামে যেরূপ শ্রীজগন্নাথের লীলাপর্বাদি হইয়া থাকে, এখানেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। ইনিই বঙ্গদেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের প্রথম স্থাপনকারী।"[৩]

এই তুলসীমঞ্চের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন।

মাহেশের রথযাত্রার দায়িত্ববাহী ফাল্গুনী বসু জানিয়েছেনঃ "একদিন হঠাৎ ধ্রুবানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করা হলো, কিন্তু তাঁর সেবা চালাবার শারীরিক ও আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নেই! কীভাবে এসব চলবে? সেইসময় শ্রীচৈতন্যদেব সদলবলে এপথ দিয়েই শ্রীক্ষেত্র গমন করছিলেন। ধ্রুবানন্দের সমস্ত কথা শুনে তিনি তাঁর গৃহী ভক্ত কমলাকর পিপিলাই চক্রবর্তীকে মাহেশে জগন্নাথদেবের সেবাকার্যে ব্রতী হতে নির্দেশ দিলেন। সেইকাল থেকে পুরুষানুক্রমে কমলাকর পিপিলাইয়ের বংশধরগণ জগন্নাথদেবের সেবাকাজ চালিয়ে আসছেন।

"তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হুগলি জেলার দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণরাম বসু। তিনি যেমন ধনী, তেমনি ধার্মিক। কমলাকর পিপিলাই একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাহেশে জগন্নাথদেবের আবির্ভাব-কথা ব্যক্ত করেন এবং জানান যে, তাঁর খুব বাসনা আগামী রথযাত্রায় জগন্নাথদেব রথে আরোহণ করুন। তাঁর বক্তব্যে কৃষ্ণরাম বসু উৎসাহিত হলেন। তিনি তখন তাঁর বন্ধু নয়নচাঁদ মল্লিককে ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন। দুই বন্ধু আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিলেন, নয়নচাঁদ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করে দেবেন এবং কৃষ্ণরাম বসু রথ নির্মাণ করে রথযাত্রা উৎসবের দায়িত্বভার নেবেন। প্রতিশ্রুতি-মতো জগন্নাথদেবের মন্দির এবং রথ নির্মিত হলো।

"প্রথম রথটি ছিল কাঠের, পাঁচচূড়াবিশিষ্ট। তারপর কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ নয়চূড়া-বিশিষ্ট রথ নির্মাণ করান। জনৈক ব্যক্তি সেই রথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে সমাজবিচারে সেই রথ অশৌচ-দোষে দুষ্ট হয়। তারপর গুরুপ্রসাদের পুত্র কালাচাঁদ পুনরায় রথ নির্মাণ করান। এরপর ঐ রথ নিয়ে এক বিসংবাদ ঘটে। তখন রথ মাহেশ থেকে যেত বল্লভপুরে ('মাসির বাড়ি' তখন বল্লভপুরে ছিল)। জগন্নাথদেবের আয় থেকে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মাহেশ ও বল্লভপুরের পুরোহিতদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বিতর্ক বিবাদে পরিণত হলে বল্লভপুরের পুরোহিতরা রোষে রথে আগুন ধরিয়ে দেয়। রথ পুড়ে যায়। এঘটনা ঘটে গুরুপ্রসাদের পৌত্র (রাজেন্দ্রনাথের পুত্র) বিশ্বম্ভরের আমলে। তারপর আসে কৃষ্ণচন্দ্রের পালা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, রথ করতে হবে লোহার যাতে তা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং অশৌচাদি দ্বারা মলিন বা অস্পৃশ্য না হয়। তিনি লোহার রথ নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মার্টিন বার্ণ কোম্পানিকে। ঐ কোম্পানি একবছর ধরে বহু পরিশ্রমে লোহার রথটি নির্মাণ করেন। ঐ রথের ঘোড়াগুলি নির্মিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির

সহায়তায়। সেই রথ আজও রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা-সহ যাত্রা করে।"

রথের সুবাদেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনতিদূরে স্থাপিত হয় বসু পরিবারের দ্বিতল ভবন। সেই ভবনের মাঝে ছিল উঠান ও তুলসীমঞ্চ। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গী-সহ মাহেশে রথ দেখতে এসেছিলেন এবং বসু পরিবারের উঠানের তুলসীমঞ্চের কাছে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই গৃহেই শ্রীশ্রীমা পদার্পণ করেন তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। এসেছিলেন স্বামী সারদানন্দজীও।

শ্যামবাজারের বসু পরিবারের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পরিচিতি ছিল। আগেই বলা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্র বসু ছিলেন বলরাম বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবাজারে বসু পরিবারের দামোদর জীউ বিগ্রহ দর্শনে এসেছিলেন বলে আমাদের অনুমান।

শতবর্ষ অতিক্রম করে কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মাহেশের রথ চলছে অপ্রতিহত গতিতে। জগন্নাথদেব মন্দির থেকে এসে রথে চড়েন এবং রথ গমন করে মাহেশের অনতিদূরে মাসির বাড়ি পর্যন্ত। অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ রথরজ্জু টেনে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে সুসম্পন্ন করেন। পুষ্পমাল্য, ধূপধুনা ও নানা আভরণে রথ হয়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দন। বসু পরিবারের জমিদারমহল আর নেই। বংশধরদের অনেকেই স্থানান্তরিত হয়েছেন। তবু উত্তর-পুরুষদের অনেকেই সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বসু পরিবারের নিমন্ত্রণে মাহেশের যে-গৃহে শ্রীশ্রীমা সঙ্গী-সহ বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেটি আজ আর নেই। সেই বিশাল ভবনের একটি একতলা কুঠি অতীতের সাক্ষী হয়ে এখনো টিকে আছে। এই ভবনে যে-তুলসীমঞ্চের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, সেটি বংশধরগণ এখনো সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঠাকুর প্রায় প্রতি বছরই মাহেশের রথে হাজির হতেন। পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন ঃ

"প্রতি বর্ষে শ্রীপ্রভুর প্রায় আগমন।
পাপী তাপী সন্তাপীর নিস্তার-কারণ॥"[৪]

কথামৃতকার শ্রীম জানিয়েছেন ঃ "ঠাকুরও মাহেশের রথে গিছলেন নৌকা করে। আমরা হাওড়া থেকে গেলাম রেলে। ভক্তরা তাঁকে খুঁজছে। ওমা, দেখি ঠাকুর রশি ধরে রথ টানছেন।... কৃষ্ণ বোসদের বাড়িতে ছিলেন—বলরামবাবুদের জ্ঞাতি, এঁদেরই ঠাকুরবাড়ি।"[৫]

ফাল্গুনী বসুর সূত্রে জানা যায়, রথযাত্রার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা বাগবাজার অভিমুখে যাত্রা করার সময় দেখেন, রাধারানি দেবীর চোখে জল! শ্রীশ্রীমা নাকি তাঁকে কাছে ডেকে বলেন, আজ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, চোখের জল ফেলতে নেই, আমি তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে যাব। তোমাদের দামোদর আমায় টানেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মাহেশের রথযাত্রা দর্শনের শুভদিনটি ছিল খুব সম্ভবত ৮ জুলাই ১৯১০ (২৪ আষাঢ় ১৩১৭) শুক্রবার।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবছরও রথযাত্রা ৮ জুলাই, শুক্রবার। ❑

পথনির্দেশ ঃ ঠিকানা—শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, মাহেশ, পোঃ রিষড়া, জেলা—হুগলি। শ্রীরামপুরের দক্ষিণে বল্লভপুর ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে জি. টি. রোডের ওপর রথতলা। তারই নিকটে জগন্নাথদেবের মন্দির। বসুদের বিশাল দ্বিতল ভবন ছিল মন্দিরের নিকটেই।

তথ্যসূত্র

১ সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬১, পৃঃ ২৯৪
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১১ সং, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৬, পৃঃ ১৪৫
৩ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন—হরিদাস দাস, ১ম খণ্ড; চরণচিহ্ন ধরে—নির্মলকুমার রায়, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ১৪০৪, পৃঃ ১৪৯-১৫০
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১০ম সং, ১৩৯২, পৃঃ ৫৭৬
৫ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৬ষ্ঠ ভাগ, ২০ অধ্যায়; চরণচিহ্ন ধরে, পৃঃ ১৪৯
৬ শ্রীশ্রীমায়ের মাহেশের রথযাত্রার সময় ১৯১০ সাল বলেই অনুমিত হয়। কারণ—

• 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে সরযূদেবী (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, ১ম সপ্তাহ [১৯১৪]) উল্লেখ করেছেন ঃ "মোটরগাড়িতে যেতে মায়ের মত নাই, কারণ একবার মাহেশে রথ দেখতে যেতে তাঁর মোটরের তলায় নাকি একটি কুকুর চাপা পড়ে।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৯৬, পৃঃ ৩৫) এর থেকে মনে হয়, মাহেশের ঘটনা অবশ্যই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগেকার।

• শ্রীশ্রীমায়ের রথযাত্রা দর্শনের সহযাত্রীদের তালিকা এবং মোটরগাড়িতে অভিযানের ঘটনায় অনুমিত হয়, শ্রীশ্রীমা উদ্বোধন থেকেই মাহেশে যাত্রা করেছিলেন। তাহলে মাহেশযাত্রার সময় ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক বছরের হওয়ার কথা।

• ১৯০৯ সালের ২৩ মে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধন বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করেন এবং তারপরই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় সং, ১৪০৭, পৃঃ ১৮১-১৮২) ঐবছর শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে নিশ্চয় রথটানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

• ১৯১০ ও ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় থেকেছেন এবং ১৯১১ ও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে অবস্থান করেছেন। সরযূদেবীর অপর এক বিবরণে (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৫) দেখা যায়, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীমা উদ্বোধন বাটীতেই অবস্থান করেছেন।

কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের মাহেশে রথযাত্রা দর্শনের সম্ভাব্য সময়টি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ হওয়াই যুক্তিসম্মত। পঞ্জিকা থেকে তারিখটি পাওয়া যায় ৮ জুলাই ১৯১০ (২৪ আষাঢ় ১৩১৭), শুক্রবার।

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়*

[পূর্বানুবৃত্তি]

■ ২ ■

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে নজরুল স্বাদেশিকতার মহান কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। তার আগের ঘটনাবলি কিছু কিছু উল্লেখ করা দরকার। গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতা, লেটো গান ও পালা রচনা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর অস্থির অধ্যায়-শেষে তিনি হঠাৎই চুরুলিয়া ছেড়ে চলে আসেন বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামে এবং সেখানে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন ঃ "তখন এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন সুখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই সময় (১৯১১ খ্রিস্টাব্দে) নজরুল ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার আগে কি কিছু পরেই নজরুল এই স্কুল ত্যাগ করেন।"[১১]

এরপর নজরুল শখের কবিগানের দলে যোগ দেন। ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "খুব সম্ভবত এই সময় তিনি আবার বাসুদেব নামক জনৈক কবিয়াল দলের জন্য গান, পালা ইত্যাদি লেখার কাজে এবং সুর সংযোজনার কাজে লেগে পড়েন।"[১২] কিন্তু বাসুদেবের দলে তিনি বেশিদিন থাকেননি। তাঁর গান শুনে অণ্ডাল-আসানসোল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের এক বাঙালি খ্রিস্টান গার্ড তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে নজরুলকে নানারকম কাজ করতে হতো। গার্ডসাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে গান শোনাতেও হতো। বিশেষ একটি ঘটনার ফেরে নজরুল এই গার্ডের সঙ্গ ত্যাগ করেন। এইসময় স্থানীয় থানার দারোগা কাজি রফিজউল্লাহ নজরুলের গান শুনে মুগ্ধ হন। নজরুল তখন আসানসোলে এ. এম. বক্সের রুটির কারখানায় চাকরি করতেন। সেখানেই দারোগা নজরুলের গান শোনেন। কিশোরটির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজির সিমলায় নিজের গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে নজরুল স্নেহযত্ন পান, দারোগা তাঁকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম দরিরামপুরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তিও করে দেন। সেখানে একবছর পড়াশোনা করে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই স্বভাবচঞ্চল নজরুল আবার দেশে ফিরে আসেন। নিজের উদ্যোগে রানীগঞ্জের কাছে শিয়ারসোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েও যান। নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁর জীবনচক্র আবর্তিত হতে থাকে।

রাজস্কুলে দুবছর পড়ার পর পড়াশোনায় হঠাৎই ইতি টানলেন নজরুল। উদ্দেশ্য ছিল, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শেখা। রাজস্কুলের বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে এসে নজরুলের মধ্যে স্বাদেশিকতার বোধ উদ্দীপ্ত হয়। দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা ছোটবয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, পাঁচু নামে এক বন্ধুর এয়ারগান নিয়ে নজরুল স্থানীয় একটি ক্রিশ্চান গোরস্থানে সমাধিফলকগুলির কোনটিকে ম্যাজিস্ট্রেট, কোনটিকে দারোগা, কোনটিকে আবার এস. ডি. ও. ভেবে দেদার গুলি চালিয়ে রাজপুরুষ মারার খেলায় মেতে উঠতেন। কিশোর নজরুল বিশ্বাস করতেন, ইংরেজের যুদ্ধবিদ্যা শিখে সেই বিদ্যাই ইংরেজ তাড়ানোর কাজে লাগাবেন। এব্যাপারে শৈলজানন্দ একমত ছিলেন না, তবু ইংরেজ সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক চাইলে দুই বন্ধুই আবেদন করলেন। নানা কারণে শৈলজানন্দের আবেদন শেষ পর্যন্ত বাতিল হলেও নজরুল ৪৯নং বাঙালি পল্টনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে করাচি চলে গেলেন।

লেটো পালারচনা ও করাচি গমনের মাঝের পর্বটিতে নজরুল-জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ সাদা চোখে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আধ্যাত্মিকতার ফল্গুধারা এই পর্বেও তাঁকে সঞ্জীবিত করেছিল। শিয়ারসোলে নজরুলের দুই প্রাণের বন্ধুর একজন ছিলেন শৈলজানন্দ, যিনি ধর্মে হিন্দু এবং অপরজন শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, ধর্মে খ্রিস্টান। ত্রিবেণী ধারার মতো হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ভাববিনিময় ভাবী লেখকের সমন্বয়বাদী চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। শৈলজানন্দ লিখেছেন ঃ "আমার সৌভাগ্য, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম এমন একটি মানুষকে, ঠিক যেসকল মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য, অবিশ্বাস্য রকমের হৃদয়ের উদারতা, বিদ্বেষকালিমামুক্ত অপাপবিদ্ধ একটি মন। তার নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতো একটি আপনভোলা প্রকৃতি।"[১৩]

'নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর' হৃদয় ছিল বলেই নজরুল ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা তুচ্ছ করে দেশের কাজে ঘর ছাড়তে পেরেছিলেন। পড়াশোনায় ভাল ছিলেন তিনি, স্কুলে প্রথম হতেন, একবার ডবল প্রমোশনও পেয়েছিলেন। মাস্টারমশাইরা তাঁর সম্পর্কে অনেক আশা করতেন। কিন্তু সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে সকল পিছুটান ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। পরার্থে স্বার্থত্যাগ ধর্মের একটি বড় লক্ষণ, তাঁর কাজে সে-লক্ষণটি অচেতন প্রজ্ঞায় প্রকাশ পেয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, অতিপ্রাকৃতের প্রতি তাঁর বরাবর একটা আকর্ষণ ছিল। চুরুলিয়ায় সুফি ফকিরের মাজারে যে অলৌকিক

* *শ্রীরামপুর-নিবাসী, কবি নজরুল বিষয়ে গবেষক, সরকারি কর্মী।*

শক্তিবিভা তাঁকে প্রাণিত করেছিল তা সারাজীবন তাঁকে ছুটিয়ে ফিরেছে দিকে, দিগন্তে। শৈলজানন্দ লিখেছেন ঃ "ইস্কুলের ছুটির পর সেদিন বিকালে নজরুল এল আমাকে ডাকতে। শিয়ারসোলের শিশু বাগানের কাছে একজন সন্ন্যাসী এসেছে, চল দেখে আসি। বৈশাখ মাস। আমাদের কয়লাকুঠির দেশে তখন দারুণ গরম। তবু সেই কাঁকর-পাথরের ডাঙার ওপর দিয়ে পরমানন্দে চলে গেলাম সন্ন্যাসী দেখতে।"[১৪]

এই খ্যাপামি নজরুলের মধ্যে ছিল তীব্র। হাজী পালোয়ানের মাজারে অল্পবয়সে মাথা ঠুকে ঠুকে তিনি প্রার্থনা করতেন ঃ "হুজুর পালোয়ান, আমায় মানুষ কর, আমায় মানুষ কর।" লেটোর আসরে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, নানুর-কেঁদুলির পথে পথে অসীমের যে-ডাক তিনি শুনেছিলেন তা একদণ্ডের জন্যও স্থির হতে দেয়নি তাঁকে। ধর্মপাগল বালকটিকে লোকে 'তারাক্ষেপা' বলে ডাকত। খ্যাপা অর্থাৎ ভাবুক ও চালচুলোহীন, নিজের সবটুকু ভুলে যে অসীমের জন্য মাতোয়ারা।

এ হেন মাতনকে বালক বয়সের স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে উপেক্ষা করা যেতেই পারে। কিন্তু তাতে নজরুল-মানসের বিশ্লেষণ বিকৃতিদোষে দুষ্ট হবে। তাঁর সৈনিকবৃত্তি এবং জ্বালাময়ী কবিতা-গান-প্রবন্ধ-নিবন্ধ-অভিভাষণ প্রভৃতি অনন্ত শক্তির প্রতি অদম্য আকর্ষণ থেকেই জন্ম নিয়েছে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সততার সঙ্গে বলেছেন ঃ "শক্তিকে হাতেকলমে জানবার জন্য দুখুমিয়া কাজি নজরুল ইসলাম প্রাণ তুচ্ছ করে সৈনিকব্রত গ্রহণ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। এইজন্য তিনি খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন অন্তরলোকের পথ থেকে। কিন্তু সে-রেশ যে রয়ে গেল, তা তাঁর পরবর্তী লেখায় বোঝা যায়।"[১৫]

তৃতীয়ত, কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নের বেশ কয়েকটি লেখায় নজরুলের আধ্যাত্মিক মানস ধরা পড়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'মুক্তি'। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপা হয়। নজরুল কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষমা', সম্পাদকের হাতে নাম বদল হলেও কবিতার বিষয়বস্তুটি ক্ষমার মহান আদর্শে গ্রথিত। রানীগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে বড় একটা নিমগাছের গোড়ায় সন্ন্যাসীদের জটলা বসত। গাঁজার ধোঁয়ায় ভরে যেত গাছ। মজার ব্যাপার এই যে, নিমগাছটি পত্রহীন ছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎই সেই গাছ ফুলেফলে ছেয়ে গেল। সকলে দেখল মহাজটাজূট এক ভীষণাকৃতির ফকির সেখানে এসে বসেছেন এবং আর সব বাবাজীরা তাঁকে দেখে পালিয়ে গেছেন। ঐ ফকিরের দুই হাত লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। তাঁর ভাষা এমন দুর্বোধ্য আর চেহারা ছিল ভয়ঙ্কর যে, লোকে প্রথম প্রথম তাঁকে দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখেই সরে পড়ত। ক্রমে দেখা গেল, তাঁর মনটি শিশুর মতো; কোন দুষ্টু ছেলে যা-তা কিছু মুখে ঢুকিয়ে দিলেও তিনি তা অমৃত মনে করে খেয়ে নেন। কারো কোন ক্ষতি করার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

এই ফকিরটিকে ঘিরে নানা কথা চালু হলো। কেউ বলে তিনি সিদ্ধপুরুষ, কারো মতে বুজরুক। এই চাপান-উতোরের মধ্যে দিন কাটছিল। একদিন এক গাড়োয়ান ভোরবেলায় গজল গাইতে গাইতে গরুর গাড়ি চালাচ্ছিল। তার গান শুনে ফকির হঠাৎই বিকট গলায় হেসে উঠলেন আর সেই হাসির চোটে বলদ ভয় পেয়ে গাড়িসুদ্ধ ফকিরের ঘাড়ে এসে পড়ল। গরুর গাড়ির চাকা ফকিরের হাড়-পাঁজরা ভেঙে দিল। লোকজন জমে গেল দ্রুত। পুলিশ এসে গাড়োয়ানকে নিমগাছে পিছমোড়া করে বাঁধল। সকলে অবাক চোখে দেখল ঃ "রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দুটি হাত/ থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত।" তাঁকে দেখে মনে হয় ধ্যানমগ্ন, কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরলে গাড়োয়ানকে গাছে-বাঁধা অবস্থায় দেখে তিনি আকুল কণ্ঠে বললেন ঃ "ওগো, আমার মুক্তিদাতায় কে রেখেছ বেঁধে?/ এ কোন্ জনার ফন্দি/ বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দি?"

দরবেশের এই অমৃতবাণী শুনে মানুষ তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারল। তাঁর হাতের শেকল খুলে গেল, নিমের ডালে হাজার হাজার পাখি গান গেয়ে উঠল। ফকির তাঁর ঝুলি থেকে দশটা টাকা বের করে পুলিশের হাতে গুঁজে দিলেন। কিন্তু সাধুর মহানুভবতা দেখে পুলিশ ঐ টাকা ফিরিয়ে দিল। ফকির তা গাড়োয়ানের হাতে তুলে দিতে বললেন। কবিতার পাদটীকায় নজরুল লিখেছিলেন ঃ "ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এই দরবেশের কথিত-রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনো হাতবাঁধা ফকিরের মাজার শরিফ বলিয়া কথিত হয়।"

ধার্মিকতার প্রকৃত রূপ নজরুল তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সহিষ্ণুতা, দ্বেষমুক্ত হৃদয় ও ক্ষমার আদর্শ যে ধর্মের মূলকথা, হাত-বাঁধা ফকিরটিকে দেখে কিশোর বয়সেই তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কবিতায় তাঁকে প্রণাম জানানোর মধ্য দিয়ে তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তির বৈশিষ্ট্যের দিকটি মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন ঠিক ঠিক সাধু হতে হলে দরবেশ-মহাত্মাটির মতো সহিষ্ণু ও ক্ষমাব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

আশ্বিন ১৩২৭-এ 'বঙ্গনূর' পত্রিকার ১ম বর্ষের ১১ সংখ্যায় 'গরিবের ব্যথা' নামে নজরুলের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন—গরিব ঘরের ছেলে খেতে-পরতে পায় না, শোওয়ার একটু জায়গা পায় না; অথচ বড়লোকের ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনের অনেক বেশি পেয়ে কেমন সুখে থাকে! নজরুল নিজে ছোটবয়স থেকে অনেক কষ্ট

করেছেন, তাই গরিব ছেলেমেয়ের দুঃখবেদনা তাঁর কলমে অকৃত্রিম ভাষায় ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন : "এই অভাগা ছেলেরা মা দাঁড়িয়ে রয় একটেরে;/ কে বোঝে ঐ চাউনি সজল কি ব্যথা চাপছে রে।"

দীনদুঃখীর বেদনায় সমব্যথী হওয়া আধ্যাত্মিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহামন্ত্র দিয়েছিলেন। নজরুলও পরবর্তী জীবনে মানুষের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মহান সেই কর্মের প্রণোদন ছিল বঞ্চিত, নিরন্ন মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। সেই ভালবাসার চিহ্ন আমরা নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে দেখতে পাই :

"দুঃখ এদের কেউ বোঝে না, ঘেন্না সবাই করে;
ভাবে, এসব বালাই কেন পথেই ঘুরে মরে?
ওগো, বড়ো মুদ্দই যে পোড়া পেটের দায়,
দুশমনেরও শাস্তি যেন হয় না হেন, হায়!"

শতেক দুঃখেও মানুষ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারায় না। গরিবের প্রগাঢ় দুঃখ দেখে এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করে কিশোর নজরুলের হৃদয়ে অভিমান জমা হয়। তাই তিনি অপূর্ব ভাষায় বলেন : "এত দুঃখেও খোদার নাকি মঙ্গলেচ্ছা আছে,/ এইটুকু যা সান্ত্বনা মা, এ গরিবদের কাছে।"

কেবল মানুষের জন্যই নয়, মনুষ্যেতর জীবের জন্যও নজরুলের প্রাণ কাঁদত। রাজস্কুলে ছাত্রাবস্থায় 'চড়ুইপাখির ছানা' নামে একটি কবিতা লেখেন তিনি। স্কুলের দালানবাড়ির উই-লাগা কড়িকাঠে একটা চড়াই-ছানা থাকত। তার মা তাকে খাওয়াত, যত্ন করত। একদিন মাকে উড়ে আসতে দেখে তারও ইচ্ছে হলো মায়ের কাছে উড়ে যায়, কিন্তু উড়তে গিয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। ক্লাসের দুষ্টু ছেলেরা পাখির ছানাকে ধরার জন্য ছুটোছুটি লাগাল। তাদের অমানবিক তথা অধার্মিক কাণ্ড দেখে কিশোর নজরুলের বুক কান্নায় ভরে উঠল। পরম আন্তরিকতায় তিনি লিখলেন :

"ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে;
ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুটি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে, আঁশু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে;
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।"

লক্ষ্য করা যায়, চড়ুইপাখির ছানাটির বুকের দুঃখ নিজের মধ্যে অনুভব করা, বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসা এবং পাখির সজল চোখে আশীর্বাদের মহিমা উপলব্ধি করা কিশোর নজরুলের আধ্যাত্মিক মানসের পরিচয় বহন করে। রাজস্কুলের এক শিক্ষকের বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে নজরুল 'করুণ-গাথা' নামে যে-কবিতাটি লেখেন, তার মধ্যেও এই মানস প্রতিভাত হয়েছে। কবিতাটির শুরু এইরকম—

"নয়ন গলিয়া বয় তপ্ত অশ্রুনীর
অশ্রু নয়, সে যে ভগ্ন মরম-রুধির।
নয় গো চোখের দেখা হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা
ভিজায়ে স্নেহক্ষীরে তৃষিত সোহাগ ভরে
ভকতি উথলি চিত করিত অধীর,
মিহিরকিরণে ওগো শুষিল শিশির।"

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেবল চোখের দেখায় নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর-গোপন সংযোগ ও সংরাগ এবং 'ভকতি উথলি' চিত্তের আত্মনিবেদন ছাত্র নজরুলের মর্মকথা ছিল। কবিতাটির দশম পঙ্‌ক্তিতে 'থামুক শিশুর হাসি গোলকে বেজ না বাঁশি', উনিশ পঙ্‌ক্তিতে 'ললাটে লিখন বিধি এত কি কঠোর', ত্রিশ পঙ্‌ক্তিতে 'ভোলানাথ! যেয়ো না গো ত্যাজি এ কৈলাসে' এবং পঁয়ত্রিশ পঙ্‌ক্তিতে 'হও গো আঁধারে চির ইরম্মদ জ্যোতি'—নিশ্চিতভাবেই আধ্যাত্মিক চিন্তনসূত্রে রচিত। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের শিকড় আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রোথিত ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার লেখাগুলিতেও সে-শিকড়ের সন্ধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়।

■ ৩ ■

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সেনাবাহিনীর পরীক্ষায় বসেন নজরুল। যাবতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে করাচি সেনানিবাসে স্থিত হতে কয়েক মাস কেটে যায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। যুদ্ধে যাওয়ার শখ থাকলেও তাঁর বন্দুক-কাঁধে যুদ্ধ করার সুযোগ মেলেনি, হঠাৎ করে রেজিমেণ্ট ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

করাচি সেনানিবাসে প্রাণবান নজরুল সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকতেন। ফারসি ভাষা শিক্ষা, কবিতা-গান-হুল্লোড়ের পাশাপাশি এখানে কয়েকটি গল্পও তিনি লেখেন। গল্পগুলির অধিকাংশ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের লেখা গল্পের সংখ্যা আঠারো। গল্পগুলিতে তাঁর তরুণ হৃদয়ের রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসই মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে। তবে আধ্যাত্মিকতার চরণচিহ্ন সেখানে অনুপস্থিত নয়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'রাক্ষুসী' গল্পে নিম্নবর্ণের এক বধূ তার স্বামীর হাতে নির্যাতিতা

হতো। নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকলে একদিন সে চণ্ডমূর্তি ধরে এবং স্বামীকে খুন করে জেলে যায়। দিল্লির বাদশাহের অহেতুক অনুগ্রহে সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক আগেই সে মুক্তি পায়। এই সময়ে সে তার এক আত্মজনকে বলে ঃ "দেখলি দিদি, ভগবান আছেন! তিনি তো জানেন আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামি দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান—এই দুইজনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার।"[১৬]

ধার্মিকতার সঙ্গে জটিলতাহীন হৃদয়ের নিবিড় বন্ধনের প্রশ্নটি নজরুলের কাছে বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। 'অগ্নি-গিরি' গল্পেও তাঁর এই মনোভঙ্গি আমরা দেখতে পাই। নিরীহ কিশোর সবুরের ওপর দুষ্ট রুস্তম ও তার দলবল অন্যায় আচরণ করলে সবুরের শুভাকাঙ্ক্ষী নূরজাহান রুষ্ট হয়। নজরুল লিখেছেন ঃ "যত সে এইসব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটির ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে।" এই আর্দ্রতা ধর্মের লক্ষণ। 'মেহের-নেগার' গল্পের নায়ক যখন জানতে পারে তার প্রেয়সী বাইজির মেয়ে, তার মনে দোলা লাগে, দ্বিধাদ্বন্দ্বও জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই সব দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সে যে সত্য-উপলব্ধির কথা বলে তা ধর্মের নিহিত মর্মবাণী ঃ "আমি ছিন্নকণ্ঠ বিহগের মতো আহত স্বরে বললুম, 'তা—তা হোক্ মেহের-নেগার। সে-দোষ তো তোমার নয়। তুমি ইচ্ছা করলে কি পবিত্র পথে চলতে পার না? স্রষ্টার সৃষ্টিতে তো তেমন অবিচার নেই। আর বোধ হয় এমনই ভাগ্যহত যারা, তাদের প্রতিই তাঁর করুণা অন্তত সহানুভূতি একটু বেশি পরিমাণেই পড়ে, এ যে আমরা না ভেবেই পারিনে।"[১৭] "জন্ম হউক যথা তথা/ কর্ম হউক ভাল"—এই বাণী এখানে মূর্ত হয়েছে। ভগবান অকিঞ্চনের প্রতি দয়াশীল হন, সেকথা স্মরণ করে নজরুল মানবীয় প্রেমে অধ্যাত্ম-অনুধ্যান কার্যকর করেছেন এবং সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে হৃদয়ের 'আড়' ভেঙেছেন।

'স্বামীহারা' গল্পে দেবত্ব সম্পর্কে যে-ধারণা নজরুল প্রকাশ করেছেন তা ভারতবর্ষের সনাতন ভাবনার অনুপন্থী। মানুষ যখন নিজের মধ্যে সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তখন সে ঈশ্বরের সমার্থক হয়। গল্পের বিধবা রমণী কথকের ভঙ্গিতে তার স্বামী সম্পর্কে এমন মহার্ঘ অনুভবই ব্যক্ত করেছে ঃ "তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের আলোর জ্যোতির মতো হয়ে ফুটে উঠত, তখন শুধু ভাবতুম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হতে পারে!... দেবতা বলে কি কোন কথা আছে? কখখনো না, মানুষই যখন এইরকম উচ্চ হতে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব বলে কোন কিছু একটা মনে থাকে না। সে দেখে সব সুন্দর আর আনন্দময়, তখনই মানুষ দেবতা হয়। দেবতা বলে কোন আলাদা জীব নাই।"[১৮]

আধ্যাত্মিকতার মহান এক মর্মকথা এই উদ্ধৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের মধ্যে যে গভীর অধ্যাত্মমানস ক্রিয়াশীল ছিল, তার শক্তিতেই তাঁর পক্ষে এমন গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। 'পদ্ম-গোখরো' গল্পে সন্তানহীনা বধূ জোহরার একজোড়া পদ্ম-গোখরোর প্রতি সন্তানপ্রীতি একধরনের ভ্রান্ত সংস্কার বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সেখানেও মাতৃহৃদয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর মহাভাবের সমার্থক হয়ে উঠেছে। নজরুলের কলমে অসাধারণ সেই বিবরণটি এইরূপ ঃ "গভীর রাত্রে কাহার হিমস্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে, সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির বাটিতে শয়ন করে।

"জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত সন্তানের মতো তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

"জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে, আর তিরস্কার করিতে পারে না।"[১৯]

দেখা যাচ্ছে, গল্পকার নজরুলের কাহিনী-বিন্যাসে আধ্যাত্মিকতার ছায়া পরতে পরতে রয়ে গেছে। তাঁর উপন্যাসেও এমনটি আছে। প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা' বাঙলা ভাষায় প্রথম পত্রোপন্যাস। এটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সময়কালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় আট কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। নজরুল তখন ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র কার্যালয়ে বিপ্লবী নেতা মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে থাকেন। মুজফ্ফর নজরুলের বাঁধভাঙা আবেগ-উচ্ছ্বাসের ধারাটিকে নিপীড়িত জনগণের রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে চালিত করার চেষ্টা করেন। স্বভাববাউল নজরুল প্রিয় বন্ধু ও পথপ্রদর্শকের ধ্যানধারণা গ্রহণ করেন। তাঁর ভিতরে উদ্দাম এক দ্রোহচেতনা কাজ করতে শুরু করে। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে আছে, নায়ক নূরুর প্রেমাস্পদা মাহবুবাকে ধরে-বেঁধে চল্লিশ বছর বয়সী এক বুড়ো জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। নূরু গেছে যুদ্ধে, অতীত স্মৃতি স্মরণ করে সাহসিকাকে লেখা এক চিঠিতে রাবেয়া বলেছে ঃ "নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে দেখছি, আবার এ-খবর শুনলে তো সে বিধাতাপুরুষের হপ্তা-পুরুষ উদ্ধার করবে। আমাদের বুক কাঁপে রে ভাই, ভয়ে দুরুদুরু করে—পাছে কোন অমঙ্গল হয়। তার চিঠির যদি ঝাঁজ দেখতিস। উঃ, যেন একটা বিপুল ঘূর্ণিবায়ু, হু-হু-হু-হু করে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার করে তুলতে চাইছে।... আমি তার চিঠির এক বর্ণও বুঝে উঠতে

পারিনে বোন, এক বর্ণও না। শুধু বুঝি, একটা তিক্ত কান্নার তীব্রতা যেন তাকে ক্রমেই শুষ্ক তীক্ষ্ণ করে ফেলচে।... খোদা ওকে শান্তি দিন।"

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিকে ঘিরে বিতর্ক যেমন দানা বাঁধে, জনপ্রিয়তার পারদ ততই চড়তে থাকে। নজরুলের নামের আগে 'বিদ্রোহী কবি' শব্দগুচ্ছটি বসে যায়। এই কবিতায় নজরুল যে যৌবনময়তা দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন তা পরাধীন জাতির শিরদাঁড়া টানটান করে দিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে দ্রোহচেতনা তা রাবেয়ার ভাষায়ঃ "যেন একটা বিপুল ঘূর্ণিবায়ু হু-হু-হু-হু করে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার করে তুলতে চাইছে।" রাবেয়ার জবানিতে লেখা হলেও এটি আসলে নজরুলের নিজেরই কথা। যে-ঈশ্বরকে তিনি পরমপিতা বলে শ্রদ্ধা করছেন, তাঁর গড়া জগতে নানা অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন, অভিমান করেছেন এবং 'একটা তীক্ত কান্নার তীব্রতা' তাঁকে 'ক্রমেই শুষ্ক তীক্ষ্ণ' করে তুলেছে। নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার এই যে-ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, এটি যথার্থ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নয়, তাঁর প্রতি অভিমানে মুখর কবি নির্ভর করেছেন নিজের ওপর। তিনি লিখেছেনঃ

"আমি হোম-শিখা আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।"

বিদ্রোহী স্বীকার করেছেন, 'মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর'। বীরভক্ত নজরুল, তাঁর হাতে কখনো বা শ্যামের বাঁশরি, কখনো অর্ফিয়াসের; কখনো আবার পরশুরামের কঠোর কুঠার কিংবা ইস্রাফিলের শিঙা। 'আমি ধূর্জটি' শব্দবন্ধে দেবাদিদেব এবং 'স্রষ্টা সূদন' শব্দবন্ধে শ্রীহরির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে, বিপ্রতীপে 'শাসন-ত্রাসন-সংহার' এবং 'মৃন্ময়' ও 'চিন্ময়'-রূপে দ্বৈতাদ্বৈত সত্তার প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। 'বিদ্রোহী' তাই আদপেই নাস্তিক্যবাদী কবিতা নয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে ৭৯ পঙ্‌ক্তির এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন নজরুল। কবিতার আরম্ভটি এরকম—

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল;
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?"

এখানে জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গার প্রতি তীব্র অভিমান নিজস্ব অভিঘাতে প্রকাশ করেছেন নজরুল। পরাধীন দেশের দুর্দশার কথা ভেবে সিদ্ধিদাতা গণেশ, কলা-বৌ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক প্রমুখকে পরিহার করে রুদ্রাণী মূর্তিতে জগজ্জননীকে এককভাবে চেয়েছেন নজরুল। তাঁর প্রার্থনায় নিহিত আছে অনন্ত শক্তির আবাহন—

"চাই নাকো ঐ ভাঙ খাওয়া শিব নিক গিয়ে তায় গঙ্গামাসী,
তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে
রক্ত-তৃষ্ণায় 'ময় ভুখা হুঁ'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।
'ময় ভুখা হুঁ'র রক্ত-ক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী
গুরুবাগের শিখ-সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ 'জয় আকালী'।
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি
দু-চোখ পুরে জল আসে মা আর কতকাল করবি দেরি।"

পুরাণভাবনার অনুষঙ্গে পরম সঙ্কটের কালে দেবীশক্তির আরাধনা করেছেন নজরুল। বীররসের কারণে এই আরাধনা বিদ্রোহাত্মক মনে হলেও তা আদতে একধরনের তান্ত্রিকতা। দেবী সরস্বতীকে নিয়ে লেখা 'বাণী-বন্দনা' কবিতাটিতেও এই মনোভাব প্রকাশিত—

"রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলেপুড়ে যাক শ্বেতবসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন,
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন।"

এবং

"শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা।
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।"

'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটিকে ঘিরে শাসকমহলে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। 'ধূমকেতু'র প্রতি ব্রিটিশের রোষানল নেমে আসে, গা-ঢাকা দেন নজরুল। কিন্তু অন্তরালে থেকেও 'ধূমকেতু'র ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় 'ময় ভুখা হুঁ' নামে এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধে ফের মাতৃ-আরাধনা করলেন নজরুল। তাঁর যৌবনদীপ্ত ভাষার অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় লিখলেনঃ "বেটী রক্ত চায়! মহাউৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে—তারা

যন্ত্র করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হলো মায়ের ছেলেরাই।”

‘মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত’ হওয়ার যে ঐতিহাসিক আহ্বান স্বামীজী করেছিলেন, তার প্রতিফলন নজরুলের লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে এক বিচার-প্রহসনে নজরুলকে শাস্তি দেওয়া হলে ২৭.১.১৯২৩ সংখ্যার ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হলো ঃ “ধূমকেতুর সারথি, প্রতিষ্ঠাতা, উদ্দাম উন্মাদ শ্রীমান কাজি নজরুল ইলসাম বুরোক্রেসীর ব্যবস্থায় রাজদ্রোহ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে একবছরের জন্য কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।... ধূমকেতুর জন্ম কি জন্য তা ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়েছে; নজরুলের জীবন ঠিক তারই অনুরূপ করে বিধাতা গড়ে দিয়েছেন।”

নজরুল অতএব শ্রীভগবানের হাতে গড়া ধূমকেতু। ‘মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে’, ‘জয় প্রলয়ঙ্কর’ বলে ‘ধূমকেতু’কে রথ করে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খণ্ডন করে আদালতে যে ঐতিহাসিক জবানবন্দি তিনি দেন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ ‘ধূমকেতু’তে তা ‘রাজবন্দির জবানবন্দি’ নামে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক সেই বিবৃতিতে নজরুল পূর্বাপর শ্রীভগবানের গুণকীর্তন করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। বিবৃতির কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো ঃ “আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

“একধারে রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত বেতনভোগী রাজকর্মচারি। আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি-অন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান।”

যিনি আদালতে দাঁড়িয়ে একটি রাজনৈতিক বিচারের জবাবে ‘আদি-অন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান’কে অভিভাবক বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিচ্ছেন, তাঁর পক্ষে নাস্তিকতার প্রশ্নটি অযৌক্তিক। জবানবন্দিতে শ্রীভগবানকে ‘সত্য-স্বরূপ’-রূপে বর্ণনা করে তিনি আরো বললেন ঃ “সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোন রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ংপ্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে।”

‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’—শক্তিসাধনার এই মহাভাবটি ‘রাজবন্দির জবানবন্দি’তে প্রকাশিত। বিবৃতির শেষের দিকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ “চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সঙ্গে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশক্রিয়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবে এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।” [ক্রমশ] [দুই]

তথ্যসূচি

১১ নজরুল-চরিতমানস—সুশীলকুমার গুপ্ত, দে'জ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৮
১২ নজরুলের জীবন ও সাহিত্য, পৃঃ ৩৫
১৩ কেউ ভোলে না কেউ ভোলে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ., ১৩৬৭, ভূমিকা
১৪ টুকরো কথা, পৃঃ ১৯
১৫ কাজি নজরুল, পৃঃ ২৫৭
১৬ রাক্ষুসী—নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প-সমগ্র, সাহিত্যম্, ১৩৭৯, পৃঃ ১৭৮-১৭৯
১৭ মেহের-নেগার, ঐ, পৃঃ ১৫৬
১৮ স্বামীহারা, ঐ, পৃঃ ১৯৭
১৯ পদ্ম-গোখরো, ঐ, পৃঃ ২১৮

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪৬

পাশাপাশি ঃ (১) কালী দি মাদার, (৪) যুবক, (৫) কোলহটকার, (৯) সুধীরা, (১০) কেশবচন্দ্র, (১২) নবজীবন, (১৪) রাস্কিন, (১৫) আহমেদাবাদ, (১৮) রমেশ, (১৯) নন্দলাল বসু।

ওপর-নিচ ঃ (২) মাতা, (৩) রয়াল, (৫) কঙ্গার, (৬) সোরাবজী, (৮) হতাশ, (১১) বলরাম, (১৩) বরোদা, (১৫) আমার (১৬) বারীন, (১৭) কলা।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ওরফে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ

নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়*

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও হুগলি জেলার মানুষ। তাঁর জন্ম ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। এর পরের রেলস্টেশন বর্ধমান জেলার কালনা। শ্রীসেনের মৃত্যু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কাশীধামে। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়সে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন অপেক্ষা ১৩ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসনাম 'স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ'। কোথাও কোথাও 'স্বামী কৃষ্ণানন্দ' বলেও উল্লিখিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লেখাপড়া করেছেন প্রথমে গুপ্তিপাড়ায়, পরে কালনায় মামাবাড়ির সূত্রে এবং সবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষাদানের আগেই তিনি বিহারের জামালপুরে রেল অফিসে চাকরি গ্রহণ করেন। বয়স তখন ১৮/১৯; মুঙ্গেরে থেকে নিয়মিত যাতায়াত করতেন জামালপুরে। মুঙ্গেরে তিনি 'আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা' স্থাপন করেন, হিন্দি ভাষা শেখেন, চিরকুমার থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে বিখ্যাত কষ্টহারিণী ঘাটে তিনি পাঞ্জাবি সাধু গুরু দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় তাঁর কর্মকেন্দ্র হয় কাশীধাম। অতঃপর কাশীতে তিনি যোগাশ্রমে অন্নপূর্ণামূর্তি স্থাপন করেন। মুঙ্গেরে থাকার সময়েই তিনি 'ধর্মপ্রচারক' নামে বাঙলা ও হিন্দি—দ্বিভাষিক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাশীতে এসে এই পত্রিকা প্রকাশে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর কর্মকেন্দ্র পরিব্যাপ্ত হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কাশী থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তখনকার ভারতের রাজধানী কলকাতায় আসেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কাশীবাসী হলেও কলকাতা তথা বঙ্গদেশে আসা-যাওয়া করতেন। কলকাতার বহু মানুষ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। এরকম গুণমুগ্ধ একজন উত্তর কলকাতার সিমলা পাড়ার দত্তবাড়ির সুসন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-১৮৯৮)। সিমলা পাড়ার দত্ত-বংশ আদিতে বর্ধমান জেলার কালনা শহরের (বৈঁচীর পথে) নিকটবর্তী দেরেটোন গ্রামের। লোকে ঐ গ্রামের নাম বলে 'দত্ত দেরেটোন'। কালনা-সূত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সম্ভবত দত্তদের কথা জানতেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় থাকার সময় তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতে পরম প্রীতিলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বোধকরি এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ১২৯৩ বঙ্গাব্দে রামচন্দ্র দত্ত নিজের লেখা গ্রন্থ 'তত্ত্বপ্রকাশিকা জীবনী ও উপদেশ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কাশীতে 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কাশী ফিরে নিজ সম্পাদিত 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকার ৬ আগস্ট ১৮৮৪ (শ্রাবণ পূর্ণিমা) সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। দ্বিভাষিক রচনাটির সূচনা এইরকম—

> **মহাত্মা রামকৃষ্ণ**
>
> গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে। তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা 'বনজ', বনের শোভাবর্ধন করিয়াই বিহনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুলবনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প।

রচনাটি তিন পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত। 'ধর্মপ্রচারক'-এর এই চরিতচিত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস যুগ্ম-সম্পাদিত (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থে 'তিরোধানের পূর্বে'র অংশে প্রকাশিত হয়েছে। তিরোধানের পরের অংশে 'ধর্মপ্রচারক' স্থান পায়নি। সম্ভবত ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ঐ সংখ্যা তাঁদের হাতে আসেনি এবং আজ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্রান্ত কোন গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেটি আগ্রহী পাঠকের জন্য নিবেদিত হলো।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষদিকে কাশীর 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ সংবাদ প্রকাশ করে। এখানে কালো বর্ডারে দুটি মৃত্যুসংবাদ পর পর

** চন্দননগর-নিবাসী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গ্রন্থপ্রণেতা ও সাহিত্য-সমালোচক। কর্মজীবনে অধ্যাপক, অধুনা অবসরপ্রাপ্ত।*

পাওয়া যায়। প্রথমটি কাশীবাসী পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) এবং দ্বিতীয়টি শ্রীরামকৃষ্ণের। সংবাদটি এরকম ঃ

"এইমাত্র খবর পাওয়া গেল কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরের মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কথা ইতোপূর্বেই পাঠকদের আমরা শুনাইয়াছি। তাঁহার সংস্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে। পরমহংস মহাশয়েরই উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের রং ধরিয়াছিল।"

এর পরও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য না হলেও একজন গুণী সাংবাদিক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা প্রকাশে ও প্রচারে স্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছেন এবং তা কাশীর বাঙালি ও হিন্দি ভাষাভাষী সকলের জন্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্যস্রষ্টা ভারতেন্দুবাবু হরিশ্চন্দ্রের (১৮৫০-১৮৮৫) সঙ্গে তাঁর আমৃত্যু সখ্য ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও শশধর তর্কচূড়ামণির কথা বলেছেন ঃ "হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি। এক-একবার মনে হয়, কাকে আর বলব! দেখো না, এই বাড়ি-ভাড়া হয়েছে বলে কতরকম ভক্ত আসছে।

"কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মতো সাইনবোর্ড তো হবে না—অমুক সময় লেকচার হইবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ১১১৩) 'কথামৃত'-এর টীকায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নেই, শব্দসূচিতে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত, গীত সঙ্গীত

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর একটি ধর্মসঙ্গীত ভক্তসমীপে গেয়েছিলেন, এটি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রচিত 'যশোদা, নাচাতো গো মা, বলে নীলমণি, সে-রূপ লুকালে কোথা, করালবদনী শ্যামা'। এই গানটি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত (১৯২৭) 'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনকর্তা দুজন—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী এবং স্বামী বেদানন্দজী। এই গানটি এর পূর্বে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক যুগ্ম-সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' (১৮৮৭) গ্রন্থে স্থান পায়নি, সেখানে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—'পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে'। এই গানটি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'পরিব্রাজকের সঙ্গীত' গ্রন্থে 'পাপ ও পুণ্যের বিবাদ' নামে স্থানলাভ করেছে। গানটি গোবিন্দ অধিকারীর 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের' অনুসারী। গানটি 'সঙ্গীত কল্পতরু'তে ১২ পঙ্‌ক্তির হলেও 'পরিব্রাজকের সঙ্গীত' গ্রন্থে আছে ২৪ পঙ্‌ক্তি।

'যশোদা নাচাতো' গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে পেয়েছিলেন বলা শক্ত। বোধকরি কলকাতায় প্রচলিত গান হিসাবে এটি তাঁর নজরে এসেছিল। এটি কামারপুকুরে শোনা গান মনে হয় না। যাত্রা-কথকতা-পাঁচালি প্রভৃতির মাধ্যমে তখন গানের প্রচার-প্রসার হতো। এভাবেই এটি শ্রীরামকৃষ্ণের অধিগত হয়ে থাকবে। সঙ্গীতপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গান গাইতেন, কাছের মানুষদের শোনাতেন—'কথামৃত'-এ এমন উদাহরণ অনেক আছে। শ্রীম ঠাকুরের মুখে এই গানটি শুনেছেন ৪ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে কলুটোলায়। গানটি আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে সমাদৃত। ১৩৯২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে দেওঘর বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত 'সাধন সঙ্গীত' (স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, ৫ম সং, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী গ্রন্থ)-এ এই গানটি স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত'-এ এই গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (পৃঃ ৪৮৪) গানটির রাগ পিলু, তাল একতাল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেছেন, এরকম একটি গান 'রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও রচনাসমগ্র' গ্রন্থে আছে। (দ্রঃ পৃঃ ১৩) গানটি নিম্নরূপ—

"যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালে কোথা, করালবদনী শ্যামা।"

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবরের দিনলিপিতে শ্রীম এই গানটির শেষে বলেছেন ঃ "এই গান শুনিয়া কেশব ঐ সুরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা খোল-করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে, মনে হলে প্রেমধারা বহে দু'নয়নে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই গান কেশবচন্দ্র ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর শুনেছিলেন। অতএব বলা যেতে পারে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুরে নতুন গান রচনায় কেশবচন্দ্র আগ্রহী হয়েছিলেন।

'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রচিত মোট ৪টি গান স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি গান পারিবারিক নামে, বাকি তিনটি গান সন্ন্যাস-নামে। যথা—(১) একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে, (২) দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর, (৩) যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী [রচনা ঃ স্বামী কৃষ্ণানন্দ]; (৪) যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি [রচনা ঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন]।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রে শ্রীকৃষ্ণানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬(?) ডিসেম্বর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত পত্রে শ্রীকৃষ্ণানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। (দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা-২৪১, ১৯৯৫, পৃঃ ১৫৬) পত্রটি নিম্নরূপ—

228, West 39th St., নিউ ইয়র্ক
১৬(?) ডিসেম্বর, ১৮৯৫

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

তোমার সব ক-খানি চিঠি একই ডাকে আজ এসেছে, মিস মুলারও একটি লিখেছেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন। যদি তাই হয়, যাদের আমি পেতে পারি, তাদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।...

আগামী মাসে ডেট্রয়েট যাব, তারপর বস্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর ইংলণ্ডে যাব কিছুদিন বিশ্রাম করে —যদি না তুমি মনে কর যে, আমাকে বাদ দিয়েও কৃষ্ণানন্দের সাহায্যে কাজ চলে যাবে। ইতি

সতত স্নেহাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পত্রটি এখানেই শেষ। ঐ খণ্ডের ৩৪২ পাতায় প্রদত্ত টীকায় আছেঃ "কৃষ্ণানন্দ, স্বামী—পূর্বনাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বিখ্যাত বক্তা ও হিন্দুধর্ম-প্রচারক। ভগবদ্গীতার টীকা-লেখক।" শেষের 'ভগবদ্গীতার টীকা লেখক' শব্দকয়টি স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী (১৯৬৩)-র পরের সংযোজন, শতবার্ষিকীর আগের সংস্করণে নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণানন্দের চেয়ে দুই মাসের অগ্রগামী। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণানন্দ কাশীতে স্বামীজীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ "আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তা কাজের হতো।" ❑

শব্দচেতনা ৪৮

গীতা, উপনিষদ্ সম্পর্কিত শব্দছক

পাশাপাশি: (১) যা দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন (৫) সপ্তর্ষির অন্যতম (৭) একাগ্রতা ও তৎপরতাকে যা বলা হয় (৯) "ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো —— ভবতি কশ্চন" (১০) শ্রীকৃষ্ণের একশো আট নামের একটি (১১) "—— লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ" (১২) "ততঃ —— তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ" (১৫) "অনেক বক্ত্র ——, অনেকাদ্ভুত দর্শনম্" (১৭) অর্জুনের হৃদয়দৌর্বল্যের অন্যতম কারণ (১৮) "ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং —— নরাধিপম্" (১৯) ধর্মসাধনায় পাঁচ মহাব্রতের একটি (২১) উপাসনার অন্যতম লক্ষণ যা করজোড়ে করতে হয়।

ওপর-নিচ: (১) গীতার এক অধ্যায় (২) অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ "তুমি অক্ষর পরম জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের ——" (৩) "আমি সর্বভূতের সনাতন ——, সুবুদ্ধি ও বীর্য" (৪) "আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, ——তে তেজ, সর্বভূতে জীবন" (৬) "অজানতা —— তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি" (৮) মনুষ্যশরীরে আছে '——দ্বার' (১১) "বিশ্বতঃ পরমাং নিত্যং বিশ্বং —— হরিম্" (১৩) এই মার্গের নাম পিতৃযান (১৪) অষ্টবিধ 'অপরাপ্রকৃতি'র অন্যতম (১৬) চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি আর এটা নিয়েই অন্তঃকরণ (১৯) "আমি সর্বময়, আমার বিভূতির —— নাই" (২০) চতুর্বেদের অন্যতম।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ভাদ্র ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এস মন রাঁধতে বস

মদন সেন

এস মন রাঁধতে বস
যোগাড়যন্ত্র প্রায় সারা।
আছে হৃদয়-রসের পাঁচফোড়ন,
আর ভক্তি-প্রীতির সম্বরা॥
জ্বাল দিও চোখের জলের
দুঃখ শোকের মিশেল ছাড়া।
ভালবাসার খুন্তি দিয়ে
করো তাকে নাড়াচাড়া॥

লাল লঙ্কা, হলুদ দিও
গেরুয়া রঙ ধরবে ভাল।
শিশুমনের মিষ্টি হাসি
সরলতার লবণ ঢাল॥
রাঁধতে গিয়ে ভয় পেও না
হাতটি ধরে ঠাকুর আছেন।
রেসিপির বাকি যা সব
নিজ গুণে যোগাড় দেবেন॥

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

উদয়ন ভট্টাচার্য

নবম ভিখারি পর্যন্ত ধান ও মুদ্রা বিলিয়ে
নিঃশেষ হয়ে গেলে
দশম ভিখারির চোখে জ্বলে ত্রৈমাত্রিক আলো
এই কি ঈশ্বরী তবে ভেবে নিয়ে
দাতা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল।

ততক্ষণে শিলালিপি পড়ে উদ্ভাসিত জ্ঞান
পণ্ডিত বিলিয়ে দিয়ে পেলেন সম্মান।

তৃতীয় নয়ন থেকে তীব্র হওয়া আলো
দাতার ভ্রূমধ্যে গিয়ে সহসা মেলালো।

তখন মন্দিরগর্ভে সোনার থালায়
সারি সারি কীট এসে অন্ন খেয়ে যায়।

মন্দির-চত্বর থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরে
নীরবে নিরন্নজনে উপবাস করে।

আলোই তাকে গর্ভগৃহে টেনে নিয়ে যায়
ঈশ্বরের অন্ন নিয়ে দলকে বিলায়।

পণ্ডিত পুঁথিতে লেখেন, জীবন ভঙ্গুর
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর॥

ত্রিপুরেশ্বরীর জন্য

দীপালি রায়

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ত্রিপুরেশ্বরীর পুজো এনেছিলাম
তুমি নাও বা না নাও
তাতে আমার কিছু এসে যায় না
মা আমার পুজো গ্রহণ করেছেন
চোখের জলে, নিঃশঙ্ক অর্পণে।

অগ্নি আমাকে স্পর্শ করেছে
আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে
পঞ্চপ্রদীপের তাপশিখা আমার চোখে,
মুখে, চিবুকে।

ঈশ্বর, তুমি কি পতিতপাবন নও,
নও দর্পহারী মধুসূদন
আমার দুচোখের পাতায় তোমার প্রসাদ
রামকৃষ্ণ নাম।

তোমার পঞ্চমুণ্ডী ধ্যানের আসনে
আমি প্রদক্ষিণ করি
একা, অনন্য চিত্তে, তোমার পঞ্চবটী
সাধনাসিদ্ধিতে আমার প্রণাম।

ঈশ্বর, তুমি কি পতিতপাবন নও
আমার দুচোখের পাতায় তোমার বিত্ত
রামকৃষ্ণ নাম।

ছন্দায়িত বাণী

সলিল মিত্র

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
—*স্বামী বিবেকানন্দ*

ঈশ্বরকে বেড়াও খুঁজে?
তিনি কোথায়? তিনি?
স্থূলদৃষ্টি নিয়ে কি আর
আমরা তাঁকে চিনি?
দরিদ্র যে দুঃখী আতুর
দুর্বল যেজন
তারি মধ্যে করি যদি
ঈশ্বর-অন্বেষণ

পেয়ে যেতেও পারি তাঁকে
সর্বজীবে তাঁর
উপস্থিতি—সবের মাঝেই
তিনি-ই একাকার!—
ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য
তাদের কর স্তব
নইলে বৃথাই তাঁকে খোঁজা,
বৃথাই সে-নামজপ।

মহাসমাধির সাজে

প্রদীপ দাশগুপ্ত

কোনদিন তুমি এত সুন্দর করে সাজোনি।
চিরদিন তুমি অপরকে সাজিয়েই এসেছ।
তোমার পর বলে তো কেউ নেই,
সবাইকে আপন করে নিয়েছিলে স্বমহিমায়।
নিচুকে উঁচু আর উঁচুকে নিচে নামিয়ে
স্নেহের সাম্যাবস্থায় এনে দিয়েছ প্রেম।
মনকে সাজিয়েছ মননশীলতায়,
চিত্তকে চিত্রিত করেছ চৈতন্য দিয়ে,
ভাবের চন্দনে চর্চিত করেছ চিন্তার ললাটটিকে।

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে যাদের সে-সাজে সাজিয়েছ—
ওরা হয়তো ভেবেছিল অভিনয়।
নাটক শেষে ফিরে যাবে
সংসারের আবর্জনায়, লোভ-হিংসার পঙ্কিলতায়।
কিন্তু পারেনি।
সে-সাজ সত্য হয়ে বাঁধা পড়েছে
তোমারই পায়ের কাছে।
কখন যে দেহে মনে রূপান্তর হয়ে গেছে কে জানে!
হিসেবি নিজেকে ভুলে হলো সেবক,
সন্ধানী ভুলে গেল তার সন্দেহ,
হিংসুক খুঁজে পেল অন্তরের হংস শুভ্রতা।
মান আর হুঁশের অন্বেষণে
নিজের মধ্যেই অনুভব করে
মানুষের ক্রমবিকাশ।

কোন এক ক্রান্তদর্শী বলেছিলেন
তোমার শ্রীমুখে থাকবেন সরস্বতী।

তিনি তো "আমাদেরই সত্যিকারের মা",
কথার রাশ ঠেলে দিতেন তোমার মুখে।
তাঁরই আশীর্বাদধন্য সে মধুর ঋতময় বাণী
আমাদের দিয়েছে অমৃতের আস্বাদন।
সে-বাণী কখনো নির্দয় আঘাত দিয়ে
জাগিয়েছে সত্যের সিংহটাকে,
কখনো বা যন্ত্রণাকাতর জীবনে দিয়েছে
পুষ্পপরশের কোমলতা,
যা নীরব অশ্রু হয়ে
ধুয়ে দিয়েছে সকল মলিনতা।

আজ তুমি সেজেছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাজে।
যে-সাজে তুমি চলেছ অমৃতের পথে,
রক্তিম পদযুগল আরো রক্তিম হয়েছে
রক্তকমলের স্নিগ্ধ প্রণামে।
নিমীলিত নয়নযুগল এই বুঝি বলবে
"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"
রজনীগন্ধার একটা মালা তোমায় ঘিরে বলছে
"কেন আমাদের ত্যাগ করলে?"

চির পথিক তুমি—
শুনেছ যুগাচার্যের আহ্বান।
ত্যাগের সাজে চলেছ দিশারি
চরৈবেতির গান গেয়ে।
আমরা শুধু কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিলাম
"হরি ওঁ রামকৃষ্ণ", "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ"
"হরি ওঁ রামকৃষ্ণ"।

আলোড়ন

অজিত বাইরী

জাহাজডুবির সময় আলোড়িত হয়
চারপাশের জল।
বৃক্ষপতনের সময় আলোড়িত হয়
চারপাশের মাটি।
ধস নামার সময় আলোড়িত হয়
পাহাড়ের বুক।
তুমি যখন ছেড়ে যাও, তখন যেন
জল, মাটি, পাথরের মতো আলোড়িত হয়
চারপাশের মানুষ।

শ্রদ্ধার্ঘ্য*

কালীসাধন ফৌজদার

স্বামীজী, ঠাকুর আর মায়ের টানে,
মীড় আর গমক মিশেছে তোমার জীবনে।
(প্রভু) **রং**গনাথের আশিস লয়ে ভক্তি ও সেবাতে,
গগনে জ্বেলেছ সূর্য আঁধার রাতে॥
না যদি জাগে ভারত সনাতন ধারাতে,
থামবে না হানাহানি কভু এ-ধরাতে।
নন্দ-বাণী শুনায়েছ তাই তুমি গো মহান
তোমার চরণে জানাই কোটি প্রণাম॥

* এই কবিতাটি পরম পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে হাসপাতালে যখন শোনানো হয়েছিল, তখন খুশি হয়ে বলেছিলেন, সংশোধন করে 'উদ্বোধন'-এ ছাপিয়ে দাও। তাঁর ইচ্ছানুসারে কবিতাটি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অলঙ্করণ : সৌরীশ মিত্র

ইতিহাসের আড়ালে গিউঞ্জু-বিষ্ণুপুর

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়*

গ্রামবাংলার ছোট্ট একটি স্টেশন। তার প্রসারিত পল্লবিত কাঁঠালগাছের ছায়ায় বাঁধানো চত্বরে বসে আছেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ কমনীয় মাতৃরূপ থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরচ্ছে। সেই চিরন্তনী জননীরূপে মোহিত হয়ে এক কুলি 'জানকী মাঈ', 'জানকী মাঈ' বলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর চরণে। তাঁর মধ্যে জনক-দুলারি সীতার রূপ প্রত্যক্ষ করে বিভোর হয়ে পড়ে সে। শ্রীমাও সত্বর সন্তানকে আশ্রয়দান করে তাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

শ্রীমায়ের চরণধূলিতে পবিত্র এই ছোট্ট স্টেশনটির নাম 'বিষ্ণুপুর'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঁকুড়া জেলার এই গ্রামটিকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলতেন। লালমাটির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ঘেরা এ এক অনন্যসুন্দর পরিবেশ। বোঝা যায়, একসময় কোন এক উন্নত রাজতন্ত্রের লীলাভূমি ছিল এই আঙিনা। আজ তা বিলুপ্ত, নিঃশেষিত হয়ে মিশে গেছে লালমাটির অন্তরালে। ফাগুনের ফুল ফোটানোর হাওয়ায় শোনা যায় তার দীর্ঘশ্বাস। শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ শিল্পনৈপুণ্যে সাজানো কয়েকটি মন্দির-দেহ। তাদের কারুকার্যমণ্ডিত থামের আড়ালে যেন লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে মল্লরাজতন্ত্রের একদা প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও মধ্যমণি মদনমোহন জীউ।
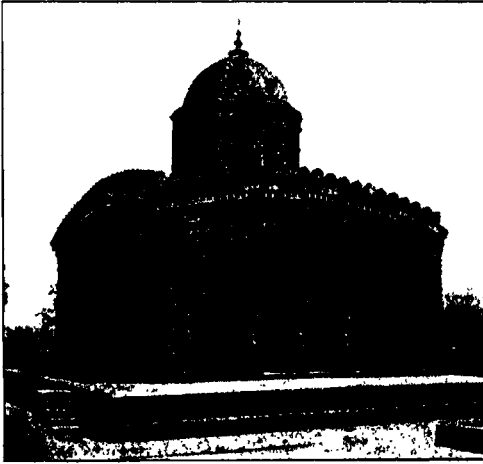
বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দির

বিষ্ণুপুরের উন্নত বিলুপ্ত নগরীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরে কোরিয়ার 'গিউঞ্জু'র হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার। ইউনেস্কোর দ্বারা 'World Heritage Site'-এর সম্মানে ভূষিত গিউঞ্জু শহরে ছড়িয়ে রয়েছে শিলা রাজতন্ত্রের অবশিষ্ট। এই রাজবংশের ভিত্তি ছিল বৌদ্ধধর্ম। তাই বৌদ্ধ শিল্প-সংস্কৃতির ও বুদ্ধমূর্তির ছয়লাপ সমস্ত গিউঞ্জু শহরে। বোঝা যায়, শিলার জীবন ছিল বুদ্ধ-পরিবেষ্টিত।

এশিয়া মহাদেশের এই দুটি পৃথক দেশের হারানো সভ্যতার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের কিছু সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। কোরিয়ার শিলা রাজতন্ত্র তার নয়শো বছরের (৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) শিল্প-সংস্কৃতির এক উন্নত নজির পেশ করলেও বাংলার বিষ্ণুপুরের ৩০০ বছরের (১৫৭১ থেকে ১৮৮৫) ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসও তার থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। শিলা রাজতন্ত্রের রাজধানী ছিল গিউঞ্জু আর মল্লরাজবংশ বেড়ে উঠেছিল রাজধানী বিষ্ণুপুরকে ঘিরে। ওদিকে বুদ্ধ শিলা সাম্রাজ্যের মূল আধার, তো এদিকে কৃষ্ণ-রাধার যুগ্ম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বিষ্ণুপুর। এক অতি উচ্চ মানের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল উভয় রাজ্যকে ঘিরে। তারই অবশিষ্ট নিদর্শন ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের প্রতিমূর্তি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে গিউঞ্জু-বিষ্ণুপুরের জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে। গিউঞ্জুর নামডাক বিশ্বব্যাপী। তাকে 'Open Art Gallery' বা উন্মুক্ত শিল্পাঙ্গন বলা হয়। বিষ্ণুপুরকেও কি সেই একই নামে সম্বোধিত করা যায় না?

গিউঞ্জুর ইতিহাস গড়ে ওঠে শিলা রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। তখন কোরিয়ায় তিনটি রাজ্য পাশাপাশি রাজত্ব করত—শিলা, পেইকচায়ে ও কোগুরো। তিনটি শক্তসমর্থ রাজ্যের মধ্যে ছিল ভীষণ রেশারেশি। একে অপরকে পরাস্ত করে সমস্ত কোরিয়ার ওপর অধিকার বিস্তার করতে চাইত। শেষে জয় হয় শিলার। ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে চিনের সাহায্যে সমস্ত কোরিয়া অধীনস্ত হলে গিউঞ্জু হয় তার রাজধানী। এর ফলে সেই দেশে চিনা সভ্যতার ছাপ পড়ে। আর ছাপ পড়ে এশিয়া মহাদেশে পরিব্যাপ্ত বৌদ্ধধর্মের। পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে কোগুরো থেকে দুজন প্রভাবশালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শিলার সোনসান উপত্যকায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, তাঁদের শক্তিশালী দৈবী জাদুমন্ত্রের জোরে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হতো, অপুত্রক পুত্র লাভ করত এবং আরো বহু মনস্কামনা পূর্ণ হতো। ধীরে ধীরে বহু লোক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী হতে আরম্ভ করে। কিন্তু উচ্চ বংশজাত রমণীদের কাছ থেকে প্রচুর বাধা আসে। তাই বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের স্থান দিতে সময় লেগে যায় প্রায় একশো বছর। শিলা রাজতন্ত্র চিনা প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করে। ফলে বৌদ্ধ চারুশিল্প, স্থাপত্যশৈলী, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও অনেক ধরনের বৃত্তির প্রবর্তন হয় সেখানে। শিলা রাজতন্ত্র 'বৌদ্ধভূমি' বা 'The land of Buddhas' নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, সেযুগে কোরিয়ান সন্ন্যাসীরা নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহে সুদূর ভারত অবধি পাড়ি দিত।

** কলকাতার সল্ট লেক-নিবাসিনী, সত্যেন বোস জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রে কর্মরতা, বিজ্ঞানসেবিকা। ভ্রমণ ও ইতিহাসচর্চার নেশা আছে।*

৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয় শিলা সাম্রাজ্য। সেই হাজার বছরের পুরনো সভ্যতাকে খুঁজে বের করে সাজিয়ে রেখেছে কোরিয়া, তুলে ধরেছে প্রাচীন শিলা সভ্যতাকে। বৌদ্ধ ও চিনা ধর্মের রঙে সাজানো শিলা সংস্কৃতির অবশিষ্ট ছড়িয়ে রয়েছে আজকের গিউঞ্জু শহরের চারধারে। সেই শহরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে শিলা রাজাদের জন্য তৈরি উঁচু উঁচু ঢিপির সমাধিস্তম্ভ। সমস্ত গিউঞ্জু শহরে এরকম বহু সমাধিস্তম্ভ আছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'Great Tombs Park', যেখানে বিভিন্ন মাপের প্রায় কুড়িটা স্তম্ভ-ঢিপি ইতস্তত ছড়ানো। এই কোরিয়ান স্তম্ভ-ঢিপির একটি বিশেষত্ব আছে। এগুলি শুধু ঢিপি হলেই চলবে না, এর মাথা সবুজ ছাঁটা ঘাস দিয়ে ঢাকা থাকতে হবে। আবার ছোট-বড় ঢিপিরও তারতম্য আছে। রাজা-উজিরের বড় এবং পাইক-পেয়াদা-প্রজার ছোট ঢিপি। এদের মধ্যে চোনমাখয়াং নামের সমাধিস্তম্ভটিকে খুলে দর্শনার্থীদের দেখার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। মরণোত্তর কালেও জীবনের গতি থামে না, একইভাবে চলে—এমনি বিশ্বাস ছিল সেযুগের মানুষজনের। তাই তারা মাটির ঢিপির ঘর তৈরি করে তার মধ্যে মরদেহকে রাখত আর তার সঙ্গে রাখত মৃতের প্রিয় খাদ্য, বস্ত্র, গহনা, এমনকি কখনো কখনো তার প্রয়োজনের ভৃত্যকেও।
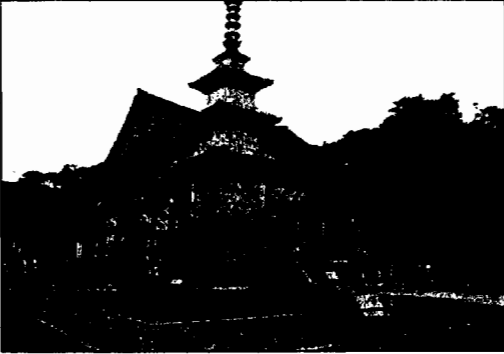
গিউঞ্জুর পুলগুবাসার ভিতরে বৌদ্ধস্তূপ

এইধরনের অসংখ্য সমাধিস্তম্ভ, প্রাচীন প্রাসাদ, বৌদ্ধমূর্তি ও খননকার্যে প্রাপ্ত নানা সামগ্রীতে সাজানো গিউঞ্জুকে আজ উন্মুক্ত প্রদর্শনশালার মতো দেখায়। এই শহরের আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিসের নাম 'চমসঙদে'। উলটো ফানেলের মতো মুখ করে রাখা কোরিয়ার বহু প্রাচীন এই মিনারটি আসলে একটি মানমন্দির। পূর্ব এশিয়ার এই প্রাচীন মানমন্দিরটি তৈরি করেছিলেন কোরিয়ার প্রথম মহিলা শাসক রানি সনডক। সারিবদ্ধ সমাধিস্তম্ভ ও এই মানমন্দিরটি আজ গিউঞ্জুর প্রতীকী হয়ে উঠেছে।

শিলা রাজবংশের অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত আছে গিউঞ্জু জাতীয় সংগ্রহশালায়। প্রাচীন বিলুপ্ত সভ্যতার প্রায় চল্লিশ হাজার জিনিস এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। কোরিয়ার এই দ্বিতীয় বৃহৎ জাদুঘরে শিল্প, শৈলী, সৌন্দর্যের মাধ্যমে চারধারে শিলা সাম্রাজ্যের জগৎ ছড়ানো। তাছাড়া অসংখ্য ভঙ্গিমার বৌদ্ধমূর্তি চমৎকৃত করে। এখানে এলে মনে হয়, আমরা বর্তমান যুগে নেই, হাজার বছর পিছিয়ে গিয়েছি।

গিউঞ্জুর আনাপ্পী পরিখার ধারে ইমহায়জিওনজি প্রাসাদ

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে (৭৪২ খ্রিস্টাব্দে) যখন গয়োঙডক রাজা রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই সময়কে শিলা সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তখনি পুলগুবাসা ও আরো অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হয়। আর তৈরি হয় কিছু বড় বড় ঘণ্টা। এরকমই 'এমিলি' নামের একটি ১১ ফুট লম্বা ঘণ্টা শোভা পাচ্ছে গিউঞ্জুর জাদুঘরে। এর আওয়াজ নাকি মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শিশুর কান্নার মতো। শান্ত পরিবেশে এই অশ্রুসিক্ত করুণ আওয়াজ ৬০ কি.মি. অবধি শোনা যায়। কথিত আছে, বুদ্ধভক্ত এক মা তাঁর সন্তানকে বিশ টন গলিত ধাতুর মধ্যে ফেলে বুদ্ধকে তা উৎসর্গ করেছিলেন। সেই গলিত ধাতু দিয়েই তৈরি হয়েছে এই ঘণ্টা। তাই তার চতুর্দিকব্যাপী ধ্বনির সঙ্গে ভেসে আসে অসহায় শিশুর আর্ত ক্রন্দন।

হাজার বছর পুরনো অবশিষ্ট শিলা সভ্যতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটির নাম 'পুলগুবাসা মন্দির'। তোহামসান পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এই বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হয় ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। শিলা সাম্রাজ্যের অপরূপ শিল্প ও স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন এই মন্দিরে রয়েছে নানা ধরনের গিল্ট ব্রোঞ্জ বুদ্ধ, প্যাগোডা ও আরো বহু মূর্তি। পাথরের মেঝে বাঁধানো সুন্দর সেতু পেরিয়ে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। বৌদ্ধমতে, এই সেতু পার হলে সামান্য গৃহিজীবন থেকে বৌদ্ধ পরিবেষ্টিত আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছানো যায়। পুলগুবাসা মন্দিরের পবিত্র আঙিনায় ও বুদ্ধের দ্বারে গিয়ে পৌঁছানোর সময় মানুষকে শুদ্ধ করে এই প্রস্তর-সেতু।

তাছাড়া আনাপ্পী পরিখার ধারে রয়েছে ইমহায়জিওনজি—শিলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাসাদের অবশিষ্ট অংশ। চারদিক দিয়ে ঢুকে যাওয়া ঝিলের জলের ওপর এমনভাবে তৈরি হয়েছিল

এই প্রাসাদ, যাতে যেকোন জায়গা থেকে দেখে তাকে সাগরের লেগুনের মতো লাগে।

গিউঞ্জু ও বিষ্ণুপুর

গিউঞ্জু শহরে বিক্ষিপ্ত শিলা সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট রূপরেখাকে দেখে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের কথা মনে পড়ে। ওদিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আধারে গড়ে উঠেছিল শিলা রাজতন্ত্র, এদিকে মল্লরাজবংশের মূল ভিত্তি ছিল কৃষ্ণপ্রেমকে ঘিরে। অরণ্যে ঘেরা এক পরিত্যক্ত অংশে হয়েছিল আজকের বিষ্ণুপুরের পত্তন। তাই আগে একে বলা হতো 'বন-বিষ্ণুপুর'। এই বন-বিষ্ণুপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠে মল্লরাজ্য, মল্লভূমি বা মল্লভূম। তার সীমানা ছিল উত্তরে বীরভূমের কিছুটা, দক্ষিণে শিলাই, পূর্বে গড় মান্দারণ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্যন্ত। এই বনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, তবে একটি প্রচলিত কিংবদন্তি আছে।

মাটি খুঁড়ে বের করা বৌদ্ধমূর্তি (গিউঞ্জু)

বৃন্দাবনের নিকটবর্তী জয়নগরের এক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে মল্লভূমের অরণ্যপথ ধরে পুরুষোত্তম তীর্থদর্শনের জন্য পুরী যাচ্ছিলেন। পথে লাউগ্রামে তাঁর স্ত্রী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। রাজা তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে সঙ্গে নেওয়া সমীচীন নয় মনে করে তাকে সেখানেই ফেলে রেখে তীর্থপথে অগ্রসর হন। একটু পরেই কসমেটিয়া বাগদি নামে একটি লোক সেখানে কাঠ সংগ্রহে এসে নবজাত শিশুটিকে দেখে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। ছেলেটির যখন সাতবছর বয়স, তখন এক ব্রাহ্মণ তার দেহে রাজলক্ষণ দেখতে পান। কিছুদিন পর স্থানীয় রাজার মৃত্যু হলে তাঁর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে নিয়ে যান। সেখানে সকলকে অবাক করে রাজহস্তী ছেলেটিকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেয়। ছেলেটির নাম রঘুনাথ। তিনিই পরবর্তী সময়ে মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য হন। এই রাজাই ক্রমশ সেই অঞ্চলের আদিবাসী কোমদের ওপর প্রভুত্ববিস্তার করে অরণ্যরাজ্য গড়ে তোলেন।

মল্লরাজবংশের উনবিংশ রাজা জগৎমল্লকে ঘিরে বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠার এক আকর্ষণীয় কিংবদন্তি আছে। একদা পদুমপুর থেকে মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজা গভীর অরণ্যে চলে যান। এমন সময় এক সুন্দর হরিণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। রাজার সঙ্গে কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলার পর হরিণটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর আসে এক বক। সে রাজার বাজপাখিকে দেখে ভয় না পেয়ে তাকে সহজে পরাস্ত করে। এইবার আবির্ভূত হয় এক নারীমূর্তি। রাজা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে পলকে বিলীন হয়ে যায় আর আকাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয় এক দৈববাণী। দৈববাণী সেই অঞ্চলের স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা করে আর তাঁরই নির্দেশমতো রাজা সেখানে মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশ থেকে শিল্পী, স্থপতি, কারিগর ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের এনে সেই মূর্তিকে ঘিরে গড়ে তোলেন এক সুন্দর সমৃদ্ধশালী নগরী। বৈষ্ণবী শক্তির আদেশে নির্মিত এই নগরীর নামকরণ হয় 'বিষ্ণুপুর'।
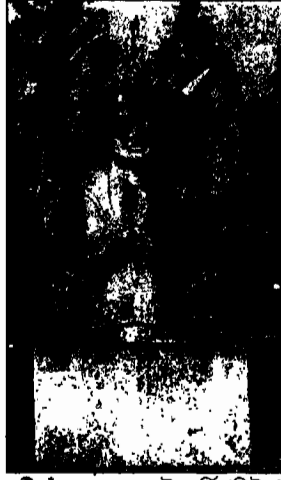
বীর হাম্বিরকে মল্লরাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা হয়। তিনি বৈষ্ণব ভাবধারায় ও কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকতেন। কথিত আছে, বৃন্দাবনে গিয়ে সেই ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে তিনি বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবনের রূপদান করার মনস্থ করেন। যমুনা-কালিন্দী নামে খাল-বিল কাটেন এবং পাশাপাশি গ্রামের 'দ্বারকা', 'মথুরা' নামকরণ করেন। বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করে তিনি বিষ্ণুপুরকে ক্রমশ বৃন্দাবনের আদলে গড়ে তোলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হাম্বির রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে শেষে বন্দি হন। শোনা যায়, কৃষ্ণভাবে বিভোর হাম্বিরই নাকি চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন মদনমোহনজীউকে—অরণ্যঘেরা বৃষভানুপুরের এক মন্দির থেকে। সেই মন্দিরের পূজারী তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে ফেরত না পেয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে-দেবতাকে নিয়ে রাজার এত আনন্দ, সেই মদনমোহন একদিন বিষ্ণুপুর ত্যাগ করবেন। পরে সেকথা সত্যি হয়। ঋণের দায়ে মদনমোহন মূর্তি বাঁধা পড়ে বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে।

এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মদনমোহনের বিগ্রহ যে সত্যি, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজও বাগবাজারের মদনমোহন-মন্দিরে তাঁর নিত্য আরাধনা হয়।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের দেবী মৃন্ময়ীর পূজা হতো শারদীয়া দুর্গাপূজার মতো। সন্ধিপূজার লগ্নে উঁচু টিলার ওপর কামান দেগে শুভ মুহূর্তের ঘোষণা করা হলে দূরদূরান্তের গ্রামে সেই পূজার সূচনা হতো। ইতিহাসের আড়ালে সেই আনন্দোৎসব হারিয়ে গিয়েছে। রাঢ়দেশের অন্যতম রাজ্য বিষ্ণুপুর আজ তার শৌর্য-বীর্য ও উন্নত শিল্প-সংস্কৃতিকে হারিয়ে অস্তমিত সূর্যের মতো দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
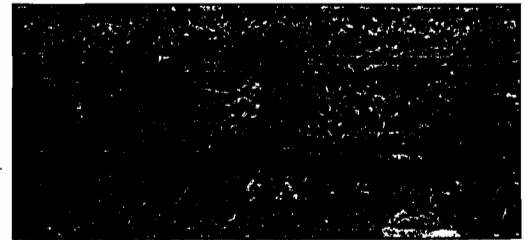
বিষ্ণুপুরের মন্দিরে পোড়ামাটির শিল্প

আইনের হেরফের ও কর্মচারিদের লোলুপতায় নিঃস্ব হয়ে গেছে মল্লবংশ। বিধ্বস্ত হয়েছে রাজপ্রাসাদ। শুধু কয়েকটি মন্দির তাদের কারুকার্যখচিত অনন্য শিল্পসৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকহীন হয়ে।

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের নগরদেবতা মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন দুর্জন সিংহ। বীর হাম্বিরের আরাধ্য কুলদেবতার তিনিই ছিলেন আক্ষরিক প্রতিষ্ঠাতা। লালমাটির দেশ বিষ্ণুপুরের সমস্ত স্থাপত্যশৈলীতে রক্তিম জাদুর পরশ। পোড়া ইঁটের তৈরি এই মন্দিরে যে সূক্ষ্ম শৈলীর নিদর্শন দেখা যায় তা পৃথিবীতে বিরল।

এখানের আরেকটি আকর্ষণীয় শ্যামরায়ের মন্দিরকে তার পাঁচটি চূড়ার জন্য 'পঞ্চরত্ন'ও বলা হয়। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ এই সুন্দর মন্দিরটি তৈরি করেন। এর পোড়ামাটির অনন্যসুন্দর কারুকার্যের জন্য একে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ রত্নমন্দির বলা হয়। লাল পাথুরে মাটিকে 'ল্যাটেরাইট' বলা হয়। এই ল্যাটেরাইট মাটিতে তৈরি পোড়ামাটির বিশিষ্ট শিল্পশৈলী সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। জার্মানির মিউনিখের গ্লিপটোথেক জাদুঘরেও তার কিছু নমুনা সাজানো রয়েছে হারিয়ে যাওয়া ইউরোপীয় সভ্যতার আধাররূপে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির এই বিস্ময়কর ভাস্কর্য শুধু রাঢ়কেই নয়, সমস্ত পৃথিবীকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

বিষ্ণুপুরের আরেকটি অভিনব শিল্পস্মারকের নাম রাসমঞ্চ। বাংলার চালাঘর ও মিশরীয় পিরামিডের সমন্বয়ে তৈরি রাসমঞ্চ আনুমানিক ১৬০০ শতাব্দীতে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল বীর হাম্বিরের অবদান। মল্লরাজত্বকালে উৎসবের আসর বসত এই মঞ্চকে ঘিরে, যেখানে আসীন হতেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। সত্যিই তখন দ্বিতীয় বৃন্দাবন হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর।

গিউঙ্জু ও বিষ্ণুপুরের মাঝে বহু মিল, আবার অনেক অমিলও। খুঁড়ে বের করা গিউঙ্জু নগরী ও তার হাজার বছরের পুরনো বিলুপ্ত ইতিহাসকে আজকের অতি-আধুনিক দক্ষিণ কোরিয়া যেভাবে সংরক্ষিত করে সর্বসাধারণের জন্য সাজিয়ে রেখেছে তা প্রশংসনীয়। তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতিকে বিষ্ণুপুর কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছে? গিউঙ্জু ইউনেস্কোর দ্বারা 'World Heritage Site'-এর সম্মানপ্রাপ্ত। অপরদিকে পৃথিবীর প্রাচীন নামজাদা সভ্যতার মানচিত্রে বিষ্ণুপুরের কোন নিজস্ব পরিচয় নেই। কারণ, আমরা বিষ্ণুপুরের সঠিক মর্যাদা দিতে পারিনি। পারিনি তার বিশ্বমানের ভাস্কর্য ও সংস্কৃতিকে সম্মানের শিখরে স্থান দিতে। গিউঙ্জুর লুপ্ত শিলা সভ্যতাকে ঘিরে হয় বার্ষিক মেলা, শিল্প মেলা, 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স'। সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে জমায়েত হয় এই পাহাড়ঘেরা দক্ষিণ-পূর্ব কোরিয়ান নগরীতে। সেই বিশ্ব সমাগমকে কেন্দ্র করে সেখানে পাঁচ, ছয়, সাত তারা হোটেলের পঙ্‌ক্তি গড়ে উঠেছে। বাঁধানো এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে সে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে সমগ্র কোরিয়ার সঙ্গে। সার্বভৌমিকতার সারিবদ্ধ রঙিন জয়পতাকায় সাজানো তার আঙিনা। আধুনিকতার আবিরের ছোঁয়ায় ও উৎসাহী ভ্রমণার্থীদের তারুণ্যে তাকে চিরনতুন দেখায়। শুধু তাই নয়, সেই প্রাচীন সভ্যতাকে বিশ্বসমক্ষে তুলে ধরে আজ কোটি কোটি টাকা আয় করছে কোরিয়া।

কিন্তু বিষ্ণুপুর? সে নির্বাক। শালবনে ঘেরা রাঢ়ের লালমাটির দেশে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বুকের অব্যক্ত বেদনাকে নিয়ে। কয়জন শুনতে চায় তার উত্থান-পতনের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী? ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : "বাঙালি বিষ্ণুপুরের মর্যাদা দিল না।" বাঙালি ভ্রমণপিপাসু, বাঙালি শিক্ষিত পর্যটক। সেই বাঙালিই যদি বিষ্ণুপুরের সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে না পারে, তাহলে কে করবে? কে তার অপরূপ শিল্প-সংস্কৃতির দিব্যজ্যোতি নিয়ে পৌঁছে দেবে বিশ্বসভায়—সর্বজনের মাঝখানে! ❑

তথ্যসূত্র

১ A History of Korea—Roger Tennaut, Kegan Paul International, 1996, London & New York
২ Historical Dictionary of Republic of Korea—Andrew C. Nahm, Asian Historical Dictionaries, No. II, The Scarecrow Press Inc., 1993, Metuchen NJ and London
৩ The Two Koreans: A Contemporary History—Don Oberdorfer, Basic Books, 2001, USA & Canada
৪ Travel Korea Your Way—Richard Saccone, Hollym, 2002, Elizabeth, NJ, Seoul
৫ মৌন-মুখর বিষ্ণুপুর—অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০০, কলকাতা

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**
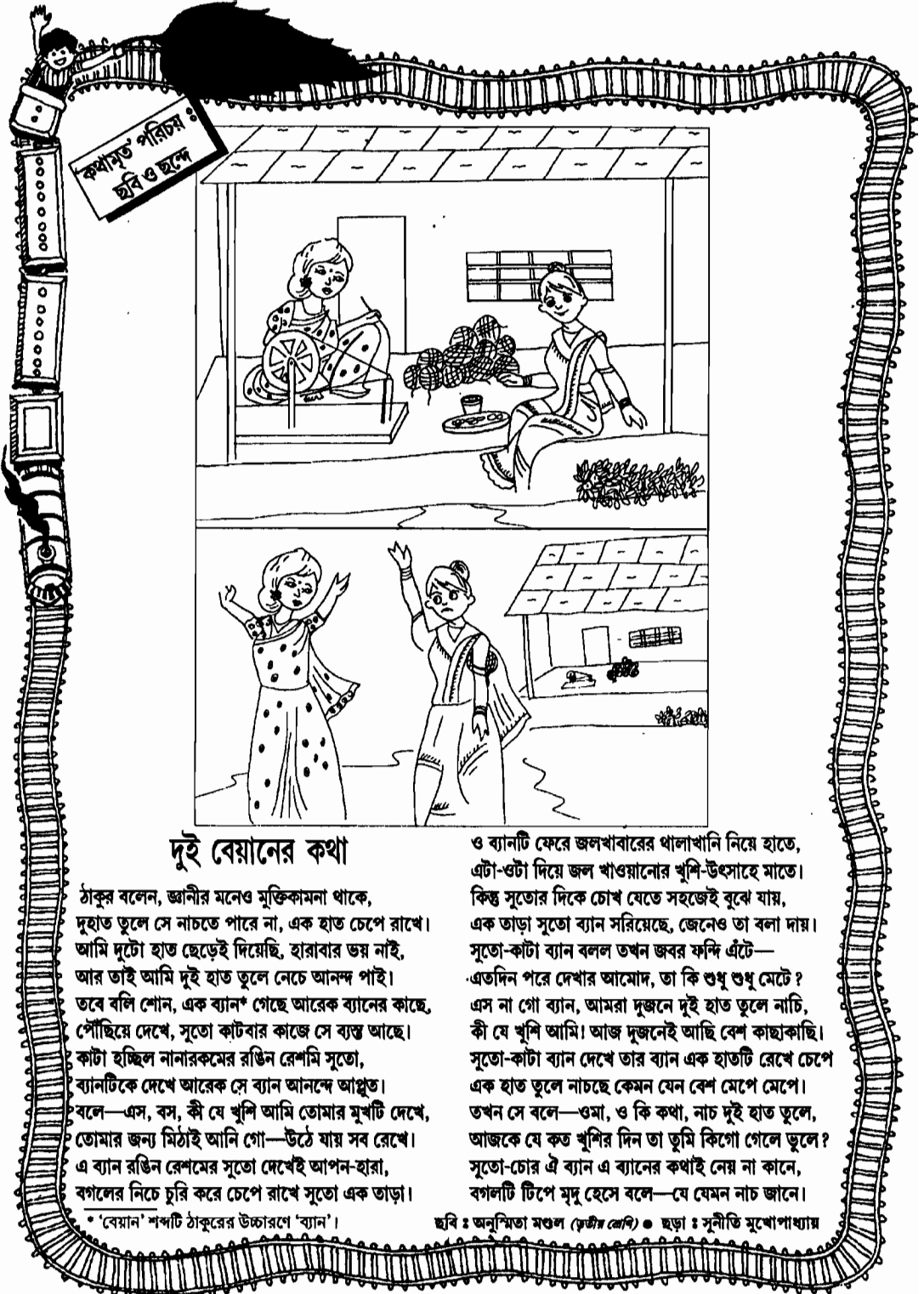
দুই বেয়ানের কথা

ঠাকুর বলেন, জ্ঞানীর মনেও মুক্তিকামনা থাকে,
দুহাত তুলে সে নাচতে পারে না, এক হাত চেপে রাখে।
আমি দুটো হাত ছেড়েই দিয়েছি, হারাবার ভয় নাই,
আর তাই আমি দুই হাত তুলে নেচে আনন্দ পাই।
তবে বলি শোন, এক ব্যান* গেছে আরেক ব্যানের কাছে,
পৌঁছিয়ে দেখে, সুতো কাটবার কাজে সে ব্যস্ত আছে।
কাটা হচ্ছিল নানারকমের রঙিন রেশমি সুতো,
ব্যানটিকে দেখে আরেক সে ব্যান আনন্দে আপ্লুত।
বলে—এস, বস, কী যে খুশি আমি তোমার মুখটি দেখে,
তোমার জন্য মিঠাই আনি গো—উঠে যায় সব রেখে।
এ ব্যান রঙিন রেশমের সুতো দেখেই আপন-হারা,
বগলের নিচে চুরি করে চেপে রাখে সুতো এক তাড়া।
ও ব্যানটি ফেরে জলখাবারের থালাখানি নিয়ে হাতে,
এটা-ওটা দিয়ে জল খাওয়ানোর খুশি-উৎসাহে মাতে।
কিন্তু সুতোর দিকে চোখ যেতে সহজেই বুঝে যায়,
এক তাড়া সুতো ব্যান সরিয়েছে, জেনেও তা বলা দায়।
সুতো-কাটা ব্যান বলল তখন জবর ফন্দি এঁটে—
এতদিন পরে দেখার আমোদ, তা কি শুধু শুধু মেটে ?
এস না গো ব্যান, আমরা দুজনে দুই হাত তুলে নাচি,
কী যে খুশি আমি! আজ দুজনেই আছি বেশ কাছাকাছি।
সুতো-কাটা ব্যান দেখে তার ব্যান এক হাতটি রেখে চেপে
এক হাত তুলে নাচছে কেমন যেন বেশ মেপে মেপে।
তখন সে বলে—ওমা, ও কি কথা, নাচ দুই হাত তুলে,
আজকে যে কত খুশির দিন তা তুমি কিগো গেলে ভুলে?
সুতো-চোর ঐ ব্যান এ ব্যানের কথাই নেয় না কানে,
বগলটি টিপে মৃদু হেসে বলে—যে যেমন নাচ জানে।

* 'বেয়ান' শব্দটি ঠাকুরের উচ্চারণে 'ব্যান'।

ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল *(তৃতীয় শ্রেণি)* ● ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

মহাসমাধির কয়েকদিন আগে—

বাবা যোগীন, একবার পাঁজিটা দেখে দেখে আজ থেকে শুরু করে দিনলিপিগুলো পড় তো।

৩১শে শ্রাবণ অবধি পড়লে? আচ্ছা থাক, আর পড়তে হবে না।

ঐদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩১শে শ্রাবণ ১২৯৩ শ্রীরামকৃষ্ণ মরদেহ ত্যাগ করে মহাসমাধিলীন হয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পর বৃন্দাবনে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করলেন—

দেখ, যোগীনকে তুমি মন্ত্রদীক্ষা দিও। আমি একটি বিশেষ মন্ত্র বলে দিচ্ছি।

অন্যদিকে স্বামী যোগানন্দ (যোগীন)-ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করলেন।

বাবা যোগীন, তোমার মন্ত্রলাভের সময় হয়েছে। তুমি মাকে গিয়ে বল।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অতঃপর যোগীনের মন্ত্রদীক্ষা হয়ে গেল। যোগীনই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দীক্ষিত সন্তান।

• চিত্ররূপ ঃ গৌরীশ মিত্র •

স্বামীজীর দৃষ্টিতে নারী

সংগ্রামী জীবনের অন্য নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ। পূর্ণ অর্থেই স্বামীজী ছিলেন তারই বার্তাবাহী। আত্মবিশ্বাসে ভর করে নিঃস্বার্থ কর্মই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। ভারতের অবহেলিত দরিদ্র মানুষের জন্য বারবার তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছে। শুধু সেযুগের স্বাধীনতা আন্দোলনই নয়—অত্যাচারিত, বুভুক্ষু, নিষ্পেষিত মানুষের পাশে তিনি আজও প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু। আজ বিজ্ঞানের যুগেও অজ্ঞানের মূঢ় আস্ফালন, মূল্যবোধের অভাব, উচ্ছৃঙ্খলতা, নিপীড়ন—এসব আমাদের চোখে পড়ে। চোখে পড়ে যোগ্য উত্তরাধিকারের আকাল। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসের বাতাবরণে আজও তাই স্বামীজী অপ্রতিরোধ্য। যুবহৃদয়ে তিনি আদর্শের প্রেরণাস্থল। 'স্বদেশমন্ত্র'-এ তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ "আমায় মানুষ কর।" আর এজন্যই তিনি 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' চেয়েছেন।

পুরুষ ও নারী প্রকৃতি তথা স্রষ্টার সৃষ্টি। মানুষে মানুষে—পুরুষ ও নারীতে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু নারীদের নিয়ে পৃথক ভাবনার কারণ অন্যত্র। প্রথমত পুরুষশাসিত সমাজ। দ্বিতীয়ত সংবিধানের স্বীকৃতি নারীদের বাস্তব জীবনে অমিল। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে নারীর সেই মূল্য খুঁজতে গেলেই হতাশ হতে হয়। এখানেই এই 'আধুনিক' মানুষদের মূঢ়তা। শিশুকাল থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নানা প্রতিবন্ধকতায় নারীদের জীবন জড়ানো। 'মানুষ' হওয়া তাদের আর হয়ে উঠছে না। অথচ স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ "পুরুষকেও আমি যাহা বলি, নারীগণকেও তাহাই বলিতে চাই। বলিতে চাই, নারীগণ, তোমরা ভারতের উপর বিশ্বাসী হও, ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাসী হও, বীর হও, নৈরাশ্য একেবারে ত্যাগ কর।"

নিরাশার অন্ধকারেই আলো খুঁজতে হয়। জ্ঞান অজ্ঞানের আঁধার দূর করে। বৈষম্যের অন্ধ গলিতে ঘুরপাক খেতে খেতে সদর রাস্তায় পৌঁছাতে আলোর অন্বেষণ করতে হয়। এই আলোর অন্বেষণে স্বামীজী সহায়ক। পুরুষ ও নারীর কাছে তাঁর বার্তা ছিল অভেদ। শিকাগো বক্তৃতার শেষদিনের অধিবেশনে স্বামীজী বলেন ঃ "প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন।" নারীকে তিনি আলাদাভাবে দেখেননি। দেখার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, আজ দেখতে হচ্ছে। কারণ, নারী-পুরুষের সাম্যভাব কখনো দেখা যাচ্ছে না। নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব আজও ক্রিয়াশীল। পণপ্রথা, নারীব্যক্তিত্বের অবমাননা, নারীনির্যাতন ইত্যাদি নানাবিধ অত্যাচারে জর্জরিত নারীসমাজ পর্যুদস্ত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে আর পাঁচটা সামাজিক সমস্যার মতোই নারীসমস্যাকে মিশিয়ে দিলে যুগ যুগ ধরে তা আবর্তিতই হতে থাকবে—সমস্যার সমাধান হবে না। স্বামীজীর দৃষ্টিকে সেই সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার করলে সামাজিক ব্যাধি দূর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—সেকথা না বললেও চলে। 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতায় স্বামীজী বলেছেন ঃ "খ্যাতির কামনা/ আর লোভের লালসা মনে যার; নারীকে যে ভাবে/ পত্নীরূপে, সে কখনো শুদ্ধচিত্ত হবে না জীবনে।" '৪ঠা জুলাই' কবিতায় স্বামীজী আবার একইভাবে বলেন ঃ "নারী ও পুরুষ সকলেই যেন উন্নত শিরে দাঁড়ায়।" স্বামীজী নারী-পুরুষকে আলাদাভাবে দেখেননি। দেখতে চাননি। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব জীবনে সেই দৃষ্টিভঙ্গি না পালটেও নারীসমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজা আমাদের প্রয়োজন কিনা—এপ্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হচ্ছে।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে স্বামীজীর জীবন ও সাধনা আবর্তিত। স্বামীজী তাঁর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "সুকৃতি তোমার হোক ছিল না যা আগে;/ হও তুমি ভারতের কন্যা মহীয়সী,/ বন্ধু ও সেবিকা হও আত্মনিবেদিতা।" ('আশীর্বাদ', ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত) ভগিনী নিবেদিতার আত্মনিবেদন আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ও বরণীয়। ভারতীয় জীবনে নিবেদিতা আদর্শস্থানীয়া—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্বামীজীর মতো আদর্শকে পেয়েছিলেন বলেই আমরা এমন নিবেদিতাকে পেয়েছি—যিনি পাশ্চাত্যে জন্মগ্রহণ করেও সর্বান্তঃকরণে ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয়।

পাশ্চাত্যের নারী সম্পর্কে স্বামীজীর মত ঃ "পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান।" আবার, তিনি বলছেন ঃ "যাহারা পাশ্চাত্যসমাজে বসবাস না করিয়া পাশ্চাত্যসমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতারক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যেসকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন—তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই।" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্ঘর্ষ')

স্বামীজীর স্বদেশচিন্তায় অতীতের মধ্যেই বর্তমানকে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার, বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত থাকে। সেদিনের অতীত আজকের বর্তমান। কিন্তু তাঁর বাণী আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তাই, বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারত ধরা দেবে সেটাই আকাঙ্ক্ষিত।

'ভারতের নারী' প্রসঙ্গে বক্তৃতায় স্বামীজীর মত ঃ "ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই এর প্রথম ও শেষ কথা।" একই বক্তৃতায় তিনি আবার বলেন ঃ "পাত্রের বাবা ছেলের জন্য বড় পণ দাবি করেন এবং মেয়ের বাবাকে বর জোগাড় করার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রি করতে হয়।" ভাববার অবকাশ রয়েছে। সেযুগেও পণ ছিল, আজও আছে। তাহলে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন কিভাবে হচ্ছে! বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানবজীবনের কোন পরিবর্তন সূচিত না হলে নিজেদের 'আধুনিক' ও 'বিজ্ঞানমনস্ক' দাবি করাকে মূঢ়তার আস্ফালন বলতে ক্ষতি কি! বাইরের চাকচিক্য অন্তরের কালিমাকে আড়াল করলে উন্নতি হচ্ছে বলা যায় না। বরং উলটোটা হলেই নিঃসন্দেহে উন্নতি হচ্ছে বলা যায়।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সমাজতন্ত্রী হিসাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র রচনায়, বক্তৃতায় নারী ও পুরুষকে এক ও অভিন্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা পেতেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে ভোগবাদী ব্যবস্থা আজকে নারীদের পণ্য করে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আজ তাই মাতৃভাবের উদ্বোধন দরকার। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে চলতে পারলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। 'মানুষ' গড়ার শিক্ষা আজ বড় বেশি প্রয়োজন। স্বনির্ভরশীল, সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার এবং অর্জিত স্বাধীনতায় নারীরা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জগৎটাই বদলে যাবে।

চন্দ্রমোহন সিংহ
বারা, বীরভূম-৭৩১ ২৩৭

'উদ্বোধন' আমাদের সম্পদ

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১১ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'উদ্বোধন যত্ন করে পড়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রাহকদেরই' পড়ে খুব ভাল লাগল এবং আশা করি, পত্রটি সকল গ্রাহকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা খুবই অল্প মূল্যে 'উদ্বোধন'-এর মতো এত মূল্যবান পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাচ্ছি, সুতরাং পত্রিকার সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব প্রত্যেক গ্রাহকেরই আছে। 'উদ্বোধন' পাঠ করে যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া বা অল্প পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া মানে পত্রিকার অবমাননা করা। তবে পত্রলেখকের সঙ্গে আমি সর্বক্ষেত্রে একমত নই। কারণ, সব পাঠকের মনোভাব এক নয়, যদিও ২।১ জন হয়তো এর অবমূল্যায়ন করেছেন, তবে অধিকাংশ পাঠককেই দেখা যায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা খুবই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আমাদেরও কখনো বা অবচেতন মনে যাতে ভুল না হয় সেবিষয়ে পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

বিধুরঞ্জন আচার্য
গুয়াহাটী, অসম-৭৮১ ০২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে সংগঠনের ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বিশ্বজনীন তাৎপর্যকে যাঁরা সর্বপ্রথম ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম সপ্তঋষির এক ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য, অধঃপতন, অজ্ঞতা দেখে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের অধঃপতিত জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এক জীবন্ত বাণী, যা তাদের মধ্যে শক্তি, বিশ্বাস এবং সেবাব্রতের ভাব সঞ্চার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করবে। স্বামীজীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ভারতীয় সমাজের এই অত্যন্ত অগোছালো ও এলোমেলো অবস্থায় একটি শক্তিশালী সংগঠন ভিন্ন কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর গুরুভাইদের উদ্দেশে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো একটি যন্ত্র চালিয়ে দেওয়া, যা প্রত্যেকের দরজায় মহান ভাবসমূহকে পৌঁছে দেবে, যার ফলে দেশের নরনারী নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। একটি সংগঠন এরকম যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে তখনি, যখন তার মধ্যে এমন লোকেরা নিজেদের সামিল করবে—যারা সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র এবং নিঃস্বার্থপর। পরবর্তী কালে এই মহান ব্রতে উৎসর্গীকৃত হলো 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এর কর্মধারার দুটি উল্লেখযোগ্য দিকের একটি হলো, মানুষের সেবাকে ঈশ্বরের সেবারূপে অনুষ্ঠান এবং অপরটি হলো অসাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বজনীনতা। নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ। এখানেই স্পষ্ট বোঝা যায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে উন্নয়নমুখী সংগঠন হবে ঐগুলিকে মনে রেখে।

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় : "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৩-১১৪) "প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।" (ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৯৩) "নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর।" (ঐ, পৃঃ ৪৩০) "শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের ওপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে।" (ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮) "হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই।... সঙ্ঘ চাই।" (ঐ, পৃঃ ৫০) সঙ্ঘবদ্ধতা, একতাই বল। আমরা জানি দশটি লাঠির গল্প। স্বামীজীর স্বপ্ন সার্থক রূপদান করতে, মিশনের ব্যাপক কর্মযজ্ঞে সাহায্যের জন্যই প্রয়োজন উন্নয়নমুখী সংগঠন।

আমরা সাধারণত সংগঠনকে তিনটি ভাগে ভাগ করি—বিনোদন, কল্যাণ ও উন্নয়ন। সংগঠন ব্যক্তি ছাড়া হয় না, তা ব্যক্তির সমষ্টি; কিন্তু মনে রাখা দরকার—ব্যক্তিই সংগঠন নয়। সংগঠনে থাকবে সাংগঠনিক রূপরেখা, অবস্থান, জনসাধারণের চাহিদা ও সমস্যা এবং স্থানীয় সম্পদ—মানবিক ও বস্তুগত। যাদের জন্য কাজ সেই জনসাধারণের অংশগ্রহণ, আর্থিক বিকাশ, হিসাব-সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের। যেমন, শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন : "যদি নিম্নশ্রেণিদের শিক্ষা দিতে পার, তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পার?" (ঐ, পৃঃ ১৯৬) "মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ।" (ঐ, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৪৩) অর্থাৎ শিক্ষা এমন হবে যাতে চরিত্র তৈরি হয়,

মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাই পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষাও চাই। এছাড়া পাঠচক্র, খেলাধূলা, নাটক ইত্যাদিও থাকবে। সেবামূলক কাজ হিসাবে থাকবে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি নজর দেওয়া। অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে থাকবে কৃষি, পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে সাহায্য করা—যা মানুষের ন্যূনতম চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবপূরণে সাহায্য করবে।

কাজের জন্য অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থ তিনটি উপায়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথা—নিজেদের তহবিল, জনগণের সাহায্য এবং বাইরের সাহায্য। প্রত্যেক সংগঠনে সকলের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যম হলো সাধারণ পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যকরী সমিতি ও গ্রহীতা গোষ্ঠী। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে বাধা-বিপত্তি আসতেই পারে। তার জন্য বাড়াতে হবে জনসংযোগ—ব্যক্তিগত, দলগত বা সমষ্টিগতভাবে। কয়েকটি বিশেষ দিকে নজর দিলে সংগঠন মজবুত, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন—প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। স্বামীজী বলেছেন ঃ "টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়।" (ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯) কাজের জন্য যেকোন অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়া। তথ্য সংগ্রহ করা ও বিশ্বাসযোগ্য করা। আবেগে বশীভূত না হয়ে কাজ করা। এতে সাময়িক কারো উপকার হলেও বাস্তবে বেশি লোকের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা—মানুষের motive-কে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন। সকলে যে ভাল বলবে, তা আশা করা উচিত নয়। সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজস্ব দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করা। বিচারকের মনোভাব না নেওয়া। অহমিকাবোধ বা নিজের মতই ঠিক—এই মনোভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়া। সংগঠনের ব্যক্তিকে তৈরি হতে হবে তিনটি 'H'-এর মাধ্যমে। এগুলি হলো—অনুভব করার হৃদয় (Heart), ধারণা করার মস্তিষ্ক (Head) এবং কাজ করার হাত (Hand)—যা আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে তাঁর সতর্কবাণী—"ভারতবর্ষে তিনজন লোকও পাঁচ মিনিট কাল একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করিতে শুরু করে—ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই দুরবস্থায় পতিত হয়।" (ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭) এগুলি মনে রেখে যদি আমরা একটি সুস্থ সুন্দর সংগঠনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবে একই সাথে আমাদের নিজেদের এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণ হবে।

সৌম্য সিনহা

অমরকানন, বাঁকুড়া-৭২২ ১৩৩

তাঁদের স্মৃতিগুলি কি হারিয়েই যাবে?

'উদ্বোধন'-এ বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়ে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ—'মাতৃতীর্থপরিক্রমা'। বছর আষ্টেক আগে 'উদ্বোধন'-এ এধরনের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল—সেটি শুধু বাগবাজার অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। এছাড়া প্রয়াত নির্মলকুমার রায়ের 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থটি তো আছেই। এইসমস্ত লেখা ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদের স্মৃতিপূত স্থানগুলি দেখার আগ্রহ আমার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিভিন্ন বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম, শুধু উত্তর কলকাতাতেই এমন স্থান রয়েছে প্রায় ১৫০টি। বলা বাহুল্য, এগুলির মধ্যে বেশ কিছু বাড়ি ভাঙা পড়েছে নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ার কারণে। যেমন—স্বামী তুরীয়ানন্দজী, রামচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখের বাড়ি। আবার কিছু বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। যেমন—স্বামী সারদানন্দজীর বাড়ি, নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং, ভাগ্যধর মল্লিকের বাড়ি ইত্যাদি। যেগুলি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, তার সংখ্যা অবশ্য কম নয়। ১০০ তো হবেই। তবে কালের করাল গ্রাসে অধিকাংশেরই অবস্থা শোচনীয়।

গত মার্চ মাসে কয়েকদিন ধরে আমি উত্তর কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চল 'পরিক্রমা' করে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি। কয়েকটি স্থানে গিয়ে আমি শিহরণ অনুভব করেছি, আবার কয়েকটি স্থানে এসে বেদনাহতও হয়েছি। অধরলাল সেনের বাড়ি, মদনমোহন ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, গরানহাটার বৈষ্ণব আখড়া, রবীন্দ্রকানন, গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ি, কমলকুটীর, সারদেশ্বরী আশ্রম, খেলাৎ ঘোষের বাড়ি প্রভৃতি স্থানে গিয়ে অভিভূত হয়েছি; কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর বাড়ি, নিবেদিতা স্কুল, যদুলাল মল্লিকের বাড়ি, সিমলায় রাজা মহারাজের বাড়ি, শোভাবাজার রাজবাড়ি, নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ, নন্দলাল বসুর বাড়ি, যোগীন-মায়ের বাড়ি প্রভৃতি স্থানে এসে বাস্তবিক মর্মাহত হয়েছি। কারণ, অর্থ ও আগ্রহের অভাবে এগুলির অবস্থা শোচনীয়। অথচ ভক্তসাধারণের কাছে এগুলির গুরুত্ব ও মহিমা অপরিসীম।

আমরা জানি, রামকৃষ্ণ মিশন তার সীমিত সামর্থ্য অনুযায়ী এখনো চেষ্টা করে চলেছে এসকল পুণ্যক্ষেত্রের যথাযোগ্য মর্যাদারক্ষায়, কিন্তু তার বাইরে আরো বহু স্থান পড়ে রয়েছে নিতান্ত অবহেলায়। এবিষয়ে আমার প্রস্তাব—বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকা স্থানগুলিকে একত্রে যদি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়, তাহলে ভক্তসাধারণ সামগ্রিকভাবে সবকয়টি পুণ্যক্ষেত্র সম্পর্কে অবগত হবেন, ইচ্ছা হলে দেখেও আসতে পারবেন। গ্রন্থে পড়া ঘটনাগুলি যদি সেইসকল স্থানে গিয়ে স্মরণ করা যায়, তবে তা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরকালের মতো অক্ষয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, যেসকল স্থান কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসেছে, মুছে যেতে বসেছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও তাঁদের পার্ষদবৃন্দের স্মৃতিচিহ্ন—সেগুলি অবিলম্বে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করুন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরাগিগণ। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ স্থানগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করলে আগামী প্রজন্ম উপলব্ধি করবে কোন্ মহান উত্তরাধিকার সে লাভ করেছে এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে।

অরিন্দম দাস

চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, কলকাতা-৭০০ ০০৩

'কথামৃত'-এর হলাহল

সুভাষ দে*

'কথামৃত' যেভাবে আমরা পড়ি বা শুনি তাতে অধিকাংশ সময়ই অনেকগুলি বিষয়ের গভীর তাৎপর্য সেভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। অধরা তো থেকেই যায় কত স্তর থেকে স্তরান্তরের পরিক্রমার আরো গহিন, আরো নিবিড় পরিচয়। এছাড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' মানেই ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতবাণী। কাজেই স্বয়ং ভগবান বা ঠাকুরের কথা শুনছি বা পড়ছি—এই বোধটিতে সচেতন থাকি বলে এসব বাণীকে বা সাদা কথাকে তেল-নুন-লকড়ির দৈনন্দিনতায় ব্যবহারযোগ্য বলে হয়তো সেভাবে ভাবিও না। যিনি বলছেন তাঁর সর্বজ্ঞতায়, অনায়াস পারঙ্গমতায়, অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অসাধারণ শক্তি দেখে এমন হতবাক হয়ে যাই, এই কথাগুলি যে আমাকেও বলা হচ্ছে—এই কথাটাই বেশির ভাগ সময় ভুলে যাই। বিষয়-বিষয়ীতে একাত্মবোধের এতই বাধা আমাদের! 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ কথা কে বলছেন? বলছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কাকে বলছেন? কাদের বলছেন? বলছেন ভক্তদের। ভক্ত কারা? ভক্তের তো কমতি নেই! কেশব সেন, নরেন, ছোট নরেন, লাটু, মহিমাচরণ, কাপ্তেন, গিরিশ, কৃষ্ণকিশোর আরো কত-শত ভক্ত! নামগুলি অবিরত শুনে শুনে এঁদের এত চেনা মনে হয়, অথচ তাঁদের ব্যক্তিপরিচয় পৃথগ্‌ভাবে জানতে চাইলে সব কেমন জানি গুলিয়ে যায়। সবাই মিলে যেন একজন ভক্তই, সব ভক্ত মিলে যেন একটিই শ্রেণি! কুচকাওয়াজের মিলিটারি কিংবা পুলিশকে যেমন ব্যক্তিপরিচয়ে পৃথক করা যায় না—তেমনি এইসব নরেন-লাটু-গিরিশ-কাপ্তেন মিলে এক অনন্ত ভক্তবাহিনী। এই যে কাউকে ব্যক্তিপরিচয়ে আর পৃথক করা যাচ্ছে না—এমনটা কেন হয়? এটা হয়, কারণ যিনি বলছেন এবং যা বলছেন তাতেই মুগ্ধতা বা ধ্যানাবেশ এত জমে যায় যে, যাঁদের বলছেন তাঁরা অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন।

'কথামৃত'-এর সব কথাই কি অমৃত? যাঁদের বলছেন তাঁরা সকলেই কি অমৃতজ্ঞানে এসব কথাকে গ্রহণ করেছিলেন? ঠাকুর কি কড়া কথা কখনো বলেননি? এড়িয়ে যাননি কি অনেক উত্থাপিত প্রসঙ্গ? এখানে হলাহল [অমৃতের বিপরীত] কি একেবারেই নেই? হলাহলের মৃত্যুর ভীষণতা না হোক—হুলের তীব্রতা তো আছেই অনেক জায়গায়। চরম আঘাত না থাকুক অন্তত পন্নগের ফোঁস কিন্তু বেশ রয়েছে। সে-আঘাতের আকস্মিকতায় আমরাও কি অনেক সময়ই নড়েচড়ে বসি না? সম্বিৎ ফিরে পাই না কি আজও?

গিরিশের নানারকম অতীতের পাপকাজ থেকে মুক্তি পাওয়া প্রসঙ্গে যখন "রসুনের বাটি যত ধোয়া যাক, গন্ধ যায় না"—এই কথাটি ঠাকুর বলেন, তখন বোঝা যায় না কি যে 'যা খুশি তাই করে যাব, আবার ঈশ্বরকেও পেতে চাইব'—পাপকর্মের ফল থেকে অব্যাহতি আশা করব—ইত্যাকার ভাবনাকে ঠাকুর প্রশ্রয় দিচ্ছেন না? অথচ অন্যত্র বলছেন ঃ "কি? আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ!" এরপর গিরিশকে সান্ত্বনার সুরে বলছেন, তবে রসুনের বাটি যদি আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া যায়, তখন আর গন্ধ থাকে না—ভগবানের সান্নিধ্য-ব্যাকুলতায় একেবারে ডুবে গেলে সব পাপ থেকে মুক্তি হবেই। এভাবেই কথার হলাহলে ডুবিয়ে দিতে গিয়েও পরক্ষণেই তিনি আবার অমৃতের আস্বাদ দিচ্ছেন, হতাশায় ডুবিয়ে দিচ্ছেন না কাউকেই। আশার বারি অবাধে ছিটিয়ে চলেছেন। এই অমৃত থেকে, কৃপা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। শ্রীশ্রীমা যে বলেছেন ঃ "এবার বাঁশ-ঘাস সব চন্দন হয়ে যাবে"—সে কি এমনি এমনি? 'কথামৃত'-এর অমৃত তো সেই মিছরির টুকরো, যেদিক থেকেই খাওয়া যায় একই স্বাদ, একইরকমের মিষ্টি। তা বলে এই অনন্ত কথামালার কি কোন তর-তম নেই? পাত্রভেদে উপদেশের যে ভিন্নতা, তা সবই অমৃততুল্য তো বটেই, কিন্তু সেই আস্বাদ্যমানতারও রয়েছে বহুমাত্রিকতা—এজন্যই এক একদিনের পাঠে, এক একদিনের শ্রবণে এক একরকম অনুভূতি হয়; এক একজনের কণ্ঠে, এক একজনের ব্যাখ্যায় একই অংশ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়। মনের, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই 'কথামৃত' নব নব অভিজ্ঞান বহন করে আনে। জীবন যত এগিয়ে চলে, 'কথামৃত'-এর যেকোন পৃষ্ঠা দেখি তা থেকে বহু যোজন এগিয়ে আছে।

তবে কি এজীবনে কিছু হলো না? হলো না মানে কি? কি যেন হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর এজীবনে হলো না। আচ্ছা, যা হয়েছে সেটাই কি হওয়ার কথা ছিল? অপার করুণাময় একজন এপৃথিবীতে এসেছিলেন; ডেকে ডেকে মানুষের চোখের জল মুছিয়ে শান্তি দিতে, তাদের ধুলোমাটি কাদা ঝেড়ে সুন্দর করে তুলতে, তাদের ভাল হোক—এই প্রার্থনা নিয়ে দিনরাত মায়ের কাছে কেঁদেকেটে সারা হয়েছেন। মাগ-ছেলের জন্য যারা কাঁদে—কাঁদে তো সকলেই—তাদের বারবার বলছেন, একটু ভগবানের জন্য কাঁদ, তোর চোখের জলের মোড় ঘুরিয়ে দে, যে-আগুন দিয়ে মানুষের ঘর জ্বালাস সে-আগুনে ঘরে ঘরে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে অন্ধকার দূর কর। দূর কর অন্ধকার তোর নিজের, দূর কর এজগতের।

---

* *কোচবিহার-নিবাসী সাহিত্যরসিক।*

তাতে তোমার কি লাভ? যাও, আমার আর ভাল হয়ে কাজ নেই।

বললে হবে কেন, মাতাল গিরিশের অশ্রাব্য গালিগালাজের অবিশ্রান্ত ধারা থেকেও যিনি ভাল কথা খুঁজে আঁচলে বেঁধে রাখতে চান, তিনি কি যেমন তেমন নাছোড়বান্দা? ঐ আমাদের জীবন গতিপথের অনেক আগে যেমন এগিয়ে থাকে 'কথামৃত'-এর যেকোন পৃষ্ঠা, তেমনি আমাদের ভালর জন্য তার অন্তহীন অহেতুক দায়।

জীবনে নিজের মতো যে একটু চলব তার কি জো আছে? কী আপদ! প্রতিটি পথের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের মতো তিনি দাঁড়িয়ে, যেভাবে নরেন দেখেছিলেন সমুদ্রপারে যাওয়ার সময়—সাগরের অতলস্পর্শী গভীরতা এবং অশ্রান্ত ঢেউয়ের চাঞ্চল্যকে তুচ্ছ করে লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন পথ দেখিয়ে। কাজেই, জীবনে কিছুই হলো না—একথা বলার মতো মুখও তো নেই! এই পোড়া কানদুটোর ভিতর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন না কোনভাবে 'কথামৃত'-এর অমৃত ঠেসেই দিচ্ছেন। যেকোনভাবেই হোক, তাঁর নামের সঙ্গে, রূপের সঙ্গে সান্নিধ্য তৈরি করে দিচ্ছেন অবিরত। সঙ্গদোষের প্রভাব কি কম! সেসবই হচ্ছে। হয়তো অজান্তে, অগোচরে—কাজেই জীবনে কিছুই হলো না বলে যে একটু আক্ষেপ করব, তারও উপায় নেই। তাঁর কথা-রূপ-ভাবের সান্নিধ্যে না এলে এজীবন যে আরো কি হতো, ভাবলে শিউরে উঠি! কাজলের ঘরে থাকলে কালি যেমন গায়ে লাগবেই, 'কথামৃত'-এর ঘোরে থাকলে অমৃত কি আর জুটবে না? ভুলে থাকা অমৃতের সন্তানদের এভাবেই অমৃতলোকে পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি।

বৈষ্ণব কবিতায় আছে ঃ "যদি গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে হইত/ কেমনে ধরিত দে/ রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা/ জগতে জানাত কে?" অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, যদি মাস্টারমশাই পাঁচ খণ্ড 'কথামৃত'-এর পঞ্চবেদ লিখে না রাখতেন তবে এই অহেতুক কৃপাসিন্ধুর স্পর্শ না পেয়ে মানুষের চৈতন্য হতো কীভাবে? হলাহলপূর্ণ, বিষয়বিষে জর্জর জীবনে অমৃত তো একমাত্র তাঁর বাণী এবং সে-বাণীর অনুসরণ। তপ্তজীবনকে শীতল করার এমন মহৌষধ আর কোথায়? প্রশ্ন জাগে, যদি স্বামীজী না আসতেন, তবে ঠাকুরকে জগৎ জানত কীভাবে? যদি মা না আসতেন তবে ঠাকুরের দর্শন পূর্ণতা পেত কীভাবে? আচ্ছা, যদি ঠাকুর নিজে না আসতেন? দূর, তা কি হয় নাকি! এ কি ভাবা যায়! সত্যি, হাসিও পায়। এগুলি তো অবিশ্বাসীদের মতো কথা। আমরা ভাববই বা কেন, কিভাবে ভাবতে পারি যে ঠাকুর আসবেন না! আমাদের জন্য তিনি তো 'কুটো বাঁধা' হয়ে আছেন সেই কবে থেকেই। তাঁকে তো আসতে হবেই। মা, স্বামীজী—এঁরাও আসবেনই, এসবই যে কবে থেকে স্থির হয়ে আছে! আবার এলেন যখন তখন যেতেও তো হবেই। সবই যে নিয়মে বাঁধা! কিন্তু এই যাওয়া তো যাওয়া নয়, এ তো আরেক রকমের স্থিতিই। অন্যতর অবস্থানই এই আপাতশূন্যতা। 'চলে গেছেন'—একথা বলে তাঁকে বাদ দেওয়ার তো জো নেই। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে যে থাকে পূর্ণই। এমন এক আপাত আজগুবি হ-য-ব-র-ল মার্কা অঙ্কের উত্তরের মতো। কাজেই তিনিও আছেন।

মা তো এতক্ষণ ছেলেকে আদর করছিল, এমনকি স্তন দিচ্ছিল পর্যন্ত। ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে রেখে পাশের ঘরে গেছেন রান্নার কাজে। ছেলে জেগে উঠে 'মা মা' ডেকে কাঁদছে। মা রান্নাঘর থেকেই সাড়া দিচ্ছেন। কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে মধু। আশ্বাসের অমৃত। ছেলে শান্ত হলো।

তবে কোন কোন ছেলে এই শুধু কথায় ভোলে না—তার চোখের সামনে মাকে দেখা চাই, মা-ও বেরিয়ে আসেন রান্নাঘর থেকে। ঠাকুর এখন সেই রান্নাঘরের মায়ের মতো সাড়া দিচ্ছেন। সাড়া দিচ্ছেন ঐ 'কথামৃত'-এর মাধ্যমে। তেমনভাবে আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে পারলে হাসিমুখে আজও এসে দাঁড়াবেন 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠা ফুঁড়ে।

'কথামৃত' ধর্মগ্রন্থ—যাকে বলি শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্র বললেই যে এক গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিময় বিশাল একটা কিছুর কথা মনে আসে—এ শাস্ত্র তো তেমন নয়। এ শাস্ত্র ভয়ে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে না, আদর করে কাছে টানে, সম্ভ্রম জাগায় না শুধু—ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। এক অদ্ভুত সারল্য ছেয়ে আছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠার অক্ষরে অক্ষরে। এই সারল্য কিন্তু বোধবুদ্ধিহীন, ন্যায়যুক্তিহীন, কার্যকারণ সম্পর্কহীন, স্থানকালপাত্রের পারম্পর্যহীন, বোকামি-ভরা সারল্য নয়। এর সারল্য 'মহতো মহীয়ান'। অতলান্ত গভীর সমুদ্রের যেমন একটা স্বাভাবিক সারল্য আছে, সীমাহীন আকাশের, গগনছোঁয়া হিমালয়ের যেমন প্রকাণ্ড বিশালতার মধ্যেও একটা অনাবিল অদ্ভুত সারল্য আছে, 'কথামৃত'-এর মধ্যেও সেই গভীর সারল্য—যা শুধু প্রণামেই মাথাকে নুইয়ে দেয় না, বন্ধু বলে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেও উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে আর আছে এক আশ্চর্য স্নেহ-মমতায় ভরা এর পাতার পর পাতা। অনন্ত আশ্বাস! এই গ্রন্থের আসল বৈশিষ্ট্যটুকু এখানেই। বেদ-উপনিষদ্ যেন দামি নকশাদার জামিয়ার কাশ্মীরি শাল, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গায়ে দেওয়ার জন্য তুলে রাখা। 'কথামৃত' যেন মা-ঠাকুমার হাতে তৈরি নকশিকাঁথা, যেকোন আবহাওয়াতেই ব্যবহার করা চলে। বেদ-উপনিষদ্ যেন আইনস্টাইনের কঠিন আবিষ্কার, কোয়ান্টাম থিয়োরি, মহাকাশ বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব আর 'কথামৃত' যেন রামপ্রসাদের গান, রূপকথার ছন্দে মোড়া

ছড়া-কবিতা-গল্প। এর সাবধানবাণীগুলিও যেন মায়ের মমতাভরা বকুনি। 'কথামৃত'-এর এই নকশিকাঁথা আবার ঐসব প্রাচীন মহৎ শাস্ত্র-দর্শন ছুট, কেন্দ্রচ্যুত কোন কিম্ভুত-নিরালম্ব বস্তুও কিন্তু নয়। কাঁথার নকশা তুলতে যে-সুতো ব্যবহার করা হয়, সে কি শুধু নামী দোকান থেকে কিনে আনা সুতো? একরকমের সুতো, নাকি একরঙের সুতো? একটিমাত্র শাড়ির পাড়ের সুতো নাকি, এক জায়গা থেকে সংগ্রহ করা সুতো? এতে আছে মা জীবনে প্রথম যে ডুরে শাড়িটি পরেছিলেন, পিসিমার ফুলশয্যার তত্ত্বের গাঢ় বেগুনি রঙের যে-শাড়ি রেঙ্গুন থেকে এসেছিল, দিদির স্কুলের শাড়ির সবুজ পাড়ের সুতো—কতরকমের উৎস, কত সংগ্রহ, কত রঙ। শাড়িগুলি নেই, কিন্তু পাড় জমিয়ে তা থেকে সুতো নিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে নকশার পর নকশা। দেশ-কাল-অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-আগত-অনাগত সব ফুটে উঠেছে এর পরতে পরতে। অনাদি অনন্ত আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, লৌকিক ভুবনের পাখি-পশু-ফুল-ফল-গাছ-মাছ-পাহাড়-নদী-মেয়ে-পুরুষ-রাক্ষস-খোক্কস-দেব-দেবী-ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি; আবার ইংরেজ কোম্পানির নিশেন, সাহেব-মেম-সার্কাস-চিড়িয়াখানা-রেলগাড়ি-বেলুন-ফুটবল—সব এসে মিশেছে উপমার পর উপমার সূঁচের ফোঁড়ে। 'কথামৃত'-এর নকশি শরীরের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে দেশ-কাল-সমাজের নানা ছবি। এর তুলনা কোথায়!

আর কথা দিয়ে এই ছবি আঁকার রীতি? পিকাসোর জ্যামিতিক কূটচাল বা দ্য ভিঞ্চির রঙের রহস্য নয়—কালিঘাটের পটের উদাসী তুলির টান, বাংলার গোবরনিকানো উঠানের আলপনা, অসমের সত্রের পুঁথির মলাটের চিত্র, ওড়িশার কাপড়ে আঁকা ছবির অলঙ্করণের নানা সহজিয়া ধারার এক রীতিহীন রীতিতে এর নকশা বোনা হয়েছে। ঠাকুর তো ছবিও আঁকতেন। পৃথিবীতে যত বড় বড় আর্টগ্যালারি ভরা ছবি রয়েছে, সেখানে কি কেউ 'আতাগাছে তোতাপাখি'র মতো নিতান্ত ছেলেভুলানো ছড়ার চিত্ররূপ এঁকেছেন? দক্ষিণেশ্বরের ঘরের দেওয়ালে ঠাকুর তাই এঁকেছিলেন। আবার সে-আঁকায় মোটিফের ব্যবহার বা প্যাটার্ণও দেখবার মতো। উপাদান ছিল তুচ্ছ কাঠকয়লা। 'কথামৃত'-এ যে কথার তুলি দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে, সেখানেও সেই সহজ শিল্পীর গভীর সাধনার সারল্যভরা ভাষায় বোনা 'কথামৃত'-এর লোকায়ত শরীর—তার কি কোন তুলনা হয়?

ধর্মশাস্ত্রে তো ভগবানকে পাওয়ার পথ-পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। 'কথামৃত'ও গ্রন্থ। ঠাকুর বলেন: "গ্রন্থই গ্রন্থি।" তাও না হয় শিরোধার্য, গ্রন্থিই সই। গ্রন্থি মানে তো গিঁট-বাঁধন। ঠিক আছে, 'কথামৃত'-এর মাধ্যমে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের গিঁট বাঁধে তো ক্ষতি কি? তবে এখানেও আমাদের মতুয়ার বুদ্ধি টেঁকে না। ঠাকুর বলবেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কোন বাইরের বন্ধনের গিঁট বাঁধতে হয় না—এ-বাঁধন তো লেগেই রয়েছে। মাকে ভালবাসার জন্য কি মায়ের আঁচলের সঙ্গে ছেলেকে গিঁট বেঁধে ঘুরতে হয় রে! তবে, এই গ্রন্থ পড়ে কি হবে ভগবানকে যদি জানা না গেল? ভগবানময় যার অস্তিত্ব, যাঁর ঈশ্বরীয় কথা বৈ আর কোন কথা নেই, গড়ের মাঠে সাহেব ছোঁড়া দেখেও যার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়—তিনি বলছেন, ভগবানকে জানার দরকারই বা কি? ভক্তি হলেই হলো। "কত বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত/ খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে"—আর ইনি এসেছেন দুপাতা গ্রন্থ পড়ে ভগবানকে জানতে। জানতে চাও ক্ষতি নেই, কিন্তু জানাতে যেও না। ও বাব্বা! এ আবার বলে কি? জানতে তেমন সুখ কৈ, মানুষকে জানাতে যত সুখ। 'কথামৃত'-এ শুধুই অমৃত? জলবিছুটির মতো বাক্যবাণও জায়গামতো তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। বলছেন, তোমাদের ঐ এক লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া, নিজেকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। চাপরাশের কথা বলছেন, বলছেন কেশব সেনের মতো লোককে। মানুষকে শেখাতে যেও না, নিজেকে শেখানোই আসল সাধনা। লেকচার দিয়ে কি শেখানো যায়? বলছেন: "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" কিন্তু আমাদের ভাব তো হলো: "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শেখাই"—শিখি কৈ? শিখতে চাই কোথায়? আবার যখন শিখতে চাই, সেও শুধু নিজের স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' নয়, কত কৌশল করে শিখে নেওয়া যায় অন্যের সাধনার ফল।

সারাটা জীবন জুড়ে শেখার তোড়জোড়—শেখানোর তোড়জোড়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, পাহাড়ের মতো বইয়ের বোঝা, ইউনিফর্ম, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট। কত আয়োজন, কত উপাদান! শিক্ষা মানেই হলো কত বেশি পয়সার চাকরি, লাইন নিয়ে পড়া, লাইনটাই হলো অন্যকে লাইনচ্যুত করে নিজের লাইনের গতি বাড়ানো। এক প্রচণ্ড গতিতে শুধু ছুটে চলা, মা-বাবা-মাস্টার-দিদিমণি-ইউনিট টেস্ট-উইকলি টেস্ট-জয়েন্ট-ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং—সব মিলিয়ে হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। আর ঠাকুর কিনা যুগের গতির উলটোদিকে গিয়ে বলছেন: "গ্রন্থই গ্রন্থি।" তবে, কাকে বলছেন, কি প্রসঙ্গে বলছেন সেটাও দেখতে হবে বৈকি! আবার এদিকে সকল গৃহী ভক্তকেই কিন্তু বলছেন, ছেলেদের পড়ানোর সুব্যবস্থা করতে। নিজে যেচে কোন কোন ভক্তের চাকরির উমেদারি করছেন—মায় ভক্তশ্রেষ্ঠ নরেনের পর্যন্ত। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যারা ঐ শিক্ষাকেই একমাত্র সার বলে, সব জানা হয়ে গেছে ভাবে, এর বাইরেও যে জগতে কিছু শেখার থাকতে পারে—সেকথা মানে না বা ভুলে যায়,

তাদের প্রতি ঠাকুর ঐ জলবিছুটির ঝাপটা দিয়েছেন। বলছেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান। আর সবই অজ্ঞান। এই ঈশ্বর যেকোন শিক্ষণীয় বিষয়েরই পরম এবং চরম লক্ষ্য হতে পারে। সেই চরমতমকে জানার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ঠাকুর ঐ যে কৌশল করে শেখার কথা বলেছিলেন ঃ "একজন আমায় বলল, মশায় সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন?"

বি. এ., এম. এ. পাশের মতো সমাধিরও কোর্স করতে চাই আমরা। "বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি"—রসুনের বাটির গন্ধ যাবে কোথায়? সব হলো, এবার একটু সমাধি হোক। পিঁপড়ে একদানা চিনি নিয়ে ভাবছে, কাল এসে সমস্ত চিনির পাহাড়টা নিয়ে যাবে!

লেকচার দেওয়া নিয়ে শ্রীমকে, কেশব সেনকে ঠাকুর মৃদু বকুনি দিচ্ছেন, আবার কেশবের অসুখে মায়ের কাছে ডাব-চিনি মানত করছেন। দুনিয়ায় এত সব ভাল ভাল জিনিস থাকতে 'ডাব-চিনি'! অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার না, কোবরেজ না, কোথাকার কি এক 'ডাব-চিনি'! সত্যি, এত অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন মন্তব্যও ঠাকুর করতে পারেন! আর ঐসব বাঘা বাঘা লোক—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, কেশব সেন—এই উত্তরাধিকারে ব্রাহ্মদের উত্থান, যুক্তিবাদের খড়্গ যাঁদের হাতে জ্বলজ্বল করছে, ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-কাণ্ট-মিল-হেগেলের দর্শন যাঁরা গুলে খেয়েছেন, যাঁদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত মেমেরা সেলাই শেখায়, ইংরেজি পড়ায়—তেমন মানুষের জন্য 'ডাব-চিনি'! ঈশ্বরের বয়ে গেছে ঐ ডাব-চিনির লোভে কেশবের অসুখ ভাল করতে। কিন্তু কি অনন্য সারল্য—এই সরলতার জোরে, এই মানতের পিছনে বিশ্বাসের টানের যে অপ্রতিরোধ্য জোর—এর তুলনা কোথায়? ঠাকুর কি জানতেন না বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা, ওষুধপত্রের নব নব সম্ভাবনার কথা? জানতেন না মানে—একেবারে 'গেজেট'! বলছেন, ওষুধে যদি কাজ না হবে, তবে আফিমে কেন বাহ্য বন্ধ হয়? ডি. গুপ্তের পেটেন্ট ওষুধের কথা বলছেন। হাত ভাঙলে 'বাড়' বাঁধছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই যে সব—সে-কথাতেই সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে আছেন। তাই যাদুবিদ্যা, সিদ্ধাই দিয়ে কেশবকে সারাতে যাননি। ঐ বিশ্বাসের 'ডাব-চিনি' পর্যন্তই।

'কথামৃত' কি শুধু ধর্মকথা? বটেই তো ধর্মকথা। তবে এতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ফেরার দুর্লভ ইঙ্গিতগুলি সব এসে মিশেছে। রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা-বিজ্ঞান-লোকব্যবহার-ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সঙ্গীত—সবকিছুর পালা পরিবর্তনের যুগান্তকারী ইশারাগুলি এতে বাণীরূপে বিধৃত হয়ে আছে। 'কথামৃত'-এর পাতা ছেড়ে এ-বাণী তাই অনন্তে ধাবমান—গগনে গগনে লোকে লোকে তার গতি। পৃথিবীতে যাকিছু ব্যক্ত সেসবই তো সেই পরমের বক্তব্যবাহী, বাণীময় রূপ। গ্রহ-চন্দ্র-নক্ষত্র-সূর্য—এসবই তাঁর এক একটি বাণী। সেই মূর্তিময়ী বাণী জগৎকে কত কি শেখাচ্ছে, সে-বাণীর ধারা কোন্ সুদূর হতে এসে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হচ্ছে! মহাজাগতিক সেই ধ্রুবপদকে জীবনে মিলিয়ে নেওয়ার সাধনাই 'কথামৃত'-এর সাধনা। জীবনে জীবন যোগ না হলে সেসমস্তই কৃত্রিম পসরার মতো ব্যর্থ হয়ে যায়। বিশালতাই কি জীবনের সব? তা তো নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর বাণী বহন করে আনে। তবে তাঁর বাণীর শ্রেষ্ঠ মূল্য এই যে, ভক্তহৃদয়ে শান্তিধারা সিঞ্চনে এর জুড়ি নেই। এক প্রবল আশাবাদের কথায় ভরে আছে 'কথামৃত'-এর অক্ষরমালা। যত পড়ি, যত শুনি—বোধিত হই, প্রাণিত হই। ক্ষুদ্রতার আবরণ সাময়িক হলেও খসে পড়ে। তবে কখনো এমনও তো ভাবি—"তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।" সম্বিৎ ফিরলে বুঝি, এভাবনাও কত নিরর্থক। তাঁর বাণীই তো প্রাণে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে শান্তির, আনন্দের, নির্ভরের। তাঁর বাণী আর তিনি কি পৃথক? তাঁর বাণী তো শুধু 'শ্রবণমঙ্গলং' নয়, তা তো তপ্ত জীবনকে স্নিগ্ধ করে, আশ্বাস দেয়, পরম নির্ভরতা দেয়—কাজেইবাণীরূপেই তুমি এস, শব্দের পথ ধরেই বাক্যমনাতীত-এর কাছে নিয়ে যাও আমাদের। কথার অমৃতে ভরে দাও আমাদের নীলকণ্ঠ জীবন। "বাণী-রূপে এস, তবু এস—ফিরিয়া যেও না, যেও না প্রভু।" ❑

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ শ্রাবণ ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা) আষাঢ় পূর্ণিমা ৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই ২০০৫) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ১৭ শ্রাবণ, মঙ্গলবার (২ আগস্ট ২০০৫)
একাদশী-তিথি	ঃ	২, ১৫, ৩১ শ্রাবণ সোমবার, রবিবার, মঙ্গলবার (১৮, ৩১ জুলাই, ১৬ আগস্ট ২০০৫)

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার প্রসারে নিবেদিতার পাশে ভগিনী ক্রিস্টিন

গোপেন্দ্রনাথ চৌধুরী*

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিস্টিন গ্রিন স্টাইডেল। মাত্র তিন বছর বয়সে পিতার সঙ্গে স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি ডেট্রয়েটে চলে আসেন। তাঁর পিতা ছিলেন খুবই সৎ এবং উদারপন্থী এক দরিদ্র জার্মান পণ্ডিত। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ক্রিস্টিন পিতৃহারা হন। অতএব পারিবারিক বিপর্যয়ে মা ও ছোট পাঁচটি বোনের দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। ফলে কঠিন বাস্তবে দারিদ্র্যের মুখোমুখি ঐ কৈশোর জীবনে সাংসারিক দায় তাঁর কাছে শিক্ষামূলক হয়ে উঠল। ভাগ্যক্রমে ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে কর্মজীবন শুরু হওয়ার সুবাদে তাঁর জীবনে সুস্থ চিন্তার সুযোগ পেলেন তিনি। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি গতানুগতিক একঘেয়ে পথের বাইরে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাঁর সেই অন্বেষণী দৃষ্টিতেই ধরা পড়ল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ নামক পরশমণিটি। প্রিয় বান্ধবী ফ্রাঙ্কির সৌজন্যে সেদিন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বক্তৃতার আসরে। সেদিনের অনুভূতি তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "আমরা মিনিট পাঁচেক শুনতে না শুনতেই বুঝতে পেরেছিলাম এতদিন ধরে যে-পরশমণিটি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটি পেয়ে যাচ্ছি।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভারতীয় শাশ্বত দর্শনের তথা পৃথিবীর মুক্তির ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে ক্রিস্টিনের জীবনতরী এক নতুন দিকে মোড় নিল। ক্রিস্টিনের স্মৃতিচারণেঃ "ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে স্বামীজী শ্রোতাদের বললেন, তারা সিংহ কিন্তু জন্মেছে মেষশাবকদের সাথে। তাই তারা নিজেদের মেষ মনে করছে। যেন সোনার খনির ওপরে বসবাসকারী মানুষ—যারা নিজেদের ভাবে দরিদ্র।" মাত্র কয়েকটা দিনের বক্তৃতা ক্রিস্টিন ও ফ্রাঙ্কিকে আকর্ষণ করে স্বামীজীর পিছু নিতে বাধ্য করল। মাঝে বেশ কিছুদিন বিরতির পর ক্রিস্টিন ও ফ্রাঙ্কি সংবাদ পেলেন, স্বামীজী তাঁর একদল শিক্ষার্থী নিয়ে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে ব্যস্ত। শোনামাত্র অধ্যাত্ম-পিপাসু দুটি প্রাণ দৌড়ালেন ভীষণ কষ্টদায়ক পথ অতিক্রম করে সেই মানুষটির কাছে। স্বামীজীও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করলেন। এখানে অলৌকিকভাবে ঐ অল্প পরিচয়েই তাঁরা স্বামীজীর কাছে দীক্ষা পেলেন। শুরু হলো গুরু-নির্দেশিত পথে চলা। স্বামীজীরও সেদিন চিনে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি তাঁকে। ঐ কর্মযোগী হৃদয়টি ভগিনী নিবেদিতার মতোই পরবর্তী কালে ভারতীয় শিক্ষার প্রসারে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

আজ ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে-দুই বিদেশিনীর নাম আমাদের সামনে ঘুরেফিরে আসে, সে-দুটি হলো ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিন। এই দুজনের মধ্যে 'নিবেদিতা' নামটি আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, 'ক্রিস্টিন' নামটি ততটা নয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে ভগিনী ক্রিস্টিন সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেনঃ "ক্রিস্টিনকে দেখার আগে পর্যন্ত আমি কখনো জানতে পারিনি আমার জীবন কতটা অসম্পূর্ণ। স্বামীজী আমার জন্য যতকিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি সেগুলিকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তিনি নিজে যেন মূর্তিময়ী 'বিস্ময়'। তাঁর সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় পড়াশুনা, কাজ ও দেখাসাক্ষাতে। কিছুমাত্র হৈহুল্লোড় না করে, কাজের জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তিনি এখানে বাস করেন। তিনি আদর্শ পাশ্চাত্য রমণী।"

ছোট একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলরূপে যে-বিদ্যালয়টির সূচনা করে নিবেদিতা ভারতীয় তথা বাংলার নারীশিক্ষার প্রদীপটি একদিন জ্বালিয়েছিলেন, ক্রিস্টিন তার সলতে পাকানোর দায়িত্বে থেকে স্থিরভাবে এক অনির্বাণ শিখা প্রজ্বালিত করে গেছেন। অচিরেই সবরকম বালিকাদের উপস্থিতিতে ভরে গিয়েছিল বিদ্যালয়টি। ধীরে ধীরে দেখা গেল, সেই বিদ্যালয়ে আরো বেশি সংখ্যক বিবাহিত মহিলা ও বিধবা নিজেদের মনের মতো পরিবেশকেই খুঁজে পাচ্ছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীশিক্ষার দরজা খুলে দিয়ে তিনি ভারতীয় মহিলাদের পথের সন্ধান দেওয়া শুরু করলেন, যাতে তারা নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিজেরাই চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। মেয়েদের কোনরকম বিজাতীয় ধর্মে বা সামাজিক রীতিতে ভাবান্তরিত করার কোন প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না; বরং তিনি চেষ্টা করতেন তাদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে ভারতীয় আদর্শের সমন্বয়ে গড়ে তোলার। অর্থাৎ একজন প্রকৃত ভারতীয় নারীর যে-গুণগুলি থাকা উচিত, সেগুলিরই অনুসন্ধান করা।

নিবেদিতার বাঙলা বলতে অসুবিধা হতো, কারণ ভাষাটা খুব ভালভাবে রপ্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রিস্টিন খুব তাড়াতাড়ি

* *উত্তর কলকাতা-নিবাসী, চাকুরিজীবী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যানুরাগী।*

বাঙলাভাষা রপ্ত করেছিলেন। শুধু রপ্ত করেছিলেন বললে ভুল হবে, ভালভাবে বুঝতে এবং সাবলীলভাবে বলতে পারতেন। এই বিশেষ গুণের জন্য শ্রীমা সারদাদেবীও তাঁকে স্নেহ করতেন।

নিবেদিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কিছুদিনের জন্য ইংল্যাণ্ডে চলে যান। প্রায় দুবছর ছদ্মনামে কাটিয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফিরে তিনি পুলিশের চোখের আড়ালে কিছুদিন কাটান। সেইসময় তাঁর অনুপস্থিতিতে ভগিনী ক্রিস্টিন খুবই যোগ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়টি পরিচালনা ও পরিবর্ধন করেছিলেন। এই কাজে ঐসময় তিনি সুযোগ্য সহকারিণীরূপে পেয়েছিলেন ভগিনী সুধীরাদেবীকে, যিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে একজন সাধারণ শিক্ষিকারূপে এই বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা ফিরে এসে বিদ্যালয়ের অগ্রগতি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ছাত্রীরা স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শে নিজেদের অবিচল রেখেছে। তারা ছিল শিষ্যার মতো, আবার ছাত্রীও বটে। আমার বিদেশে থাকাকালে ক্রিস্টিন এসব সংগঠন করেছেন এবং রূপদান করেছেন।

ভগিনী দেবমাতা একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বিদ্যালয়টির প্রকৃত অধ্যক্ষা ছিলেন ক্রিস্টিন। সাহিত্যের কাজে নিবেদিতাকে এতই ব্যাপৃত থাকতে হতো যে, শিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করতে তিনি প্রায় সময়ই পেতেন না। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে একটি নতুন গ্রন্থ রচনায় তিনি সাহায্য করেছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিনের ছিল এক ব্যতিক্রমী নিঃস্বার্থ চরিত্র এবং সেবার এক বিরল মনোভাব।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার ক্রিস্টিনকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। ক্রিস্টিন তাঁর শিক্ষকতার পারিশ্রমিকে ডেট্রয়েটের দুঃখী মা আর ছোট ছোট পাঁচটি বোনের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।

বাল্যবিবাহের কারণে অসমাপ্ত পড়ুয়াদের, স্কুলছাড়াদের, কমবয়সী বধূদের শিক্ষার আওতায় না আনতে পারলে স্বামীজীর নির্দেশিত নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই অধরা থেকে যেত। ক্রিস্টিন স্বামীজীর দেহত্যাগের পর এবিষয়ে উদ্যোগী হলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর জগদ্ধাত্রীপূজার দিন গৃহবধূদের বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনকার রক্ষণশীল সমাজে গৃহবধূদের বাড়ির বাইরে আনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হলো। সেটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে উৎসাহীদের ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসবে, আবার স্কুল শেষে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এধরনের প্রয়াস ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য অভাবনীয় ছিল। এর মূলে ছিল নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের অক্লান্ত পরিশ্রম। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে তা রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিল। দেশ-বিদেশের পরিচিতদের কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যও আসতে শুরু করেছিল। সমসাময়িক গুণীজনদের তথা শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন প্রত্যক্ষ করে ক্রিস্টিন ভাবলেন, ঠিক পথেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন।

বিশেষ উৎসাহে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বোন লাবণ্যপ্রভা বসু পড়ুয়াদের হস্তাক্ষর ও পাঠের তালিম দিতেন। যোগীন-মা দিতেন ধর্মশিক্ষা, বেলুড় মঠ থেকে কখনো স্বামী বোধানন্দ, কখনো মায়ের বাড়ি থেকে স্বামী সারদানন্দ গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন।

ক্রিস্টিন সামগ্রিকভাবে সবকিছু দেখাশোনা করতেন এবং তার সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন সেলাই ও সূচিকর্ম শেখাতেন। তখনকার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করার এই পরিকল্পনা ভগিনী ক্রিস্টিনের স্বপ্ন ছিল। তাই এই দায়িত্বে তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেও সময় করে ভারতীয় দর্জিদের কাছে সেলাই, কাপড়ের মাপজোক, কাটিং ইত্যাদি শেখেন। নিবেদিতা এক চিঠিতে লিখেছেন, স্কুলে সাপ্তাহিক দুদিনের সেলাই ক্লাসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে ক্রিস্টিনকে ছাত্রীদের তিনগুণ পরিশ্রম করতে হতো। এই সেলাইয়ের ক্লাসকে শিক্ষামূলক করার জন্য, যথাসাধ্য বৈচিত্র্য আনার জন্য নানারকম চেষ্টা করতেন। দুটি মানচিত্র ছিল তাঁর। একটি ভারতের, অন্যটি পৃথিবীর। তার সাহায্যে ক্রিস্টিন তাঁর শিক্ষার্থিনীদের ইতিহাস, ভূগোল সম্পর্কে ছোট ছোট ধারণা দিতেন। মরুভূমি, সমুদ্র, দ্বীপ এবং পর্বতমালার অবস্থান চেনাতেন। ভারতীয় তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা দিতেন। দেশি-বিদেশি নানা বিষয়ে ইতিহাসের কাহিনীও বলতেন। কখনো বৌদ্ধযুগ, কখনো নীলনদ, কখনো বা হজরত মহম্মদ। ক্রিস্টিনকে মধ্যমণি করে ছাত্রীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং বিবিধ বিদ্যাচর্চায় বিদ্যালয়টি এক মণিমালায় পরিণত হয়েছিল। বাগবাজার এলাকার তথা উত্তর কলকাতার মেয়েদের মধ্যে উদ্দীপনার প্রবল ঢেউ এমনভাবে আছড়ে পড়তে লাগল যে, বাড়ির মেয়েরা তাড়াতাড়ি গৃহস্থালির কাজ শেষ করে ফেলতেন, পাছে বিদ্যালয়ে হাজির হতে দেরি হয়ে যায়! নিয়মিত নতুন নতুন মুখ স্রোতের মতো আসতে লাগল। তাদের বসার জায়গার অভাবে ১৭ নং বোসপাড়া লেনের সংলগ্ন ১৬ নং বাড়িটিও ভাড়া নেওয়া হলো। এইসময় তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন এইসমস্ত বয়স্ক পড়ুয়াদের দলকে সামলাতে—তাদের বিভিন্ন শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও আলাদা আলাদাভাবে সময় দিতেন এবং সুপরামর্শ দিয়ে ক্রিস্টিন তাদের উপযুক্ত অভিভাবকের আসনটি গ্রহণ করতেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থিনী পারিবারিক উপদেষ্টা হিসাবেও ক্রিস্টিনকে পেতে চাইত। ক্রিস্টিন তাদের নতুন নতুন উৎসাহে সমস্যাগুলি শুনে বোঝার চেষ্টা করতেন এবং সমাধানের পথ

খুঁজতেন। তাঁর বিশ্রামের অবসর থাকত না। এর জন্য কোন আক্ষেপ বা কষ্ট হতো না।

নিবেদিতা যখন বিদ্যালয়টির অর্থসঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদের দুয়ারে দুয়ারে ছুটছেন এবং প্রয়োজনে বইলেখার কাজে তৎপর বা বিদেশে পর্যন্ত দৌড়াচ্ছেন, তখন ক্রিস্টিনের মতো এক বলিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও অর্থসংগ্রহের জন্য সফল সংগঠক স্কুলের হাল ধরায় তিনি ঐসকল দিকে মন দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দায়িত্ব ক্রিস্টিনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি মনঃসংযোগ করেছিলেন বিভিন্ন লেখালেখি ও বক্তৃতায়। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ সমস্তই খরচ হতো স্কুলের কাজে। নিবেদিতার ওপর আরেকটি মহান ব্রত ঐসময় বিশেষভাবে আরোপিত হয়েছিল, সেটি হলো স্বাধীনতা। ভারতমাতাকে তিনি নিজের মায়ের থেকেও বেশি শ্রদ্ধা করতেন বললে ভুল হবে না, তাঁর পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করতে না পারাটা তাঁর কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল এবং গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে পৌঁছে তাঁর জ্বালাময়ী ব্রিটিশবিরোধী ভাষণ যুবসমাজ তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কেবল উদ্বুদ্ধ করেনি, দেশের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

তখনকার রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বেড়া নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের মতো বিদেশিনী দুই মহিলার করাঘাতে ভেঙে গিয়েছিল। এ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। তৎকালীন বাংলার পরিচিত ব্যক্তিরা থেমে থাকেননি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাকে রূপদানে সাহায্য করতে। নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনদের দৈনন্দিন আচরণে দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, স্থানীয় সংস্কৃতিগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া, ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস না করা, অপরিচ্ছন্ন বস্তির সরল সহজ শিশু-নারীপুরুষদের সাবলীল ও আন্তরিকভাবে আপন করে নেওয়ার প্রবণতা এদেশীয় মানুষদের কাছে তাঁদের আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সাবেকি তথা গোঁড়া অভিভাবকদের এবং সমাজের অন্যান্যদের মনে আরো ভরসা জুগিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ, ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ নীলরতন সরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষদের বাগবাজারে ১৭ নং বাড়িতে আসা-যাওয়ার উৎসাহ দেখে। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই আজকের বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ নারীপ্রগতির এই উৎস-সন্ধানীদের শ্রদ্ধা জানায়। নারীশিক্ষায় অগ্রণীদের মধ্যে সিস্টার ক্রিস্টিনও আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন যুগ যুগ ধরে। যদিও ১৩ অক্টোবর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতার অকালপ্রয়াণের আগে তাঁর তৈরি উইলে বোসপাড়া স্কুলের পুরোপুরি দায়িত্ব ক্রিস্টিনের ওপর ছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে তিনি যখন বেশ কিছুদিন স্কুলের বাইরে অর্থাৎ আমেরিকাতে ছিলেন, তখন সে-দায়িত্ব ভগিনী সুধীরাদেবী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। এব্যাপারে তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা। বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন ক্রিস্টিনের শেষজীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং বিশ্বাস থাকলে ডেট্রয়েটের মতো শহরেও যে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করা যায়, ক্রিস্টিন তা দেখিয়েছেন। ডেট্রয়েটে ভারতীয় ইতিহাস, কৃষ্টি ও বেদান্তদর্শনের ওপর উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ক্লাস নিতেন। তাই নিবেদিতা যেমন একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীস্বরূপা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে ভগিনী ক্রিস্টিন ছিলেন নিবেদিতার অনুপূরক। ❑

• **সহায়ক গ্রন্থ ঃ** The letters of Sister Nivedita—Shankariprasad Basu, Vol. I, II.

এক মূল্যবান বক্তৃতামালা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

Sri Ramakrishna's Religion • *Written by* : ***R. K. Dasgupta*** • *Published by* : ***Swami Prabhananda, Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata-700 029*** • *Price* : ***Rs. 40*** • *Pages* : ***14+130*** • *First Published* : ***March 2001***

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষায়নের আধুনিক জোয়ারে যথার্থ পণ্ডিত মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সেই বিরল বৈদগ্ধ্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কলকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই দুই পীঠস্থানে তাঁর ছাত্রাবস্থা কেটেছে। কর্মজীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি রেখেছেন তাঁর গভীর প্রজ্ঞার সাক্ষ্য : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান, জাতীয় গ্রন্থাগারের মহানির্দেশক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের ভারততত্ত্ব চর্চা বিষয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক'। লিখেছেন 'Swami Vivekananda on Indian Philosophy and Literature' এবং 'Swami Vivekananda's Vedantic Socialism'-এর মতো সমাদৃত আলোচনাগ্রন্থ।

আমরা সৌভাগ্যবান, বার্ধক্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি এখনো নতুনতর মননশীল চিন্তায় আমাদের সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তারই এক ফসল আলোচ্য **'Sri Ramakrishna's Religion'** গ্রন্থটি —ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত ধারাবাহিক ১২টি ভাষণের এক শোভন সঙ্কলন। স্বভাবতই গ্রন্থটি ১২টি প্রায় সমদৈর্ঘ্যের পরিচ্ছেদে বিভক্ত। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর সংক্ষিপ্ত সারবান ভূমিকায় প্রথমেই আলোচনার মূল সুরটুকু ধরিয়ে দিয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ধর্মচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য : এক—ধর্মসাধনে ভারতীয় সনাতন পথকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন; দুই—কোন 'মতুয়ার বুদ্ধি'র দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মমতকে তিনি সত্য বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন; এবং তিন—মূর্খ, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষকে তিনি দয়া নয়, দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে বলেছেন।

মহারাজের এই বক্তব্যের সূত্র খেয়ালে রাখলে অধ্যাপক দাশগুপ্তের দ্বিতীয় ভাষণ 'The Reconciliation of Opposites'-এ বুঝতে আরো সুবিধা হয়। বাস্তবিক এই দ্বিতীয় ভাষণটিতেই বক্তার মৌলিক চিন্তার ছাপ সবচেয়ে স্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির পূজা করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে মায়ের চরণে নিবেদনের পুষ্প নিজের মাথায় স্থাপন করতেন—পূজিতার সঙ্গে নিজেকে অভেদ কল্পনা করতেন। অর্থাৎ দ্বৈতবাদীর মতো পৌত্তলিক সাধনা করতে করতে কেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদ্বৈত ভাবনার সর্বোচ্চ স্তরে তিনি পৌঁছে যেতেন! শ্রীদাশগুপ্ত বিস্তারিত আলোচনায় দেখিয়েছেন : "Ramakrishna believes in this co-existence of Advaita and Dvaita in man's religious life." শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এমন দ্বৈত-অদ্বৈতের বিভেদরেখা মুছে যাওয়া সাধনার শিকড় যে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত ছিল, সেকথা এই পরিচ্ছেদে খুব স্পষ্টভাবে আলোচিত। অবাক লাগে প্রাচীন শাক্ত কবি কমলাকান্তের গানেও এই ধারণার প্রকাশ দেখে—

> "মা কখনো শ্বেত, কখনো পীত,
> কখনো নীল লোহিত রে,
> কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি,
> কখনো শূন্যরূপা রে।"

এর পরের আটটি পরিচ্ছেদে 'Ideas Old and New', 'The Nature of God', 'The Path of Devotion' ইত্যাদি শিরোনামে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং শেষ দুটি পরিচ্ছেদ 'The Response of Max Muller' এবং 'The Western Response'-এ পাশ্চাত্যের চোখে এই বিষয়ের মূল্যায়ন আলোচিত। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মচেতনা সম্পর্কে এক সামগ্রিক ধারণা শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর এই ১২টি ভাষণে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থনাম হিসাবেও 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা' কথাটিই বেশি যথাযথ হতো।

বক্তা নিজেও বোধহয় এই 'Sri Ramakrishna's Religion' শিরোনামটি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত বা দ্বিধাগ্রস্ত। তাই 'Introduction' শীর্ষক প্রথম বক্তৃতার প্রায় পুরোটাই এই নামের পক্ষে যুক্তি সাজাতে খরচ হয়ে গেছে। 'The Philosophical Framework' শীর্ষক চতুর্থ বক্তৃতায় তাঁকে পুনরায় এই বিষয়টির অবতারণা করতে হয়েছে। (p. 35)

শ্রীরামকৃষ্ণ কি সত্যিই কোন নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন? ধর্মীয় নেতা থেকে সমাজবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ থেকে সাধারণ ভক্ত—সর্বস্তরের মানুষই বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতো পণ্ডিতপ্রবরের কাছে এই নানা মতামতের মূল্যায়নমূলক এক বিস্তৃত আলোচনা অভিপ্রেত ছিল। গ্রন্থ-নামও এমন এক আলোচনাই দাবি করে। কিন্তু তিনি সে-পথ এড়িয়ে গিয়েছেন। প্রথম ও চতুর্থ বক্তৃতায় নানা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, পুস্তকের পশ্চাৎ প্রচ্ছদে গ্রন্থ-পরিচিতি হিসাবে সেকথাই উল্লিখিত : "The subject, 'Sri Ramakrishna's Religion', is an expression which the author uses not to mean any new religion but a new outlook on religion as embodied in Sri Ramakrishna's life."

প্রকাশককে ধন্যবাদ এমন মূল্যবান এক বক্তৃতামালাকে স্থায়িভাবে ধরে রাখার এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। নির্ভুল, দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে। একটিই অনুযোগ, গ্রন্থটিতে কোথাও বক্তৃতাদানের সন-তারিখের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ❑

পাঁচের চালচিত্রে সুভাষিত নেতাজী-চরিত

সুমন সেনগুপ্ত

নেতাজী ও পাঁচের পাঁচালী ● লেখক : কানাইলাল বসু ● প্রকাশক : দেবকুমার বসু, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ● মূল্য : ৭৫ টাকা ● পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬+১১২ ● প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৩

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপনাময় কর্মজীবন, রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ, রণাঙ্গনে সঙ্কটাকীর্ণ ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সৈনিকব্রত গ্রহণ এবং দার্শনিক প্রজ্ঞা আজও আমাদের আপ্লুত করে তোলে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন শুরু। স্বদেশ ও স্বদেশবাসী এবং পরাভূত উপনিবেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তখন থেকেই তাঁর মনন ও জীবনচর্যাকে আন্দোলিত করে তোলে। এই উজ্জীবনী চিন্তার প্রকাশ ঘটে তাঁর অসংখ্য ভাষণ-প্রবন্ধ-চিঠিপত্রে। দেশত্যাগের বিপদসঙ্কুল সিদ্ধান্তে, ইউরোপের দেশে দেশে ও এশিয়ার ভূখণ্ডে জাপানের সাহায্য প্রার্থনায়, আই. এন. এ. বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদগ্রহণে এবং সর্বোপরি অসংখ্য মুক্তিসংগ্রামী ও সাহসিক বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে। সার্বিক সাফল্য সেদিন আসেনি, কিন্তু স্বদেশভূমিতে জাতীয় পতাকাকে সেদিন আমরা উদ্ভাসিত হতে দেখেছিলাম। সেদিনের এই আত্মত্যাগ ও সঙ্কল্পের নজির বিশ্বে বোধকরি আর নেই।

'নেতাজী ও পাঁচের পাঁচালী' গ্রন্থটি কবিতার আঙ্গিকে লেখা। লেখক কানাইলাল বসু কৈশোরেই নেতাজীর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাধীনতার যুদ্ধে। না, এই গ্রন্থটি নেতাজীকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা অথবা স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ নয়। নেতাজীর জীবনের কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা এবং তথ্যপূর্ণ গবেষণার ফসল লেখক তুলে ধরেছেন গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

পাঁচ সংখ্যাটি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম সবকিছুকেই যেন নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। যেমন, লেখক পাঁচ সংখ্যাটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা করেছেন ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, এমনকি শারীরবিজ্ঞানেরও। লেখকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে আমরা জানতে পারি 'পঞ্চভূত'-এর কথা—যা রসায়নের আদিকথা। কী আছে পঞ্চভূতে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। অর্থাৎ পাঁচের প্রোজ্জ্বল উপস্থিতি। আবার এসেছে পঞ্চেন্দ্রিয় (শারীরবিজ্ঞানের আলোচনায়), পঞ্চশস্য (হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনায়)। পাঁচের এই ভুবনজড়ানো পাতা ফাঁদে ধরা দিয়েছে বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সমাজ—কখনো লক্ষ্যে, কখনো বা অলক্ষ্যে।

এ হেন পাঁচ সংখ্যা যে নেতাজীর কর্মময় জীবনকেও এক অলঙ্ঘনীয় ছন্দে বেঁধে ফেলেছে, লেখক অনুসন্ধিৎসু মনে তার সন্ধান করেছেন। নেতাজী-চরিতকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মূলত দুটি ভাগে—(১) নজিরবিহীন ব্যক্তিত্ব এবং (২) বসু হলেন নেতাজী।

চমৎকৃত হতে হয় দুটি বিভাগের আলোচনাতেই। নজিরবিহীন ব্যক্তিত্বের উৎসসন্ধানে লেখক বিষয় নির্বাচনে উৎকৃষ্ট সৃজনীর ছাপ রেখেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার, গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এখানেই পরিস্ফুটিত হয়েছে। পাঁচের আনাগোনা নেতাজীর জীবনেও যে কতখানি সাবলীল ছিল তার পরিচয় মেলে এই আলোচনার সূত্র ধরেই।

কেন সুভাষচন্দ্র নজিরবিহীন ব্যক্তিত্ব? কারণ, পাঁচটি ঘটনাকে লেখক তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে—

(ক) একক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা (আই. এন. এ. সরকার), (২) ডুবোজাহাজে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা, (৩) নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে তিন-তিনটি কমিশন গঠন, (৪) দেশসেনানীদের কাছে তাঁর উদাত্ত আহ্বান এবং (৫) আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠাদিবসে নিজের প্রাণসংশয় জেনেও কুচকাওয়াজে অভিবাদন নেওয়ার ঘটনা।

এই পাঁচটি ঘটনা লেখকের মতে নেতাজীর অবিসংবাদী জননেতার মূর্তিটি উন্মোচিত করে তোলে।

'বসু হলেন নেতাজী' প্রসঙ্গে লেখক পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক-লেখক কানাইবাবুর মতে, যে পাঁচটি ঘটনার সূত্র ধরে সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব আসমুদ্রহিমাচলকে আন্দোলিত করে তুলেছিল তা হলো—

প্রথমত, দেশবাসীর কাছে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাভাবনাকে বিকশিত করতে এগিয়ে আসে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'। দ্বিতীয়ত, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ—এর ফলে তৈরি হয় 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার'। তৃতীয়ত, জাপানের স্বীকৃতি—আই. এন. এ. সরকারকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয় জাপান সরকার। চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে এসেছে দুই ব্যক্তিত্বের কথা, যাঁদের বাদ দিলে নেতাজী চরিতালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন রাসবিহারী বসু, অপরজন হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই দুই চরিত্রকে তাই যথোচিত সম্মানপূর্বক স্মরণ করেছেন লেখক।

এই ধরনের গ্রন্থের লেখকের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়ে, এটাই স্বাভাবিক। গ্রন্থটি সহজ, সরল বাঙলায় লেখা। আলঙ্কারিক শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য একেবারেই নেই। এক লহমায় গ্রন্থটি পড়লেই দেশনায়ক সুভাষের লড়াকু ও আপসহীন চরিত্রের ছোঁয়া পাঠক পেয়ে যাবেন—একথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায়। গ্রন্থটির মুদ্রণ উন্নত মানের, বাঁধাই ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ভাল। প্রচ্ছদের সবুজ রং যেন নেতাজীর চিরতারুণ্যের প্রতীকই বহন করে।❑

বিজ্ঞানচিন্তার নতুন দিক

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

চেতনার সন্ধানে বিজ্ঞান • লেখক : অরূপরতন ভট্টাচার্য • প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ • মূল্য : ৩০ টাকা • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮০ • প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৩

এই পৃথিবীর প্রাণিকুলে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক বেশি চিন্তা করার ক্ষমতাই তার এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এই চিন্তাশক্তিই জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের ও নানা দর্শনভাবনার। এসেছে অধ্যাত্মবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক। আপাতদৃষ্টিতে এরা পরস্পরবিরোধী মনে হলেও বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের যে তেমন বিরোধ নেই, সেটাই বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। এই প্রতিপাদ্যটিকে সামনে রেখে এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম'—এই অভেদাত্মক উপলব্ধিকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানমনস্ক অধ্যাত্মবিদদের হাতে **'চেতনার সন্ধানে বিজ্ঞান'** গ্রন্থটি তুলে দিয়েছেন লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞানলেখক হিসাবে অরূপরতনবাবু পাঠকসমাজে সুপরিচিত। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তিনি নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখা ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর নতুন সংযোজন।

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে দৃশ্যমান জগতের বিজ্ঞানের সঙ্গে উপলব্ধি-নির্ভর আধ্যাত্মিক দর্শনের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক জড়বস্তুতে চেতনার উন্মেষের প্রশ্নে ফিজিক্স ও মেটাফিজিক্সের মধ্যে এক অভিন্নতার সন্ধান করেছেন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই লক্ষ্যে একদিকে তিনি যেমন পর্যালোচনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কাজ ও বিশ্বাসকে, অন্যদিকে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞান-সম্মত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে। সেইসঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সদর স্ট্রিটে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, আমেরিকায় লেকের ধারে স্বামীজীর একত্বজ্ঞানের উপলব্ধি, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরাট ঐক্যসন্ধান প্রভৃতি ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে বাড়তি মাত্রা দিয়েছে।

হাজার হাজার বছরের বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষের জানার পরিমাণ অজানার তুলনায় এতই সামান্য যে, 'অনির্ণেয়' শব্দটি বিজ্ঞানে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই চেতনার প্রশ্নে অধ্যাত্মবিদ্ এবং পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন একপেশে সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য। নিকোলাস কোপার্নিকাস কিছুকাল গির্জায় কাটিয়েছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা ও আইনবিদ্যা ছাড়াও ধর্মতত্ত্বে তিনি ডি. লিট ডিগ্রি নিয়েছিলেন। সেই মানুষ যখন বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, পূর্বের কোন ধারণা বা আপ্তবাক্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জড় বিশ্বের পরিচয়, বস্তু ও শক্তির অভিন্নতা, অপ্রাণ থেকে প্রাণের উত্তরণের মতো বিষয়ে তেমনি বাধা হয়নি এযুগের অনেক প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মবাদী বিজ্ঞান-সাধকেরও। বর্তমান গ্রন্থে রয়েছে তারই এক তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখ্য অধ্যায়টি হলো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য। লেখক স্বল্প অবকাশে রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইনের সাক্ষাৎকারের আলোচনা করেছেন। ছুঁয়ে গেছেন আইনস্টাইনের ব্যাখ্যায় পরমাণু-জগতের ক্ষুদ্রতম উপাদানের শৃঙ্খলার প্রশ্নটি। সেইসঙ্গে এনেছেন আইনস্টাইনের ভাবনায় এই শৃঙ্খলাটির বোধের বাইরে থাকাটা। একইসঙ্গে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় হাইজেনবার্গের প্রিন্সিপল অফ আনসার্টেন্টির অবতারণা করে লেখক অনেক বেশি বুভুক্ষু রেখেছেন পাঠককে।

গ্রন্থটিতে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে 'জড়বিশ্ব জড় নয়', 'চেতনায় জড়ের উত্তরণ ও জগদীশচন্দ্র' অধ্যায়-দুটি। 'ঈশ্বরচিন্তা ও মহেন্দ্রলাল' অধ্যায়টিও সুলিখিত।

এমন একটি জটিল ও বিশাল প্রসঙ্গে এই কৃশ গ্রন্থটি পাঠকের চিন্তার পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রে উত্তেজক বটিকার কাজ করবে, সন্দেহ নেই। বাঙলায় এমন বিষয়ের বিজ্ঞানগ্রন্থ বিরল। অধ্যাত্মবিদ ছাড়াও বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক এই গ্রন্থটি হাতে পেলে না পড়ে পারবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

একটাই বলার, গ্রন্থটির কিছু কিছু বিশ্লেষণ আরেকটু বিস্তৃত হলে ভাল হতো। অধ্যায়গুলি সূচিবদ্ধ থাকারও দরকার ছিল। ❑

সত্যের উন্মোচন অবশ্যম্ভাবী

স্বামী সুপর্ণানন্দ

মৌলবাদী ইতিহাসের মূল্যায়ন হরপ্পা সভ্যতা আর্য না অনার্য • লেখক : সুনীল রায় • প্রকাশক : সমরেন্দ্র মৈত্র, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ • মূল্য : ৬০ টাকা • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১২৮ • প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০২

সমালোচ্য গ্রন্থ **'মৌলবাদী ইতিহাসের মূল্যায়ন হরপ্পা সভ্যতা আর্য না অনার্য'**-এর নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত পরিষ্কার করেছেন। গ্রন্থটিতে মৌলবাদী হিন্দু ঐতিহাসিকদের হরপ্পা সভ্যতাকে আর্যসভ্যতার নিদর্শন হিসাবে জাহির করার অপচেষ্টাকে(?) নিন্দা করা হয়েছে। হিন্দু মৌলবাদীদের যুক্তিজাল সুনীলবাবুর কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু তাঁর নিজের যুক্তি সর্বাংশে গ্রাহ্য—এই মানসিকতা আজকের সব প্রগতিশীল চিন্তাবিদের মতোই তিনিও ধরে রেখেছেন। 'মৌলবাদী' শব্দটি গালাগালির ভাষা কেন হলো? আভিধানিক অর্থে যারা 'মূলানুগ', তারা কেন মৌলবাদী নন? যারা মৌলবাদী তারা যুক্তিবাদী হতে পারেন না—এমন একটা hypothesis ধরে নিয়েই প্রগতিবাদীরা নাকি শিক্ষার বিস্তার করেন! মৌলবাদীদের যুক্তিবাদী হতে বাধা কোথায়? যাঁরা মূলানুসারী নন, তাঁরাই কেবল যুক্তিবাদী?

লেখকও ধরেই নিয়েছেন, আর্যরা বহিরাগত। এত নিশ্চিত করে ধরে নেওয়ার

মধ্যে সেই পুরনো model বা যুক্তিরই অবতারণা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়েছেন Truncated করে। স্বামীজীও এত নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। যে বেদ-উপনিষদ্-পুরাণের আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের আজও ভাবায়, যে-সাম্যতত্ত্ব ঋষিদের মধ্যে একটি পবিত্র অধ্যাত্ম এবং সমাজতত্ত্ব হিসাবে অনুশীলনীয় ছিল—সেগুলি পৃথিবীর আর কোন দেশে কি ছিল বা আজও আছে? আর্যরাই তাদের ধারক, বাহক—এমন কথা বলা অন্যায় কেন? বহিরাগত যদি হয়, তবে সেই বাইরের দেশ কোথায়? সেখানে মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য হিসাবে আত্মতত্ত্ব বা নিজেকে জানার প্রচেষ্টা আদৌ ছিল, না কি এখনো আছে? এবিষয়ে লেখকের নীরবতা আশ্চর্যরকমের। বরং অনেক কষ্টকল্পিত সরব প্রচেষ্টা হলো, 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' (ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২-৪)—এই সাম্য-চেতনার কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নেই, এটি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ভিতর নেহাতই একটি সমাজচেতনা। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে চলতে হবে—এই ধারণা গোষ্ঠীমানুষের বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। ভাগ্যিস, এইসব 'আধুনিক' আবিষ্কারের ফসল স্বামীজী জানতে পারেননি তখন!

গ্রন্থটি লেখার পিছনে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন দুজন মৌলবাদী ঐতিহাসিক এন. এস. রাজারাম এবং ডঃ এন. ঝাঁ-এর একটি প্রবন্ধের। সেখানে বিশেষ করে আলোচনা হয়েছে হরপ্পার সীলমোহরে অঙ্কিত জীবটিকে নিয়ে। রাজারামদের ধারণা ঐ জীবটি একটি অশ্ব। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতা আর্যদেরই। সুনীলবাবুরা প্রমাণ করেছেন এই জীবটি অশ্বের নয়, কাল্পনিক 'Unicorn' নামে এক পশুর। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতা আর্যদের নয়। হয়তো এই সরলীকরণ 'অতি' হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটি তাই। অবশ্যই পাঠকরা পুস্তকটিতে লেখকের বিশ্লেষণক্ষমতা, তথ্য নিয়ে গবেষণা করার দক্ষতার সম্যক পরিচয় পাবেন। এসব প্রশংসনীয়। কিন্তু সরস্বতী নদী নিয়ে কিছুকাল ধরে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তাতেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং সিদ্ধান্ত-স্থাপন কত অভ্রান্ত! বিদেশির বক্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার সেকেলে মানসিকতায় তাঁর লেখনী অভ্যস্ত। নইলে সিংহবাহিনী দুর্গার উৎসস্থল 'ব্যাকটিয়া' অঞ্চল, ভারতে নয়—এই তথ্য (Asko Parpola-প্রদত্ত) এত জোরের সঙ্গে পরিবেশিত হতো না। তাঁর ধারণা, ভারতীয়রাও ওসব দেশ থেকে এসেছে বলেই এসব জিনিস ওখানে পাওয়া গেছে। ভারতীয়রাও যে ওদেশে যেতে পারেন, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে—সে-প্রশ্ন একবারও উঠল না! কিন্তু কেন? আফগানিস্তান নিয়েও কথা উঠেছে। বৃহত্তর ভারতবর্ষ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? আসলে, সিদ্ধান্তটি কী হবে তা আগে থেকে ঠিক করা থাকলে তথ্যগুলিকে সেভাবেই সাজানো সহজ হয়ে ওঠে। সেই সহজ কাজই যেমন সুনীলবাবু করেছেন, তেমনি রাজারামরাও করেছেন। সেজন্য 'রাজারামরা কি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন সেসময়?'—এসব কথা বলে লাভ নেই। সেই একই যুক্তি বক্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গ্রন্থটির ছাপা ভাল। শেষে Michael Witzel এবং Steve Farmer-এর প্রবন্ধ-দুটি সংযোজিত করে লেখক তাঁর উত্তেজনার রসদ কোথা থেকে সংগৃহীত করেছেন, তার ঠিকানা নির্দেশ করেছেন। মুখবন্ধে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ও রাজারামদের মতো অনেকেরই মাথা থেকে এই আর্য-ভূত নামানোর জন্য 'প্রবল কোপে সম্মার্জনী প্রয়োগ' করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বস্তুত, এই 'সম্মার্জনী প্রয়োগ'-এর প্রতিটি ক্ষেত্রকে ধরে ধরে আলোচনা করলে সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তবে আশা করি, তেমন আলোচনা কেউ কেউ করবেন না। এসব অনেক মন্তব্যের এবং তথ্যের উত্তর না দিয়ে আমাদের বৈদান্তিক নিরাসক্ত মন বরাবরই আত্মস্থ থাকতে চেয়েছে! আমরাই এভাবে আমাদের স্বদেশকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছি। ফলে, সূর্যের আলোর মতো যা সত্য তাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছি! আমাদের অতীতগৌরব কিছু নেই, সবই হতশ্রী—এই ভাব পেয়ে বসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী এসেছিলেন উপনিষদের যুগের হারিয়ে যাওয়া সাম্য এবং মানবমহিমার মহত্ত্বকে পুনরুদ্ধার করে মানবসমাজকে বাঁচাতে। যথার্থ সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই—হয়তো আমাদের উত্তর প্রজন্মের কাছে। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

* *অ্যালবাম • লেখক : নীরেন রায় • প্রকাশক : দীপ্তি চক্রবর্তী, অক্ষরম, শৈলস্মৃতি, রিজেন্ট পার্ক, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-১১৮ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২০+১৬০ • মূল্য : ৬০ টাকা • প্রকাশকাল : ১৪০১। গ্রন্থটিতে ধর্ম, জীবন, সাহিত্য, ভ্রমণ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন সনাতন গোস্বামী। গ্রন্থটি বিষয়ের বৈচিত্র্য, জীবনবোধের ঐশ্বর্য এবং আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ।*
* *ধর্মপদম্ (পালি-ভাষাতঃ সংস্কৃত-ভাষায়ামনূদিতম্) • লেখক : প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু • প্রকাশক : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ৫০-টি/১সি পটারি রোড, কলকাতা-১৫ । • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪+৭৬ • মূল্য : ১০ টাকা • প্রকাশকাল : ১৩৯৯*
* *সঙ্কীর্ণ এই পৃথিবী • লেখক : ধীরেন্দ্রনাথ দাস • প্রকাশক : লেখক, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট-বি, ফার্স্ট ফ্লোর, ৯জি ভট্টাচার্য পাড়া রোড, কলকাতা-৬৩ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৯২ • মূল্য : ১৫০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০৪*
* *ঘটনাপ্রবাহে দিব্য জীবনচিত্র • রচনা ও সঙ্কলন : অমিত চৌধুরী • প্রকাশক : সাধনবিকাশ দত্ত, বিধানপল্লি, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩৬ • মূল্য : ২০ টাকা • প্রকাশকাল : ২০০৪*
* *আমার সাধের সাধনা • লেখক : গীতি সেনগুপ্ত • প্রকাশক : অপূর্বকুমার সাহা, জাগরী, ৭৪/৫এ, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৩ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৬ • মূল্য : ২৫ টাকা • প্রকাশকাল : ১৪০৭।*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর স্মরণে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিগত ১৫ মে ২০০৫ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্মরণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দ্রকুমার গুজরাল, শ্রী এল. কে. আদবাণী। স্বামী গোকুলানন্দজী সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐ সভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।—সম্পাদক
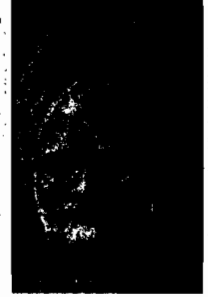
মাননীয় স্বামী গোকুলানন্দজী, মাননীয় স্বামী স্মরণানন্দজী, মান্যবর গুজরাল সাহেব, মাননীয় আদবাণীজী, রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্বান সন্ন্যাসিবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

আজ এখানে আমরা আমাদের সমকালীন যে মহান আত্মার জীবন ও বাণীর পর্যালোচনা করতে সমবেত হয়েছি, যিনি ছিলেন একজন যথার্থ বিদ্বান ও জ্ঞানী পুরুষ, যাঁর উপলব্ধি তাঁকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যাঁর মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত হতো আনন্দ—সেই স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর প্রয়াণসংবাদে এদেশের লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারীর হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে এবং সকলেই অনুভব করছেন, এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ, একজন মহান শিক্ষক, মহান শিক্ষাবিদ্‌, কৃতী সজ্জন, দরিদ্রের সহায় এবং সর্বোপরি গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষ—যিনি মানবিকতার শ্রেষ্ঠ সনাতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন।

তিনি ছিলেন নির্মাতা—আমাদের দেশে এবং বিদেশে তিনি নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের নব নব শিক্ষা ও ধ্যান-মন্দির। একাধিক প্রজন্ম তাঁর পায়ের তলায় বসে ভারতের ঐতিহ্যবাহী পুরাণ ও শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করেছিল। আমি নিঃসন্দেহ, তিনি ছিলেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতা-ব্যাখ্যাকার।

বেদান্তদর্শনের ওপর তাঁর বক্তৃতামালা তাঁকে এনে দিয়েছিল সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধা।

তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ এবং এই উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অংশেও তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের প্রভাব রেখে গেছেন। সর্বোপরি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানবপ্রেম, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, অনুকম্পা এবং বিদ্যা—সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ মনে করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী প্রচারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিবেকানন্দ, আমারও তাই মত। ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন আধুনিকতার মোড়কে, যেখানে ছিল মানবিকতা ও উদারতা। স্বামী বিবেকানন্দও হিন্দুধর্মের এমন ব্যাখ্যাই পছন্দ করতেন।

আগেই বলেছি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ছিলেন অতি বড় মাপের একজন শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষকও। আমাদের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বিবিধ রচনাসম্ভারের সঙ্গে তাঁর রচনাগুলিও লক্ষ লক্ষ যুবহৃদয়ে ভারতের পবিত্র ঐতিহ্যগাথা দৃঢ়াঙ্কিত করে দিয়েছিল। কী কেরালা, কী কলকাতা, কী হায়দ্রাবাদ, কী নিউ দিল্লি অথবা করাচি—যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই রেখে এসেছেন একটি উন্নত চেতনার প্রজন্ম, যারা দেশের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা কিশোর থেকে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করত। কেউ তাঁর কাছে আসত জ্ঞান অর্জনের জন্য, কেউ আসত প্রেরণালাভের জন্য, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য ছিল মানসিক শান্তির অন্বেষণে। তাঁর

সুরেলা কণ্ঠ, মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর পাণ্ডিত্য বিশাল শ্রোতাকে আকর্ষণ করত। আমাদের যুগে তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের মহান প্রবক্তা এবং যেন আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি।

আমি নিজে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেছি এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ও চিন্তাপ্রবাহে হারিয়ে গেছি অনেকবার। তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল একটি অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হতো শান্তি, আনন্দ আর পবিত্রতা। তাঁর উপস্থিতিতে ধুলিমলিন সাংসারিক জীবনে দুশ্চিন্তাগুলো অনেক দূরে সরে যেত।

তিনি একদা আমাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দুটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার অনুবাদ এরকম ঃ

(১) যিনি সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব-পূর্ণ, সহৃদয়; যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমব্যবহার করেন, যিনি মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত; যিনি মৌনপ্রিয়—সেই ব্যক্তি আমার (শ্রীভগবানের) প্রিয়।

(২) যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং আমার মধ্যে সকলকে দর্শন করেন, আমি তার নিকট অদৃশ্য হই না অথবা তিনি আমার নিকট অদৃশ্য হন না; যিনি ব্রহ্মৈকত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাকে ভজনা করেন—সেই যোগী সকল অবস্থায় বর্তমান থেকেও আমাতেই অবস্থিতি করেন।

ওপরে বর্ণিত যোগীর মতোই স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এক মহান যোগী ছিলেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর প্রয়াণে পৃথিবী একজন সত্যকার সন্ন্যাসীকে হারিয়েছে। আমরা দরিদ্রতর হয়েছি। আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন স্বামীজীর রচনা, তাঁর বক্তৃতার অডিয়ো ভিজ্যুয়াল টেপ ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতি আমাদের এবং উত্তর প্রজন্মের মধ্যে জাগরূক রাখার চেষ্টা করেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর স্মৃতিচারণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ❑

ইংরেজিতে মূল ভাষণটি স্বামী গোকুলানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদের বিষয় স্বামী যোগানন্দ (১৮৬১-১৮৯৯)। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ছয়জন ঈশ্বরকোটির অন্যতম, স্বামীজী যাঁকে 'কামজিৎ' অভিধায় অভিহিত করেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁকে বলতেন 'ধ্যানী'। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যাঁকে 'মাথার মণি' বলেছিলেন, সেই শ্রীশ্রীমায়ের 'ছেলে যোগেন'-এর দেহত্যাগের সংবাদে স্বামীজীর খেদোক্তি ঃ "কড়ি খসল। এবারে ধীরে ধীরে বর্গা সবও খসে পড়বে।" মর্মাহত শ্রীশ্রীমায়ের আক্ষেপ ঃ "বাড়ির একটা ইঁট খসল; এবারে সব যাবে।" সরল, মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী, মাতৃভক্ত ও শুকদেবের ন্যায় পরম পবিত্র ছিলেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরি, যাঁদের ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত, সেই বংশেই তাঁর জন্ম। পিতা নবীনচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ—অধিক সময় পূজা ও ধ্যানাদিতে অতিবাহিত করতেন। ঘটনাচক্রে যোগীন মহারাজকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর অভয় দিয়ে বলেছিলেন ঃ "বে করেছিস, তা ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না।" বিবাহের পর বৈরাগ্যের প্রাবল্যে মাঝেমধ্যে তিনি ঠাকুরের কাছে রাত্রিবাস শুরু করেন। প্রথম প্রথম এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, কারো বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না। সদ্বংশে জাত ও ধার্মিক পরিবারে আজন্ম লালিত-পালিত হওয়ায় তিনি বড়ই সংসার-অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই ঠাকুরের কাছে কখনো কখনো তিরস্কৃত হয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁকে সাবধান করে দেন ঃ "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে?" যোগীন বড়ই ভাবুক আর খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। একদা নৌকার আরোহীরা ঠাকুরের অযথা নিন্দা করলে তিনি কষ্ট পান, কিন্তু প্রতিবাদ না করায় ঠাকুর বলেন ঃ "শাস্ত্রে কি আছে জানিস—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সে-স্থান পরিত্যাগ করবে।" অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আরো কঠোর হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা যোগীনকে প্রথম দীক্ষা দেন। তারপর থেকে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করতে থাকেন। মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দকে কেউ সামান্য পয়সা দিলেও তিনি তা তুলে রাখতেন যাতে মা কখনো তীর্থাদিতে গেলে ইচ্ছামতো খরচ করতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর ওপর স্বীয় গৃহস্থালির কাজের জন্য নির্ভর করতেন। কাশীপুরে ঠাকুরের শরীর নিয়ে অন্যরা বিচলিত হলে শ্রীশ্রীমা যোগীনের মারফত বলে পাঠাতেন ঃ "হতাশ হতে মানা কর। তাঁর শরীর তো আজকাল একটু ভাল রয়েছে।" একবার সারদানন্দ মহারাজ স্বামীজীর কথা বুঝতে না পারায় যোগীন মহারাজের পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন ঃ "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, তিনি যা বলবেন, তা-ই ঠিক।" কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরে যোগীন মহারাজ এত ধ্যান করতেন যে, সর্বদা চোখ লাল হয়ে থাকত।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠায় 'প্রচ্ছদ পরিচিতি'র ১১তম পঙ্‌ক্তিতে '১৮৮৩'-এর স্থলে '১৮৮৪' এবং ১৯তম পঙ্‌ক্তিতে 'মিত্রের' স্থলে 'ঘোষের' হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা ঃ গত ২৫ মার্চ ২০০৫ চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত সংযোজিত অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মুজফ্‌ফরপুর ঃ গত ৩ এপ্রিল ২০০৫ চক্ষু অস্ত্রোপচার কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ছাপরা ঃ গত ৪ এপ্রিল ২০০৫ নবনির্মিত সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট ঃ গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ভ্যালু এডুকেশন অ্যাণ্ড কালচার'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর ঃ গত ১৩ এপ্রিল ২০০৫ নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও কুটিরশিল্প ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চেরাপুঞ্জি ঃ গত এপ্রিল ২০০৫-এ শিল্প বিদ্যালয়ের নবনির্মিত শাখাভবন এবং কালীবাড়ি, জতপ ও লইভুজতে নবনির্মিত তিনটি বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ তিনি শেলাপুঞ্জির প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া ঃ গত ২০ এপ্রিল ২০০৫ 'শিবানন্দ সদন (জুনিয়র বয়েজ হোস্টেল)'-এ প্রস্তাবিত সংযোজিত অংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির), বাগবাজার ঃ গত ১ মে ২০০৫ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে এই বলরাম-মন্দিরের হলঘরটিতে বসেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাই ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহিভক্তদের সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সঙ্ঘের মাধ্যমে জগতের কল্যাণে সকলকে আহ্বান জানান। এই পুণ্য দিনটির স্মরণে পবিত্র হলঘরটিতে আয়োজিত বৈকালিক আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মঠাধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী।

নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপন

গুজরাটের বরোদা বা বদোদরা প্রদেশের ঐতিহাসিক 'দিলারাম বাংলো'তে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালীন দেওয়ান মনিলাল যশভাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন। গত

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল, বদোদরা

১৮ এপ্রিল ২০০৫ গুজরাট সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই বাংলো রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন। রামনবমীর পুণ্যদিনে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের হাতে প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজপত্র তুলে দেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী। তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী ও সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজীর শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী; সেইসঙ্গে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বক্তৃতা দেন নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী ও স্বামী আদিভাবানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী ধ্রুবেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ভক্ত ও অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন সকালে নবনির্মিত ঠাকুরঘরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পটে মঙ্গলারতি, পূজা ও বিশেষ হোম অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ৪০০-র বেশি ভক্ত বসে প্রসাদ পান। মিশনের নবগঠিত এই কেন্দ্রটির নাম—রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল, বদোদরা। ঠিকানা—**Dilaram Bungalow, Opp. Circuit House, R. C. Dutt Road, Vadodara, Gujarat-390007; Phone: (0265) 555-4343; E-mail: rkmvmv@rediffmail.com; Website: www.geocities.com/rkmvmv.**

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরানগর ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রের একটি দল 'বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতা' কর্তৃক আয়োজিত রাজ্যস্তরের বিজ্ঞানভিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী কেশবানন্দজী (ননীগোপাল মহারাজ) গত ৪ এপ্রিল ২০০৫ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কনখল সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।
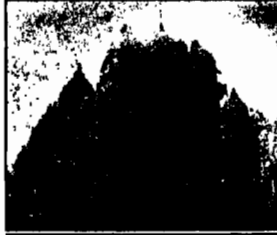
পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ সালে শিলং কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে নিজ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রম, চেন্নাই মঠ, বৃন্দাবন, মাতৃভবন (কলকাতা), জামশেদপুর, মাইসোর, সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং বেলুড় মঠের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কনখল সেবাশ্রমে তিনি গত ১৩ বছর যাবৎ অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত ও তপস্বী স্বভাবের।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী (রামমূর্তি মহারাজ) গত ৫ এপ্রিল ২০০৫ বিকাল ৪টায় 'বারাণসী হোম অফ সার্ভিস'-এর হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন তিনি শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৯ সালে চেন্নাই মঠে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে নিজ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি রেঙ্গুন সোসাইটি, উটকামণ্ড, কলম্বো এবং সালেম কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩ বছর মাদুরাই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি গত ৩ বছর যাবৎ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, প্রফুল্ল ও তপস্বী স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৩ ও ২৩ মে ২০০৫ যথাক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বগানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী।

গত ৮ মে ২০০৫ সন্ধ্যা ৭টায় সারদানন্দ হল-এ প্রয়াত পরম পূজ্যপাদ ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্মরণে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্বামী অসীমাত্মানন্দজী প্রমুখ সেবকবৃন্দ স্মৃতিচারণা করেন। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীমা কে. জি. স্কুল, কাজিয়ালপাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্যগীত, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, কল্পতরু ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন অমিতা মণ্ডল। ভাষণ দেন তৃপ্তিশঙ্কর ঘোষ, কানন ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণকান্ত দত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, গোবরডাঙা (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৬-১৮ জানুয়ারি ২০০৫ বেদ ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, সঙ্গীতাঞ্জলি, যাত্রাপালা, ক্যুইজ, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী, স্বামী বরদাত্মানন্দজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, উদয় ভাদুড়ি, বাপি ভট্টাচার্য, কে. পি. দাস, সন্তোষকুমার ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার সরাফ, বিরাট মণ্ডল, নীরেন্দ্রলাল গুহ, তপন শিকদার প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে ২,০০০ নরনারী ও ১,৫০০ শিশু, কিশোর-কিশোরীর মধ্যে নতুন বস্ত্র এবং ৩,০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে লেখাপড়ার সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ২০,০০০ ভক্ত ও গ্রামবাসী বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) ঃ গত ২১ জানুয়ারি ২০০৫ সেবাসঙ্ঘের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি) ঃ গত ২২-২৩ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নরদেবানন্দজী। প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। উপস্থিত সকলের মধ্যে 'অমৃতবাণী', 'সবার স্বামীজী' ও 'যুবনায়ক বিবেকানন্দ' পুস্তিকা এবং দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ২২-২৩ জানুয়ারি ২০০৫ ক্রীড়া ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে যুব উৎসব ও নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৩৭ জন অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ৬২ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ওড়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২২-২৩ জানুয়ারি ২০০৫ বেদপাঠ, শোভাযাত্রা, পূজা, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকেশানন্দজী, স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী, আলোকময় বসু ও অধ্যাপক তপনকুমার দে। ২৩ তারিখ ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হুগলি-চুঁচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি (হুগলি) ঃ গত ২২-২৬ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, গরুর গাড়িতে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি-সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, কবিগান, বংশীবাদন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ২২ তারিখ দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী। বিকালে পুরস্কার বিতরণ ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বরানন্দজী, প্রব্রাজিকা সুবিমলপ্রাণাজী, অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী, অধ্যাপিকা জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায়

ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সারদাদেবী সেবাশ্রম, বারুইপুর (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ কন্টাই পালপাড়া সারদাদেবী মহিলামণ্ডলের পরিচালনায় বারুইপুর বিজ্ঞানমেলা প্রাঙ্গণে 'দশম কৃষি, শিল্প, পর্যটন ও বিজ্ঞান উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের এন. আর. ডি. সি. শ্রীচন্দ্রমোহন। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও হাজার হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে আলোচনাচক্র, বিবিধ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যাত্রা, পুতুলনাচ, স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, স্বেচ্ছায় রক্তদানশিবির, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ, নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

সাঁকরাইল সেণ্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শিশুদের হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উপস্থিত সকলকে 'আমি মা, সকলের মা' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে কম্বল এবং সুনামি-বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ২,৩০১ টাকা বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে ভাষণ দেন রথীন্দ্রনাথ মাইতি। প্রশ্নোত্তরপর্ব ও ক্যুইজ পরিচালনা করেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে 'বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন' পুস্তিকা ও ছবি প্রদান করা হয়। এদিন দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ২৫ জানুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী যতীশানন্দজী, প্রশান্তকুমার সিন্‌হা ও অধ্যাপক অমিতাভ রায়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন সুনামি ত্রাণের জন্য ১,০০০ টাকা প্রদান এবং দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ২০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, খোসকদম্বপুর (বীরভূম) ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, শোভা-যাত্রা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দজী (বর্ধমান)। দুপুরে প্রায় ৮,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন ৩২ জন দরিদ্রনারায়ণকে কম্বল প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, আনন্দপুরী (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৫ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নতুন প্রতিকৃতির উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন (দমদম) ঃ গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, যুব ও ছাত্র সম্মেলন, মাতৃসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে সেবায়তনের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ২৬ তারিখ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন ও আশীর্বাণী প্রদান করেন। এদিন দুপুরে প্রায় ১,৮০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী, স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, হর্ষ দত্ত প্রমুখ। ২৮ তারিখ অনুষ্ঠান শেষে সকলকে শ্রীশ্রীমায়ের বই ও ছবি প্রদান করা হয়।

কাবলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী ও স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। রক্তদান শিবিরে ৮০ জন রক্তদান করেন। ৭০ জন দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কথামৃত সঙ্ঘ, টালিগঞ্জ (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সুনামি ত্রাণ তহবিলের জন্য একটি ১০,০০০ টাকার ড্রাফ্‌ট স্বামী স্মরণানন্দজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৩৯) ঃ গত ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, নাটক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম ও তিলজলা হাইস্কুলে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধারমণ চক্রবর্তী এবং ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সংসদের সাধারণ সম্পাদক শৈলেন্দ্র নন্দী ও সভাপতি অশোককুমার মাইতি।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৫ বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সহায়তায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী কালাতীতানন্দজী ও শক্তিপদ ত্রিপাঠী। ৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রত্যেককে 'ভারতের নিবেদিতা' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। গত ৩০ জানুয়ারি ২০০৫ অনুষ্ঠিত ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী ও স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) ঃ গত ৩০ জানুয়ারি ২০০৫ পূজা, নগর-পরিক্রমা, অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রেশ্বরানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী অক্ষয়ানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী নগর-পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে 'আমি মা, সকলের মা' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

পাতুল মিলন মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি) ঃ গত ৩০ জানুয়ারি প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বরানন্দজী, ব্রহ্মচারী কাশীনাথ, অধ্যাপক অমরেন্দ্র আদক এবং হিমাংশু ঘোষ। দুপুরে প্রায় ৬৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঙ্কজ দে। পাঠচক্রের পক্ষ থেকে সুনামি ত্রাণের জন্য ১,০০১ টাকা স্বামী বরানন্দজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শ্রীগদাধর আশ্রম, বহরকুলি (বর্ধমান) ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভাষণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন স্থানীয় ৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্রছাত্রীকে ১,৮০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কাটোয়া সারদা নারী সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সহযোগিতায় পাঠ, ভক্তিগীতি, রণপা নৃত্য, স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনা ও একটি বাণী মুখস্থ বলার প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সফল প্রতিযোগীদের ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বই এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের 'সবার স্বামীজী' বইটি পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদিকা পার্বতী দাস।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, 'গীতা' এবং স্বামীজীর জীবনী ও বাণী পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। এদিন ৪০ জন দরিদ্রনারায়ণকে কম্বল প্রদান করা হয়।

উলুবেড়িয়া 'উদ্বোধন' গ্রাহক সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ শিবমন্দির, হালালপুর (নদীয়া) ঃ গত ১-৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, জপধ্যান, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, যোগব্যায়াম প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১ তারিখ ২,৫০০ নরনারায়ণের সেবা করা হয়। ৪ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী সুরেশানন্দজী ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ৪-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি, ভক্তসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন ও স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী হৃতানন্দজী এবং স্বামী সত্যস্থানন্দজী। ৪৭টি আশ্রম থেকে ১২২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পরিষদের ৫টি কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের সুনামি ত্রাণ তহবিলে ৯,৫০৫ টাকা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চন্দননগর (হুগলি) ঃ গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ উষাকীর্তন, পাঠ, সঙ্গীত, রামনামসঙ্কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ১৬৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক দুলালচন্দ্র নায়েক।

শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (কলকাতা-৮১) ঃ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ভক্তিগীতি, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শরৎ পার্ক-এ বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী, প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, অশোক মুখার্জি, মিহিরকুমার ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র দাস, অমলা মুখার্জি প্রমুখ। ৫ তারিখ প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হরিপাল (হুগলি) ঃ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ উষাকীর্তন, পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বরানন্দজী ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

প্রাণবল্লভপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ এবং আবৃত্তি, ক্যুইজ, শঙ্খবাদন, অঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দজী (বর্ধমান), রথীন প্রামাণিক, সর্বাণী প্রামাণিক, অতনু মণ্ডল প্রমুখ।

শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (হাওড়া) ঃ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রভাতফেরি, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তিগীতি, যাত্রানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী মথুরেশানন্দজী ও স্বামী শ্রীশানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ক্যুইজ, গান, তাৎক্ষণিক নাটক, পুরস্কার-বিতরণ, কথায় ও গানে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনালেখ্য পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ৬ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী ও কমলকুমার মান্না। দুপুরে প্রায় ৯,০০০ নরনারায়ণ বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ১৫০ জন দুঃস্থ মহিলার মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

তারকেশ্বর কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র (হুগলি) ঃ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বীরানন্দজী ও সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথ মাজি। দুপুরে ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৫৫ জন রক্তদান করেন।

নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পাঠ, ধ্যান, ভজন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর পত্রাবলি পাঠ ও আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী এবং ঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা সুবিমলপ্রাণাজী।

ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (হাওড়া) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী। ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণাজী এবং সভাপতি ভীষ্মদেব সাহা। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রায় ১,৩৫০ জন ভক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও প্রসাদ পান।

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, বিভিন্ন ক্রীড়া ও 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য, কবিনাচ, লীলাকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, যাত্রাভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শশধরানন্দজী, ব্রহ্মচারী লোকেশচৈতন্য, রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলী চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি আলোকময় ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, চুঁচুড়া (হুগলি) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, সঙ্গীত, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

তমলুক বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ মনঃসংযোগ শিক্ষা, স্বামীজীর জীবন আলোচনা, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর পর্ব, স্মরণিকা ও পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে তমলুক হ্যামিল্টন হাই স্কুলে যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মহামণ্ডলের কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধি সোমনাথ বাগচী ও সুখেন্দুবিকাশ জানা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ দেন স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী, অজিতকুমার নায়েক, সোমনাথ বাগচী প্রমুখ।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, হাঁটাল (হাওড়া) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সঙ্গীত, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন কমিটি ও পাঠচক্রের যৌথ উদ্যোগে হাঁটাল বিশালাক্ষী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। ভাষণ প্রদান ও প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণাজী ও পুলক মুখোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে যুগ্ম-সম্পাদক মনোরঞ্জন মান্না ও শ্যামল মাজী। প্রায় ৯০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ও দুপুরে প্রসাদ পান।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, পাঠ, আলোচনা, গীতি-আলেখ্য, পুরস্কার-বিতরণ, নাট্যানুষ্ঠান, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

সেবাব্রত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর (ময়াল)-এর সহযোগিতায় দুদিনব্যাপী দন্তচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। ব্যাঙ্গালোর ডেন্টাল কলেজের সহাধ্যক্ষা অরুণাদেবীর পরিচালনায় ৯ জন দন্তচিকিৎসক ১৮০ জনের চিকিৎসা করেন। ৯৬ জনের দাঁত তোলা, ২৪ জনের দাঁতে ফিলিং এবং ৬০ জনের সাধারণ দন্তচিকিৎসা করা হয়। ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, ব্রহ্মচারী অমিয় ও ৭ জন সহযোগী উপস্থিত ছিলেন। ৮ তারিখ ৩০ জন নরনারীকে কম্বল প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কাটোয়া-নিবাসী নিত্যানন্দ অধিকারী গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র, কলকাতা-নিবাসী বলাইচাঁদ ঘোষ গত ২২ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি শ্রীশ্রীমা এবং মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মাস্টারমশাই প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গদের দর্শন করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বিরাটী-নিবাসিনী সন্ধ্যারানি মজুমদার গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পাঁশকুড়া-নিবাসী যুগলকিশোর পুরোকায়েত গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তিনি পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী মায়া ব্যানার্জি গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধামুয়া-নিবাসী অনুকুলচন্দ্র সরদার গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার ঠাকুরপুকুর-নিবাসী অমলভূষণ মুখোপাধ্যায় গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী হরিসাধন চ্যাটার্জি গত ৩ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির হিন্দমোটর-নিবাসী রাজগোবিন্দ গুপ্ত গত ৪ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কালীঘাট-নিবাসী কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ❑

গ্রাহকদের উদ্দেশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব

(১) আপনারা সকলেই জানেন, কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য এই বছরে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (by hand) নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকে নিলে ১০০ টাকা। এই সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রাহকরা পান ১১টি সাধারণ সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪) এবং ১টি বিশেষ (শারদীয়া) সংখ্যা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৬)।

এই কারণে শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়ে গেলে তার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব হয় না এবং সাধারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বছরে ২টির বেশি ডুপ্লিকেট কপি দেওয়াও সম্ভব হয় না।

(২) কোন সংখ্যা না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ অবধি অপেক্ষা করে উদ্বোধন কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর (পৌষ) সংখ্যা না পেলে জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখের পর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

(৩) ডুপ্লিকেট কপি ডাকে পাঠালে পুনরায় তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইচ্ছা করলে গ্রাহকগণ VPP মারফত ডুপ্লিকেট কপি পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১টি পত্রিকার ক্ষেত্রে ১০ টাকা দিয়ে পোস্ট অফিস থেকে পত্রিকাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে।

(৩) যাঁরা বৃদ্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়ে এসে হাতে হাতে পত্রিকা নিয়ে যেতে অপারক—তাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ডাকে পত্রিকা নিলে যা খরচ পড়ে অর্থাৎ ১০০ টাকা দিয়ে গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রের মাধ্যমে পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে পত্রিকাপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে।

(৫) যাঁরা ডাকে শারদীয়া সংখ্যা নেন, তাঁদের কাছে আমাদের প্রস্তাব—এই মূল্যবান সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে নিন। এতে ২৫ টাকা বেশি লাগলেও পত্রিকা হারানোর সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে গ্রাহকমূল্য বাবদ ১২৫ টাকা (১০০+২৫) দিতে হবে।

(৬) গ্রাহকমূল্য জমা দেওয়ার রসিদটি যত্ন করে রাখবেন। কারণ, পূজা সংখ্যা সংগ্রহ করার সময় অতি অবশ্যই এই রসিদটি দেখাতে হবে।

অন্যের পূজা সংখ্যা সংগ্রহ করার সময় সেই ব্যক্তির রসিদ এবং তাঁর Letter of Authorization সঙ্গে আনতে হবে।

(৭) যাঁরা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে হাতে হাতে পত্রিকা নেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে ২ মাসের মধ্যে পত্রিকা সংগ্রহ করে নেবেন। দপ্তরে স্থানাভাব হেতু ২ মাসের পর পত্রিকা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।

(৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০জন স্থানাধিকারীর জন্য ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের 'উদ্বোধন' উপহারস্বরূপ দেওয়া হবে—এটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাবদে অনুদান দিয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী অমর পাড়ুই—তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে। যদি উক্ত স্থানাধিকারীদের কারো সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হয়, অনুগ্রহ করে বিষয়টি তার গোচরে আনবেন।

আশা করি, উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক/গ্রাহিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাব।

বিনীত

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)**, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক**, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেণ্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেণ্টার**
  গুসকরা-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **ডঃ শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
  ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৬১২৩৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ**, সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ-৭১৩৪০৩,ফোন ঃ০৩৪৩-২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত)**
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, মেমারি কেন্দ্র, পারিজাত নগর
  মেমারি-৭১৩১৪৬, ফোন ঃ ০৩৪২২-২৬০৩৬২

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ**
  নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯
- **অজয়কুমার গাঙ্গুলী**
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**, শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল**, হাওড়া রেলস্টেশন

রামকৃষ্ণ মঠ

ফোন : ২৫২৩৪২২, ২৫৩২৬৯০
ফ্যাক্স : ২৫৩৭০৪২

ধনতলী, নাগপুর-৪৪০ ০১২

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন মন্দির

একটি আবেদন

প্রিয় ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ,

নাগপুরের ধনতলীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ বিগত ৭৪ বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে। মধ্যভারতে এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন মন্দিরের পুরনো বাড়িটি ও তার সংলগ্ন উপাসনালয়টিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। জীর্ণতার জন্য এগুলির স্থানে নতুন মন্দিরাদি নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া ক্রমবর্ধমান ভক্তসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান উপাসনাকক্ষটিও বড়ই অল্পপরিসর। তাই আমরা স্থির করেছি, অনেক বড় আকারে একটি মন্দির ও একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হবে। এগুলির বিবরণ এইরূপ—

মন্দিরের আয়তন ১১৭´×৫৮´
মন্দিরের উচ্চতা ৬৭´
গর্ভমন্দির ১৮´৬˝×১৮´৬˝
উপাসনাকক্ষ (৫০০ ভক্তের জন্য) ৬৭´×৪০´
দুদিকের বারান্দা প্রতিটি ৬৭´×৫´
মন্দিরের ভিত্তি তথা অডিটোরিয়াম ৯১´৬˝×৯১´

সমগ্র প্রকল্পটির জন্য খরচ হবে ৩ কোটি টাকা (৩,০০,০০০,০০ টাকা), যার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে সহৃদয় ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করি। সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গৃহীত এই প্রকল্পে আপনার ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ইতি
ভগবদ্‌পদাশ্রিত আপনাদের
স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ
অধ্যক্ষ

অনুদান ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট বা চেক-এ 'রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর'-এর নামে পাঠানো যেতে পারে। অনুদান আয়কর আইনের ৮০জি ধারাবলে করমুক্ত। বিদেশি মুদ্রায়ও অনুদান গ্রহণ করা হবে।

"আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।" তিনি বললেন, " 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', এইটি ধারণা কর।"
— শ্রীরামকৃষ্ণ

"সব সময় ঘড়ির কাঁটার মত ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।"
— শ্রীমা সারদাদেবী

"ঠাকুর ও মাকে অভেদ ভাবে দেখবে। ঠাকুরের কৃপা না হ'লে মাকে পাওয়া যায় না। আবার মা'র কৃপা না হ'লে ঠাকুরকে পাওয়া যায় না।" — শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী প্রয়াত অর্ধেন্দু ভূষণ বসুর স্মরণে

জন্ম ঃ ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯১৫

মৃত্যু ঃ ১০ই মার্চ, ২০০৫

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করে তোমার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক - এই প্রার্থনা করি।

নিবেদক — স্ত্রী কণক বসু, পুত্রদ্বয় - দেবকুমার বসু, রাজকুমার বসু

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"

৺অসীমরতন চীনা

(গড়িয়া)

জন্ম ঃ ১২-০৯-১৯৩০ মৃত্যু ঃ ১৪-০১-২০০৫

তোমার কর্মপ্রেরণা, আদর্শ ও আশীর্বাদ আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় হোক।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তোমার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বিশ্বজিৎ চীনা (পুত্র), অমূল্যরতন চীনা (ভ্রাতা), নরেন্দ্রনাথ চীনা (ভাইপো), পূর্ণিমা চীনা (স্ত্রী), নমিতা চীনা (পুত্রবধূ), অনিমা চীনা (ভগিনী), লতিকা চীনা (ভ্রাতৃবধূ), রত্না চীনা (ভাইঝি), সোমা চীনা (ভাইঝি)।

উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ

সাধনপাদ

সূঃ ১৮ (ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)

দৃশ্য

ভূতাত্মক - ইন্দ্রিয়াত্মক

প্রকাশ - ক্রিয়া - স্থিতিশীল

অবস্থা

আকাশ	বায়ু	অগ্নি	অপ	ভূমি	বিশেষ	বাক্ শ্রোত্র পাণি ত্বক পাদ চক্ষু পায়ু জিহ্বা উপস্থ ঘ্রাণ
শব্দ	স্পর্শ	রূপ	রস	গন্ধ	অবিশেষ	অস্মিতা

লিঙ্গ

অলিঙ্গ

∴ এক পুরুষের মুক্তিতে সকল পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হয় না ;

অর্থাৎ পুরুষ বহু

পরিণাম

কৃতার্থের প্রতি দৃশ্য নষ্ট হয়েছে

অকৃতার্থের প্রতি দৃশ্য নষ্ট হয় নি

সূত্র ঃ ১ দ্রষ্টব্য

ক্রিয়াযোগঃ

- তপঃ
  - ব্রহ্মচর্য
  - সত্য
  - মৌন
  - ধর্মানুষ্ঠান
  - দ্বন্দ্বসহন
  - মিতাহার
- স্বাধ্যায়
  - প্রণবাদি মন্ত্রজপ
  - মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন
- ঈশ্বর প্রণিধান
  - কর্মফল পরমগুরু-চরণে অর্পণ } ≃ { সর্বকর্মফল সংন্যাস

সূত্র ঃ ৩৪ (ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)

হিংসা

[৮১ প্রকার]

কৃত — কারিত — অনুমোদিত

লোভপূর্বক — মোহপূর্বক — ক্রোধপূর্বক

- মৃদু
  - মৃদু
  - মধ্য
  - অধিমাত্র
- মধ্য
  - মৃদু
  - মধ্য
  - অধিমাত্র
- অধিমাত্র
  - মৃদু
  - মধ্য
  - অধিমাত্র

অনুরূপে - স্তেয়, অসত্য, অব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ৮১ প্রকার

Ref পাতঞ্জল যোগদর্শন ঃ হরিহরানন্দ আরণ্য ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

উদ্বোধন ।।১০৭।।

১০৭তম বর্ষ | ৭ম সংখ্যা ● শ্রাবণ ১৪১২ ● জুলাই ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ আলাদা কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১২)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১২/সেপ্টেম্বর ২০০৫ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে প্রাক্‌-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা উদ্বোধন অফিসে এসে জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।
- **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা **ডাকযোগে (By Post)** পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- **রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৩ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।**
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে,** তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি** সংগ্রহ করার সময় **তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।** গ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবশ্যই গ্রাহকের **'অনুমতিপত্র'** সঙ্গে আনবেন।
  - **যদি কারো ক্যাশমেমো/রসিদ/মানি অর্ডার প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে, নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ১০ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ২০ অক্টোবর ২০০৫ বৃহস্পতিবার কার্যালয় খোলা থাকবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

◆ **আ**মি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

◆ **ধ**র্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতি'র মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া।

◆ **বে**দান্ত বলেন—যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন।

◆ **বি**দ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে-শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।

◆ **আ**মি বলি যে, গ্রিক মন—যা ইউরোপীয় জাতির বহির্মুখ শক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে—তার সঙ্গে হিন্দু মন মিলিত হলে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে।

◆ **ভা**রত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর বেশ-সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।

◆ **আ**মরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে—এমন ভাবের দরকার নাই। সেইগুলি পরিত্যাগ কর। সর্বপ্রকার রহস্যের দিকে ঝোঁক ত্যাগ কর।

◆ **জ**গতের ইতিহাস হইল—পবিত্র গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। ... যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমস্ত জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

◆ **আ**মাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

◆ **ম**হাবীরের মতো অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবিনি। ক-দিনের জন্যই বা শরীর? ক-দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ?

◆ **টা**কায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

◆ **কা**রও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সে-ই যথার্থ সর্দার হতে পারে।

◆ **এ**ক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো।

◆ **প্রে**ম এবং সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।

স্বামী বিবেকানন্দ

চিত্তের একাগ্রতা ও ধ্যান

'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ একাগ্রতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এইসকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে—কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। সে-আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং ইহাই রহস্য।" (অবতরণিকা, 'রাজযোগ')

উপরে উদ্ধৃত অংশে জীবনের যে-রহস্যের কথা স্বামীজী উল্লেখ করিলেন, চিত্তের একাগ্রতা তাহা উদ্ঘাটনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বা ধাপ। এই 'একাগ্রতা' গুণটি আধ্যাত্মিক পথেও যেমন, জাগতিক লক্ষ্যেও তেমনি অবশ্যপ্রয়োজনীয়—সেকথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। মন একটি শক্তিশালী যন্ত্র এবং যখন উহার মধ্যে একাগ্রতা বা 'ঐকাগ্র্য' নামক গুণের আবির্ভাব ঘটে, তখন উহা সহস্রগুণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া নিমেষের মধ্যে চিন্তনীয় বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা অর্জন করে। আতসকাচ বা magnifying glass-এর মাধ্যমে সূর্যরশ্মি যেমন কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রচণ্ড তাপ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা অর্জন করে, তদ্রূপ।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, যেকোন ধরনের একাগ্রতাকে 'ধ্যান' বলা যায় না। 'ধ্যান'-এর সংজ্ঞা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষত হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থসমূহে নির্দিষ্টভাবেই নিরূপিত হইয়াছে। সেবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। আপাতত 'চিত্তের একাগ্রতা'র কী অর্থ তাহাই সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বেদান্ত-মতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত একই বস্তু, অবস্থা ও ক্রিয়া-ভেদে উহা ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং মনের একাগ্রতা সমার্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। মনে যে-বৃত্তি উঠিতেছে, তাহাকে যোগশাস্ত্রে 'চিত্তবৃত্তি' বলা হইয়াছে এবং মহামুনি পতঞ্জলি বলিলেন, এই 'চিত্তবৃত্তি'কে সম্পূর্ণ বিনাশ করিলেই জীবাত্মার সহিত 'পুরুষ' বা পরমাত্মার 'যোগ' স্থাপিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আলোচনার অবকাশ বর্তমানে নাই। বরং 'পাতঞ্জল যোগসূত্র'-এর কয়েকটি ক্রিয়াত্মক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মনকে একাগ্র করিবার নানাবিধ উপায়ের কথা আমরা এতাবৎ শুনিয়া আসিয়াছি। অনেক মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাঁহারা মনকে স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি সুপ্রাচীন। মন্ত্রজপ আরেকটি শাস্ত্রবিদিত পদ্ধতি। বাহ্য কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অথবা সাহায্য না লইয়া মনকে স্থির করিবার দুইপ্রকার পদ্ধতি আছে। ধ্যানশীল যোগিগণ বাহ্য সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। সাধারণ মানুষের বাহ্য সাহায্য প্রয়োজন হয়। সঙ্গীত-শ্রবণ, মন্দিরে অপর সকল ভক্তের সহিত একত্রে বসিয়া উপাসনা করা কিংবা আধুনিককালের 'গাইডেড মেডিটেশন' অর্থাৎ কোন যোগ্য সঞ্চালকের নির্দেশ অনুযায়ী পর পর কয়েকটি আসনাদি সহায়ে মনঃসংযোগ অভ্যাস করা। পূজার্চনার মধ্য দিয়াও মনের একাগ্রতা-সাধন সম্ভব। যাহারা ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্যও মনের একাগ্রতা যে জীবনের একটি অত্যাবশ্যক অভ্যাস, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞানী কিংবা ব্যবসায়ী, শিল্পী কিংবা খেলোয়াড়, প্রশাসক কিংবা শ্রমিক—সকলেরই মনের একাগ্রতা কাজের জন্যই প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে আমরা মূলত আধ্যাত্মিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। ছাত্রছাত্রীগণের ক্ষেত্রেও এই আলোচনা কল্যাণসাধকই হইবে—সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিক্ষার্থীর প্রথম প্রয়োজনীয় গুণ চিত্তের একাগ্রতা। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। একটি প্রদীপশিখার দিকে নির্নিমিখ চাহিয়া থাকা কিংবা একটি নির্দিষ্ট মন্ত্র নিরন্তর জপ করিলে মনের কী পরিবর্তন হইতে পারে? পদার্থবিদ্যায় একটি পরীক্ষণের কথা আমরা জানি—Forced Vibration বা বলপূর্বক কম্পন। যেমন, একটি তানপুরার তার 'সা'তে বাঁধিয়া অঙ্গুলির আঘাতে শব্দ করিলে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী তারে কম্পন হইতেছে, যদিও উহা স্পর্শ করা হয় নাই। তেমনি

মন্ত্রজপের মাধ্যমে চিত্তের সকল বৃত্তিকে ক্রমে একটি নির্দিষ্ট কম্পনে টানিয়া লইয়া অসংখ্য বৃত্তিকে এক বৃত্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। 'মন্ত্র' যে সংস্কৃত ভাষায় হইতে হইবে তাহা নহে। খ্রিস্টধর্মে ইংরেজি ভাষায় মন্ত্র জপের কথা আমরা জানি। 'The way of a Pilgrim' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এক অজ্ঞাত সাধকের আন্তর রূপান্তরের কাহিনী বিবৃত আছে। সেই মিস্টিক সাধক "Oh Lord Jesus, have mercy upon me"—এই মন্ত্র দিবারাত্র জপ করিতেন। তাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়াছিল।

মহামুনি পতঞ্জলি 'ধ্যান' শব্দটি যথেষ্ট সাবধানেই ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস মানুষের জীবনে যেকোন স্তরেই শুরু হইতে পারে, কিন্তু ধ্যানের যোগ্যতা সাধকজীবনে বেশ অনেকখানি অগ্রসর হইলেই লাভ হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ-এর বর্ণনা দিয়াছেন পতঞ্জলি—'যম', 'নিয়ম', 'আসন', 'প্রাণায়াম', 'প্রত্যাহার', 'ধারণা', 'ধ্যান' ও 'সমাধি'। ইহার মধ্যে 'যম' ও 'নিয়ম'কে সার্বভৌম মহাব্রত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আস্তিক-নাস্তিক, পুরুষ-নারী—সকলেই স্থান-কাল-নির্বিশেষে 'যম' ও 'নিয়ম' অভ্যাস করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে পারে।

প্রাথমিক অবস্থায় সৃজনশীলতা মানুষকে চিত্তৈকাগ্রতায় সাহায্য করে। সেইজন্য শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে অভিভাবকদের সাহায্য করা উচিত। সৃজনশীলতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর মাটির মূর্তি গড়িতেন। একদা তাঁহার গড়া মূর্তি দেখিয়া মথুরানাথ বিশ্বাস মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সুদক্ষ কারিগরের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী শিষ্যদের জীবন সযত্নে গড়িয়াছিলেন। তাঁহার সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বামী বিবেকানন্দ। (শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নির্মাণ' আখ্যা দেওয়া সমীচীন নহে, কারণ শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী।) যদিও এইপ্রকার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, তথাপি বিবিধ দার্শনিক প্রসঙ্গের অবকাশ এখন আমাদের নাই। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার-আপনার যাহা কিছু সমস্যা, তাহার সমাধান অন্বেষণই এই আলোচনার লক্ষ্য। আধুনিক সমাজে আমাদের সমস্যার অন্ত নাই। ভারতীয় সমাজ বহুমাত্রিক। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ইহার সমস্যা জটিলতর এবং ভিন্নতর। বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি-পুরাণ, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান, বহু ভাষাভাষিতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিষম সংমিশ্রণ—সবকিছু মিলাইয়া ভারতীয় সমাজ একটি অত্যন্ত জটিল বস্তুরূপে প্রাচীনকালে যেরূপ ছিল, এখনো সেরূপই আছে। পাশ্চাত্যের ছোটখাট দেশগুলির দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারি, তাহাদের দেশ একমাত্রিক। তাহাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই একমাত্রিক এবং রাজসিক সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে মানুষের নিরাপত্তা (প্যালেস্তাইন ইত্যাদি কয়েকটি ইউরোপীয়ান দেশ, কয়েকটি দক্ষিণ আমেরিকান দেশ এবং এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ বাদ দিলে) সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। সেইসকল দেশে দারিদ্র্য নাই। আছে বিলাসবাহুল্য এবং সকলরকম সামাজিক সুখ-সুবিধা, যাহা ভারতবর্ষে নাই। সেখানে তাহাদের বাহ্য সমস্যা নাই বলিলেই চলে। তাই তাহারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের পাঁচহাজার বৎসরের সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতি বাহিরের সমস্যার সমুচিত সমাধান করিতে পারিতেছে না ঠিকই, কিন্তু এদেশের বৃহত্তর জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহাদের সম্মুখে আত্মোপলব্ধি এবং আত্মবিকাশের উপায় বিধৃত আছে, যাহা পাশ্চাত্যে নাই। তাহাদের রক্তে রক্তে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা প্রবাহিত হইতেছে। তাহাদের সম্মুখে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'পাতঞ্জল যোগসূত্র', সর্বোপরি বেদান্ত-নির্ঘোষিত "সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম"—নামক অদ্ভুত যাদু রহিয়াছে। যতই হিন্দু-মুসলমান সংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কিংবা পাশ্চাত্যাভিঘাত ভারতবর্ষে আসিয়া পড়ুক না কেন, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের যে-উত্তরাধিকার ভারতবর্ষের মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই তাহাদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই মিটাইয়া লইবার পথ দেখাইবে।

কিন্তু যেভাবেই ভারতবাসী তাহার সমস্যার সমাধান খুঁজুক না কেন, তাহার প্রথম পদক্ষেপই হইবে—আত্মসংযম। শ্রীশ্রীমা বলিতেন: "ত্যাগই ছিল ঠাকুরের [অঙ্গের] ভূষণ।" তেমনি 'আত্মসংযম'-রূপ ভূষণে আভরিত হইয়া ভারতবাসী বিশ্বসভায় উপনীত হইবে—ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, ইহাই হইবে বিশ্ববাসীর উপেক্ষায় ভারতবাসীর সমুচিত জবাব।

সমষ্টির প্রশ্ন ব্যষ্টিনির্ভর। তাই চিত্তের একাগ্রতা আজ একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যেকোন বিষয়ের উপর একাগ্রতাকে ধ্যান বলা হয় না। স্ব-

স্বরূপানুসন্ধানের কারণে যে-একাগ্রতা, তাহাকেই ‘ধ্যান’ বলা হয়। কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের পূর্বে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত, ধ্যানের বা চিত্তৈকাগ্রতার বিষয়বস্তু নির্বাচন কিভাবে হইবে? বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্ব স্ব বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই মনকে একাগ্র করিয়া থাকে। ইষ্টলাভার্থী নিজের ইষ্টদেবতাকে একাগ্রতার বিষয় করেন। সাকার ধ্যান কিংবা নিরাকার ধ্যান—যাহাই অভ্যাস করা হউক না কেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দ্রিয়সংযম ও বাসনানিবৃত্তির প্রয়োজন। কারণ, অসংযত ইন্দ্রিয় এবং মনোগত বিভিন্ন বাসনা মনকে কিছুতেই একাগ্র হইতে দেয় না। ছাত্রছাত্রীগণ প্রায়শ দুঃখপ্রকাশ করে—‘পড়াশোনায় মন লাগে না।’ তাহার কারণ, তাহাদের মনোগত অসংখ্য বাসনা এবং নিরাপত্তার অভাব। যেসব ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় উচ্চ স্থানাধিকার করিতেছে, তাহাদের মনেও অসংখ্য বাসনা আছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি বিশেষ বাসনা (যথা, উচ্চ স্থানাধিকারলাভ) অত্যন্ত প্রবল থাকে। সেইরূপ, যাহাদের ‘পড়াশোনায় মন লাগে না’ তাহাদের মনে অন্যান্য অসংখ্য বাসনার সহিত যদি একটি প্রবল বাসনা থাকে, উহাই তাহাকে অগ্রসর হইতে প্রেরণাদান করিবে। কিন্তু সাধকের পক্ষে অন্য কথা। তাহার মন ‘নির্বাসনা’ না হইলে ইষ্টলাভ বা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ বলিতেন, সুতোয় একটুও ফেঁসো থাকিলে সুচের মধ্যে গলিবে না।

আত্মসংযমের জন্য প্রয়োজন ‘নিয়মানুবর্তিতা’। যাহার জীবনে discipline নাই, তাহার আত্মসংযম অসম্ভব। একটা নিত্য-নৈমিত্তিক discipline অবশ্যই প্রয়োজন। বিশেষ উৎসবের কারণে কিংবা বিপদে-আপদে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ক্ষণিকের জন্য হইলেও পুনরায় জীবনকে পূর্বের নিয়মে ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য ও অভ্যাস প্রয়োজন। কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্বদা উত্তরমুখী হইয়া থাকে, নাড়াইয়া দিলেও সে দুলিয়া দুলিয়া ঠিক উত্তরমুখী হইয়া পড়ে, সেইরূপ।

নিয়মানুবর্তিতার জন্য প্রয়োজন জীবনের পরম লক্ষ্যের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। প্রাণের কেন্দ্রে যদি ইষ্টের প্রতি যথার্থ ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে সকল প্রচেষ্টা বিফল হইবে। পতঞ্জলি সূত্রাকারে সেকথাই বলিলেন: “স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।” দীর্ঘকালব্যাপী অনুক্ষণ আদরের সহিত সেবা করিলে (অভ্যাস করিলে) সাধক দৃঢ়ভূমি (বা প্রতিষ্ঠা—যেকোন বিষয়ে) লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা দু-পাঁচদিনের ব্যাপার নহে। ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং মনের নিরালস্য ভাব বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অতিমাত্রায় ফলাকাঙ্ক্ষী হইলেও সাফল্য আসিতে বিলম্ব হয়। স্বামীজী সেকারণে বারংবার বলিতেন: “Take care of means”—উপায়ের [পথের] যত্ন লও। যদি জানা থাকে যে, এই পথেই সাফল্য আসিবে, তাহা হইলে গন্তব্যস্থল মনে না রাখিলেও চলিবে। তখন পথের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

চিত্তের একাগ্রতাসাধনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাধন—প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয় (চক্ষুর বিষয় রূপ বা আলো, কর্ণের বিষয় শব্দ, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয় রস বা আস্বাদ, ত্বক-এর বিষয় স্পর্শ) হইতে প্রত্যাহৃত করিবার ক্ষমতা না থাকিলে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। শক্তিশালী ধ্যানপ্রবণ মন একবার মন্দ বিষয়ে ধাবিত হইলে উহাকে নিবৃত করা সহজসাধ্য নহে। অতএব প্রত্যাহার অভ্যাস মনঃসংযমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্রত্যাহার অভ্যাস সহজসাধ্য হয় যদি সাধকের অন্তরে বৈরাগ্য ক্রিয়াশীল থাকে। বৈরাগ্যই তাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যকে দূর করিতে সক্ষম এবং সদাসর্বদা মনে প্রবল ‘বিচার’ না থাকিলে বৈরাগ্যের জন্ম হয় না। যে-লক্ষ্যে আমি অগ্রসর হইতেছি, আমার জীবনে তাহার প্রয়োজন আছে কিনা, অন্য প্রয়োজনের তুলনায় সে-প্রয়োজন কতটা প্রবল, পরিণতিতে উহা আমার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাইতে সাহায্য করিবে কিনা ইত্যাদি বিচার সর্বদা সাধকের মনে প্রবুদ্ধ থাকিলেই তাহার অন্তরে বৈরাগ্য বিরাজ করিবে। এই বৈরাগ্য তাহাকে ‘প্রত্যাহার’-এ সাহায্য করিবে, প্রত্যাহার অভ্যাসের ফলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন তাহার সহজসাধ্য হইবে। চিত্ত একাগ্র হইলে তাহার মনের সূক্ষ্মতা বা ধার বৃদ্ধি পাইবে। মন শক্তিশালী ও সূক্ষ্ম হইলে আত্মতত্ত্বের উদ্ভাসনে তাহা ক্রমশ শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধ মনে সহজে তত্ত্বচিন্তা সম্ভব হইবে, তত্ত্বচিন্তা বা ইষ্টচিন্তা তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর পারে লইয়া গিয়া তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাইবে। সাধকের মোক্ষলাভ হইবে। অতএব মনঃসংযম ও চিত্তের একাগ্রতার ভূমিকা সাধক-জীবনের বনিয়াদ—সেব্যাপারে সন্দেহ নাই। [ক্রমশ]

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত

॥১॥*

১৫০২ জোন্স স্ট্রিট
সান ফ্রান্সিস্কো
৪ মার্চ ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার কেমন কাটছে? মিসেস ফাঙ্কে ও অন্য সব বন্ধুরা কেমন আছেন? তুমি সুখে আছ না অবসাদে ডুবে, নাকি দুঃখে ভারাক্রান্ত, কিংবা আর কিছু? আমি ক্রমেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বেশি করে মানিয়ে নিচ্ছি। আমার স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল, তবে আগেকার মতো নয়। জানি না আর কোনদিন পুরনো জীবনীশক্তি ফিরে পাব কিনা। হ্যাঁ, আমি এই অবস্থাতেই খুশি, এই জগতে যতটুকু সুখী হওয়া সম্ভব আমি তাই।

মার্গো বস্টনে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ আমি সান ফ্রান্সিস্কোতে এসেছি এবং কাজ, শুধু কাজ করছি। যখনি পূর্বাঞ্চলে যাওয়ার পাথেয় জুটে যাবে, তখনি আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব। ডেট্রয়েটে এখন নিশ্চয়ই বেজায় শীত পড়েছে। এখানকার আবহাওয়া এখন চমৎকার। এই স্থানটি অনেকটা ভারতের উত্তরপ্রান্তের মতো। ভারতে এই মাসটা বসন্তকাল। এখানেও তাই। এপ্রিল না মে মাসে তোমাদের বসন্তকাল হয়—আমি ভুলে গেছি, তবে এপ্রিল মাস মার্চের মতো এতটা ঠাণ্ডা নয়। তাই নয় কি?

আশা করছি, আমি এপ্রিল মাসে এই স্থান ত্যাগ করে পূর্বদিকে রওনা হব। যাওয়ার পথে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য শিকাগোতে নামব এবং তারপরে তোমরা চাইলে খানিক বিশ্রামের জন্য ডেট্রয়েটে যাব। সেখান থেকে যাব নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি স্থানে।

আমার রচনা পাঠ করে এখানে ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেরা আমার চিন্তাধারা বোঝার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মনে হচ্ছে লিখিত কথাগুলি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সেজন্য ভিড় জমাতে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এখন এটা দেখার যে, যখন প্রবেশদ্বারে ৫০ সেণ্ট দিতে হবে তখনো এই আগ্রহ থাকে কিনা। তোমার ছুটি কবে থেকে শুরু হচ্ছে? মে মাসে—তাই কি?

আমি কাজ করতে চাই না। আমি চাই শান্তি ও বিশ্রাম। স্থান ও কালের জ্ঞান আমার আছে, কিন্তু মনে হয় নিয়তি বা কর্মফল আমাকে কাজ—শুধু কাজের দিকে চালিত করছে। যেসব গবাদি পশু কশাঘাতে তাড়িত হয়ে কসাইখানার দিকে চলার সময় পথের ধারে একমুঠি ঘাস দ্রুত কামড়ে নেয়, আমাদের অবস্থাও সেইরকম। এসবই হলো আমাদের কর্মফল—আমাদের ভয়সঞ্জাত। ভয়—যা থেকে দুঃখকষ্ট আর আধিব্যাধির সূত্রপাত।

নির্ভীক, আগের মতো বেপরোয়া ও সবকিছু সম্পর্কে নিস্পৃহ হতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মানসিকভাবে দুর্বল ও ভয়ার্ত হয়ে আমরা অপরের অনিষ্ট করি। আঘাত পেতে ভয় পেয়ে আমরা আরো বেশি আঘাত করে ফেলি। অশুভকে এড়াতে এত বেশি চেষ্টা করি যে, আমরা তারই মুখে গিয়ে পড়ি।

আমাদের চারপাশে কতই না ঠুনকো বাজে জিনিসের স্তূপ আমরা সাজিয়ে তুলেছি! এতে কোন কল্যাণ হয় না; বরং যে-দুঃখজ্বালাকে আমরা এড়াতে চাই, সেই দুঃখের পথেই পরিচালিত হই। সারাটা জীবন আমি খুবই আবেগপ্রবণ ছিলাম এবং তার ফলে নিজে দুঃখ পেয়েছি ও আমার আবেগ দ্বারা অপরকে দুঃখ দিয়েছি। এখন আমি দৈহিক ও মানসিকভাবে বলিষ্ঠ হচ্ছি। আর আবেগপ্রবণতা নয়। এখন কাজের পালা, ভাবনার নয়। অতিরিক্ত খুঁটিনাটি বিষয় ভাবনা আমাদের কোনদিকেই এগোতে দেয় না। আমি 'জ্বাল দেওয়া চিনির রস' হয়ে গেছি—গুডউইন তাই বলত।

সারাদিন কি কর—সেই একই নিয়মমাফিক কাজ? তোমার ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শরণাগতির যদি অর্ধেকও আমার থাকত। আমি এক তর্জনগর্জনকারী, ব্যস্তবাগীশ, ভাবপ্রবণ আহাম্মক।

এবার আমি বিশ্রাম নিতে বদ্ধপরিকর, প্রথমত অন্তরের দিক থেকে, পরে অবশ্যই পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে।

---

* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রের সামান্য অংশ ভুলক্রমে নিবেদিতাকে সম্বোধন করে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে (৪৫নং পত্র) প্রকাশিত হয়েছে। পত্রটি এখানে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হলো।
—সম্পাদক

আর কাজ নয়, বরং শান্তিই এখন আমার কাম্য বস্তু। কোলাহলময় জীবজগতে আমি নিজের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এখন আমি দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে বিশ্রাম ও শান্তি পেতে চাই। মাঝে মাঝে আমাকে দু-এক ছত্র লিখো; লিখবে তো? শুধু অন্তত তুমি কি করছ ও কেমন আছ—এই কথাটা আমাকে জানাবার জন্য!

তোমাকে, মিসেস ফাঙ্কেকে ও অপর সকলকে আমার অশেষ ভালবাসা জানাই।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ আমি এমনই বেকুব যে, চ্যামপ্লেন স্ট্রিট, কংগ্রেস স্ট্রিট ও আলফ্রেড স্ট্রিটের মধ্যে আবার তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি! তাই মিসেস ফাঙ্কের প্রযত্নে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। এবার অঙ্গীকার করছি, তোমার ঠিকানাটা সযত্নে টুকে রাখব এবং পুরনোগুলি কেটে দেব। হাজারবার মার্জনা চাইছি। এটা অমার্জনীয়। তাই নয় কি? স্থান সম্পর্কে এতই দুর্বল স্মরণশক্তি! বস্তুর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। যাকে আমি কখনো ভুলি না, সে হলো আত্মা।

॥২॥**

বেদান্ত সোসাইটি
১০২ ইস্ট, ফিফটি এইটথ স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক
৯ জুন ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমি আর বেশি লিখতে পারিনি, কেননা ক্যালিফোর্নিয়ায় গত কয়েক সপ্তাহের অবস্থানকালে আরেকবার রোগটার পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল এবং আমাকে বেশ ভুগিয়েছে। যাই হোক, ওটা হওয়াতে আমি উপকৃত হয়েছি, কারণ আমি জানতে পেরেছি, দুশ্চিন্তা আর ভীতি ছাড়া বাস্তবিকপক্ষে আমার কোন রোগ নেই। আমার কিডনীগুলি যেকোন স্বাস্থ্যবান মানুষের যেমন থাকে তেমনি ভাল আছে। কেবল আমার স্নায়ুগুলিই ব্রাইটের ব্যাধির সব লক্ষণ ডেকে আনে।

৭৭০নং ওক স্ট্রিট, সান ফ্রান্সিস্কো থেকে আমি তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, যার কোন উত্তর পাইনি। অবশ্য আমি তখন শয্যাশায়ী ছিলাম এবং ঠিকানার খাতাটিও আমার আবাসস্থলে ছিল না। তাই সংখ্যা লিখতে ভুল হয়েছিল।

তুমি ইচ্ছা করেই উত্তর দাওনি—একথা আমি বিশ্বাস করি না। বুঝতেই পারছ, এখন আমি নিউ ইয়র্কে এবং কয়েকদিন এখানে থাকব। ওহিয়োর অন্তর্গত ক্লীভল্যাণ্ডের মিসেস ওয়াল্টনের কাছ থেকে আমি আমন্ত্রণ পেয়েছি। তা আমি গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে লিখেছেন, তুমিও নিমন্ত্রিত হয়েছ এবং তা গ্রহণ করেছ। বেশ! তাহলে ক্লীভল্যাণ্ডে আমাদের দেখা হচ্ছে। ইউরোপে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। হয় সেখানে অথবা অন্যত্র—যেখানে তুমি চাও। যদি মনে কর যে, ওহিয়োতে তোমার যাওয়া সম্ভব হবে না তবে তুমি অন্যত্র যেখানে বলবে সেখানেই গিয়ে আমি তোমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে আসব।

তোমার স্কুলের ছুটি কবে থেকে পড়ছে? তোমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সবকিছু আমাকে লিখবে; অবশ্যই লিখো!

মিস নোবল (নিবেদিতা) খুব চাইছে যে, আমি ক্লীভল্যাণ্ডে যাই। যাত্রার আগে আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য নিরিবিলিতে সেইসব বন্ধুদের মধ্যে বিশ্রাম নিতে পারলে অত্যন্তই আনন্দিত হব, যাঁরা আমাকে মোটেই বিরক্ত করেন না। আমি জানি সেভাবেই আমি বিশ্রাম ও শান্তি পাব এবং এব্যাপারে তুমি অনেকটা সহায়তা করতে পার। অবশ্য ক্লীভল্যাণ্ডে সবসময়ই কয়েকজন বন্ধু থাকবেন এবং কার্যত প্রচুর গালগল্প চলবে। যদি তুমি মনে কর অন্য কোথাও আমি প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রাম পাব, তবে সেবিষয়ে আমাকে সবকিছু লিখো।

তোমার চিঠির ওপরই ক্লীভল্যাণ্ডের ভদ্রমহিলাকে আমার উত্তর দেওয়া নির্ভর করছে।

আমার একান্ত অভিলাষ, এই মুহূর্তে ডেট্রয়েটে বা অন্য কোথাও সেইসব বন্ধুদের মধ্যে যদি থাকতে পারতাম, যাঁদের বরাবর ভাল এবং খাঁটি বন্ধু বলে আমি জানি। এটা দুর্বলতা; কিন্তু যখন দৈহিক জীবনীশক্তি হ্রাস পায় এবং স্নায়ুগুলি শিথিল হয়ে আসে, আমি কারো ওপর নির্ভর করার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে পড়ি। তুমি জেনে খুশি হবে, পশ্চিমাঞ্চলে আমি কিছু অর্থ উপার্জন করেছি। সুতরাং, আমার খরচ চালিয়ে নিতে আমি বেশ পারব।

শীঘ্র চিঠি দিও।

তোমাদের স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

** ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।—সম্পাদক

শ্রাবণ ১৩১২
জুলাই ১৯০৫

পারলৌকিক স্বার্থপরতা।

(ব্রহ্মচারী উপেন্দ্রনাথ)।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুইদল দার্শনিক দেখা যায়। একদল বলেন, জ্ঞানের পর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; আর একদল বলেন, জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অবস্থান হওয়া উচিত। প্রথম দলের নেতা ভগবান্ শঙ্করস্বামী, দ্বিতীয় দলের নেতা রামানুজাচার্য্য। আত্মার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়াতেই জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ ধারণা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—আত্মা এক ও বিভু, রামানুজ বলেন—আত্মা অণু সুতরাং বহু। শঙ্কর বলেন, জ্ঞানের চরম লক্ষ্য আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি; সেই জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্মের শেষ হইয়া গেল। আর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত কিছু রহিল না;... সুতরাং তখন আর কি কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিবে? শঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আজকাল অনেকে কি সেইজন্য নিশ্চেষ্ট?

কাশীর দ্বার পার হইতে না হইতেই সোঽহং-এর যথেষ্ট ঘটা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগকে কোনও লোকহিতকর কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জগৎটা সব মায়া কিনা, সেইজন্য তাঁহারা মায়ার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, পাছে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে মায়া আসিয়া তাঁহাদের ধরিয়া ফেলে। অথচ নিত্য নৈমিত্তিক আহারাদি ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে,... সত্ত্বগুণের সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর দিয়া তমোগুণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে?—শঙ্করাচার্য্য? যিনি কর্ম্মের বিরোধী হইয়াও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়া যিনি জ্ঞান-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন? যিনি নিজে কর্ম্মবীর, তাঁহার যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে এরূপ জড়তার সম্ভাবনা থাকিত না।

জ্ঞানের চরম কথা আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি।... জ্ঞানের পর আমার কর্ম্মনাশ, আর কর্ম্ম সঞ্চিত হইতে পারে না; কিন্তু পরের জন্য আমার তখনও কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়া জগৎকে তুচ্ছ স্বপ্নবোধে ত্যাগ করিয়াছি, অপরকেও সে-জ্ঞানের অধিকারী করিতে হইবে। আমি জাগিয়া উঠিয়াছি; আর সকলে আমার পার্শ্বে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে; জানি সে-কান্না স্বপ্নমাত্র, কিন্তু তাহাদিগকেও জাগাইয়া দিতে হইবে; তাহাদের কষ্ট যে আমার কষ্ট। যাহার যে-পথ উপযোগী, তাহাকে সেই পথে লইয়া গিয়া ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী করিতে হইবে।

ঐটুকু ভুল বুঝিয়াই আমরা গোলমাল করিতেছি, আর ধর্ম্মের নামে একটা প্রকাণ্ড জড়তার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি। পরের প্রাণের বেদনা আমাদের প্রাণে বাজে না, আর্ত্তের ক্রন্দনে আমরা বধির। আমরা সকলে একেবারে বিষমজ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছি। সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পরমহংস সকলেই আপন আপন জপমালা লইয়াই ব্যস্ত; যে-সমাজের ভিক্ষান্নে তাঁহাদের শরীর পরিপুষ্ট, সে-সমাজের প্রতি যে তাঁহাদের কোনও কর্ত্তব্য থাকিতে পারে—একথা তাঁহাদের বড় একটা মনে হয় না। সমাজ দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, রোগক্লিষ্ট, কিন্তু ধ্যানমগ্ন সাধুদিগের গণ্ডীর বাহির হইবার যো নাই—মায়াবিনী রাক্ষসী তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। মায়া কাটাইবার ইচ্ছাও যে মায়া—একথা তাঁহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসীদের কর্ম্ম করিলে নিরয়গামী হইতে হয়—এই একটা ভীষণ ধারণা আসিয়া জুটিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতানায় একবার দুর্ভিক্ষ হয়। একজন সন্ন্যাসী ক্লিষ্টদিগের সেবার জন্য ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর এ ব্যবহার একজন ব্রাহ্মণের সহিল না। তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এখন আবার কর্ম্ম করিলে যে আপনাকে নরকগামী হইতে হইবে।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রের বচন ত আর মিথ্যা হইবার নহে; নরকে যাইতে হয় যাইব।" সন্ন্যাসী নরকভয়ে ভীত নহে দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটু বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর যথার্থ মনোগত ভাব জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহাশয়! দুর্ভিক্ষপীড়িতের কষ্ট দূর করা কাহার কর্ম্ম?—গৃহস্থের। গৃহস্থ আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া এখন ভোগসুখলিপ্ত, আর্ত্তের কষ্ট দূর করিবে কে? কাজেই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে। আপনারা আসিয়া এই কাজ করিতে থাকুন, আমরা চলিয়া যাইব। জগতের সেবা করিতে গিয়া যদি নরকভোগই করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সবই ত সেই ব্রহ্ম।"

সমস্ত সন্ন্যাসীর ভিতর যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সমাজে কখনই এতটা জড়তা থাকিত না। ধর্ম্মের যাঁহারা রক্ষক, তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হইলে সমাজে ভীষণ ভেদবুদ্ধি আদি আসিয়া পড়ে।... যাহাদের দয়া নাই, তাহাদের আবার ধর্ম্ম কি? যাহাদের সমবেদনা নাই, তাহাদের আবার পবিত্রতা কি? এই শুষ্ক কঠোরতা যে শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে; যাহারা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের মধ্যেও এই অভিমান কম প্রবল নহে।...

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে আত্মার একত্ব উপলব্ধ হয় নাই, কিন্তু সেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের নামে এত ভেদবুদ্ধি, আচারের নামে এত অত্যাচার! নিয়মের উপর নিয়ম, বন্ধনের উপর বন্ধন আঁটিয়া আমরা সমাজকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছি।...

অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া সকলকেই মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া—এই বর্ণ-বিভাগের উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রেণীর উপকারের জন্যই জাতিভেদ, তাহাদের পীড়নের জন্য নহে। সেই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হইল তাহা হইলে ধিক্ আমাদের ব্রাহ্মণত্ব অভিমানে, ধিক্ আমাদের বেদাধিকারে! যেদিন দেখিব দীনদরিদ্র অনশনক্লিষ্ট শোকতাপার্ত্ত ভারতবাসীর জন্য দেশের শতসহস্র যুবকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে; যেদিন দেখিব ব্রাহ্মণ ঘৃণিত পদদলিত শূদ্রের সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রমাণ করিতে উদ্যত—সেইদিন বুঝিব বৈদিক ঋষিদিগের সমাধি-লব্ধ একাত্মজ্ঞান সফল হইয়াছে। আর যতদিন তাহা না হইবে জ্ঞান শুধু কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে, ততদিন জানিব আমরা যাহা আজকাল ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেছি তাহা কেবল—পারলৌকিক স্বার্থপরতা।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।—সম্পাদক

সপ্তম অধ্যায় ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥২৯॥

শ্লোকার্থ ঃ *জরা ও মরণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত যাহারা আমাকে [শ্রীভগবানকে] আশ্রয় করিয়া প্রযত্ন করে, তাহারা সেই পরব্রহ্ম, যাবতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং সাধনভূত কর্মের রহস্যও জানিতে পারেন।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের বহু জন্মের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখলাভের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইলেও জরা ও মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই, জরা এবং মরণে সর্বপ্রকার সুখ-আয়োজনের অবসান হয়। সাধারণত মানুষের কিছুতেই জ্ঞান হয় না। কিন্তু কোন কোন অভিজ্ঞ জীবাত্মা ইহা হইতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করিয়া ভগবানের কথা জানিলে তখন তাঁহারা সাধনে অগ্রসর হইয়া আত্মানুভূতি লাভ করিয়া জরা-মরণের পারে গমন করেন।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥৩০॥

শ্লোকার্থ ঃ *যে-ভক্তগণ অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিগণ মরণকালেও আমাকে জানেন এবং মৃত্যুকালেও আমাকে স্মরণ করিয়া আমারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হন।*

[**মন্তব্য ঃ** শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিয়াছেন, মৃত্যুকালেও যথার্থ ভক্তের ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা থাকে না। অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা স্বয়ং ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে বিধৃত করিয়াছেন।—**সম্পাদক**]

॥ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টম অধ্যায় ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥২॥

শ্লোকার্থ ঃ *অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম কাহাকে বলে? কর্মই বা কী? অধিভূত এবং অধিদৈব কী বস্তু? হে মধুসূদন, এই শরীরে অধিযজ্ঞ কে? তিনি কীপ্রকারে এই দেহে অবস্থিত? কিভাবেই বা তিনি চিন্তনীয়? মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে আপনাকে জানেন?*

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণ লোকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির অত্যন্ত অভাব। সেইজন্য অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুই তাহারা বুঝে না। অথচ অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় জানিবার একটা প্রয়োজন তাহারা সকলেই অন্তরের অন্তরে অনুভব করে। বিশেষত নানাপ্রকার বিপদে পড়িয়া কোন দৈবীশক্তির সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা হয়। জ্ঞানিগণ এইজন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ পর্যন্ত সৃষ্টির ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার পূজা, যাগ, যজ্ঞাদির উপদেশ করিয়াছিলেন। পূর্বকালে সব তত্ত্বই কাহারও নিকট হইতে শুনিতে হইত। উপাসনা ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা নানাকারণে সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই অবস্থায় সর্ববিধ সৎকর্ম, জ্ঞানপ্রচার কোন কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ফলে মানবজাতির মধ্যে সর্বত্র সমাজশিক্ষা ও রক্ষার ভার পুরোহিত হাতে গিয়া পড়িল। পুরোহিতরা বংশ-পরম্পরায় একইপ্রকার কাজ করিতে করিতে যন্ত্রের মতো হইয়া পড়ে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য নিজের অধীনস্থ লোকদিগকে চিরকাল করতলগত রাখিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে ধর্ম ও নীতি কতকগুলি 'creed'-এ পরিণত হইয়া যুগে যুগে মানবজগতে দারুণ কলহ উপস্থিত করিয়াছে।

মানবজীবনের দুইটি প্রয়োজন সর্বকালে সর্বদেশে বিদ্যমান। প্রথমটি (ইহকাল) এই জীবন রক্ষা করা ও উন্নতি লাভ করা; দ্বিতীয়টি (পরকাল) এই জীবন যাইলেও পরবর্তী কালে সুখে শান্তিতে থাকা। প্রথমটি সম্পাদন করিবার জন্য নানাপ্রকারের আইন-কানুন, শিক্ষা, ব্যবসাদি প্রচলিত আছে

এবং চিরকালই ছিল। পরকালের উন্নতির উপায় ধর্ম নামে জগতে পরিচিত। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই দুটির কোন পার্থক্য নাই। কোন ব্যক্তি প্রকৃতির রহস্য জানিয়া সুখে শান্তিতে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরে পূর্ণ মুক্তি বা আনন্দ লাভ করিবে—ইহাই জীবনের মূল রহস্য। প্রাকৃতিক নিয়মে জগতে সকল মানুষকে একইভাবে পরিচালিত করা কোন কালেই সম্ভব হয় নাই, হইবেও না। সেই কারণেই বিভিন্নপ্রকার পূজা-উপাসনা, যাগ-যজ্ঞাদির প্রচলন হইয়াছে। বর্তমানে বাহ্যজগতের বিষয়-পর্যবেক্ষণ শক্তি আশ্চর্যরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে। তাহার ফলে জগৎ-রহস্য মানুষকে বুঝানো আর পূর্বের মতো অসম্ভব নহে। আমাদের শাস্ত্রে সকল মানুষকে মনুর সন্তান বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব নানা কারণে মানুষ ঠিকভাবে বুঝিতে পারে নাই, কেবল জ্ঞানীরা ইহা অনুভব করিতেন মাত্র। কিন্তু এখন একটু বুদ্ধি থাকিলেই 'Biology', 'Physiology' এবং 'Psychology' পড়িতে পারিলে মানবজাতির ঐক্য অতি অনায়াসে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

শ্লোকার্থ ঃ *যাহা পরম অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম। 'স্বভাব' অর্থাৎ জীবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়। আর, সকল প্রাণীর ভাব (উৎপত্তি) এবং উদ্ভব (বৃদ্ধি)-নিমিত্ত দেবতার উদ্দেশে যে-দান বা যজ্ঞ (ইহাকে বিসর্গ বলা হয়), তাহাই 'কর্ম' নামে অভিহিত।*

ব্যাখ্যা ঃ ইতিহাসে প্রায়শই দেখা যায়, হয়তো আত্মরক্ষার জন্য লোকে একতা অবলম্বনে এক দেশে বাস করিত এবং তাহাদের সামান্য স্বার্থের জন্য অন্য গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিতে ইতস্তত করিত না। বিশেষত যখনি কোন দানবপ্রকৃতির লোক সেই দেশের রাজা হইত, তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে ক্ষেপাইয়া নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অন্য দেশ লুণ্ঠন করিত। ভয়ে কোন লোক তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিত না। ভারতের বাহিরে এবং ভারতবর্ষেও এইরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। যদিও বেদান্তে সাম্যবাদের চূড়ান্ত কথা সব লিখিত আছে, তথাপি মনুষ্যসমাজে কখনো তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মানবজাতির মধ্যে নানান দার্শনিক মতবাদ যথা, 'Nihilism', 'Communism', 'Socialism' প্রভৃতি ভাব স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে অনেক বুদ্ধিমান লোক জানিতে পারিয়াছেন যে, আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে এবং কলহ না করিয়াও এই জগতে বাস করা যাইতে পারে।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং'—গঙ্গা যেমন গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া সাগরে পড়িতেছে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্যমান সৃষ্টি বহির্গত হইয়া যেন দারুণ বেগে প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃতিতে আবার মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই চিরচঞ্চল সৃষ্টির পিছনে একটি সম্পূর্ণ স্থিরবস্তু রহিয়াছে; তাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই, তাহার সীমা নাই। তাহাতে অনন্ত সৃষ্টি রহিয়াছে। তাহা সবচেয়ে বড় বলিয়া তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে (বৃনহ্+মন্=বৃহত্তম)। এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানার নামই জ্ঞানলাভ করা। আমরা এই সৃষ্টির ভিতরে আছি—এই সৃষ্টি পার হইয়া ব্রহ্মের নিকট যাইতে গেলে সৃষ্টির সমস্ত স্তরভেদ করিয়া যাইতে হইবে; সেই স্তরগুলিকেই 'অধ্যাত্ম', 'অধিভূত', 'অধিদৈব', 'অধিযজ্ঞ' নামে শ্রীভগবান অভিহিত করিলেন।

যেমন দেখিতে পাই, কখনো কখনো সূর্য মেঘাবৃত হইলেও মেঘের ভিতর দিয়া কিছু কিছু আলো দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য একেবারে অদৃশ্য হন না—ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এই সৃষ্টির পিছনে থাকিলেও সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার ঈষৎ প্রকাশ একটু একটু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সামান্য প্রকাশগুলিকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মের নিকট পৌঁছাইতে হয়। সব প্রাণীর ভিতরেই একটা 'স্ব-ভাব' আছে, তাহারা সকলেই নিজের ভিতর 'আমি' 'আমি'—এরূপ একটা অনুভব করিয়া থাকে। জীবের ভিতরে ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই 'আমি'-কে ধরিয়া ব্রহ্মের কাছে পৌঁছাইতে হয়। আত্মা শব্দের অর্থ—'আমি'। সকল আত্মাকে তিনি অধিকার করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার সেই ভাবকে 'অধ্যাত্ম' বলে। [ক্রমশ] ॥ বত্রিশ ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ ভাদ্র ১৪১২
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী নিরঞ্জনানন্দ**
শ্রাবণ পূর্ণিমা
৩ ভাদ্র, শুক্রবার
(১৯ আগস্ট ২০০৫)
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী
১০ ভাদ্র, শুক্রবার
(২৬ আগস্ট ২০০৫)
স্বামী অদ্বৈতানন্দ
শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী
১৭ ভাদ্র, শুক্রবার
(২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ ১৪, ২৯ ভাদ্র
মঙ্গলবার, বুধবার
(৩০ আগস্ট, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫)

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *যেসব ভারতীয় আমেরিকানদের বিবাহ করে ওদেশেই রয়ে গেছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী মত? তাঁদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের ওপর আমেরিকান জীবন কীরকম প্রভাব ফেলতে চলেছে?*

উত্তর ঃ এমন বহু ভারতীয় আছেন, যাঁরা আমেরিকায় বিবাহ করে ওদেশেই পাকাপাকিভাবে রয়ে গেছেন। তাঁদের কয়েকজন আমাকে আমেরিকায় ছেলেমেয়ে মানুষ করার অসুবিধার কথা বলেছেন। ওদেশের সমাজ এইসব ছেলেমেয়েকে হু হু করে নিজের স্রোতের মধ্যে টেনে নেয়, যদিও সেই স্রোতে এমন কিছু অশুভ শক্তি থাকে যা আধুনিক আমেরিকান ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ক্ষতিকর। এব্যাপারে বহু আমেরিকাবাসীও আজ চিন্তিত। তাঁদের প্রশ্ন—আমাদের ছেলেমেয়েদের কী [উন্নতি] হচ্ছে? আসলে, এইসব ছেলেমেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমেরিকান সমাজের দুর্বার জনস্রোতে। দুর্ভাগ্যবশত ঐ সমাজজীবনের অনেকটাই গড়ে উঠেছে হলিউড সিনেমা ও টিভির আদলে—যে-টিভির অবস্থান আজ ঘরে-ঘরে। তাই সমস্যাটা যতটা আমেরিকান বাবা-মায়েদের, ততটাই ভারতীয় বাবা-মায়েদেরও, বিশেষত তাঁদের—যাঁদের মনে মানব ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রা সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা আছে। এই সমস্যার সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে চলবেন তা ঠিক করতে না পেরে এই শ্রেণির মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েন। যেমন, ছোটরা খুব সহজেই সমসাময়িক আমেরিকান সমাজের মূল্যবোধ, অদ্ভুত চালচলন ও ভাষা রপ্ত করে ফেলে। তারা কখনো কখনো সামাজিক ঐতিহ্যপূর্ণ সমস্ত কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। তারা শ্রদ্ধা হারায় বাবা-মা, গুরুজনের ওপর; শ্রদ্ধা হারায় মাস্টার মশাইদের ওপর। আর ঈশ্বরে শ্রদ্ধাভক্তি তো একটি অতি দুর্লভ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে! ব্যক্তিত্বসর্বস্বতার একক আধিপত্যের ফলে অন্তরের সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার জগতে মানুষ একরকম ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে। সভ্যতা খুব বেশিরকমভাবে যন্ত্রচালিত ও যন্ত্রশিল্পনির্ভর হয়ে পড়লে এবং একটি আদ্যোপান্ত বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হলে জন্ম নেয় এইসব সমস্যা। ছোটদের কখনো কখনো তাদের বাবা-মায়ের সম্বন্ধে বলতে শুনেছি—'বুড়োবুড়িগুলো'। এইসব ছোটদের কারো কারো ভাবনাচিন্তাটা এইরকম—বুড়োবুড়িগুলো এই দেহের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু ওরা তো এখন 'বুড়িয়ে' গেছে—ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এইবার আমরা আমাদের নিজের জীবন ঠিকঠাক বুঝে নেব।

মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটি পবিত্রতার দিক আছে, সেটাই ওদেশের আধুনিক মানবদর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও সেখানকার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও জীবনচর্যায় এই ভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়, তবুও একথা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান দর্শন এইসব [অধ্যাত্মবাদী] চিন্তাভাবনার একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ব্যাপারটা সত্যি সত্যি হয়ে দাঁড়ায় স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার মতো—যে-স্রোত এক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী; আর তার সেই শক্তিটা আসছে আধুনিক জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বৃহত্তর অংশের ভাবতরঙ্গ থেকে।

মানুষের চিন্তাজগতে এই বিকৃতির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী অতিমাত্রায় ফ্রয়েডীয় চিন্তা, যার উৎপত্তি মানবচরিত্র সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ফ্রয়েড একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন; তিনি মানুষের মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বকে মানব মনের চেতন স্তর থেকে অর্ধচেতন ও অচেতন স্তরে নিয়ে গিয়ে ঐ বিদ্যাকে এক সুগভীর বিজ্ঞানসম্মত ধারায় অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি একজন রূপকার তথা পথিকৃৎ। কিন্তু না এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাঁর ভাবনাচিন্তার স্তরেই থেমে থেকেছে, না তাঁর পথিকৃৎতুল্য প্রচেষ্টা ও সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারতীয় জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে 'বৈপ্লবিক' বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। ভারতবর্ষের সুগভীর মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান কেবল মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধচেতন ও অচেতন অবস্থা আবিষ্কার করেই বা চেতন স্তরে মানুষের ভাবনাচিন্তা ও ব্যবহারের ওপর ঐ দুই স্তরের প্রভাব চর্চা করেই থেমে থাকেনি, এই বিদ্যা আরো গভীরে প্রবেশ করে আবিষ্কার করেছে এক অতিচেতন সত্তাকে; সন্ধান পেয়েছে মানবহৃদয়ে অবস্থিত এক দৈবী সত্তার—একমাত্র যে-সত্তা থেকে আসে তার সমস্ত নৈতিক, নৈসর্গিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের স্বীকৃতি বা অনুমোদন। মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে আসতে থাকা নিত্যনতুন তথ্যের সম্মুখীন হতে অস্বীকার করার দরুন ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এক জায়গায় নিশ্চলভাবে আটকে পড়েছিল। মানুষের মন যে শুধুই 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ'—

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব তার এই নিজস্ব গোঁড়া মতবাদ ত্যাগ করতে চাইল না। অথচ তার ওপর চাপ আসছিল ফ্রয়েডেরই কয়েকজন সহকর্মীর চিন্তাভাবনা থেকে—যেমন ইয়ুং (Jung)-এর, যিনি মনে করতেন যে, ফ্রয়েড-কথিত 'ইদ্' (Id)-এর অন্তর্গত ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা দিয়েই আমাদের মনোজগৎ গঠিত নয়; মনের মধ্যে এমন 'কিছু' আছে যা 'ইদ্'-এর বিরোধিতা করে, তাকে প্রতিহত করে—এবং সেই 'কিছু'কে তিনি বললেন 'স্পিরিট'। বললেন, 'স্পিরিট' যদি একটি অস্পষ্ট ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে 'ইদ্'-ও তা-ই। সুতরাং ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি মোটামুটি সন্তোষজনক মানবদর্শন গড়ে তুলে সেখানেই থেমে থাকার অর্থ হলো মানবব্যক্তিত্ব ও মানবীয় সত্তার অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকৃত করা, খর্ব করা। পাশ্চাত্যে এটাই ঘটেছে। সেখানে বহুকাল ধরে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব মানুষের মনের ওপর তার একচ্ছত্র শাসন চালিয়েছে। আজ সেখানে মানুষ এটা ক্রমশ আরো বেশি করে বুঝতে পারছে।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব কী বলে? বলে—মানুষের মনের সবরকম আবেগকে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করতে দাও; তাদের সংযত করার, সংহত করার, শৃঙ্খলিত করার বা দমন করার চেষ্টা করো না। এসব করলে মানুষের ব্যক্তিত্বে এক অসহ্য যন্ত্রণাময় অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই মতের কিছুটা ঠিক, কিছুটা ভুল; কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব জোর দিয়ে বলে যে, এটা পুরোপুরিই ঠিক। তাই বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার সাহস করেন না, আর সেই একই কারণে নিজেদেরও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন না। শিক্ষককুল ও সমাজও একই পথ অনুসরণ করে। দূর করে দেওয়া হয় নিজের ওপর সবরকম নিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযমকে; আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া 'অবাঞ্ছিত' ডিসিপ্লিনের তো কথাই নেই!

এর ফলে আমেরিকায় এসেছে এক নতুন দর্শন—যাকে বলা হচ্ছে 'আবেগ-উন্মোচী' বা 'impulse-release' দর্শন। এর বক্তব্য হলো—মনের মধ্যে যেকোন আবেগ উঠলেই তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দাও বা উন্মোচিত কর; তাকে ধরে রেখো না, নিয়ন্ত্রণ করো না; কারণ ওগুলি খুব 'স্বাভাবিক', ওগুলি সুন্দর। এখন, স্বভাবতই এইসব আবেগের বেশির ভাগই আসে মানুষের জৈব প্রকৃতি থেকে, অর্থাৎ এগুলি 'জৈব' মানুষের আবেগ—এবং 'জৈব সত্তার ওপরে তো আর কিছুই নেই'! অতএব পুরো ভাবনাটা সাধারণত পথ হারায় মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের স্তরেই এবং জীবন ক্রমশ আরো বেশি করে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে শুরু করে জৈব পরিতৃপ্তির মধ্যেই। আর যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সামান্য জৈব পরিতৃপ্তির চেয়ে উর্ধ্বতর কোন মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চান, তাঁদের বস্তুত এই ফ্রয়েডীয় ফতোয়ার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে কোনরকমে টিকে থাকতে হয়।

তবে শেষোক্ত মানুষদের কেউ কেউ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন। আসলে তাঁরা এই ব্যবস্থার ভয়াবহ দিকটিকে দেখতে আরম্ভ করেছেন। এইরকমই একজন মানুষ—একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; যাঁর একটি শাণিত উক্তির কথা আমি প্রায়ই আমার বক্তৃতায় বলতাম, আর তাতে শ্রোতারা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতেন। উক্তিটি আমি কোথাও পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ "আমাদের একটা পুরনো প্রবাদ ছিল—Spare the rod and spoil the child, অর্থাৎ বেত হঠাও, বাচ্চার বারোটা বাজাও। এখন আমরা সঙ্গতভাবেই ঐ প্রবাদ বর্জন করেছি; ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আমরা ভীতি ও শারীরিক শাস্তির জায়গায় নিয়ে এসেছি ভালবাসা, দয়া ও সহমর্মিতা। এটা চমৎকার হয়েছে। তবে, এখন আমাদের শিক্ষাকে উদ্বোধিত করার জন্য দরকার একটি নতুন প্রবাদের, এবং সেটি হলো—Spare the Freud and save the child! অর্থাৎ ফ্রয়েড হটাও, বাচ্চা বাঁচাও!"

ব্যক্তিত্ব-বিকারের হাত থেকে শিশুদের বাঁচাতে হলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে বিদায় দিতে হবে। শিশুকে তার সব আদিম আবেগ সংযত করে উন্নততর আত্মসংযত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠার শিক্ষা দিতে হবে। তবে, সত্যিই কি এইরকম 'উন্নততর' স্তর বলে কিছু আছে? আধুনিক যুগের এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং এর যুক্তিসঙ্গত উত্তর রয়েছে বেদান্তে। সত্যিই যে এরকম 'উন্নততর' কোন স্তর আছে, বেদান্ত সেব্যাপারে নিয়ে আসে এক দৃঢ় প্রত্যয় ও অনুভূতি—কেবল বিশ্বাস নয়। মানব-অস্তিত্বের শিকড়-সন্ধানী ভারতীয় দর্শনের এ-ই হলো স্থির সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, এটি একটি সিদ্ধান্ত, যেটিকে যেকেউ যাচাই করে নিতে পারেন। আর ঠিক এখানেই আধুনিক যুগের পটচিত্রে বেদান্তের প্রত্যয়ী প্রবেশ—যা মানুষকে এই যুক্তিনিষ্ঠ বোধে প্রতিষ্ঠিত করে যে, কেবল দৈহিক বা জৈব সত্তার অতি-পরিচিত গণ্ডির উর্ধ্বে তার ব্যক্তিত্বের একটি ভিন্নতর, উচ্চতর মাত্রাও আছে।

[ক্রমশ]

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যার ৩১৬ পৃষ্ঠার ৩৪তম পঙ্ক্তিতে '২৬ এপ্রিল ২০০৫' হবে।

গত আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যার ৪৪৫ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২য় পঙ্ক্তিতে 'স্বামী হৃতানন্দজী'র স্থলে 'স্বামী ঋতানন্দজী' হবে।

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।—**সম্পাদক**

তারকেশ্বর

অরিন্দম দাস

শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন অরিন্দম দাস। এবার দ্বাত্রিংশতম পর্যায়।—সম্পাদক

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিকালের শত শত মানুষের পাপ-তাপ নিজের ভাগবতী তনুতে গ্রহণ করে তিনি স্বেচ্ছায় 'ক্রুসিফায়েড' হতে চলেছেন। কণ্ঠহারের মতো তিনি ধারণ করেছেন মারাত্মক কালব্যাধি—ক্যান্সার। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর শরীর ছটফট করছে, কিন্তু মন সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী। চারপাশে পরিবৃত ভক্তজনদের মুখে ঘনায়মান অমাবস্যার অন্ধকার। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবী এতকালের অন্তরাল সরিয়ে দিয়ে প্রাণপণে সেবা করছেন, সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন তাঁর সন্তানদের। কিন্তু তাঁর স্বামী 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে' দিয়ে মহানন্দে উপভোগ করছেন মহা-কালের পদধ্বনি! মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই তিনি স্বামিহারা হতে চলেছেন!

শ্রীশ্রীতারকনাথ

একদিন তিনি স্থির করলেন তারকনাথের কাছে 'হত্যা' দেবেন। জগৎরক্ষায় যিনি স্বয়ং নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন—তিনিই যদি কৃপা করে তাঁর স্বামি-দেবতার শরীরকে রক্ষা করেন। শিব ছাড়া সতীর মর্মযন্ত্রণা আর কেই বা বুঝবে!

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনুমতি চাইলেন শ্রীশ্রীমা। তিনি অনুমতি দিলেন, কিন্তু ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন—কিছু লাভ হবে না। একদিন কাশীপুর থেকে তারকেশ্বরের পথে রওনা দিলেন শ্রীশ্রীমা। সঙ্গী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবী এবং একজন পরিচারিকা।[১] তিনি কোন্ তারিখে কোন্ সময়ে যাত্রা করেছিলেন তা জানা যায় না। জানা যায় না, তিনি কোন্ পথে উপস্থিত হয়েছিলেন তারকেশ্বরে। প্রসঙ্গত, সেসময় শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ট্রেন চলত। ১ জানুয়ারি ১৮৮৫ থেকে তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ব্রাঞ্চ লাইনে ২২-২৩ মাইল ট্রেন চালাতে শুরু করে। লাইনটি তৈরি করেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েজ।[২] সুতরাং শ্রীশ্রীমা ট্রেনপথেও তারকেশ্বরে গিয়ে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো কাশীপুর থেকে নৌকায় বৈদ্যবাটী, সেখান থেকে পদব্রজে অথবা গরুর গাড়িতে শেওড়াফুলি হয়ে ট্রেন ধরেছিলেন। অন্যপ্রকারেও গিয়ে থাকতে পারেন। শেওড়াফুলি থেকে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে তিনি তারকেশ্বরে যেতে পারেন। মোট কথা, এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। যেটুকু জানা যায়, সেটি শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখের কিছু কথাঃ "ঠাকুর তাকে [নাগ মহাশয়কে] প্রসাদ করে দিতে গিয়ে ভাত বেশ এত কটা খেলেন। বললুম, 'এই তো বেশ খাচ্চ, তবে আর সুজি খাওয়া কেন? ভাত দুটি দুটি খাবে।' ঠাকুর বললেন, 'না না, শেষ অবস্থায় এই আহারই ভাল।' এক একদিন নাক দিয়ে, গলা দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়ত—অসহ্য কষ্ট হতো। আহা, তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম, তাতেও কিছু হলো না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজানো থাকলে তার উপর ঘা মেরে কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেইরকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, 'এজগতে কে কার স্বামী? এসংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?'—একবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে নিলে! আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে-মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম—পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে পড়েছিলুম কিনা। তবে প্রাণ একটু সুস্থ হলো। তার পরদিনই চলে আসি। আসতেই ঠাকুর বললেন, 'কিগো, কিছু হলো?—কিছুই না।' "[৩]

হলো সেটিই—যেটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্থির করে রেখেছিলেন। শ্রাবণ সংক্রান্তির রাত্রে মহাসমাধিতে লীন হওয়ার পূর্বে বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত করে গেলেন শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরে। আর সতীর অন্তরের আকুতি ও অশ্রু অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করে শৈবতীর্থ তারকেশ্বর অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে।

তারকনাথের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সংযোগ অবশ্য আরো আগেকার। তাঁর কথা থেকেই জানা যায়, ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র মাস (মার্চ ১৮৮১) নাগাদ তিনি প্রসন্ন-মামা, লক্ষ্মী-দিদি প্রমুখের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আসার পথে তারকনাথের কাছে 'গত অসুখের মানসিক নখ-চুল' দিয়ে এসেছিলেন।[৪] এরও

আগে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন মাস নাগাদ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭) তিনি তারকেশ্বরে এসেছিলেন। সেটি ছিল তাঁর চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বর-আগমন। সেবার পথে তেলোভেলোর মাঠে তিনি ডাকাতের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সে রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন। পরদিন প্রভাতে ডাকাতসর্দার সাগর সাঁতরা ও তাঁর স্ত্রী শ্রীশ্রীমাকে তারকেশ্বরে পৌঁছে দেন। তখন সকাল প্রায় নয়টা। প্রথমে তাঁরা উঠেছিলেন একটি দোকানে। শ্রীশ্রীমায়ের 'ডাকাত-মা' 'ডাকাত-বাবা'কে বলেন ঃ "আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি; বাবা তারকনাথের পূজা শিগগির সেরে বাজার থেকে মাছ, তরকারি নিয়ে এস, আজ তাকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।"[৫] আমাদের অনুমান, তারকনাথের মন্দিরের কাছে এসে তাঁকে দর্শন না করে শ্রীশ্রীমা চলে যাননি।
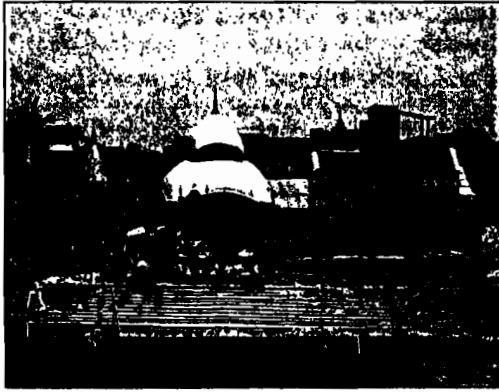
তারকেশ্বর-মন্দির, সামনে দুধপুকুর ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

বস্তুত, সেকালে কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় গমনাগমনের সময় শ্রীশ্রীমাকে বহুবার তারকেশ্বর হয়ে যেতে হয়েছে। প্রত্যেকবারই কি তিনি তারকনাথকে দর্শন করে যেতেন? তেমন সুনির্দিষ্ট কোন তথ্যপ্রমাণ না থাকলেও আমাদের অনুমান, কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যও তাঁকে তারকেশ্বরে থামতে হতো। সেসময় তারকনাথকে দর্শন করা বিচিত্র নয়। শ্রীশ্রীমা এরকম কতবার এসেছেন তারকেশ্বরে? তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অনুসন্ধান ও তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, শ্রীশ্রীমা মোট আটবার এই পথে কলকাতায় এসেছেন এবং সাতবার ফিরেছেন।[৬] যিনি নিজের অসুখ নিরাময়ের জন্য তারকনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরোগ্যের জন্য কলকাতা থেকে অত দূরে তারকেশ্বরে গিয়ে 'হত্যা' দিয়েছিলেন—তাঁর তারকনাথ-প্রীতি ও বিশ্বাস যে কত গভীর ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

এই শৈবক্ষেত্রে তিনবার শুভাগমন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীম-র অপ্রকাশিত ডায়েরি থেকে স্বামী প্রভানন্দ উল্লেখ করেছেন, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি, রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীম স্ত্রী, দ্বিতীয় পুত্র ও একজন পরিচারিকাকে নিয়ে তারকেশ্বর যান। পরদিন তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চান ঃ "কিছু দিয়েছিলে?" শ্রীম বলেন ঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ, পাণ্ডাকে বললুম আমায় খুব ভালভাবে পূজা করিয়ে দাও। চার আনা দক্ষিণা দেব।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বলেন ঃ "বেশ করেছ।" শ্রীম আরো বলেন, পাণ্ডারা শিবলিঙ্গের ওপরকার ঢাকনা তুলে দিলে তিনি তাঁকে স্পর্শ করে জপ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হয়ে বলেন ঃ "এতদিনে তোমার হাত শুদ্ধ, হাড় শুদ্ধ হলো।" কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ "কেমন, তোমার কি বোধ হলো—[তারকেশ্বর] সত্য কিনা?" শ্রীম বলেন ঃ "আজ্ঞে, খুব প্রকাশ দেখলুম, আর যেতেই গা ছমছম করতে লাগল। আরো ভাবতে লাগলুম, উনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] তিনবার ছুঁয়ে গেছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বলেন ঃ "কেমন, তিনি[ই] সব হয়েছেন না? নরেন্দ্র এখন সব মানছে।"[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দও এই তীর্থে আগমন করেছিলেন।

তারকনাথ এইভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করে আসছেন। অনাদি শিবলিঙ্গ তারকনাথের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। তারকেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে রামনগরে তখন বাস করতেন রাজা বিষ্ণুদাস। ভারামল্ল নামে তাঁর সংসারত্যাগী এক ভ্রাতা জঙ্গলে যোগসাধনা করতেন। গুড়ে-ভাটা গ্রামের মুকুন্দরাম ঘোষের ওপর ন্যস্ত ছিল রাজবাড়ির যাবতীয় গাভির রক্ষণাবেক্ষণের ভার। তিনি প্রায়দিনই দেখতেন, কয়েকটি গাভি সম্পূর্ণ দুধশূন্য হয়ে থাকে। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন, গাভিগুলি নিকটবর্তী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে একটি শিলাস্তম্ভের ওপর তাদের সমস্ত দুধ নিঃশেষ করে ফিরে আসছে। মুকুন্দরাম ভারামল্লকে এই অদ্ভুত ঘটনাটি জানালেন, তিনিও গিয়ে দেখলেন সেই এক দৃশ্য।

ভারামল্ল রাজা বিষ্ণুদাসকে এই শিলার কথা জানালে তিনি তাঁকে রামনগরে তুলে আনার বন্দোবস্ত করলেন। সেই অনুযায়ী একদিন পঞ্চাশ হাত খুঁড়েও তাঁর মূল না পাওয়ায় সেদিনের মতো খননকার্য স্থগিত থাকল। সেই রাতেই ভারামল্ল স্বপ্নে দেখলেন, তারকনাথ যেন তাঁকে বলছেন—'আমি তারকেশ্বর শিব, কেউ আমাকে তুলতে পারবে না; কারণ গয়া, গঙ্গা, কাশী পর্যন্ত আমার প্রসার আছে। তুমি আমায় তোলার চেষ্টা করো না, বরং এখানেই আমার মন্দির তারকেশ্বরের মন্দির বলে নির্মাণ করে দাও।' এই স্বপ্নাদেশের পর ভারামল্ল ও বিষ্ণুদাস—দুই ভাই মিলে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। ভারামল্ল দেবসেবার জন্য ১,০২৩ বিঘা জমি অর্পণ করেন এবং মুকুন্দরাম ঘোষের ওপর যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত

হয়। কিছুকাল পর মুকুন্দ ঘোষ প্রয়াত হলে মহন্ত হন মায়াগিরি ধূম্রপান।[৮] পরবর্তী কালে মন্দিরটি ভেঙে গেলে বর্ধমানের মহারাজা পুনর্নির্মাণ করে দেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে চিন্তামণি দে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে মন্দিরের সামনে নাটমন্দির নির্মাণ করেন। তারকনাথের মাহাত্ম্য-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হওয়ায় ছোট মন্দিরে তাঁদের অসুবিধা হতে থাকে। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ছোট মন্দিরের ওপর বর্তমান আটচালা শৈলীর বড় মন্দিরটি তৈরি করে দেন পাতুল-সন্ধিপুর নিবাসী গোবর্ধন রক্ষিত। বাংলায় শৈব সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ মঠ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'মাসিক বসুমতী'র ভাদ্র ১৩৬২ সংখ্যায় জানিয়েছেন, ভারামল্লের আগেও 'তারকেশ্বরের অস্তিত্ব শিষ্টসমাজে অজ্ঞাত ছিল না'। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখ থেকে। সেখানে লেখা আছে—'শুভমস্তু শকাব্দ ১৫৪৩'। অর্থাৎ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দেও তারকনাথের পরিচিতি ছিল।

এখানেই শ্রীশ্রীমা 'হত্যা' দিয়েছিলেন বলে কথিত

● *আলোকচিত্র : মৃগাঙ্কশেখর কর*

গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে ১/২ ফুট উঁচু এবং ৩/৪ ফুট ব্যাসের বৃহদাকার শিবলিঙ্গের ওপর নানা আবরণ ও ফুল-মালা দিয়ে সাজানো থাকায় শিবলিঙ্গকে স্পর্শ করা যায় না। সুধীরকুমার মিত্র জানিয়েছেন : "গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ এই শিবলিঙ্গকে সামান্য পাথর-জ্ঞানে উহার উপর ধান ঝাড়িত। বহু বৎসর যাবৎ এইরূপ ধান ভানিবার জন্য শিবলিঙ্গের উপরে একটি গর্ত হইয়া যায়। এই গর্ত আজও তারকনাথের মাথায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়।"[৯]

সেই কোন্ কাল থেকে কত শত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে আশুতোষ মহাদেব স্থির অবিচলভাবে অবস্থান করছেন পশ্চিমবঙ্গের এই অদ্বিতীয় শৈবতীর্থে। শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে জনসমুদ্র এসে আছড়ে পড়ে তাঁর সামনে। বছরের অন্যান্য সময়েও তাঁর আশীর্বাদ নিতে নিত্য অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের কাছে এই তীর্থের মহিমা বোধকরি আরো অনেক বেশি। কারণ, শিবের পাশাপাশি সতীর—শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি সারদাদেবীর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। তাই এই মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আমরা শুধু তারকনাথকেই স্মরণ করি না, স্মরণ করি শ্রীমা সারদাদেবীকেও। ❑

<u>পথনির্দেশ</u> : ঠিকানা—শ্রীশ্রীতারকনাথ মন্দির। গ্রাম ও পোঃ তারকেশ্বর, জেলা—হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪১০। কলকাতা থেকে ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই মন্দিরে আসতে গেলে ট্রেনপথই শ্রেয়। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর লোকালে সময় লাগে প্রায় পৌনে দু-ঘণ্টা। বাসেও আসা যেতে পারে। স্টেশন থেকে মিনিট দশেক দূরত্বে তারকনাথের শ্রীমন্দির। মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ৩টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র

১ দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, এস. মণ্ডল, বিদ্যামন্দির, ঢাকুরিয়া, ৩য় সং, পৃঃ ৭২। সম্ভবত তাঁদের সঙ্গে কোন পুরুষ যাত্রাসঙ্গীও ছিলেন, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।

২ দ্রঃ কাশীপুর থেকে তারকেশ্বর—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মাতৃশক্তি', ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১১, পৃঃ ১৯২। তারকেশ্বর স্টেশনে স্থাপিত একটি ফলকে লেখা আছে : "১৮৮৬ খৃঃ প্রথমার্ধে, (আগস্টের পূর্বে) মাতা সারদামণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আরোগ্যকামনায় এই শাখা রেলে তারকেশ্বর (প্রথম ট্রেনে) এসে শ্রীশ্রীতারকনাথ মন্দিরে ধর্নায় পড়েছিলেন। শতবর্ষপূর্তি স্মরণে মর্মর ফলকটি স্থাপিত হলো।"

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১৪০৮, পৃঃ ২১৬-২১৭। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী একটি অতিরিক্ত তথ্য জানিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা তারকনাথের মন্দির-সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে নানা উপচারে তারকনাথের পূজা করেছিলেন। তারপর সেই সিক্তবসনেই অনাহারে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য 'হত্যা' দিয়েছিলেন। (দ্রঃ সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১২৩)

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২২৯

৫ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৫৮

৬ দ্রঃ শ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় শ্রীশ্রীমা পদব্রজে তেলোভেলোর পথ দিয়ে তারকেশ্বর হয়ে বৈদ্যবাটীতে আসতেন। সেখান থেকে নৌকা ধরে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাতেন। বর্ধমান ও বিষ্ণুপুর থেকে রেল চলাচল শুরু হলে তিনি এপথ দিয়ে আর যাননি। এপথ দিয়ে তাঁর শেষবার দক্ষিণেশ্বরে আসা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।

৭ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০১-১০৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ কোন্ সময়ে এবং কী কী উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে তিনবার গিয়েছিলেন, তা জানা যায় না।

৮ হুগলি জেলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৯১, পৃঃ ১১১৩

৯ ঐ, পৃঃ ১১১২

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

গুরুপূর্ণিমা

স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ*

(গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা)

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সনাতন সংস্কৃতির নির্যাসস্বরূপ 'গুরুপূর্ণিমা' আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় অতি নিষ্ঠাসহকারে পালন করেন এই তিথিটি।

● গুরুপূর্ণিমা কি ও কেন? ●

পরব্রহ্মের বাঙ্ময় প্রকাশ—মহাবিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত। তিনি নিত্য বর্তমান। তিনিই আদি, তাঁর কোন স্রষ্টা নেই। তিনি নিষ্ক্রিয়, তবুও তাঁর ইচ্ছামাত্র ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তিনি ইচ্ছা করলেন—"একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।" অর্থাৎ আমি এক থেকে বহু হব। ফলে তাঁর নাভিকমল থেকে সৃষ্টি হলো ব্রহ্মার। শ্রীবিষ্ণু ভাবলেন, আমি আমার সৃষ্ট জীবকে মুক্তিমন্ত্র দেব। তাই জ্ঞানময় বেদের সৃষ্টি হলো।

এই বেদজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম অধিকারী ব্রহ্মা। তাই পরব্রহ্মই আদি গুরু এবং ব্রহ্মাই আদি শিষ্য। পরব্রহ্ম এই বেদজ্ঞান ব্রহ্মাকে দেন আষাঢ় পূর্ণিমাতে। তাই তা 'গুরুপূর্ণিমা' নামে খ্যাত।

ব্রহ্মা এই বেদজ্ঞান দিলেন চার ঋষি—সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতনকে। এই ঋষিচতুষ্টয় বেদজ্ঞান দিলেন অত্রি, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ—এই সপ্তর্ষিকে। পরে গুরু ও শিষ্য পরম্পরায় এই জ্ঞান এল সাকল্যাচার্যের কাছে। সাকল্যাচার্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের গুরু।

ব্যাসদেব এই জ্ঞান বা মহাজ্ঞান চারভাগে ভাগ করেন। নামকরণ করেন—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। তাঁর চার শিষ্য পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও সুমন্তকে এই চারটি বেদের ভার দিলেন। তাঁরা ভূভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেদের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটালেন। তাই ব্যাসদেবের নাম হলো 'বেদব্যাস'। তাঁর পিতা ছিলেন পরাশর মুনি এবং মাতা ধীবর-রাজকন্যা সত্যবতী। মহাভারতে তাঁর জন্মের বর্ণনা আছে। এই আষাঢ় পূর্ণিমাতে পরাশর মুনির ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল ব্যাসদেবের। আর এইদিনই তিনি বেদ বিভাগ করেছিলেন। তাই এই দিনটিকে 'ব্যাসপূর্ণিমা'ও বলা হয়।

ব্যাসদেবকেই প্রধান গুরু মনে করে সমস্ত সম্প্রদায় এই দিনটিতে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন এবং তার সঙ্গে তাঁরা নিজের ব্যক্তিগত গুরুপূজাও করে থাকেন। সাধু-ভক্ত সকলে এই দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

● 'গুরু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ●

(১) √গৃ + কু = গুরু। √গৃ = শব্দ করা + উ (কু) কর্তৃবাচ্যে। যিনি যেকোন বিদ্যা তথা ধর্মকর্মের পথ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ যেকোন বিদ্যালাভ করতে হলে গুরুকরণ প্রয়োজন। কারণ গুরু ছাড়া কোন বিদ্যালাভ হয় না।

(২) √গৃ = গলাধঃকরণ করা। যিনি শিষ্যের সকল পাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন, তিনি গুরু-পদবাচ্য।

(৩) 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা'য় (১।৩৪) আছে: "স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।" যিনি ক্রিয়া করিয়া আমাকে বেদজ্ঞান দান করেন, তিনিই গুরু।

(৪) গ-কার: সিদ্ধিদঃ প্রোক্ত; রেফং পাপস্য দাহকরঃ (বা হারকঃ); উ-কার: শম্ভুরিত্যুক্ত (বা বিষ্ণুরব্যক্ত), ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ (বা গুরুঃ পরঃ) (রঘুবংশম্, ১।৫৭, ২।৬৮)

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—গ-কার সিদ্ধি দান করে। র-কার পাপের দহনকারী বা হরণকারী এবং উ-কারকে বিষ্ণু বা মহাদেব বলে জানবে। আর গুরুতেই এই তিন শক্তি যুক্ত থাকে।

● সনাতন ভারতবর্ষে গুরু কারা? ●

দুই জাতির মধ্যে অগ্নি গুরু। আর বর্ণসমূহ অর্থাৎ জাতিবিভাগ করলে ব্রাহ্মণই গুরুপদবাচ্য। স্ত্রী অর্থাৎ বধূদের গুরু হলেন স্বামী এবং সবজায়গায় অতিথি হলেন গুরু। তাই বলা হয়: "গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং/ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ/ পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং/ সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" (হিতোপদেশ, মিত্রলাভ-৬২)

এ তো গেল সমাজে জীবনযাপনের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ ধারা বজায় রাখার বিধান। কিন্তু গুরু হলেন আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান দেওয়ার একমাত্র কর্ণধার। অর্থাৎ 'গুরু' শব্দটির বহুল ব্যবহার কেবল ব্রহ্মোপলব্ধি তথা নিজের স্বরূপ জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই দেখা যায় পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ এসেছেন, প্রায় সকলেই গুরুগ্রহণ করেই সিদ্ধিলাভ করেছেন।

● শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর আলোকে গুরু ●

সাধন-ভজনে উৎসাহ দেওয়া এবং হতাশা থেকে মুক্ত করার জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধন করিয়ে লন।" আবার তিনি ব্যক্তিগুরুকে প্রাধান্য না দিয়ে বলেছেন: "গুরু এক সচ্চিদানন্দ।" সেইজন্য মানুষ-গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করার জন্য তিনি সিদ্ধান্তবাক্যে বলেন: "গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান

---

* *রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ায় কর্মরত সন্ন্যাসী।*

করলে তবে হয়।" আর গুরু যতই মানুষের মতো আচরণ করুন না কেন, "গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নাই।" তবে গুরুকরণের সময় একটু যাচাই করে নিতে হয়, নাহলে উভয়েরই যন্ত্রণা। অর্থাৎ "গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা।" আর আত্মোপলব্ধি তখনি সম্ভব, যখন গুরু নিজে উপলব্ধিবান পুরুষ হবেন। তাই তিনি বলেন ঃ "গুরু নিজে পূর্ণজ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।" তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাসই সাধককে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। তাই তাঁর বাণীতে দেখা যায় ঃ "গুরুবাক্য ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খেই ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।" "গুরু যে-নামটি দেবেন, বিশ্বাস করে সেই নামটি লয়ে সাধন-ভজন করতে হয়।" আর গুরুকৃপায় যে একমুহূর্তে মুক্তি হয়ে যায়, সেকথাও তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন ঃ "গুরুকৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়।" অবশ্য একটি বিষয়ে তিনি আমাদের খুব সাবধান করেছেন—গুরুকরণ একবার হয়ে গেলে আর গুরুর কোন বাহ্যকর্মের বিচার করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ "গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নেই।"

সুতরাং সাধক যদি তাঁর মনের অন্ধকার অপসারণ করতে চায়, তবে গুরুর প্রতি পূর্ণভক্তি ও নিষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক তাঁকেই কেবল আনন্দস্বরূপ বলে জানবে। তাহলেই তার স্বরূপোপলব্ধি হবে। তাই 'গুরুস্তোত্র'-এ পাই ঃ

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"

(গুরুস্তোত্রম্, ১৪)

—যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, পরম সুখদ, নির্লিপ্ত, জ্ঞানমূর্তি, দ্বন্দ্বাতীত, গগনসদৃশ, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য, এক, নিত্য, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাবাতীত এবং ত্রিগুণরহিত, সেই সদ্‌গুরুকে আমি নমস্কার করি। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদের বিষয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (১৮৭১-১৯১৩)। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের 'ঈশ্বরকোটি' বলে অভিহিত করতেন, তাঁদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীনগণ যে ছয়জনকে ঈশ্বরকোটির মধ্যে গণনা করতেন, তাঁদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রেরও নাম আছে। লীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, ঠাকুর "আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের নিচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের ভক্ত সকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না।" কথামৃতে আছে ঃ "পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম", "অংশে শুধু নয়, কলা", "ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপরে ফুল। আগে দর্শন, তারপর মহিমা শ্রবণ। তারপর মিলন।"

পূর্ণচন্দ্র পূর্ণজ্ঞান নিয়েই জন্মেছিলেন। তের বছর বয়সে পূর্ণ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজার শাখার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। পূর্ণচন্দ্রের মিষ্ট ভাষা, সুন্দর মধুর স্বভাব, উজ্জ্বল নয়ন, সুঠাম দেহ ও উজ্জ্বল শ্যামকান্তি দর্শনে মাস্টার মশাইও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীম আলাপ করে জ্ঞাত হলেন—বালক আবাল্য ভগবদ্ভক্ত। তাই তাঁকে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠের জন্য উপদেশ দেন এবং নানান ধর্মকথা শুনান। পূর্ণচন্দ্রের পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ ছিলেন ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে কর্মরত এবং পারিবারিক সুশৃঙ্খলার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। পূর্ণচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে সুবৃহৎ দেবালয় দর্শনে মুগ্ধ এবং দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভে চরিতার্থ হয়ে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। সেদিন ঠাকুর তাঁকে আদর করে খাবার খাইয়েছিলেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তিনি অলৌকিক আনন্দে বিভোর হলেন এবং নয়নদ্বয় থেকে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়ে কপোলদ্বয় ভাসিয়ে দিল। প্রত্যাগমনের জন্য পূর্ণ সুপ্তোত্থিতবৎ উঠে দাঁড়ালে ঠাকুর জননীর ন্যায় তাঁর চিবুক ধরে স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন ঃ "তোর যখন সুবিধা হবে চলে আসবি—গাড়ি ভাড়া এখান থেকে নিবি।" পূর্ণচন্দ্রের নবজীবনের সুপ্রভাত হলো। দক্ষিণেশ্বরে একদিন পূর্ণ এলে তাঁকে নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—পূর্ণকে যেন মাল্য ও চন্দনাদিতে ভূষিত করে খাওয়ানো হয়। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে তাঁর আপন মায়ের মতো করে স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়ালেন। পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুরের দিব্যদর্শন ঃ "...চারিদিকে আনন্দের কুয়াশা। তারই ভিতর থেকে তের-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে উঠল। মুখটি দেখা যাচ্ছে—পূর্ণের রূপ। দুজনেই [শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ও পূর্ণ] দিগম্বর। তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেলা। দৌড়াবার পর পূর্ণর জলপিপাসা পেল। সে একটি গ্লাসে করে জল পান করলে। পরে আমাকে দিতে এল। আমি বললাম, 'ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না', তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।" একবার ঠাকুর পূর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "স্বপ্নে কি দেখিস?" পূর্ণ উত্তর দিলেন ঃ "আজ্ঞে, আপনাকে দেখেছি—বসে আছেন, কি বলছেন।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যুবক ভক্তদিগকে সন্ন্যাসী সাজতে দেখে পূর্ণের পিতার মনে ভয় হলো। তাই অপরিণত বয়সেই তাঁকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলো। পূর্ণের পরবর্তী জীবন ভক্তদের কাছে যেমন আকর্ষণীয়, সদ্ গৃহস্থের কাছে তেমনি শিক্ষাপ্রদ। লীলাপ্রসঙ্গকার সত্যই লিখেছেন ঃ "ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।" পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা বুঝতেন। যাঁরা দেশের জন্য কারাবরণ করতেন, তিনি তাঁদের সন্ন্যাসীর তুল্য মনে করতেন। তাঁর স্বভাব ছিল অপরের দোষদর্শন না করে গুণগ্রাহী হওয়া।—সম্পাদক

ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের প্রথম সোপান নীরবতা

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ*

"যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাক্-নিরোধঃ।"[১] চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা মনকে একাগ্র করার প্রথম সাধনা বাকসংযম। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা মনকে বিষয়মুখী ও চঞ্চল করে রাখে। তাই মনকে একাগ্র করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন বৃথা বাক্যালাপ বর্জন। কারণ, ঈশ্বর বিনম্রচিত্ত মানুষকেই পছন্দ করেন। "ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাবতি"[২]—বাচালতার দ্বারা কেউ ধার্মিক হয় না। সকল ব্যষ্টিমনের নিয়ন্ত্রা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেদিন ধ্যানরত রানি রাসমণিকে রুক্ষস্বরে বলে উঠলেনঃ "কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ (বিষয়) চিন্তা?" অর্থাৎ তাঁর ভাবটি ছিল, যারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে চায়, তারা যেন হৃদয়মন্দিরটিকে সকল বৈষয়িক কোলাহল থেকে মুক্ত রাখে। কারণ, নীরবতাই যে ভগবানের প্রকৃত গৃহ—যেখানে আমরা তাঁর সান্নিধ্যলাভ করি। স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে অক্ষম, দুর্বল-চিত্তসম্পন্ন তামস প্রকৃতির মানুষের চুপ করে থাকাকে 'নীরবতা' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে না; বরং নীরবতা তাঁদেরই মানায় যাঁরা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যাঁরা গভীরভাবে একাগ্রতা-সহ চিন্তা করতে পারেন, যাঁদের চিন্তার মধ্যে সাম্যতা থাকে, চিত্ত যাঁদের আয়ত্তাধীন, যাঁরা সকল বৃত্তি ওঠার প্রাগ্‌ভাবে মনকে রাখার চেষ্টা করেন। নীরবতা মানে কোন কাজকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, কাজের মধ্য থেকেই মনটাকে উচ্চভূমিতে তুলে রাখা। সবকিছুরই মধ্যে থেকেও যেন কোন কিছুতেই নেই—এইরূপ সচেতন ভাবে থাকাই প্রকৃত নীরবতা। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষই নীরবতার মধ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করে থাকেন।

কিন্তু ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের বাসনা, তাদের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ বা প্রাপ্তির পর তার সংরক্ষণের চিন্তা মানুষকে আত্মচিন্তার সময় দেয় না; চিত্ত শান্ত হওয়ার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হয়। যতদিন আমরা রঙিন চশমা পরে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে ভরা ধরিত্রীর রামধনু দেখতে থাকব, যতদিন আমরা মিছরির পানা উপেক্ষা করে চিটেগুড়ের পানাতেই তৃপ্ত থাকব, যতদিন আমরা বাইরের কোনকিছুর প্রত্যাশায় ছুটব, যতদিন আমরা ছেলেভোলানো চুষি নিয়ে ভুলে থাকব, ততদিন সকল বৃত্তির আধার সেই 'নিয়ামক' থেকে আমরা দূরে থাকব। ততদিন মা আমাদের তাঁর লীলা-পোষ্টাই করার জন্য খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবেন। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ/ স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।/ কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্/ আবৃত-চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"[৩]

সেই 'নিয়ামক' কে দেখতে পান? না, 'কশ্চিদ্ধীরঃ'—কোন কোন ধীর, শান্ত ব্যক্তি—যিনি বহির্জগতের সকল আকর্ষণ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে ধীরস্থিরভাবে জপ-ধ্যান, বিচার ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যত শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়েছেন। যতই দেহ-মনের সঙ্গে একাত্মবোধ কমতে থাকবে, যতই আমাদের চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা বাড়তে থাকবে, ততই আমরা ক্রমশ 'প্রত্যগাত্মা'-এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকব। শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ "উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রানি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে—নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্ত-চেতনায়ম্।"[৪] সর্ববিদ্যা ও সর্বশাস্ত্র মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়ায় উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু অব্যক্ত ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হননি, কারণ তাঁকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তিনি শান্তচিত্তেই একমাত্র অনুভবগম্য।[৪] একথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন।

চিত্তকে নিরুদ্ধ করার প্রকৃষ্ট উপায় সাক্ষীচৈতন্যে স্থির থেকে সকলপ্রকার দ্বৈতসংস্কার নষ্ট করা অথবা উপাধিভূত চিত্তকে পৃথক করা। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রথমে জগতের প্রতি আকর্ষণ কমাতে হবে। দ্বিতীয়ত, অসীমের সসীম রূপকে হৃদয়মন্দিরে বসিয়ে একাগ্রচিত্তে মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে চিত্তের তরঙ্গায়িত অবস্থাকে শান্ত করতে হবে। 'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্'[৫]—ক্ষতিকারক চিন্তাকে বাধা দেওয়ার জন্য বিপরীত চিন্তার স্রোত তুলতে হবে। এইভাবেই আমরা আত্মারাম হয়ে নীরবতার স্নিগ্ধালোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করব। বৃত্তি ওঠার প্রাগ্‌ভাবে সচেতনভাবে মনকে রাখার চেষ্টা করা দরকার। এই অভ্যাসের ফলে অশুভ বৃত্তিগুলি যখন পোড়া দড়ির মতো তাদের ক্রিয়মাণ শক্তি হারাতে থাকবে, ততই আনন্দের একটা আভাস উপলব্ধি হবে—যেমন ঘুমের প্রাগ্‌মুহূর্তে অনুভূত হয়। সেইরূপ সচেতন অবস্থাতেই যখন অজ্ঞান বৃত্তিসকল ওঠা বন্ধ হবে, তখনি নদী তার গতিপথ হারিয়ে বলে উঠবেঃ "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। হা বু, হা বু, হা বু।"[৬] অথবা বলে উঠবেঃ "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।"[৭]

---

* রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠে কর্মরত নবীন সন্ন্যাসী।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে অথবা জড়জগতের উন্নতিতে যেসব মহাপুরুষ সারা বিশ্বে বিপ্লব এনেছেন, তাঁরা অধিকাংশই তাঁদের নিজ নিজ লক্ষ্যে স্থির থেকে নীরব ভূমিকায় সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন; তাঁরা আমাদের মতো বেতার, দূরদর্শন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আড্ডা-গল্পগুজব প্রভৃতিতে নিজেদের মগ্ন রাখেননি। একটি বিষয়ের প্রতি তাঁদের একাগ্রতা এতই প্রবল ছিল যে, বহির্জগতের দ্বারা তাঁদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনা করতে যেতেন, তখন প্রায়ই তাঁর জামার বোতাম খোলা থাকত, চুল এলোমেলো থাকত, মোজা গুটিয়ে থাকত, তন্ময় হয়ে যেন চলেছেন। তিনি একদিন এক নাচের আসরে এক তরুণীর আঙুল হঠাৎ টেনে এনে পুরে দিলেন জ্বলন্ত পাইপের মধ্যে, তরুণীর আর্ত চিৎকারে চমক ভাঙে নিউটনের। আসলে তখন মন তাঁর ভেসে চলেছে গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে। বিচিত্র সব চিন্তাই তাঁকে বাহ্যজগৎ থেকে আলাদা করে রাখত প্রতি মুহূর্তে।

আরেকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস—যিনি সোনার খাদ মাপতে গিয়ে তরলের প্লবতা বল আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন—তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সিসিলির প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠছেন 'ইউরেকা'। 'ইউরেকা'। (আমি পেয়েছি! আমি পেয়েছি!) সাইরাকিউসের সম্রাট হিয়েরোর কাছে তিনি যাচ্ছেন নগ্ন হয়ে। যদি জড়জগতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের ঐ অবস্থা হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক জগতের সাধকদের তো ঐরূপ ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও মায়ের দর্শনের জন্য দিনের পর দিন পঞ্চবটীর তলায় নীরব সাধনায় তন্ময় হতে হয়েছে। তাঁর নিজের বস্ত্রের কোন ঠিক নেই, প্রতি মুহূর্তেই তাঁকে দেখে মনে হতো তাঁর দেহ-মনের মালিক কে? একইভাবে তুকারাম কিংবা মীরাবাঈকে দিনের পর দিন নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। এইরূপ সকল মহাপুরুষকেই দীর্ঘদিন ধরে নীরবে অহংশূন্য হয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবতায় তন্ময় হতে হয়েছে। জগৎ ছিল তাঁদের পদতলে, তাই তাঁদের সকলের জীবনেই মিলেছিল হীরের খনি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আমরা কেন সেই হীরের খনির সন্ধান পাচ্ছি না? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবতারিণীর নাকের নিচে তুলো দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন অনুভব করেছেন, রামলালার সঙ্গে কথা বলেছেন, রামলালাও কোলে ওঠার জন্য আবদার করেছে। [*"কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, গঙ্গার জলে ঝাঁপাই জুড়বে! যত বারণ করি, 'ওরে অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোসকা পড়বে! ওরে অত জল ঘাঁটিসনি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে'—সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলছে!"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*] তুকারাম 'বিট্‌ঠোবা'র জীবন্ত সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ করছেন, ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে বিট্‌ঠোবাকে দেখে সব আখ বিলিয়ে দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রীমা সারদাদেবী অষ্টসখীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হালদারপুকুরে স্নানে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের জীবনে তার কোনকিছুই প্রত্যক্ষ হয় না কেন?

কারণ একটাই, আমাদের 'আবৃতচক্ষুঃ'। আমরা আমাদের মনের মালিন্য, অন্তরের উত্তেজনা, আকাশ-কুসুম কল্পনা, বাসনা ও বৈষয়িক চিন্তার আতর ছড়ানো অজ্ঞানের রুমাল দিয়ে চোখ আবৃত রেখে কাঁটাঘাস খেয়ে চলেছি। বহিরিন্দ্রিয়ের দরজাগুলি খুলে রেখে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতে চাইছি। আমরা আমাদের হৃদয়মন্দিরে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'-রূপ আদর্শ না রেখে বাসনায় পরিপূর্ণ হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চেষ্টা করছি! তার ফল—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শশাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োএবাভিবর্ধতে।"[৮] আসলে আমাদের আঁশ-চুবড়ির গন্ধই ভাল লাগে, গোলাপের গন্ধ নয়। কারণ, আমাদের বেশির ভাগ সময় বৈষয়িক মানুষের (দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যাদের বিল্ডিং দেখতে পাঠিয়ে দিতেন সেইসব) সঙ্গে থাকতে হয়। ঐরূপ অশুভ তন্মাত্রায় আমাদের মন মলিন হয়, ফলে তাঁর সান্নিধ্যলাভ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। আমরা জানি না যে, পবিত্র ও জ্ঞানী আত্মা থেকে পূত ও সাম্যভাবাপন্ন স্পন্দন বিকীর্ণ হয়, তাঁদের সংস্পর্শে যারা আসে তাদের ওপর শুভ তন্মাত্রার প্রভাব পড়ে, যা সাধারণের উন্নতিতে সাহায্য করে। "নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং—সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।"[৯] বিষয়াসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গত্যাগের নামই যথার্থ নিঃসঙ্গতা। তাই লোকসঙ্গ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তরে আনন্দ পাওয়ার কোন আশা নেই। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন: "যখনই আমি মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছি তখনই আমার মনবুদ্ধি মলিন হইয়াছে।"[১০] "একমাত্র ভগবান ও তাঁহার দূতগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার কামনা কর এবং [বিষয়ী] মানুষের সঙ্গে মাখামাখি এড়াইয়া চল।"[১১] তুকারাম বলেছেন: "সংসার হইতে সদা দূরে রহিবারে চাই; মানবের সাথ আর করিতে বাসনা নাই। বিজন বিপিন মাঝে সতত হরষে র'ব; জগতের কার[ও] সনে কখনও না কথা ক'ব।"[১২]

আরেকটি বিষয় প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগীদের অন্তঃকরণে বিক্ষেপ ঘটায়, তা হলো বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে সর্বদা মগ্ন থাকা। সর্বত্রই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে

সংসারমনস্ক লোকদের জন্য; প্রকৃত আধ্যাত্মিক জগতের মানুষদের জন্য নয়। "উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাব ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাঽধমাধমা।"[১৩] সদা ব্রাহ্মীস্থিতি সর্বোত্তম, ব্রহ্মচিন্তন মধ্যম, স্তুতিজপাদি অধম ও বাহ্যপূজা অতি নিকৃষ্ট বলা হয়ে থাকে। "উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্। অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থ-ভ্রান্ত্যধমাধমা।"[১৪] তত্ত্বচিন্তা অতি উত্তম, শাস্ত্রচিন্তা মধ্যম, মন্ত্রচিন্তা অধম এবং তীর্থভ্রমণ অতি নিকৃষ্ট পরিগণিত হয়ে থাকে। নানাবিধ উৎসবমুখর দিনে বাহ্য বিক্ষেপ বর্জন করার জন্য আমাদের বেশি করে ধ্যান ও প্রার্থনাতে মনোযোগ দেওয়া সমীচীন। ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে মন শান্ত হয়। অতএব ঐদিনগুলি যেন কেবল বাহ্য উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের দিন না হয়ে, হয় যেন অন্তরে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার দিন। দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেনঃ "মা কি কেবল ঐ প্রতিমাতেই রয়েছেন? তোমার হৃদয়ই তো তাঁর চিরন্তন আবাস, তাঁকে সেখানে অধিষ্ঠিত করে তাঁর মাটির প্রতিমাটি ফেলে দাও না কেন?" কী অপূর্ব এই উপদেশ! বাইরে তাঁকে না দেখে হৃদয়ে তাঁকে দেখতে বলছেন। আর, নীরবতাই হলো সেই হৃদয়মন্দিরের গর্ভগৃহ, যেখানে আমরা তাঁর সান্নিধ্য পাই! শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে যদি আমরা শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হই, তাহলে আমরা "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হতে থাকব।[১৫] ঠাকুর গাইতেনঃ "আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।/ যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।/ পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"[১৬]

চিত্তবিক্ষেপের আরেকটি প্রবল কারণ হলো অহঙ্কার। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"[১৭] আমরা অধিকাংশই নিজেদের খুব বড় বলে মনে করি, তাই আমাদের চারদিকে অজ্ঞানের একটা বেড়া দিয়ে তার ভিতরে অহংরূপী গোখরো সাপকে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছি; ফলে প্রতি মুহূর্তে সেই অহংরূপী সাপটি সামান্য বাক্যাঘাতেই ফোঁস-ফোঁস করে চলেছে। যতদিন আমাদের দেহ-মনের ওপর একটা ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ববোধ থাকবে, যতদিন আমাদের হৃদয়মন্দিরে অহংরূপী সাপ রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষার বশীভূত হয়ে ফোঁস-ফোঁস করতে থাকবে, যতদিন না আমরা সেখানে নম্রতা, দয়া, ক্ষমা ও করুণার অনুশীলন করতে পারব, ততদিন চরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব নয়। স্বামী তুরীয়ানন্দজী এপ্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ "ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই বসতে চান, কিন্তু বসতে গিয়ে দেখেন আর একজন বসে আছেন—তিনি হলেন 'অহং'।" যিশুখ্রিস্ট বলছেনঃ "সুশিক্ষিত বিদ্বান লোক অপেক্ষা শান্তিপ্রিয় মানুষ জগতের অধিক কল্যাণসাধন করিতে পারে।"[১৮] "অহং কর্তেত্যহং মানো মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ। নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব।"[১৯] 'আমি কর্তা'—এই অহঙ্কাররূপ কৃষ্ণসর্প কর্তৃক তুমি দষ্ট হয়েছ; অতএব 'আমি কর্তা নই'—এইপ্রকার নিশ্চয়রূপ অমৃত পান করে পরমানন্দ লাভ কর। তুকারাম বলেছেনঃ "বিদ্যা, বুদ্ধি যদি কিছু থাকিত আমার, তাহলে ঘটিত ঘোর বিপদ অপার।/ তুকা বলে, বড় বলে করে যারা মান। নরক তাদের ভাগ্যে ইথে নাহি আন॥"[২০] "আমারি চোখের সামনে আমার মৃত অহং শুয়ে; হে ওপারের আনন্দ, তুলনা কর।/ আনন্দে জগৎ পূর্ণ, আমিও আনন্দিত, সর্বাত্মা যিনি রয়েছেন তথায়।"[২১]

নীরবতার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত সান্নিধ্যলাভ করি। কথা যদি বলতেই হয় তাহলে তা যেন কর্কশ ও উচ্চস্বরে না বলে ধীর, শান্ত, মধুরভাবে বলি; বলার মধ্যে যেন একটা আদর্শ থাকে। উদ্দেশ্যহীন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, বৃথা তর্ক, পরনিন্দা, পরচর্চায় নিজেদের মনকে যেন নিয়োজিত না রাখি। অতি সচেতনতার সঙ্গে অন্যের ব্যাপারে যেন নিজের কোন অভিমত প্রকাশে আগ্রহ না দেখাই; অথবা 'নিজে বিশেষ একটা কিছু'—এইরূপ দেখানোর চেষ্টা না করি। এলোমেলো চিন্তায় মস্তিষ্ক ভরিয়ে না রেখে, গল্প-গুজবে সময় নষ্ট না করে শান্তভাবে তাঁর সান্নিধ্যলাভেরই যেন চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়ের কোলাহল যখন নিস্তব্ধতায় ডুবে যায়, যখন বহুত্বের জালে আর আবদ্ধ না হই—তখনি তাঁর সান্নিধ্যলাভ করি। সুতরাং হৃদয়ে কোন তিক্ততা না রেখে মনকে সর্বদা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে উঁচুতে তুলে রাখতে হবে, দেহের পরিবর্তে দেহমন্দিরের দেবতাকে দেখতে হবে। কারণ, নীরবতাই যে তাঁর পরম নিশ্চিন্ত গৃহ। ❑

তথ্যসূচি

(১) বিবেকচূড়ামণিঃ, ৩৬৭; (২) ধম্মপদ, ১৯।৪; (৩) কঠ উপনিষদ, ২।১।১; (৪) জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, ৫২; (৫) পাতঞ্জল যোগসূত্র, ২।৩৩; (৬) তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১০।৫; (৭) কঠ উপনিষদ, ২।১।১৫; (৮) মনুসংহিতা, ২।১৪; (৯) বিষ্ণুপুরাণ; (১০) ঈশানুসরণ, ৬৯; (১১) ঐ, ৩৭; (১২) তুকারাম-চরিত, ১০৭; (১৩) তত্ত্বনির্ণয়, ১১।৪৫; (১৪) মৈত্রেয়ী উপনিষদ, ২।২১; (১৫) কঠ উপনিষদ, ১।২।৫; (১৬) কমলাকান্ত চক্রবর্তী; (১৭) গীতা, ৩।২৭; (১৮) ঈশানুসরণ, ১১২; (১৯) অষ্টাবক্র গীতা—আত্মানুভবোপদেশঃ, ৮; (২০) তুকারাম-চরিত, ১৭৫; (২১) Psalms of Maratha Saints—Nicol Mac., The Heritage of India Series, pp. 79-80

শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ

সুচিত্রা রায় আচার্য*

মানবপ্রেম ও মানবসেবাই মানবতাবাদের মূল কথা। এই মানবপ্রেমই স্বামী বিবেকানন্দের বৃহৎ হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল ইতিহাস-সচেতন হয়ে, সমাজ-সংস্কার করে, শিক্ষার বিস্তার করে এই সমাজেরই বাসিন্দা মানুষের দুঃখ মোচন করতে।

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চিত্রপটে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি ভারতবর্ষ। তিনি দেখেছিলেন এক শাশ্বত ভারতকে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পরিক্রমা করে দরিদ্র, শোষিত দেশবাসীর বেদনাকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' উত্তীর্ণ হয়ে ধ্যাননেত্র উন্মীলন করে ধর্ম, দর্শন ও সংহতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন। প্রাচীন ভারতকে তিনি একটি 'নেশন' বা জাতি বলেছেন। তাঁর কথায়ঃ "প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়।... মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যেসকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।"[১]

যেকোন মানুষের শিক্ষাচিন্তার বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণার কথা এসেই পড়ে। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও সেই কথাই বলা যায়। সামাজিক ধ্যানধারণার পরিপেক্ষিতেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার আলোচনা করতে হবে।

স্বামীজী 'হিন্দু কল্পতত্ত্ব' (Theory of cycles)-এ বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতেঃ "এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিল, তারপর পড়িল। কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্যসমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গ-গতিতেই চলিতে থাকে। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।"[২] স্বামীজী জানতেন সমাজ বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে। হার্বার্ট স্পেনসারের মতো বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ের ক্ষয় ও অবলুপ্তিকে তিনি দেখেননি। দেখেছেন সমাজ-বিবর্তনের ধারা, যার মধ্য দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়ে ওঠে। এই বিকাশই তো অগ্রগতি। তাঁর মতে, মানবজীবনের অভিযান মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, বরং নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে। ব্যক্তির ভূমিকাকে তিনি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, বৈদান্তিক শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এটাই মুক্তির পথ। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।

আজকের এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা বেশিদিনের পুরনো নয়। বারইভিয়ার বিশপ জন অ্যামোস কামোনিয়াস চেয়েছিলেন মানুষের সত্তার উর্ধ্বগতির মাধ্যমে তাকে উন্নত করতে। কামোনিয়াস তাঁর লক্ষ্যসাধনে সক্ষম হলেন না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন মানুষের গোষ্ঠী তৈরি হলো। শুরু হলো জনশিক্ষা—'mass eduction'।

শিক্ষার এই নতুন ধারণায় বিদ্যালয় হলো অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের ছাপ যোগাড় করতে অপারগ ব্যক্তির বাড়ল দারিদ্র্য। বাড়ল নতুন ধরনের শ্রেণিবিন্যাস। পাস-ফেলের বিচারের পরিণামে মানুষ শিখল নিজেদের হেয়জ্ঞান করতে। মানুষ হারাল আত্মবিশ্বাস, হারাল মূল্যবোধ। এই অসম্পূর্ণ সমাজের মধ্যে থেকেও স্বামীজীর ছিল সামাজিক পূর্ণতার ধারণা। তিনি বুঝেছিলেন, আত্মগ্লানি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চাই জীবনবেদের সংস্কার। তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তা প্রসারিত ছিল জীবনবেদের অভিমুখে।

স্বামীজীর মতে, প্রকৃত শিক্ষার অর্থ হলো মানুষ গড়া। তথ্যাধিক্যকে ভিত্তি করে প্রকৃত শিক্ষা দাঁড়াতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যভিত্তিক শিক্ষাকে ইঙ্গিত করেই লিখেছিলেন তাঁর 'তোতাকাহিনী'। বলহীনের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বুভুক্ষু মানুষকে ধর্ম-দর্শন শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাই নিবেদিতার দৃষ্টিতে, জনগণের মধ্যে অন্নসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিতরণের চিন্তাই স্বামীজীকে বেশি বিব্রত করেছিল। এই

* *রীডার, সংস্কৃত বিভাগ, কাঁচড়াপাড়া কলেজ।*

বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্যে মনের বলিষ্ঠতা গঠনের সঙ্গে থাকবে আত্মার উদ্বোধন। এই শিক্ষাই 'man making education' বা মানুষ গড়ার শিক্ষা।

বেদান্ত-মতে জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। শিক্ষা হলো কেবল উপলব্ধি বা জাগরণ। গাছের চারা যেমন সৃষ্টি করা যায় না, কেবল লালন করতে হয়—ঠিক তেমনি কাউকে কিছু শেখানো যায় না, শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপলব্ধির পক্ষে সহায়তা করা যায়। স্বামীজী এই মতেই পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিচারে কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না।

এই উপলব্ধি বা মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক কালের 'হিউরিস্টিক পদ্ধতি'র (heuristic method) খুব মিল আছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। শিক্ষক শুধু তত্ত্বাবধান করেন। শিক্ষার ব্যাপারে প্রাচীন গ্রিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এইরকমই। ডিকিনসনের প্রতিপাদ্য[৩] বিষয় স্বামীজীর শিক্ষাতত্ত্বে পরিস্ফুট, তাঁর দর্শনের অন্যতম শাশ্বত উপাদান।

জাতীয় চরিত্রবিরোধী কোন শিক্ষাই কার্যকর হতে পারে না। শিক্ষার জন্য গুরুকুল পদ্ধতিকে (এই পদ্ধতি প্রাচীন গ্রিসে প্রবর্তিত ছিল) তিনি ভারতের জাতীয় পদ্ধতি বলে মনে করতেন। গুরুকুল পদ্ধতির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন ঃ "শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।... বিশ্বাস, নম্রতা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোনরকম সম্প্রসারণই কল্পনা করা যায় না।"[৪]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই দুইয়েরই লক্ষ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপলব্ধি। নিবেদিতা বলেছেন ঃ "স্বামীজীর কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনকিছুই ছিল না।"[৫]

আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম মানুষের অন্নসংস্থান করতে পারে না, কিন্তু ধর্ম পারে মানুষকে নির্ভয় করে তুলে অমৃত-জীবনের সন্ধান দিতে। এ-থেকেই আসে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা। নির্ভীক মনে বিবেক জাগে। মানুষ তখন সামাজিক বিধিনিষেধ অপসারণে সমর্থ হয়। এটাই শিক্ষার প্রাথমিক অবদান। স্বামীজীর বিচারে তাই ধর্মই শিক্ষার ভিত্তিস্থল।

মানুষ গড়া শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য পাঠক্রম হিসাবে বিবেকানন্দ নির্বাচন করেছেন—শরীরচর্চা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা (aesthetics), যুগোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য এবং ভাষা।

শরীরচর্চার উদ্দেশ্য হলো শরীর ও মন-প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য আনা। ধর্ম ও বিজ্ঞান হলো সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার যুগল ভিত্তি। আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজী প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে দেখিয়েছিলেন আত্মনির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। কান্তিবিদ্যা হলো চারুকলা ও উপযোগের সমন্বয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিতে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি সম্ভব।

কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ মানুষকে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে। জ্ঞান সংস্কৃতিভিত্তিক না হলে জনগণের উন্নতি স্থায়ী নাও হতে পারে।

স্বামীজীর মতে, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য একাধিক ভাষা আয়ত্তে থাকলেও মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার বাহন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলন কোন পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব বুঝে তিনি ভারতে ইংরেজি ভাষাচর্চার সুপারিশ[৬] করেছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থের ধ্যান-ধারণা জনগণের ভাষাতেই জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা ছিল তাঁর অভিমত। এর সঙ্গে তিনি সংস্কৃতশিক্ষার নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার জাতিকে মর্যাদা ও শক্তিসামর্থ্য প্রদান করবে। জনগণ সংস্কৃতচর্চা উপেক্ষা করলে এই ভাষায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিশেষ অধিকার জন্মাবে। জন্মাবে নতুন ও কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা। তাই সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্বামীজী 'ত্রিভাষা ফর্মুলা' নির্দেশ করেছেন।[৭]

শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলপ্রদ করার জন্য মৌল উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণও প্রয়োজন। স্বামীজীর মতে, ভারতের পক্ষে এই প্রয়োজনীয় উপাদান হলো বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়, মূল প্রেরণার জন্য ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস। এছাড়া দরকার অভিনিবেশ (concentration), ভোগবাসনাশূন্যতা (detachment), আর প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার যোগস্থাপন (communion with nature)। বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এর মাধ্যমেই সমাজের মানুষের অভাব থেকে মুক্তি সম্ভব।

ব্রহ্মচর্যের ফলে প্রচণ্ড সক্রিয়তা ও ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়। এর সঙ্গে জন্মায় বলিষ্ঠতা ও নৈতিক চেতনা। মনোনিবেশ ও ভোগবাসনাশূন্যতা ব্রহ্মচর্যেরই উপাদান।

তিনি বিশ্বাস করতেন, অভিনিবেশ বা মনোনিবেশ থেকেই আসে তীব্র আঘাতের শক্তি। বিশ্বাস করতেন, সেই তীব্র সংবেগ নিয়ে সঠিকভাবে আঘাত করলে বিশ্বের সব রহস্যই জিজ্ঞাসুর কাছে অনাবৃত হয়ে যাবে।[৮] এর সঙ্গে চাই প্রয়োজনমতো মনকে বিচ্ছিন্ন করে বিষয়ান্তরে স্থাপন করার ক্ষমতা।

শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ ঃ "প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা লাভ কর (let nature be thy teacher)। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগস্থাপনের ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।"[৯] স্বামীজীর মতে, এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

ভারতীয় নারীদের সমস্যা ভিন্ন ধরনের। সেখানে গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতি অনেকটাই স্ত্রীলোকদের ওপর নির্ভর করে। তাই পুরুষদের শিক্ষা থেকে পৃথগ্‌ভাবেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থা নির্দেশ করেছেন।

বিগত দুই শতাব্দী ধরে চলছিল নারীজাগরণের প্রয়াস। স্বামীজীর চিন্তাধারায় এসে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল। রামমোহনের চোখে সতীদাহ প্রথা ছিল নারীনির্যাতনের বিভীষিকাময় রূপ। এই অত্যাচার থেকে মুক্ত করে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। সে-চিন্তারই অগ্রগতি দেখা যায় বিদ্যাসাগরে। বিধবা বিবাহ, বালবৈধব্য-রোধ এবং স্ত্রীশিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে নারীজাগরণে প্রয়াসী ছিলেন। স্বামীজী আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করে সমস্যাটিকে দেখলেন। নারীকে তিনি স্বাবলম্বী করতে চাইলেন। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন নারীসমস্যার সমাধান করতে। স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে স্বামীজী নারীসমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। তাঁর মতে, স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, সংস্কৃত ও কিছু ইংরেজি। শিক্ষাসূচির তালিকায় রন্ধনবিদ্যা, সূচিশিল্প, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা প্রভৃতি।[১০] আজ থেকে এক শতক আগে যেযুগে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বা সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রমে স্বীকৃতি পায়নি, সেদিন সেগুলিকে তিনি প্রথম স্ত্রীশিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করলেন। স্বামীজী নারীকে আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইলেন। চাইলেন, বৈদান্তিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী নারী নিজেই তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে উঠুক। খুলে দিলেন নারীজাগরণের এক নতুন দিগন্ত।

সমাজের মধ্যে প্রকৃত অর্থে মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টিকেই সমাজ-সংস্কার বলা যায়। স্বামীজীর মতে, সংস্কার বাইরের রদবদল নয়, অন্তরাগত সম্প্রসারণ (growth from within)। সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করলে এই সংস্কার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকেন্দ্রিক। শিক্ষাকে তাই সামাজিক শিক্ষাই বলা যায়। স্বামীজীর মতে ঃ "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে-পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[১১] অল্ডাস হাক্সলির মতকে মেনে নিয়ে ঐশী শক্তিকে যদি 'সেই পূর্ণাঙ্গতা, সেই শিবময়তা' (the perfection itself, the goodness itself) বলে মানা যায়, তাহলে শিক্ষা ও ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় একই বিকাশধারার দুটি পৃথক দিক। জনসাধারণের কাছে শিক্ষার সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "যে-অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে ও ফলপ্রসূ হয়, তাকেই বলা হয় শিক্ষা।"[১২]

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আমরা কতকগুলি ধারণা পাই ঃ প্রথমত, শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন করে তার প্রবাহ ঘটাতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষ গড়া। ধর্মেরও উদ্দেশ্য তাই।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষা হলো অনুশীলন, যার দ্বারা মানুষের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী প্রকৃতির সমন্বয়সাধন সম্ভব। শিক্ষা তাই ব্যক্তি ও সমাজ—দুয়েরই উন্নতির পথ।

এই ধারণাগুলির প্রতিধ্বনি করে স্বামীজী বললেন ঃ "যে-বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?"[১৩]

জনশিক্ষাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন ঃ "যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।"[১৪] বস্তুত, স্বামীজীর সামাজিক শিক্ষা জনশিক্ষারই নামান্তর। এই জনশিক্ষা ইউরোপে ধর্মসংস্কারের পরে প্রচলিত জনশিক্ষার থেকে আলাদা। [ক্রমশ]

তথ্যসূচি

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৮৯
২ ঐ, ৮ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৭০
৩ The Greek View of Life—G. K. Dickinson, Oxford University Press
৪ Swami Vivekananda on India and Her problems—Compiled by Swami Nirvedananda, 1971, p. 46
৫ Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda—Sister Nivedita, 1967, p. 7
৬ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, 1959 pp. 368-369
৭ Ibid., Vol. III, 1960, p. 290
৮ Ibid., Vol. I, 1957, p. 130
৯ Ibid., Vol. V, p. 160
১০ Ibid., Vol, VI, 1956, p. 493
১১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৪০০
১২ The Complete Works, Vol. IV, 1955, p. 490
১৩ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৭
১৪ The Complete Works, Vol. IV, p. 482

তুলসীদাসের দৃষ্টিতে ভরতের প্রেমমূর্তি

স্বামী অবধূতানন্দ*

তুলসীদাসজী 'শ্রীরামচরিতমানস'-এর মঙ্গলাচরণে ভরতের বন্দনা করে বলেছেন ঃ

"প্রণবউঁ প্রথম ভরত কে চরণা।
জাসু নেম ব্রত জাই ন বরণা॥
রামচরণ পঙ্কজ মন জাসূ।
লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পাসূ॥"

—প্রথমে আমি ভরতের চরণে প্রণাম করছি, যিনি নিয়ম-ব্রতধারী এবং যাঁর মন সদা লুব্ধ মধুকরের ন্যায় শ্রীরামচরণে নিবিষ্ট।

অর্থাৎ মৌমাছি যেমন ফুলের মধুপান ছাড়া অন্য কিছুই চায় না, ভরতের চিত্তভ্রমরও তেমনি রামের চরণে রসাস্বাদন ছাড়া আর কিছুই চায় না। দশরথ নিজে বলেছেন, আমি রামের চেয়েও ভরতকে অধিক ধার্মিক বলে মনে করি। রামও ভরতের প্রশংসা করে বলেছেন—ভরত সত্যবাদী, সুমঙ্গল ও মহাত্মা।

ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামের অবতরণ শুধু রাবণ নামক রাক্ষসকে বধ করার জন্যই নয়, বরং ভরতের প্রেম পৃথিবীতে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, রাবণবধ গৌণ ছিল। রামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চোদ্দ বছর বনবাস তিনি কী নিমিত্ত করলেন? রাম উত্তরে বলেছিলেন, ভরত আমার গুণ ও আমার প্রতি প্রেম প্রকট করার জন্য চোদ্দ বছর নন্দীগ্রামে বাস করেছে, আমিও ভরতের প্রেম প্রকট করার জন্য চোদ্দ বছর বনে ছিলাম। ভক্ত চান ভগবানের মহিমা প্রচার করতে, ভগবানও চান ভক্তের মহিমা প্রচারিত হোক।

রাজা দশরথ বিবাহের সময় কৈকেয়ীর পিতাকে কথা দিয়েছিলেন, অযোধ্যার রাজ্য কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকে দেওয়া হবে। একথা ভরত জানতেন এবং হয়তো ভরত দীর্ঘদিন মামারবাড়িতে কাটিয়েছেন এজন্যই। ভরতের ধারণা, এতে মা কৈকেয়ীর তাঁর প্রতি মমতা কমবে এবং রামের গুণমুগ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাবেন। ভরত মনেপ্রাণে জানতেন, অযোধ্যার সিংহাসনে বসার উপযুক্ত একমাত্র প্রভু রামই।

রামচন্দ্রের আসন্ন রাজ্যাভিষেকের শুভ সংবাদে সকলে যখন আনন্দিত, সেইসময় স্বর্গের দেবতারা প্রমাদ গণলেন, রাবণবধ কি করে হবে? দেবতাগণ সরস্বতীকে অনুরোধপূর্বক বললেন ঃ হে মাতা, আপনি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আপনি এমন কিছু উপায় স্থির করুন যাতে রামচন্দ্র রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে যান এবং দেবকার্য সিদ্ধ হয়। তুলসীদাসজী বলছেন, জ্যোৎস্নাধারায় যখন সকলেই আনন্দ উপভোগ করে তখন চোরের পক্ষে জ্যোৎস্নারাত্রি দুঃখজনক। রাজগুরু বশিষ্ঠদেব ভরতের মাতুলালয়ে দূত পাঠিয়ে দুই ভাইকে অযোধ্যায় ডেকে পাঠালেন।

এদিকে যেদিন থেকে দেবচক্রান্তে অযোধ্যায় এই অনর্থ শুরু হলো, সেদিন থেকে মাতুলালয়ে ভরত নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ এবং দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। নানা চিন্তা ও আশঙ্কায় তাঁর কাল কাটতে লাগল। ভরত সকলের মঙ্গল কামনা করে ব্রাহ্মণভোজন, দান, শিবপূজা ও প্রার্থনা করতে লাগলেন। এমন সময় অযোধ্যা থেকে দূত এসে ভরতকে গুরুর নির্দেশ ও অযোধ্যা যাওয়ার আহ্বান জানালেন। অযোধ্যার কাছাকাছি এসে ভরত দেখলেন, সমস্ত প্রকৃতি যেন শ্রীহীন হয়ে আছে! পশুপক্ষী সব যেন কি এক গভীর বেদনায় ম্রিয়মাণ! নগরে প্রবেশ করে তিনি নানা দুর্লক্ষণ দেখলেন। অযোধ্যাকে নিরানন্দ দেখে তিনি পিতার ঘরে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে জননীর নিকট মর্মান্তিক ঘটনাবলি শুনলেন। শোনামাত্রই তিনি কঠোর ভাষায় মাকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ তুমি পিতাকে হত্যা করে, রামকে বনবাসী করে আমাকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছ। তুমি পাপীয়সী, বংশনাশিনী রাক্ষসী। তোমার পাপ অভিলাষ আমার দ্বারা পূর্ণ হবে না। নিষ্পাপ রামকে আমি অবশ্যই বন থেকে ফিরিয়ে এনে দেবতার ন্যায় সেবা করব। হে নিচহৃদয়া জননী, তোমার মনে যখন এই জঘন্য চিন্তার উদয় হলো তখনি কেন তোমার হৃদয় ভেঙে টুকরো হয়ে গেল না? এই জগতে জীবজন্তু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এমন কে আছে, যাঁর কাছে শ্রীরাম প্রাণতুল্য প্রিয় নন? সেই জগদ্বল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের তুমি শত্রুতা করতে পারলে? অমাত্যগণকে তিনি বললেন ঃ আমি কোনদিন রাজ্য কামনা করিনি বা রাজ্যলাভের জন্য জননীকে পরামর্শ দিইনি। আমি রামের অরণ্যযাত্রারও কোন সংবাদ পাইনি।

অতঃপর জননী কৌশল্যার কাছে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তিনি বললেন ঃ মা, আমার মতো হতভাগ্য আর কে আছে; মা, তোমার আজ যে-দশা ও দুঃখ তা আমারই জন্য, পিতা গত হলেন, রঘুনাথ বনে—আমিই তো এইসব অনর্থের হেতু। ভরতের চোখের জল মুছিয়ে কৌশল্যা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ বাছা ভরত, অধীর হয়ো না। কুসময় জেনে শোক পরিহার কর। কাউকে দোষ দিও না। আরো বললেন ঃ বৎস ভরত, আমি জানি তুমি কায়মনোবাক্যে রামানুরাগী। চন্দ্র বরং বিষ বর্ষণ করতে পারে, বরফ থেকে তাপ বিকিরণও বরং সম্ভব, জলচর প্রাণীর জলে অনীহা

** কোয়ালপাড়া আশ্রমের দায়িত্বে—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাহিত্যপ্রেমী সন্ন্যাসী।*

হলেও হতে পারে; কিন্তু ভরত, আমি জানি তোমার পক্ষে রামের প্রতিকূলতা একান্তই অসম্ভব। এই কথা বলে কৌশল্যা পরম স্নেহে ভরতকে বুকে টেনে নিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব যখন ভরতকে রাজ্যগ্রহণের জন্য নানাভাবে যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণ দেখিয়ে বললেন, তুমি রাজ্যগ্রহণ কর, এতে পিতৃসত্য রক্ষা হবে। পরশুরাম, রাজা যযাতি প্রমুখ পিতৃসত্য পালন করেছেন, তুমিও পিতার বচন পালন করে সত্যরক্ষা কর। ভরত সভার মধ্যেই গুরু বশিষ্ঠদেবকে বললেন ঃ আমার মনে হয় পিতা সত্যকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি, বরং ভ্রমবশত সত্যে অসত্য ও অসত্যে সত্য বুঝেছিলেন। পিতা সমস্ত প্রজার সামনে রামকেই রাজ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং ধর্মসম্মতভাবে রামকেই রাজা করা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, মৃত্যুর সময় পিতা সত্য-অসত্যের নির্ণয় ঠিকমতো করতে পারেননি। তবে পিতা দশরথ সত্যের জন্য (রামের বিরহে) জীবন ত্যাগ করেছেন, এজন্য তিনি ধন্য। পিতা স্বর্গে গিয়েছেন; রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ বনে, আর আপনারা আমাকে বলছেন রাজপদ স্বীকার করতে! বলছেন, এতেই আমার ও প্রজাদের কল্যাণ হবে; কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে জানি শ্রীরামচন্দ্রের সেবাতেই আমার মঙ্গল নিহিত আছে। নিরাবরণ অঙ্গে যেমন ভূষণ শোভা পায় না, বৈরাগ্যবান না হয়ে ব্রহ্মবিচার যেমন অর্থহীন, নানাপ্রকার ভোগ রুগ্নব্যক্তির পক্ষে যেমন মূল্যহীন, শ্রীহরিতে প্রীতিহীন মানুষের পক্ষে যেমন জপ ও যোগ ব্যর্থ, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত, কিন্তু নিষ্প্রাণ দেহের যেমন মূল্য নেই—তেমনি রঘুপতি বিনা আমারও সেসবই ব্যর্থ। গুরু বশিষ্ঠ সূর্যবংশের পরম্পরার কথা বলে বলছেন ঃ রাজ্য পিতা থেকে পুত্রে আসে, সেই অনুযায়ী রাজা দশরথের দেওয়া রাজ্য ভোগ করলে তোমার মঙ্গল হবে। ভরত গুরু বশিষ্ঠদেবকে বললেন ঃ ভগবান! আপনি জগদ্বিখ্যাত পরম জ্ঞানী হয়েও আমাকে রাজ্যগ্রহণ করতে আদেশ করছেন! হায়, বিধিবিমুখ হলে সবকিছুই প্রতিকূল প্রতীত হয় দেখছি। গুরুদেব, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে দাতা যে-বস্তু দান করছেন তা তার নিজস্ব কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই রাজ্য দশরথ তাঁর পিতা অজ থেকে লাভ করেছিলেন। অজ তাঁর পিতা রঘু থেকে লাভ করেন এবং রঘু তাঁর পূর্বপুরুষ দিলীপ থেকে লাভ করেন। এইভাবে পরম্পরানুযায়ী অনুসন্ধান করলে অন্তে বোঝা যায় যে, অযোধ্যা রাজ্যের প্রকৃত স্বামী রাম। "সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী।" (শ্রীরামচরিতমানস,২।১৮৫।২)

অতঃপর ভরত বললেন ঃ প্রার্থনা করি শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে যেতে আপনারা আমায় অনুমতি দেবেন। সংসার আমায় কি বলবে তা নিয়ে আমি ভাবি না। পরলোকের চিন্তাও নেই আমার। আমার হৃদয়ে শুধু এক দুঃসহ দাবানল জ্বলছে যে, আমারই জন্য আবাল্য সুখে লালিত রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে এখন বনবাসজনিত নিদারুণ দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছে। লক্ষ্মণেরই জীবন ধন্য, কেননা সে সর্বস্বত্যাগ করে রাম-সীতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। আপনাদের কাছে তাই আমি সবিনয়ে বলছি, রঘুনাথের চরণদর্শন না করলে আমার অন্তর্জ্বালা দূর হবে না। অনুমতি করুন, আগামী কাল প্রভাতেই শ্রীপ্রভুদর্শনে রওনা হব। যদিও কুমাতার গর্ভে আমার জন্ম, যদিও আমি সর্বদা দোষযুক্ত, তবুও আমি তো তাঁরই। তিনি কখনো আমায় ত্যাগ করবেন না, এ-ভরসা আমার আছে।

ভরতের কথা শুনে সকলেই অভিভূত হলেন এবং সকলেই তাঁর সঙ্গে রামদর্শনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। অতঃপর রাজ্যাভিষেকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তিনি মন্ত্রী সুমন্ত্র ও কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে বনে গমন করলেন। গুরু বশিষ্ঠ, মাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য পুরবাসিগণকে যথাযোগ্য যানে আরোহণ করিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন পদব্রজে চলতে লাগলেন এই ভেবে যে, প্রভু হেঁটে গিয়েছেন আর আমরা রথে চড়ে কিভাবে তাঁর কাছে যাব! অবশেষে মাতা কৌশল্যার নির্দেশে ভরত ও শত্রুঘ্ন রথে চড়ে যেতে রাজি হলেন। ক্রমে ভরত শৃঙ্গবের পুরের সন্নিকটে এলে রামসখা নিষাদরাজ গুহক ভরতের আগমন-সংবাদে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ভাবলেন, ভরতের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। রামের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেজন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে রামকে পাহারা দিতে লাগলেন। কিন্তু গুহক যখন দূত পাঠিয়ে ভরতের আগমনের কারণ জানতে পারলেন, তখন সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন। ভরত নিষাদরাজের কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন। ভরত গুহককে সাগ্রহে বললেন ঃ আমাকে সেই স্থানে নিয়ে চল, যেখানে শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ বনগমনের পথে রাতে শয়ন করেছিলেন। বলতে বলতে তাঁর নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। যেখানে যেখানে রামের পাদস্পর্শ হয়েছিল, সেইসব স্থানে ধূলি নিয়ে তিনি গায়ে ও মাথায় ঠেকালেন। ভরত তৃণশয্যায় শয়ন, ফলমূলাদি আহার ও জটা-চীর ধারণপূর্বক দিন কাটাতে লাগলেন।

পরদিন প্রাতে গঙ্গা-পার হয়ে তিনি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ভরদ্বাজ মুনি যথাযোগ্য আতিথেয়তা করে ভরতকে বললেন ঃ হে ভরত! মনের গ্লানি ও সঙ্কোচ ত্যাগ কর। আমি তোমার চরিত্র ও গুণের পরিচয় পেয়েছি। সবকিছু কালের গতির পরিণাম, এতে তোমার

কোন দোষ নেই। রামের বনগমন কল্যাণদায়ক হবে। ভরদ্বাজ মুনি ভরতের প্রশংসা করে বললেন ঃ

"রাম ভগত অব অমিঅঁ অঘাহূঁ।
কীন্হেহু সুলভ সুধা বসুধাহূঁ॥" (ঐ, ২।২০৮।৩)

—হে ভরত, তুমি রামের মহিমা প্রচার করে পৃথিবীতে অমৃতলাভ সহজ করে দিয়েছ। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণ এই অমৃত পান করে তৃপ্তিলাভ করবে। যাঁর প্রেম ও সুন্দর স্বভাব চরিত্রের বশীভূত হয়ে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীরাম অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর আবার দুঃখ বা গ্লানি কিসের? হে ভরত! তুমি ধন্য! কৈকেয়ীর কুবুদ্ধি, মন্থরার মন্ত্রণা, প্রভুর বনগমন এবং দশরথের মৃত্যু প্রভৃতি নিমিত্তমাত্র ছিল।

কবি তুলসীদাস বলছেন ঃ

"পেম অমিঅ মন্দরু বিরহু ভরতু
পয়োধি গঁভীর।
মথি প্রগটেউ সুর সাধু হিত কৃপাসিন্ধু রঘুবীর॥"
(ঐ, ২।২৩৮)

—কৃপাসিন্ধু রামচন্দ্র দেবতা ও সাধুগণের হিতের জন্য ভরতরূপী সমুদ্রকে বনগমনরূপ বিরহমন্দরাচল দ্বারা মন্থন করে রাম-প্রেমরূপ অমৃত উৎপন্ন করেছেন। শ্রীভরতের প্রেম লোকসমাজে অব্যক্ত ছিল। রামের বনগমন হওয়ায় ইহা প্রকাশ পেয়েছে এবং দেবতা ও সাধুগণও এতে উপকৃত হয়েছেন। সমুদ্রমন্থন দ্বারা যে-অমৃত উঠেছিল তা খেয়ে দেবতারা অমর হন ও অশুভ শক্তি নাশ হয়। দেবতাদের সামনে যে-সমস্যা ছিল তা সমস্ত মানুষের জীবনে বিদ্যমান। দেবাসুর সংগ্রাম যেন সৎ গুণ ও অসৎ গুণের নিরন্তর সংঘর্ষ। সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রয়োজন, তবে ঈশ্বরের কৃপা হয়। বস্ত্রবিহীন ব্যক্তির অলঙ্কার ধারণে যেমন সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না, তেমনি সদ্‌গুণে ভূষিত হয়েও যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস না থাকে তাহলে তার কোন মূল্য নেই। তুলসীদাস বলেছেন ঃ

"জৌঁ ন হোত জগ জনম ভরত কো।
সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কো॥
কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা।
কো জানই তুম্হ বিনু রঘুনাথা॥" (ঐ, ২।২৩২।১)

—যদি পৃথিবীতে ভরতের জন্ম না হতো, তাহলে ধর্মের সারবস্তুকে কে ধারণ করত? হে রঘুনাথ, কবিগণেরও কল্পনাতীত ভরতের গুণের কথা আপনি ছাড়া আর কে জানে?

"সিয় রাম প্রেম পিযূষ পূরন হোত জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষম ব্রত আচরত কো॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠন্হি হঠি রাম সনমুখ করত কো॥"
(ঐ, ২।৩২৫।ছঃ)

তুলসীদাস বলছেন, রামপ্রেমরূপ অমৃতে পূর্ণ ভরতের জন্ম যদি না হতো, তাহলে মুনি-ঋষিদেরও দুর্লভ যম, নিয়ম, শম, দমাদি কঠোর তপস্যা ও ব্রত আচরণ কে করত? সন্তাপ, দারিদ্র্য, দম্ভাদি দোষসমূহকে কে নাশ করত?

সমাজের ব্যাধি দূর করে আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রামরাজ্য গঠনের ভার ভরত নিয়েছেন। বাইরের দুর্গুণরূপ রাক্ষসনাশের ভার যেমন রাম-লক্ষ্মণ নিয়েছেন, তেমনি অন্তর্জগতের দুর্গুণনাশের ভার (কাম, ক্রোধ, লোভাদি) ভরত নিয়েছেন। ভরতের দিব্য প্রেম ও ত্যাগ, লক্ষ্মণের শৌর্য-বীর্য, হনুমানের দিব্য সেবাভাব এবং প্রভু রামের অনুপম করুণা ও উদারতার সমন্বয়ে আদর্শ রামরাজ্য গঠিত হয়। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন ঃ হে লক্ষ্মণ, আমার প্রতি তোমার অগাধ প্রেম আছে; সেজন্য তুমি ভরতের গুণের কথা ভুলে বৃথা সন্দেহ করছ। কিন্তু হে লক্ষ্মণ শোন, ভরতের মতো উত্তম পুরুষ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে কখনো জন্মায়নি।

"ভরতহি হোই ন রাজমদু বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহু কি কাঁজী সীকরনি ছীরসিন্ধু বিনসাই॥"
(ঐ, ২।২৩১)

—অযোধ্যারাজ্যের তো কথাই নেই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের পদ লাভ করলেও ভরতের মনে অহঙ্কার বা রাজ্যলাভের বাসনা কখনো হবে না। একবিন্দু অম্ল ক্ষীরসমুদ্রে পড়লে ক্ষীরসমুদ্র কি কখনো নষ্ট হয়? ভরত ক্ষীরসমুদ্র-স্বরূপ। মদ, মোহ, লোভ-রূপ অম্ল থেকে মুক্ত। তাছাড়া ক্ষীরসমুদ্রে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বাস করেন। ভরতের সংস্পর্শে অসাধু ব্যক্তিও সাধুতে পরিণত হয়।

তুলসীদাস ভরতকে 'শশি সার সুধা' বলেছেন। চন্দ্রে বিদ্যমান অমৃতলোক কল্যাণকারী। চন্দ্রের অমৃত বনস্পতি-সমূহকে শক্তিদান করে এবং সন্তপ্ত জীবকে শীতলতা ও সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করে। ভরতের চরিত্র ও স্বভাব সন্তপ্ত জীবের পক্ষে শান্তিপ্রদ ও কল্যাণকর। শ্রীরাম-পদ-অভিলাষী ভরত তীর্থরাজ প্রয়াগের নিকট বর চেয়ে বলছেন ঃ

"অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।
জনম জনম রতি রাম পদ যহ বরদানু ন আন॥"
(ঐ, ২।২০৪)

—আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না, এতে আমার রুচি বা ইচ্ছা নেই। জন্মজন্মান্তর যেন শ্রীরাম-চরণে প্রেম ও দৃঢ় অনুরাগ হয়, আমি কেবল এই একমাত্র বরই চাই; অন্য কিছু নয়।

ভরত রামের সুখে সুখী ও রামের দুঃখে দুঃখী। রামের সঙ্গে সারাজীবন বনে থাকলেও তিনি তাকে বৈকুণ্ঠে বাস মনে করেন। 'তৎসুখসুখিত্বম্'—প্রভুর সুখেই ভরতের সুখ-শান্তি। শ্রীরামচন্দ্রের নিবাসস্থান চিত্রকূটে প্রবেশ

করামাত্রই ভরতের দুঃখ ও হৃদয়ের বেদনা দূর হয়ে গেল। তুলসীদাস লিখেছেন ঃ

"করত প্রবেস মিটে দুখ দাবা।
জনু জোগীঁ পরমারথু পাবা॥" (ঐ, ২।২৩৮।২)

—প্রভু শ্রীরামের দর্শনমাত্রই ভরতের দুঃখ ও হৃদয়ের জ্বালা দূর হলো। যোগীর যেন পরমার্থলাভ হলো।

ভরতের চিত্রকূটে আগমনের কারণ অন্তর্যামী রাম বুঝতে পারলেন। একদিকে ভরতের প্রেম ও আগ্রহ রক্ষা করা, অন্যদিকে পিতৃসত্য পালন করা প্রভৃতি কথা ভেবে প্রভু রাম চিন্তাগ্রস্ত হলেন। এদিকে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন শুনে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে বললেন ঃ হে প্রভো! এরূপ এক উপায় স্থির করুন, যাতে রাম অযোধ্যায় ফিরে না যায়। ইন্দ্রের চিন্তা—রাম অযোধ্যায় ফিরে গেলে রাবণবধ এবং স্বর্গরাজ্য লাভ কী প্রকারে হবে? ইন্দ্রের কথায় গুরু বৃহস্পতি বললেন ঃ

"জো অপরাধু ভগত কর করঈ।
রাম রোষ পাবক সো জরঈ॥" (ঐ, ২।২১৭।৩)

—যে ভক্তের প্রতি অপরাধ করে, সে ভগবান রামের ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে যায়। ভগবান সব অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু তাঁর ভক্তের অপরাধকারীকে কখনোই ক্ষমা করেন না। ভরতের প্রশংসা করে গুরু বৃহস্পতি বলছেন ঃ

"ভরত সরিস কো রাম সনেহী।
জগু জপ রাম রামু জপ জেহী॥" (ঐ, ২।২১৭।৪)

—সারা জগৎ রামনাম জপ করে, কিন্তু শ্রীরাম স্বয়ং যাঁর জপ করেন (প্রশংসা করেন)—সেই ভরতের সমান রামের প্রিয় ও প্রেমী ভক্ত আর কে আছে? সুতরাং হে দেবরাজ! বৃথা সন্দেহ ও মোহ ত্যাগ করে শ্রীরাম ও ভরতের চরণে প্রীতি ও ভক্তি কর, এতে তোমার কল্যাণ হবে। গুরু বশিষ্ঠদেব ভরতের প্রেম ও আন্তরিক ইচ্ছার কথা জেনে রামচন্দ্রকে বললেন ঃ

"সব কে উর অন্তর বসহু জানহু ভাউ কুভাউ।
পুরজন জননী ভরত হিত হোই সো কহিঅ উপাউ॥"
(ঐ, ২।২৫৭)

—অন্তর্যামী রাম! তুমি সকলের মনের ভাব ও ভালমন্দ জান। তাই যাতে সকলের কল্যাণ হয় তার উপায় স্থির কর।

ভরতের প্রতি গুরুর স্নেহ দেখে রামচন্দ্র বিশেষ আনন্দিত হলেন। ভরতকে ধর্ম-ধুরন্ধর এবং কায়মনোবাক্যে নিজের সেবক জেনে রামচন্দ্র গুরু ও সকলকে বললেন ঃ

"লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ। করত বদন পর ভরত বড়াঈ॥
ভরতু কহহিঁ সোই কিএঁ ভলাঈ। অস কহি রাম রহে অরগাঈ॥" (ঐ, ২।২৫৮।৪)

—ছোট ভাই জেনে ভরতের প্রশংসা করতে আমার বুদ্ধি সঙ্কুচিত হচ্ছে। তথাপি আমি বলছি, ভরত যা বলবে ও করবে তাই হবে এবং তাতেই সকলের কল্যাণ হবে। এই বলে রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

ভরত দেখলেন অনুনয়, বিনয়, প্রার্থনা এবং গুরুর অনুরোধ প্রভৃতি প্রভু রামচন্দ্রের মনে প্রভাববিস্তার করতে অসমর্থ। প্রভু রাম পিতৃসত্য রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর রাম পুনরায় ভরতকে বলছেন ঃ ভাই! আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেম, ভক্তি ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি ধর্মসঙ্কটে ফেলছ?

"তাত তুম্হহি মৈঁ জানউঁ নীকেঁ।
করৌঁ কাহ অসমঞ্জস জীকেঁ॥
রাখেউ রায়ঁ সত্য মোহি ত্যাগী।
তনু পরিহরেউ পেম পন লাগী॥" (ঐ, ২।২৬৩।৩)

—হে তাত! আমি তোমায় ভালভাবেই জানি। কিন্তু কী করি, কোন উপায় স্থির করতে দ্বিধাগ্রস্ত। রাজা দশরথ আমাকে ত্যাগ করে সত্যকে রক্ষা করেছেন এবং আমার প্রতি প্রেম থাকায় আমার বিরহে শরীরত্যাগ করেছেন।

"তাসু বচন মেটত মন সোচু।
তেহি তেঁ অধিক তুম্হার সঁকোচু॥" (ঐ, ২।২৬৩।৪)

—পিতৃসত্য পালন করার চিন্তা, তোমার প্রেমের বশীভূত হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারা এবং গুরুর আজ্ঞা পালন না করতে পারায় আমি ধর্মসঙ্কটে পড়েছি। এখন তুমি যা করবে, যা বলবে, আমি তাই মেনে নিতে বাধ্য হব। তোমার ওপর সিদ্ধান্তের ভার দিলাম।

ভরত মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, ভক্তাধীন প্রভু রাম যদি পিতৃসত্য রক্ষা না করেন তাহলে মনে দুঃখ পাবেন। আমার জন্য প্রভুর পিতৃসত্য রক্ষা না হলে সূর্যবংশের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে। শরীরের কষ্টের থেকে মনের কষ্ট বা পীড়া অধিক। সমস্ত বাহ্য ভোগসুখ প্রাপ্ত হলেও মনের দুঃখ হেতু সবকিছু বিষবৎ প্রতীত হয়। সুতরাং প্রভু রামের যাতে সুখ হয়, আমি তাই করব। প্রভুর সুখশান্তি ও মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলে আমারও আনন্দ। প্রভুর মনের ভাব বুঝে ভরত রামকে বললেন ঃ

"দেবঁ দীন্হ সবু মোহি অভারূ। মোরেঁ নীতি ন ধরম বিচারূ।
কহউঁ বচন সব স্বারথ হেতূ। রহত ন আরত কেঁ চিত চেতূ॥"
(ঐ, ২।২৬৮।২)

—হে দেব! আপনি সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করলেন, কিন্তু আমার না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে ধর্ম। আমি তো কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বলছি। আর্ত ও দুঃখী মানুষের চিত্তে বিবেক-বিচার থাকে না। তুলসীদাস বলছেন ঃ

"আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা
সেবা ধরমু কঠিন জগু জানা॥

স্বামী ধরম স্বারথহি বিরোধূ।
বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধূ॥"

—সেবাধর্ম অত্যন্ত কঠিন। এটি বেদ, পুরাণ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তা জানে। প্রভুর প্রতি কর্তব্যপালনে এবং স্বার্থে বিরোধ। একসঙ্গে দুই পালন করা যায় না। স্বার্থে অন্ধ ভালবাসা এবং প্রেমে জ্ঞান থাকে। আমি স্বার্থবশ অথবা প্রেমের বশীভূত হয়ে বলব, দুদিক থেকেই ভয়ের কারণ। তুলসীদাস বলছেন ঃ

"জাসু বিলোকি ভগতি লবলেসূ।
প্রেম মগন মুনিগন মিথিলেসূ॥
মহিমা তাসু কহৈ কিমি তুলসী।
ভগতি সুভায়ঁ সুমতি হিয়ঁ হুলসী।। (ঐ, ২।৩০২।৩)

—যাঁর ভক্তির কণামাত্র পরিচয় পেয়ে মুনিগণ এবং জনকরাজা প্রেমে মগ্ন হন, সেই ভরতের মহিমা তুলসীদাস কী করে বর্ণনা করবে। ভরতের ভাব-ভক্তির পরিচয় পেয়ে কবির হৃদয়ে সুবুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতের প্রেমের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ ভাই ভরত! সত্য ও ধর্মে তুমি অটল। তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল। আমার প্রতি তোমার প্রেম ও ভক্তি অনুপম। সুতরাং আমাদের উভয়েরই ধর্ম ও কর্তব্য হলো পূজনীয় পিতার সত্যপ্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করা। এতে পরলোকে পিতার আত্মা শান্তিলাভ করবে।

"মোর তুম্হার পরম পুরুষারথু।
স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু॥" (ঐ, ২।৩১৪।২)

—আমাদের উভয়েরই পিতার আদেশকে পালন করা উচিত, কেননা এতেই আমাদের পরম পুরুষার্থ, স্বার্থ, সুযশ, ধর্ম, পরমার্থ, সবকিছু পূর্ণ হবে। রাজার কল্যাণে সকলেরই কল্যাণ। সুতরাং তাঁর প্রতিজ্ঞা ও ব্রতকে রক্ষা করা উচিত।

"দেসু কোসু পরিজন পরিবারূ।
গুরু পদ রজহিঁ লাগ ছরুভারূ।
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী।
পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী॥" (ঐ, ২।৩১৪।৪)

—রাজ্য, রাজকোষ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সবকিছু গুরুর কৃপার ওপর নির্ভর করে। তুমি গুরু বশিষ্ঠ, মাতাগণ এবং মন্ত্রিগণের শিক্ষা ও উপদেশানুসারে রাজ্য ও প্রজাগণকে পালন কর।

শ্রীরাম, ভরতের প্রেমে বশীভূত হয়ে ও ভরতের মনের ভাব অনুভব করে ভরতকে কৃপা করে নিজের পাদুকা দান করলেন।

"প্রভু করি কৃপা পাঁবরী দীন্হীঁ। সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হীঁ॥" (ঐ, ২।৩১৫।২) ❑

এই রচনাটি 'রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) 'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখার বিষয়—ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না।

(২) লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়।

(৩) কবিতা ও পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে।

(৫) লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়।

(৬) উচ্চমানের লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হয় না। 'মাধুকরী' বিভাগেই ঐধরনের লেখা প্রকাশিতব্য।

(৭) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতার বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না।

(৮) জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখতে হয়। শব্দসংখ্যা ২,৫০০-এর কম। লেখক বা লেখিকার নাম, ঠিকানা, ফোন নং এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৯) একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

(১০) লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে ঐ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখক-লেখিকার। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার **সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক** ইত্যাদির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(১১) রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(১২) 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগের জন্য লিখলে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই জানাবেন। নতুবা চিঠি গ্রাহ্য হবে না।

(১৩) লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব লেখক-লেখিকাদের।

সমাধি-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী গণনাথানন্দ*

ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বোচ্চ উপলব্ধি 'সমাধি'। সমাধির অসীম আনন্দ মুখে বলা যায় না। যিনি বলবেন, তিনি ব্রহ্মে লীন। ঐ অবস্থায় সাধক ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হয়ে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগদর্শন'-এ বলেছেন ঃ "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ।" (বিভূতি-পাদ, ৩)—ধ্যানের গভীরতায় সাধকের চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয়ে তদাকার প্রাপ্ত হয় এবং কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাকে 'সমাধি' বলে। যিনি সে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ—সমাধিমান পুরুষ। শ্রীম 'কথামৃত' মহাগ্রন্থে ঠাকুরের সমাধি-চিত্রগুলি যথাসম্ভব হুবহু ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তাই বিভিন্ন পরিদৃশ্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে 'সমাধি-মন্দিরে' অর্থাৎ সমাধিস্থ অবস্থায় দেখতে পাই। সমাধির প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। 'কথামৃত'-এর বিষয়বস্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বরলাভের উপায় এবং তার পথনির্দেশ। সবচেয়ে বড় কথা, সকল ধর্মকথায় ঠাকুর ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন। ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত—এই তিনের সম্মিলিত ভাবপ্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে, তাই এর তুলনা নেই। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রের আলোয় ঠাকুরের সমগ্র জীবন নব নব ভাবে বিভাসিত হয়ে রয়েছে এবং ধর্মজগতে তিনি অনন্ত ভাবে বিচরণ করেছেন। ধর্মের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর নেই। বেদ-বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তের প্রতিপাদিত 'ব্রহ্ম' তাঁর জীবনে প্রমাণিত সত্য। সকল ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে মিশে এক হয়ে গেছে। বহু সাধনা ও সিদ্ধির সাগরসঙ্গম হয়েছে তাঁর জীবনে। সমাধি-মন্দিরে তাঁকে দেখে শাস্ত্রবাক্যে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। এখানে 'ভাবের ঘরে চুরি' নেই, রয়েছে মহাভাবের প্রকাশ। তাঁর কথাতেই আছে ঃ "যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি কালী বলে কই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী।"

'কমল কুটির'-এ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর সমস্ত ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করে বললেন, সকল মত ও পথ সমভাবে সত্য—"যত মত তত পথ।" "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ, ১।১৪৮।৩৬)—সত্যবস্তু এক, কিন্তু জ্ঞানিগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। ঈশ্বরকে দেখা যায়, কথা বলা চলে তাঁর সঙ্গে এবং সর্বানুস্যূত বিশ্বচৈতন্যকে ধ্যানের বোধে বোধ করা যায়, যেমন ঋষিরা করেছিলেন। ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সাধনজীবনে ঠাকুর মায়ের দর্শনলাভের জন্য শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। কেন কাঁদলেন? কেঁদে মানুষের সাধন সহজ করলেন। বললেন, কাঁদলে মনের ময়লা কেটে যায়, মন শুদ্ধ হলে সবই হলো। মাতৃ-চৈতন্যে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল হৃদয়ের অসামান্য উক্তি ঃ "মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বৈ কিছু জানি না।" 'কথামৃত'-এ বর্ণিত ঠাকুরের ঈশ্বরীয় ভাব ও তাঁর লীলার দৃশ্যগুলি যেন জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হয়। মনে হয়, তিনি যেন সামনে বসে কথা বলছেন, দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান করছেন, কীর্তনানন্দে নৃত্য করছেন, আবার পরক্ষণে 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' নিমজ্জিত হয়ে শান্ত সমাহিত। 'ভাস্বর ভাবসাগর' শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসাগর মন্থন করে অমৃত উঠিয়ে এনেছেন। অমৃতের পূর্ণপাত্র নিয়ে তিনি চির অপেক্ষমাণ। আহ্বান

* রামকৃষ্ণ মিশন মোরাবাদি, রাঁচিতে কর্মরত সন্ন্যাসী।

করছেন সবাইকে, তোমরা এস আমার কাছে। অমৃতের আস্বাদন করে অমর হও, কারণ তুমি অমৃতের সন্তান। সমাধিস্থ ঠাকুর 'মর্ত্যের অমৃতস্বরূপ'।

মাস্টার মহাশয় ঠাকুরের বিশেষ কৃপাধন্য সৌভাগ্যবান পুরুষ ও তাঁর অনন্ত কৃপার সাক্ষী। তিনি জীবনের এক 'turning point'-এ ঝড়ের এঁটো পাতার মতো হয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেল। তাঁর করুণার আলোকে অভিস্নাত হয়ে নতুন জীবন ও প্রেরণা লাভ করলেন। উত্তীর্ণ হলেন মৃত্যু থেকে অমৃতে। আনন্দময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে তাঁর লীলাবিলাসের সাক্ষী করে রেখে গেছেন।

ভজনানন্দে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টার মহাশয়ের তৃতীয় দর্শন (৫ মার্চ? ১৮৮২)। বেলা আন্দাজ ৫টা। সেইদিনের দর্শন প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "তিনি (মাস্টার) শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে! শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই-চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন,... এমন মধুর গান তিনি কখনো কোথাও শুনেন নাই।... ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা নড়িতেছে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি! মাস্টার এরূপ কখনো দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়। গানটি এই—'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন...' ইত্যাদি। ঠাকুরের সেই ভুবনমোহন হাস্য!... স্তিমিতলোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন...! সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।" ('কথামৃত', ১ম ভাগ, ১৩৭২, পৃঃ ৩১-৩২) ঠাকুরের অদ্ভুত সমাধি দর্শন ও তার আকর্ষণে পরদিন (৬ মার্চ?) বেলা তিনটার সময় শ্রীম আবার এসে উপস্থিত। যার অরোধ্য আকর্ষণ অন্য সকল আকর্ষণকে ভুলিয়ে দেয়। "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং।" (ভাগবত, ১০।৩১।১৪)

এই আকর্ষণী শক্তি ভগবানের জীবোদ্ধারের শৈলী। প্রত্যেকটি যুগের একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন মেটাতেই ভগবানের আবির্ভাব। ঠাকুর সকলকে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যই এসেছেন। লক্ষণীয় এই যে, মাস্টার মহাশয়ের তখন কি অবস্থা হচ্ছে? মনে করলে অন্য জায়গায় যাওয়ার জো নেই, এখানে আসতেই হবে! এই যে যুগাবতারের যোগাবস্থা দেখা যাচ্ছে —এটি শুধু তাঁর কৃপাতেই সম্ভব। স্বামীজী ঠাকুরকে "জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়।/ নিরোধন সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়॥"—মন্ত্রে স্তব করেছেন। এই যে সমাধি, এ হলো ধর্মসংস্থাপন। এখানে আছে ধর্মের প্রমাণিত নির্যাস। বাক্যবিস্তার নেই এখানে। তিনি নিজেকে প্রচার করেননি—প্রকাশ করেছেন। শাশ্বত সত্যকে উন্মোচন করে দিয়েছেন। এর ফলেই তাঁর শান্ত সমাহিত অবস্থা, তাঁর 'Face of silence' অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বহু কণ্ঠে বন্দিত ও ঘরে ঘরে পূজিত। সমাধিস্থ ঠাকুরকে দেখা যায় জাগ্রত চৈতন্যের ভূমাস্থিতিতে। যাঁরা সমাধিস্থ পুরুষের সেই অবস্থিতি সাক্ষাৎ করেন, তাঁরা শাস্ত্রের সত্যে অবিশ্বাসী হতে পারেন না। তাঁরা দেহাত্মবাদে বিশ্বাস রাখতে পারেন না। বন্ধন হচ্ছে এই দেহাত্মবুদ্ধি। তিনি আমাদের বহির্মুখী মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করলেন স্বয়ং যোগস্থ হয়ে। সমাধিস্থ ঠাকুর তাই 'খণ্ডন ভববন্ধন'।

ঐতিহাসিক উইলিয়ম ডিগবী লিখেছেন ঃ "Sri Ramakrishna revealed God to weary mortals."—ক্লান্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবান কি, ভগবানলাভের আনন্দই বা কি সেটি তিনি প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গ অবতারণায় লক্ষ্য করি— "ভক্তেরা এইমাত্র হাসিখুশি করিতেছিলেন, এখন সকলেই এক দৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের অদ্ভুত সমাধি অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।" "সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়।" সকলের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়েছে বিনা আয়াসে একমাত্র যোগেশ্বরের সমাহিত অবস্থার দরুন। এটি যোগেশ্বরের মহাশক্তির খেলা। যাঁরা দেখলেন, তাঁরা জানলেন ধর্ম কি বস্তু। ঠাকুর প্রাণস্পর্শী ভাষায় ধর্মের অনেক সরল ও মধুর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে জোরালো প্রচার হচ্ছে এইসব ক্ষণে, যখন তিনি সমাধিস্থ হয়ে একটি কথাও বলতে পারেননি। পণ্ডিত শশধর একজন ধর্মপ্রবক্তা। ঠাকুর তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছেন ভবরোগ সারাতে হলে উত্তম বৈদ্যের সহজ কৃত নিদান চাই। শশধর পুণ্যবলে বা নিছক কৃপায় ধর্মের সার দেখতে পেলেন চোখের সম্মুখে। 'Seeing the Unseen'—এই দুর্লভ সমাধিদৃশ্য অবতারপুরুষের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়।

সমাধি প্রসঙ্গ বা ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত গীত হলে ঠাকুর দিব্যভাবে বিভোর হয়ে সহজ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত একটি সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুর সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে বাহ্যশূন্য—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে॥
জ্ঞান-অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইব শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে॥ ইত্যাদি

" 'আনন্দ অমৃতরূপে'—এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতীর্থ পরিক্রমায় লক্ষ্য করি, তিনি ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন ও তদ্ভাবের আনন্দে এত তন্ময় হয়ে যেতেন, যার ফলে তাঁর মুহুর্মুহু সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ ঘটেছে। বেদ-বেদান্তে যাঁকে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হয়, তিনিই আবার 'ভক্তানুকম্পায়' সগুণ সাকার রূপ পরিগ্রহ করেন। সমাধিস্থ ঠাকুর 'নির্গুণ গুণময়' অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপে অবতীর্ণ ভগবান।

কেশব-ভবনে কীর্তনানন্দে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার কেশব সেনের 'কমলকুটির'-এ দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুরের ছবি প্রথম তোলা হয়েছিল। দিব্যভাবে মগ্ন ঐ সমাধি-চিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সীমাহীন ভাব-প্রকাশ। ব্রহ্মানন্দে ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। নিমীলিত নেত্রযুগল, শান্ত, সৌম্য, মুখে ভুবনমোহন হাসি। সমাধিমূর্তির বামহাতের অঙ্গুলিসকল ছড়ানো, বলা যায় 'অবহেলামুদ্রা' অর্থাৎ সংসারে 'সং'-ই সার। এই দৃশ্যজগৎ মায়াময় ক্ষণিক। স্মরণ করিয়ে দেয় "ভুলো না মন দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে", সংসারের অসারত্ব ইঙ্গিত করছে। অন্যদিকে ডানহাতের ঊর্ধ্ব-প্রসারিত অঙ্গুলিদ্বয় যেন বেদ-বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভগবানই সত্য। যিনি নিত্য, শাশ্বত—তিনিই রূপে, অরূপে ও চৈতন্যরূপে সর্বত্র বিরাজমান। তাঁকে জানলেই জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩।৮) ঈশ্বরদর্শন হলে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হলো। দণ্ডায়মান সমাধি-চিত্রে যেন এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে আছে। ঈশ্বর-উপলব্ধির আনন্দ কেউ কাউকে পাইয়ে দিতে পারে না। সে-আনন্দের আস্বাদন স্বীয় সাধন-লব্ধ। সকলেই আনন্দের অধিকারী হতে পারে। চাই ব্যাকুলতা, চাই আন্তরিকতা।

জীবনের কেন্দ্রে ভগবানকে নিয়ে আসতে হবে, ভালবাসতে হবে তাঁকে। তিনি যে 'সুহৃদং সর্বভূতানাং'। (গীতা, ৫।২৯) গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ হে পার্থ, তুমি যে আমার অতি দুর্লভদর্শন বিশ্বরূপ দেখলে, দেবতাগণও সদা এর দর্শনাকাঙ্ক্ষী—

"সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥"

(১১।৫২)

ভক্তগণ এই দিব্যদর্শন কেবল অনন্যা ভক্তির দ্বারাই প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য।" (ঐ, ১১।৫৪) ঠাকুরের সমাধিরূপ দর্শন শুধু তাঁর কৃপাতেই সম্ভব। অনন্ত বিশ্বে বিরাজমান ভগবানকে ধরে এনে যেন তিনি দেখালেন—দেখ, এই দেখ, ভগবান আছেন, অতি কাছে আছেন। কাছে থাকা ভগবানের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাক্যবিস্তার করে নয়, করেছেন সর্বোচ্চ অনুভূতি সমাধি-মন্দিরে আসীন হয়ে। ধর্মজগতে তাঁর উপদেশদানের চেয়ে সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে তাঁর এই সম্পূর্ণ নির্বাক বাহ্যশূন্য হওয়া—তাঁর সমাধি। এই অদ্ভুত অবস্থা বর্ণনাতীত হলেও যাঁরা চোখের সম্মুখে এই সমাধি অবস্থা দেখেছেন, তাঁদের সন্দেহ ভেঙেছে ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে, যা হচ্ছে আমাদের 'ভববন্ধন'। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই 'যোগসহায়'।

গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকাবিহার করেন। কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণ ও মাস্টার মহাশয় কলকাতা থেকে জাহাজে করে এসেছেন। এক আনন্দের পরিবেশ। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব মিলনদৃশ্য আর অনন্ত আকাশের নিচে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ। সেদিনের ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মাস্টার মহাশয় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ "ঊর্ধ্বে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ি, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্যঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন। আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়।" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৮)

"বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই

বাহ্যশূন্য। সমাধিস্থ। মাস্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন।" (ঐ, পৃঃ ৩৭) এখানে যে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে, এর মর্মার্থ অবধারণ করা ধ্যানসাপেক্ষ। ভবসাগরের কাণ্ডারী নৌকায় উঠেই সমাধিস্থ। বুঝে নিতে হবে যে, ডুবে গিয়েই উত্তরণ, হুঁশ। জগৎ ব্যাপারে আমাদের টনটনে হুঁশ, তাই আমরা ভগবদ্ ব্যাপারে বেহুঁশ। যখন সত্যি হুঁশ হলো, ঠাকুর হলেন বেহুঁশ—বাহ্যশূন্য। কারণ, চৈতন্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে চিদাকাশ, তাই বাহ্যশূন্য। দৃশ্যজগৎ অদৃশ্য হয়েছে ভগবদ্-দর্শনের আনন্দে। এই অফুরন্ত আনন্দের উৎস মা আনন্দময়ী। যিনি বিশ্বময় আবার বিশ্বাতীত। 'আনন্দম্' ব্রহ্মকে জানলে মানুষ নির্ভয় হয়, আনন্দময় হয়ে যায়। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।২।৯) ভক্তসাধক গেয়েছেন ঃ "ভবে সেই সে পরমানন্দ, যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে।" (সাধনসঙ্গীত, পৃঃ ১৯০)

এই যে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৌকায় উঠে সমাধিস্থ হলেন—এটি হলো ভবকাণ্ডারীর হাল ধরা, ওপারে উঠে আসা। তিনি 'ভব-সাগর-তারণ-কারণ' কিনা। এখন উঠুক না প্রলয়ঙ্কর ঝড়; আর ভরাডুবির ভয় নেই, কারণ সঙ্গে তিনি রয়েছেন। "সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়"—মন্ত্রে স্বামীজী ঠাকুরকে স্তব করেছেন। যাঁর সমাধি হলো, তিনি কে—সেদিন যাঁরা নৌকায় ছিলেন তাঁরা সকলে হয়তো জানতেন না। কিন্তু আজ আমরা যখন তাঁর সঙ্গে ভাবের নৌকায় উঠলাম, আমরা প্রায় সকলেই জানি ও মানি তিনি কে।

যিনি সমাধিস্থ, অজান্তেই তিনি নিজেকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছেন সদ্যফোটা পদ্মের মতো সকল শাস্ত্রের সার-সুরভি। তাঁর অনুভূতির স্পন্দন ক্রমে আঘাত করেছে আলোর মতো আমাদের অন্তরের অন্ধকারে। আমরা ভাবছি, তাই তো এ কি হলো? কাকে দেখতে পেয়ে ইনি সমাধিস্থ হলেন? তাছাড়া এই যে নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছি, না দেখে উপায়ান্তর নেই—দেখতেই হবে। বুঝি, না বুঝি, এ হচ্ছে ধ্যান। কার ধ্যান হচ্ছে এখানে? যিনি বলেছেন ঃ "সম্ভবামি যুগে যুগে।" কেন? ধর্মসংস্থাপনার্থায়। আমাদের জীবনে তাঁর অবতরণ সার্থক হতে শুরু হয়ে গেছে—আমাদের ভববন্ধন খণ্ডিত হতে আরম্ভ করছে যখন "সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায়"।

"নৌকা আসিয়া লাগিল।... ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে হুঁশ করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও ভাবস্থ—একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। ক্যাবিনঘরে প্রবেশ করিলেন।... একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসানো হইল,... ঠাকুর বসিয়া আবার 'সমাধিস্থ'। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।" (কথামৃত, পৃঃ ৩৮) এই অপরূপ সমাধি-চিত্র দর্শনে উপস্থিত সকলেই আত্মহারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি অবস্থার মাধ্যমে সত্যধর্মকে প্রকাশ করেছেন। ঐসব অবস্থায় ভগবদ্‌বোধে নিমজ্জিত হয়ে একটি কথাও তিনি বলতে পারেননি। শুধু তাই নয়, এই অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি ভগবানকে আমাদের চৈতন্য-ধৃত করে রেখে গেছেন। কেমন করে? তিনি ধ্যান করতে করতে হয়েছেন ধ্যেয়, ধর্ম দেওয়ার সঙ্গে দিয়েছেন প্রেম, প্রাণের নিগূঢ়তম প্রদেশে দিয়েছেন—আমি চাই আর না চাই আমি তা হারাতে পারি না। কারণ যাঁকে চাই তিনি সম্মুখে সমাধিস্থ।

যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে দেখতে পাই, সমাধি হচ্ছে যেন তাঁর অধর্ম নিরসনের অশনি। "বাগ্-বৈখরী শব্দঝরী" (বিবেকচূড়ামণি, ৫৮) অর্থাৎ ভাষার ওপর অধিকার, শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য—এসব তাঁর ছিল না। শুধু নির্বাক, নীরব অবস্থার দরুন তিনি হয়েছেন সরব—বহু কণ্ঠে সোচ্চার। চৈতন্য জাগরণই ধর্মসংস্থাপন। নিজের সমাধি হলে সবচেয়ে ভাল। না হয়ে থাকে তো ঠাকুরের 'সমাহিত-মন' তাঁর কৃপায় নিরীক্ষণ করা ভাল। কেন? তাতে নিজের ভিতরকার সুপ্তচৈতন্য জেগে ওঠে, আগুন যদি নিজেদের কাঠে রাখি আগুন ধরবে না? আমরা নিরেট কাঠ হতে পারি, কিন্তু ভিতরে সুপ্ত আগুন রয়েছে। এখানেও যা, ওখানেও তা। চৈতন্য অখণ্ড।

ঠাকুরের ধর্মসংস্থাপনের এই সূক্ষ্ম ধারাটি এজগতে প্রবলভাবে প্রবহমান। আমরা সকলে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী, কারণ "ঠাকুর বসিয়াই আবার সমাধিস্থ"। ❑

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বিবেকানন্দ

দেবী রায়

"Love! That wonderful four-lettered word."

তুমি—সেই
সপ্তঋষির এক ঋষি!
তোমার আবির্ভাব অখণ্ডের ঘর
থেকে!
—কেন এসেছ? এনেছ তুমি-ই
ডেকে।
তোমার কাজে
এজগৎ মাঝে,
প্রেমের প্রচারে
বারেবারে
বলাবে তুমি-ই
সেই
আমাকে।
আজ হোক বা কাল
থাকবে,
সাক্ষী মহাকাল।

জয় হবে—হবে জয়
সত্যের জয়
প্রেমের জয়।
—খোঁজ করছ, ঈশ্বরের?
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"
বলেছ, এগিয়ে যাও!
ওঠো! জাগো...
মানুষ নিজেকে
জানুক 'সে কে'
জানুক তার আত্মাকে
লাভ করুক
তার অনন্ত সম্ভাবনার
পরিচয়!
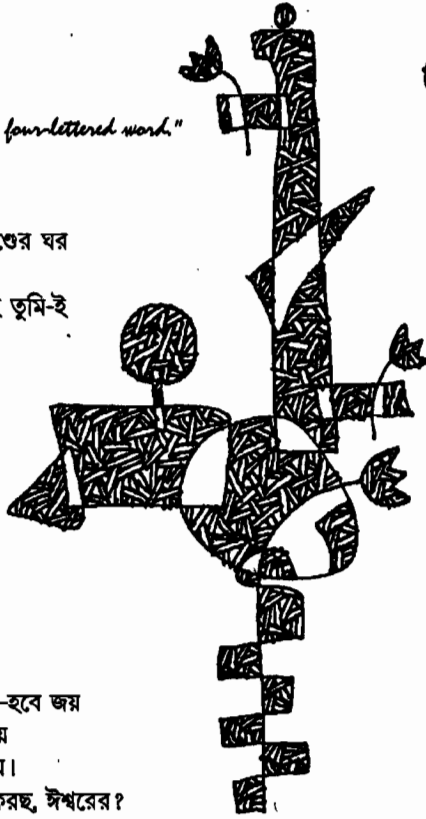
৪ জুলাই

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ এক আশ্চর্য দিন
স্মৃতির সরণি ধরে ফিরে ফিরে আসে।
এইদিন আমরা জেগে উঠি
এক মহত্তম অনুভবের স্পন্দনে,
স্বামীজীর মহাসমাধির স্মৃতিচারণে।

কতই বা বয়স ছিল তাঁর,
স্বল্পায়ু জীবনে অজস্র সহস্রবিধ কর্মের সাধনায়
তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ।
অথচ কোটি কোটি হৃদয়ের ভারেও
অনন্য নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অবিচলিত, নিঃশঙ্ক।
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র অমেয় মন্ত্রে দীক্ষিত
স্বামীজীর বহুধাবিস্তৃত কর্মোদ্যোগ
আজ জনতার মহাসমুদ্র ধরে
সতত প্রবহমান।

এই পরম লগ্নে আজ প্রণাম জানাই
মহান প্রজ্ঞায় অভিস্নাত স্বামীজী স্বরূপকে।

ত্রয়ী

সন্তোষকুমার অধিকারী

জীবন-১

শব্দধ্বনিহীন হয়ে সময়ের বুকে যদি থাকে,
সুর হয় ছন্দহীন, কথা তার হারায় ব্যঞ্জনা,
দৃষ্টি যদি শূন্য এক বৃত্ত শুধু অস্পষ্ট ধূসরে,
সময় হারায় গতি, স্পন্দনবিশূন্য তবে সে কোন্ জীবন?

জীবন-২

কে জানত—তুমি শুধু স্তব্ধ হিমাচল!
ছায়া নেই, শব্দ নেই, স্বর নেই, সুখ নেই তার,
আশাহীন নিরালোক—বেদনায় চেয়ে থাকা শুধু
সারাক্ষণ জেনে যাওয়া জীবনের বিবর্ণ বেদনা!!

জীবন-৩

মুহূর্তেরা দ্রুতগামী দুর্গম মনের চেয়ে বেশি,
দণ্ডগুলি বয়ে যায়, ফুরায় আকাশ থেকে আলো,
অর্থহীন সে-জীবন, গতি নেই হৃদয়েতে যার,
প্রাণশূন্য শিলাস্তূপ, মগ্নধী মৃত্যুর আঁধারে—
তবুও নিঃশব্দ এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বুকে
সহসা বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ করে হৃদয়, পৃথিবী!!

তিনি

সিদ্ধার্থ সিংহ

কী ছিল, কী নেই, তার জন্য ভেবো না,
ভাবতে হলে তাঁর জন্য ভাব।
এর-তার কাছে হাত পেতো না,
পাততে হলে তাঁর কাছে হাত পাত।
দু-হাত জমির জন্য কেঁদো না,
কাঁদতে হলে তাঁর জন্য কাঁদ।
কারও কাছে মাথা নত করো না,
করতে হলে তাঁর কাছে নত কর।
শুধু শুধু 'বুড়ি' ছোঁয়ার জন্য ছুটো না,
ছুটতে হলে তাঁকে ছোঁয়ার জন্য ছোট।
যদি সত্যিই কাউকে ভালবাসতে চাও,
তাঁকেই ভালবাস।

তিনি ছিলেন, তিনি আছেন,
তিনিই তো থাকবেন।

'স্বার্থ'ভিক্ষা

রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মাগো—
অর্থ, বল, গরিমা যা দিয়েছ
অতৃপ্ত রয়েছি আমি তাতে
'স্বার্থ'ভিক্ষা চাই তাই আজ
শুধু 'আমি'ই রব এজগতে।
'আমি'রে সুপ্রতিষ্ঠিত কর
তোমার এ-ভূমণ্ডল মাঝে
নিশ্চিহ্ন করে সহস্র 'তুমি'রে
'আমি' যেন সেথায় বিরাজে।
যত দুঃখ-দৈন্য-হতাশা 'তুমি'র,
নিযুত বৎসরের জমানো আঁধার,
মুহূর্তে করে দাও মোর
শূন্য হোক সবার ভাঁড়ার।
আমি শুধু আনন্দেতে রব
'তুমি'গুলি কোথাও উধাও
কোটি কোটি হৃদয়ের ধ্বনি
মম চিত্তে সহর্ষে বাজাও।
'আমি' রব সবাকার মাঝে
'তুমি'রে দেব না অধিকার
'ধোঁকার টাটি'র এ-সংসারে
'আমি' মজা লুটি—জগৎই আমার।

হে অনন্ত আলো

পার্থপ্রতিম মজুমদার

কোন্ সকালে লুকিয়ে আছ
অরূপ কোন্ আলোর দেশে
কোথায় কোন্ পথের শেষে
দাঁড়িয়ে আছ অলক্ষিতে
কেউ জানে না, কেউ জানে না।

গোপন সুখে পাতার মাঝে
মুকুলগুলি উঠছে ফুটে
অসীম কোন্ আলোর রেখা
লুটিয়ে আছে সবুজ ঘাসে

তোমার সুরে আজকে যেন
সকল সোনা, সব-ই সোনা।

নদীর বুকে বাতাস হাসে
মায়ের কোলে দামাল ছেলে
পাহাড়-চূড়ে স্বর্ণছটা
সাগর ছোটে উর্মি দোলে
সবার সাথে আছ তুমি
হাওয়ার মাঝে অন্য হাওয়া
অসীম সেই তরঙ্গেতে।

কোন্ সকালে লুকিয়ে আছ
কেউ জানে না, কেউ জানে না।

তিষ্ঠ

অনুপ মুখোপাধ্যায়

অনেক টালবাহানা
এবং উতোর চাপানোয়
কাটিয়ে বছর বাহান্ন
পা দিয়েছি তিপ্পান্নয়।

অযুত নিযুত বিবাদ
জীবনটা যেন বরবাদ
দিলে একেবারে বাদ
কী মন্দ?

তবু তো আশার বাতাস
বইছে মন্দ মন্দ
শুনি বিজয়ের ধ্বনি
অস্ফুট মৃদুমন্দ।

আত্মার এই মন্ত্রে
(লেখা রয়েছে তন্ত্রে)
জাগে ঘুমন্ত প্রাণ
মনের যেখানে ত্রাণ

ছেড়ে বাসনা লক্ষ
এটাই হোক না লক্ষ্য

আর যদি থাকে স্মরণে
জীবনে কিংবা মরণে—
মাতা, গুরু আর ইষ্ট
টলায়মান এ তরণী
তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ...

দিশারি

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

জটিল কথা সহজ ভাষায়
এমন করে কে বলেছে?
এমন করে টাকা মাটি
কে আর কবে এক করেছে?

আহা! আমি কেমন রসিক
তোমারি ভবের কাণ্ডারি,
বড়লোকের দাসীর মতোই
বেশ সেজেছি সংসারী।

সংসারেতে রাঘব-বোয়াল
ওদের দেখি ভীষণ দাপট,
সব কেড়ে চায় রাজা হতে
মারছে শুধুই লেজের ঝাপট।

এসব দেখেই জীবনপথে
একলা আমি পথটি হাঁটি,
পাঁকাল মাছের মতোই কেমন
পাগল মনে পিছল কাটি।

সকল জ্ঞানের আধার তুমি
বাজাও বীণা ঝঙ্কারে,
অসার ফেলে সার ধরব
দুধ আর জলের সংসারে।

অলংকরণ : সৌমীন মিত্র

নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়*

[পূর্বানুবৃত্তি]

■ ৪ ■

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে নজরুলকে ভিন্ন ভাবনায় চিত্রিত করার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু কাব্যটি মন দিয়ে পড়লে আমরা দেখতে পাই, 'জগন্নাথের সাম্যলোক' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এই কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। ভগবানের গড়া এই জগৎসংসারে যারা অসাম্যের বীজ বুনে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত নজরুল। যে বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি মন্দির-মসজিদে ঘুরে ক্ষুধার অন্ন পায়নি বরং নির্দয়ভাবে বিতাড়িত হয়েছে, তার কণ্ঠে নজরুল ভাষা দিয়েছেন এইভাবে—"আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,/ আমার ক্ষুধায় অন্ন তা' বলে বন্ধ করনি প্রভু।/ তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি/ মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।"

ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে নিরন্ন মানুষের এই লাঞ্ছনা দেখে মুখ বুজে বসে থাকেননি নজরুল। ভজনালয়ের প্রতি তাঁর জেহাদ ঘোষিত হয়েছে 'মানুষ' নামের সুবিখ্যাত কবিতাটিতে—"কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়/ ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।" ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এ তাঁর সত্য-অভিযান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "সত্যকথাই কলির তপস্যা।" নজরুল আজীবন সত্যসন্ধানী ছিলেন, শিল্পীমনের নানা দোলাচল তাই অকপটে প্রকাশ করেছেন তিনি, সত্যের অপলাপে মেতে ওঠেননি কখনো। জোরালো কণ্ঠে বলেছেন ঃ "বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়/ বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।" এই সত্যানুভূতি উঠে এসেছে আত্মোপলব্ধির অদ্বৈত ভাবনায়, 'সাম্যবাদী' কবিতায় যা চিত্রিত হয়েছে জোরালো ভাষায় ঃ "বন্ধু বলিনি ঝুট,/ এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।/ এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,/ বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,/ মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়/ এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।"

'মানুষ' কবিতায় একই কথা তিনি লিখলেন অন্য ভাষায় ঃ "হয়তো আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদী ঈশা,/ কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা,/ কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?/ হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবা-রাতি।"

'বিবেকচূড়ামণি' নামক মহাগ্রন্থে শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ "নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।/ অখণ্ড-বোধোঽহমশেষসাক্ষী নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ॥" (৪৯৪)—আমি নারায়ণ, আমি নরকাসুরঘাতী কৃষ্ণ, আমি ত্রিপুর দৈত্যের বিনাশ-কারী, পরমপুরুষ এবং ঈশ্বর। আমি অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, পরমস্বতন্ত্র তথা অহং-মমত্বশূন্য।

বৈদান্তিক এই ভাবনার অনুসূত্রে স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, নিজেকে জানাই শিক্ষার সার্থকতা। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই আত্মন্-এরই উচ্চকিত জয়গান। উপনিষদের ঋষিও বলেছেন ঃ "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" অর্থাৎ বিশ্বজগতে যাকিছু চলছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত। 'ক্ষুদ্র আমি'র আবরণ সরিয়ে ফেললেই প্রকাশিত হবে 'বৃহৎ আমি', আমার মধ্যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে আমার সত্তা একীভূত হয়ে ধরা দেবে। উপনিষদ্ তাই আরো বললেন ঃ "যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু-পশ্যতি।/ সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" যিনি সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। উপনিষদ্ শিক্ষার মহান এই আলোকবর্তিকা শ্রীরামকৃষ্ণে নতুনতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মুখে নির্বিকল্প সমাধির বাসনার কথা জেনে তিনি বলেছিলেন ঃ "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীনকথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।"

এই শিক্ষার অভিঘাতে জন্ম নিলেন ভাবিকালের বিবেকানন্দ। বললেন ঃ "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?/ জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই যুগবাণী দেশের তৎকালীন যুবশক্তিকে 'অভীঃ' মন্ত্রে জাগিয়ে তুলল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ, নজরুল ও আরো বহু মনীষার কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেল ব্যাপ্ততর ক্ষেত্রের উজ্জ্বল প্রণোদন। নজরুলের লেখায় স্বামীজীর ভাববাণীর ছায়াপাত ঘটল এভাবে ঃ "কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে/ কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়চূড়ে?/ হায়, ঋষি দরবেশ,/ বুকের মণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।/ সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে, তুমি আছ চোখ বুজে,/স্রষ্টারে খোঁজ—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে;/ ইচ্ছা-অন্ধ। আঁখি খোল, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,/ দেখিবে তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।"

'ঈশ্বর' কবিতার এই ভাববস্তু নজরুলের কাব্যভাবনার বিশেষ একটি দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র যে মহান ব্রত স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রভাব

* শ্রীরামপুর-নিবাসী, কবি নজরুল বিষয়ে গবেষক, সরকারি কর্মী।

নজরুলের রচনায় স্পষ্ট। দেশের দরিদ্র, পতিত মানুষদের জাগানোর, তাদের পাশে দাঁড়ানোর যে-শপথ স্বামীজী নিয়েছিলেন, নজরুলের লেখায় সেই প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায়। 'কুলি-মজুর' কবিতায় তিনি লিখেছেন : "তুমি শুয়ে রবে তে-তলার 'পরে আমরা রহিব নিচে,/ অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে।/ সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা রসে/ এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।"

অধ্যাত্মচেতনার সূত্র-সংযোগে তিনি আরো বলেছেন : "একের অসম্মান/ নিখিল মানবজাতির লজ্জা সকলের অপমান।/ মহা-দানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,/ ঊর্ধ্বে হাসিতেছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

একের অপমানে বহুর অপমানবোধ, শয়তানের উত্থানের অলক্ষ্যে ভগবানের রহস্যঘন প্রণোদন ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মচেতনার অনুষঙ্গে চিত্রিত। নজরুলের সাহিত্যভাবনা তাই ভারতবর্ষীয় ধর্মমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়নি কখনো।

■ ৫ ■

ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীতে মানুষের সমানাধিকারের বিরুদ্ধ-শক্তির দিকে তর্জনী উঁচিয়ে নজরুল বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টির আদিকথা। 'ফরিয়াদ' কবিতায় বলেছেন : "এই ধরণীর যাহা সম্বল/ বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল,/ সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল/ পাখির কণ্ঠে গান,—/ সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান।" এই ফরমান যখন পিষ্ট-দলিত হয়েছে, সুবিচার চেয়ে গর্জে উঠেছেন পৌরুষদীপ্ত নজরুল। এই পৌরুষ তাঁর জীবন ও সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মের হানাহানি, জাতি ও বর্ণ-ভেদ, শোষণ, পরাধীনতা প্রভৃতি ধর্মবিরুদ্ধ কার্য-পরম্পরার প্রতি দীর্ঘ সংগ্রামই তাঁর জীবনদর্শন। 'মন তোর মন্তর'—পরমপুরুষের এই যুগোত্তীর্ণ বীক্ষায় তিনি দেখেছেন মানুষকে। শাস্ত্রবদ্ধতা নয়, হৃদয়ের পরম নির্যাসটুকুকেই মূল্য দিয়েছেন তিনি। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে (প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৩৬) নজরুল দেখিয়েছেন, নিম্নশ্রেণির মুসলমানেরা পেটের দায়ে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। তাদের দুঃখের কথা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অনুপম ভাষায় : "জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐরকমের কোন একটা কিছু করে। আর, মেয়েরা ধান বাড়িতে ভানে, ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখীবাঙ্কা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে।

"বিধাতা যেন দয়া করেই এদের জীবনে দুঃখকে বড় করে দেখবার অবকাশ দেননি। তাহলে হয়তো মস্ত বড় একটা অঘটন ঘটত।"[২০]

কৃষ্ণনগরে থাকার সময়ে (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) এই মানুষগুলোর ধর্মাধর্ম, দুঃখ-বেদনা, ধর্মান্তর, শাস্ত্রবদ্ধতা ও শাস্ত্রবিরোধ নজরুলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। চোখ-কান খোলা রেখে হৃদয় দিয়ে সবটুকু বিচার করেছিলেন তিনি। 'ঝিলিমিলি' নাটিকায় মানবীয় প্রেমের রুদ্ধ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে তাই তিনি জেগে উঠেছেন, 'সেতু-বন্ধ' নাটকে অন্তরীক্ষের গানে বাণী সংযোজন করেছেন এমন প্রমত্ততায় : "হর হর শঙ্কর। জয় শিব শঙ্কর।/ দানব-সন্ত্রাস জয় প্রলয়ঙ্কর।/ জয় শিব শঙ্কর।"

পদ্মা নদীর ওপর সারা ব্রিজ নির্মাণ প্রসঙ্গে এই নাটক। শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, যন্ত্ররাজ পরাজিত হয়েছে পদ্মাদেবীর কাছে। মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে সে বলে : "আমার মৃত্যু নাই। দেবী। আজ তোমারই জয় হলো। দেবতার মতো দানবও বলে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের ওপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।"

জবাবে পদ্মা বলে : "জানি যন্ত্ররাজ। তুমি বারেবারে আসবে, কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে।"

দেব-দানবের যুদ্ধে শেষত দৈবশক্তির জয় সুনিশ্চিত। অন্ধকার পরাভূত হবে আলোর কাছে, তাই প্রয়োজন শক্তিসাধনা। 'দেয়ালী-উৎসব' নিবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন : "আজ বাঙালির ঘরে ঘরে দেয়ালী-উৎসবের আগুন লেগেছে, শব্দ-বিদারণের ধুম পড়ে গেছে।... মুসলমানের মোহররমের লাঠি খেলার মতোই এ দেয়ালী-উৎসবেরও আগুন আর বোমাও আজ শুধু অভিনয়মাত্র।...

"এ তোমার শক্তিপূজা নয় বাঙালি, এ তোমার মিথ্যাপূজা, শক্তির অপমান। যে-দেবীর পূজায় আজ এই দেয়ালী-উৎসব করছ, সে-বেটি সত্য আগুন জ্বালিয়েছিল অত্যাচারী অসুরের রাজ্যে। তার ভূত-প্রেত-বিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলায় উৎপীড়কের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"পার তো তেমনি করে এস বাঙালি ও করালী কালী বেটির মতো অন্ধকারের চেয়েও ভীষণ কালরূপ নিয়ে, যেন সে-কালরূপ দেখে মহাকালও ভয় পায়।"[২১]

নজরুলের সামগ্রিক রচনায় হৃদয়ের নির্মাল্য আর শক্তিসাধনার সমারোহ। ইসলামের কাছে তিনি চেয়েছেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, কালীর কাছে শক্তি এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কাছে অমেয় প্রেম। মূল ভাবটি শক্তি—অনন্ত অখণ্ড শক্তি, যা মানুষকে সকল বন্ধনমোচন করতে সাহায্য করে।

ইসলামের প্রতি নজরুলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আবাল্য। হাজি পালোয়ানের শক্তিধারা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "হুগলিতে থাকতে মাঝে মাঝে বলতেন, 'এখনও পীরের উদাত্ত আহ্বান আমি রাত্রে শুনতে পাই।' " ধর্মপ্রাণ নজরুল জানতেন, ইসলাম মানে শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী। ভক্তকবি দাদূর কথাটি তাঁর প্রিয় ছিল—"সোঈ কাজী

সোঈ মুল্লা সোঈ মোমিন মুসলমান।/ সোঈ সয়ানে সব ভলে জে রাহে রহমান॥"

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বঙ্গানুবাদ করেছেন ঃ "সেই কাজী, সেই মুল্লা, সেই মোমিন, সেই মুসলমান, সেই তো সুবুদ্ধিমান, সেই তো সবরকমে ভাল যে দয়াময়ের সঙ্গে প্রেমে রহে অনুরক্ত।" মহান এই প্রেমমার্গ ছেড়ে মুসলমান যখন হানাহানির পথে মাতে, সে-মাতন কষ্ট দেয় নজরুলকে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি লেখেন ঃ "তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ; ক্ষমা কর হজরত।/ ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ।"

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'যুগান্তর' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইসলামী' নামের এই মহামূল্যবান কবিতায় নজরুল আরো লিখেছেন ঃ "তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,/ তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াছ অমর বাণী।/ মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা/ সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,/ বেহেশত্ হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত॥"

এই বেদনা একজন সাচ্চা মানুষের, যাঁর ধর্ম ইমান। রাগানুগা ভক্তি নজরুলের। আল্লাহ্‌র প্রেম তাঁর পরমধন, তাই তিনি লিখতে পারেন ঃ "গলায় যাহার দোলায় বিধি/ পাগল প্রেমের শিকলি ফাঁসি/ প্রেমের এবং প্রেমকে জানা/ স্বাদ অ-রসিক জানবে কিসে?"

অধ্যাত্মরসে মশগুল নজরুল আচারবিচার ছেড়ে, তুচ্ছ সংস্কার পরিহার করে প্রেমের পথ ধরেছিলেন। দাদু, কবীর প্রমুখ সাধক-কবির যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে সুফি মতের পাল তুলে দিওয়ানা হয়েছিলেন তিনি। হাজি পালোয়ান ছিলেন সুফি সাধক। এই শ্রেণির সাধকেরা সোফ্ বা কম্বল পরিধান করে সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন, শাস্ত্রকথা অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তার সারটুকু নিয়ে হৃদয়ের রসে সিক্ত হতেন। আউল-বাউল-ফকির-দরবেশের মতো রসিক হৃদয় ছিল নজরুলের, তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে এমন রসধারা ঃ "আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে/ ফলবে ফসল বেচবে তারে কিয়ামতের হাটে।/ পত্তনীদার যে এই জমির/ খাজনা দিয়ে সেই নবিজীর/ বেহেশতেরই তালুক কিনে বসব সোনার খাটে।"

একটি অসাধারণ গানে তিনি লিখেছেন ঃ "বক্ষে আমার কাবার ছবি/ চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।/ শিরোপরি মোর খোদার আরস/ গাই তারি গান পথ বে-ভুল॥/ লায়ালির প্রেমে মজনু পাগল/ আমি পাগল 'লা ইলা'র;/ প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে/ অরসিকে কয় বাতুল।"

এমন বাতুলতা নজরুল কোথায় পেলেন, সে-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। "ওরা খোদার রহম মাগে/ আমি খোদার ইশক্ চাই"—এমন অনন্যসাধারণ অনুভবের সূত্র-সংযোগটিই বা কী? অনুসন্ধানে জানা যায়, মুসলিম সাধনপথের মজ্‌বুবপন্থা অর্থাৎ প্রেমের পথে ঈশ্বরসাধনার মতটি পছন্দ ছিল তাঁর। এক গোপনচারী দরবেশের কাছে তিনি ইসলামি যোগসাধনাও শিক্ষা করেছিলেন। সেই সাধনার বলে 'ফাণা' স্তর অতিক্রম করে 'ফিল্‌ফাণা' স্তরে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হয়ে থাকার শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। সে-কারণেই হিন্দু কিংবা ইসলাম—কোন মতের শুষ্ক আচার-বিচার গ্রহণ করেননি তিনি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হল-এ কলকাতা মুসলিম ছাত্রসম্মিলনের দ্বিতীয় দিনে 'আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ' শীর্ষক একটি অভিভাষণে তিনি বলেন ঃ "বন্ধুগণ! আল্লাহ্ জানেন, আমার অমৃতের সাধনা—আমার মুক্তির, আজাদির সাধনা আমার একার জন্য নয়। অমৃত যদি পাই, মুক্তি যদি পাই—সে-অমৃত মুক্তিতে আপনাদের সকলের হিস্‌সা আছে। শুধু পরম গোপনকে জানাই আমার সাধনা নয়—তাঁকে জেনে তাঁকে পেয়ে প্রকাশ-জগতে আনার জন্যই আমার এ তপস্যা।" এই মহৎ তপস্যায় ব্রতী হতে গিয়ে ইসলামের নামে চলে আসা অবরোধ-প্রথা, সঙ্গীতের বিরোধিতা, শাস্ত্রবদ্ধতা প্রভৃতির প্রতি আঘাত হানতে হয়েছে। ফলে তাঁকে কেউ কেউ 'কাফের' মনে করেছে, তবু পিছপা হননি তিনি। মানুষের প্রতি পরম বিশ্বাস রেখে বলেছেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিয়ে এই আশার বাণী শোনাচ্ছি—তিনি প্রকাশিত হবেন তোমাদেরই মাঝে, জরাজীর্ণ দেহে নয়, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের প্রার্থনামতো আমার মতো মহামূর্খকে লিখালেন কবিতা, গাওয়ালেন গান—তাঁর শক্তি এই নামগোত্রহীনের হাতে দিলেন আশার বাঁশি, আহ্বানের তূর্য, রুদ্রের ডমরু-বিষাণ। তোমরা চাও—আরো চাও—দেখবে তোমাদেরই মাঝে চির-চাওয়া রুদ্র-সুন্দর আসবেন নেমে।"

এই সদর্থক ভাবনা যেন স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিরূপ। বীর সন্ন্যাসী বলেছেন ঃ "ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, সাধারণ লোকের ভিতরেই যতকিছু মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে, জগতে বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে।"[২২]

■ ৬ ■

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নজরুল জীবনের তৃতীয় পর্বের শুরু। এই পর্বটি বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার। চারবছর আগে ডিসেম্বরের এক অশুভ দিনে মারা যায় নজরুল-প্রমীলার প্রথম সন্তান কৃষ্ণ-মহম্মদ বা আজাদ-কামাল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) মারা যান কবিমাতা জাহেদা খাতুন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের বাসায় কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল অকস্মাৎ মারা যায়। প্রমীলাদেবীর কাকিমা, নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরীদেবী মারা যান ১৯৩৮

খ্রিস্টাব্দে। গত শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকে কবিপত্নী প্রমীলাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমে (১৯৩৭, মতান্তরে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। এদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য, অপরদিকে নানা প্রতিকূলতা ও বিরোধিতা, রোগযন্ত্রণা, বিরহবেদনা প্রভৃতি নজরুলকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নজরুলের সক্রিয়তা বিনষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নজরুল সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্রিয়তম পুত্র বুলবুল মারা যাওয়ার পর থেকেই তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সঙ্গীতের মধ্যে প্রাণের আরাম খুঁজতে চেয়েও ব্যর্থ হন বারেবারে। লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমির প্রধানশিক্ষক 'যোগিরাজ' বরদাচরণ মজুমদারের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি তন্ত্র ও যোগসাধনায় ডুবে যান। গুরুর যোগশক্তিতে তিনি একবার স্থূলচক্ষে বুলবুলের দেখা পেয়েছিলেন বলেও শোনা যায়। শাস্ত্রসার গীতার অমূল্য উপদেশ বিস্মৃত হয়ে মৃত পুত্রকে দেখতে চাওয়া এবং নিজের খেয়ালখুশিমতো যোগ ও তন্ত্রসাধনা করা নজরুলের পক্ষে বিষময় হয়েছে বলেই মনে হয়। কলকাতার মহানির্বাণ মঠ থেকে যোগাদি সেরে রাত্রিবেলায় রক্তচক্ষু হয়ে তিনি যখন ফিরতেন, তখন অনেকের কাছেই তা খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, নজরুলের মতো এক মহৎপ্রাণ অধ্যাত্মচেতন মানুষ দৈব-দুর্বিপাকে মস্তিষ্কের সকল শক্তি হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু জীবন্মৃত স্তরে পৌঁছানোর আগে তন্ত্রমার্গের অনুষঙ্গে তিনি শ্যামা ও কালী বিষয়ক, আগমনী ও হরি বিষয়ক যে অসাধারণ সঙ্গীতরাজি উপহার দিয়ে গেলেন, তা জাতির সম্পদ হয়ে রইল।

একটি ভাবসুন্দর গানে নজরুল লিখেছেন ঃ "আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে/ জপি আমি শ্যাম নাম/ মা হবেন মোর মন্ত্রগুরু/ ঠাকুর হবেন ঘনশ্যাম।/ ডুব দিয়ে শ্যাম-যমুনাতে/ আমি খেলব হোলি শ্যামের সাথে।/ শ্যাম যদি হন বিমুখ, তবে/ মা পুরাবে মনস্কাম।"

এখানে শ্যাম ও শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব ও কালীতত্ত্ব একাকার হয়েছে। তন্ত্রের প্রভাবে নজরুলের কৃষ্ণ যোগমার্গের পথিক। পরবর্তী গানটিতে তা দেখা যায়—"আমি কি সুখে লো গৃহে রব/ শ্যাম হলো যদি যোগী, ওলো সখী/ আমিও যোগিনী হব।/ শ্যাম যে-পথ দিয়ে চলে যাবে/ সেই পথের ধূলি হব/ সে চলে যেতে দলে যাবে/ সেই সুখে লো ধূলি হব।"

রাগানুগা ভক্তি শাক্তকবির হাতে যোগের পথে পূর্ণতা পেয়েছে। 'বলরে জবা বল/ কোন্ সাধনায় পেলিরে তুই/ শ্যামা মায়ের চরণ তল', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলে দেখে যা আলোর নাচন', 'থির হয়ে তুই বস দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে', 'তোর কালরূপ দেখতে মাগো, কাল হলো মোর আঁখি', 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী', '(আর) লুকাবি কোথায় মা কালী/ বিশ্বভুবন আঁধার করে তোর রূপে মা সব ডুবালি', '(মা) খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে, নয়ন দিয়ে বহে ধারা/ (মা) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা, তোরই সাজে তারা', 'কোথায় গেলি মাগো আমার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে/ ক্লান্ত আমি খেলে খেলে এ সংসারের ধূলি মেখে' প্রভৃতি মাতৃসঙ্গীতে রাগানুগা ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। 'প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী', 'নমো নমো নমঃ হিমগিরিসুতা দেবতা-মানসকন্যা', 'বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো' প্রভৃতি গানের পাশাপাশি 'জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী', 'জয় শঙ্কর-শিষ্যা', 'নাচে গৌরী দিব্য হিমগিরি', 'নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ, নমো নটনাথ।/ এ নাট দেউলে/ কর হে কর তব শুভ চরণপাত' প্রভৃতি হরগৌরীর প্রশস্তিবাচক ও দিব্যভাবময়।

রাধাকৃষ্ণ ভাবতত্ত্বের সাযুজ্যে নজরুল বহু গান লিখেছেন। কয়েকটি গান উল্লেখ করা যাক ঃ 'এস হৃদি রাস-মন্দিরে এস, হে রাসবিহারী কালা', 'এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া', 'ঐ শ্যাম মুরলী বাজায়', 'ওরে মথুরাবাসিনী মোরে বল', 'কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম', 'কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়', 'গহন বনে শ্রীহরি নামের মোহন বাঁশি', 'গুঞ্জা মালা গলে কুঞ্জে এস হে কালা' প্রভৃতি। 'ঘনশ্যাম কিশোর নয়ন আনন্দ', 'গিরিধারীলাল কৃষ্ণ গোপাল', 'নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দদুলাল', 'নাচে শ্যামসুন্দর গোপাল নটবর' বাৎসল্যরসে জারিত। হিন্দিতে লেখা 'ঘন শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যায় এ ভবসংসার মে', 'তুম হি মোহনচাঁদ কি জ্যোতি', 'বাতা দে রে যমুনাকে জল কাঁহা মেরে শ্যামল', 'পাপী তাপী সব তারলে চলি হয়/ কৃষ্ণ প্রেমকি নাইয়া', 'জপে ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণকে নাম', 'নারায়ণ নারায়ণ যে নাম জপেন' ও আরো বহু গান শ্রীহরির চরণে নির্মাল্যরূপে রচিত হয়েছে।

বৃন্দাবনের মুরলীধরকে কবি রাধার হৃদয় নিয়ে খুঁজেছেন। মহাপ্রভুর উত্তরাধিকার এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তিনি লিখেছেন ঃ "এস মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী/ গোপাল গিরিধারী শ্যাম।/ তেমনি যমুনা বিগলিত করুণ/ কুলুকুলু স্বরে ডাকে অবিরাম।" এবং "মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি/ তুমি ব্রজের বালারে রাই-কিশোরী/ ভুলাইলে যেই রূপ ধরি।"

নারায়ণকে আহ্বান করে আকুল কণ্ঠে তিনি বলেছেন ঃ "তোমার মহাবিশ্বে কিছু/ হারায় না কভু/ আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায়/ তাইতো কাঁদি প্রভু।/ তোমার মতোই তোমার ভুবন/ চিরপূর্ণ হে নারায়ণ,/ দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন/ তাই এ দুঃখ প্রভু।"

■ ৭ ■

পৃথিবীর যেকোন সাধক-কবির হৃদয় মরমিয়া ভাবের আধার। সহজিয়া পথে বাউল ও ফকিরের অন্তর নিয়ে তাঁরা

খুঁজে ফেরেন মনের মানুষ, এই মানুষের মধ্যে সন্ধান করেন সেই মানুষের। নজরুল লিখে গেছেন : "আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল,/ আমার দেউল/ আমার এ আপন দেহ।/ আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর/ অন্তরে মন্দিরগেহ।"

খ্যাপা বাউল প্রাণের সবটুকু দিয়ে প্রার্থনা করেছেন : "রাখ এ মিনতি ত্রিভুবনপতি/ তব পদে মতি (রাম)/ আঁখির আগে যেন সদা জাগে/ তব ধ্রুব জ্যোতি।" মানুষের চোখে শ্রীভগবানের করুণা-অঞ্জন যখন লাগে, আত্ম-পর ভেদ দূর হয়ে যায়, জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংস্কার পিছু হটে, সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের প্রেরণা অন্তরে সঞ্চারিত হয়। আমরা দেখেছি ছোট বয়স থেকেই নজরুলের মধ্যে সমন্বয়ী চেতনা জাগরুক ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সে-চেতনা একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে জেগে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যটির কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখব।

সুফি মতের সমন্বয়ী ভাবধারায়, বাউল ও ফকিরী তত্ত্বে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবিন্যাসে নজরুল বাংলার মাটির উত্তরাধিকার খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর বাউল হৃদয়ের একতারায় মানুষের বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছিল ধর্মসাধনার অভিঘাতে—"বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিমে আসমানে/ লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গোরস্থানে।/ হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত কঙ্কাল/ কসাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল?/ রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়,/ বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝিগো আজান থামিয়া যায়।/ থালা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে চলিয়াছে হের ঈদ্‌গাহে/ তীর-খাওয়া বুক, ঋণে বাঁধা শির লোটাতে খোদা বরাহে,/ একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার/ উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড়?"

ধর্মভীরু বুভুক্ষু মানুষ মুসলমান জনসমাজে যেমন, হিন্দু এবং অন্যান্য জনসমাজেও তেমনি নিষ্পেষিত, ক্লিষ্ট। একদল সুযোগসন্ধানী মানুষ সহজ-সরল এই মানুষদের ধর্মবিশ্বাসকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধতার পথে চালিত করে। ফলে শুরু হয়ে যায় হানাহানি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হলে নজরুল ব্যথিত হৃদয়ে সমন্বয়ের গান ও কবিতা লেখেন, প্রবন্ধ-অভিভাষণে ঐক্যের মহামন্ত্র প্রচার করতে থাকেন। তিনি লেখেন : "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া/ ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।/ বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে-জাত/ কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?" আরো বলেন : "ভগবানের ফৌজদারি কোর্ট নাই সেখানে জাতবিচার,/ (তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাকার।/ জাত সে শিকেয় তোলা রবে/ কর্ম নিয়ে বিচার হবে/ (তা' পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে নরক কিংবা স্বর্গে যাওয়া।"

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করে যে অভিভাষণ ('মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা') তিনি দিয়েছিলেন, তার সমাপ্তিতে বলেন : "সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামির অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে।" 'রুদ্রমঙ্গল' (প্রকাশ : ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থভুক্ত 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের ব্যর্থ হানাহানির দৃশ্যশেষে লিখেছেন : "দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিল।... সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।"[২৩]

'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন : "আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনদিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই এক। তাঁর এক হাতের অস্ত্র, তাঁরই আরেক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে তাঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওরফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই, একেবারে 'ক্লিন'।...

"অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি—আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি খ্রিস্টানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন—আমরা মানুষের জন্য এসেছি, আলোর মতো, সকলের জন্য।"[২৪]

প্রিয় বন্ধু প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খানকে লেখা একটি চিঠিতে নজরুল বলেছিলেন : "আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি এসেছিলাম হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে শেক্ হ্যাণ্ড করিয়ে দেবার জন্য।" ধর্মসমন্বয়ের যে মহান ব্রত অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রচার করেছিলেন, তার অনুসারী চেতনায় নজরুল তাঁর লেখায় আজীবন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মিলনের গান গেয়ে গেছেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাই সঠিকভাবে বলেছেন : "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগের সমন্বয়বাদকে যেমন সহজ সরলরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—নজরুলের ব্যাকুলতাও এই সমন্বয়বাদেরই আরেক কালোপযোগী বিকাশ। তাঁর এই সাধনফলও নানা পথের যৌগিক আস্বাদন থেকেই হয়েছে।"[২৫]

নজরুল-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রভাব কতটা প্রত্যক্ষ, সেবিষয়ে তেমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তবে তাঁর লেখায় এই দুই মনীষীর অপরিহর প্রভাব ছাড়াও উজ্জ্বল দুটি কাব্যগীতিতে আমরা নজরুলের মনোভাব অনুসরণ করতে

পারি। 'অবতারপুরুষ পরম' নামে সতেরো পঙ্‌ক্তির কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন: "জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নম/ সর্বধর্মসমন্বয়কারী নররূপে/ অবতার পরমপুরুষ।"[২৬]

আরো বলেছেন: "ভূভারতের কলহের কুরু-ক্ষেত্রে/ দাঁড়াইলে তুমি আসি সকরুণ নেত্রে/ বাজালে অভয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ,/ বিনাশিলে অধর্ম, হিংসা, আতঙ্ক—/ প্রেম-নদীয়ায় তুমি নব-গৌরাঙ্গ/ সকল জাতির সখা প্রিয়তম।"[২৭]

এই কবিতায় 'কথামৃত' সম্বন্ধে নজরুল যা বলেছেন তা অসাধারণ: "তোমার কথামৃত কলির নব বেদ/ একাধারে রামায়ণ ও গীতা।" এই পঙ্‌ক্তি প্রমাণ করে তিনি 'কথামৃত'-এর নিবিড় পাঠক ও ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। অন্য একটি গানে নজরুল পরমপুরুষকে প্রণাম জানিয়েছেন এভাবে: "মন্দিরে মসজিদে গির্জায় পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,/ তব নাম-মাখা প্রেম নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার।"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর বীক্ষাটিও চমৎকার: "জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী-বীর চীর-গৈরিক-ধারী।/ জয় তরুণ-যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী॥/ যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম তুমি তেজস্বী তাপস পরম।/ ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥/ মদ-গর্বিত বল দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী।/ শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ-গ্লানি।/ নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, মুছে দিয়ে জাতি-ধর্মের ভেদ;/ জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি।"

■ ৮ ■

জীবনের চতুর্থ তথা শেষ পর্বে (১০ জুলাই ১৯৪২—২৯ আগস্ট ১৯৭৬) নজরুল-মানসে আধ্যাত্মিকতার ভাস্বরজ্যোতি জাগরুক ছিল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের একদল ছাত্রী তাঁকে দেখতে এলে তাদের একজনের খাতায় নজরুল যে-কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন, তা তাঁর আধ্যাত্মিক মানসের পরিচয় বহন করে। সুফি জুলফিকার হায়দরের লেখা 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (ঢাকা, ১৯৬৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতাটি এইরকম: "তোমরা সকলে পুষ্পাঞ্জলির মতো দেখতে সুন্দর/ তোমরা সকলে আরো সুন্দর হও, হও আনন্দিতা ও মনোহর।/ তোমরা আমাদের মাঝে মাঝে দেখতে এস,/ তোমরা আমাদের পরম আত্মীয়ের (মতো) ভালবেসো।/ আল্লাহ তোমাদের চিরঞ্জীব করে রাখুক।/ আল্লাহ তোমাদের ফিরদৌস আলায়নসীব করে থাকুক।"[২৮]

'লা-ইলা'র প্রেমে বিভোর কবি, শতদলের কবি নজরুল দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাক্‌শক্তিরহিত, সৃজনহীন জীবনে হয়তো বা হতভাগ্য সম্রাট শাজাহানের মতোই তাঁর প্রাণপ্রিয় ঈশ্বরের প্রেমের তাজমহলের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থেকে অন্তরের ঐশ্বর্য খুঁজে পেয়েছেন। সে-ঐশ্বর্যের কথা পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানবে না। কেবল আমাদের কানে মন্ত্রের মতো ঘুরে ফিরবে তাঁর মহান অনুভব-বাণী: "সে-ই আল্লার শক্তি লভিয়া নিত্য শক্তিমান/ তারি মুখ দিয়া উদ্গত হয় আল্লার ফরমান।/ অন্তরে তার বহে দুরন্ত সদা বিপ্লব-ঝড়;/ বাহিরে সে থাকে শান্ত, করিয়া আল্লাতে নির্ভর।/ তিনিই ইমাম তিনিই অগ্রনায়ক সারথি তিনি/ জাগাইয়া ভূমিকম্প পাষাণে চেতনা জাগান তিনি।/ সর্বযুদ্ধে জয়ী হন ইনি আল্লার শক্তিতে/ এর সৈন্যরা সমবেত হয় প্রেম আর ভক্তিতে।"[২৯]

প্রেম ও ভক্তির, জীবের মধ্যে শিবের সন্ধানকারী, সমন্বয়বাদী কবি নজরুলের মৃত্যু নেই। মানুষের হৃদয়-শতদলে তিনি যে চির-অম্লান হয়ে বিরাজ করবেন, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, তিনি অবিনাশী। সত্যধর্মের অগ্রপথিক নজরুলকে তাঁরই লেখা 'অর্ঘ্য' কবিতাটি উদ্ধৃত করে আমরা প্রণাম জানাতে পারি: "হায় চির-ভোলা! হিমালয় হ'তে/ অমৃত আনিতে গিয়া/ ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের/ মৃত্যু-গরল পিয়া!/ কেন এত ভাল বেসেছিলে তুমি/ এই ধরণীর ধূলি?/ দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে/ স্বর্গে লইল তুলি।" [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূচি

২০ মৃত্যুক্ষুধা—নজরুল ইসলাম, কাজি নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র-৩, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, ২০০২, পৃঃ ৩৬৫
২১ দেয়ালী-উৎসব, ঐ, ২০০২, পৃঃ ৪৮৪-৪৮৫
২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী (সংক্ষিপ্ত), উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৯, পৃঃ ৬৬
২৩ মন্দির ও মসজিদ—নজরুল ইসলাম, কাজি নজরুল ইসলাম রচনা-সমগ্র-২, ২০০১, পৃঃ ৪৪১
২৪ হিন্দু-মুসলমান, ঐ, পৃঃ ৪৪৬
২৫ কাজি নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, ১৯৫৫, পৃঃ ২৭৯
২৬ 'উদ্বোধন': শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১৯৯৯, পৃঃ ৭৫৩
২৭ ঐ
২৮ নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়—সুফি জুলফিকার হায়দর, সুফি জুলফিকার হায়দর ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৭২
২৯ নজরুল রচনাবলী (৩য় খণ্ড)—নজরুল ইসলাম, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, পৃঃ ৫১১-৫১২

ঐ বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।
—সম্পাদক

প্রসঙ্গ 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী'

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'একটি নদীর মৃতুকাহিনী' প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১২ সংখ্যায় উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ত্রিবেণীর সরস্বতী নদী সম্পর্কে কিছু লিখতে নিবন্ধকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় হয়তো তা লিখে জানাবেন, তবে এসম্পর্কে আমার যেটুকু জানা আছে বইপত্র পড়ে, সেটুকু নিবেদন করছি। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সরস্বতী মর্ত্যের নদী। তাতে সরস (জল) আছে, তাই এর নাম 'সরস্বতী'। বেদে এই নদীর নাম বহুবার পাওয়া যায়। আর্যরা সরস্বতীর তীরে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তখন এই নদী স্রোতস্বতী ছিল। অম্বালা জেলার মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন সরস্বতী বর্তমান 'ঘাগ্গর'। সমুদায় সরস্বতী বিনষ্ট হতে সহস্রাধিক বছর লেগে থাকবে। রাজপুতানার বালুকার অভ্যন্তরে তা অদৃশ্য হয়েছে। পৌরাণিক ধারণায় সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়ে এসে প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এভাবে তিনটি ধারা মিলিত হয়েছে বলে প্রয়াগ ত্রিবেণী বা যুক্তবেণী।

আমাদের বিশ্বাস, এলাহাবাদের প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী একধারায় মিলিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলাতে ত্রিবেণীতে এসে বিযুক্ত হয়েছে। এখান থেকে ভাগীরথী দক্ষিণে, সরস্বতী পশ্চিমে এবং যমুনা বা কাঁচড়াপাড়া খাল পূর্বদিকে গিয়েছে বলে ত্রিবেণীর নাম 'মুক্তবেণী'। ত্রিবেণীর আরো কয়েকটি নাম পাওয়া যায়—'তারবেণি', 'ত্রিভেণি', 'ত্রিপানি' ইত্যাদি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাযাত্রা' কবিতায় ত্রিবেণীকে বলেছেন 'তিরপূর্ণী'—"পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণীর ঘাটে।" মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী থেকে উৎপন্ন একটি ধারা ভাগীরথী। তিব্বত থেকে আগত জাহ্নবী বা জাড়গঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। এই মিলিত ধারার সঙ্গে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা এসে সংযুক্ত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের পরবর্তী অংশের নাম 'গঙ্গা'। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথের মেয়ে বলে গঙ্গার অপর নাম 'ভাগীরথী'। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত বলে নাম 'ত্রিপথগা'। গঙ্গার মাহাত্ম্য হিসাবে কাহিনীর সীমা নেই। ভগীরথ স্বর্গ থেকে পবিত্রসলিলা গঙ্গাকে এনেছিলেন বলে গঙ্গা হিন্দুমাত্রেরই ভক্তির আধার এবং এই কারণেই গঙ্গার শেষভাগ 'ভাগীরথী' নামে অভিহিত।

বহু শতাব্দী পূর্বে হুগলি নদীর অস্তিত্ব ছিল না। গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মানদী দিয়ে প্রবাহিত হতো না। ভাগীরথীই এর প্রধান পথ ছিল। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাচীন সরস্বতী নদী মজতে আরম্ভ করে এবং মজতে মজতে বর্তমানে শুষ্কপ্রায় হয়ে ক্রমবিলীয়মান খালে পরিণত হয়েছে। শীর্ণকায় ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) দেবানন্দপুর অঞ্চলে দেখা যায় এখনো।

কলিন্দ দেশে উৎপন্ন বলে যমুনা নদীকে 'কালিন্দী'ও বলে। প্রয়াগে যমুনা গঙ্গাতে এসে মিশেছে, আর সেই মিলনস্থানেই সরস্বতীও পরে এসে মিশেছে অন্তঃসলিলা হয়ে। এতক্ষণ যা নিবেদন করা হলো তাতে আশা করি, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ত্রিবেণীর সরস্বতী নদীর পরিচয় পেয়ে যাবেন। প্রথম পত্রলেখক শ্রীভট্টাচার্যও জানতে পারবেন কেন প্রথমে গঙ্গা, পরে যমুনা এবং তারপর সরস্বতী—এভাবে নদী-তিনটির নামের বিন্যাস হয়েছে।

অজিতেন্দ্র সিংহ
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী' নিবন্ধটি পাঠ করে সাতিশয় মুগ্ধ হলাম, আবার একইসঙ্গে একটি সংশয়ে পতিত হলাম।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর নিবন্ধের একস্থানে লিখেছেন ঃ "এমন একটি তথ্য হলো—শল্যপর্বে উল্লিখিত সরস্বতীর সাতটি নাম এবং সেই নদীগুলির স্থান নির্ণয়।... রাজা কুরু নাম দিয়েছিলেন 'ওঘোবতী', জায়গার নাম কুরুক্ষেত্র।"

আমার কাছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও ডঃ নীরদবরণ হাজরার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত একখানি 'কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত' আছে। উল্লিখিত নিবন্ধখানির তথ্য মহাভারত থেকে বিস্তৃতভাবে জানব—এই আশায় 'শল্যপর্ব' খুঁটিয়ে পাঠ করলাম। কিন্তু হতাশ হলাম। এখানে এরকম কোন আলোচনা নেই।

আমার জিজ্ঞাসা—ঐ আলোচনা কি ব্যাসকৃত সংস্কৃত মহাভারতে আছে? কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত কি মূল সংস্কৃত মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুকৃতি নয়? নাকি অন্য কোন পর্বে সরস্বতীর সপ্তনাম দেওয়া আছে?

সম্প্রতি অমিত চক্রবর্তী নামে এক তরুণ কবি একখানি কাব্য সৃষ্টি করে পুরস্কৃত ও যশস্বী হয়েছেন। কাব্যখানি সংলাপধর্মী। নাম—'ওখবতী ভাঙ্গনে নির্মাণে'।

এই 'ওখবতী' বিষয়ে সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত পৌরাণিক অভিধানে উল্লিখিত আছে ঃ "ওখবতী—ইনি নৃগরাজের পিতামহ ওখবানের কন্যা। এর সঙ্গে সুদর্শনা-অগ্নির পুত্র সুদর্শনের বিবাহ হয়। ইনি ধর্ম কর্তৃক পতিভক্তি ও তপস্যার জন্য আশীর্বাদ লাভ করেন। সেই আশীর্বাদে ধর্ম বলেন—এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্ধশরীর দ্বারা ওখবতী নদীরূপে লোকপাবন এবং অর্ধশরীর দ্বারা সুদর্শনের অনুগমন করবেন।"

ইনিও লিখেছেন, মহাভারতে 'ওখবতী'র পুণ্য জীবনকাহিনী আছে। সংলাপ কাব্যের সমালোচক লিখেছেন—মহাভারতের

অনুশাসন পর্বের মধ্যে ওখবতী কাহিনী বিধৃত আছে। এই মহাভারতের মধ্যে অষ্টাদশ পর্ব রয়েছে, কিন্তু 'অনুশাসন পর্ব' নামে কোন পর্ব নেই। তবে কি বাঙলায় অনূদিত আরো ভিন্ন মহাভারত বর্তমান? অনুশাসন পর্বের এই ওখবতীই কি শ্রীমুখোপাধ্যায় বর্ণিত 'ওধোবতী'? সরস্বতী কল্যাণবতী লোকপাবন—ওখবতীই সেই নদীরূপে ধর্মের আশীর্বাদে প্রবাহিতা, আবার সরস্বতীর কুরু-প্রদত্ত নাম 'ওধোবতী'—এই তিন সত্যের সম্মিলিত বিশ্লেষণ কি 'ওধোবতী' ও 'ওখবতী'কে অভিন্ন সত্তায় প্রকাশ করছে না? এবিষয়ে আলোকপাত করলে বিশেষ উপকৃত হব।

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
শ্রীপাটমুলুক, বীরভূম-৭৩১২০৪

লেখকের উত্তর

সিদ্ধেশ্বরবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যেকয়টি প্রশ্ন তাঁর মনে এসেছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাশীরাম দাস বিরচিত বাঙলা মহাভারত কবিতায় লেখা, মূল সংস্কৃত মহাভারত থেকে অনেকাংশে দূরে। যেমন রামায়ণ এবং রামচরিতমানস। একটি আদি এবং অন্যটি তার অংশমাত্র।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'সরস্বতী' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮) আছেঃ "পুষ্কর, গয়া প্রভৃতি তীর্থে যে যে সরস্বতী আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। দ্বিতীয়ত, যজ্ঞকালে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মর্ষিগণ মন্ত্রবলে যেখানে যেসময় সরস্বতীর আবাহন করিয়াছিলেন, সত্যসঙ্কল্পতার জন্য সেই সমস্ত স্থানে সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাই শাস্ত্রোক্তি। মহাভারতে (শল্যপর্ব, ৩য় অধ্যায়) ইহাদের এইরূপ নাম দেখিতে পাওয়া যায়—

'সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চোঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা॥৪
পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী॥১৩
আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী... ॥১৯
আহূতা পরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাস্তাং গয়েম্বাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২১
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাত্মনঃ।
উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী॥২৩
আজগাম সরিৎশ্রেষ্ঠা তং দেশং ঋষিকারণাৎ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা... ॥২৫'

"মহাভারতের এই বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুপ্রভা প্রভৃতি সাতটি স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত সরস্বতী নদী ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে যজ্ঞের সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছিল। এই সাতটি নদী-সংহতির সাধারণ নাম 'সপ্ত-সরস্বতী' বা সপ্তসারস্বত। কিন্তু মহাভারতের মূলে আখ্যাত নদীর নামগুলি গুণিয়া দেখা যায় ইহারা মূল সরস্বতী সমেত নয়টি নদী, কারণ সুরেণু নামে একটি সরস্বতী ঋষভদ্বীপে, আরেকটি গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে)।

"সুতরাং ইহারা পৃথক পৃথক সুরেণু। ব্যাসদেব বলেন, হিমালয়ে যখন ব্রহ্মা আবাহন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তসরস্বতী পুনরায় একত্র হইয়াছিল। এই সপ্তসরস্বতীর মহিমা ব্যাস গাহিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে এইটুকু স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের প্রধান সরস্বতীর অন্য কোন নাম না হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী নামই ছিল। কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত মহর্ষি বশিষ্ঠ আবাহন করিয়াছিলেন বলিয়া এই পর্যন্ত সরস্বতীর শাখার নাম 'ওঘবতী' হয়। নাম-গণনায়ও ব্যাসদেব মুখ্য সরস্বতী নামটিকে সকল নামগুলির মধ্যস্থানে রাখিয়াছিলেন।"

ওঘবানের কন্যা ওঘোবতীর কথা শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী কাব্যে উপস্থিত করেছেন। কাব্য এবং মূল কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথও মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন এবং কবিসুলভ যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাঙলায় মহাভারত অনুবাদকালে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। মারাঠি, তেলেগু, তামিল, অসমিয়া, ওড়িয়া, এমনকি হিন্দিতেও অনেক মহাভারত লেখা হয়েছে। প্রতিটি অনুবাদই মূল থেকে বিচ্ছিন্ন, একেকটি পড়লে হতবাক হতে হয়। সুতরাং বাঙলা মহাভারতে 'অনুশাসন পর্ব' নেই—এ এমন নতুন কথা কি!

তাঁর আরেকটি প্রশ্ন হলো, ওঘোবতী ও ওধোবতী(ধ) কি ভিন্ন? উত্তরে জানাই, শব্দটি ওঘোবতী(ঘ)। যদি কোন পার্থক্য দেখে থাকেন তা মুদ্রণপ্রমাদ।

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়
সাউথ পার্ক, নয়াদিল্লি-১১০০১৯

'আমি' ঘোচায় 'কথামৃত'

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন এবং চৈত্র ১৪১১ সংখ্যায় শ্রীরথীন দে-র 'কথামৃত'-র কথা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

বিখ্যাত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র, সাহিত্যিক, গায়ক ও মনীষী দিলীপকুমার রায় অতি শৈশব থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ছিলেন। তিনি শৈশবে এবং কৈশোরে মাঝে মাঝেই শ্রীম-র কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য যেতেন। শ্রীম-ও দিলীপ রায়ের এই আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয় আধ্যাত্মিক তথ্য জানাতে খুবই আনন্দবোধ করতেন। দিলীপকুমার রায় পরবর্তী জীবনে শ্রীম-র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা স্বীকার করেছেন এবং শ্রীম-র কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা তথ্য জেনে যে তাঁর অন্তর সমৃদ্ধ হয়েছে, সেকথাও বারবার বলেছেন।

শ্রীরথীন দে-র নিবন্ধটি পড়ে আমাদের অন্তরও সমৃদ্ধ হলো এবং অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তিনি যে অনেক

পরিশ্রম করে এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি 'উদ্বোধন'-এর পাঠককুলের কাছে উপহার দিয়েছেন, সেজন্য তাঁকে এবং 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক মহারাজকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই নিবন্ধ পড়ে জানতে পারি, শ্রীম তাঁর জীবনে আমিত্বের লেশটুকুও রাখেননি। তাঁর জীবনটাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবময় হয়ে গিয়েছিল। পরমভক্ত প্রহ্লাদের সমগ্র জীবনটাই যেমন শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে নিবেদিত হয়েছিল, তাঁর সমগ্র অন্তর সর্বদাই যেমন ঈশ্বরভাবনায় নিমগ্ন থাকত—ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীম-ও তেমনি অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণই যে শ্রীম-র সমগ্র জীবন পরিচালিত করেছিলেন, সেবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রী, আর শ্রীম যন্ত্র। এমন যন্ত্রী পেলে কে না যন্ত্র হতে চায়? কে না অপার সুখের মহাসাগরে ভাসতে চায়? আবার শ্রীম যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিরহঙ্কারিতাই এর প্রমাণ। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণসমূহের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে শ্রীম-র কার্যাবলির হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

গীতায় (১২।১৩, ১৪) শ্রীভগবান বলেছেন: "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।/ নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥/ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।/ ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"—যিনি কাউকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান, যিনি মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযত-স্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাঁহার মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, ঈদৃশ মদ্ভক্ত আমার প্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রণাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত, অহমিকাশূন্য, আত্মপ্রচারবিমুখ, শ্রীরামকৃষ্ণের অতিপ্রিয় শ্রীম-র চরণেও প্রণাম। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যকার হতে পেরেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আশিসকুমার গুপ্ত
হালতু, কলকাতা-৭০০ ০৭৮

সাবধানের মার নেই

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীঅসীম চৌধুরী বর্ণিত ঘটনাটি পড়ে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। 'উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত পাঠিকা হিসাবে ঘটনার হুবহু বিবরণটি অন্যান্যদের জানাতে চাই—হয়তো ভবিষ্যতের সতর্কীকরণ হিসাবে ঘটনাটি চিহ্নিত হবে। বছর দুয়েক আগে বেলা ১১টা নাগাদ কলিংবেলের শব্দে বেরিয়ে দেখি, গৈরিক বসনধারী এক সন্ন্যাসী কিছু অর্থসাহায্যের জন্য দ্বারে উপস্থিত। বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বললেন, বারাসত রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথ আশ্রম থেকে এসেছেন এবং সেইসঙ্গে এও বললেন, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাইমারি বিভাগের তিনি অধিকর্তা। বারাসত অনাথ আশ্রমের উন্নতিকল্পে তাঁর এই অর্থসাহায্য সংগ্রহকরণ। তাঁর সব কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওঁকে আমি ঘরে এনে বসালাম। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, এই নাম তাঁর পূর্বাশ্রমের মায়ের নাম। তাই তিনি আমাকে 'মা' বলেই ডাকবেন। আমার 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থটি থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থটি আমাকে উপহার দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। নিজের নাম বললেন—দিলীপ মহারাজ। তাঁর হাতে একটি 'উদ্বোধন'ও ছিল। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর তিনি আমার কাছে ১৪০ টাকা চাইলেন। অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে আমি ঐ অর্থপ্রদানের রসিদের কথা উল্লেখ করতেই তিনি বললেন, ৪/৫ দিনের মধ্যে এসে নিজের হাতে ঐ রসিদ ও গ্রন্থটি তিনি আমাকে দিয়ে যাবেন। আজ অবধি তাঁর আর কোন পাত্তা পাইনি।

রমা দেবরায়
নোনা চন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০ ১২২

প্রসঙ্গ: স্বামী কেশবানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১১ সংখ্যায় নির্মলকুমার রায় 'কোয়ালপাড়া' আশ্রম রচনাটিতে লিখেছেন, কেদারচন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী কেশবানন্দ) অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, স্বামী কেশবানন্দ পূর্বাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন। তাঁর পত্নী পরবর্তী কালে 'জগদম্বা-মা' নামে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সামনে একটি কুটিরে অবস্থান করতেন। মঠের সন্ন্যাসীরা অনেকেই তাঁকে দর্শন করেছেন।

স্বামী ব্যাপ্তানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস, লাক্সা
বারাণসী-২২১০১০

স্বামী শিবানন্দের পত্র

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যায় হেমচন্দ্র দত্তকে লেখা স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিখানির পাদটীকায় একটা সংশোধন আছে। সম্ভবত পোস্টকার্ডের পিছনে লেখা ঠিকানা দেখেই এই মন্তব্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কর্মজীবনে হেমচন্দ্র ছিলেন Asst. Headmaster, Abdullapur High English School, Mirkadim, P.O. Dacca.

আমি হেমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, কল্যাণীনিবাসী। আমার কাছে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ঐ চিঠিখানি আমিই 'উদ্বোধন'-এ পৌঁছে দিয়েছিলাম।

মিহিরকান্তি দত্ত
কল্যাণী, নদীয়া

ভোগবাদের নাভিশ্বাস

সুবলচন্দ্র মণ্ডল*

যেকোন জীব তার বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; ঐ বাস্তুতন্ত্রের জড় ও জৈব উপাদানের ওপরই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়। তার বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদের ভিত্তি এখানে। কী পরিমাণ বস্তু জীবের সুস্থভাবে অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজন তা প্রকৃতির বিধানেই নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, জীবনধারণের জন্য যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন, কেবল সেইটুকুই ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়; তার থেকে বেশি খাদ্য গ্রহণ অসুস্থতাই আনে।

যে-ভোগ প্রকৃতি-নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যায় তা কৃত্রিম এবং এটাই ভোগবাদের বাস্তব রূপ। একের ভোগবাদী জীবনচর্যা অপর অনেকের বঞ্চনার ফলেই সম্ভব; তাই তা অনৈতিক এবং তা সমাজে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই প্রবণতা মানবসভ্যতার প্রথমেই দেখা গিয়েছিল। তাই প্রাচীন সাংস্কৃতিক চিন্তায় এবং ধর্মীয় অনুশাসনে এর নিষেধ দেখা যায়। ঈশ উপনিষদে (১।১) এই নিষেধ প্রথম দেখা যায়—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। এর তাৎপর্য হলো—প্রয়োজনীয় মাত্রায় ভোগ এবং তদতিরিক্ত ত্যাগ।

বৌদ্ধধর্মানুসারে মানবজীবনের লক্ষ্য নির্বাণলাভ; এর জন্য 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসারে জীবনযাপন কর্তব্য। এর সারকথা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন। অর্থাৎ কৃচ্ছ্রতা এবং মাত্রাতিরিক্ত ভোগ উভয়ই বর্জন। এখানে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' বাণীর মর্মই ভাষান্তরে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যের সঙ্গে এমন আচরণ করবে না যেমন আচরণ অন্যে তোমার সঙ্গে করুক—এটা চাও না। এই দার্শনিক সূত্র জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সূত্র মেনে চললে সমাজে কোন বৈষম্যই থাকতে পারে না।

বাইবেল-এ আছে ঃ "একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের রাজত্বে প্রবেশের থেকে একটি উটের পক্ষে সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া সহজতর।" (সেন্ট ম্যাথু, ১৯।২৪) এখানেও ধনসঞ্চয়ে, সুতরাং অতিমাত্রিক ভোগে কঠোর নিষেধের ইঙ্গিত রয়েছে।

কোরানে বলা হয়েছে ঃ "১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, ২. যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও; ৩. এ সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এ জানতে পারবে;... ৬. তোমরা তো জাহান্নম দেখবেই।" [১০২(১), কোরআন শরীফ, হরফ প্রকাশনী]।

** স্পষ্টবক্তা লেখক চাকদহ-নিবাসী, 'জাতীয় শিক্ষক' এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। প্রাক্তন বিধায়কও বটে।*

ইওরোপীয় নবজাগরণের আগে এবং কিছু পরেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ঐসব অনুশাসন মেনে চলত; ব্যতিক্রমী মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আদর্শ থেকে বিচ্যুত সামন্ত এবং ধর্মগুরুদের মধ্যেই এটা দেখা যেত।

নবজাগরণের প্রথম পর্বে নিয়ন্ত্রক শক্তি ছিল দুটি ঃ (১) খ্রিস্টানধর্মের নৈতিক প্রভাব; (২) প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব। এই প্রথম পর্ব প্রধানত ইতালিতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তুরকিদের আক্রমণে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এবং তা পশ্চিম ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে।

নবজাগরণের প্রথম পর্বে জোর দেওয়া হতো ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ওপর। এবিষয়ে বিশেষ অবদান জুগিয়েছিলেন পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং বোকাসিও (১৩১৩—১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। এঁরা মানুষের ব্যাবহারিক ও নৈতিক মানোন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বে নৈতিকতা এবং তার উৎস ঈশ্বরনির্ভরতার প্রভাব বর্জন করে ব্যাপকভাবে ইহসর্বস্বতা প্রচারিত হতে লাগল। এই মাটির পৃথিবীকেই মানুষ তার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করল। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অভিযাত্রীরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ল সারা পৃথিবীর পরিচয় জানতে। ফলে নতুন নতুন দেশ তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে অভিযাত্রীদের সামনে উদ্ভাসিত হতে লাগল। এবিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

"Since the days of Henry VII (1485–1509) a spirit of adventure had sent Englishmen,... out into the great waters. To explore, to find gold, to trade, and, it may be added, to plunder, were the objects." (The New Groundwork of British History—Warner, Marten and Muir, p. 360)

সাহিত্যেও এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়; যেমন, Marlow-রচিত Dr. Faustus (1588-1589) নাটকে Faustus-এর মুখে এই কথাগুলি শোনা যাচ্ছে ঃ

"I'll have them fly to India for gold,/ Ransack the ocean for orient pearl,/ And search all corners of the new-found world/ For pleasant fruits and princely delicates;.../ I'll have them to wall all Germany with brass,.../ I'll have them fill the public schools with silk,/ Wherewith the students shall be bravely clad." (Lines 80-90, I, i)

এই সাক্ষ্য ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস এবং সাহিত্য থেকে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী প্রায় সবদেশই নতুন দেশের সন্ধানে লেগেছিল; এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা

ছিল স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের। ঐসব দেশের মানুষের ইহসর্বস্বতা-প্রভাবিত মনে নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলির সম্পদরাশি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করল। ক্রমে ক্রমে ইউরোপেতর সব মহাদেশেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ গড়ে তুলল এবং সেখানকার সম্পদ লুঠ করে স্বদেশের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লাগল। এই সময়ে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার লুণ্ঠনের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের হিংস্রভাবে হত্যা করে প্রায় নিঃশেষ করা হলো এবং সেখানে শ্বেতাঙ্গ বিজেতাদের স্থায়ী বসবাস শুরু হলো। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রভাব বিস্তার ঘটেছিল, কিন্তু এমন নৃশংস হত্যালীলার মাধ্যমে বসতি বিস্তারের ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ঠিকভাবে বুঝতে হলে সভ্যতা বিস্তারপদ্ধতির যে-পার্থক্য, তার মূলের স্বরূপ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি কতকগুলি মূলত বর্বর জাতির হাতে। ভাণ্ডাল, অস্ট্রোগথ, ভিসিগথ, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন এবং হূন—এরাই হলো ঐসব জাতি। এরাই রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল এবং ইউরোপের সর্বত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এদের আদিম বাসভূমির প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হতো। তার ফলে হিংস্রতা এবং বর্বরতা এদের মজ্জাগত চারিত্রধর্মে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী কালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তা ছিল বাহ্য হালকা আবরণমাত্র; সমগ্র সত্তার মজ্জাগত বর্বরতা বিশেষ হ্রাস পায়নি। তাই, যদিও খ্রিস্টধর্মে এই নির্দেশ আছেঃ "Thou shalt not kill", "Thou shalt not steal." (হত্যা করবে না, চুরি করবে না)—তবুও এই দুই মানবিক নির্দেশের হিংস্র উল্লঙ্ঘন দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিতঃ "সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।" ('সভ্যতার সঙ্কট')

পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত ইহসর্বস্ব এবং উগ্র ভোগবাদী হওয়ায় তা স্বভাবতই প্রকৃতিবিরোধী এবং মানবকল্যাণ-বিরোধী। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব; সুতরাং তার শুভবুদ্ধির উদয় হবেই এবং নিজেকে সামূহিক বিনষ্টি থেকে বাঁচাতে এই সভ্যতা-ছদ্মবেশী বর্বরতার অবসান ঘটাবেই। বস্তুত, আজ এই অসভ্য সভ্যতার নাভিশ্বাসের বহু পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমানের বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ঐ নাভিশ্বাসের একটি পরোক্ষ লক্ষণ। বিশ্বায়ন দুরকমের হতে পারে। এক ধরনের বিশ্বায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সকলেই উপকৃত হয়। যে-বিশ্বায়নে জ্ঞানের, সংস্কৃতির এবং পণ্যের আদানপ্রদানের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়, তা-ই বাঞ্ছিত। কিন্তু বর্তমানের বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির ওপর উন্নত দেশের অর্থনৈতিক শোষণ চালানো এবং তা নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যবিস্তার।

এই প্রাধান্যবিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল। আমরা দেখেছি—কীভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব অবশিষ্ট পৃথিবীতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি শাসিতদের নিজেদের সংস্কৃতিতেও দীক্ষিত করেছিল। প্রভাবাধীন ও বিজিত দেশের বাসিন্দারা বিজয়ীর প্রতাপে বিহ্বল হয়ে বিজয়ীর সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা উন্নততর ভেবে এই দীক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে দিল।

এই দাসসুলভ মনোভাবের প্রথম শিকার হলো সমাজের ওপরতলার লোকেরা। তাদের অনুকরণ ধীরে ধীরে সমাজের সব স্তরেই চুঁইয়ে যেতে লাগল। এইভাবে বিদেশ-নির্ভরতা, বিদেশির অনুকরণে চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনুষঙ্গ হিসাবেই এসে পড়ল। কারো মাথায় এল না যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রণালী স্থানবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থাই ঠিক করে দেয়; তার থেকে বিচ্যুতি প্রকৃতিবিরোধী হওয়ায় নানা সমস্যারই সৃষ্টি করে।

এই অবস্থার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বেড়েই চলল। একইসঙ্গে অধীন দেশের স্থানীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হলো। এইভাবে বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলি উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে চলল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমে ক্রমে সর্বত্র প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভাবধারার শিষ্য হলেও জনসাধারণের এক বিপুল অংশে স্বনির্ভরতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় ছিল। প্রধানত সেই কারণে উন্নয়নের কাজে বিদেশি পুঁজি, প্রযুক্তি ইত্যাদির আমদানি হলেও স্বনির্ভরতার বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতেই হয়েছিল।

এতে উন্নত দেশগুলির বাইরের বাজার ক্ষুদ্রতর হতে লাগল; তাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও এত বেশি নয় যে, দেশে উৎপাদিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ঐসব দেশে শিল্পে সঙ্কট, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিকভাবে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিল। এই অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পরিত্রাণের পথ হিসাবে বিশ্ববাজার পুনর্দখলের ফন্দি করতে লাগল। তারই অন্তিম পরিণতি হলো বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠনের মাধ্যমে অবারিত বিশ্ববাজার অর্থাৎ বিশ্বায়ন বা ভুবনায়ন। কিন্তু এতেও পরিত্রাণ নাই; বিশ্বজুড়ে মন্দা দেখা দিয়েছে। (দ্রঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪।২।২০০৩)

এপর্যন্ত যা দেখা গেল তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, চরম ভোগবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প, অর্থনীতি,

সমাজব্যবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না; কেননা তা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং মানবতার শত্রু। বর্তমান বিশ্বায়ন বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার নাভিশ্বাসের এটাই স্পষ্ট লক্ষণ।

সারা পৃথিবীর পরিবেশ-দূষণ এমনই আরেক লক্ষণ। পরিবেশ-দূষণ ভোগবাদেরই বিষময় পরিণাম। ভোগের জন্য প্রাথমিক উপাদান প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে নানা প্রক্রিয়ায় ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করার সময় বহু ক্ষেত্রেই এমন বস্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যেগুলির পরিমাণ বেশি মাত্রায় হলে প্রকৃতি সেগুলিকে নিজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারে না; মানুষের কর্মের ফলে পরিবেশের এই বিকৃতিই পরিবেশ-দূষণ। বায়ু, জল, মাটি—প্রকৃতির এই প্রধান উপাদানগুলি সবই আজ দূষণে আক্রান্ত।

সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশে আজ দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে। আশার কথা, সর্বত্র মানুষের মধ্যে এসম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। ১৯৯২ ও ২০০২ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রসঙ্ঘ আয়োজিত 'বসুন্ধরা সম্মেলন' (World Summit) এই সচেতনতার ফল। এই সচেতনতা আরো শক্তিশালী হলেই দূষণরোধের ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আর তা হবে অপ্রয়োজনীয়, মাত্রাতিরিক্ত ভোগ পরিত্যাগ। কারণ, দূষণ যদি রোগ হয়, বস্তুতান্ত্রিক ভোগ তার মূল। রোগের নিরাময় করতে হলে তার মূলোৎপাটন অবশ্যই করতে হবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ-দূষণ পরোক্ষে ভোগবাদের মৃত্যুরই পূর্বলক্ষণ সূচিত করছে।

মানব-দূষণ পরিবেশ-দূষণের মতোই ভোগবাদের মৃত্যুর একটি পরোক্ষ কারণ। ভোগ মানুষকে এমনভাবে দূষিত করেছে যে, মুষ্টিমেয় ভোগী মানুষ নিজেদের মনুষ্যত্ব তো কলুষিত করেছেই, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজকেও বঞ্চিত এবং ভোগের প্রতি প্রলুব্ধ করে পথভ্রষ্ট করেছে। এরই ফলে মানবসমাজের বৃহত্তর অংশ তার স্ব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এইটিই মানব-দূষণ। এইভাবে দূষিত মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক—সর্বক্ষেত্রেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে।

আমরা আগেই জেনেছি, ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ সুস্পষ্ট। কিন্তু ভোগবাদী মানুষের কাছে ধর্ম একটি কুসংস্কার, তাই পরিত্যাজ্য। অথচ ঐ অনুশাসনগুলি যে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা গ্রথিত তা ভোগবাদীর মোহান্ধকার ভেদ করে তার কাছে বোধগম্য হয় না, যদিও ঐ মানুষ যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার গুণগানে পঞ্চমুখ।

রাজনৈতিক উপনিবেশের যুগে উপনিবেশগুলিতে বিজয়ী জাতিগুলি সাংস্কৃতিক দাসত্ব চাপিয়ে দেয়; এটি মানব-দূষণ প্রক্রিয়ার বিশ্বায়নের শুরু। এরই ভিত্তিতে বর্তমানের অশুভ বিশ্বায়ন ও সার্বিক দূষণপ্রক্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে। এর বিষময় পরিণতি সমাজে নানা অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে; এসবের প্রধান রূপ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—স্বার্থপরতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে শিথিলতা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ। আজ সারা পৃথিবীতেই এইসব অশুভ পরিস্থিতি গভীর সঙ্কটের রূপ নিতে চলেছে। কিন্তু এই অবস্থার মূল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হওয়ায় কোন দেশই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

বর্তমানে মানুষের সামনে যেসমস্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তার প্রায় সবগুলিরই মূল কারণ ভোগবাদ। আর এইসব সমস্যা নিয়ে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারে না। তাই মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ ভোগ পরিত্যাগ। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানুষের চোখে কারণ-সমস্যা-সমাধান সম্পর্ক ধরা পড়ে না। এই কারণেই বাহ্যত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দেশেই কোন সঙ্কটমোচন হচ্ছে না; বরং সব সঙ্কটই ক্রমশ জটিলতর রূপ নিচ্ছে।

অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, পুঁজিবাদই সকল মানবিক সঙ্কটের মূল; এর প্রতিকার সমাজবাদী ব্যবস্থায়। কিন্তু সমাজবাদী ব্যবস্থায়ও যদি ভোগবাদী জীবনধারা চলতে থাকে, তাহলে ভোগের আয়োজন থেকে উৎসারিত সঙ্কট আপনি কীভাবে দূর করবেন?

বরং সত্য এটাই—মানুষের মন থেকে ভোগের মোহ দূর না করা পর্যন্ত প্রকৃত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং মানুষের সঙ্কটমোচনও অসম্ভব।

এতক্ষণের আলোচনায় একথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাকৃতিক বিধানানুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসন-অনুমোদিত জীবনচর্যাই ভাবী মানুষের একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত। এর ব্যর্থতায় সার্বিক বিনাশ। ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪৭

পাশাপাশি ঃ (১) রুদ্রকরাম, (৪) পালিভাষা, (৬) অসিত, (৭) মায়াদেবী, (১১) দশবল, (১২) সংঘং (১৪) শরণং, (১৫) নির্বাণ, (১৬) আবরণ, (১৭) মদনদেব।

ওপর-নিচ ঃ (২) কলিত, (৩) মহামারী, (৫) লিচ্ছবী, (৬) অনুশাসন, (৮) দেবদত্ত, (৯) হলকর্ষণ, (১০) সংস্কার, (১৩) সংগ্রাম, (১৪) শরীর, (১৫) নিদান।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

রমা রায়চৌধুরী

অহঙ্কার

ভূতসিদ্ধ সে এক মানুষ, সিদ্ধ হয়েই ভূতকে দিল ডাক,
ভূত তো এসেই হাজির, বলে, 'বল তোমার কাজগুলো কি?
          একে একে সেসব করা যাক।
তবে কিনা কাজ করবার আগে একটা
          কথা বলার আছে,
একটি শুধু শর্ত, যা আজ রাখব তোমার কাছে।
আর তা হলো, যেদিন তুমি বলবে আমায়,
          করার মতো কাজ নেই তো আর,
ঠিক সেদিনই ভাঙব তোমার ঘাড়।'
ভূতসিদ্ধ মানুষটা তো ভূতকে দিয়ে হাজারো কাজ
          করায় একে একে,
          অবশেষে হিসেব করে দেখে,
কাজ নেই তো আর,
ভূত বলল—'আজই জেনো ভাঙব তোমার ঘাড়।'
লোকটা বলে, 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক,
          এমন কথাই ছিল তো তোর সাথে,
একটু আমায় সময় দে বাপ,
          কাজ কুড়িয়ে দিচ্ছি এনে এক্ষুণি তোর হাতে।'
এই বলে সে গুরুর কাছে দৌড়ে গিয়ে
          ভূতের ব্যাপার সবই খুলে বলে,
গুরু বলেন, 'ভয় পেলে কি চলে?
এক কাজ কর, একটাই কাজ, সেটাই হবে ভূতের কাছে
          শেষ-না-হওয়া বিশাল কাজের বোঝা,
একটা বাঁকা চুল দিয়ে বল করতে সেটা সোজা।'
ভূতসিদ্ধ তা-ই করল, ভূতটা তো সেই চুলটা সোজা
          করার জন্য চেষ্টা করে ঢের,
টানলে সোজা, ছাড়লে সেটা যায় যে বেঁকে ফের।
ঠাকুর বলেন, অহঙ্কারও ঐ চুলটার মতো,
এই যায় তো আবার আসে,
          যাওয়া-আসাই চলছে অবিরত।

ছবি : সৌরীশ মিত্র ● ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

কথামৃতকার মহেন্দ্র মাস্টার একদিন ক্লাসে ছাত্রদের বললেন ঃ

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। মানুষের অন্তরে ঈশ্বর বিরাজিত। তাঁর দর্শনলাভই আমাদের লক্ষ্য।

পরে একান্তে—

তুমি তো দেখছি বাল্যকাল থেকেই ভগবদ্ভক্ত। যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো একজনকে দর্শন করতে চাও তাহলে দক্ষিণেশ্বরে যেও।

এর নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। মাত্র ১৩ বছর বয়স। বিদ্যাসাগরের স্কুলে পড়ে।

ছেলেটি তো বেশ। এস, ঘরের ভিতরে এস।

আহা, দেখ দেখ, এর উঁচু সাকার ঘর। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কী অনুরাগ!

কলকাতার রাস্তায় তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত। নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পূর্ণ একদিন ট্রামে মাস্টার মশাইকে যেতে দেখে—

ঐ যে মাস্টার মশাই। তাঁকে প্রণাম করি। আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেছেন।

• চিত্রকল্প ঃ সৌরীশ মিত্র •

বেদান্ত দর্শনের আলোকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব

কৌশিক দাশগুপ্ত*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে শুধু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের স্তম্ভস্বরূপ তাই নয়, বিশ্বরহস্যের নানা নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তরও এই তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞানী নীলস বোর, শ্রয়েডিঙ্গার এবং হাইজেনবার্গের সাধনায় এই তত্ত্বের উদ্ভাবন। অণু-পরমাণুর ধর্ম এবং পারস্পরিক ক্রিয়াবিষয়ক ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বের সাফল্যের জন্য আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বকে প্রায় সমার্থক ভাবা হয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো কোয়ান্টাম তত্ত্বও সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত যেসব উচ্চমানের নির্ভুল গণনা করা সম্ভব হয়েছে, তার সবকিছুর পিছনেই আছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবদান।

দর্শনের জগতেও কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। বিগত শতাব্দীতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দর্শন সারা পৃথিবীর চিন্তাবিদদের ভাবিয়েছে, এখনো ভাবিয়ে চলেছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের দর্শন আমাদের সনাতন বা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত দর্শন থেকে সরে এসে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে শেখায়। কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও তার অন্তর্নিহিত দর্শন, 'বিশ্ব' ও 'জগৎ' সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বা সেইসব সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আগামী দিনে 'পদার্থবিদ্যা' বা তার দর্শন যেদিকে অগ্রসর হতে পারে, 'বেদান্তদর্শন' বহু আগেই সঠিকভাবে সেই সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছে!

আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ কোন বাস্তব জগৎ কি আছে? নাকি বাস্তবতা আমাদের চেতনা থেকে সৃষ্ট? যুগ যুগ ধরে দর্শনের জগতে এটা একটা মূল প্রশ্ন।

প্রাচীন গ্রিসের পদার্থবিজ্ঞানী এবং পাশ্চাত্যে প্রথম পরমাণুর ধারণার জনক ডিমক্রিটাস থেকে শুরু করে তৎকালীন অধিকাংশ দার্শনিকেরই মত ছিল, বাস্তবতা আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ আমাদের চেতনায় ধরা পড়ার আগেও বাস্তব জগতের অস্তিত্ব ছিল। বাস্তবতা সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা ছিল একটু অন্যরকম। তাঁর মতে, আমরা যে-জগৎ প্রত্যক্ষ করি তা আসলে মূল জগতের 'ছায়া' মাত্র। আমরা যে-জগৎ প্রত্যক্ষ করি তা পরিবর্তনশীল। তিনি মনে করতেন, পরিবর্তনশীল কোনকিছুই আমাদের জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। সুতরাং পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে আরেকটি স্থির, ধ্রুব, অপরিবর্তনীয় 'সত্তা' থাকা প্রয়োজন। প্লেটোর মতে যা 'absolute', বেদান্তে সেটিই 'ব্রহ্ম'।[১] এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্লেটো দেহের পিছনে অবস্থিত 'আত্মা'র অবিনশ্বরতার কথা বলেছেন। প্লেটোর মতে এই অপরিবর্তনীয় সত্তা কেবল ধ্যানের মাধ্যমেই আমাদের চেতনার অন্তর্গত হতে পারে।

অপরদিকে, পরবর্তী কালে আমরা ইংরেজ দার্শনিক রেনে দেকার্তের লেখায় বাস্তবতা চেতনা-নিরপেক্ষ এই কথার সমর্থন পাই। দেকার্ত 'বস্তু' এবং 'চেতনা'কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন[২] এবং প্লেটো-কথিত বস্তুর অপরিবর্তনীয় 'সত্তা'র চেতনার অন্তর্গত হওয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করেন।

দেকার্তের এই দর্শনের প্রভাবে নিউটনের সময় থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞান জগৎকে 'কার্য-কারণ' শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলে মনে করত।[৩] যেখানে সেই যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে 'মানবাত্মার চৈতন্য'-এর কোন ভূমিকাই ছিল না। সেই কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ বিশাল যন্ত্রটির নিরিখেই এই জগতে মানবের স্থান নির্ণয় করা হতো। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলা হয় 'বস্তুবাদ'।

বিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্ববর্তী তিন শতক জুড়ে বিজ্ঞান এবং তার দর্শন এক 'বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদ্ধ জলায়' আটকে পড়েছিল। সেখানে জগতের সবকিছুকেই বিচার করা হতো বস্তুবাদী একমাত্রিক (One Dimensional) দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং তার অন্তর্নিহিত দর্শন আমাদের আগেকার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে আমাদের চিন্তার মুক্তি ঘটিয়েছে।

▣ কোয়ান্টাম তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ▣

আমাদের বাস্তব জগতে কোন বস্তুকে টানলে বা ধাক্কা দিলে তার অবস্থান-পরিবর্তন হয়। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী কোন বস্তুর অবস্থান (position) এবং ভরবেগ (momentum)-এর সঙ্গে তার ওপর ক্রিয়াশীল বলের নির্দিষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব-অনুযায়ী কোন বস্তুর বিষয়ে সবকিছু তথ্যই তার 'তরঙ্গ-অপেক্ষক' (wave function)-এর মধ্যে নিহিত আছে। তরঙ্গ-অপেক্ষককে শ্রয়েডিঙ্গার ψ (সাই) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করেন। বস্তু বিষয়ে যদি এমন কোন তথ্যের উদ্ভব হয়, যার উত্তর ψ (সাই)-এর মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়, তবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব-অনুযায়ী সেই তথ্যের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। গাণিতিকভাবেও পারমাণবিক মাত্রায় (atomic dimension-এ) ψ (সাই)-কে বিশ্লেষণ করে আমরা বস্তুর

বিজ্ঞানে স্নাতক, পেশায় ব্যবসায়ী। কলকাতা-নিবাসী তরুণ গবেষক।

অবস্থান ও ভরবেগ একসঙ্গে জানতে পারি না, একটিকে সসীম করলে অপরটি অসীম হয়ে যায়। সুতরাং কোয়াণ্টাম তত্ত্ব-অনুযায়ী একইসঙ্গে বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ জানা সম্ভব নয়।

কোয়াণ্টাম তত্ত্বেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বিবর্তিত কোয়াণ্টাম তত্ত্বে ব্যক্তিমানবের চেতনা ও পরিমাপ প্রক্রিয়া—এই দুটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা চোখ দিয়ে আকাশের সূর্য, চাঁদ, গাছ, পশুপাখি, পাহাড়, বাড়ি ইত্যাদি নানা জিনিস দেখছি। দেখামাত্রই কিন্তু আমাদের মনে তার পরিমাপ হয়ে যাচ্ছে এবং বস্তুটির বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারছি।

কিন্তু পারমাণবিক মাত্রায় আমরা কোনকিছুই খালি চোখে দেখতে পাই না। সেখানে আমাদের আলো এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুকণার অবস্থান পরোক্ষভাবে পরিমাপ করতে হয়। এই পরিমাপ প্রক্রিয়ার ফলে কোন বস্তুকণার নির্দিষ্ট বাস্তবতার সৃষ্টি হয় এবং তা আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয়, পরিমাপ করার আগে পর্যন্ত কোন বস্তুকণার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তা কেবল কয়েকটি সম্ভাবনার গাণিতিক সমষ্টিমাত্র এবং যে-ব্যক্তি পরিমাপ করছে, সেও ঐ experiment-এর একটি অংশবিশেষ।

▣ শ্রয়েডিঙ্গারের পরীক্ষা[৪] ▣

শ্রয়েডিঙ্গার বিড়াল নিয়ে একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা করেন। মনে করা যাক, বাক্সবন্দি একটি বিড়াল আছে, বাক্সের ভিতরে আছে বন্দুক এবং বিকিরণে সক্ষম তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিকিরণের ধর্ম অনিশ্চিত এবং তা যখন-তখন ঘটতে পারে। বিকিরণ ঘটলেই বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে বিড়ালটির মৃত্যু ঘটবে। এবার, বাক্স বন্ধ থাকা অবস্থায় যদি প্রশ্ন করা হয়, বিড়ালটি জীবিত না মৃত, তবে এই প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

কারণ, বাক্স বন্ধ থাকা অবস্থায় বিড়ালটির বেঁচে থাকা অথবা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা অর্ধেক-অর্ধেক (৫০ ঃ ৫০)। গাণিতিকভাবে বলা যায়, বাক্স বন্ধ থাকাকালীন বিড়ালটির অবস্থা অর্ধেক জীবন ও অর্ধেক মৃত্যুর 'লিনিয়ার কম্বিনেশন' বা 'রৈখিক সমবায়'।

যদি বিড়ালটির অবস্থা সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করতে চাই, তবে আমাদের বাক্স খুলতে হবে বা পরিমাপ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। তখন বিড়ালটি বেঁচে থাকা অথবা মরে যাওয়ার অর্ধেক-অর্ধেক সম্ভাবনার সমষ্টি থেকে জীবন বা মৃত্যুর যেকোন একটা অবস্থায় পর্যবসিত হবে এবং বিড়ালটির অবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা লাভ করবে।

পারমাণবিক মাত্রায় ঠিক একই প্রক্রিয়ায় পরিমাপ পদ্ধতিতে কোন বস্তুকণা কয়েকটি সম্ভাবনার সমষ্টি থেকে যেকোন একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব অবস্থায় পর্যবসিত হয় এবং আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে।

সুতরাং পরিমাপ করার মাধ্যমে কোন বস্তুকণা আমাদের চেতনায় ধরা পড়ার পূর্বে তার কোন বাস্তবতা নেই। এটাই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের ফলে (১) কার্য-কারণ সম্পর্কিত আগেকার বস্তুবাদী দর্শনের অবসান ঘটেছে। (২) দর্শনের জগতে মানবাত্মার চৈতন্যের আসন স্থায়িভাবে সুপ্রমাণিত হয়েছে। (৩) বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে এক অদৃশ্য যোগাযোগ অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তা—একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (৪) কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আমাদের বিষয়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে বা মানবচৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে বিচার করতে শেখায়। ফলে 'বস্তুবাদী' দর্শনের 'বিষয়-বিষয়ী'র প্রভেদ লুপ্ত হয়।

▣ অদ্বৈতবেদান্তে কার্যকারণ সম্পর্ক এবং মায়াবাদ ▣

বেদান্তদর্শন বলতে মূলত অদ্বৈত বেদান্তই এখানে আলোচ্য। অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর এবং আধুনিককালে মূলত স্বামী বিবেকানন্দ।

অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে কেবল এক আত্মাই আছেন, এক অখণ্ড সত্তারূপে। এই সত্তা অনন্ত, সমস্ত কার্য-কারণের অতীত, অপরিণামী, চির আনন্দময়, নিত্যমুক্ত, অখণ্ড ও নির্গুণ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, এই অপরিণামী সত্তাকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মকে যখন আমরা দেশ-কাল-নিমিত্ত নামক চশমার মধ্য দিয়ে দেখি, তখন এই ব্রহ্ম সগুণ হয়ে বিভিন্ন আকার (form) গ্রহণ করে একটি 'পরিণামী জগৎ'-এর সৃষ্টি করে, যার ফলে স্থান-কালাদি বিভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব হয়। একে তখন আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। যেমন, অসীম সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রাংশ দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে 'ঢেউ' বা 'তরঙ্গ' হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, দেশ-কাল-নিমিত্ত—এগুলির আলাদাভাবে কোন অস্তিত্ব নেই; এরা পরস্পর মিলিতভাবে থাকে। বিশুদ্ধ 'দেশ' বা বিশুদ্ধ 'কাল'-এর অস্তিত্ব নেই। এরা যৌগিক পদার্থ এবং সেহেতু এরা 'মায়া'। এই মায়া অবলুপ্ত হলেই 'ঢেউ' আবার সমুদ্র হিসাবে প্রতিভাত হয়।

জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতানুযায়ী, ব্রহ্মের যেটুকু অংশ দেশ-কালের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে আসে, আমাদের মন ও বুদ্ধি কেবল সেটুকুকেই জানতে পারে। তাঁর মতে, আমাদের জগৎ অসীম দেশ-কালের কাঠামোর মধ্যে কার্য-কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা।[৫]

চৈতন্যময় মানবাত্মার দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রথম চেষ্টা করেন জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার। তাঁর রচনায় আমরা বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The world as Will & representation'-এ মানবের ইচ্ছা (will)-কেই তিনি 'Thought-in-itself' বা জগতের মূল সত্তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এপ্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "বিষয়-বিষয়ী প্রভেদ করার কারণে এই জগৎ যে মানবের 'ইচ্ছা'র প্রতিফলন, সেটা কাণ্ট ব্যাখ্যা করেননি।"[৬]

শোপেনহাওয়ার ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাবে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা শ্রয়েডিঙ্গার তাঁর 'Mind & Matter' গ্রন্থে লেখেন, জগতে বহু মন বা চেতনা নেই। চেতনা শুধু একটাই আছে। আমরা জানি, এটাই উপনিষদের মতবাদ।[৭]

এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রয়েডিঙ্গার লিখেছেনঃ "আমার মন এবং বহির্জগৎ একই মৌলিক উপাদানে গঠিত। ব্যক্তি ও বস্তু একই। তাদের মাঝের ব্যবধানের প্রাচীর পদার্থবিজ্ঞানে 'কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' আবিষ্কারের কারণে ভেঙে গেছে তা নয়, কারণ হলো—আসলে এই প্রাচীরটাই নেই।"[৮]

স্বামীজী বললেনঃ "যদিও পাশ্চাত্যে কাণ্টই প্রথম 'দেশ-কাল-নিমিত্ত' যে চিন্তারই প্রণালী-বিশেষ একথা বলেন, কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্বেই একথা আমাদের শিক্ষা দেয় এবং একে 'মায়া' বলে চিহ্নিত করে।"[৯]

কাণ্ট ব্রহ্মের কথা তাঁর দর্শনে বললেও দেশ ও কাল—এই দুটিকে অনন্ত ও স্বতন্ত্র বলেছেন।[১০] কিন্তু স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন বস্তু অনন্ত (infinite) ও স্বতন্ত্র হতে পারে না। একের অধিক বস্তু সবসময়েই যৌগিক, কারণ একটি অপরটির সাপেক্ষে সীমাবদ্ধ।

কাণ্ট বলেন, আমাদের জ্ঞান কখনোই যুক্তিরূপ বিশাল প্রাচীরকে ভেদ করতে পারে না। স্বামীজী কাণ্টের এই কথা খণ্ডন করে বলেনঃ "আমরা যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারি এবং যোগিগণ এমন বস্তু লাভ করতে সক্ষম যা যুক্তির উর্ধ্বে।"[১১]

এখানে স্বামীজী পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনে যে অখণ্ড ভাব সৃষ্টি হয়, তার কথা বলেছেন; যুক্তি কেবল দেশ-কাল-নিমিত্তেই সীমাবদ্ধ এবং দেশ-কাল-নিমিত্ত যে 'মায়া' তা আমরা আগেই দেখেছি।

শোপেনহাওয়ার 'ইচ্ছা'কেই এই জগতের মূল সত্তা হিসাবে বলেছেন। স্বামীজী অনেক পূর্বেই বলেছেন, ইচ্ছা যেহেতু অন্য কোন বস্তুর সাপেক্ষে সৃষ্টি হয়, সুতরাং ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ। জগতের মূল সত্তা কখনো যৌগিক পদার্থ হতে পারে না। তাই এই ইচ্ছার ধারণা পরিবর্তন করে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মানবের আত্মাকে মূল সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২]

উদাহরণ হিসাবে স্বামীজী বলেন, সূর্যের রশ্মি যখন অসংখ্য দর্পণের ওপর পড়ে, তখন ঐ প্রত্যেকটি দর্পণ একেকটি ক্ষুদ্রাকার সূর্যের মতো ঐ আলো বিকিরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সূর্যের আলো ও দর্পণের প্রতিফলিত আলো 'পরিমাণগত'ভাবে না হলেও 'গুণগত'ভাবে এক। সেইরকম সূর্যের জায়গায় ব্রহ্ম এবং দর্পণের জায়গায় মানবাত্মাকে বসালে তারাও গুণগতভাবে অবশ্যই এক হবে। স্বামীজীর মতে এভাবেই 'সেই অনন্ত নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে আমরা অভিন্ন'—এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

▣ জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় এবং জগৎ সম্পর্কে বেদান্ত তথা স্বামীজীর অভিমত ▣

জগৎকে স্বামীজী দুভাগে ভাগ করেছেন—বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ। আমাদের মন যখন বাইরের জগতের ওপর তার মানসিক তরঙ্গ (wave) নিক্ষেপ করে, তখন সেই নিক্ষেপিত তরঙ্গের দ্বারা বহির্জগৎ দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে নানা আকার (form) পরিগ্রহ করে ধরা দেয়।

বেদান্তদর্শনের মতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, প্রথমে স্থূলদেহ, তার পিছনে প্রাণময় ইন্দ্রিয়গণ, তাদের পিছনে মন, মনের পিছনে বুদ্ধি, বুদ্ধির পিছনে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের পিছনে অপরিবর্তনীয় একরস আত্মা। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই আত্মা নির্গুণ, নিরাকার।

যখন বহির্জগতের কোন বস্তুকে আমরা দেখি, তখন চক্ষুই সেই দর্শনের কারণ নয়। প্রকৃত কারণ দর্শনেন্দ্রিয়, যা মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। এই দর্শনেন্দ্রিয়ের পিছনে থাকে মন। এই মন যখন ইন্দ্রিয়তে যুক্ত হয়, কেবল তখনি ইন্দ্রিয়ের পক্ষে কোন কাজ করা বা বহির্জগতের সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণ সম্ভব। কিন্তু এর পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের পশ্চাতে অবস্থিত বুদ্ধি পূর্বানুভূত সংস্কার অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে নিজের মতো সাজায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হয় না।

স্বামীজী এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। যদি আমরা প্রজেক্টরের সাহায্যে পর্দার ওপর কোন ছবি ফেলার চেষ্টা করি তখন যে মূল ব্যাপারটি ঘটে তা হলো—নানা ধরনের আলোককিরণ পর্দার ওপর একত্রিত হয়ে নানা বস্তু ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কিন্তু কোন সচল বস্তুর ওপর এই আলোককিরণ একত্রিত করা যায় না। কারণ, আলোকরশ্মিগুলি নিজেরাই সচল। সেই কারণে স্থির, অচঞ্চল পর্দার প্রয়োজন হয়।

সেইরকম আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের বিভিন্ন ভাব (মানসিক তরঙ্গ)-কে কোন স্থির বস্তুর

ওপর একত্র করতে পারছে, ততক্ষণ আমাদের বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু কি সেই স্থির বস্তু, যার ওপর সমস্ত কিছু একটি অখণ্ড ভাব ধারণ করে?

সেই স্থির বস্তু যার ওপর মন সমস্ত ছবি আঁকছে এবং যার ওপর মন ও বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত বিষয়ানুভূতি স্থাপিত, সেটিই হলো আমাদের আত্মা। সুতরাং মনের দ্বারা নিক্ষেপিত তরঙ্গ আত্মার ওপর প্রতিফলিত হলে তবেই আমরা বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকি।[১৩]

বহির্জগৎ আমাদের অন্তর্জগতেরই প্রতিবিম্ব। আমাদের অন্তর্জগৎকে বাদ দিলে বাইরের কোন নিরপেক্ষ বাস্তবতার অস্তিত্ব থাকে না। জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের আত্মচৈতন্যের শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের ফল। শঙ্করাচার্য বর্ণনা করেছেন ঃ "বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং"— দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর (অর্থাৎ বহির্জগতের) মতো এই বিশ্ব আমাদের চিত্ত-দর্পণে প্রতিভাত হচ্ছে।

সাংখ্যদর্শনের পরিণতিতে বেদান্তদর্শনের এই সিদ্ধান্তকেই বর্তমান কালের কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু যান্ত্রিক-ভাবে ও গাণিতিকভাবে কিছুটা সমর্থন করেছে মাত্র। ❑

তথ্যসূচি

১ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—নীরদবরণ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪-১৫, ২৩
২ The Tao of Physics—Fritsof Capra, Harper Collins Publication, 3rd Edn., 1992, p. 27
৩ Ibid.
৪ In search of Schrodinger's Cat—John Gribbin Black Swan Publication, 1996
৫ ইমানুয়েল কান্ট—হুমায়ুন কবীর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৩য় সং, ৪র্থ অধ্যায়
৬ The World as Will & Representation—Arthur Schopenhauer, Dover Publication, 1969, pp. 421-422
৭ মন ও জড়বস্তু (Mind & Matter)—এরভিন শ্রয়েডিঙ্গার, অনুবাদ ঃ পূর্ণিমা সিংহ, বাউলমন প্রকাশন, ২য় সং, ১৯৯০, পৃঃ ৩৮
৮ ঐ, পৃঃ ৪০
৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৯, পৃঃ ২০০
১০ ইমানুয়েল কান্ট—হুমায়ুন কবীর
১১ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯, পৃঃ ২৩১
১২ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯
১৩ ঐ, পৃঃ ৩৩

শব্দচেতনা ৪৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কিত শব্দছক

পাশাপাশি ঃ (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বলা হয় —— (৫) "বলং —— চাহং কামরাগবিবর্জিতম্" (৭) শ্রীভগবান বলছেন ঃ যারা আমাকে তত্ত্বের সহিত জানে, তারা —— থেকে মুক্ত হয় (৮) "ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং ——" (৯) "সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ ——" (১১) শ্রীকৃষ্ণ (১৩) "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ ——" (১৬) "শারীরং —— কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" (১৭) শ্রীভগবান বলছেন ঃ যা লাভ করলে কেউ আর সংসারে ফিরে আসে না, তা-ই আমার —— (১৯) "ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে ——।"

ওপর-নিচ ঃ (২) জ্ঞানলাভের উপায়গুলির অন্যতম (৩) আত্মা হলেন —— দ্বারবিশিষ্ট দেহপুরের প্রভু (৪) "এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না —— কামকামা লভন্তে" (৬) "শ্রদ্ধাবান্ —— জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" (৭) একাগ্রতা ও তৎপরতাকে যা বলা হয় (৮) "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং ——" (৯) "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব —— কারণমুচ্যতে" (১০) "যততামপি —— কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" (১২) "—— বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ (১৪) "—— ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা" (১৫) "আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে —— প্রসীদ" (১৮) "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং ——।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আশ্বিন ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অনবদ্য সাহিত্য-মীমাংসা

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

সাহিত্যের সংসার • লেখক: বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় • প্রকাশক: নেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ • মূল্য: ১০০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৯২ • প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৪১০

'সাহিত্যের সংসার' বিশ্বসাহিত্যের বর্ণপরিচয়। এই গ্রন্থ স্বদেশ ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ভাবনার মনোজ্ঞ, মননশীল, সংবেদনশীল ও সুখপাঠ্য পরিচিতি।

সমগ্র জগৎই সাহিত্যিকের সংসার। আর এই সংসারের মানুষকে নিয়েই

সাহিত্যিকের সৃষ্টি। কবি-চেতনার পরিধি অসীম। তাই মানুষের জীবন লেখকদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে নব নব রূপে ধরা দিয়েছে। ভূমিকাত্মক রচনাটিতে গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্যকে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধগুলি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিটি প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য। যথা—'সাহিত্যে মানবিকতা: বর্ণপরিচয়', 'সংস্কৃত সাহিত্যে রোমান্টিকতা', 'মধুসূদনের সাহিত্যে প্রাচী ও প্রতীচী', 'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিবেকানন্দের বাঙলা রচনা', 'হ্যামলেট নাটকের চারশো বছর', 'বিশ্বমানব গ্যেটে', 'হাইনরিখ হাইনে' ও 'সমালোচক এলিয়ট'।

সমালোচনাগুলি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পূর্ণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক-রূপে লেখকের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ইংরেজি ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় গ্রন্থে বর্তমান। তাই তাঁর প্রবন্ধগুলিতে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এইদিক থেকে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি। 'বিবেকানন্দের বাঙলা রচনা' প্রবন্ধে চিন্তানায়ক মনীষী বিবেকানন্দের কবিমানসকে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "বিবেকানন্দ জানতেন, কি পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে উপদেশ দেওয়া যায়, সাহিত্য-মীমাংসক হরেস-এর মতো utility (উপযোগিতা) ও dulce (মাধুর্য)-এর সামঞ্জস্য করা যায়। ভারবি 'কিরাতা-র্জুনীয়ম্'-এ লিখেছিলেন, 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ', অর্থাৎ যেটা যুগপৎ মঙ্গল ও মনোরঞ্জন করে—এমন বাণী দুর্লভ। বিবেকানন্দের বাঙলা গদ্যরচনায় এই দুর্লভ সমন্বয় সম্ভব হয়েছে এবং সেখানেই এর স্বকীয়তা ও অনন্যতা।" (পৃঃ ১০৪)

বিশ্বনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জীবনে জীবন যোগ' করেছেন তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনার মধ্যে। বর্তমান কালে মানবিকতা বিশ্বসাহিত্যের একটি মূল্যবান বিষয়বস্তু। বিষয়টির একটি সুন্দর আলোচনা পাওয়া যাবে লেখকের 'সাহিত্যে মানবিকতা: বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে। আলোচনায় ইংরেজি, রুশ, জার্মান ও ভারতীয় সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান কালের বহুকথিত মানবাধিকার সংরক্ষণের কথা তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক। স্বভাবতই তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যে রোমান্টিকতা' আলোচনা চমৎকারিত্বের দাবি রাখে। একথা সার্বিকভাবে বলা যায় যে, গ্রন্থে বিষয়বস্তুর আলোচনার মধ্যে লেখক তাঁর কবিসত্তার পরিচয় রেখে গেছেন। এর কারণ হলো তিনি নিজে কবি। 'মধুসূদনের সাহিত্যে প্রাচী ও প্রতীচী' ও 'বঙ্কিম-উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব' রচনাদুটিতে লেখক কিছু নতুন কথা এনেছেন এবং প্রচলিত ভুল ধারণা সংশোধন করে দিয়েছেন। এই কথা 'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি সম্পর্কেও বলা যায়। হাইনের কবিসত্তার অন্তরে তিনি সহজেই প্রবেশ করতে পেরেছেন। ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত ও অন্যান্য সাহিত্যে লেখক অবাধে সঞ্চরণ করতে পারেন। বহু সুনির্বাচিত সানুবাদ উদ্ধৃতি তাঁকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থের কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে। একটি হলো উদ্ধৃতির বাহুল্য। আরেকটি বিষয়বস্তুর বিস্তারের বাহুল্য—যা বক্তব্যের গভীরতাকে হ্রাস করে।

বিশ্বনাথবাবুর বাঙলা শৈলী ও প্রসাদগুণ সমুজ্জ্বল। লেখকের পূর্বপ্রকাশিত 'সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের দীর্ঘদিন পর তাঁর নবপ্রকাশিত গ্রন্থটির জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। 'সাহিত্যের সংসার' পাঠ করে সর্বশ্রেণির পাঠক যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষালাভ করবেন—এই কামনা। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ আকর্ষক। ❑

ভারতবর্ষে চিরকাল শিক্ষার বনিয়াদ অধ্যাত্মবাদ

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য

In Search of Our Nationalist Roots for a Philosophy of Education • Published by: Swami Prabhananda, Secretary, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata-700 029 • Pages: 8+236 • Price: Rs. 50 • First Published: March 2004

আজ পৃথিবীর যা বয়স হয়েছে তাতে জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্র্যকে একান্ত-ভাবে লালন করার দিন আর নেই। বিদ্যা-সমবায়ের বা সমন্বয়ের যুগ এসেছে। তাই যেকোন দেশের বিদ্যাকে সমস্ত বিদ্যার মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে। এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে আত্মহনন। আবার ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে প্রেম,

OUR NATIONALIST ROOTS FOR A PHILOSOPHY OF EDUCATION

সেবা, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলার জন্য অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে। আলোচ্য গ্রন্থ **'In Search of Our Nationalist Roots for a Philosophy of Education'**-এর মূল বক্তব্য এটাই।

গ্রন্থের সূচনায় সংযোজিত আছে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান স্বাগত ভাষণ। স্বামী প্রভানন্দ মহারাজের চিন্তার পরিচ্ছন্নতার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর ব্যবহৃত যুক্তি ও ভাষার সৌকর্যে।

সম্পাদক রাধারমণ চক্রবর্তীর লেখায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে স্বামীজীর বৃহত্তর শিক্ষাভাবনা ও তার প্রয়োগের কথা।

বাস্তবিকই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরাধীন আমলে এবং বর্তমানেও চায়নি দেশের মানুষ যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠুক। মেকলের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়। তাদের উচ্ছিষ্টের অসার অংশ। মুনাফালোভী বণিকের জারজ সন্তান। আমাদের তপোবনে, বৌদ্ধবিহারে, নালন্দা বিক্রমশীলার বিদ্যায়তনে সাধনা ও শিক্ষা একত্রে মিলিত হয়েছিল। শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করে মানুষের শক্তি যেখানে বৃহদ্ভাবে উদ্যমশীল সেখানেই বিদ্যাকে স্বামীজী মেশাতে চেয়েছিলেন।

যে-শিক্ষা ব্যাবহারিক প্রয়োজনের খেয়া পারাপারে কাজে শুধু লাগে, যে-শিক্ষা মানুষের মানবিক সমগ্রতাটুকু অস্বীকার করে—তাকে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধীজী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, জে. কৃষ্ণমূর্তি সবাই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের সামাজিক অবস্থান পৃথক হলেও, তাঁদের শিক্ষাভাবনা ও দর্শন আলাদা হলেও তাঁদের স্বতন্ত্র অবস্থানের অন্তরালে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম ঐকান্তিক পরম্পরাগত যোগাযোগ রয়েছে। আটজন বক্তার তথ্যনিষ্ঠ ও আন্তরিক আলোচনায় সেই জায়গাটা খুব স্পষ্ট। যেমন ধরা যাক, প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যার আদর্শ ছিল জ্ঞানার্জন। কেননা বাঙালি উদ্যমহীন, অলস ও আরামপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের এই অন্ধ সংস্কার থেকে দূরে রাখতে হবে। ছেলেবেলা থেকে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নেই। যাকিছু নিতান্ত আবশ্যক তাই কণ্ঠস্থ হয়েছে। তেমন করে কোনমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিদ্যালাভ হয় না।

তাই শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গঠনমূলক স্বদেশি শিক্ষার পীঠস্থান করতে। গান্ধীজীর 'নঈ তালিম' দেশ গঠনের কাজ শুরু করেছিল। সত্য ও অহিংসার দর্শনের ওপর তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষা শুধু পাঠ্যের মধ্যে নয়, হাতে-কলমে দিতে হবে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশগঠনের জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি তিনি আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুত করে তার বিক্রির ব্যবস্থাও করেন। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন, একুশ শতকের শিক্ষা শুধু জাতির প্রগতির জন্য নয়, বিশ্বমানবের মানস পরিবর্তন ও চৈতন্যের উদ্বোধনের জন্য। কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদর্শন মানুষকে বিস্তৃত ও দেবত্বে উন্নীত করার জন্য। স্বামীজী তথ্যচয়নকে শিক্ষা বলেননি। বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মসাধনাকে যুক্ত করে তিনি মানুষকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। এবং চিন্তায় ও কর্মে বিশুদ্ধতা না থাকলে স্বামীজীর মতে পূর্ণ মানুষ হওয়া অসম্ভব।

সতীশচন্দ্র সম্পর্কে এখানে সচকিত হওয়ার মতো কিছু তথ্য আছে। আটজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সন্ন্যাসিবৃন্দ উপরি উক্ত মনীষীদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও দর্শন সম্পর্কিত ধ্রুপদী চিন্তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এখানে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁদের চিন্তা যথার্থই গভীর ও পরিশ্রমী।

এই গ্রন্থ আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিনারের বিশ্বস্ত দলিল—আমাদের মনীষীদের শিক্ষাভাবনার সমীক্ষা। এঁরা কেউ কারো 'ক্লোন' নন। অথচ এঁদের শিক্ষাদর্শনের শিকড় একই মাটি, জল, বাতাস থেকে পুষ্টিলাভ করেছে। বুধসমাজের কাছে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

এই মগজের জমিদাররা আঁধারের আল বেয়ে আনতে চেয়েছিলেন লাল টুকটুকে দিন। চেয়েছিলেন অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার শান্তির পৃথিবী। তাঁদের অমৃত স্বপ্নগুলি আজও যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে বেঁচে আছে। সময়ের কাঁচে কিরণ হয়ে আছে, কেননা তপস্যা ও জন্মভূমি কোনদিনই মলিন হয় না। এবার কি শুরু হবে বরফ গলা? ❑

ভারতে সংহতি রক্ষার একটি নতুন পন্থা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

Museum Education : An Approach To National Integration in India ● Written by : Dr. Dilip Kumar Ray ● Available from : Dr. Dilip Kumar Ray, 114A Ashokegarh, Kolkata-700 108 ● Pages : 4+78 ● Price : Not mentioned ● First Published : December 2002

ভারতের বর্তমানকালে যে-সমস্যাটি ক্রমশই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলো জাতীয় সংহতির সমস্যা। ধর্মের নামে দেশভাগের পর থেকে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে শুধু হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়—নৃতাত্ত্বিক বিচারে বিভিন্ন গোষ্ঠী, ভাষাগত বিচারে বিভিন্ন গোষ্ঠী, আঞ্চলিক স্বার্থের বিচারে বিভিন্ন ধরনের দলাদলি ভারতের জাতীয় সংহতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। রাজনীতির নেতারা জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির মধ্যে কিছু কিছু রদবদল ও সংস্কার করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আটাত্তর পাতার **'Museum Education : An Approach To National Integration in India'** গ্রন্থে Musiologist গ্রন্থকার যাদুঘর শিক্ষার (museum education) মাধ্যমে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কথা আলোচনা করেছেন। বক্তব্যটি কিছুটা নতুন।

আজ 'মিউজিয়ম' শুধু চিত্তবিনোদনের জায়গা নয়। মিউজিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখানো হয় এবং বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ জাতীয় নেতা বা ধর্মীয় নেতার জীবনী-কর্মক্ষেত্র নিয়েও মিউজিয়ম গড়ে উঠছে। সেদিক থেকে আজকের মিউজিয়ম হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকেন্দ্র এবং লোকশিক্ষার বাহন। মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকেরা মিউজিয়মের বাইরে—স্কুল-কলেজে বা সভামঞ্চে গিয়েও জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা পরিবেশ রক্ষণ বিষয়গুলি সম্পর্কে গণ-সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং বড় শহর ছাড়াও ছোট শহর ও গ্রাম-গঞ্জে ছোট ছোট বিষয়ভিত্তিক মিউজিয়ম গড়ে তুললে জাতীয় সংহতির পক্ষে জনমানসে ভাল প্রভাব ফেলা যেতে পারে। জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলার কাজে মিউজিয়মের ভূমিকা খুবই কার্যকরী, কেননা ভারতের মতো বিশাল দেশে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত বৈচিত্র্য যে বিপুল, সেকথা বিভিন্ন প্রদর্শনশালার মাধ্যমে বোঝানো সহজ।

গ্রন্থকার পাঁচটি অধ্যায়ে জাতীয় সংহতি সমস্যার স্বরূপ, জাতীয় সংহতি প্রচেষ্টার ইতিহাস এবং অ-প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মিউজিয়ম শিক্ষা একধরনের অ-প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা,

যার কার্যকারিতা খুব সরল ও সুন্দরভাবেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজে সাধারণত এইদিকে খুব একটা নজর দেওয়া হয় না। সুতরাং এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রন্থকার একটি যুগোপযোগী মূল্যবান কাজ করেছেন। লোকশিক্ষার মাধ্যমেই যে সমাজে কুসংস্কারগুলি দূর করা সম্ভব—একথা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো করে খুব কম লোকেই ভেবেছিলেন এবং সেজন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন 'লোকশিক্ষা' দেওয়ার জন্য। এখন পরিবর্তিত যুগে মিউজিয়ম শিক্ষা যে লোকশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বাহন হতে পারে এবং তার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করা যেতে পারে—একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ। ❑

একটি প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

জ্বেলে দিয়ে জ্ঞানের আলো (ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত ও মহান পণ্ডিতচতুষ্টয়) • লেখক : ডঃ নরেশচন্দ্র নন্দ • প্রকাশক : শ্রীমতী বুলবুল নন্দ, পঞ্চতীর্থ স্মৃতি সমিতি, অর্ণব নিকেতন, ৪০ বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০৮ • মূল্য : ১২৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৩৮ • প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৪০৯

বাঙালির বৈদুষ্য সম্বন্ধে বলা হয়, শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রেই এই বৈদুষ্য নিজস্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে—তা সেক্ষেত্র কাব্যই হোক বা দর্শনই হোক, তান্ত্রিক সাধনাই হোক বা বৈষ্ণব সাধনাই হোক। বাঙালির বৈদুষ্য সম্বন্ধে এই যে প্রসিদ্ধি, তা মেদিনীপুরের বৈদুষ্য বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে মেদিনীপুরের একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। এখানকার পণ্ডিতগণ কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি ধর্মশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র—সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজ নিজ প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবজাগরণ ও মুক্ত মননের প্রসারে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকাও নিয়েছেন। এখানেই মেদিনীপুরের বৈদুষ্যের বৈশিষ্ট্য।

অমৃতময়ী দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে ভারতীয়তার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃতের ওপরে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সংস্কৃতির যা শাশ্বত প্রার্থনা—চাই আলোক ও মুক্তি-ব্যাপ্তি ও সত্যানুসন্ধান। এই প্রার্থনা শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই নিজেকে প্রকাশিত করেনি, সমস্ত জীবনচর্চার মধ্যেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে। আর এই যে মুক্তি ও ব্যাপ্তির অন্বেষা, একে চরিতার্থ করার উপায়েরও সন্ধান ভারতীয় মনীষা দিয়েছে। তাই সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচিত না হলে স্বদেশচর্চা ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় না, ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানা যায় না, আর স্বভাবতই ভারতীয়তাকে ধরা যায় না। মেদিনীপুরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ খাঁটি ভারতীয় ছিলেন বলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশি আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন। তাই প্রাচীন যুগচেতনার সঙ্গে আধুনিক বৈপ্লবিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে এঁরা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

প্রাচীন যুগচেতনার সঙ্গে আধুনিক যুগচেতনার এই যে মিশ্রণ, এটা আমাদের জানা হতো না, যদি না অধ্যক্ষ ডঃ নরেশচন্দ্র নন্দ তাঁর **'জ্বেলে দিয়ে জ্ঞানের আলো'** শীর্ষক মহাগ্রন্থ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেন। এই গ্রন্থে যে পণ্ডিতচতুষ্টয়ের বহুধাব্যাপ্ত বৈদগ্ধ্য ও জীবনী নিয়ে ডঃ নন্দ আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন—(১) পণ্ডিতকুলভাস্কর দানবীর দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন, (২) নিখিল-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতকুলশিরোমণি রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব, (৩) পণ্ডিতাগ্রণী অধ্যাপক দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন এবং (৪) পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন। এঁরা শুধু বিশাল পাণ্ডিত্যই অর্জন করেননি কিংবা অসংখ্য শাস্ত্রের গভীরে শুধু প্রবেশই করেননি, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, স্বদেশচর্চায় ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন, সমাজের সেবা করেছেন। হয়তো বা গীতার সেই বাণীকেই স্মরণ করে, যে-বাণীর বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।" ভারতবর্ষে যেসমস্ত মনীষী ত্যাগমন্ত্রের উদ্গাতা হয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁদের কথা তো আমরা জানি। কিন্তু আরো অনেক মুক্তবুদ্ধি মানুষ আছেন যাঁরা নীরবে, নিভৃতে জনসেবা করে গেছেন, শিক্ষার আলোকে অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করার ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ হয়েছেন, সংস্কৃতির মানকে উন্নত করে সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। অথচ এঁরা কোনদিন পাদপ্রদীপের আলোকে অভিস্নাত হননি। এই যে অতন্দ্র সাধনা, বিস্ময়কর বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ, নিরলস সমাজসেবা—এসবের সমন্বয় প্রায়শই মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। যাঁদের মধ্যে দেখা যায় তাঁদের শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'অতিমানব' বা 'Super Man' বলে মানতেই হয়। নরেশচন্দ্রকে তাই অভিনন্দিত করে বলি—এরকম চারজন অতিমানবের ইতিবৃত্ত রচনা করে এবং এর সঙ্গে বহু অনাবিষ্কৃত ইতিহাস উদ্ধার করে তিনি বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

গ্রন্থটি একাধারে ইতিহাস ও সমাজের দর্পণ, জীবনী ও ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের উপস্থাপনা। ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞান থেকে, জীবনকে দর্শন থেকে পৃথক করা যায় না। ডঃ নরেশচন্দ্র নন্দ এই সত্যটি উপলব্ধি করে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে এই গ্রন্থটি এতই সুখপাঠ্য হয়েছে। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

* *আয় বৃষ্টি ছড়া-ই • লেখক : রেণুপদ ঘোষ • প্রকাশক : স্বাতী রায়চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৪৪এ চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪০ • মূল্য : ৪০ টাকা • প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০০৪।* একটি মনোরম অলঙ্কৃত ছড়ার বই। লেখক 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত।

* *ছন্দছড়ায় বুদ্ধকথা • সম্পাদনা : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র হালদার • প্রকাশক : তাপস অধিকারী, এ/৩ গভঃ হাউজিং এস্টেট, ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিনিউ, কলকাতা-১৪ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৪ • মূল্য : ২৫ টাকা • প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০৮।* অন্নদাশঙ্কর রায়, আল্ মামুদ প্রমুখ এপার বাংলার ৩৭ জন এবং ওপার বাংলার ১৫ জন কবির মূল্যবান কবিতার সঙ্কলন।

* *কে বলে ঈশ্বর নেই? • লেখক : মনোরঞ্জন চন্দ্র • প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ • পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮০ • মূল্য : ২৫ টাকা • প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৪০৫।* বিভিন্ন বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রের নিরিখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় একটি মনোজ্ঞ রচনা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বাঁকুড়া : গত ১৬ মে ২০০৫ নতুন প্রাক্‌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক : গত ৪-৫ জুন ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাক্রমে যুব ও ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী অমরাত্মানন্দজী। উভয় সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী। যুবসম্মেলনে ২২৫ জন এবং ভক্তসম্মেলনে ৪০০ প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও বসে প্রসাদ পান।

ছাত্রকৃতিত্ব

সি. বি. এস. সি.-র অধীনে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের দশম শ্রেণি (এ. আই. এস. এস.) ও দ্বাদশ শ্রেণির (এ. আই. এস. এস. সি.) পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়	পরীক্ষা	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
আলং	১০ম শ্রেণি	৮৬	৬২	২৮
	১২শ শ্রেণি	৬৫	৩৮	৫
দেওঘর	১০ম শ্রেণি	৬৯	৬৯	৬৬
	১২শ শ্রেণি	৫৩	৫৩	৪৫
নরোত্তমনগর	১০ম শ্রেণি	৩৩	২৬	১৫
	১২শ শ্রেণি	২৮	২৪	১১
বিবেকনগর (ত্রিপুরা)	১০ম শ্রেণি	৫৪	৩৯	১৫
	১২শ শ্রেণি	৩০	২৫	১১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়গুলির ফলাফল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
আসানসোল	১২১	১১৫	৮৩
বরানগর	১২০	১২০	৯২
কামারপুকুর	৯৭	৯৬	৫৫
কাটিহার	৬৯	৪৭	২২
মালদহ	৮৬	৮৬	৭১
মনসাদ্বীপ	৭৩	৩৬	৭
মেদিনীপুর	৯১	৮৮	৪৮
নরেন্দ্রপুর (বিদ্যালয়)	১২০	১২০	১১৮
„ (ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি)	১১	১১	১১
পুরুলিয়া	৮৫	৮৪	৬১
রহড়া	২২২	২২২	১৮৬
রামহরিপুর	৭১	৬০	৩৬
সারগাছি	৮৭	৭৯	৩৫
সরিষা (বয়েজ স্কুল)	১৬২	১৫৪	৫৩
„ (গার্লস স্কুল)	১১৩	৯০	২৮
টাকি	৭০	৭০	১৬

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফল নিম্নরূপ :

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	'স্টার' (৭৫%)
নরেন্দ্রপুর	১৩০	১২৮	১০৭
পুরুলিয়া	৪৬	৪৩	২৮
রহড়া	৯৬	৮৩	৪৮
বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ)	৮৬	৮৪	৫২
মালদহ	৫৫	৫৪	৩৩

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসব : গত ১১ জুন ২০০৫ মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সানাইবাদন, ভজন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্বোধন বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ৯৬তম পদার্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীকীর্তন এবং মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি এবং অমর পাড়ুই ও সহশিল্পিবৃন্দ। শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃক যাত্রাপালা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশ' এবং শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ কর্তৃক শ্রুতিনাটক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি মা সারদা' পরিবেশিত হয়। সকালের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করেও হাজার হাজার ভক্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে প্রায় ৮,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি ও লাড্ডু প্রসাদ গ্রহণ করেন। মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৫০ জন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেন।

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ৪ জন আসামী উৎসবের আমন্ত্রণলিপি জেলারকে দেখিয়ে উৎসবে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁরা 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক। তাঁরা এদিন উৎসবে যোগদান করে তৃপ্তিলাভ করেন। পুনর্নবীকরণ ইত্যাদি কাজও এদিন তাঁরা সেরে নেন।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমরুল (হুগলি) : গত ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, লীলাকীর্তন, রামায়ণ গান, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ৬ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী। ঐদিন দুপুরে প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী ও সুনীল দেবনাথ। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক অলোককুমার ঘোষ। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (কলকাতা-৩২) : গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পদার্থবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক 'ডঃ এইচ. এল. রায় বিল্ডিং'-এর সভাগৃহে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজাগরণ' শীর্ষক এক আলোচনাসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কুশলেন্দু গোস্বামী ও সভার আহ্বায়ক অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ জোয়ারদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম, নাওরা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, পাঠ, রামায়ণ গান, ভক্তিগীতি, ব্রতচারী নৃত্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী পুরাতনানন্দজী ও স্বামী সুপর্ণানন্দজী।

আগ্রা সারদামণি পল্লিমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পাঠ, ভজন, বস্ত্রবিতরণ, মাতৃসভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকেশানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী মায়াধীশানন্দজী, ডঃ শ্যামল গুপ্ত এবং 'সারদা আশ্রম, মেদিনীপুর'-এর সন্ন্যাসিনীবৃন্দ। ১৩ তারিখ প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ (নদীয়া) : গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তন, শ্রুতিনাটক, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবাত্মানন্দজী। দুপুরে ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, শ্রুতিনাটক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ১৮ তারিখ ৫০টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী সগুণানন্দজী। ১৯ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি—১৯৮৫, বজবজ (কলকাতা-১৩৭) : স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবিজয়ের পর দক্ষিণ ভারত হয়ে কলকাতা ফেরার পথে এস. এস. মোম্বাসা জাহাজে এসে ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলার মাটিতে বজবজে প্রথম পদার্পণ করেন। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ আসেন। সেই ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রার স্মরণে গত ২০ বছর যাবৎ উক্ত কমিটির ব্যবস্থাপনায় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ 'বিবেকানন্দ স্পেশাল' নামে একটি ট্রেনের প্রতীকীযাত্রার আয়োজন করেন। এবারও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পত্র ও পুষ্পে সজ্জিত ব্যানার ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ ঐ স্পেশাল ট্রেনটির যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ট্রেন ছাড়ার সবুজসঙ্কেত দেন এবং তাঁকে সহায়তা করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীশ্যামকুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিশোকানন্দজী, পি. সি. সরকার (জুনিয়র), কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডঃ অনুপকুমার চন্দ, কলকাতার তৎকালীন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধেশ্যাম, রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দু মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ট্রেনটি বেলা ১০টা ২৩ মিনিটে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় ভাষণ দেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি গণেশ ঘোষ প্রমুখ।
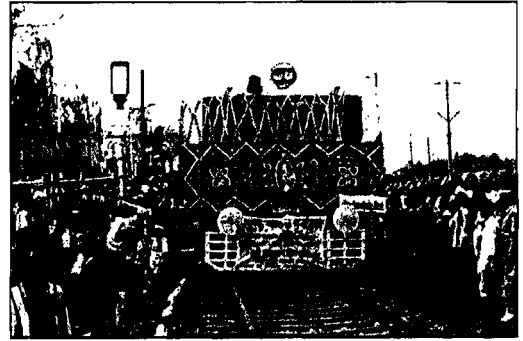
বজবজ স্টেশনে 'বিবেকানন্দ স্পেশাল'-এর শুভযাত্রার সূচনা

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সজ্জিত ট্রেনটিকে শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় ঐদিন যাতায়াত করানো হয়। সঙ্গে ছিল রেকর্ডে পরিবেশিত স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতা ও ভক্তিগীতি।

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নদীয়া) : গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব পালিত হয়। উভয়দিনে ভাষণ দেন স্বামী কৈবল্যানন্দজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা অজেয়প্রাণাজী, ডঃ গোপালজী ত্রিবেদী ও রণজিৎ সাহা। ২০ তারিখ ৭৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর (কলকাতা-৪৯) : গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ,

ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দত্তপুকুর মাতৃ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পল্লি-পরিক্রমা, পাঠ, নাটিকা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শত-বার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী ও কাজি আহমদ হোসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম, গান্ধী কলোনি (কলকাতা-৯২) : গত ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রভাতফেরি, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী, স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী ও পূর্বা সেনগুপ্ত। এই উপলক্ষ্যে সহস্রাধিক নরনারায়ণকে প্রসাদ ও নববস্ত্র প্রদান করা হয়।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, কোন্নগর (হুগলি) : গত ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, গীতিনাট্য, নাটক, স্মারকপত্র 'বোধোদয়' প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অজিত ঘোষাল প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির, ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা (হাওড়া) : গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী, গীতা পাইকাড়া ও কাশীনাথ দে চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রার্থনামন্দিরের সম্পাদক রঞ্জিত দাস। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ২০০ দুঃস্থনারায়ণের মধ্যে কম্বল ও বস্ত্র এবং ভক্তদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করা হয়।

বিবেকানন্দ আশ্রম, কটক (ওড়িশা) : গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী জয়দানন্দজী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চাঁদুর শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ শরণতীর্থ (হুগলি) : গত ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, যোগব্যায়াম প্রদর্শন, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমরাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৩২ জন দরিদ্রনারায়ণকে পঞ্চোপচারে পূজা করা হয়।

হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, আগমনী সঙ্গীত, নগর-পরিক্রমা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে নবনির্মিত ভবনে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ২৬ তারিখ ভবনের ফলক উন্মোচন, দ্বারোদ্ঘাটন ও ভাষণ প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ তারিখ ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দজী ও প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী। প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে ২০ জন দুঃস্থনারায়ণকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

বীরনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) : গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভক্তিগীতি, নাটক, অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণ, বীরনগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী প্রাণারামানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বসিরহাট শ্রীসারদাদেবী সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ নবনির্মিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে এদিন বিশেষ পূজা, পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী। এদিন ৫০ জন দুঃস্থ মহিলাকে কম্বল প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর (হাওড়া) : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 'স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী ভেদাতীতানন্দজী, ডঃ রামচন্দ্র মান্না, প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর-পর্বে উত্তর প্রদান করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের অন্যতম কেন্দ্র সারদা সেবাসঙ্ঘের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়ার পৌরপ্রধান ডাঃ কে. পি. দাস প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৫-৬ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, বস্ত্র-বিতরণ, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যানুষ্ঠান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয় দিনে ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী প্রমুখ। ৫ তারিখ ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৬ মার্চ ২০০৫ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী

পূর্ণব্রহ্মানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী, প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দেবরূপাপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (পুরুলিয়া শাখা), পুরুলিয়া (বাঁকুড়া) : গত ৬ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কীর্তনগান, পুস্তক ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী আপ্তেশ্বরানন্দজী, বিমলচন্দ্র দে ও ডাঃ চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী।

বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, ঠাকুরপুকুর (কলকাতা-৬৩) : গত ৬ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি বিতরণ, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য সভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী ও স্বামী সোমাত্মানন্দজী।

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মহারাজগঞ্জ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৯ মার্চ ২০০৫ ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 'স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুবসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী পররূপানন্দজী, অশোকরঞ্জন বসু ও আজিজুল রহমান। প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে একটি করে স্বামীজীর বই ও ছবি প্রদান করা হয়। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী পররূপানন্দজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও সেখ ফিরোজ। প্রায় ২,৫০০ ভক্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক উপলকুমার গায়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নামসাই (অরুণাচল প্রদেশ) : গত ৯-১২ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, লীলাগীতি, নৃত্যনাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ৯ তারিখ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও সাধুনিবাস 'প্রথমানন্দ স্মৃতিভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন যথাক্রমে স্বামী ঈশাত্মানন্দজী ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী, প্লিন্টিকা নামচুম ও মনোজকুমার পালিত। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক চয়ন পুরকায়স্থ। ১২ তারিখ স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। উৎসবের দিনগুলিতে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-২৮) : গত ১০-১২ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ৮৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দুয়াদণ্ড রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে ভক্তদের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (বর্ধমান) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভক্তিগীতি, বাউলসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন এভিনিউ (দুর্গাপুর) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

নারিট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সারদা আশ্রম (হাওড়া) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ পাঠ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন বিকাশ দে, সম্পাদক শ্রীমন্ত মণ্ডল ও অরুণ মজুমদার। প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভজন, আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সংগৃহীত অর্থ থেকে উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের মাধ্যমে বেলুড় মঠের সুনামি ত্রাণ তহবিলে ৬৩৩ টাকা প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম, বলাইচক (হুগলি) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভজন, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা, গাছগাছড়ায় রোগ নিরাময়ের ওপর প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, হরিনাম সঙ্কীর্তন, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন দরিদ্র-নারায়ণদের ধুতি ও শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়।

চন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাসঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ১২ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। 'কথামৃত' ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী পাঠ করেন যথাক্রমে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন মাজি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১২-১৩ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি, ভি.ডি.ও. প্রদর্শনী, ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। ১২ তারিখ প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ১৩ তারিখ সেবাশ্রমে স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, গোপীবল্লভ গোস্বামী, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, কমলকুমার মান্না, অলোককুমার ঘোষ প্রমুখ।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) : গত ১২-১৩ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রুতিনাটক, প্রদর্শনী, কীর্তন, রামায়ণ গান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ১২ তারিখ প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সিঙ্গুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ১২-১৪ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, নগরকীর্তন, ভক্তিগীতি, যাত্রানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ও সাধারণ উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুখানন্দজী ও স্বামী আত্মবিকাশানন্দজী। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, হাইলাকান্দি (অসম) : গত ১২-২০ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গীতিনাট্য, পদাবলিকীর্তন, নগর-পরিক্রমা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। ২০ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, কেলাতি (বাঁকুড়া) : গত ১২ ও ২০ মার্চ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, পাঠ, আবৃত্তি, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ও মহোৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রশান্তানন্দজী, স্বামী নির্মোহানন্দজী, ডঃ মতিলাল চক্রবর্তী, ডঃ ধ্রুবানন্দ দে, পণ্ডিত তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৯,০০০ নরনারায়ণের সেবা করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খারুপেটিয়া (অসম) : গত ১২ এবং ২১-২৩ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তসম্মেলন, রামনামসঙ্কীর্তন, পুরস্কার বিতরণ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি এবং সাধারণ উৎসব পালিত হয়। ১২ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন 'বিবেকানন্দ কম্পিউটার ইনস্টিটিউট'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। ২৩ তারিখ সাধুনিবাসের শিলান্যাস করেন স্বামী অনন্তানন্দজী ও স্বামী ত্যাগাত্মানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী অনন্তানন্দজী, স্বামী ত্যাগাত্মানন্দজী প্রমুখ।

বেলডাঙ্গা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ) : গত ১৩ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তসম্মেলন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন অধ্যাপক হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম হালদার। এদিন প্রায় ১৩৫ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র (বাঁকুড়া) : গত ১৩ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী অবধূতানন্দজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, তেলোভেলোর চটি (হুগলি) : গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, মেলা, যাত্রানুষ্ঠান, সেবাশ্রমের মুখপত্র 'অর্ঘ্য' প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১৫ তারিখ আয়োজিত 'স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যশিবির'-এ ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়। সেবাশ্রমের তরফ থেকে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ১৬ তারিখ আয়োজিত 'কৃষিশিবির'-এর আলোচ্য বিষয় ছিল 'মৎস্য সুরক্ষা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়'। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ডঃ রণজিৎ গোস্বামী, সেন্ট্রাল আইল্যাণ্ড ফিশারিজ (ব্যারাকপুর)-এর বিজ্ঞানী ডঃ অনুপকুমার দত্ত ও মৎস্য গবেষক ডঃ অসীম নাথ।

তালপুকুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৯ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১৯-২০ মার্চ ২০০৫ ভজন, শোভাযাত্রা, কীর্তন, পাঠ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কৌশিকানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ। ২০ তারিখ দুপুরে প্রায় ৭,৫০০ নরনারায়ণ বসে প্রসাদ পান।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি (হুগলি) : গত ১৯-২০ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বার্ষিক মুখপত্র 'উদ্দীপন' প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অরুণাত্মানন্দজী, অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ, বিচারপতি সমীরকুমার নিয়োগী ও অনীশ রায়চৌধুরী।

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হাওড়া) : গত ২০ মার্চ ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শেখরানন্দজী ও স্বামী যতীশানন্দজী। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২০ মার্চ ২০০৫ জপ-ধ্যান, বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বিকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। দুপুরে ১৫০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বর্ধমান : গত ২০ মার্চ ২০০৫ পাঠ, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, গীতিনাট্য, রামায়ণগান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও পুতুণ্ডা আশ্রমের স্বামী শিবাত্মানন্দজী।

মনসুকা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২০ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও সাধারণ উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, প্রতাপচন্দ্র মাইতি, কমল মান্না, গোপেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) : গত ২০ মার্চ ২০০৫ 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন স্থানীয় অনাথাশ্রমের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী-সহ ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হুগলি) : গত ২৬-২৭ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, পাঠ, বিশেষ পূজা, শ্রুতিনাটক, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী, দক্ষিণেশ্বরের স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী ও ডঃ নমিতা দত্ত। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পূর্ব গোবিন্দপুর, খন্দপুকুর (হুগলি) : গত ২৬-২৭ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বরানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, কানাইলাল ঘাঁটি ও সন্তোষকুমার চীনা। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৬-২৮ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, বাউলগান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী গতভয়ানন্দজী, স্বামী কৈবল্যানন্দজী, প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা বোধরূপপ্রাণাজী, ডঃ বিচিত্র সরকার। ২৭ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) : গত ২৬-২৭ মার্চ ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী। ২৭ তারিখ স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ অমূল্যকুমার চক্রবর্তী। এদিন দুপুরে ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জাড়া (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২৭ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, উদয়-অস্ত শ্রীরামকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন সম্পাদক স্বামী দেবানন্দজী, স্বামী ইষ্টানন্দজী, ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, আলোকময় বসু, অধ্যাপিকা সুনীতা মল্লিক, অলোককুমার ঘোষ, ডাঃ আর. আই. খান প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ১০০ দুঃস্থ-নারায়ণকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা (হুগলি) : গত ২৭ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বোধপ্রাণাজী। এদিন প্রায় ৫০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি (কলকাতা-১৪৪) : গত ২৭ মার্চ ২০০৫ বিশেষ পূজা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী, প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়প্রাণাজী ও তরুণ গোস্বামী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত ও দুঃস্থনারায়ণ বসে প্রসাদ পান। এদিন ৪৮ জন দুঃস্থনারায়ণকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

ঝিখিরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (হাওড়া) : গত ২৭ মার্চ ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ভি.ডি.ও. প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-স্মরণোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী বীরানন্দজী ও স্বামী জপপ্রিয়ানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন দুঃস্থনারায়ণ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে বস্ত্র ও 'সবার স্বামীজী' পুস্তক বিতরণ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সল্ট লেক-নিবাসী ডঃ অনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ১২ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার গড়িয়া-নিবাসী অসীমরতন চীনা গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নদীয়ার কুমারখালি-নিবাসী বীরেন রায় গত ১৫ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার পাইকপাড়া-নিবাসিনী গীতা তপস্বী (লাহিড়ী) গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার গল্ফ গ্রিন-নিবাসী সমরেন্দ্রনাথ সেন গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার খলিসাকোটা-নিবাসী গুরুদাস শীল গত ২০ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, অসমের হাফলং-নিবাসিনী রেণুকা দাষ বর্মণ গত ২১ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার বেহালা-নিবাসিনী যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী মানসী পাল গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কাঁচরাপাড়া-নিবাসী গোপেন্দ্রচন্দ্র মোদক গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত যদুলাল মল্লিকের প্রপৌত্রবধূ, কলকাতা-নিবাসিনী হেমপ্রভা মল্লিক গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরাগী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দুর্গাপুর-নিবাসী দেবব্রত মিত্র গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়ার শিবপুর-নিবাসিনী শোভা রায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের আঙ্গুয়া-নিবাসী নবীনচন্দ্র দাস গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ফুলিয়া-নিবাসিনী মুক্তি রায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।❑

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন্ দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

‘উদ্বোধন’-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**
  কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
  হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ**
  ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন ঃ ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**
  ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
  ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন ঃ ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **মা সারদা এজেন্সি**
  রামকৃষ্ণ মিশন স্টাফ কোয়ার্টার, গোলপার্ক, কলকাতা-২৯
  ফোন ঃ ৯৪৩৩১৬৪২৩৪
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক**, সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র**, চেতলা
- **শোভনা ভৌমিক**
  ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৯৭-০১২২
- **আদ্য ব্রাদার্স**
  ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল**
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫
  ফোন ঃ ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক**
  ৪/১ বেনেপোড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ডি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
  ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **দাসানুদাস সাহা**, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট
  কলকাতা-৫, ফোন ঃ ২৫৫৪-৬২৯৯
- **রবি হাজরা**
  ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**
  বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**
  ২৪/৬১ যশোর রোড
  ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮
  ফোন ঃ ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**
  প্রযত্নে বিকাশ সাহা
  মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা-৭৯
  ফোন ঃ ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**
  প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন ঃ ২৫১২-৯৫৬০/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক)
  ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১
  ফোন ঃ ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন ঃ ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**
  ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড, সন্তোষপুর
  যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ** (রামকৃষ্ণ আশ্রম)
  ১৯৩/১এ, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ**, উদয়পুর
  প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা
  কলকাতা-৪৯, ফোন ঃ ২৫৪১-০১২২
- **রূপম চক্রবর্তী**
  প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
  বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬,
  ফোন ঃ ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪
- **বিবেকানন্দ পাঠমন্দির**
  প্রযত্নে কানাইলাল বসু
  ৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর
  কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪
- **অলক পাল চৌধুরী**
  প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, সঙ্কটাপল্লী
  ঘোলা বাজার-১১১, ফোন ঃ ২৫৯৫-২১৮৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র**
  ১১/৫৪ ঋষি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৫১

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি

পোঃ টাকি, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৯

ফোন ঃ (০৩২১৭) ৪৭২২৫

একটি আবেদন

এতদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী, প্রাক্তন ছাত্র ও সহানুভূতিশীল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি, উত্তর ২৪ পরগনা** একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদপুষ্ট, তাঁহার কৃপাধন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত দ্বারা ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। প্রায় ৭৪ বছর বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাধ্যমে একটি নামী হাই স্কুল, ৩টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি ছাত্রাবাস, ১টি ডিস্পেনসারি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির-সহ আশ্রমটি এক সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "যখন যেমন তখন তেমন।" এই কথা স্মরণ করিয়া আগামী ২০০৬ সালে আশ্রমের আসন্ন প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রাক্কালে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতির কথা ভাবা হইয়াছে।

এতদুপলক্ষ্যে কিছু উন্নতিমূলক কার্য করিবার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। কার্যগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রকল্পের বিবরণ	আনুমানিক ব্যয়
একটি পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর	৩ লক্ষ টাকা
জীর্ণ ছাত্রাবাসের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	২ লক্ষ টাকা
খেলাধুলার মাঠ সংস্কার ও ব্যায়ামাগার	১ লক্ষ টাকা
কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা চালু করা	২ লক্ষ টাকা
মন্দির সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
আশ্রমগৃহ সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রকল্প	১০ লক্ষ টাকা
	মোট ২০ লক্ষ টাকা

উপরি উক্ত প্রকল্পে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেক বা ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **"Ramakrishna Mission Ashrama, Taki"**—এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ

সম্পাদক

● ভূতের পঞ্চাবস্থা / পঞ্চরূপ → ভূতজয়

স্থূল - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চমহাভূত(পঞ্চীকৃত, বেদান্ত মতে)
স্বরূপ - ঘন, তরল উষ্ণ, শীতল, বায়বীয়, ইত্যাদি
সূক্ষ্ম - পঞ্চতন্মাত্র (বেদান্তের অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত)
অন্বয় - সত্ত্ব, রজ, তমো গুণাত্মকতা- কি অনুপাতে তারা বর্তমান
অর্থবত্ত্ব - ভোগপ্রদান সামর্থ্য

● ইন্দ্রিয়ের পঞ্চাবস্থা/পঞ্চরূপ → ইন্দ্রিয়জয়

গ্রহণ - শব্দাদি বিষয়গ্রাহ্যেতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি
স্বরূপ - কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু অথবা কর্ণ ইত্যাদি। উহাই 'স্বরূপ'।
অস্মিতা - অহঙ্কারই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অস্মিতার সক্রিয় অংশবিশেষ।
অন্বয় - ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ- ক্রিয়া- স্থিতিশীল যে রূপ
অর্থবত্ত্ব - ভোগপ্রদান সামর্থ্য

ভূতজয় → **অনিমাদি সিদ্ধি** এবং **কায় সম্পৎ** এবং **কায় ধর্ম**

অনিমাদি সিদ্ধি অষ্টধা [শ্রীরামকৃষ্ণ এইগুলি ঘৃণা করিতেন]
- অনিমা [অণুপরিমাণ হওয়া]
- লঘিমা [তুলাবৎ লঘু হওয়া]
- মহিমা [বিরাটাকার ধারণ ক্ষমতা]
- প্রাপ্তি [যাহা ইচ্ছা স্পর্শ ক্ষমতা, যথা চন্দ্র]
- প্রাকাম্য [ইচ্ছার অনভিঘাত, যথা ভূমি ভেদপূর্বক নিম্নে গমন]
- বশিত্ব [ভূত বা ভৌতিক পদার্থের উপর বশিত্ব। অগ্নিকে শীতল হতে বলা ইত্যাদি]
- ঈশিত্ব [ভূত ভৌতিকের প্রভব, অপ্যয় ও ব্যূহের (structure) উপর ঈশিত্ব]
- যত্রকামাবসায়িত্ব [সত্যসঙ্কল্পতা]

কায়সম্পৎ
- রূপ
- লাবণ্য
- বল
- বজ্রসংহননত্ব [বজ্রবৎ দার্ঢ্য]

কায়ধর্ম [কায়ধর্মের অনভিঘাত]
শরীর আগুনে পুড়বে না, জলে সিক্ত হবে না, সময় মত জরা বার্ধক্য আসবে না, অল্প বা অধিক ভোজন করলে অজীর্ণ বা অনশন করবে না, ইত্যাদি

ইন্দ্রিয়জয়
মধুপ্রতীক সিদ্ধি
- মনোজবিত্ব [শরীরে অনুপম গতিলাভ]
- বিকিরণভাব [বিদেহ (apart from gross body) ইন্দ্রিয়ের অভিপ্রেত বৃত্তিলাভ]
- প্রধানজয় [সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতির বশিত্ব - ইহা ক্রিয়াশক্তির চরমসীমা]

(যোগব্যতীত)
সিদ্ধি লাভের উপায়
পঞ্চ প্রকার
- জন্ম
- ঔষধি
- মন্ত্র
- তপঃ
- সমাধি

উৎস ঃ
পাতঞ্জল যোগদর্শন ঃ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়...

সীমান্ত

জন্ম : ৩০ মে ১৯৭৬
মৃত্যু : ১৭ জুলাই ২০০৪
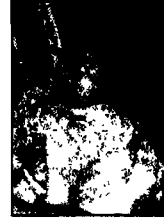
বেদান্ত

কল্যাণীয়া মা রোমি,

স্বাতী দাস সাহা তোমার ভাল নাম। আমরা জানি 'মা রোমি'। তোমার স্থূল-শরীর ত্যাগ করার একবছর পূর্ণ হলো। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ইষ্টদেবতার পাদপদ্মে তোমার পুত্রদ্বয়-সহ আনন্দে আছ। তিনি তোমার ইহকালের ভার নিয়েছিলেন, এখন পরকালেও তিনিই তোমাকে দেখছেন। এটাই তো আমাদের সান্ত্বনা। আমরা তোমাকে স্মরণ করি তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর আরো সুখে রাখুন—এই প্রার্থনা জানিয়ে। তোমরা সুখে থাক, আনন্দে থাক।

৫৮ডি, সৎচাষিপাড়া রোড
কাশীপুর
কলকাতা-৭০০ ০০২

শ্রীবিজয় দাস [বাপি] (আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ), শ্রীমতী করবী দাস [মামনি],
শাশ্বতী [বোন] ও স্নিগ্ধজ্যোতি পাল [ভগিনীপতি],
মাসিমণির আদরের ছোট্ট 'রাজ' আর অন্য প্রিয়জনেরা।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার সল্ট লেক-নিবাসিনী কুমারী অপর্ণা ঘোষ গত ১৬ মে ২০০৫, সোমবার সকাল ১০টায় ইহলোক ত্যাগ করেছে। দেহান্তকালে তার বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। নিষ্কাম সেবা ও সদাহাস্যময়তা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রয়াতার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, আমাদের এই প্রার্থনা।

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❊

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❊

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol.107
No.7
July
2005

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP/039/LPWP/11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন

... মাঘ ১৪১১ (১৫ জানুয়ারি ২০০৫) 'উদ্বোধন' ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ ... ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে ... সাময়িকপত্রের ১০৬ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম।

নতুন গ্রাহকভুক্তি চলছে। ... করবেন না।

* 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

* বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ও সংযুক্ত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ... মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

* প্রসঙ্গত ... যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ ... বেশি। কিন্তু সর্বসাধারণের ... চিন্তা করে আগামী বছরের জন্য আমরা গ্রাহকমূল্য ... পারিনি, ৮০ টাকাই রাখা হয়েছে (... দ্রষ্টব্য)। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—... ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশামতো বাঙালির ঘরে ঘরে ... আমরা 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে পারিনি। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন ... নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় এক ... হাজার অতিক্রম করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

* 'উদ্বোধন'-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', ... সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী ... এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের ... উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য ... আর্থিক দান ... আইনের ৮০জি ধারা ... করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে "Ramakrishna Math, Baghbazar"—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক, ... উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ... ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে ... উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 'Udbodhan Office, K...' নামে চেক বা ড্রাফট ...

সৌজন্যে

✽ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা।

ভাদ্র ১৪১২ ◆ ৮ম সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নি...

উদ্বোধন

॥ ১০৭ ॥

"আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ—খা রে, নে রে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

১০৭ তম বর্ষ ❀ উদ্বোধন কার্যালয় ❀ কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● সারদাপীঠের ফোন : ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

ই-মেল : rmsppp@vsnl.com ● (বিঃ দ্রঃ বেলুড় মঠের ফোন নং : ২৬৫৪-১১৪৪/[illegible])

আমাদের প্রকাশিত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

যেসব অ্যালবামের শুধু ক্যাসেট (মূল্য : ৩৫ টাকা) *আছে*

ক্যাসেট	অ্যালবামের নাম
(SP-14-16)	শ্রীকালীকীর্তন *(৩ খণ্ডে)*
(SP-18)	গীতিবন্দনা
(SP-21-22)	সংকীর্তন সংগ্রহ *(১ম ও ২য় খণ্ড)*
(SP-17)	বীরবাণী
(SP-35)	আগমনী
(SP-4)	যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ *(বক্তৃতা—স্বামী ভূতেশানন্দ)*
(SP-30)	শ্রীসারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য
(SP-19)	শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান *(বক্তৃতা—স্বামী ভূতেশানন্দ)*
(SP-28)	সরস্বতীবন্দনা

যেসব অ্যালবামের ক্যাসেট (মূল্য : ৩৫ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য : ১০০ টাকা) *উভয়ই আছে*

ক্যাসেট/সিডি	অ্যালবামের নাম
(SP-1 & CD/SP-1)	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
(SP-3 & CD/SP-3)	শ্রীরামনাম-সংকীর্তনম্
(SP-9 & CD/SP-9)	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
(SP-13 & CD/SP-13)	শ্রীসারদাবন্দনা
(SP-23 & CD/SP-23)	ওঠো জাগো
(SP-27 & CD/SP-27)	বেদমন্ত্র
(SP-37 & CD/SP-37)	সবাই মিলে গাই এসো
(SP-31-34 & CD/SP-31-34)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *(চার খণ্ডে)*
(SP-39 & CD/SP-39)	শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্
(SP-41-44 & CD/SP-41-44)	শ্রীশ্রীচণ্ডী *(চার খণ্ডে)*
(SP-36,40 & CD/SP-36,40)	ভজন সুধা *(দুই খণ্ডে)*
(SP-38 & CD/SP-38)	যুগে যুগে হরি
(SP-45 & CD/SP-45)	স্বামী অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর
(SP-2,7,8,10-12 & CD/SP-2,7,8,10-12)	কথামৃতের গান *(ছয় খণ্ডে)*

ক্যাসেট (মূল্য : ৩৫ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য : ৯০ টাকা)

(SP-6 & CD/SP-6)	শিবমহিমা
(SP-25 & CD/SP-25)	রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
(SP-26 & CD/SP-26)	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
(SP-20 & CD/SP-20)	বিবেকানন্দ বন্দনা
(SP-29 & CD/SP-29)	শ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(SP-5 & CD/SP-5)	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব
(SP-24 & CD/SP-24)	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা

ক্যাসেট (মূল্য : ৪০ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য : ৯০ টাকা)

(SP-48 & CD/SP-48)	রামকৃষ্ণের বেদিতলে
(SP-47 & CD/SP-47)	দেহি পদতরণী
(SP-46 & CD/SP-46)	মায়ের পায়ে জবা

যেসব অ্যালবামের শুধু ভিসিডি আছে

ভিসিডি	অ্যালবামের নাম
(VCD/SP-2,2A)	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আরাত্রিক *(বাঙলা ও ইংরেজি)* (২০০/-)
(VCD/SP-1A,1)	শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন *(১ম পর্ব)* *(বাঙলা ও ইংরেজি)* (১৫০/-)
(VCD/SP-3A,3B,3)	মা সারদার চরণরেখা *(বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজি)* (১৫০/-)
(VCD/SP-4)	শক্তিতত্ত্বে দেবী দুর্গা ও শ্রীশ্রীমা সারদা *(দুই খণ্ডে)* (প্রতিটি ১২৫/-)

সদ্যপ্রকাশিত অ্যালবাম

(CD/SP-49)	যুগজননী সারদা *(স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ)*

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

প্রার্থনা ও সঙ্গীত	*মূল্য ১৮ টাকা*
শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ	*মূল্য ৫ টাকা*
শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ	*মূল্য ৬ টাকা*
স্বামীজীর উপদেশ	*মূল্য ৫ টাকা*
আরাত্রিক ভজন	*মূল্য ২ টাকা*
ধর্ম ও ধর্মজীবন	*মূল্য ৫ টাকা*
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদর্শ ও ইতিহাস	*মূল্য ৫ টাকা*
আত্মবিকাশ	*মূল্য ৬ টাকা*

গঙ্গা ধূপ

৫০ কাঠি *(মূল্য ১৫ টাকা)*, ১০০ কাঠি *(মূল্য ৩০ টাকা)*

সারদাপীঠের অন্যান্য সামগ্রী

● পঞ্চপ্রদীপ *(৮০০ টাকা)* ● ঝাড়প্রদীপ *(৭৫০ টাকা)* ● কর্পূরদানি *(৩৭৫ টাকা)* ● দীপদানি *(৩৫০ টাকা)* ● ধূপদানি [ওঁ] *(৬০ টাকা)*, [বাড] *(৭০ টাকা)* এবং [লোটাস] *(৭৫ টাকা)* ● অ্যালুমিনিয়াম ফটো ফোল্ডার *(নানা সাইজের)* ● ল্যামিনেটেড ফটো *(নানা সাইজের)* ● বাণী জ্যাকেট *(ছবিসহ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কিছু উপদেশ)* ● আর্কলিক ফটো ফ্রেম ● শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদদের ফটো *(বিভিন্ন সাইজের)*

প্রাপ্তিস্থান : রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শোরুম, বেলুড় মঠ শোরুম, মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রিট ও ভারতবর্ষে এদের অন্যান্য কেন্দ্র), মেলোডি (কালীঘাট) এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম।

বিঃ দ্রঃ ডাকযোগে জিনিস পেতে হলে দ্রব্যের মূল্য M.O. অথবা D.D. মারফত নিম্নোক্ত ঠিকানায় অগ্রিম পাঠাতে হবে।
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (পি. কাম পি. অ্যাণ্ড সি. আই. সেকশন), পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২।

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১২)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

❑ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১২/সেপ্টেম্বর ২০০৫ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** ক্রেতারা ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে প্রাক্-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা উদ্বোধন অফিসে এসে জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন—২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে।

❑ **এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**

❑ যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা হয় না।** ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। **২৭ আগস্ট ২০০৫-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

❑ **রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৭ আগস্ট ২০০৫-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**

❑ **২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।

❑ যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৩ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন।

✤ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক।**

✤ প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** সংবাদ পাঠান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।

✤ **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে,** তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।** গ্রাহক ছাড়া অন্য কেউ এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবশ্যই গ্রাহকের **'অনুমতিপত্র'** সঙ্গে আনবেন।

✤ **যদি কারো ক্যাশমেমো/রসিদ/মানি অর্ডার প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে, নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**

❑ **৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ১০ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ২০ অক্টোবর ২০০৫ বৃহস্পতিবার কার্যালয় খোলা থাকবে।**

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং, যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

এই শরীর যতই সুন্দর ও রোগমুক্ত হোক, জীবনে নাম-যশ যতই হোক, মেরুপর্বতের মতো যতই নানাবিধ ধনসম্পত্তি হোক; গুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন যদি না মগ্ন হয়, তাহলে আর কি হলো? (অর্থাৎ সবই বৃথা)

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্বং, গৃহং বান্ধবাঃ সর্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

স্ত্রী, ধনসম্পত্তি, পুত্র-পৌত্রাদি সবকিছু এবং ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব—যাবতীয় ঈপ্সিত বস্তু লাভ হলেও গুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন যদি না লগ্ন হয়, তাহলে আর কি হলো?

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা, কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

ষড়ঙ্গ বেদ যদি মুখস্থ থাকে, যদি শাস্ত্রজ্ঞান ও কবিত্বগুণ প্রকটিত থাকে, যদি গদ্য ও সুন্দর পদ্য রচনার ক্ষমতা থাকে; তথাপি গুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন যদি না থাকে, তাহলে আর কি হলো?

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ, সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

কারো বিদেশে খুব সম্মানলাভ হতে পারে, স্বদেশেও লোকে ধন্য ধন্য করতে পারে, আবার সদাচার ও সৎকার্যে কেউ সর্বদা নিরত থাকতে পারে; কিন্তু গুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন যদি না একাগ্র হয়, তাহলে আর কি হলো?

গুর্বষ্টকস্তোত্রম্, ১-৪

ধ্যান ও তাহার অনুষঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা জাগতিক বিষয়ে, জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতাকে 'ধ্যান' শব্দে অভিহিত না করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ক একাগ্রতাকেই 'ধ্যান' বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। অর্থাৎ স্ব-স্বরূপকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া যদি কেহ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন এবং যথাবিধি 'ধারণা'র স্তর অতিক্রম করিয়া বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে চিত্তপ্রত্যয় লাভ করেন, তাহা হইলে ঐ অবস্থাকেই 'ধ্যান' নামে অভিহিত করা হইবে। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার ছুরি-কাঁচি হাতে লইয়া শরীরে অস্ত্রোপচারকালে চিত্তকে একাগ্র করেন ঠিকই, কিন্তু উহা 'চিত্তের একাগ্রতা'ই, ধ্যান নহে। অতএব 'ধ্যান' একটি আধ্যাত্মিক পরিভাষা। এইরূপ সংজ্ঞায়ন আমাদের আলোচনার সুবিধার্থেই। বস্তুত, যে মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে—সেই প্রক্রিয়ার প্রয়োগস্থল যেমন চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারেন, তেমনি কোন জড়বস্তুও এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগস্থল হইলে কোন আপত্তি বা বাধা নাই। আর, পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের 'বিভূতিপাদ' নামক অধ্যায়ে এই প্রয়োগস্থল প্রাথমিকভাবে জড়বস্তু বৈ অন্য কিছু নহে! কিন্তু তিনি ক্রমশ সেই জড়বস্তু হইতে মনকে চেতন-বস্তুতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং সবশেষে 'ধর্মমেঘ-সমাধি'র উল্লেখ করিয়া 'বিবেক-খ্যাতি'র সাহায্যে 'কৈবল্য'লাভের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কৈবল্যলাভ এবং দ্রষ্টার 'স্বরূপে অবস্থান' একই কথা। বেদান্তের পরিভাষায় ইহাই নির্বিকল্প সমাধি।

প্রাথমিকভাবে 'সার্বভৌম মহাব্রত' বলিয়া যে 'যম' ও 'নিয়ম'-এর উল্লেখ করা হইয়াছিল, মূলত তাহাই 'ধ্যান'-এর অনুষঙ্গ বলা যাইতে পারে। 'যম' ও 'নিয়ম' প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন'-এ ইতঃপূর্বে বহু আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়া আমরা সংক্ষেপে তাহাদের গূঢ়ার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহারা পক্ষীর দুই পক্ষের ন্যায়। যে-পক্ষীর দুই পক্ষ নাই তাহার কোন গতি নাই; যাহার একটি পক্ষ আছে, সে বহু চেষ্টা করিয়া গড়াগড়ি দিয়া কিছুটা অগ্রসর হইতে পারে। যাহার দুই পক্ষই আছে এবং সক্রিয়, সেই পক্ষীই আকাশে উড়িতে পারে। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা কতটা তাহা আর বেশি বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

সত্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি গুণ একত্রে 'যম' অভিধায় উল্লিখিত হয়। সত্যপরায়ণতা, পবিত্রতা, কায়মনোবাক্যে হিংসার অভাব, অচৌর্য অর্থাৎ অপরের ধন বা বস্তু চুরি না করা এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের অধিক কিছু গ্রহণ না করা—ইহাই ঐ পাঁচটি শব্দের তাৎপর্য। এই পাঁচটি গুণের প্রসার যোগীর মনোবল বৃদ্ধি করে। ভাবিয়া দেখিলে, এইগুলি সাধারণ গৃহস্থ মানুষেরও মনোবল বৃদ্ধি করে। স্বামীজী বারংবার বলিতেন ঃ "Strength is life, weakness is death." অর্থাৎ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তির যে-উৎসের কথা আমরা 'যম' অভিধায় প্রাপ্ত হইয়াছি, মহামুনি পতঞ্জলি তাহা বলিয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবেরও পূর্বে। অথচ এখনো পর্যন্ত উহারা পৃথিবীর যেকোন দেশে, যেকোন জাতির, যেকোন স্তরের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং বিশ্বের যেকোন সমাজে মূল্যবোধের ভিত্তিস্বরূপ। এই পঞ্চ যমের অভাব অর্থাৎ অসত্য, অ-ব্রহ্মচর্য, হিংসা, চৌর্য (বা স্তেয়) এবং পরিগ্রহ (পুঁজিবাদী মানসিকতা)-ই আজ এই একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্য(?) ও শিক্ষিত(?) বিশ্ব-সমাজে নিয়তির অভিশাপস্বরূপ প্রতীত হইতেছে!

শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপঃ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটি গুণ বা অভ্যাসকে পতঞ্জলি 'নিয়ম' নামে সংজ্ঞায়িত করিয়াছেন। শুচিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য মানসিকতা হওয়া উচিত। শুচিতার অভাবেই ম্যালেরিয়া হইতে শুরু করিয়া এড্‌স এবং অন্যান্য মারণ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-সমাজে যত বেশি শুচিতার অভাব, সেই সমাজে বিভিন্ন রোগের তত বেশি প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে বাড়িতে কিংবা বিদ্যালয়ে শিশুরা যদি শুচিতার শিক্ষা পাইত, সমাজের রূপ অন্যপ্রকার হইত। দ্বিতীয়ত, ধ্যানের অপরিহার্য সহায়ক হিসাবে সন্তোষ একটি দুর্লভ গুণ। চিত্তপ্রসাদ বা মনের প্রসন্নতা মানুষের জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ক্ষোভ, বিদ্বেষ, অসূয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ বা মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি মানুষের মনকে কিছুতেই প্রসন্ন থাকিতে দেয় না। যোগীর অন্যতম প্রধান সাধন এই 'সন্তোষ'। এবিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হইবে। স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বীয় অধ্যয়ন-এর অর্থ দুইপ্রকার হইতে পারে। প্রথমত, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং দ্বিতীয়ত গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রজপ। শারীরিক বা মানসিক কষ্ট সহ্য করিবার বিশেষ ক্ষমতাকে 'তপঃ' বা 'তপস্' বলা হয়। তপস্ বা তপস্যা এমন পর্যায়ে সাধককে লইয়া যাইবে যে, চিত্তের প্রসন্নতা বা সন্তোষ কখনো বিঘ্নিত হইবে না। এবং এই পর্যায়ের শেষ কথা—সর্বশাস্ত্রবিদিত 'কর্মফলসমর্পণ'। অর্থাৎ সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া

সাধক মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে—ইহাকেই পতঞ্জলি 'ঈশ্বর-প্রণিধান' বলিয়া অভিহিত করিলেন। এই পাঁচটি সদ্‌গুণ সাধকের অবশ্য-প্রয়োজনীয় করণ। আজকাল সর্বত্রই 'সংযমের অভাব', 'অশালীন আচরণ', 'মূল্যবোধহীনতা', 'সামাজিক অবক্ষয়', 'জনগণতান্ত্রিক সচেতনতার দৈন্য', 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের অজ্ঞতা' ইত্যাদি গালভরা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষের মূলে জল দিবার কেহ নাই! 'যম' ও 'নিয়ম'-এর যে-সংজ্ঞা মহামুনি পতঞ্জলির নিকট আমরা শুনিলাম, তাহাই যেকোন সমাজে (বিশেষ করিয়া ভারতীয় সমাজে) উন্নতির মূল পদক্ষেপ বলিয়া রাষ্ট্রীয় স্তরে স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কোন হানি হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন ঃ "যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই—ইহা প্রমাণ করিয়াছে, সাধুচরিত্র, পবিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। ধ্যানের অনুষঙ্গ দুইপ্রকার হইতে পারে। একটি অনুকূল এবং অপরটি প্রতিকূল চরিত্রের। ধ্যানাভ্যাসের সহিত প্রতিকূল অনুষঙ্গগুলির আবির্ভাব হইয়া থাকে, বিনা প্রচেষ্টায়। এই প্রতিকূল অনুষঙ্গগুলিকে পতঞ্জলি 'অন্তরায়' বলিয়াছেন। অন্তরায় নয়প্রকার। যথা—**ব্যাধি**, **স্ত্যান** (চিত্তের অকর্মণ্যতা), **সংশয়** (ইহা ঠিক, না উহা ঠিক —এই সিদ্ধান্তে অক্ষমতা), **প্রমাদ** (মনের একাগ্রতার অভাবের কারণে সাধনায় ঔদাসীন্য), **আলস্য**, **অবিরতি** (ইন্দ্রিয়লালসার প্রাবল্য), **ভ্রান্তিদর্শন** (কোন বিষয় বা বস্তুকে যথার্থরূপে না দেখিয়া অন্যভাবে দেখা), **অলব্ধভূমিকত্ব** (যতই আপ্রাণ চেষ্টা করুক না কেন, তবু ধ্যান বা সমাধি তাহার নিকট অধরাই থাকিয়া যায়), **অনবস্থা** (ধ্যান বা সমাধিতে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করিয়াই তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়া, অর্থাৎ ধ্যানে বা সমাধিতে স্থিতিলাভের অভাব)। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এসবই মনের ব্যাপার। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ধর্মসাধনা কিংবা আত্মজ্ঞান-লাভের যে-প্রক্রিয়া বৈদিক যুগ হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে অনুবর্তিত হইতেছে, তাহা মূলত মানসিক প্রক্রিয়া। ইহাকেই স্বামীজী মানুষের 'Mystic faculty' বলিয়াছেন। অতএব মনই ধর্মজীবনের প্রধান উপকরণ। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্যার গভীরতা প্রাচ্যের তুলনায় সামান্যই বলিতে হইবে। কারণ, উহাতে মনের উপাদান কারণ লইয়া বিশেষ গবেষণা নাই।

যে-ব্যক্তি নিজের চিত্তের একাগ্রতাসাধনে আগ্রহী, ধ্যানের অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয় অনুষঙ্গই তাহার জানা দরকার। যথাযথ উপায়ের দ্বারা ধ্যানের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে হইবে এবং একইসঙ্গে অনুকূল অনুষঙ্গের সাধনা করিতে হইবে। ব্যাধি দূর করিবার জন্য আসন ও প্রাণায়ামের বিধি দিয়াছেন সূত্রকার। চিত্ত সর্বদা সক্রিয় এবং অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণাত্মক না হইলে উহার অকর্মণ্যতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সূত্রকার ইহাকে 'স্ত্যান' বলিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের সান্নিধ্যে আসিলে বা জীবনী ও বাণী পড়িলে 'সংশয়' দূর হইতে পারে এবং 'প্রমাদ' হ্রাস পাইয়া সাধনে উৎসাহবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দেহ এবং মনের গুরুভাবই আলস্য, অর্থাৎ ভারী বস্তু যেমন নাড়াচাড়া করিতে অসুবিধা, তদ্রূপ 'শরীরটা যেন আর চলিতেছে না' কিংবা 'এখন আবার এইসব শাস্ত্রগ্রন্থ আনিলে'-জাতীয় শারীরিক ও মানসিক আলস্য। ইহা যোগের বিঘ্ন।

যম ও নিয়মের বিপরীত ভাবগুলিকে বলা হয় '**বিতর্ক**'। অর্থাৎ অসত্য, হিংসা, অ-ব্রহ্মচর্য, চৌর্য, পরিগ্রহ এবং অশৌচ, অসন্তোষ, অনধ্যায়, বিলাসিতা ও স্বার্থবুদ্ধি (কর্মফলের ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধির অভাব)। এই 'বিতর্ক'-এর প্রাদুর্ভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সূত্রকার বলিলেন ঃ "বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।" অর্থাৎ মনে যেই ক্ষতিকারক কোন ভাব বা চিন্তা উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহার বিপরীত চিন্তাতরঙ্গ উঠাইতে পারিলে 'বিতর্ক' আর আসিবে না। এই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য মনকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করা। মনের কী অবস্থা হইলে উহা সমাধির যোগ্যতা লাভ করে? পূর্বেই বলা হইয়াছে, চিত্তের প্রসন্নতাই মনের প্রাথমিক যোগ্যতা। চিত্তপ্রসাদ অর্থাৎ সন্তোষ বা মনের সদাপ্রসন্নতা যোগসাধনার প্রথম কথা। যাহারা অত্যন্ত বেশি কথা বলে, তাহাদের চিত্তের প্রসাদ বজায় থাকে না। তাই নীরবতা যোগের অন্যতম অনুকূল অনুষঙ্গ। যোগের বিঘ্ন কার্যোৎকণ্ঠা। কার্যোৎকণ্ঠার আধুনিক নাম 'Tension'। ইহা যোগের প্রতিকূল অনুষঙ্গ। যে ঠিক ভক্ত, সে ঈশ্বরনির্ভর। শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ বলিতেন ঃ "আমার মা সব জানেন।" এই অবস্থায় কার্যোৎকণ্ঠা থাকে না। ইহার পর উল্লেখ্য অহঙ্কার বা মদ। শক্তিমদ, বিদ্যামদ, ধনমদ ইত্যাদি যোগের প্রতিকূল অনুষঙ্গ। ধ্যান করিয়া যদি অহঙ্কার জন্মায়—'আমি বড় ধ্যানী', তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির চিত্ত হয়তো একাগ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহা যোগের অনুকূল নহে। মাৎসর্য বা 'jealousy' যোগের অত্যন্ত প্রতিকূল অনুষঙ্গ। ইহাতে চিত্তের প্রসন্নতা খর্ব হয়। যেমন করিয়াই হউক যোগী স্বচিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হইতে দিবেন না। আপনারা লক্ষ্য করিলেই বুঝিবেন, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনেও এই সন্তোষ অত্যন্ত জরুরি।

সূত্রকার চিত্তের প্রসন্নতা বজায় রাখিবার একটি অদ্ভুত উপায় বলিলেন। 'সমাধিপাদ'-এর ত্রয়োত্রিংশ সূত্রে তিনি

বলিলেন ঃ "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ-পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" অর্থাৎ কী পদ্ধতিতে মনকে অভ্যস্ত করিতে হইবে? **সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা, অপুণ্যে উপেক্ষা।** আরো সহজ করিয়া বলা যায়। নিজের কিংবা অপরের সুখ দেখিলে মনে 'বাঃ! খুব সুন্দর, খুব ভাল কথা' ইত্যাদি চিন্তাতরঙ্গ উঠাইতে হইবে। অপরের সুখ দেখিয়া যদি কাহারো অন্তরে দুঃখের আবির্ভাব ঘটে, কিংবা অপরের দুঃখ দেখিয়া যদি তাহার নিজের অন্তরে সুখানুভূতি হয়—তাহা হইলে অচিরেই যে উভয়ের চিত্তের প্রসন্নতা বিঘ্নিত হইবে, সেব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। নিজের সুখকে মানুষ যেপ্রকারে স্বাগত জানায়, অপরের সুখেও সে যদি অনুরূপ সুখী হয়, তাহা ধ্যানের পূর্ণ সহায়ক হইয়া উঠে; কারণ ইহার সাহায্যে চিত্তের ঈর্ষা-কলুষ মন হইতে দূরীভূত হয়। অতঃপর নিজের কিংবা অপরের দুঃখ প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিলেন, মনে করুণার উদ্রেক ঘটাইতে হইবে। পরের অপকার করিবার ইচ্ছা-কলুষ এইভাবে মন হইতে ক্রমশ বিলীন হইলে পর চিত্ত ধ্যানের যোগ্যতালাভ করিবে। তেমনি পুণ্যকার্যে যদি চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে মনের ভিতর হইতে অসূয়া দূরীভূত হইবে। আমাদের ঠিক বিপরীতই ঘটে। কেহ যদি দয়া-দানাদি পুণ্যকর্ম করে, আমাদের মনে চিন্তা উঠে ঃ 'দেখ, কেমন লোকদেখানো পুণ্য করছে!' যুক্তিবাদী বলিবেন, যথার্থ আন্তরিকতার সহিত করুক কিংবা লোক দেখাইয়া করুক—তাহাতে কি আসে যায়? একটা দরিদ্র মানুষের তো উপকার হইল। যোগী বলিবেন, ঐ অসূয়াজাত মনোভাব তোমারই মনকে ধ্যানের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত করিতেছে, ইহা তুমি বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। আর যে-স্থানে অপুণ্যকার্য চলিতেছে—ঘুষ, প্রবঞ্চনা, অসত্য, চুরি, নরহত্যা ইত্যাদি—সেইসব অপুণ্য দর্শনেও যোগের বা ধ্যানের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যোগী ঐসকল বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইবেন। ভক্ত ঐসকল বিষয়ে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। কর্মী সম্ভব হইলে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ঐ অপুণ্যকর্ম দমনে সচেষ্ট হইবেন। যদি ঐ অপুণ্যকারী অসুরের দল বেশি শক্তিশালী হইয়া প্রতি-আক্রমণ করিবার আয়োজন করে, তখন কর্মী ঐ ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া স্বীয় চিত্তের প্রসন্নতা বজায় রাখিবেন। অর্থাৎ ধ্যানের সহায়করূপে 'উপেক্ষা' চিত্তের প্রসন্নতা বজায় রাখিবার একটি অত্যাবশ্যক উপদেশ।

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করিবেন ঃ 'ইহা কি কোন সুযুক্তি হইল? আমরা সমাজে বাস করি। অন্যায়, অত্যাচার ও যাবতীয় অপরাধ দেখিয়াও আমরা কি উপেক্ষা করিব? ইহা কি স্বার্থপরতার নামান্তর নহে? আমাদের পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন যে-সমাজে বাস করিতেছে তাহাকে অপরাধমুক্ত করিবার দায়িত্বকে অস্বীকার করিবার এই উপদেশ কতটা গ্রহণযোগ্য?' তাহার উত্তরে বলি, প্রশ্নটি যথার্থ বটে। কিন্তু একবার বলুন তো, সমাজে প্রতিদিন এই যে লক্ষ লক্ষ অপরাধ সঙ্ঘটিত হইতেছে, ইহার কয়টিতে আপনি সচেতন ও সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ গড়িতেছেন? একটু বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায়, আমরা আমাদের স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি, বাকি সর্ব ব্যাপারেই উদাসীন থাকি ও তাহা উপেক্ষা করি। মন্দের ভাল ইহাই যে, আপনার স্বার্থ-সংক্রান্ত যেটুকু বিষয়, অন্তত সেই বিষয়েতেও যদি অপরাধ-প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তাহাও স্বাগত। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক স্তরে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যেই এই অপরাধ-প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারেন তো তাহা উত্তম। স্বামীজী এই মনোভাবের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ (দুষ্ট ব্যক্তি) একটি চড় মারে, তাহাকে দশটি চড় ফিরাইয়া দিও। ইহাই সংসারীর কর্তব্য। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ ঘটে। আমাদের যতটুকু স্বার্থ, সেই স্বার্থাংশটুকু সিদ্ধ হইলেই আমাদের সক্রিয় প্রচেষ্টা থামিয়া যায়। এই কারণেই বলা হইয়াছে, 'যদি সম্ভব হয়'। যেমন প্রশাসনের উচ্চস্তরে যদি কেহ 'প্রণামী' গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের কী করিবার থাকে? যে-ব্যক্তি ধ্যানেচ্ছু, সে নিশ্চয়ই ঐ ব্যাপারকে উপেক্ষা করিয়া নিজ চিত্তের প্রসন্নতা বজায় রাখিতে চাহিবে, কারণ সে জানে অযথা চিত্তবিক্ষেপ না ঘটাইয়া মনকে ধ্যানাভ্যাসে মগ্ন রাখিলে তাহার শান্তি বৈ অশান্তি হয় না। সুতরাং নিজের কোন্‌টি কর্তব্য, কোন্‌টি অকর্তব্য—ইহা সম্যক বুঝিয়া যে-ব্যক্তি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নামক ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাঁহার চিত্তপ্রসাদ তাঁহাকে উন্নততর জীবন যাপনে সাহায্য করে। এইভাবে সমাজের প্রত্যেক মানুষের জীবনধারা যদি ক্রমশ উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া উঠে, স্বাভাবিকভাবেই তাহা এই সমষ্টিরূপী সমাজকেও উন্নততর করিবে—সেকথা বলাই বাহুল্য।

ধ্যানের আরেকটি অনুকূল অনুষঙ্গ হইল নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস। এককথায় ইহাকে 'প্রাণায়াম' বলা চলে। অসংযত চরিত্রের ব্যক্তি কখনো নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। সুতরাং প্রাণায়াম অভ্যাসের পূর্বে সংযত জীবন, সংযত আহার-বিহার, শুচিতা ইত্যাদি অবলম্বনীয়। বিষয়ে অনাসক্ত; একাগ্রতাসম্পন্ন শক্তিশালী মন যে-ব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকে, তাঁহা অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি জগতে বিরল। [সমাপ্ত] ❑

স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র

পুলিনবিহারী মিত্রকে লিখিত*

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

THE RAMAKRISHNA MATH
BELUR P.O., HOWRAH DIST.
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

শ্রীমান পুলিন,

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি কিছু২ ধ্যান জপ করিতেছ, পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে এবং আশ্রমের কাজ করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মন সর্বদা শান্ত থাকে না। তুমি যেমন প্রভুর উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতেছ, সেইরূপ বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে থাক। সাধ্যমত জপধ্যান নিশ্চয়ই করিবে। উহাতে বাধা কখনো করিবে না। প্রভু তোমাকে নিশ্চয় শান্তি ও আনন্দ দিবেন। মন খারাপ হইলে খুব ব্যাকুল হইয়া প্রভুর নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিও। তিনি তোমায় সর্বদা শান্তি দিবেন ও দেখিবেন। তোমরা যে শ্রীশ্রীঠাকুরের—যুগাবতার, যুগগুরুর আশ্রয় পাইয়াছ। তোমাদের কোন ভাবনা নাই। তুমি ও আশ্রমসহ সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Hathiramji Mutt
Ootacamund (Madras)
16.7.26
৩১/৩/৩৩

শ্রীমান পুলিনবিহারী,

বহুকাল পর তোমার পত্র পাইলাম। তোমার পূজনীয় দাদামহাশয় পূর্ণ বয়সে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে লীন হইয়াছেন শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হই নাই, কারণ তিনি সময়মতোই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তবে তোমার দুঃখ হইবার কারণ যথেষ্ট আছে, কারণ তাঁর শেষ সময়ে তিনি তোমায় দেখিতে পাইলেন না এবং তুমিও পাইলে না। যাহা ভবিতব্য, প্রভুর ইচ্ছায় তাহা হইয়াছে। তিনি অতি পবিত্র, উচ্চহৃদয় ও ধার্মিক লোক ছিলেন—তাহা আমরা বিশেষ জানি, তাঁর হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতি ছিল। ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের উপর তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের ওখানে মঠ স্থাপন হইবার মূলে তিনি। তাঁর আত্মা শ্রীগুরুদেবের অভয় ও চিরশান্তিময় পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছে—এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুমি প্রভুর কৃপায় এখন বিষয়কর্ম বুঝিতে পার এবং বেশ চালাইয়া লইতে পারিবে। প্রভুর স্মরণ করিয়া সৎপথে থাকিয়া সংসারের কর্তব্যকার্য সকল করিতে থাক। প্রভুর নাম স্মরণ নিত্যই করিবে। অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবে, তিনি তোমায় ঠিক পথে চালাইবেন। ভগিনীদায় হইতেও মুক্ত হইবে কোন চিন্তা নাই। দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি ভাল করিয়া করিও। তিনি বাস্তবিক বড় পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন।

উদয়নারায়ণের পুত্রদের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলা ভাল। সেসম্বন্ধে তোমরা যেরূপ ভাল বিবেচনা কর করিও। ওখানে অমেয়ানন্দ ও শ্রীযুক্ত পরেশ মাইতি ও গ্রামের ও নিকটস্থ ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্তব্য করিও। আমি এখন বহুদূর দেশে রহিয়াছি, সুতরাং আমি এখান হইতে কিছুই বলিতে পারিব না। শশি (কল্যাণচৈতন্য) মঠেই আছে, মঠে এখন যাঁরা কাজকর্ম দেখিতেছেন, আবশ্যক হইলে তাঁদের লিখিও। তবে তাঁদের না লিখিয়া তোমরা সকলে মিটাইয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়।

তুমি বুদ্ধিমান ও ধার্মিক, যাহা করিবে ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না। ঠাকুর মঙ্গলময়। তাঁর কাজ তিনি তোমাদের দ্বারাই করাইয়া লইবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। কোন ভয় নাই। বৃহৎ সংসারের ভার এখন তোমার উপর ন্যস্ত হইল। ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার সে-ভার বহনের শক্তি নিশ্চয়ই দিবেন। তার কোন সন্দেহ নাই। তোমাকে দেশের লোক অনেকেই ভালবাসেন ঠাকুরের কৃপায়। মঠের দাতব্য চিকিৎসালয় বেশ ভাল চলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহা বড় প্রয়োজন। তুমি প্রভুর ইচ্ছায় উহাতে যতটা পার সাহায্য করিবে। তুমি তাঁর ইচ্ছায় ডাক্তার হইয়াছ। বহু লোকের সেবা করিতে পারিবে। ইহা খুব বড় কার্য ঠাকুরের। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ অমেয়ানন্দ ও পরেশ মাইতি মহাশয়কে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিও।

* স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য পুলিনবিহারী মিত্র ভাল গান গাইতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যবর্গ তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন।—সম্পাদক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি।—সম্পাদক

অষ্টম অধ্যায় ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বর ভাব, সহজ কথায়, দেহাদি ভাবই 'অধিভূত'। পুরুষ অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলবর্তী সর্বদেবতার অধিপতি যে বৈরাজ পুরুষ, তিনিই অধিদৈবত (সকল দেবতার অধিষ্ঠাতা)। আর এই দেহে অন্তর্যামীরূপে স্থিত আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীদেবতা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক ও তৎফলদাতা।*

ব্যাখ্যা ঃ অধ্যাত্ম বলিতে তাঁহার শুধু শুদ্ধ 'আমি'-ভাবটাই বুঝিতে হইবে। যখন তিনি দেহ-মন-বুদ্ধি ও পূর্ব-সংস্কাররূপ উপাধি-যুক্ত, তখন তিনি অধিভূত। এই অবস্থা অবিরাম পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষরভাব বলা হইয়াছে (ক্ষর অর্থাৎ যাহা অনবরত ক্ষয় হইতেছে)। এই সৃষ্টির ভিতরে এক মহাশক্তি খেলা করিতেছে। সেই শক্তির এক একটি ভাব অবলম্বন করিয়া আমরা এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়াছি। ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শক্তিকে আমরা বলি পবনদেব, দগ্ধ করিবার শক্তিকে আমরা বলি অগ্নিদেব, সাগরের অনন্ত জলরাশিরূপ রাজ্য পরিচালক রাজাকে বলি বরুণ ইত্যাদি। এই যাবতীয় দৈবশক্তি ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। আমরা যত দেবতার পূজা করি, তাহাতে তাঁহারই পূজা করা হয়।

যে সমষ্টি-চৈতন্য সমস্ত দেহরূপ পুরে বাস করেন, তিনিই পুরুষ। সর্বদেবতার সমষ্টি অর্থাৎ উঁহাকে পূজা করিলে সমস্ত দেবতার পূজা, জগতের সমস্ত শক্তির পূজা করা হয়।

অধিযজ্ঞ = মানুষের ভিতরে ঈশ্বর বা দেবদেবীর উপাসনা এবং পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি সর্বত্রই দেখা যায়। অতি বিরল পার্বত্য জাতিরা পর্যন্ত নানাপ্রকার পূজাদি করে। জীব এই প্রেরণা ব্রহ্ম হইতেই পায়। যজ্ঞের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বেদ বলিয়াছেন ঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ", আর গীতাতেও আছে ঃ "সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"। এস্থলে মানুষের স্বাভাবিক উপাসনা-প্রবৃত্তির কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই তিনি সর্বজীবের ভিতর অধিযজ্ঞরূপে বিরাজিত। তিনিই অধিযজ্ঞ—"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"।

ধর্মসাধনাতে সর্বত্রই নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণভাব ও ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা যায়। এই জগতে সর্বত্র নানাভাবে ব্রহ্মই যে নিজেকে প্রদর্শন করিতেছেন—ইহা না জানিলে উপাসনা অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। মোটকথা, সৃষ্টির সর্বত্র জগৎকারণ অক্ষয় ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষের বহির্মুখ দৃষ্টিকে অন্তর্মুখ করিয়া মনকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিবার জন্য নানাপ্রকারে নানাদিক হইতে গীতায় বহু নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবের ভিতরে 'আমি' 'আমি' বোধ একটি আশ্চর্য বস্তু, যাহা প্রস্তরজাতীয় জড়বস্তুতে নাই। ইহাই অধ্যাত্মবিভূতি।

প্রত্যেক জীবের বাহিরের আবরণ বারবার খসিয়া পড়িলেও আবার নূতন একটি আবরণ নিজের ভিতর হইতেই সে বাহির করে। ইহাও ব্রহ্মশক্তিতেই হইয়া থাকে। ইহাই অধিভূত।

সর্বজীব অবিরাম আপনাকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিবর্তন বা evolution-এর প্রেরণায় কীটপতঙ্গ পর্যন্ত জ্ঞানী হইতে পারে। ঘড়ির ভিতরে একখানা ইস্পাতের পাতকে খুব জোরে গুটাইয়া রাখা হয়, তাহা নিজের অবস্থা লাভ করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে; তাই সেই ঘড়ি চলে। অবিকল সেইরূপ প্রতি জীবের ভিতরে অসীম শক্তিশালী অনন্ত ব্রহ্ম নিজেকে প্রবল মায়াশক্তির দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি নিজে নিজেকে বিকাশ করিবার অবিরাম চেষ্টা করেন। ইহাই তাঁহার বিভূতির রহস্য। যখন উপাসনাদি কার্যে মানুষের প্রবৃত্তি হয়, তখন সেই প্রবৃত্তির প্রেরয়িতাকে অধিযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই ভাব এবং উদ্ভব—উন্নতি করা। ইহাই সাধারণভাবে সমাজের লক্ষ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাই, শতসহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যুগযুগান্তর হইতে মানব-সমাজ টিকিয়া আছে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাই যেসব কার্যের দ্বারা এই ক্রিয়াদুটি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম।

কর্মের এই ব্যাপকতর সংজ্ঞায় যজ্ঞ, দেবোপাসনা তাহার একটি অংশমাত্র।

[**মন্তব্য ঃ** তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হইয়াছেঃ "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত।" (১।৭।৪।৩)—সেই শরীরী প্রথম জীব বা পুরুষই অধিদেব, তিনিই আদিকর্তা। আর শ্রীভগবান বলিতেছেন, সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামীরূপে আমিই অধিযজ্ঞ। এই অন্তর্যামীর গুণ কী? না, তিনি অসঙ্গ বা অনাসক্ত অর্থাৎ অস্পৃষ্ট। আর সেই কারণেই দেহ বিনষ্ট হইলেও পরবর্তী দেহেও তিনি অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন।—সম্পাদক]

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৫॥

শ্লোকার্থ ঃ *মরণকালে আমাকে যে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়—এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ এই সৃষ্টিতে যাহাকিছু কাজ হয়, তাহারই একটা নিয়ম আছে। এই প্রকৃতির ভিতরে কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনাই ঘটিতে পারে না। যেসব কাজ সাধারণ লোকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া থাকে, যোগীরা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহা অনায়াসে ঘটাইতে পারেন। (স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 'রাজযোগ' দ্রষ্টব্য) কখনো কখনো বাহ্যদৃষ্টিতে খারাপ লোককে মৃত্যুকালে ভগবানের নাম করিয়া মরিতে দেখা যায়—যেমন অসতীর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ, ঘোর সংসারীর ভগবানের নাম করিতে করিতে মৃত্যু ইত্যাদি। আমরা তাহাদের বাহিরের জীবনই দেখি; কিন্তু সে-ব্যক্তির বুদ্ধিতে ভগবানলাভ যে জীবন-সমস্যার একমাত্র মীমাংসা, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা তো আমরা দেখিতে পাই না। সেই ব্যক্তি অতীতের কর্মসংস্কার বশে বাধ্য হইয়া অথবা জীবিকা-নির্বাহের জন্য বাধ্য হইয়া অতি অনিচ্ছায় অসৎ-কার্য করিয়া থাকে। তাহার পূর্বসংস্কারের প্রেরণায় যে অসৎ-কর্মে গতি হইয়াছে, সেই সংস্কার নিঃশেষ (exhaust) হওয়া মাত্রই ভগবানে রতিমতি হইবে এবং মুক্তি হইবে—ইহাই ঘটনা।

একটি বিষয় মনে রাখা খুব জরুরি—জীব মনে-প্রাণে যাহা চায়, তাহাই পায়। যাহা সেইভাবে চায় না, তাহা পায় না। জ্ঞানপন্থী বলেন, ভগবান বলিয়া কোন 'কৃপাময়' কেহ নাই। ভক্ত বলিবেন, যাঁহাকে আমরা ভগবান বলি, তাঁহাকে কৃপাময় বলিতে পারি। কেন? কারণ যে তাঁহার কাছে যায়, সে যাহা চায়, তাহাই পায়। উত্তরে জ্ঞানী বলেন, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি নিত্যযুক্ত আছে। সেই যোগটি সম্বন্ধে সচেতন হইলেই ব্যষ্টিতে সমষ্টির শক্তি সঞ্চারিত হয়। ইহাকেই লোকে দয়া, কৃপা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। ভক্তের মতে, তখনি তাঁহাকে কৃপাময় বলা যায়, যদি তাঁহাকে পরম সুহৃৎ নিজের মায়ের মতো বোধ হয়—fullest surrender চাই।

তবে আমরা যতদিন এই দ্বৈতভূমিতে আছি, ততদিন তাঁহাকে পূজা করিতে ও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে এইটি জানিয়া যে, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।/ ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি যে কেবল আমার ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাই নহে, হে কৌন্তেয়! অন্তকালে যেকোন ব্যক্তি যদি কোন দেবতার স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে সর্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় [পরজন্মে] সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের বুদ্ধিতে যাহা উপাদেয় (acceptable) বলিয়া ধারণা থাকে, সে যে-অবস্থায় যেভাবেই থাকুক না কেন, সে সেই অবস্থায় সেই বস্তুর চিন্তা করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িলেও সেই প্রেয় বস্তুর দিকে মনের একটা ঝোঁক থাকে; তাহার ফলে দেহত্যাগের সময় তাহার সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং সারাজীবন ধরিয়া কেহ যদি ঈশ্বরকেই নিজের প্রেয় (শ্রেয় তো বটেই) বলিয়া ভাবিয়া থাকে, মৃত্যুকালে তাহার ঈশ্বরচিন্তাই হয়। তখন কী হয়? পূর্বে পঞ্চম শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। মৃত্যুকালে মানুষের নূতন কোন স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না। মন্ত্রজপের উদ্দেশ্যও তাহাই।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥৭॥

শ্লোকার্থ ঃ *সুতরাং সর্বদা তুমি আমাকেই চিন্তা করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য যুদ্ধাদি স্বধর্ম অনুষ্ঠান কর। আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত হইলে নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।*

ব্যাখ্যা ঃ তোমার পূর্বকর্মফলে তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ। তোমার কর্তব্যে অবহেলা করিলে তোমার অতীত কর্ম ক্ষয় হইবে না। বরং যুদ্ধে দুষ্টের দমন না করিলে সমাজের অ-হিত হইবে, তাহাতে তোমার (ক্ষত্রিয়ের) পাপ হইবার সম্ভাবনা। আর যুদ্ধ তো বাহিরের কাজ। যদি মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ, ভগবানের চিন্তা করা তোমার নিশ্চিত ধারণা হইয়া থাকে, তবে বড় মানুষের বাড়ির দাসীর মতো তোমার কর্তব্য সুসম্পাদিত কর। এবং যদি মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমায় পাইবে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। আমরা যতদিন না কর্মত্যাগ (বাসনাত্যাগ) করিয়া থাকিতে পারি, ততদিন গুরুর আদেশে কর্ম করিব এবং সকল সময়েই চেষ্টা করিব যাহাতে ইষ্টে মন থাকে। যে-কর্ম করিব তাহা সুসম্পাদিত হইবার পর আর ফিরিয়াও দেখিব না বা কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিব না। যখন এইভাবে কর্মফল কমিতে কমিতে মন সকল সময়ে ঈশ্বরাভিমুখী হইবে, তখন আর কর্ম সাধারণ জীবের ন্যায় ফলপ্রসব করিবে না। [ক্রমশ]॥তেত্রিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

আজ হতে উদ্বোধন শতবর্ষ আগে

ভাদ্র ১৩১২
আগস্ট ১৯০৫

বুদ্ধগয়ায় বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।)

ইংরাজী ১৮৮৬ সাল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার গৃহী ভক্তেরা লালাবাবুর কাশীপুরস্থ বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, আর তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁহাকে তথায় রাখিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতেছেন। প্রত্যেকেই তাঁহার সেবায় দিবানিশি নিযুক্ত, ঠাকুর কিন্তু স্বামীজির সেবা গ্রহণ করিতে পারেন না। বিবেকানন্দ সেবা করিতে গেলে তাঁহাকে নিবারণ করেন, বলেন, তোর অন্য পথ। ঠাকুরের কোন কথা মানিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলে ঠাকুর বলেন, "তোর ও পথ নয়, তুই সব দেখেশুনে বুঝেনে।"... পরমহংসদেব তাঁহাকে সন্ন্যাসী গুরুভাইগণের নেতা করিয়াছেন।... ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হইল। স্বামীজির নিজের তীব্র বৈরাগ্য যেন বুদ্ধদেবের তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাঁহার প্রাণে প্রবল বাসনা হইল, বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখিবেন।...

কিন্তু গুরুদেবের সেবা স্বহস্তে না করিলেও সমস্ত ভার যখন তাঁহারই উপর, তখন কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবেন?... এই চিন্তায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।... ক্রমে তাঁহার চিন্তা নিবৃত্ত হইয়া আসিল, গুরুদেবের উপর অচল বিশ্বাস —তিনি দেখিলেন, যাঁহার জন্য এত চিন্তা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান্, বিবেকানন্দ নিজেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন। স্বামীজি বুদ্ধগয়া গমনে স্থিরনিশ্চয় হইলেন।...

চৈত্রমাস, একদিন বৈকালবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় শিবানন্দ এবং অভেদানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ বাগানের পশ্চাদ্ভাগের ছোটদ্বার দিয়া গোপনে বাহির হইলেন। পদব্রজে তিনজনে আলমবাজারের ঘাটে আসিয়া নৌকা করিয়া অপর পারে উঠিয়া বালি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনুসন্ধানে জানিলেন, গয়া যাইবার সুবিধামত গাড়ী পরদিন প্রাতঃকালে পাইবেন। সেরাত্রি নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তিনটার সময় সকলকে উঠাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া পুনরায় ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলেন। রাত্রি বারটার সময় বাঁকিপুরে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দোকানে বিশ্রাম করিয়া প্রত্যুষে গয়ার গাড়ীতে উঠিলেন। কাশীপুর বাগান ত্যাগ করিয়া অবধি বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেব, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, তাঁহার ঘোরতর কঠোর সাধনা, অবশেষে বহুজন্মদুর্লভ বোধি জ্ঞান বা নির্ব্বাণলাভ—এই সকল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না।

বেলা এগারটার সময় গয়ায় পঁহুছিয়া স্বামীজি বলিলেন, "চল্, ফল্গুতে স্নান করা যাক্।"... স্নান করিতে করিতে বিবেকানন্দ আবার বলিলেন, "আয়, রামচন্দ্র যেমন বালির পিণ্ডি দিয়েছিলেন, আমরাও তেমনি বালির পিণ্ডি দিই।"... একটু বিশ্রামের পর বৈকালে বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন; প্রায় চারি ক্রোশ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর তথায় উপস্থিত হইলেন ও রাত্রে আহারান্তে ধরমশালায় যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বোধি মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। ললিতবিস্তর ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ স্বামীজির বিশেষরূপ পড়া ছিল। সেই সকল গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সাধনাবস্থায় তাঁহার যে-রূপ প্রগাঢ় সত্যপিপাসা ইত্যাদি ভাবের উদ্রেকের কথা বিবৃত আছে, বোধি মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিবেকানন্দের স্মৃতিতে সেই সকল ভাব যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গিগণের মনে হইল, যেন তাঁহারা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লোক; সকলেই বুদ্ধদেবের ভাবে একেবারে বিভোর হইলেন।

মন্দিরের প্রথমতলে উচ্চ প্রস্তরময় আসনের উপর বুদ্ধদেবের যে ধ্যানমূর্ত্তি স্থাপিত, তাহার সম্মুখে বিবেকানন্দ দুই গুরুভ্রাতার সঙ্গে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধ্যানের পর উঠিয়া আগত মোহান্ত মহারাজের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। স্বামীজির সহিত আলাপে মোহান্ত মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনারা যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকুন। ভোজনাদি মঠে যাইয়াও করিতে পারেন বা অনুমতি হইলে এখানেও পাঠাইয়া দিতে পারি।" স্বামীজি বলিলেন, "আমরা মঠে যাইয়াই ভোজন করিয়া আসিব।" আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনজনে বোধি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যাহা যাহা দেখিবার আছে সমস্ত দেখিলেন। মঠ ও অন্যান্য স্থানও দেখিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন বোধি মন্দির একেবারে জনশূন্য ও নিস্তব্ধ হইল, তখন বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া বোধিদ্রুমের নীচে প্রস্তরনির্ম্মিত আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর হঠাৎ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া পার্শ্বস্থিত গুরুভ্রাতাকে দুই হস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। গুরুভ্রাতা চমকিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় তিনি পুনরায় গভীর ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বিরত হইলেন।

তিন দিবস এই প্রকারে বোধি মন্দিরে বাস করিবার পরে একদিন স্বামীজি ফল্গুর পূর্ব্ব ধারে মোহান্তের যে শাখা মঠ আছে, তাহা দেখিতে যান এবং তথায় সেই রাত্রি অবস্থিতি করিয়া পরদিন পুনরায় বোধি মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন যে, পীড়িত গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন, এজন্য কাশীপুরে সকলেই তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিবেন। এজন্য এখন তাঁহাদের কলিকাতায় যাওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছেন। স্বামীজির যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্তর করিলেন, তবে চল, হাঁটিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক্, কত নূতন নূতন দৃশ্য দেখা হবে, নানা রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়া হবে, অনেক জ্ঞান জন্মাবে। কিন্তু আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, পদব্রজে যাইলে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, তাহাতে সকলের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িবে। এজন্য সকলে ট্রেনে করিয়াই কলিকাতা ফিরিলেন। কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হইয়া গুরুচরণে প্রণিপাত করিলেন, গুরুদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না; গুরুভ্রাতাগণও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

আধুনিক সভ্যতায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের একাধিপত্যের ফলে উদ্ভূত কুফলগুলিকে দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সৌভাগ্য-বশত, এই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বাধা পেতে আরম্ভ করেছে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের কাছ থেকেই, যার একটি দৃষ্টান্ত আগেই উল্লেখ করেছি। এই একাধিপত্য শুধু যে শিক্ষাব্যবস্থাকেই প্রভাবিত ও আহত করেছে তা-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প—এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে গোটা সমাজটাকেই ক্লিষ্ট করেছে। এই কুপ্রভাবের একটি দিক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমেরিকার ওরিগন স্টেটের কে. জি. ডব্লিউ. রেডিও, পোর্টল্যাণ্ডের একটি দু-ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে। তারিখটি ছিল ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৯, শুক্রবার। পোর্টল্যাণ্ডে আমাদের একটি বেদান্ত সোসাইটি আছে, যার (তৎকালীন) অধ্যক্ষ (ছিলেন) স্বামী অশেষানন্দ। তাঁর অতিথি হয়ে ওখানে এক সপ্তাহ থাকাকালে তিনি আমার জন্য আশপাশে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল রেডিও স্টেশনে কুড়ি মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান। কিন্তু সাক্ষাৎকারটি চলল পুরো দুঘণ্টা ধরে—রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত—কারণ, যেমন যেমন সাক্ষাৎকার চলছিল, তেমন তেমন যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন—মিস্টার ফেনউইক—তিনি আলোচনার বিষয়বস্তুতে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ছিলেন। এই মিঃ ফেনউইক একজন প্রাণচঞ্চল যুবক—যিনি সমস্ত ধর্মের সমালোচক, সব যোগী ও মহর্ষিদের প্রতি সন্দিগ্ধ, তবে সত্যের প্রতি গভীর প্রত্যয় ও অনুরাগসম্পন্ন; এবং কতকটা আক্রমণাত্মক, 'ড্রপ আউট' প্রকৃতির মানুষ। কেউ কেউ আমাকে আগেভাগে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল, ইত্যাদি। কিন্তু আমি বললাম, ওটা কোন সমস্যা হবে না, কারণ উনি মানুষটা সত্যানু-রাগী, সৎ এবং খোলামেলা—অন্য অনেক ড্রপ আউটের মতোই।

সাক্ষাৎকারের শুরুতে আমাকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে সমস্ত যোগী ও আধ্যাত্মিক গুরুর সঙ্গে যা করা হয়—বিশেষত তাঁরা ভারতীয় হলে—তা হলো, পরিচয়পর্বটা শুরু করা হয় হালকাভাবে। অতএব আমাকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে মিঃ এফ. বললেন : "এই যে, আমার সামনে হাজির হয়েছেন আরেকজন স্বামীজী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী)। ইনি হলেন অমুক, অমুক, অমুক।" কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা বদলে গেল, কারণ আমি চট করে বিষয়টিকে বদলে আধুনিক সভ্যতায় মানুষের সমস্যা ও অন্যান্য গুরুতর প্রসঙ্গে নিয়ে গেলাম। দেখলাম মিঃ এফ.ও পরিবর্তিত পরিবেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাইক্রোফোনে চিৎকার করে বলছেন : "ও, ইনি একজন নতুন ধরনের স্বামীজী। উনি কী বলছেন, শুনুন।" মুহূর্তের মধ্যে সব লঘুতা উবে গেল এবং তখন থেকে শেষ পর্যন্ত যেটা চলল, সেটা একটা আন্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাক্ষাৎকার মিনিটখানেক এগোলে আলোচনাপ্রসঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা বা আত্মসংযমের কথা বললাম। কিন্তু যেই সংযম বা 'ডিসিপ্লিন' শব্দটি উচ্চারণ করেছি, অমনি মিঃ এফ. আমাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন : "ওঃ স্বামীজী, আমরা এইসব ডিসিপ্লিনে বিশ্বাস করি না। সংযম দিয়ে হবেটা কী? আমরা বিশ্বাস করি স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায়। স্বাভাবিক থাকায়।"

ওঁর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে যে উচ্চকিত আত্মতুষ্টি ও দৃপ্ত বিজয়ীর ভাব ছিল, তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে ঐ উক্তির নেপথ্যে যে-ভাবনা কাজ করেছে, সেটা আন্দাজ করে বললাম : "মিঃ এফ., এই একটু আগে আপনি পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার-বাদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। আপনি বললেন, ওঁর বাজনা কী চমৎকার, কী স্বতঃস্ফূর্ত, কী স্বাভাবিক। তা বেশ তো; কিন্তু আপনি কি একবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন, ওঁর বাজনার ঐ স্বতঃস্ফূর্তি ও স্বাভাবিকত্বের পিছনে আছে বছরের পর বছরের কঠোর সংযম বা ডিসিপ্লিন? এদিকটা নিয়ে আদৌ কখনো ভেবেছেন কি?"

এইভাবে বলামাত্র মিঃ এফ. উত্তেজিত হয়ে প্রায় ফেটে পড়ার মতো করে মাইক্রোফোনে বললেন : "আরে, এটা তো একটা দারুণ আইডিয়া! জিনিসটা কখনো এভাবে ভাবিনি। ব্যাপারটা নতুন লাগছে। হ্যাঁ, এইভাবে দেখলে অবশ্য সংযমের গুরুত্বটা বুঝতে পারছি।" তারপর বিশেষভাবে শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বললেন : "আপনারা শুনুন, ভারতের এই প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর কী বলার আছে!"

এদিকে পূর্বনির্ধারিত ২০ মিনিট প্রায় শেষ হয়ে আসছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর আগ্রহ তখন ক্রমশ বাড়ছে। মধুর সম্ভাষণে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ক্লান্ত কিনা। আমি বললাম : "একেবারেই নয়; আপনি যতক্ষণ চাইবেন, আমি ততক্ষণই চালিয়ে যেতে রাজি।"

আলোচনা এগিয়ে নিয়ে বললাম : "দেখুন, আমিও স্বাভাবিকত্ব বা স্বতঃস্ফূর্তির কদর করি। মানুষের জীবন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমি এই স্বাভাবিকত্ব বা স্বতঃস্ফূর্তির দুটি পৃথক শ্রেণি বা স্তর লক্ষ্য করি; একটির অবস্থান সংযম বা ডিসিপ্লিনের নিচে, আরেকটির সংযমের ওপরে। জন্তুরা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক; গরু-ছাগলে যেখানে-সেখানে অপকর্ম করে বেড়ায়। ওটাও একরকমের 'স্বাভাবিকত্ব'। কিন্তু আমরা কি মানবশিশুকে শৌচাদির ব্যাপারে কিছুটা ডিসিপ্লিন বা সংযম শেখাই না? শিশুদের প্রথমে আমরা এই বিষয়ে শৃঙ্খলা শেখাই, পরে শেখাই অন্যান্য বিষয়েও। এই শেখানোটা প্রথমে হয় বাবা-মায়ের তরফ থেকে; পরে শিশু নিজেই নিজেকে শেখায়, যাতে সে মানুষের স্ব-ভাব অর্জন করে মানুষের মতো বেড়ে উঠতে পারে। আসলে, যেকোন সংস্কৃতিই হলো আবেগের সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ এবং এই সংস্কৃতি ব্যাপারটি কেবল মানুষের মধ্যেই আছে; পশুর কোন সংস্কৃতি হয় না। একদিকে এইরকম সুচিন্তিত শৃঙ্খলা, অন্যদিকে তাকে পরিচালনকারী যুক্তিবিচার ও সত্যানুরাগ—এরই সাহায্যে মানুষ তার নিজের মধ্য থেকেই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বভাবকে—প্রথমে মানবস্বভাব ও পরে দেবস্বভাবকে বিকশিত করে তোলে। এইভাবে সর্বপ্রকার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি যে জৈব স্তরে আবেগের অবাধিত প্রকাশের মতোই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, তা বোঝা যায় তখনি, যখন আমরা 'স্বভাব' ও 'স্বাভাবিক' শব্দদুটির অর্থের সুবিশাল ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অবহিত হই।"

দুধরনের মানুষ আছেন, যাঁদের কোন সংযমের দরকার হয় না এবং যাঁদের কোনরকম উদ্বেগ, উত্তেজনা বা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হয় না—এঁরা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই বলে বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি শ্রীমদ্ভাগবতের এই সুপরিচিত শ্লোকটির (৩।৭।১৭) উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

"যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥"

অর্থাৎ দুধরনের মানুষ (সংশয়জনিত) উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকতে এবং সুখী জীবন যাপন করতে পারেন—যথা, যে-ব্যক্তি মূঢ়তম (অর্থাৎ যাঁর মধ্যে 'মানুষ' হয়ে ওঠার সংগ্রামটা শুরুই হয়নি) এবং যিনি বুদ্ধির পরপারে চলে গেছেন (অর্থাৎ যিনি পাশবিক ও মানবিক—উভয় স্বভাবকেই অতিক্রম করে অনন্ত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন)। বাকি যাঁরা এই দুই স্তরের মধ্যে আছেন, তাঁরা নানাভাবে (উদ্বেগ ও সংশয়জনিত) ক্লেশ ভোগ করে চলেছেন।

উচ্চতম স্তরে—যেমন বুদ্ধ, যিশু, রামকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের স্তরে কোন উদ্বেগ বা সংগ্রাম নেই; সেখানে সবকিছুই পুনরায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত—যেমনটি কিনা ছিল একটি শিশুর স্তরে। কিন্তু এই দুই স্তরের স্বাভাবিকত্ব ও স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যে রয়েছে বিশাল এক ব্যবধান, যেটিকে অতিক্রম করতে হবে। আর সেই অতিক্রম করাটা হতে পারে অনায়াস ও আনন্দপূর্ণ। আসলে, এ হলো অস্তিত্ব ও বিকাশের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে মানসিক শক্তির ঊর্ধ্বায়ন। একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি; মানবীয় স্তরে এটিই বিবর্তনের রূপ—বলছেন বেদান্ত। বিশ শতকের জীববিদ্যা একে বলছে মানসিক-সামাজিক বিবর্তন, যেখানে মানুষের জৈব বিবর্তন আরোহণ করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রায়, ঠিক যেমন এককালে মহাজাগতিক মাত্রার প্রাকৃতিক বিবর্তন জীবকোষের মধ্যে এসে আরোহণ করেছিল জৈব মাত্রার ঊর্ধ্বায়িত স্তরে। এই সংগ্রাম এবং আদিম আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করার এই প্রক্রিয়াকে মানবসমাজ থেকে সরানোর চেষ্টার মানেই হলো মানুষকে আবার পশুর স্থবির অস্তিত্বের স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ কিন্তু তার নিজস্ব মানবদর্শনের ভ্রান্ত পরিচালনায় ঠিক এটাই করে চলেছে। ঐ দর্শন অনুযায়ী মানুষের দেহটাই শেষ কথা এবং জৈব পরিতৃপ্তিই পরম প্রাপ্তি—তার ওপর আর কিছু নেই। আর তাই আধুনিক মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ-সহ সবরকম শৃঙ্খলা বা সংযমের কথায় কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়, এবং সেই একই কারণে তার কাছে বিশাল জ্ঞান, প্রযুক্তিকৌশল, সম্পদ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে সে একদম ফাঁকা এবং সর্বপ্রকার উদ্বেগ, অপ্রাপ্তি ও অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে।

এসব কথা মিঃ এফ.-এর বেশ মনে ধরল। মানুষ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের চলতি, শৌখিন গোঁড়ামি ছেড়ে তিনি যেভাবে অতি দ্রুত মানবসত্তার গভীরতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক ঋষি-আবিষ্কৃত সত্য তত্ত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন, তাতে বোঝা গেল, মানুষটি যথার্থই উদার ও সত্যানুরাগী। এরপর তাঁর প্রতিটি প্রশ্নই হলো সুচিন্তিত এবং তিনি আর কেবল একজন সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী না থেকে হয়ে উঠলেন সমগ্র আলোচনার একজন প্রকৃত অংশগ্রহণকারী। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে তখনি চলে এল সত্যিকারের এক স্বাভাবিকত্ব ও স্বতঃস্ফূর্তি।

চিন্তাশীল মনের ওপর বিভিন্নভাবে স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত বেদান্ত-ভাবনা যে-প্রভাব ফেলেছে, এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। আসলে, বেদান্তকে পরিবেশন করতে হবে আধুনিক যুগের চিন্তা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। তাহলে আর কোন চিন্তাশীল মানুষ এতে 'না' বলতে পারবেন না। বেদান্ত এমন কোন দর্শন বা নীতিনিয়ম নয়, মানুষের সুখ-শৌখিনতা ধ্বংস করাতেই যার আনন্দ। এটি এমন একটি দর্শন, যা গড়ে তোলে—উইলিয়াম জেমসের ভাষায়—সুস্থ-সবল মানসিকতা। বেদান্ত 'ব্রহ্ম' নামের যে পারমার্থিক সত্যের কথা বলেন, তাঁর স্বরূপ হলো 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'; অর্থাৎ তিনি অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের সমাহৃত প্রকাশ। তিনিই মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। আর তাই 'ঈশ্বর'-এর সন্ধান শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'সত্য'-এর সন্ধান—যে-সন্ধান আদ্যন্ত আনন্দ দিয়ে গড়া। 'মানসিক শক্তি ও আবেগকে কেন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করব?'—এই প্রশ্নের বৈদান্তিক উত্তর হলো ঃ প্রথমত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হয়ে অন্তরের দৈব সম্ভাবনাকে অভিব্যক্ত করার জন্য; দ্বিতীয়ত, একটিমাত্র জীবনকালে প্রকৃতির ও 'বুদ্ধি' নামক প্রকৃতিদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহারটির সাহায্য নিয়ে 'আধ্যাত্মিক মুক্তি' নামক সেই অবস্থাটি লাভ করার জন্য, যেটিকে প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথে অর্জন করতে লেগে যাবে কোটি কোটি বছর।*

এই প্রসঙ্গে এসে যায় 'তপস্' শব্দটির কথা, যেটির তাৎপর্য কতকটা 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর কাছাকাছি। এই তাৎপর্য যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত ও পরিবেশিত হলে কোন চিন্তাশীল মানুষ এর বিরোধিতা করতে পারবেন না। শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্যে (দ্রঃ ৩।১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা থেকে এই শব্দটির একটি সুন্দর সংজ্ঞা উদ্ধার করেছেন ঃ

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে॥"

অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তিকে একাগ্র বা সংহত করার নামই তপস্। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (অর্থাৎ ন্যায়-নীতি ও সদাচারসমন্বিত বিভিন্ন পথের মধ্যে) এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুত, এটিই ধর্মের উচ্চতম রূপ।

এই সংজ্ঞাসূত্রে দেখা যাবে, প্রত্যেক মহান ভাবান্দোলনের, বিজ্ঞান বা কলাক্ষেত্রে প্রত্যেক সৃজনশীল কাজের, সব মহান সামাজিক প্রচেষ্টার ও আধ্যাত্মিক জীবনের নেপথ্যে থাকে এই 'তপস্'। এই যদি 'তপস্'-এর স্বরূপ হয়, তবে আর কে একে অস্বীকার করবে—একমাত্র তারা ছাড়া, যারা আটকে রয়েছে জৈব স্তরেই, বেদান্ত যাকে বলছেন 'সংসার'-এর স্তর—যেখানে অনেক শক্তি আছে, গতিও আছে; কিন্তু প্রগতি নেই। তাই বর্তমানে বেদান্তের এইসব পরীক্ষাযোগ্য ও পরীক্ষিত সত্যের প্রচার হওয়া দরকার যুক্তিসিদ্ধরূপে ও ব্যাবহারিক আঙ্গিকে; কেবল একগুচ্ছ করণীয় ও অ-করণীয়ের তালিকারূপে নয়।

[ক্রমশ]

* এই অনুচ্ছেদে এবং এর আগেও উল্লিখিত 'বিবর্তন' সম্বন্ধে জীববিদ্যা ও আর্য প্রজ্ঞার সমন্বয়ী আলোকে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বিস্তৃততর অনুপম বিশ্লেষণ তাঁর 'Science and Religion' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।—অনুবাদক

রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান

অরিন্দম দাস

> শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন অরিন্দম দাস। এবার ত্রয়োত্রিংশতম পর্যায়।—সম্পাদক

"এমন জায়গায় বাগান কিনো, যেখানে একশোটা খুন হলেও টের পাওয়া যায় না।"[১]

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যাঁর শ্রীমুখ থেকে একথাটি উচ্চারিত হয়েছিল, তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নির্জন স্থানের সন্ধান করতে বলেছিলেন মানুষ 'খুন' করতে নয়—মানুষের অন্তর্গত আসক্তি, আলস্য ও আমিত্বকে 'খুন' বা নাশ করে অখণ্ড মনোনিবেশে যাতে ঈশ্বরের চিন্তা করা যায় সেইজন্য।
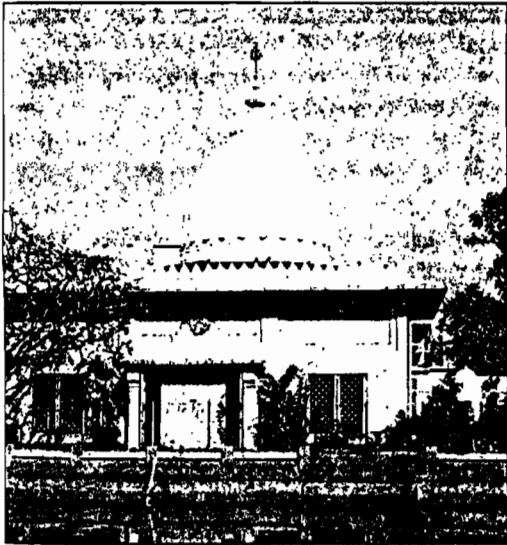
রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান

শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের একান্ত মনোবাসনা ছিল, একটি নির্জন সাধনক্ষেত্র রচনা করার—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দ এসে স্মরণ, মনন ও কীর্তন করবেন। তদুত্তরে উপরি উক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে পূর্ব কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্ত একটি উদ্যানবাটি ক্রয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এর নামকরণ করেন—'যোগোদ্যান'। সেবছর ২৬ ডিসেম্বর এই উদ্যানভূমিতে পদার্পণ করে তিনি বলেন ঃ "আহা! বাগানটি তো বেশ! এইরকম বাগানে যেন আছি, একদিন দেখেছিলাম।" উদ্যানের মধ্যস্থ পুকুরের দক্ষিণদিকে একটি ঘরে বসে ইতস্তত নিরীক্ষণ করে তিনি বলেন ঃ "দেখ, এই ঘরটি যেন ঠাকুরঘর বলিয়া বোধ হইতেছে।" তারপর ভক্তদের আনীত ফল-মিষ্টি গ্রহণের পর তিনি সামনের পুকুরের জল পান করেন, বলেন ঃ "পুকুরের জলটি তো বেশ মিষ্টি।" পুকুরের পূর্বদিকে তুলসীকাননে এসে তিনি প্রণাম করে মন্তব্য করেন, এটি ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র।[২]

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে দ্বিতীয়বার আসেন গলরোগের চিকিৎসার জন্য। রামচন্দ্র দত্তের ব্যবস্থাপনায় ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর কণ্ঠ পরীক্ষা করেন।[৩]

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে লীন হলে তাঁর দেহাবশেষের কিছুটা অংশ ২২ আগস্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে এখানে সমাহিত করা হয়। ঐবছরই শ্যামাপূজার দিন সমাধিস্থলের ওপর প্রাথমিকভাবে একটি মন্দির নির্মিত হয়। এর কয়েকদিন পর স্বামীজী এখানে এসে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীর অপ্রকট হলেও তিনি সূক্ষ্মশরীরে নিত্য বর্তমান। একথা স্মরণ করেই প্রতিবছর জন্মাষ্টমী তিথিতে রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের 'নিত্য আবির্ভাব উৎসব' পালন করতে থাকেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তাঁর দেহ-রক্ষার পর এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই মন্ত্রদীক্ষিত সন্ন্যাসী ও যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ যোগবিনোদ মহারাজ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীপদ বসুমল্লিক। তাঁর সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "যদি ঠাকুরের প্রকৃত ভক্ত দেখতে চাও তো কালীকে দেখ। কালী তার গুরু ভিন্ন আর কিছু জানে না, কায়মনোচিত্তে গুরুকে চিন্তা করতে করতে তার আকৃতি রামের মতো হয়েছে। কালীই ঠাকুরের ঘরের নৈষ্ঠিক গুরুভক্ত। ওরকম গুরুভক্ত কমই আছে।"[৪] প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে শ্রীমন্দিরের সামনে পাকা নাটমন্দির নির্মিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে)। নবনির্মিত নাটমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে যোগবিনোদ মহারাজ আমন্ত্রণ জানান শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি' শ্রীমা সারদাদেবীকে।

শ্রীশ্রীমা নির্দিষ্ট দিনে যোগোদ্যানে এসে বেদির ওপর স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পূজা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নিত্য আবির্ভাব উৎসব'-এ যেন নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। তাঁর সেই অপার্থিব ভাব ও ভক্তি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত মনোমোহন মিত্রের মনে হয় ঃ "শ্রীশ্রীমা কৈলাসের ভগবতী-রূপে সাক্ষাৎ মহাদেবের পূজা করিতেছেন। আর আমরা ভাবে প্রেমে আত্মহারা হইয়া সেই পূজা দেখিতেছি। শ্রীশ্রীমায়ের নিবেদনকালীন আর্তির কথা কি আর বলিব, আমরা সকলে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।"[৫] শ্রীশ্রীমা সমস্ত দিন এখানে কাটিয়ে ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করে ফিরে যান কলকাতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে।

শ্রীশ্রীমা এখানে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন যোগবিনোদ মহারাজের আমন্ত্রণে ১৩১১ বঙ্গাব্দের (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের)

জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নিত্য আবির্ভাব উৎসব' উপলক্ষ্যে।[৬] শ্রীশ্রীমা তখন অবস্থান করছিলেন ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটে 'নীলমণি শান্তিধাম'-এ। আশুতোষ মিত্র লিখেছেন : "একদিন প্রাতে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদ আসিয়া আমাদের নিকট শ্রীমাকে প্রণাম করিবার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা তাঁহাকে উপরে লইয়া যাই। উপরে গিয়া তিনি শ্রীমাকে জন্মাষ্টমীর উৎসবে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি লয়েন। অতএব জন্মাষ্টমীর দিনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের গাড়িতে শ্রীমা, লক্ষ্মী-দিদি, গোলাপ-মা, নলিনী এবং রাধুকে লইয়া যাই।"[৭]

শৈলবালা চৌধুরী তাঁর মাতৃস্মৃতিতে যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন-দৃশ্যটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি কোন তারিখ উল্লেখ করেননি, যদিও জানিয়েছেন ঐবছর (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে মায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমরা ধরে নিতে পারি, ঐবছরের উৎসবেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপম স্মৃতিচারণ : "ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিন সেজদিদি ও আমি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়াছি। তথায় গিয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা আসিবেন বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। ঠাকুরঘরের নিকট তাঁহার বসিবার জন্য একটি স্থান ভাল করিয়া ঘেরা হইয়াছে। মা আসিবেন, তাঁহার দর্শন পাইব ভাবিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইতেছে। মা আসিলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাস্তায় নতুন কাপড় পাতা হইল, শাঁখ বাজিতে লাগিল। সেই কাপড়ের উপর দিয়া মা আসিলেন, সঙ্গে লক্ষ্মী-দিদি। মাকে দেখিবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে সেইদিকে গেলাম। দেখিলাম, মা ধীরভাবে আসিতেছেন, তাঁহার দর্শন করিতে সেইদিকে গেলাম। মধ্য হইতে আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'এসেছ মা?' অনেক লোকের ভিড় হইল; আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, ঘাড় নাড়িলাম মাত্র। সেজদিদি পুত্রশোকে বড় কাতর ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি মাকে কখনো দেখিনি, তুমি মাকে বলো যেন আমায় কৃপা করেন।' বহু লোকের ভিড়ের ভিতর আমি মাকে বলিবার সুযোগ পাইতেছিলাম না। একটু ফাঁকা হইলেই মাকে বলিলাম, 'মা, এই আমার জা।' এই কথা বলিতেই মা সস্নেহে বলিলেন, 'সব জানি, মা।' আমার আর কোন কথা মাকে বলা হইল না।"[৮]

যাঁর নিত্য প্রকাশ স্মরণে এই উৎসব—সেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই অনুপম মাতৃপ্রতিমার মধ্য দিয়ে নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে যোগভূমি যোগোদ্যানে পরিব্যাপ্ত আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গকে নতুন গতি দান করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুই বিখ্যাত পার্ষদ গিরিশচন্দ্র ও শ্রীম উৎসবে উপস্থিত থেকে অবগাহন করলেন সেই আনন্দপ্রবাহে। একের পর এক সঙ্কীর্তন-দল এসে কীর্তনের সুমধুর সুরে ভাসিয়ে দিল মঠ-প্রাঙ্গণ। শ্রীশ্রীমা একভাবে বসে থেকে প্রণাম গ্রহণ করতে লাগলেন শত শত ভক্তের। ভাদ্র মাসের গরমে গায়ে চাপা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে প্রণাম নেওয়ায় তাঁর কষ্টই হয়েছিল সেদিন, কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সবকিছু হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী গোলাপ-মা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে। আশুতোষ মিত্র লিখছেন : "মাঝে মাঝে গোলাপ-মা আসিয়া বলেন, 'মাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।' আমরা যোগবিনোদকে বলায় তিনি ছাড়তে চাহেন না। এইপ্রকার অনেক বলার পর যখন ছাড়িলেন, তখন অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টা।
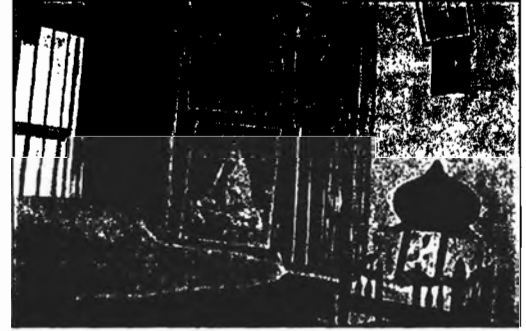
যোগোদ্যান-এ শ্রীশ্রীমায়ের ঘর ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

"বাটিতে ফিরিয়া গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী-দিদির নিকট শুনা যায়, শ্রীমার সেখানে বড়ই কষ্ট হইয়াছে—সারাদিন ধরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া থাকিতে হয়, হুদো হুদো লোক প্রণাম করিতে আসিতেছে, একটু বিরাম নাই। এই পচা গরমে তাঁহাকে কাঠের পুতুলের মতো একভাবে থাকিতে হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা কষ্ট তাঁহার হইয়াছে শ্রীঠাকুরের সমাধি (তিরোধানের পরে শ্রীঠাকুরের পূতাস্থি যেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, সেই স্থান) দেখিয়া।"[৯]

শ্রীশ্রীমা এখানে তৃতীয়বার পদার্পণ করেন যোগবিনোদ মহারাজের আমন্ত্রণে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৫ ভাদ্র (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট), শনিবার বিকালে। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ও আরো কয়েকটি গাড়িতে উদ্বোধন থেকে এখানে পৌঁছাতে তাঁর প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন যোগীন-মা, গোলাপ-মা, কয়েকজন আত্মীয় এবং স্বামী শান্তানন্দ-সহ দু-একজন সাধু। শান্তানন্দজী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন : "যোগোদ্যানে যোগবিনোদ স্বামী এবং আরো অনেক ভক্ত মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা ভক্তদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবৃতা থাকিলেও যোগবিনোদ স্বামীর নিকট ঘোমটা দিতেন না। প্রথমেই ঠাকুরঘরে যাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও প্রণামাদি সারিয়া মন্দির-সংলগ্ন বাগানখানি পরিদর্শনান্তে ঠাকুরঘরের পূর্বদিকস্থ দ্বিতল বাড়িটির উপরের ঘরটিতে বসিলেন। স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত ভক্ত মাকে প্রণাম করিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ ও বিশ্রাম করিয়া রাত সাড়ে ৭টায় উদ্বোধন বাটিতে ফিরিয়া আসেন।"[১০]

ঐবছর ২১ ভাদ্র (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর) জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'নিত্য আবির্ভাব উৎসব'

উপলক্ষ্যে এই পুণ্যভূমিতে চতুর্থ তথা শেষবারের মতো শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ঘটে। স্বামী শান্তানন্দ জানিয়েছেন, এদিন শ্রীশ্রীমা 'উদ্বোধন' থেকে বেলা সোয়া ২টা নাগাদ বেরিয়ে একঘণ্টা পর কাঁকুড়গাছিতে পৌঁছান। এদিনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন ও প্রণাম সেরে মন্দির-সন্নিহিত বাগানটি দেখে মন্দিরের পিছনের বাড়িটির দোতলার ঘরে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। "সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ায় আশ্রমের ভিতরের রাস্তাটিতে যেমন কাদা, তেমনি পিছল হইয়াছিল। মায়ের ঐরূপ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে হাঁটিতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া একজন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী সন্তান মাকে সাহায্য করিতে ধরিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা শশব্যস্তে উত্তর করিলেন, 'না, না, না, এমনিই যেতে পারব, ধরবার কোন দরকার নেই; এখানে কত লোকজন—ভক্তেরা রয়েছে, দেখলে কী মনে করবে?' মা ছিলেন সত্যই খুব লজ্জাশীলা; কোন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী সন্তানও হাত ধরিয়া সাহায্য করিবে—ইহাও তাঁহার মনোমত হইত না।"[১১]

দুর্গাপুরী দেবী 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, শ্রীশ্রীমায়ের 'আরোগ্যলাভের পর' রামচন্দ্র দত্তের দুই কন্যা বিষ্ণুবিলাসিনী ও বিষ্ণুমানিনী (তাঁর আরো একটি কন্যা ছিল—বিষ্ণুমোহিনী) তাঁকে আমন্ত্রণ জানান যোগোদ্যানে এসে প্রসাদ গ্রহণ করতে। শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "ঠাকুরের ওপর রামচন্দ্রের কী অটল বিশ্বাস ছিল। সেই সিংহের বাচ্চা তোমরা, যাব বৈকি মা। আমি যাব তোমাদের ওখানে। বেলুড়ের সন্তানদেরও নিমন্ত্রণ করো, রামলালদের করো, গৌরী-মাকে করো।...

"কাঁকুড়গাছি উদ্যানে মা যাইতেছেন—এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নির্ধারিত দিবসে অনেক ভক্ত নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া মা সকল ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিলেন, যাহাতে কিছু ত্রুটি না হয়। তাহার পর ঠাকুরের প্রতিকৃতির সমক্ষে নাটমন্দিরে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিশেষরূপে শোভিত একখানি আসন মাতা গ্রহণ করিলেন। সর্বপ্রথমে জনৈকা কন্যা শ্রীশ্রীসারদাস্তোত্রটি ('প্রকৃতিং পরমাম্') আবৃত্তি করিল। তৎপর গোলাপ-মা ঠাকুরের পুণ্যকথা আলোচনা করিলেন। লক্ষ্মী-দিদি এবং চপলা নাম্নী এক ভক্তিমতীর সুমধুর কীর্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পূজা ও ভোগরাগের পর মাতাঠাকুরানি এবং সমবেত মহিলাবৃন্দের মধ্যে গৌরী-মা প্রসাদ পরিবেশন করেন। রামচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের ভক্তি ও আন্তরিকতায় আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হইল মাতৃবন্দনা উৎসবটি।"[১২] শ্রীশ্রীমা কবে এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন, সেই তারিখটির উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে নেই। হতে পারে এটি তাঁর পূর্বোক্ত চারটি আগমনের কোন একটির সঙ্গে সম্পর্কিত। লক্ষণীয়, দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের 'আরোগ্যলাভের পর' তাঁকে রামচন্দ্র দত্তের দুই কন্যা নিমন্ত্রণ করেছিলেন—যদিও অন্য কারো স্মৃতিকথায় তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। স্বামী শান্তানন্দ তাঁর মাতৃস্মৃতিতে জানিয়েছেন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি তিনি 'মায়ের বাড়ি'তে এসে শোনেন, শ্রীশ্রীমায়ের পানিবসন্ত হয়েছে।[১৩] এর প্রায় দুই মাস পর ৩ ভাদ্র শ্রীশ্রীমা যোগোদ্যানে যান। সুতরাং দুর্গাপুরী দেবী প্রদত্ত বিবরণটি ৩ ভাদ্রের হতে পারে। কিন্তু এব্যাপারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, কারণ তাঁর ঐ বিবরণের সঙ্গে স্বামী শান্তানন্দের বিবরণে বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য আছে।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যোগোদ্যান-কর্তৃপক্ষ এই মঠের ভার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের হাতে তুলে দেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর বিগ্রহ এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মহাপীঠ'-এর পরিবর্তে বর্তমান নামকরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই উদ্যানটি ক্রয়ের বহু আগে মানসনেত্রে দেখেছিলেন, এখানে তিনি যেন রয়েছেন। বাস্তবিক, স্থূলশরীর অপ্রকটের পর তিনি আক্ষরিকভাবেই চিরকালের মতো এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে রইলেন এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির মতোই তাঁর সঙ্গে রয়ে গেলেন শ্রীমা সারদাদেবীও। একবিংশ শতাব্দীর কর্মকোলাহলময় কলকাতার বুকে অবস্থান করেও এমন শান্ত সুন্দর সাধনক্ষেত্র সত্যিই দুর্লভ। ❑

পথনির্দেশ ঃ ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান, ৭ যোগোদ্যান লেন, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪। সি. আই. টি. রোড ও মানিকতলা মেন রোড-এর সংযোগস্থল (কাঁকুড়গাছির মোড়) থেকে পূর্বদিকে মানিকতলা মেন রোড দিয়ে প্রায় ৪০০ গজের মতো এসে ডানদিকে যোগোদ্যান লেন ধরে আসা যায়। আবার ই. এম. বাইপাস থেকে মানিকতলা মেন রোড ধরে পশ্চিমদিকে এসে বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলে বামদিকে পড়বে যোগোদ্যান লেন। যাঁরা ফুলবাগানের দিক থেকে আসবেন, তাঁদের পক্ষে সি. আই. টি. রোডের ওপর কাঁকুড়গাছি পোস্ট অফিস (বা কাঠগোলা) স্টপেজে নেমে ডানদিকে রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ধরে আসা সুবিধাজনক। মন্দির খোলা থাকে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সকাল ৫টা থেকে ১১টা ৪৫, বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা এবং অক্টোবর থেকে মার্চ সকাল সাড়ে ৫টা থেকে ১১টা ৪৫, বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১৪০৩, পৃঃ ৩০৩
২ ভক্ত মনোমোহন, ১৩৫১, পৃঃ ১৬৫
৩ দ্রঃ পুণ্যভূমি যোগোদ্যান, রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, ২০০৫, পৃঃ ৮
৪ ঐ, পৃঃ ২৩
৫ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ২৫৮
৬ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪০১, পৃঃ ১৫৬
৭ শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ২য় খণ্ড, ১৪০৩, পৃঃ ২৯৭-২৯৮
৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১৪০৮, পৃঃ ২৯৮
৯ শ্রীমা, পৃঃ ২৯৮
১০ 'উদ্বোধন', ৫৫তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬০, পৃঃ ১৯৯ (স্মৃতিকথাটি 'মাতৃদর্শন'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।)
১১ ঐ, পৃঃ ২০০
১২ সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ২৩৫-২৩৬
১৩ 'উদ্বোধন', ঐ, পৃঃ ১৯৭

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শ ঃ একটি অভিনব ভাবান্দোলন

সঞ্জয় ভুঁইয়া*

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ,
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাক্ ভবেৎ ॥"

"বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তার সেবা— এর নাম কর্ম।"—স্বামী বিবেকানন্দ

'সেবাধর্ম' শব্দটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন কোন কথা নয়। সনাতন ভারতের মূল ভাষ্যটিই হলো ত্যাগ এবং সেবা। সেই হিসাবে সনাতন ধর্মের অনুগামী কিংবা এই মহান ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়ে পরবর্তী কালে যে যে ধর্মমত ভারতবর্ষের মানুষের জাতীয় আবেগে এক গভীরতর মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে, বলা চলে সেগুলির প্রায় সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছে এই অসাধারণ আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই। সেই হিসাবে দেখতে গেলে আধুনিককালে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-উদ্ঘাটিত সনাতন হিন্দুধর্মের যে সর্বাধুনিক রূপ, নিশ্চিতভাবে তারও মূল ভিত্তি ঐ সেবাধর্ম। তাহলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুসৃত সেবাধর্মের আদর্শ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত এই সেবাধর্মের আদর্শে স্পষ্টতই কিছু পার্থক্য আছে, যা সাম্প্রতিককালে সেটিকে এক অভিনব ভাবান্দোলনরূপে ধর্মজগতে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছে।

■ সেবা কি? ■

এসম্বন্ধে কোনকিছু আলোচনা করার আগে প্রথমেই যে-প্রশ্নটি অবধারিতভাবে উঠে আসে, তা হলো সেবা কি? শব্দটিকে সরাসরি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়—'সেবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'পরিচর্যা বা শুশ্রূষা'। সেই অনুসারে বিভিন্ন শাস্ত্রে সেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে (আত্ম-ইন্দ্রিয়ের চর্চা ব্যতিরেকে) কোন আর্ত, মুমূর্ষু, দরিদ্র অথবা কোন দেবতা-দ্বিজের, এমনকি কোন ইতর পশুপক্ষীরও পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সদা-সর্বদা নিজেকে কল্যাণকামী কর্মে নিয়োজিত রাখতে পারেন, তবে অবশ্যই সেটিকে সেবা অভিধায় ভূষিত করা যেতে পারে। শুধু সনাতন হিন্দুধর্মেই নয়, পরোপকার কর্মে বিশ্বাসী খ্রিস্টধর্ম, ভ্রাতৃভাবী ইসলামধর্মে কিংবা নানকপন্থী শিখ সম্প্রদায় বা সিন্ধীদের মধ্যেও দেখা যায়, তাঁরাও এই সেবারূপ কর্মটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে তাকে মানবজীবনের একটি অতি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে, মূলত ব্যক্তিচরিত্রের এই সুমহান দিকটির ওপরই নির্ভর করে রয়েছে গোটা মানবজাতির আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি।

■ সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ ■

যদি তা-ই হয় তবে সেক্ষেত্রে একজন সন্ন্যাসীর (অথবা সেই সৎ ব্যক্তি—যিনি সর্বতোভাবে অধ্যাত্মপথের পথিক) সঙ্গে এই সেবাধর্মের যোগাযোগ অত্যন্ত সুনিবিড়। একথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হয় না। কারণ, হিন্দুধর্ম-মতে—একজন সন্ন্যাসীর জন্মটিকে স্পষ্টতই বলা হয়েছে 'বহুজনহিতায়' ও 'বহুজনসুখায়'। অর্থাৎ প্রথমত, অন্যের হিত ও কল্যাণের জন্যই একজন সন্ন্যাসী তাঁর জীবনধারণ করবেন এবং এটিই তাঁর সাধন। সুতরাং সেই হিসাবে মানবিক অধিকারবোধের দিক থেকে আমাদের সকলেরই পরস্পর পরস্পরকে সেবার অধিকার থাকলেও একজন সন্ন্যাসীর সমাজকল্যাণের ধারণাটিকেই (স্পৃহাটিকে) ভারতীয় ভাব-সংস্কৃতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। অতএব ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধর্মের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকতর আলোচনা করা যায়। দেখা যায়, প্রচলিত ধারাগুলিকে বিভক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবার আদর্শটিকে এমন এক দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন, যা একইসঙ্গে যুগোপযোগী ও সর্বাঙ্গীণ। একটি যুগপ্রবর্তনকারী ভাবান্দোলন-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের বিশিষ্টতা ঠিক এখানেই। এব্যাপারে প্রখ্যাত গবেষক ডি. এস. শর্মা বলেছেন ঃ "Of all the religious movements that have sprung up in India in recent times, there is none so faithful to our past and so full of possibilities for the future, so rooted in our national conciousness and yet so universal in its outlook, as the movement connected with the names of Sri Ramakrishna Paramhamsa and his disciple, Swami Vivekananda. In a way, the true starting point of the present Hindu Renaissance may be said to be Sri Ramakrishna Paramhamsa."[১] তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সকলের কাছে প্রথমেই যা জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে, তা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধর্মের উৎসটি কোথায়? উত্তরে বলা যায়, সেটি স্পষ্টতই নিহিত রয়েছে মানুষের অধ্যাত্মজীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্র্যে। তার মধ্যে প্রথমটি হলো মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর-উপলব্ধির দিক এবং দ্বিতীয়টি হলো সেই উপলব্ধিরই শুদ্ধতম বহিঃপ্রকাশ বা তার ব্যাবহারিক দিক।

■ সাযুজ্য ও বিরোধাভাস ■

প্রথমেই উপলব্ধির কথায় আসা যাক। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম বা মানবধর্ম সম্পর্কে সনাতন ধর্মে এপর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের

* কলকাতা-নিবাসী নবীন প্রজন্মের সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাবন্ধিক।

প্রদর্শিত পথের কোন তফাৎ নেই। কারণ, 'ভগবৎ চেতনা' (God consciousness) তথা তত্ত্বানুভূতি হলো মানুষের জীবনের সেই সুদুর্লভ অবস্থা, যাকে হিন্দুশাস্ত্রে বরাবরই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং সেই পরম্পরাগত ধারণা অনুসারে পরমাত্মা ও জীবাত্মা, ঈশ্বর ও মানুষ, জীব ও জগৎ প্রকৃত অর্থে যে পরস্পর এক এবং অভিন্ন—এই একত্বের (oneness) ধারণাটিই হলো সর্বযুগে ও সর্বকালে সেবাধর্মের মূলকথা। সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেব্য ও সেবকের মধ্যে কোন ভেদের প্রশ্ন নেই। অতএব সেই সূত্র ধরে এগোলে আধুনিককালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও যে মানবসেবার উৎস নির্ধারণ করতে গিয়ে তার পূর্বশর্ত হিসাবে ঐ ঈশ্বরপ্রণিধান তথা মানুষে মানুষে সমতার বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন, তার মধ্যে কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর এই অভিনব প্রয়াস এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াটিকে কেন্দ্র করে প্রশ্নটি উঠেই এসেছিল। স্মরণে রাখা যেতে পারে, সেটি ছিল উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের দিক। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মনের আলোয় তখন সেবার অর্থটি কিন্তু সেব্যের কাছে শুধুই কিছু বাহ্য সাহায্যের যোগানমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তার ওপর কেশব সেন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণির মানুষেরাও সমাজ-সংস্কারের নেশায় সমস্ত জাতিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের উন্নতির কথাটি ভাবা হয়েছিল আত্মোন্নতির বিষয়টিকে বাদ রেখেই। কাজেই সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তা হলো, বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের ঘোরতর এক বিরোধাভাস যা সমাজের সকল মানুষকেই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেটি এইরকম ঃ আগে সামাজিক উন্নতির পথটি ধরে পরে আত্মোপলব্ধি, নাকি আত্মোপলব্ধির পথটি ধরে তবে সামাজিক উন্নতি? বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় পক্ষের দাবির ভিত্তিটি ছিল অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত আদর্শ, যা সমাজের সেই গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতরেও একটু একটু করে আলোর রেখা হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাছাড়া শুধু পক্ষাপক্ষের প্রশ্ন বলেও নয়, 'কথামৃত'-এর বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও একজন অন্তর্দ্রষ্টা ঋষির মতোই তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ থেকে বিদ্যাসাগর এবং কেশব সেনকে এব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যা পরবর্তী কালে ভাবগত দিক দিয়ে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তাকে বারেবারে সঠিক বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। এব্যাপারে প্রয়াত অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে সেই কথাটিই আরো সুন্দরভাবে আমাদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, যেখানে একজন সন্ন্যাসীর সমাজচিন্তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ "It must be recognized that a saintly person while not seeming to do anything utilitarian for society is actually fulfilling the highest social responsibility by igniting a moral conscience. Through precept and example he is changing indivisuals and therefore society. Every act of truth is also an act of service." অর্থাৎ সাধুসন্তেরা আপাতদৃষ্টিতে সংসারের উপকারী কোন কাজ করছেন না বলে মনে হলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজটিই করছেন মানুষের নৈতিক চেতনাকে উদ্দীপিত করে। উপদেশ দিয়ে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতিটি সৎকর্ম সেবাকর্মও বটে।[২] সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দেখলে একজন 'প্রজ্ঞাবান' মানুষের ক্ষেত্রে আগে অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে পরে সামাজিক স্তরে অবতরণের বিষয়টি নিশ্চয়ই কখনো দোষের কারণ নয়! ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, সমসাময়িক কালের আর পাঁচটা সামাজিক আন্দোলনের তুলনায় তাই এটি ছিল সত্যই একটি বৃহৎ মাপের এবং অতিবিরল এক ঘটনা। কারণ, ঠিক যেমনভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নানক, চৈতন্যও একসময়ে সমাজে একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের সূচনা করতে গিয়ে সবার আগে এই ঈশ্বর-অনুভূতির বিষয়টিকেই সর্বাধিক মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবে এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণও সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে সেই বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এবং তাদের শুদ্ধচৈতন্যের স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিলেন।

■ প্রচলিত ধারার বিপরীতে ■

প্রচলিত ধারার তথাকথিত সমাজসেবার বিপরীতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মতাদর্শটি যে ক্রমেই একটি গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল—এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে দেখা যায়, সেবার সর্বময় রূপটি শুধু বাহ্য পরিষেবার মধ্যে আটকে না থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে আধ্যাত্মিক স্তরে প্রভাবিত করেছিল। এখানে তাঁর মুখনিঃসৃত এরকমই কয়েকটি অসাধারণ উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা তাঁর ভাবতন্ময়তা থেকে উৎসারিত হয়ে যথার্থভাবেই মানুষের কল্যাণের পথটি প্রশস্ত করে তুলেছিল। যেমন, তিনি যখন একজন 'জগদ্‌গুরু'-রূপে 'জীবে দয়া', 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কিংবা 'চৈতন্য হোক' ইত্যাদি সর্বোচ্চ মূল্যের বাক্যগুলিকে উপদেশরূপে সর্বসাধারণের উদ্দেশে প্রয়োগ করেছেন, তখন বেদবাক্যের মতোই সেই কথাগুলির মূল্য ছিল অপরিসীম, যা একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণারূপে তাদের জনহিতকর কর্মেও সমানভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছিল। কারণ, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখে থাকি সেবারূপ কর্মটিকে ঠিক ঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য যে যে মানবীয় গুণগুলি থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন অর্থাৎ দয়া, মায়া, ক্ষমা, প্রেম, সহানুভূতি ও তপস্যা, সেসব আসে ঐ হার্দিক মূল্যবোধ থেকেই। কাজেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী যিনি হবেন, তিনি সাধারণ মানবিক প্রবণতা থেকে কোন্ বিষয়টিকে আগে গুরুত্ব প্রদান করবেন? প্রথমেই

বাহ্য সেবার কাজে সরাসরি নিজেকে নিয়োগ করা, নাকি সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ভালভাবে অনুধাবন করে নিয়ে তবেই নিজেকে সেই লোকহিতৈষণার স্তরে নামিয়ে আনা? অবশ্য তার মানে এটি মনে করে নেওয়া ঠিক নয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শটি শুধুই তত্ত্বকথা এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। যেটি আমরা ঔপনিষদিক যুগ এবং তার পরবর্তী সময়েও দেখে থাকি এবং এটিই ছিল তৎকালীন সময়ে অন্তর্মুখী ধর্মচর্চার একটি আপত্তিকর রূপ। বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব, রামানুজের ভক্তিবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ আদর্শগত দিক দিয়ে খুব উচ্চমার্গের কথা বলে গেলেও মনে রাখা দরকার, সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষার স্বার্থে তার কোন ফলিত বাস্তবানুগ রূপ কিন্তু তখনো পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে আসেনি। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠেয় সেবাধর্মের কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম সেবার ব্যাবহারিক দিকটি কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা গেলেও সেখানে আবার অন্যকে দয়া করার মতো মানসিকতাকে কেন্দ্র করে সেব্য এবং সেবকের মধ্যে স্পষ্টতই কিছু শ্রেণিবিভাজনও লক্ষ্য করা যেত—যেটি সর্বতোভাবেই ছিল সেবাধর্মের আদর্শের বিরোধী। যে-কারণে পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাধর্মের আদর্শটিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সমাজের এই অসামঞ্জস্যটির ওপরই যেন সবার আগে আলোকপাত করেছেন। একদা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত এই ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেছে: "দয়া নয়, দয়া নয়; শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" আর সহৃদয় মানবপ্রেমী মাত্রই অবগত আছেন, এক্ষেত্রে দয়া ও সেবার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে সেই অসাধারণ বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, যার কোন পূর্বাপর দৃষ্টান্ত অন্তত এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই। (কারণ, এটি আজ নানাভাবে আলোচিত যে, দয়া করা হয় সমাজের উচ্চাসনে বসে, তাতে মানুষকে করুণা করার বিষয়টি যেন একটু হীনার্থেই প্রকাশ পেয়ে থাকে; কিন্তু সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেটি হওয়া উচিত অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষকে পূজা করে ভগবৎকৃপা লাভ করা, সেটি কখনো পূর্ণ হয় না। কাজেই সেই অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম-অনুসৃত দয়া শব্দ তথা সেবার শুধু নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়টির বিরোধিতা করেছেন বলে বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ তিনি এই দয়াকে যে খুব উচ্চাসন প্রদান করেছিলেন—এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সত্যিকারের দয়ার উৎসই হলো ঈশ্বরপ্রেম।) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্মতর মাপকাঠি থেকে বিচার করে দেখলেও বলা চলে, সেখানে প্রচলিত ধারার অন্যান্য ধর্মের সেবা আন্দোলনের বিস্তৃতিকে ছাপিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানবসেবার বিষয়টি এমনই এক অপূর্ব ব্রহ্মময় স্তরে উন্নীত হয়েছিল, যেখানে ঐ মানুষ এবং তার সামাজিক মর্যাদাবোধকে যতটা গুরুত্ব প্রদান করে দেখা হয়েছিল, অন্য কোন কিছুকেই যেন ঠিক ততটা নয়। আর মানবাত্মার যথার্থ উন্নতি সম্পর্কে এই সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের সেই দ্বিতীয় প্রধান অংশ অর্থাৎ তার ব্যাবহারিক দিক, যা আমাদের দেশের ধর্মের ইতিহাসে আজও এক ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে এবং সেটি পাশাপাশি একটি গণমুখী মানবধর্মরূপেও সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের দোষত্রুটিগুলিকে ব্যাপক আকারে চিনে নিতে সাহায্য করেছে। সেই সমন্বয়ী ভাবাদর্শের কার্যকরী দিকটি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

■ যোগসমন্বয় ও আদর্শের রূপায়ণ ■

যেহেতু সেই প্রথম দেশে একটু স্বতন্ত্রভাবেই সেবাধর্মের একটি বাস্তবধর্মী এবং কার্যে রূপান্তরিত রূপ ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত হতে চলেছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তার আবেদন এবং প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল অপরিসীম। সেখানে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম অর্থাৎ ধর্মজীবনের চারটি প্রধান ভাবের বিরল সমন্বয়ে মানুষের ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে সেই অপূর্ব মেলবন্ধনটি হতে দেখা গিয়েছিল। এই মনুষ্যদেহেই রয়েছে সেই 'পরমাত্মা'র নিবাস—এটি গভীরভাবে অনুধাবন করাই জ্ঞান, পাশাপাশি 'রাজযোগ' সহায়ে সেই 'আত্মরূপী নারায়ণ'-এর প্রণিধান করা, 'ভক্তিযোগ' সহায়ে সেই 'পরমেশ্বর'-এ অনুরক্ত হওয়া ও সর্বশেষে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ মনে নিঃস্বার্থ কর্মে তাঁর সেবা করে মুক্তিলাভ করা—এই যোগচতুষ্টয়ের মধ্য দিয়ে পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শটিকেই এত সুন্দর এবং সঙ্ঘবদ্ধ আকারে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন, যার ফলে সেবারূপ কর্মটি নিঃসন্দেহে সমাজে ধর্মজীবনযাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এতে দুরকমভাবেই আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটা সম্ভব। প্রথমত, নিজের মুক্তিলাভ এবং সেইসঙ্গে গোটা জগতেরও কল্যাণ—সংক্ষেপে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। এই প্রসঙ্গে যদি ঐ বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ছাড়াও তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য সেবাধর্মের আদর্শটিকেও এখানে পাশাপাশি রেখে তুলনা করি, তবে দেখতে পাব সেখানে এই 'আত্মনো মোক্ষার্থং' বিষয়টির প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা গেলেও 'জগদ্ধিতায় চ'-এর ভাবটি কিন্তু সমাজে প্রাধান্যলাভ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আগমনের পর থেকেই। আর এটিই ছিল লোকসমাজে তাঁদের জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ। সন্দেহ নেই, এই অসামান্য মনোভাব এবং তার সূত্র ধরে মানবসেবার বিষয়টি তৎকালীন সময়েই ছিল গণতান্ত্রিক এবং বহুমুখী। কারণ শুধু সেবাকাজের বিষয় বলে নয়, সেই সূত্র ধরে সমাজ-সংস্কারের প্রশ্নটিও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমত জাতিভেদপ্রথা, দ্বিতীয়ত অস্পৃশ্যতা, তৃতীয়ত বিভিন্ন ধর্মমতের যে একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণতা মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ককে পদে পদে ব্যাহত

করে—সেই আপাত বৈষম্যের সমাধানরূপেও এই যোগসমন্বয়ী সেবাধর্মের বিকল্প কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে এখানে এমন দুটি উদাহরণ টেনে আনা যেতে পারে, যেগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই একসময় আমাদের দেশের ইতিহাসে নিজেদের উপযুক্ত জায়গা করে নিয়েছিল। প্রথমটি হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দরিদ্রনারায়ণ সেবার আদর্শ ও দ্বিতীয়টি মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন। আর সেই সূত্রে মননশীল মানুষ মাত্রেই অবগত আছেন, আজকের দিনে তাঁরা যেটিকে যুগধর্ম বলে উল্লেখ করে থাকেন সেই যুক্তিমনস্কতা ও মানবতাবাদের গোড়ার কথাটিও কিন্তু এই বহুমুখী সেবাধর্মের আদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়, যেহেতু চরিত্রগত দিক দিয়েও এটি সর্বাংশেই নিঃস্বার্থ এবং অসাম্প্রদায়িক।

■ বাস্তবতা এবং আরো গভীরতর লক্ষ্যে ■

ইতিহাস বলছে অপ্রকট হওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অভিনব ভাবাদর্শটি আরো ব্যাপকভাবে গোটা মানবসমাজের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা করেছিল দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে। প্রথমত, স্বামীজীর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল সেই সূত্রটির ভাষ্য (interpritation) এবং শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল সেই ভাষ্যটিরই কার্যে রূপান্তরিত রূপ (practical demonstration)। তাঁদের দুজনের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের সুশিক্ষিত মানবসমাজ সেবার সংজ্ঞাটিকে এক নতুন অর্থে গ্রহণ করতে শিখেছিল। শিখেছিল আধুনিককালে শুধু এই সেবাধর্মের ওপর ভিত্তি করেই ধর্মজীবনের যেটি চরম লক্ষ্য অর্থাৎ 'আত্মমুক্তি' তথা 'ভগবানলাভ', তা করা সম্ভব হবে যদি সেবাধর্মের অন্তর্নিহিত 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই তত্ত্বটিকে আপন করে নেওয়া যায়। কারণ, আধুনিক সমাজতত্ত্বও বলে সেবা সেবারূপে সার্থক হয় তখনি, যখন তা ব্যক্তিগত জীবনে উৎকর্ষসাধনের পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণেও কাজে আসে। যদি তা না হয়, তবে সেক্ষেত্রে স্পষ্টতই সেবার মূল উদ্দেশ্যটিই যেন কিছুটা খর্ব হয়ে পড়ে। সে-কারণে পূর্ববর্তী সময়ে দেখা গিয়েছিল, সেবার সর্বোচ্চ আদর্শটি আমাদের অধিগত হওয়া সত্ত্বেও তার কোন ইতিবাচক প্রভাব আমাদের দেশের বৃহত্তর জনমানসের ওপর পড়েনি। বরং 'ব্যাবহারিক' ও 'পারমার্থিক' অবস্থার প্রভেদের ফলে সেগুলি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের থেকে যেন কিছুটা দূরেই থেকে গিয়েছিল। ফলে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে এমন কোন ধর্মীয় আন্দোলনও গড়ে ওঠেনি, যার ফলে সমাজের সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। কাজেই সেই হিসাবে দেখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই মানবসেবাবাদের বিষয়টি যেকোন অর্থেই তথাকথিত ধর্মজীবনের অনুপন্থী ছিল না—একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, যার আওতায় পূর্বে বর্ণিত সেবার সমস্ত শর্তই খুব গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এজন্য একজন বাস্তবধর্মী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'-এর মধ্য দিয়ে 'নরনারায়ণসেবা'র যে অভূতপূর্ব নীতিখানি গ্রহণ করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাই-সহ সমস্ত সমাজসেবীকে যে-কথাটি বারেবারে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শটি ঠিক ঠিকভাবে আত্মস্থ করে নিয়ে 'আমাদের প্রত্যেককে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করতে হবে' এবং বিরাটরূপী এই জগৎ অর্থাৎ সমষ্টির সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে হবে, তবে সাবধান! সেটি যেন কখনোই অন্যকে ছোট করে না হয়। এবং সেজন্য শুধু আগেকার দিনের কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মতাদর্শকে আঁকড়ে থাকলেই চলবে না, বরং সেবার যাবতীয় সম্ভাবনাকে আরো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ সেজন্য একদিক দিয়ে যেমন প্রথামতো সাধনভজন, জপতপ, যোগাভ্যাস ইত্যাদি করতে হবে; তেমনি আবার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঙ্ঘ স্থাপন, সম্প্রসারণ, ত্রাণকাজ ও সেবাশুশ্রূষাও সমানতালে চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ একটি আধুনিক ধর্মসঙ্ঘকে পরিচালনা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সন্ন্যাসী হিসাবে এসবকিছুই করতে হবে; তবে তার পিছনে যেন একটি লক্ষ্যই বর্তমান থাকে, তা হলো দেশের অজস্র দরিদ্ররূপী, আর্তরূপী, নিঃস্বরূপী নারায়ণের সেবা করা। নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের দেশে তাদের বরাবরই অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়েছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্বামীজী গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখে জানালেন : "আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১০২) আর সম্ভবত সেটিই হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রতি ঠিক ঠিকভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। (এজন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মূল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত দশ দফা নিয়মাবলি দ্রষ্টব্য।) ঠিক সেই কারণেই প্রথম প্রথম স্বামীজীকে তাঁর কোন কোন সতীর্থের কাছ থেকেই ভয়ানক বেগ পেতে হলেও ভবিষ্যতে কিন্তু দেখা গিয়েছিল, আধুনিককালে ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করতে গেলে এই সমাজধর্মী মানসিকতাকে আপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্ক যিনি ঠিক ঠিক অনুসরণ করে চলবেন, তিনি সন্ন্যাসীই হোন অথবা গৃহী—তাঁকে তাঁর স্বধর্ম পালনের আগেও কিন্তু ঐ 'সামাজিক প্রতিদান' (social contribution)-এর বিষয়টিকেই সবার আগে মাথায় রেখে এগোতে হবে এবং সেটির সুবাদে এটি কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলবে না যে, ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিলাভ করার আগেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের প্রতিও তার

একটি দায় আছে। সেই দায়টি হলো, স্বামীজীর ভাষায়, প্রথমে অন্নে, বস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় তাদের প্রত্যেককে একটি সম্মানজনক অবস্থায় তুলে আনা এবং তারপর সেই সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করে এঁদের ভিতরেও সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। সেটিই হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল লক্ষ্য এবং সেইসঙ্গে একটি জাতীয় লক্ষ্যও বটে। আর আজ ইতিহাসও এঘটনার সাক্ষী আছে যে, একসময় বহরমপুরের সারগাছি অঞ্চলের মহুলা গ্রামে স্বামী অখণ্ডানন্দের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম যে সংগঠিত সেবাকাজের সূত্রপাত রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছিল, সেটিই আজ ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে সারা বিশ্বব্যাপী এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সে-কারণে বারাণসী ও কনখল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারায় রীতিমতো উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো সমাজসেবী এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতো দার্শনিক উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ "ভগবান বুদ্ধের উদার আদর্শসমূহের পূর্ণতা যেমন সম্রাট অশোকের প্রজারঞ্জনে সাফল্যলাভ করেছিল, তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাবসমূহ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে।" এবং "একমাত্র রাজা অশোকের দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন পুরাতন সভ্য যুগে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবাধর্মের অনুষ্ঠান হয়নি, এমনকি হিন্দুশাস্ত্রেও সেবাকার্যের এমন উচ্চ মর্যাদা দেখা যায়নি।"[৩] এটি সর্বকালের জন্য মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের পথটিকেই প্রশস্ত করে তুলেছিল। আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী সদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী এবং নিবেদিতা, ক্রিস্টিনের মতো একাধিক সর্বত্যাগী মহৎপ্রাণাদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে—যাঁদের চরম আত্মত্যাগের ওপর ভিত্তি করেই একদিন আমাদের দেশে এই 'সেবা মহোৎসব'টি সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয়েছিল, সমাজে আজও যার প্রভাব ক্রম-উপচীয়মান।

■ বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বশেষ কথা ■

আজ পৃথিবীর চতুর্দিকে তাকালেই যখন দেখা যাচ্ছে মানুষে মানুষে কেবল অসাম্য, হিংসা আর প্রতারণা, ধর্ম-জাতি-সংস্কৃতির নামে পরস্পরের মধ্যে কেবল শত্রুতা, অবিশ্বাস আর বঞ্চনা; তখন তার একমাত্র কারণ হিসাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ঐ অভাবটিকেই দায়ী করা উচিত, যা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হতে মানুষকে এক বীভৎস অবস্থার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন ঘুরেফিরে তাই যে-প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হলো এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে মানুষের উদ্ধারের কি কোন রাস্তা আছে? থাকলেও সেটি ঠিক কোন্ মত ও পথের ওপর রচিত হলে গোটা সমাজকে তা দ্রুত মুক্তির পথে নিয়ে যাবে? অধুনা সমাজবিজ্ঞানীদের দিকে চোখ রাখলে প্রথমত যেটি নজরে পড়ে, তা হলো মানবপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা থাকুক বা না থাকুক, নিজেদের স্ব-অভিজ্ঞাত মতামতের অন্তত সেরকম কোন অভাব নেই। সোস্যালিজম্, কমিউনিজম্ ইত্যাদি হাজারো রকমের 'ইজম'-এর প্রবর্তন করে তাঁরা বারবার আমাদের কেবল এই কথাটিই বোঝাতে চাইছেন যে, একমাত্র তাঁদের প্রদর্শিত মানবসেবা এবং মানবমুক্তির পথ অবলম্বন করেই নাকি এই অশান্তির সংসারে খুব শীঘ্রই শান্তি এসে উপস্থিত হবে। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মানুষের যথার্থ কল্যাণের প্রশ্নে সেসব আদৌ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আজ চতুর্দিকে তাকালেই তাই 'দাবি'র কথাটি যত প্রবলভাবে কানে আসছে, 'কর্তব্য'-এর কথাটি তার এক শতাংশও নয়। অথচ এমন সময় ছিল যখন আমাদের এই ভারতবর্ষে কোন দাবি নয় বরং কর্তব্যের ভাষাই প্রধান ছিল—যে-কর্তব্য এবং সেবাপরায়ণতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের সুন্দর ভারতীয় সমাজটি গড়ে উঠেছিল। ঠিক এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ সেবাদর্শ ও যোগসমন্বয়ের অভিজ্ঞানই একমাত্র পারে আমাদের সেই সঠিক পথের সন্ধান দিতে। কেননা এটি আমাদের কোন মতের কথা বলে না, এটি আমাদের কোন তত্ত্বের কথাও বলে না। বরং এটি ধর্মের সেই 'প্রত্যক্ষ অনুভূতি'র দিকটিই বারেবারে মানুষের সামনে তুলে ধরে, যার ফলে একদিন না একদিন মানুষে মানুষে অবশ্যই যাবতীয় বিভেদের অবসান ঘটা সম্ভব হবে। আর ঠিক সেই একতার সূত্র ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধর্ম সমাজে আজ এক বিশেষ আন্দোলনেরও দাবি রাখে, যা বর্তমান পৃথিবীতে যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ এবং সাম্যবাদ আনয়নের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন—যাকে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি যথার্থ অর্থেই বলেছেন ঃ "এই ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা তথা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভিত্তিক সমন্বয়বাদের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিশ্বের শান্তি, মৈত্রী ও সহাবস্থানের প্রশ্নটি একদিন শেষ আশ্রয় খুঁজে পাবে।"[৪] আর এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নরনারায়ণ সেবাধর্মটি আজ এক অসাধারণ সমাজবিজ্ঞানরূপেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হতে পেরেছে। ❑

১ Hinduism through the ages—D. S. Sarma, Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai, 1955, p. 125

২ World thinkers of Ramakrishna-Vivekananda—Edited by Swami Lokeswarananda, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2nd Edition, p. 30

৩ ১৩ অক্টোবর ১৯৪১ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৩৯তম বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণানুসারে।

৪ Sri Ramakrishna and his unique message—Swami Ghanananda, Ramakrishna Vedanta Culture, London, 3rd Edition, Foreword, pp. viii-ix

পরমার্থ প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ

শিবজ্ঞানে জীবসেবা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'উদ্বোধন', ১০৩তম বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা

শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ

সুচিত্রা রায় আচার্য*

[পুর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যাপকতা মিল্টনের 'Treatise on Education'(১৬৪৪)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে পড়ে স্টুয়ার্ট মিলের জন্য তাঁর পিতা জেমস মিলের নির্ধারিত শিক্ষা। স্বামীজীর মাধুর্যময় শিক্ষার পরিধি বিশাল। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য বেদান্তের ধারণায় মানুষ গড়া, সমাজে পূর্ণাঙ্গতা নিয়ে আসা। তাঁর বিশ্বাস—সকলেই পূর্ণতায় উপনীত হতে পারে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রথমে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক তৈরি করতে, যাঁদের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষার প্রসার হতে পারে। পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থাতেই উন্নয়নযাত্রা সম্ভব। শিক্ষাপদ্ধতিকে কাম্যরূপ দিলেই এই পূর্ণতার যাত্রাপথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরে চলে যাবে।

স্বামীজীর শিক্ষাব্যবস্থাকে কেউ কেউ অবাস্তব, এযুগের অনুপযোগী বলে মনে করতে পারেন। দেশকালের সীমায় মানুষের সমাজজীবন বাঁধা, কিন্তু মানুষ তো চিরকালের। আর সেই চিরকালীন মানুষের বিকাশের জন্য আছে কিছু চিরকালীন তত্ত্ব। বিবেকানন্দের চিন্তায় কিছু তত্ত্ব আছে যা সর্বকালের সর্বমানবের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই তাই আজকের মানবপ্রবাহের ক্ষেত্রেও স্বামীজীর মূল্য সমান।

ভারতীয় সনাতন আদর্শের চিরন্তন গতিধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রমূর্ত। এই সনাতন আদর্শ দেশ ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে গেছে। সত্যের কোন সময়সীমা নেই। তাই এক শতাব্দী আগেও যা সত্য ছিল, আজও তাই সত্য। রাষ্ট্র, সমাজ, মানবজীবন, ধর্ম ও কর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর চেতনা আজও মানুষের জীবনবেদ। পূর্ণতা অপূর্ণতা, পাওয়া না-পাওয়া আর আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাসকে যদি ফিরে দেখি, দেখতে পাই আজও রয়েছে মানুষের আনন্দ ও সুখের অপূর্ণতা।

মনুষ্যত্বহীন, আত্মমর্যাদাহীন বহু মানুষই হারিয়ে ফেলেছে কর্মোদ্যম, হৃদয়ের অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি। সর্বোপরি হারানো মূল্যবোধের প্রবাহে হারিয়ে ফেলেছে প্রাণের প্রাচুর্যকে। এই স্বার্থকেন্দ্রিক বাস্তবতার যুগেও হিন্দুধর্মের প্রবক্তা সন্ন্যাসীর প্রচারিত বার্তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সর্বজনীন ধর্ম, সর্বকালের সর্বমানবের উপজীব্য। বিবেকানন্দের কথায়—"শাস্ত্র যদি কর্মচঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে, অনুশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে, তবে দুর্বল মানুষের কাছে এই শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই।"[১৫] এযুগের কবি যখন বলেছেনঃ "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি", তখন সেযুগের বীর সন্ন্যাসীর মুখে শুনিঃ "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।"[১৬]

সভ্যতার আতিশয্যে মানুষ আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সভ্যতার পোশাক পরা দুর্নিবার সেই জনস্রোতে মানুষ ক্রমশ নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং একাকী অনুভব করছে। আর এ হেন সভ্যতার ফলশ্রুতিতে অসম্পূর্ণ এই সমাজে ভোগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরের পাশেই তৈরি হচ্ছে দারিদ্র্যের গভীর খাদ।

আজকের যুগসমস্যা হলো, ঐক্যচ্যুত নিঃসঙ্গ মানুষ হারিয়েছে ব্যক্তিত্ব। তার নিজের চারদিকে গেঁথেছে অসঙ্গতির বিশাল প্রাচীর। তাই দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ আর প্রেমের মধ্যে, বুদ্ধি আর বিবেকের মধ্যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি আর নিজের উন্নতির মধ্যে। এই সমস্যা অনুভব করেছেন মনীষী হেনরি হুইলর, মার্লোপণ্টি, লিউইস মম্ফোর্ড, এরিক ফ্রন্ট, এরিক কাহলার, নরম্যান কাসিন্স, লেকমতে-দ্য-ন্যুই, আর্ণল্ড টয়েনবি এবং আরো অনেকে। তাঁদের মতে, মানুষকে পূর্ণ করে তোলাই এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ।

বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে স্বামীজী ভারতের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করলেন। মানুষকে ডেকে বললেন তার স্বরূপকে জানতে আর তাকে প্রকাশ করতে। তিনি বললেন—মানুষের জন্যই সভ্যতা, সভ্যতার জন্য মানুষ নয়। তাই কোন তত্ত্বের কাছেই তিনি মানুষকে বলি দেননি। তাঁর কথাঃ "অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।"[১৭] মানুষের হয়ে ওঠার (being & becoming) জন্য তত্ত্ব, মানুষের এই হয়ে ওঠার নামই ধর্ম। "যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে।"[১৮] বর্তমান কালের মীমাংসার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্যপ্রতিভা সম্যক বিকশিত হয়েছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা। এই দুটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হবে বর্তমান কালের মীমাংসা।

* *রিডার, সংস্কৃত বিভাগ, কাঁচড়াপাড়া কলেজ।*

স্বামীজীর কথায়ঃ "জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব বর্তমান।"[১৯] "মানুষের মধ্যেই যে-দেবত্ব প্রথম থেকে আছে তার বিকাশই ধর্ম। ধর্ম মানে শাস্ত্রপাঠ, তত্ত্বকথা কিংবা মতবাদ নয়। ধর্মীয় আলোচনা এমনকি ধর্মসম্পর্কীয় যুক্তিবিচারও নয়। ধর্ম মানে 'আদর্শস্বরূপ' হওয়ার চেষ্টা করা এবং হয়ে যাওয়া।"

ইতিহাস যেমন অতীতের অনুলিপি, তেমনি অনাগতের মুকুরও বটে। ইতিহাস-সচেতনতার ফলে বিবেকানন্দ দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তাই নিজের যুগে দাঁড়িয়ে বর্তমানের সঙ্গে তিনি আগামী দিনের রূপ ও কর্তব্য নির্ণয় করে গেছেন।

আজকের যুগ বুদ্ধিবাদের যুগ। এই যুগের মানুষ যুক্তি বা বিচার দিয়েই সবকিছু গ্রহণ করে। এযুগের মানুষ যদি ফিরে তাকায় তাঁর দিকে, শুনতে পাবেঃ প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ করব একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।[২০] নূতনের আহ্বানের সঙ্গে আরো বলেছেনঃ "যা বলি সেসব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি।"[২১]

সিস্টার নিবেদিতা, যিনি গভীরতম বোধি দিয়ে স্বামীজীকে বুঝেছিলেন, তাঁর বিচারে বিবেকানন্দের ভিতরে ছিল তিনটি উপাদান—জ্ঞানচর্চা, দুর্লভ অপরোক্ষকে সুলভ করার সহজতা আর দেশকে ভালবেসে পাওয়া বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতির সমন্বয়ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখান থেকেই তাঁর বাণী উৎসারিত হয়েছিল। নিবেদিতার দৃষ্টিতে, স্বামীজীর একটি সম্পূর্ণ আধুনিক মন ছিল। তাঁর মতেঃ "যে-অবস্থায় মানুষ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে, সেই সমাধি-অবস্থালব্ধ শাশ্বত প্রজ্ঞালোকে তাঁহারও চিত্ত উদ্ভাসিত থাকিত বটে, কিন্তু উহা সেইসকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরই নিপতিত হইত, যাহা আধুনিক জগতের মনীষী ও কর্মিগণের আলোচনার বিষয়।"[২২]

'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী' গ্রন্থে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, কয়েক বছর ধরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ করার পরেই স্বামীজী লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আর্ত মানবতাকে, তার সকল করুণ নগ্নতার মধ্যে তাঁর দেশমাতৃকাকে স্বহস্তে ও স্বচক্ষে স্পর্শ ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সঙ্গে ধর্মের উন্নতিও সেখানে অনিবার্য। মানুষের ভিতর যে-দেবত্ব আছে তাকে প্রকাশ করাই স্বামীজীর কাছে ধর্ম। সেই প্রসঙ্গেই চিন্তাশীল গ্রন্থকার মোহিতলাল মজুমদার বলেছেনঃ "আধুনিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী... একটা বিশিষ্ট যুগ, সে-যুগে সমাজ, ধর্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে-সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালির সকল বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল; সে এক অকাল সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল।"[২৩] আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেনঃ "সে একটা সেন্টিমেন্ট মাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না।"[২৪]

নবযুগের পথপ্রদর্শক স্বামীজী আজকের মানবসমাজের ব্যাধির নিদান হিসাবে সমস্ত মানুষকেই সবল করতে চাইলেন। মানুষ স্ব-মহিমায় স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে সব ব্যাধিই দূর হয়—এই বিশ্বাস নিয়ে বললেনঃ "এস, মানুষ হও।... তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।"[২৫] "বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। পশ্চাতে চাহিও না।... এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।"[২৬]

দারিদ্র্যপীড়িত, অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত, নিরন্ন, পদদলিত, অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের হাহাকার সেই মহাপ্রাণকে স্পর্শ করেছিল। তাই ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, নারী, গণজাগরণ, চরিত্র, মনুষ্যত্বের বিকাশ, আত্মবোধের প্রসার, মুক্তি, জ্ঞানবিজ্ঞানের মিলন—সমস্ত বিষয়েই তিনি তাঁর উপলব্ধ দৃষ্টিকে সুচিন্তিতভাবে প্রকাশ করেছেন। বিবেকানন্দের মতে, প্রাচীন ধর্ম বলত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না—সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না—সেই নাস্তিক। আজকে এই ভাব মানবধর্মী আধুনিকরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছেন।

মননের দীনতায়, জীবন-এষণার কার্পণ্যে প্রয়োজনের তাগিদে, অভাবের তাড়নায় জাতি যে-আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাচ্ছিল না তাকে রূপ দিয়ে স্বামীজী বললেন, ভারত আবার জাগছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তার যা দেওয়ার আছে, দিতে প্রস্তুত হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক

ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবীকে জয় করবে। আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাতে হবে তা নয়। ভারতকে অবশ্যই পৃথিবীকে জয় করতে হবে—এর চেয়ে নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হতে পারি না।[২৭] "চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে।... এখনো শত শতাব্দী জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।"[২৮] এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়েছেনঃ "যত মত তত পথ।" "সঙ্ঘাত নয়, সহাবস্থান।" "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" "ঐ রুক্ষ মাথায় তেল দাও, ঐ শূন্য উদরে অন্ন দাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার এই দীপটি জ্বেলেছিলেন নিভৃত কোন অর্বাচীন দেবালয়ে। সেই শিক্ষার শিখাকেই স্বামীজী রূপ দিলেন বিশ্বমানবের ত্রাণসূর্যে। বললেনঃ "A commandment I give unto you, that you love one another."

শতবর্ষ আগে দৃপ্ত সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মমহাসভার বিশাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বমানবের মনে আর প্রাণে ছুঁইয়েছিলেন আগুনের পরশমণি। সে-পরশমণি এযুগের মানবপ্রবাহকেও সমানভাবে স্পর্শ করছে। [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূচি

১৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৮৩
১৬ ঐ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৯
১৭ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
১৮ ঐ, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১২৬
১৯ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২
২০ ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৪৩
২১ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫
২২ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ১৩৬১, পৃঃ ৯৯
২৩ বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ২০২
২৪ ঐ, পৃঃ ২০৪-২০৫
২৫ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯
২৬ ঐ, পৃঃ ৩৬৭
২৭ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩
২৮ ঐ, পৃঃ ২১৫

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদের বিষয় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ (১৮৬২-১৯০৪)। শ্রীরামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ সম্ভবত শ্রাবণ পূর্ণিমায় ২৪ পরগনার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অম্বিকাচরণ ঘোষ।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বাল্যে তীরধনুক ও অস্ত্রাদি নিয়ে খেলা করতেন। তাঁর চেহারা অতি সুন্দর, সুদীর্ঘ এবং ব্যায়ামাদির ফলে সবল ও সুঠাম ছিল। তাঁর প্রকৃতি ছিল নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন। একটি প্রেততত্ত্বান্বেষী দল দুরারোগ্য রোগ নিরাময় ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শনে তাঁকে প্রেতাবতরণের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করত। যদিও ব্যাপারটি ভাল নয়, তবু এই সুযোগেই তাঁর মনে বৈরাগ্য এল। কারণ, এক অতি ধনশালী ব্যক্তি একটানা ১৮ বছর অনিদ্রায় ভুগে শেষে রোগারোগ্যের জন্য নিরঞ্জনের শরণ নেন। নিরঞ্জন অবাক হয়ে ভাবেন, এত ধনী, অথচ দুঃখের অন্ত নেই! এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভগবৎ প্রেম ও চিত্তাকর্ষক উপদেশ শ্রবণ করে অনুভব করলেন, যেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কতকালের পরিচিত! কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর নিরঞ্জনকে বললেনঃ "দ্যাখ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি। তা কোন্‌টা হওয়া ভাল?" নিরঞ্জনের উত্তর—ভগবান হওয়াই শ্রেয়। স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ঠাকুর একবার নিরঞ্জনকে বলেছিলেনঃ "দ্যাখ, তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস, তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তাহলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাত জানবি।" একদিন নিরঞ্জনকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে ঠাকুর ভাবাবেশে বলতে লাগলেনঃ "ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে—তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল?" এই অহৈতুকী ভালবাসার রহস্য নিরঞ্জন ভেদ করতে পারেননি। কিন্তু সেই অপূর্ব প্রেম তাঁকে চিরতরে আপন করে নিল। একসময় মাস্টারকেও ঠাকুর বলেছিলেনঃ "দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এসব থাকতে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আছেঃ "বাবুরাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোকরা? যদি আর কেউ আসে, বোধহয় ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে।... সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়।... নিরঞ্জন বিয়ে করবে না।" বিয়ের কথায় নিরঞ্জন জানায়ঃ "বাপরে, ও বিশালক্ষীর দ!" [মহার্দক, যেখানে পা দিলে নরম মাটি ভিতরে টেনে নেয়।]

একবার গঙ্গাবক্ষে গহনার নৌকায় যাত্রীদের দ্বারা ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ সহ্য করতে না পেরে নিরঞ্জন নৌকা ডুবিয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্যোগ করেন। এই ঘটনা শুনে ঠাকুর তাকে তিরস্কার করেনঃ "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশবর্তী হতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হয়েই মিলিয়ে যায়।" 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ আছে, ঠাকুর নিরঞ্জনকে আণবী বা মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন। নিরঞ্জনও ঠাকুরের প্রেমে ও অধ্যাত্মস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের অসুখের সময় কাশীপুরে তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে গিয়ে অপরের অপ্রিয়ভাজনও হতে হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি নিরঞ্জন মহারাজের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। স্বামীজীর ভাষায়ঃ "নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে; কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি, তার লাঠি হজম হয়ে যায়।" কর্তব্যানুরোধ ও বৈরাগ্যের প্রাবল্যে তাঁকে আপাত একটু উগ্রপ্রকৃতি মনে হলেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোমলতার অভাব ছিল না। আঁটপুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবন্ত সারদা মহারাজকে তিনি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করেও পুষ্করিণী থেকে উদ্ধার করেন। লাটু মহারাজের উক্তিঃ "কারুর অসুখ শুনলে দৌড়ঝাঁপের কাজ নিরঞ্জন ভাই নিজের মাথায় নিত।" বরানগর মঠে থাকাকালীন নিরঞ্জনানন্দের প্রধানত তপস্যার দিকেই মন থাকত। স্বামীজী বেলুড় মঠে অত্যন্ত পীড়িত হলে তাঁর দ্বাররক্ষকের দায়িত্বও নিতে হয়েছিল স্বামী নিরঞ্জনানন্দকেই।—সম্পাদক

ত্রয়ী

স্বপন নন্দী

১.
সমুদ্র তিনি
তারও গভীর-নিভৃতে যেখানে মুক্তো, যেখানে পরমার্থ
এত অবগাহনেও স্পর্শ মেলেনি তাদের
অবিরাম ছন্দে যদি স্নাত হও
অশান্ত তরঙ্গে যদি স্পর্শ করে তোমার ধী
তুমি পাবে
সমুদ্র তিনি;
এস বিতংস ছিন্ন করি, এস পরমহংসে, এস অবতরণে।
২.
দূরের আকাশ তিনি অনেক আকাশ
নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর বাক্‌মঞ্জরি, বাগীশ্বরী তিনি
সারদা মহীয়সী
নারী ও প্রকৃতির সহমর্মে সমবেদে শারদা
কোটি কোটি সন্ততি নিয়ে অহরহ প্রসন্ন অতি
এস বন্ধ্যা সময়, শস্য কুড়িয়ে নাও নিজস্ব শ্যামলে
আন্তরিক সবুজে সর্বংসহা সর্বজনীন মা
ফসল ছড়িয়ে দিচ্ছেন।
৩.
আগুনের কাছ থেকে তিনি নিয়েছিলেন পাঠ
তাই বিশ্ববিবেক
সঙ্কটের ম্লানতা মুছে তিনি নির্বিশেষকে ডেকেছিলেন—'এস ভাই'
তাই তাঁর আনন্দসত্তা;
বিটপী তিনি ঝড়ের চরিত্র জানেন
অশান্ত উপকূলে তিনিই গড়তে পারেন শান্ত নীড়
বরিষ্ঠ সন্ন্যাসে তিনি আবহমান নৌকা
৪.
এস যাত্রী হই ত্রয়ীতে, তমসা থেকে সূর্যকরোজ্জ্বলে।

চিরসুন্দর

গায়ত্রী সেনগুপ্ত

কঠিন পাথর তাতেও ফাটল ধরে নীরস গাত্রে
কে মেলে দেয় সবুজ পাতা একটি বাদল রাত্রে?
প্রলয় শেষে আকাশে হয় রামধনুকের সৃষ্টি
তপন তাপে ধরার বুকে এ কার করুণা বৃষ্টি?
অসীম আকাশে চন্দ্র সূর্য কোটি কোটি গ্রহ তারকায়
বিস্ময়ে হেরি অপরূপ রূপ প্রতি প্রতি অণু কণিকায়।
সংশয়ভরা অন্তরমাঝে দীপ্ত আলোকশিখাতে
পথ খুঁজে পাব জানি হে নাথ তোমার করুণা-কণাতে।

বিকালে

স্নেহেন্দু মাইতি

বিকালে সূর্য যখন অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে
সেই পেশল তেজ ক্লান্তিময়—ম্লান
আমার ভিতরে কে কেঁপে উঠল।
যে-তোমার দিকে এতদিন ফিরেও তাকাইনি
চোখ ও নাকের খুঁত ধরেছি বরাবর
আজ বিকালের আলোয় রহস্যময়ী হয়ে উঠছ।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখে যখন বিস্মিত হচ্ছি
আর ক্রমাগত নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি
হঠাৎ হাসতে হাসতে এসে হাত ধরলে।
তোমার কাছে নত হতেই
মন্দিরে শঙ্খধ্বনি
গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি
মসজিদে আজানের সুর।

আকুতি

মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস

শান্তি দে মা, শান্তি দে।
কর মা শীতল বক্ষ আমার
তোর দুটি হাত বুলিয়ে দে॥

রিপুর দাহ মর্মতলে, সর্বদেহে অগ্নি জ্বলে
পাষাণ চাপা, দুখেরি ভার,
হৃদয় হতে নামিয়ে দে॥

অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে, নয়ন আমার অন্ধ হলো
কোথায় আলো, জানি নে মা, দূরেই সে তো পড়ে রলো।

ভেদাভেদের তর্কে পড়ি, তীর্থ হতে তীর্থে ঘুরি
চঞ্চলতার মোহ হতে—
সব কালিমা মুছিয়ে দে॥

তোমার ভালবাসা

নিতাই নাগ

তোমার গভীর ভালবাসা—
আঁধার রাতে জীবনমাঝে যেন চাঁদের আলোয় গড়া।
তোমার শুভ আশীর্বাদ—
অঝোর ধারায় ঝরতে থাকা যেন পরম বৃষ্টিধারা।
তোমার অপার কৃপা—
যেন হৃদয়-মাঝে সাগর-ঢেউয়ের অবিরাম আছড়ে পড়া।

আমি*

অমরকুমার ঘোষ

স্বরূপ আমার অরূপ বটে
নিরাকার ও নির্বিকার
একা ভ্রমি সঙ্গিবিহীন
সঙ্গোপনে চরাচর।
অসীম অনন্ত আমি
নিত্য, সত্য, তবু শূন্যময়
অবহ জীবন তাই
বহু হতে বড় সাধ হয়।
অশেষ বৈচিত্র্যে ভরা
সৃষ্টি হোক বহু বর্ণময়
তাই তো রূপের চিন্তা
কত রূপ এই বিশ্বময়।
কত কত গ্রহ তারা ভৌতিক প্রসার
পঞ্চভূত।
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাঝে
সৃজনের লীলা কত না অদ্ভুত।
জীবদেহে চেতনারে করি সঞ্চালন
ভাল মন্দ, বাসনা-কামনা করি জাগরণ।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি
মায়াজাল, জটিল বিস্তার
অন্তরালে অদৃশ্য একাকী
কারণস্বরূপ আমি বসে আছি।
আকারে নিরাকারে রূপে বা অরূপে
আমি বর্তমান
অদ্বিতীয় আমি, রহস্যের অগম্য গভীরে
অগোচরে চিরদিন করি অবস্থান।
আমি তো ত্রিগুণাতীত নাম-রূপ গণ্ডির বাহির।
মন মোরে পাবে না বাধিতে
তাই তো মানব রচে কত রূপ মোর
নিজ নিজ মনমতো ডাকে কত নামে।
কতিপয় ভক্ত-যোগী শুদ্ধ কল্পনায়
ছবিমাত্র দেখে মোর, মনের আরশিতে।
তোমার মনন চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান
আমারই তো দান।
তোমার অন্তরে সদা চেতনস্বরূপ
অদৃশ্য অধরা তবু, আমি বর্তমান।

ক্রিয়া কর্ম যত কিছু কর
আমি কর্তা তার।
তুমি-আমি, আমি-তুমি
মিছে কথা যত
তোমাতেই আমি আছি
জানিবে সতত।
চারিদিকে যত কিছু
জড়-জীব-প্রাণ
জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন
ব্যাপ্ত ত্রিভুবন
সবকিছু আমি।
এ আমারে, আনন্দে বিশ্বাসে
অনায়াসে কর না দর্শন
বিশ্বাসে ভক্তিতে।
এছাড়া অন্যরূপে ভিন্ন কোথা
অন্য কিছু নই।
তুমি নও কোনদিন ছিন্নবাঁধা
ভিন্ন আমা বৈ।

* বেদান্ত-তত্ত্ব অবলম্বনে।

উদ্বোধন

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য

১

ভোগবাদ আর অবিশ্বাসের মায়া—
লক্ষ্যের পথে ফেলেছে অশুভ ছায়া,
লাঞ্ছিতা আজ কন্যা-জননী-জায়া
দিকে দিকে শুধু দেখি শয়তান কায়া।

২

এ-আঁধারে চাই চলার পথের আলো,
নবযৌবন চেতনার দীপ জ্বালো—
দূরে যাক যত অশুভ কলুষ কালো,
চরিত্র বলে বন্দিত সমাজটা হোক ভাল।

৩

আজ চাই শুভচেতনার জাগরণ—
সত্য-ন্যায়ের আশ্বাসে সনাতন,
দূর কর যত সন্দেহ অকারণ—
সেই পথে চল, যে-পথে উন্নয়ন।

৪

বালার্করাগ রঞ্জিত হোক ভাল,
অগ্নিবলয় ভেদি এস মহাকাল—
হোক অপগত মোহান্ধ মায়াজাল,
দৃঢ় হাতে ধর যুগতরণীর হাল।

৫

নতুন যুগের দৃপ্ত উদ্ভাসন—
আঁধার বিদারি আলোয় উত্তরণ,
নবজীবনের দীপ্ত উজ্জীবন—
নবচেতনার দিশারি 'উদ্বোধন'।

অলঙ্করণ : সৌরীশ মিত্র

বৈকালী হ্রদে

প্রীতি ভট্টাচার্য

এখন আমি 'অস্তিত্বের বৈকালী এক হ্রদে'
ডুব দিয়ে স্নান করি যেন নিত্য দুই বেলা
ভোরের আলোয় ভালবাসা, স্নিগ্ধ হাওয়ার
মৃদু কাঁপন—পাখির গানে জলতরঙ্গ—
একটু একটু করে আমি তলিয়ে যেতে থাকি
নিবিড় কোন জলাশয়ের মগ্ন চেতনায়
শান্ত শীতল স্পর্শটুকু জড়িয়ে থাকে শুধু।

সন্ধ্যেবেলায় সূর্যডোবা ধূসর অন্ধকারে
আকাশজোড়া হ্রদের জলে নিথর বিস্তার
ভাসতে থাকি ভারহীন এক ব্যাপ্ত চেতনায়
ভাল লাগার মুক্তিটুকু ছড়িয়ে থাকে শুধু।

শ্রীশ্রীমা ঃ আগে মানুষ, পরে ধর্ম

স্বামী নিরন্তরানন্দ*

মানুষ মানুষ মানুষ। মানুষের অনুষঙ্গ ছাড়া সবই মূল্যহীন। আবার ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, কলা, সাহিত্য—এসব মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের স্বার্থেই এসকল জ্ঞানের শাখা আজ পল্লবিত, প্রস্ফুটিত। এসমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্র মানুষ। আজ আর বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবী বা সূর্য নয়। হয়তো তাই শিল্পী গেয়েছেন ঃ "মানুষ মানুষেরই জন্যে/ জীবন জীবনেরই জন্যে/ একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?/ মানুষ মানুষকেই পণ্য করে/ মানুষ মানুষকে জীবিকা করে।..." ইদানীং মানুষের জীবনে ও আচরণে ধর্মের যে-রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে, তা কিন্তু ভিন্ন রকমের; অনেক ক্ষেত্রে তা বিপরীত, অশুভের হাতছানি দেয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। প্রশ্ন উঠেছে, ধর্ম কি মানুষের জন্য, নাকি মানুষ ধর্মের জন্য?

এতাদৃশ পরিস্থিতিতে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন এক আশার আলোকবর্তিকারূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। দেখি, শ্রীশ্রীমা লোকচক্ষুর একটু আড়ালে গ্রামবাংলার শান্ত পরিবেশে দৈনন্দিন কাজকর্মে সদা ব্যস্ত। তিনি যেন সেই পর্ণকুটিরের উঠানের মধ্যস্থলে নির্মিত তুলসীমঞ্চের সামনে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রদীপটির স্নিগ্ধ শীতল ক্ষীণালোকে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের পিণ্ডীকৃত জালের জট ছাড়াচ্ছেন, এক এক করে খুলছেন সকল গ্রন্থি। সকলকে বলে দিচ্ছেন, হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে সত্যিকারের ধর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। দেখিয়ে দিচ্ছেন—ধর্মজীবন কত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। তাঁর কর্মময় জীবন থেকে উত্তর পাই, ধর্ম মানুষেরই জন্য, তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বলে গিয়েছেন, ধর্ম মানুষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের কারণ।[১] স্বামী বিবেকানন্দও এযুগে ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ধর্ম পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।"[২]

প্রকৃত ধর্ম সেবার মধ্যে উন্মোচিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সেটিই আলোচ্য। নরের সেবাও নারায়ণসেবা—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের এক প্রধান স্তম্ভ। কাশীতে স্বামীজীর সেবাধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন যুবক আর্ত-পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তা এক বিরাট সেবাশ্রমের রূপ নিয়েছিল। সন্ন্যাসীদের দ্বারা তখন তা পরিচালিত হচ্ছিল; সন্ন্যাসীরাও রোগি-নারায়ণের সেবায় নিরত থাকতেন। সন্ন্যাসীদের এই রোগিসেবা শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত কিনা, তা নিয়ে তাঁর অনেক ভক্তের মনে সংশয় ছিল। এই সংশয়ের অবসান হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের এক বিশেষ অনুভব ও বাণীর মধ্য দিয়ে। তিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সেবাশ্রম পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তিনি রোগীদের সেবাকাজ দেখে খুব প্রীতিবোধ করেন। সেদিনই একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" মা ধীরভাবে বলেছিলেন ঃ "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।"[৩] শ্রীশ্রীমা জগৎকে নবযুগধর্ম শিক্ষা দিলেন, নর নরমাত্র নয়, নর নারায়ণ। নরের সেবা নারায়ণেরই সেবা, তা-ই যুগধর্ম।

মানুষ পাপী নয়। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ দিব্য। এক কুলমহিলা কর্মবিপাকে দুষ্প্রবৃত্তির পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নিজের ভুল একদিন বুঝতে পেরেছিলেন ও উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি মায়ের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মাকে বললেন ঃ "মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই।" শ্রীশ্রীমা এগিয়ে এসে দুই হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?"[৪] সকলকেই মা উদ্ধার করেছেন।

যে-ধর্ম উপায়হীনের উপায়ের সন্ধান দিতে পারে, সেই ধর্মই যথার্থ ব্যাবহারিক ধর্ম। তাই যে-ধর্ম বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, সেই ধর্মে স্বামীজী বিশ্বাস করতে পারেননি। একদিন মা কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুলতলায় চৌকির ওপর বসে আছেন, এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে নালিশ করল, তার উপপতি তাকে হঠাৎ ত্যাগ করেছে। তার জন্য সে সব ত্যাগ করেছে; কিন্তু এখন সে নিরুপায়। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি, মা পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ায় ঘৃণাভরে মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন না, কিংবা 'মা, কি করবে! সবই ভগবানের ইচ্ছে।' ইত্যাদি নীতিধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলেন না; তিনি তাঁর স্বকীয় ভূমিকায় নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন। ডোমকে ডাকিয়ে স্নেহপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম

ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড় মঠ-এর আচার্য, বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

হবে—নরকেও স্থান পাবে না।" মায়ের কথায় লোকটির মন দ্রবীভূত হলো এবং সে মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে গেল।[৫]

ধর্মের আরেকটি দিক—শুচি থাকা চাই, শুচিবাই নয়। 'শৌচ' সকল ধর্মমতে এক আবশ্যিক সাধনবিশেষ। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ে—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব—সকলের জন্য শৌচ সাধনের নির্দেশ আছে। আত্যন্তিকতা যখন শৌচের সঙ্গে যুক্ত হয়, শৌচ তখন স্বাভাবিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়; আর মাত্রাতিরিক্ত শৌচের নামই 'শুচিবাই'। শুচিবাই জীবনকে অযথা সমস্যাসঙ্কুল করে তোলে। একদিন নলিনীদেবী (শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভক্তমহলে 'নলিনীদিদি' নামে খ্যাত) ভেজা কাপড়ে শ্রীমায়ের নিকট এসে বলছেন, কাকে তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করেছে, তাই আবার তিনি স্নান করে এসেছেন। মা শুনে বললেনঃ "বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে কখনো শুনিনি। বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।... শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।"[৬] এই শুচিবাইগ্রস্তা মহিলা শুচিবাইয়ের জন্য নিজে কষ্ট পেয়েছেন, অপরেরও কষ্টের কারণ হয়েছেন।

শুচিবাই থেকে মানুষকে রক্ষা করতে শ্রীশ্রীমা প্রথমে প্রবোধবাক্য, পরে যুক্তিপ্রয়োগ করতেন। এসবের সাহায্যে যখন তিনি উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন তিনি নিজ দেবীত্বের সাহায্য নিয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। তিনি তখন জয়রামবাটীতে আছেন, একদিন বাড়ির পাচিকা ব্রাহ্মণী রাত নটার সময় এসে বললেনঃ "কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।" মা তাঁকে বললেনঃ "এত রাত্রে স্নান করো না; হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়।" ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেনঃ "তাতে কি হয়?" মা বললেনঃ "তবে গঙ্গাজল নাও।" এতেও পাচিকার মন উঠল না দেখে পবিত্রতাস্বরূপিণী মা বললেনঃ "তবে আমাকে স্পর্শ কর।" এতক্ষণে পাচিকার চোখ খুলল এবং তিনি অন্তত তখনকার মতো শুচিবাই থেকে মুক্তি পেলেন।[৭]

স্মৃতিকার মনু মহারাজ ধর্মজীবনে শাস্ত্রের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞান আর স্বাধীন বিচারের প্রয়োগের কথা বলে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও যুক্তিবিচারের প্রয়োজনীয়তা বারবার আমাদের মনে করিয়েছেন। আবার, তিনি সাধারণ জ্ঞানের (common sense) ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামী মহাদেবানন্দ মায়ের আদেশে বর্ষার এক দিনে হলদিপুকুর গ্রামে গিয়েছেন; কেরোসিন, আটা ইত্যাদি প্রায় এক মণ মাল কিনে মায়ের বাড়ি ফিরছেন। মাথায় করে বয়ে আনছেন, কেননা মা তো কুলির কথা বলেননি। এদিকে মাথার বোঝা ক্রমে ভীষণ ভারী লাগছে, এতটা রাস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে করছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন, মায়ের একাজ তিনি করবেনই। এদিকে যেভাবেই হোক, মা জয়রামবাটীতে তাঁর এই সন্তানের সমস্ত কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করছেন। মহাদেবানন্দজী মায়ের বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখেন, মা নিজের ঘরের বারান্দায় দ্রুত পাদচারণ করছেন, মুখখানি তাঁর লাল, চক্ষুদুটি যেন কপালে উঠেছে, আর আপনমনে বলছেনঃ "একটা কুলি নিতে কেন বললুম না?" মহাদেবানন্দজী যখন বোঝা নামিয়েছেন, তখন মা তাঁকে বললেনঃ "একটা কুলি নিতে হয়। আমি বলিনি, তাতে কী হয়েছে? এরকম করে কি চলতে হয়!"[৮]

ধর্ম যে সাধনার বিষয়—একথা কে না জানে? সাধনজীবনের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এক অভিনব মাত্রায় দেখতে পাই। একবার মা দীক্ষার্থী দুই ভাইকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। উভয়েই তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন। দীক্ষার পর মা তাঁদের বললেনঃ "রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।" এক ভাই বললেনঃ "মধ্যাহ্নে করব না মা? ত্রিসন্ধ্যায়?" মা উত্তর দিলেনঃ "বাবা, তোমরা ছাত্র, কলেজে যেতে হবে। দুপুরবেলাতে কি আর সম্ভব হবে? তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় করবে, আর তাছাড়া যখন সময় পাও তখনি জপ করবে।"[৯]

অহিংসার প্রচার ভারতের সর্বত্র। অহিংসা পালনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর এক বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। এক ভক্তকে মা একরকম জোর করে মাছ খাওয়ালেন। সেই ভক্ত মাছ খাওয়া ত্যাগ করেছিলেন এই অনুযোগ করে যে, মা মাছ খান না। মা তাঁকে গম্ভীরভাবে বললেনঃ "আমি কি একমুখে খাই?—তুমি কি তাই মনে কর? বোকামি করো না—মাছ খাবে। আমি বলছি, খাবে।" সেই অবধি ঐ ভক্ত আজীবন আমিষাশী ছিলেন।[১০]

"ভক্তের জাত নাই।"—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জাতিবিচার, স্বামীজীর মতে, একটি সামাজিক প্রথাবিশেষ। জাতিবিচার প্রকৃত ধর্মের সীমানার বাইরে। শ্রীশ্রীমাও বলতেনঃ "ভক্তের জাত নাই।" তাঁর মন ছিল অত্যন্ত উদার। কে কার প্রণম্য?—এই প্রশ্নের উত্তরের মাপকাঠি তাঁর নিকট কোন পুরনো স্মৃতিশাস্ত্র ছিল না, ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয়টি পরিষ্কার হবে একটি ঘটনা বিচার করলে। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি উদ্বোধনে রাধুকে দেখতে এসেছেন। পরে মায়ের আদেশে রাধু তাঁকে প্রণাম করলেন। কবিরাজ মশায় চলে যাওয়ার পর কেউ কেউ মাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "উনি কি ব্রাহ্মণ?" মা বললেনঃ "না, বৈদ্য।" প্রশ্ন উঠলঃ "তবে যে প্রণাম করতে বললেন?" মা উত্তর দিলেনঃ "তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ; ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য। ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে?"[১১] শ্রীশ্রীমা একথা

বলেছিলেন আজ থেকে আশি-নব্বই বছর আগে, যখন ব্রাহ্মণদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য করা হতো। জানি না আজকের দিনে কয়জন স্ত্রী বা পুরুষ এরকম উদারতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

প্রাচীন শাস্ত্রে কায়িক, মানসিক ও বাচিক তপস্যার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ "কলিতে অন্নগত প্রাণ।" ভারতবর্ষ সাধনার প্রতিকূল জলবায়ুর দেশ; তদুপরি দরিদ্র। সেই দেশের মানুষকে কায়িক তপস্যা করতে উপদেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র। শ্রীশ্রীমায়ের মন কত উদার, প্রত্যক্ষনির্ভর এবং বাস্তবধর্মী ছিল, তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনে।

শ্রীশ্রীমা কায়িক তপস্যার চেয়ে মানসিক তপস্যার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। বাংলার কোন কোন অংশে বিধবা মেয়েরা আহারাদি সম্বন্ধে খুব কঠোরতা করেন। এক বিধবার কঠোরতার কথা জেনে সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রগতিশীল মন নিয়ে তিনি ঐ বিধবা রমণীকে বললেন ঃ "তুমি রাত্রে রুটি, পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও।"[১২] শরীররক্ষার জন্য তিনি সুযুক্তিপূর্ণ বিধান দিলেন। অথচ অন্নগ্রহণের পরিবর্তে রুটি-পরটা খেতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা তিনি দেশাচারকেও সম্মান জানালেন।

দেশাচার কতদূর পালনীয় সেবিষয়ে মায়ের স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল। লৌকিক ব্যবহারে তিনি দেশাচার মেনে চলতে চেষ্টা করতেন, অপরদেরও বলেছেন ঃ "দেশাচার মানতে হয়।" মনে রাখা দরকার, শ্রীশ্রীমা বা শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো ধর্মগুরুরা অতীতকে ভাঙতে আসেন না, বরং গড়তে আসেন। সাধারণের অনুসরণীয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও অগ্রগতির অনুকূল এক জীবনাদর্শ প্রদর্শনের জন্য তাঁদের আগমন। পূর্বপুরুষদের আচরিত এবং বর্তমান যুগের উপযোগী দেশাচার পালন করা উচিত, কেননা তার ফলে এখনকার মানুষ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। জনৈক দীক্ষার্থীর কুলগুরু আছেন জেনে শ্রীশ্রীমা মন্ত্রদানে অসম্মত হয়ে বলেছিলেন ঃ "কুলধর্মানুযায়ী চলা উচিত; জাতিবিচার সংসারে থাকলে মেনে চলতে হয়।"[১৩] তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন, কুলধর্ম মেনে না চললে সংসারে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

দেশাচার পালন করতে গিয়ে মানুষকে পিষে মারা চলে না। সেক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা সহানুভূতিশীল ও যুক্তিসঙ্গত বিধান অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। যোগীন-মার বিধবা খুড়িমা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন; প্রথমে গিয়েছেন নহবতে। বৃদ্ধা খুড়িমা পূর্বদিনে কোন কারণে অন্নগ্রহণ করেননি। আজও তিনি কিছু খাবেন না, কারণ আজ একাদশী। বার্ধক্যের জন্যও তিনি আজ সোজা হয়ে চলতে পারছেন না; আবার হাঁপাচ্ছেন। সে-অবস্থায় তাঁকে নহবতের দিকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীমা এগিয়ে এসে তাঁকে হাত ধরে এনে ঘরে বসালেন ও জিজ্ঞেস করলেন ঃ "একটু শরবত দেব?" বৃদ্ধা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। তিনি একটু সুস্থ হলে যোগীন-মা তাঁকে ঠাকুরের ঘরে নিয়ে চললেন। শ্রীশ্রীমাও সঙ্গে গেলেন। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে একেবারে ঝুঁকে পড়ছিলেন। ঠাকুর তা দেখে ব্যথিত হয়ে যোগীন-মাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এমন হাঁপাচ্ছে কেন?" যোগীন-মার মুখে কারণ শুনেই ঠাকুর উদ্বেগভরে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন ঃ "তুমি একে একটু শরবত খাইয়ে দিতে পারলে না?" মা উত্তর দিলেন ঃ "আমি বলেছিলুম; ইনি রাজি হননি।" ঠাকুর তখনি শিকে থেকে চিনি নামিয়ে গঙ্গাজলে শরবত করে বৃদ্ধার মুখে ধরে বললেন ঃ "খাও।" বৃদ্ধা একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে তাকালেন; পরে বিনা বাক্যব্যয়ে শরবতটুকু পান করে বুকে হাত দিয়ে বললেন ঃ "বুকটা ঠাণ্ডা হলো, বাবা।"[১৪]

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি, শ্রীশ্রীমা ভগিনী নিবেদিতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ভোগের রান্না এবং সেই ভোগের নিবেদন অনুমোদন করেছিলেন। মা সেই নিবেদিত অন্ন গ্রহণও করেছিলেন। "একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমার কাজের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।' "[১৫]

দানধর্মের কথাও মা বলেছেন স্পষ্টভাবে। শ্রীমা গৃহস্থ ভক্তদের সঞ্চয় করতে উপদেশ করতেন। প্রধান শিক্ষক প্রবোধবাবু মায়ের জন্য একদিন বহু টাকার ফল, মিষ্টি ও তরকারি কিনে আনেন। মা তা দেখে বিরক্ত হলেন ও তিরস্কার করলেন ঃ "বানরের চুল হলে বাঁধতে জানে না। তুমি এতগুলি টাকা কেন খরচ করলে? তোমার ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করা উচিত। আমার কি ঠাকুর কিছুর অভাব রেখেছেন?" প্রবোধবাবু দুঃখিত হলেন, ভাবলেন ঃ "আমি গরিব বলে কি আমার সেবা করবার অধিকার নেই?" তাঁর দুঃখ হয়েছে বুঝে মা তাঁকে বললেন ঃ "কি জান, বাবা? কিছু সঞ্চয় করলে নিজের সংসারে ও ভবিষ্যতের উপায় হবে। আর সাধুদেরও সেবা করতে পারবে। কিছু না থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদের কি দেবে, বাবা?"[১৬]

মা বলতেন, পূজার সার আন্তরিকতা। অপরে শিবপূজা করে দেখে জনৈকা স্ত্রীভক্তের তা করতে আগ্রহ জন্মেছিল। তিনি এবিষয়ে মায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন। মা তাঁকে বললেন ঃ "আমি যে-মন্ত্র দিয়েছি, তাতেই সব—দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব ঐ মন্ত্রে হয়। তবে কারো ইচ্ছা হলে শিখে নিয়ে করতে পারে। তোমাদের ওসবের দরকার নেই, ওসব করলেই হাঙ্গামা বাড়ানো।" উপনয়নের ব্যাপারে মা এক চিঠিতে বলেছিলেন ঃ "তোমার পৈতা নেওয়ার সম্বন্ধে আমি আর কি লিখব? ইহা কোন মন্দ কাজ নয়—সামাজিক ব্যাপার। এসব বিষয় তোমরা যেরূপ ভাল বিবেচনা কর করবে। পৈতা নিলে যাতে তার সদ্ব্যবহার হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। যা ঠিক ঠিক মতো চালাতে না পারবে, তা হুজুগে পড়ে করো না।"[১৭]

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে মাকে বললেন ঃ "মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি?" মা নেওয়ার জন্য হাত পেতে বললেন ঃ "খুব নেব বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বৈকি।" পাশে একজন স্ত্রীভক্ত দাঁড়িয়েছিলেন, মাকে বললেন ঃ "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?" মা তাঁকে উত্তর দিলেন না। মা ঐ কলাগুলি তুলে রাখলেন এবং মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্টি দিতে বললেন। ঐ মুসলমান চলে গেলে মা স্ত্রীভক্তকে তিরস্কার করে গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "কে ভাল, কে মন্দ—আমি জানি।"[১৮]

আরেকটি কথা। সত্যবাদিতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা—"সত্যকথা কলির তপস্যা" আজ সর্বজনবিদিত। একজন মায়ের আশ্রিত ভক্ত তাঁকে পত্রে লিখেছেন যে, তিনি যে-চাকরি করেন, তাতে সময় সময় মিথ্যা বলতে হয়; সেজন্য চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পারছেন না, কারণ পরিবারের ভরণ-পোষণের আর কোন উপায় নেই। সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নয়। এমতাবস্থায় ভক্ত মাকে চিঠি লিখেছেন তাঁর উপদেশের আশায়। মা একটু ভাবলেন, তারপর পত্রলেখককে লিখতে বললেন ঃ "তাকে লিখে দাও চাকরি না ছাড়তে।" অল্পবয়স্ক লেখক মায়ের উপদেশ শুনে দ্বন্দ্বে পড়েছেন। মা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন ঃ "আজ একটু সামান্য মিথ্যা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু চাকরি ছেড়ে অভাবে পড়লে তখন চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না।" শেষোক্ত অংশ "অভাবে পড়লে তখন চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না"—মা খেদ করে দুই-তিন বার বললেন। লেখক মায়ের দূরদৃষ্টি ও সন্তানকে রক্ষা করার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হন।[১৯]

তাই আগে মানুষ, পরে ধর্ম। ভারতের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তার বহু কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ—ভারতবাসীর জীবনে কার্যকারিতার খুব অভাব। তবে ধীরে ধীরে সে-অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের মধ্যে পরিশ্রম করার ইচ্ছাও যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়ছে, তেমনি উচ্চ উচ্চ ভাবের সাকার রূপ দিতে আগ্রহের নিদর্শনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। শ্রীশ্রীমায়ের অনলস কর্মময় জীবনের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

স্বামীজী সনাতন ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাকে সাহায্য করতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নেই—তা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদ হিসাবেই থেকে যাবে। ধর্মের সাহায্যে যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হতে হবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেখানেই তার সাহায্য পেতে পারে—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চ শিখরে—ধর্ম যেন সবসময় সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করতে পারে।"[২০] শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সেই সনাতন ধর্মের ফলিত রূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে সুপরিজ্ঞাত কথা ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সূত্র, স্বামীজী তার ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীমা তার ব্যাবহারিক রূপ (Practical demonstration)"—অত্যন্ত সত্য। ❑

তথ্যসূচি

১ আচার্য শঙ্করকৃত 'গীতাভাষ্য' দ্রষ্টব্য
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১০ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩২০
৩ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং, পৃঃ ২১০
৪ ঐ, পৃঃ ৩০৭
৫ ঐ, পৃঃ ২৮৮
৬ ঐ, পৃঃ ৩৫৯
৭ ঐ, পৃঃ ৩৩২
৮ ঐ, পৃঃ ৩৩৮
৯ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬১, পৃঃ ২৭৯
১০ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় খণ্ড, ১৪০৩, পৃঃ ৩৬৬
১১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৫৮
১২ ঐ, পৃঃ ৩৫৯
১৩ ঐ, পৃঃ ৩৫৭
১৪ ঐ, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০
১৫ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২০১
১৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৭৩
১৭ ঐ, পৃঃ ৩১৪
১৮ ঐ, পৃঃ ২৮৮
১৯ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮২, পৃঃ ৯৬-৯৭
২০ দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II, 10th edn. pp. 300-301

'আমি'র খোঁজে

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।" আমারই জন্য সূর্য-গ্রহ-তারা। এই 'আমি' আছে বলেই ভালবাসা, ঘৃণা, পূজা। আমার অস্তিত্বেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব। 'আমি'ই প্রথম এবং শেষ কথা। 'আমি' এক রক্তমাংস, হাড়পাঁজরে গড়া মানুষ। বোধ হয় ভুল বলা হলো। এটা গোটা 'আমি' নই। প্রাণহীন শবদেহে রক্তমাংস, হাড়পাঁজরা সবই আছে—তবুও তার মধ্যে 'আমি' নেই। এই 'আমি' তখনি আসবে যখন প্রাণের সঙ্গে মন থাকবে। মনপ্রাণহীন দেহ জড়বস্তু ব্যতীত কিছুই নয়। একটি পাথর পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের অনুভূতি পায় না; তেমনি মৃতদেহ পৃথিবীর অনাবিল সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারে না। অতএব মানুষ জড়, প্রাণ এবং মনের সমন্বয়। কখনো সে বলে ঃ "জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ/ ধন্য হলো, ধন্য হলো মানবজীবন।" পরক্ষণেই কেঁদে বলে ঃ "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে/ এসেছে আমার দ্বারে।"

'আমি'কে কৃত্রিমভাবে (চিকিৎসাবিজ্ঞানে) অজ্ঞান করলে মন ডুব দেয় অজ্ঞাত অন্ধকারে। কিন্তু প্রাণ থেকে যায়। জ্ঞান ফেরত আসে প্রাণ রয়েছে বলেই। এই জ্ঞান আর কিছুই নয়—মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এককোষী প্রাণী থেকে উদ্ভিদ এবং নিম্নতম জীবদেহে মনের অস্তিত্বের প্রকাশ নেই। মনের ক্রমবিকাশের পরিণতি বুদ্ধিতে। যত উন্নততর জীব, তত মনের জটিলতা এবং বুদ্ধির বিচিত্র খেলা। মানুষের 'আমি' নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অহংবোধ বা অহঙ্কার নিয়ে আসে। সকল জীবের অন্তরে এই অহংবোধ থাকলেও মানুষের অহংবোধের এক আলাদা মাত্রা আছে।

"আমি চোখ মেললুম আকাশে—/ জ্বলে উঠল আলো/ পূবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'—/ সুন্দর হলো সে।"

মানুষের 'আমি' জড়দেহের সঙ্গে প্রাণ শুধু নয়, এতে রয়েছে মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ। কী বিশাল কাজ করে চলেছে এই তিন সত্তা—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই তিনের সমন্বয়ে অসীম বিশ্বজগতে অনেক কিছুই আমরা জানতে পারছি। জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা বাড়তে বাড়তে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। অজানা সীমাহীন জগতের বুকে জ্ঞানের দীপশিখা মানুষের 'আমি'কে সাহায্য করছে বেশ কিছু অব্যক্ত এলাকায় আলো ফেলে দখল করতে। ব্যক্তিমানুষ জানে তার মৃত্যু হবে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে রেখে যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার ফসল। কয়েক শতাব্দী পরে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো আমাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিসরকে আলোচনা করতে গিয়ে ভাববে অন্ধকার যুগের গুহামানবের কথা। আমেরিকা আবিষ্কার একসময়ে প্রচণ্ড ঝড় তুললেও বর্তমানে এক সামান্য ব্যাপার।

'আমি'র মধ্যে মন এক অসাধারণ ইন্দ্রিয়। যদিও প্রাণ বাদ দিয়ে মন দেহে থাকতে পারে না, তবুও মনের কাজ রীতিমতো গোলমেলে। স্বপ্নে আমরা নানা জায়গা, ব্যক্তি এবং অনেক কিছুই দেখি। স্বপ্নাবস্থায় মনে হয় ওগুলি সব বাস্তব এবং সত্য। স্বপ্নে বেড়াতে গেছি পুরীর সাগরতীরে; নীল সাগরের ফেনিল ঢেউ সশব্দে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে—সবই দেখছি। স্বপ্নভাঙার পর বেদনার সঙ্গে বুঝি, আমি নিজের বিছানায়। তখন সব 'ঝুটা হ্যায়' বলি। ভাবি, স্বপ্ন কী অবাস্তব। আর মৃত্যুতে দেহ থেকে চলে যাবে মন এবং প্রাণ। তখন যদি মন এবং প্রাণের অস্তিত্ব থাকে সূক্ষ্মভাবে, তখন এই পৃথিবীর খেলা মনে হবে অবাস্তব। স্বপ্নের স্থিতি কয়েক মিনিট বা ঘণ্টা। আমাদের পরমায়ুর অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়। আর আমাদের জীবনের স্থিতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়সের তুলনায় আরো অনেক কম। আমাদের সংগৃহীত জ্ঞান—তার স্রোতোধারায় পরবর্তী প্রজন্ম বহু দূর এগিয়ে যাবে। কিন্তু তখন আমার এই 'আমি' আর থাকবে না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মভাবে থাকলে জগৎ তখন স্বপ্নের মতো প্রপঞ্চ। মানবজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমার অবদান এবং অবস্থিতি অসীম সমুদ্রের বুকে লুপ্ত হওয়া এক বুদ্‌বুদ। কবির ভাষায় ঃ "প্রথম দিনের সূর্য/ প্রশ্ন করেছিল/ সত্তার নতুন আবির্ভাবে—/ কে তুমি?/ মেলেনি উত্তর।/ বৎসর বৎসর চলে গেল/ দিবসের শেষ সূর্য/ শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল/ পশ্চিম সাগরতীরে/ নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—/ কে তুমি?/ পেল না উত্তর।" এটাই 'আমি'র রহস্যময় প্রহেলিকা।

'আমি' কি প্রাণ? প্রাণ এবং মন দুটি আলাদা সত্তা। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান ডিয়েগো ক্যাম্পাসে অবস্থিত 'Centre for Brain and Cognition' এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি লক্ষ্য করল। Electrode-এর দ্বারা Parietal lobe-তে জাগ্রত মানুষের ডানদিকে স্পর্শ করতেই দেহত্যাগ করা মনের শূন্যে ভাসমান অবস্থা বারবার তৈরি হয়েছে। অথচ দেহে প্রাণ রয়েছে। দুটি আলাদা সত্তা বলে প্রতিভাত হয় আবার অন্যভাবে। যেমন Braindeath হওয়া সত্ত্বেও দৈহিক মৃত্যু পরে হয়। গীতার পুরুষোত্তমযোগের সপ্তম এবং অষ্টম শ্লোক এই প্রসঙ্গে তুলনীয় ঃ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।/ মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥/ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।/ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" অর্থাৎ আমারই সনাতন অংশ জীব হয়ে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সংসারে বা কর্মভূমিতে আকর্ষণ করে থাকে। যেমন বায়ু গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ নিয়ে যায়, সেইরকম জীব এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করে, তখন এইসকলকে (পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে) সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য
ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১২৩

প্রসঙ্গ 'টেপিওকা' ও 'ভার্মিসেলি'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১১ সংখ্যায় শ্রীদিলীপকুমার ভারতী 'শ্রীরামকৃষ্ণের চার রসদ্দার পাঁচ সেবায়েত' প্রবন্ধে লিখেছেন, বলরাম বসু শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য চাল, মিছরি, সুজি, সাগু ও বার্লির সঙ্গে ভার্মিসেলি ও টেপিওকার ব্যবস্থা

করতেন। 'টেপিওকা' ও 'ভার্মিসেলি' শব্দদুটি অচেনা লাগায় তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি 'টেপিওকা' সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিয়েছেন, 'ভার্মিসেলি' সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানাবেন বলেছেন। এইসময় আমিও নানা জায়গায় যোগাযোগ করে উক্ত বিষয়ে জানতে পেরেছি। সূত্রগুলি বিশদ আকারে নিবেদন করা হলো, যদি পাঠকবর্গের কখনো কোন কাজে লাগে।

(১) ভার্মিসেলি (Virmicelli) ঃ যব বা গমের পিটুলি বিশেষ, প্রচলিত অর্থে সিমুই বা সেয়োঁ।

সূত্র ঃ (ক) Samsad Students' English Bengali Dictionary, Reprint March 1980, p. 772

'Bishop Candlestick' গল্পে বিশপের ঘরে জেলখাটা এক কয়েদির খাওয়ার সময় এই 'Vermicelli'-এর উল্লেখ আছে।

Vermacelli কথাটি ল্যাটিন—Vermius W or M.

সূত্র ঃ (খ) The Concise Oxford Dictionary, 1987, p. 1193.

Pasta made in long slender threads.

(২) টেপিওকা (বানানভেদে টেপারি) কুলজাতীয় ক্ষুদ্র অম্লমধুর দেশি ফলবিশেষ।

সূত্র ঃ সংসদ বাঙলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত ও পরিবর্তিত ৩য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭১, পৃঃ ২৮২।

করুণাময় কোনার
দুর্গাপুর, বর্ধমান

স্মৃতির সরণিতে 'মায়ের বাড়ি'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'মধুর স্মৃতি' শিরোনামে শ্রীমতী তৃপ্তি বসুর 'মায়ের বাড়ি' সম্পর্কে তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণা পড়ে ঐ বাড়িটিকে ঘিরে আমারও পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। আমার বয়স এখন সত্তর ছুঁই-ছুঁই। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত ঘটনা, কত সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য মনে দাগ কেটে গেছে।

আমার দিদিমা কিরণময়ী দেবী থাকতেন উদ্বোধনের খুব কাছে। তিনি নিত্য 'মায়ের বাড়ি' যেতেন। 'মায়ের বাড়ি' তখন 'মঠ' এবং 'উদ্বোধন' নামেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল। আমার বড়মামা কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঠ ও 'উদ্বোধন' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমার মা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। পূজনীয় স্বামী আত্মবোধানন্দজী মহারাজ (সত্যেন মহারাজ) তখন এই মঠের অধ্যক্ষ এবং একই সঙ্গে নিবেদিতা স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মা ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্রী।

চল্লিশের দশকে আমরা দক্ষিণ কলকাতা থেকে বাগবাজারে দিদিমার কাছে গেলে অতি অবশ্য দিদিমা ও মায়ের সঙ্গে উদ্বোধনে যেতাম। তখন সেটি আমার কাছে আকর্ষণীয় বেড়াবার জায়গা ছিল। শ্রীমতী তৃপ্তি বসুর বর্ণনা অনুযায়ী তখন ঐ বাড়িটি খুবই ছোট ছিল। ঢুকেই বাঁদিকে ছিল বসার ঘর। গণেশ মহারাজ সেখানে বসতেন। মেঝেতেই গদির ওপরে বসে লেখাপড়ার জন্য দু-একটি ডেস্ক ছিল। পাশের ঘরটি ছিল বই ও কাগজপত্রে ঠাসা। সেটি ছিল অফিস ও লাইব্রেরি। এখন সেখানে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐ দুটি ঘরের প্রতি তখন বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। ভদ্রলোক ও সাধুদের দেখতাম সেখানে। উঠানটি ছিল এখনকার চেয়ে বড়। চৌবাচ্চা ছিল সেখানে। উঠানের পূর্বদিকে কোনদিন যাইনি। তাই কাঠের সিঁড়িটি ছিল কিনা মনে নেই। পাশের বাড়িটি তখনো মায়ের বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত হয়নি। তাই পূর্বদিকে একতলা, দোতলা বা তিনতলায় কোন ঘর ছিল না।

আমরা দোতলায় গেলে প্রথমে মায়ের ঘরে ঢুকে খাটের ওপর অধিষ্ঠিতা মাকে ও বেদিতে শোভিত ঠাকুরকে প্রণাম করতাম। তখন ওপরের ঘরগুলির অবারিত দ্বার ছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডানদিকে ছিল স্বামী আত্মবোধানন্দজীর ঘর। সেই ঘরে এবং অন্য ঘরগুলিতে ছিল আমাদের অবাধ যাওয়া-আসা। তখন সেখানে এখনকার মতো এত লোকসমাগম হতো না। দোতলার ভিতরের বারান্দাটি ছিল বেশ সরু। এখনো পূজনীয় সারদানন্দজী মহারাজের ঘরের সামনের থামগুলি সেই চিহ্ন বহন করছে।

আমরা ছোটরা মায়ের ঘর পার হয়ে সামনে রাস্তার ধারের বারান্দায় চলে যেতাম। সেখান থেকে সামনের বস্তির ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, তাদের ঘর-বাড়ি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতাম। কখনো কখনো তিনতলার ছাদেও যেতাম। ততক্ষণ দিদিমা ও মায়ের যথাক্রমে পুজো ও স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ চলত। তারপর ডাক পড়ত প্রসাদ নেওয়ার জন্য। ফল-প্রসাদ ছাড়াও অনেকসময় অন্নপ্রসাদও লাভ করেছি। পাতা পেতে বসার জায়গা হতো একতলায় ঢুকেই ডানদিকের ঘরে। এখনো সেখানে মাঝে মাঝে প্রসাদ গ্রহণ করি। একদিন প্রসাদে পাওয়া খুব জিরিজিরি করে কাটা মচমচে আলুভাজা (সম্ভবত বলরাম মহারাজের নিজের হাতে কাটা) ও কলাইয়ের ডালের কথা এখনো মনে পড়ে। গোপাল মহারাজকেও মনে আছে। স্বামী আত্মবোধানন্দজীর ঘরে তাঁর পরিবেশিত বড় বড় রাজভোগ খেয়েছি। বড়রা চা পেতেন সেইসঙ্গে।

'মায়ের বাড়ি' শৈশব থেকে বার্ধক্যে আমার প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখনো একানব্বই বছরের মাকে নিয়ে দিদি ও আমি যখন মায়ের বাড়িতে যাই, মনে হয় যেন বাপের বাড়ি এসেছি। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে সাধু-মহারাজ ও কর্মীদের আন্তরিকতা মনে আনন্দের প্রলেপ লেপন করে।

সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়
চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

তমসা থেকে জ্যোতির পথে কয়েকজন অভিযাত্রী

উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি রেজিস্টার্ড N.G.O. এবং বিগত চারবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে কারা-আবাসিকদের মধ্যে এডস্ ও স্বাস্থ্য

সচেতনতা বিষয়ে কাজ করে চলেছে। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কারা-আবাসিক রাসেন্দু চক্রবর্তী আমাদের এই কাজে প্রথম থেকেই সাহায্য করে চলেছে। এখন ও আছে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। রাসেন্দু শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে সংশোধন করতে উদ্যোগী। এই বছর উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসবে জেলকর্তৃপক্ষ পুলিশ পাহারায় রাসেন্দু ও আরো তিনজন বন্দিকে নিয়ে আসে। সে 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিভিন্ন বই সে নিয়মিত পড়ে। এবার ঠাকুরের তিথিপূজা উপলক্ষ্যে সে 'রাজপথ' নামে একটি কবিতা লেখে এবং তার খুব ইচ্ছা সেটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হোক। কবিতাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হলে সে যে অত্যন্ত আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে, তা বলা বাহুল্য। কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

রাজপথ

(রাসেন্দু চক্রবর্তী)

পথের শেষে রাজার বাড়ি আছে বলে
রাজপথ নামাঙ্কিত করি,
শুনেছি রাজা মোদের বেশ আমুদে,
দেখা করিবারে রাজপথে চলি।
শুনেছি রাজপথটি বড়ই মসৃণ
মসৃণতাতে অনেকে যায় পিছলে,
পথের শেষে আমুদে রাজাকে
দেখিবারে নাহি পায়।
পথটি নাকি তিনটি ভাগে বিভক্ত
বামে ইড়া, ডানে পিঙ্গলা, মাঝে সুষুম্না শক্ত
বামে বা ডানে গেলে নাহি পারে পৌঁছিবারে
পথের শেষে আমুদে রাজার দরবারে।
শুরু থেকে শেষ আছে পান্থশালা ছয়
পান্থশালার নামকরণ পৌরাণিক বলে শক্ত,
মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধ-আজ্ঞা
তারপর রাজার সিংহদরজা সহস্রার অবস্থিত।
মধ্যপথে এগোবারে ছটি রিপুর বাধা আসে
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য নামে পরিচিত,
ছয়ের বাধা কাটিয়ে যেজন চলিবারে পারে
তারাই তো পৌঁছাতে পারে রাজার দ্বারে।
মূলাধারে রহেন কুণ্ডলিনী
তিনি তো মোদের শক্তিস্বরূপিণী,
তিনি রহেন সুপ্তাবস্থায়
সংযম ও সাধনে জাগ্রত হয়ে চলেন সহস্রারমুখী।
সিংহদরজা খুললে 'পর আমুদে রাজার দেখা মেলে
রাজার দেখা পেলে ধরার সকলই যায় ভুলে,
আমুদে রাজার আনন্দ পেয়ে
কেহ ফিরিতে পারে, কেহ নাহি পারে।

নিম্ন হতে ঊর্ধ্বে যাওয়ার তরে কেহ কেহ
মসৃণতার কারণে বারে বারে যান পিছলিয়ে,
যোগে ও ক্রমোর্ধ্বে যাইবারে
রিপুদমনে সক্ষমেরা যান পূর্ণানন্দে মিশিয়ে।

অবনীন্দ্র নাগ
কলকাতা-৭০০ ০০৫

বন্দির মুক্তি

আমরা দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ বন্দি। বন্দি-জীবনের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যায় না। প্রতিদিন আমরা সেই কষ্ট ভোগ করে চলেছি। কিন্তু তারই মধ্যে এমন একটি দিন ছিল, যেদিন কিছুক্ষণের জন্যও আমরা মুক্তি, আনন্দ ও ভালবাসার মধুর স্বাদ পেয়েছিলাম। সেদিনের সেই অপূর্ব স্মৃতি আমাদের বন্দি-জীবনের দুঃখকে অনেকটাই দূর করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্যি বলতে কি, আমরা আমাদের জীবনকে নতুন করে—আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি।

২৬ বছর আগে একটা কথা শুনেছিলাম—'কৃপা' মানে করে (কৃ) পাওয়া (পা)। এতদিন পরে কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। দিনটি ছিল ১১ জুন ২০০৫। সেদিন আমরা চারজন বন্দি শ্যামপুকুর থানা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে। থানার এক পুলিশ কর্তা আমাদের এখানে নিয়ে আসার পর বুঝতে পারলাম সৎ পবিত্র জীবনযাপনের আনন্দ কতটা। ঐ পুলিশ কর্তাটির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, আমরা আপনাদের সঙ্গে ঐ অতি ব্যস্ততার দিনে আলোচনার জন্য বেশি সময় পেলাম না। কিন্তু যে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় আপনারা এবং আমাদের পুলিশ কর্তা আমাদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, প্রসাদ দিলেন—তা আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে। ভবিষ্যতে আমরা সঠিক পথে চলব—এই বিশ্বাস আমরা লাভ করেছি। আমাদের যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা পরে বললেন যে, তাঁরা নাকি এর আগে মায়ের বাড়িতে যাননি। আমাদের নিয়ে যেতে গিয়ে তাঁদেরও সব দর্শনাদি হয়ে গেল। তাঁরা তো খুব খুশিই, বন্দিভাইরাও সকলে খুশি। আবার কবে সেখানে যাব, সেই আশায় দিন গুনছি। মনের আনন্দে এতখানি লিখে ফেললাম, কিছু ভুল করে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন। আসলে ফিরে আসার পর থেকে আমাদের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, আমাদের এই আনন্দের কথা সকলকে জানাই। আমরা সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' কিনেছি এবং 'উদ্বোধন'-এ আমাদের গ্রাহকমূল্য জমাও দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমাদের দীক্ষা নেওয়ার বাসনা, দেখা যাক মা কি করেন। তাঁর অনেক দয়ায় আমরা এখন খুব ভাল আছি। আপনারাও ভাল থাকুন। প্রণাম নেবেন।

রাসেন্দু চক্রবর্তী, শ্যামকমল খাওয়াস,
শৈলেন ব্যানার্জি, নিমাই কোরা
মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল, পশ্চিমবঙ্গ

যুদ্ধ প্রসঙ্গে তত্ত্বকথা

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়*

যুদ্ধ পৃথিবীর মাটিতে ঘটে থাকে। সেখানে তার লক্ষ্যবস্তু—হয় সোনার খনি, না হয় তেলের খনি অথবা অন্য কোন সম্পদ, এমনকি মানবসম্পদও হতে পারে। শূন্যে বিচরণকারী হেলিকপ্টার ও বিমান আধুনিক যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য, যদিও তাদের মাঝে মাঝে নেমে আসতে হয় মাটিতে লক্ষ্যের দিকে। উর্ধ্ব থেকে নিচের দিকে তাকালে অনেক কিছু নজরে পড়ে; কিন্তু দৃষ্টির ভুল সংশোধনে ভূমিতে নামাটাও জরুরি।

সাধারণ বুদ্ধির বিচারে যুদ্ধ একধরনের বিশাল অপরাধ, মানবকুলের চিরশত্রু, চিরনিন্দনীয় ও চির-অবাঞ্ছিত। তাই অনেক কাব্যে ও গদ্যসাহিত্যে যুদ্ধের যন্ত্রণাময় পরিণতি (tragic aspect)-কে প্রাধান্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। তবু এমন অনেক যুদ্ধবিষয়ক কবিতা, কাব্য ও কাহিনী আছে, যেখানে মানুষের শৌর্যবীর্য ও আত্মত্যাগ গৌরবোজ্জ্বল রূপে চিত্রিত ঃ

"Cannon to right of them,
cannon to left of them,
Volly'd and thunder'd,...
They were not to reason why,
They were but to do and die."

(The Charge of the Light Brigade—Tennyson)

রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধকাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রামায়ণে নারীত্বের প্রতিভূ সীতার মর্যাদারক্ষায় এবং ধর্ম ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য রামের আবির্ভাব এক বীর যোদ্ধার ভূমিকাতে। মহাভারতের যুদ্ধ স্পষ্টতই ধর্মসংস্থাপনায়; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে প্রেরণা দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ...।/ ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"—হে পার্থ কাতর হয়ো না,... তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে অগ্রসর হও।

তাহলে অন্যায়ের প্রতিরোধে যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম, তা হেয় কর্ম নয় বরং তা মানুষের কর্তব্য। জীববিজ্ঞানী ডারউইন 'Origin of Species' গ্রন্থে (১৮৫৯) প্রাণীর জীবনযাত্রার মূল সূত্র দিয়েছেন ঃ "Struggle for existence and survival of the fittest." অর্থাৎ জীবন হলো অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং যোগ্যতম যারা তারাই কেবল এই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে পারে (যোগ্যতমের উদ্বর্তন)। "মরে বাঁচ" (Die to live) বলে একটা নীতিবাক্য আছে বটে, কিন্তু গীতার বিচারে এমন বাঁচা বাঁচাই নয়। বেঁচেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে গেছেন ও অমর হয়েছেন—ঔদাসীন্যের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নয় অথবা আত্মহত্যা করেও নয়। আসলে কোন কাজের মূল্যায়নের জন্য কাজটির মূলগত উদ্দেশ্য (motive)-কেই লক্ষ্য করা দরকার, কেবল কাজটিকে নয়। আদালতের বিচারের ভিত্তি হচ্ছে বিচারাধীন কাজটির উদ্দেশ্য কি তা নির্ণয় করা। যদি প্রতিপন্ন হয় যে, কোন হত্যার মূলে ছিল আত্মরক্ষার অপরিহার্য তাগিদ এবং সেটাই ছিল হত্যা-কারীর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহলে তার মুক্তি হওয়ারই কথা।

॥২॥

অন্যায়ের প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে যুদ্ধের মূলে আর যেসব উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা হলো লুণ্ঠনের প্রবণতা বা লালসা এবং মানুষের পাশব প্রবৃত্তিগত আক্রমণ-প্রবণতা (যুদ্ধ-প্রবৃত্তি), যা হিংসাবৃত্তির (ধ্বংস কামনার)-ই নামান্তর। মানুষের আরেকটি মৌল প্রবৃত্তি হলো প্রাধান্য (প্রভুত্ব)-লাভের প্রেরণা, যা পশুর জগতেও দেখা যায়। অনেক সময় ঐ দুই বৃত্তি (যুদ্ধবৃত্তি ও প্রাধান্য-বৃত্তি) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। হিংসা অথবা প্রাধান্য-লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে-আক্রমণ তা বর্বরতারই অন্তর্গত অপরাধ। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে হিংসাকে সংযত করে রাখতে পারলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখি, সকলে সবসময় ঐরকম সংযম বজায় রাখেন না। সহজাত প্রেরণাগুলি দমনের ব্যাপারে মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিটাই যথেষ্ট নয়—চাই আত্মিক বল (Spiritual strength)। লালসাজনিত যে-আক্রমণ (লুণ্ঠন) তা স্পষ্টতই অত্যন্ত নিন্দনীয়, জঘন্যতম অপরাধ; বিশেষত এই কারণে যে, লালসার সংবরণ মানুষেরই সামর্থ্যগত। লালসা প্রসঙ্গে ঈশ উপনিষদের সেই মন্ত্রটি উল্লেখ্য, যা সংসারযাত্রার মন্ত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মনকে বারংবার আন্দোলিত করেছিল ঃ "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।/ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥ অর্থাৎ ঈশ্বর যাকিছু দিয়েছেন, কেবল তা-ই ভোগ করবে, পরের ধনে লোভ করো না। (অবতারণিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড) আমেরিকার ইরাক আক্রমণ যদি হয়ে থাকে লুণ্ঠন-প্রবণতারই অভিব্যক্তি, তাহলে তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও জঘন্যতম অপরাধ।

প্রভুত্বলাভের যে মৌলিক প্রেরণা তা যুদ্ধ-প্রবৃত্তির (ধ্বংস-প্রবৃত্তির) সঙ্গে সম্বদ্ধ থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল প্রভুত্বলাভের প্রেরণা এবং যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐ তালিকায় ভোগলিপ্সা বা লুণ্ঠন-প্রবণতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। লালসা যত না জৈবিক (biological), ততটাই মানসিক

* *অবসরপ্রাপ্ত রিডার, রামানন্দ কলেজ, বাঁকুড়া।*

(psychological)—মানুষের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যার সংবরণ সম্ভব। ধ্বংসবৃত্তি সভ্যতার বিনাশ ঘটায়; আবার ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে নতুন সৃষ্টির সূচনাও হয়, নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। বনের বৃক্ষকে কেটে ফেলে তাদের ডাল ও কাণ্ড থেকে যেসমস্ত কাঠ পাওয়া যায়, সেগুলি গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইঁট গুঁড়িয়ে যে সুরকি পাওয়া যায়, তাকে নতুন নির্মাণের কাজে সিমেন্ট (cement) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ফ্রয়েড অবশ্য প্রাণজ প্রেরণার পরিশোধন ও উদ্গতি (sublimation)-এর কথাও বলেছেন। উদ্গতির ফলে সহজাত প্রবৃত্তিকে উচ্চতর ও গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা যায়। কিন্তু মানবদেহের গঠনতন্ত্রের মধ্যে ঐরকম উদ্গতির স্থিতিকালই বা কতখানি? পূর্ণ রূপান্তর কি সম্ভব?

তাহলে কি বলতে হয়, যুদ্ধ মনুষ্যকুলের বংশানুক্রমেই নিহিত (War is in the germ of man)? পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কোন একসময় ফ্রয়েডকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোতে এমন এক পথের সন্ধান দিন যা বিশ্বসমাজকে যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করবে। তাতে ফ্রয়েড উত্তর দিয়েছিলেন—তা সম্ভব নয়, কেননা মানুষ একধরনের প্রাণীবিশেষ, পশুপক্ষীর তুলনায় উচ্চতম প্রাণী (higher animal) মাত্র, অতিপ্রাণী (super animal) নয়। হিংসা (violence) বা ধ্বংসপ্রেরণা পাশব প্রকৃতিতে অনিবার্যভাবে উপস্থিত। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু 'Everyday Psycho-analysis' গ্রন্থে তত্ত্বটিকে বোঝাবার জন্য একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক কোচম্যান যেন নৃশংসভাবে তার ঘোড়াকে চাবুক মেরে চলেছে। তা দেখে কোন পথচারী কোচম্যানটির হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে তাকেই চাবকাতে থাকে। নৈতিক দৃষ্টিতে এর সমর্থন মিলতে পারে; বলতে পারি, এটা প্রাণীর প্রতি নির্মম আচরণের একধরনের মানবিক প্রতিক্রিয়া—শাস্তিদান। কিন্তু ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে ঘোড়াটির ওপর কষাঘাত-দৃশ্য ঐ পথচারীর নির্জ্ঞান মনের সুপ্ত আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং এরকম ক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষ থেকে নৈতিক সমর্থনের স্পষ্ট সম্ভাবনা থাকায় পথচারীটি সাহস করে কোচম্যানকে চাবুক মেরে নিজেরই জাগ্রত আক্রমণ-বাসনা পূরণ করে নেয়।

এদিকে, ধর্মমাত্রেরই লক্ষ্য শান্তি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ঘোষণায়—ধর্ম বিশ্বকে সুস্থিত রাখে। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ শান্তি। যিশুখ্রিস্ট বিশ্বকল্যাণের বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। "তবুও ফেরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।" স্বামীজী শিকাগো ভাষণে হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করে বলেন: "Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism... have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilisation and sent whole nations to despair." (সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এর ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মাদনা... পৃথিবীকে হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, বারংবার এর মাটিকে মানুষের রক্তে সিঞ্চিত করেছে এবং মনুষ্যজাতিকে একেবারেই নিরাশ করে দিয়েছে।) তাঁর বিচারে, ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য হবে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা—বিবাদ নয়, একের অপরের ভাবকে গ্রহণ ও আত্মীকরণ—বিনাশসাধন নয়, শান্তি ও সমন্বয়—মতবিরোধ নয়। ("Help and not Fight, Assimilation and not Destruction—Harmony and Peace and not Dissension.") অবশ্য ধর্মযুদ্ধ যদি হয় কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের মতো—ধর্মসংস্থাপনায় (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), তাহলে তারও পরম লক্ষ্য হবে মানবসমাজকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু জীবনের বাস্তবতায় সেই বিষয়ে সায় আছে কি? আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বিরোধ, তা আজও মানুষকে আন্দোলিত করে রেখেছে। অধিক ক্ষেত্রেই দেখি, ধর্মযুদ্ধের মূলে জৈব-প্রেরণাগুলি কাজ করে। আক্রমণ-প্রবণতা এবং স্বকীয় সাম্প্রদায়িক মতকে তুলে ধরে অপরকে দাবিয়ে, এমনকি আত্মসাৎ করেও নিজের প্রাধান্যলাভের কামনাই (প্রভুত্ব-কামনা) প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আশ্চর্যের বিষয়, বিজ্ঞানের যুগেও যখন মানুষ গ্রহান্তবর্তী (inter-planetary) সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করছে, তখন ধর্মীয় জেহাদ মানব-সভ্যতাকে ক্রমশ বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, মানুষের হিংসাবৃত্তি ও প্রভুত্বকামনা হয় ধর্ম কিংবা রাজনীতি অথবা অর্থনীতিক—কোন এক আদর্শকে উপলক্ষ্যমাত্র করে আত্মপ্রকাশ ও আত্মতৃপ্তি ঘটিয়ে নেয়।

॥৩॥

আবার কার্ল মার্ক্স মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিকে তার প্রকৃত মুক্তি বলে মনে করেছিলেন। তাঁর বিচারে, মনুষ্যগোষ্ঠীকে কেবল দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—একটি অর্থলিপ্সু বা মাত্রাতিরিক্ত ভোগলিপ্সু (greedy) এবং অন্যটি অভাবী (needy)। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি জনসাধারণকে শোষণ করে তাদের ভোগলিপ্সা মিটিয়ে চলে, আর অফুরান হলো তাদের লিপ্সা। এইভাবে অলস শোষক ধনী শ্রেণি ও অন্যদিকে পরিশ্রমী বিত্তহীন (proletarian) শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। শাসনক্ষমতা ও বিত্তের উৎসগুলি যদি ঐ আপাত অসহায় বিত্তহীন শ্রেণির হাতে চলে আসে, তাহলে সমাজে স্থায়িভাবে সাম্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হতে পারবে। কিন্তু ঐরূপ সমাধান নির্ভর করে সমাজ ও প্রকৃতির উৎপাদন-সামর্থ্যের ওপর। প্রশ্ন হলো: গোটা সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতিতে ভোগের

উপকরণ কি পর্যাপ্ত? ডারউইনের বক্তব্য তা নয়। তাঁর ঘোষণায় প্রাণীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী ও চিরন্তন, যেহেতু প্রকৃতির দেওয়া ভোগের উপকরণ অপর্যাপ্ত, অতি সীমিত (nature is not prolific)। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের অন্যতম প্রধান কারণটি ছিল অর্থনৈতিক। অবশ্য যদি সমাজতন্ত্রের বিশ্বায়ন (globalisation) হতে পারে, তাহলে হয়তো সমস্যাটির নিষ্পত্তি সম্ভব হবে, কেননা সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক গবেষণা এই আশাসূচক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে (যা World Health Organisation-এর বক্তব্যে প্রকাশিত) যে, বিশ্বসমাজের যা উৎপাদন তা বর্তমান জনসংখ্যার ছয়গুণকে তৃপ্ত করতে পারে; পক্ষান্তরে ধনতন্ত্রী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অপচয় (wastage)। এই গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের দূরদৃষ্টি অনুযায়ী, প্রকৃতির যে সম্ভাব্য সামর্থ্য (potentiality) তার বাস্তব রূপায়ণ সার্থক হলে যে বিস্ময়কর পরিণাম দেখা দেবে, যে নববিভূতির আবির্ভাব ঘটবে—তা বর্তমান অবস্থাতে অকল্পনীয়। কিন্তু এ তো তত্ত্বকথা ও স্বপ্নমাত্র। তাছাড়াও সমস্যা এই যে, অর্থনীতি মানবজীবনের অনেকাংশ জুড়ে থাকলেও সেটাই একমাত্র জীবনকথা নয়। অবশ্যই মানুষ তার ভোগলালসাকে সংবরণ করে সমাজ বিবর্তনের এক নতুন অধ্যায়ে পৌঁছাতে পারে, কেননা লুণ্ঠনপ্রবণতা প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) নয়। কিন্তু আক্রমণ-প্রবৃত্তি ও প্রভুত্ব-কামনা নিঃসন্দেহে সহজাত। মনোবিজ্ঞানী অ্যাডলার শক্তি (প্রাধান্য)-লাভের প্রবণতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তাই বলা যায়, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও উৎকণ্ঠা (anxiety) হচ্ছে মানবজীবনের অপরিহার্য সঙ্গী।

॥৪॥

সমাধান কোথায়? ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক (existentialist) জাঁ পল সারত্রেঁ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা পরিণতিতে অত্যন্ত উৎপীড়িত বোধ করেন এবং মানবজীবনের ভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। প্রাণের গঠনতন্ত্রে উপাদান হিসাবে হিংসা (আক্রমণ-প্রবৃত্তি) ও যুদ্ধের সম্ভাবনা অনিবার্যরূপে উপস্থিত বলেই উৎকণ্ঠা ও ভীতি মানব-বৈশিষ্ট্যের একটা অঙ্গ হয়ে আছে। ঐ উৎকণ্ঠা আবার সারত্রেঁকে ছুটিয়েছে মুক্তির সন্ধানে, তাঁর চিন্তাকে জীবনের ব্যাপারে ঐকান্তিকরূপে অভিনিবিষ্ট করেছে—যার ফলে তাঁর ভিতরে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হয়েছে তা আরেকজন অস্তিবাদী দার্শনিক হাইডেগারের চিন্তাধারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। জীবনযন্ত্রণার অনিবার্যতার কথাই তাঁদের চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। সারত্রেঁ অনুভব করলেন, প্রত্যেক মানুষ সমস্যা ও যন্ত্রণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সমস্যাক্লিষ্ট জীবন অতিবাহিত করে এবং যন্ত্রণাতেই হয় তার মৃত্যু। এই জীবনের বাইরে (অতিবর্তী) কোন মুক্ত এলাকার কথাও এখানে বলা হয়নি। কিন্তু জীবনযন্ত্রণা অনুভবকারীর অস্তিত্ব ও আত্মচেতনাকে লুপ্ত করে না বরং তীব্রতররূপে প্রকট করে। এমনকি সারত্রেঁর বক্তব্য, ঐরূপ যন্ত্রণার উপলব্ধিতে মানুষ মুক্তির চেতনাও লাভ করে ("It is in anguish that man gets the consciousness of freedom—Being and Nothingness.")। অবশ্যই হাইডেগার বা সারত্রেঁ ভাববাদী (idealist) নন এবং যন্ত্রণাময় বাস্তব জীবনযাত্রায় সাহসের সঙ্গে অংশগ্রহণেই তাঁদের আগ্রহ লক্ষণীয়। সংগ্রাম ও যন্ত্রণাকে জীবনের এক স্বাভাবিক ও সর্বজনীন ব্যাপার বলে মেনে নিতে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। এমন মেনে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে উপশম (relief)। অস্তিত্ববাদী হাইডেগার দেখিয়েছেন যে, উদ্বেগপ্রবণতা, অনির্দিষ্ট ভীতি (vague fear), আতঙ্ক (phobia), অবসাদ ইত্যাদি মানসিক বিকারের রূপগুলি ব্যক্তিমাত্রেরই গঠনতন্ত্রে নিহিত রয়েছে—কেবল নির্দিষ্ট কোন মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, সমস্ত মানুষই ঐসব সমস্যাতে বিজড়িত। সংগ্রাম, ভয় ও উৎকণ্ঠাকে জীবনের আবশ্যিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার বলে বুঝে নিতে পারলে মানসিক অস্থিরতার মাত্রা হ্রাস পায় এবং ব্যক্তিবিশেষ ঐগুলিতে নিজেকে সার্থকরূপে উপযোজিত (adjusted) করে নিতে পারে। তখন জীবনসংগ্রাম তার অনুভবে স্বাভাবিক ও সহজ হয়, সে অনায়াসেই সংগ্রামের সম্মুখীন হতে পারে; সংগ্রামের পরিণতিতে তার কর্মযোগ্যতা (efficiency) এবং জীবনের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয় না। এমন চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় জে. এম. সিনজের 'Riders to the pea' নাটকে, যেখানে দুঃখদগ্ধা নায়িকা হলেন এক ধীবর পরিবারস্থ মা মৌরিয়া। তাঁর স্বামী সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গেলেন এবং পরবর্তী কালে তাঁর সব পুত্রই একের পর এক ঐভাবে মারা গেল। তাঁর সর্বশেষ পুত্রকে মৃত অবস্থাতে দেখে মৌরিয়া মুহ্যমান না হয়ে

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪৮

পাশাপাশি ঃ (১) বিশ্বরূপ, (৫) জমদগ্নি, (৭) সমাধান, (৯) যোগী, (১০) বনমালী, (১১) নায়ং, (১২) পদং, (১৫) নয়নম, (১৭) মোহ, (১৮) নরাণাঞ্চ, (১৯) অহিংসা, (২১) নমস্কার।

ওপর-নিচ ঃ (১) বিভূতিযোগ, (২) পরমাশ্রয়, (৩) বীজ, (৪) অগ্নি, (৬) মহিমানং, (৮) নব, (১১) নারায়ণং, (১৩) দক্ষিণায়ন, (১৪) অহংকার, (১৬) মন, (১৯) অস্ত, (২০) সাম।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

সিদ্ধার্থ মাণ্ডি, রমা রায়চৌধুরী, দিলীপকুমার মৌলিক, গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।

স্থিরচিত্তে বললেন—পৃথিবীর কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কি আশা করা যায়? কোন মানুষ চিরকাল জীবিত থাকে না এবং ট্র্যাজেডির রূপ যাই হোক না কেন, আমাদের প্রশান্ত চিত্তে তাকে মেনে নিতেই হবে। ("What more can we want than that? No man at all can be living forever and we must be satisfied.")

ভাববাদী চিন্তাধারায় যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরা হয়তো হাইডেগার, সারত্রেঁ প্রমুখ অস্তিত্ববাদীদের দুঃখবিষয়ক উক্তিগুলিকে তাঁদেরই (অস্তিত্ববাদীর) বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সুসামঞ্জস করে দেখতে অস্বস্তি বোধ করবেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন: এমন অস্তিত্ববাদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি? তাঁদের বিচারদৃষ্টিতে হাইডেগার বা সারত্রেঁর অপরাজেয় মনোবলের উৎসটি কোথায় যেন ধূমায়িত, প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সারত্রেঁ ও মৌরিয়া যদি তাঁদের অবচেতনার অবগুণ্ঠনে অন্তত তাঁদের জড়বাদী (materialistic) দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাপিয়ে উঠতে না পেরে থাকেন, তাহলে তাঁদের ঐ বেপরোয়া কথাগুলি মুখের কথা মাত্র। তবুও অনস্বীকার্য যে বর্তমানে, বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকায়, মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে এজাতীয় অস্তিত্ববাদের প্রভাব বেশ কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং ইতিহাস, নৃতত্ত্ব (anthropology) এবং সমাজবিজ্ঞানেও এর যুগান্তকারী প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে জানাতে চেয়েছেন যে, ধ্বংস ও দুঃখের আড়ালে কোথায় যেন অমৃত লুকিয়ে আছে—যেজন্য তারই প্রচ্ছন্ন প্রেরণায় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা মৃত্যুকেও উপেক্ষা করে উচ্চমানের জীবনযাত্রা নির্বাহে সমর্থ। স্বামীজী তাঁর 'জীবন্মুক্তের গীতি'তে বিপদসঙ্কুল মানবাত্মাকে দিয়েছেন আশার বাণী: "রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি আসুক জগৎ/ চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,/ হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,/ মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্যগতি নয়।" তিনি 'অজানা দেবতা'তে গেয়েছেন: "দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে—/ হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন,/ বেদনায়, অশ্রুধারে, মর্ম-যন্ত্রণায়—/... কৃতজ্ঞ হৃদয় তার করে উচ্চারণ—/ 'ধন্য দুঃখ, ধন্য এ বেদনা'।" 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় শ্যামা মা যুদ্ধ ও বিনাশের জননীরূপে চিত্রিত। ধ্বংস ও প্রমাদের জননী হয়েও তিনি আনন্দময়ী। "জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?/ দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥/ পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।/ চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: "বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" বা "মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।" তিনি তাঁর 'দুঃখ' নিবন্ধে লিখেছেন: "মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল অশ্রুজলে আচ্ছন্ন নয়, রুদ্রতেজে দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজ পদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখও সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ।" আবার তিনি লিখেছেন: "যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই আনন্দস্বরূপ।" "দুঃখ ও রসের পথ, রসেরই উপায়, রসের নামান্তর।" ব্রিটিশ দার্শনিক হোয়াইটহেডের উক্তি: "মৃত্যু জীবজগতের, প্রত্যেক বাস্তব সত্তা (actual entity)-র অনিবার্য পরিণতি; আর মৃত্যুরহস্যের উদ্ঘাটনেই রয়েছে অমৃতের স্বাদ।" "Peace is the understanding of tragedy."—প্রশান্তি হলো দুঃখাশ্রিত প্রজ্ঞা (অর্থাৎ দুঃখের মর্মোপলব্ধিজাত প্রজ্ঞা)।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন: "আনন্দ হলো জীবন্ত যাকিছু তার প্রচ্ছন্ন উপাদান,/ দুঃখ ও শোক অবধি বিশ্ব আনন্দের ছদ্মবেশ,/ তা লুকিয়ে রয়েছে তোমার বেদনা আর আর্তির পিছনে।"

উক্ত অস্তিত্ববাদী ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারায় ব্যক্তিবিশেষ সমাজ ও পার্থিব পরিবেশের আমূল রূপান্তরের কথা নেই; হিংসা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ যেন পার্থিব জীবনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য-রূপেই রয়ে গেছে; লোকোত্তর ভূমির মরমি (mystic) অভিজ্ঞতায় কেবল সমস্যাগুলি অতিক্রান্ত হতে পারে। তাই বুদ্ধদেব পার্থিব চেতনার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে নির্বাণলাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মানুষকে জানিয়ে গেছেন। শঙ্করাচার্যও বিশ্বপ্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলে বুঝে মানুষকে বলেছেন তার প্রাকৃত চেতনাকে নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন করে দিতে; ব্রহ্মনির্বাণকেই তিনি পরম জীবনাদর্শরূপে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতের প্রাচীন ও গতানুগতিক অধ্যাত্মবাদীরা লোকোত্তর ভূমিতে হয় নির্বাণ অবস্থায় অথবা দ্যুলোকে (স্বর্গে) জীবনসমস্যার নিষ্পত্তি খুঁজেছেন। প্রতীচ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য স্বর্গলোক।

এতকাল জীবের জড় শরীরটাকে বন্ধনের হেতু বলে মনে করা হয়েছে বলেই জীবন্মুক্তি (জীবদ্দশায় মুক্তি) যথার্থ মুক্তি হিসাবে গণ্য হয়নি। সেই মতে, শুদ্ধচিত্ত সাধকের দেহাবসানের পর যে বিদেহমুক্তি ঘটে, কেবল সেটাই প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন যে, দুঃখনিবৃত্তি পৃথিবীতেও সম্ভব এবং তা সম্ভব মানুষের রূপান্তরসাধনার পরিণতিতে। সৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতি কি ধ্বংসে এবং মৃত্যুতে? জগৎস্রষ্টা মূঢ় ও নীরস নন, খামখেয়ালিও নন। "এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রীতি।" (দিব্যজীবন, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৬) অবশ্যই মানুষ তার দৈহিক গঠনে চিন্তা ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণীমাত্র, যার মধ্যে ভালবাসা হিংসাবৃত্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু প্রাকৃত বিবর্তন (evolution of nature)-এর পরিণাম হিসাবেই মানুষের জড় শরীরটারও রূপান্তর ঘটবে—সেটি হবে দিব্য শরীর। জড় বন্ধন নয়—অজ্ঞান (ignorance)-ই প্রকৃত বন্ধন, যা জীবের মন, প্রাণ ও জড়দেহকে মাত্রাভেদে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। সাধককুল তাঁদের উত্তরণের ভূমিকাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দে অবতরণেরই পূর্ববর্তী ভূমিকা রচনা করে গেছেন, কেউ হয়তো অজ্ঞানে, কেউ বা সজ্ঞানে—কারণ উত্তরণ এবং অবতরণ বিশ্বপ্রকৃতির একই বৃহৎ সাধনার দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা যেমন ফরাসি লেখক সারত্রেঁকে তাঁর দর্শনচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, তেমন আবার প্রথম যুদ্ধের ভীষণ রূপ আরো তিনজন মনীষীর চিন্তাকে আন্দোলিত করে—ভারতের শ্রীঅরবিন্দ, গ্রেট ব্রিটেনের স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার এবং ফ্রান্সের টেইলর। এই তিনজনই পার্থিব বিবর্তনের দিব্য পরিণতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাহলে যুদ্ধের সমাধান মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে নেই—সমাধান আছে প্রাকৃত বিবর্তনেরই নতুন এক পর্যায়ে, প্রকৃতির অঙ্গীভূত আত্মসচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী মানুষেরই আধ্যাত্মিক সাধনার চূড়ান্ত পরিণতিতে, মানুষকে ছাপিয়ে যাওয়ার মধ্যে। অস্তিত্ববাদী হাইডেগার যথার্থই বলেছেন, দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠা মানুষের গঠনতন্ত্রেই নিহিত প্রায় সহজাত বৈশিষ্ট্যের মতো। শ্রীঅরবিন্দের ধারণায় মনের উচ্চতম স্তরেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে—যার প্রতিফলন পাওয়া গেছে সুর ও অসুরের যুদ্ধে (এখানে, মানুষী শরীরে যেসব দেবতা, তাঁদের সুর বলা হয়েছে—তাঁরা অতিমানস নন)।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষের ভিতরে দেবত্ব লুকিয়ে আছে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শুধু যে মানুষী চেতনার রূপান্তর হবে তা নয়, মানবদেহেরও রূপান্তর সম্পূর্ণ হবে—শুঁয়োপোকা যেমন রূপান্তরিত হয় প্রজাপতিতে। ❑

শব্দচেতনা ৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কিত শব্দছক

পাশাপাশি : (১) "সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু ——" (৩) যিনি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানেন (৫) "—— শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি" (৬) "দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং —— রাজসং স্মৃতম্" (৭) "ন চ সংন্যসনাদেব —— সমধিগচ্ছতি" (৮) "যে চৈব সাত্ত্বিকা —— রাজসাস্তামসাশ্চ যে" (৯) সর্বভূতে এক পরমাত্ম জ্ঞানকে যে-জ্ঞান বলা হয় (১১) জলাশয়ের মধ্যে যে-জলাশয় ঈশ্বরের বিভূতিরূপে ধ্যেয় (১৩) "এবং বহুবিধা যজ্ঞা ——ব্রহ্মণো মুখে" (১৫) "—— সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি" (১৬) "যে যথা —— প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (১৭) যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়, তাদের নিরন্তর এখানে বাস করতে হয় (১৯) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (২০) "——বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্" (২১) "চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি —— মৎপরঃ" (২২) "—— সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্"।

ওপর-নিচ : (১) "ভোক্তারং —— সর্বলোকমহেশ্বরম্" (২) "—— জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি" (৩) "—— প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" (৪) "ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং —— ন দানবাঃ" (৫) ধর্মসাধনায় পাঁচটি মহাব্রতের অন্যতম (৮) অর্জুনকে শ্রীভগবান এই নামেও সম্বোধন করেছেন (১০) "—— পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ" (১২) "—— পূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ" (১৪) "—— দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্" (১৬) মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ" (১৮) "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু ——" (২০) "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি —— প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম কার্তিক ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
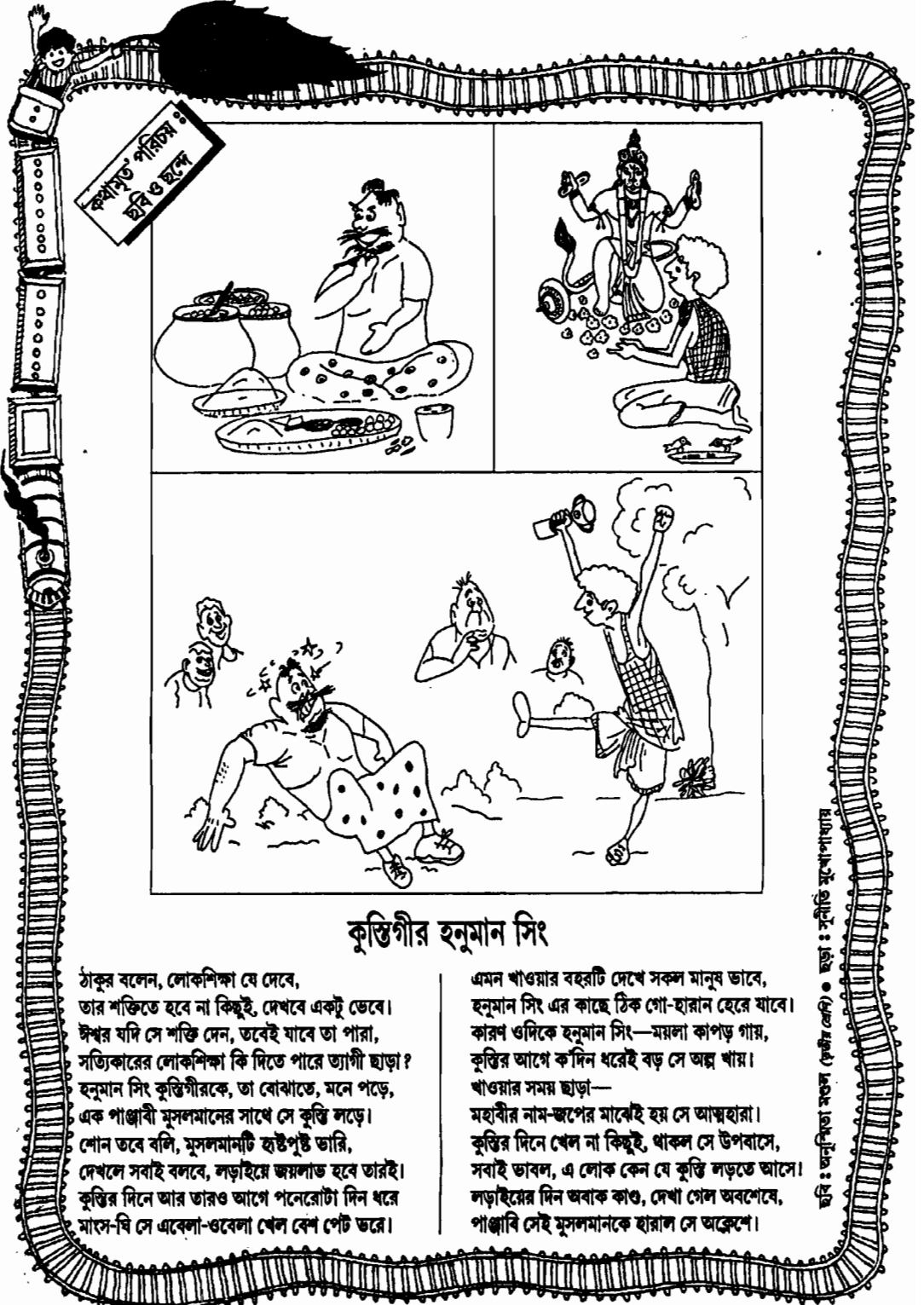
কুস্তিগীর হনুমান সিং

ঠাকুর বলেন, লোকশিক্ষা যে দেবে,
তার শক্তিতে হবে না কিছুই, দেখবে একটু ভেবে।
ঈশ্বর যদি সে শক্তি দেন, তবেই যাবে তা পারা,
সত্যিকারের লোকশিক্ষা কি দিতে পারে ত্যাগী ছাড়া?
হনুমান সিং কুস্তিগীরকে, তা বোঝাতে, মনে পড়ে,
এক পাঞ্জাবী মুসলমানের সাথে সে কুস্তি লড়ে।
শোন তবে বলি, মুসলমানটি হৃষ্টপুষ্ট ভারি,
দেখলে সবাই বলবে, লড়াইয়ে জয়লাভ হবে তারই।
কুস্তির দিনে আর তারও আগে পনেরোটা দিন ধরে
মাংস-ঘি সে একেলা-ওবেলা খেল বেশ পেট ভরে।

এমন খাওয়ার বহরটি দেখে সকল মানুষ ভাবে,
হনুমান সিং এর কাছে ঠিক গো-হারান হেরে যাবে।
কারণ ওদিকে হনুমান সিং—ময়লা কাপড় গায়,
কুস্তির আগে ক'দিন ধরেই বড় সে অল্প খায়।
খাওয়ার সময় ছাড়া—
মহাবীর নাম-জপের মাঝেই হয় সে আত্মহারা।
কুস্তির দিনে খেল না কিছুই, থাকল সে উপবাসে,
সবাই ভাবল, এ লোক কেন যে কুস্তি লড়তে আসে।
লড়াইয়ের দিন অবাক কাণ্ড, দেখা গেল অবশেষে,
পাঞ্জাবি সেই মুসলমানকে হারাল সে অক্লেশে।

ছবি : অনিন্দিতা মণ্ডল (দ্বিতীয় শ্রেণি) ● ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ। একদিন—
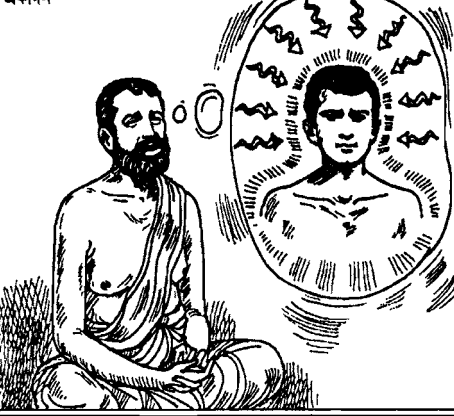
ও মহিন্দর (*শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মশাইকে কখনো কখনো 'মহিন্দর' বলে ডাকতেন*)। দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। তাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে দোষ স্পর্শ করে নাই। মায়ের জন্য কর্ম করে, ওতে দোষ নাই।

স্বামীজী আমেরিকা জয় করে ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭ কলম্বো অবতরণ করলেন—

ওরে নিরঞ্জন, তুই এতদূরে এখানে কি করে এলি আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য?

বাহ্! তুমি কি তপস্যা আর কষ্টটাই না করে আমেরিকা জয় করে এলে! আর তোমার জন্য আমরা কি এইটুকু করতে পারি না?

একদিন বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :
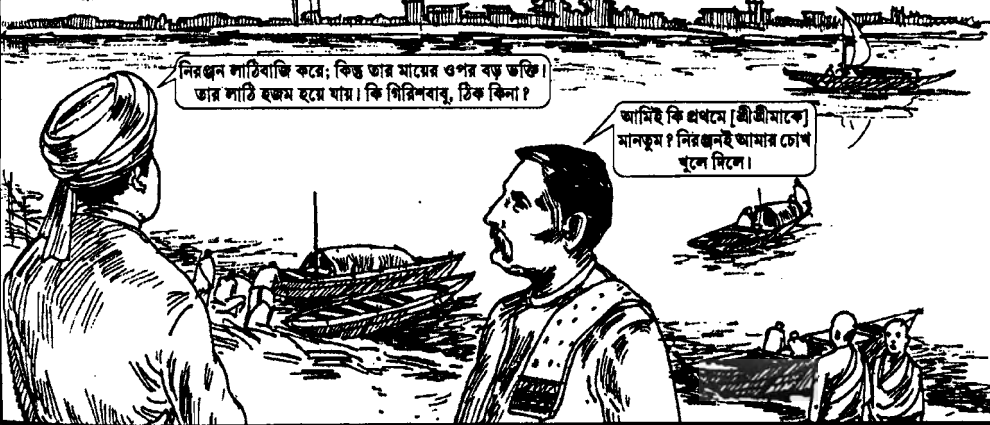
নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে; কিন্তু তার মায়ের ওপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়। কি গিরিশবাবু, ঠিক কিনা?

আমিই কি প্রথমে [শ্রীশ্রীমাকে] মানতুম? নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিলে।

শরণাগতি ও শ্রীশ্রীমা

স্বামী চিদ্‌রূপানন্দ*

বিগত সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন-বর্ষে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর কতই না লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যতই লেখা হোক তাঁর সম্বন্ধে, কোনদিন বলা শেষ হবে না। তিনি অনির্বচনীয়া। তাঁকে কোন বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু আমরা দু-চার কথা বলে তাঁর স্মরণ-মনন করার চেষ্টা করি। তাঁর সম্বন্ধে কেবল বলা যায়, তিনি আমাদের সকলের পরম শরণাগতি, আমাদের সকলের আশ্রয়দাত্রী, আমাদের জন্মজন্মান্তরের মা।

ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ সখা অর্জুনকে জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কত উপদেশ দিলেন, কিন্তু অর্জুনের বিষণ্ণতা গেল না। তাই ভগবান সর্বশেষ গুহ্য কথা বললেন : "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।/ মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" (গীতা, ১৮।৬৫) এখানে যেন ভগবান অর্জুনের কাছে প্রার্থনা করছেন। যেহেতু ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন : তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, হে অর্জুন তোমার সমস্ত মন আমাকে দাও। আমাতে তুমি চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং আমাকে নমস্কার কর। "সত্যং তে প্রতিজানে"—আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি যে, তুমি আমাকে লাভ করবেই।

আমাদের জন্মজন্মান্তরের মা শ্রীসারদাদেবী বলেছেন : আমি তোমাদের মা, আমি সকলের মা, আমি সত্যিকারের মা। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশ ঘোষ মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "তুমি কিরকম মা?" মা এক অপূর্ব উত্তর দিয়েছিলেন : "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী।" মা যেন এখানে প্রতিজ্ঞা করেই বলছেন, আমিই তোমাদের মা। তোমরা হয়তো ধুলো-কাদা মেখে আমাকে ভুলে আছ, কিন্তু আমি তোমাদের সর্বদা হাত ধরে রেখেছি। আমিই তোমাদের আশ্রয়, তোমাদের শরণাগতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই শরণাগতি বা ভগবানের ওপর পূর্ণ নির্ভরতা বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে বলতেন : বেড়ালছানা হবি, বানরছানা হবি না। বানরছানা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে যাওয়ার সময় তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের সম্ভাবনা বেশি। তাই ঠাকুর বলতেন : বেড়ালছানা হবি, বানরছানা হবি না। হেঁসেল বা আঁস্তাকুড় কিংবা বিছানায়—যে-অবস্থায় বিড়াল তার বাচ্চাকে রাখে, বেড়ালছানা সেই অবস্থাতেই খুশি থাকে। সে মাকে মিউমিউ করে ডাকে। মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা—সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

ঈশ্বরের ওপর এই নির্ভরতা আসে ভালবাসা থেকে। শরণাগতির মূল উৎস ভালবাসা। ভগবানকে একান্ত আপনজন মনে করে ভালবাসতে না পারলে আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়। এ ভালবাসা কেমন?—ভালবাসি বলে ভালবাসি, কেন ভালবাসি জানি না। স্বামী বিবেকানন্দ 'ভক্তিযোগ'-এ বলছেন, প্রেমে কোন দরকষাকষি বা কেনাবেচার ভাব নেই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে এ কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয়। আবার প্রেমে কোন ভয় নেই। যারা ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তারা মনুষ্যাধম; তাদের মনুষ্যভাবই এখনো পূর্ণ বিকাশিত হয়নি। তারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তারা মনে করে, ভগবান এক বিরাট পুরুষ, তাঁর এক হাতে দণ্ড, এক হাতে চাবুক; তাঁর আজ্ঞা পালন না করলে তারা দণ্ডিত হবে। এই ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা করা অতি নিম্নশ্রেণির উপাসনা। তৃতীয়ত, প্রেমে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান নেই। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকবে না, কারণ প্রেমই প্রেমিকের সর্বোচ্চ আদর্শে রূপায়িত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই 'ঈশ্বর' বলা হয়। পরম প্রেমই ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধে বলছেন, এ প্রেম হলে জগৎ ভুল হয়ে যাবে। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যায়। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যায়।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী সাধনের অভ্যাসের তারতম্যে শরণাগতি তিনভাবে লক্ষ্য করছেন—'ঈশ্বরের আমি', 'ঈশ্বর আমার' এবং 'আমিই ঈশ্বর'। শরণাগতির প্রথম অবস্থায় বোধ হয় 'ঈশ্বরের আমি' অর্থাৎ 'আমি তাঁর'। "সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।/ সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" (শঙ্করাচার্যকৃত বিষ্ণুষট্‌পদী দ্রঃ) অর্থাৎ হে নাথ, ভেদ চলে গেলেও চিরকাল 'আমি তোমার', 'তুমি যে আমার'—এ কখনো নয়। সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও সকলেই বলে 'সমুদ্রের তরঙ্গ'; 'তরঙ্গের সমুদ্র' কেউ তো বলে না। এই অবস্থায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের অংশ ছাড়া অন্য কোন ভাব চিন্তা করতে পারে না। নিজের যাকিছু সব ঈশ্বরের ওপর সমর্পণ করেই তাঁর আনন্দ।

শরণাগতির এই প্রাথমিক ভাবটি আরো ঘনীভূত হয়ে পরিপক্ব হলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করে। শরণাগতির এই অবস্থায় সাধকের বোধ হয় 'ভগবান আমার'। "হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।/ হৃদয়াদ্ যদি

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এ কর্মরত নবীন সন্ন্যাসী।

নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৩।৯৭)—হে কৃষ্ণ! জোর করে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমার হৃদয় থেকে যদি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝতে পারি। অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনের পথে নিঃসঙ্গ হয়ে চলেছেন, লীলাময় শ্রীভগবান খেলাচ্ছলে বালকবেশে তাঁকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। বিল্বমঙ্গলের খুব ইচ্ছা বালকবেশী কৃষ্ণের সুকোমল শ্রীহস্তখানি একটিবার স্পর্শ করেন। কোনরকমে একদিন হাত ধরে ফেললেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো; কিন্তু কৃষ্ণ ধরা দিতে চান না। তাই সবলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন। বিল্বমঙ্গল হাসছেন। তাঁর ভাব—হে প্রভু, তুমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে। হৃদয়ের মধ্যে যে তোমাকে পুরে রেখে দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছি—পালাবে কোথায়? তাই ভক্ত এই অবস্থায় বলছেন ঃ আমার হৃদয় থেকে যদি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝতে পারি।

শরণাগতির তৃতীয় অবস্থা সাধকের সর্বোচ্চ অবস্থা। এখানে অদ্বৈতানুভূতি। সাধকের বোধ হয়—আমিই তিনি। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রথমে শ্রীভগবানকে স্তব করছেন "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৬৪) ইত্যাদি সম্বোধন করে। কিন্তু এইভাবে স্তব করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে একেবারে শ্রীভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতে লাগলেন ঃ "সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।/ মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে॥/ অহমেবাক্ষয়ো নিত্যং পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।/ ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥" (ঐ, ১।২০।৮৫, ৮৬)—সেই অনন্ত সর্বগত, তিনিই আমি। আমার থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত; আমিই অক্ষর, নিত্য, পরমাত্মা, ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বেও আমি, পরেও আমি। এখানে ভক্তের 'তিনি' জ্ঞানীর 'আমি'তে পরিণত হয়ে গেল। এই স্তরে সাধকের যে-উপলব্ধি তা অবাঙ্মনসোগোচর—বোধে বোধ মাত্র। যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মাস্বরূপ, সকলের সার ও আনন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যসত্তাস্বরূপ—তিনিই সাধকের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র।

শরণাগতির শুরু বা প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ভালবাসা এবং ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, সংসারে থাকবি ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। নিজের যাকিছু সব ঈশ্বরের ওপর সমর্পণ করেই তাঁর আনন্দ। তাঁর ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম ভগবানের চরণে অর্পণ করে—ভগবান যখন যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চান। ঠাকুর একদিন ভক্তদের বলছেন, তোরা সব কি প্রার্থনা করিস! ভগবানের জন্য ব্যাকুল না হলে কি কিছু হয়? এইরকম করে তাঁর জন্য কাঁদতে হয়—বলে ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছাড়-পিছাড় করতে লাগলেন। ভক্তরা ঠাকুরের ঐরকম ব্যাকুলতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ভগবানের জন্য কিরকম ব্যাকুল হতে হয় এবং ঈশ্বরনির্ভরশীল হতে হয় ঠাকুর তা নিজের জীবনে দেখিয়ে গেলেন। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়েই ঠাকুরের প্রথম ভগবৎ অনুভব। তিনি দেখিয়ে গেলেন যে, ভগবানকে লাভ করতে হলে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান বা বিধিবদ্ধ সাধনের যে একান্ত দরকার হয় তা নয়। প্রয়োজন কেবল তাঁর জন্য ব্যাকুল হওয়া। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের জন্য ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। এমন ছটফট করে কাঁদছেন যে, লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবছে মানুষটির বোধ হয় শূলবেদনা হয়েছে! শিশু মায়ের কোল থেকে বিচ্যুত হলে যেমন অসহায় হয়ে কাঁদে, এই সাধক শিশুটি সেইভাবেই মায়ের জন্য কাঁদছেন। সে-কান্না এমনই যে, জগন্মাতা দূরে থাকতে পারেন না।

আবার অন্যভাবেও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ধরা না দিলে তাঁকে ধরা যায় না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" (কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩)—যাঁকে তিনি বরণ করেন, সে-ই তাঁকে লাভ করে। ভগবান কাকে কখন বরণ করবেন তা তিনিই জানেন। কাজেই তিনি দয়া করে যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করে। তাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলছেন, সাধনের অহঙ্কার দূর করার জন্য যাকিছু সাধন।

ঠাকুর বলছেন ঃ আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকি। লোকে যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে, আমি তাঁকে 'কালী' বলি। তিনিই সব করছেন। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরনি, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি। আমি যাকিছু করছি, সে তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছ বলে করছি। ঠাকুর বলছেন, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে মা ও ছেলের সম্পর্ক। আমরা দেখি ঠাকুরের মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আবার সর্বভূতে তিনি মাকে দেখছেন।

ঠাকুর কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছেন ঃ "ওমা! ওমা! ওঁকাররূপিণী! মা! এরা কত কি বলে মা—কিছু বুঝতে পারি না! কিছু জানি না মা!—শরণাগত! শরণাগত! কেবল এ করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা! শরণাগত! শরণাগত!"

বাস্তবিক ঠাকুর এবং মা ধর্ম জিনিসটা আমাদের কাছে সহজ করে দিয়ে গেছেন। শুধু বুঝে নিতে হবে তাঁরা কে এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? মা অতি সহজ করে বলছেন, আমি তোমাদের মা। শুধু 'মা' বলে ডাকলেই হবে। আমি তোমাদের সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী মা নয়, পাতানো মা নয়; কথার কথা মা নয়—সত্য জননী। আমি শুধু তোমাদের মা। তোমাদের শরণাগতি, তোমাদের আশ্রয়। আমি সতেরও মা, অসতেরও মা; সতীরও মা, অসতীরও মা। মা পাপকে ঘৃণা করেন, কিন্তু সকল পাপীকে কোলে তুলে নিলেন।

মা যে সকল জীবের জননী তা তিনি নানা ঘটনায় ও কথায় সন্তানদের বুঝিয়ে দিতেন। এক যুবক ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে বললেন ঃ "ঠাকুরই তোমার গুরু।" যুবকটি জিজ্ঞাসা

করলেন ঃ "তাহলে তুমি কে?" মা বললেন ঃ "আমি মা।" যুবকটি মানবেন না, বললেন ঃ "তা কি করে হয়? আমার মা তো বাড়িতে আছেন; যিনি আমার গর্ভধারিণী।" মা বললেন ঃ "আমিও তোমার মা।" যুবকটি মানবেন না, তাঁর সোজা হিসাব—ঠাকুর ইষ্ট, সারদাদেবী গুরু আর তাঁর নিজের মা রয়েছেন বাড়িতে। মা জোর দিয়ে বললেন ঃ "না, আমিই তোমার সেই মা। চেয়ে দেখ ভাল করে।" যুবক ভক্তটি স্পষ্ট দেখলেন, মায়ের শ্রীমূর্তির জায়গায় তাঁরই গর্ভধারিণী। মা দেখিয়ে দিলেন, জগতে সমস্ত মায়ের রূপে তিনিই বিরাজ করছেন।

এমনকি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেরও মা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বামী, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সন্তানরূপে দেখেছেন। জগতের ইতিহাসে এ এক নতুন দৃষ্টান্ত। মাকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?" জগদ্বাসী যেন শুনতে চান মা কি উত্তর দেন। মা অতি সুন্দর উত্তর দিলেন ঃ "সন্তানের মতো দেখি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৬৫) মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের কল্যাণে যে-মায়ের ধ্যান করেছিলেন, যে-মাতৃভাবকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন—জননী সারদাদেবী সেই মাতৃভাবেরই জীবন্ত বিগ্রহ। বিশ্বমাতৃত্বের এক জীবন্ত প্রতীক। নানা রূপে যুগে যুগে মায়ের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এমন জ্ঞানদায়িনী সারদা, স্নেহময়ী কমলা ও কল্যাণময়ী জগদ্ধাত্রীরূপে মায়ের আবির্ভাব কি কখনো হয়েছে?

ঠাকুর জানতেন, মা স্বয়ং জগজ্জননী। তিনি বললেন ঃ "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, ১৪০০, পৃঃ ২০৬) জগতের সকলে যাতে মাকে জগজ্জননীরূপে চিনে নিতে পারে সেজন্য ঠাকুর মায়ের বোধন করলেন জগজ্জননী ত্রিপুরসুন্দরীরূপে। এইজন্য আমরা ঠাকুরের কাছে ঋণী। ঠাকুর মায়ের এই বোধন করে জগতের সামনে তাঁর স্বরূপ তুলে ধরলেন। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পূজা করে তাঁর চরণে জপমালা সমর্পণ করলেন। সাধনার সকল ফল সমর্পণ করে মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।

ঠাকুর জগতের সকল সন্তানেরও ভার মায়ের ওপর দিয়ে গেলেন। তিনি মাকে বললেন ঃ "আমি কি করেছি, তোমাকে অনেক করতে হবে।" মা হলেন সন্ন্যাসী, গৃহী ও সকল জীবের আশ্রয়। মা হলেন এই সঙ্ঘের জননী। ১ মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিন স্বামীজী সভায় সকলের উদ্দেশে বললেন ঃ "শ্রীশ্রীমাকে রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে, আমাদের গুরুপত্নী হিসেবে মনে কর? তিনি তা নয় রে ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।" স্বামীজী থেকে শুরু করে সকল সন্ন্যাসী সন্তান মাকে জগজ্জননীরূপে পূজা করতেন। মায়ের আশীর্বাদই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসা। স্বামীজী সর্বদা নিজেকে ঠাকুর ও মায়ের 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলে মনে করতেন। তিনি যখন ভারত-পরিক্রমা বা আমেরিকা যাচ্ছেন তখন মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই যাত্রা শুরু করেছেন। অনেক গ্রন্থে আছে, আমেরিকায় যাওয়ার পূর্বে মায়ের অনুমতি পেয়ে স্বামীজী সমুদ্রতীরে গিয়ে আনন্দে নেচেছিলেন। পাশ্চাত্যে সাফল্যের প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন ঃ আমি মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম; সেখানে আমার বক্তৃতার মাধ্যমে যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিলাম—তা মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতেই ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। আরো বলছেন ঃ আমি যেখানে থাকি, ঘরে উপস্থিত একটি ব্যক্তির মতোই আমি মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। আর টের পাই, তিনি সর্বদাই আমার হাত ধরে আছেন ও একটি কচি শিশুর মতো আমাকে চালিত করছেন।

মায়ের অন্য সন্তানরা যাতে মাকে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারে, তাই স্বামীজী সকলকে উদ্দেশ করে চিঠিতে লিখছেন ঃ "মা হচ্ছেন জ্যান্ত দুর্গা।... দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।" "যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।" (পত্রাবলী, ১৪০৭, পৃঃ ২৫৬-২৫৭) "যার তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) বিশ্বাস নাই আর মা-ঠাকুরানিতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বললুম, মনে রেখো।" (ঐ, পৃঃ ৩৭৭) "তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী-মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।... ওপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।" (শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৯৩, পৃঃ ১০৮)

স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইরাও মাকেই একমাত্র আশ্রয়দাত্রী ও শরণাগতি হিসাবে চিনে নিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রশ্নে গোলাপ-মা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" রাখাল মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯) স্বামী সারদানন্দজী একদিন এক ভক্তকে শ্রীশ্রীমায়ের অনন্ত কৃপা ও করুণার কথা বলতে গিয়ে বলেন ঃ "তুমি যাঁর (শ্রীশ্রীমার) কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" (ঐ, পৃঃ ৩০৪) মায়ের একটি সুন্দর রূপের বর্ণনা করেছেন স্বামী শিবানন্দজী। তিনি বলেছেন ঃ "তিনি আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী। ঠাকুরের লীলাপুষ্টি করবার জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন। তাঁর অবস্থিতিমাত্রেই জগৎ ধন্য হয়ে যাচ্ছে। মাকে কেউ বুঝতে পারিনি। তাঁর ভাব এত চাপা, তাঁকে কে বুঝবে? তিনি মোটেই ধরা দিতে চান না। সাধারণ

গৃহস্থের ঘরের মেয়েদের মতো থাকেন—সব কাজকর্ম করেন, ভক্তসেবা করেন। কে বলবে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী। মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে খুব ভক্তিবিশ্বাস প্রার্থনা করবে। তিনি প্রসন্না হলেই জীবের ভক্তিমুক্তি সব হয়।" (শিবানন্দ বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭-৮) স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলেছেন ঃ "আমি এত লোককে চিঠি লিখি কিন্তু মাকে কেন চিঠি লিখি না জান? মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন। তাঁকে লোকদেখানো চিঠি লিখে কি হবে?" স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলছেন ঃ "মায়ের নাম জপ করি—'মা আনন্দময়ী' বলে। তাঁর নামেতে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়।" মায়ের কৃপা সম্পর্কে স্বামী প্রেমানন্দজী বলছেন ঃ "এ কী মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! দেখচ না কত লোক সব ছুটে আসছে! যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন—অনন্ত শক্তি! অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন।... আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন... আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে!—মা! মা! জয় মা!" (স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, ১৩৮৬, পৃঃ ১৩২)

একবার জয়রামবাটীতে এক শিক্ষক মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তিনি স্কুলের শিক্ষক, লেখাপড়া জানা লোক, কিন্তু লোকে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করত। তিনি যখন প্রণাম করলেন, তখন সেখানে ডাক্তার নলিনী সরকার উপস্থিত ছিলেন। ঐ শিক্ষক চলে যাওয়ার পর নলিনীবাবু মাকে বললেন ঃ "আপনি কেন ওঁকে চরণ স্পর্শ করতে দিলেন?" মা বললেন ঃ "দেখ বাবা, আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। আমি সতীরও মা, অসতীরও মা। আমার ছেলে, আমার মেয়ে যদি ধুলো ঘেঁটে শরীর ময়লা করে, আমি কি তাদের ফেলে দেব? আমি যে মা। আমি তাদের আমার আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে কোলে নেব।" এই ছিলেন মা! সকলকে তিনি স্নেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতেন, কারোর দোষ দেখতেন না।

মা বলতেন, ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটি কে নেয়? আমরা তো এজন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপীতাপীর ভার আর কারা সহ্য করবে?

মায়ের এক সেবক লিখছেন ঃ "মাকে সর্বদাই জপ করতে দেখা যেত। শেষবয়সে শরীর যখন দুর্বল তখনো জপের বিরাম ছিল না। রাতেও ঘুমোতেন খুব কম। জপ করেই কাটাতেন। কেউ ঘুমোতে বললে বলতেন, 'ঘুম কি আর আছে, না আসে? মনে হয়, যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে।' বলতেন; 'কি করি বাবা, ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কেউ কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন, কেউবা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এই সংসারে বড় দুঃখকষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।' "

বিপথগামিনী এক মেয়ে সমাজে উপেক্ষিতা, কিন্তু মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন ঃ "ভয় কি মা, তুমিও যে আমার মেয়ে।" মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, এমন স্নেহ-ভালবাসা সে কখনো পায়নি। গোলাপ-মা সতর্ক করলেন, কিন্তু মা বললেন ঃ "না, ও আমার মেয়ে, আমার কাছে আসবে।" গোলাপ-মা বললেন ঃ "ওকে অন্য মেয়ে-ভক্তরা পছন্দ করেন না, এমনকি বলরামবাবুর স্ত্রী বলেছেন, 'ও যদি আসে তাহলে আমাদের আর মায়ের কাছে আসা হবে না।' " তখন মা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ "সে যদি না আসতে চায়, আসবে না। কেউ যদি না আসে না আসুক, কিন্তু ও আমার কাছে আসবে। ওর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।" যারা সমাজে অবহেলিত, অসৎ, মাতাল, পাগল—সকলের একমাত্র আশ্রয়দাত্রী মা। তাঁর গণ্ডিভাঙা ভালবাসার কাছে সব ধুলো-ময়লা ধুয়ে গেছে।

বিদেশি অত্যাচারী ইংরেজদেরও মা বলতে পারছেন না যে, 'ওরা উচ্ছন্নে যাক'। মা বলছেন, ওরাও যে আমার সন্তান। ভগিনী নিবেদিতা ঠাকুরের জন্য ভোগ রেঁধে নিয়ে গেলে অন্যরা নিতে সাহস করছে না। কারণ, নিবেদিতা ম্লেচ্ছ! কিন্তু মা হাসিমুখে নিলেন ও আশীর্বাদ করলেন। বললেন ঃ "নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে দেওয়ার অধিকার আছে। পায়েস আমি নেব। কারোর যদি আপত্তি থাকে সে নিজেকে নিয়েই থাক।"

এক মুসলমান ঠাকুরের জন্য কলা নিয়ে এসেছে। মা খুশি হয়ে সেই কলা নিচ্ছেন। তাই দেখে এক স্ত্রীভক্ত বাধা দিয়ে বলছেন ঃ "ওরা চোর, হয়তো চুরি করে ঐ কলা নিয়ে এসেছে।" মা তাঁকে বললেন ঃ "কে ভাল কে মন্দ আমি জানি। কে হিন্দু কে মুসলমান আমি জানি। কে চোর কে সাধু আমি জানি। ভাঙতে পারে সবাই, গড়তে পারে কজন?"

সন্তানের ভালবাসায় মা আত্মহারা হয়ে পড়তেন। তিনি যখন সকল ছেলের এঁটো পরিষ্কার করছেন, তখন একজন বলছেন ঃ "মাগো ছত্রিশ জাতের এঁটো!" মা উত্তরে বলছেন ঃ "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথায়?" মা চাইতেন তিনি যে 'মা'—এই নামেই তাঁর সকল সন্তান চিনে নিক। তিনি তো বিশ্বজননী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; কিন্তু এই 'মা' মহামন্ত্রে ছেলের কাছে ধরা দেবেন বলেই তাঁর আবির্ভাব! ❑

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যার ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৯তম পঙ্‌ক্তিতে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র'-এর পরিবর্তে 'দক্ষিণ আফ্রিকা' হবে।

নিয়মিত 'ভিটামিন' ব্যবহার কি বিজ্ঞানসম্মত?

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য*

দীর্ঘ সুস্থ জীবনযাপনের আগ্রহে ও আর্থিক সচ্ছলতায় জনস্বাস্থ্যচেতনা এখন বৃদ্ধির দিকে। পত্র-পত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমগুলির ভূমিকাও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্যের প্রথম শর্ত খাদ্য ও পুষ্টিতে তাই আগ্রহ বাড়ছে। খাদ্যের পুষ্টিমান ঠিক রাখতে কয়েকটি ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয়। বাজারে ভিটামিন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ ইত্যাদি প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। ডাক্তারবাবুদের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও পাওয়া যায়। এবিষয়ে একটি প্রশ্ন শোনা যায়—নিয়মিত ভিটামিন খাওয়ার প্রয়োজন আছে কি? ভিটামিন ব্যবহারের বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়—(১) ভাল খাওয়া-দাওয়া করলে ভিটামিন তো খাদ্য থেকেই পাওয়া যায়। (২) কোন শারীরিক ভিটামিন-অপুষ্টি লক্ষণ না থাকলে বা অসুবিধা বোধ না করলেও ভিটামিন খেতে হবে কেন? (৩) অনেক ভিটামিন খেয়েও কোন কাজ হয় না। (৪) ভিটামিন খাওয়া একটা কু-অভ্যাস, ক্ষতিকরও হতে পারে। (৫) ভিটামিনে অযথা অর্থব্যয় না করে সেই টাকায় খাদ্যের উন্নতি করলেই ভাল হয়। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিগুলি সহজগ্রাহ্য কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

◈ ভাল খাদ্য ও ভিটামিন ◈

খাদ্য ভাল হতে হলে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে শারীরিক প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হতে হবে। পুষ্টিবিজ্ঞানে এরকম খাদ্যকে 'সুষম খাদ্য' (balanced diet) বলে। শক্তিদায়ক শর্করা ও স্নেহজাতীয় (fats and oils) খাদ্য, দৈনন্দিন দৈহিক ক্ষয়পূরণকারী ও বৃদ্ধি সহায়ক প্রোটিন (আমিষ/নিরামিষ), জৈব রাসায়নিক বিপাকীয় কাজে অতি প্রয়োজনীয় কিছু ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানীয় জল—এগুলি সুষম খাদ্যে প্রয়োজনমতো পাওয়া যায়। চাহিদা বয়স, লিঙ্গ ও কায়িক শ্রম-নির্ভর। বাড়ন্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী বা স্তন্যদাত্রী মায়েদের চাহিদা বেশি। বেশি কায়িক শ্রমে খাদ্যের অধিক ক্যালরি-মানের (খাদ্যের অন্তর্গত শক্তির মাপক) সঙ্গে প্রয়োজনযুক্ত কিছু ভিটামিন B-এর চাহিদা বাড়ে। সাধারণভাবে দানাশস্য, ডাল, তেল, শাক-সবজি, ফলমূল (কয়েক রকমের হলে ভাল হয়), সম্ভবমতো দুধ, মাছ বা অন্য আমিষজাতীয় খাদ্য সুষম খাদ্যের তালিকায় থাকে। কিন্তু সংগ্রহ, রন্ধন, সংরক্ষণ ও পরিবেশন—সর্বস্তরেই খাদ্যের ভিটামিন-সমৃদ্ধি কমে যেতে পারে। দেখা যায়, অনেকেই সুষম খাদ্য খান না। খাদ্যাভ্যাস নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। অনেকেই পরিবর্তনে অনাগ্রহী। শাক-সবজি, ফলমূল সকলে পছন্দ করেন না, দামও কম নয়। সবজি রান্না করাও সময়সাপেক্ষ। যত্রতত্র ভোজন, ভ্রমণ, হোটেলবাস—এসব এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও খাদ্য প্রায়ই সুষম হয় না। ভাল খাবার বলতে অনেকের পছন্দ হোটেল-রেস্তরাঁর মুখরোচক খাবার। পুষ্টিবিদেরা এবিষয়ে ভিন্নমত। নানা কারণে খাদ্যাভ্যাস দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার ধরন, বাজারের নানারকম তৈরি ও আধা-তৈরি খাবার (শক্তিদায়ক কিন্তু প্রায়ই ভিটামিন-সমৃদ্ধ নয়), আর্থিক সচ্ছলতা এবং প্রচারমাধ্যমে বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্যভাবে খাদ্যগ্রহণকে প্রভাবিত করছে। কর্মব্যস্ত মানুষ ও বিশেষ করে শিশুরা এতে বেশি প্রভাবিত হয়। পরিমাণগতভাবে বেশি শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। সবগুলি সহজপাচ্যও নয়। জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক স্তরভেদ অনেক। সুষম খাদ্য অনেকেরই লভ্য নয়। এছাড়াও আছে বিপাকের ওপর দূষিত পরিবেশ ও কীটনাশকের প্রভাব। এইসব বিচার করে খাদ্য থেকে যথেষ্ট ভিটামিন পাওয়া যাচ্ছে কিনা বুঝতে হবে।

◈ সুস্থ শরীরে ভিটামিন ◈

কোন ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ কিনা সহজে বোঝা যায় না। ব্যক্তিভেদে সুস্থতাবোধ ভিন্ন। স্বাস্থ্যের স্বীকৃত সংজ্ঞায় দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়। খুঁটিয়ে দেখলে এমন স্বাস্থ্য দুর্লভ। কিন্তু এগুলির সবকটিই প্রভাবিত করতে পারে খাদ্যগ্রহণকে। যদি শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই ধরা হয় তবুও বলা যায়, প্রকৃত দৈহিক স্বাস্থ্য খুব কম লোকই ভোগ করেন। কিন্তু অপুষ্টির লক্ষণ? পুষ্টিগুণযুক্ত খাদ্যবস্তু (nutrient) শরীরে কম-বেশি সঞ্চিত থাকে। প্রোটিন, স্নেহবস্তু, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ—সব পুষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। কিন্তু এই সঞ্চিত পরিমাণে অনির্দিষ্টকাল চলে না। কোনটির অভাব দু-একদিনেই বোঝা যায়, কোনটির দু-এক বছর (যেমন ভিটামিন B_{12})। তাই নির্দিষ্ট অপুষ্টি-লক্ষণ প্রকাশ পেতে কম-বেশি সময় লাগে। ঐসময়ে সঞ্চিত পুষ্টিবস্তু (ভিটামিনও) থেকে বিপাকীয় কাজ চলে যায়। ভিটামিন-অপুষ্টিজনিত যেসব নির্দিষ্ট রোগলক্ষণ জানা আছে, সেগুলি প্রকাশ পায় তখনি যখন ঐ সঞ্চিত ভিটামিন প্রায় শেষ হয়ে আসে। কিন্তু তার আগেই জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষায় (bio-chemical tests) বা অন্য কিছু বিশেষ পরীক্ষায় ধরা যায় যে, কোন্ ভিটামিনের সঞ্চয় কমে আসছে। মোট কথা, ডাক্তারি পরীক্ষায় অপুষ্টি-লক্ষণ ধরা না পড়লেও এবং কোন শারীরিক অসুবিধা বোধ না হলেও জৈব-রাসায়নিক স্তরে অপুষ্টি থাকতে পারে। ঐসময়ে বিপাকীয় কাজ নিম্নমানের হওয়াতে দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা নিম্নমানের হওয়া সম্ভব।

** স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পুষ্টিবিভাগ।*

◈ অসুস্থ শরীরে ভিটামিন ◈

খাদ্যগ্রহণ প্রভাবিত হতে পারে রুচি, ক্ষুধা, বমি—এসব কারণে। গৃহীত খাদ্য হজম ও শোষণে বাধা আসতে পারে যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের পাচকরসের অভাব ঘটলে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের অনেক অসুখে। তারও পরে নানা বিপাকীয় অসুখে খাদ্য পুরোপুরি কাজে লাগে না। এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায়ই নানা অসুখে ভোগে আর বয়স যতই বাড়ে, দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারীর সংখ্যাও কমতে থাকে। অসুস্থ শরীরে সুষম খাদ্য খাওয়া বিশেষ সমস্যা। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, বাত (gout), কিডনি ও যকৃতের অসুখ এবং দীর্ঘস্থায়ী অনেক পেটের অসুখে খাদ্যের বাছবিচার করতেই হয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নানা সংক্রামক রোগ। অনেকগুলিতে ভিটামিনের চাহিদা বেড়ে যায়। শিশুদের হাম ও কেঁচো-কৃমি রোগের সঙ্গে ভিটামিন A-এর অভাব, কেঁচো-কৃমি রোগের সঙ্গে ভিটামিন A ও ভিটামিন D-এর অভাবজনিত অস্থিনম্রতা ও বিকৃতি লক্ষণযুক্ত রিকেটস্ রোগের সহাবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিতেকৃমি ফলিক অ্যাসিড (ভিটামিন B কমপ্লেক্সের একটি) খেয়ে রক্তাল্পতা ঘটায়। দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখ ভিটামিন শোষণে বাধা হয়। বিশেষ করে B কমপ্লেক্সের অভাবে মুখে ও জিভে ঘা বা প্রদাহ হয়। যেকোন জ্বরে বা অনেক সংক্রামক রোগে বিপাকীয় কাজ বেড়ে যায় এবং একাজে অপরিহার্য ভিটামিন B কমপ্লেক্স ক্ষুধামান্দ্য ও অজ্ঞতাবশত খাদ্য বাছবিচার—এসবের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যায়। যেকোন ক্ষত নিরাময়ে ভিটামিন C-র প্রয়োজন। বিপাকীয় অস্বাভাবিকতায় ডায়াবেটিস রোগে ভিটামিন B_1 ও B_{12}-এর অভাবে স্নায়ুরোগ ঐ ভিটামিন প্রয়োগে উপশম হয়। যাঁরা বেশি মদ্যপান করেন ও প্রায়ই সুষম খাদ্য খান না, তাঁদের ভিটামিন B_1-এর অভাবে স্নায়ুরোগ হয়—তা মারাত্মকও হতে পারে। যকৃতের অসুখে ভিটামিন A-এর সঞ্চয় কমে যায় ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে সরকারি ব্যবস্থায় বিনামূল্যে ফলিক (লৌহমিশ্রিত) অ্যাসিড (লৌহ-সহ) ট্যাবলেট দেওয়া হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মায়ের রক্তাল্পতা ছাড়াও গর্ভাবস্থায় ফলিক অ্যাসিডের অভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণ নানারকম স্নায়বিক বৈকল্য নিয়ে জন্মায়। ভিটামিন D প্রাণিজ স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। অবশ্য সূর্যালোকের অতিবেগুনি (ultra violet) রশ্মির সাহায্যে চামড়ায় ভিটামিন D তৈরি হতে পারে। এর অভাবে ক্যালসিয়াম শোষণে ও অস্থি গঠনে বাধার জন্য শিশুদের রিকেটস্ রোগ ও মায়েদের অস্থিনম্রতা (osteo-malacia) সারা ভারতেই কম-বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। কিন্তু প্রচলিত ধারণা এই যে, দেশে যখন প্রচুর সূর্যালোক তখন ভিটামিন D-এর অভাব হয় না। সম্প্রতি এই ধারণা বদলে যাচ্ছে। বার্ধক্যে অস্থির ক্ষয় হয় ও অস্থি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তখন ভিটামিন D (ও ক্যালসিয়াম) গ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়।

কিছু কিছু ক্ষতিকর মুক্ত মৌল (free radicals) বিপাকীয় কাজে উৎপন্ন হয়। কিছু কিছু ভিটামিন (A, E, B_6, B_{12}, ফলিক অ্যাসিড, C) এগুলি অপসারণে সাহায্য করে। হৃদ্‌রোগ ও মস্তিষ্কের ধমনির রক্তচলাচলের বাধাজনিত রোগ সৃষ্টিতে এই মুক্ত মৌলগুলির ক্ষতিকর প্রভাব আছে। ফলিক অ্যাসিড বিপাকে উৎপন্ন 'homocystine' নামক ক্ষতিকারক অ্যামাইনো অ্যাসিড-এর প্রতিরোধ করে ধমনির ভিতরের ঝিল্লির (endothelium) কাজ স্বাভাবিক করে ও হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, কয়েকটি খনিজ লবণ (trace elements) খুব সামান্য পরিমাণে থাকলেও এরা ভিটামিনগুলির সঙ্গে একাজে সাহায্য করে। সমস্যা এই যে, হৃদ্‌রোগ বা মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বাধার কারণ ধমনির ভিতরের দিকে ঝিল্লিতে কোলেস্টেরল-জাতীয় বস্তু জমে ধমনিনালীর সঙ্কুচিত হয়ে পড়া। এই বিকারতত্ত্বীয় পরিবর্তন (atherosclerosis) শুধু মুক্ত মৌলের কারণেই হয় না; রক্তে কোলেস্টেরল-জাতীয় বস্তুর বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, বিকৃত খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, শ্রমবিমুখতা, মেদবৃদ্ধি এবং কিছুটা জন্মগত প্রবণতা এর কারণ। কাজেই ভিটামিন এই রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে মাত্র।

◈ ভিটামিনে কখন কাজ হয় না ◈

ভিটামিনের ব্যবহারে প্রত্যাশিত ফল না পেয়ে অনেকে ভিটামিনের কার্যকারিতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিক হলো প্রত্যাশার ধরন। সাধারণত 'টনিকের কাজ' বা 'দুর্বলতা' রোধ করা—এগুলি প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু এসব ভিটামিনের অভাবজনিত নাও হতে পারে। ভিটামিন খাদ্যে শক্তি জোগায় না। শরীরে মাংস বা মেদবৃদ্ধিও করে না, কিন্তু বিপাকীয় কাজে ভিটামিনের অভাবে শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকে শক্তি পাওয়া যায় না। প্রোটিনের কাজও হয় না। সাধারণত তিন ধরনের কারণে চিকিৎসকরা ভিটামিন খেতে বলেন—(১) নির্দিষ্ট ভিটামিন-অপুষ্টি লক্ষণ থাকলে, (২) সুষম খাদ্য দেওয়া সমস্যা হলে, (৩) কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রোধ করতে এবং (৪) এমন কিছু অসুখের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে, যেগুলি ভিটামিন-অপুষ্টিজনিত না হলেও দেখা গেছে কোন কোন ভিটামিন ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। শেষের এই কারণটিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন মত। সম্ভাব্য অপুষ্টি রোধে কিছু ভিটামিন ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি আছে। আধুনিক জীবনযাত্রায় খাদ্য প্রায়ই সুষম হয় না। ১৯৬৬-২০০০—এই সময়ে প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রবন্ধের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও খাদ্য প্রায়ই সুষম হয় না। ভিটামিন B_{12} ও ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি বিশেষ করে দেখা গেছে। কঠোরভাবে নিরামিশাষী হলে খাদ্যে B_2, B_6 এবং বিশেষ করে B_{12}-এর অভাব ঘটে। B_{12} প্রাণিজ প্রোটিনখাদ্য ছাড়া পাওয়া যায় না। প্রয়োজন মেটাতে রোজ প্রায় এক লিটার দুধ পান করতে হবে। ভিটামিন A উদ্ভিজ্জ তেলে পাওয়া যায় না, ব্যতিক্রম পাম তেল। অবশ্য শাক-সবজি ও

ফলমূলের ক্যারোটিন থেকে ভিটামিন A তৈরি হয়। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, খিটখিটে মেজাজ, স্মৃতি হ্রাস, ক্ষুধামান্দ্য ও অনিদ্রার কারণ ফলিক অ্যাসিড-অপুষ্টি হওয়া সম্ভব। যদিও আপাতভাবে এই অপুষ্টি বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত, সব খাদ্যেই বিশেষ করে শাকপাতায় ফলিক অ্যাসিড প্রচুর থাকে। শাকপাতার প্রাচুর্য এদেশে; কিন্তু ব্যবহারের অনিচ্ছায়, রন্ধনদোষে (সিদ্ধ করে জল ফেললে প্রায়ই অর্ধেকের বেশি নষ্ট হয়ে যায়) ও সর্বোপরি পেটের অসুখে ফলিক অ্যাসিড-অপুষ্টি ঘটে। কিছু কিছু ভিটামিন কোন কোন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। ভিটামিন A, E, C এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তি এগুলি ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

◈ বেশি ভিটামিনের কুফল ◈

বেশি ভিটামিন খেলে ক্ষতি কি? ভিটামিন যদি এতই প্রয়োজনীয় হয়, তবে মনে হতে পারে বেশি ভিটামিনে শরীরের কাজ বেশি ভালভাবে হবে। ভিটামিন খাদ্যপ্রাণ, অভাবে প্রাণধারণ অসম্ভব। কিন্তু প্রাণধারণে তার ভূমিকাও নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট তার প্রয়োজনের পরিমাণও। সর্বোপরি সাম্প্রতিক গবেষণায় যেভাবে ভিটামিনের কাজ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ও পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে প্রয়োজনীয় ভিটামিনটুকুই (খাদ্য ও ওষুধ যোগ করে) খাওয়া উচিত। ভিটামিন A খুব বেশিমাত্রায় দু-একদিন খেলেই বমি, মাথাধরা, চর্মরোগ, উদরাময়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। মেরু অঞ্চলের অভিযাত্রীরা শ্বেত ভল্লুক বা স্লেজ কুকুরের মাংস, বিশেষ করে মেটে (ভিটামিন A খুব বেশি থাকে) খেয়ে এমনভাবেই অসুস্থ হয়েছিল। একটু বেশিমাত্রায় ভিটামিন A দীর্ঘদিন ব্যবহারে ক্ষুধামান্দ্য ও শিশুদের বৃদ্ধি কমে আসে। পরে ত্বক শুকনো হয়ে যায়, চুলকানি, মুখের কোণায় ঘা, ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়া, মানসিক অবসাদ, শারীরিক ক্লান্তি, মাথাঘোরা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি, পেশি ও অস্থিতে ব্যথা ও ফোলা ইত্যাদি দেখা যায়। সমস্যা এই যে, এগুলির বেশ কয়েকটি ভিটামিন A-অপুষ্টিতেও দেখা যায়। ভিটামিন A খাওয়া বন্ধ করলে এগুলি আস্তে আস্তে সেরে যায়। বেশিদিন ভিটামিন D খেলে ক্ষুধা নষ্ট ও মেজাজ খিটখিটে হতে থাকে। পরে বমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেশির শৈথিল্য, ঘন ঘন প্রস্রাব, অস্থি-বিকৃতি ও শিশুদের বিকাশ ব্যাহত হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্যালসিয়াম জমে যায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি হয় ও বৃক্ক (Kidney) ঠিকমতো কাজ করে না। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন B কমপ্লেক্স ও C সম্বন্ধে এত স্পষ্ট কুফল দেখা না গেলেও বেশিমাত্রায় গ্রহণ পুরোপুরি নিরাপদ না হতেও পারে। ভিটামিন C বেশিমাত্রায় খেলে (অনেকে সর্দিকাশিতে খান, বিষয়টি বিতর্কিত) শরীর তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। পরে অল্পমাত্রায় খেলে অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়—এমন কিছু তথ্য আছে। এই ভিটামিন দীর্ঘদিন ব্যবহারে বৃক্কের দোষও হতে পারে। B ভিটামিনগুলি বিপাকে রাসায়নিক কাজ করে। বেশি পরিমাণে খেলে প্রস্রাবে বেরিয়ে যায়, সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমগ্র বিপাকীয় কাজ এক সমন্বিত প্রক্রিয়ায় চলে। কোন একটি ভিটামিনের অভাব বা আধিক্য ঘটলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। যেমন শুধু ফলিক অ্যাসিড খেলে ভিটামিন B_{12}-এর অপুষ্টি দেখা দেয়। দুটির কাজ প্রায় একইরকম। এমন খুবই কম দেখা যায় যে, একটিমাত্র ভিটামিনের অপুষ্টি ঘটছে আর কোন অপুষ্টি নেই। সাধারণভাবে অপুষ্টি প্রায় সবসময়েই সামগ্রিক অপুষ্টি বিশেষ, এটা যখন খাদ্যাভাবজনিত।

◈ ভিটামিনে অযথা অর্থব্যয় ◈

ভিটামিন ব্যবহারে অবশ্যই অর্থব্যয় হয়। তবে যেসব ভিটামিন B কমপ্লেক্স ও C মিশ্রিত ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি বাজারে সাধারণত পাওয়া যায়, সেগুলিতে দৈনিক চাহিদার খুব বেশি থাকে না। একটু বেশি হলে প্রস্রাবে বেরিয়ে যায়। নির্ধারিত মাত্রার বেশি খাওয়া ঠিক নয়। বাজারে নানারকম খাদ্য ও পানীয় তৈরি বা আধা-তৈরি অবস্থায় (processed foods) পাওয়া যায়। এগুলিতে বিশেষ করে কিছু শিশুখাদ্যে ভিটামিন যোগ করা থাকে। তার ওপর আরো ভিটামিন খেলে চাহিদার বেশি যোগান হয়ে যেতে পারে। যদিও সব ভিটামিন একসঙ্গে খাওয়া উচিত নয়। A ও D প্রায়ই বাদ দেওয়া যায়। ভিটামিন ও খনিজ লবণের মুক্ত মৌল অপসারণকারী (antioxidant) মিশ্রণের কথা আগেই বলা হয়েছে। অনেক অবৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক বুদ্ধিপ্রণোদিত মিশ্রণও চলছে। এখানেই শেষ নয়। শীঘ্রই বাজারে আসছে এমন একটি বহু-ওষুধ বড়ি (polypill), যার মধ্যে থাকবে কম মাত্রায় ফলিক অ্যাসিড, তিনটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, হৃদ্-মস্তিষ্ক ধমনিরোগ প্রতিরোধে অ্যাসপিরিন, কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ এবং ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা রোধ করতে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী আরো একটি ওষুধ। বয়স ৫৫ পেরলে অনেকেরই হৃদ্‌রোগ বা মস্তিষ্কের ধমনিঘটিত রোগ হয়ে থাকে। তাই আগে থেকেই এগুলি আজীবন খেয়ে যেতে হয়। নির্দিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে দু-একটি বাদ যাবে। সব মিলিয়ে দাম হবে সাধারণবিত্ত লোকের পক্ষে খুবই বেশি। অবশ্যই জীবনের দাম ওষুধের চেয়ে সবসময়েই বেশি. কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। এগুলির সম্ভাব্য জনপ্রিয়তায় ওষুধ কোম্পানিগুলির আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে। আধুনিক ভোগবাদী মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন এবং ফলমূল ও শাক-সবজিপ্রধান সুষম খাদ্যে আগ্রহী হবেন—এমন সম্ভাবনা কম। তাই ভয়াবহ বিষয় হলো, এই ওষুধ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের বিকল্প হিসাবে গৃহীত হবে। যত বৈজ্ঞানিক তথ্যই থাক, ব্যক্তিস্তরে এর ব্যবহার চিকিৎসকের বিবেচনাসাপেক্ষ। ব্যক্তির জীবনযাপন প্রণালী, আর্থিক সামর্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, অসুখ—সবকিছু বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শেষ কথা, সুস্থ শরীর ও সুষম খাদ্যগ্রহণকারী ব্যক্তির ভিটামিনে অযথা অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই। ❑

নিবেদিতার ঐশী মহিমার এক জীবন্ত দলিল

অমলেন্দু চক্রবর্তী

হিমালয়-দুহিতা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা • *লেখক: কানাইলাল ঘোষ* • *প্রকাশক: প্রসূনকুমার বসু, সমকাল প্রকাশনী, ৯৪ সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০* • *মূল্য: ৪০০ টাকা* • *পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৪+৮১৪* • *প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৩*

জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। হিন্দুধর্ম এই মহাজীবনে শাঙ্করদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিল, আর সেইসঙ্গে সকল আদর্শ বা পন্থাই যে মানবাত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতম প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সাম্প্রদায়িকতা নয়, সমন্বয়; বিশেষ কোন উপাসনা-মন্দির নয় বরং অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পেল।

আপন মুক্তির জন্য ব্যাকুল না হয়ে বিশাল বটবৃক্ষের মতো বিশ্বমানবকে ছায়াদানের ব্রতে বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। বলেছিলেন —"দয়া নয়, সেবা"। বিবেকানন্দ সেই 'সেবা'কেই বলেছেন 'পূজা', আর এই মহাপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ তিনি ভারত ও সমগ্র জগতের কাছে 'নিবেদিতা'কে উৎসর্গ করেছিলেন। আপন গুরুর কাছে নিবেদিতা যে-ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলেন, তার শরীরীসত্তা সমগ্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে ভালবাসার সে-আনন্দ তিনি বিবেকানন্দ-মানসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে-ভালবাসা জাতীয় গৌরব ও বেদনাবোধের অংশীদার হলেও আসলে তা বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গিত ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার বাণী। বিদেশিনী নিবেদিতার পক্ষে ভারতোপলব্ধির সাধনায় এই অসাধারণ সিদ্ধি তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বের পরিচায়ক হলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারাই এবিষয়ে তাঁর পথনির্দেশ করেছে। নিবেদিতার চিন্তন ও বিবেকানন্দের সমর্থন প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু উপদেশ নয়, প্রধানত ধর্মজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন সমন্বয়ধর্মের আদর্শ তাঁর মানসকন্যার অন্তরে সঞ্চার করে চলেছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণ ও ইউরোপ-যাত্রার স্মৃতি এদিক থেকে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কানাইলাল ঘোষ রচিত '**হিমালয়-দুহিতা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা**' গ্রন্থটি হলো ঐশী মহিমার সন্ধানে ভগিনী নিবেদিতার এক জীবনবৃত্তান্ত। সুবিশাল গ্রন্থটির প্রায় সিংহভাগ (প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা) জুড়ে রয়েছে উনবিংশ শতকের বাংলা তথা সমগ্র ভারতের ধর্মীয় রেনেশাঁসের প্রধান রূপকার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে শুরু করে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বহু-আলোচিত এক জীবনগাথা —যা 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে গ্রন্থকার ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইউরোপ পরিভ্রমণের সময় স্বামীজীর কাছে যেসকল ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়েছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। হিমালয় পরিভ্রমণকালে তাঁর মহান গুরুর আত্মত্যাগের মহিমা নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন বারবার। অমরনাথ-যাত্রাপথের সৌন্দর্য এবং সেইসঙ্গে দুর্গম পথের কষ্টসাধ্য চড়াই-উতরাই—সবই নিবেদিতা ভুলে যান একদিকে গুরু বিবেকানন্দ, অপরদিকে শিবভূমি হিমালয়ের অকল্পনীয় মহিমায়। হিমালয়ের অধীশ্বর দেবাদিদেব মহেশ্বর আবাল্য স্বামীজীর আরাধ্য দেবতা। তাই নিবেদিতার হিমালয়-প্রীতিতে গুরু-হিমালয় বিরাটত্বে একাকার। অমরনাথ তুষারলিঙ্গ দর্শনের জন্য স্বামীজীর সেই পর্বতগুহায় আবেগবিহ্বল প্রকাশ এবং প্রণামান্তে নিবেদিতার সামনে তাঁর আবির্ভাব—এককথায় স্বর্গীয় সে-দৃশ্য। এখানেই নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে শোনেন, অমরনাথের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বরলাভ করেছেন।

গ্রন্থকার শ্রীঘোষ 'ভারতের মুক্তিযুদ্ধে' উৎসর্গীকৃত ভগিনী নিবেদিতার বিরাট কর্মযজ্ঞের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর থেকে নিবেদিতা তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ জেলে গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ দেখাশোনার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৫৭ বছর পরেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। যদি কোনদিন সে-ইতিহাস রচিত হয়, তার প্রতিটি পাতায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লেখা থাকবে এই মহীয়সী বিদেশিনীর কথা, লেখা থাকবে ভারতের সার্বিক উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ নিবেদিতার এক মহান কর্মযজ্ঞের কথা। একাধিক পত্রাবলি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতের অদ্বৈতবোধকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁরই গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। গ্রন্থকার শ্রীঘোষ 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' এবং নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকা প্রসঙ্গে গ্রন্থটির প্রতিটি পাতায় সন, তারিখ ও ঘটনার যে বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, তাতে গ্রন্থটির মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বামীজীর ইচ্ছাপূরণই ছিল নিবেদিতার জীবনের একমাত্র ব্রত। গুরুর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ সম্বন্ধে ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। উভয়ের প্রতিভা, বিদ্যা, রচনাশক্তি, ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় এক। একদিকে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগরক্ষা, অন্যদিকে নারীশিক্ষার প্রসারণের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য স্কুল চালানো—যুগপৎ করে গিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও 'The

Master as I saw Him' গ্রন্থটি লেখা চলছিল। ১৯০৯ সালে তিনি 'Footfalls of Indian History' লিখতে শুরু করেন। একইসঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য নিয়মিত সম্পাদকীয় ও 'Modern Review'-এর জন্য নোট ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এত কাজ, এত ব্যস্ততা, তবুও বিষণ্ণতায় নিবেদিতার প্রাণ ভরে উঠছিল। কত কাজ অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। স্বামীজীর অর্পিত কর্মের কতটুকু সম্পাদন করতে পেরেছেন তিনি? তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের আশ্রম বা ছাত্রীনিবাস তখনো স্থাপিত হয়নি। কত আগ্রহ ডঃ বসুর বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য করবেন বলে। দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। জাতীয়তার পুনরুত্থানে কত কিছু করার আছে। পরক্ষণেই তাঁর অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠেছে—জগতের বোঝা বহনের অধিকার কে তোমায় দিয়েছে? নিজের কাজ করে চল—নিজের কাজই একমাত্র কর্তব্য। জীবনের শেষকথা আত্মসমর্পণ। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত তিনি—সেই জীবনদেবতার আহ্বানই তাঁর চরম পাথেয়।

হিমালয়-দুহিতা নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত শৈলশিখর দার্জিলিং শহরেই অন্তিম বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। মৃত্যুর কথা যখন তিনি চিন্তা করতেন, তখন তাঁর মনে হতো, সেই আনন্দসত্তার সঙ্গে অতল গর্ভে মগ্ন হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু। তিনি বলতেন, শরীর যায়, আসে কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। জীবনের মতো মৃত্যুও আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুভূতিপ্রবাহের এক অংশমাত্র। সেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন: "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।" উপনিষদের এই দিব্যবাণী উচ্চারণ করে অন্তর তাঁর দীপ্ত হয়ে উঠল। সহসা নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন: "The boat is sinking but I shall yet see the sunrise."—তরী ডুবছে, আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব। (ভারতের স্বাধীন সূর্যোদয় আমি দেখবই—এই ছিল তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন।)

গ্রন্থটির 'পরিশিষ্ট' পর্বে (পৃঃ ৭৩৯-৭৮৪) নিবেদিতার জীবনের অনেক বৃত্তান্ত সংযোজন বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ৭৮৫-৮১৩ পৃষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর চরিতচিত্র, নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে লেখা তাঁর একাধিক পত্র, বেদান্তদর্শনের কিছু অপব্যাখ্যার যোগ্য উত্তর, গুরুনিন্দায় ব্যথিত নিবেদিতাকে মিস লংফেলোর রচনা এবং নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর ছোট বোনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একাধিক পত্র—মূল ইংরেজি রচনাগুলির সংযোজন নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তবে এই বিশাল গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা উচিত ছিল। নিবেদিতার জীবনের বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে বিভিন্ন পর্বের বিভাজন একান্ত প্রয়োজন। মুদ্রণজনিত একাধিক ভুলত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থকার গ্রন্থটি রচনায় যে গুরুভার নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করেছেন, এজন্য তাঁর সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। নিবেদিতার কর্মবহুল জীবন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত গ্রন্থটি গবেষণাপ্রিয় ব্যক্তিদের উৎসাহ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ❑

শালগ্রাম শিলা: প্রতীক, দর্শন ও বিজ্ঞান

কমল নন্দী

ভগবান বিষ্ণু ও শালগ্রাম শিলা • লেখক: অশোক রায় • প্রকাশক: দেবাশিস ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ • মূল্য: ১২০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১০+২৯৮ • প্রকাশকাল: ২০০৩

অশোক রায় রচিত **'ভগবান বিষ্ণু ও শালগ্রাম শিলা'** গ্রন্থটি হাতে পেয়ে প্রথমেই মনে হলো ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির 'most modern encyclopaedia'-তে নিশ্চয় কিছু রত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে। সে-অনুমান বৃথা হয়নি।

রথযাত্রা দিবসে (১৪ জুলাই ১৮৮৫) বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মশাইকে বলছেন: "শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যানরা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম—বেশ চক্র থাকবে, গোমুখী আর সব লক্ষণ থাকবে; তাহলে ভগবানের পূজা হয়।" যেন সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলছেন: "কি দেখছিলাম। ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড সং, উদ্বোধন, পৃঃ ৯৭৬)

শালগ্রাম শিলা ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে পরিচিত। বিষ্ণু সৃষ্টিকে পালন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শালগ্রাম শিলায় নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। তাঁর প্রজ্ঞায় শালগ্রাম ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। শাস্ত্রে পাই, তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—তিনি অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর আবার বৃহতের চেয়েও বৃহত্তর। গণিতের শূন্য আর অসীম। "Zero is lesser than the least number, one can think of." আর "Infinity is greater than the greatest number, one can think of." এই 'dichotomy'-র ওপর হিন্দুদর্শন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। ভক্তিহিমে বরফ আর জ্ঞানসূর্যের তেজে জল। তিনি বিন্দুও বটে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বটে।

শালগ্রাম শিলা ও ভগবান বিষ্ণুর একাত্মতা স্থাপনে লেখক নিষ্ঠাবান অধ্যবসায়ের পরিচয় গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে রেখেছেন—এবিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই। আভিধানিক অর্থে শালগ্রাম 'কীটচ্ছিদ্রিত চক্রযুক্ত গণ্ডকী তীর্থজাত শিলাখণ্ড বিশেষ যা বিষ্ণুর মূর্তিভেদ'রূপে পরিচিত। এই শালগ্রাম শিলায় দশাবতার চরিত্র আরোপ করা হয়েছে লক্ষণভেদে। লক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া সেবিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠা নিষ্ঠাবান গুরু ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। লেখক প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করে বিস্তৃতভাবে তার বর্ণনা করেছেন; ফলে আগ্রহী পাঠকের কৌতূহলও উত্তরোত্তর বেড়েছে। সেই কৌতূহল মেটাতে লেখক ধীরে ধীরে জীবাশ্ম বিজ্ঞানে প্রবেশ করে

শিলার লক্ষণগুলি চিত্র সাহায্যে বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের তৃপ্তির উপাদান নিহিত আছে এই পর্বে। ত্যাজ্য শিলার চিত্রাবলি থেকে কুদর্শন বা কুরূপ শিলার গঠন কেমন হয় এবং কেন হয় তা লেখক সযত্নে পাঠকদের বোধগম্য করে তুলেছেন। তাছাড়া লেখক রসায়নবিদ, তাই অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রাণপঞ্চ (Primordial broth) কিভাবে সৃষ্টি হলো অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। বহুরূপ চতুর্ভুজ কার্বন অণু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন থেকে শুরু করে জটিল আণবিক গঠনসম্পন্ন RNA (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) ও DNA (ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) অণুর বিবর্তনের মূল প্রক্রিয়াগুলি লেখক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোটি কোটি বছর আগে সংযোজন ও বিয়োজনের অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার পরিণতিতে আবহমণ্ডলে একসময় বেড়ে গেল অক্সিজেনের পরিমাণ এবং মুক্ত অক্সিজেনের ঊর্ধ্বাকাশে রাসায়নিক মেলবন্ধনের ফলে জন্ম নিল ওজোনস্তর যা সূর্যরশ্মি থেকে নির্গত প্রাণঘাতী আলট্রা ভায়োলেট, গামা রশ্মি প্রভৃতিকে শোষণ করে ধরিত্রী মায়ের কোলে লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলাকে অব্যাহত রাখল।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চভূত) সঙ্গে চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্তির কোন প্রতীকী যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, তবে লেখক অভিনব একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন চতুর্বিংশতি (২৪) সংখ্যাটির। তাঁর মতে, বিষ্ণুর চারটি হাত আর চারটি হাতে চারটি প্রকরণ (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) মোট সাজানো সম্ভব 'ফ্যাকটোরিয়াল ৪'-রকমভাবে। ফ্যাকটোরিয়াল ৪-এর মান ৪×৩×২×১=২৪। দেব-দেহ-সম্ভূতা গণ্ডকী দশহাজার বছর ধরে বিষ্ণুকে তুষ্ট করে বর পান যে, তাঁর গর্ভে যেন তিনি অনাদি অনন্ত কাল ধরে বিরাজ করেন। সেই পৌরাণিক কাহিনীর ভৌগোলিক প্রকাশ হলো নেপালের গণ্ডকী নদীর জলে শালগ্রাম শিলার অবস্থান। তার সঙ্গে ট্রাইলোবাইট ও ব্রাকিয়োপোড নামক জীবাশ্মও পাওয়া যায়, যদিও সেগুলি ত্যাজ্য শিলা বলে পরিগণিত হয়। পুণ্যতোয়া গণ্ডকীর অপর নাম নারায়ণী বা শালগ্রাম। লেখক যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে গণ্ডকীর উপাখ্যানটি বর্ণনা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ "ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম।" হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক বলে নিন্দা করা বুদ্ধিজীবীদের একটা ফ্যাশন, এমনকি বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ও সেই দোষে দুষ্ট ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্মপিপাসু মানুষ যখন সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন মহৎ ভাবগুলিকে প্রতীকের মাধ্যমে চিন্তা করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। একথা প্রকৃত সাধকমাত্রেই স্বীকার করেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা লীলাচঞ্চল সামগ্রিক সৃষ্টিকে যদি শালগ্রাম শিলার মধ্যে কল্পনা করে সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কি? সাধনায় যা সাহায্যকারী বা হিতকারী তা-ই গ্রহণীয়—তাতে পৌত্তলিকতার রবার স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিন্দা করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা অর্থহীন। শালগ্রাম শিলার এই আলোচনা তখনি সার্থক হবে যখন এর বিজ্ঞান-ইতিহাস ছাপিয়ে এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক দর্শনটি পাঠকের মনে পৌঁছে যাবে। গ্রন্থটি পড়ে মনে হলো, লেখকেরও সেই অভীপ্সা। আমরা ভারতীয়, আমাদের আন্তর সম্পদ সম্বন্ধে আমরা সচেতন ও গর্বিত। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীবিষ্ণু—শালগ্রাম শিলা তাঁরই প্রতীক। শিলাটিকে পূজা করেই সেই মহৎ ভাবটির বোধ বা উপলব্ধি যদি জন্মায় তো ধন্য মানবজন্ম—যার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো ভগবদ্ দর্শন; কারণ 'তুমি জান আর না জান—তুমি সেই রাম।'

গ্রন্থটি কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও সুলিখিত। গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠকগণের সবচেয়ে বড় লাভ হবে বিষ্ণু-সংক্রান্ত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের সঙ্গে পরিচয়, যা একত্রিত হয়ে এভাবে কখনো পরিবেশিত হয়নি। তাছাড়া লেখক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা শুরু করেছিলেন বটে, তবে আলোচনা-শেষে দর্শনের দিগন্তে পাঠককে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। ❑

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাক বিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাসের ২০ (অথবা ২১) তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাস অনুযায়ী ৬ বা ৭ তারিখে। গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। সম্ভব হলে আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস হয়ে গেলে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয় তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, কালাডি: গত ২২ জুন ২০০৫ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত সংযোজিত অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হলো

গত ৪ জুলাই ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বেলুড়ের বিবেকানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব সুনীলকুমার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের সচিব বেদপ্রকাশ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও নাগরিকবৃন্দ।

এদিন উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে 'বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সচিব স্বামী সর্বলোকানন্দজী, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যাণ্ড কালচারাল সেন্টার-এর অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দজী, কবিতা আবৃত্তি করেন দেবাশিস বসু ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। প্রসঙ্গত, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবসও এইদিন উদ্‌যাপিত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্সেপ্ট পেপার' প্রকাশ করছেন।
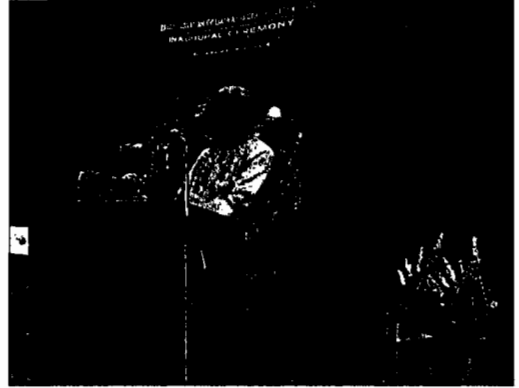
সভায় বক্তব্য রাখেন অন্যতর সহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ

ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী জানান, আপাতত 'Disability Management and Special Education'-এর পাঠ্যক্রম দিয়ে সূচিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ, কোয়েম্বাটুর কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, রাঁচি মোরাবাদি কেন্দ্র এবং গ্রামীণ উন্নয়নমূলক শিক্ষার কর্মসূচি, বেলুড়ের সমাজসেবক শিক্ষণমন্দিরের কর্মসূচি ইত্যাদির সাহায্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হচ্ছে—যার মূল লক্ষ্য এমন বিষয়কে নিয়ে শিক্ষাপ্রদান, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যার গুরুত্ব নেই। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও নীতিশিক্ষা (Indian Spiritual and Cultural Heritage and Value Education) এবং আপতকালীন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা ও ত্রাণকার্য (Disaster Management including Relief and Rehabilitation) প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সেবাব্রত

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর: গত এপ্রিল ২০০৫ থেকে একবছর ১৬টি দুঃস্থ পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ৬ জুলাই ২০০৫ প্রথম কিস্তির (৩ মাসের) টাকা দেওয়া হয়েছে।

নতুন কেন্দ্র স্থাপন

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা: **Ramakrishna Mission Ashrama, Ramakrishna Ashrama Marg (Beed Bypass), Aurangabad, Maharashtra-431 005, Phone No. : (0240) 237-6013, e-mail : rkm_aurangabad @sancharnet.in and ramakrishna_abd@yahoo.com.** স্বামী বিষ্ণুপদানন্দজী এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৫ সালের সর্বভারতীয় ডাক্তারি

প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণির একটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

২০০৫ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নরোত্তমনগর ও আগরতলা বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

বিদ্যালয়	পরীক্ষা	বিষয়	স্থান
নরোত্তমনগর	জে. ই. ই. (অরুণাচল প্রদেশ)	ইঞ্জিনিয়ারিং	১, ৩ ও ৭
	ঐ	মেডিকেল	২, ৭ ও ১০
আগরতলা	জে. ই. ই. (সারা ভারত)		২, ৩ ও ৯ (রাজ্যস্তরে)
	ঐ (ত্রিপুরা)	ইঞ্জিনিয়ারিং	১৪

বহির্ভারত

নতুন উপ-শাখাকেন্দ্র স্থাপন ঃ 'দি বেদান্ত সোসাইটি অফ ক্যানসাস সিটি, ইউ. এস. এ.'-কে বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস, ইউ. এস. এ.-র অধীনে রামকৃষ্ণ মঠের উপ-শাখাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। কেন্দ্রটির ঠিকানা ঃ **Vedanta Society of Kansas City, 8701 Ward Parkway, Kansas City, Missouri 64114, USA. Phone No.: (1-816) 444 8045, e-mail: vskc@netzero.net**

RAMAKRISHNA MISSION
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL-711202
PHONES (PBX):
654-1144/1180/9581/9681/5391/8494/5700/5701/5702/5703
FAX: 654-4346
E-mail: rkmhqbm@cal.vsnl.net.in

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গুজরাটে বন্যাত্রাণকার্য

গুজরাটের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার অব্যবহিত পরেই রামকৃষ্ণ মিশন গত ৩০ জুন থেকে বন্যা-পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে। আমাদের বরোদা ও রাজকোট শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে বরোদা জেলার পাডারা ও কর্জন তালুকায় এবং আনন্দ, খেড়া ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য এলাকাগুলিতে প্রায় ১,৩৪,০০০ খাবারের প্যাকেট ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী সংবাদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

০৩.০৭.২০০৫ — **স্বামী স্মরণানন্দ**
বেলুড় মঠ — সাধারণ সম্পাদক

দেহত্যাগ

স্বামী শক্তিদানন্দজী (জীবন মহারাজ) গত ১৮ জুন ২০০৫ রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে জামশেদপুরের টাটা মোটর হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। কয়েক বছর যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৩ সালে জামশেদপুর আশ্রমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বৃন্দাবন ও পাটনা কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি জামশেদপুর আশ্রমেই অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, মধুর ও কঠোর পরিশ্রমী স্বভাবের।❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ প্রায় ২ বছর শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে অবস্থান করার পর গত ৩০ মে ২০০৫ রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান), কাঁকুড়গাছির অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন থেকে তিনি যোগোদ্যানেই অবস্থান করবেন। যোগোদ্যানের ফোন নং ঃ ২৩২০-২৯২৭ ও ২৩৩৪-৬০০০।

গত ১৪ জুলাই ২০০৫ সকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে শুভ পদার্পণ করেন এবং সারাদিন অবস্থান করার পর সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে ফিরে যান।

গত ২১ জুলাই ২০০৫ 'গুরুপূর্ণিমা' উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী যোগানন্দ উৎসব সমিতি, দক্ষিণেশ্বর (কলকাতা-৫৭) ঃ গত ২৯ মার্চ ও ৩ এপ্রিল ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানে যথাক্রমে তাঁর জন্মতিথি ও সাধারণ উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী গিরীশানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য। প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পাণ্ডু (অসম) ঃ গত ১-৪ এপ্রিল ২০০৫ নৃত্য, গীতি-আলেখ্য, যাত্রাপালা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, ডঃ সরযূ দাস এবং ডঃ কমলেন্দু দেব ক্রোড়ী। ৪ তারিখ প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র, নিমতলা (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২ এপ্রিল ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন 'সারদা ভবন'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও অধ্যাপিকা ডঃ চিন্ময়ী নন্দী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডাঙ্গামোড়া (হুগলি) ঃ গত ২-৩ এপ্রিল ২০০৫ শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, বাউলগান, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, হাস্যকৌতুক পরিবেশন, রামায়ণ গান, স্মরণিকা 'অর্ঘ্য'-এর প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও বার্ষিক

উৎসব পালিত হয়। ৩ তারিখ ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ুই। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক অমিয়কুমার অধিকারী। দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, রথতলা (নদীয়া) : গত ২-৩ এপ্রিল ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বাউলগান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-স্মরণোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী, স্বামী উমেশানন্দজী, স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী ও ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন দুঃস্থ মহিলা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে বস্ত্র এবং খাতা, পেনসিল প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

সীতারামপুর রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ২-৩ এপ্রিল ২০০৫ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, নাটক, 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ৩ তারিখ সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শুভব্রতানন্দজী, ডঃ সুতপা বসু ও সতীশ পুরী। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সভাপতি জয়দেব মুখোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া) : গত ২ এপ্রিল ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী স্নিগ্ধানন্দজী ও সুবিনয় দে। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী। প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। পরদিন বিশেষ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক যুব-উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, মহারাজগঞ্জ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৪ এপ্রিল ২০০৫ নামখানা ব্লকের অমরাবতী গ্রামের নটেন ধাড়ামির মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দুটি তাঁর পুত্র তপন ধাড়ামি ও পরিবারের অন্যান্য সকলের ইচ্ছায় এবং সঙ্ঘের সহযোগিতায় ডাঃ বিধান গিরি-র উদ্যোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে অন্ধজনের কল্যাণে প্রদত্ত হয়।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা সারদা সেবাশ্রম, মির্জাপুর (হুগলি) : গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। ২৬৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, বিরাটী (কলকাতা-৫১) : গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান প্রভৃতির মাধ্যমে 'ফেস্টিভ্যাল' ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ ভাব-সমন্বয় কেন্দ্র, সুইস পার্ক (কলকাতা-৩৩) : গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ সঙ্গীত, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, দ্বিমাসিক বাঙলা মুখপত্র 'নির্ভীক পথিক'-এর প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বেলুড়ের 'বিবেকানন্দ সভাগৃহ'-এ সারা বাংলা বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী রমানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী, শ্যামলকুমার সেন, নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার মিত্র, জুলফিকার আলি প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রায় ১,০০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া-কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ ভজন, পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, বাউলগান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রাজীবানন্দজী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, পর্ণশ্রী, বেহালা (কলকাতা-৬০) : গত ১০-১৩ এপ্রিল প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অজেয়প্রাণাজী, ডঃ সুরেশ কুইতি, ডাঃ অশোক ঘোষ প্রমুখ। ১০ তারিখ দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১০-১৩ এপ্রিল ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা,

---

অনুষ্ঠান-সূচি : আশ্বিন ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	:	স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ১০ আশ্বিন, সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাদ্র অমাবস্যা ১৭ আশ্বিন, সোমবার (৩ অক্টোবর ২০০৫)
পূজাতিথি-কৃত্য	:	মহালয়া ভাদ্র অমাবস্যা ১৭ আশ্বিন, সোমবার (৩ অক্টোবর ২০০৫) শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ২৪ আশ্বিন, সোমবার (১০ অক্টোবর ২০০৫)
একাদশী-তিথি	:	১৩, ২৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার, শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৪ অক্টোবর ২০০৫)

ভক্তিগীতি, পালাকীর্তন, 'সঙ্গীতময় ভাগবতকথা' পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ১০ তারিখ সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মথুরেশানন্দজী ও স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর): গত ১৩-১৫ এপ্রিল ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রভাতফেরি, নরনারায়ণসেবা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ক্রীড়ানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৩ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী, অরুণাভ মাইতি, সহদেবরাম মাইতি ও সখারাম সামন্ত। ১৫ তারিখ প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হারিট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলি): গত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০০৫ উষাকীর্তন-সহ গ্রাম-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনে ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী ও স্বামী শেখরানন্দজী। দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে প্রায় ৫০টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উভয় দিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, নাটক, পুরস্কার বিতরণ, নৃত্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দজী, ডাঃ মানসকুমার পাড়িয়া, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শুড়িখালী শ্রীশ্রীমা সারদা-শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া): গত ১৭ এপ্রিল ২০০৫ পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, বাউলগান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ জয়গুরু ব্রহ্মচারীজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, চাতরা (বীরভূম): গত ১৭ এপ্রিল ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী কল্যাণানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী, ব্রহ্মচারিণী সারদা ও সম্পাদক বামদেব সাহা। দুপুরে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খয়েরপুর (পশ্চিম ত্রিপুরা): গত ২১ এপ্রিল ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ২০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ এবং ভাষণ প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এদিন প্রায় ৬৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সিহাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাধনমন্দির (বাঁকুড়া): গত ২১ এপ্রিল ২০০৫ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রদর্শনী, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অবধূতানন্দজী, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী ও স্বামী স্নিগ্ধানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট (কলকাতা-৬৫): গত ২১-২৫ এপ্রিল ২০০৫ শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য, যাত্রানুষ্ঠান, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী, প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ কমল নন্দী, অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি): গত ২২-২৪ এপ্রিল ২০০৫ অঙ্কন, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত, ক্যুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, বাউলগান, ভক্তসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রত্যহ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। ২৪ এপ্রিল প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, মণ্ডলগ্রাম (বর্ধমান): গত ২৫ এপ্রিল ২০০৫ উষাকীর্তন, পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন ১২ জানুয়ারি ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত 'বিবেক পরিচিতি' পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী বসে প্রসাদ পায়।

শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ, অযোধ্যা, বেলপুকুর (হাওড়া): গত ১ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। প্রায় ৭২৫ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৪৭টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কল্যাণী ও কল্যাণী সারদা সমিতি (নদীয়া): গত ১ মে ২০০৫ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, স্মারকগ্রন্থ 'অঞ্জলি' প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় 'ঋত্বিক সদন'-এ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শুকদেবানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী, স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী এবং শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী।

কুমিরমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলি): গত ১ মে ২০০৫ পূজা, পাঠ, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার মিত্র। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (হুগলি): গত ১ মে ২০০৫ সঙ্ঘগীতি ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বড়া মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়-এ বার্ষিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর-পর্বে উত্তর প্রদান করেন অমিত দত্ত ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠ ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সহ-সম্পাদক সুকুমার সাঁতরা। ১৩৭ জন প্রতিনিধি এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ মিলনতীর্থ, বেলঘরিয়া (কলকাতা-৫৬): গত ১ মে ২০০৫ স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্যারীমোহন স্মৃতিশহর গ্রন্থাগার-এ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

ভাষণ দেন প্রভাস দাস, সুনীল রুদ্র এবং সম্পাদক আশিসকুমার রায়। উপস্থিত সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বই প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিষদ—২০০৩ (কলকাতা-৪) : গত ১-২ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক, সেতারবাদন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাদস্পর্শ-ধন্য কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১ তারিখ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। ২ তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন পূর্বোক্ত মঠেরই সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দজী ও সুহাস চট্টোপাধ্যায়। এদিন ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

খড়্গপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ৭ মে ২০০৫ বৈদিকমন্ত্র, 'গীতা', 'কথামৃত', মায়ের জীবনী ও বাণী পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে সোসাইটির মহিলা ভক্তবৃন্দ কর্তৃক মহিলা সাধন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শ্রুতিসারানন্দজী। প্রায় ৫০ জন মহিলা প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাঁও (অসম) : গত ৭-৮ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ভক্তসম্মেলন, পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনে ভাষণ দেন স্বামী পরাশরানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। ৮ তারিখ দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দুয়াদণ্ড রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ৮ মে ২০০৫ আলোচনা, বার্ষিক পত্রিকা 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' প্রকাশ, প্রতিনিধি ও গ্রামের মানুষদের 'বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন' পুস্তক ও ছবি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী হররূপানন্দজী, সঙ্ঘের সভাপতি শঙ্করপ্রসাদ কারক এবং সেখ হাসান ইমাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হিমাংশু মুখার্জি, সহদেব ঘোষ ও চুনিলাল হাজরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক বরুণকুমার সাঁই। প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ৮ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, নৃত্য-গীত প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। দুপুরে উপস্থিত সকলে প্রসাদ পান।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ [আশ্রম] (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ১৪-১৫ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, বাউল সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র পাল। এদিন ১০০ দুঃস্থ ছাত্রীর প্রত্যেককে ১টি কলম ও ২ দিস্তা কাগজ প্রদান করা হয়।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৫ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, পথ-পরিক্রমা, রামায়ণ গান, লোকগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও কৃষ্ণকান্ত দত্ত। এদিন দুঃস্থনারায়ণদের মধ্যে ৪২টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

তড়কাবাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (বাঁকুড়া) : গত ১৫ মে ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, ক্যুইজ, যাত্রাপালা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শৈলজানন্দজী ও সমীরণ চক্রবর্তী। এদিন ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ডি. ভি. সি.-র ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সমীরণ চক্রবর্তী দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য এদিন এস. আই. পি. ডি. ভি. সি. নির্মিত গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, নিউ দিল্লি-নিবাসিনী সবিতা রায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার বিধাননগর-নিবাসী বৃন্দাবন ব্যানার্জি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার বল্লভপাড়া-নিবাসী সুদীনকুমার বল্লভ গত ৩ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, জলপাইগুড়ি-নিবাসিনী বাণী কুণ্ডু গত ৫ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁশবেড়িয়া-নিবাসী হীরেন্দ্রবিজয় ধর গত ৫ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী ছন্দা রায় গত ১২ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হুগলির মাহেশ-নিবাসিনী টগররানি বসু গত ১৬ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ডিব্রুগড়-নিবাসী পার্থসারথি দে গত ১৮ মার্চ ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুষমা ঘোষ গত ২ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ছিলেন স্বামী সুবোধানন্দজীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সাগরদ্বীপ-নিবাসী নিতাইচরণ সাহু গত ৮ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নদীয়া জেলার বাগআঁচড়া-নিবাসী শম্ভুনাথ গড়াই গত ৯ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী ডাঃ গৌরচাঁদ পোদ্দার গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ❑

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

রামকৃষ্ণ মঠ

ধনতলী, নাগপুর-৪৪০ ০১২

ফোন ঃ ২৫২৩৪২২, ২৫৩২৬৯০
ফ্যাক্স ঃ ২৫৩৭০৪২

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন মন্দির

একটি আবেদন

প্রিয় ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ,

নাগপুরের ধনতলীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ বিগত ৭৪ বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে। মধ্যভারতে এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন মন্দিরের পুরনো বাড়িটি ও তার সংলগ্ন উপাসনালয়টিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। জীর্ণতার জন্য এগুলির স্থানে নতুন মন্দিরাদি নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া ক্রমবর্ধমান ভক্তসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান উপাসনাকক্ষটিও বড়ই অল্পপরিসর। তাই আমরা স্থির করেছি, অনেক বড় আকারে একটি মন্দির ও একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হবে। এগুলির বিবরণ এইরূপ—

মন্দিরের আয়তন ১১৭´×৫৮´
মন্দিরের উচ্চতা ৬৭´
গর্ভমন্দির ১৮´৬˝×১৮´৬˝
উপাসনাকক্ষ (৫০০ ভক্তের জন্য) ৬৭´×৪০´
দুদিকের বারান্দা প্রতিটি ৬৭´×৫´
মন্দিরের ভিত্তি তথা অডিটোরিয়াম ৯১´৬˝×৯১´

সমগ্র প্রকল্পটির জন্য খরচ হবে ৩ কোটি টাকা (৩,০০,০০০,০০ টাকা), যার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে সহৃদয় ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করি। সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গৃহীত এই প্রকল্পে আপনার ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ইতি
ভগবদ্পদাশ্রিত আপনাদের
স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দ
অধ্যক্ষ

অনুদান ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট বা চেক-এ 'রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর'-এর নামে পাঠানো যেতে পারে। অনুদান আয়কর আইনের ৮০জি ধারাবলে করমুক্ত। বিদেশি মুদ্রায়ও অনুদান গ্রহণ করা হবে।

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

SRI MA SARADA DEVI

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

- রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম
  বেলুড় মঠ, ফোন : ২৬৫৪-৫৮৯২
- রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
  ৪ নম্বর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৪২-০৯৩২
- সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭১১ ৩১১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪
- মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯
- বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- বালী ঘোষপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি
  মধ্য জয়পুর বিল, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- সারদা বুক এজেন্সি, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন : ২৬৬০-১০৮৪
- শুকদেব সাঁতরা, গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬
- পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি
  গ্রাম+পোঃ পানিত্রাস-৭১১ ৩২৫
- হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  হাঁটাল-৭১১ ৪০৪
- সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন : ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২
- শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫
- মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩
- শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২
- বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯
- বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২
- শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ
  গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২
- ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন : ২৬৬৯-০৮০৬
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫
  ফোন : ২৬৫৯-১১৪৪
- দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন : ২৬২৯-০০৮৮
- বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  পোঃ বেলাড়ী, ভায়া : উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫
- দীনবন্ধু পণ্ডিত, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্কাশী, থানা : বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭
  ফোন : ২৬৬১-৮১১২
- স্বামী ধর্মব্রতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন
  বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন : ২৬৬৮-০০১৪
- সম্পাদক, উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ, উলুবেড়িয়া

জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : (০৩২২৮) ২৭২২১৮
- রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : (০৩২২৭) ২৬৫২০০
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬২১০৫
- দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১
  ফোন : (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬
- বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম
  গ্রাম : বরুণা (ভুতা), পোঃ ভুতা, থানা : দাসপুর
- ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
  ফোন : (০৩২২৫) ২৬০২৭১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
  গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬
- খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬
- শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬
- ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন : (০৩২২৭) ২৮৩৫৫৯
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির
  পোঃ এগরা-৭২১ ৪২৯, ফোন : (০৩২২০) ২৪৪১৯১

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

নির্মীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✵

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

✵

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

তত্ত্বম্ পদার্থ-পরিচয়ঃ

মহাবাক্য

বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ

প্রত্যগাত্মা

বিলোম অনুলোম

ত্বম্

ত্বম্‌পদ বাচ্যার্থ

ত্বম্‌পদ লক্ষ্যার্থ

তৎপদ লক্ষ্যার্থ → অনুপহিত শুদ্ধচৈতন্য

অজ্ঞান - মায়া = ব্রহ্মশক্তি = ত্রিগুণাত্মিকা পরাপ্রকৃতি

ব্যষ্টি (মলিন সত্ত্বপ্রধান, নিকৃষ্ট উপাধি, অল্পজ্ঞ) — প্রাজ্ঞ

সমষ্টি (শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান, উৎকৃষ্ট উপাধি সর্বজ্ঞ) — ঈশ্বর

তৎপদ বাচ্যার্থ → ঈশ্বর

তথ্যপঞ্জী:— বেদান্তসারঃ—সদানন্দযোগী—এবং—সুবোধিনী টীকা

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ওঠো - জাগো, আত্মনির্ভর হও।

মহান ভারতীয় দার্শনিক স্বামীজির অগাধ বিশ্বাস ছিল দেশের যুবশক্তির ওপর। তাঁরা জাগবে, উঠে দাঁড়াবে, আত্মনির্ভর হবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার ৫৪ শতাংশই ২৫ বছরের নীচে। পিয়ারলেস স্বামীজির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশক্তিকে সম্মানের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ দেখাচ্ছে। 'পিয়ারলেস স্বরোজগার যোজনা'-র মাধ্যমে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় স্বনির্ভরতার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মাঝে আত্মশক্তি জাগরিত হয়েছে। ভারতমাতার এই কৃতী সন্তানকে আমরা জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে করব সাকার, এই আমাদের অঙ্গীকার।

পিয়ারলেস ভারতের তরুণদলকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.,
Peerless Bhawan, 3 Esplanade East, Kolkata 700 069
Phone 033 22483247, 22483001, 22203740, 22436758,
Fax 033 22485197, E-mail peerless@cal3.vsnl.net.in
Website www.peerless.co.in
For information about products and services,
SMS *smart* to 4545

Peerless
Smart solutions

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol.107
No.8
August
2005

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No
SSRM/KOL RMS/WB/RNP/039/LPWP/11/2004-06
ISSN 0971-4316 R N 8793/57
Postal Regn No SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

'উদ্বোধন' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য একটি সুসংবাদ!

১০০ বছরের (১৮৯৯-১৯৯৯) 'উদ্বোধন' (প্রায় ৭৫,০০০ পৃষ্ঠা) প্রায় ১৫টি সি.ডি.-তে (একত্রে একটি প্যাকেটে) আগামী দুর্গোৎসবের (১৪১২) পূর্বেই প্রকাশিত হতে চলেছে। মূল্য ঃ ১,৫০০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রকাশন-পূর্ব নথিভুক্তিকরণ (Pre-publication Membership)-এর ব্যবস্থা নেই।

পরবর্তী বিজ্ঞাপনটিও অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন।

※ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০৲ টাকা। সডাক ১০০৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০৲ টাকা।

আশ্বিন ১৪১২

শারদীয়া সংখ্যা

কার্যালয় ● কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি

পোঃ টাকি, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৯
ফোন ঃ (০৩২১৭) ২৩৪৪৭৩/২৩৩৮৭৮

একটি আবেদন

এতদ্দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী, প্রাক্তন ছাত্র ও সহানুভূতিশীল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি, উত্তর ২৪ পরগনা** একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদপুষ্ট, তাঁহার কৃপাধন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত দ্বারা ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। প্রায় ৭৪ বৎসরব্যাপী বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাধ্যমে একটি নামী হাই স্কুল, ৩টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি ছাত্রাবাস, ১টি ডিস্পেনসারি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির-সহ আশ্রমটি এক সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন ঃ "যখন যেমন তখন তেমন।" এই কথা স্মরণ করিয়া আগামী ২০০৬ সালে আশ্রমের আসন্ন প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রাক্কালে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের কথা ভাবা হইয়াছে।

এতদুপলক্ষ্যে কিছু উন্নতিমূলক কার্য করিবার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। কার্যগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রকল্পের বিবরণ	আনুমানিক ব্যয়
ছাত্রাবাসের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর	৩ লক্ষ টাকা
জীর্ণ ছাত্রাবাসের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	২ লক্ষ টাকা
খেলাধূলার মাঠ সংস্কার ও ব্যায়ামাগার	১ লক্ষ টাকা
কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা চালু করা	২ লক্ষ টাকা
মন্দির সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
আশ্রমগৃহ সংস্কার	১ লক্ষ টাকা
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রকল্প	১০ লক্ষ টাকা
	মোট ২০ লক্ষ টাকা

উপরি উক্ত প্রকল্পে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেক বা ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **"Ramakrishna Mission Ashrama, Taki"**—এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে
স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ
সম্পাদক

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির

জয়রামবাটী, বাঁকুড়া-৭২২১৬১ ফোন ঃ ০৩২১১-২৪৪২২২, ০৩২৪৪-২৪৪২১৪

বিশেষ আবেদন ঃ আমোদর সংস্কার প্রকল্প

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে 'মায়ের গঙ্গা' আমোদর অতি পবিত্র স্থান। শ্রীশ্রীমা ভাইদের নিয়ে আমোদরে স্নান করতে যেতেন। তাই ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয়ে ঐ পবিত্র নদীতে স্নানের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে নদীতে জল না থাকায় স্নান করতে না পারার জন্য ভক্তদের মনে বিশেষ কষ্ট হয়। এমনকি গ্রীষ্মে স্পর্শ করার মতো জলও থাকে না। জলের ব্যবস্থাদি এবং নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আনুমানিক ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন।

নলকূপ নির্মাণ	২,০০,০০০/-	জলাধার নির্মাণ (৫০'×২৫')	৩,০০,০০০/-
ঘাট বাঁধানো	৩,০০,০০০/-	মাটি কাটানো	১,০০,০০০/-
বাঁধ দেওয়া	৫,০০,০০০/-	বিবিধ	২,০০,০০০/-
রাস্তা তৈরি	৫,০০,০০০/-	রক্ষণাবেক্ষণ (স্থায়ী আমানত)	৫,০০,০০০/-
শ্মশানঘাট সংস্কার	৪,০০,০০০/-		

মোট খরচ ঃ ৩০,০০,০০০/-

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন—মুক্তহস্তে দান করে জীবন সার্থক করুন ও ভক্তদের হৃদয়ের কষ্ট লাঘব করে পুণ্য অর্জন করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী অমেয়ানন্দ

*** এই শুভ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং ঐ দান ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। * চেক/ড্রাফ্ট/মানি অর্ডার 'শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির' (Sri Sri Matrimandir)—এই নামে পাঠাবেন। U.B.I. Joyrambati Branch. S.B. A/c. No.-01**

> All religions are true. God can be reached by different religions. Many rivers flow by many ways but they fall into the sea. They all are one.
>
> Sri Ramakrishna

A WELL WISHER

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নহে যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না; আবার যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগিদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৯১৮ সাল। শরৎকাল। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করিতেছেন। সেইজন্য তিনি মাকে লইয়া গিয়াছেন। মা মঠের উত্তরে বাগানে আছেন। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত একরাত্রে হঠাৎ মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত। মা ভক্তটির আগ্রহ দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলেন ঃ "দেখ, এইরকম টান না হলে কি তাঁকে পাওয়া যায়?"

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

> Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succour you want is within yourselves. Therefore make your own future.
>
> Swami Vivekananda

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✲

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

✲

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছ জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Past since are counteracted by meditation, japa and spiritual thought.

Sri Ma Sarada Devi

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৬ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১২-১৪১৩ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এখন আপনি বছরের যেকোন মাস থেকেই 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে পারবেন এবং সেই মাস থেকে মোট ১২ মাসের জন্য বই পাবেন। দুই বা তিন বছরের জন্য গ্রাহক হলেও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে, যেকোন মাসে গ্রাহক হলে সেই মাস থেকেই হিসাব শুরু হবে। অবশ্য, পুরনো ব্যবস্থায় (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) কেউ গ্রাহকপদ নবীকরণ করতে চাইলে তাঁকে মার্চ মাসের মধ্যেই তা করতে হবে। ঐ মাসের পরে নবীকরণ করলে পুরনো সংখ্যাগুলি (যথা এপ্রিলে নবীকরণ করলে জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিনটি সংখ্যা) দেওয়া সম্ভব হবে না; সেগুলি তাঁরা আলাদাভাবে ধার্য-মূল্যে কিনে নেবেন। তাই পুরনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, গ্রাহকপদ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য আপনারা অবশ্যই মার্চের মধ্যে নবীকরণ করিয়ে নেবেন।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৮তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৬) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) : ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আজীবন গ্রাহকভুক্তি : আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

'উদ্বোধন'-এর সেবায় নটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য আটটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700 003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে : আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১

পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উদ্বোধন কার্যালয়ের সকল বিভাগ ১০ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর (২০০৫) বন্ধ থাকবে।

শ্রীসারদাপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্

ওঁ প্রাতঃ স্মরামি জননীং পরিশুদ্ধরূপাং
নিত্যাং হি পাপশমনীং তমসো নিহন্ত্রীম্।
প্রাতঃ প্রভাং জনিমতাং সুমতিপ্রদাত্রীং
দিব্যামনন্তকরুণাং মম সারদাখ্যাম্॥১॥

আমি প্রাতঃকালে আমার মা সারদাকে স্মরণ করি। সারদা পরিশুদ্ধরূপা। তিনি নিত্যা। তিনিই পাপ, অজ্ঞানাদি নিবারণ করেন। এই সারদাই প্রাতঃকালীন প্রভা বা উষা। তিনি সকল জীবকে শুভবুদ্ধি দান করেন। তিনি দিব্যা। তাঁর করুণার সীমা নেই।

প্রাতর্নমামি জননীং প্রথমার্কবর্ণাং
হৈমাং শিবাং সকলধীপ্রবিকাশহেতুম্।
নানাগুণাশ্রয় সুধীযতিরাজপূজ্যাং
দেবীং সুদিব্যচরিতাং মম সারদাখ্যাম্॥২॥

প্রাতঃকালে সারদানাম্নী আমার মায়ের বন্দনা করি। তাঁর বর্ণ প্রভাত-সূর্যের মতো। তিনি হিমবানের কন্যা ও মঙ্গলরূপিণী। তিনি নানা গুণের আশ্রয় ও বিদ্বান যতিশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পূজিতা। তিনি দেবী ও দিব্যচরিত্রমণ্ডিতা।

প্রাতর্ভজামি জননীং যুগদেবপূজ্যাং
আদ্যন্ত-মধ্য-রহিতাং প্রথমাং তথাদ্যাম্।
সীতাদি রূপবিহিতেশ্বর সাহচর্য্যাং
সর্বাশ্রয়াং সকলদাং মম সারদাখ্যাম্॥৩॥

যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের যিনি পূজ্যা, আমার জননী সেই সারদাদেবীকে প্রাতঃকালে ভজনা করি। তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত-হীনা। সকলের পূর্বে তাঁর প্রকাশ এবং তিনি আদ্যাশক্তি। সীতাদিরূপে তিনি (যুগে যুগে) ভগবানের সঙ্গে লীলা করেছেন। তিনি সকলের আশ্রয়স্বরূপিণী ও সর্বাভিষ্টপ্রদাত্রী।

স্বামী সুনির্মলানন্দ

অদ্বৈতা, নিরাকারা, নির্গুণা

দেখিতে দেখিতে পুনরায় শারদোৎসব আসিয়া পড়িল। বিগত বৎসরে যখন মা আসিয়াছিলেন, সন্তানের প্রাণে আনন্দের জোয়ার আসিয়াছিল। সকলপ্রকার সাংসারিক আবিলতা ও ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করিয়া, হাজারো দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করিয়া বাঙালির জাতীয় উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হইবে, জগজ্জননীকে কন্যারূপে নিজের ঘরের লোক বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাতিয়া উঠিবে—একথা ভাবিলেই হৃদয়ে যেন একটা ঝঙ্কার উঠিতে থাকে। সময়ের দিকে চাহিয়াও মনে হয় যেন চক্ষুষ্মান নহে বলিয়া বোধ হয়। 'পুজো পুজো' ভাব এখন আকাশ-বাতাস মোহিত করিতেছে। চতুর্দিকে সকলের ব্যস্ততা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া এই চিরাচরিত সমাজচিত্রকে অন্য রূপ প্রদান করিতেছে। যখন বর্ষার মেঘে ভারী আকাশ-বাতাস ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিয়া সূর্যের পথ প্রশস্ত হয়, যখন বর্ষার পলকের ন্যায় ঝকঝকে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে হরিৎ শস্যভূমি, তখন মন উদ্বেল হইয়া উঠে। পূজাবসানে আবার ফিরিয়া আসে সেই পুরনো অভ্যাস, রেলস্টেশনে অফিসযাত্রীর ভিড়, বড়বাজারে নূতন বস্ত্র সব গুদামে ভরিয়া শীতবস্ত্র বাহির করিবার তোড়জোড়, পুরোহিতের সেই একঘেয়ে পৌরোহিত্য, সেই কৃষকের আমন তোলা, সেই শীতের ক্রিকেট, সেই বাঙালির ভ্রমণাভিলাষ, সেই কাশ্মীর সমস্যা আর আতঙ্কবাদ, সেই ডোভার লেন কিংবা পৌষমেলা অথবা কলকাতা বইমেলা আর সেই পুরনো পাটালিগুড়। সম্প্রতি ইহার সহিত কিছু বিদেশি সংস্কৃতি আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, কালচক্র এইভাবেই ঘূর্ণায়মান।

লক্ষণীয় ইহাই যে, পৌরাণিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিলেও এই একই চিত্র মানসপটে ফুটিয়া উঠে। দেবতা ও অসুরের আবহমানকালের দ্বন্দ্ব যেন আর ফুরায় না। একসময়ে দেবতাগণের প্রাধান্যবশত শস্যশ্যামলিত ধরণিতে ত্যাগ-দয়া-সংযম-সত্যের অভিঘাত, তৎসহ নির্মল ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-সামাজিক অভ্যুদয়, শান্তিপূর্ণ বিশ্বচরাচর; আর অন্যসময়ে দানবশক্তির প্রাধান্যে ত্রিভুবন প্রকম্পিত, অস্থিরতা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, নরমেধ যজ্ঞ আর অসত্যের অশনিপাতে দিগ্‌দিগন্তে হাহাকার ধ্বনি। নির্যাতিত মানুষের সেই আর্তি যখন নিঃশব্দে কিংবা সশব্দে কুণ্ডলীকৃত ধূমের ন্যায় ঊর্ধ্বগগনে ধাবিত হয়, তখন ধর্ম-অধর্মের তীব্র অসাম্যে বিচলিত শ্রীভগবান স্বীয় বৈষ্ণবীশক্তি অবলম্বনে সজ্জনকে রক্ষা ও দুর্জনকে বিনাশ করিবার জন্য ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন ঃ "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত..." ইত্যাদি, অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী ঘোষণা করিতেছেন ঃ "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।" অর্থাৎ কখনো বিদ্যাশক্তি, কখনো বা অবিদ্যা শক্তির প্রাধান্য দেখা যায়—নদীতে জোয়ার-ভাটার মতো। যখন জোয়ারের পর ভাটা পড়িবে, তখন নদীর জল প্রায় পুষ্করিণীবৎ স্থির হইয়া আসে। সেইরূপ অল্প সময়ের জন্য জগতে ধর্ম ও অধর্মের সাম্যাবস্থার পরই আবার অসাম্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে জীবননদীতে অনাসক্ত হইয়া যে-ব্যক্তি জোয়ার-ভাটার খেলা দেখিতে পারেন, তিনি অধ্যাত্মজীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য তাহা নহে। সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই গতিপ্রবাহের পশ্চাতে একটি অপরিবর্তনীয় শাশ্বত

শারদ প্রার্থনা

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাঙালির জাতীয় উৎসব শারদোৎসব সমাগতপ্রায়। [illegible]

সত্তা আছে বলিয়াই এই পরিবর্তনগুলি মনুষ্যবুদ্ধির গোচর হইতেছে। নদীর জলতরঙ্গ রূপ ও নাম-ভেদে বহু হইলেও 'জল'-রূপ একটি অধিষ্ঠানের জন্যই উহারা অস্তিত্ববান। নদীতে জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রেও একই কথা : জল যদি না থাকে, নদীতে জোয়ার-ভাটার প্রশ্ন নাই। সেইরূপে যদি 'আত্মা' নামক অধিষ্ঠানটি না থাকে, তাহা হইলে আপনার-আমার ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য ঘটনার অস্তিত্বই অসম্ভব হইত। এবং ব্যক্তিজীবনে সেই আত্মা নামক অধিষ্ঠানটির অপরিবর্তনীয়, অনাদি, অনন্ত, চিরস্থির, নিষ্ক্রিয় এবং অস্পৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা তাহাকে 'অধিষ্ঠান' বলাই যুক্তিযুক্ত নহে। সমষ্টি অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের ক্ষেত্রে সেই অপরিবর্তনশীল 'অধিষ্ঠান'কেই শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবাঙ্মনসগোচরম্ এই চিদাত্মক সত্তার ক্রিয়াশীলতা লক্ষিত হয় চিৎশক্তির মাধ্যমে। একদিকে উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা, অপরদিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মশক্তির অসাধারণ বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য দেখিলে বিস্ময় জাগে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষি বলিতেছেন : "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" চিতিরূপে অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানরূপে সর্ববিশ্বব্যাপী সেই আরাধ্যা দেবী বিরাজিতা। তিনি কেমন? অখিল প্রাণিবর্গের শরীরস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী : "ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।" দেবীকে দেহধারিণী হিসাবে মহিষাসুর ও অপরাপর অসুরবৃন্দ, এমনকি দেবতারাও দেখিয়াছিলেন। অতঃপর দেবদৃষ্টিতে ধরা পড়িল আরো কিছু, যাহা অসুর বা দানবীয় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তাহা দেবীর বিরাট রূপ, যাহাকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নহে। তিনি অমূর্তা, দিব্যা, অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র বিরাজিতা। সেই কথাই মুণ্ডক উপনিষদে ঋষি বলিলেন : "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।/ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" সেই পরম পুরুষ হইতেই মন, বুদ্ধি ও সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্টিলাভ করিয়াছে, এবং তৎসহ সৃষ্ট হইয়াছে বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং আকাশ।

বস্তুত, শ্রীশ্রীচণ্ডীর পৌরাণিকতার আড়ালে মহান অদ্বৈততত্ত্বই ইহার মূল প্রতিপাদ্য। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত এই গ্রন্থের (সাতশত শ্লোকের সমাহার) শুরুতেই চরম অদ্বৈত অনুভূতির কথা দেবীসূক্তের মাধ্যমে ঋষি প্রকাশ করিলেন : "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি। কল্পকাহিনী এইপ্রকার : অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া বিশ্বচরাচরে কেবল নিজেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সেই অনুভূতির দার্ঢ্য এমন পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে যে, সেই ঋষিকন্যা বলিতেছেন : আমিই একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেবতা। আমিই মিত্র, বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি— ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে দিব্যচক্ষুর সাহায্যে পার্থ অর্জুন শ্রীভগবানকে একই ভাবে দেখিয়া স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বলিতেছেন :

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
 স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
 ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
 পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥" (৩৮, ৩৯)

দেবী যে অনুভব আত্মায় করিয়াছিলেন (subjective realization), সেই একই অনুভব অর্জুনের হইল objectively অর্থাৎ যুক্ত প্রত্যক্ষে। অর্জুন বলিতেছেন : হে অনন্তরূপ! আপনি আদিদেব, অনাদি পুরুষ। আপনিই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান; আপনিই জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য দুই-ই। আপনিই পরম ধাম, আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র; আপনিই লোকপিতা ব্রহ্মা। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি।

অর্থাৎ একটি কথা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, যে উমা মেনকার প্রাণপাখি, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালির ঘরকন্নার একেবারে অন্দরমহলের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে আগমনী সঙ্গীতের মাধ্যমে কিংবা লোকসংস্কৃতির পরতে পরতে, সেই ঘরের মেয়ে উমাকে অবলম্বন করিয়াই পরম মানবকল্যাণচিকীর্ষু শাস্ত্রপ্রণেতাগণ মানুষের মনকে দৈনন্দিন সংসার-পঙ্কিল আবিলতার ঊর্ধ্বে টানিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তান্ত্রিক পদ্ধতিই হইল অত্যন্ত সাধারণ স্তর হইতে যেকোন সাধককে ধীরে ধীরে, বোধ হয় তাহার অজান্তেই, অতি উচ্চস্তরে টানিয়া তুলিয়া শেষে অদ্বৈত-অনুভূতির যোগ্য করিয়া লওয়া। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন : "শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা। ইহার প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপা ও উত্তর চরিত্র সামবেদ-স্বরূপা।" এবিষয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, স্বামী সারদানন্দের মতে, প্রথমত ইহাই প্রমাণ করা যে, তন্ত্র বেদমূল; এবং দ্বিতীয়ত শুদ্ধাচার তন্ত্র কামগন্ধবিবর্জিত, প্রেমরসরঞ্জিত ও অদ্বৈতানুভূতি লাভের এক সহজ ও মনোরম পন্থা। ■

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পুরনো ইতিহাসের একটি পাতা*

প্রিয় শ্রীমতী বুল,

আপনার সানুগ্রহ অনুসন্ধানের উত্তরে, আমাদের কাজকর্মের বর্তমান অবস্থা এবং এই সময়ে এর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আপনার সামনে উপস্থাপিত করার একটা সুযোগ পেয়ে আমি সত্যই নিজেকে ধন্যবাদার্হ মনে করছি। এই আশা নিয়ে লিখছি যে, আমাদের Guild of Help[১]-এর সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য পাব।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে যখন ভগিনী ক্রিস্টিন আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন, সেসময় পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সংগঠনমূলক কাজ খুব সামান্যই করা গিয়েছে। সিস্টার বেট ও আমি এখানে বাস করি চাকর-বাকর ছাড়াই। এই বাড়িটি গুছিয়ে নিতে, আমাদের ছোট গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহটি খোলা রাখতে ও পরিচালনা করতে এবং ভগিনী বেট যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন মহিলার বাড়িতে এবং এখানে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের বৈকালিক সেলাই শেখাবার ক্লাস নেন, তাতে অনেক শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। ১৯০৩-এর শীতকালটা আমার নিজের সময় ব্যয়িত হয়েছে দুটি দীর্ঘমেয়াদি বক্তৃতা-সফর, পত্র-পত্রিকায় লেখা ও অন্যান্য বাইরের কাজে।

যদিও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, যে-সময় ও শক্তিব্যয় প্রয়োজন ছিল, তার তুলনায় কোন একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু আমার ধারণা, ঐ কয়মাসের পরীক্ষামূলক কাজকর্ম আশপাশের সমাজমণ্ডলীর মধ্যে এই খুদে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি নিজস্ব স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। কখনো কখনো রোগীর সেবাশুশ্রূষা করার জন্য ডাক এসেছে; একাজে ভগিনী বেট বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কখনো আমরা কথকতার আয়োজন করেছি। কথকতা হচ্ছে প্রাচীন পুরাণ নিয়ে প্রবচন, এই আসরে মহিলারা উপস্থিত থাকেন; কখনো বা আমরা পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আমরা যাকিছু করেছি তাতে সাধারণ মানুষ আমাদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে শিখেছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, এবাড়িতে তারা স্বাধিকারে আসতে পারে।

১৯০৩-এর প্রথম ভাগে ভগিনী ক্রিস্টিন আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছে এবং আপনি জানেন তার কিছুদিন পরেই আপনি এখানে এসেছিলেন। সেদিন থেকেই এখানকার কাজকর্ম সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে এবং রন্ধন ও অন্যান্য কাজকর্মের ব্যাপারে আমরা তদনুযায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

প্রথম থেকেই ভগিনী ক্রিস্টিনের ইচ্ছা ছিল মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাকার্য সংগঠন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে সে স্বামী সারদানন্দের উপদেশ অনুসরণ করতে থাকে। পরিণতিতে নভেম্বরের গোড়ার দিক থেকেই এই বাড়িতে রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের সেলাই ও অন্যান্য বিষয়ে শেখার জন্য সে ক্লাস নিতে থাকে। শুরু থেকেই ভগিনী ক্রিস্টিনের সৌভাগ্য এই যে, সে ইংরেজি, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাল জানা ব্রাহ্মসমাজের কুমারী লাবণ্য বসুর সহযোগিতা পেতে থাকে। পরে অবশ্য কুমারী বসু অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাঁর অভাব কতকটা পূরণের জন্য নারীদের জন্য যে ডাফরিন হাসপাতাল আছে, সেখানকার প্রধানা ডাঃ ভগহ্যানের আকর্ষক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

ক্লাস আরম্ভ করে আশা করা গিয়েছিল, বড়জোর আট-দশজন রক্ষণশীল মহিলা ভরদুপুরে তাদের অন্দরমহল ছেড়ে অপরিচিত একটি বাড়িতে এসে শিক্ষাগ্রহণের এই দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেবে। সকলকে অবাক করে দিয়ে প্রথমদিনেই উপস্থিত হয় পঁচিশজন ছাত্রী। এবং সেদিন থেকে ছাত্রীসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে একসপ্তাহ আগে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

অপ্রকাশিত এই পত্রটির অনুবাদক স্বামী প্রভানন্দজী, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা।

১ এবিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় নিবেদিতা প্রচারিত বিদ্যালয়-পরিকল্পনাটিতে। দ্রঃ Complete Works of Sister Nivedita, Vol. IV, pp. 377-378, footnote

উনষাট। এবাড়ির সীমিত পরিসরে একসঙ্গে এত মানুষের পক্ষে স্থানের অপ্রতুলতা। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা লক্ষ্য রাখছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন বাড়ি থেকে মহিলাদের বেরিয়ে আসার নানা সমস্যার কথা। কিন্তু দেখা গেল, ভগিনী ক্রিস্টিনের স্থায়ী বন্ধু ও সমর্থকদের মধ্যে এসে জুটেছিল কয়েকজন যুবক ও বৃদ্ধা রমণী। তরুণদের স্বাভাবিকভাবেই আকাঙ্ক্ষা যে, তাদের স্ত্রী ও ভগিনীদিগের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মোচিত হয়; এবং প্রবীণা হিন্দু রমণীগণের—এঁদের অধিকাংশ বিধবা, সুতরাং পুরনোপন্থীদের নেতৃস্থানীয়া; তাঁদের সূক্ষ্ম আন্তরদৃষ্টি ও সাধারণবুদ্ধি এই শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করেছিল। এসব প্রবীণা রমণীগণ প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গার ঘাটে স্নানের জন্য মিলিত হন এবং এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে আলোচ্য বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

প্রথমাবধি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ক্লাসে সেলাই, বাঙলা পড়া ও লেখা এবং ইংরেজি শেখানো। এছাড়াও ভগবদ্গীতা থেকে পাঠ করা হয়। চিন্তামূলক আলাপ-আলোচনার সাগ্রহ সুযোগ দেওয়া হয় এবং ভূগোল ও ইতিহাস সংক্রান্ত পাঠ্যবিষয়কে ম্যাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্য কাজের চাপে এবিষয়গুলির কয়েকটি কখনো কখনো বাদ দিতে হয়েছে। অপরপক্ষে ডাঃ ভগহ্যান যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সবাই শুনেছে। কিন্তু খুব শীঘ্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ভগিনী ক্রিস্টিনের জনপ্রিয়তার মূলে সূচিশিল্প। জামা-কাপড় তৈরি করতে ও রিপু করতে মহিলাগণ এতই আগ্রহী যে, অপারগ না হলে তারা মধ্যাহ্নের আগেই সানন্দে উপস্থিত হতো এবং তাদের ফেরত পাঠানো সহজ ছিল না। তারা যতক্ষণ এবাড়িতে থাকত, বলা বাহুল্য, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষদের কোন ঠাঁই হতো না। এদের ক্লাস সপ্তাহে দুদিন করে হয়—সোমবার ও শুক্রবারে।

এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে, এই বাড়ির কাজকর্ম সংগঠিত হলে ভগিনী বেট অন্য কাজ করার অবসর পান এবং আমরা এবাড়ির পার্শ্ববর্তী দুটি কামরাযুক্ত বাড়িতে ছোট ছোট মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। এখানে ভগিনী বেট প্রত্যেকদিন দুঘণ্টা করে তিনটি ক্লাস নেন। তিনি শেখান সূচিশিল্প, অল্পসল্প অঙ্কন, বাঙলা পঠন ও লিখন। তাছাড়া সাধারণ কিণ্ডারগার্টেন উপাদানের সাহায্য নিয়ে তিনি শিশুদের মধ্যে সংখ্যা, নকশা ও অঙ্কন সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। খ্রিস্টসন্ধ্যা উপলক্ষ্যে শিশুদের এসময়কার কাজকর্মের একটা ছোট প্রদর্শনী করা হয়। সেখানে শিশুদের মায়েদের কয়েকজন এসেছিলেন। মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। খ্রিস্টমাসের কাহিনী বলা হয়েছিল। আমাদের এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সে-বিকালটি সকলের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক তরুণ সন্ন্যাসী ইদানীং জাপানে গিয়েছিলেন। সামান্য কয়েক সপ্তাহ হলো তিনি ভগিনী বেটের শিশুদের সামনে ঐ দেশ সম্পর্কে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে একটি বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আরেকদিন সন্ধ্যাতে এই বাড়িতে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন গৃহবধূদের সম্মুখে। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ সফল হয়েছে। সত্যিই, আমাদের পরিকল্পনা আছে যে, দুই বা তিনজন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা বাংলার রমণীদের কল্যাণার্থে 'ম্যাজিক লণ্ঠন মিশন'-এ বেরোতে পারে।

ইতোমধ্যে অনেক জায়গা থেকে সাগ্রহ অনুসন্ধান ও অভিনন্দনের পূর্বাভাস এসেছে। আমাদের মনে হয়েছে, এধরনের একটি উদ্যোগের শিক্ষামূল্য সম্ভবত অনেক; এবিষয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। এই উদ্যোগটি নিতে হলে আমাদের স্লাইডের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়াতে হবে। আমরা বিশেষ করে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক অথবা শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কিত স্লাইড বাড়াবার চেষ্টা করব। হিন্দু রমণীদের নিঃসন্দেহে জনসাধারণের হিতকর বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আলোচ্য উপায়গুলি নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। অবশ্য আমরা বিশেষ করে চাইব ভারতীয় ও এশীয় মহাদেশীয় সংক্রান্ত বিষয়গুলি তাদের দেখাতে। কিন্তু যেহেতু তুলনামূলক উপস্থাপনা মনের ওপর ছাপ ফেলার প্রধান শক্তিশালী উপায়, তাই পাশ্চাত্যের নগর ও পাশ্চাত্যের জীবন সংক্রান্ত ছবিও খুব কার্যকরী হবে এবং আধুনিক শিল্পব্যবস্থার উদাহরণ দেওয়ার জন্য এধরনের চিত্রের কোন বিকল্প নেই।

বিগত বসন্তকালে স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে ছয়টি তরুণের হিমালয়-ভ্রমণ সংগঠন করা সম্ভব হয়েছিল। দলটি ছয় সপ্তাহে পদব্রজে প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করেছিল। এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। তারা রেলগাড়িতে চেপে কাঠগোদাম গিয়েছিল। মাথাপিছু যাতায়াতের রেলভাড়া পড়েছিল ২০ টাকা অর্থাৎ ৭ ডলার বা ১ পাউণ্ড, ৬ শিলিং ও ৮ পেন্স (প্রায়)। আর তাদের পরিভ্রমণের বাকি সবকিছুর জন্য মাথাপিছু খরচ পড়েছিল অর্ধেক পরিমাণ অর্থ।

আমরা খুবই আশা করছি, ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে। যখন বুঝতে পারি ভারতীয় যুবকদের কত

প্রয়োজন তাদের মাতৃভূমিকে জানা ও ভালবাসা, তখনি অনুভব করি ভ্রমণ ও দর্শনের পরিশীলিত অভ্যাসের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত আর কিছু হতে পারে না। আমরা খুশি হব যদি আগামী মে মাসে একটি দলকে গঙ্গার উৎসক্ষেত্রে এবং অক্টোবর মাসে আগ্রায় তাজমহল এবং দিল্লি ও ফতেপুর সিক্রিতে মুঘল প্রাসাদ ও সমাধির ওপর স্মৃতিস্তম্ভগুলি দেখতে পাঠাতে পারি।

আপনাকে বিবেকানন্দ বোর্ডিং স্কুলের বিষয় বলা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে স্বামী সারদানন্দ গত গ্রীষ্মে (১৯০৩) এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছেন। গ্রাম থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ও পরীক্ষায় যোগদানকারী ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস (ছাত্রাবাস) ও হোস্টেলের চেয়ে অধিক জরুরি আর কোন কাজ কলকাতাতে নেই। কিন্তু আমাদের এই ছাত্রাবাসটিতে বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভাল রান্নার ব্যবস্থা ও পরিষেবা এবং দৃঢ় অবিচলিত নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে সফল হয়েছে; অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠানটিকে মোটা বাড়িভাড়া এবং একটি বৃহৎ অঙ্কের প্রাথমিক খরচ-খরচার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। আমার নিজের ঐকান্তিক অনুরোধে—অবশ্য যে-অনুরোধের সঙ্গে দায়িত্ব এসে পড়ছে—ছাত্রাবাসের কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন কলেজ-ফেরত ছাত্রদের সামান্য বৈকালিক জলখাবারের জন্য অল্প টাকা খরচ করতে সম্মত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে প্রতি রবিবার বিকালে এবাড়ি থেকে চা-টার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৈনন্দিন খাবার যোগান দেওয়ার জন্য যে-দান আসবে, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ঐ চা-এর জন্য তহবিল এবং সংগৃহীত অর্থ উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছানো দরকার। মিশনারি তহবিল দ্বারা পুষ্ট ও নিঃশুল্ক যে-দুটি বা তিনটি ছাত্রাবাস আছে, তাদের মধ্যে সমমর্যাদায় সংস্থাপিত করতে হলে এই ছাত্রাবাসটির একান্তভাবে প্রয়োজন অর্থসাহায্য। ছাত্রাবাসটির সফল হওয়া দরকার, কারণ এটি ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য একান্তভাবেই একটি ভারতীয় উদ্যোগ। কিন্তু সফল হবে কি করে, যদি প্রতিটি আহার খুব হিসাব করে ব্যবস্থা করতে হয় এবং যদি বইপত্র বা খেলাধুলার জন্য কোন উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকে। এই ছাত্রাবাসটির জন্য যেকোন দান বা চাঁদা সানন্দে গ্রহণ করা হবে।

ভবিষ্যতের কথা বিচার করে আমরা সানন্দে ভাবতে পারি যে, বর্তমান বছরের পরিচালনার জন্য আমাদের যথেষ্ট অর্থ হাতে আছে। ভগিনী বেটের স্বাস্থ্য এতই অনিশ্চিত যে, তার ওপর নির্ভরশীল কাজের অংশ যেকোন সময় বন্ধ করে দিতে হতে পারে। একই সময়ে ভগিনী ক্রিস্টিনের কাজের সম্প্রসারণের এত সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা ভগিনী বেটের অভাবের ক্ষতিপূরণের বেশি হবে। এমনকি ভগিনী বেট যদি ইউরোপে ফিরে যায়, তাহলে আমরা তার বদলে কর্মী খুঁজে বের করব—যাতে বিদ্যালয়টি মোটামুটি চালু থাকে। এটি করতে হলে তরুণ শিক্ষিকাদের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ তাদের কাছে মূল্যবান হবে এবং তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রীদেরও উপকার হবে।

এসব ছাড়াও গোপালের মা নামে পরিচিতা এক বৃদ্ধা হিন্দু মহিলাকে আবাসস্থান দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই মহিলার প্রতি আমাদের সকলের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আমাদের মধ্যে গোপালের মায়ের উপস্থিতি আমাদের প্রচুর শক্তি যোগাচ্ছে এবং কাজ ও বাড়িটির পরিচালনায় সহায়তা করছে। এর ফলে এটা হয়তো অসম্ভব হবে না যে, অন্যান্য হিন্দু মহিলাগণ আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে সম্মতা হবেন এবং বিধবাদের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের লালিত আকাঙ্ক্ষাকে সফল করে তুলবেন।

ভগিনী ক্রিস্টিনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, মহিলাদের কর্মসূচিকে বিশেষভাবে পরিচালিত করা—যাতে বিধবাদের মধ্যে শিল্পকাজ আরম্ভ করা যায়। ইতোমধ্যে একজন মহিলা একটি বুননের যন্ত্র (knitting machine) ব্যবহার করতে শিখেছেন এবং এখন তিনি এবিষয়ে শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু এসব কর্মোদ্যোগ যা আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, সেগুলি পরিচালনা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন অর্থ ও কর্মী।

আমাদের প্রিয় বন্ধু ডাঃ ভগহ্যানের আকাঙ্ক্ষা যে, উচ্চবংশসম্ভূত প্রাচীনপন্থী হিন্দু বিধবাগণকে নার্সিং-এর কাজ জীবিকারূপে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। আমরা সবাই তাদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনাদি আনতে অনেক সময় ও প্রচুর অধ্যবসায় প্রয়োজন। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে, প্রয়োজনীয় সাহায্যগুলি এসে উপস্থিত হবে।

প্রিয় শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ওলি বুল, বিশ্বাস করুন, আপনি যে খোঁজখবর নিয়েছেন তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার একান্ত বিশ্বস্ত—

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ — ১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা

উদ্বোধন

আশ্বিন ১৩১২
সেপ্টেম্বর ১৯০৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পিতামাতা ও জন্মকথা।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্*)

শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর নামক গ্রামে। তাঁহার কুটীরখানি গ্রামের সদর রাস্তার উপর। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র বটে, কিন্তু মহাতেজস্বী ও ত্যাগী; দিবানিশি আপনার গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন।... দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি আজন্ম কোন প্রকার বিষয়কর্ম্ম, ভিক্ষা বা শূদ্রের নিকট দান পরিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার কুটীরের কিয়দ্দূরে অতি সামান্য একটুকরা ধানজমি। সেই জমিতে তিনি 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া ধান ছড়াইয়া দিতেন এবং তাহাতেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাঁহার সংসারের সম্বৎসরের সংস্থান। উক্ত জমিতে অজন্মা কখনও হয় নাই।

গ্রামের জমিদার লাহাদের একটী অতিথিশালা আছে। এই পথে গমনকালে সাধু সন্ন্যাসীর সেইখানেই বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া যাইবার সকল প্রকার ব্যবস্থা আছে। তথাপি এমন দিন নাই যে, খুদিরামের বাড়ীতে দুই-এক জন অতিথি নাই। খুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী এইসকল অতিথির জন্য রন্ধন ও ইঁহাদের পরিচর্য্যা স্বহস্তে করিতেন, এজন্য প্রত্যহই তাঁহার আহার করিতে অপরাহ্ণ হইয়া পড়িত।...

একদিন খুদিরাম তাঁহার প্রিয়তম কন্যা কাত্যায়নীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন; সকলে বলে উপদেবতাগ্রস্ত। খুদিরাম দেখিতে গেলেন। কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভূতই হও কি কোন উপদেবতাই হও, এখনি আমার কন্যাকে ছাড়িয়া দেও, উহাকে আর কষ্ট দিও না।" তেজস্বী ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় উপদেবতা উত্তর কহিল, "আমি আপনার কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গয়ায় যাইয়া আপনি আমায় পিণ্ড দিয়া উদ্ধার করুন।" এই বলিয়া সে আপনার নামগোত্রাদি তাঁহাকে জানাইল। খুদিরাম গয়াধামে যাইতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন।...

পিণ্ডদান করিলে গয়াধামে তিন দিবস বাস করা বিধি। খুদিরাম সেই বিধিমত গয়াধামেই আছেন; একদিন রজনী প্রভাত সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, ভগবান্ নবযৌবনসম্পন্ন শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি তোমার পুত্র হইয়া জন্মাইব।" খুদিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি দরিদ্র, তোমার সেবা কেমন করিয়া করিব?" ভগবান্ উত্তর করিলেন, "তোমার সেজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই।" খুদিরাম জাগ্রত হইয়া অপার চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। ঠিক সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্নে চন্দ্রাদেবী তাঁহার সুপরিচিতা দুইটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাটীর অনতিদূরে একটী শিবালয়ের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন, শিবালয়ের দিক্ হইতে একটী জ্যোতি বায়ুতে পরিণত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশিল। তিনি অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে সকল কথা জানাইলেন। এই দুই সঙ্গিনীর মধ্যে একজনের নাম ধনি কামারনী, ইনি চন্দ্রাদেবীর কথা বিশ্বাস করিলেন।... গয়াধাম হইতে খুদিরাম বাড়ী আসিলে চন্দ্রাদেবী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে এইকথা জানাইলেন এবং খুদিরামও সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রাদেবীকে নিজ স্বপ্নের কথা জানাইয়া কহিলেন, "দেখ, একথা খুব গোপন রাখিও, কোনমতে প্রকাশ করিও না এবং কোন ঘটনায় ভীত হইও না।"... দিন দিন চন্দ্রাদেবীর গর্ভলক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইতে লাগিলেন।... এই সময়ে তিনি অনেক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন নানা দেব দেবীর দর্শন পান, কখন দেখেন গোপাল যেন নূপুর পায় দিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে।... খুদিরাম তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এইসকল এবং আরও অনেক ঘটনা হবে আমি জানি, ইহাতেই আরও বোধ হয়, আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। তুমি ভয় পাইও না, ভয়ের কোনও কারণ নাই।"...

এইরূপে দশমাস অতীত হইলে ১৮৩৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে চন্দ্রাদেবী স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত। খুদিরাম বলিলেন, "সে কি কথা, তুমি আগে রঘুবীরের ভোগ রাঁধ, তাঁর সেবা হোক তবে, এখন কেমন করে প্রসব হবে?"... শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্ম হইল। খুদিরামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। "আমাদের কি সৌভাগ্য, আজ গদাধর স্বয়ং আমাদের সন্তান রূপে আসিয়াছেন।"—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।...

ষষ্ঠীপূজাতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপন আপন কার্য্যগুলি তৎপর সারিয়া লইয়া আপনাপন সন্তানদের গৃহে ফেলিয়া গদাইকে কোলে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিতেন এবং গদাইও সকলের কোলে যাইতেন। যিনি একবার সেই সুন্দর শিশুটীকে কোলে করেন, তাঁহার আর তাহাকে অপরের কোলে দিতে ইচ্ছা হয় না।

সঙ্কলন: রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ 'গুরুদাস বর্মন' ছদ্মনামে লিখতেন। স্বামীজী মজা করে তাঁকে 'প্রিয় সিঙ্গি', 'সিয় প্রিঙ্গি', কখনো শুধু 'সিঙ্গি' বলে ডাকতেন। ওপরে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ একটু অন্যরকম আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর বর্ণনাই অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ বলে মনে হয়।—সম্পাদক

মধুকৈটভ বধ লীলা

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

বহুকাল আগে দ্বিতীয় মন্বন্তরে পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন রাজা সুরথ। এক এক মনু এক এক মন্বন্তরের অধিপতি বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছেন। এই মনুর সংখ্যা চোদ্দ। পৃথিবীর হিসাবে ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বছর ধরে এক এক মনু রাজত্ব করেন। এক এক ইন্দ্র ও সপ্তর্ষি এই কাল পর্যন্ত আধিপত্য করেন। তারপর মহাপ্রলয় হয়। প্রলয়ান্তে আবার নতুন পৃথিবীতে নতুন মনুর রাজত্ব আসে। এখন বৈবস্বত, সপ্তম মনুর রাজত্ব চলছে।

কয়েক লক্ষ কোটি বছর আগে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের বড় ছেলে চৈত্রের বংশে সুরথ নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি প্রজানুরঞ্জক ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর সময়ে কাশ্মীরের শেষ সীমানায় কোলানগর-বিধ্বংসী ও ম্লেচ্ছ পর্বতবাসী রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই রাজ্য কি বর্তমান আফগানিস্তান অঞ্চল? তখনো সেখানে ম্লেচ্ছ জাতির বাস ছিল? তারা আবার পর্বতবাসী! ভৌগোলিক হিসাবেও এই স্থানটির পরিচয় মিলে যাচ্ছে। তবে 'কোল' শব্দের অর্থ কেউ কেউ 'শূকর' বলেছেন। কোলা-বিধ্বংসীরা শূকর খেতেন। তাহলে তারা মঙ্গোলীয়ও হতে পারে। তবে এই আক্রমণকারীরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। কিন্তু মনে হয় গেরিলা যুদ্ধের মতো কিছু কৌশল তারা জানত, যেজন্য অল্প সৈন্য নিয়েও সুরথ রাজার বিরাট সৈন্যবাহিনীকে তারা হারিয়ে দিয়েছিল।

যুদ্ধে পরাজিত, মানসিক অবসাদগ্রস্ত রাজাকে তাঁর নিজের রাজ্যেও মন্ত্রী ও পারিষদরা প্রতারণা করে রাজ্যচ্যুত করল। দুঃখ-যন্ত্রণায় রাজা নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য শিকারের ছল করে একাকী বনে চলে গেলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে কেবলই তাঁর মনে পড়তে লাগল যা তিনি ছেড়ে এসেছেন সেইসব বিষয়ের কথা—তাঁর পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনসম্পদ, চাকরবাকর, প্রিয় হাতি ইত্যাদি।

সেইসময় সেই বনে তিনি আরেকজনকে দেখতে পেলেন। তাঁকেও খুব বিষণ্ন মনে হলো। প্রশ্ন করে তাঁর পরিচয় জানা গেল। তিনি এক ধনী ব্যবসায়ী, নাম 'সমাধি'। তিনিও তাঁর অসাধু ছেলে ও স্ত্রীদের দুর্ব্যবহারে সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে নিরুপায় অবস্থায় এই বনে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মনে এখনো তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী সেই আত্মীয়দের কথা ঘুরেফিরে আসছে! তাদের ভাল-মন্দের কথা ভেবে এখনো তিনি চিন্তিত হচ্ছেন।

রাজা সেই কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন: যারা আপনার কষ্টের কারণ, তাদের কথা এখনো ভেবে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন? বৈশ্য বললেন: কি করি বলুন তো? আমি যে কিছুতেই তাদের ওপর আমার স্নেহ-মমতাকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না। তাদের দুর্বৃত্তবৃত্তির কথা জেনেও আমার মন থেকে তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা যাচ্ছে না।

রাজা দেখলেন, তাঁর নিজেরও তো একই অবস্থা। পূর্বস্মৃতি তাঁকেও ব্যাকুল করে তুলেছে! তখন দুই সমব্যথী অরণ্যবাসী হাজির হলেন এক ব্রহ্মবিদ তপস্বী মেধস মুনির কাছে। তাঁকে প্রণাম ও নিজেদের পরিচয় দান করে তাঁরা তাঁদের মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থার কথা নিবেদন করলেন। কেন তাঁদের মন স্ববশ নয়? সব ছেড়ে এসেও বারবার কেন মনে সেইসব ফেলে আসা রাজ্য, ঐশ্বর্য, মন্ত্রীপরিষদ, প্রাসাদ, সৈন্য ও আত্মীয়দের কথা মনে আসছে? তাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, সেটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও চঞ্চল মন তাদেরই জন্য দুর্ভাবনাগ্রস্ত হচ্ছে। এর কারণ কি? তাঁরা কেন অজ্ঞানীর মতো ঐসব ছেড়ে

* *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, সুলেখক ও সুবক্তা।*

আসা বিষয়ের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন? এ তো অবিবেকী লোকের পক্ষে শোভা পায়।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের এই কথা শুনে মেধস মুনি বললেন : তোমরা নিজেদের জ্ঞানী মনে করছ, কিন্তু আবার ব্যবহার করছ অজ্ঞানীর মতো। এইরকমই হয়। তুমি তো সামান্য একজন রাজা—রজোগুণে মত্ত, বিষয়ভোগে সদা রত। আর ইনি দিনরাত টাকাপয়সা নিয়ে ব্যবসায় মত্ত ছিলেন। তোমরা নিজেদের জ্ঞানী বলছ কি করে? তোমরা তো কোন্ ছার, কত মুনি-ঋষিও সংসারপাকে, মোহ ও মমতার ঘূর্ণিপাকে বোকার মতো ঘুরে মরছে। জীবজন্তু, মানুষ সকলেই মোহাচ্ছন্ন। প্রত্যুপকারের আশায় তারা সংসারে সকলকে প্রতিপালন করে, সব কাজ করে লোভের বশবর্তী হয়ে। আজ যাদের জন্য সবকিছু করছে, ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু পাবে—এই আশা। মোহই সবকিছুর মূল, কিন্তু এই মোহেরও কারণ আছে। কেন সকলে মোহাচ্ছন্ন হয় এইভাবে?

মোহের কারণ মহামায়ার মায়া। আর এই মায়াই সংসারের ধারণীশক্তি। তাঁরই অচিন্তনীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সব জেনেও জীব সংসারচক্র থেকে নিস্তার পায় না। এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এই মহামায়ার প্রভাবে তাঁর কুহকে আচ্ছন্ন হয়ে সাধারণ জীবের মতো জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হন।

'মহামায়া' শব্দটি শুনে রাজা একটু অবাক হয়ে ঋষিকে জিজ্ঞেস করলেন : এই যে-নামটি আপনি বললেন, যাঁর এত প্রভাব—সেই মহামায়া কোন্ দেবী? তাঁর উৎপত্তি কিভাবে? তাঁর কাজ কি? সেই দেবীর স্বভাব ও চেহারা কেমন আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ঋষি বললেন : সেই মহামায়া নিত্য বর্তমানা। তাঁর আদি বলে কিছু নেই। এই জগৎ তাঁর শরীর অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী তিনি। জগতের যাবতীয় বস্তুই তাঁর মূর্তি। তিনি নিত্যা হলেও দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে বারবার নতুন নতুন নাম ও রূপে আবির্ভূতা হতে হয়। মানবের সাধনাতেও তাঁকে রূপ ধরে নেমে আসতে হয় বারবার। শাস্ত্র বলছেন—"নানারূপধরাদেবী নানাশক্তি-সমন্বিতা আবির্ভবতি কার্য্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী।"

সেই আদ্যাশক্তি পরাশক্তি মহামায়াই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপিণী ব্রহ্মশক্তি। তাঁরই মায়ায় এই জগৎপ্রপঞ্চ 'হয়, রয়, যায়'। ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর পালনীশক্তি, মহেশ্বরের সংহারশক্তি, সূর্যের প্রকাশশক্তি, অনন্ত ও কূর্মদেবের ধরা-ধারণশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি, পবনের সঞ্চালিকাশক্তি—এই সব শক্তিতেই সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া নিজ শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই লীলাচ্ছলে ঐসব শক্তিরূপে বিরাজ করছেন। তিনি সকল দেবদেবী, জীবজন্তু, মানব, দানব—সর্বভূতের অন্তর-বাহির জুড়ে বর্তমান। তাঁর শক্তিতেই সবকিছু শক্তিমান।

ঋষি মেধস তাঁর দুই প্রশ্নকর্তাকে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ জানিয়েছিলেন দেবীর কতকগুলি অপূর্ব লীলা-কাহিনীর মাধ্যমে।

এই দেবীমাহাত্ম্য-কথা অভিনব। এটি কথোপকথনের মাধ্যমেই প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল। সেটি আগে জেনে নিলে আমাদের সমগ্র বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

কোন একসময় মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে মহাভারতের কিছু জটিল বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় মহাজ্ঞানী দ্রোণমুনির পুত্র পিঙ্গাক্ষ, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখের কাছে তাঁকে যেতে বলেন। এই ঋষিপুত্রেরা তখন পিতার অভিশাপে পাখির রূপ ধরে বিন্ধ্যপর্বতের এক গুহায় বাস করছিলেন। তাঁরা পাখিরূপে থাকলেও পূর্বজন্মের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান তাঁদের স্মৃতিতে ছিল। জৈমিনি তাঁদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরা সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক মীমাংসা করেছিলেন। এই বর্ণনায় আদি হচ্ছে মেধস মুনির সুরথ-সমাধির কাছে দেবীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা। পরে ক্রৌষ্টুকী ভাগুরী নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তান মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে সব শোনেন, যা মেধস মুনি বলেছিলেন। এই তত্ত্বই আবার মার্কণ্ডেয় মুনি ও ক্রৌষ্টুকী ভাগুরীর কাছে শোনেন দ্রোণমুনির পক্ষিরূপী চার সন্তান। তাঁরা সেটি জৈমিনির কাছে ব্যাখ্যা করেন। তাই 'চণ্ডী' গ্রন্থকে বলা হয় 'ষট্ সংবাদ কথা'। তিনজোড়া কথোপকথন এটি। এই দেবীতত্ত্ব আবার দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ প্রভৃতিতেও কিছু কিছু ব্যাখ্যাত হয়েছে।

দেবীমাহাত্ম্য সাতশো শ্লোক ও শ্লোকার্থ নিয়ে রচিত। কিন্তু আসলে এতে ৫৭৮টি শ্লোক আছে। সেগুলি ৭০০ মন্ত্রে বিভক্ত। এটির বিভাগ এইরকম—শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৫৩৭, অর্ধশ্লোক ৩৮, শ্লোকের ত্রিপদ ৬৬, উবাচাঙ্কিত ৫৭, পুনরুক্তি ২। মোট ৭০০ শ্লোক। তিনটি অধ্যায় এই গ্রন্থের—প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। তিনটি চরিতে দেবীর তিনটি রূপ প্রকাশিত। যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এই তিনটি লীলায় দেবী জগৎ ও দেবতাদের রক্ষার জন্য ত্রিমূর্তি ধারণ করেন। আদ্যলীলায় তিনি অশরীরী শক্তি। যোগমায়া বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত করে মধু-কৈটভ দৈত্যদের বধ করতে প্ররোচিত করেন। এখানে তিনি বিষ্ণুশক্তিরূপে প্রকাশিত মহাকালী তামসী আদ্যাশক্তি। বিষ্ণু যখন প্রলয়ান্তে দেবীর

আবরণীশক্তিতে নিদ্রাভিভূত হয়ে কারণসলিলে অনন্তশয়নে ছিলেন, তখন জগতে দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। শুধু জল আর জল। সেই অবস্থাতেই শায়িত বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি দিব্য পদ্মের সৃষ্টি হলো সৃষ্টিশক্তি দেবী মহামায়ার কৃপায়। ক্রমে সেই পদ্মের গহ্বর থেকে আবির্ভূত হলেন রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র শিশুর আকারে প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি পদ্মযোনি। কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণুর কর্ণ থেকে দুটি ভীষণ অসুরের সৃষ্টি হলো। এদের নাম মধু আর কৈটভ। এরা অসুর, প্রচণ্ড প্রাণশক্তির অধিকারী। জন্মমাত্রই কারণসলিলে ভাসতে ভাসতে তারা ক্ষুধার্ত হয়ে এদিক-ওদিক খাদ্য খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল কিছু ওপরে পদ্মের মধ্যে এক রক্তবর্ণ ব্যক্তি বিরাজ করছেন। তারা ভাবল, সেটি অত্যন্ত সুখাদ্য। তারা তখন ব্রহ্মাকে ধরতে এগিয়ে গেল জলতল থেকে।

এদিকে ব্রহ্মা দেখলেন সমূহ বিপদ। এই অসুরদের হাত থেকে যিনি বাঁচাতে পারেন, তিনি তো ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তাই প্রাণের তাগিদে বিষ্ণুর নেত্রাধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রারূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়াকে কাতর হয়ে ডাকতে লাগলেন, যাতে তিনি বিষ্ণুকে ঘুম থেকে তুলে এই দুই অসুরের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন।

যে-দেবীর স্তব তিনি করলেন—তিনিই মহামায়ার তামসী শক্তির প্রকাশ মহাকালী। যোগনিদ্রারূপিণী তমোগুণপ্রধানা আদ্যাশক্তিই এখানে মহাকালীরূপে ব্রহ্মার মানসনেত্রের সামনে প্রকাশিতা হন তাঁর স্তবে প্রসন্না হয়ে। যে-শিবা নির্গুণা নিত্যা সর্বব্যাপিনী ও নির্বিকারা, যোগ ছাড়া যাঁকে জানা যায় না—যোগগম্যা, যিনি অখিল বিশ্বের আশ্রয়ভূতা তুরীয়া চৈতন্যময়ী—তাঁরই সগুণাবস্থায় সাত্ত্বিকী শক্তি মহাসরস্বতী। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজ ও চণ্ড-মুণ্ডাদি দৈত্যনাশিনী। এঁরই রাজসী শক্তি মহিষাসুরমর্দিনী মহালক্ষ্মী—যিনি অষ্টাদশভুজা দুর্গা ভগবতী। আর এঁর তামসী শক্তি যোগনিদ্রাময়ী দেবী মহাকালী 'মধু-কৈটভাদি দৈত্যদলনী', বিষ্ণুর যোগনিদ্রাস্বরূপিণী। এঁরা সবাই দেবীবিগ্রহ।

বিপদে পড়ে ব্রহ্মা সেই সর্বজীবের তামসশক্তি, সম্প্রতি যিনি বিষ্ণুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন—সেই পরমাশক্তি মহাদেবীকে জাগ্রতা করার জন্য কাতর হয়ে বন্দনা করতে লাগলেন। তাঁর এই স্তুতিটি অপূর্ব দৈবীশক্তির মহিমাদ্যোতক। তিনি বললেন : হে দেবি। তুমি সর্ববর্ণময়ী আদি শব্দপ্রকাশিকা নাদাত্মিকা। তুমি সর্বমন্ত্রময়ী। যজ্ঞকালে ও শ্রাদ্ধকালে তুমিই পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞভাগ বহন করে নিয়ে যাও। তুমিই আদি মন্ত্র গায়ত্রীস্বরূপিণী পরমা জননী। তুমিই সমস্ত জগৎকে ধরে রেখেছ। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের ভার তোমারই হাতে। তুমিই ঔপনিষদিক মহাবাক্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের লক্ষ্যার্থ। তুমিই জীবের অবিদ্যা-মোহময়ী শক্তি, আবার সর্বজ্ঞত্বশক্তিরূপা। বেদবিদ্যাস্বরূপা, সংসারের স্থূলকারণ আসক্তিও তুমি। তুমি দেবতা ও অসুরদেরও শক্তিস্বরূপা। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা যে-মন্ত্র স্মরণ করে সৃষ্টি করেন, তুমিই সেই মহাস্মৃতিস্বরূপিণী। আবার জীবের তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃতিস্বরূপা অবিদ্যাও তুমি। তুমি সকল জীবজগতের কারণরূপা—অনাদিশক্তি। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ তোমারই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। তুমি ব্রহ্মার যেখানে লয় হয়, সেই কল্পান্তকারী কালরাত্রি। (তন্ত্র-মতে কার্তিক মাসের চতুর্দশী সংযুক্ত অমাবস্যাকে 'কালরাত্রি' বলে।) তুমিই মহাপ্রলয়ের রাত্রি। (তন্ত্র-মতে মহাষ্টমীর রাত্রি 'মহারাত্রি'।) আবার অজ্ঞানরূপ ভীষণ অন্ধকারে জীব যখন মমতাবর্তে ঘুরপাক খায় আর সত্য বিস্মৃত হয়, সেই 'মোহরাত্রি'ও তুমি। (একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই মোহরাত্রির অন্ধকার দূর হয়। এটি তন্ত্র-মতে জন্মাষ্টমীর রাত্রি। যেমন দিবাবসানে রাত্রিতে জীবজগৎ বিশ্রাম নেয়, তেমনি মহামায়াতেই চরাচর সমগ্র জগৎ চিরবিশ্রাম নেয়, লীন হয়। এইজন্য মহামায়া রাত্রিরূপা। চণ্ডীর 'রাত্রিসূক্ত'-এ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।)

তুমি পুণ্যবান মানুষের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীময়ী। আবার যে-কাজ করা অনুচিত, তাতে সদাই সঙ্কুচিতা, নিষিদ্ধ কাজে সর্বদা বিমুখ। বিষয়সুখ ভোগ থেকে তুমি সর্বদাই বিরত। তুমি সর্বভূতে শ্রী, হ্রী, বুদ্ধি ও লজ্জা-রূপিণী। তুমি স্থির, জগৎকল্যাণকারিণী ও বুদ্ধিরূপিণী। তুমি বৃদ্ধি, সন্তোষ, শান্তি ও ক্ষমা-রূপিণী। তুমি দশভুজা, তাই তোমার দশ হাতে খড়্গ, শূল, নরমুণ্ড, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনুর্বাণ, ভুসণ্ডী (তিন হাত লম্বা খুব মোটা কালো সাপের মতো দেখতে) ও পরিঘ (গোলাকৃতি সাড়ে তিনহাত লম্বা, দূর থেকে ছুঁড়ে মারা যায়) অস্ত্র ধারণ করে আছ। তুমি অপরূপা, সৌন্দর্যময়ী। জগতের সমস্ত সুন্দর ব্যক্তি ও বস্তুর চেয়েও তুমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। তুমি 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠা। তুমি 'অপর' অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা। (এর আরো একটি অর্থে বলা হয়েছে, তুমি ঐহিক সুখদাত্রী, তাই সৌম্যা। স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখের কারণ বলে সৌম্যতরা আর নির্বাণদাত্রী বলে অশেষ সৌম্য অতিসুন্দরী। আবার ভক্তের কাছে সৌম্যা—প্রসন্না, আর অসুরদের কাছে অসৌম্যতরা—ভয়ঙ্করী।)

হে সর্বদেবময়ী সর্বস্বরূপিণী। যাকিছু দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন অনিত্য বস্তু—সবই তুমি। সকলের সর্বশক্তির মূলাধার তুমি। সকল দেবতা ও জীবজগতের যতরকম

ক্রিয়া হচ্ছে সবকিছুর মূল তুমি। সকলের সব শক্তির প্রকাশের প্রেরণাও তুমি। অতএব হে জগদম্বে! স্তবের লক্ষ্য, স্তবকারক ও স্তুতি—সবই যখন তুমি, তখন কে কার স্তব করবে? বিশ্বমাতৃমূর্তিতে তুমিই তো জগদ্ব্যাপ্ত, তাই কোন্ ভাষায় ও ভাবে তোমার স্তব করব? সবচেয়ে বড় কথা, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্তা—তিনিই তোমার মায়ায় নিদ্রাবিষ্ট, সুতরাং তোমায় স্তব করে হেন সাধ্য কার? হে সর্বভূতবিলাসিনি! আমি তোমার তত্ত্ব সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

তোমার শক্তিতে ভগবান নারায়ণও যখন অচেতন হয়ে পড়ে আছেন, তখন কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে কে এমন পণ্ডিত আছেন, দুঃসাহসী হয়ে যিনি গুণাতীতা তোমার এই মায়ার লীলা বুঝতে পারবে? তুমি যখন বিষ্ণু, শিব ও আমাকে দেহধারণ করিয়েছ, তখন তোমার স্তব আমি কোন্ ভাষায় করব?

হে দেবি! তুমি এখন আমার প্রার্থনায় প্রসন্না হয়ে এই দুই দারুণ অসুরকে মোহাচ্ছন্ন কর। জগন্নাথ নারায়ণকে শীঘ্র নিদ্রা থেকে জাগরিত কর এবং অসুরদ্বয়কে বধ করার জন্য তাঁকে বুদ্ধি প্রদান কর।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রসন্না হয়ে দেবী যোগনিদ্রারূপিণী বিষ্ণুকে জাগানোর জন্য তাঁর শরীরের যেসব অংশ আচ্ছন্ন করে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন—সেই চোখ, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয় ও বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। মানুষ নিদ্রিত হলে শরীরের এইসব অঙ্গই আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রাবিষ্ট হয়। দেবী নিজেকে পৃথক করে নিলে বিষ্ণুর শরীরজাত ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। ব্রহ্মা এইসময় মহাকালীকে দেখলেন নীলকান্তমণির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা এক দেবীমূর্তিতে। তাঁর দশটি মুখ ও প্রতি মুখে ত্রিনেত্র। তিনি দশ হাত ও দশ চরণ-বিশিষ্টা। সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা। দশ হাতে তিনি খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনুক, পরিঘ, শূল, ভুসণ্ডী, নরমুণ্ড ও শঙ্খ ধারণ করে আছেন। এই দেবী ব্রহ্মার ধ্যানমন্ত্রে আবির্ভূতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর আদিরূপা মহাশক্তি ইনিই।

দেবীর কৃপায় বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন—দুই ভয়ঙ্কর অসুর মধু আর কৈটভ ব্রহ্মাকে হত্যা করতে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন দুষ্টজনের ধ্বংসকারী জনার্দন অনন্তশয্যা ত্যাগ করে দুই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বাহুযুদ্ধ চলল। তখন দেবী মহামায়া আবার তাঁর মায়াশক্তির খেলায় দুই অসুরকে মোহাচ্ছন্ন করলেন। তারা দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে করতে অহঙ্কৃত হয়ে দেবীর মায়ার বশে হঠাৎ বিষ্ণুকেই বলে বসল: তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা খুব খুশি হয়েছি; তুমি আমাদের কাছে কিছু বর চাও।

নারায়ণ অসুরদের এই মতিচ্ছন্ন অবস্থা যে মহামায়ারই মহিমায়, তা বুঝতে পেরে বললেন: বেশ তো, যদি তোমরা আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে বর দিতে চাও, তাহলে তোমরা দুজনেই আমার বধ্য হও। অন্য বর আমি চাই না।

অসুরেরা এই কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে তারপরে একটু বুদ্ধি খেলিয়ে বলল: ঠিক আছে, তোমার হাতে মৃত্যু যদি হয় সে তো ভালই, তবে যেখানে জল নেই—এমন কোন জায়গায় আমাদের মারতে হবে।

তারা ভাবল, সমগ্র জগৎ তো কারণসলিলে পূর্ণ। তাই জলশূন্য জায়গা বিষ্ণু কোথায় পাবে? তাই তাদেরও মরা সম্ভব হবে না। এখানে আরেকটি পুরাণে বলা হচ্ছে, তারা আরো দুটি শর্ত দিয়েছিল—যখন দিনও নয়, রাত্রিও নয় এবং যে-অস্ত্র এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি—সেই অস্ত্রে ঐসময় তাদের মারতে হবে। নির্বোধ অসুরদের সামান্য বুদ্ধি, তাই তারা মহামায়ার মায়াতে বিষ্ণুর লীলা কি হবে তা ধরতে পারেনি।

নারায়ণ তখন তাদের দুজনকে দুহাতে ধরে তাঁর দুই হাঁটুর ওপর রাখলেন—যা জল-স্থল কোনটাই নয়। আর সময়টা হলো দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ—সন্ধ্যাবেলা। অনন্তশয্যা থেকে উত্থিত নারায়ণ এই প্রথম আয়ুধ ধরলেন শঙ্খ, চক্র ও গদা। সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তিনি অসুরদের মুণ্ড কেটে শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দুই বিশালদেহী অসুরের দেহ ঘুরপাক খেতে খেতে নিচে পড়তে লাগল। তাদের বিরাট দেহ থেকে প্রচুর মেদ ঝরে পড়তে লাগল জলে। সেই অসুরদের মেদ একত্রিত হয়ে কারণসলিলে সৃষ্টি হলো মেদিনী অর্থাৎ পৃথিবীর। বলা হয়, অসুরদের মেদ থেকে মেদিনীর সৃষ্টি বলে কেউ মাটি খায় না।

এইভাবে মধু-কৈটভবধ ও দেবী মহামায়ার আদিলীলা মহাকালীর কথা শোনালেন মেধস মুনি—রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তরে। তিনি আরো বললেন: তোমরা চাইলে এই মহামায়ার আরো কিছু অবতারলীলার কথা পরে শোনাব।

"এষা সা বৈষ্ণবীমায়া মহাকালী দুরত্যয়া।/আরাধিতা বশী কুর্যাৎ পূজাকর্তৃশ্চরাচরম্॥"—ইনিই দুরতিক্রমনীয়া বৈষ্ণবী-মায়া মহাকালী। এঁর পূজা করলে চরাচর জগৎ পূজকের বশীভূত হয়।■

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমা সারদাদেবী

প্রণবেশ চক্রবর্তী*

॥ ১ ॥

১৯১৬ সাল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

সেবার সপ্তমীপূজার সকাল থেকেই শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। বেলুড়ের আকাশ জুড়ে কালো মেঘের রাজত্ব। প্রভাতের আলো মিলিয়ে গিয়ে সকালেই যেন নেমে এল অন্ধকার। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ, তবুও বৃষ্টির শেষ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কি যে হবে, কিছুই বুঝতে পারছেন না। তবে এটা সকলেই বুঝতে পারছেন যে, এ-বৃষ্টি সহজে থামবার নয়।

মহাপূজা হচ্ছে বেলুড় মঠে। জগৎ আলো করা মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি সুদৃশ্য পূজামণ্ডপে স্থাপন করে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলগাছতলায় বোধন সম্পন্ন হয়েছে। এপর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, কিন্তু সপ্তমীর সকাল থেকেই দেখা দিল বিপত্তি।

মঠে হচ্ছে মৃন্ময়ী জগন্মাতার পূজা, আর পাশেই নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা', ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের 'সাক্ষাৎ জগদম্বা' শ্রীমা সারদাদেবী। সঙ্ঘজননী মা উপস্থিত আছেন, তাই সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা মহানন্দে দেবীপূজায় আত্মনিয়োগ করলেন।

সপ্তমীপূজার দিনই মা এলেন মঠে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীভক্তরাও আছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই পূজামণ্ডপে এসে মা পূজা দেখলেন, দেখলেন তাঁর সন্তানরা কী পরম নিষ্ঠায় মাতৃপূজার আয়োজন করেছেন!

১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন, তখনো তিনি পূজার সময় মঠে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নামেই পূজার সঙ্কল্প হয়েছিল। কারণ, বিরজাহোম করে যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁদের নামে পূজার সঙ্কল্প হতে পারে না। সেই ১৯০১ সালে পূজা হওয়ার পর ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তারপর কয়েক বছর বেলুড় মঠে পূজা বন্ধ ছিল। আবার ১৯১২ সাল থেকে পূজা শুরু হয়। প্রতিবারই পূজার সঙ্কল্প হয় মায়ের নামে।

যাই হোক, আলোচ্য ১৯১৬ সালের দুর্গাপূজায় পূজামণ্ডপে কিছুক্ষণ অবস্থান করে শ্রীশ্রীমা আবার ফিরে গেলেন নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই। বাগানবাড়িতে ফিরেই তিনি খবর পেলেন, তাঁর ভাইঝি রাধু খুব অসুস্থ। তাই তাঁকে এখনি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। মা পড়লেন দোটানায়। একদিকে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা, তাঁর সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সন্তানদের অনন্ত প্রত্যাশা, অন্যদিকে তাঁর অসুস্থা ভাইঝি রাধু।

এই প্রসঙ্গে রাধুর কথা একটু স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভাই অভয়চরণ—যিনি সেযুগে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন। শ্রীশ্রীমা তাঁর এই ছোট ভাইকে খুব ভালবাসতেন। অকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে এই ভাই প্রাণ হারান। মৃত্যুকালে তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলে গিয়েছিলেন ঃ "এরা সব থাকল দিদি, তুমি এদের দেখো।" অভয়চরণের আকস্মিক মৃত্যুর ছয় মাস পরে তাঁর একটি কন্যাসন্তান হয়—তারই নাম রাধারানি বা রাধু। এই রাধুর মা নানারকম শোক-দুঃখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাধুর যখন বারো বছর বয়স, তখন শ্রীশ্রীমা নিজে উদ্যোগী হয়ে বাঁকুড়া জেলার তাজপুর গ্রামের জমিদার বংশীয় মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মন্মথনাথের সঙ্গে রাধুর বিয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মন্মথনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় রাধু পিতৃগৃহ জয়রামবাটিতে ফিরে আসেন। রাধুরও মানসিক ভারসাম্য বজায় ছিল না বিয়ের পর থেকে। তাঁর একটি পুত্রও হয়েছিল। ১৯১৬ সালে রাধু শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কলকাতাতেই থাকতেন। সেই রাধু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, খবর পেয়ে মা কলকাতায় ফিরে যাবেন ঠিক করলেন।

---

* *প্রখ্যাত সাংবাদিক, সুলেখক।*

এই সংবাদ মঠে নিয়ে এসেছিলেন স্বামী ধীরানন্দ। তিনি স্বামী প্রেমানন্দকে সংবাদটা দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে পূজার কয়দিন বেলুড় মঠে থাকার অনুরোধ করতে। শ্রীশ্রীমা যেন পূজার মধ্যে কলকাতায় ফিরে না যান। মা চলে গেলে সপ্তমীতেই পূজার যাবতীয় আনন্দ ম্লান হয়ে যাবে।

স্বামী ধীরানন্দের কথা শুনে প্রেমানন্দজী হাতজোড় করে বললেন ঃ "মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে? তাঁর যা ইচ্ছা, তা-ই হবে—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে?"

অবশ্য শেষপর্যন্ত মাকে আর তখনি কলকাতায় ফিরে যেতে হয়নি। কারণ, একটু পরেই কলকাতা থেকে খবর এল—রাধু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে; চিন্তার কোন কারণ নেই। মা এই খবর পেয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদল করলেন। হয়তো এর পিছনেও মহামায়ার ভিন্ন কোন ইচ্ছা ছিল। ছিল অন্য কোন ইঙ্গিত।

মা ফিরে যাচ্ছেন না—এই খবরে আবার মঠের সকলে পরম আনন্দে পূজার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃষ্টি যে থামে না! দেখতে দেখতে দুপুরের প্রসাদ বিতরণের সময় হয়ে গেল। বৃষ্টি না থামলে এত লোক প্রসাদ পাবেন কোথায়, বসবেন কোথায়? সামান্য সামিয়ানার সাধ্য কি বৃষ্টিকে আড়াল করে! অথচ প্রসাদ দেওয়ার সময় হয়ে গেল—সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। বেলুড় মঠের পাশেই বাগানবাড়িতে বসে জগজ্জননী সারদাদেবী যখন শুনলেন, অত লোক কোথায় বসে প্রসাদ পাবেন, তখন তিনিও ভক্তদের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

ওদিকে ভক্তরা যখন প্রসাদ পাওয়ার জন্য সামিয়ানার নিচে বসলেন, তখন বাগানবাড়িতে শ্রীশ্রীমা বসে গেলেন দুর্গানাম জপ করতে। তিনি তখন তপস্বিনী জননী—সন্তানের কল্যাণে তিনি ধ্যানস্থা। মাঝে মাঝে তিনি বলছেন ঃ "তাই তো এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব ভেসে যাবে!" তারপরই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ "মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর।"

সাক্ষাৎ জগদম্বার এই আবেদন কি বৃথা যেতে পারে? সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, সকাল থেকে যেখানে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেখানে ঠিক প্রসাদ পাওয়ার সময় কে যেন এক অদৃশ্য হস্তে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। প্রসাদ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে মিটে যাওয়ার পর আবার বৃষ্টি দেখা দিল।

শুধু একদিন নয়, অষ্টমী ও নবমী—এই দুদিনও জগৎকল্যাণে আবির্ভূতা জননী সারদাদেবীর দিব্যপ্রভাবে ঠিক প্রসাদ বিতরণের সময় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেত। মাতৃমহিমার এই অপূর্ব প্রকাশে মঠের সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত।

অষ্টমীর দিন সকালবেলা মা এলেন মঠে পূজার আয়োজন দেখতে। পূজামণ্ডপের পাশেই মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা ভোগের জন্য কুটনো কুটছিলেন। শ্রীশ্রীমা এই দৃশ্য দেখে প্রসন্নচিত্তে বললেন ঃ "ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে!" সেখানে কাজ করছিলেন স্বামী জগদানন্দ। তিনি হেসে বললেন ঃ "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই হলো মূল উদ্দেশ্য—তা সাধন-ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটেই হোক।"

মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার পর স্বামী সারদানন্দ একজন ব্রহ্মচারীর হাতে একটা গিনি তুলে দিয়ে বললেন ঃ "এই গিনিটা মা-কে দিয়ে প্রণাম করে আয়।" ব্রহ্মচারী বুঝলেন উলটো, মনে করলেন—পূজামণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমার সামনে প্রণামী দিতে হবে। তবু সংশয়মুক্ত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সারদানন্দজী বললেন ঃ "ঐ বাগানে মা আছেন; তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হলো।"

এই পূজার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়ে স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী তুরীয়ানন্দকে একটি পত্র লেখেন ৯ অক্টোবর ১৯১৬ তারিখে। পত্রটি মূলত দুর্গাপূজার পর গুরুভাইকে বিজয়ার নমস্কার আলিঙ্গন জানাবার জন্যই।

ঐ পত্রে মহাপুরুষ মহারাজ লিখেছেন ঃ "আমি মঠে (বেলুড় মঠে) প্রতিমায় মহামায়ার আরাধনা কখনো দেখি নাই... এবার আবার শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল—অনুমানের আর প্রয়োজন ছিল না। প্রতিমাখানি অতি সুশ্রী ও সুগঠিত হইয়াছিল। পূজারী ও তন্ত্রধারক দুইটি ব্রহ্মচারী। যুবক তন্ত্রধারকটি সুপণ্ডিত এবং গ্র্যাজুয়েট। পূর্বে কোন সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিল। এখন শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়া মঠে আছে। পুরোহিত যুবকটি তাহাদের নিজের বাটিতে কয়বার দুর্গাপূজা করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অনেক বিষয় জানা আছে। অতিসুন্দর পূজা করিয়াছে।... তাহাদের চেষ্টাতেই পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও (পূজার) তিনদিন অনবরত বৃষ্টি-ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমনকি, ভক্তরা যেসময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে, ঠিক সেইসময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগেন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনি ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল—অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন—'তাই তো, এত লোক কি করিয়া এই বৃষ্টিতে বসিয়া খাইবে? পাতা-টাতা সব যে ভাসিয়া যাইবে। মা রক্ষা কর।' মা-ও সত্যসত্যই রক্ষা করতেন; তিনদিনই ওইরকম। তিনদিনে প্রায় ৪ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছে (দুবেলা ধরিয়া)।

"বিজয়ার দিন মা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা আসিয়া বরণাদি সব করিলেন। তারপর ছেলেরাই সব প্রতিমা লইয়া দুখানা

নৌকা জুড়িয়া তাহার ওপর বসাইয়া একবার উত্তরদিকে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত ও তারপর ফিরিয়া দক্ষিণে লালাবাবুদের সায়ের পর্যন্ত, তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া মঠের ঘাটে প্রতিমা জলমগ্ন করিল।" (মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, ৮০ নং পত্র, ১৩৮৭, পৃঃ ১২৩-১২৪)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেবার সেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে। স্বামীজী সেবার দুর্গাপূজায় পশুবলি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আপত্তি করায় পশুবলি পরিত্যক্ত হয়। সেই থেকে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় আর কখনো পশুবলি দেওয়া হয়নি।

॥ ২ ॥

জননী সারদাদেবী নরলীলায় অবতীর্ণা সাক্ষাৎ মা জগদম্বা—এই রহস্যটা শুধু যে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ বা গিরিশচন্দ্র ঘোষই বুঝেছিলেন তা নয়, সমকালের অনেক সাধারণ মানুষও মায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার স্বরূপ।

জয়রামবাটির কাছেই কোয়ালপাড়া গ্রাম। রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর মা কলকাতায় আসার সময় জয়রামবাটি থেকে গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুর স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠতেন। পথে কোয়ালপাড়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। সেই সুযোগে সেখানকার মানুষজন তাঁকে দর্শন করে তৃপ্তিলাভ করতেন। এই কোয়ালপাড়া গ্রামেরই অতিসাধারণ মানুষ ছিলেন নফরচন্দ্র কোলে। তিনিও মাকে সাক্ষাৎ মা দুর্গা বলেই মনে করতেন।

ঘটনাটা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের। তখন অগ্রহায়ণ মাস। মা তখন বাগবাজারে উদ্বোধনে (মায়ের বাড়ি) অবস্থান করছেন। সঙ্গে সেবক আছেন কোয়ালপাড়ার জনৈক ব্রহ্মচারী। আর আছেন স্বামী সারদানন্দ—মায়ের প্রধান সেবক।

হঠাৎ সেদিন রাত দশটার সময় সারদানন্দজী বাড়ির দোতলায় বিশ্রামরত সেই ব্রহ্মচারীকে একতলায় ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটা কি? হন্তদন্ত হয়ে সেই ব্রহ্মচারী নিচে নেমে দেখেন, কোয়ালপাড়া গ্রামের বৃদ্ধ নফরচন্দ্র কোলে এসেছেন—তিনি রাত্রেই মাকে দর্শন করতে চান।

ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সারদানন্দজী নির্দেশ দিলেন মাকে খবর দিতে। নফরবাবুকে দোতলার ঠিক মাঝখানের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। দুঃখীজনের মা এসে সেখানেই নফরবাবুকে দর্শন দিলেন। অত রাত্রে।

মাকে কাছে পেয়েই নফরবাবু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চোখের জলে মায়ের চরণ ধুইয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন : "মাগো, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আমার কয়েকটি নাতনি ও একটি নাতি মারা গেছে। এখন ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকটি নাতনি ও নাতি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। কোন চিকিৎসায় কোন কাজ হচ্ছে না। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি—আপনাকে আশীর্বাদ করতে হবে আমার বংশ যাতে রক্ষা পায়।"

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, সেসময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের ভাল কোন চিকিৎসা ছিল না—বিশেষত বাঁকুড়া জেলার দুর্গম গ্রামে।

নফরবাবুর সব কথা শুনে মা পরম স্নেহে বললেন : "সে-কি! আপনি এরকম আশঙ্কা করছেন কেন? আপনি লক্ষ্মীমন্ত ভাগ্যবান লোক।"

মায়ের এই আশ্বাসবাণীতে নফরবাবু শান্ত হলেন না, বললেন : "না, মা, আমি কিছু শুনতে চাই না, আমার এই শেষ বয়সে একমাত্র নাতির শোক যেন না পাই।" তিনি এসব কথা বলছেন, আর মায়ের চরণযুগল ধরে অবিরাম কেঁদে চলেছেন।

ভক্তের অশ্রুজলে ভগবতীর মন সিক্ত হলো। মা বললেন : "আপনি উতলা হবেন না, উঠুন। আচ্ছা আমি ঠাকুরকে জানাচ্ছি।"

নফরবাবু তাতেও আশ্বস্ত হলেন না, তিনি তখন নাছোড়বান্দা, তিনি চান জননীর আশীর্বাদ—অন্য কিছু নয়। শেষপর্যন্ত মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত হলো অভয়বাণী। মা অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে বললেন : "না, আপনার কোন ভয় নেই।" ব্যাস, এই কথাটুকুই তো শুনতে চেয়েছিলেন বৃদ্ধ। এবার তিনি মাকে প্রণাম করে চোখের জল মুছতে মুছতে দোতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। মা নফরবাবুর জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন।

জগজ্জননী সারদাদেবীর আশীর্বাদে বৃদ্ধের নাতিটি রোগমুক্ত হয়েছিল, পূর্ণ হয়েছিল নফরবাবুর প্রার্থনা।

॥ ৩ ॥

দিনটি ছিল ১৯১২ সালের ১৬ অক্টোবর। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন। দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠী—বোধনের দিন। সেদিন বিকালে জননী সারদাদেবী বেলুড় মঠে পদার্পণ করবেন। মঠের সকলেই গভীর আগ্রহ নিয়ে মায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন : মা কখন আসবেন?

এদিকে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, অথচ মায়ের শুভাগমন হলো না। এতে স্বামী প্রেমানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠলেন—উত্তেজনা দমন করার জন্য তিনি একবার এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছেন, আবার সেদিক থেকে এদিকে ছুটে আসছেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, মায়ের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ তখনো বসানো হয়নি। দেখেই তিনি বলে উঠলেন : "এসব এখনো হয়নি, মা আসবেন কি!"

ওদিকে মঠের বেলতলায় দেবীর বোধন শুরু হয়ে গেল। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা পথের দিকে তাকিয়ে আছেন—মা কখন আসবেন? দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের

গাড়ি এসে মঠের দরজায় পৌঁছাল। অমনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা—মা এসে গেছেন। সবাই ছুটলেন গাড়ির দিকে। ইতোমধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি গাড়ি থেকে ঘোড়া-দুটিকে খুলে দিয়ে সাধু ও ভক্তদের নিয়ে গাড়িটা টানতে টানতে মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। আনন্দে বিহ্বল প্রেমানন্দজী সেই গাড়ি টানতে টানতে ভাবের আবেশে টলতে লাগলেন। তাঁর চোখ-মুখে আনন্দের শিহরণ।

গাড়ি মঠের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। প্রথমে মায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-মা গাড়ি থেকে নামলেন—তারপর তিনি হাত ধরে অতি সন্তর্পণে মাকে নামালেন। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চোখ বুলিয়ে মা রীতিমত প্রসন্ন হয়ে বললেন ঃ "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুণ এলুম।"

সেবার মা ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত বেলুড়েই অবস্থান করেছিলেন। মঠের উত্তরদিকে বাগানবাড়ি 'লেগেট হাউস'-এ তাঁদের রাখা হয়েছিল। মা দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ঐবাড়িতে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি ও ভানুপিসিও ছিলেন।

মহাষ্টমীর দিন কয়েকশো ভক্ত সাক্ষাৎ জগদম্বাকে প্রণাম করে ধন্য হলেন। মা একটি তক্তপোশের ওপর পশ্চিমদিকে মুখ করে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন, পেলেন জগজ্জননীর আশীর্বাদ। সেদিন মা তিন-চার জনকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন।

ঐদিন রাত্রে মঠের পূজাপ্রাঙ্গণে 'জনা' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। বিজয়ার দিন রাত্রে অভিনীত হয়েছিল 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' নাটকটি। শ্রীশ্রীমা দুইদিনই রাত্রে মঠের দোতলায় বসে এই যাত্রাভিনয় দেখেছিলেন।

মহানবমীর দিন দুপুরের পর গোলাপ-মা এসে স্বামী সারদানন্দজীকে বললেন ঃ "শরৎ, মা-ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশি হয়ে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" এই কথাটি শোনার জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। মায়ের প্রসন্নতা অর্জিত না হলে, মায়ের আশীর্বাদ না পেলে এত সব পূজার সার্থকতা কি! তাই গোলাপ-মার কথা শুনে কি বলবেন, সারদানন্দজী প্রথমে তা ভেবেই পেলেন না, শুধু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ঃ "বটে!" একথা বলেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন তাঁরই পাশে বসা বাবুরাম মহারাজের দিকে, বললেন ঃ "বাবুরামদা শুনলে?" বাবুরাম মহারাজ শুনেছিলেন ঠিকই, এখন সারদানন্দজীর প্রশ্নের উত্তরে গভীর আনন্দে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

দেখতে দেখতে একসময় নবমী-নিশি হলো অতিক্রান্ত। এল বিজয়া দশমী। মাকে যেতে দিতে মন চায় না, তবু যেতে দিতে হয়। মঠের প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্যসলিলে মা দুর্গার বিসর্জন হবে। তার জন্য একটা বড় মাপের নৌকাও ঠিক করা হলো। একসময় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা মিলে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে এনে নৌকায় তুললেন। সেই নৌকায় ছিলেন ডাক্তার কাঞ্জিলালও। তিনি দেবীর সামনে নানারকম মুখভঙ্গি এবং রঙ্গব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন। অনেকেই ডাক্তার কাঞ্জিলালের ঐ হাস্যরস পরিবেশনে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। কেউ কেউ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন মার্জিত-রুচি ব্রহ্মচারী এসব দেখে-শুনে খুবই চটে যাচ্ছিলেন।

জননী সারদাদেবী স্বয়ং নিজের ঘরে বসে এইসব দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সাধু ঐ 'মার্জিত-রুচি' ব্রহ্মচারীর বিরূপ মানসিকতার দিকে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মা কিন্তু ডাক্তার কাঞ্জিলালের রঙ্গব্যঙ্গকেই সমর্থন করলেন, বললেন ঃ "না, না, এসব ঠিক। গান-বাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ—এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।"

এইরূপ এক পূজায় শ্রীরামকৃষ্ণের মানস সন্তান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি ব্রহ্মানন্দজী জননী সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ মা দুর্গাজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। তিনি একশো আটটি পদ্মফুল দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপূজার মাধ্যমে করেছিলেন আত্মনিবেদন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "সাক্ষাৎ জগদম্বার উপস্থিতি ব্যতীত তাঁহারা (সাধু-ব্রহ্মচারী) দেবীপূজাকে পূর্ণ মনে করিতে পারিতেন না। পূজায় সঙ্কল্প হইত তাঁহারই নামে, অদ্যাপি তাহাই হয়। সেজন্য পূজোপলক্ষ্যে শ্রীমায়ের বেলুড়ে আগমন ও অবস্থিতির সহিত বিজড়িত বহু পুণ্যময় ঘটনার স্মৃতি আজও সাধুরা সাদরে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন—ঐগুলি তাঁহাদের নিকট বড়ই অনুপ্রেরণাপ্রদ! পূজার দিন শ্রীশ্রীমা মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে দুইহস্তে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতেন; ইহা না করিতে পারিলে যেন তাঁহাদের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে প্রসন্না দেখিলে সকলের মনে হইত দেবী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন।" ■

সহায়ক গ্রন্থ

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
৩ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী
৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা
৫ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী

এই রচনাটি 'স্বামী গম্ভীরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব-স্তুতিগীতিঃ

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে সংস্কৃতে 'পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব-স্তুতিগীতিঃ' রচনাটি ১০৭ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল রামচন্দ্র দত্তের পরিচালনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার ১১০-১১৪ পৃষ্ঠায়।

সেইসময়, ঠাকুর পূর্ণাবতার-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে রামচন্দ্র দত্ত প্রচার শুরু করলে তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হয়। ঠাকুর দেহে থাকতেও তাঁকে অবতার বলে প্রচার করায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এইসকল ঘটনার সাক্ষী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেনঃ "এই ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর রামদাদা নির্ভীক ও অটল ছিলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন; এইজন্য অকুতোভয়ে নিজের মত প্রচার করতে লাগলেন। এইসময় তাঁকে বহু লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে হয়েছিল, নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

"মোট কথা, লোকে তখন রামদাদার মত পছন্দ করত না, তাঁকে বিদ্বেষ করত। মাত্র রামদাদাই নিজের মত নিজে পোষণ করতেন। এরূপ অতি সঙ্কটময় অবস্থাতে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামদাদা কখনো দু-মনা হননি। তিনি পরমহংস মশাইকে প্রত্যক্ষ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে ধ্রুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁকে অবতার বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পৈতেন।

"রামদাদার ভাব হলো, সচ্চিদানন্দ এবার পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ভাব ও কথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করাই হলো মহাতপস্যা। অন্যরকম তপস্যা করার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ তপস্যালব্ধ বস্তুই তো তিনি; আর অকারণে তপস্যা করার প্রয়োজন নেই।" (গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৬২)

অবতারবাদের এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এই স্তুতিগীতিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামের এই অসাধারণ রচনাটি শতাধিক বর্ষ ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। এর মধ্যে লেখকের পরিতৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। রচনাটি 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রবর্তিত হওয়ার ছয় মাস আগেই প্রকাশিত হয়।

হরিপদ ভৌমিক (সংগ্রাহক)

আজানুলম্বিতভুজং ধৃতযোগমুদ্রং,
আমীলিতেক্ষণমভীক্ষিতুমাত্মরূপম্।
মূর্চ্ছদ্‌দ্বিজার্চ্চিরধরং প্রভুরামকৃষ্ণং,
আলোলমাংসলপৃথূরসমেকমীড়ে॥১॥

জগৎপবিত্রায় পবিত্রকীর্ত্তয়ে,
অপারকারুণ্যরসৈকমূর্ত্তয়ে।
পরোপকারায় শরীরপূর্ত্তয়ে,
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমো নমঃ॥২॥

নাধীতবিদ্যায় বিশুদ্ধবুদ্ধয়ে,
গৃহীতদারায় মহোর্দ্ধরেতসে।
বিমুক্তসঙ্গায় জনালয়ৌকসে,
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমো নমঃ॥৩॥

প্রচণ্ড-পাষণ্ড-বিনম্রকারিণে,
তত্ত্বোপদেশেন মনঃপ্রমাথিনে।
মোহান্ধচিত্তে মতি-দীপ-দায়িনে,
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমো নমঃ॥৪॥

সংসার-দাবানল-দাহ-বারিণে,
স্বভক্তদেহার্জ্জিতপাপভারিণে।
গরিষ্ঠপাপিষ্ঠকুলৈকতারিণে,
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমো নমঃ॥৫॥

বিস্পষ্ট-দৃষ্টান্ত-সমূহ-দর্শিনে,
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-পদার্থ-বাদিনে।
গভীরতত্ত্বার্থসুখৈববোধিনে,
শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমো নমঃ॥৬॥

স্বভক্তদৈন্যারিষু ধূমকেতবে,
দুঃখাব্ধিপারায় কঠোর-সেতবে।
অভীপ্সিতার্থার্পণকামধেনবে,
তস্মৈ নমঃ পাপবনীকৃশানবে॥৭॥

সমাধিমগ্নায় শিবং দিদৃক্ষবে,
সদ্যোগযুক্তায় ভবান্মুমুক্ষবে।
তপঃপ্রবর্ত্তায় রিপুং দিধক্ষবে,
নমোহস্তু তস্মৈ পরমায় ভিক্ষবে॥৮॥

* ঢাকার রামলোচন সিদ্ধান্তপঞ্চাননের পৌত্র, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ'-এর প্রথম শিক্ষার্থী, কাশীর মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির শিষ্য।

সংসাধিতানেককসিদ্ধিরীতয়ে,
প্রসাদিতানেককদেবমূর্ত্তয়ে।
প্রসারিত-সার্জ্জিত-যোগশক্তয়ে,
নমোঽস্তু তস্মৈ ভবশোকমুক্তয়ে॥৯॥

চিত্তে মরৌ সূক্তি-সুধা-প্রবর্ষিণে,
অসন্নৃণাং সাধুমনঃপ্রহর্ষিণে।
আকাস্মিকব্রাহ্মমতপ্রমর্দ্দিনে,
নমোঽস্তু তস্মৈ মুনয়েঽদ্যদুর্দ্দিনে॥১০॥

পূর্ণীকৃতা যেন সতাং মনোরথা;
চূর্ণীকৃতা যেন বিলাসিকাপথাঃ।
তৃণীকৃতা যেন চ ভোগবাসনা,
ঋণীকৃতা ভক্তগণা নমামি তং॥১১॥

কেচিত্ত্ববতারমবতীর্ণমিহামনন্তি,
অন্যে পুনর্ন তদিতি প্রসভং দ্বিষন্তি।
নদ্বেষ্মি ন প্রতিবদামি চ শাস্ত্রদাসঃ,
পূজ্যোগুরুস্ত্বমসি দেব। ততো নমামি॥১২॥

শ্রীশাবতারো ভব মা ভবেতি বা,
ত্বমেব তদ্বেৎসি ন মাদৃশোঽজ্ঞকঃ।
ক্ষমস্ব দোষং দয়য়া দয়ার্ণবঃ,
অজ্ঞানতৈবাত্র দয়াবিকর্ষিণী॥১৩॥

আদ্যন্তমেতাং প্রণিধায় যঃ পঠেৎ,
প্রাতঃ সমুত্থায় মহাত্মনঃ স্তুতিম্।
পাপপ্রবৃত্তি র্ন চ তং প্রসর্পতি,
যথা পিশাচী পরিধূপিতং গৃহং॥১৪॥

ইতি শ্রীজয়চন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণকৃতা
পরমহংস-শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতিগীতিঃ সমাপ্তা।

অনুবাদ

যিনি আজানুলম্বিত ভুজে যোগমুদ্রাধারণে আসীন, যিনি আত্মজ্যোতি অবলোকন করিবার নিমিত্ত নেত্রদ্বয় ঈশৎ মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট, যাঁহার ঈষদ্বিকসিত দশনযুগের জ্যোতিতে অধোরষ্ঠ প্রতিভাত, যাঁহার স্থূল বক্ষস্থল অল্পাল্প লোলিত মাংসল, আমি সেই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্তুতি বা ধ্যান করিতেছি॥১॥

যিনি বিমল যশ বিস্তার করিয়া এই জগৎ পবিত্র করিয়াছেন, যাঁহার সেই প্রশান্ত কমনীয় মূর্তিখানি কেবল অসীম করুণারসেই পরিপূর্ণ ছিল, যিনি কেবল পরোপকারার্থই সেই ভৌতিক দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি কেবল পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥২॥

যিনি কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করিয়াও শাস্ত্রীয় মর্মার্থে বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, যিনি দারগ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মচর্যব্রত হইতে স্খলিত হন নাই, যিনি লোকালয়ে থাকিয়াও বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥৩॥

যিনি এক একটা অসুরবিশেষ দুর্দান্ত পাষণ্ডকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বোপদেশ দান করিয়া পাষণ্ডদিগের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি পাষণ্ডগণের অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়াগারে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দিয়াছেন, আমি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বারবার প্রণাম করি॥৪॥

যিনি সংসাররূপ দাবানলের তীব্র দাহ নিবারণে প্রভুত বারিস্বরূপ ছিলেন, যিনি আপন ভক্তগণের পাপের ভার আপনিই স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বারবার নমস্কার করি॥৫॥

যিনি অতি সরল সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তসকল দেখাইয়া দুরূহ বেদান্ত বিষয় ব্যাখ্যা করিতেন এবং অতি গভীর তত্ত্বসমূহও অতি সহজে বুঝাইয়া দিতেন, আমি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥৬॥

যিনি আপন ভক্তকুলের দরিদ্রতারূপ অরিগণের বিনাশসূচক উদিত ধূমকেতু, ভক্তগণের দুঃখসাগরপারের নিমিত্ত সুদৃঢ় সেতু, যিনি অভিলষিত বিষয় প্রদানে কামধেনু এবং যিনি পাপকাননদাহে প্রজ্বলিত হুতাশন ছিলেন, আমি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি॥৭॥

যিনি ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিবার ইচ্ছায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন, যিনি কামক্রোধাদি ষড়রিপুকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন, আমি সেই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি॥৮॥

যিনি নানাবিধ শাস্ত্রোক্ত রীতিতে সাধনা করিয়া অনেক দেবদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি যোগশক্তি স্বয়ং অর্জন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিয়াছিলেন, ভবদুঃখ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আমি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি॥৯॥

যিনি অসজ্জনের চিত্তমরুভূমিতে হিতোপদেশ-সুধা বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সাধুগণের মন আনন্দিত করিতেন, যিনি আধুনিক ব্রাহ্মমত খণ্ডিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে সেই মহর্ষি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি॥১০॥

যিনি সাধুগণের অভীষ্টপূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খল বাবুগণের অসৎ পথ ধ্বংস, বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ এবং ভক্তগণকে চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি নমস্কার করি॥১১॥

হে দেব। কেহ কেহ তোমাকে ঈশ্বরাবতার মনে করে, অপরাপরে তাহা নয় বলিয়া গায়ের জোরে বিদ্বেষ করে, আমি কিন্তু শাস্ত্রের অনুগত, সেইজন্য তাহাতে প্রতিবাদও করি না এবং তোমায় বিদ্বেষও করি না, কিন্তু তুমি পরমপূজ্য ভক্তিভাজন গুরু—এবুদ্ধিতে তোমাকে নমস্কার করি॥১২॥

হে দেব। তুমি ঈশ্বরাবতার কিনা তাহা তুমিই জান, আমার মতো অজ্ঞান তাহা কিরূপে জানিবে? হে দয়ার সাগর। উক্ত স্তুতিবিষয়ে দোষ নিজ দয়াগুণে মার্জনা করিবে। 'আমি অজ্ঞান' বলিয়াই আমার উপর (আপনার) দয়া হইবে॥১৩॥

যেমন ধূপগন্ধে আমোদিত গৃহে পিশাচী প্রবিষ্ট হইতে পারে না, সেপ্রকার প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই মহাত্মার এই স্তুতি যে-ব্যক্তি প্রণিধানপূর্বক আদ্যন্ত পাঠ করিবে, তাহাকে কোনপ্রকার পাপপ্রবৃত্তি স্পর্শ করিতে পারিবে না॥১৪॥

মহাপুরুষ মহারাজঃ আরো কিছু স্মৃতি

স্বামী ভূতেশানন্দ*

তখন উদ্বোধনে পূজনীয় শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) কাছে যাতায়াত করি। যাতায়াত মানে মহারাজের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতুম। বড়রা অনেকে প্রশ্ন করতেন, মহারাজ উত্তর দিতেন। বসে শুনতুম। এইভাবে পরিচয়। বাগবাজারে জ্ঞান মহারাজের আশ্রমে যাতায়াত আছে, সেকথাও মহারাজ জানতেন। সেসময় সবে স্কুল পাস করেছি। মনে সাধু হওয়ার খুব ইচ্ছে। একদিন শরৎ মহারাজের কাছে সোজাসুজি ব্রহ্মচর্য প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেনঃ "আমি তো ব্রহ্মচর্য দিই না। মহাপুরুষ মহারাজ দেন। মঠে গিয়ে তুই মহাপুরুষ মহারাজকে বল।"

—মহাপুরুষ মহারাজকে আমার ভয় করে।

—সেকিরে! মহাপুরুষ মহারাজ শিবতুল্য মানুষ। তাঁকে আবার কারো ভয় করে?

একথা বলে জ্ঞান মহারাজকে ডেকে মহারাজ বললেনঃ "ওকে নিয়ে যাও মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। আমি পাঠিয়েছি বলবে।"

জ্ঞান মহারাজ নিয়ে এলেন মঠে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। তিনি সব শুনে বললেনঃ "ব্রহ্মচর্য আমি দেব, কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে। বি. এ. পাস করতে হবে। তারপর সাধু হবে।"

সুতরাং কাপড়ে কোঁচা দিয়ে মাথায় শিখা রেখে ভর্তি হলাম কলকাতার সংস্কৃত কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে। ব্রহ্মচারীর বেশ, কলকাতা শহরের সহপাঠীরা কি দৃষ্টিতে দেখবে—সে-ব্যাপারে একটু সঙ্কোচ গোড়ায় ছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্য করলাম ক্লাসের ছেলেমেয়েরা খ্যাপানো তো দূরের কথা, আমায় খুব সমীহ করত ও সম্ভ্রমের চোখে দেখত। কলেজে কোন অসুবিধাই হয়নি। অন্যদিকে, কাব্যের অধ্যাপক রাজেন বিদ্যানিধি এবং দর্শনের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমায় খুব ভালবাসতেন। যাহোক, দেখতে দেখতে বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। শেষ পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েই সোজা বেলুড় মঠ। মহাপুরুষ মহারাজকে মঠে চলে আসার কথা নিবেদন করতেই মহারাজ খুব খুশি।

১৯২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমাদের ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ হয়। আমাদের দলে ছিলেন গম্ভীর মহারাজ (স্বামী গম্ভীরানন্দ), মোতি মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী শিবস্বরূপানন্দ, মহারাজের সেবক) ও ফণি মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী আত্মারামানন্দ)। সেদিনটি আরেকটি কারণে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহাপুরুষ মহারাজ আমায় তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। তিনি খুব গম্ভীর, যেন খুব চিন্তিত। আমায় বললেনঃ "আরে শোন, তুই তো বামুনের ছেলে পুজো-আচ্চা জানিস। মঠের ঠাকুরের পূজারী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে ব্রহ্মচর্যের হোম করতে পারবে না। তুই তো এসব জানিস। তুই-ই তোদের ব্রহ্মচর্যের হোমটা করবি।" আমি এতে যারপরনাই খুশি হয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করলাম। সত্যিই সেদিন নিজেদের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের হোম করতে পারার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম।

১৯২৮ সাল। সেবছর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথির পূত উষালগ্নে মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে নবজীবন দান করলেন। আমাদের সন্ন্যাস হয়েছিল পুরনো মন্দিরের নিচের ঘরে—এখন যেখানে মঠ অফিস।

আমি মহারাজের ফর্ম্যাল সেবকদের মধ্যে ছিলাম না। তবে তাঁর কৃপায় সেবার যথেষ্ট সুযোগ পেতাম। সন্ন্যাসের পরের বছর তপস্যার জন্য মনে তীব্র ব্যাকুলতা। একদিন সন্ধ্যার পর মহারাজকে ম্যাসাজ করছি।

* পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথোপকথন থেকে সঙ্কলন করেছেন স্বামী ঋতানন্দ।

মনের কথাটা জানালাম যে, তপস্যায় যাওয়ার জন্য মন খুব আকুলি-বিকুলি করছে। শুনেই তিনি খুব খুশি হলেন। শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। বসেই আমার দিকে খুব গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রেখে দু-হাত দিয়ে নিজের দুই উরুর ওপর তাল ঠুকে বললেন ঃ "যাও বাবা যাও, খুব তপস্যা কর। আর যাওয়ার আগে যে-কদিন মঠে আছ খুব কষে জপ-ধ্যান কর, তাহলে তপস্যায় গিয়ে ঠিক ঠিক সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। আর ছুটি শেষ হলে সোজা চলে এসে ঠাকুরের কাজে লাগবে। বেশিদিন বাইরে থাকতে নেই। তাতে মন উড়ুউড়ু হয়ে যায়। সে-মনে না হয় তপস্যা, না হয় ঠাকুরের কাজ।" অবাক হয়ে ভেবেছি, আমি তপস্যায় যাব, তাতে মহাপুরুষ মহারাজের কী আগ্রহ! সর্বদা কতভাবেই না উৎসাহ দিতেন সাধন-ভজনের জন্য।

মহাপুরুষ মহারাজ গান খুব পছন্দ করতেন। চাইতেন ছেলেরা গানবাজনা করে। নিজেরও গলা খুব মিষ্টি ছিল। তাঁকে গান গাইতে শুনেছি। একদিন শরৎ মহারাজকে বললেন ঃ "শরৎ নে, বাঁয়াটায় ঠেকা দে।"—বলে গান গাইলেন। শরৎ মহারাজ বাজালেন, মহাপুরুষ মহারাজ গাইলেন। মহারাজ আগেও গাইতেন। ঠাকুরের দেহ যাওয়ার পর সম্ভবত মঠ তখন বরানগরে উঠে এসেছে। শুনেছি, সেখানে এক বর্ষার দিনে তিনি ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত হৃদয়ে খুব করুণ সুরে 'হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা/ বিপদ পড়ল সই! মালতীর মালা।' গানটি গেয়েছিলেন।

একদিন সকালে মহারাজের ঘরে ঢুকতেই বলছেন ঃ "বুঝেছ, খুব বিপদে পড়েছি।"

—কি হলো মহারাজ?

—দেখ না, মোতি অসুস্থ। এখন ভাবছি আমার ঘরটা কে মুছবে?

—আমি পুঁছে দিচ্ছি। এর জন্য আপনি অত ভাবছেন কেন?

মহারাজ নিশ্চিন্ত হলেন। এমনই ছিল তাঁর শিশুসুলভ স্বভাব। নিজের জন্য কাউকে সামান্য কাজ করতে বলতেও কত দ্বিধা!

কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তরে মহারাজ যথাযথ উত্তর অথবা 'জানি না'—এরকম উত্তর পছন্দ করতেন। এলোমেলো বা গোঁজামিল একেবারে সইতে পারতেন না। একদিন সকালে মন্দিরাদি প্রণাম সেরে মঠে হাঁটছেন। স্বামীজীর মন্দিরের সামনে থেকে লঞ্চঘাট দেখা যায়। ওখানে কয়েকটি আলো জ্বলছিল। মহারাজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ওখানে কটা আলো জ্বলছে?" সঙ্গে যারা উপস্থিত ছিল, একেক জন একেক রকম উত্তর দিল। এরই মধ্যে আমি ওখানে ছুটে গিয়ে আলোগুলি গুনে এসে সঠিক সংখ্যাটি বললাম। তাতে মহাপুরুষ মহারাজ খুব খুশি হলেন এবং বারবার সকলের সামনে এই সামান্য ব্যাপারেই আমার প্রশংসা করতে লাগলেন।

আমার মঠজীবনের প্রথমদিকে একবার খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। সেটা ১৯২৮ সাল। রক্ত-আমাশয়ে ভুগে ভুগে একেবারে মরণাপন্ন। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গঙ্গেশানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজের সচিব) মহারাজকে গিয়ে বললেন ঃ "মহারাজ, ও তো চলল।" মহাপুরুষ মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখ। হাত জোড় করে ঠাকুরের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে বললেন ঃ "দেখো, ঠাকুরের কি ইচ্ছা।" তাঁর কৃপায় সেবার সেরে উঠলাম। তবে শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। বিছানার সাথে মিশে গিয়েছিলাম। অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দ) আমাকে পাঁজাকোলা করে এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় শুইয়ে দিতেন। তিনি খুব সেবা করেছেন। পরেশ মহারাজ (স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ) আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "কিরে, তোর কাকে দেখতে ইচ্ছা করে? বাড়িতে খবর দেব?" আমি বললাম ঃ "না, যখন ভাল ছিলাম তখনি খবর দিইনি আর এখন তো মরতে চলেছি, এখন খবর দেওয়ার দরকার নেই।"

মহাপুরুষ মহারাজ খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মঠে তারাসার পণ্ডিত সাধু ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রাদি পড়াতেন। তখন চলছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও তার শাঙ্করভাষ্য পাঠ ও আলোচনা। মহারাজ একটা বই জোগাড় করে রোজ আমাদের সঙ্গে সে-ক্লাসে যেতে শুরু করলেন। আমরা তো খুব সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত। একদিন শুদ্ধানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে জানালেন ঃ "মহারাজ, আপনি ক্লাসে যাওয়ায় নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীরা খুব সঙ্কোচবোধ করেন।" মহারাজ বললেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসে আমি আর যাব না। কিন্তু রোজ পাঠের পর একজন এসে আমাকে সেদিন কি পড়া হলো সংক্ষেপে শুনিয়ে যাবে।" সে-ভারটি পড়েছিল অনঙ্গ মহারাজের ওপর। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে-কাজটা মাঝেমধ্যে আমাকে করতে হতো। দেখতাম, মহারাজ খুব মনোযোগের সঙ্গে বিষয়গুলি শুনে ঘাড় নেড়ে তর্ক ও সিদ্ধান্তকে অনুমোদন জানাতেন।

মঠের সব কাজের প্রতি মহারাজের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। ঠাকুরসেবার খুঁটিনাটি যত্নের সঙ্গে শেখাতেন। একদিন ঠাকুরের প্রসাদী পান মুখে দিয়েই সেটি মুখ থেকে বার করে ফেললেন। ঠাকুরঘরের ভাঁড়ারিকে ডাকালেন। সে কাছে এলে মহারাজ তাকে বললেন ঃ "আজ তুমি ঠাকুরের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছ। পানে অত চুন দিয়েছ! সাবধান, ঠাকুর

এখানে জীবন্ত, আমাদের সেবা নেন।" একথা বলে কতটুকু চুন-সুপারি একটা পানে দিতে হবে সব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আবার বললেন: "দেখো, মঠের আমি প্রেসিডেন্ট। এসব ঠাকুরের সেবা তো আমারই করার কথা। কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছি। নিজে করতে পারি না। তাই তোমরা কর। দোষ-ত্রুটি হলে সে তো আমারই অপরাধ।" মহারাজ এমন ভঙ্গি ও বিনয়ের সুরে কথাগুলি বলেছিলেন, উপস্থিত আমাদের সকলের মনে ঠাকুরসেবার গুরুত্ব যে কত গভীর, সেটি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

সেবার যতীশ্বরানন্দজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার এডিটর হয়ে মায়াবতী যাচ্ছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার সময় বললেন: "মহারাজ, আমি কি লিখব? আমি কি জানি?"

মহারাজ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন: "খুব করে ঠাকুরের ধ্যান করবে। আমাদের ঠাকুর অনন্ত ভাবময়। দেখবে মাথায় এত ভাব আসবে যে, তাতে একেবারে ভেসে যাবে।" আরেকটা কথা বলেছিলেন: "ধ্যানের সময় ভাববে যে, মঠ-মিশনের কাজ ইত্যাদি কিছুই নেই। শুধু ঠাকুর আছেন আর আমি আছি।"

মহাপুরুষ মহারাজ রসিকতাও খুব করতেন। একবার মঠে অনেকগুলি কম্বল এসেছে। মঠের ম্যানেজার প্রিয়দা (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) সেগুলি মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন। মহারাজ দেখে খুশি হয়ে বলছেন: "বেশ, বেশ, সাধুদের একেকজনকে একেকখানা করে কম্বল দাও।" প্রিয়দা বললেন: "না মহারাজ, এগুলি এসেছে গরিবদুঃখীকে দেওয়ার জন্য।" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন: "ও, সাধুরা বুঝি বড়লোক?"

একদিন আমরা কয়েকজন একেক করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে ঢুকছি। যে-ই ঢুকছে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন: "কে?" অমনি সে বলছে: "আমি অমুক, মহারাজ।" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন: "ও, তুমি অমুক মহারাজ।" দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে মহারাজ এরকমই বললেন। আমি ঢুকতেই মহারাজ যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন: "কে?" আমি কিন্তু উত্তর দিলাম: "মহারাজ, আমি অমুক।" এবারে মহারাজ আমার সঙ্গে সেভাবে বলতে না পেরে সকলকে বলছেন: "দেখো, ওর কি বুদ্ধি, ও আগে 'মহারাজ' কথাটা বলে বলল, 'আমি অমুক'।" মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন এমনই মজার মানুষ।

আরেকটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মঠে এসেছেন অখণ্ডানন্দজী (গঙ্গাধর) মহারাজ। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর সঙ্গে খুব ফষ্টিনষ্টি করতেন। অখণ্ডানন্দজী ছিলেন খুব সরল। সারগাছিতে খুব কাজকর্ম করতেন। সেখানে লোকজনের অভাব। তাই সাধুকর্মী চেয়েছেন মঠে। মঠ থেকে কাউকে পাঠাচ্ছে না। সেজন্য খুব অভিমান করে ছেলেমানুষের মতো মহাপুরুষ মহারাজকে সেকথা জানিয়ে বললেন: "বনে-বাদাড়ে পড়ে আছি। কাজের লোকজন নেই। মঠে লোক চাইলেও লোক দেবে না!"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে দেখিয়ে অখণ্ডানন্দজীকে বললেন: "দেখো, এ ছেলেটি খুব ভাল। একে তোমার ওখানে নেবে তো নিতে পার।"

—ভাল আর মন্দ, একটা পেলেই হয়।

—কিন্তু, ও তো কলকাতার ছেলে। রাতে লুচি খাওয়ার অভ্যেস। ওকে নিলে রাতে কিন্তু লুচি খাওয়াতে হবে।

অখণ্ডানন্দজী গজগজ করে মৃদু স্বগতোক্তি করলেন: "হ্যাঁ, নিজেরাই ডাল-ভাত খেয়ে কোনরকম রয়েছি, তা আবার রাতে লুচি খাওয়াতে হবে!"

একটু চটেছেন দেখে মহাপুরুষ মহারাজ রসিকতা করে আবার বলছেন: "তাছাড়া, ওর খুব শাস্ত্রচর্চা করায় আগ্রহ। পড়তে শুনতে ভালবাসে। তোমার ওখানে নিলে একজন পণ্ডিত রেখে ওকে শাস্ত্র পড়াতে হবে।" এবার অখণ্ডানন্দজী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার মতো গর্জে উঠে বললেন: "দরকার নেই আমার সাধুকর্মীর। ওখানে কখন কোথায় থাকি, কি করি তার ঠিক নেই, বলে কিনা পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র পড়াতে হবে!" একথা বলে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে ঘর থেকে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ দিব্যি হেসে বললেন: "দেখলি, গঙ্গাকে কেমন চটালাম!"

একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহারাজ, ঠাকুর আপনাদের কিভাবে উপদেশ দিতেন সে-ব্যাপারে একটু বলুন। মহারাজ শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। উৎসাহের সঙ্গে বললেন: "ঠাকুর কিরকমভাবে বলতেন, আমাদের জন্য তাঁর কী গভীর আগ্রহ, সেই আকুল মুখভঙ্গি—তা তো বাবা তোমাদের দেখাতে বা বোঝাতে পারব না। কি বলতেন—কথাগুলি হয়তো বলতে পারব, কিন্তু সেসময়ে ঠাকুরের দেহ-মনে যে-ভাবান্তর হতো, সেটিই ঠাকুর আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন—তা তো দেখাতে বা বলতে পারব না। মহাপুরুষ মহারাজও এমন তীব্র আর্তি নিয়ে কথাগুলি বলেছিলেন যে, তাতেই আমাদের মন ভরে গিয়েছিল।

অন্য একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরের পশ্চিমের জানালার সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন। সমুদ্রবৎ গম্ভীর—একেবারে অন্তর্মুখ। কাছে রয়েছি। অনেকক্ষণ পর আমায় দেখতে পেয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। এতক্ষণ চোখ

চেয়েইছিলেন, কিন্তু কিছুই যেন দেখছিলেন না। বললেন ঃ "ঠাকুর আমাকেও ঈশ্বরকোটি করে দিয়েছেন। ভিতরে এত শক্তি অনুভব করি যে, যদি এই আমগাছটাকে বলি মুক্ত হয়ে যাক, এক্ষুনি গাছটা মুক্ত হয়ে যাবে।" শুনে আমি স্তম্ভিত।

রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিল মাছ ধরার খুব সখ। মঠের প্রেসিডেন্ট হয়ে মহারাজের মাছ ধরতে বসা মহাপুরুষ মহারাজ একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই এব্যাপারে মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে একটু ভয় করতেন এবং এড়িয়ে চলতেন। মাঝেমাঝে মহারাজ করতেন কি, নিজের চেলাদের দিয়ে আগেভাগেই ছিপ, চার ইত্যাদি পুকুরপাড়ে পাঠিয়ে দিতেন এবং কিছু পরে খালি হাতদুটো ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে মহাপুরুষ মহারাজের সামনে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যেতেন। এমনই ছিল মহারাজের বালকসুলভ আচরণ। মহাপুরুষ মহারাজ সব টের পেতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। মহারাজের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের সম্ভ্রম ছিল সত্যি দেখার মতো।

মহাপুরুষ মহারাজের অসাধারণ সংযম ছিল। তেল-মশলাবর্জিত একটা বিস্বাদ ঝোল ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান খাবার। তাঁর গুরুভাইরা সেটির নাম দিয়েছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। বেলুড় মঠে তাঁকে সেটি তৃপ্তির সঙ্গে নিত্য খেতে দেখেছি। শুনেছি, কাশীতে থাকতেও তিনি এ-ঝোল খেতেন। তাই কাশীতে এর নাম 'কাশীর ঝোল'। এ-ঝোলটি সম্পর্কে বেশ এক পরিহাসপূর্ণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কাশীতে প্রচলিত আছে। আমরা চন্দ্র মহারাজের (স্বামী নির্ভরানন্দ) কাছে সেটি শুনেছি। হাস্যরসে ভরপুর সে-প্রসঙ্গ কত আশ্রমে রাতে প্রসাদ পাওয়ার পর সাধু-ব্রহ্মচারীদের আড্ডায় করেছি। সেটি এরকম ঃ

কঠ উপনিষদের একটি শ্লোকে (১।৩।১৫) নির্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্মরূপ আত্মার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

এই শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মরূপ আত্মার লক্ষণগুলির সঙ্গে সেই ঝোলের অভাবনীয় সাদৃশ্য চমকপ্রদ। 'অশব্দম্' মানে শব্দবিহীন—ঝোলে আনাজ কিছু তো নেই যে নাড়াচাড়া দিলে শব্দ হবে। দুটি বস্তুর আঘাতজনিত কারণে শব্দের সৃষ্টি। হাতা দিয়ে নাড়লে কোন দৃশ্য বস্তুর অভাববশত আঘাত না লাগায় এটি শব্দহীন। 'অস্পর্শম্'—স্পর্শবিহীন। এটি এত তরল যে, স্পর্শহীন—ধরাছোঁয়া যায় না। 'অরূপম্'—তেল-মশলাহীন বলে প্রায় বর্ণহীন—অরূপ। আবার, যতই খাও না কেন তার শেষ নেই—'অব্যয়'—ব্যয় হয়ে শেষ হয়ে যায় না, ক্ষয়রহিত। 'অরসম্'—স্বাদহীন—বিস্বাদ। 'অগন্ধবৎ'—ফোঁড়নটোড়ন কিছু ব্যবহার না করায় অগন্ধি—গন্ধহীন। কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে তা জানা যায় না। তাই—'অনাদি', আদিহীন। অন্যপক্ষে, এটি যে কোনদিন বন্ধ হয়ে যাবে তা-ও নয়, কারণ এটি অনন্তম্—চলতে থাকবে। 'মহতঃ'—মহৎ ব্যক্তিগণ থেকে এটির উৎপত্তি। 'পরম্' মানে বিলক্ষণ। অনুপম, কোন দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গে উপমান উপমেয় সম্বন্ধশূন্য, তাই 'নিরুপম্'। 'ধ্রুবম্'—কূটস্থ নিত্য। খেতে বসে অন্য পদ থাকুক আর না থাকুক এটি নিত্য উপস্থিত। এর কখনো অভাব দৃষ্ট হয় না, তাই 'নিত্য'। 'নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—যেমন তাঁকে (ব্রহ্মরূপ আত্মা) অবগত হলে সাধক মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত হন, তদ্রূপ এই ঝোল কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণে মর্ত্যজীব মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্বলাভ করে।

মহাপুরুষ মহারাজের সচিব দ্বিজেন মহারাজ (গঙ্গেশানন্দজী) ছিলেন ক্রিকেট-পাগল। মহারাজ সেটি জানতেন। ভারতীয় দল খুব খারাপ খেললে পরদিনের খবরের কাগজের সে-অংশটা মহাপুরুষ মহারাজ বার করে অন্য সেবকের মাধ্যমে দ্বিজেন মহারাজের কাছে পাঠিয়ে বলতেন ঃ "আজ দ্বিজেনের জন্য বড় খবর আছে।" এরকম ঠাট্টা-রসিকতাও মহারাজ তাঁর সঙ্গে করতেন। যাহোক, ক্রিকেটের কোন বড়সড় ম্যাচ থাকলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রেডিওতে কমেন্ট্রি শোনা বা দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর খবরের কাগজে ক্রিকেটের খবর সবিস্তৃত পাঠ ছিল সে-সময়ে দ্বিজেন মহারাজের নিত্য রুটিন।

তখন কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেট চলছে। দ্বিজেন মহারাজের মনে তীব্র ইচ্ছে, একদিন মাঠে যান। কাউকে কিছু বলেননি। দুদিন খেলা হয়ে গেছে। তৃতীয় দিনে খেলা খুব আকর্ষণীয় অবস্থায় গড়িয়েছে। সন্ধ্যায় মহাপুরুষ মহারাজ দ্বিজেন মহারাজকে ডাকলেন। বললেন ঃ "কাল তুমি খেলা দেখে এসো।" দ্বিজেন মহারাজ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এখন টিকিটই বা কোথায় পাবেন আর টাকাই বা কে দেবে? মহাপুরুষ মহারাজ বললেন ঃ "টেবিলের ওপরে ওখানে একটা টিকিট আছে। আর আমার জামার পকেটে কিছু টাকা আছে। দেখো তোমার কত লাগবে—ওখান থেকে নিয়ে যেও।" আশ্চর্য, মহাপুরুষ মহারাজ কাউকে না জানিয়ে এক পরিচিত ডাক্তার-ভক্তের মাধ্যমে একদিনের একটা টিকিট দ্বিজেন মহারাজের জন্য আনিয়ে রেখেছিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় দ্বিজেন মহারাজ খেলা দেখে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতেই মহারাজ খুশিতে

বলে উঠলেন ঃ "দ্বিজেন, বেশ দেখলে তো। এবার খুশি তো।" কথাগুলি এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন দ্বিজেন মহারাজের সখ মেটায় মহারাজের কী অসীম তৃপ্তি! পরবর্তী কালে দ্বিজেন মহারাজ আমাদের বলেছিলেন ঃ "এরপর থেকে কিভাবে কেন জানি না, আমার মন থেকে ক্রিকেট-প্রীতি একেবারে কমে গেল। জীবনে আর কোনদিন মাতামাতি তো দূরের কথা, ক্রিকেটের প্রতি তেমন আকর্ষণই আর অনুভব করতাম না।"

স্বামীজীকে ঠাকুরের অন্য সন্তানেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখতেন, সেকথা শুনেছি। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন—সেরকম একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সে-ঘটনাতে আমি উপস্থিত ছিলাম।

একদিন রাতে প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে রয়েছি। মঠবাড়ির পূর্বদিকের বারান্দায় মহারাজ গঙ্গার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে বসে। সামনে আমরা কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী মেঝেতে বসে। অনেক-রকম প্রসঙ্গের পর স্বামীজীর কথা উঠল। একের পর এক ঘটনা। কি সব আলোচনা হয়েছিল এখন কিছুই মনে নেই। সেসব কথা লিখে রাখা, এমনকি সযত্নে মনে রাখার তাগিদও তখন আমরা তেমন অনুভব করিনি। তাঁদের সান্নিধ্যে আমাদের মন-প্রাণ আনন্দে এতই ভরপুর হয়ে যেত যে, আলাদা করে কিছু সংগ্রহ করে রাখা কখনো মনেই উঠত না। যাহোক, শুধু মনে আছে, বহুক্ষণ—তা দু-তিন ঘণ্টা তো হবেই, শুধুই স্বামীজীর প্রসঙ্গ করলেন মহাপুরুষ মহারাজ। যখন থামলেন, রাত অনেক হয়ে গেছে। মহারাজ খুব গম্ভীর, স্তব্ধ। আলো-আঁধারেও দেখা যাচ্ছে, মহারাজের মুখ আরক্তিম, চোখের পাতা ভারি। চুপ করে বসে আছেন। আমরা নির্বাক নিঃস্পন্দ। বেশ কিছুক্ষণ পর দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল। থমথমে পরিবেশ। দ্বিজেন মহারাজ কাছে এসে মহারাজকে দু-বাহুতে স্পর্শ করে বললেন ঃ "মহারাজ, রাত অনেক হয়েছে, চলুন এখন শোবেন একটু।" দ্বিজেন মহারাজ একথা শেষ না করতেই মহাপুরুষ মহারাজ যেন গর্জে উঠে খুব জোরের সঙ্গে বললেন ঃ "কি? ঘুম! ঘুম কোথায় চলে গেছে। স্বামীজীর এত কথা হলো, আবার ঘুম থাকে নাকি? স্বামীজীর কথা বলে কত রাত আমরা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। স্বামীজীর কথা হলে ঘুম-টুম সব পালিয়ে যায়। স্বামীজীর কথা হলো। কী inspiration! আমার তো এতটুকু ক্লান্তি নেই, দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। স্বামীজী আমাদের ঘুম ভাঙাতে এসেছিলেন। জেগেছি, আর কি ঘুমাই রে?" মহারাজের প্রতিটি কথা যেন এক শক্তিপ্রবাহের মতো আমাদের দেহ-মনে শিরশির করে সঞ্চারিত হচ্ছিল। সে-অনুভব বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। বেশ অনেকক্ষণ ওভাবে কেটে গেল। এবারে দ্বিজেন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে ধীরে ধীরে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

আরেকটি ঘটনা। তখন স্বামীজী স্বয়ং রয়েছেন মঠে। ঘটনাটি শুনেছি স্বামীজীর শিষ্য-সেবক কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) কাছে।

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী রাজা মহারাজকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। মহারাজ আসতেই স্বামীজী বললেন ঃ "রাজা, আজ তুই একটু আমাকে বেশ কষে দলাই-মলাই করে দে তো দেখি। এরা ঠিক পেরে ওঠে না। ওদের যেন সব কচি খোকার হাত।" আর কানাই মহারাজকে বললেন ঃ "আজ আমায় ম্যাসাজ রাজাই করবে। তুই এখন আয়। কিছুক্ষণ পর আবার আসিস।" কানাই মহারাজ দেখলেন, মুহূর্তে রাজা মহারাজ পালোয়ানের মতো কাপড়টাকে কাছা দিয়ে স্বামীজীর শরীরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দলাই-মলাই শুরু করে দিয়েছেন। কানাই মহারাজ ঘরের বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। স্বামীজী এখনো ডাকছেন না। কৌতূহলী হয়েই কানাই মহারাজ ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করে ঘরের ভিতরে যেন কোন কাজের জন্য গেছেন—এমন ভাব করে এটা-ওটা খুঁজছেন। দেখলেন, মহারাজ তাঁর পালোয়ানী দশাসই শরীর নিয়ে স্বামীজীকে ম্যাসাজ করতে করতে একেবারে শ্রান্ত, ক্লান্ত, সত্যিই হাঁপাচ্ছেন এবং দরদর করে তাঁর সারা শরীরে ঘামের ধারা বইছে! স্বামীজী কিছু টের পাওয়ার আগেই কানাই মহারাজ বেরিয়ে এলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মহারাজ স্বামীজীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে স্বামীজী কানাই মহারাজকে ডাকলেন এবং হাতপাখার বাতাস করতে বললেন।

এদিকে রাতে প্রসাদ পাওয়ার সময় স্বামীজীর ও রাজা মহারাজের কয়েকজন চেলা কানাই মহারাজের কাছ থেকে স্বামীজীর মহারাজকে দিয়ে এতক্ষণ ম্যাসাজ করানোর ঘটনাটি শোনেন। তাঁদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেন ঃ "মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, আমাদের গুরু। তাঁকে দিয়ে স্বামীজী এই সামান্য কাজ করালেন! আমাদের বললেই তো হতো।" ইত্যাদি। আবার স্বামীজীর কোন চেলা বললেন ঃ "আমরা থাকতে মহারাজকে এত কষ্ট দেওয়া কেন? আমাদের ডাকলেই তো হতো। আমরা একটু গুরুসেবা করে ধন্য হতাম।" অবশেষে কিভাবে এবং কার কাছে তাঁদের মনের সংশয়টি খুলে ধরা যায়—ভাবতে ভাবতে সাধুরা ঠিক করলেন, ব্যাপারটি প্রসাদ পাওয়ার পর মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। সেরকম সিদ্ধান্ত করে কয়েকজন সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেলেন এবং

সন্ধ্যার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করে স্বামীজীর এরকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সব শুনে মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠলেন এবং উৎফুল্ল হয়ে বারেবারে বলতে লাগলেন : "আহা! আহা! রাজার কী ভাগ্য! সত্যিই রাজাকে দিয়ে স্বামীজী একঘণ্টা দলাই-মলাই করিয়েছেন! আহা! আহা! রাজার কী সৌভাগ্য! ওর জীবন ধন্য হয়ে গেল। আহা! আমায় যদি স্বামীজী ডাকতেন। আঃ, আমায় যদি একটিবার স্বামীজী এ-সুযোগ দিতেন! আমার জীবন সার্থক হতো, কৃতকৃতার্থ হতাম! স্বামীজী স্বয়ং শিব! শিবাবতার! তাঁর দেহের সামান্য সেবা দুর্লভ!" এরকম বলতে বলতে মহাপুরুষ মহারাজ যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠছেন এবং রাজা মহারাজের ভাগ্যের প্রসন্নতা ভেবে যারপরনাই আহ্লাদিত হচ্ছেন দেখে অর্বাচীন সাধুরা একেবারে হতভম্ব ও বিস্মিত। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর স্বরূপ সম্পর্কে কি কি বলতেন, সেসব কথা মহাপুরুষ মহারাজ কিছু বললেন। নবীন সাধুরা সেসব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজের মহাপ্রয়াণ দিবসের একটি দৃশ্য এখনো মনে ভেসে ওঠে। মহারাজের পত্রপুষ্পমাল্যাদি-ভূষিত পূতদেহ মঠের সব মন্দির পরিক্রমা করে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামীজীর আমগাছটির নিচে খাটে শায়িত। অগণিত সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত একে একে মহারাজের পাদপদ্মে অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে চারপাশে দণ্ডায়মান। এমন সময় কলকাতার বেদান্ত মঠ থেকে গাড়ি করে এলেন অভেদানন্দজী মহারাজ। গাড়ি থেকে নেমে জুতোজোড়া একটু দূরে খুলে রেখে হাতদুটো জোড় করে এগিয়ে এলেন মহাপুরুষ মহারাজের চরণদ্বয়ের ঠিক কাছে। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে হাতজোড় করেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করে মহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মে নতমস্তক হয়ে প্রণাম করলেন। সে-দৃশ্য চোখ বুজলে এখনো যেন দেখতে পাই। শ্লোকটির অর্থ : হে প্রণতপালক মহাপুরুষ! সর্বদা ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয়াদিজনিত পরাভবনাশক, অভীষ্টপ্রদ, পরম পবিত্র গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিবব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনীয়, শরণ্য, ভৃত্যজনের আর্তিহর ও সংসারসাগরের পোতস্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। ■

শব্দচেতনা ৫১

শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

■	১			২	■	৩	■	৪		৫	
৬	■	■	■		■		■		■		■
	■	৭	■	৮					■		■
৯				■	■		■		■	১০	
	■		■	■	১১		১২	■	■		■
	■		■	১৩	■	■	১৪		১৫		■
■	১৬				■	■		■		■	১৭
■		■	■	১৮	১৯		■	■		■	
২০		■	২১	■		■	■	২২			
■		■	২৩				২৪	■		■	
■		■		■		■		■	■	■	
২৫				■		■	২৬				■
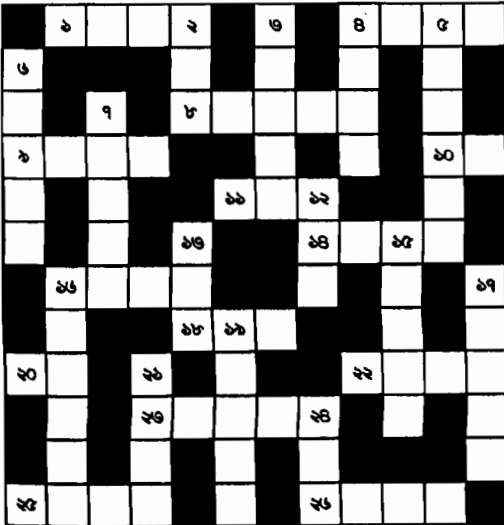
পাশাপাশি : (১) "ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ ——মতাড়য়ৎ" (৪) "তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো —— মহাসুরাঃ" (৮) "প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী ——" (৯) "রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব ——" (১০) "মহা—— মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে" (১১) "ত্বয়েব দেবি —— ভুবনত্রয়েঽপি" (১৪) "হিমবান্ —— সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ" (১৬) "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ ——" (১৮) "পরা পরাণাং —— ত্বমেব পরমেশ্বরী" (২০) "ব্রবীতী কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং ——" (২২) "স্বর্গাম্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন —— ভুবি" (২৩) "ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি —— বৈ যতঃ" (২৫) "তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং —— ন জায়তে" (২৬) "—— বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূম্মহিষাসুরঃ।"

ওপর-নিচ : (২) "একাকী হয়মারুহ্য —— গহনং বনম্" (৩) "——নির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ" (৪) "অন্যেষাঞ্চৈব —— শক্রাদীনাং শরীরতঃ" (৫) "—— তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্" (৬) "চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি ——" (৭) "দদাবশূন্যং সুরয়া —— ধনাধিপঃ" (১২) "জয়েতি —— মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্" (১৩) ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ ——বান্" (১৫) "পাদাক্রান্ত্যা —— কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্" (১৬) "বার্তা চ —— পরমার্তিহন্ত্রী" (১৭) "—— চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্" (১৯) "—— ভূতানি তানি ময়্যেব শোভনে" (২১) "বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ —— গতাঃ" (২৪) "——নাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।"

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এই সেই বাড়ি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়*

এই তো সেই ঠাকুরদালান। উঠান থেকে প্রায় একমানুষ উঁচু। পরপর ছয়টি ধাপ উঠান থেকে উঠে গেছে ঠাকুরদালানে। উলটোদিকে সময়ের কাঁটা ঘোরাই। কাঁটায় কাঁটায় দুপুর দুটো তিরিশ মিনিট। ১৮৭০ সাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্য। সর্বোচ্চ সোপানে সদর্পে যে-বালকটি বসে আছে, তার নাম নরেন্দ্র। আরো নাম আছে—বীরেশ্বর; বিলে।

শুরু হোক খেলা। সর্বোচ্চ ধাপে রাজা নরেন্দ্র। সিমুলিয়ার বালক রাজা। মুঘলসম্রাট আকবরের মতো সদ্য সিংহাসন লাভ করেছেন। রাজপ্রাসাদের ঠিকানা—৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট। রাজার পিতার নাম শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্ত। আপাতত তিনি প্রাসাদে নেই, আছেন আইনের জগতে। কলকাতার বাঘা অ্যাটর্নি। এই রাজ্যের যাবতীয় খাজনা আসে আইনব্যবসা থেকে। প্রাসাদের প্রজাগণ সেই অর্থে রাজার হালেই প্রতিপালিত হন। বালক রাজার মাতার নাম ভুবনেশ্বরীদেবী। এই বালক রাজার প্রবল দুঃশাসনে অস্থির হয়ে তিনি এখন রাজ অন্তঃপুরে সামান্য বিশ্রামে আছেন।

রাজসভা শুরু। নকিব ফুঁকারে। নিচের ধাপ দেখিয়ে রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেনঃ তুমি হচ্ছ মন্ত্রী, আর তুমি সেনাপতি, যাও ওখানে দাঁড়াও।

আরেক ধাপ নিচে সভাসদদের স্থান। ঘোষণা হলো—সভার কাজ শুরু। সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজাকে প্রণাম জানাল।

রাজার গম্ভীর গলায় প্রশ্নঃ মন্ত্রী, রাজ্যের খবর কি?

আজ্ঞে মহারাজ, প্রজারা পরম সুখে আছে।

পরম সুখে থাকলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু মন্ত্রী যেদিন জানাতঃ মহারাজ! একজন দস্যু বড় উৎপাত করছে, সেদিন শুরু হতো দক্ষযজ্ঞ।

রাজার আদেশঃ দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।

আদেশ পাওয়ামাত্রই দশ-বারোজন সান্ত্রি হে রে রে রে করে দস্যুটিকে ধরার জন্য তাড়া করল। দস্যু কেন সহজে আত্মসমর্পণ করবে! সে সদর দরজার দিকে ছুটছে। পিছনে পিছনে ছুটছে রাজার সান্ত্রিবাহিনী। তারা কেউ অস্ত্রধারী। চিৎকারে বাড়ি ভেঙে পড়ে আর কি। সকলের দিবানিদ্রা ছুটে গেল। দেউড়িতে শুয়েছিল ভৃত্যবর্গ। কাঁচাঘুম ভেঙে গেল। সান্ত্রিবাহিনীকে ধরে দু-চার ঘা দেওয়ার জন্য তারাও ছুটছে। সর্বোচ্চ সোপানে বসে রাজা নরেন্দ্র মৃদু মৃদু হাসছেন।

এই উঁচু দালান থেকে বালক রাজা নরেন্দ্রনাথ একদিন নিচের উঠানে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলেন ঠাকুরদালানে। জ্ঞান ফিরে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন, আঘাত অবশ্যই গুরুতর, তবে প্রাণের ভয় নেই। নরেন্দ্রনাথের ডান চোখের ভ্রূর ওপরটা কেটে গিয়েছিল। সেই ক্ষতচিহ্ন আজীবন ছিল। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ যদি সেদিন ঐরকম ওর শক্তি না কমে যেত, তাহলে ও যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলত।

এই সেই দেওয়াল, যে-দেওয়ালে ঝুলত হুঁকোর জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ-হুঁকো, কায়স্থ হুঁকো, কৈবর্ত হুঁকো, মুসলমান হুঁকো। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে নানা জাতের মক্কেলরা আসত। একদিন নরেন্দ্রনাথ প্রতিটি হুঁকোয় পরপর মুখ ঠেকিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন; জাত যায় কিনা। পিতা বিশ্বনাথ ঘরে এসে অবাক হয়ে দেখছেন পুত্রের কাণ্ড। জিজ্ঞেস করলেনঃ কি কচ্ছিস রে?

নরেন্দ্রনাথের স্পষ্ট উত্তরঃ দেখছি, জাত না মানলে কি হয়।

এই সেই উঠান। উঠানের এই জায়গাটায় বালক নরেন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন তার গ্যাসঘর। কলকাতায় সবে গ্যাসের আলো এসেছে। সোডা-লেমনেডের দোকান বসেছে। বোতলের মুখে গুলি। চাপ দিয়ে গুলিটাকে ভিতরে ঢোকালেই জলের বুজবুজি। ঠাকুর বলতেনঃ কাক খুললেই গ্যাঁ (অর্থাৎ কর্ক খুললেই) এইসব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার-স্যাপার দেখে নরেন্দ্রনাথ

* প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, 'উদ্বোধন' পরিবারে সুপরিচিত।

কারখানা বসালেন। এই উঠানের একপাশে। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির মতো গ্যাস তৈরি হবে। তৈরি হবে সোডা আর লেমনেড। কতকগুলি পুরনো দস্তার নল, মাটির হাঁড়ি আর খড়—এই হলো সেই কারখানার যন্ত্রপাতি। খড় জ্বালালেই ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া ঐ নল বেয়ে উঠত ওপরে। সুপারভাইজার নরেন্দ্রনাথ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গম্ভীর। দেখছেন কেরামতি। সঙ্গে সঙ্গীরা। উঃ! কী আবিষ্কার। রেলগাড়িও চলতে লাগল। সঙ্গীরা তাঁর কর্মী। আদেশ করছেন ঃ না, এ কিচ্ছু হয়নি, আরো আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা। গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে।

'নারায়ণ হরি, নারায়ণ হরি'। সদরে এক সাধু ভিখারি। বালকের কানে গেছে সেই ডাক। ছুটছেন বালক বিলে। ধর, ধর। কে আটকাবে? সাধুর ডাক শুনেছেন—'নারায়ণ হরি'। আরে ওকে আটকা, এখুনি সব দিতে শুরু করবে। হাতের কাছে যা পাবে।

সাধু বললেন ঃ একটা কাপড় দাও না বাবা।

নরেন্দ্রকে মা ভুবনেশ্বরীদেবী সেদিন পরিয়ে দিয়েছিলেন নতুন একখানি ধুতি। সেই ছোট্ট ধুতিখানি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে খুলে সাধুকে দিয়ে দিলেন। সেই ছোট্ট ধুতিতে লজ্জা নিবারণ তো হবে না। ধুতিখানি মাথায় জড়িয়ে সাধু চলে যাচ্ছেন, সদরে দাঁড়িয়ে সানন্দে দেখছেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। এখনো ২৩ বছর দূরে। শুয়ে শুয়ে ভাবতেন নরেন্দ্রনাথ—আমি রাজা হব, না আমি সন্ন্যাসী হব? ইচ্ছা করলে রাজা আমি হতে পারি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসীই হব। ঐ যে ডাক দিয়ে যায় আমার ভবিষ্যৎ, 'নারায়ণ হরি'। এই ক্ষুদ্র নরেনে তৈরি হচ্ছে জগৎকাঁপানো সেই বৃহৎ বিবেকানন্দ।

আপাতত, তুই এই ঘরে তালাবন্ধ থাক।

সেই একই লীলা—যশোদা, নন্দলালা। মাতা ভুবনেশ্বরীদেবী, পুত্র নরেন্দ্রনাথ। দুর্দান্ত বালক বন্দি থাক কিছুক্ষণ। একটু আগে দিদিরা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তাড়া খেয়ে নরেন্দ্র আঁস্তাকুড়ে গিয়ে উঠলেন। নানাভাবে মুখ ভেঙচাতে ভেঙচাতে বলতে লাগলেন ঃ ধর না, ধর না।

সেই ঘর, বন্দি বীরেশ্বর। ঘরে অনেক জিনিসপত্র। বীরেশ্বর মুচকি মুচকি হাসছেন। তাহলে কাজ শুরু করা যাক। রাস্তা দিয়ে সাধু, ভিখারি অনবরতই যাওয়া-আসা করছেন। ঘরের যাবতীয় জিনিস তাদের ডেকে ডেকে জানলা-পথে দান করতে লাগলেন। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। সব নিয়ে যাও। ঝন্‌ঝন্ শব্দে প্রতিবেশীরা চমকে উঠলেন। দত্তবাড়িতে ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বীরেশ্বর আজ রেগে গেছে। রেগে গেলে আর রক্ষা নেই। মা বলছেন ঃ অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত।

বারান্দার সেই স্থান। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের রাগের চিকিৎসা হতো। ছেলের মাথায় মা বালতি বালতি জল ঢালতেন আর জপ করতেন—'শিব, শিব'।

জলস্নাত জীবন্ত বালক শিব, জ্যোতির্ময়। ভিজে চুল কপাল বেড়েছে। তাণ্ডব শেষ করে নটরাজ প্রশমিত শিব। জলমগ্ন, ধ্যানস্থ। চারপাশে প্রবাহিত জাহ্নবীধারা। এই সেই বারান্দা, যেটি রূপান্তরিত হতো শিবভূমিতে।

ঐ ওখানে কে দাঁড়িয়ে গোয়ালের সামনে? আমাদের বীরেশ্বর। কি করছে? দেখে এস। গাভির গলায় মালা পরিয়েছে। কপালে দিয়েছে সিঁদুরের ফোঁটা। গায়ে হাত বুলিয়ে কেমন আদর করছে। দুজনে ভীষণ বন্ধুত্ব, ভীষণ ভাব-ভালবাসা।

আর ঐ ছাগল তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। ওটিও নরেন্দ্রের ক্রীড়াসঙ্গী। শুধু কি তাই, ঐ খাঁচাবন্দি বিলিতি ইঁদুর, কাকাতুয়া, পায়রা—সবই ওঁর চিড়িয়াখানার অতিথি।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আরো ওপরে একেবারে ছাদে। সেই ঘর। এই ঘরে অতীত বসে আছে। সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক হরিকে নিয়ে ধ্যানে বসেছেন নরেন্দ্র। দরজা ভিতর থেকে খিল আঁটা। সামনে মেলা থেকে কিনে আনা মাটির যুগলমূর্তি—রামসীতা।

বহুক্ষণ বালকের কোন সন্ধান নেই। কোথায় গেল বীরেশ্বর। খোঁজ খোঁজ। চারদিকে হুলস্থুল পড়ে গেল। শেষে একজনের মনে হলো, ছাদের ওপরটা একবার দেখলে হয় না। চিলেকোঠার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলিতেও খুলল না। তখন দরজা ভাঙার ব্যবস্থা হলো। ভাঙা দরজা দিয়ে ছুটে পালাল হরি। ধ্যানস্থ নরেন্দ্র। দরজা ভাঙার শব্দ, এত হইচই, তবু ধ্যান ভাঙেনি। ধীর, স্থির, মুদিত নয়ন। অবশেষে অনেকবার ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁর চৈতন্য ফেরানো হলো।

দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরকে পাগল করে দিয়েছিলেন—সমাধি, সমাধি, সমাধি। সমাধি তো সঙ্গে করেই এনেছিলেন। এই চিলেকোঠার ঘরেই একদিন ধ্যানখেলা চলছে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। নরেন্দ্র চলে গেছেন গভীর ধ্যানে। এমন সময় মেঝেতে এক গোখরো সাপ। ছেলেরা ছুটে গিয়ে বড়দের ডেকে আনল। তাঁরা এসে দেখলেন, সেই ভয়ঙ্কর অপূর্ব দৃশ্য—ধ্যানস্থ বালক শিব, সামনে ফণাবিস্তার করে আপন ভাবে দুলছে গোখরো সাপ। এই চিলেকোঠাটি সেই শিবক্ষেত্র।

বাবার গাড়ির সহিসের সঙ্গে খুব ভাব। রাত্তিরবেলা দালানের এই পাশটায় বসে দুজনের যত গল্প! বাবাকে তো

বিলে বলেই দিয়েছে, বড় হলে সে সহিস কিংবা কোচোয়ান হবে। মাথায় পাগড়ি, হাতে চাবুক, গাড়ির মাথায় উচ্চাসনে বসে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে বলিষ্ঠ, দুরন্ত ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে শহরের জানা-অজানা পথে শকট চালনা করবে। বীরেশ্বর রোজ সীতারামের পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। একদিন পুজোর শেষে আস্তাবলে গেছেন। সহিসের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। দুজনেই যেন সমবয়সী। যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে যেমন ছিলেন হাজরামশাই, বাল্যে সেইরকম এই সহিস। সহিস আজ খুব জোর দিয়ে বললেঃ বিয়ে করা বড় খারাপ।

নরেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক। সহিসের অকাট্য যুক্তি নরেন্দ্রনাথ ফেলতে পারছেন না। অবশেষে তাঁকে স্বীকার করতে হলো, বিয়ে করা খুবই খারাপ। চোখে জল নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। মা কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের দুঃখে চোখের জল? প্রথমে কিছুই বললেন না, কিন্তু চোখে আরো জল—টইটম্বুর। শেষে বললেন, রামসীতাকে পুজো করা আর সম্ভব হবে না। বিয়ে করা খুবই খারাপ, আর রামচন্দ্র সেই অপরাধে অপরাধী। অপরাধীকে আর আমি দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতে পারব না।

মা বললেনঃ ওতে আর কি হয়েছে, তুই শিবপূজা কর।

সেদিন রাতে এই বাড়ির ছাদে সেই বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ-দৃশ্য। যুগলমূর্তিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বীরেশ্বর। অনেকদিন পুজো করেছি। ধ্যান লাগিয়েছি সামনে। না, দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। কেন তুমি বিয়ে করলে শ্রীরামচন্দ্র! তবে যাও। পথের ঐ জায়গাটিতে যুগলমূর্তি ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সময় গেল, না সময় এল! সময় কোন্‌দিকে যায়? আগে না পিছে!

যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!—প্রথম পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইয়ের মুখের ওপর এই কথাই বলেছিলেন। মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতেনঃ দেখো মা, নরেন যেন বিয়ে করে না ফেলে।

শ্রীরামের প্রতি বিরূপ হলেও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো নরেন্দ্রনাথও আজীবন সীতার ভক্ত ছিলেন। পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সীতাকে দর্শন করেছিলেন। শুধু দর্শন নয়, সীতা তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে ঠাকুর প্রায়ই বলতেনঃ জনমদুখিনী সীতাকে যে প্রথমেই দেখেছে, সে কেমন করে সুখের আশা করে!

ঠাকুরদালানের দক্ষিণদিকে এই যে-ঘরটি, এই ঘরটির একটি নাম আছে—'বোধনঘর'। বিশ্বনাথ দত্তের পিতা দুর্গাপ্রসাদ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের পিতামহ বিশ-বাইশ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। বিশ্বনাথ দত্তের তখন অন্নপ্রাশন হবে। তিনি সম্ভবত ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গৃহত্যাগের পর গঙ্গাসাগর দর্শনের পথে দুর্গাপ্রসাদ একবার কলকাতায় এসে এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠেছিলেন। তাঁর ভাই কালীপ্রসাদ খবর পেয়ে দুর্গাপ্রসাদকে পালকিতে বসিয়ে প্রহরিবেষ্টিত করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। এনে এই বোধনঘরে সন্ন্যাসীকে বন্দি করে রাখলেন। দুর্গাপ্রসাদ অন্ন, জল গ্রহণ করলেন না। টানা তিনদিন জপের ওপর থাকলেন। সকলে ভয় পেলেন; যদি দেহ চলে যায়! দুর্গাপ্রসাদ মুক্তি পেয়ে সেই যে চলে গেলেন, তারপর একবারমাত্র তাঁর দর্শন পাওয়া গিয়েছিল কাশীতে। এই বোধনঘরে সজ্জিত আছে পিতামহের লক্ষ-কোটি জপ। নরেন্দ্রনাথ দেখতে হয়েছিলেন ঠিক তাঁর পিতামহের মতো। সবাই বলতেন, দুর্গাপ্রসাদ ফিরে এসেছেন।

এই এত রাতে ঐ শোওয়ার ঘর থেকে কলকল করে এত হাসি ভেসে আসছে কেন? ঐ যে ভাইবোনদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ শুতে গেছেন। রোজ রাতে ঘুমাবার আগে নরেন্দ্রকে গল্প বলতে হয়। মজার মজার গল্প। আজকের গল্পটা কি? থেকে থেকে এত হাসি!

ব্যাঙের বাড়িতে বিরাট যজ্ঞি। কিন্তু তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যাঙ-কর্তা গেছে মশাদের বাড়িতেঃ ভাই! আমাদের বাড়িতে বিরাট যজ্ঞি। খুব খাওয়া-দাওয়া, তোমাদেরও নেমন্তন্ন। তা তোমরা আমায় কিছু কড়ি ধার দাও, কিছুদিন পরেই শোধ করে দেব।

মশারা ব্যাঙ-কর্তাকে কিছু কড়ি ধার দিল। ব্যাঙের যজ্ঞ হয়ে গেল। এল শ্রাবণ মাস। শুরু হলো বর্ষা। মশারা ঝাঁক বেঁধে ব্যাঙ-কর্তার বাড়িতে এসে বলতে লাগলঃ কঁড়ি দাঁও ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই।

নরেন্দ্রের মশার গলা শুনে ভাইবোনদের কলকল হাসি।

ব্যাঙ তখন খেয়েদেয়ে কেঁদো মোটা। বর্ষার জলে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে আরামসে বসে আছে। মশারা সেখানে যেতে পারে না। তাই অনেকটা ওপর থেকে বলছেঃ কঁড়ি দাঁও ভাঁই। ব্যাঙ-কর্তা পেটটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলতে লাগলঃ কে কার কড়ি ধারে, কে কার কড়ি ধারে!

নরেন্দ্রের এবার ব্যাঙের গলা। আবার কলকল হাসি।

মশারা হতভম্ব। এ বলে কি? তারা গাছের ডালে ডালে বসে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে এল একটা সাপ। কপ্‌। ব্যাঙটাকে গিলছে। একটু একটু করে। ব্যাঙটার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার পরিত্রাহি চিৎকারঃ কড়ি নাও, কড়ি নাও। মশারা গাছে বসে শুনছে, আর বলছেঃ এঁখন সাঁপের পেঁটে যাঁও। এঁখন সাঁপের পেঁটে যাঁও।

শিশুদের হাসির কলরোল। তারপর ঘুম এল। শান্তির ঘুম। নীল স্বপ্ন। ৩ নম্বর বাড়ির সারাদিনের কলকোলাহল

স্তব্ধ। নিভে গেছে সব আলো। নরেন্দ্র চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ভ্রূর মাঝখানে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে সেই জ্যোতির্ময় ত্রিভুজ! নরেন্দ্রনাথ ভাবতেন, সকলেরই বুঝি এইরকম হয় ঘুমাবার সময়। দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ প্রথম গেছেন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। পশ্চিমের দরজা দিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন। দুটি গান শোনালেন ঠাকুরকে। ঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেনঃ তুই কি ঘুমোবার আগে একটা জ্যোতি দেখিস? নরেন্দ্র উত্তর দিলেনঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর বললেনঃ বাঃ, সব মিলে যাচ্ছে! এ ধ্যানসিদ্ধ —জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণনা করেছেনঃ আজীবন ঘুমব বলে চোখ বুজলেই ভ্রূর মাঝখানে অপূর্ব এক জ্যোতির্বিন্দু দেখতে পেতুম। এক মনে সেই অপূর্ব বিন্দুর নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকতুম। দেখবার সুবিধের জন্য লোকে যেভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আমি সেইভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতাম। ঐ অপূর্ব বিন্দুতে চলত নানা রঙের খেলা। বিন্দুটি ক্রমশ বড় হতে হতে একসময় ফেটে যেত। সারা শরীর ঢেকে যেত সাদা তরল জ্যোতিতে। আর তখনি আমার চেতনা লুপ্ত হতো।

নরেন্দ্রনাথ প্রণামের ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে আছেন। ভাইবোনেরা গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ৩ নম্বর বাড়িটি রাতের চাদরের তলায় নিস্তব্ধ। নিচের অফিসঘর অন্ধকার। অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত বিশ্রাম করছেন। সার সার আইনের বই। ধারার পর ধারা। জল নেই এক ফোঁটা! বিরাট টেবিলে সাদা দলিল-দস্তাবেজ। মামলার আর্তনাদ। আর বিলিতি দোয়াত। হার্ডমুথ কোম্পানির কলম।

দাতা বিশ্বনাথের পেনসনে পালিত একদল নিষ্কর্মা পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে! কেউ আছে গাঁজায়, কেউ আফিমে, কেউ চরসে। হেদোর ধারেই গুলির আড্ডা।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপালবাবুর জিমন্যাস্টিকের আখড়ায় বারবেল, ডাম্বেল বিশ্রাম করছে। প্যারালাল বার ঘামছে না। একজোড়া রিং দুলছে না। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়ার উৎসাহী সভ্য। লাঠিখেলা, ফেনসিং, রোয়িং, সুইমিং, কুস্তি—সবেতেই তিনি পারদর্শী।

সেই রুপোর প্রজাপতিটা কোথায় গেল। কোন্ দেওয়ালে আটকেছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম হওয়ার পুরস্কার। বাড়ির উঠানে ব্যায়ামের আখড়া করেছিলেন। বন্ধুদের নিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চার ব্যবস্থা। বেশ ভালই চলছিল। একদিন ব্যায়াম করতে গিয়ে খুড়তুতো ভাইয়ের হাত ভাঙল। কাকার আদেশে আখড়া উঠে গেল।

সখের থিয়েটার দল করেছিলেন। স্টেজ বেঁধে কয়েকবার অভিনয়ও হলো। আরেক কাকার আপত্তিতে থিয়েটার বন্ধ হলো। স্টেজ খুলে ফেলা হলো। থিয়েটারের পরিবর্তেই ব্যায়ামের আখড়া হয়েছিল।

নবগোপালবাবুর আখড়া ছাড়াও কয়েকজন মুসলমান ওস্তাদের কাছে লাঠিখেলার বিশেষ তালিম নিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। বয়স মাত্র দশ। মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্র। একটি মেলা উপলক্ষ্যে জিমন্যাস্টিকের আয়োজন করা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ দর্শক। সবশেষে লাঠিখেলা হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর সব যেন কেমন ঝিম মেরে গেল! তখন নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেন। সবচেয়ে বলবান এক যুবক সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে এলেন। শুরু হলো প্রবল লড়াই। দর্শকদের সকলেই অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন, এই অসম লড়াইয়ের ফলাফল কি হতে পারে। তবু বালক নরেন্দ্রনাথের কৌশল আর সাহস দেখে ক্ষণে ক্ষণে হাততালি। একসময় পাঁয়তাড়া কষতে কষতে হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ সুকৌশলে ও সশব্দে প্রতিপক্ষকে এমন এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন যে, তাঁর হাতের লাঠি দুটুকরো হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ জিতলেন। সিমুলিয়ার দুর্দান্ত সাহসী, একরোখা, একগুঁয়ে ছেলেটি একটি আবির্ভাব। বুঝেছিলেন সকলে।

বাবা একটি টাট্টুঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। বালক নরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়া রপ্ত করলেন। কোনকিছু শিখতে তাঁর বেশিদিন সময় লাগত না। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ৩ নম্বর বাড়ি থেকে রোজ সকালে আর বিকেলে একটি টাট্টুঘোড়া নিষ্ক্রান্ত হতো। আরোহী এক রাজপুত্র। টগবগিয়ে ছুটত ঘোড়া কলকাতার পথে পথে।

বাড়িতে আজ কিসের উৎসব! একের পর এক ঘোড়ার গাড়ি আসছে। বিশিষ্ট পোশাকে বিশিষ্ট চেহারার ভদ্রলোকরা আসছেন! সঙ্গীতপ্রেমী বিশ্বনাথবাবুর গানের আসর। জলসা। বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণীরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। সঙ্গীত-শেষে দত্তমশাই প্রত্যেককে পরিতুষ্ট করবেন মোগলাই খানায়, পোলাও, মাংস ইত্যাদিতে। নিজেই রাঁধবেন। পুত্র নরেন্দ্র সহকারী। পিতা বিশ্বনাথ সপরিবারে দেড়বছর রায়পুরে ছিলেন। দত্তমশাই সেই সময় পুত্রকে রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন। শিখিয়েছিলেন দাবাখেলা।

দত্তপরিবারের উৎস সন্ধানে অবশ্যই আমাদের দূর অতীতে যেতে হবে। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পাদে। বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন কায়েম হয়েছে। বর্ধমানের কালনা সাবডিভিশনের একটি গ্রাম, দত্ত-দারিয়াটোনা। চলতি নাম 'ডেরেটোনা'। ডেরেটোনার জমিদার রামনিধি দত্ত, তাঁর পুত্র

রামজীবন ও পৌত্র রামসুন্দর দত্তের সঙ্গে ইংরেজ আমলের একেবারে প্রথম ভাগে গড়-গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করলেন। গোবিন্দপুর ছাড়তে হলো। ইংরেজদের কেল্লা হবে সেখানে। দত্তপরিবার চলে এলেন কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। মধু রায়ের গলিতে তৈরি হলো নতুন বাড়ি।

সে তো অনেককাল আগের কথা, ১৬০০ শেষ হয়ে ১৭০০ শুরু হচ্ছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জব চার্ণক হুগলি নদীর পূর্বকূলে তিনটি গ্রাম ইজারা নিলেন। কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর। ঐসময় মুঘল ভারতে বাংলার সুবেদার ছিলেন মান সিং। রামনিধি আর রামজীবন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামসুন্দর ছিলেন এক জমিদারের দেওয়ান।

রামসুন্দরের বড় ছেলের নাম রামমোহন দত্ত। ভাল ফারসি জানতেন। সুপ্রিম কোর্টের জনৈক ইংরেজ অ্যাটর্ণির অফিসে ম্যানেজিং ক্লার্কের কাজ করতেন। প্রচুর উপার্জন। ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের এই বাড়িটি তাঁর নির্মাণ। দেড় বিঘা জমি। দক্ষিণমুখে নেপালশালে তৈরি বিশাল প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী 'পাঁচফুকুরী' অর্থাৎ ঘষা গোল ইঁটের থামের ওপর পাঁচটি খিলানযুক্ত ঠাকুরদালান। ঠাকুরদালানের দোতলায় দক্ষিণদিকে বড় বড় হলঘর। উত্তরদিকের ঘরটিকে বলা হতো 'বড় বৈঠকখানা' আর দক্ষিণের ঘরটি 'ঠাকুরঘর'। বাইরের উঠানের পশ্চিমে চকমেলানো দালান আর গোয়ালঘর। অন্দরমহলের দুদিকে দুটি প্রাঙ্গণ আর পিছনদিকে 'কানাচ' বা অন্দরমহলের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পুকুর। ৩ নম্বর বাড়ির বাইরে ২ নম্বরে রামমোহন দত্তের 'অশ্বশালা'। জমির পরিমাণ চার কাঠা। বৈঠকখানা ঘরে সেকালের প্রথানুসারে দেওয়ালগিরি, বেল লণ্ঠন, হাঁড়ির লণ্ঠন সাজানো। দেওয়ালে ঝোলানো ভাল ভাল ছবি।

অন্ধকার রাত নামত যখন বাইরে, তখন অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় গা ছমছমে পরিবেশ। মাঝে মাঝে লণ্ঠনধারী পথিক দু-একজন। 'চিত্তেশ্বরী' মন্দির থেকে একটি রাস্তা গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাত্রিপথরূপে এগিয়ে গেছে কালীঘাটে। সাহেবরা এই পথটিকে বলত 'Pilgrim's Track'। এই রাস্তাই পরবর্তী কালের চিৎপুর রোড। বেণ্টিক স্ট্রিটের পরেই ছিল একটি খাল, 'গোবিন্দপুর-ক্রিক'। পথ খাল পেরিয়ে প্রবেশ করল চৌরঙ্গির জঙ্গলে। ভবানীপুর ভেদ করে কালীঘাটে। চিত্তেশ্বরীতে অমাবস্যার রাতে চিতে ডাকাত নরবলি দিত। এদিকে বিশে ডাকাত, ভবানীপুরের বিখ্যাত ডাকাত রসা পাগল।

পলাশির যুদ্ধের পর থেকে চেহারা পালটাতে লাগল। ইংরেজ আর বণিক নয়—শাসক। কলকাতার সাহেবরা তখন একটি জ্বরকে যমের মতো ভয় পেত। যমই বটে। ধরলে অবধারিত মৃত্যু। তারা এই জ্বরের নাম রেখেছিল 'পাক্কা জ্বর'। লর্ড ক্লাইভের সুযোগ্য সহযোগী অ্যাডমিরাল ওয়াটসন এই জ্বরে অকালে চলে গেল।

স্যাঁতসেঁতে জমি, যত্রতত্র জঙ্গল আর কলাঝোপ। 'বোর্ড'-এর নির্দেশ হলো—কলকাতাকে কলাগাছ ও জঙ্গলশূন্য করতে হবে। তা না করলে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। সার্ভেয়ার সাহেবকে আদেশ করা যাচ্ছে—মহারাষ্ট্র-খাতের সীমার মধ্যে জঙ্গলময় সমস্ত স্থান তিনি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করবেন।

এই হুকুমের একশো বছর পর নরেন্দ্রনাথ এলেন। তখনো সিমুলিয়ার আশপাশে কলাঝোপ।

সেই ঝোপটি ঠিক কোন্ জায়গায় ছিল? বীরেশ্বর বিবাহ করার অপরাধে রামসীতাকে পরিত্যাগ করলেও মহাবীর হনুমানের অনুরাগী। হৃদয়ে মহাবীরের আদর্শ জ্বলজ্বল করছে। একবার যদি তাঁর দেখা পাই! বীরেশ্বর শুনেছিলেন, যেখানে রামায়ণ পাঠ হয় সেখানে মহাবীর হাজির থাকেন। কোথাও রামায়ণ গান হবে জানতে পারলেই বীরেশ্বর ছুটে যেতেন। একদিন এইরকমই এক আসরে গেছেন। কথকঠাকুর যখন বললেনঃ হনুমান কদলীবনে থাকেন, তখন বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়? কথকঠাকুর একটু ঠাট্টা করলেনঃ হ্যাঁগো, গিয়েই দেখ না।

বালকের বিশ্বাস! বাড়ির কাছেই কলাগাছের ঝোপ। ভয়-ডর নেই। ফণাতোলা গোখরোর সামনে ধ্যানে স্থির। ঢুকে গেলেন কলাঝোপে। মশার কামড়। বসে আছেন মহাবীরের অপেক্ষায়। রাত বাড়ছে। ঝিমঝিম রাত। ঘণ্টা পার। মহাবীর কোথায়! হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ছলছল চোখে বড়দের জানালেন, মহাবীর তো এলেন না। তাঁরা প্রবোধ দিলেনঃ ওরে বিলে, বোধহয় আজ প্রভুর কাজে হনুমান অন্য কোথাও গেছেন, তাই তাঁর দেখা পাসনি।

এই সেই দেওয়াল। এই দেওয়ালেই ছিল সেই বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না। পিতার অমিতব্যয়িতায় ক্ষুব্ধ যুবক নরেন্দ্রনাথ একদিন স্পষ্ট করে বললেনঃ আপনি আর আমার জন্য কী করেছেন?

ধীর-স্থির পিতা বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পুত্রকে বললেনঃ যা আরশিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখ গে, তাহলেই বুঝবি।

এই সেই ঘর, নরেন্দ্রনাথ পিতার সমালোচনা করে বলেছিলেনঃ তোমার নির্বিচার দানে কিছু নেশাখোর পালিত

হচ্ছে, তা কি তুমি বোঝ! তখন বিশ্বনাথ দত্ত যা বলেছিলেন, তার থেকেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনমন্ত্র। তিনি বলেছিলেনঃ জীবনটা যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চোখে দেখবি।

স্বামীজীর বাড়ি, আগে যেমন ছিল

এই সেই ঘর। সেই রাত, গভীর। ধ্যান শেষ। ভাসছেন আনন্দে। হঠাৎ দিব্যজ্যোতিতে ঘর ভরে গেল। এক অপূর্ব সন্ন্যাসী দক্ষিণের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন। সৌম্য, সুন্দর, জ্যোতির্ময়। গেরুয়া বসন, হাতে কমণ্ডলু। সেই আবির্ভাব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন নরেন্দ্রনাথের দিকে। নরেন্দ্রনাথ ভয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে এলেন। পরমুহূর্তেই ফিরে গেলেন ঘরে। সন্ন্যাসী কি বলতে চাইছেন? ঘর শূন্য। নরেন্দ্রনাথের কাছে সে-রাতে এসেছিলেন তাঁর ধ্যানের দেবতা—গৌতম বুদ্ধ। ঐ ঘরে।

এই সেই বাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তিনবার এসেছিলেন এই বাড়ির দুয়ারে। মিষ্টি কণ্ঠের মধুর ডাকঃ নরেন আছিস! বেরিয়ে আয়, জগৎ যে তোকে ডাকছে। ঘরে বাইরে শিক্ষা দিতে হবে যে! মা যে তোকে এই লীলাভূমি থেকে একেবারে বের করে দেবেন, ও আমার রাজা। মা যে তোকে তাঁর কাজ করবার জন্য সংসারে টেনে এনেছেন। আমার পিছনে তোকে ফিরতেই হবে। তুই যাবি কোথায়!

১৮৮৬ শেষ হয়ে এল। শেষবারের মতো একবার তাকালেন মামলা-মকদ্দমায় দীর্ণ, শরিকী সঙ্কীর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত ভিটেটির দিকে। সিমুলিয়ার উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হলো সেই জ্যোতিষ্ক—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে চিনেছিলেন—সপ্তঋষির এক ঋষি। নিবেদিতা বললেনঃ "He became India."

২০০৫। শরৎ। রাত গভীর। কর্কশ কলকাতার কোলাহল বুঝি ঘুমাল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট। সেই ৩ নম্বর।

কে আপনি, সন্ন্যাসী?

নরেন্দ্র।

নো এনট্রি।

আমি স্বামী বিবেকানন্দ।

আসুন, আসুন।

এ কি? এ যে প্রাসাদ!

ঠাকুর যে বলেছিলেনঃ নরেন রাজার প্রাসাদ তৈরি কর—জ্ঞান, ভক্তির মশলায় কর্মের ইঁট দিয়ে। আমরা সবাই বসব। শুরু হবে নতুন শতাব্দীর নবযাত্রা। ■
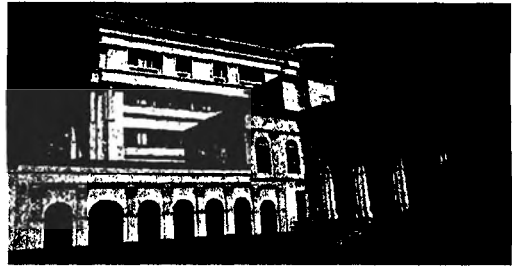
স্বামীজীর বাড়ির বর্তমান রূপ

অনুষ্ঠান-সূচিঃ কার্ত্তিক ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	স্বামী সুবোধানন্দ কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী ২৭ কার্ত্তিক, রবিবার (১৩ নভেম্বর ২০০৫) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দশী ২৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর ২০০৫)
পূজাতিথি-কৃত্য	ঃ	শ্রীশ্রীকালীপূজা দীপান্বিতা অমাবস্যা ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার (১ নভেম্বর ২০০৫) শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা কার্ত্তিক শুক্লা নবমী ২৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর ২০০৫)
একাদশী-তিথি	ঃ	১১, ২৬ কার্ত্তিক শুক্রবার, শনিবার (২৮ অক্টোবর, ১২ নভেম্বর ২০০৫)

কামারপুকুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চতুর্স্ত্রিংশতম পর্যায়।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে কামারপুকুরের স্মৃতি বড় বিচিত্র! একদিকে স্বামীর ঘর—তাঁর জীবনের কৈশোর ও যৌবনের সাক্ষী। সেই কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমায়ের স্থায়ী বসবাস আমরা দেখতে পাই না কেন? পাঠকের এ কৌতূহল স্বাভাবিক। পরবর্তী কালে বহু ভক্ত এপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারেননি। তিনি মোটামুটি একটা উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। ঠাকুর দেহান্তের আগে কোন এক সময় শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন ঃ "তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাক-ভাত খাবে, আর হরিনাম করবে।" পরবর্তী কালে ভক্তদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি কেবল ঠাকুরের একটি কথাই রাখতে পারিনি।" একটি কথা হলো—কামারপুকুরে অবস্থান। শ্রীশ্রীমায়ের ঐ উক্তি বস্তুত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতার পরিচায়ক। ঠাকুরের কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, যদিও তার জন্য তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ ১২৬৬) ঠাকুরের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কামারপুকুরে শ্বশুরালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পদার্পণ ঘটে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশ দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম, তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। (কামারপুকুরের জমিদার) ধর্মদাস লাহা এসে বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।' (জ্ঞাতিভাই) সূয্যির বাপ (ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়) কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন।"[১] বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশে শ্রীশ্রীমায়ের কমপক্ষে তেইশবার গমনাগমনের সময় চিহ্নিত করা যায়। সংশ্লিষ্ট সময়ে তাঁর অবস্থান দীর্ঘ না হলেও শ্বশুরালয়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণে তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রম পূর্ণ পরিব্যক্ত। বিবাহকালে ঠাকুর কামারপুকুরে প্রায় দুই বৎসরাধিককাল অবস্থান করেন। বিবাহের ১ বছর ৮ মাস পরে তিনি শ্বশুরগৃহে (জয়রামবাটী) যান। সেই যাত্রায় ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে আসেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। সেটি তাঁর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে আগমন। "তেরো বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে একবার কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। তখন তিনি সেখানে এক মাস থাকেন। ঐসময়ে ঠাকুর ও তাঁহার মাতা দক্ষিণেশ্বরে এবং মায়ের ভাসুর, জা প্রভৃতি কামারপুকুরে ছিলেন।"[২] এটি মায়ের তৃতীয়বার শ্বশুরালয়ে আগমন। সেটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এই কালে শিবরাম ভূমিষ্ঠ হন। খুব সম্ভবত নবজাতককে দর্শনের উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন ঘটে থাকবে। "ইহার পাঁচ-ছয় মাস পরে মা পুনরায় শ্বশুরবাড়ি আসিয়া দেড় মাস থাকেন। এই সময়েও ঠাকুর ও তাঁহার মাতা দক্ষিণেশ্বরে।"[৩] এটি মায়ের চতুর্থবার আগমন (মে ১৮৬৭)। তাঁর পঞ্চমবার আগমন ঘটে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়-সহ দেশে হাজির হলে (নভেম্বর ১৮৬৭)। সেই যাত্রায় মা কামারপুকুরে সাত মাস ছিলেন।[৪] অতঃপর শ্রীশ্রীমায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তমবার শ্বশুরালয়ে অবস্থানকাল হিসাবে ১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দকে (জুলাই মাস) চিহ্নিত করা যায়। "সাধনকালের অবসান হইতে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর চাতুর্মাস্যের সময় যখন দেশে যাইতেন, তখন শ্রীমাও সম্ভবত সঙ্গে থাকিতেন।"[৫] ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য উল্লেখ করেছেনঃ "ঠাকুর ১২৮৩ থেকে ১২৮৫ সাল (১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পর পর তিন বৎসর দেশে গমনাগমন করেন।" ঠাকুর বর্ষাকালে ঘাটাল হয়ে স্টিমার ও নৌকায় চড়ে দেশে যেতেন। এরকম এক যাত্রায় ঠাকুর ও মা বালি-দেওয়ানগঞ্জের এক মোদকগৃহে ত্রিরাত্রি বাস করেন।[৬] নৌকায় বালি হয়ে দেশে যাওয়ার কথা মাস্টার মহাশয়ের

** উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।*

দিনলিপিতেও উল্লেখ আছেঃ "নৌকায় করে বালি হয়ে একসঙ্গে দেশে যাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া, আর কত গান গাইলেন। আহা, সে কী ভাব! আবার বলিলেন, 'আমি জানি তুমি কে, কিন্তু তা এখন বলব না।' " এসকল ঘটনায় বোঝা যায় যে, ঠাকুর ঘাটালের পথে কমপক্ষে দুবার (১৮৭৭ এবং ১৮৭৮) গমনাগমন করেছেন। শ্রীশ্রীমা ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঘাটাল পথে দেশে আগমনে ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুরালয়ে অষ্টমবার উপস্থিতি ঘটে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে, যখন ঠাকুর সেখানে আট মাস (৩ মার্চ ১৮৮০ থেকে ১০ অক্টোবর ১৮৮০) ছিলেন এবং কীর্তনানন্দে শিহড়, শ্যামবাজার ও কয়াপাটের লোকেদের মোহিত করেছিলেন। সেই যাত্রায় মা কামারপুকুরে সাত মাস ছিলেন।[৭]

অতঃপর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সপ্তাহ খানেক কামারপুকুরে তাঁর অবস্থান ঘটে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ উপলক্ষ্যে। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি সেখান থেকে ব্যবস্থা করে মাকে কামারপুকুরে পাঠিয়েছিলেন।[৮] তারপর ঠাকুরের গলরোগ ও মহাপ্রয়াণ।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের (১৮৮৬) পর শ্রীশ্রীমা তীর্থদর্শনে বের হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে ১৮৮৭ সেপ্টেম্বর থেকে কামারপুকুরে অবস্থান করতে থাকেন। এই যাত্রায় তিনি প্রায় নয় মাস ছিলেন।[৯] এটি তাঁর দশমবার অবস্থান।

এরপর শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে কলকাতা যান। সেখান থেকে ফিরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তিনি পুনরায় কামারপুকুরে বসবাস করতে থাকেন। এটি তাঁর একাদশতম অবস্থান। এবারও প্রায় বছর খানেক তিনি শ্বশুরগৃহে অবস্থান করেন।[১০] এটি তাঁর একাদশতম অবস্থান।

মাস্টার মহাশয়ের দিনপঞ্জি থেকে ১৮৯০ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাস পর্যন্ত আরো দশবার তাঁর কামারপুকুর আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। ফলে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গমনাগমন সংখ্যা হয় একুশবার।[১১] এই কালপর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কামারপুকুর আগমন ঘটে গ্রীষ্মকাল,

শ্রীশ্রীমায়ের কামারপুকুরে অবস্থানের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	সময়	স্থায়িত্বকাল			উপলক্ষ্য
		বছর	মাস	দিন	
	■ ঠাকুরের লীলাকালেঃ				
১।	মে ১৮৫৯ থেকে মে ১৮৫৯	০০	০০	০৭	ঐ বিবাহ
২।	ডিসেম্বর ১৮৬০ থেকে জানুয়ারি ১৮৬০	০	০১	০	রামলালের জন্ম
৩।	মে ১৮৬৬ থেকে জুন ১৮৬৬	০০	০১	০	ঐ শিবরামের জন্ম
৪।	ডিসেম্বর ১৮৬৬ থেকে জানুয়ারি ১৮৬৭	০	০১	১৫	নবজাতক শিবরামের অসুস্থতা
৫।	মে ১৮৬৭ থেকে নভেম্বর ১৮৬৭	০০	০৭	০০	ঠাকুর সহ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন
৬।	জুলাই ১৮৭৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৭৭	০০	০৩	০০	বর্ষাকালে পেটের অসুখ সারানোর জন্য ঠাকুরের আগমন
৭।	আগস্ট ১৮৭৮ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৭৮	০০	০২	০০	ঐ
৮।	মার্চ ১৮৮০ থেকে অক্টোবর ১৮৮০	০০	০৭	০০	পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে কীর্তনানন্দে যোগদান
৯।	জুলাই ১৮৮৪ থেকে জুলাই ১৮৮৪	০০	০০	০৭	রামলালের বিবাহ
	■ ঠাকুরের লীলাবসানের পরঃ				
১০।	সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ থেকে জুন ১৮৮৮	০০	০৯	০০	বৃন্দাবন থেকে ফিরে ঠাকুরের নির্দেশ রক্ষার্থে
১১।	ফেব্রুয়ারি ১৮৮৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯০	০১	০০	০০	কলকাতা থেকে ফিরে ঠাকুরের নির্দেশ রক্ষার্থে
১২।	অক্টোবর ১৮৯০ থেকে অক্টোবর ১৮৯০	০০	০০	০৭	দুর্গাপূজোপলক্ষ্যে
১৩।	ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯১	০০	০০	০৭	ঠাকুরের ঘর মেরামত করাতে
১৪।	জুলাই ১৮৯১ থেকে অক্টোবর ১৮৯১	০০	০৩	০০	মনসাপূজা ও দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে
১৫।	জুলাই ১৮৯২ থেকে জুলাই ১৮৯২	০০	০০	০৭	মনসাপূজা (দশহরা) উপলক্ষ্যে
১৬।	জানুয়ারি ১৮৯৩ থেকে জানুয়ারি ১৮৯৩	০০	০০	০৭	ঠাকুরের ঘর মেরামতির কাজে
১৭।	জুলাই ১৮৯৩ থেকে জুলাই ১৮৯৩	০০	০০	০৭	মনসাপূজা (দশহরা) উপলক্ষ্যে
১৮।	মে ১৮৯৫ থেকে মে ১৮৯৫	০০	০০	০৭	রঘুবীরের বৈকালিকের ব্যবস্থা করতে
১৯।	নভেম্বর ১৮৯৫ থেকে জানুয়ারি ১৮৯৬	০০	০২	০০	ঠাকুরের ঘর মেরামত করাতে
২০।	মে ১৮৯৭ থেকে মে ১৮৯৭	০০	০০	০৩	রঘুবীরের বৈকালিকের ব্যবস্থা করতে
২১।	সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭	০০	০০	০৭	দুর্গাপূজোপলক্ষ্যে
২২।	মার্চ ১৯০৯ থেকে মার্চ ১৯০৯	০০	০০	০৩	যোগবিনোদের উদ্যোগে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনকল্পে
২৩।	মে ১৯১৩ থেকে মে ১৯১৩	০০	০০	০৭	রঘুবীরের বৈকালিকের ব্যবস্থা করতে
২৪।	মার্চ ১৯১৬ থেকে মার্চ ১৯১৬	০	০০	০৩	ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করতে

বর্ষাকাল ও শীতকালে। শিবরামের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে অনুমিত হয়, শ্রীশ্রীমা গ্রীষ্মকালে রঘুবীরের বৈকালিক দেওয়ার উদ্দেশ্যে, বর্ষাকালে দশহারা ও মনসার পুজোপলক্ষ্যে এবং শীতকালে ঠাকুরের ঘর মেরামতির জন্য আসতেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে যোগোদ্যানের স্বামী যোগবিনোদের উদ্যোগে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আয়োজন ঘটলে শ্রীশ্রীমায়েরও সেখানে সপ্তাহকাল অবস্থান ঘটে। সেটি হয় বাইশতম অবস্থান।[১২]

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে জনৈক ভক্ত উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে (মে মাসে) কামারপুকুর দর্শনে হাজির হলে সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পান।[১৩]

শিবুদাদার অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় দেখা যায়, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ভোগ দিতে কামারপুকুর এসে ত্রিরাত্রি বসবাস করে গেছেন।[১৪]
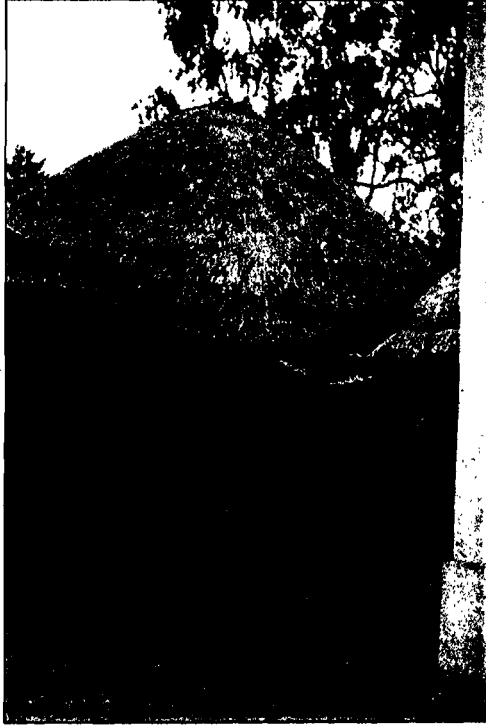
কামারপুকুরে ঠাকুর এবং মায়ের ব্যবহৃত ঘর

আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

সময় ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় শ্রীশ্রীমাকে কামারপুকুরে নয়বার অবস্থান করতে দেখা যায়। তার মধ্যে চারবার (ডিসেম্বর ১৮৬০, মে ১৮৬৬, ডিসেম্বর ১৮৬৬ এবং জুলাই ১৮৮৪) তিনি শ্বশুরালয়ের অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে অবস্থান করেছেন; ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছেন। তাঁর এই অবস্থানগুলি অবশ্যই বেশিদিনের জন্য ছিল না। এইকালে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে রামেশ্বরের স্ত্রী শাকম্ভরী দেবী এবং তাঁদের পুত্রকন্যাগণ (রামলাল, শিবরাম ও লক্ষ্মী দেবী) অবস্থান করতেন। এই সময়কালের অভিজ্ঞতা শ্রীশ্রীমা নিজ মুখে ব্যক্ত করেছেন : "তেরো বছর বয়সে যখন কামারপুকুরে যাই, হালদারপুকুরে নাইতে যেতে ভয় হতো। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে ভাবছি, নতুন বৌ, কি করে একলা লোকদের সুমুখ দিয়ে যাব আসব। এমন সময় দেখি কি, আটটি মেয়ে এল—আমার সমবয়সী। আমি তখন রাস্তায় নামতেই তারা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। বললে, 'নাইতে যাবে? চল, আমরা তোমায় ঘিরে নিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমরা কে গা'? তারা বললে, 'তুমি নতুন বউ কিনা—আমরা তোমার বন্ধু, তোমার এই কাছেই থাকি।' আমি বুঝলুম পাড়ার মেয়েরা হবে। তারা আমায় নিয়ে চলল—চারটি মেয়ে আমার আগে, আর চারটি পিছনে। আমি স্নান করলুম, তারাও করলে। তারপর আবার ঐরকম করে আমাকে নিয়ে ফিরে এল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমরা রোজ তোমায় খুঁজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার রেখে যাব। তুমি বন্ধু কিনা।' এরপর রোজ তারা আমায় নিয়ে যেত, আবার রেখে যেত। অনেকদিন ভেবেছি, মেয়েগুলি কারা, আমার স্নানের সময় রোজই আসে! কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না।"[১৫]

"শ্বশুরবাড়ি বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর (রামেশ্বর) রাত্রে আমায় শুতে যেতে বলতেন, আর উনি কেবল হাসতেন। সেইসময় একসঙ্গে শুতুম, আর সারা রাত গল্পেই কেটে যেত। বলতেন, কেমন করে সংসারের কাজ করতে হয়, কেমন করে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আর জানতে হয়, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার ও নিত্য-বস্তু।... 'ঠাকুর যখন কথা কইতেন—বলছেন তো বলছেন —কথা আর ফুরুতে চাইত না। আমি শুনতে শুনতে মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম। অন্য মেয়েরা আমাকে ঠেলে তুলতে যেত, বলত, 'এমন সব কথা শুনলেনি, ঘুমিয়ে পড়লে।' ঠাকুর তাদের বারণ করতেন। বলতেন, 'ওকে তুলোনি, ও যদি সব শোনে তো ও থাকবেনি, চোঁচা দৌড় মারবে'।"[১৬]

"ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি তখন ছেলেমানুষ বৌটি গো। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, 'কাল এই এই

রান্না করো গো।' আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচফোড়ন ছিল না, দিদি (রামেশ্বরের স্ত্রী) বললে, তা অমনিই হোক, নেই তার আর কি হবে।' ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন, 'সেকি গো, পাঁচফোড়ন নেই তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে।"[১৭]

"সেই বামুন ঠাকরুণও (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) তখন ওখানে (কামারপুকুরে) ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে মা বলতেন। আমিও তাঁকে শাশুড়ির মতো দেখতুম ও ভয় করতুম। তিনি বড় ঝাল খেতেন। নিজে রান্না করতেন—ঝালে পোড়া। আমাকে খেতে দিতেন, চোখ মুছতুম আর খেতুম। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে বলতুম, 'বেশ হয়েছে।' রামলালের মা বলত, 'হ্যাঁ, যে ঝাল হয়েছে।' আমি দেখতুম তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, 'বৌমা তো বলেছে ভাল হয়েছে। তোমার বাপু কিছুতে ভাল হয় না। তোমাকে আর বেন্নুন দেব না।' "[১৮]

বস্তুত, শ্রীশ্রীমায়ের কামারপুকুর অবস্থানে ঠাকুর তাঁর ভাবী জীবনের প্রস্তুতির খসড়া গড়ে দিয়ে গেছেন। সময় দীর্ঘ না হলেও এক বিস্ময়কর দৈব সাহচর্যে ঠাকুর ও মায়ের কামারপুকুরে অবস্থান ছিল বড়ই মধুর। সেখানে যেমন ছিল নৈষ্ঠিক শিক্ষার বিচিত্র আয়োজন, তেমনি ছিল রঙ্গরসের মধুর স্রোত। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ঠাকুরের বিচিত্র শিক্ষার ধারা ধীরে ধীরে মায়ের ওপর প্রবাহিত হয়েছে। "তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী কিশোরীর হৃদয় ভালবাসার দ্বারা জয় করিয়া তিনি উহাতে আপন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন স্বীয় ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ শ্রীমায়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন এবং উচ্চ ধর্মজীবনলাভের জন্য কিরূপে চরিত্রগঠন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিলেন, অপরদিকে তেমনি দৈনন্দিন গৃহস্থালি কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে থাকিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন—এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া লোকব্যবহার, পরিবারে প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার সহিত আদান-প্রদান, নৌকায় বা গাড়িতে যাইবার সময় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা, এমনকি প্রদীপের পলতেটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, ইত্যাদি কিছুই সে অপূর্ব শিক্ষা হইতে বাদ পড়িল না।"[১৯]

রঙ্গরসেও ঠাকুর কম ছিলেন না। সংসারজীবনে নারী-হৃদয়ে যে বাৎসল্যধারা চিরজাগরুক—তাকে ত্যাগব্রতে মহিমান্বিত করায় কেবল উপদেশাবলিই যে যথেষ্ট নয়, ঠাকুরের মায়ের প্রতি আচরণ ও কথোপকথনে সেই শিক্ষাধারা আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে। "ঠাকুর সদা সর্বদা মাকে সংসারের অনিত্যতা, দুঃখ-কষ্টের কথা বলে বুঝাতেন, 'বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিই সার।' বলতেন, 'শেয়াল কুকুরের মতো কতকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা বিইয়ে কি হবে?' মায়ের মার অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছিল—কয়েকটি মারাও গিয়েছিল। মা তাঁর সেই ছোট ছোট ভাইবোনদের কোলে কাঁখে করেছেন, তাদের মৃত্যুতে তাঁর মা-বাপের শোক-কষ্টও দেখেছেন, শোকতাপ করেছেন—সেইসকল উল্লেখ করে ঠাকুর বলতেন, 'তোমারও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে। দেখেছ তো কত দুঃখ-কষ্ট! হাঙ্গামের দরকার কি? ওসব না হলে আছ ঠাকরুনটি, থাকবেও ঠাকরুনটি।' মা-ঠাকরুন সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কামারপুকুরের সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতেন। একদিন সকালবেলা মা বাড়ির ভিতরে ন্যাতা দিচ্ছেন (গোবর-মাটি দিয়ে লেপছেন), ঠাকুর বাইরে দাঁতন করছেন, আর নানারূপ রঙ্গরসের কথা বলে সকলকে হাসাচ্ছেন। মা-ঠাকরুনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ছেলের অন্নপ্রাশনে যে-কোমরে গোট পরে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভুঁইয়ে আছড়ে কাঁদতে হবে।' লজ্জাশীলা মা নীরবে সব শুনছিলেন। ঠাকুর বারংবার ছেলের মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেষে আস্তে আস্তে বললেন, 'সবগুলোই কি আর মরে যাবে?' মার কথা বের হতে না হতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে! ওমা; আমি বলি, সাদাসিদে ভালমানুষ, কিছু জানে না—পেটের ভেতর সব আছে! বলে কিনা, সবগুলো কি আর মরে যাবে?' মা ছুটে পালিয়ে গেলেন।"[২০]

"কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি।' আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হলো রামদাস বদ্যি আর আমি হলুম ছিনাথ সেন—হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে। তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সবসময় পাবে—গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হয়। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সবসময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সবসময়

বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে, তা বটে। এ সবসময় আছে'।"[২১]

ঠাকুরের লীলাকালে কামারপুকুরের অবস্থানের সুযোগে আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগ্রহণে মায়ের কৈশোর পরিণত হয়েছিল। সেখানে তিনি লক্ষ্মীদির সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়' পড়তে শুরু করেছিলেন, যদিও তা ভাগনে হৃদয়ের উৎপাতে পরিসমাপ্ত হতে পারেনি। কামারপুকুরে থাকার অবকাশে তিনি সাঁতার, সঙ্গীত ও রান্নায় পটুতা লাভ করেছিলেন। তিনি গান গাইতে শিখেছিলেন। তার উৎস ছিল ভ্রাম্যমাণ বাউল, ভিখারি ও গ্রামে অনুষ্ঠিত যাত্রাপালা। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠকের স্মরণে থাকবে, নিকটবর্তী গ্রামে একসময় যাত্রাপালা হচ্ছিল, মা পরিবারের অন্য এক মহিলার সঙ্গে সেখানে যাত্রাপালা শুনতে যেতে আগ্রহী হলে ঠাকুর অনুমতি দেননি। কিন্তু ঠাকুর সে-পালাটি দেখে এসে নিজে হুবহু সেই পালার সমস্ত অভিনয় মাকে দেখিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্বশুরালয় কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামে তিনি বালিকা বধূরূপে প্রথম প্রবেশ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবন এই গ্রামের বাতাবরণকে লক্ষ্য করেছে। ঠাকুরের লীলাবসানের পরও, যদিও তখন তিনি যুবতীই, এই গ্রামে একাকিনী দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। দেখেছেন তিনি আত্মীয়-পরিজনদের স্বরূপ, সেইসঙ্গে প্রতিবেশীদেরও আচার-আচরণ। ঠাকুরের লীলাকালে শ্রীশ্রীমা ছিলেন একান্নবর্তী চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এক সাধারণ প্রতিনিধি; আর ঠাকুরের লীলাবসানের পর সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি একাকিনী বা একক ব্যক্তিত্ব, অন্যধারে গভীর ব্যঞ্জনাময় এক সাম্রাজ্যের (শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের) চূড়ামণি। সাধারণ মানুষ সেদিন প্রথম প্রথম এই সত্যটি অবধারণে অসমর্থ ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সত্যটি প্রকটিত হয়। তাই ঠাকুরের লীলাবসানের অব্যবহিত পরেই যে-কামারপুকুর মাকে দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় অস্থির করেছিল, সেই কামারপুকুর পরবর্তী কালে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনায় অধীর হয়ে ওঠে।

"ঠাকুরদের বাড়ির উত্তরভাগের সদর রাস্তার উপর—এখনকার মতো—তিনখানি দক্ষিণদ্বারী ঘর ছিল। বাটীর প্রাচীরের বাহিরে পূর্বদিকের ঘরখানি বৈঠকখানা; প্রাচীরের ভিতরে মধ্যের অপেক্ষাকৃত বড় ঘরখানিতে রামলাল-দাদার পিতা রামেশ্বর বাস করিতেন। উহার পশ্চিমে এবং রঘুবীরের ঘরের উত্তরে তদপেক্ষা ছোট ঘরখানিতে ঠাকুর বাস করিতেন। শ্রীমায়ের কামারপুকুর-জীবন এই ঘরেই যাপিত হইয়াছিল। ঐ বাসগৃহ দুইখানির মধ্যস্থলে উত্তরের রাস্তায় নামিবার খিড়কির দরজা। প্রাচীন রন্ধনশালা দক্ষিণের প্রাচীরের গায়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। তিন অংশে বিভক্ত ইহারই একটি কক্ষ পরে মায়ের রান্নাঘরে পরিণত হয়। পশ্চিমের প্রাচীরের মধ্যস্থলে রঘুবীরের আগার। পূর্ব-প্রাচীরের মধ্যস্থলে বাড়ির প্রবেশদ্বার। ঐ দ্বার ও রন্ধনশালার মাঝামাঝি ঢেঁকিশাল—যেখানে ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল।

"তখনকার দিনে রঘুবীরের ঘরে দেবতাদের জন্য যে-বেদি ছিল, উহার মাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজে মাথায় করিয়া আনিয়া স্বহস্তে উহা নির্মাণ করেন। ঐ বেদিতে বর্তমানে চারিটি দেবদেবী স্থাপিত আছেন। গোপাল-মূর্তি লক্ষ্মীদিদির স্থাপিত। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম রামেশ্বর তীর্থ
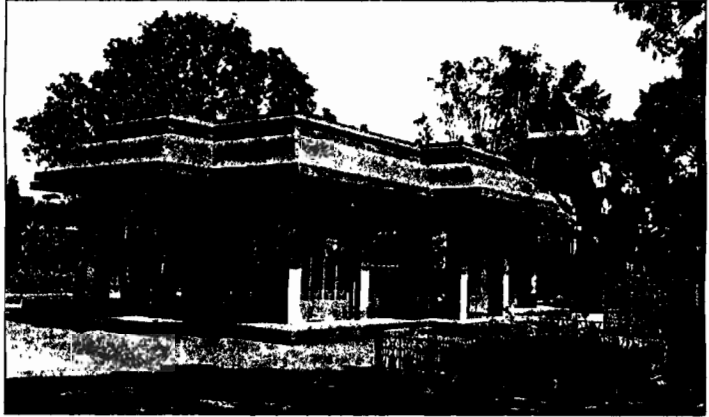
কামারপুকুরে নাটমন্দির-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ● আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

হইতে শ্বেতপাথরের রামেশ্বর শিব আনিয়াছিলেন। রঘুবীরকে তিনি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। শীতলার প্রতীক একটি আম্রপল্লবযুক্ত সিন্দুরলিপ্ত ঘট। শ্রীমা বলিয়াছিলেন 'ইনিই আমাদের আদি গৃহদেবতা।... রঘুবীরকে নিরামিষ ও শীতলাকে মাছ ভোগ দেওয়া হয়।'

"কামারপুকুর তখন সমৃদ্ধ, জনবহুল ও কোলাহলপূর্ণ বলিয়াই লজ্জাশীলা শ্রীমায়ের নিকট ভীতিপ্রদ। বিশেষত, অশিক্ষিত, অনুদার ও সহানুভূতিশূন্য পল্লিবাসী এই সহায়হীনার দারিদ্র্যে অবিচলিত উচ্চভাব সম্বন্ধেও অনুসন্ধিৎসাশূন্য।"[২২] এ হেন কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুরের লীলাবসানের পর শ্রীশ্রীমা পুনরায় অবস্থান করতে লাগলেন।

ঠাকুরের লীলাবসানের পর বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনি দেশে যাত্রা করেন। বর্ধমান থেকে উচালন পর্যন্ত

অর্থাভাবে আট ক্রোশ পথ হেঁটেই এসেছিলেন। উচালনের চটিতে গোলাপ-মার রান্না তরকারিশূন্য খিচুড়ি খেয়ে মা বলেছিলেনঃ "কী অমৃতই তুমি রেধেছ, গোলাপ!" তারপর মাকে কামারপুকুরে রেখে স্বামী যোগানন্দ ও গোলাপ-মা কলকাতা ফিরে গেলেন। শ্রীশ্রীমা কামারপুকুর বাড়িতে একাকিনী অবস্থান করতে লাগলেন। এইসময় শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ (রামলাল ও শিবরাম), তাঁদের ভগিনী লক্ষ্মীদেবী সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছিলেন। শ্রীশ্রীমা এসে দেখলেন, তাঁর দিন চলার মতো না আছে অর্থসম্বল, না ধান-চাল! কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রামলালের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি কামারপুকুর এসে এক সপ্তাহকাল কাটিয়ে গেছেন। তখন সমস্ত জিনিসই ঠিক ছিল। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন এসে পৌঁছালেন, দেখলেন ভাঁড়ারঘর চালশূন্য। সর্বত্রই নিঃস্ব ও রিক্ততার চিত্র। একে তাঁর পরম সম্পদ শ্রীশ্রীঠাকুরই লোকজীবন থেকে অন্তরালে, তার সঙ্গে ঘরের এই নিদারুণ রিক্ততা—এটা তিনি ভাবতেই পারেননি। তাঁর জানা ছিল শ্বশুরকুলের দারিদ্র্যের স্বরূপ! ঠাকুরও তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি রঘুবীরের সেবার জন্য শিহড়ে জমি কিনিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া কামারপুকুর গ্রামেও তাঁদের আগে থেকেই কিছু জমি (লক্ষ্মীজলা—১ বিঘা ১০ ছটাক) ছিল। এই জমির ফসল সেকালে যৎসামান্য ছিল না। কিন্তু বাস্তবে মা যখন কামারপুকুরে উপস্থিত হলেন, তার কণামাত্র দেখতে পেলেন না। দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তার সঙ্গে ছিল প্রতিবেশীদের সমালোচনা। ঠাকুরের দেহান্ত ঘটলে তিনি হাতের বালা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর মাকে দর্শন দিয়ে তা খুলতে নিষেধ করেন। ফলত মায়ের প্রথানুগ বিধবার বেশে থাকা সম্ভব হয়নি। সংসার ও সমাজের প্রতিকূলতার সামনে কী অসহনীয় অবস্থার সামনে তাঁকে পড়তে হয়েছিল, তার খণ্ডাংশ মাত্র বহুকাল পরে তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। কার্যত কামারপুকুরে অবস্থানকালে বিচিত্র সমস্যা পর্যায়ক্রমে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় চরম দারিদ্র্যের কথা। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন ঃ "তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" এইসময় তিনি ঠাকুরের কথা অনুসরণে ব্রতী হয়ে শতছিন্ন কাপড় গিঁট দিয়ে দিয়ে পরেছেন এবং কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাক বুনে কালাতিপাত করেছেন। কী দুঃসহ দারিদ্র্য!

প্রতিবেশীদের অন্যায় আচরণও মাকে বিব্রত করেছিল। সমকালে ওড়িশা দেশীয় এক সাধু কামারপুকুর গ্রামে বাস করতেন। ধর্মদাস লাহার ধর্মশীলা কন্যা প্রসন্নময়ীর ব্যবস্থায় গোঁসাইমহলের প্রাচীরের বাইরের দিকে একখানি চালাঘরে ঐ সাধু বাস করতেন। কিন্তু ক্ষমতাদৃপ্ত কয়েকজন হঠকারী যুবক তাঁকে সেখান থেকে উৎখাত করে। শ্রীশ্রীমা তাঁর কয়েকজন সহযোগী ব্যক্তির সহায়তায় সেই সাধুকে হালদারপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে থাকার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তাঁর একটি কুটির নির্মাণে তিনি সহায়তা করেন।

তৃতীয়ত, গ্রামের অনুদার মহিলাদের তীব্র সমালোচনার প্রবাহও মাকে কম যন্ত্রণা দেয়নি। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমা হাতের বালা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশেই তিনি লালপাড় কাপড় ও হাতে সোনার বালা পরে থাকতেন। গ্রামীণ প্রথানুযায়ী তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর বসন-ভূষণে বৈধব্যচিহ্ন নেই। এই প্রসঙ্গ সেদিন কামারপুকুর গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদের বিশেষ আলোচ্য হয়েছিল। এই সমালোচনার বান এত তীব্র ছিল যে, মা বলেছেন ঃ "তখন সব লোকের ভয়ে—এ ও বলছে, ও তা বলছে—হাতের বালা খুলে ফেললুম।"[২৩]

চতুর্থত, কিছু অবাঞ্ছিত উৎপাত সেকালে মাকে সহ্য করতে হয়েছিল। একে সংসারে অনটন—তার ওপর লোকবল নেই। অথচ অতিথি-অভ্যাগত লেগে আছে। বিভিন্ন ভিখারি মায়ের কাছে অন্নপ্রার্থনা জানালে মা নিজে অভুক্ত থেকে তাদের খেতে দিয়েছেন। এমন কালেই হরিশ নামে ঠাকুরের এক ভক্ত কামারপুকুর গ্রামে এসে হাজির। সে মায়ের কাছেই থাকে। তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল বলে মা তাকে স্নেহযত্ন করতেন। একদিন তিনি যখন পাশের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়িতে ঢুকছেন, তখন সে মায়ের পিছু পিছু ছুটছে। মা বলেছেন ঃ "তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (ধানের গোলার) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন নিজমূর্তি এসে পড়ল। আমি নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ-হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল। তারপর নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) এলে তাকে বললুম, 'ওকে পাঠিয়ে দাও।'"[২৪]

পঞ্চমত, আত্মীয়-পরিজনদের অনুদারতা তিনি পদে পদে অনুভব করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ "লক্ষ্মীদেবী বৃন্দাবনে মায়ের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু কামারপুকুরে যাইলেন না। তিনি সম্ভবত দক্ষিণেশ্বরে

ভ্রাতাদের সহিত থাকাই শ্রেয় মনে করিলেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীমায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন দায়িত্ব তো গ্রহণ করেনই নাই, বরং এক বিষম বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। রানি রাসমণির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীমাকে মাসিক পাঁচ-সাতটি করিয়া টাকা দিতেন। শ্রীমায়ের বৃন্দাবনে অবস্থানকালে রামলাল-দাদা কালীবাড়ির খাজাঞ্চি প্রভৃতিকে বুঝাইলেন যে, মা ভক্তদের নিকট যথেষ্ট অর্থ পান; নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সুতরাং কালীবাড়ির টাকা বন্ধ হইয়া গেল।"[২৫] সমকালে একান্নবর্তী পরিবার থেকে মাকে পৃথগান্ন করা হলো—"মাতৃগৃহ হইতে একবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমা দেখিলেন, রামলাল-দাদা বাড়ির ও গৃহদেবতার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের ঘরখানি তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল; উহাতে প্রবেশ করিয়া তিনি একাই স্বামীর ভিটা আগলাইতে লাগিলেন।"[২৬] বিসংবাদের আরেক খণ্ড চিত্র—"কামারপুকুরে মা যখন থাকতেন, তখন কতদিন মায়ের ভাতের ওপরে একটু তরকারি জোটাতে মাকে হিমসিম খেতে হতো। ঠাকুরের ঘরের সামনে একটুখানি জায়গায় মা নিজের হাতে শাক বুনেছেন। লক্ষ্মীদিদি সে-শাক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতেন। মা নিষেধ করাতে তিনি মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন, অনেক রূঢ় ও কটু কথা মাকে শুনিয়েছিলেন। মা নীরবে সেসব সহ্য করেছিলেন।"[২৭]

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি ● আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

কামারপুকুরের জীবন মায়ের বস্তুত সংগ্রামের জীবন। সমকালীন অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লিবাসীর মনে উন্নত চিন্তার খোরাক ছিল না। শ্রীশ্রীমা সমকালীন বাতাবরণের মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎ প্রতিবাদস্বরূপ থেকেছেন এবং জগৎসংসারে ঠাকুরের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মায়ের এই সংগ্রামে ঠাকুরের প্রতিনিয়ত দর্শনদান ও মাকে আশ্বস্ত করা এই অধ্যায়ের ইতিবাচক দিক। সেইসঙ্গে স্মরণীয় সহানুভূতিসম্পন্না কতিপয় নারীর (প্রসন্নময়ী, ধনী কামারনি ও শঙ্করী) সহযোগিতা। লোকলজ্জা ও প্রতিবেশীদের ক্রূর সমালোচনার ভয়ে মা যখন হাতের বালা খুলে রাখতে চেয়েছিলেন, তখনি ঠাকুরের দর্শন পেলেন। "ঠাকুর আমাকে বললেন, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো?' আমি বললুম, 'বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে।' তিনি বললেন, 'আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।' সেইদিনই বৈকালে গৌরদাসী এল। তার কাছে শুনলুম, 'চিন্ময় স্বামী' (চিরজীবিত স্বামী—তাঁর স্ত্রীর বৈধব্য হয় না)।"[২৮] কামারপুকুরে থাকাকালে শ্রীশ্রীমা আরেকটি কষ্ট অনুভব করেছিলেন। তা হলো গঙ্গাহীনতা! কিভাবে স্নান করবেন? তখন আবার ঠাকুরের দর্শন। মা বলছেন: "একদিন দেখি কি, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল—এইসব যত ভক্তেরা, কত লোক! দেখি কি, ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম, ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।"[২৯] সেইসময় মা মাঝে মাঝে ভাবতেন: "ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে?" তারপর ঠাকুর একদিন তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন: 'ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই সব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কত লোকে তোমাকে 'মা' 'মা' বলে ডাকবে।"[৩০] কামারপুকুরে নিজের স্বাস্থ্য ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মা উদাসীন থাকতেন। বহুদিনই তাঁর অনাহারে কেটেছে। ঠাকুর তখন তাঁকে দর্শন দিয়েছেন: "একদিন ঠাকুর এসে বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।' খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলুম।... তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলুম।"[৩১]

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা যখন কামারপুকুরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর বাড়ির অনতিদূরেই গোঁসাইমহলে

প্রসন্নময়ী দেবী বসবাস করতেন। তিনি অত কাছে থাকা সত্ত্বেও মায়ের চরম দারিদ্র্যের সংবাদ পাননি, কারণ মা নীতিগতভাবে তাঁর অভাবের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। ঘটনা আরো দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকত যদি না ধনী কামারনির ভগিনী শঙ্করীদেবী উদ্যোগী হতেন। শিবুদাদার অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়ঃ "খুড়িমায়ের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্য পুরোদমে ছিল, যদিও তিনি নিজ মুখে তা কখনো স্বীকার করেননি। কামারপুকুরে থাকাকালে তাঁর কষ্টের কথা আমি নিজ মুখে কখনো তাঁকে লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিনি। কথাপ্রসঙ্গে শঙ্করীমাসির মুখ থেকেই সেসময়ের কিছু কথা জানতে পেরেছি। খুড়িমা এখানে থাকার বেশ কয়েকদিন পর একদিন দুপুরবেলা তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন। তখন দেখেন খুড়িমায়ের ছেঁড়া কাপড়। এক সাধু ভাত খেয়ে উঠলেন। সেদিন খুড়িমা কেবল সাপুনে শাক ভাজা খেয়ে কাটিয়েছিলেন। তিনি এমন বহুদিন করেছেন, নিজের খাবার অতিথিদের দিয়ে নিজে জল খেয়ে কাটিয়েছেন। খুড়িমায়ের কাছে তাঁর খুব আসা-যাওয়া ছিল। শঙ্করীমাসি খুড়িমার কষ্টের কথা প্রসন্নময়ীর কানে তোলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি জয়রামবাটীতে দিদিমা ও মামাদের খবর দেন। তারপর মামারা এসেছিলেন এবং খুড়িমাকে জয়রামবাটী নিয়ে গিয়েছিলেন।"[৩২] সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যের আরো নজির আছে—প্রসন্নময়ীদেবীর হস্তক্ষেপে নিন্দামুখর গ্রামবাসীদের সহসা স্তব্ধ হওয়া, আকস্মিকভাবে গৌরী-মায়ের কামারপুকুরে আসা ও মাকে আশ্বস্ত করা এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে আঁটপুর থেকে বলরাম বসুর সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনীদেবীর আকস্মিকভাবে কামারপুকুরে আগমন ও কলকাতার ভক্তদের মায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করানো।

ওপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়, ঠাকুরের লীলাকালে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে অবস্থান করে ঠাকুর-প্রদত্ত বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় পরিণত ও পরিশীলিত হয়েছেন। ঠাকুরের লীলাবসানের পর তাঁর অবস্থান নানা ঝঞ্ঝাবর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তিনি সেই প্রতিকূলতা পরিহার করে কামারপুকুর ত্যাগ করেননি। ধীরে ধীরে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। সাধারণভাবে তাঁর জীবনীতে তাঁর দীর্ঘ উপস্থিতি জয়রামবাটীতেই লক্ষিত হয়। তবুও কামারপুকুরে স্বামীর ভিটা সংরক্ষণ ও সঞ্জীবিত রাখার এষণা তাঁর হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। তাই বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কামারপুকুরে তাঁর অবস্থানের ধারাবাহিকতা কখনোই থেমে থাকেনি। তাঁর জীবনীতে কামারপুকুর অধ্যায় অবশ্যই এক স্মরণীয় উপাখ্যান। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর বসন-ভূষণ (যা শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত) নিয়ে তাঁকে যে-নিন্দাধ্বনি শুনতে হয়েছিল, তিনি নীরবে তা সহ্য করেছেন। যে উচ্ছৃঙ্খল যুবকগোষ্ঠীর দৌরাত্ম্যে তিনি বিরক্তবোধ করেছেন (উড়িয়া সাধু সংশ্লিষ্ট ঘটনায়), সেই যুবকরাই কিছুকাল পরে তাঁর চরণে প্রণিপাত জানিয়ে নিজেদের অপকর্মের জন্য মাফ চেয়েছেন। তাই শ্রীশ্রীমায়ের কামারপুকুরের জীবন পাঠক-মনে অস্বস্তি ঘটালেও এটি তাঁর দৈব ব্যক্তিত্বেরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ■

তথ্যসূত্র

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৩, পৃঃ ২৪
২ শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ১৩৯০, পৃঃ ১১
৩ ঐ, পৃঃ ১১
৪ শ্রীমা সারাদা দেবী, পৃঃ ২৫
৫ ঐ, পৃঃ ৫৫
৬ ঐ
৭ ঐ
৮ শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃঃ ৩৩
৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১২২
১০ ঐ, পৃঃ ১২৩
১১ ঐ
১২ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরীদেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬১, পৃঃ ২৬৭
১৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১৩৯৬, পৃঃ ১০৯
১৪ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি—শিবরাম চট্টোপাধ্যায় [অপ্রকাশিত] (লেখকের কাছে সংরক্ষিত)
১৫ শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃঃ ১১-১২
১৬ ঐ, পৃঃ ১২-১৩
১৭ ঐ, পৃঃ ১৪
১৮ ঐ, পৃঃ ১৪-১৫
১৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৮
২০ ঐ, পৃঃ ২৯
২১ ঐ, পৃঃ ৩০
২২ ঐ, পৃঃ ১১৮-১১৯
২৩ শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃঃ ১২৩-১২৪
২৪ ঐ, পৃঃ ১২৫
২৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১১৬-১১৭
২৬ ঐ, পৃঃ ১২২
২৭ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—সম্পাদনাঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৪০৪, পৃঃ ৬৫১
২৮ শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী, পৃঃ ১২৪
২৯ ঐ, পৃঃ ১২৪
৩০ ঐ, পৃঃ ১২৩
৩১ ঐ, পৃঃ ১২৪
৩২ শিবুদাদার অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বাংলার শারদীয় দুর্গোৎসব ঃ ইতিহাস ও অনুসন্ধান

দেবব্রত দাস*

বাংলায় যেকোন উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা প্রাচীনতম এবং উৎসবের রূপে এখনো পর্যন্ত দুর্গাপূজারই সবচেয়ে বেশি ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা ও জাঁকজমক। একথা ঠিক যে, মাতৃশক্তির আরাধনায়, শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে বাংলায় দেবী কালীরই প্রাধান্য। কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজায় পূজা অপেক্ষা উৎসব-আনন্দের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। দুর্গাপূজায় এই উৎসব-প্রাধান্যের জন্যই মনে হয় সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গা অপেক্ষা কালীই প্রাধান্যলাভ করেছেন এই বাংলায়।

শরৎকালে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন যে, দুর্গাপূজা প্রাচীন শারদোৎসব। দেবী দুর্গার অপর নাম 'অম্বিকা'। অম্বিকা বলতে শরৎ ঋতুও বোঝায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, শরৎ ঋতুর পূজা করার অর্থই দেবী অম্বিকার পূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা করা।[১]

এই শারদীয়া দুর্গোৎসবকে 'অকালবোধন' বলা হয়। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা রাত্রিতে দুর্গাকে বোধন করেছিলেন। রাত্রিকালে বোধন করা হয়েছিল বলে একে 'অকালবোধন' বলে। কারণ, প্রচলিত বিশ্বাস হলো, বসন্তকালে অর্থাৎ আদিত্যের উদয়কালেই বোধন করা উচিত। 'রাত্রি' হচ্ছে সূর্যের দক্ষিণায়ন। শাস্ত্রে বলে, বছরের ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ দেবতাদের একদিন ও দক্ষিণায়ন দেবতাদের একরাত্রি। দক্ষিণায়ন শুরু হলে বিষ্ণু শয্যাগ্রহণ করেন, তখন হয় শয়ন একাদশী। আর দক্ষিণায়ন শেষ হলে বিষ্ণু শয্যাত্যাগ করেন, তখন হয় উত্থান একাদশী। সমস্ত দেবতার নিদ্রার কাল দক্ষিণায়ন ও জাগরণের কাল উত্তরায়ণ। শরৎকাল দক্ষিণায়ন, তখন বিষ্ণুশক্তি-বিষ্ণুমায়া দুর্গাও নিদ্রিতা থাকেন—একারণে শারদীয়া পূজায় দেবীর জাগরণের জন্য বোধনের প্রয়োজন হয়। শরৎকালে দেবীকে বোধনের দ্বারা জাগাতে হয় বলে তাঁর অপর নাম 'শারদা'। বসন্ত ঋতু উত্তরায়ণ; তখন দেবতাদের 'দিন' বলে কোন বোধন করতে হয় না। চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে নবমী তিথি পর্যন্ত দেবী দুর্গার 'বাসন্তী পূজা' হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যা মহামায়ার কালীরূপের আবির্ভাবের কাল বলে যেমন ঐসময় কালীপূজার পক্ষে প্রশস্ত, তেমনি শরৎকাল তাঁর দশভুজারূপে আবির্ভাবের কাল বলে, শাস্ত্রে অকাল হলেও, এই কালকেই দুর্গাপূজার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলে বিধান দেওয়া হয়েছে।

বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলন শরৎকালে। তাই এর অপর নাম 'শারদীয়া'। এই উৎসবের অন্যতম নাম শারদোৎসব। তবে ঠিক কোন্ সময় থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছিল, এসম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলার মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা পাই না। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত কতকগুলি দুর্গাপূজার বিধান পাওয়া গেছে। এই বিধানগুলি মুখ্যরূপে দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ-জাতীয় কয়েকখানি উপপুরাণ থেকে সঙ্কলিত।

দেবীপুরাণে দুর্গাপূজাকে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঃ

"অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িকা।।"[২]

বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে দেখা যায়, 'কালীবিলাসতন্ত্র'-এ কার্তিক-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ-সমেত প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে।

প্রাচীন পুরাণাদির মধ্যে অগ্নিপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গৌরীপূজার বিধান আছে। অগ্নিপুরাণেরই ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমাপূজার বিধিও চোখে পড়ে। গরুড়পুরাণের ১৩৫-১৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজাবিধি বর্ণনা করা হয়েছে।

** হিন্দুশাস্ত্রের নিষ্ঠাবান গবেষক, অধ্যাপক, পূর্বেও 'উদ্বোধন'-এ অনেকবার লিখেছেন।*

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'ই দেবী দুর্গার আকর গ্রন্থ। অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন, সম্ভবত বাংলাদেশই চণ্ডীর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মিরী ও বিলাসী—এই চারপ্রকার তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্ত্রে বলা হয়েছে : "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা" অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশে তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব হয়। পালরাজাদের সময় বাংলায় তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাঙলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার প্রাচীন পীঠস্থানগুলির বেশির ভাগ বাংলাদেশেই অবস্থিত। বাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগ দীর্ঘকাল জঙ্গলাবৃত ছিল। এইসব জঙ্গলের আদিম অধিবাসীদের 'কিরাত' বা 'শবর' বলা হতো। 'কাদম্বরী', 'হরিবংশ', 'দশকুমারচরিত', 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত এই যে, চণ্ডী-বর্ণিত দেবী প্রকৃতপক্ষে কিরাত ও শবরগণেরই উপাস্যা ছিলেন। সুতরাং কিরাত ও শবরদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব বলে মনে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অংশ হলেও শ্রীশ্রীচণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্ররূপে গৃহীত। যখন প্রধান প্রধান সব তন্ত্রই বাংলায় উৎপন্ন, তখন চণ্ডীও বাংলাতেই উদ্ভূত—এ-কথা বলা যেতে পারে। বাংলার পূর্বসীমান্তে চট্টল শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে অবস্থিত মেধসাশ্রমই সম্ভবত চণ্ডীতে উক্ত মেধামুনির আশ্রম—এরূপ অনুমান আমরা করতে পারি। এছাড়াও চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে—সুরথ ও সমাধি মহামায়ার 'মহীময়ী' মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন। মৎস্যপুরাণেও দুর্গামূর্তি-নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। এখন এই 'মহীময়ী' মূর্তি বাংলাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ীপ্রতিমা অর্থাৎ মাটির তৈরি প্রতিমা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নেই বললেই চলে। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাঠ বা পাথরের তৈরি মূর্তিপূজাই বেশি প্রচলিত।[৩]

এইসব কারণ লক্ষ্য করেই বোধ হয় আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'পূজা-পাঠন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "শারদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে।"[৪] অবশ্যই প্রাচীনতার এই হিসাবের মধ্যে বাড়াবাড়ি রয়েছে। তবে অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্তত এক হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন।[৫]

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালি স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামে একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁর 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামে মৌলিক গ্রন্থে (যেটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি দেওয়া আছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ থেকে তাঁর গ্রন্থ-দুটির অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ থেকেও বহু বাক্য উদ্ধার করেছেন। তাঁর পরবর্তী কালের নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চন-কৌমুদী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০) তাঁর 'ক্রিয়া-চিন্তা-মণি' এবং 'বাসন্তীপূজাপ্রকরণ' গ্রন্থ-দুটিতে দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করেছেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫-১৪৫০) 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃন্ময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসব বিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। শূলপাণির 'দুর্গোৎসব বিবেক' ও 'বাসন্তী বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামে তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূতবাহন 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করেছেন। শূলপাণি ও জীমূতবাহন—বাংলার এই দুই পণ্ডিত দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাণি তাঁর পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলি উদ্ধার করেছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁর গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহুবাক্য উদ্ধার করেছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেনরাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং উত্তররায়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী সাবর্ণ-গোত্রীয় ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধানমন্ত্রী (সান্দিবিগ্রহিক মন্ত্রী)। শাস্ত্রে ও শস্ত্রে ছিল তাঁর সমান পারদর্শিতা। এগারো থেকে বারো শতকের মধ্যে রচিত ভবদেব ভট্টের গ্রন্থ 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি'তে মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার বিধিব্যবস্থার কথা রয়েছে। বিহারের রাজা, মহারাষ্ট্রদেশীয় বর্গিসর্দার রঘুজী ভোঁসলে বাংলায় চৌথ আদায় করতে এসে কাটোয়া শহরে বঙ্গীয় প্রথামতে দুর্গাপূজা করেছিলেন। ওপরের এসকল তথ্য দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল।

পূজাবিধি রচিত হওয়ার পূর্ব থেকেই পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়ে থাকে। কারণ, কিছুদিন পূজা প্রচলিত থাকার পরেই বিধির প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। বিদ্যাপতি যে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা সম্ভবত মিথিলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরবিজয়ী ধীরসিংহের (মতান্তরে, ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের) আদেশে। এবিষয়ে পূর্ববর্তী যে-নিবন্ধগুলি ছিল তা দেখে বিদ্যাপতি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথমে হয়তো পূজাবিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; রাজা ও রাজবংশীয় ব্যক্তিগণের পূজায় উৎসব-অনুষ্ঠান, জাঁকজমক যতই বেড়ে যেতে লাগল, পূজাবিধানও সম্ভবত ততই বর্ধিতকলেবর হতে থাকল।

বর্তমানে যেভাবে এবং যে-প্রথায় বাংলাদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত, তা খুব সম্ভবত ষোড়শ শতকে শুরু হয়েছে। আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার বঙ্গদেশীয় কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। কথিত আছে যে, কুল্লুক ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়ে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর উপদেশ চান; রমেশ শাস্ত্রী তাঁকে দুর্গাপূজা করার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন করেছিলেন উদয়নারায়ণের পৌত্র এবং কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ।

সংক্ষেপে বাংলাদেশে দেবীপূজার প্রচলনের যে-ইতিহাস আমরা আলোচনা করলাম তাতে দেখা গেল যে, প্রাচীনকালেই বাংলাদেশে দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হয়েছে। পূজাকে অবলম্বন করে উৎসবের ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা আজ অবধি বাঙালির সর্বপ্রধান ও সর্ববৃহৎ উৎসব। আমরা সাধারণভাবে 'পূজা' বলতে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই বুঝে থাকি। 'পূজা এসে গেল', 'পূজার সময় বেড়াতে যাব', 'এবার পূজা কোন্ মাসে' ইত্যাদি বাক্যের ক্ষেত্রে 'পূজা' কথার লক্ষ্য নিঃসন্দেহে 'দুর্গাপূজা' বা 'শারদোৎসব'। শারদীয়া দুর্গাপূজায় 'পূজা' অপেক্ষা উৎসব-আনন্দের দিকটাকেই আমরা বড় করে পেয়ে থাকি। এই উৎসব-আনন্দের রূপটা যে একুশ শতকেই প্রধান হয়ে উঠেছে তা কিন্তু নয়, শারদীয়া পূজার প্রচলনের প্রথম থেকেই এই ব্যাপারটা আমরা লক্ষ্য করি।

শারদীয়া দুর্গাপূজা থেকে আরম্ভ করে বসন্তকাল পর্যন্ত মাতৃশক্তি দেবীকে আমরা নানা রূপে পূজা করে থাকি। দুর্গাপূজার পর ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, সরস্বতীপূজা এবং সবশেষে বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী-মূর্তির পূজা তথা অন্নপূর্ণাপূজা—সবই সাংবাৎসরিক পূজা। প্রথম থেকেই দুর্গাপূজার সবটাই উৎসব—শারদোৎসব। সে-উৎসব একজনের নয়, সেটি সার্বজনীন। এটি বাংলার শৈব-শাক্ত-বৈভব-সৌর-গাণপত্য নির্বিশেষে সকলেরই উৎসব। এমনকি এই উৎসবে বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে সামিল হয় বাংলার বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমানও। প্রকৃতপক্ষে, শারদোৎসব হলো বাঙালির জাতীয় উৎসব। বাংলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করলে বোঝা যাবে, এই ব্যাপক সাংবাৎসরিক উৎসবের সঙ্গে মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত্র এবং পরবর্তী কালের জমিদারি-তালুকদারিতন্ত্রের যোগ রয়েছে। দুর্গাপূজা বনেদি পরিবারের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান ছিল। তারপরে ক্রমে ক্রমে চালু হয় সার্বজনীন বা বারোয়ারি পূজা। এলাকার ক্লাব ও সংগঠনগুলির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে সার্বজনীন দুর্গাপূজা। উৎসবের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে থাকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে।

প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজার এই উৎসব-প্রধান রূপটি বাংলাদেশে যে কেবল মধ্যযুগে (অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক) বা আধুনিক যুগে (বিংশ ও একবিংশ শতক) ফুটে উঠেছে তা নয়, আদিতেই এই শারদীয়া পূজার 'উৎসব-রূপ' ছিল। দেবীপূজার সঙ্গে 'শস্যোৎসব' এবং 'বিজয়োৎসব'-এর প্রসঙ্গে এর পরিচয় আমরা পাই। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন যে, শারদীয়া পূজার মূলে সবটাই উৎসব—শরৎকালীন আনন্দোৎসব। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "দুর্গোৎসব নয়, শারদোৎসব; শরৎঋতু প্রবেশজনিত উৎসব।"[৬]

মধ্যযুগে বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলনকারী হিসাবে দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়—রাজা গণেশ এবং রাজা কংসনারায়ণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুঘল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বাংলার মনোরম শরৎঋতুতে দুর্গাপূজায় জাঁকজমকের জন্য ব্যয় করেছিলেন তৎকালের হিসাবে নয় লক্ষ টাকা। তখন থেকেই দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণ করে শারদীয়া পূজার ব্যাপারটা চালু হয়ে যায় মূলত রাজা-মহারাজাদের মধ্যে। ব্রিটিশ আমলে এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করতে থাকেন ইংরেজদের অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু জমিদারেরা। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "ইংরেজের কলকাতায় বিরাট সমারোহের সঙ্গে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ডেপুটি কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র [১৬৬৫-১৭৭৩]। পলাশীর যুদ্ধের আগে গোবিন্দরাম মিত্রের প্রভাব ছিল নতুন কলকাতা শহরে অসীম।... এমনই প্রতাপান্বিত গোবিন্দরামের কুমারটুলির বাড়িতে শুরু হয় ইংরেজ আমলের নতুন কালের

বড়লোকের নাচগান-রোশনাইভরা জাঁকজমকের দুর্গাপূজা। গোবিন্দরাম ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ডেপুটি জমিদার হয়েছিলেন। সেই বছরই নাকি দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন গোবিন্দরাম। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির মুনশি থেকে মহারাজা হওয়া। নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের নতুন রাজবাড়িতে বিরাট সমারোহের সঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু করেন। ... এইভাবে শহরের নতুন কালের বড়লোকদের দেখাদেখি গ্রামের জমিদারও সমারোহের সঙ্গে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। ... বড়লোক বাড়ির দুর্গাপূজার বাইরে সাধারণ মানুষের বারোয়ারি পূজা শুরু হয় গুপ্তিপাড়ায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে 'The Friends of India' কাগজে এই পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত বৈদ্য কীর্তিচন্দ্র সেনের বংশে দেবীর পূজা হতো দীর্ঘদিন ধরে। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই পূজা বলিদানে বিঘ্ন হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এটি বন্ধ হতে দেননি। ১২জন ব্রাহ্মণ অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে এই পূজা চালানোর ব্যবস্থা করেন। এইভাবে শুরু হয় বারোয়ারি পূজা। বড়লোকের বাড়ি থেকে সাধারণের মধ্যে এইভাবে বারোয়ারি পূজা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুষ্টিমেয় উৎসব ক্রমশ সাধারণ উৎসবের রূপ নিতে আরম্ভ করে।"[৭]

বাংলার শারদীয়া প্রকৃতির মধ্যেই থাকে উৎসবের আয়োজন, আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেজে ওঠে চিরন্তনী আগমনী গীতির সুর। কেবল হিমালয়কন্যা উমার পিত্রালয়ে আগমন নয়, এই আগমনী গীতির সুরে সুরে বাঙালি হৃদয়ে সূচিত হয় চরাচরব্যাপী অনির্বচনীয় এক আনন্দস্বরূপার আসন্ন আবির্ভাব—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি 'শারদলক্ষ্মী'। কবি নজরুল সম্ভবত তাঁকেই আবাহন করে লিখেছেন : "শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া।/ শিউলি রঙিন শাড়ি পরে ফেরো আগমনী গীতি গাহিয়া।"

এই শারদলক্ষ্মীর পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার আকাশে উৎসবের রং লেগে যায়। দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে মহৎ কিছুর সম্ভাবনায় ঢাকের গুড়গুড় শব্দে বাঙালির হৃদয়কন্দরে কাঁপন ধরে। এইভাবেই শুরু হয় শারদোৎসব। এমন উৎসব কি শুধু হিন্দুর একার হতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে মহাপূজার সূত্রপাত কয়েকদিন আগেই—মহালয়ার গান দিয়ে, যা এতদিন ধরে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান বলে। এর আবেদন কি বাঙালি খ্রিস্টানকেও মুগ্ধ করে না? যখন শারদ প্রভাতের সেই আনন্দময় মুহূর্তে শিউলির মৃদু গন্ধের সঙ্গে তার কানে পৌঁছায় আগমনী গানের সুর, তখন ঐ বাঙালি খ্রিস্টানও বুঝতে পারে—বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা এসে গেছে। সে-মুহূর্তে কি তার আরো মনে পড়ে যায় না ক্যারল গানের কথা? ক্যারল গানকে ইদানীং আগমনী গান বলা হচ্ছে—দূরদর্শন ও বেতারের মাধ্যমে তা ছড়িয়েও পড়ছে।

বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে বাংলায় শক্তি উপাসনার প্রাবল্য দেখা দেওয়ায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে হলেও তার প্রভাব পড়েছিল। সে-কারণে কিছু কিছু মুসলিম কবিকেও শক্তিরূপিণী দেবীর উপাসনাধর্মী পদ, গান কিংবা গীত রচনা করতে দেখা গেছে। ঐসময় শাক্ত আদর্শ-প্রভাবিত কোন কোন মুসলমানও কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি দেবীর পূজা তো করতই, শরৎঋতুতে হিন্দুদের দেখাদেখি দুর্গাপূজাও করত। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার লিখিত গেজেটে এই তথ্য পাওয়া যায়।[৮]

হাণ্টারের এই গেজেটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত তাঁর 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন : "বাংলার কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানও দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন—একথা সুপ্রসিদ্ধ। এর বড় কারণ বোধ হয় এই যে, ওহাবী প্রভাবের পূর্বে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা প্রতীক-চর্চার একান্ত বিরোধী ছিল না।"[৯]

শারদোৎসবকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান—সবার উৎসব করে তুলতে হলে প্রতিমাপূজার বাইরে এর যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি রয়েছে, সচেতন উদ্যোগের দ্বারা সেগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে না তুলে উপায় নেই। ■

তথ্যসূত্র

১ দুর্গাপূজা : সেকাল থেকে একাল—বিমলচন্দ্র দত্ত, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচার, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৭
২ দেবীপুরাণ, ২২।২৩
৩ শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৯৮৫, পৃঃ ভূমিকা (২৫-২৬)
৪ দ্রঃ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭; পৃঃ ৮০
৫ শ্রীশ্রীচণ্ডী, পৃঃ ভূমিকা (২৬)
৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ৮০
৭ বাঙালির দুর্গোৎসব—ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শারদীয় উৎসব ১৪০৬, পৃঃ ৩৮
৮ দুর্গা : বাঙালি মুসলমান—আবদুর রউফ, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০০, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পৃঃ ২৮৬
৯ কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলি, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃঃ ৩২৫

এই রচনাটি 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দ ও মুম্বাইয়ের ছবিলদাস পরিবার

স্বামী শুদ্ধরূপানন্দ*

এই মূল্যবান রচনাটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়। লেখাটি ইতঃপূর্বে 'বেদান্ত কেশরী' ও প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—একটু ভিন্নরূপে। বিদগ্ধ অনুবাদককে অনুরোধ করা হয়েছিল, যদি প্রয়োজন মনে করেন, তিনি বক্তব্যগুলি আগে-পরে সাজিয়ে নেবেন। অতএব পুনর্বিন্যাস-হেতু 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী'তে যে-লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে, এটিকে তার হুবহু অনুবাদ বলা যাবে না।

কোন উল্লেখপঞ্জী (list of reference) অনূদিত নিবন্ধে দেওয়া হয়নি। স্বামীজী সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রাসঙ্গিক reference প্রবন্ধের ভিতরে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। শুধু ছবিলদাস পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কিত যেসব মারাঠি, গুজরাটি ও ইংরেজি নির্দেশিকা মূল নিবন্ধে ছিল, অনুবাদকের বিবেচনায় সেগুলি অপ্রয়োজনীয় বিধায় বাদ দেওয়া হয়েছে।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা তাঁর জীবনের একটি অধ্যায়ে মুম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত গুজরাটি ব্যবসায়ী ছবিলদাস লালুভাই, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার রামদাস ছবিলদাস ও জামাতা পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নামের উল্লেখ দেখতে পাবেন। তবে জীবনীতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম দুজনকে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত না করায় কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নানা সূত্র থেকে স্বামীজীর জীবনের ঐ পর্যায়ের কয়েকটি ঘটনার যে-বিবরণ পাওয়া যায় তাতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, একসময়ে ছবিলদাস পরিবারের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে আমরা ঐসব তথ্য একত্র করে যথাসম্ভব সুসম্বদ্ধ একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার জন্য সর্বাগ্রে স্বামীজীর জীবনের এই অধ্যায়ের মুখ্য পার্শ্বচরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

■ ছবিলদাস লালুভাই ■

ছবিলদাস লালুভাই ১৮৩৯ সালে মুম্বাই শহরের এক গুজরাটি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পরিবার ছিল চেওয়ালী ভানশালী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন অংশে 'ভানুশাল' নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন—ভানশালীরা তাঁরই বংশধর। বেলুচিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) প্রদেশের মরুতীর্থ হিংলাজের[১] অধিষ্ঠাত্রী মাতা হিংলাজ ছিলেন এঁদের কুলদেবী। পরবর্তী কালে ভানশালীরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পরিত্যাগ করে দক্ষিণে নেমে আসেন ও পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে কচ্ছ, সোরাঠ (কাথিয়াওয়াড়), সুরাট, সিন্ধু ও চেওয়ালে বসতিস্থাপন করেন। এঁদের যে-শাখাটি মুম্বাই বন্দরের বিপরীতে অবস্থিত চেওয়ালে বসতি করে, সেটি চেওয়ালী ভানশালী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, চেওয়ালে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর দেবী হিংলাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় লোকেদের কাছে ইনি 'হিঙ্গলদেবী' নামে পরিচিতা। প্রতিবছর পৌষ পূর্ণিমার সময়ে এখানে তিন-চারদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ছবিলদাসের পিতার নাম ছিল লালুভাই জয়রামদাস। গুজরাটিদের সাধারণ ধারা অনুযায়ী ভানশালীরাও সম্প্রদায়গতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকেই বৃত্তি হিসাবে পছন্দ করত। ছবিলদাস লালুভাইয়ের কর্মজীবন শুরু হয় খুবই অল্প বয়সে। যখন তিনি মাত্র তেরো বছরের, তখন 'মেসার্স কুলার পামার কোম্পানি'র মুম্বাই শাখায় ১৫ টাকা মাসিক বেতনে

* রামকৃষ্ণ মঠ, জয়পুরে সেবারত সন্ন্যাসী, ছবিলদাসের বংশধর।

চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। তাই কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়ে গেলেই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন ও কয়েকটা বড় দেশি নৌকা কিনে তাই দিয়ে মুম্বাই বন্দরে আগত জাহাজের মাল খালাস করা ও তোলার ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন এবং তার ফলে ঐধরনের কাজের অনেকখানি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কলকাতা বন্দর ও চিনদেশের ঐজাতীয় কাজের বরাত পাওয়ার জন্য তিনি মুখ্য কমিশন এজেন্ট গেলাভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর ১৮৬৪ সালে তিনি স্বয়ং 'ব্রে ও ম্যাকিন্টস কোম্পানি'র মুখ্য কমিশন এজেন্ট হন। এইভাবে তিনি তৎকালীন ব্যবসায়ী সমাজের একজন অগ্রণীব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সুবিধার্থে তিনি নিজস্ব একটি বাষ্পীয় পোত কেনেন। সেটির নাম ছিল 'গ্যালিলিও'—তৎকালে যার বিমামূল্য ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সেসময়ে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলির খুব রমরমা চলছিল। পৃথিবীর সর্বত্র এবং ভারতবর্ষেও বিলাতি কাপড় খুব জনপ্রিয় ছিল—তার চাহিদা ছিল প্রচুর। বাজারের এই তেজি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ছবিলদাস তাঁর বাষ্পীয় পোত 'গ্যালিলিও'তে করে বিলাতি কাপড় আমদানি করতেন। তা মুম্বাইয়ের পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে তিনি বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন। তাছাড়া সৌরাষ্ট্রের জামনগরে তাঁর নিজস্ব একটি কারখানা ছিল; সেখানে হাতির দাঁতের সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি হতো। 'গ্যালিলিও'তে করে তিনি সেই সব জিনিসপত্র ও আরো নানা আকর্ষণীয় দ্রব্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করতেন। ভারত সরকারকে চার হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে তিনি পশ্চিম ভারতের কয়েকটি বন্দর মারফত বাণিজ্য করার অনুমতি পান। তিনিই ছিলেন ফরাসি দেশে গমনকারী প্রথম ভারতীয় ব্যবসায়ী। এজন্য সেদেশের সরকারের তরফ থেকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের সূত্রে তিনি আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। আমরা পরে দেখব, এইরকম এক যাত্রায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহযাত্রী ছিলেন।

ছবিলদাস লালুভাই

আমদানি-রপ্তানি ছাড়া ছবিলদাস লালুভাই সরকারি ও বেসরকারি গৃহাদি নির্মাণের ঠিকাদারি ব্যবসাতে হাত দেন এবং তাতেও প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। মুম্বাই-পুনা রেলপথের কর্জট থেকে লোনাওয়ালা অংশের বেশ কিছু রেললাইন সংক্রান্ত নির্মাণের বরাত হাতে নিয়ে তিনি সেই কাজ সুসম্পন্ন করেন। মুম্বাই শহরের অনেকগুলি বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রেও তিনিই ঠিকাদার ছিলেন; দাদার অঞ্চলে তাঁর তৈরি করা এবং মালিকানাধীন কয়েকটি বাড়ি এখনো বর্তমান। গৃহনির্মাণের কাজে অসাধারণ সংগঠনদক্ষতা তাঁকে প্রায় প্রবাদপ্রতিম পুরুষে পরিণত করে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একরাত্রের মধ্যে একটি চওল[২] পুনর্নির্মাণের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুম্বাইয়ের নালবাজার অঞ্চলে ছবিলদাস লালুভাইয়ের একটি চওল ছিল। ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাসে একদিন হঠাৎ আগুন লেগে চওলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার ফলে ছবিলদাসের ৫২,০০০ টাকার মতো লোকসান হয়। উপরন্তু তৎকালীন মিউনিসিপাল কমিশনার ক্রফোর্ড সাহেবের কাছে চওলটি পুনর্নির্মাণের অনুমতি চাইতে গেলে তিনি 'জমিটি এখন সরকারের বর্তেছে'—এই অজুহাতে এককথায় 'না' বলে দেন। ছবিলদাস কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। কথিত আছে, বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি ও মজুর লাগিয়ে এবং ইঁট, পাথর, কাঠ প্রভৃতি জিনিসপত্র যোগাড় করে তিনি একরাত্রের মধ্যে সমগ্র চওলটি পুনর্নির্মাণ করে ফেলেন। সকাল হলে দেখা যায়, সেইখানে আগের মতোই একটি চওল দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘটনার পর খবরের কাগজে শিরোনাম বেরিয়ে যায়—'একরাত্রে চওল নির্মাণকারী ছবিলদাস'।

বৃহত্তর মুম্বাই ও তার আশপাশে ছবিলদাসের বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল। তার মধ্যে খাস মুম্বাইয়ে নেপিয়ন সি রোডের 'সমুদ্রভিলা' নামে বিশাল অট্টালিকা, আর মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে বোরিভিলি ফ্যাক্টরি লেনের বাগানঘেরা সুসজ্জিত বাংলোটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রভিলা ছিল ছবিলদাস পরিবারের মুখ্য বাসগৃহ। বোরিভিলির বাংলোটি তিনি অনেক সময় ব্যবহার করতেন তাঁর ইংরেজ বন্ধু ও ব্যবসায়সূত্রে পরিচিত সাহেব-

সুবোদের আপ্যায়নের জন্য। এছাড়াও মুম্বাই শহরে ছড়ানো অন্তত ছয়-সাতটি ঠিকানায় ছবিলদাসের বাড়ি বা জমি ছিল। মুম্বাইয়ের বাইরেও গোরেগাঁও, থানে এবং অন্যত্র তাঁর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল, বেশ কিছু গ্রামও তাঁর স্বত্বাধীন ছিল। তার মধ্যে বোরিভিলি সন্নিকটবর্তী সালসেট দ্বীপ, সেখানে অবস্থিত কানহেরি গুহাশ্রেণি ও সেখানকার কয়েকটি গ্রাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ছবিলদাসের কর্তৃত্ব এইসব নিজস্ব সম্পত্তির বাইরেও প্রসারিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বোরিভিলি, কানহেরি প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গ্রামের 'খোট' বা রাজস্ব আদায়ের অধিকর্তা নিযুক্ত করেন।

ছবিলদাস সমুদ্রভিলায় সপরিবারে রাজকীয় মর্যাদায় বাস করতেন। সেকালে অভিজাত মহলে 'শিগ্রাম' নামে একরকমের বড় ঘোড়ার গাড়ির চলন ছিল। ছয়টি অথবা আটটি ঘোড়া ঐ গাড়ি টানত। সাধারণত ইংরেজ লাটসাহেব, জজ বা ঐ শ্রেণির উচ্চ পদাধিকারীরাই শিগ্রাম ব্যবহার করতেন। ছবিলদাসের নিজস্ব একটি শিগ্রাম ছিল। যেসব ঘোড়ায় সেটি টানত তাদের রাখার জন্য সমুদ্রভিলার নিচের তলায় একটি বড় আস্তাবল ছিল। ছবিলদাসের শিগ্রাম একবার রাস্তায় লাটসাহেবের শিগ্রামকে অতিক্রম করে যাওয়ায় সরকার থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সুচতুর ছবিলদাস নিপুণভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করে সেই মকদ্দমা খারিজ করিয়ে দেন।

ছবিলদাস লালুভাই দুবার বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে রামদাস ও কর্সনদাস নামে দুই পুত্র ও ভানুমতী নামে এক কন্যার জন্ম হয়। রামদাস ও কর্সনদাস দুজনেই বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে মুম্বাইয়ে আইন ব্যবসায় রত হন। ভানুমতীর বিবাহ হয় প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। পরবর্তী কালে শ্যামজী স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ছবিলদাস পরিণত বয়সে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁর জনমেজয় ও ভদ্রসেন নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ও উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মুম্বাইয়ে 'আর্যসমাজ'-প্রভাবিত এক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্বাসরোধকারী নিগড় থেকে মুক্ত করা এবং হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বাধ্যতামূলক বৈধব্যজীবন যাপন, সতীদাহ, বিগ্রহপূজা প্রভৃতি প্রথা দূরীভূত করা ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন এর উদ্যোক্তা। এই আন্দোলনের পিছনে মুম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সমাজের সমর্থন ছিল। ছবিলদাস লালুভাই ও তাঁর পরিবারের অনেকে দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। উল্লেখ্য যে, মুম্বাইয়ে আর্যসমাজের প্রথম দিককার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ছবিলদাস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তবে সম্ভবত ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছবিলদাস শেষ অবধি কট্টর আর্যসমাজপন্থী ছিলেন না। তাঁর মুম্বাইয়ের গুলালওয়াড়ী অঞ্চলে রামমন্দির নির্মাণ করা ও মৃত্যুর পর সনাতন-মতে শ্রাদ্ধশান্তি, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতির জন্য নিজের 'উইল'-এ অর্থের সংস্থান রেখে যাওয়া থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত মনে হয় না।

প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেও মানুষের প্রতি ভালবাসা ছবিলদাসের সহজাত ছিল। জনহিতকর কার্যে
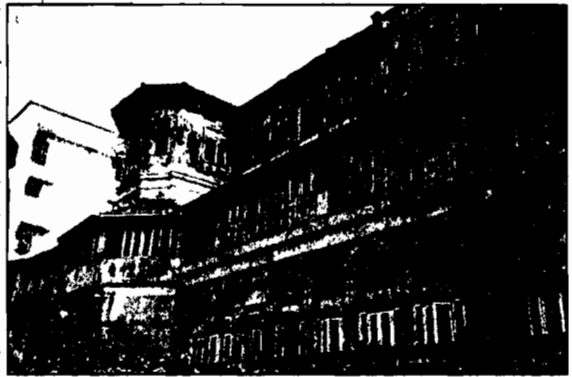
স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত 'সমুদ্রভিলা'—এখন যেমন

তিনি অকৃপণ হস্তে দান করতেন। ১৮৭৪ সালে মুম্বাইয়ে প্লেগ মহামারির প্রকোপ হলে আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ শহর ছেড়ে দলে দলে পালাতে শুরু করে। তাদের জন্য ছবিলদাস মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে গোরেগাঁওয়ে নিজের জমিতে অনেক আশ্রয়শিবির খুলে দেন। এরপরে একবার তাঁর জমিদারি যেখানে ছিল, সেখানে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি তখন সেই অঞ্চলের শত শত অনাথ শিশুকে একবছর ধরে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন। ১৯০৫ সালে যখন লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নির্মিত হয়, ছবিলদাস তার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। এই 'ইণ্ডিয়া হাউস' বিলেতে শিক্ষারত ভারতীয় ছাত্রদের একটি প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এখানে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্ম করতেন। ১৯১৪ সালে ছবিলদাস লালুভাইয়ের দেহাবসান হয়। তাঁর শেষ উইলে তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজের

জন্য অর্থের সংস্থান রেখে যান। তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য হাসপাতাল, বিদ্যালয়, শিল্পপ্রযুক্তি শিক্ষালয় প্রভৃতি নির্মাণ ও ছাত্রবৃত্তির প্রবর্তন এবং বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস তথা দরিদ্রদের আবাসগৃহ প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। ছবিলদাসের মৃত্যুর পর তাঁর উইলের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পুত্র জনমেজয় মুম্বাইয়ের দাদার অঞ্চলে একটি দ্বিতল বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। 'ছবিলদাস লালুভাই বয়েজ হাইস্কুল' নামে খ্যাত ও তিনহাজারের অধিক ছাত্র সম্বলিত ঐ বিদ্যালয়টি বর্তমানে মুম্বাইয়ের একটি সুপরিচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঐ বিদ্যালয় থেকে 'তিলক ব্রিজ' পর্যন্ত রাস্তা 'ছবিলদাস লালুভাই রোড' নামে পরিচিত। এছাড়া ছবিলদাস পরিবারের অর্থানুকূল্যে বোরিভিলি রেলস্টেশনের পশ্চিমে একটি প্রসূতিসদন নির্মিত হয়েছে। এটি ছবিলদাসের দ্বিতীয়া পত্নী কেশরবাঈয়ের নামাঙ্কিত।

রামদাস ছবিলদাস

■ রামদাস ছবিলদাস ■

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষে অথবা ষাটের দশকের প্রথমে ছবিলদাস লালুভাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস ছবিলদাসের জন্ম হয়। সেদিক থেকে তিনি বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে সামান্য কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তিনি মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'এলফিনস্টোন স্কুল'-এ পড়াশোনা করেন। পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ১৮৮৪ সাল নাগাদ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও এল. এল. এস. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন মুম্বাইয়ের প্রথম দেশীয় ব্যারিস্টার; এই কারণে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলে সরকার থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

রামদাস ছবিলদাস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, বিশেষ করে বেদ ও উপনিষদে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম জীবনে তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর কাছে সংস্কৃত ভাষার পাঠ নেন। দয়ানন্দ তাঁকে সংস্কৃতে শ্লোক রচনার কলাকৌশলও শিখিয়ে দেন। ১৮৮৩ সালে দয়ানন্দ সরস্বতীর তিরোধান হলে রামদাস তাঁর উদ্দেশে একুশটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। দয়ানন্দের প্রভাবে তিনি আর্যসমাজের প্রতি অনুরক্ত হন। আর্যসমাজের মুম্বাই শাখার তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

শাস্ত্রচর্চা ও দার্শনিক আলোচনায় রামদাস ছবিলদাসের প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁদের নেপিয়ন সি রোডের বাসগৃহ সমুদ্রভিলায় দুর্লভ শাস্ত্রগ্রন্থের এক মূল্যবান সংগ্রহ ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীদের রামদাস আপন গৃহে সাদরে আমন্ত্রণ করে আনতেন—তাঁর গৃহ তাই শাস্ত্রীয় বিচার ও দার্শনিক আলোচনায় সরগরম হয়ে থাকত। দয়ানন্দ সরস্বতী যে তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। আমরা পরে দেখব, স্বামী বিবেকানন্দও মুম্বাইয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন সমুদ্রভিলায় বাস করেছিলেন।

প্রথম জীবনে মুম্বাইয়ে প্র্যাকটিস করলেও পরবর্তী কালে রামদাস ছবিলদাস নাগপুরে চলে যান এবং সেখানে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করেন।[৩] তিনি নাগপুরে 'সিভিল লাইন্স'-এ একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করে সপরিবারে সেখানেই বাস করতে থাকেন। বাকি জীবন তাঁর নাগপুরেই কাটে। তাঁর দুই পুত্রও নাগপুর কোর্টের ব্যারিস্টার হন। ১৯২০ সালে নাগপুরে রামদাস ছবিলদাসের দেহান্ত হয়। নাগপুর শহরের একটি মহল্লা তাঁর নামানুসারে 'রামদাস শেঠ' নামে পরিচিত।

■ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ■

ছবিলদাস লালুভাইয়ের জামাতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার জন্ম হয় কচ্ছের মাণ্ডবিতে ১৮৫৭ সালে—কাচ্ছী শাখাভুক্ত এক ভানশালী পরিবারে। শৈশবেই লেখাপড়ায় তাঁর অদ্ভুত মেধার পরিচয় পেয়ে অভিভাবকেরা তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য মুম্বাইয়ে পাঠিয়ে দেন। মুম্বাইয়ের উইলসন হাইস্কুলে পড়ার সময় প্রতি বছর তিনি পরীক্ষায় প্রথম হতেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায় তিনি সমধিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এই সময়ে ছবিলদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। ১৮৭৫ সালে শ্যামজীর সঙ্গে ছবিলদাসের কন্যা ভানুমতীর বিবাহ হলে এই বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

আমরা আগেই দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মুম্বাইয়ে আর্যসমাজ আন্দোলন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ঐসময়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ও আর্যসমাজে যোগ দেন। তাঁর মেধা ও বিদ্যাবত্তা দেখে দয়ানন্দ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তিনি দয়ানন্দের বিশ্বস্ত সহকর্মী ও নানা কাজে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সংস্কৃত অধ্যাপকের

আবশ্যক হয়। প্রখ্যাত মনীষী স্যার মনিয়ের উইলিয়ামস দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে একজন উপযুক্ত লোক পাঠাতে অনুরোধ করেন। দয়ানন্দ ঐ পদের জন্য শ্যামজীকে মনোনীত করলে তিনি অক্সফোর্ডের অধ্যাপকরূপে ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে স্যার মনিয়েরকে তাঁর সুবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষার অভিধান রচনায় প্রভূত সাহায্য করেন। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে শ্যামজী মুম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত হন। পরবর্তী কালে তিনি রতলম, উদয়পুর ও জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ানরূপেও কাজ করেন। সম্ভবত এই পর্যায়েরই কোন এক সময়ে আজমীঢ়ে তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

ব্যবসার ক্ষেত্রেও শ্যামজী প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। মুম্বাইয়ে থাকার সময়ে শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাছাড়া তিনি তিনটি চালু কাপড়ের কলের মালিক ছিলেন—সেগুলি থেকেও তাঁর যথেষ্ট লাভ হতো। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিশেষ পরিচয় ও খ্যাতি কিন্তু অন্য দিক থেকে—তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অগ্রণী নায়ক। প্রথম জীবনেই তাঁর মনে স্বদেশকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। তাঁর অর্জিত ধনসম্পদ তিনি এই উদ্দেশ্যে অকাতরে ব্যয় করতে থাকেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাঁর এইসব কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, নানাভাবে ফাঁদ পেতে তারা তাঁকে হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। দু-একবার তিনি ধরাও পড়েন, কিন্তু ছবিলদাস লালুভাইয়ের জামাতা হওয়ার সুবাদে অব্যাহতি পেয়ে যান।

ক্রমে শ্যামজীর মনে প্রতীতি জন্মায় যে, ভারতের মাটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে-বীজ উপ্ত হয়েছে, তাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কাউকে দেশের বাইরে গিয়ে সেখান থেকে আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবে। ১৮৯৭ সালে এই উদ্দেশ্যে তিনি সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেন। সেখানে বাসকালে তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন। প্রবাসী ছাত্রদের সাহায্যার্থে তিনি বেশ কয়েকটি বৃত্তির প্রবর্তন করেন। বৃত্তিগুলি রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, দয়ানন্দ সরস্বতী, বাহাদুর শাহ্ জাফর, টিপু সুলতান প্রমুখ ভারতীয় বীর ও মনীষীদের নামাঙ্কিত ছিল। সম্প্রদায় নির্বিশেষে যেকোন ভারতীয় ছাত্র এগুলির সাহায্যে বিদেশে পড়াশোনা করতে পারত। শর্ত ছিল একটিই—বৃত্তিভোগীরা পরবর্তী জীবনে সরকারি চাকরি করতে পারবে না এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। যাঁরা এই বৃত্তির সুযোগ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীর সাভারকর, রানাডে ও বাপতের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ডে শ্যামজী ইংরেজ মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সারের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় তিনি 'Indian Sociologist' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরত এবং ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করত। পরে তিনি 'হোম রুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন—এটির অভীষ্ট ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা ও সেই উদ্দেশ্যে প্রচার করা। ১৯০৫ সালে শ্যামজীর উদ্যোগে লণ্ডনের অভিজাত এলাকায় 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে একটি বৃহৎ ভবন নির্মিত হয়। এর একতলাটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাসস্থানে পরিণত হয়। এখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নানা পরিকল্পনা ও কর্মধারা রচিত ও নিরূপিত হতো। নানা ধরনের সাহিত্য, প্রচারপুস্তিকা, এমনকি বিস্ফোরক পদার্থও এখান থেকে ভারতে চালান যেত।

শ্যামজীর এইসব কাজকর্মের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগেই তিনি প্যারিস ও সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায় চলে যান। বাকি জীবন তিনি জেনিভাতে থেকেই আপন কাজকর্ম পরিচালনা করেন। সেখানেই ১৯৩০ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। শ্যামজীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহাবশেষ ভারতে আনা হয়েছে। ২০০৩ সালে কচ্ছে একটি নতুন বিমানবন্দর চালু করা হলে সেটি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নামাঙ্কিত করা হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের আগে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অগ্রণী নায়করূপে পরিচিত ছিলেন।

ছবিলদাস লালুভাই ও তাঁর পরিজনবর্গের যে-পরিচয় ওপরের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বাইয়ের ছবিলদাস পরিবারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। শুধু যে বিত্তের জন্যই পরিবারটি গৌরবান্বিত হয়েছিল তা নয়, বিদ্যাবত্তা ও সংস্কৃতিমনস্কতার দিক থেকেও পরিবারের একাধিক সদস্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আবার এঁদের বিদ্যা কোনক্রমেই একপেশে ছিল না। একদিকে যেমন এঁদের অনেকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তেমনি অনেকেরই সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র

চর্চায় আগ্রহ ও সেবিষয়ে ব্যুৎপত্তি ছিল। ওপরে যে-তিনজনের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের কোন না কোন পর্বে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। আমরা এখন সেই কাহিনী বিবৃত করব।

■ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ■

ছবিলদাসের পরিজনবর্গের মধ্যে তাঁর জামাতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাই সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে মুম্বাই থেকে অনেক দূরে আজমীঢ় শহরে। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে (The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. I, 6th edn. Advaita Ashrama, pp. 283, 286) আছে যে, তিনি ১৮৯১ সালের ৭ আগস্ট থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত খেতড়িতে থেকে তারপর আজমীঢ়ে যান। আজমীঢ়ের তৎকালীন বাসিন্দা হরবিলাস সর্দা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বামীজী তিন-চারদিনের জন্য সেখানে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। এরপর তিনি বীওয়ারে চলে যান। সেইসময় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা আজমীঢ়েই থাকতেন, কিন্তু কয়েকদিনের জন্য মুম্বাই গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি হরবিলাস সর্দার মুখে স্বামীজী ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা তথা স্বদেশপ্রেমের কথা শোনেন। পরের দিনই শ্যামজীর বীওয়ার যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি খোঁজ করে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আজমীঢ়ে ফিরে আসেন। এর পরে স্বামীজী আবার চোদ্দ-পনেরো দিনের মতো শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার অতিথি হয়ে আজমীঢ়ে ছিলেন। হরবিলাস সর্দা লিখেছেন, ঐসময় প্রতিদিন তিনি শ্যামজীর নিবাসে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতেন। সন্ধ্যা হলে তাঁরা তিনজন একত্রে ভ্রমণে বেরতেন। ভ্রমণকালে নানা চিত্তাকর্ষক বিষয়ে স্বামীজী কথাবার্তা বলতেন। সংস্কৃত সাহিত্য অথবা দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে শ্যামজীর সঙ্গে তাঁর নানারকম আলোচনা হতো। হরবিলাস সর্দা তাঁর স্মৃতিচারণে ঐ আনন্দময় দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

ওপর থেকে নিচে: ছবিলদাস লালুভাই, রামদাস ছবিলদাস (পুত্র), সূর্যকান্ত রামদাস (পৌত্র) ও জনক রামদাস (প্রপৌত্র)

স্বামীজী যে দু-সপ্তাহের ওপর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার আতিথ্য স্বীকার করে তাঁর গৃহে বাস করেছিলেন, তার থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি সুগভীর প্রেম দুজনেরই মজ্জাগত ছিল, দুজনেই ভারতের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখতেন। শ্যামজী এর জন্য সহিংস আন্দোলনের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা করতেন, আর স্বামীজী ছিলেন আধ্যাত্মিক জাগরণের ধ্রুব পথের দিশারি। লক্ষণীয় যে, স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার কয়েক বছর পরেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা তাঁর নিশ্চিন্ত জীবন ও জীবিকা পরিত্যাগ করে আপন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে বিদেশযাত্রা করেছিলেন।

■ মুম্বাইয়ের পথে স্বামীজী ■

১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আজমীঢ় থেকে গুজরাট অভিমুখে রওনা হন। এরপর প্রায় ছয়মাস ধরে তিনি গুজরাট, বিশেষ করে কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছ অঞ্চলের তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। কাথিয়াওয়াড়ে অবস্থানকালেই আমেরিকার শিকাগোর আসন্ন ধর্মমহাসভার কথা তাঁর গোচরে আসে। এসময়ে কাথিয়াওয়াড়ের লিমড়ির ঠাকুরসাহেব (মহারাজা), জুনাগড়ের দেওয়ান ও পোরবন্দরের দেওয়ানের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয় এবং এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত লিমড়ির ঠাকুরসাহেব যশবন্ত সিংজীর গুজরাটি জীবনীতে বলা হয়েছে যে, তিনিই স্বামীজীকে পাশ্চাত্যে গিয়ে বেদান্ত প্রচারের পরামর্শ দেন। জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই ও তাঁর অধস্তন কর্মচারী সি. এইচ. পাণ্ডিয়ার কাছে স্বামীজী স্বয়ং নিজের অনুরূপ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। আর স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে (Vol. I, p. 295) আছে যে, তিনি পোরবন্দরে থাকার সময় সেখানকার দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ তাঁর চিন্তাধারার বিস্তার ও মৌলিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলেন:

"স্বামীজী, আমার আশঙ্কা হয় আপনি এদেশে থেকে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না, এখানে অল্প লোকই আপনার গুণের মর্ম বুঝবে। আপনার পাশ্চাত্যে যাওয়া উচিত, সেখানকার লোকেরা আপনাকে ঠিক ঠিক ধরতে পারবে এবং আপনার মূল্যও বুঝতে পারবে। এটা নিশ্চিত যে, পাশ্চাত্যে সনাতনধর্ম প্রচার করে আপনি সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলতে পারবেন।" গুজরাট ভ্রমণ শেষ করে ১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের একেবারে প্রথমে স্বামীজী মহাবালেশ্বর যান ও সেখানে লিমড়ির ঠাকুরসাহেবের অতিথিরূপে আড়াই মাসের মতো কাটান। তারপর পুনা হয়ে জুনের শেষাশেষি তিনি খাণ্ডোয়া পৌঁছান।

এই কালে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবল এক আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটে। এই পর্বে একসময়ে গুজরাটের মাণ্ডবিতে স্বামীজীর সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দের সাক্ষাৎ হয়। অখণ্ডানন্দজী বিস্ময়ের সঙ্গে স্বামীজীর মুখচ্ছবিতে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন—তাঁর দেহ থেকে যেন একটি অপূর্ব দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গেও মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর দেখা হয়। স্বামীজীকে অভেদানন্দজীর মনে হয় যেন এক 'প্রদীপ্ত আত্মা'('a soul on fire')।

খাণ্ডোয়াতে স্বামীজী সেখানকার উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তিন সপ্তাহের মতো ছিলেন। এইসময়ে গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয় তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বামীজী তখন পরের বছরের শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায় যোগদানের বিষয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবছিলেন। হরিদাসবাবুকে তিনি বলেন যে, যদি কেউ এর জন্য তাঁকে পাথেয় দিয়ে সাহায্য করে, তাহলে ভাল হয়—সেক্ষেত্রে তিনি আমেরিকা যেতে প্রস্তুত আছেন। হরিদাসবাবু স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, স্বামীজী আরো কিছুদিন খাণ্ডোয়ায় থেকে যান। কিন্তু স্বামীজী তাঁকে বলেন, যদিও সেখানে থাকতে তাঁর ভালই লাগছে, তবু তাঁকে রামেশ্বরে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়, আর এভাবে নানা জায়গায় থেমে থেমে গেলেও তাঁর চলবে না। হরিদাসবাবু যখন দেখলেন, স্বামীজী বিদায় নিতে কৃতসঙ্কল্প, তখন তিনি মুম্বাইয়ে তাঁর ভাইয়ের নামে স্বামীজীকে একটি পরিচয়পত্র দিয়ে বললেন যে, তাঁর ভাই তাঁকে মুম্বাইয়ের সুপরিচিত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এরপর তিনি মুম্বাই অবধি একটি টিকিট কেটে স্বামীজীকে ট্রেনে তুলে দিলেন।

■ স্বামীজী ও রামদাস ছবিলদাস ■

স্বামীজী ১৮৯২ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে মুম্বাই পৌঁছান। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভাই তাঁর সঙ্গে রামদাস ছবিলদাসের পরিচয় করিয়ে দেন। রামদাস আন্তরিকতার সঙ্গে স্বামীজীকে তাঁর গৃহে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানান এবং স্বামীজী তাতে সম্মত হন। সেসময়ে নেপিয়ন সি রোডের বৃহৎ পারিবারিক ভবন সমুদ্রভিলায় রামদাস ও ছবিলদাস পরিবারের অন্যান্যরা বাস করতেন। স্বামীজী সেইখানে গিয়েই উঠলেন। সমুদ্রভিলা সমুদ্রতীরে অবস্থিত তিনতলা অট্টালিকা—এর দোতলা ও তিনতলায় ছিল লম্বা টানা বারান্দা। প্রসঙ্গত, স্বামীজী যে এইরকম একটি বাড়িতে বাস করেছিলেন, তার পরোক্ষ প্রমাণ আমরা পাই তাঁর 'জ্ঞানযোগকথা' আলোচনার অন্তর্গত একটি বর্ণনায়। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৪১২) সেখানে উচ্চতর বোধে পৌঁছানো যে অতি কঠিন এবং অধিকাংশ লোকের কাছেই যে বিমূর্ত তত্ত্বের চেয়ে স্থূলবস্তু বেশি সহজবোধ্য তা বোঝাবার জন্য স্বামীজী একটি দৃষ্টান্ত দেন। তার ভিতর স্পষ্টতই রামদাস ছবিলদাসদের বাড়িটির বর্ণনা আছে। স্বামীজী বলেন যে, দুটি লোক—তাদের একজন হিন্দু ও অন্যজন জৈন—মুম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে বসে সতরঞ্চ খেলছিল। বাড়িটি সমুদ্রের ধারে। খেলা দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল। যে-বারান্দায় খেলা চলছিল তার নিচে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হচ্ছিল। খেলতে খেলতে জোয়ার-ভাটা কেন হয়—তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হলো। কীভাবে খেলোয়াড় দুজনের কেউই সেখানে উপস্থিত এক তরুণ ছাত্রের দেওয়া 'চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের ফলে জোয়ার-ভাটা হয়'—এই তত্ত্ব মেনে নিল না এবং কীভাবে সুপণ্ডিত গৃহস্বামী এসে স্থূলবস্তুর মাধ্যমে এক কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে বিতর্কের নিরসন করলেন—স্বামীজীর আলোচনায় তার উপভোগ্য বিবরণ আছে। এক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো, কাহিনীর ঘটনাস্থলের যে-বর্ণনা স্বামীজী দিয়েছেন তা হুবহু সমুদ্রভিলা ও তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলে যায়।

স্বামীজী ও রামদাস ছবিলদাস প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র চর্চায় দুজনেরই সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তাই দুজনের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরি হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে, রামদাসের গৃহে সংস্কৃত গ্রন্থের এক মূল্যবান সংগ্রহ ছিল। তার ওপর স্বামীজী এখানে শাস্ত্র আলোচনার উপযুক্ত সঙ্গীও পান। ১৮৯২ সালের ২২ আগস্ট জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেনঃ "আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যয়নের

সাহায্যও জুটেছে। অন্যত্র এরূপ পাওয়ার আশা নাই; সুতরাং শেষ করে যাওয়ার আগ্রহ হয়েছে।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯) এই কারণে স্বামীজী রামদাসের অতিথি হয়ে মুম্বাইয়ে দুমাসের মতো কাটান। এই সময়ে প্রায়শই তাঁর ও রামদাসের মধ্যে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা হতো। একদিনের আলোচনার বিষয়ে আমরা জানতে পারি মহাপুরুষ মহারাজের একটি প্রতিবেদন থেকে। ১৯২৭ সালের ২৯ জানুয়ারি মহাপুরুষ মহারাজ মুম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, স্বামীজী মুম্বাইয়ে ছবিলদাসের বাড়িতে ছিলেন; শহরের নানা দ্রষ্টব্য স্থান সেসময় তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন ঃ "আর্যসমাজ-এর সভ্য রামদাস ছবিলদাস প্রথমে সাকারভাবে ঈশ্বর-উপাসনার বিরোধী ছিলেন। এই নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হতো। একদিন তিনি স্বামীজীকে বলেন, 'বেশ কথা, স্বামীজী, আপনি বলছেন—সাকারভাবে ঈশ্বরের উপাসনা, বিগ্রহপূজা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সত্য। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যদি বেদ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে এই মত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমি আর্যসমাজ ছেড়ে দেব।' উত্তরে স্বামীজী খুব জোর দিয়ে বলেন, 'অবশ্যই, আমি তা করতে পারি।' এই বলে তিনি বেদের আলোকে হিন্দুদের বিগ্রহপূজা প্রভৃতি প্রথাগুলির ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে রামদাসের বিশ্বাস উৎপাদন করে তবে ছাড়েন। প্রতিশ্রুতিমত এরপর রামদাস আর্যসমাজ ছেড়ে দেন।" এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর সংসর্গ রামদাসের অভ্যস্ত চিন্তার জগতে কী আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

'সমুদ্রভিলা'-র সামনের ফলকে বাড়ির নাম দেখা যাচ্ছে

দুমাসের মতো মুম্বাইয়ে থাকার পর সেখান থেকে স্বামীজী দক্ষিণ ভারতের পথে ট্রেনে পুনা রওনা হন। এই যাত্রায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। তিলক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে একজন সন্ন্যাসী আমার কামরায় উঠলেন। কয়েকজন গুজরাটি ভদ্রলোক তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তাঁরা আমার সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর প্রথামাফিক পরিচয় করিয়ে দিলেন ও তাঁকে পুনায় আমার বাড়িতে থাকবার জন্য বললেন।" আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, উক্ত গুজরাটি ভদ্রলোকদের একজন ছিলেন রামদাস ছবিলদাস স্বয়ং।

পরবর্তী কালেও স্বামীজীর সঙ্গে রামদাস ছবিলদাসের যোগাযোগ ছিল। ১৮৯৩ সালের মে মাসে আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী যখন আবার মুম্বাই আসেন, তখন রামদাসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঐ বছরের ২২ মে মুম্বাই থেকে খেতড়ির মহারাজাকে লেখা তাঁর একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে আছে ঃ "মুম্বাইতে আমি আমার বন্ধু ব্যারিস্টার রামদাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে-ভদ্রলোক একটু ভাবপ্রবণ স্বভাবের। মহারাজের চারিত্রিক মহত্ত্বের কথা শুনে সে এতদূর অভিভূত হয়ে যায় যে, আমাকে বলে, এই সময় যদি গ্রীষ্মের মাঝামাঝি না হতো তাহলে অবশ্যই এইরকম একজন রাজাকে দেখতে সে খেতড়ি ছুটত।"

■ স্বামীজী ও ছবিলদাস লালুভাই ■

১৮৯২ সালে রামদাসের অতিথি হয়ে সমুদ্রভিলায় থাকার সময় স্বভাবতই গৃহকর্তা ছবিলদাস লালুভাইয়ের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয় পরের বছর স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার কালে। ১৮৯৩ সালের ৩১ মে স্বামীজী 'পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানি'র 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে মুম্বাই থেকে আমেরিকার পথে জাপান-যাত্রা করেন। ছবিলদাস লালুভাই[৪] সেই জাহাজে জাপান অবধি তাঁর সহযাত্রী ছিলেন—তিনি নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে সেইসময় আমেরিকা যাচ্ছিলেন। পরে আমেরিকায় পৌঁছে শিকাগোয় কয়েকদিন থাকার পর, ধর্মমহাসভার তখনো অনেক দেরি আছে দেখে স্বামীজী জুলাইয়ের শেষে ট্রেনে করে শিকাগো থেকে বোস্টন যান। ছবিলদাস এই যাত্রায়ও স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন।[৫] তিনি তখন ইংল্যাণ্ডের পথে শিকাগো থেকে বোস্টন যাচ্ছিলেন। ১৮৯৩ সালের ২০ আগস্ট স্বামীজী 'মেটকাফ, ম্যাসাচুসেটস' থেকে তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে—(ছবিলদাস) লালুভাই যে তাঁর সঙ্গে বোস্টন পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন, সেকথার উল্লেখ আছে। ঐ চিঠিতেই অন্যত্র আছে ঃ "রামদাসের পিতা ইংল্যাণ্ডে গিয়াছেন। তিনি বাড়ি যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহার অন্তরটা খুব ভাল। উপরটায় কেবল বেনিয়াসুলভ কর্কশতা।" (বাণী ও রচনা,

৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯) এর আগে ছবিলদাসের জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখেছি, তিনি প্রথাগত শিক্ষালাভ করার বিশেষ সুযোগ পাননি। কিন্তু অসাধারণ পুরুষকারের বলে নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবনে সাফল্যলাভ করেছিলেন। স্বামীজী বরাবর তাঁর শিষ্য ও পরিচিতদের উৎসাহিত করতেন ইংরেজদের খোশামোদ করে চাকরি যোগাড় করার পরিবর্তে স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবসায়ে নামতে। কাজেই স্বামীজী যে ছবিলদাসের মতো কর্মবীরের গুণগ্রাহী হবেন এবং বাইরের অপরিশীলিত চেহারার অন্তরালে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে পারবেন—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ছবিলদাসের হৃদয়বত্তা ও বিদেশে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো তথ্য আমরা পাই স্বামীজীর ভক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষের[৬] একটি চিঠি থেকে। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর মুম্বাই থেকে খেতড়ির দেওয়ান জগমোহনলালকে অক্ষয়কুমার লেখেন ঃ "আমার আগের চিঠির জের টেনে আমি আপনাকে স্বামীজীর বিষয়ে নতুন কিছু সংবাদ দিচ্ছি। আজ সকালে স্বামীজীর খবর জোগাড় করার উদ্দেশ্যে আমি মিঃ ছবিলদাসের ওখানে গিয়েছিলাম, এইমাত্র ফিরছি। বোস্টনে দুজনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত মিঃ ছবিলদাস বরাবর পূজ্যপাদ স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় স্বামীজীর কাছে টাকাকড়ি ঠিক কত আছে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর কাছে মাত্র ১০০ পাউণ্ড আছে। মিঃ ছবিলদাসের মনে হয় যে, ঐ যৎসামান্য অর্থে শিকাগোতে বড়জোর তিন-চার দিন থাকা চলবে, কারণ আমেরিকাতে সব কিছুই ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পাঁচগুণ মহার্ঘ। সম্ভব হলে ইউরোপে যাওয়ার এবং সেখানে বেশ কিছুদিন—একবছরের মতো—কাটাবার ইচ্ছাও স্বামীজীর মনে ছিল। এইসব শুনে মিঃ ছবিলদাস স্বামীজীকে অনুরোধ করেন যে, যখনি তাঁর অর্থের প্রয়োজন হবে তিনি যেন ছবিলদাসের লণ্ডনের অফিসে তার করেন। দেশে ফেরার পথে তিনি তাঁর লণ্ডনের প্রতিনিধিকে এসম্বন্ধে নির্দেশও দিয়ে রাখেন। বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেও ছবিলদাস দুবার স্বামীজীকে তার করেন, কিন্তু কোন জবাব পাননি। এরপর লণ্ডন থেকে আবার তিনি গুরুজীকে [স্বামীজীকে] জিজ্ঞাসা করে পাঠান—তিনি তখনি দেশে ফিরতে ইচ্ছুক কিনা? প্রত্যুত্তরে স্বামীজী জানান, 'আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আমার ফিরতে এখনো অনেক দেরি'।"

■ স্বামীজীর কানহেরি গুহা দর্শন ■

১৮৯২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছবিলদাস পরিবারের অতিথিরূপে থাকার সময় স্বামীজী মুম্বাই ও তার আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। স্বামীজী ঐসময় 'এলিফ্যাণ্টা' গুহায় যেতে পারেননি। তার কারণ, তখন বর্ষাকালে আরবসাগর অতিরিক্ত বিক্ষুব্ধ ও বিপদসঙ্কুল থাকায় সেখানে যাতায়াতের লঞ্চ-সার্ভিস বন্ধ ছিল। তবে কানহেরির গুহাশ্রেণি স্বামীজী দেখতে গিয়েছিলেন। এই গুহাশ্রেণি মুম্বাই থেকে মাইল কুড়ি দূরে বোরিভিলির সন্নিকটস্থ সালসেট দ্বীপে অবস্থিত। আমরা আগেই দেখেছি যে, এই সালসেট দ্বীপ ছিল ছবিলদাস লালুভাইয়ের নিজস্ব জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপটি বস্তুত মূল ভূখণ্ডেরই অংশ—ছোট একটি নদী মূল ভূখণ্ড থেকে একে পৃথক করে রেখেছে, বাকি তিনদিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। এখানে অবস্থিত কানহেরি গুহাশ্রেণি পশ্চিম ভারতের বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধ গুহাশ্রেণির অন্যতম। কানহেরিতে একশোরও অধিক গুহা আছে। খ্রিস্টীয় যুগের আদি পর্বে বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুরা এইসব গুহায় বাস করতেন; সেসময়ে এই গুহাশ্রেণি বৌদ্ধদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। গুহাশ্রেণির কাছ দিয়ে যে প্রধান সড়ক ছিল, তাই দিয়ে সাধারণ লোকেরা ধর্মোপদেশলাভের জন্য নিয়মিত এখানে আসত। কথিত আছে যে, ৪ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ এখানকার সুবৃহৎ চৈত্যগৃহটি উৎসর্গ করেন। এই মর্মে একটি শিলালিপি এখানকার প্রবেশপথের পাশে খোদিত আছে। বুদ্ধঘোষ কানহেরি থেকেই সিংহলে যান এবং সেখান থেকে আবার ব্রহ্মদেশে গিয়ে সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

১৮৯২ সালে মুম্বাইয়ের কোলাবা থেকে আন্ধেরি অবধি ট্রেন-পরিষেবা চালু ছিল। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, স্বামীজী, রামদাস ও সম্ভবত ছবিলদাসেরও সঙ্গে সমুদ্রভিলার নিকটতম স্টেশন গ্রাণ্ট রোডে ট্রেন ধরে আন্ধেরি অবধি গিয়ে সেখানে থেকে ঘোড়ার গাড়িতে বোরিভিলি গিয়েছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁরা ছবিলদাসের আট-ঘোড়ার গাড়ি শিগ্রামে চেপে সোজা নেপিয়ন সি রোডের বাড়ি থেকে বোরিভিলি গিয়েছিলেন। বোরিভিলিতে ছবিলদাসের যে একটি নিজস্ব বাংলো ছিল, যেটি তিনি সাহেব-সুবোদের আপ্যায়নের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন—তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। খুবই সম্ভব যে, ছবিলদাস পরিবার স্বামীজীকেও ঐ বাংলোয় রেখে অতিথি সৎকার করেছিলেন। বস্তুত, বোরিভিলিতে ঐরূপ বৃহৎ নিজস্ব একটি বাংলো থাকতে গৃহস্বামীরা যে একদিনেই স্বামীজীকে কানহেরি দেখিয়ে নেপিয়ন সি রোডের বাড়িতে ফিরে আসবেন তা একরকম অসম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজী কোনকিছু ওপর ওপর ভাসা ভাসা দেখার পাত্র ছিলেন না। কানহেরিতে গিয়ে তিনি অবশ্যই সেখানকার প্রতিটি গুহা

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তবে ছেড়েছিলেন। পাথর কেটে তৈরি গুহা-স্থাপত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর সুগভীর আগ্রহ ছিল। অনুমান করা যায় যে, এখানকার ১, ২ ও ৩ নং গুহার বৃহদাকার স্তম্ভ ও স্তূপের গঠনশৈলী ও ভাস্কর্য দেখে স্বামীজী মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ৩ নং গুহায় অবস্থিত চৈত্যগৃহ ও ১০ নং গুহার সমাবেশকক্ষ দেখেই স্বামীজীর মাথায় বেলুড়ের ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রার্থনাকক্ষের সম্মুখভাগে অনুরূপ অলঙ্করণ করার কথা আসে।[৭] এইসবের ভিত্তিতে এটা মনে করা মোটেই অসঙ্গত নয় যে, স্বামীজী বোরিভিলির বাংলোতে কয়েকদিন থেকে কানহেরির গুহাগুলি বেশ কয়েকবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করেছিলেন। শুধু একবার দেখে এত সবিস্তারে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হতো না।

কানহেরির গুহাশ্রেণি স্বামীজীর মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল তা আমরা জানতে পারি অন্য একটি সূত্র থেকে। কানহেরি দর্শনের কয়েক বছর পরে আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছে স্বামীজী এর বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ভগিনী ক্রিস্টিন পরবর্তী কালে এসম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন (Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, 3rd Edn., 1983) যে, সহস্র-দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী একদিন বলেনঃ "ভারতের এক রমণীয় স্থানে আমাদের একটি কেন্দ্র হবে। সেটি হবে তিনদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা এক দ্বীপের ওপর। সেখানে ছোট ছোট গুহা থাকবে—তার প্রতিটিতে দুজন করে আবাসিক থাকতে পারবে। গুহাগুলির মাঝে মাঝে স্নানের জন্য জলাধার থাকবে। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত থাকবে পানীয় জলবাহী নল। একটি বড় সভাকক্ষ থাকবে, তার থামগুলি হবে খোদাইয়ের কাজ করা। আর উপাসনার জন্য থাকবে অধিকতর কারুকার্যমণ্ডিত একটি চৈত্যগৃহ। রীতিমতো সৌখীন ব্যবস্থা!" ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেন যে, স্বামীজীর ঐ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনে তখন সকলেরই মনে হয়েছিল, তিনি আকাশকুসুম কল্পনা করছেন। বাস্তবে যে ঐরকম একটি স্থানের অস্তিত্ব থাকতে পারে তা তাঁরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

'সমুদ্রতিলা' থেকে দৃশ্যমান আরবসাগর

এর বেশ কয়েক বছর পরে ভগিনী ক্রিস্টিন ভারতে আসেন। সেসময়ে একবার যখন তিনি মুম্বাই যান, তাঁর কানহেরির গুহাগুলি দেখার ইচ্ছা হয়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বোরিভিলি অবধি ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে তিনি একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আর রাস্তা না থাকায় তিনি এবং গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পায়ে হেঁটে এগোতে থাকেন। ক্রিস্টিন লিখেছেনঃ "আমরা অল্পদূর যাওয়ার পরই একটি ছোট নালা পড়ল। সেসময় তাতে জল ছিল না বললেই হয়। ওপারে একটা ছোট পাহাড়। তার ওপর অবধি ধাপে ধাপে পাথর-কাটা সিঁড়ি। চূড়ায় ওঠামাত্র এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনদিকে সমুদ্র, ভাস্কর্যমণ্ডিত বিশাল সভাকক্ষ, চৈত্যগৃহ, ছোট ছোট কুঠুরি—তার প্রতিটিতে দুটি করে প্রস্তর-শয্যা, কুঠুরিগুলির মাঝে মাঝে জলাধার, এমনকি জলবহনকারী নল পর্যন্ত। মনে হলো যেন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বপ্ন বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই পরিত্যক্ত বিহারভূমির খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস আমেরিকায় বহুদিন আগে শোনা কল্পকাহিনীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়লাম।"

কানহেরি থেকে ফিরে এসে কলকাতায় স্বামী সদানন্দের কাছে ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তাতে স্বামী সদানন্দ বলেনঃ "হ্যাঁ, আমেরিকা যাওয়ার আগে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করার সময় স্বামীজী ঐ গুহাগুলি দেখেছিলেন। জায়গাটি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মনে হয়, কোন পূর্বজন্মে তিনি ওখানে বাস করেছিলেন—সেই স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। তাঁর আশা ছিল, কোন একদিন জায়গাটি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে।" স্বামীজী জানতেন, কানহেরির গুহাশ্রেণি ছবিলদাস লালুভাইয়ের নিজস্ব জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি চাইলে রামদাস ছবিলদাস বা ছবিলদাস লালুভাই যে তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের জন্য জায়গাটি দেবেন, সেসম্বন্ধে স্বামীজী নিঃসন্দেহ ছিলেন। মনে হয় এই কারণেই তিনি ভবিষ্যতে কানহেরিতে একটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলার আশা পোষণ করতেন।

■ মুম্বাইয়ে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ■

মুম্বাইয়ে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির মধ্যে ছবিলদাস পরিবারের মূল বাসগৃহ সমুদ্রভিলা অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজী এখানে দুমাসের মতো বাস করেছিলেন। ছবিলদাসের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কেশরবাঈ ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই বাড়িটি দোরাব শা বোমানজী দুবাশ নামে মুম্বাইবাসী এক পারসি ভদ্রলোককে বিক্রি করে দেন। এটির এখনকার ঠিকানা—দোরাব শা লেন, নেপিয়ন সি রোড। (বাড়ির ক্রেতার নামে এর সামনের গলিটির নামকরণ হয়)[৮] এর বর্তমান স্বত্বাধিকারী বিলাসরায় মহাবীরপ্রসাদ বদ্রীপ্রসাদ। তিনতলা বাড়িটির এখন নিতান্ত ভগ্নদশা। সামনের গাড়িবারান্দাটি মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছে—সেখানে মালিকের নিযুক্ত পাহারাদারেরা থাকে। ভিতরের মূল অংশের অবস্থা বিপজ্জনক। নিচের তলার আস্তাবলটি এখনো দেখা যায়। বাড়িটির অবস্থান সমুদ্রের ধারে। দোতলা ও তিনতলায়, স্বামীজীর বর্ণনায় যেমন আছে, সেইরকম লম্বা টানা বারান্দা। পিছনে প্রতি তলায় মূল বাড়ির সঙ্গে যুক্ত আরেকটি তিনতলা বাড়ি সংলগ্ন—এখানে ভৃত্যদের থাকবার ঘর, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। নির্মাণের মালমশলার ধরন ও গঠনশৈলী দেখে বোঝা যায় যে, বাড়িটি অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো। অট্টালিকাটি দেখলে এটি যে একজন রীতিমতো ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসগৃহ ছিল, সেসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

ছবিলদাসের মৃত্যুর পর কেশরবাঈ দুই পুত্র জনমেজয় ও ভদ্রসেনের সঙ্গে বোরিভিলির বাংলোতে বাস করতেন। পরবর্তী কালে এই বাংলোটির উত্তরাধিকার জনমেজয়ের কন্যা হংসবেন গোরাগান্ধীর ওপর বর্তায়। বছর কুড়ি-বাইশ আগে তিনি এটি ভেঙে এর জায়গায় একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ করেন। আমরা এর আগে দেখেছি যে, পারিপার্শ্বিক বিচার করে মনে হয়, স্বামীজী কানহেরির গুহাদর্শন উপলক্ষ্যে বোরিভিলি গিয়ে ছবিলদাসের সেখানকার বাংলোতে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। হংসবেন গোরাগান্ধীর প্রতিবেদন থেকে আমরা এর প্রত্যক্ষ সমর্থন পাই। স্বামীজী যখন বোরিভিলির বাংলোয় ছিলেন, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় আশপাশের অঞ্চল থেকে অনেকে তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতে আসত। এদের মধ্যে একজন ছিল অল্পবয়স্ক বালক, তার নাম চন্দ্রকান্ত। সে তার পিতার সঙ্গে আসত। স্বামীজীকে দর্শন করে সে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। হংসবেন বলেন যে, স্বামীজী চলে যাওয়ার পরও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে প্রতিদিন ঐ বাংলোয় আসত; বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সে এই অভ্যাস বজায় রেখেছিল। কেন সে ঐ বাংলোর উদ্দেশে প্রণাম জানায়?—অনুসন্ধিৎসু কেউ একথা জানতে চাইলে সে বলত, কীভাবে বাল্যকালে ঐ বাংলোতেই তার একজন দীপ্তিমান, মহাশক্তিধর, প্রেমিক সন্ন্যাসীকে দেখার ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ছবিলদাস লালুভাইয়ের স্বামীজীর স্মৃতিপূত এই দুটি গৃহের গুরুত্ব জানিয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থানে অবস্থিত গৃহে ১৮৯২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাস করেছিলেন' —এই মর্মে একটি মর্মরফলক স্থাপন করা প্রয়োজন। তাহলে স্থানটি শুধু মুম্বাইয়ের নাগরিকদের কাছে নয়, ভারত তথা বিশ্বের বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে এক দ্রষ্টব্য তীর্থে পরিণত হবে। এছাড়া কানহেরির গুহাশ্রেণিকে ঘিরে স্বামীজীর সেখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার যে-স্বপ্ন ছিল, তার কথা তো আমরা আগেই বলেছি। ■

তথ্যসূত্র

১ এটি একটি প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ। দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত বলে হিংলাজ দর্শন খুবই দুষ্কর। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ হিংলাজ তীর্থদর্শন করেছিলেন।

২ 'চওল' হলো নিম্নবিত্ত লোকেদের জন্য নির্মিত বহুতল বাসগৃহ। এগুলিতে প্রতি তলায় একটি টানা বারান্দার মুখোমুখি পাশাপাশি অনেকগুলি কামরা থাকে। প্রতি কামরায় এক একজন ভাড়াটে থাকে। বারান্দার দুই প্রান্তে থাকে সকলের জন্য সাধারণ শৌচাগার ইত্যাদি।

৩ ছবিলদাস লালুভাইয়ের উইলের বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি, এক সময়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যাদের মনোমালিন্য হয়। হয়তো পারিবারিক সংঘাতই রামদাসের মুম্বাই ত্যাগ করার অন্যতম কারণ।

৪ স্বামীজীর বাঙলা জীবনীতে ('যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪১১) এক্ষেত্রে ভুল করে ব্যারিস্টার ছবিলদাস ('তাঁর গৃহে স্বামীজী পূর্বে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন') স্বামীজীর সহযাত্রী ছিলেন বলা হয়েছে। ইংরেজি জীবনীতেও (Vol. I, p. 304) রামদাস ছবিলদাস স্বামীজীর সঙ্গে ইয়োকোহামা থেকে শিকাগো ভ্রমণ করেছিলেন বলায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে ২২ মে ১৮৯৩ তারিখে মুম্বাই থেকে খেতড়ির রাজাকে লেখা স্বামীজীর অপ্রকাশিত চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছেঃ "তার (রামদাসের) পিতা ৩১ তারিখে শিকাগো যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তা যদি হয় তো আমরা একসঙ্গে যেতে পারি।"

৫ ইংরেজি জীবনীতে (Ibid., p. 402) এখানে ছবিলদাস লালুভাইকে 'Mr. Lulloobhoy' বলা হয়েছে।

৬ অক্ষয়কুমার ঘোষ কলকাতায় স্বামীজীর পূর্বপরিচিত এক পরিবারের সন্তান। খাণ্ডোয়ায় থাকার সময় স্বামীজীর এঁর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ইনি স্বামীজীর প্রতি অনুরক্ত ও তাঁর স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন (Life, Vol. I, p. 303)। পরবর্তী কালে ইনি ইংল্যাণ্ডে যান। স্বামীজীর একাধিক পত্রে এঁর নামের উল্লেখ আছে।

৭ স্বামীজীর এই পরিকল্পনা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ চিত্র ও নকশায় রূপায়িত করে রাখেন; পরে ১৯৩৮ সালে যখন বেলুড়ের মন্দির নির্মিত হয়, তখন তা কার্যে পরিণত করা হয়।

৮ ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান লেখক পৃথক পৃথগ্‌ভাবে ছবিলদাসের দুজন উত্তরপুরুষকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িটি চিনিয়ে দিতে বলেন এবং তাঁরা দুজনেই একই বাড়ি চিহ্নিত করেন।

গুরুগ্রন্থসাহিব, শিখগুরু ও শিখমুদ্রার ইতিকথা

মদনমোহন সাহা*

"পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে, জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক
নূতন জাগিয়া শিখ, নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'গুরুগ্রন্থসাহিব'-এর লেখা শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৪০১ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৬০৪ সালে অমৃতসরের হরমন্দির সাহিবে (স্বর্ণমন্দিরে)। পঞ্চম গুরু অর্জনদেবের উপস্থিতিতে তাঁরই সঙ্কলিত গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহিব' শিখদের উদ্দেশে প্রকাশ করা হয়। সেই সুবাদেই ২০০৪ সালটি বিশ্বের সমস্ত শিখধর্মাবলম্বীদের কাছে ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐবছরের ১ সেপ্টেম্বর শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থসাহিব' প্রকাশের ৪০০ বছর পূর্তি উৎসব অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসব সমাপ্ত হবে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গুরুদ্বারে মহোৎসব পালনের মাধ্যমে।

১৬০৪ সালের পর দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ গুরু তেগবাহাদুরের ৫৬টি পদ এবং ৫৭টি শ্লোক 'গ্রন্থসাহিব'-এ সংযুক্ত করেন। ১৭০৮ সালের ৪ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের নান্দোড়ে গুরু গোবিন্দ সিংহ এই মহাগ্রন্থকে গুরুর মর্যাদায় মহিমান্বিত করেন, যা আজ সকলের কাছে পূজ্য 'গুরুগ্রন্থসাহিব' হিসাবে। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য আজ সমস্ত শিখজাতিকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে।

পঞ্চম গুরু অর্জনদেব 'গুরুগ্রন্থসাহিব' সঙ্কলন করার সময় এই কথাটাই মনে রেখেছিলেন যে, 'গুরুগ্রন্থসাহিব' এমন একটি গ্রন্থ হবে যা তৎকালীন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের সমস্ত মানুষের একাত্মতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হবে। তাই এতে সমস্ত বর্ণের সাধু-সন্তের বাণী সংযোজিত হয়েছে। যেমন ভক্ত রবিদাস ছিলেন তথাকথিত চর্মকার, ভগবান নামদেব ছিলেন ধোপা, ভক্ত কবীর জোলা (তাঁতি), সন্ত ফরীদ সুফি মুসলমান, ভক্ত সেইন নাপিত, ভক্ত ধন্না জাঠ, ভক্ত জয়দেব ব্রাহ্মণ এবং গুরু নানক ছিলেন ক্ষত্রিয়। এঁদের সকলের বাণী 'গ্রন্থসাহিব'-এ স্থান পেয়েছে। তাই এই গ্রন্থ এক অদ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। 'গ্রন্থসাহিব'-এ ৩১টি ভাগে ৫৮৯৪টি শ্লোক বা ছন্দ রয়েছে। এই গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা ১৪৩০। উপরি উক্ত সাধু-সন্ত ছাড়াও মহারাষ্ট্রের স্বামী পরমানন্দ, গুজরাটের রাজা পীপা-সহ পাঞ্জাব, রাজস্থান-সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহাপুরুষদের তত্ত্ববাণী 'গ্রন্থসাহিব'-এ সঙ্কলিত হয়েছে। সেহেতু এই পবিত্র গ্রন্থ শুধু শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছেই নয়, হিন্দু জনগণও একে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। পঞ্চম গুরু অর্জনদেব ও দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের মতে 'গুরুগ্রন্থসাহিব' শুধু ধর্মপুস্তকই নয়, এটি এক জীবন্ত দেবতার মূর্ত প্রতীক।

উল্লেখ্য যে, নবম গুরু তেগবাহাদুর, যিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার থেকে মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করতেন এবং আওরঙ্গজেবের আদেশে যাঁর শিরশ্ছেদ হয়, তাঁর পুত্র দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের (১৬৭৫-১৭০৮) কোন পুত্রসন্তান জীবিত না থাকায় গুরু-পরম্পরায় ছেদ পড়ে, তাই 'গুরুগ্রন্থসাহিব'কে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইসময় থেকে

* সম্পাদক, অ্যাকাডেমি অফ ইণ্ডিয়ান কয়েন্স অ্যাণ্ড হিস্ট্রি, কলকাতা-নিবাসী, সুলেখক। 'গুরুগ্রন্থসাহিব'-এর ৪০০ বছর পূর্তি স্মরণে এই নিবেদন।

আজ পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ 'গ্রন্থসাহিব'কেই গুরুর মর্যাদা প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত, সকল শিখগুরুর জন্ম হয়েছে অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশে, একমাত্র দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়েছে বিহার শরিফ পাটনায়। তাঁর মাতার নাম গুজরী দেবী। তাঁর চার পুত্র অজিত সিংহ, জুজহার সিংহ, জরযোয়ার সিংহ, ফতেহ সিংহ—সকলেই মুঘল সৈন্যদের হাতে প্রাণবিসর্জন দেন।

অমৃতসর স্বর্ণমন্দির

উল্লেখ্য যে, গুরু গোবিন্দই প্রথম গুরু যিনি প্রতিটি শিখ ধর্মমতাবলম্বী ভক্ত-শিষ্যের নামের শেষে 'সিংহ' উপাধি সংযোজন করার ও অস্ত্র রাখার নির্দেশ দেন এবং উচ্চ-নিচ জাতিভেদ প্রথা অবলুপ্ত করে সমস্ত শিখধর্মাবলম্বীকে একই পঙ্ক্তিতে ভোজন করার নিয়ম চালু করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি শিখকে 'পঞ্চবিধি' পালন করতে হবে অর্থাৎ যতদিন না আমাদের লক্ষ্যপূরণ ও ভারতের বুকে শিখরাষ্ট্র স্থাপিত হয়, ততদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আর এই কারণেই আমাদের ধর্মের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা আবশ্যক। কেন এই শক্তির প্রয়োজনীয়তা তা জানতে হলে পূর্ব ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। গুরু গোবিন্দের পিতা গুরু তেগবাহাদুর-সহ দিল্লির সদর রাস্তা চাঁদনিচকে যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন ভাই সতিদাস, ভাই মোতিদাস ও ভাই দয়ালদাস। আজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গুরুগ্রন্থসাহিব গুরুদ্বারা, যেটি 'শিশগঞ্জ গুরুদ্বারা' নামে পরিচিত। ঐ গুরুদ্বারার দেওয়ালে লেখা আছে গুরু তেগবাহাদুরের অমর বাণী—"ন খুদ কিসীসে ডরো, ন কিসী কো ডরাও।"

দুর্ভাগ্যবশত যে গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ সালে পাঞ্জাবের গোদাবনী নদীর তীরে এক আফগান আততায়ীর হাতে নিহত হন। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় তার নাম দিয়েছিলেন 'মামুদ'। এরপর বীর শিখনেতা বান্দাবাহাদুর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং শিখশক্তিকে সুসংহত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৭১৫ সালে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় মুঘল সৈন্যদের হাতে বন্দি হন এবং ১৭১৬ সালে সম্রাট ফারুকশিয়ারের আদেশে তাঁকে হাতির পায়ের তলায় পিষে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু এতেও শিখজাতিকে দমানো যায়নি। ১৭৩০ সালে জাসা সিং আলুওয়ালিয়া ও কাপুর সিংয়ের নেতৃত্বে পুনরায় শিখশক্তি সংগঠিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৭১০ সালে আহম্মদ শাহ দুরানীর রাজধানী শিরহিন্দ লুঠ হওয়ার পর শিখনেতা 'বান্দা' (পাদশা বা বাদশা) এক স্বাধীন সার্বভৌম বাদশাহ্-রূপে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরিচিতি লাভ করে। দুরানীদের অধিকৃত শহর শিরহিন্দ বিজয় এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। পরবর্তী কালে সেটি শিখরাজ্যে পরিণত হয়। শিখদের অধিকৃত দুর্গটির নাম ছিল 'লোহাগড়'। লোহাগড় বিজয়কে স্মরণীয় রাখার জন্য সেখান থেকেই তাঁরা পারসি ভাষায় কবিতা উৎকীর্ণ করে মুদ্রা প্রচলন করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ—

"সিখা জাদদার হর দো আল্ম তেগ-ই-নানক ওয়াহিব অস্ত
গুরু গোবিন্দ সিং শাহ-ই-শাহান-বজল-সাকা সাহিব অস্ত।"

—দুই বিশ্বেই মুদ্রা চালু আছে, দাতা গুরু নানকের তরবারি এবং রাজার রাজা গুরু গোবিন্দ সিংহই সত্যিকারের প্রভু।

মুদ্রার একদিকে উৎকীর্ণ এই কবিতা ছাড়াও অপরদিকে উৎকীর্ণ রয়েছেঃ "জারবরে আমিনুদ্দাহার মাসোয়ারাৎ শহর জিনাতুলতখ্‌ত্ মুশরক বখ্‌ত।"—আশীর্বাদধন্য সিংহাসন ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর রক্ষকের উদ্দেশে রচিত।

মুদ্রা অভিধানে উপরি উক্ত মুদ্রাকে 'স্মারক মুদ্রা' বলা হয়। এইরকম মুদ্রার প্রচলন করা তখনকার সম্রাট ও সুলতানদের রেওয়াজ ছিল। সম্রাট আকবর, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক, ত্রিপুরার হিন্দু রাজা ধন্যমাণিক্য প্রমুখ শাসকগণ বিভিন্ন রাজ্যবিজয়ের পর এইজাতীয় মুদ্রা প্রচলন করতেন।

১৭৭৭ সালে অমৃতসর থেকে 'নানক শাহী' নামে একধরনের মুদ্রা প্রচলন করা হয়। মুদ্রাটির একদিকে লোহাগড় থেকে চালু করা মুদ্রার মতো লিপি এবং অপরদিকে নতুন লিপি "জারব শ্রীঅমৃতসর জুলুম-ই-তখ্ত অকাল সম্বত" এবং তারপরে বিক্রমাব্দ সাল-তারিখ উৎকীর্ণ ছিল। এছাড়া 'অকালশাহী গুরু নানক' কথাগুলি খোদাই করা বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে।

এরপর রণজিৎ সিংহ যে-মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন, তার মধ্যে কিছু ছিল পারসিক এবং কিছু ছিল গুরুমুখী লিপি। পারসিক লিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রায় নিম্নলিখিত কবিতাটি আছে—

> "দেগ তেগ-ও-ফত্ ও নসরৎ বেদরং
> ইয়াফত্ আজ নানক গুরু গোবিন্দ সিং।"

—গুরু গোবিন্দ সিংহ নানকের কাছ থেকে পেয়েছেন অবিলম্বিত সহায়, প্রাচুর্য, তরবারি এবং বিজয়।

যদিও গুরুমুখী শিখজাতির ভাষা এবং ঐ ভাষাতেই 'গুরুগ্রন্থসাহিব' রচিত, তথাপি তৎকালে পারসিক ভাষা ভারতের রাজভাষা হওয়ার সুবাদে শিখরাষ্ট্রে রাজকার্যে পারসিক ভাষা ব্যবহৃত হতো। বেশ কিছু তামার মুদ্রায় গুরুমুখী ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে।

গুরুদ্বারে 'গুরুগ্রন্থসাহিব' পাঠ চলছে

মধ্যযুগের শেষ লগ্নে মহান ধর্মীয় নেতা গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯) অবিভক্ত পাঞ্জাবের তালবন্দি গ্রামে (বর্তমান নানকানা) এক পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালু ও মাতার নাম ত্রিপতা। তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মিলনসাধন করে উদার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র শহর মক্কা, পারস্য, বাগদাদ ও সিংহল ভ্রমণের পর হিন্দু পণ্ডিত ও মৌলভির কাছে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর তিনি রাজস্থানের জাঠ, অবিভক্ত সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু মানুষ যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও ভক্তিমার্গের আদর্শে বিশ্বাসীদের নিয়ে সুগঠিত এক সম্প্রদায় বা জাতি গঠন করেন—যাদের কাজ পরোপকার ও মানবসেবা। পরবর্তী কালে গুরু নানকের ধর্মমত 'শিখধর্ম' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক বলতেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যিনি ন্যায়নিষ্ঠ এবং তিনিই প্রকৃত মুসলমান, যিনি নিষ্ঠা সহকারে কাউকে আঘাত না দিয়ে নিজ ধর্ম পালন করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে কোন প্রভেদ নেই। এটি ঈশ্বর-সাধনার দুটি পথ মাত্র। তাই ধর্ম নিয়ে বিবাদ না করে একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা উচিত। গুরু নানক প্রাচীন হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এছাড়া হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের যাকিছু মহান, যাকিছু ভাল তার ওপর ভিত্তি করে নিজের ধর্মমত গড়ে তোলেন।

গুরু নানকের তিরোধানের পর তাঁর ছায়াসঙ্গী ও পার্ষদ অঙ্গদদেবকে তাঁর আদর্শ এবং বাণী প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গুরু অঙ্গদদেবের দেহত্যাগের পর আরো ৮ জন ঐ দায়িত্ব পালন করেন। নানক-সহ মোট ১০ জন শিখ-ইতিহাসে 'গুরু' নামে খ্যাত। তাঁরা হলেন গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯), দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদদেব (১৫০৪-১৫৫২), তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৪৭৯-১৫৭৪), চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৩৪-১৫৮১), পঞ্চম গুরু অর্জনদেব (১৫৬৩-১৬০৬), ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দদেব (১৫৯৫-১৬৪৪), সপ্তম গুরু হর রায় (১৬৩৩-১৬৬১), অষ্টম গুরু হরকিষণদেব (১৬৫৬-১৬৬৪), নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬২১-১৬৭৫) এবং দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৫৬-১৭০৮)। এরপর আর কেউ গুরুপদে অভিষিক্ত হননি অর্থাৎ গুরু-পরম্পরার এখানেই সমাপ্তি। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর বছর থেকে কয়েকজন শিখ নেতা শিখ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। এঁরা কেউ 'নেতা', কেউবা 'রাজা', আবার কেউ 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত। এঁরা হলেন যথাক্রমে—(১) বান্দা বাহাদুর (১৭০৮-১৭১৬), (২) খালসা মিলিটার গভর্ণমেণ্ট (১৭১৬-১৭৯৯), (৩) রণজিৎ সিংহ (১৭৯৯-১৮৩৯), (৪) কুরুক সিংহ (১৮৩৯-১৮৪০), (৫) শের সিংহ (১৮৪০-১৮৪৬), (৬) দিলীপ সিংহ (১৮৪৩-১৮৪৯)।

বিদেশি ঐতিহাসিকদের মতে, এই শিখশক্তি উত্থানে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন অত্যাচারী আফগান শাসক আহম্মদ শাহ আবদালী। আবদালীর ভারত অভিযানের শেষে গৃহাভিমুখী আফগানদের পিছন থেকে গেরিলা আক্রমণের সাহায্যে শিখ সৈন্যরা যেমন লুণ্ঠিত দ্রব্য কেড়ে

নিত, তেমনি ভারতীয় বন্দিদেরও মুক্ত করে দিত। এইভাবে আবদালী পরোক্ষভাবে শিখদের রসদ ও শক্তি দু-ই যোগান দিয়ে গেছেন। ফলে শিখেরা ১৭৬৭ সালের মধ্যেই নিজেদের প্রকৃত আধিপত্য (Defacto Sovereignty) স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই অভিমতকে সমর্থন করেন।

মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়েছিলেন, সেই'রকম মহারাজা রণজিৎ সিংহও আফগানিস্তানের দুরনী সুলতানদের অধিকৃত অঞ্চল এবং ভারতে মুঘল সম্রাটদের অধিকৃত রাজ্য নিয়ে এক অখণ্ড শিখরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐ পরিকল্পনা সফল করতে যুদ্ধবিগ্রহ ও কূটনীতি উভয়েরই তিনি সাহায্য নেন। ১৭৯৮ সালে আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র কাবুলের অধিপতি জামানশাহ মুঘল রাজ্য পাঞ্জাব আক্রমণ করলে রণজিৎ সিংহ তাঁকে সবরকম সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জামানশাহ রণজিৎ সিংহকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে লাহোরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে কাবুলে ফিরে যান। রাজা রণজিৎ জামানের অধীনতা অস্বীকার করে লাহোরকে স্বাধীন শিখ রাজ্যের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সেখান থেকেই শিখ রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা শুরু হয়। ফলে শিখ রাজ্য ভারতের মানচিত্রে স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ

১৮৩৯ সালের জুন মাসে মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, রণজিৎ সিংহই একমাত্র ভারতীয় শাসক ছিলেন, যিনি মুঘল সম্রাট, আফগানিস্তানের আবদালীর বংশধর এবং ইংরেজ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮০২ সালে অমৃতসর, ১৮০৬ সালে লুধিয়ানা, ১৮১৮ সালে মুলতান, ১৮১৯ সালে কাশ্মীর, ১৮৩৩ সালে লাদাখ, ১৮৩৪ সালে পেশোয়ার প্রভৃতি রাজ্য তিনি জয় করেন। এছাড়া সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের জন্যও তিনি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। তবুও বলা যায়, একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হয়ে এতগুলি রাজ্য জয় করা তৎকালীন বিচারে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

১৮০৯ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে রণজিৎ সিংহের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐ চুক্তির বলে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া হয়। এই চুক্তি পরও কিন্তু ব্রিটিশদের মনে সন্দেহ ছিল, রণজিৎ সিংহ রাজ্যবিস্তারের জন্য উদ্গ্রীব হবেনই। রণজিৎ সিংহ শিখজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এক সামরিক জাতিতে পরিণত করেন, যাতে তারা ইংরেজ এবং মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, কি কারণে, কোন্ পরিস্থিতিতে একটি ধর্মীয় মার্গ বা সম্প্রদায়ের মানুষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল? ১৬০৫ সালে মুঘলসম্রাট আকবর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রিয় প্রপৌত্র অর্থাৎ জাহাঙ্গীর-পুত্র খসরুকে দিল্লির সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যান। সেই অনুযায়ী খসরু দিল্লির সিংহাসন দাবি করেন। এতে আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীর অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং ক্রুদ্ধ হন। ফলে খসরু পিতার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এইভাবে কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর অবশেষে ১৬২২ সালে খসরু মুঘল সৈন্যদের হাতে বন্দি হন এবং বন্দি অবস্থায় কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজকুমার খসরুর মৃত্যু মুঘল-শিখদের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে।

অপরদিকে সম্রাট জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী মুঘল রাজকুমার খসরুকে অর্থ ও সামরিক সাহায্য দেওয়ার অজুহাতে বা অপরাধে শিখধর্মের পঞ্চম গুরু অর্জনদেবকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। অর্জনদেব ঐ জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করায় সম্রাট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গুরুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ফলে শিখধর্মাবলম্বী ভক্ত শিষ্যগণ অত্যাচারী মুঘল শাসকদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দদেব সমস্ত শান্ত ও ভক্তিমার্গের শিখজাতিকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে সুশৃঙ্খল এক যোদ্ধাজাতিতে রূপায়িত করেন। তিনি মৃত্যুভয়হীন এমন একদল সৈন্য তৈরি করেন, যাদের কাজ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা, আশ্রিতকে আশ্রয়দান করা প্রভৃতি।

কথিত আছে, অর্জনদেবের পর গুরুপদে উন্নীত হওয়ার সময় হরগোবিন্দদেবকে যখন পূর্বতন গুরুদেবের কণ্ঠহার ও

উষ্ণীষ প্রদান করা হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমার কণ্ঠহার হবে তরবারি বন্ধনী এবং উষ্ণীষে থাকবে রাজকীয় পক্ষি-পালক। মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তিনি শিখদের সামরিক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেন। মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পর শিখগণ শিবালিক পর্বতে আত্মগোপন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। তেজস্বী বীরধর্মপরায়ণ হরগোবিন্দ ১৬৪৪ সালে দেহত্যাগ করেন। তিনি মাত্র ৪৯ বছর জীবিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর অর্জনদেবের হত্যার মধ্য দিয়ে শিখদের মনে মুঘলদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষের সূচনা করেছিলেন তা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। অর্থাৎ শিখদের প্রতি মুঘলদের অবিচার ও হিংসাই প্রতিহিংসার জন্ম দিয়েছিল। তাই কখনো সরাসরি যুদ্ধে, কখনো গেরিলা যুদ্ধে প্রায় ১০০ বছর ধরে শিখরা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যে ফাটল ধরেছিল। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

শিখ মুদ্রা :
একদিকে পাতা এবং অপরদিকে বিজয়পতাকা বা নিশানের ছাপ দেখা যাচ্ছে

শিখ শাসকদের প্রচলিত বেশির ভাগ মুদ্রাই ছিল তামার, তবে কিছু রুপার মুদ্রাও তাঁরা তৈরি করেছিলেন। এছাড়া মহারাজা রণজিৎ সিংহ ১৮০৪ সালে স্বর্ণমুদ্রাও (মোহর) তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। মুদ্রার ওজন ১০.৭০ গ্রাম থেকে ১১.৪০ গ্রাম, বলা বাহুল্য মুদ্রাগুলি দুষ্প্রাপ্য। মুঘল তাম্রমুদ্রার নাম অনুযায়ী শিখ মুদ্রার নামও ছিল 'দাম'। পরবর্তী কালে তামার মুদ্রাকে 'পয়সা' আর রুপার মুদ্রাকে 'রুপিয়া' বলা হতো। লিপি হিসাবে শিখ শাসকগণ ফারসি লিপির বেশি ব্যবহার করতেন। কিছু কিছু মুদ্রা অবশ্য গুরুমুখী ভাষায় উৎকীর্ণ দেখা গেছে। তবে রুপার এক রুপী ও হাফ রুপীর গোলাকার মুদ্রায় পারসি ভাষাই দেখা যায়, এর ওজন ছিল যথাক্রমে ১০.৭০ গ্রাম ও ৫.৩৫-৫.৮০ গ্রাম। ১৭০৮ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত শিখসাম্রাজ্য কতকগুলি মিসলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল (Military Khalsa Government)। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তির (১৭৯৯-১৮৩৯) প্রথমদিকে হাতে পেটাই ছাপ চিহ্নযুক্ত যেসব মুদ্রা প্রবর্তিত হয়, সেগুলির একপিঠে ছিল বড় আকারের পাতার ছাপ ও পারসি অক্ষরে সন-তারিখ। ১৬৭৫-১৭০৮ সালে শিখ সম্প্রদায়ের দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের নামে ফারসি ও গুরুমুখী ভাষায় বেশ কিছু মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু তাতে শিখ মুদ্রার বৈশিষ্ট্য পাতার চিহ্ন ছিল না। মনে হয়, তামার সেইসব মুদ্রা কোন বেসরকারি ট্যাকশালে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

যদিও শিখমুদ্রার বৈশিষ্ট্য হলো পাতার ছাপ, তবুও বেশ কিছু মুদ্রায় অন্যান্য চিহ্ন দেখা গেছে। যেমন ১৮৩৭ সালে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর ট্যাকশাল থেকে যে-মুদ্রা চালু করেন, তাতে শিখ শাসকদের বীরত্বের প্রতীক ছিল সিংহ ও তলোয়ার। কিছু মুদ্রায় একদিকে যেমন সিংহ ও তলোয়ারের ছাপ ছিল, তেমনি অপরদিকে ভালবাসার প্রতীক গোলাপের চিহ্ন কিছু মুদ্রায় দেখা গেছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিখ শাসকগণ শুধু যুদ্ধই করতেন না, প্রজাসাধারণকে ভালওবাসতেন এবং তাদের সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করতেন। এছাড়া নাগরী ভাষায় 'ওম' ও 'হরজী' অর্থাৎ হিন্দুদেবতা শিবের নাম মুদ্রায় খোদাই করেছিলেন। শুধু মুদ্রায় নয়, হিন্দুদেবতা কৃষ্ণ, হরি, রাম, গোপাল প্রভৃতি নামবাচক শব্দ 'গুরুগ্রন্থসাহিব'-এ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে ধারণা হয়, পঞ্চম গুরু অর্জনদেব, দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রকারান্তরে সহজ-সরলভাবে হিন্দুধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা না হলে 'গ্রন্থসাহিব'-এ হিন্দু দেবদেবীর নাম বারবার উল্লিখিত হতো না। এছাড়া মুসলিম আগ্রাসন থেকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তাঁরা ভারতের সনাতন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করেছিলেন। তাই 'গুরুগ্রন্থসাহিব'-এর ৪০০তম প্রকাশ বর্ষে শিখ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতের আপামর জনসাধারণ ঐ একই আনন্দে উদ্ভাসিত। ■

গ্রন্থসূত্র

১ The Sikh Review—Narinder Pal Singh
২ South Asian Coins & Paper money, Crause Publication, England
৩ ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা—চক্রবর্তী, কয়াল, হাজরা
৪ ভারতের মুদ্রা—ডঃ পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা
৫ প্রাচীন মুদ্রা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ শিখ ইতিবৃত্ত, বিশ্বশান্তি প্রকাশন

এই রচনাটি 'অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

যাজ্ঞসেনী

ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়
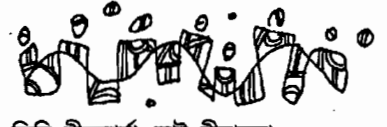
হাজার হাজার বছর আগে
কবি ব্যাসদেব সৃষ্টি করলেন
এক নারী, সে অনন্যা,
দ্রুপদ রাজকন্যা।
সে যেন বাধা-বিপত্তিভরা
এক দুর্গম পথযাত্রী—
পঞ্চপাণ্ডব যার স্বামী
অসহায় নয় সে নিশ্চয়ই
এটাই তার পাথেয় বোধহয়।
সম্বল তার মনোবল—
শেখেনি সে হার মানতে।
বনবাসকালে কাতর হতে
দেখেনি তাকে কেউ।
দ্রুপদরাজ-তনয়ার চলার গতি
থামাতে পারেনি তার পথশ্রম,
সে শুধুই চলেছে তার নিজস্ব
চলার অক্ষরেখাটি ধরে।
কৌরব কর্তৃক বস্ত্রহরণ,
কৃষ্ণার জীবনের এক চরম প্রহসন।
তার পঞ্চস্বামী পাণ্ডবেরা
রক্ষা করতে পারেনি
সেই নির্যাতন থেকে।
রাজা-মহারাজ-আচার্য-শাস্ত্রজ্ঞ
বীর-মহাবীর, এমনকি পঞ্চপাণ্ডব
সকলের উপস্থিতিতেই
কৌরব পক্ষের রাজকুমার দুঃশাসন
তার বস্ত্রহরণে উদ্যোগী হলে
দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ নিমিত্তে
স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই যেন বস্ত্ররূপে
দ্রৌপদীকে আগলে রেখেছিলেন—
বিষ্ণুর প্রতি নিষ্ঠাই সেই
অন্তিম মুহূর্ত থেকে রক্ষা করেছিল;
তবুও অন্য পুরুষ ভাবেনি কখনো,
পঞ্চস্বামী প্রত্যেকেই এক একজন
পরমপুরুষ তার কাছে।
এত লাঞ্ছনার পরও ভর্ৎসনা
করেছে সকলকে কিন্তু কর্তব্যে
অবহেলিত হয়নি কেউই তার কাছে।
কৃষ্ণই তার সখা ও সহায়
তার পরম আশ্রয় সে জেনেছে
বারংবার, তার কথা ভেবেছে যতবার।
চলমান সংসারে ক্ষান্ত হয়নি সেবায়
আত্মীয়-অনাত্মীয়-সপত্নী-শ্বশ্রুমাতা
অতিথি-অভ্যাগত উপেক্ষিত
হয়নি কেউই।
সপত্নীসন্তান তার যেন নিজ সন্তান,
মাতৃত্বের অভাব ঘটেছে কিনা
লেখেনি কবি কোথাও—
তিনি বীরভার্যা, তাই বীরাঙ্গনা,
তাই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং কীচককে
শারীরিক বলে পরের পর ধরাশায়ী
করতে সমর্থ হয়েছিল অনায়াসে।
সুদেহী রন্ধনপারদর্শিনী
সে কৃষ্ণা-শ্যামাঙ্গিনী হলেও
রূপে সে ভুবনমনোমোহিনী।
ব্যাসদেব সৃষ্ট অনন্যা কন্যা
তার রঙিন পালকে মোড়া
চরিত্রের এক একটি স্ফুলিঙ্গ
এক একটি যুগকে উপহার
দিতে দিতে চলেছে—
তার বর্ণ-ব্যঞ্জনাময় ময়ূরপঙ্খি
নৌকাখানি নিয়ে যেন মেতে উঠেছে
নব নব যাত্রায়—যুগ থেকে যুগান্তরে
কাল থেকে কালান্তরে,
কবি তাকে এনেছে এযুগেও
তার উত্তরসূরি খুঁজতে
যার হাতে তার প্রবাহদণ্ডটি
দিয়ে সর্বকালীন নারীচরিত্রের
ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।
সে-নারী চিরকালীন
সে-নারী যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিতা
লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিতা।

লীন হও

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

ধ্যানের গভীরে ডুব দিয়ে দেখ, অরূপের খোঁজ পাবে
তন্ময় হলে ধরা দেন তিনি, সাড়া দেন প্রেমভাবে।
চিন্তামণিই হৃদয়ের ধন, তাকেই পাথেয় করি
চৈতন্যের আলোকিত পথে পরমাত্মাকে স্মরি।
ঈশ্বরভাবে লীন হয়ে যাও, হও তাতে মাতোয়ারা
শ্রীরামকৃষ্ণ দেখান ভক্তে, সত্যের ধ্রুবতারা।

ঠাকুর বলেন, সবকিছু ভুলে যত তুমি মজে যাবে
তদ্গত প্রাণে ভক্তিবাঁধনে পরম পুরুষে পাবে।
নুনের পুতুল লবণসাগরে দ্রবীভূত হয় শেষে
আকুলতা নিয়ে বিগলিত হও, ঈশ্বরে ভালবেসে।
তিনি নারায়ণ, ভক্তিকাঙাল, আর সব ধুলোবালি
শ্রীরামকৃষ্ণ শোনান সবারে ভক্তির দুতিয়ালি।

মা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মা মানে শুধু জ্যোৎস্নায় চাঁদ হাসে।
মা মানে শুধু শেকড় যেমন মাটিকে ভালবাসে॥
মা মানে শুধু বান ডেকে আলো আকাশ জুড়ে ওড়ে
মা মানে শুধু একলা আগুনে সবার জন্য পোড়ে॥
মা মানে শুধু স্তব্ধতা ভেঙে কাছে আরো ডেকে নেওয়া
মা মানে শুধু যার কেউ নেই তার প্রিয়জন পাওয়া॥
মা মানে শুধু সুয্যিঠাকুর যার পায়ে রং মাখে
মা মানে শুধু আঁচলে যার নদীটা নিজেকে রাখে॥
মা মানে শুধু এলোমেলো কিছু পদ্ম বকুল ফোটা
মা মানে শুধু জীবন-ফুলটা ধরে রাখে যে-বোঁটা॥
মা মানে শুধু বুকের মধ্যে শীতল বটের ছায়া
মা মানে শুধু যার কোলে বসে হাতছানি দেয় মায়া॥

স্মরারি স্মরণ স্তোত্রম্

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কপর্দী কপালী পিনাকী ত্রিশূলী ত্রিনেত্রস্ত্রিমূর্তিস্ত্রিপত্রপ্রিয়ো যঃ।
কলাংশং শশাঙ্কং ললাটে দধানং ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥১॥
অঘোরা তনুর্যা বিপৎসু শরণ্যা সুরূপা কুরূপা নবীনা প্রবীণা।
মমায়ং প্রণামঃ প্রয়াতু প্রণম্যং ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥২॥
তপস্বীং তপস্যা ফলানাং প্রদাতা ভবেশো নিরীশো বরেণ্যঃ করালঃ।
অমূর্তো বপুষ্মান্ বিরুদ্ধো গুণাস্তে ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৩॥
স কান্তা বিধাতা প্রশান্তঃ স পাতা জগত্যাঃ সহর্তা মহৌজাঃ সরুদ্রঃ।
সতীশো মখারিঃ প্রচণ্ডঃ স ভীমো ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৪॥
অজন্মাঽবিনাশী স্বয়ম্ভুরনাদিরতন্দ্রঃ প্রবুদ্ধঃ প্রজানাং হিতার্থম্।
অবাসাঃ সুবাসা অধৃষ্যোঽভিগম্যো ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৫॥
যদন্নপ্রদাত্রী যদা সাঽন্নপূর্ণা স ঈশং কথং বা ক্ষুধার্তশ্চরেচ্চ।
বসানস্ত্বচং যঃ সরোজাসনস্থো ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৬॥
যদীয়াং সিতাঙ্গাৎ সুশুভ্রা বিভূতিঃ পতন্তী ত্রিলোকীং পবিত্রী করোতি।
বিরিঞ্চির্হরি যা বিধত্তঃ স্বগাত্রে ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৭॥
গণেশঃ সুপুত্রো ধনেশঃ সুমিত্রং মহোচ্চো হিমাদ্রির্গৃহিণ্যা পিতাঽস্য।
গিরীশঃ শ্মশান স্থলে যদ্ বিহারো ভুজঙ্গস্রজং তং স্মরামি স্মরারিম্॥৮॥
তদীয়াৎ সুকণ্ঠাৎ প্রগীতা স্বরাস্তে প্রমূর্তাঃ প্রপূর্ণা দিবং ক্ষ্মাং চরন্তি।
মুরারেঃ পদাজাদ্ গলন্তী ত্রিধারা ধরিত্রীং সুধাম্বুপ্রবাহৈঃ পুনাতি॥৯॥
জটায়াং বহন্তীং নদীং তাং সপত্নীং সহর্ষং হসন্তীং লসন্তীং বিলোক্য।
অপর্ণা সকোপা স্বভর্তুর্বিবৃত্তা ততঃ কিং স্বপিত্রোর্নিকেতং গতাঽসীৎ॥১০॥
ভবাব্ধৌ নিমগ্নঃ কুবুদ্ধিঃ কুকর্মা ন বিদ্যা শমাদেঃ সমাধে র্ন লেশঃ।
ঋতে ত্বাং সহায়ো ন কশ্চিদ্ যতো মে ত্বদাখ্যাঽশুতোষঃ প্রভো যা বৃথাঽভূৎ॥১১॥
ত্রিতাপাদ্ বিমুক্তেঃ সমর্থস্ত্বমেকো মমৈষা সপর্যা নমস্তে শিবায়।
কৃপাব্ধেঃ কণৈকং লভে তে প্রসাদাদ্ ভুজঙ্গপ্রয়াতাৎ স্মরামি স্মরারিম্॥১২॥

বঙ্গানুবাদ: *মহাদেবের জটা কপর্দ, কপাল, পিনাক—ধনু, ত্রিশুল হস্তস্থিত অস্ত্র, ত্রিমূর্তি—একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাঁর ললাটে শশীকলা। তিনি নির্মাল্যধর। স্মরারি কামশত্রু, অঘোরা—অভয়ঙ্কর, তনু—শরীর, বিপদে শরণদাতা, তিনি সুরূপ, কুরূপ, নবীন এবং প্রবীণ। ভক্তের প্রণাম প্রণম্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। তিনি স্বয়ং তপস্বী অথচ তপস্যার ফলদাতা। তিনি ভবেশ অথচ স্বয়ং নিরীশ্বর, বরণীয় অথচ করালমূর্তি, অমূর্ত কিন্তু শরীরধারী কান্ত, বিধাতা, প্রশান্ত, পালয়িতা অথচ জগতের সংহারকারী, ভীমমূর্তি, জন্মহীন, অবিনাশী, স্বয়ম্ভু, অনাদি, অতন্দ্র এবং সর্বদা ভূতকল্যাণে জাগরিত, বিবস্ত্র অথচ শোভনবস্ত্র পরিহিত, অবর্ণনীয় হয়েও সুগম্য। সর্বদা স্বয়ং দেবী অন্নপূর্ণা তাঁকে অন্নদান করছেন, তবু তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে ভিক্ষা করেন; তাঁর শুভ্র দেহ থেকে শুভ্রভস্ম মাটিতে পড়লে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু নিজ দেহে ধারণ করেন; গণপতি তাঁর সুপুত্র, ধনপতি কুবের তাঁর সখা; অথচ হিমালয় তাঁর গৃহিণীর পিতা, তাঁর সুমধুর কণ্ঠনির্গত স্বরসমূহ প্রমূর্ত হয়ে স্বর্গে এবং মর্ত্যে বিচরণ করছে। সেই গান শুনে মুরারির গলিত পাদপদ্ম প্রসৃতা গঙ্গা অমৃতোপম জলধারার দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র করছেন। তাঁর জটা নিয়ে হাসতে এবং খেলা করতে সপত্নী গঙ্গাকে দেখেই কি পার্বতী রাগ করে বাপের বাড়ি হিমালয়ে চলে গিয়েছেন? ভবসমুদ্র-নিমগ্ন, কুবুদ্ধি এবং কুকর্মা আমার বিদ্যা নেই, শম, দম, যম এবং বিন্দুমাত্র সমাধিও নেই। তুমিই আমার একমাত্র সহায়, তোমার আশুতোষ নাম যেন মিথ্যা না হয়। তুমিই আমার ত্রিতাপ-আধ্যাত্মিক, শারীরিক এবং মানসিক বিপদ রোগাদি, আধিদৈবিক তাপ—দৈব বিপদ আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাদি এবং আধিভৌতিক—হিংস্র প্রাণ প্রভৃতি জাত বিপদসমূহ উদ্ধার করতে একমাত্র সমর্থ।*

মা এলেন

দেবকুমার বাগচী

বন্যা প্লাবন শারদ লগন
মিলেমিশে দুঃখে-শোকে
বৃষ্টি ঝরে আকাশ থেকে
শিউলি ঝরে সিক্ত বুকে
বাতাস তুমি সর্বজনীন
স্বপ্ন দোলাও সজীব মনে
আশার বিতান প্রাণের টানে
সন্ধিপূজার সম্মিলনে।
বিশ্ববিবেক পেরিয়ে যখন
দৃষ্টি হানে লোভ-লালসা
কোথায় অসুর দলন নিঠুর
পীড়ন ক্লিষ্ট সমতলে!
স্বজনহারা শান্তি অপার
স্রোতস্বিনীর পুণ্যলাভে—
মেঘ আড়ালে বার্তা লিখন
গ্রহমঙ্গল আবির্ভাবে।
প্রাণের গগন এই যে ভুবন
খুঁজে বেড়ায় কাশফুল মন
নেই নীলিমা না আশ্রয়
অমাবস্যার অমানিশায়
ঢাকের বাদ্যি আওয়াজ তোলে
জীবনপথে পায় কি দিশা—
ছন্দে সুরে জীবনযাপন
ভূমির স্পর্শে নতুন জীবন
মায়ের কোলেই উষ্ণ আদর
প্রদীপশিখা জাগায় আশা।
মাতৃ-আনন আগমনী
ভক্তিসজ্জা চোখের পলে
বিদায় সৃজন কাল দশমী
ভাসিয়ে দুখের সাগরজলে।

কথার মালা

স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

সৃষ্টির প্রথমে,
নটরাজের ডমরু উঠেছিল বেজে।
সেই তাণ্ডবে যেন ফুলঝুরির মতো
সৃষ্টি হলো এক একটা অক্ষর—অ, আ, ক, খ...।
তাদের নিয়ে বিধাতা করেন খেলা।
অক্ষর থেকে উৎসারিত হয় শব্দ।
জগৎজুড়ে কত ভাষার মেলা,
মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ,
শব্দ বেয়ে ঝরে পড়ে অবিরাম॥
ঈশ্বর অসীম। তবু তাঁর নামের সিঁড়ি বেয়ে
দেখি মন চলে যায় দূরে—
শিশিরভেজা কাশফুলে, আর
মেঘের পারে ঐ বুঝি তিনি বিরাজিত।
অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে, কাছে পেতে চাই তাঁকে—
নিবিড় আনন্দে॥
জীবন হবে তাঁরই সেবার অর্ঘ্য,
আর বিশ্ব জুড়ে ধ্বনিছে যে-সঙ্গীত,
তাঁর আরতি হয়ে উঠবে তা—সে তো জানি॥

মা, এস তুমি

উত্থানপদ বিজলী

মা, এস তুমি
তোমার জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে
বসে আছি কাঙালের মতো।

আমার মনের ভিতর সবুজ সবুজ গাছপালা,
আজ তারা পাতা নাড়ছে।
শালিক টিয়া ময়না বৌ-কথা-কও পাখি...
তারা সব কলরব করছে।
আমার বুকের ভিতর জল-টলমল দীঘি
তাতে উথলে উঠছে হাজার হাজার ঢেউ।
আমার অন্তস্তলে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল...
তোমার যুগল চরণে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য।

মা, এই সূর্যস্নাত প্রভাতে—
এক কোণে এখনো জমে থাকা আমার অন্ধ তামসকে
স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতাকে
তোমার শাণিত ত্রিশূলে বিদ্ধ করে বিনাশ কর।
শুদ্ধতায় ভরে উঠুক চৈতন্য-আকাশ।...

দীর্ঘদিন হৃদয়ের দুয়ার খুলে তোমার জন্য
বসে আছি।
এলো চুলে, দীঘল নেত্রে, আলতা রাঙানো পদে
মা সিংহবাহিনী এস।

প্রণতি 'উদ্বোধন'

অশোক দাস

সাতরাজার ধন 'উদ্বোধন'
যাবে সে কোন্ গৃহকোণ
স্থির করে দেন প্রাণের ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং।
দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে
যদি হাঁক উচ্চৈস্বরে—
কে নেবে গো 'উদ্বোধন'?
নেব আমি দাও আমাকে
যে আসবে—নিতে ছুটে
সে ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে
একটু আগেই, বিলক্ষণ।
সাতরাজার ধন—'উদ্বোধন'।

প্রত্যভিজ্ঞা

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

একটি দিকে কবিতা আছে—তারা
অন্ধকার জড়িয়ে আছে গান;
বাউল শুধু বাজিয়ে একতারা
সাঙ্গ কর আলোর সন্ধান।
তারার দেহভস্ম আজ ভোরে
ঝরেছে ঐ নিরভিমান ঘাসে;
বাউল একা কঠিন মুঠি ভরে
আঁধার ভালবাসে।

মা তুমি

কুসুমিতা চৌধুরী *(অষ্টম শ্রেণি)*

মা সারদা—
তুমি শুভ্রশঙ্খের ধ্বনি।
জয়রামবাটির শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে তুমি,
তুমি আলোকোজ্জ্বল মণি।
দক্ষিণেশ্বরের কালী তুমি,
তুমি শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা বীণাপাণি।
সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তুমি,
তুমি গীতার বাণী।
শত কোটি নরনারীর মাতা তুমি,
তুমিই শ্রীকৃষ্ণের রাধারানি।
পূজার থালার জবা তুমি—
তুমিই রামকৃষ্ণের চোখের মণি।
তুমি যেন চমকিত দামিনী,
তুমি আমাদের জননী, সারদামণি।

আজ কাল পরশুর গানে

রেণুপদ ঘোষ

কেন্দ্রে রাখি মূর্তি আমি—তোমারই এ ভাবমূর্তি,
তোমাকেই দেখতে দেখতে প্রদক্ষিণ আমার
ছ-ছটি ঋতু আমার আবর্তিত হয়; নলিনীদলগত
যে জীবন তা বিশ্বাস হয়নি এতদিন—আজ হয়।
আমার বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্ সবই কেবল তুমি
এক অলৌকিক রৌদ্রে চোখ মেলতে মেলতে
গ্রীষ্মে, আমি তোমারই মুখোমুখি হই।
কথা হয় গূঢ় বাক্যে, গুহ্য সে-আলাপ।
সে-রহস্যে রঙের বদল ঘটে, আকাশও
নিচু হয়ে চলে আসে কাছে,
গাঢ় হয় রাত্রির আঁধার।
সে কার মঞ্জীর-ধ্বনি ব্যাকুল বাঁশরি যেন, পদাবলি
হেঁটে আসে বুকে, কদম্ব-পরাগমাখা ফালি চাঁদ
হাসে, কাঁদে, কথা বলে—শিশুর স্বভাব যেন...
অথচ, এসবও লৌকিক নয়; অনুভবে সত্য হয়ে ওঠে।
এভাবেই শরৎ আসে, শিশুহাসি
মুখে তারও; জিরাফের মতো চাঁদ রেখে গেলে তাকে
লুফে নেয় আকাশের তারা—বড় অদ্ভুত খেলায়,
সেখানেও দেখি মুখ তোমারই বিভূতিমাখা আলো;
বলে নাকি : 'ভাল, শুধু ভাল রেখো, ভাল থেকো?'
এ-জন্মের ভাল থাকা কতদূর হতে পারে আর।
অন্নে থেকে অন্নের জীবনে, একা লক্ষ
কোথা যাবে আর?
সীমার ভিতরে তবু অপরূপ তুমি
মেঘ ও রৌদ্রে সত্য হয়ে ওঠ।
হেমন্ত যখন আসে, খেত-খামার ঢেকে যায় ঘ্রাণে
কুয়াশার কারুকার্যে মুখখানি তার, দিশাহীন
নাবিকের জীবনের উল্লাসের খোঁজে
নম্র অতি জলের মতো সহজে পা ফেলে;
ক্ষুধা নয় তৃপ্তি নয়—দূরের পাড়িতে
এ-রহস্য বড় সুমধুর!
তারপর আলোর রাত্রি নামে
খালে বিলে বাওড়ে ও গাঙে, শীতের পালক নিয়ে
চুপ থাকে দুরন্ত পাখিটি, তখনো স্রোতের রং
মাটি পায়—গগন স্পর্শ করে;
আমাদের ধ্যানের মূর্তি
প্রতিষ্ঠার পর বিসর্জনেও বড় দক্ষ সে।
পায়ে পায়ে যারা দূরে যায় তারা আর
সেভাবে ফেরে না। বিজন শীতের রাত
দোল খায় শুধু এক হিজলে শিমুলে।
অথচ আমাদেরই ওম
প্রাণের উত্তাপে শুধু এঁকেছে যে-ছবি, তাও
নিখুঁত তোমারই।
পূর্ণ হলে ছবিখানি, তুলি-হাতে রং-পাত্রে
ভিজে উঠি নিজে,
পঞ্চশরে মধুপের বাচালতা থাকে না তখন
ঘাসে ফুলে, ফুলের ভিতরে থেকে
এজীবন ঠেলে তোল সুদিনের বীজে—তখনো
তোমাকে দেখি বিস্ময়ে—নির্বাকে...
এহো বাহ্য মনে হয়, পাদস্পর্শে তৃপ্তি শুধু প্রাণে।
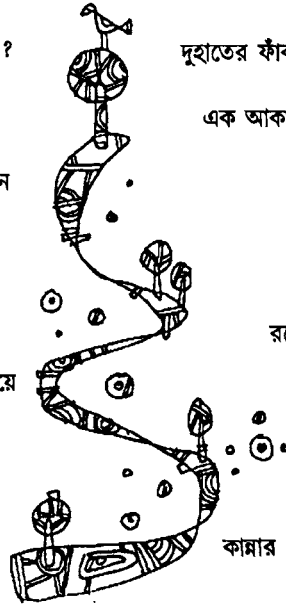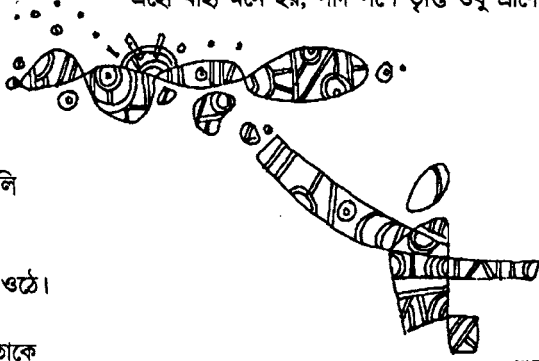
মা

শুভ্রকান্তি দে

পশ্চিম আকাশের অস্তমিত সূর্যের হালকা রক্তিম আভা যখন
লীন হয়ে যাচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকারে,
বাতাসে যখন ছড়িয়ে পড়ছে বেহাগের অন্তরাগ
প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা শেষ গ্রন্থিটাও যখন
দুহাতের ফাঁক গলে মিশে যেতে চাইছে অনন্তের মাঝে,
তখনি,
এক আকাশ নিঃসঙ্গতা আর দুচোখ ভরা অশ্রু নিয়ে
বুঝতে পারলাম—
মাগো, তুমি আমায় কতটা ভালবাস।

সব হারানোর শ্মশানে দাঁড়িয়ে
আজ অনুভব করছি—
আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে শুধু নয়,
রক্তের কণায় কণায়, আমার সবটুকু অস্তিত্বে
মাগো তোমারই পরশ মাখা।
যে-পরশ আজও অম্লান,
মাতৃস্নেহের আবিরে আরো লাল।

লেখনী আজ স্তব্ধ হতে চায়,
সামনে ছড়ানো সাদা পাতার স্তূপ।
কান্নার স্রোতে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টিতে
আজ বুঝলাম—
মাগো, তুমি আমায় কতটা ভালবাস।

এখন ভাবি

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষাটটি বছর হেলায় ফেলায় গেল কেটে
শাঁখের ফুঁ যখন বাজে সাঁঝবেলাতে
তখন ভাবি—
জীবনের এই সাঁঝবেলাতে
শূন্য হয়ে থাকল বুঝি ঐ ঝোলাটা
ভাবনা শুরু তখন থেকেই।
তোমার ছবি রাখা ছিল দেওয়াল 'পরে
তেমন করে সে-ছবির পানে চাইনি আমি
সাঁঝের শাঁখ বাজল যেদিন আমার ঘরে
চোখদুটো হঠাৎ দেখি ভিজে গেছে ব্যথার জলে
হৃদয়-জুড়ে গভীর ক্ষত টের পেয়েছি
অমনি গেলাম ছুটে তোমার ছবির কাছে।
দেখতে পেলাম তোমার হাসি ছড়িয়ে আছে ছবি জুড়ে
সেই হাসিতে পড়ছে ঝরে প্রেমের ধারা
হাতদুটোকে তুলে দিলেম ছবির পানে
দুহাত আমার ভরে গেল প্রেমের ধারায়।
এখন ভাবি
শূন্য ঝোলা ভরতে হবে তোমার নামে
আর দেরি নয়
ঘণ্টা যদি হঠাৎ বাজে
তাই তো তোমায় দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি
ধন্য করে নেব আমি তোমার প্রেমে।
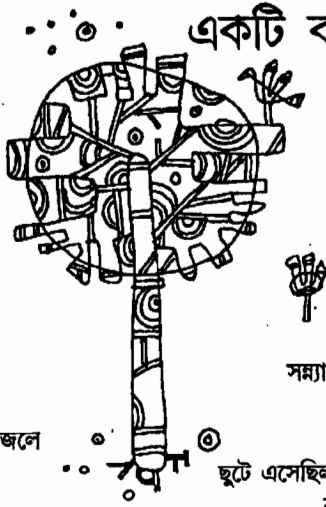
একটি বাড়ি ও সময়ের শিকড়

মঞ্জুভাষ মিত্র

বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সবুজের বুকে
আমাকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে
দয়াময়ী
একদিন আশ্রয় দিয়েছিল
বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে—
আমার প্রথম লেখা কবিতার মতো
বাড়িটা জ্যোৎস্নারাতে দাঁড়িয়ে আছে
সন্ন্যাসীর ধ্যানে প্রথম আবির্ভূত মহামায়ার মতো
চারু চিকণ তার জানলাগুলি
এখানে ওখানে মধুলতার বিস্তার
ছুটে এসেছিল তেরোটি বসন্ত আর তেরোটি শরৎগোধূলি
বাতাসের স্রোতে ভেসে এল স্বপ্নফুলের মালা
গাছের মাথায় পাখির বাসায় তাকিয়ে দেখলাম
স্বপ্নফুল রাশি রাশি
হ্যাঁ, এই বাড়িতে আমি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম
ভেবেছিলাম পুরস্কার পাব
ভেবেছিলাম মানুষকে ভালবাসব
আমার সেই তৃষ্ণা আজও বেঁচে আছে
আগের থেকেও সতেজ আর প্রখর, শুনতে পাই
সে আমাকে দিনরাত ডাকছে
সময়ের শিকড় ভারী হয়ে নামে এখানে ওখানে
নতুন সমুদ্রতটে সৌন্দর্যের ঢেউ আছড়ে পড়ে, বলে ভালবাসি।

স্বয়ংসিদ্ধা

শ্যামলী মহাপাত্র

বশ্য সম্মোহনে 'জগতাং ধাত্রী' বিশ্বমাতা
তন্ত্রে তন্ত্রী বিশ্বজননী ত্রিজগৎ-ধাত্রী দশভুজা
বিন্ধ্যবাসিনী বাঘমুখী চতুর্ভুজা মহাভারতে
ব্যাবিলনে ননা, বৃন্দাবনে দ্বিভুজা কাত্যায়নী দুর্গা
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দুর্গাসুর বধে দেবী দুর্গা
দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী দেবীপুরাণে।
সর্বরূপিণী কালী দুর্গা পার্বতী চামুণ্ডা কৌশিকী
মার্কণ্ডেয়ে; পদ্মপুরাণে বৈদিক দেবী পার্বতী
পৃথ্বীদেবী কালিকাপুরাণে; পরমাপ্রকৃতি
অভিন্না ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কুমারীই পূজিতা কন্যাকুমারিকাতে
বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়া থাকেন নিদ্রিতা শরতে
অকালবোধনে জাগ্রতা দেবী তাই তো শারদীয়া।
রামের আদিত্যস্তবে তুষ্ট ব্রহ্মা লঙ্কার সমুদ্রতীরে
দেবীপূজায় করেন পৌরোহিত্য রাবণবধের প্রার্থনায়
সর্বব্যাপিনী সর্বৈশ্বর্যময়ী বিশ্বপ্রসবিণী মহামায়া
সমূহ মাতৃত্বের আবরণে তিনিই
পরমাপ্রকৃতি জগদ্ধাত্রী শ্রীমা সারদা
মায়ের অপার মহিমা-করুণায় সিঞ্চিত ধরা
আপ্লুত বঙ্গবাসী আবেগবিহ্বল শারদ ফল্গুধারায়।।

রাজামশাই রাজাই রবে

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

দেশজুড়ে আজ চলছে খেলা খুনখারাপি বোমবাজি
কেই বা গুরু শিষ্য বা কে? হাত-সাফাইয়ের কারসাজি।

বোমবাজিটা নিয়মমাফিক, কখন কোথায় বসবে কে?
আজ যদি হয় হালিশহর, কাল হবে তা বেলঘরে।

দুর্ঘটনা লেগেই আছে, বোঝাই বাসটাও উলটে যায়
রেলডাকাতি সন্ধ্যা-সকাল, কর্তারা সব নাক ডাকায়।

একটা শব্দ আছে বটে, কথায় কথায় তদন্ত
তদন্ত ঠিক হচ্ছে কিনা, সেটাই হয় ফের তদন্ত।

দুঃখের কথা বলব কী আর, হওয়ার যেটা সেটাই হবে,
উলুখাগড়া গোল্লায় যাক, রাজামশাই রাজাই রবে।

রূপকথা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
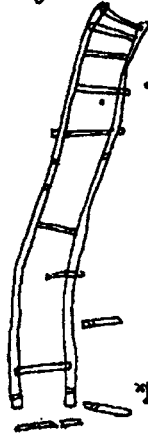
না, না, কাশফুলের খেলনা দিয়ে ভুলিও না—
ভরা নদীর গল্প আর পুজো পুজো রোদ—
যে-আকাশে রং ঢেলে অপরূপ হতো সে-রোদ্দুর
সে-আকাশ আজকে কদ্দুর?

মিথ্যায় মগজ ঠুকে যতই রক্তাক্ত কর মন
সে-স্বপ্ন এখানে অশোভন।

এখানে বিবর্ণ বুড়ি সাদা কাশ-চুলে
মরা ছেলে বুকে নিয়ে রাতজাগা বিধবার মতো
নিহত নদীর শব কোলে করে কাঁদে বালুচরে।
শূন্যময় সেই কান্না, নিভে যাওয়া স্মৃতির নিঃশ্বাস—
শেফালির জন্মকথা এখানে কে করবে বিশ্বাস?

কাশফুল
ঘাসফুল
ধান-সিঁড়ি নদী আর ময়ূরপঙ্খির
নীলাভ স্বপ্নের জাদু এখানে বুনো না ঃ
সেই রং বুলিও না শূন্যতার এ ধুধু গৈরিকে—
সে-আলো তো জ্বলবে না
কোনদিন আর এই নেভানো প্রদীপে।
তার চেয়ে বেশ আছি নির্মোহের কোলে
নিষ্প্রদীপ মানস-ভূগোলে
এঁটে দিয়ে বিস্মৃতির ঝাঁপ ঃ
ছিন্নমূল এ বোঁটায়
আর সেই পদ্মরাগ রূপকথা দুলিয়ে কি লাভ?
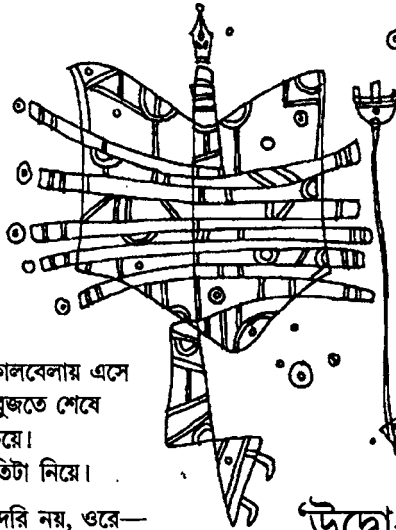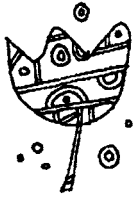
যখন ভাঙল...

জগবন্ধু হালদার

প্রতীক্ষাতেই দিনটা গেল—বিকালবেলায় এসে
বুকের পদ্মপাপড়িগুলো চোখ বুজতে শেষে
প্রহর গোণে, আলোর পানে চেয়ে।
তৃপ্তি এল পায়ে পায়ে সাঁঝবাতিটা নিয়ে।

লগ্ন বুঝি এসেই গেল। আর দেরি নয়, ওরে—
বাসনা জ্বালা, বাসনা জ্বালা, আয়রে ত্বরা করে
পুড়িয়ে দে সব, ছাই করে দে, আলোয় আলো কর;
রাত্তিরটা পার করে চল বিশ্বচরাচর।

কে এসেছে দোরগোড়াতে? নাড়ছে কড়া জোর।
ও মা, এ যে কাকজোছনা ভোর।
কে তুমি গা বে-আক্কেলে? সময় পেলে নাকো।
এমন সময় এলেই যদি দোর আগলেই থাক।
ও মা, তুমি দিব্যপুরুষ বটে।
দাঁড়াও তবে, দাঁড়াও ঘাটের তটে।
আমার বাপু তাড়া আছে যাব বহুৎ দূর—
নিয়ে যাবে সঙ্গে করে অরূপ অচিনপুর?

'উদ্বোধন'-এর পাতায় পাতায়

দুর্গাদাস মণ্ডল

'উদ্বোধন'-এর পাতায় পাতায়, পাই যে খুঁজে তাঁদের ছায়া;
হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া দেহের কায়া।
সুপ্ত হৃদয় জাগিয়ে তোলে, অন্ধকারের গহন থেকে—
মনের কালি দেয় মুছিয়ে, পবিত্রতার ছোঁয়ায় ঢেকে।
উপনিষদ্ বেদ ও গীতার, ছন্দ বাজে তোমার বুকে—
সারা বছর সঙ্গ যে পাই, কাজের মাঝে দুঃখে-সুখে।
রামকৃষ্ণ, সারদা মা, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা
সবার পরশ তোমার মাঝে, তাই তো তুমি সবার পরম মিতা।

অলঙ্করণ : সৌরীশ মিত্র

দেবীর কুমারীরূপ

নবকুমার ভট্টাচার্য*

সৃষ্টিশক্তির একটি খণ্ডরূপে কুমারীশক্তির আরাধনা সব দেশে সকল মানুষের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে। মহাশক্তির সুনির্দিষ্ট এক অনিন্দিতা রূপময়ী আকৃতির নাম 'কুমারী'—যদিও বেদে কুমারীশক্তির প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। মনুস্মৃতিতে কুমারীশক্তিকে বিশেষভাবে লালন-পালন করে তোলার নিদর্শন রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ "পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে/ অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥" (বাজসনেয় মাধ্যন্দিনশুক্ল যজুর্বেদসংহিতা—বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, মুম্বই, ১৯১২, পৃঃ ২৬)

কুমারীদের মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়ন হওয়ার মতোই একটি সংস্কার। তাদের অধ্যাপনা, বেদপাঠ ও গায়ত্রীপাঠের জন্য উপযুক্ত করে শিক্ষিতা করা হতো। বেদে মহিলা বৈদিকদের কথাও রয়েছে। বেদে একবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে 'চরণ' বলা হয়েছে। বিদ্বান ঋষিদের সঙ্গে বিদুষী ঋষিপত্নী ও ঋষিতনয়াগণ সমভাবে বিনা বাধায় চরণ সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারতেন। পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে 'চরণেভ্যো ধর্মবৎ' (৪।২।৪৬) বলে জনসমূহ অর্থে চরণ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। পাণিনির সূত্রের বার্তিককার কাত্যায়ন। 'শাখাধ্যেতৃ' (৪।১।৬৩) সূত্রে তিনি 'চরণ' শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, প্রাচীনকালে সুপণ্ডিতা স্ত্রীগণও চরণভুক্ত হতে পারতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে এককালে কুমারীশক্তিকেও তুলে ধরার সবরকম প্রচেষ্টা হতো, কারণ তখন এই বিশ্বাসটা দৃঢ় ছিল যে, কুমারীশক্তিই সৃষ্টির মূলবেদি। কুমারীপূজা মহাশক্তির সবটুকু সৃষ্টিক্ষমতা আর মাধুর্য-মহিমা অনুভব করার আরেক নাম। দেবীর কুমারী নাম বহু প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছেঃ "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।" (তৈত্তিরীয় আরণ্যকম্, ১০।১।৭—রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত, ১৮৭২) মহাভারতের বিরাটপর্বে আছেঃ "নমোঽস্তু বরদে! কৃষ্ণে! কুমারি ব্রহ্মচারিণি।" (মহাভারত—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, ১২ খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃঃ ৫৬) আবার ভীষ্মপর্বে বলা হয়েছেঃ "কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে।" (ঐ, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫)

দেবী কন্যাকুমারী

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫তম দেবীসূক্তটি একই বৈদিক কুমারী ঋষি বাক্-এর আত্মানুভূতির বাঙ্ময়প্রকাশ। সেখানে তিনি নিজেই জগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্ত্রী। আদিশক্তি এই কুমারী ঋষিকন্যার মাধ্যমেই জগৎসৃষ্টির কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। সেই কুমারীশক্তি বিশ্বপ্রসবিনীঃ "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি,/ তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীসূক্ত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২২২)

বৈদিক যুগে দেবতাদের মধ্যে উষাকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে 'মাতা দেবানাম্' অর্থাৎ সমস্ত দেবতার জননী। দেবমাতা অদিতির কোন রূপকল্পনা শাস্ত্রে নেই, কিন্তু উষার রূপ কল্যাণময়ী অনিন্দিতা অরুণবর্ণা। অদিতির ঘনীভূতা মূর্তি উষা। তাই উষা 'অদিতেরণাকম্'—অদিতিরই আলোকচ্ছটা। উষার মধ্যে শক্তির দুটি বিভাগ রয়েছে—একটি জায়া, অন্যটি জননী। সূর্যকে তিনি জন্ম দেন বলে তিনি জননী। তারই কোলে সূর্যের আবির্ভাব। এই জননীই আদি কৌমারী

---

* *উত্তর কলকাতার নিস্তারিণী চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত, বেদ-প্রচারকার্যে নিরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, 'পৌরোহিত্য বার্তা'র সম্পাদক।*

শক্তি—যাঁর কোন জনক বা পিতা, পালক বা পতি নেই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায়ঃ "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।৩)

এই কুমারী মাতাই আদি পিতা সৃষ্টিকর্তাকে প্রসব করেন 'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্'; কিন্তু তাঁর জন্ম দেন কে? তাঁর স্থানই বা কোথায়? সে যে জলধির অগাধে। সেখানেই এই শক্তির যোনি বা উৎস 'মম যোনিরপস্বহন্তঃ সমুদ্রে' বলেছেন তিনি নিজেই। এই কারণেই কুমারীপূজার এত মহিমা। কুমারীপূজার সার্থকতার মূলতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। সেখানে নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে—বিশ্বের সমস্ত নারী দেবীপ্রকৃতির অংশরূপা। তাই রমণীর অপমানে প্রকৃতিরই অবমাননা করা হয়। যিনি কুমারী কন্যাকে বসন-ভূষণ চন্দন দিয়ে পূজা করেন, তিনি আসলে প্রকৃতিরই পূজা করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে প্রকৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী—এই পাঁচ প্রকার প্রকৃতি।

শিশুকন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করার এক সূক্ষ্ম নিদর্শন রয়েছে বৃহদ্ধর্মপুরাণে।এই পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায়, রাম কর্তৃক রাবণবধের উদ্দেশ্যে দেবতাগণ যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মার অনুমতি চাইলেন। ব্রহ্মা দেবীকে জাগরিত করার কথা উল্লেখ করলে দেবতারা আদ্যাশক্তির স্তব করলেনঃ "কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।" (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, চৌখাম্বা পুস্তক ভবন, বারাণসী, ২৩।১৮।৩৮২) সেই স্তবে সন্তুষ্টা হয়ে এক কুমারী দেবী আবির্ভূতা হয়ে দেবীর বোধন করে পূজা করতে নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশমতো ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে এসে ঘুরতে ঘুরতে এক নির্জন স্থানে বেলগাছের একটি পাতায় সোনার বরণ এক শিশুকন্যাকে নিদ্রিতা দেখে তাঁকেই বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননী মহামায়া বলে স্তব করেছিলেন। ব্রহ্মার সেই স্তবেই শিশুকন্যা জাগরিতা হয়ে দেবীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং দেবতাদের অভীষ্ট পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুন দেবী কুমারীর পূজা করেছিলেন। মহাকাল সংহিতা, মার্কণ্ডেয়পুরাণেও কুমারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের ১০১তম অধ্যায়ে নন্দিকেশ্বর রুদ্র কথিত ৬০ রকম ব্রতের কথা বলতে গিয়ে ২৭ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে নবমীতে একাহারী থেকে শক্তি অনুসারে এক-একটি কন্যাকে ভোজন করিয়ে আসন, স্বর্ণখচিত বস্ত্র ও কঞ্চুক দান করার কথা। তা করলে মহাপাপ নাশ হয়।

দেবীপুরাণ-মতে, দেবীপূজার পর উপযুক্ত উপচারে কুমারীদের ভোজন করিয়ে তৃপ্ত করতে হবে। তন্ত্রসারে বলা হয়েছেঃ কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোককে ভোজন করানো হয়। "কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।" (তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, শ্লোক ৫৮, পৃঃ ৬৪২) তন্ত্রমতে অবশ্য সমস্ত দেবতাই কুমারী। দেবী শিবকে বলেছেনঃ আমি কুমারী, তুমিও কুমারী—"কুমারিকা হ্যহং নাথ সদা ত্বং হি কুমারিকা।" (ঐ, শ্লোক ৬১, পৃঃ ৬৪৩) মূলত আমাদের আরাধনা মৃন্ময়ীর নয়, সে যে চিন্ময়ীর আরাধনা। রমণীর মাঝে জননীর দর্শন, এক প্রকৃতির মাঝে বিশ্বপ্রকৃতির অবলোকন—তা সহজ সরল ভাবে বুঝিয়ে দিতেই শাস্ত্রকাররা কুমারীপূজার নির্দেশ দিয়েছেন।
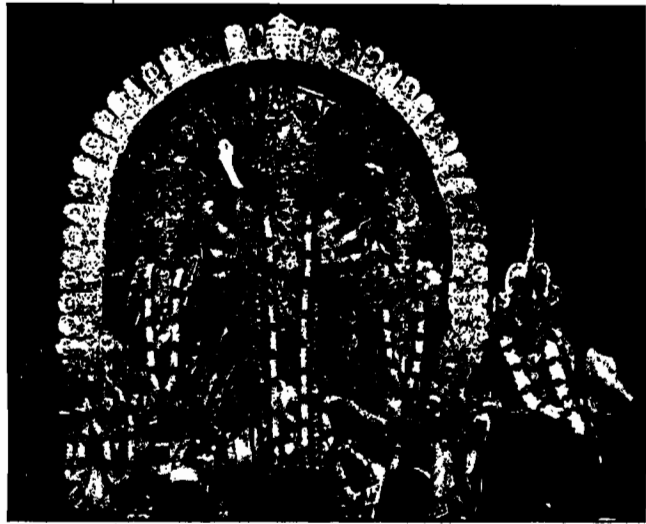
বেলুড় মঠে কুমারীপূজা

কুমারীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কুমারীর আকৃতি হবে সুন্দর সুলক্ষণা এবং প্রকৃতি হবে শোভনা। আগমতত্ত্ববিলাসে বলা হয়েছেঃ "কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ।" (আগমতত্ত্ববিলাস—পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, ২য় পরিচ্ছেদ, নবভারত পাবলিশার্স, পৃঃ ৬৪০) মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ, কারণ মানুষ চৈতন্যযুক্ত। মানুষের মধ্যে আবার যিনি সৎ, নির্মলচরিত্র—তাঁর মধ্যেই আবার ঈশ্বরের অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকাশ। শিশুদের মধ্যে এই গুণগুলি প্রবল। তাই কুমারীর মধ্যে দেবী আরাধনার বিধি। কুমারীপূজা শারদীয়া মহাপূজার অপরিহার্য অঙ্গ। দেবীভাগবতে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত নয়দিন প্রত্যহ যথাবিধি কুমারীপূজার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা

হয়েছে ঃ "নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীনাঞ্চ পূজনম্। বস্ত্রালঙ্কারনৈর্দ্রব্যৈর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ঃ।" (দেবীভাগবত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ৩য় স্কন্ধ, নবভারত পাবলিশার্স, ২৬।৩৭।২২৪) অর্থাৎ প্রতিদিন সুন্দর বসন, ভূষণ ও অমৃতময় ভোজন দিয়ে কুমারীপূজা করা উচিত। দেবীপুরাণে অমৃতময় ভোজন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্যকাস্বপি।" (দেবীপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪।১১। ১৪১) অর্থাৎ শালিধানের ভাত, শর্করা প্রভৃতি সহযোগে কুমারীকে ভোজন করাতে বলা হয়েছে।

কুমারীপূজার ফলের কথা বলে শেষ করা যায় না। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ "কুমারী পূজনফলং বক্তুনার্হসি সুন্দরী।" (যোগিনীতন্ত্র—সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত, ১৭শ পটল, শ্লোক ৩০, নবভারত পাবলিশার্স, পৃঃ ১৭৭) শিব পার্বতীকে বলেছেন ঃ "কুমারী পূজনং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।" (ঐ, ১৩শ পটল, শ্লোক ৩৫, পৃঃ ১৩৬) এই পূজার ফলে ত্রিলোক জয় করা যায়। কুমারীই দেবী—একথা মনে রেখে কুমারীকে পূজা করতে হবে। ভারতে দুটি মন্দিরে দেবীকে কুমারীরূপে পূজা করা হয়। এক মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে, অন্যটি ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারীতে।

বর্তমানে যেসমস্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি পাওয়া যায় তাতে কুমারীপূজার বিধান রয়েছে নবমীর দিন। এর উৎস মূলত তন্ত্র। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে ঃ "হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা।/ পরিপূর্ণং ফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্।" (তন্ত্রসার, শ্লোক ৫৭, পৃঃ ৬৪২) কথাটির অর্থ—কুমারীপূজা ছাড়া হোমাদি সমস্ত কাজ করেও দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ হোমাদি কথাটির ওপর অন্যভাবে গুরুত্ব দিয়ে পুঁথিকাররা যে কেবল নবমীতে কুমারীপূজার নির্দেশ দিয়েছেন তা সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায় না। কারণ, দুর্গাপূজায় তন্ত্র অপেক্ষা পুরাণের প্রামাণ্য ও প্রাধান্য অনেক বেশি।

'তন্ত্রসারে' এক থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কুমারীকে পূজার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বয়স অনুসারে কুমারীর নামকরণও করা হয়েছে। তন্ত্রে এক বছর বয়সের কুমারীর নাম 'সন্ধ্যা', দুবছর বয়সের কন্যার নাম 'সরস্বতী', তিন বছরের মেয়ে 'ত্রিধামূর্তি', চার বছরে 'কালিকা', পাঁচ বছরে 'সুভগা', ছয় বছরে 'উমা', সাত বছরে 'মালিনী', আট বছরে 'কুব্জিকা', নয় বছরে 'কালসন্দর্ভা', দশ বছরে 'অপরাজিতা', এগারো বছরে 'রুদ্রাণী', বারো বছরে 'ভৈরবী', তেরো বছরে 'মহালক্ষ্মী', চৌদ্দ বছরে 'পীঠনায়িকা', পনেরো বছরে 'ক্ষেত্রজ্ঞা' এবং ষোলো বছর বয়সে কুমারী 'অম্বিকা'। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে পদ্ধতিগুলিতে কুমারীর নামকরণের যে-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়, কারণ তাতে ষোড়শ বর্ষীয়া পর্যন্ত কুমারীর নামকরণ করে পূজা করতে বলা হয়েছে; কিন্তু শাস্ত্রে স্পষ্টই নির্দেশ করা হয়েছে—দশ বছর বয়স্কা পর্যন্তই কুমারীকে পূজা করা উচিত ঃ "অত ঊর্ধ্বং ন কর্তব্যং সর্বকার্য বিগর্হিতা।" (শুদ্ধিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন, হৃষিকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃঃ ৭৩)

বিশ্বসারতন্ত্রে কুমারীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "অষ্টবর্ষা তু সা কন্যা ভবেদ্ গৌরী বরাননে/ নববর্ষা রোহিনী চ দশবর্ষা তু কন্যকা/ অত ঊর্ধ্বা মহামায়ে ভবেৎ যৈব রজস্বলা।". (বিশ্বসারতন্ত্র—শ্রীকৃষ্ণদাস ভেঙ্কটেশ্বর সম্পাদিত, পুণা, ১৮৩২ শকাব্দ, ২৬।৪৫।১৮২)

প্রসঙ্গত, দেবীভাগবতে কুমারীর নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেখানে এক বছর বয়সের কুমারী পূজার যোগ্য নয়। দুবছর থেকে দশ বছর বয়স্কা বালিকা কুমারী হবে। তাদের বয়স অনুযায়ী নাম হবে। দুবছর বয়সের কুমারীর নাম 'কুমারিকা', তিন বছরে 'ত্রিমূর্তি', চার বছরে 'কল্যাণী', পাঁচ বছরে 'রোহিণী', ছয় বছরে 'কালিকা', সাত বছরে 'চণ্ডিকা', আট বছরে 'শাম্ভবী', নয় বছরে 'দুর্গা' এবং দশ বছর বয়সের কুমারীর নাম 'সুভদ্রা'। এই নয়প্রকার কুমারীপূজার পৃথক পৃথক ফলের কথাও বলা হয়েছে। যেমন—দুবছরের কুমারীতে কুমারিকার পূজা করলে দুঃখ, দারিদ্র্য ও শত্রুনাশ হয় এবং ধন, আয়ু ও বলবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। ত্রিমূর্তির পূজা করলে আয়ুবৃদ্ধি, ধনধান্যাগম ও বংশবৃদ্ধি হয়। কল্যাণীর পূজা বিদ্যার্থী, বিজয়ার্থী, রাজ্যার্থী ও সুখার্থীরা করে থাকেন। রোহিণীর পূজায় রোগনাশ হয়, কালিকার পূজায় শত্রুনাশ হয়। চণ্ডিকার পূজায় ধনৈশ্বর্যলাভ হয়। শাম্ভবীর পূজা করলে শত্রুদের মোহিত করা যায়। দুর্গার পূজা করলে ঐহিক দারিদ্র্য এবং শত্রু বিনষ্ট হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সুভদ্রার পূজা করা উচিত।

তন্ত্রে যেকোন জাতির কুমারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার কথা বলা হয়েছে ঃ "জাতিভেদো ন কর্তব্যাঃ কুমারী পূজনে শিবে।" (যোগিনীতন্ত্র, ১৭শ পটল, শ্লোক ৩১, পৃঃ ১৭৭) স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরে তাই একবার একটি মুসলমান মেয়েকে কুমারীপূজা করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে যোগিনীতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে; কুমারীপূজায় ব্রাহ্মণকন্যা নয়, বেশ্যাকন্যা উৎকৃষ্টা ঃ "যদিভাগ্য বশাদ্দেবি বেশ্যাকুল সমুদ্ভবাম্/ কুমারী লভতে কান্তে সর্বস্বেনাপি সাধকঃ।" (ঐ, শ্লোক ৩৫, পৃঃ ১৭৮)

কুমারীর ধ্যানের অর্থ করা হয়েছে ঃ মা, তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দরি, কিন্তু আজ তুমি কালিকারূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত। তুমি জ্ঞানরূপিণী, হাস্যময়ী, মঙ্গলদায়িনী। প্রণামে বলা হয়েছে ঃ মা, তুমি প্রসন্না হলে আমাকে সৌভাগ্য দান করতে পার। তুমি সকল প্রকারের সিদ্ধি আমাকে দান কর। তুমি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল কত রকমের অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হয়েছ। তুমিই সরস্বতী। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ■

মহাকবি নিরালার প্রেমানন্দ-স্মৃতিচারণ

স্বামী বিদেহাত্মানন্দ*

মহাকবি নিরালার পিতৃদেব পণ্ডিত রামসহায় ত্রিপাঠী উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার গড়কোলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল এস্টেটের অধীনে কর্মস্বীকার করে বসবাস শুরু করেন। ১৮৯৩ সালের বসন্ত পঞ্চমীর দিন মহিষাদলেই নিরালার জন্ম হয়; ১৯০৮ সালে বিবাহ হয় এবং তাঁর কিছুদিন পর পত্নীর প্রেরণায় তিনি হিন্দি ভাষা শিখতে শুরু করেন। এইভাবেই পরবর্তী কালে হিন্দি সাহিত্যের মহাকবি সূর্যকুমার ত্রিপাঠী বা নিরালার আবির্ভাব ঘটে। ঘটনাচক্রে ১৯১৫ সালে যখন স্বামী প্রেমানন্দজী মহিষাদলে আসেন, তখন যুবক সূর্যকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামী প্রেমানন্দজী এই পশ্চিমীয় যুবকের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনেন। এরপর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের (মহিষাদল) গৃহে নিরালা প্রায় যাতায়াত করতে থাকেন এবং স্বামীজীর রচনাবলি অতীব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবে যোগ দিতে মাঝে মাঝে বেলুড় মঠেও তিনি যাতায়াত শুরু করেন। ১৯২৭ সালে অদ্বৈত আশ্রম থেকে মাসিক পত্রিকা 'সমন্বয়' প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতে আসেন এবং উদ্বোধন কার্যালয়েও বসবাস করতে শুরু করেন। এর ফলে স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটে।

লখনৌ শহরের নিরালা নগরে মহাকবি নিরালার মর্মরমূর্তি

স্বামী প্রেমানন্দজী যে মহিষাদলে এসেছিলেন, সে-ঘটনার উল্লেখ খুব ছোট আকারে পাওয়া যায় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'প্রেমানন্দ-প্রেমকথা' পুস্তকে। প্রাসঙ্গিক অংশটি এইরূপ ঃ "নাটশালের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন পান এবং পুরীধামে গিয়া মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।... নাটশাল রূপনারায়ণ নদের তীরে, গেঁওখালির সন্নিকটে অবস্থিত। দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মঠে জন্মোৎসব হইয়া যাওয়ার পরে বাবুরাম মহারাজ এখানে শুভাগমন করেন, গোপাল মহারাজ (?) প্রমুখ নয়জন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া (১৯১৫)। দশটি চকে বিভক্ত নাটশালের রাজচকে হিজলি ক্যানেলের পাড়ে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্টিমারে কলিকাতা হইতে গেঁওখালি আসিয়া বাবুরাম মহারাজ তথাকার থানার দারোগার বাসায় মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রাম করেন।... গেঁওখালির দারোগা ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য ও পূর্ববঙ্গের লোক। মহিষাদল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার শচীন্দ্রনাথ বসুও—মহিষাদল ও নাটশালের ব্যবধান তিন মাইল মাত্র—ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত, উক্ত সেবায়োজনে তাঁহারা উভয়েই সক্রিয় সাহায্য করেন।...' শচীনবাবুর আহ্বানে বাবুরাম মহারাজ মহিষাদলে যাইয়া একদিন অবস্থান করেন।"

** রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে প্রকাশিত হিন্দি মাসিক পত্রিকা 'বিবেক-জ্যোতি'র সম্পাদক। মূল হিন্দি রচনার বাঙলা অনুবাদ করেছেন স্বামী সুপর্ণানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুর।*

আরো একবার বাবুরাম মহারাজ মেদিনীপুরে আসেন (১৯১৭ সালের ৩ মার্চ)। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের বিবরণ এইরকম ঃ "এই বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ মেদিনীপুর গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন অক্ষরানন্দ, বরদানন্দ, উমানন্দ ও ব্রহ্মচারী যতীশ (রামানন্দ)। বরদানন্দ বলেন—মেদিনীপুরের উৎসবে একদিন দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'চল্। নারায়ণসেবা দেখে আসি।' তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছি, ভক্তেরাও আছেন, মনে হইল সেবা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। দেখিলাম, দুই হাত দিয়া নিজের বাহুমূল টিপিয়া টিপিয়া শরীরে মন আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। নানারকমের নোংরা লোক বসিয়া আহার করিতেছে। তিনি ঐরূপ একজনের পাত হইতে দুই-এক দানা তুলিয়া নিজের মুখে দিলেন। আমরা 'করেন কী, করেন কী' বলিয়া বারণ করায় বলিলেন, 'নারায়ণের প্রসাদ'।"

দেখা যাচ্ছে, ১৯১৭ সালে মেদিনীপুরের উৎসবে প্রেমানন্দজী এসেছিলেন দ্বিতীয়বার। সেটি মেদিনীপুর সদর শহর কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। আমাদের ধারণা, দ্বিতীয়বারও তিনি যে নাটশাল বা মহিষাদলে আসেননি এবং মেদিনীপুর শহরেই এসেছিলেন—এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। যাইহোক, নিরালার বর্ণনায় প্রেমানন্দজীর মহিষাদল আগমনের যে-আলেখ্যটি পাই তা খুব সম্ভব প্রথমবারের আগমনকে উপলক্ষ্য করেই লেখা।

নিরালা নিজেকে ভক্তরূপে নিরূপিত করে এবং স্বামী প্রেমানন্দজীকে ভগবানরূপে চিহ্নিত করে 'ভক্ত এবং ভগবান'—একথা লিখে গেছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে মহিষাদল রাজবাড়ির দেওয়ান নিজে নিয়ে আসেন। রাজার কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল—যাদের তিন-চার হাত জটা নেই, তামাক-গাঁজায় আসক্তি নেই, ধুনি জ্বালাবার প্রচেষ্টা নেই—তারা সাধু-মহাত্মাই নয়। যাদের এসবে আসক্তি আছে, তাদেরই তিনি মহাসমারোহে গাঁজাদি দান করে সেবায় তৎপর হতেন। সেজন্য রাজার শিক্ষিত কর্মচারিবৃন্দ এসব পুরনো মহাত্মাজীদের যেমনভাবে অশ্রদ্ধা করতেন, তার চেয়েও বেশিভাবে অশ্রদ্ধা করতেন স্বয়ং রাজাকে। স্বামী প্রেমানন্দজীর শুভাগমন খুবই সমারোহের সঙ্গেই হয়েছিল। ভক্ত (নিরালা) নিজে উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ান (শচীন্দ্রনাথ বসু) তো ছিলেনই। দেওয়ান ভক্তের দীনভাব দেখে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভক্ত নিজে স্বামীজীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মালা তৈরির জন্য ফুল বেচছিলেন। প্রেমানন্দজী মালা পরে পরিহাস করে বলেন ঃ "তোমরা দেখছি আমাকে কালী বানিয়ে দিলে।" ভক্ত তো সত্যই বুঝতেই পারেননি যে, ঐদিন ঐ দেবদেহে সমস্ত ধর্মের মিলন ঘটেছিল। ব্রহ্মচারী মহাবীর, প্রভু রামজী, সমস্ত দেবদেবী এই সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিলেন। বড় ভক্তির সঙ্গেই পরমহংসদেবের পূজা সমাপ্ত হলো। রাজ্যের বড় বড় অফিসার সব একত্রিত হয়েছেন। দেওয়ানজী কবীরের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করে প্রেমানন্দজীকে শোনাচ্ছেন। ভক্ত তুলসীদাসজীর রামায়ণ সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন—যদি তিনি শোনেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে পড়তে শুরু করেছেন ভক্ত। সুতীক্ষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামের মিলন এবং পুনরায় নিজের গুরুর কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া—এই অংশটি পড়া হচ্ছে। ধ্যানমগ্ন হয়ে প্রেমানন্দজী শুনছেন ঃ "শ্যামতামরসদাম শরীরম্ / জটামুকুট পরিধান-মুনি-চীরম্" ইত্যাদি। সাহিত্য-মহারথ গোস্বামী তুলসীদাসজী যেন শব্দ-স্বরের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছেন। প্রেমানন্দজীর তো ভাবের ইয়ত্তা করা যাচ্ছে না। ভক্ত একটু ক্লান্ত হয়েছেন। পূর্ণবিরামযুক্ত দোঁহা শেষ হতেই মহারাজ পাঠ শেষ করার নির্দেশ দিলেন। পুনরায় মাঝে মাঝে ধর্মকথা শুরু হলো। তিনি দেওয়ানজীকে প্রতি একাদশীতে মহাবীরের পূজা এবং রামনামসঙ্কীর্তন করার নির্দেশ দিলেন।

এই ঘটনাটিকেই নিরালা বিস্তারিতভাবে 'স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার গদ্যরূপান্তর এরকম—

"আমের মুকুলের ওপর বসন্ত ঋতু নেমে এসেছে। ভ্রমরের দল মধুর গুঞ্জনে রত। বাতাসে মৃদুমন্দ গন্ধ। জলভরা পুকুরের কিনারে সারিবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ। জলের ওপরে মাছগুলি লেজ, পাখনা উলটে দিয়ে আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। পূজার উপচার হিসাবে গন্ধরাজ, বকুল, বেল, জুঁই, কেতকী, চাঁপা প্রভৃতি ঋতুপুষ্পগুলি ফুটে উঠেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ির পিছনে পেয়ারা, জাম, বেদানা, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বৃক্ষগুলি শোভা পাচ্ছে, একটু দূরে বাঁশঝাড়। তেঁতুল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষ রয়েছে। বাড়ির সামনেই স্বচ্ছ, পবিত্র এবং স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর দেবালয় বা পূজাগৃহ। ভক্তব্রাহ্মণের শোভন গৃহ। একদিকে ধানের গোলা, অন্যদিকে সুন্দর বাঁধানো ঘাটযুক্ত স্বচ্ছসলিল পুষ্করিণী। গোলাপ, নারিকেল-শোভিত। সজ্জিত বৈঠকখানায় গৃহস্বামী বসে আছেন। কলরবমুখর বালকেরা নির্ভয়ে খেলা করছে—কুল, খেজুর, আম, জাম গাছের তলায়। ফলগুলি পেকে উঠেছে যে! উঁচু জায়গায় গাঁয়ের লোকের বাস। নিচু জমিতে জল জমে থাকে বলে এখনো নরম। কিন্তু ধানকাটা শেষ। গৃহস্বামী পরমহংসদেবের ভক্ত।

"যুবসমাজ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বই অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। যেমন বসন্তকালে বৃক্ষগুলি তাদের জীর্ণপত্রগুচ্ছ পরিত্যাগ করে নতুন পত্রসম্ভারে শুদ্ধ করে নেয় নিজেদের, তেমনি তাঁর প্রভাবে মানুষের পুরনো ধারণা দূরীভূত হয় এবং

চরিত্র সংশোধিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দজী যে উৎসবে আসছেন সে-কথা গ্রামবাসীরা নিশ্চয় জেনে গেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে প্রেমানন্দজীকে আনার জন্য ভক্তকে পাঠানো হয়েছিল। প্রভাতসূর্যের মতোই জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসা হলো। সঙ্গে ছিলেন এক ব্রহ্মচারী, যিনি যুগপৎ আত্মানুসন্ধান এবং জীবসেবার জন্য এই অঞ্চলে এসেছিলেন। সমুদ্র পূর্ণিমার চন্দ্র দেখে যেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে, সেইরকম প্রেমানন্দজীকে দেখে জনসমুদ্রও উদ্বেল হয়ে উঠল।

"একটি ধানখেতকে পিটিয়ে সমান করে উৎসবক্ষেত্র তৈরি করা হয়। সামিয়ানা, তোরণ, দ্বারে আম্রশাখা-সিন্দুর-স্বস্তিকাচিহ্নিত জলপূর্ণ মঙ্গল কলসের শীর্ষে কচি নারিকেল প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। পুষ্প-পল্লবে মঞ্চ সজ্জিত, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিও পুষ্পশোভিত হয়ে মঞ্চোপরি একটি চেয়ারে বিরাজিত ছিল। রঙিন কাগজের তৈরি শিকল দিয়ে প্রবেশদ্বারে বিশাল 'স্বাগত' লেখা ছিল। বাল-বৃদ্ধ-যুবা সব নরনারী যাওয়া-আসা করছিল। খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন চলছিল। দরিদ্রনারায়ণদের খিচুড়ি, তরকারি, মিষ্টান্নাদি দ্বারা আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হয়। প্রসাদ-প্রত্যাশী সকলেই খুব বড় বড় পঙ্ক্তিতে বসেছেন। সবাই আমন্ত্রিত। রাজকর্মচারিবৃন্দ, ধনী, মানী সবাই জীবনপুষ্টি এবং আধ্যাত্মিক ধারণার জন্য এসেছেন। প্রেমানন্দজী স্বয়ং ভক্তিরূপী। তাঁকে ঘিরে সব ভক্তের সমাবেশ হয়েছে, যেমন নানারকমের (ভাল-মন্দ) দেহসমূহ আত্মাকে ঘিরে থাকে। আত্মা নির্লিপ্ত, বায়ুর ন্যায় ভাল-মন্দ গন্ধ তার নিজের নয়। মঞ্চের সামনে গায়করা মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে কীর্তন করছে, ভক্তেরাও যোগ দিয়েছেন, চক্রাকারে বারংবার পরিক্রমা করে কীর্তন চলছে। এইভাবে উৎসব শেষ হলো।

"দেওয়ানজী প্রেমানন্দজীকে আপন ভবনে অতি সমাদরে নিয়ে এসেছেন। পূজা-অনুষ্ঠান হয়েছে। মহারাজ সেখানে অবস্থান করছেন। পশ্চিমীয় তরুণ 'রামচরিতমানস' থেকে শ্রীসুতীক্ষ্ণের কথা মধুর কণ্ঠে পড়ছেন। অংশটি শ্রীরঘুনাথের বন্দনা ও ভক্তিভাবের দ্বারা সম্পৃক্ত। শ্রোতৃবৃন্দের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। ধ্যানমগ্ন প্রেমানন্দজীর মন ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠে সহস্রারে পৌঁছে গেছে। লোকোত্তর আনন্দে উদ্ভাসিত তিনি। পাঠ শেষ হলো। গৃহস্বামী ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। নতুন পাতা পড়ল, আসন, গ্লাস সব রাখা হয়েছে। ঘৃতপক্ক খাবারগুলির সুবাসে চারিদিক ম ম করছে; সব রাজকর্মচারী আজ আমন্ত্রিত।

"আবাহন করে প্রেমানন্দজীকে নিয়ে আসা হলো। হাতমুখ ধুয়ে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সব আমন্ত্রিত অতিথি একই পঙ্ক্তিতে বসেছেন। দেওয়ানজী নিজে কায়স্থ কুলোদ্ভব। প্রেমানন্দজী এবং বিবেকানন্দ উভয়েই পূর্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন। বসু মহাশয়ের সেজন্য বিশেষ গর্ব। তিনি প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন ঃ 'একদিন ব্রাহ্মণরা আমাদের পতিত করেছিল; আমাদের শূদ্র বলে এসেছে। কিন্তু শ্রীবিবেকানন্দ এবং আপনি অসাধ্যসাধন করে আমাদের ধন্য করে দিয়েছেন। আমরাও ব্রাহ্মণের মতোই একই সাধনলব্ধ ফল ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পেরে সমাজে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছি।' স্বামীজী একপক্ষের এইরকম স্তুতি শুনে চুপ করে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সজাগ হয়ে উঠল। তাদের স্পর্ধোদ্যত মস্তকগুলি লক্ষ্য করে প্রেমানন্দজী বুঝলেন, এবার তারা ক্ষোভে ফেটে পড়বে। সেজন্য প্রেমবিগলিত স্বরে তিনি বললেন ঃ 'সন্ন্যাসী হওয়ার পর তো আমাদের দেশ, কাল, পাত্র সব চলে গেছে। আমাদের রামকৃষ্ণময় জীবন সবার সেবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শুভজন্ম ব্রাহ্মণের গৃহে হয়েছিল বলেই আমি বা বিবেকানন্দ তাঁর কাছে যাইনি। গিয়েছিলাম আমরা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, যোগিশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধপ্রবর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি যে, যিনি পরমাত্মালীন তিনি জাতিকুলের ওপরে উঠে গেছেন।'

"দ্বিজভ্রমরকুল এমন মধুপুষ্পরূপ বচনের আস্বাদ পেয়ে শান্ত হয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু একজন বোলতাজাতীয় ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দজীকে দংশনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, বললেন ঃ 'আমাদের রাজা ব্রাহ্মণ, আমি এইসব ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কথা ওনাকে বলব। ওঁর সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠ রাজকর্মচারী একসঙ্গে বসবেন, আমরা সব দেখব।' অন্য একজন তাঁকে থামাতে গিয়ে বললেন ঃ 'আরে! এখনি কোথায় যাও? রসগোল্লা আসছে। এমনিতেই তো জিভ কটু করে ফেলেছ, এখন মিঠে কর।' ব্রাহ্মণ উঠতে গিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। প্রেমানন্দজী ভোজন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। এবং বললেন ঃ 'আমাদের মধ্যে যদি কেউ সম্যক্ সমঝদার থাকেন তো ঐ বিদ্বানকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিন।' এই কথা শুনে সেই দ্বিজ রাগে উঠে পড়লেন এবং পশ্চিমের যুবকের (নিরালার) দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'ঘোর কলিকাল! এইসব লোকও এই পঙ্ক্তির মধ্যে বসে গেছে, যাদের মা-বাপের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।' মহারাজ বললেন ঃ 'এমন কলিকালেই তো রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তো এইসব মানুষেরই পরমবন্ধু হয়েছিলেন, যাদের কোন পরিচয় ছিল না। যারা ম্লেচ্ছ বা দুরাচারী বলে চিহ্নিত ছিল, তাদেরই তো পরিচয় দেওয়া হয়েছে।'

"দেওয়ান বিপদ বুঝে প্রেমানন্দজীকে জোড় হাতে মিনতি করতে লাগলেন ঃ 'আপনি না বসলে সবাই যে উঠে পড়বে। যজ্ঞ সমাপ্ত হবে না।' স্বামীজী বললেন ঃ 'ভোজন সমাপ্তির অন্ন, মিষ্টান্ন সব নিয়ে এই যুবককে পরিবেশন করুন। এর থেকেই ভোজন শুরু হবে। পুনরায় সবাই প্রসাদ পাবে।'

"মেঘমন্দ্র কণ্ঠধ্বনিতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রেমানন্দজী বসলেন আবার। মিষ্টান্ন আনা হলো। বিনয়পূর্বক যুবকটিকে প্রথম পরিবেশন করা হলো। আমন্ত্রিতগণ সাধুতা এবং সময়ের প্রভাবকে মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে ভোজন করলেন। সবার প্রাণগগনে যেন তারকার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেল। সবাই সচকিত। সাধুভোজ পূর্ণ হলো।

"পরদিন প্রাতঃকালে ধর্মসভা হলো। স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীমুখ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং বিবেকানন্দের কথা শোনার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অতি আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হয়েছিল। দেওয়ানজী সভাপতির আসনে সুশোভিত ছিলেন।

"সমাগত বক্তাদের বক্তৃতা হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে, কেউবা স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে। কেউ কেউ আধুনিক ধর্ম, ত্যাগ, জাতির উত্থান, প্রেম, সেবা, দেশনায়কতা, ভারত তথা বিশ্বের সমস্যা প্রভৃতির ওপর বললেন। একজন ব্রহ্মচারী স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' থেকে 'সখার প্রতি'—এই বিশিষ্ট কবিতাটি আবৃত্তি করেন। প্রেমানন্দজীকে বলবার জন্য অনুরোধ করা হলো। এতক্ষণ ধরে জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শন করছিল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'আপনারা সব বিদ্বান লোক, ভালই বললেন। আমি তো সেবকমাত্র। আমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর ছিলেন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ। সবার জন্য তিনি এই মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন—শুধু কর্ম কর। আপনাদের আগ্রহে আমি পুনরায় সাংসারিক ধর্ম নিয়ে কিছু বলছি। এসব কথা মুনি-ঋষিরাই বলে গেছেন। নারদ একদিন বিষ্ণুর কাছে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মর্ত্যলোকে আপনার কোন পুণ্যশ্লোক ভক্ত আছে? বিষ্ণু বললেন, একজন সজ্জন কৃষক আছে। সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। নারদ বললেন, আমি তার পরীক্ষা নেব। বিষ্ণু হেসে বললেন, নাও পরীক্ষা। ভক্তের কাছে গিয়ে নারদ হাজির হলেন এবং দেখলেন, কৃষকটি দুপুর পর্যন্ত হাল চাষ করে। তারপর বাড়িতে ফিরে রামজীর নাম করে একবার, পুনরায় স্নান-ভোজন সেরে কাজে যায়। সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকবার সময় আরেকবার রামজীর নাম করে। প্রাতঃকালে কাজে বের হওয়ার সময়ও একবার মধুর নাম স্মরণ করে। ব্যস! কেবল তিনবার। নারদ তো অবাক! ঋষি-মুনিরা দিনরাত নাম জপছেন আর শেষে কিনা এই কিষাণই ভগবানের স্মরণে এল? এবং বিষ্ণুলোকেও যাবে? তিনি শ্রীভগবানকে বললেন, প্রভু, কিষাণকে দেখলাম। সারাদিনে মাত্র তিনবার নাম স্মরণ করে। বিষ্ণু বললেন, খুব জরুরি একটি কাজ পড়েছে। তুমি ছাড়া সে-কাজ আর কেউ করতে পারবে না। এ তো সাধারণ কথা। ওর মীমাংসা পরে হবে। এখন তুমি সেই জরুরি কাজটি কর। এই তেলভর্তি পাত্রটি নিয়ে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে এস। খুব সাবধানে থেকো, যেন একফোঁটা তেলও পড়ে না যায়। সেই আজ্ঞা শিরোধার্য করে নারদ বিশ্বপর্যটন করলেন এবং শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন। একফোঁটা তেলও তো ঐ পাত্র থেকে পড়ে যায়নি। এই কথা ভেবেই তেল সম্বন্ধে এক নতুন রহস্য উদ্ভাবন করে তিনি খুব উল্লসিত হলেন। ভগবান বিষ্ণু নারদকে দেখে সস্নেহে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার প্রশ্নের জবাব তো এসে গেছে। এখন বল, পাত্র নিয়ে যাওয়ার সময় কতবার ইষ্টনাম জপ করেছ? শঙ্কিত চিত্তে নারদ বললেন, এ কাজ তো আপনারই ছিল, আমার মনও তো ঐ কাজেই লেগে ছিল। নাম আবার কখন নেব? বিষ্ণু বললেন, নারদ, ঐ কিষাণ যে-কাজটি করছে, সেই কাজটিও তো আমিই তাকে দিয়েছি। তাছাড়া আরো বেশ কিছু দায়িত্ব ওর ওপর চাপানো আছে। সে তো সব কাজই করে এবং আমার নামও নেয়। সেইজন্যই তো সে আমার প্রিয়তম। নারদ লজ্জিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনি অতি সত্য কথাই বলেছেন।'

"আলোচনা সমাপ্ত করে প্রেমানন্দজী বসলেন।

"তিনি প্রধান অমাত্যকে বললেন ঃ 'এখানকার দর্শনীয় স্থান যেসব আছে তা দেখাবে না?' অমাত্য বললেন ঃ 'রাজার গড়ের ভিতর কৃষ্ণজীর মন্দির আছে। স্থানটি বড় সুন্দর। সন্ধ্যারতির সময় আপনাকে নিয়ে যাব। তাছাড়া রাজার প্রাসাদও খুব দেখার জিনিস, কিন্তু ওখানে আপনার গিয়ে লাভ নেই।' স্নান, ধ্যান, ভোজন, বিশ্রামের পর রাজগড়ে কৃষ্ণজীকে দেখার জন্য সবাই তৈরি। প্রেমানন্দজী, তিনজন ব্রহ্মচারী, অমাত্য এবং পশ্চিমীয় যুবক রওনা দিলেন।

"গড়টাকে চারিদিকে বেষ্টন করে রেখেছে তিন মাইল বিস্তৃত পরিখা। পরিখার পুল পার হয়ে পশ্চিমের সিংহদ্বার। সোজা রাস্তা চলে গিয়েছে। দুধারে বিশাল জলাশয়। উদ্যানের সমতলভূমিতে দূর্বাঘাসের আস্তরণ। লাল, হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের ফুলের বাহার। এরা সব নয়ন, মনের তৃপ্তিসাধন করছে। সরোবরের জল স্পর্শ করে স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলেছে। দুদিকেই সরোবর। কিছু দূর গিয়ে দুই রাস্তার দুদিকেই দুটি করে বটম পামের সারি। ঠিক মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণজীর মন্দিরের রাস্তা গিয়েছে। দূর্বার সবুজ রং, সরোবরে জলের লঘু নীলিমা, বটম পামের কালো ছায়ার বিস্তৃত আবরণ, ঋতুপুষ্পের বাহার, দেবদারু, হিং, এলাচ, অশোক প্রভৃতি বিরল বৃক্ষের নিয়ন্ত্রিত সমাবেশ। সরোবরে বায়ুতাড়িত তরঙ্গের খেলা। সব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। একটি রাস্তা রাজভবনের দিকে গিয়েছে। পুনরায় একটি বড় উঠান। তারপর সুসজ্জিত উদ্যান এবং বিশাল প্রাসাদ। প্রধান অমাত্য প্রেমানন্দজীকে সেই বিশেষ পথ দিয়েই নিয়ে চললেন।

"সিংহদ্বারে যেমন প্রহরী মোতায়েন ছিল, এখানেও প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। অল্প দূরে রাজপ্রাসাদের তোরণ এবং

প্রহরী দুই-ই দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের প্রায় কুড়িখানা সিঁড়ি ভেঙে একতলা পর্যন্ত অতিক্রম করলে প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়। সেখানে দুদিকে তোপ আছে, সোনার জল-শোভিত দুটি ভীমকায় সিংহ বসে আছে। দুদিকে একটি একটি করে বটম পামের বড় গাছ আছে। শ্বেতপাথরের তৈরি খোলা বারান্দাগুলিও বিশাল। উঁচু উঁচু রেলিং, বড় বড় সব দুপাল্লা দরজা। আবার একটি কাঁচের। বিশাল রাজবাড়ি। মন্দ বাতাসে তাড়িত হয়ে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ রজনীগন্ধার হালকা সৌরভ।

"প্রহরী প্রধান অমাত্যকে সেলাম করে বিনয়ের সঙ্গে বলল ঃ 'মহারাজের হুকুম আছে, একমাত্র আপনিই এই পথে যেতে পারেন। অন্যদের ব্যাপারে যতক্ষণ না হুকুম আসছে, ততক্ষণ তাঁদের ছাড়া যাবে না। ওঁদের জন্য রাস্তা ঐদিকেই আছে।' সেই পূর্বপরিচিত ব্রাহ্মণ যুবক, যে ভোজনে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, বেরিয়ে এসে বলল ঃ 'মহারাজ নেমে আসছেন। উনি পরমহংসদেবকে যথেষ্ট সম্মান করেন। কিন্তু পূর্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন—এই সেই স্বামীজী, যিনি আমাদের অপমান করেছেন, তাঁর জন্য মন্দিরদর্শনের উচিত ব্যবস্থা রাজা করবেন।'

"একজন সাধারণ কর্মচারীর এমন স্পর্ধা দেখে দেওয়ানজীর তো চক্ষুস্থির! তিনি বললেন ঃ 'ইনি যে এসেছেন এই আমাদের বহু ভাগ্য। তুমি কি করে বুঝবে ইনিই বা কে আর বিবেকানন্দই বা কে?' সংবাদদাতা বলল ঃ 'মহারাজ যা বলেছেন, তাই বললাম। আপনি যেমন বলবেন, তাই মহারাজকে গিয়ে বলব। পুনরায় উত্তর নিয়ে আসব। একটু দাঁড়িয়ে যাবেন আপনারা, কারণ উনিও তো দাঁড়িয়ে আছেন।' এই বলে সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ 'মহারাজের আদেশ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার তো জানা আছে যে, কোন নতুন ব্যক্তির এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। আপনি এতদূর চলে এসেছেন একজন অচেনা লোককে নিয়ে, অথচ রাজার সিপাহিরা আপনাকে কিছু বলেনি—এটাই তো আশ্চর্য!'

"এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? শিব যেমন গরল হজম করেছিলেন, সেইরকম এই অপমান সহ্য করেই প্রেমানন্দজী বললেন ঃ 'আমার তো জানা ছিল না যে, দেবদর্শনের জন্য আবার হুকুম লাগে।' সেই ব্রাহ্মণ বলল ঃ 'দেবতা রাজারই, কোন প্রজার নন।' প্রেমানন্দজী রেগে গেলেন, কিন্তু পুরো কথা শোনার জন্য ধৈর্যধারণ করলেন। ব্রাহ্মণ বলেই চললেন ঃ 'প্রধান অমাত্যজী! যাঁর দর্শনের জন্য আপনারা বের হয়েছেন, আমাদের এখানে রাজা তো তিনিই। তাহলে এখন বলুন, অপমান কার করেছিলেন?' ম্যানেজার প্রেমানন্দজীকে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝালেন ঃ 'এই রাজ্যের রাজা শ্রীকৃষ্ণ। এখানে শীলমোহরের ছাপ কৃষ্ণজীর নামেই। কথিত আছে, এরা সব তাঁরই উত্তরাধিকারী।' প্রেমানন্দজী মনে মনে হাসলেন।

"সহজভাবেই বললেন ঃ 'ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে তো এদের এত অহঙ্কার। তা উনিও (শ্রীকৃষ্ণ) কি ব্রাহ্মণ ছিলেন?' যুবকটি তখন একটু দমে গিয়ে বললেন ঃ 'মহারাজ এও বলেছেন, এই সব নগ্ন প্রশ্নের উত্তর নগ্নভাবেই দিতে হবে এবং আমার নাগা গুরুকে এজন্য এখানে জাহির করা হবে।' প্রেমানন্দজী বললেন ঃ 'পরমহংসদেব তো নাঙ্গা হয়ে যেতেন। গুরু সব এক। সাধু অপমান করে না, সহ্য করে সব।' প্রধান অমাত্য ভীষণ ধাক্কা খেলেন। ব্রাহ্মণ যুবক বলেই চলল ঃ 'আপনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকর্মচারী। সেজন্যই অল্প শাস্তির বিধান আপনার জন্য করা হয়ে আছে। হয় আপনি, না হয় প্রেমানন্দজী—একজন মাত্র সজ্জন ব্যক্তি এই পথ দিয়ে যেতে পারবেন। অন্যরা ঘুরে যাবেন। আর এই পশ্চিমদেশীয় যুবকটির মন্দিরে প্রবেশ তো চিরকালের জন্যই নিষিদ্ধ।'

"কম্পিত কলেবরে প্রেমানন্দজী বললেন ঃ 'এইজন্য আমি আসিনি। আমরা যেন কখনো মন্দিরদর্শন করিনি।! আমি সাধু।' তাঁর শরীর থেকে তেজোপুঞ্জ নির্গত হয়ে যেন সবাইকে গ্রাস করতে এল! হঠাৎ ব্রাহ্মণ যুবক স্তম্ভিত হয়ে দেখল, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দজীর ভিতর এসে গেছেন। সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখ রগড়ে সে আবার দেখল, প্রেমানন্দজীর দেহে কৃষ্ণজীরই জ্যোতির্ময় ঘনীভূত নীলকান্তি প্রকাশমান। আনন্দের পরমাণুগুলো যেন ফোয়ারার মতো বেগে বেরিয়ে পড়ছে! যাঁরা সেখানে ছিলেন, সবাই আনন্দে ডগমগ। ব্রাহ্মণটি দেখল, সেই জ্যোতির একটি রেখা দিয়ে পশ্চিমীয় যুবক প্রেমানন্দজীর সঙ্গে বাঁধা আছে।

"পাগলের মতো সে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল ঃ 'বা! বা! আজ পর্যন্ত এমনটি আর কখনো দেখিনি।' বলছে আর ছুটছে। শেষে রাজার কাছে পৌঁছাল। মহারাজ শোনামাত্রই অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি তখন ঐ রাস্তা দিয়েই স্বামীজীকে কৃষ্ণমন্দিরে সমাদর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ যুবককে পাঠিয়ে দিলেন। প্রেমানন্দজী বললেন ঃ 'আমি সাধারণের মতো ঘুরেই যাব। এতেই আমি খুশি।' তিনি ঘুরেই গেলেন।...

"দুদিকে নহবতখানা, শ্বেতপাথরের চত্বর; দুদিকে দিব্য মন্দির। সামনে বিশালকায় মন্দিরে কৃষ্ণজীর সোনার অলঙ্কারে ভূষিত মূর্তি। দেখলে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। পশ্চিমীয় যুবক এসময় বাইরে অপেক্ষা করে ছিলেন। প্রেমানন্দজী চলতে চলতে বললেন ঃ 'বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো আমি।'... স্বামীজী ফিরে যাচ্ছেন, প্রেমের প্রেরণায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবক ভক্তটিও তাঁকে অনুসরণ করছে। কিন্তু তাঁর মন থেকে বাসনা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—*চিরকালের জন্য* সে আর ফিরবে না।" ■

প্রসঙ্গ ঃ ভারতীয় তরবারি

দিলীপকুমার রায়*

তরোয়াল, তলোয়ার বা তরবারি—যে-নামেই ডাকা হোক, বহু প্রাচীনকাল থেকে এটি ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধনুর্বেদে ভারতীয় তরবারি অমুক্ত শ্রেণিভুক্ত অস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত। এর প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত বা রহস্যাবৃত। মহাকাব্যের যুগে মহাভারতে আমরা প্রথম তরবারির পৌরাণিক উৎপত্তির সন্ধান পাই। মহাভারতে বর্ণিত আছে, দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের সময় তরবারির দেবতা 'অসিদেবতা' ব্রহ্মার অলৌকিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে চারদিক আলোকিত করে হিমালয় পর্বতের শিখরে আবির্ভূত হন।[১] অসুরনিধনের জন্য ও বিশ্বে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক পৃথিবীতে প্রথম তরবারির আবির্ভাব ঘটে। এই পৌরাণিক কাহিনীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

অ্যানটেনা-সোর্ড

উৎপত্তি যেভাবেই হোক, আজও তরবারি ভারতীয় অস্ত্রাগারে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে তরবারি আজ্ঞাপালনের নির্দেশক, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও শক্তির সুস্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতীক হিসাবে বিবেচিত। একজন বীর যোদ্ধার কাছে তরবারি তাঁর সকল কাজ ও সুখ-দুঃখের সমভাগী ও সর্বোত্তম বিশ্বস্ত সাথি।

তরবারির ক্রমবিকাশ ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগেই শুরু হয়েছিল। উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের (Upper Palaeolithic Age) 'ফ্লিন্ট-ড্যাগার' (Flint-dagger), 'বৃহৎ ছুরি' (Knife), 'সেল্ট' (Celt) প্রভৃতি এবং নব্যপ্রস্তর যুগের 'স্পিয়ারহেড' (Spearhead)-কে বর্তমান যুগের তরবারির পূর্বসূরি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন অস্ত্রের মধ্যে বৃহৎ ছুরিকা ও তরবারির পার্থক্য খুবই সামান্য এবং তা নির্ণয় করা দুরূহ কার্য। গুণগত ও গঠনগত সৌসাদৃশ্য থাকার জন্য ম্যাকে (Mackay) হরপ্পা-সভ্যতা যুগের খননকার্য থেকে প্রাপ্ত 'স্পিয়ারহেড'-গুলিকে তরবারির শ্রেণিভুক্ত করেছেন কেবল এদের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ও লম্বা যে-অংশটি হাতলের সঙ্গে ফলককে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখে (tang), তার জন্য।[২] ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকে প্রথম তরবারি আবিষ্কার করলেও ম্যারসাল (Marshall) কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে, হরপ্পা-সভ্যতার যুগে তরবারির কোন অস্তিত্ব ছিল না।[৩] খুব সম্ভবত সাধারণ সৌসাদৃশ্য ও তীক্ষ্ণধার দুইপার্শ্ব এই অস্ত্রটিকে তরবারি শ্রেণিভুক্ত করলেও এর মাপ অনুপাতে ওজন খুবই বেশি।
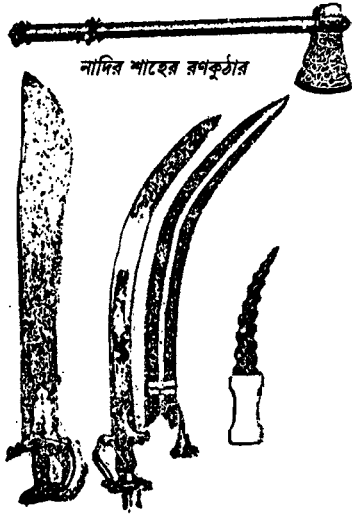
নাদির শাহের রণকুঠার

আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতানের তরবারি

তাম্রযুগে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সহ তরবারির আবির্ভাব ঘটে। এই অঞ্চলে খননের ফলে আবিষ্কৃত অস্ত্র-সম্ভারের (Copper Hoard Weapons) মধ্যে তরবারি আকৃতির যে বিশেষ অস্ত্রসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলি 'অ্যানটেনা-সোর্ড' (Antennae-sword) নামে পরিচিত। এগুলি স্পষ্ট মধ্যশিরা-যুক্ত ক্রমশ সরু, লম্বা ও হালকা তরবারি। এর হাতল কীটপতঙ্গের মাথায় অবস্থিত জোড়া-শুঙ্গের ন্যায় দ্বিধাবিভক্ত বলে 'অ্যানটেনা-সোর্ড' নামে পরিচিত। হায়দ্রাবাদ ও গঙ্গা-যমুনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত কিছু সংখ্যক 'অ্যানটেনা-সোর্ড'-এর নমুনা নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম, হায়দ্রাবাদের স্টেট মিউজিয়াম ও এলাহাবাদ মিউজিয়াম-এ সংরক্ষিত আছে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) সর্বপ্রথম বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে আবিষ্কৃত এই তরবারিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করেন। পরবর্তী কালে হিরানন্দ শাস্ত্রী, এ. ক্যাম্পবেল এবং এস. সি. রয় এধরনের আরো কিছু তরবারি হরদই, বিথুর, বুলন্দশহর ও হায়দ্রাবাদ শহরের কাছ থেকে আবিষ্কার করেন। তরবারিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এদের হাতল

---

*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মিউজিওলজি'তে ডক্টরেট প্রাপ্ত এবং ঐ বিভাগের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক; প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যার গবেষক এবং একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের লেখক।

ও ফলক একই ছাঁচে ঢালাই করা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এইসব অস্ত্রের সঠিক সময় নিরূপণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। পিগট (Piggot) কিন্তু এই অস্ত্রগুলিকে হরপ্পা থেকে আগত শরণার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে করেন।[৪] লাল (Lal)-এর মতে, এই অস্ত্রগুলি এমন একটি সভ্যতা বা সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত যা গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চলে প্রবলভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সম্ভবত কৈমুর ও বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণদিকে বিস্তারলাভ করে।[৫]

কপার হোর্ড-এর সঙ্গে প্রাপ্ত অ্যানটেনা-সোর্ড ও অন্যান্য অস্ত্রগুলি এতই উন্নত মানের যে, হরপ্পা-সভ্যতার স্থলে প্রাপ্ত অন্য সব যুদ্ধাস্ত্র ও প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা চলে না বরং পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এগুলিকে হরপ্পা-পরবর্তী যুগের অস্ত্র হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর সমরবিদ্যায় অগ্রগতি ও অস্ত্রনির্মাণে নিপুণতা প্রমাণ করে।

বৈদিক যুগে আর্যজাতির মধ্যে সম্ভবত তরবারির কোন প্রচলন ছিল না। মহাভারতের শান্তিপর্বে নির্দিষ্টভাবে তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চতুর্থ পাণ্ডব নকুল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা ছিলেন।[৬] মেজর সেনশর্মা মনে করেন, মহাকাব্যের যুগে সাধারণ পদাতিক সৈন্যরা তরবারি, ভল্ল, ধনুক ও বিভিন্ন প্রকার ক্ষেপণাস্ত্রের প্রবল অনুরাগী ছিল।[৭] এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কয়েকটি তরবারি, যথা—মধুমক্ষিকা চিহ্নিত দীর্ঘ তরবারি, ব্যাঘ্রচর্মের খাপে রক্ষিত সুবর্ণফলক-বিশিষ্ট বৃহৎ অথচ হালকা তরবারি, সোনার হাতলযুক্ত গোচর্মের আধারে রক্ষিত তরবারি, নিশাদগণ দ্বারা নির্মিত ছাগচর্ম আবৃত স্বর্ণময় তরবারি ও স্বর্ণ-বিন্দু সমৃদ্ধ ইস্পাত-নির্মিত তরবারি। এই তরবারিগুলি ছিল খুবই উচ্চ মানের ও ফলকগাত্র সম্পূর্ণ গ্রন্থিবিহীন।[৮]

পৌরাণিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—নিস্ত্রিংস, ভীষমনা, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরসদা, শ্রীগর্ভ, বিজয়া, ধর্মমূল ইত্যাদি। সম্ভবত তরবারিগুলির চরিত্রানুগ বিশেষ গুণের জন্য এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণির তরবারির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ইঞ্চি। এর কম বা বেশি দৈর্ঘ্যের তরবারি নিকৃষ্ট শ্রেণির। উৎকৃষ্ট শ্রেণির তরবারির গাত্রে কোন গাঁট থাকে না; ফলক হয় তীক্ষ্ণধার ও পদ্মফুলের পাপড়ির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং তরবারি চালনার সময় ঝঙ্কার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে। তরবারি সাধারণত যোদ্ধার কোমরবন্ধের বামদিকে চর্ম বা মখমল দ্বারা আবৃত কাঠের খাপে হুক বা রিং-এর সাহায্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ধাতু বা হস্তিদন্ত-নির্মিত খাপের প্রচলন থাকলেও সচরাচর ব্যবহৃত হতো না। খাপটি যাতে কোমরবন্ধ থেকে স্খলিত বা পিছলে না যায়, সেজন্য স্প্রিং লক-এর ব্যবস্থা থাকত। একজন দক্ষ অসিযোদ্ধা বত্রিশ রকম পদ্ধতিতে তরবারি চালনা করতে সক্ষম।[৯]

অষ্টাদশ শতকের জুলফিকার তরবারি

তরবারির দুইটি অংশ—হাতল ও ফলক। হাতলটি আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যথা—নারচ (Point), পরজ (Knuckleguard), চৌক (base), থলি (quillon), পুতানা (grip), কটি (necklace), কাটোরিল (pommel), বাতাসা (Sugar-cake), কংগ (Cordon) ও মোগরা (Mallet)। অনুরূপভাবে ফলকের বিভিন্ন অংশের নাম যথাক্রমে টংক (point), পিপালা (curvature), পেটা (edge), মাং (ribs), নভাহ (furrows on the blade), তেচ্ছা বা খাজানা (blade) ও দুমালা (tang)।[১০]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নিস্ত্রিংস, মণ্ডলাগ্র ও অসিযষ্টি নামক মৌর্য যুগের কয়েকটি তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিস্ত্রিংস বাঁকা হাতল-যুক্ত, মণ্ডলাগ্র সোজা ফলকবিশিষ্ট কিন্তু মাথার ওপর একটি গোলাকার পাতলা চাকতি-যুক্ত এবং অসিযষ্টি তীক্ষ্ণধারযুক্ত লম্বা সোজা মোটা লাঠির ন্যায় তরবারি বিশেষ। তরবারির হাতল সাধারণত বাঁশের মোটা শিকড়, মহিষ বা গণ্ডারের শিং, কাঠ, হাতির দাঁত ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হতো।[১১]

ভারতবর্ষে রাজপুত, মারাঠা, শিখ, বাঙালি ও মুঘল যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ তরবারির প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান ও নির্ভরশীল ছিলেন। প্রতিটি যোদ্ধার তরবারির আকৃতি, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন পটচিত্র, মুদ্রিত চিত্র, ভাস্কর্য, মুদ্রা ইত্যাদিতে ভারতীয় তরবারির প্রতিরূপ বিদ্যমান। প্রায় প্রতি যুগের অসংখ্য তরবারি ভারত ও বিদেশের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

রাজপুত যোদ্ধাদের তরবারি সাধারণত প্রশস্ত, মজবুত, প্রতিরোধক্ষম ও ফলকের উত্তল কিনারা তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট। বলিদানের জন্য ব্যবহৃত রাজপুত তরবারি অত্যন্ত ভারি, প্রশস্ত, ভোঁতা বা দ্বিধাবিভক্ত সূচিমুখ-বিশিষ্ট। মহারাণা মান সিং-এর বিখ্যাত 'খণ্ড' তরবারি জয়পুরস্থ Maharaja Swai Man Singh II সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজপুত তরবারির সঙ্গে মহারাজা হামির সিং-এর তরবারিটি সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

মারাঠা সৈনিকরা ছিল দক্ষ অসিযোদ্ধা। তারা বন্দুক বা মাস্কেট অপেক্ষা তরবারির ওপর বেশি নির্ভরশীল ও যথেষ্ট
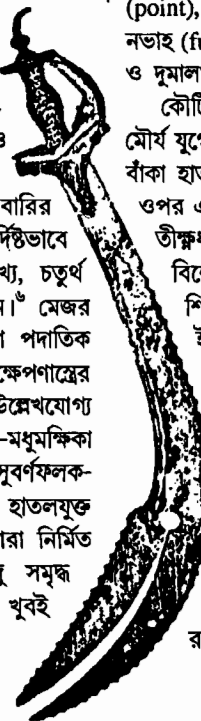
আস্থাভাজন ছিল। সোজা বা বক্র সকল প্রকার মারাঠা তরবারি দৃঢ়তা ও নমনীয়তার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পান (temper)-সম্পন্ন। নানা রাও পেশোয়া-র তরবারিটি নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই তরবারিটি সামান্য বক্র। এর ফলকের উপরিভাগ একদিকে ধারালো, কিন্তু নিচের অংশের উভয় দিকই ধারালো। মারাঠা যোদ্ধাদের বিখ্যাত 'পাট্টা' তরবারি খুবই লম্বা এবং দুই পার্শ্বই তীক্ষ্ণধারযুক্ত। তাদের 'খণ্ড' তরবারি রাজপুতদের খণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত এবং ফলকের নিচের দিক সামান্য বক্র। হাতের আঙুলগুলি রক্ষা করার জন্য মারাঠা-তরবারির হাতলের অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
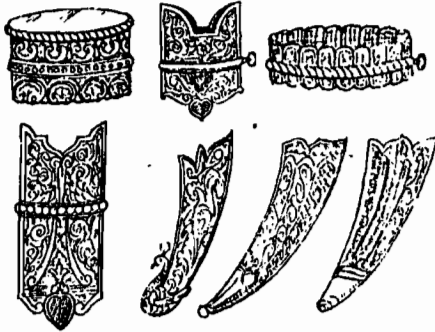
তরবারির বিভিন্ন অংশের অঙ্গসজ্জা

বাঙালি যোদ্ধাদের কাছে তরবারি সম্ভবত ব্যক্তিগত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ঈশ্বর ঘোষের লিপিতে 'খড়্গগ্রহ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। খড়্গ ও অসি বাঙালির খুব সাধারণ দুটি ভিন্ন প্রকারের তরবারি। খড়্গ খুবই প্রতিরোধক্ষম তীক্ষ্ণধারযুক্ত তরবারি। এর অগ্রভাগ চক্রাকার, কমলাকৃতি বা সুচিমুখ-বিশিষ্ট। অসি সম্ভবত ভারি, সোজা, সুচিমুখ এবং ফলকের দুই পার্শ্ব চওড়া ধারালো তরবারি বিশেষ।[১২]

শিখ যোদ্ধাদের নিকট তরবারির ধর্মীয় শুচিতা লক্ষণীয়। তাদের খণ্ড তরবারি খুব চওড়া এবং হাতলে অঙ্গুলি-রক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন স্মৃতি বা ঘটনার সঙ্গে মানসিক সংযোগ থাকার জন্য খণ্ড তরবারি এক বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেছে। শিখদের ব্যবহৃত সাধারণ তরবারিকে বলা হয় 'তলওয়ার'। এর ফলক সোজা কিংবা সামান্য বাঁকা হতে পারে। সোজা তরবারির দুই পার্শ্ব ধারালো, কিন্তু বাঁকা তরবারির হয় ফলকের একদিক ধারালো অথবা ফলকের উপরিভাগ একদিকে ধারালো এবং নিম্নভাগের দুই দিকই শাণিত। 'কিরিচ' হচ্ছে খুব লম্বা, সোজা ও পাতলা তরবারি। 'খং' খুবই ছোট তরবারি। এটা সাধারণত খাপ ছাড়াই কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। 'পাট্টা' তরবারি রাজপুত ও মারাঠা যোদ্ধাদের ন্যায় শিখ যোদ্ধাদের কাছেও সমানভাবে আদৃত।

মুঘল যোদ্ধাদের মধ্যে বহুপ্রকারের তরবারি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তরবারি-বেল্টের প্রতি মোঘল যোদ্ধাদের যথেষ্ট বাবুয়ানি লক্ষণীয়। বেল্টগুলি খুব বেশি চওড়া এবং সুন্দরভাবে বিভিন্ন সাজসজ্জায় অলঙ্কৃত হয়ে কাঁধে শোভা পেত। কখনো কখনো কোমরবন্ধের সঙ্গে তরবারি ঝুলতে দেখা যেত। 'সামশের', 'ধুপ', 'অরপৃষ্ঠ', 'অরদম', 'জুলফকার', 'মোতি-দৌদাতি', 'সাকেলা', 'কুকাড়িদার', 'তেঘা', 'গদ্দারা', 'গুপ্তি', 'পাট্টা', 'সিরোহি' ইত্যাদি মোঘল যুগের কয়েকটি বিশেষ ধরনের তরবারি।

'সামশের' হচ্ছে দৃঢ়মুষ্টি ধারণের জন্য ছোট হাতলযুক্ত তরবারি, যার ফলকের উত্তল দিক ধারালো। 'নিমচা-সামশের' সামশেরের একটি ছোট সংস্করণ, যা ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে হামিদ খানকে আক্রমণের জন্য ইব্রাহিম কিউলি খান ব্যবহার করেছিলেন। 'ধুপ' হচ্ছে ক্রশ-আকৃতিবিশিষ্ট হাতলযুক্ত প্রায় চার ফুট লম্বা সোজা চওড়া দুদিক ধারালো তরবারি। ধুপ তরবারি কর্তৃত্ব ও উচ্চপদমর্যাদার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হতো। এই ধরনের তরবারি সাধারণত উন্নতচরিত্র, উচ্চবংশজাত, সর্বতোভাবে সফল বীর যোদ্ধাদের সম্মানচিহ্ন হিসাবে প্রদান করা হতো। একে 'আশা-সামশের' বা পদাধিকারের প্রতীক তরবারিও বলা হতো। 'অরপৃষ্ঠ' হচ্ছে সেইসব তরবারি, যার ফলকের একদিক ধারালো কিন্তু অপরদিক করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। অরপৃষ্ঠের ফলকটির যদি দুইদিক খাঁজকাটা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'অরদম'। আবার এই তরবারির ফলকটি যদি দ্বিধাবিভক্ত ও করাতের ন্যায় খাঁজকাটা হয়, তাহলে তাকে 'জুলফকার' নামে চিহ্নিত করা হয়। যে-তরবারির ফলকে একাধিক গর্ত থাকে এবং সেই গর্তে আবর্তনশীল লোহার বল সংযুক্ত থাকে, তাকে বলা হয় 'মোতি-দৌদাতি'। ইস্পাতের সঙ্গে ব্রোঞ্জ বা তামা মিশ্রণের দ্বারা যে-তরবারি নির্মিত হয়, তাকে বলা হয় 'সাকেলা'। এর ফলক এতই স্থিতিস্থাপক যে, একে ধনুকের ন্যায় বাঁকাতে পারা যায়। যদি তরবারির হাতল কাস্তের ন্যায় বাঁকা হয়, তাহলে তাকে বলা হয় 'কুকাড়িদার'। 'তেঘা' সামশেরের ন্যায় দেখতে, কিন্তু ফলকটি খুব চওড়া এবং হাতলটি অপেক্ষাকৃত লম্বা। 'গদ্দারা' তেঘার ন্যায়, কিন্তু সুচিমুখ অগ্রভাগ বাঁকা। 'গুপ্তি' এক বা দুই দিক ধারালো সরু লম্বা ফলক-বিশিষ্ট তরবারি। গুপ্তির খাপ একটি ভ্রমণ-যষ্ঠির ন্যায়। 'পাট্টা' এক বা দুই দিক শাণিত লম্বা সোজা তরবারি। বর্তমানে মহরমের শোভাযাত্রায় মুসলমানদের হাতে এই তরবারি খুব দ্রুত আবর্তিত হতে দেখা যায়। 'সিরোহি' ঈষৎ বাঁকা ফলকযুক্ত তরবারি। এর ফলক 'তলওয়ার' অপেক্ষা সরু, লম্বা ও হাল্কা। সম্ভবত রাজস্থানের সিরোহি নামক স্থানে এই তরবারি প্রস্তুত হতো বলে এমন নামকরণ হয়েছে। সিরোহি স্থানটি উচ্চ মানের তরবারির ফলক প্রস্তুতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষে তরবারি প্রস্তুত হতো সাধারণত জাঙ্গল (Jungala) প্রদেশের পন্ড্রারা লৌহ, শতহরণ (Sataharana) প্রদেশের শুভ্রবর্ণ লৌহ, অনুপ (Anupa) প্রদেশের কৃষ্ণবর্ণ লৌহ, গুজরাট প্রদেশের নীলবর্ণ লৌহ, মহারাষ্ট্র প্রদেশের ধূসরবর্ণ লৌহ, কলিঙ্গ প্রদেশের সুবর্ণবর্ণ লৌহ এবং কম্বোজ প্রদেশের তৈলাক্ত লৌহ দ্বারা।[১৩] তরবারি ও অন্যান্য লৌহ-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি ছিল যথাক্রমে খট বা খট্টার (Khat or Khattara), ঋশিক (Risika), সুরপরক (Surparaka), অঙ্গ (Anga), ভঙ্গ (Vanga) ও কৈশিক (Kaisika)। খট-এর নির্মিত তরবারি ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ, ঋশিক-এর উৎপাদিত তরবারি কর্তন ও ছেদন-ক্ষমতার জন্য সুবিদিত, সুরপরক-এ নির্মিত তরবারি দৃঢ়তা ও দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সুপরিচিত, অঙ্গ-এর তরবারি তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, ভঙ্গ-এর তরবারি খরশান ও তীব্র আঘাত সহ্য করতে সক্ষম এবং কৈশিক-এর তরবারি সংবেদনশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ।[১৪]

সে-যুগে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র নির্মাণের পদ্ধতি খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রথমে প্রয়োজনমতো নমনীয় লৌহপিণ্ড বিভিন্ন আকৃতির গলনপাত্রে (crucible) চব্বিশ ঘণ্টা গরম করা হতো। পরে গলনপাত্র ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলে গলা লৌহপিণ্ড উপযুক্ত সমহারের ফলে স্ফটিকের ন্যায় সুষম আকৃতিবিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত মাপের দৃঢ়তাসম্পন্ন পিঠার ন্যায় একটি বস্তুতে রূপান্তরিত হতো। এই পিঠার ন্যায় বস্তুটিকে পুনরায় গরম করে রক্তবর্ণ ও নমনীয় করা হতো। রক্তবর্ণ বস্তুটিকে কামারশালায় পিটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত আকৃতি ও মাপে পরিণত করা হতো। আকাঙ্ক্ষিত আকৃতিবিশিষ্ট এই পিটান (after forging) বস্তুটি পুনরায় একটি টিনের পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করে চুল্লির মধ্যে রাখা হতো। এসময়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে চুল্লির মধ্যে বস্তুটি সমানভাবে উষ্ণতালাভ করে। পরবর্তী সময়ে বস্তুটির দৃঢ়তা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য তার উপরিভাগে শুষ্ক হাড়ের গুঁড়া সমানভাবে ছিটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। অবশেষে বস্তুটি উপযুক্ত শাণ ও পালিশ করা হতো। সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বলা হতো 'সাইকালা' (Saikala)। পরেও কর্মকারের ইচ্ছা বা চাহিদামতো বিভিন্ন দানাদার বুনোটের রূপ দেওয়ার জন্য ফটকিরি বা পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ বা গুঁড়া ব্যবহার করা হতো। এই কাজটিকে শিল্পীর ভাষায় বলা হয় 'জোউহর' (Jauhar)।[১৫]
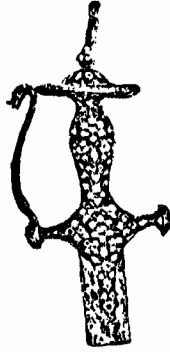
রত্নখচিত তরবারি

ভারতে প্রাক্ ও প্রারম্ভিক ইতিহাসের যুগে তরবারির যথেষ্ট ব্যাবহারিক উপযোগিতা থাকলেও কোন নান্দনিক প্রভাব ছিল না। মধ্যযুগে কার্যকরী ভূমিকা ছাড়াও তরবারি ছিল সাহস, মহত্ত্ব, উদারতা, বীর্যবত্তা, নারীজাতির প্রতি বীরোচিত আনুগত্য, সৌজন্য, মর্যাদাবোধ ইত্যাদির প্রতীক। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে দ্বিধা নেই যে, ভারতীয় যোদ্ধাদের কাছে তরবারি তাদের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের ন্যায় চিরবিশ্বস্ত সহায়ক। আজও কোন কোন যোদ্ধাজাতির মধ্যে দেখা যায়, বিবাহের সময় পাত্র নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত তরবারি বহন করে। সম্ভবত এই সৌন্দর্য-সচেতনতার প্রভাবে আজও তরবারিকে অলঙ্কৃত করার প্রবণতা দেখা যায়। তরবারিকে অলঙ্কৃত করার জন্য সাধারণত পিতল, রৌপ্য, স্বর্ণ, মূল্যবান প্রস্তর, মাছের কাঁটা, কচ্ছপের খোল, কাষ্ঠ, চর্ম, কাঁচ ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। অলঙ্কৃত করার জন্য তরবারির ফলক নির্মাণের সময় প্রথমে কামারশালায় কাজ করে পরে মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর বসানো হতো।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা সৌন্দর্যময় চারুশিল্পের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র, পটচিত্র, বিভিন্ন ঘরানার চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, মন্দিরগাত্র, মুদ্রা ইত্যাদিতে তরবারির প্রতিকৃতি ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

সাঁচির ভাস্কর্য ভারতের প্রাচীনতম ভাস্কর্য-রূপে বিবেচিত। স্মিথ ও দীক্ষিতার মতে, ভারুত-এর ভাস্কর্যগুলি সাঁচি অপেক্ষা প্রাচীন।[১৬] সাঁচির ভাস্কর্যগুলির মধ্যে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক দুর্গ ও নগর অবরোধের দৃশ্য নজরে পড়ে। এইরূপ একটি দৃশ্যে আঁটোসাঁটো পোশাক-পরিহিত সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের বামদিকে চওড়া ফলকযুক্ত তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপের একটি স্তম্ভে সুন্দরভাবে খোদাই-করা তরবারি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার ভুবনেশ্বরের মন্দিরে পাথরে উৎকীর্ণ নতোন্নত (relief) ভাস্কর্যের ঝালরের কাজে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পদাতিক

সৈন্যরা সোজা তরবারি ও লম্বা ধনুক-সহ বীর যোদ্ধাদের পশ্চাতে সুশৃঙ্খলভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। কুচকাওয়াজরত পদাতিক সৈন্যদের পিছনে রসদ-সরবরাহ বিভাগের লোকজনের সঙ্গে আরো কিছু সৈন্য লম্বা সোজা তরবারি ও আয়তাকার ঢাল বহন করছে।[১৭] ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরি পর্বতে খ্রিস্টপূর্ব দুশো বছরের প্রাচীন 'রানিগুম্ফা'র ভিতর একাধিক স্থাণুদৃশ্যের (tableaux) মাধ্যমে রাজকুমার ও রাজকুমারীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ সুন্দরভাবে চিত্রিত আছে। এখানে দেখা যায়, রাজকুমারের হস্তে মুক্ত তরবারি; কিন্তু রাজকুমারীর হস্তে শুধু ঢাল বিদ্যমান, কোন তরবারি নেই। এই দৃশ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, রাজকুমারীর তরবারিটি যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে 'গণেশ গিরিগুহা'তে পরস্পর সদৃশ একই ধরনের স্থাণুদৃশ্যের বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেখানে সামান্য পরিবর্তন নজরে পড়ে। এই দৃশ্যে

রাজকুমারকে প্রতিহত করতে ঢাল-তরবারি হস্তে এক নারীযোদ্ধা উপস্থিত। প্রাচীন ভারতে নারীযোদ্ধার প্রতিনিধিত্ব খুবই বিরল ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮] আবার দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ওড়িশার 'কোণার্ক' মন্দিরের দক্ষিণদিকের সদরে বক্র তরবারি হস্তে দুটি পদাতিক সৈন্যকে অশ্ব-পদদলিত দেখা যায়।

পুরাণে বিভিন্ন দেবদেবীর হস্তে বিবিধ অস্ত্রের মধ্যে খড়্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খড়্গ বলতে সাধারণ তরবারিকে বুঝায়, কিন্তু বিভিন্ন দেবদেবীর হস্তের তরবারিগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত।[১৯] কোয়েম্বাটুরে পেরুর মন্দিরে এক মস্তক, তিন চক্ষু, বত্রিশ হস্ত-বিশিষ্ট জটাজুটধারী বীরভদ্র-মহাদেবের দক্ষিণদিকের ষোলটি হস্তের একটিতে তরবারি নজরে পড়ে।

অজন্তা গুহাচিত্রে প্রদর্শিত অস্ত্রগুলি খুবই প্রাচীন, সরল, অযৌগ ও বৈচিত্র্যহীন। পন্ত-এর মতে, যে দুই ডজন বিভিন্ন অস্ত্র চিত্রিত আছে, তার মধ্যে তরবারি কমপক্ষে পঞ্চাশবার আঁকা হয়েছে।[২০] নতুন দিল্লির জাতীয় সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত জয়পুর ঘরানার একটি চিত্রে তরবারি, ঢাল ও ছোরা-সহ এক রাজপুত সৈনিককে সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।[২১]

ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তার জন্য প্রতিটি দেশে বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন আছে। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত মুদ্রা নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রের অমূল্য নিদর্শন বহন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত বিভিন্ন মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করলে বহু সমরাস্ত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত দেখা যায়। হেলিওক্লের (Heliokle, C.150-140 BC.) একটি রৌপ্য মুদ্রায় জেউসকে (Zeus) বাম হস্তে লম্বা তরবারি-সহ মুদ্রিত দেখা যায়।[২২] কুশান যুগের বহু মুদ্রাতে তরবারি মুদ্রিত দেখা যায়। একটি স্বর্ণমুদ্রাতে কণিষ্ককে দক্ষিণ কটিদেশ থেকে ঝুলন্ত তরবারি ও বাম হস্তে বল্লম-সহ মুদ্রিত নজরে পড়ে। কুশান যুগের রাজা হুবিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রায় এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি মুদ্রিত দেখা যায়, যার দক্ষিণ হস্তে চওড়া তরবারি। গুপ্তযুগের 'ছত্র টাইপ' (Chatra type), 'হর্সমেন টাইপ' (Horsemen type), 'চক্রবিক্রম টাইপ' (Cakravikram type) ও 'রাইনোসেরস স্লেয়ার টাইপ' (Rhinoceros-slayer type) প্রভৃতি মুদ্রাসমূহে বিভিন্ন আকৃতির বহু প্রকারের তরবারির প্রতিকৃতি মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যায়।[২৩]

প্রাচীন ইতিহাস ও সমরবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তরবারির বিবর্তন ও ক্রমোন্নতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সাধারণ মানুষ অনেকেই জানেন না যে, আজকের রাইফেলের (Rifle) সঙ্গিনকে বলা হয় 'তরবারি সঙ্গিন' (Sword-bayonet)। সম্মুখ-সমরে তরবারির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। শত্রুপক্ষের জমি দখল করতে আজও সঙ্গিন-যুদ্ধ অপরিহার্য। চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা বিভিন্ন চারুকলা স্রষ্টার কাছে প্রতিযুগে তরবারির হাতল, ফলক, খাপ, বক্রতা, খোদিত লিপি, নকশা, অলঙ্করণ ইত্যাদি অনুপ্রেরণার উৎস এবং বস্তুটির ঐতিহাসিক কাল নির্ধারণ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত বিভিন্ন তরবারি দর্শকদের চোখের সামনে মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ বীর যোদ্ধাদের বীরত্বকাহিনী উন্মোচিত করে। বর্তমান যুগেও তরবারি প্রতিটি ভারতীয় শিখ ও রাজপুতের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। ■

তথ্যসূচি

১ Mahabharata—(tr.)-Kaliprasanna Singha, Santiparva, 1976, ch. 1bb, p. 161
২ Further Excavation of Mohenjodaro—E. J. H. Mackay, Vol-I, 1938, p. 459
৩ Mohenjodaro and Indus Valley Culture—J. Marshall, Vol-1, 1971, p. 35
৪ Pre-historic India—S. Piggot, 1950, p. 238
৫ Further Copper Hoard from the Gangetic Basin and a review of the problem, Ancient India—B. B. Lal, No. 7, 1951 ; p. 37.
৬ Mahabharata, p. 161.
৭ The Military History of Bengal—Major P. Sensarma, 1977, p. 11.
৮ Mahabharata, Vanaparva, ch. 42.
৯ Weapons, Army Organisation and Political Maxims ... firearms—Oppert Gustav, 1967, p. 25.
১০ Studies in Indian weapons and warfare—G. N. Pant, 1970, p. 152.
১১ Kautilya Arthasastra—(tr.) Dr. Radhagobinda Basak, Vol-1, 1970, p. 155.
১২ The Military History of Bengal, pp. 29-30.
১৩ War in Ancient India—V. R. R. Dikshitar, 1948, p. 118.
১৪ Studies in Indian Weapons and Warfare, p. 83; The Military History of Bengal, p. 12; The Art of War in Ancient India—P. C. Chakrabarti, 1972, pp. 163-164.
১৫ Andhra Pradesh State Museum Serioes No. 13—M. L. Nigam, Hyderabad, 1975, pp. 13-14.
১৬ A history of fire art in India and Ceylon—V. A. Smith, 1911, p. 30.
১৭ War in Ancient India, pp. 133-134; Orissa— Hunter, Vol-I, p. 235.
১৮ Indian Sculpture and Paintings—E. B. Havell, 1928, p. 247, pl. XLIII; Viswakarma—A. K. Coomarswami, 1914, pl. LXXVI, LXXVII, LXXIX.
১৯ Development of Hindu Iconography—Jitendranath Banerjee, 1956, pp. 229-302.
২০ Studies in Indian Weapons and Warfare, p. 111.
২১ Ibid. pl. XVII.
২২ Catalogue of the coins in the Government Museum—C. J. Rodgers, Lahore, 1881, pp. 3, 20.
২৩ Studies in Indian Weapons and Warfare, pp. 101-102.

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বিরজানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

লোকনৃত্য রায়বেঁশে

শান্তনু মুখোপাধ্যায়*

শহরের কোলাহলমুক্ত হয়ে রাঙা কাঁকুড়ে মাটির বীরভূমে পা ফেলে চিত্তে শিশুর সারল্য জাগে। নিয়ত যেখানে যন্ত্রের ঘড়-ঘড় যন্ত্রণা, ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা নাগরিক জীবনের মানসিক চাপ, মাপা হাসি চাপা কান্নায় জীবন যখন ছটফট করে ওঠে—তখন দু-দণ্ড বৈচিত্র্য অন্বেষণে মোরাম-ঢালা পথ হয়ে মেঠো পথ ধরে গ্রামে এলে মনে হয়—এই তো বুঝি আসল জীবন, যেখানে সব জমানো হতাশা, অহঙ্কার নিমেষে উবে যায়। প্রত্যক্ষ দিগন্তে মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা, মিষ্টি বাতাস ও সবুজের মেলার মাঝখানে অকস্মাৎ বিউগল, কাঁসি ও ঢোলের বৃন্দবাদ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। "কোন ভয় নেই", সঙ্গী নুর ইসলাম বলে ঃ "যা শুনছেন তা হলো 'রায়বেঁশে'। ঐ যে দূরে সামরিক নৃত্যভঙ্গিমায় রায়বেঁশে শিবু, মাধব প্রামাণিকেরা।" বাংলার অতিপ্রাচীন লোকসম্পদ—লোকনৃত্য রায়বেঁশে।

■ রায়বেঁশের অর্থ ■

গুরুসদয় দত্ত 'বাংলার বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাকৃত শব্দ 'রাআ' থেকে উৎপত্তি 'রায়'।[১] 'রায়' কথাটার অর্থ 'শ্রেষ্ঠ'। 'রায়বাঁশ' শব্দের অর্থ— 'শ্রেষ্ঠবাঁশ'। এই 'রায়বাঁশ' দিয়ে বল্লমের হাতল তৈরি করা হতো। তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন, রায়বাঁশ দিয়ে তৈরি হাতল-সহ বল্লম যে-যোদ্ধা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত, তাকেই বলা হয় 'রায়বেঁশে'। সম্প্রতি বিজয়কুমার দাস সম্পাদিত ও সঙ্কলিত 'বীরভূম' গ্রন্থে গবেষক অধ্যাপক কিশোরীরঞ্জন দাস 'বীরভূমের লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "রাইজাতীয় একপ্রকার বাঁশের শক্ত লাঠি নিয়ে খেলার নাম রায়বেঁশে।" তাহলে রায়বেঁশে হলো তিনের সমাহার—(১) লোকনৃত্য, (২) যোদ্ধশ্রেণি এবং (৩) ক্রীড়া। এর কোন্‌টাকে রায়বেঁশে বলা হয় বা সবগুলোকে নিয়েই রায়বেঁশে কিনা, সে-আলোচনা পরে করা হবে। কিন্তু 'রাই' বা 'রায়'—ঠিক কোন্‌টি থেকে 'রায়বেঁশে' শব্দটি লোকনৃত্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে তা পরিষ্কার হবে যদি অভিধানগত অর্থ বোধগম্য হয়। অভিধানে 'রায়বাঁশ' সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'A spear (বর্শা) with a bamboo handle.' রায়বেঁশে—Spearman (বর্শাধারী)। তবে বীরভূম জেলায় নানুরের অনতিদূরে চারকলগ্রামের রায়বেঁশে শিল্পীরা অনধিক পাঁচ ফুট উচ্চতার সরু গিটওয়ালা বাঁশ (লাঠি)-কে 'রায়বাঁশ' বলে দাবি করেন। সকলের মতে, বর্তমানের রায়বেঁশে শিল্পীরা হলেন কয়েক শতক পূর্বেকার যোদ্ধশ্রেণির বংশধর।

■ রায়বেঁশের উৎপত্তি ■

বর্তমানের রায়বেঁশে শিল্পী বলতে অতীত গৌরবোজ্জ্বল অবিভক্ত বাংলার বীর যোদ্ধশ্রেণিকে বোঝায়। গুরুসদয় দত্ত ১৯৩০ সালে যখন দ্বিতীয়বারে বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন তখন আবিষ্কার করেন, হাজার বছর পূর্বেকার 'রায়বেঁশে' যোদ্ধ বাঙালি জাতির বংশধর এখনো এই বাংলায় বর্তমান। বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্যের বীরত্বগাথা সুবিদিত। গুরুসদয় দত্ত উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার শ্যামরূপার গড় থেকে মহামদপাত্র রায়বেঁশে যোদ্ধাদের সাহায্যে লাউসেনের ময়নাগড় আক্রমণ করেন।[২] গুরুসদয় দত্ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য অনুসরণে প্রমাণ করেছেন, সে-সময়ের (তিনশো বছর থেকে সহস্র বছর পূর্বেকার) রায়বেঁশে যোদ্ধার সাথে তাঁর সময়ের রায়বেঁশে যোদ্ধার অদ্ভুত মিল ছিল।[৩] ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার মোগল শাসনকর্তা মানসিংহের সৈন্যদলে রায়বেঁশে যোদ্ধারা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আরো প্রকাশ যে, রায়বেঁশে যোদ্ধা-সমৃদ্ধ হয়ে কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করেন। পরবর্তী কালে বীরের ভূমি বীরভূমে রাজনগর রাজার রায়বেঁশে যোদ্ধা ছিল।

* *চন্দননগর-নিবাসী অর্থনীতিবিদ্‌, লোকসংস্কৃতি গবেষক।*

অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধসাজে সজ্জিত রায়বেঁশে যোদ্ধারা যেমন অজয় নদের পাড়ে রাঢ়ভূমি বীরভূমেরই অধিবাসী ছিলেন, তেমনি পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলায় ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকাতেও এদের উপস্থিতি ছিল সপ্তদশ শতক ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে।

■ যোদ্ধা রায়বেঁশে থেকে লোকনৃত্য রায়বেঁশে ■

যোদ্ধা রায়বেঁশে কিভাবে রায়বেঁশে নর্তকে রূপান্তরিত হলো, এখন সে-প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। নবাবী আমল ও ইংরেজ বণিকদের সময়েও রায়বেঁশে যোদ্ধাদের/রক্ষীদের প্রচলন ছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু গোরাদের শাসনকালে যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় যখন যন্ত্রীকরণের সূচনা হলো, তখন থেকেই রায়বাঁশের হাতলযুক্ত বল্লম হাতে রায়বেঁশে যোদ্ধার দিন ফুরিয়ে এল। অর্থাৎ লাঠি-বল্লমের পরিবর্তে যখন দেশীয় রাজাদের রণাঙ্গনে ধীরে ধীরে তরবারি-হাতে অশ্বারোহী সৈনিক ও আরো পরে কামানের গোলার প্রবেশ ঘটল, তখন রায়বেঁশে যোদ্ধার আর প্রয়োজন রইল না। জীবিকার ক্ষেত্রে রায়বেঁশে যোদ্ধারা হয়ে গেল উদ্বৃত্ত বা 'surplus'। গুরুসদয় দত্ত সেই পরিবর্তন-কালকে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময় বলে চিহ্নিত করেছেন। রণবাদ্য, রণভঙ্গিমায় পারদর্শী একদল রায়বেঁশে যোদ্ধা উপার্জনের তাগিদে রণনৃত্য অর্থাৎ রায়বেঁশে নৃত্যশৈলী গ্রহণ করল। জনমানসে এক স্থায়ী জায়গা করে নিল রায়বেঁশে নৃত্য। কারণ বীরত্বব্যঞ্জক, পৌরুষপূর্ণ নৃত্যের মধ্যে গ্রামবাসীরা পেল আমোদ-প্রমোদের উপকরণ। এইভাবে রায়বেঁশে নৃত্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটল লোকনৃত্যের অঙ্গনে। আর এই রায়বেঁশে ক্রমে ক্রমে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল।

রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশন করছেন চারকল গ্রামের শিল্পীরা

আরো একদল রায়বেঁশে দেশীয় রাজা ও জমিদারের কোটাল, পাইক, পেয়াদা/বরকন্দাজ, লেঠেল প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত হলো। গ্রামীণ আচার ও সংস্কৃতিতে রায়বেঁশেদের দ্বিধারা স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। বাংলার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে রায়বেঁশের প্রভাব সকলের নজরে এল।

■ রায়বেঁশে শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ■

সমাজের দুর্বলতর কিন্তু সবল ও অবহেলিত শ্রেণিদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে ঋণী, যেহেতু প্রায় হাজার বছর ধরে রায়বেঁশে নৃত্যের অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার মূলে আছে এরা। নিরন্ন, অর্ধভুক্ত মানুষ—সমাজে যারা দিল অনেক, কিন্তু পেল না কিছুই—তারাই মূলত রায়বেঁশে শিল্পী। লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে এরা নিষ্ঠা ও দায়িত্বের পরিচয় রেখে চলেছে। মাল, হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি ও অন্যান্য তফসিলীর মতো অন্ত্যজ শ্রেণি ও মুসলিম সম্প্রদায় রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত। এক অজ্ঞাত কবির প্রচলিত রচনা এই ধারণাকে প্রমাণ করেঃ "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।/ ঝাঁঝ কাঁসর মৃদং বাজে।"

এখানে 'আগডুম' কথাটির অর্থ আগের সারিতে ডোম, 'বাগডুম' পাশের সারিতে ডোম এবং 'ঘোড়াডুম সাজে'—সম্মুখ সারির সৈন্যসজ্জার ডোম। এই অবহেলিত শ্রেণি রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শন করে তথাকথিত উচ্চশ্রেণির মানুষদের কাছে প্রশংসা অর্জন করলেও সামাজিক দিক থেকে অবজ্ঞাই এদের ভাগ্যে জুটেছে। অথচ সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রায়বেঁশে নৃত্যদলে নাচ করেছে, ঢোল বাজিয়েছে। গুরুসদয় দত্ত এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

■ রায়বেঁশের ব্যবহার ■

রায়বেঁশের ব্যবহার হয়েছে—(ক) যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার ভূমিকায়, (খ) বিয়ের আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্যপ্রদর্শনে, (গ) শরীরচর্চা ও সামরিক ব্যায়াম প্রদর্শনের কাল্পনিক যুদ্ধে, (ঘ) কোটাল, পাইক-পেয়াদা/বরকন্দাজ, লেঠেল হিসাবে, (ঙ) শোভাযাত্রায় নৃত্যপ্রদর্শন করে, (চ) বরযাত্রীদের সুরক্ষাদানে। অর্থাৎ আত্মরক্ষা, আক্রমণ ও বিনোদন—এই তিন ভিন্নধর্মী পেশায় রায়বেঁশের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

■ রায়বেঁশের জনপ্রিয়তা হ্রাস ■

এতক্ষণ রায়বেঁশে নৃত্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তার ছবি চিত্রিত হয়েছে এবং সমাজ ও জনজীবনে তার অবিচ্ছেদ্য প্রভাব আমাদের নজরে এসেছে। এ হেন রায়বেঁশে নৃত্যকেও হঠাৎ পিছু হটতে হলো। ব্যাণ্ডদল, কবিগান, যাত্রাপালা, কৃষ্ণলীলা, বাইনাচের রায়বেঁশে নৃত্য তার স্ব-আবেদন হারিয়ে ফেলতে বসল। স্ত্রীভূমিকাহীন রায়বেঁশে কতকাল তার পৌরুষনৃত্য প্রদর্শন করে যুগোপযোগী হবে। তাই অর্ধভুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ আদুড় গায়ের পুরুষ রায়বেঁশের দল 'আধুনিকতা' আমদানি করল। এই লোকনৃত্য গ্রহণ করল 'বিষ' সংস্কৃতি।

■ রায়বেঁশে যখন হলো 'রাইবিশে' ■

অনুজ্জ্বল রায়বেঁশেকে চমকপ্রদভাবে সাজানোর জন্য এল 'রাইবিশে' সংস্করণ। রায়বেঁশে শিল্পীরা মেয়েলি

পোশাকে ও রূপচর্চায় নারীবেশ গ্রহণ করল। নারীরূপী পুরুষশিল্পীদের নৃত্যভঙ্গিমায় রায়বেঁশে জেগে উঠল, কিন্তু তার নাম হলো 'রাইবিশে'। এই বিষপ্রয়োগে রায়বেঁশে এগিয়ে চলল। বেঁচে রইল রায়বেঁশে, বেঁচে গেল লোকনৃত্য।

রায়বেঁশে নৃত্যের অন্তর্গত রভ বাঁকানোর খেলা

■ রায়বেঁশে নৃত্যের সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্য ও ধ্বনি ■

জমকালো সাজপোশাক ও চড়া মেক আপে রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশিত হয় না। নৃত্যশিল্পীরা সাধারণত আদুড় গায়ে ধুতিকে হাঁটুর ওপর মালকোচা মেরে পরেন। মাথায় থাকে লালফেট্টি অথবা গামছা। কোমরেও থাকে গামছা। কখনো গায়ে থাকে লাল ফতুয়ার মতো জামা। হাতে রায়বাঁশ, কঞ্চি অথবা কাঠের তৈরি ঢাল ও তলোয়ার। পায়ে ঘুঙুর। রাইবিশে নৃত্যে পুরুষ শিল্পীরা মেয়ে সেজে পরিধান করত ঘাগরা, লম্বাচুল, মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে খোঁপা, চুলে ও খোঁপায় গয়না। বাদ্যের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় বাঁশি, সানাই, ঢাক, ঢোল, রণশিঙা ও কাঁসি। ধ্বনি বিভিন্নরকম হতো, যেমন—হাতের চেটোতে তালি, মুখে তালি, গালে তালি, উরুতে চপেটাঘাত, 'ইঃ আঃ' শব্দ ইত্যাদি।

■ রায়বেঁশে ও গুরুসদয় দত্ত ■

গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেদের বাংলার বীরযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনে আই. সি. এস. গুরুসদয় দত্ত সরকারি কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যেমন রায়বেঁশে নৃত্য, ঢালি নৃত্য, পাইক নৃত্য, কাঠি নৃত্য, ছৌনৃত্য, জারিনৃত্য ইত্যাদি। তিনি বীরভূমের দায়িত্ব নিয়ে আসেন ১৯১৯ ও ১৯৩০ (ভিন্ন মতে ১৯৩১) সালে যথাক্রমে জেলার মুখ্য প্রশাসক ও জেলা সমাহর্তা হিসাবে। ১৯২৯-এ ময়মনসিংহের জেলাশাসক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মৈমনসিংহ লোকনৃত্য ও লোকগীতি সমিতি'। সেবছরই লণ্ডনের অ্যালবার্ট হল-এ 'All England Folk Dance Festival'-এ যোগদান করে তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতে লোকনৃত্যের সম্পদ লুকিয়ে আছে আর সেই লোকনৃত্যের প্রতি রয়েছে দেশবাসীর উদাসীনতা। তাছাড়া দেশের খেটে খাওয়া মানুষ, যথা চাষি ও শ্রমিকের মধ্যে গণজাগরণ ও চেতনা ফিরিয়ে আনার অর্থ হলো লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। তাঁর এই চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৩০ সালে তিনি বীরভূমে খুঁজে পেলেন লুপ্তপ্রায় রায়বেঁশে নৃত্য। তাঁর নিজের কথায়ঃ "বাংলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের (Folk song and Folk dance) পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রচলনের প্রচেষ্টাকে আমি চিরকাল অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি।"[৪] তিনি নিজে জেলাশাসক হয়েও রায়বেঁশে নৃত্যে অংশগ্রহণ করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৩০ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রীর সিউড়ি আগমন উপলক্ষ্যে তিনি রচনা করেছিলেন 'রাইবিশের গান'—"আয় মোরা সবাই মিশে,/ খেলব রাইবিশে।/ মোরা খেলব রাইবিশে/ মোরা নাচব রাইবিশে।/ আয় মোরা সবাই মিশে খেলব রাইবিশে। নহে ঘৃণ্য জিনিস এ/ মহামূল্য জিনিস এ।/ আয় মোরা সবাই মিশে খেলব রাইবিশে।"

গুরুসদয় দত্তের মনে হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিকতার রক্ষাকবচ ছাড়া পুনরুজ্জীবিত রায়বেঁশে নৃত্য হয়তো আবার হারিয়ে যাবে। তাই ১৯৩১ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি'। ১৯৩৩ সালে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'All India Folk Dance Society'। ১৯৩৪ সালে 'বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি'র নতুন নাম হয় 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি'। বাংলার ব্রতচারী সমিতির মুখপত্র 'বাংলার শক্তি' ডিসেম্বর ২০০২ সংখ্যায় অধ্যাপিকা সমাপ্তি দাস 'লোকনৃত্যচর্চার প্রসারে গুরুসদয় দত্ত' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ "তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি, যিনি নৃত্যচর্চাকে ব্রতের মর্যাদা দিলেন।" গুরুসদয় দত্ত নিয়মনিষ্ঠা, দেশসেবা, দশের সেবা ইত্যাদির ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাই একসময়ের রায়বেঁশে ও লেঠেল দল—যারা চোর-ডাকাতের মতো অসামাজিক পেশা গ্রহণ করেছিল, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সুষ্ঠ সুন্দর রূপ দিয়ে তিনি জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ডাকাতদলের মূলত বসবাস ছিল বীরভূমের আমোদপুরের কাছে পাহাড়পুর, সিউড়ির নিকটে মাধাইপুর। আর চোরেদের ঘাঁটি ছিল নানুরের কাছে চোরকলগ্রাম বা বর্তমানের চারকলগ্রামে। কর্মচ্যুত লেঠেল, চোর, ডাকাত দলকে তিনি শুদ্ধ ও সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনলেন রায়বেঁশের মাধ্যমে। এইভাবে তিনি লুপ্তপ্রায় রায়বেঁশে নৃত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন। তিনি বীরভূম জেলায় সিউড়ির ১৫ কি.মি. দক্ষিণে তদানীন্তন সুলতানপুর (বর্তমান নাম—অবিনাশপুর) গ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বঙ্গদেশে প্রথম

রায়বেঁশে নৃত্যের দল গঠন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান—সকলেই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিল।

■ রায়বেঁশের বিরোধিতা ■

রায়বেঁশের প্রতি যুবসমাজের গভীর আগ্রহ দেখে সেসময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রায়বেঁশকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। অনেকের ধারণা হলো যে, গান্ধীজীর বিভিন্ন আন্দোলনের বিরোধিতাই বুঝি রায়বেঁশের উদ্দেশ্য। তাই ১৯৩২ সালে কংগ্রেস নেতা ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখেছিলেন ঃ "দিদির বিয়ে যেমন তেমন/ দাদার বিয়ে রাইবেশে—/ আয় ঢকাঢক মদ খেয়ে—/ ভদ্দলোকের ছেলেগুলো—/ নাচছে এবার রাইবেশে—/ দেখেশুনে আর বাঁচি না—/ নেশার গুমোর যায় বা ফেঁসে।/ গান্ধীরাজার হুকুম মতো/ জ্বলল আগুন দেশ জুড়ে—/ বীরভূম আজ বাঁধা পড়েছে/ গুরুদত্তের প্রেমডোরে।"

এরপরে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের জেল হয়। পরবর্তী কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার কালের কথা' রচনায় ছড়াটি মুদ্রিত হয়।[৫]

■ রবীন্দ্রনাথ ও রায়বেঁশে ■

১৯১৯ সালে বীরভূমের মুখ্য প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে এসে গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শ্রীনিকেতনে তখন পরিচালিত হতো 'ব্রতীবালক সঙ্ঘ' ও ধীরুনন্দ রায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ব্রতীবালক'। এই ব্রতীবালক সঙ্ঘের কাজে উৎসাহিত হয়েও গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারীর ভাবধারা গঠন করেন।

রায়বেঁশে নৃত্য

বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গুরুসদয় দত্তের রায়বেঁশে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় খুশি হন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি লিখেছিলেন ঃ "আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নূতন আবিষ্কার করেছেন; এরকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ।... এই নাচ আমাদের দেশের চিত্তদৌর্বল্য দূর করতে পারবে। তাই আমি কামনা করি, আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক, সার্থক হোক।"[৬]

■ ঢালি ও রায়বেঁশে নৃত্য ■

যশোরের ঢালি নৃত্যের সাথে রায়বেঁশে নৃত্যের মিল যথেষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। ঢালি নৃত্যও রণনৃত্য। এককথায় ঢালি ও রায়বেঁশে উভয়েই লোকনৃত্য। গুরুসদয় দত্ত এই ঢালি নৃত্যচর্চারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

■ রায়বেঁশে কী ব্রতচারী নৃত্যের অঙ্গীভূত? ■

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, রায়বেঁশে নৃত্যের চল ব্রতচারী সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ছিল। তাহলে প্রশ্ন আসে, রায়বেঁশে কিভাবে ব্রতচারী নৃত্যের অঙ্গীভূত হলো? গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন—একথা সর্বজনবিদিত। মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রতচারী প্রণালী গৃহীত হয়েছিল। জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিশ্বকে মোহিত করবে—এই আশা ছিল গুরুসদয় দত্তের। রায়বেঁশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য, আনন্দের জাগরণ তিনি ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে রায়বেঁশে-সহ বাংলার বিভিন্ন লোকনৃত্যের ধারাকে সজীব ও সক্ষম করে তুলতে তিনি সেইসমস্ত লোকনৃত্যসমূহকে ব্রতচারী নৃত্যের অঙ্গীভূত করেন।

নৃত্যের কলাকৌশল ও শৈলীর দিক থেকে রায়বেঁশের মধ্যে আছে যুদ্ধ-অভিপ্রায়। প্রকারান্তরে, অধ্যাপক কিশোরীরঞ্জন দাস একান্ত সাক্ষাতে জানিয়েছেন, ব্রতচারী নৃত্য মূলত বরণনৃত্য। তাঁর মতে ঃ "বাইরের লোককে স্বাগত জানানো, সামাজিক সভ্যতা—যে-গান, যে-ভঙ্গি, যে-শিষ্টাচার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা ব্রতচারী।" তিনি মনে করেন, রায়বেঁশে যদি হয় কিছুটা আমোদ, রক্ষণ, আক্রমণ-প্রণালী; তবে পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতির মতো সমাজকল্যাণের দিক আছে ব্রতচারীতে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

(ব্রতচারী বরণনৃত্য) "স্বাগত, স্বাগত, স্বাগত হে, শুভ অতিথি...।"

(সমাজকল্যাণ/সেবামূলক) "আয় কচুরী (কচুরীপানা) নাকি...।"

তবে যেহেতু গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেকে প্রাতিষ্ঠানিক মোড়কে রক্ষা করতে চেয়েছেন এবং রায়বেঁশে নৃত্যের চর্চা ও প্রসার বাংলার ব্রতচারী সমিতির হাতে, তাই রায়বেঁশে ব্রতচারী নৃত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে।

■ বাংলার ব্রতচারী সমিতি ও রায়বেঁশে ■

বাংলার ব্রতচারী সমিতি বর্তমানে রায়বেঁশে নৃত্যের অভিভাবক। গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক রায়বেঁশে নৃত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু রায়বেঁশে নৃত্য যে তার স্বগরিমা নিয়ে আজও বর্তমান, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে বাংলার ব্রতচারী সমিতি। রায়বেঁশে নৃত্যের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয় ঠাকুরপুকুর জোকার ব্রতচারী গ্রামে। এছাড়াও বাৎসরিক শিবিরে রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রধান রায়বেঁশে

শিল্পীদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে আসছে বাংলার ব্রতচারী সমিতি। ৬ ফেব্রুয়ারি ব্রতচারী প্রতিষ্ঠাদিবস এবং ১০ মে গুরুসদয় দত্তের জন্মদিবসে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রায়বেঁশে নৃত্যও পরিবেশিত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গুরুসদয় দত্ত চেষ্টা করেছিলেন মণিপুরী রাসনৃত্য ও গুজরাটি গরবা নৃত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হিসাবে রায়বেঁশের পরিচিতি ঘটানো। আমরা জানি, প্রাদেশিক নৃত্যের মধ্যে ভাংড়া নৃত্য যতটা পাঞ্জাব রাজ্যের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রায়বেঁশে কিন্তু সেভাবে তার উপস্থিতি বাংলার মধ্যে ও বাইরে ঘটাতে পারেনি।

■ রায়বেঁশে ও বর্তমান কাল ■

রায়বেঁশে নৃত্য এখনো লোকনৃত্য হিসাবে আদৃত হচ্ছে। অর্থাৎ রায়বেঁশে শিল্পীরা এখনো রায়বেঁশে নৃত্যের চর্চা ও প্রসারের কাজে ব্রতী আছে। জনসাধারণ এখনো রায়বেঁশে নৃত্যের অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকে। এই ২০০৫-এও কলকাতা মহানগরীতে 'ষড়ভুজ' সংস্থা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রায়বেঁশে নৃত্য সার্থক হয়ে উঠেছিল লোকশিল্পীদের জীবন্ত স্পর্শে। একথা অনস্বীকার্য, পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল টিভির সংযোগ, অডিও এবং ভিডিও সিডি, ফিল্মী আবেদনে রায়বেঁশের মতো প্রাচীন লোকনৃত্য টিকিয়ে রাখা বেশ কঠিন। তবুও প্রতিকূলতার মধ্যেই রায়বেঁশে শিল্পীরা সেই কঠিন কাজই করে যাচ্ছেন। আজ থেকে একশো পঞ্চাশ বছর আগে রায়বেঁশের দল বীরভূমে ছিল ১৪৪টি। পঞ্চাশ বছর আগেও বীরভূমের অন্তত ২০টি গ্রামে রায়বেঁশের দল ছিল। বর্তমানে বীরভূম জেলায় রায়বেঁশের দল আছে চারকলগ্রাম, রসাগ্রাম, সোঁজ, দেবগ্রাম, নোয়াপাড়া, পাহাড়পুর ও মাধাইপুরে। চারকলগ্রামে শিবু প্রামাণিক ও তার ভাইপো মাধব প্রামাণিকদের একটা রায়বেঁশের দল ছিল।

শিবু প্রামাণিক (এখন বয়স প্রায় ৬৭) ১৯৮২ সালে লণ্ডনে রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শন করেন। তিনি ৩ জানুয়ারি ১৯৯৪ বাংলার ব্রতচারী সমিতির এক অনুষ্ঠানে তদানীন্তন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডির দ্বারা পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। বয়সে যুবক মাধব প্রামাণিক ১৯৯৭ সালের ১১ থেকে ১৭ মে Korea International Festival-এ যোগদান করেন ও রায়বেঁশে শিল্পী হিসাবে সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ডে প্রদর্শনী করেন।

এই দলটি যেসমস্ত নৃত্য প্রদর্শন করে তা হলো ঃ মা কালীর বন্দনায় ভৈরব নৃত্য, শরীরের ভরভিত্তিক যোগাসন, ছোট রিঙের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল, নাগরদোলা নৃত্য, আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের জন্য ঢাল, তলোয়ার, ফলা ও লাঠির খেলা, গরুর গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে চক্রের খেলা, রণ-পায়ে হাঁটা, ডন, বৈঠক ও পিছনে ভল্ট, যোগবলে লোহার ফলা ও রড বেঁকানোর খেলা, ঢেঁকি ঘোরানো, দড়ি ঘোরানো ইত্যাদি। এছাড়া নোয়াপাড়ার দলও ঢেঁকি দিয়ে দরজা ভাঙা ও অগ্নিগোলকের মধ্যে প্রবেশ ইত্যাদি খেলা দেখাত।

পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব যেসমস্ত দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায়নি, সেখানে শিবু প্রামাণিকের দল এখনো রায়বেঁশে প্রদর্শনী করেন। একরাত্রে ৩,৫০০ টাকায় এরা উল্লিখিত বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক অতীতে ১৯৮০ সালে সিউড়ির বেণিমাধব স্কুল সংলগ্ন মাঠে যে লোক-উৎসবের আসর বসেছিল, সেখানেও রায়েবেঁশের দল উপস্থিত ছিল। এপ্রিল মাসের প্রখর তপন-তাপেও রায়বেঁশে দেখবার জন্য ৩০০ দর্শক হাজির হয়। বীরত্বব্যঞ্জক ছন্দোময় পৌরুষসম্পন্ন নৃত্যের জন্যই এই রায়েবেঁশে এখনো লোকসংস্কৃতিতে একটা স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্রতচারী শিবির, সরকারি অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে রায়েবেঁশের দল আমন্ত্রিত হয়ে থাকে। শিবু প্রামাণিক এই প্রবীণ বয়সেও চারকলগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে রায়বেঁশের ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। এইভাবে রায়বেঁশে নৃত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

■ রায়বেঁশের ভবিষ্যৎ ■

রায়বেঁশে নৃত্যের একটা আবেদন থাকলেও প্রধানত সমাজের সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। রায়বেঁশে মূলত রণনৃত্য। ঠিক এই কারণেই রায়বেঁশে নৃত্যের বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা বীরভূম বাদে অন্য জেলায় ঘটেনি। এই নৃত্য সঙ্গীতময় না হওয়ার ফলে সার্বিক আবেদনের দিক থেকে তা আহামরি কিছু নয়। এছাড়া মনোরঞ্জনের সব উপকরণ এই নৃত্যে অনুপস্থিত। স্বীকার করতে বাধা নেই, বাউল, টুসু, ভাদু, গম্ভীরা ও ছৌ নাচের মতো এই রায়বেঁশে নৃত্য ততটা জনপ্রিয় নয়।

তবুও নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই নৃত্য এখনো বেঁচে আছে। মূলত সরকারি অনুষ্ঠান, বাংলার ব্রতচারী সমিতির শিবির, লোকসংস্কৃতি উৎসব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই রায়েবেঁশে নৃত্যশিল্পীরা তাদের জন্য ধার্য ও নির্দিষ্ট সময়ে যান্ত্রিকভাবে এই নৃত্যকলা প্রদর্শন করে ক্রমশ পর্দার আড়ালে চলে যায়। আবার পরের অনুষ্ঠানে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় রায়বেঁশে শিল্পীরা দিন গোনে। ❑

তথ্যসূত্র

(১) বাংলার বীর যোদ্ধা রায়বেঁশে—গুরুসদয় দত্ত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ২২, পাদটীকা; (২) ঐ, পৃঃ ২২; (৩) ঐ; (৪) ঐ, পৃঃ ১৫; (৫) দ্রঃ জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম—অমিয় ঘোষ, পৃঃ ৪৩; (৬) ঐ, পৃঃ ৪২

স্বামী অভেদানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ*

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস। উত্তর কলকাতার আহিরীটোলা। ২১ নং নিমু গোস্বামী লেন। দোতলা বাড়ির একটি কক্ষ। গভীর নিঝুম রাত। প্রকৃতি শান্ত, নিস্তব্ধ। অপরূপ নৈঃশব্দ্য। এক সৌম্যদর্শন যুবক ধ্যানমগ্ন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আনন্দসাগরে ভাসমান। যুবকের আত্মা দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে স্বাধীন বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণরত। ক্রমশ আত্মা অনন্ত আকাশে উর্ধ্বগামী। একের পর এক দৃশ্য। সুন্দর মনোরাম প্রাসাদে উপস্থিত। প্রাসাদের স্তরে স্তরে নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবের মূর্তিসকল দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের ভিন্ন ভাব ও প্রতীক অবলোকনে তিনি বিহ্বল। ক্রমে কোন অনির্বচনীয় অতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় প্রণোদিত এক বিরাট কক্ষে তাঁর গমন। তিনি অভিভূত অপরূপ দর্শনে। কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে এক-একটি বেদিতে সকল দেবদেবী, অবতারপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের মূর্তি। দশাবতার, যিশুখ্রিস্ট, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য প্রমুখ উপবিষ্ট। আর সেই বিরাট কক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অপরূপ দৃশ্যের সুধাপানে রত যুবক। ক্রমশ শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি জ্যোতির্ময় রূপ পরিগ্রহ করল বিরাট মূর্তিতে। সেই বিরাট মূর্তির মধ্যে একীভূত হলেন সকল দেবদেবী, আধিকারিক ও অবতারপুরুষেরা।

ধ্যানভঙ্গ হলো যুবকের। ভোর হলো। দিব্য দর্শনের রেশ যুবকের মনে। কিন্তু মর্মার্থগ্রহণে অসমর্থ। দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত যুবক। আনন্দময় স্বরে আবেগমথিত কণ্ঠে যুবক সব নিবেদন করলেন স্বীয় গুরুর কাছে। আশ্চর্য-চরিত্র রহস্যময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অধরে মৃদু হাস্য। চক্ষু অর্ধনিমীলিত। প্রশান্ত আনন। দেবীমহিমায় মণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর ঃ "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে। এবার দেবদেবী দর্শনের চরম সীমায় পৌঁছেছিস। তোর আর কিছু দর্শন করার বাকি নেই। এখন থেকে তুই অরূপ নিরাকার ঘরে উঠলি।"

অখিলতত্ত্ববেত্তা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় যুবকের মন আনন্দে ভরপুর। তাঁর আননে অনাবিল প্রশান্তি। এই যুবক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯)। 'কালী মহারাজ' নামে ভক্তমহলে সুপরিচিত।

আবাল্য যোগানুশীলনে অনুসন্ধিৎসু কালীপ্রসাদ যোগশিক্ষার মানসে একদা উপনীত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সর্বযোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে। প্রথম দর্শনে সর্বযোগবেত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ চিনেছিলেন তাঁর যোগিশিষ্যকে। আর পরদিনই পরমযোগিবর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামন্ত্রদানে দীক্ষিত করলেন যোগাসনে উপবিষ্ট কালীপ্রসাদকে।

ক্রমে কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী ও সেবকরূপে পরিচিত হলেন। লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলাখেলায় যুবক-শিষ্যদের একসূত্রে গ্রথিত করলেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, শশী, শরৎ, লাটু, হরি, সারদা, নিরঞ্জন, যোগেন, গঙ্গাধর, খোকা, বুড়োগোপালদা, হরিপ্রসন্নের সঙ্গে সেই যে প্রেমময় রামকৃষ্ণপ্রেমের বন্ধনে কালীপ্রসাদ আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা আজীবন ছিল অটুট, অবিচ্ছিন্ন ও সজীব।

অদ্ভুত স্মরণশক্তি, চিত্তের তীব্র একাগ্রতা ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহা অভেদানন্দজীকে বিবিধ শাস্ত্র ও বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও নিগূঢ় আত্মতত্ত্ববেত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনা-ব্যাখ্যা এবং সুললিত

* রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের বিদগ্ধ গবেষক সন্ন্যাসী, সুলেখক।
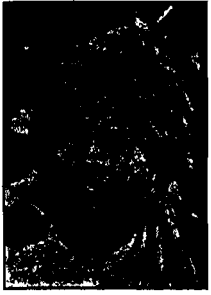
ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্ররচনা সর্বজন-সমাদৃত। তাঁর তপস্যাময় পরিব্রাজক জীবন ছিল ঘটনার ঘনঘটায় সমুজ্জ্বল। তাঁর অনুভূতি, ত্যাগদীপ্ত ও বিচিত্র মণীষাময় জীবন পাশ্চাত্যে প্রায় সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরে (১৮৯৭-১৯২১) সফল বেদান্ত প্রচারকরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা যুবসমাজকে করেছিল উদ্বোধিত ও উদ্দীপিত। তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর (১৯২১-১৯৩৯) ছিল বিশেষ কর্মবহুল। তখন তাঁকে দেখি কর্মযোগীরূপে। কলকাতায় ও দার্জিলিঙে শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বতন্ত্রভাবে ও নিজের মনোমত করে।

অভেদানন্দজীর যেমন গুরুভাইদের প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা, পরম প্রীতির সম্পর্ক, গভীর স্নেহবন্ধন; তেমনি তাঁর গুরুভাইরা ছিলেন তাঁর প্রতি সমস্নেহপরায়ণ ও সমপ্রেমময়। এ ছিল তাঁদের পরস্পরের প্রতি জন্ম-জন্মান্তরের গভীর সম্পর্ক। তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গী—'কলমির দল'। সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ, যা একান্ত সহজাত, অপার্থিব ও অপ্রমেয়।

শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কালী, লাটু, বাবুরাম, শশী, শরৎ প্রমুখ গুরুভাইদের শ্রীরামকৃষ্ণের অনলস সেবা; কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শিবরাত্রিতে নরেন্দ্র, কালী প্রমুখ তিন-চারজন গুরুভাইয়ের ব্রতোপবাস ও গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া; ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক জীবন-আলোচনায় উজ্জীবিত নরেন, তারক ও কালীর বোধগয়ায় বোধিদ্রুমতলে তপস্যায় যাওয়া; কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের একতলায় এক বৃহৎ মশারিতলে গুরুভাইদের একত্রে শয়ন; পুরীধামে কালী, শরৎ ও বাবুরাম—তিন গুরুভ্রাতার একত্রে তপস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনায় তাঁদের পারস্পরিক প্রীতির অনুপম নিদর্শন আমরা দেখতে পাই।

বরানগর মঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম মঠ। নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে তারক, শশী, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, কালী প্রমুখ একত্রিত হলেন মঠে। তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা, কঠোরতা, শাস্ত্রাদি পাঠের আধ্যাত্মিক-খনি ছিল বরানগর মঠ। মঠের একটি ছোট্ট ঘরে কালী মহারাজ অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন ধ্যানজপ ও শাস্ত্রাদি পাঠে। তাই গুরুভাইরা নাম দিয়েছিলেন 'কালী-তপস্বী'র ঘর। শাস্ত্রমতে অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে কালী মহারাজ গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। নতুন নাম 'স্বামী অভেদানন্দ'।

একদিন মাস্টার মহাশয় বরানগর মঠে এসে তপ্তবালির ওপর অভেদানন্দজীকে শুয়ে থাকতে দেখলেন। ভয় পেয়ে তিনি যোগানন্দজীকে বললেন ঃ "কালী মঠের কঠোরতা সহ্য না করতে পেরে দেহত্যাগ করেছে।" যোগানন্দজী সহাস্যে বললেন ঃ "ও কি মরে? ঐ শালা অমনি করে ধ্যান করে।" স্বামীজী ও অভেদানন্দজীর মধ্যে সপ্রেম শাস্ত্রাদি আলোচনা, তর্কাদি হতো। জয়-পরাজয়ে দুজনেই হতেন উল্লসিত। কালী মহারাজ মঠের কোন কাজে লিপ্ত হতেন না বলে অন্য গুরুভাইরা একদিন অনুযোগ করলেন স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী অমনি বললেন ঃ "তোদের একটা ভাই যদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে, তো তোদের এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হাণ্ডা আছে; আমি মেজে দিচ্ছি।" স্বামীজী আদর করে কালী মহারাজকে ডাকতেন 'কালুয়া' বলে। কালী মহারাজ বলতেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল।"

প্রেমানন্দজী, সারদানন্দজী ও অভেদানন্দজী পুরীর একটি মঠে তপস্যায় আছেন। তাঁদের দিন অতিবাহিত হয় জগন্নাথ দর্শনে ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ-ধারণে। প্রেমানন্দজী পড়লেন টাইফয়েডে। অভেদানন্দজী ও সারদানন্দজীর সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। সারদানন্দজী আবার রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত। দুই গুরুভ্রাতার সেবায় তিনিও হলেন রোগমুক্ত। হৃষিকেশে আবার তপস্যারত অভেদানন্দজী জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস ও রক্ত-আমাশয়ে শয্যাশায়ী হলেন। অমনি কোথা থেকে তিন গুরুভ্রাতা উপস্থিত—তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তাঁদের সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলেন অভেদানন্দজী। আবার কাশীতে অসুস্থ বিবেকানন্দের সেবায় নিযুক্ত হলেন সদ্যরোগমুক্ত অভেদানন্দজী। কালী মহারাজ নিজেই এবার এক সংক্রামক রোগে আচ্ছন্ন। তা জেনে স্বামীজী তাঁর শিষ্য সদানন্দকে পাঠিয়ে দিলেন কাশীতে কালী মহারাজের সেবার জন্য।

পরিব্রাজনকালে অভেদানন্দজী একবার চাকুরিরত গুরুভাই হরিপ্রসন্নের আতিথ্য গ্রহণ করেন গাজীপুরে। সেখানে হরিপ্রসন্ন অভেদানন্দজীকে তর্কে লাগিয়ে দিলেন এক দ্বৈতবাদী পণ্ডিতের
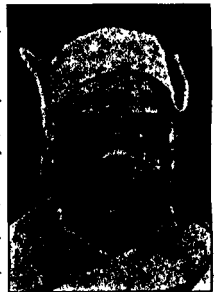
সঙ্গে। পরবর্তী কালে হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী) বলেছিলেন: "মহারাজ, আপনার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও তর্কপটুতার কথা আমার জানা ছিল। তাই সেদিন দ্বৈতবাদী পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে বিচারে আমি আপনাকে লাগিয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি পণ্ডিতজীকে পরাস্ত করবেনই।"

কাশীর বংশী দত্তের বাগানে চার গুরুভাই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন—অভেদানন্দজী, সারদানন্দজী, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ও ভাই ভূপতি। পরিব্রাজক-জীবনে অভেদানন্দজী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পান জুনাগড়ের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি পণ্ডিত মনসুখরাম ত্রিপাঠীর বাড়িতে। অভেদানন্দজীকে দেখিয়ে স্বামীজী পণ্ডিতজীকে বললেন: "ইনি অদ্বৈতবেদান্তী, আমার গুরুভ্রাতা। ইনি আপনার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করবেন।"

এসব ঘটনায় আমাদের মানসপটে স্বতই উদিত হয় অভেদানন্দজীর সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের অনুপম ভ্রাতৃপ্রেমের সম্বন্ধ।

বরানগর মঠে থাকাকালীন কোন কারণে কোন গুরুভাইয়ের প্রতি অভেদানন্দজীর অভিমান হয়। সেই অভিমানবশত তিনি সঙ্কল্প করেন যে, মঠে আর ফিরবেন না। তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন, পরিব্রাজক-জীবন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর মনে ক্রমাগত স্বামীজীর কথা অনুরণিত হলো: "তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাদের নিয়েই মঠ। তোমরা মঠে না গেলে মঠ কার জন্য?" তখন অভেদানন্দজীর মনে চিন্তা হতে লাগল: "ভাবলাম—রাগ আর কার ওপর করব? গুরুভাইদের ওপর? গুরুভাইরাও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাদের নিয়েই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা।" তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মঠে ফিরে যাবেন গুরুভাইদের কাছে।

বরানগর মঠে ফিরে আসতেই শশী মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন কালী মহারাজকে। সকলেই আনন্দে অভিভূত। শশী মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় দক্ষিণেশ্বরে—যেদিন তিনি প্রথম এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনমানসে। দুজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব। শশী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: "এতদিন ছিলে কোথায়?" কালী মহারাজের উত্তর: "তীর্থ ভ্রমণে।" শশী মহারাজ: "আমি কিন্তু ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে দিবারাত্র কাটাচ্ছি।" কালী মহারাজ: "শশী, আমাদের মধ্যে তুমিই যথার্থ ভাগ্যবান। তোমার ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণা।" কালী মহারাজের মান-অভিমান গেল উড়ে। এবার নিশ্চিন্ত মনে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন তপস্যায়।

তপস্যার পর অভেদানন্দজী উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় মঠ আলমবাজার মঠে। এখানে মঠের সচ্ছলতা দেখে তিনি প্রীত হলেন। বেশ গুছানো। ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। শশী মহারাজ তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। এখানেও কালী মহারাজ একটি ঘরে ধ্যান-জপ, শাস্ত্রপাঠ নিয়ে থাকতেন। গুরুভাইরা এই ঘরের নাম দিলেন 'কালী-বেদান্তী'র ঘর। অত্যধিক নগ্নপদে ভ্রমণের ফলে অভেদানন্দজীর গিনিওয়ার্ম হয়। সাতবার তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার হয়। সেসময়ে শরৎ মহারাজ, লাটু মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ তাঁর প্রাণপণ সেবা করেছিলেন। পরবর্তী কালে কালী মহারাজ বলতেন: "অসুখের সময় শরৎ, লাটু ও নিরঞ্জন—এরা খুব সেবাযত্ন করেছিল। তাদের যত্ন ও ভালবাসা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।" এখানে শিবানন্দজী ও অখণ্ডানন্দজী কালী মহারাজের কাছে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য পড়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শিবানন্দজী শাস্ত্র পড়ছেন কনিষ্ঠ গুরুভাই কালী মহারাজের নিকট। এঁদের পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল।

এখানে অভেদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি স্তোত্র রচনা করলেন—'ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং...।' লাটু মহারাজ শ্লোকটি শুনে মনে খুবই ব্যথা পেলেন। সরাসরি স্তোত্র-রচয়িতাকে বললেন: "কালী, তুই এঁরি ভেতর ঠাকুরকে বলিস কিনা যিশুকেষ্টর অবতার?' কালী মহারাজ বিনীতভাবে বললেন: "ভাই, তাও কি কখনো হয়? শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা ভুলব—একথা মুখে আনাও অন্যায়। তিনি যে আমাদের মাথার মণি, তাঁকে ধরেই তো এত বাধা-বিপত্তি ও ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে আমরা এখনো টিকে আছি।" শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে বলাতে লাটু মহারাজের মুখে আর হাসি ধরে না। আনন্দে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন: "ওঃ, তাই বল। আমি তাহলে ভুল বুঝেছিলাম।" লাটু মহারাজের এই সহজ সরল ব্যবহারের কথা কালী মহারাজ পরবর্তী কালে উল্লেখ করে বলতেন: "শ্রীশ্রীঠাকুরের

ওপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। গুরুর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই লাটু মহারাজকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিল।"

এদিকে সংবাদ এল আলমবাজার মঠে—প্রিয় গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের শিকাগো ধর্মমহাসভার বিজয়বার্তা। সকলেই এ-সংবাদে উল্লসিত। আর ওদিকে আমেরিকায় খ্রিস্টান মিশনারি ও ব্রাহ্মসমাজের নেতার ক্রমাগত কুৎসা রটনায় বিবেকানন্দ বিব্রত। তিনি আলমবাজার মঠে জানালেন কলকাতায় এর প্রতিবাদে সভা করে আমেরিকায় বিবরণ পাঠাতে। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অভেদানন্দজী। সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দজী, সারদানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজী। অভূতপূর্ব সাফল্য! স্বামীজী লিখলেন অভেদানন্দজীকে (নভেম্বর ১৮৯৪)ঃ "তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই। অদ্ভুত কার্যক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের সকলের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে।... তোমাদের পরস্পরের ওপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক।... তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোন ভয় নাই।"

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আলমবাজার মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি উন্মুখ। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে লণ্ডনে আছেন স্বামীজী। গুরুভাই সারদানন্দজীকে আগেই আমেরিকায় পাঠিয়েছেন। এবার ডাকলেন অভেদানন্দজীকে। স্বামীজী ঠিক লোক চিনেছিলেন। আউটরাম ঘাটে গুরুভাইরা চোখের জলে বিদায় দিলেন অভেদানন্দজীকে—ব্রহ্মানন্দজী, যোগানন্দজী, অদ্ভুতানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী, রামকৃষ্ণানন্দজী, সুবোধানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী ও ত্রিগুণাতীতানন্দজী। গুরুভাইদের ছেড়ে অজানা দেশে যাত্রার সময় অভেদানন্দজীও চোখের জল সংবরণ করতে পারেননি। তিনি অভিভূত হয়েছিলেন গুরুভাইদের 'অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসা'য়।

লণ্ডনে উপস্থিত হলে অভেদানন্দজীকে বেদান্ত-প্রচারে নামিয়ে দিলেন স্বামীজী। আর বললেনঃ "নিজের পায়ে দাঁড়াও।" এরপর সুদীর্ঘকাল আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত প্রচার করেছিলেন অভেদানন্দজী। খ্যাতনামা দার্শনিক ও সুপণ্ডিত হিসাবে পাশ্চাত্য জগতের বিদগ্ধমহলে পরম আদৃত হয়েছিলেন তিনি। এজন্য তাঁকে বহু কষ্টস্বীকার ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অভেদানন্দজী বলতেনঃ "একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া ও স্বামীজীর অফুরন্ত ভালবাসাই আমার সকল কষ্টকে ভুলিয়ে দিত।" স্বামীজী বলতেনঃ "আমি যদি এই মরজগৎ থেকে প্রস্থান করি, তাহলেও আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মুখ দিয়ে আমার বাণী প্রচারিত হবে।" আর অভেদানন্দজীও মুক্তকণ্ঠে বলতেনঃ "স্বামী বিবেকানন্দ আমার চিরবরণীয় ভ্রাতা। তাঁর মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি নিহিত এবং সেই শক্তিই তাঁকে ভারতে আসমুদ্রহিমাচল ও ভারতবর্ষের বাইরে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রাণপ্রাচুর্যে বলীয়ান ও কার্যসংগ্রামে সফল করেছিল।... শিকাগোর সেই ধর্মমহাসভায় [স্বামীজী] শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই উপলব্ধিময় মহান চিন্তা ও দর্শনকে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন।... স্বামী বিবেকানন্দের সেই ঋণ আজ আমাদের কাছে চির অপরিশোধ্য হয়ে থাকবে।" তাঁর লিখিত 'Swami Vivekananda and His work' গ্রন্থটি প্রিয় গুরুভাই বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রগাঢ় ভালবাসা ও অগাধ ভক্তির নিদর্শন।

আমেরিকার নিউ ইয়র্কে অভেদানন্দজী প্রচাররত সারদানন্দজীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। আবার নিউ ইয়র্ক ও রিজলী ম্যানরে (১৯০০) তুরীয়ানন্দজী ও স্বামীজীকে পেয়ে অভেদানন্দজী আনন্দে হলেন অভিভূত। তিন গুরুভাই পরস্পরের মধ্যে আলোচনায়, গল্পে, হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলেন।

এরই মধ্যে অভেদানন্দজী একবার (১৯০৬) ভারতে এসে পুরীধামে মিলিত হলেন ব্রহ্মানন্দজী, শিবানন্দজী, প্রেমানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে। সেসময়ে ব্রহ্মানন্দজী তাঁর পাশ্চাত্য-কার্যের প্রশংসা করেছিলেনঃ "ভাই কালী,... এক্ষণে পাশ্চাত্য-দেশে তোমার সকল কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করে আমি ও আমাদের সকলে বিশ্বাস করছি যে, নরেন এখনো জীবিত আছে তোমার মধ্য দিয়ে।"

বিদেশে থাকাকালীন অভেদানন্দজীর সঙ্গে গুরুভাইদের পত্রালাপ হতো। কেউ যদি দেরি

করে চিঠি পেতেন কিংবা বিলম্বে চিঠি দিতেন, তাহলে পরস্পরের ওপর মান-অভিমান হতো। এর মধ্য দিয়ে পরস্পরের ভালবাসার ছবি ফুটে উঠত। গুরুভাইদের লিখিত পত্রের ছত্রে ছত্রে এরকম চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অতি আদরের দুলাল। তাঁকে কালী মহারাজ বলতেন—অধ্যাত্ম-অনুভূতির অতলস্পর্শী সাগর। ব্রহ্মানন্দজী একবার মঠের অর্থসঙ্কটের কথা জানিয়ে বই-বিক্রির কিছু লভ্যাংশ চেয়েছিলেন কালী মহারাজের কাছে (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)ঃ "তোমার চিঠিপত্র কিছুদিন হইতে পাই নাই। তোমরা কেমন আছ সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিবে। আমার হজমশক্তিটা খারাপ হয়ে গেছে, তাঁর কৃপায় একরকম যাচ্ছে। যাহোক, মাঝে মাঝে খবর নিও ও চিঠিটা আস্‌টা ছেড়ো।

"মঠের কিরকম টানাটানি অবস্থা। অর্থাগম প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর কাজ ও ভাবের প্রসার করা প্রায় একেবারে স্থগিত রাখতে হয়েছে।... সেইজন্য মঠের Trustee-রা সকলে মিলিত হয়ে এই ঠিক হয়েছে যে, ঠাকুরের ও স্বামীজীর উক্তি ও Lectures and other works প্রভৃতি আমাদের যেসকল centres হইতে ছাপাইয়া বিক্রয় হয়, তাহাদের হইতে লাভের এক চতুর্থাংশ (25 Percent of the Profits) যদি তাহারা মঠে প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত টাকায় মঠের এবং ঠাকুর ও স্বামীজীর অনেক কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়।... আমার খুব বিশ্বাস, তুমি এবিষয়ে নারাজ হইবে না... তুমি পত্রপাঠ তোমার অভিপ্রায় জানাইবে। তোমার উপরই আমাদের একান্ত ভরসা। তুমি যদি ঐভাবে সাহায্য না কর তবে কে করিবে?" কালী মহারাজ এ-চিঠি পেয়ে ব্রহ্মানন্দজীকে ২২৫ ডলার পাঠিয়েছিলেন।

সারদানন্দজী যখন কালী মহারাজের সঙ্গে বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্কে দেখা করতে এলেন, সেসময়ে দুই গুরুভ্রাতার মিলনদৃশ্য ছিল অপূর্ব। দুজনের চোখে জল। সারদানন্দজী স্বামীজীর আদেশে ভারতে ফিরে এসে মিশনের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। এদিকে স্বামীজীও মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন। সেকথা বিস্তৃত-ভাবে জানিয়ে সারদানন্দজী চিঠি লিখলেন (৭ আগস্ট ১৯০২)ঃ "তাঁহার কার্য তিনি করিয়া চলিয়া গেলেন! এখন যেসকল কাজকর্ম আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি, রাখাল প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যাহাতে বজায় থাকে তাহার উপায় করিও।"

অভেদানন্দজীর সহপাঠী ছিলেন বাবুরাম মহারাজ। দুই সহপাঠীর বন্ধুত্ব ছিল গভীর। বাবুরাম মহারাজ অভেদানন্দজীকে আদর করে ডাকতেন 'কালুভায়া', 'কালুবীর' বলে। চিঠিতে থাকত এসব সম্বোধন। তিনি অভেদানন্দজীকে লিখেছেন (২৭ মার্চ ১৯১৭)ঃ "ভাই, তুমি কি কোন কালে কোন শরীরে ঠাকুর ও আমাদের ছাড়িতে পারিবে, না—আমরা এবং শ্রীশ্রীপ্রভু তোমায় ছাড়িবেন?... তুমি কুড়ি বৎসর প্রবাসে আছ বলে কি মনে কর, আমরা তোমার পর হয়ে গেলাম? ভায়া, বল দেখি, প্রাণ থেকে তুমি কী কোন কালে আমাদের পর করিতে পারিবে? অভিমান তো আপনার লোকের উপরই লোকে করে থাকে। তুমি আবার বিদেশে পড়ে আছ। আমি তোমায় সাদা সোজা সরল কথায় লিখিতেছি—তোমায় এখানে কেহ পর ভাবে না। সেই পূর্বের মতোই আপনার বলে জানে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়া, হরি ভায়া, তারকদা, শরৎ, খোকা, গঙ্গা সবাই তোমায় আমাদের ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বলেই ভালবাসে। আমাদের আর এই জগতে আপনার বলিতে কে আছে দাদা?"

তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে অভেদানন্দজী একত্রে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেছেন। দুজনেই সার্থক বেদান্ত-প্রচারক। তুরীয়ানন্দজী ভারতে ফিরে এলেও অভেদানন্দজী রইলেন পাশ্চাত্যে। তুরীয়ানন্দজী এক পত্রে (৩১ জুলাই ১৯১২) প্রিয় গুরুভাইকে লিখলেনঃ

"প্রিয় ভাই স্বামী অভেদানন্দ,

অনুগ্রহ করে তুমি যে বই-এর প্যাকেটটি পাঠিয়েছ তা পেয়েছি। সর্বান্তঃকরণে এজন্যে তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি এভাবে যে আমাকে স্মরণ করেছ, তাতে আমার ওপর তোমার ভালবাসা আছে তার নিদর্শনই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য আমি তোমাকে এতদিন কিছু লিখিনি, কিন্তু তার জন্যে তোমার কুশল-সংবাদ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইনি। আর সত্য বলতে কি, আমি পূর্বেকার মতোই এখনো তোমার আমেরিকার কাজের ওপর অনুরাগী রয়েছি।"

অদ্ভুতানন্দজীর সঙ্গে অভেদানন্দজী বেশ মজা করতেন। অদ্ভুতানন্দজী বিদেশ থেকে ঘড়ি ও পাগড়ি চেয়েছিলেন

অভেদানন্দজীর কাছে। মজা করে অভেদানন্দজী পাঠিয়ে দিলেন র‍্যাটল সাপের একটা লেজ। তা পেয়ে অদ্ভুতানন্দজী রাগ করে ভক্তদের বললেন : "দেখ না কালীর কি বেপার। আমি বললাম তাকে ঘড়ি আর পাগড়ি পাঠাতে, আর সে পাঠাল কিনা আমায় একটা সাপের লেজ? এ তো ভারি কথা গো।" এর রহস্য অভেদানন্দজী পরে বলেছিলেন : "আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে এরকম হাসি-ঠাট্টা-তামাসা প্রায়ই চলত। এটা ভালবাসার লক্ষণ।"

অদ্ভুতানন্দজী কালী মহারাজের কাছ থেকে চিঠি না পেলে উতলা হতেন। তাঁর এরকম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় একটি চিঠিতে (৭ ডিসেম্বর ১৯১০) : "ভাই কালী, ইতিপূর্বে আমি তোমায় ৫/৬ খানি পত্র দিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একখানিরও জবাব তুমি অদ্যাপি দিলে না। এত দীর্ঘকাল তোমার কোন পত্রাদি না পাওয়ায় বিশেষ ভাবিত আছি। কারণ, একা তোমাকে চারিদিকে প্রচারকার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে বিলাতে (লণ্ডনে) আসা-যাওয়া করিতে হয়। এত পরিশ্রম সত্ত্বেও তোমার শরীর কেমন আছে এবং কিরূপ উৎসাহের সহিত কার্যের প্রসার করিতেছ তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। আশা করি তুমি ভালই থাক, কিন্তু অবসর পাইলে আমাদের আগেকার ভালবাসার ও একত্রে সকলে থাকার আনন্দের দিন স্মরণ করিয়া আমাদের খোঁজ-খবর লইও। একেবারে আমাদের কথা ভুলিয়া থাকা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তুমি আমার বহু বহু নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে।"

অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে কালী মহারাজের ছিল বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক। কালী মহারাজ নিজেই বলেছেন : "গঙ্গাধর মহারাজ আমায় খুব মানত। প্রায়ই চিঠি দিত। শেষ পর্যন্ত ও আমায় চিঠি দিয়েছে। সে স্বামীজীকে খুব ভক্তি করত। স্বামীজীও (বিবেকানন্দ) আবার তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।" ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বিজয়ার চিঠিতে অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন : "বহুকাল হইল তোমার পত্র পাই নাই। আজ এই পত্রে তোমাকে আমাদের সকলের শ্রীশ্রীবিজয়ার নমস্কার, কোলাকুলি ও ভালবাসা জানাইতেছি।... ভাই, যতই সেদেশে কাজে ব্যস্ত থাক, একবার একবার আমাদিগকে মনে করিও, একেবারে ভুলিয়া থাকিও না। একেই তো তুমি ঐ দেশে এক যুগের ওপর আছ। এখন মনে হয় যেন তুমি ঐ দেশেরই। তোমার কুশল সমাচার দিয়া সুখী করিও।"

রামকৃষ্ণানন্দজীর সঙ্গে কালী মহারাজের দীর্ঘ পত্রালাপ হতো। তিনি মঠের সব খবর দিতেন অভেদানন্দজীকে। রামকৃষ্ণানন্দজীর একটি পত্রে আছে (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) : "নরেন তো কার্য হইতে অবসর লইয়াছেন। এখন তোমরাই তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছ।... পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দজীউর তুমিই উপযুক্ত গুরুভাই—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমি ইহাতে যে কত আনন্দিত তাহা তোমায় বলিয়া কি জানাইব।"

আমেরিকায় থাকাকালীন অভেদানন্দজী একবার (১৯০৬ সালে) ভারতে এসেছিলেন। সেসময়ে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে কলম্বোতে অভ্যর্থনা জানান। তিনি কালী মহারাজকে নিয়ে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেওয়ান। শশী মহারাজের অনুরোধে মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোর মঠের নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন অভেদানন্দজী। তিনি যখন আমেরিকার পাট চুকিয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন গুরুভাইদের সান্নিধ্যে, তখন অনেক গুরুভাই আর শরীরে নেই—বুড়োগোপাল মহারাজ, শশী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং লাটু মহারাজ। মাত্র কয়েকজন গুরুভাই রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হলেন অভেদানন্দজী। শিবানন্দজীর সঙ্গে তিনি গেলেন পূর্ববঙ্গে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহে দুই গুরুভাইয়ের আগমনে ভক্তেরা প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন।

অভেদানন্দজী বেলুড় মঠে না থেকে বেদান্ত-প্রচারের জন্য কলকাতায় এলেন। নিজের ভাবে বেদান্ত সমিতি গড়লেন। সেখানেই থাকতেন তিনি। অভেদানন্দজী এভাবে বেদান্ত সমিতিতে স্বাধীনভাবে নিজের কার্য শুরু করেছিলেন, কিন্তু গুরুভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুর। শিবানন্দজী, সারদানন্দজী প্রমুখ যেতেন তাঁর কাছে। আর অভেদানন্দজী যেতেন বেলুড় মঠে—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে। তিনি বক্তৃতাদিও দিতেন সেখানে। প্রিয় গুরুভাই ব্রহ্মানন্দজীর মহাপ্রয়াণে কালী মহারাজ ছুটে গিয়েছিলেন বলরাম মন্দিরে শেষ প্রণতি জানাতে। সারদানন্দজীর মহাসমাধিতে কালী মহারাজ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন বেলুড় মঠে। সৎকারকার্য সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন। সারদানন্দজীর ভাণ্ডারার দিন তিনি গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে। কলকাতার নাগরিকগণ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য অ্যালবার্ট হল-এ স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন অভেদানন্দজী।

সারদানন্দজীর মহাসমাধিতে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন দুই গুরুভাই—শিবানন্দজী ও অভেদানন্দজী। শোক সামলে উঠে শিবানন্দজী স্বামীজীর প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বাস্তবরূপ দিতে প্রয়াসী হলেন। শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন—ঠিক হলো। সেই পুণ্যদিন ১৩ মার্চ ১৯২৯। ঐদিনটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি। শুভকার্যে উপস্থিত ছিলেন অভেদানন্দজী ও তাঁর আরো দুজন গুরুভাই—স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ও মাস্টার মহাশয়।

অভেদানন্দজী সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দজী একবার বলেছিলেন ঃ "কালী যখন তার বাইরের কাজ কমিয়ে দেবে, তখনই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ লোকে বুঝতে পারবে।" ব্রহ্মানন্দজীর এই কথা প্রতিফলিত হয়েছিল অভেদানন্দজীর জীবনের শেষ পর্বে। অভেদানন্দজী তখন গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত। অধ্যাত্মপিপাসুদের মধ্যে অকাতরে তিনি বিলিয়েছেন মহামন্ত্র।

এদিকে শিবানন্দজী রোগশয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুভাইকে দেখে এলেন অভেদানন্দজী। ইহজগতে দুই গুরুভাইয়ের এই শেষ মিলন। এর একদিন পরেই (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) শিবানন্দজীর মহাসমাধিলাভ হলো। ছুটে এলেন অভেদানন্দজী বেলুড় মঠে। তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতাকে মালা পরালেন, দুপাশে রাখলেন ফুলের তোড়া। দুহাতে পুষ্প নিয়ে ভাগবতের 'বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্' শ্লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে প্রণাম করলেন। অ্যালবার্ট হল-এর স্মৃতিসভায় অভেদানন্দজী শিবানন্দজীর স্মৃতিচারণ করলেন।

অখণ্ডানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি কলকাতায় সমিতিভবনে এসে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয় গুরুভাই অভেদানন্দজীকে। মাত্র বছর তিনেক পরে অখণ্ডানন্দজীও চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে। অভেদানন্দজী চোখের জলে শেষ বিদায় জানালেন অখণ্ডানন্দজীকে। গলায় মালা পরিয়ে দিলেন তিনি। চিতাতে অগ্নিপ্রদানের পর অভেদানন্দজী বেলুড় মঠ থেকে ফিরে এলেন সমিতিতে। কলকাতায় অখণ্ডানন্দজীর এক স্মৃতিসভায় তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতার স্মৃতিচারণ করলেন ঃ "তার খুব প্রীতির ভাব ছিল। গুরুভাইদের সঙ্গে তার যেমন প্রীতি ছিল অমন প্রায় দেখা যায় না।... সে স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল।... দেখ না, স্বামীজী বিলেত থেকে তাঁকে চিঠি দিলে, তুমি গরিবদের জন্যে কিছু কর। তাই সে সারগাছি গ্রামে গিয়ে গরিবদের জন্য আশ্রম করে সারাজীবন ওখানে পড়ে থাকল, আমার সঙ্গে তার খুব প্রীতি ছিল, মাঝে মাঝে পত্রাদি দিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে ছিল পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভালবাসা। এই ভালবাসা সত্যই বিস্ময়কর। কী সরলতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তিই না ছিলেন এঁরা! তাঁদের মধ্যে ছিল একই ধরনের সহজ-সরল কথা এবং আলাপ-আলোচনা। ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁদের সমান ব্যবহার। প্রত্যেকেই অনুভব করতেন নির্মল ভালবাসার সৌরভ। প্রত্যেকেই অভিন্নহৃদয় গুরুভাইদের কথা বলতে বলতে হয়ে উঠতেন উল্লসিত। এসময়ে তাঁদের মুখমণ্ডল হতো প্রদীপ্ত, চক্ষুযুগল করত ছলছল। শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন গুরুভ্রাতাদের এই প্রেম-ভালবাসার মাধ্যম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে কলকাতার টাউন হল-এ বসেছিল বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন (মার্চ ১৯৩৭)। এই সম্মেলনে অভেদানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে তিনিই বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে-হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তার শেষ শিখাটি ছিলেন অভেদানন্দজী। সেই শিখাও হলো নির্বাপিত। মর্ত্যধামে সেই শিখা মিলিত হলো অনন্ত শিখাময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাশিখায়। অভেদানন্দজী-শিখা চিরতরে চির আশ্রয় পেল অনন্তভাবগ্রাহী রামকৃষ্ণ-মহাশিখার চরণতলে।

"ওঁ শাস্ত্রজ্ঞায় প্রশান্তায় বেদান্তপ্রতিপাদিনে।
নমোঽস্ত্বভেদপাদায় জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্তয়ে ॥" ■

তথ্যসূত্র

১ History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission—Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, 1983
২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, ১৩৭৯
৩ ঐ, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, ১৩৮০
৪ জীবনকথা—স্বামী শঙ্করানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৩৫৩
৫ কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ—সঙ্কলন ঃ স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কুমারখালী, নদীয়া, ১৩৫০
৬ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৪
৭ ঐ, ২য় ভাগ, সম্পাদক—স্বামী শঙ্করানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৮৪
৮ মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৮১
৯ ঐ, ২য় ভাগ, ১ম সং, ১৯৮২
১০ ঐ, ৩য় ভাগ, ২য় নতুন সং, ১৩৯৩
১১ তীর্থরেণু—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫৪
১২ পত্রসঙ্কলন—স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫০
১৩ স্তোত্ররত্নাকর—স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫৬
১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৭১
১৫ মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭৭

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

রাশিয়ায় কয়েকদিন

স্বামী প্রমেয়ানন্দ*

মস্কো রামকৃষ্ণ সোসাইটি বেদান্ত সেন্টারের একটি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে আমার রাশিয়া যাওয়া। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আমাকে অনেক আগেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন। আমিও সানন্দে তা গ্রহণ করি। এই সুযোগে মস্কো ছাড়া রাশিয়ার আরো দু-একটি জায়গা দেখার সুযোগ হয়। রাশিয়াযাত্রায় আমার সঙ্গী ছিলেন ব্রহ্মচারী ভিক্টর (অমৃতচৈতন্য)। ভিক্টর একজন রাশিয়ান যুবক। মস্কো সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং ক্রমে তাঁদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষপর্যন্ত তিনি ত্যাগের পথ অবলম্বন করে বেলুড় মঠে এসে ব্রহ্মচারীরূপে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ভিক্টর সঙ্গে থাকায় আমার খুব সুবিধা হয়েছিল। বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে। কারণ, রাশিয়ানদের মধ্যে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। ভিক্টর নিজের মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজিও জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় একেবারে নতুন নয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ লিও তলস্তয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তাঁদের জীবন ও বাণী তাঁকে প্রভাবিত করেছিল—এটা তাঁর লেখায় স্পষ্ট। পরবর্তী কালেও রাশিয়ার বেশ কিছু পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেছেন এবং বর্তমানেও অনেকে করছেন। তাঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তবে রামকৃষ্ণ মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে রাশিয়ায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তথা বেদান্ত প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয় বলতে গেলে আজ থেকে ২০-২২ বছর আগে। কমিউনিস্ট শাসনাধীন রাশিয়ায় তখন ধর্ম ছিল নিষিদ্ধ। তাদের শাসনের অবসানের পর ধর্ম আবার পুরোদমে সমাজজীবনে ফিরে আসে।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া সরকার ধর্মবিষয়ক একটি আইন পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেন। সেই আইন অনুযায়ী, যেসকল ধর্মীয় সংগঠনের ওদেশে অবস্থান কুড়ি বছরের কম, তারা কোনপ্রকার ধর্মপ্রচার, প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বা পুস্তকাদি প্রকাশ করতে পারবে না। পারবে তখনি যখন তাদের অবস্থানের কুড়ি বছর পূর্ণ হবে। ফলে শুধু চারটি ধর্ম—অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম, ইহুদিধর্ম, ইসলামধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম সরকারিভাবে স্বীকৃতিলাভ করল। হিন্দুধর্ম সরকারিভাবে রাশিয়ায় স্বীকৃত নয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা সুযোগ এসে গেল। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'একাডেমি অফ সায়েন্স' থেকে বারবার অনুরোধ এল তাদের দেশে একজন সন্ন্যাসীকে পাঠাতে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ইতোমধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে কয়েকবার সেদেশ ঘুরে এসেছেন। তিনিও রাশিয়াতে একজন সন্ন্যাসী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। শেষপর্যন্ত বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ একজন সন্ন্যাসীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা ও বেদান্ত ছাড়াও রাশিয়ানদের খুব শ্রদ্ধা তথা আগ্রহ এই প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত আয়ত্ত করার প্রতি। সোভিয়েত দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী জ্যোতীরূপানন্দকে রাশিয়ার কাজের জন্য মনোনীত করেন।

** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং প্রাক্তন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক।*

তদনুসারে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মস্কো পৌঁছান। তখন ডঃ রিবাকভ ছিলেন 'ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দকে সাময়িকভাবে মস্কোয় থাকার জন্য তিনি একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। প্রথমদিকে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দকে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তাঁর প্রাত্যহিক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোই কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, কারো সঙ্গে কোন পরিচয়ও নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রাক্তন ছাত্র এইসময় মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করতেন। তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। সময়মতো তাঁর সহায়তা না পেলে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দকে হয়তো অধিকতর কঠিন সমস্যায় পড়তে হতো। ক্রমে ভারতীয় ধর্মজীবনে আকৃষ্ট রাশিয়ান বন্ধুরাও এগিয়ে এলেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় একটি শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কেন্দ্র গড়ে উঠল। কিন্তু পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূল না থাকায় ছয়মাস পূর্ণ হতেই স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ইত্যবসরে আমাদের রাশিয়ান বন্ধু এবং অনুরাগীরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন। রাশিয়ার আইনকানুন বিদেশিদের পক্ষে এমনিতেই খুব অনুকূল ছিল না, তাও আবার ক্রমশ জটিলতর হতে লাগল। মস্কোতে ফিরে এসে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আরো দুবার বাসস্থান পরিবর্তন করলেন। ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দজী দুবার মস্কো ঘুরে গেছেন। ওখানে যেভাবে কাজ হচ্ছে তা দেখে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু স্বামী জ্যোতীরূপানন্দজীর বসবাসের অসুবিধা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করল। শেষপর্যন্ত তাঁরই অর্থানুকূল্যে মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে পর পর দুটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব হলো ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ মস্কোতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি স্থায়ী শাখাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর বহু চেষ্টায় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া সরকার কেন্দ্রটিকে একটি ধর্মীয় সংস্থারূপে অনুমোদন করলেন। প্রচারের কাজও নতুন অ্যাপার্টমেন্টে যথারীতি চলতে লাগল। কখনো মস্কো ইউনিভার্সিটি, কখনো ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের হল-এ, কখনো বা অন্যত্র স্বামী জ্যোতীরূপানন্দজী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বহু রাশিয়ান ছাত্রের আগ্রহে তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষারও একটি ক্লাস খুলতে হলো। ক্লাস হতো অ্যাপার্টমেন্টেই সপ্তাহে একদিন করে। এখনো তাই হয়। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দজীর প্রচারের পরিধিও ক্রমশ বাড়তে লাগল। রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে এবং লিথুয়ানিয়াতেও কয়েকবারই তিনি গেছেন আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে। মস্কো ছাড়া প্রতি মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গেও তিনি একবার করে যেতেন ওখানকার রামকৃষ্ণ সোসাইটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে।

এইভাবে মন্থর গতিতে রামকৃষ্ণ সোসাইটির কাজ যদিও নির্বাধায় চলতে লাগল, কিন্তু সমস্যা হলো স্থান সঙ্কুলান নিয়ে। স্বল্প-পরিসর অ্যাপার্টমেন্টে উৎসবাদিতে ভক্ত ও অনুরাগীদের স্থান সঙ্কুলান ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল। তাছাড়া থাকার একটি মাত্র ঘর। দ্বিতীয় কেউ এলে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই একটি বড় অ্যাপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হতে লাগল। শেষপর্যন্ত আমাদের ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার কয়েকটি কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব হলো। আর এই অ্যাপার্টমেন্টের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যেই আমার রাশিয়া যাওয়া।

মস্কোগামী 'এরোফ্ল্যাট' বিমান দিল্লি থেকে ছাড়বে ভোর পাঁচটায়। তাই আমরা রাত দেড়টা নাগাদ (শুক্রবার, ৫ নভেম্বর ২০০৪) দিল্লি আশ্রম থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিই। দিল্লি আশ্রমের দুজন তরুণ সন্ন্যাসী বিমানবন্দরে আমাদের ছাড়তে এসেছেন। তাঁদের ব্যবস্থাপনায় একজন বিমানকর্মী আমাদের পাশপোর্ট পরীক্ষা করানো ইত্যাদি নিয়মানুযায়ী যা যা করণীয় অল্পসময়ের মধ্যেই সব করিয়ে দিলেন। কাজেই আমাদের কোন হাঙ্গামাই পোহাতে হলো না। বিমান অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা পরে ছাড়ল। বিমানে দিল্লি থেকে মস্কো যেতে ৬ ঘণ্টার একটু বেশি সময় লাগে। ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে আমাদের বিমান মস্কো বিমানবন্দরে অবতরণ করল। তখন স্থানীয় সময় ৯টা ৪০ মিনিট এবং তাপমাত্রা ৩° সেলসিয়াস। বিমান থেকে নেমে অভিবাসন (Immigration) ও শুল্ক বিভাগের (Customs) বেষ্টনী পার হতে কোন অসুবিধা হলো না। মালপত্র নিয়ে যথাসময়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমাদের স্বাগত জানাতে বাইরে তখন অপেক্ষা করছিলেন , স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, বেদান্ত সেন্টারের সেক্রেটারি লিলিয়ানা, আশ্রমের জনৈক ঘনিষ্ঠ ভক্ত রীণা দাস এবং আলেকজাণ্ডার। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমরা সোজা চলে এলাম আশ্রমের নতুন অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে। দুদিন পরে এই অ্যাপার্টমেন্টেরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। বিমানবন্দর থেকে এখানে আসতে আধঘণ্টার একটু বেশি সময় লাগল। অ্যাপার্টমেন্টটিকে নিজেদের প্রয়োজনমতো রূপ দেওয়ার কাজ তখনো শেষ

হয়নি। এখানে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টেরও বাইরে বা ভিতরে কোন অদল-বদল করতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। সে আবার একাধিক বিভাগের অনুমতিসাপেক্ষ। এখানে বিদেশিদের ক্ষেত্রে আইনের কড়াকড়িও খুব বেশি।

রাশিয়া দেশটি দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এক সুকঠিন নিয়মকানুনের নিগড়ে। । সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান ছিল না। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই শাসনের অবসান ঘটে এবং তখন থেকে একটা মুক্ত বাতাস নীতির হাওয়া বইতে শুরু করে। দেশের মানুষও যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তবে সবকিছুরই ভাল এবং মন্দ দুটি দিক আছে। ফলে নতুন নীতির ইতিবাচক বহু সুফলের সঙ্গে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাবও যে এসে গেছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। সরকারি দপ্তরগুলির কাজকর্মেও আগের মতো তৎপরতার পরিবর্তে অজান্তেই কিছুটা শিথিলতা এসেছে।

যাই হোক, অ্যাপার্টমেণ্টে এসে দেখি প্রায় ৮-১০ জন পুরুষ ও মহিলা নতুন অ্যাপার্টমেণ্টটিকে প্রয়োজনীয় রূপ দেওয়ার জন্য অতি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের দেখে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, এঁরা বোধহয় কোন ঠিকাদারের কর্মী। কিন্তু পরে আমার ভুল ভাঙল। জানতে পারলাম এঁরা সকলেই আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী এবং অনুরাগী ভক্ত। স্বেচ্ছায় এই কাজ করছেন। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ কাজের ব্যাপারে তাঁদের আরো কিছু নির্দেশ দিলেন। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা পুরনো আশ্রমে এলাম। নতুন আশ্রম থেকে এখানে আসতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। পুরনো আশ্রমটি একটি বহুতল বাড়ির নিচের তলায় তিন কামরাযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অ্যাপার্টমেণ্ট। তার একটি কামরায় ঠাকুরঘর। অপর একখানি স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের থাকার জন্য। এই ঘরেই তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। আবার তাঁর কাছে যারা সংস্কৃত পড়তে আসে, তাদের ক্লাসও নেন। তৃতীয় ঘরখানি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন হলে শোয়ারও ব্যবস্থা আছে। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। অপর ঘরখানিতে থাকলেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ এবং ব্রহ্মচারী ভিক্টর। সেদিন প্রায় আড়াইটা নাগাদ দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। সন্ধ্যা সাতটায় ঠাকুরঘরে প্রার্থনাদি হলো। সন্ধ্যার পর সুদেষ্ণা তাঁর স্বামী নীতিন এবং ছেলেকে নিয়ে আশ্রমে এসেছিলেন। চমৎকার ভক্ত-পরিবার। তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো।

পরদিন ৬ নভেম্বর, শনিবার সকালে ঠাকুরঘরে প্রার্থনাদির পর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আমরা তৈরি হয়ে থাকলাম। আজ সমস্ত দিনই বাইরে থাকতে হবে। যথাসময়ে রক্তিম দাস তাঁর গাড়ি নিয়ে এলেন। রক্তিম, তাঁর স্ত্রী রীণা এবং একমাত্র মেয়ে চৈতিকে নিয়ে তাঁদের সংসার। রীণা গতকাল আমাদের স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরেও গিয়েছিলেন। রক্তিম বাংলাদেশের চট্টগ্রামের লোক, মস্কোতে ব্যবসা করেন। রীণাও একটি রুশ সংস্থায় কর্মরতা। চৈতি এখনো স্কুলের ছাত্রী। রীণা পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। এই পরিবারটি স্বামী . জ্যোতীরূপানন্দকে তাঁর কাজে প্রয়োজনমতো সবরকমের সাহায্য করেন। রক্তিমের সঙ্গে প্রথমে আমরা কাছাকাছি একটি বাজারে গেলাম। নতুন আশ্রমের জন্য কিছু জিনিসপত্রের ফরমাশ দেওয়া ছিল। সেগুলি সংগ্রহ করে আমরা ক্রেমলিনে আসি। লাল রঙের ইঁটের প্রাচীর ও বহু টাওয়ারে সুরক্ষিত ক্রেমলিন রাশিয়ার ধর্ম ও রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—দেশের বহু উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী। ক্রেমলিনের ভিতরে রয়েছে অনেকগুলি গির্জা এবং ক্যাথিড্রাল। সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরগুলিও আছে এর ভিতরে। ক্রেমলিনের প্রাচীরের ঠিক বাইরে রেড স্কোয়ারে লেনিনের সমাধিস্থল। তাঁর দেহ সেখানে সংরক্ষিত। আজও তাঁকে দেখার জন্য মানুষের আগ্রহের শেষ নেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্রেমলিন ও রেড স্কোয়ার দেখে আমরা সোজা রক্তিমদের বাড়িতে আসি। দুপুরে তাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর পূর্বব্যবস্থামতো ডলফিনের খেলা দেখাতে রক্তিম আমাদের একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন। এক ঘণ্টা ধরে চমৎকার সব মজার মজার খেলা। বেশ ভালো লাগল। 'ডলফিন শো' দেখে রক্তিমের গাড়িতেই আমরা নতুন অ্যাপার্টমেণ্টে এলাম। তখন ওখানে শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে পুরোদমে। আজ রাতের মধ্যেই সমস্ত কাজ সারতে হবে। কাল .সকালেই উদ্বোধন। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ এই ব্যাপারে তাঁদের যথাযথ পরামর্শ দেওয়ার পর আমরা পুরনো আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হই। সেদিন রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট ছিল। কলকাতার যানজটের কথা মনে পড়ে গেল। তবে দুটোর মধ্যে তফাত আছে। কলকাতার যানজটের সঙ্গে থাকে হর্ণের অবিরাম আওয়াজ, কে আগে যাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখানে ওসব নেই। সকলেই লাইন ধরে চুপচাপ নিজের গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত রাত ৯টায় আমরা আশ্রমে পৌঁছালাম।

৭ নভেম্বর, রবিবার নতুন আশ্রম অ্যাপার্টমেন্টের উদ্বোধন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হবে। আজ থেকে আমাদের নতুন অ্যাপার্টমেন্টে থাকা। তাই সকাল সকাল স্নান সেরে সাড়ে সাতটা নাগাদ জিনিসপত্র নিয়ে নতুন আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওখানে পৌঁছে দেখি বেশ কিছু ভক্ত ইতোমধ্যেই এসে পড়েছেন। সাজানো-গোছানোর কাজও মোটামুটি হয়ে গেছে। নতুন অ্যাপার্টমেন্টটি পুরনোটির তুলনায় বেশ বড়। আলো-হাওয়াও বেশি। পুরনো আশ্রমে ছিল ঠাকুরঘর-সহ তিনটি ঘর। এখানে ঠাকুরঘর-সহ চারটি। ঘরগুলিও তুলনামূলকভাবে বড়। এই অ্যাপার্টমেন্টটি চোদ্দতলা একটি বাড়ির পাঁচতলার এক প্রান্তে। ঘর থেকে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। তাছাড়া দালানেও বেশ কিছুটা জায়গা আছে।

মস্কোর নতুন আশ্রমের ঠাকুরঘরে বিশেষ পূজার পর

সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি আমাকে করতে হলো। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ যখন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তখনি বলে রেখেছিলেন ঃ "নতুন অ্যাপার্টমেন্টের শুভ উদ্বোধনের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা তোমাকে করতে হবে।" বহু বছর আমি নিজের হাতে পূজা করিনি। অনভ্যাসের ফলে মুদ্রাদিও প্রায় ভুলে গেছি। তাই ঠিক সাহস হচ্ছিল না। আমার এই মনোভাবের কথা চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ "প্রয়োজন হলে পূজায় আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু পূজা তোমাকেই করতে হবে। এটা আমাদের সকলের ইচ্ছা।" কাজেই রাজি হওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তাই ঠিক করলাম, করতেই যখন হবে তখন মস্কো যাওয়ার আগেই পূজাটা আবার সড়গড় করে ফেলি। করলামও তাই। তাছাড়া অন্য একটি কারণও ছিল। আমি দেখলাম, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ যদি পূজার কাজে আটকে পড়েন, তাহলে অনুষ্ঠানের অন্যান্য কাজগুলি পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাতে নানা অসুবিধা হবে। তাই আমি ব্রহ্মচারী ভিক্টরকে সঙ্গে রেখে পূজায় বসলাম। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ভক্তদের নিয়ে পূজার নৈবেদ্য তৈরি, ভোগ রান্না ইত্যাদি কাজে লেগে গেলেন। সাহায্যকারী ভক্তদের অনেকেই রাশিয়ান। কী নিষ্ঠা সহকারেই না তাঁরা সব কাজ করছিলেন! সেদিন সকালের অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০-৫৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রিভাকভ এবং অধ্যাপক ডঃ মার্ক মুকুলস্কি। তাঁরা দুজনেই ঠাকুরের ভক্ত। পূজা ও ভোগারতির পর দুপুরে উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পেলেন। সন্ধ্যায়ও আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ এবং আরতি হয়। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানেও প্রায় ৩০-৩৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলকে পেটভরে প্রসাদ খাওয়ানো হলো। সমস্ত দিনই অ্যাপার্টমেন্টে যেন একটি উৎসব-আনন্দের হাওয়া বইছিল। অনুষ্ঠানে যোগদান করতে মস্কো ছাড়া সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকেও কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন। অনুষ্ঠানাদি দেখে তাঁরা মাঝরাত্রের ট্রেন ধরে আবার সেন্ট পিটার্সবার্গ ফিরে যান।

মস্কোয় থাকাকালীন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ একদিন বিখ্যাত বলসয় থিয়েটারে অনুষ্ঠিত ব্যালে নৃত্য দেখাতে
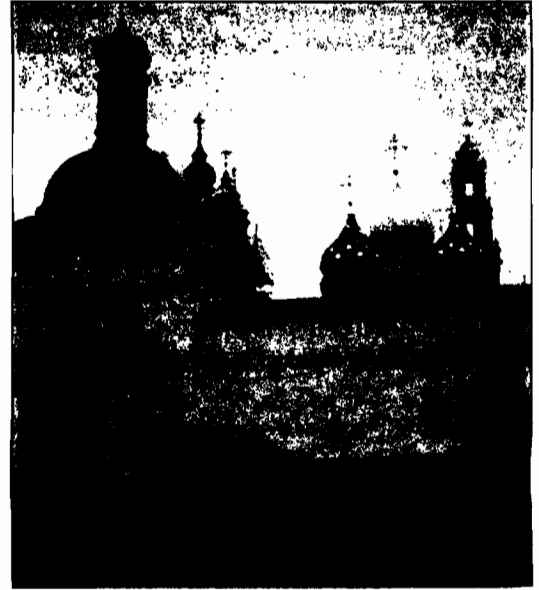
জাকর্স্কে সেন্ট সের্গিয়াস লাবরা

নিয়ে গিয়েছিলেন। একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে শিল্পীরা অতি দক্ষতার সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ করেছিলেন; যা যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল। আরেকদিন প্রসিদ্ধ রাশিয়ান সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম।

একদিন ব্রহ্মচারী ভিক্টর, লিলিয়ানা ও আলেকজাণ্ডার-সহ 'সের্গেই পাছাদ' (বর্তমান নাম 'জাকর্স্ক') যাই ওখানকার 'দি হোলি ট্রিনিটি—সেন্ট সের্গিয়াস লাবরা' দেখতে। এটি রাশিয়ার অর্থোডক্স খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের বৃহত্তম আবাসস্থল (Monastery)। মস্কো থেকে গাড়িতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় লাগে। রাশিয়ায় অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রভাব খুব বেশি। রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রভাব বা সমাদর একেবারে নেই বললেই চলে।

'সেন্ট সের্গিয়াস লাবরা' একটি অতি প্রাচীন মঠ। সেন্ট সের্গিয়েভ রাদনীজ ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের কাছে এটি অতি পবিত্র একটি তীর্থস্থান, তাই ভক্তসমাগম হয় প্রচুর। গির্জায় প্রার্থনা ও ধর্মীয় সঙ্গীতাদিও নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে এবং তাতে অনেক ভক্ত যোগদান করেন।

এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আমাদের একটি গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামটির নাম 'বারিনোভা'। মস্কো থেকে ২৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে। নিকটতম শহর ওখান থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ আগেই আমাদের বলে রেখেছিলেন, বারিনোভা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই একটি গ্রাম। আধুনিক যুগের ব্যবস্থাদি ওখানে নেই। তাই শৌচাদিও অনেকটা গ্রামের মতো করেই সারতে হবে। গৃহস্বামী লোনিয়া, তাঁর স্ত্রী লেনা, একমাত্র ছেলে পাশা এবং লোনিয়ার মাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার।

রাশিয়ার কিছুটা অংশ পড়েছে ইউরোপে এবং কিছুটা এশিয়ায়। আগের সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আর নেই, ভেঙে গেছে। তাই মানচিত্রও বদলে গেছে। এখন কেবল একুশটি রাজ্য নিয়ে বর্তমান রাশিয়া। সরকারি নাম 'রাশিয়ান ফেডারেশন'। পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-অংশ এশিয়ায় পড়েছে, যেমন—কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাশিয়ানদের পছন্দ করে না। ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের যেমন অবস্থা হয়েছিল, অনেকটা সেরকম। তাই বাধ্য হয়ে রাশিয়ানরা অনেকে ফেডারেশনে চলে আসে। ফেডারেশন সরকারও তাতে বাধা দেয়নি। কাজেই অনেক রাশিয়ানই ওসব দেশ থেকে এসে ফেডারেশনের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। লোনিয়ারাও এভাবেই উজবেকিস্তান থেকে এসেছেন। চাষ-আবাদই তাঁদের পেশা। গম, তরিতরকারির চাষ যেমন করেন, তেমন পশুপালনও করেন। তাতে সংসার চালানোর পক্ষে যথেষ্ট আয় হয়। বারিনোভা ১৫-২০টি বাড়ি নিয়ে ছোট একটি গ্রাম। শীতকালে তাপমাত্রা –৩৫° সেলসিয়াসে নামে।

লোনিয়া স্বামী জ্যোতীরূপানন্দকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। গরমের সময় কয়েকবারই তিনি তাঁদের বাড়িতে এসে কয়েকদিন করে কাটিয়ে গেছেন। পূর্বব্যবস্থানুযায়ী লোনিয়া তাঁর গাড়ি নিয়ে মস্কোতে আসেন। প্রাতরাশের পর স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, ব্রহ্মচারী ভিক্টর এবং লিলিয়ানা-সহ লোনিয়ার গাড়িতে আমরা বারিনোভার উদ্দেশে রওনা হলাম। পৌঁছাতে চার ঘণ্টার একটু বেশি সময় লাগল। শেষের ২-৩ কিলোমিটারে রাস্তা নেই বললেই চলে। তার আগে অবশ্য রাস্তা খুবই ভাল। মাঠের ওপর দিয়েই গাড়ি চলল। আমরা যে গ্রামে যাচ্ছি, সেকথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা। শেষপর্যন্ত আমরা লোনিয়াদের বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য লেনা এবং আরো কয়েকজন বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

লোনিয়াদের বাড়ির সামনে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, ব্রহ্মচারী ভিক্টর, লেখক, লেনা এবং লোনিয়া

লোনিয়াদের দুটি বাড়ি আছে। বাড়িদুটি প্রায় পাশাপাশি। একটিতে লোনিয়া, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এবং অপরটিতে তাঁর মা থাকেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন ছেলে বাড়িতে ছিল না। শহরে গেছে কোন দরকারি কাজে। আমাদের পেয়ে লোনিয়াদের কী আনন্দ! চোখে-মুখে সেই আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে। লোনিয়া বা লেনা কেউই রাশিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না, কিন্তু এখানে ভাষা মোটেই অন্তরায় নয়। হৃদয়ের ভাষা সকলেই বুঝতে পারে।

যাহোক, খাওয়া-দাওয়া হতে হতে প্রায় বিকাল সাড়ে ৩টা বেজে গেল। তারপর একটু বিশ্রাম। ওখানে বেশি

বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। একেবারে দূষণমুক্ত বায়ু। সামান্য বিশ্রামেই ক্লান্তিভাব কেটে যায়। রাস্তায় কিছুটা বেড়ানো হলো। বেড়াতে বেড়াতে যে-বাড়িতে তাঁদের মা থাকেন সেই বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। বয়স ৭৮, কিন্তু এখনো কর্মক্ষম। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

লোনিয়াদের বাড়িতে বৈঠকখানার মতো একটি ঘর আছে। তাতে একটি টেলিভিশন ও কিছু বইপত্র আছে। সেই ঘরেরই একটি টেবিলের ওপর ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ফটো বসানো আছে। সন্ধ্যায় আমরা সেখানে বসে প্রার্থনাদি করলাম। লোনিয়া এবং লেনাও আমাদের সঙ্গে বসলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা অবাক করার মতো। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যত ভজনের ক্যাসেট বেরিয়েছে, বোধহয় তার সবগুলিই তাঁরা সংগ্রহ করে রেখেছেন এবং অবসরমতো সেগুলি বাজিয়ে শোনেন। ঠাকুর সম্বন্ধে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের কাছে তাঁরা যেটুকু শুনেছেন তার অতিরিক্ত কিছু পড়াশোনা করেছেন বলে মনে হলো না, অথচ সব ঘরেই ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি রেখেছেন। ঠাকুর একসময় বলেছিলেন, তাঁর ছবি কালে ঘরে ঘরে পূজা হবে। লোনিয়াদের বাড়িতে এসে সেকথাই বারবার মনে হচ্ছিল।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর পূর্বব্যবস্থামতো পুরো বাড়িটা আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে লোনিয়ারা পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে থাকলেন। যাওয়ার আগে বাড়ির প্রতিটি দেওয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে তাঁরা দেখলেন, ঠিকমতো গরম আছে কিনা। যাতে আমাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট না হয় তা সুনিশ্চিত করে তবে তাঁরা শুতে গেলেন। পরদিন সকাল ১০টায় বারিনোভা থেকে রওনা হয়ে ২টা নাগাদ মস্কো পৌঁছালাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের নতুন ঠাকুরঘরে ঠাকুরের আরতি ও ফল-মিষ্টি ভোগ দেওয়া হলো। পরে সমবেত ভক্তদের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলো। লিলিয়ানা সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে দিলেন। প্রায় ৩০-৩৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। লক্ষণীয় যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন রাশিয়ান।

১৩ নভেম্বর স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও ব্রহ্মচারী ভিক্টর সহ ট্রেনে চেপে আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গ যাই। ট্রেন ছাড়ল রাত ১২টা ১০ মিনিটে। ট্রেনের ব্যবস্থা খুবই ভাল। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কামরা। পরদিন সকাল ৮টায় আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেশনে পৌঁছালাম। তখনো বেশ অন্ধকার। এই অঞ্চলটি খুব উত্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে ওখানে দিন-রাত্রির তফাত খুব বেশি। গ্রীষ্মকালে অনেক সময় প্রায় ২৪ ঘণ্টাই সূর্যের আলো থাকে। শীতকালে তার বিপরীত। আমরা শীতের শুরুতে গেছি। তখনই ১৫ ঘণ্টা রাত। যাই হোক, আশ্রমের সদস্য ইগর এবং লোধামিলা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে ইগরই আমাদের গাইড। আশ্রম স্টেশনের খুবই কাছে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম।

সেন্ট পিটার্সবার্গে আমাদের যে-আশ্রম আছে, সেটি বহুতল একটি বাড়ির একতলায় অবস্থিত একটি অ্যাপার্টমেন্ট। আগেই বলা হয়েছে, স্বামী ভব্যানন্দজীর অর্থানুকূল্যে এটি কেনা হয়েছে। আশ্রমে তিনটি ঘর আছে। একটি ঠাকুরঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, একটি স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের জন্য। তিনি যখন আসেন তখন এই ঘরে থাকেন। তৃতীয়টি আশ্রমের অফিস। আমরা আশ্রমে পৌঁছে স্নান ও প্রাতরাশ সেরে ইগরের সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

কমিউনিস্ট রাজত্বের সময় তদানীন্তন শাসকবর্গ সেন্ট পিটার্সবার্গ বদলে শহরটির নাম রাখেন 'লেনিনগ্রাদ'। তাদের শাসনের অবসান হলে নতুন সরকার শহরটির পুরনো নামটি অর্থাৎ সেন্ট পিটার্সবার্গই বহাল রাখেন। নেভা নদীর তীরে প্রাসাদ, বড় বড় উদ্যান ও স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। নদী, খাল ও বড় বড় উদ্যানে পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন এই শহরটি নানা দেশের পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় একটি পর্যটনক্ষেত্র। আমস্টারডামের মতো নদী ও খালগুলিতে মোটরলঞ্চে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। শহরের বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখাবার পর ইগর আমাদের প্যালেস স্কোয়ারে নিয়ে এলেন। এখানেই আছে প্রসিদ্ধ 'Winter Palace'। নেভা নদীর তীরে বিশাল এলাকা জুড়ে এই প্রাসাদ। আগে এটি ছিল সম্রাটদের আবাসস্থল, এখন 'আর্মিতাজ মিউজিয়াম' (Hermitage Museum)। এটি পৃথিবীর বিখ্যাত মিউজিয়ামগুলির অন্যতম। আমরা দুঘণ্টার মতো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ঠিকমতো দেখতে গেলে আরো অনেক বেশি সময় লাগে।

বিকালের দিকে আমরা 'পিটারগফ'-এ যাই। স্থানটি বাল্টিক সাগরের তীরে। যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। এখানে তৎকালীন জারদের অনেকগুলি বড় বড় প্রাসাদ আছে। প্রাসাদগুলি তাদের গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহৃত হতো বলে নাম 'Summer Palace'। আমরা যখন ওখানে পৌঁছেছি, তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসও বেশ জোর বইছে। একটু পরেই ছোট ছোট দানার মতো বরফ

পড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে এলাম। ততক্ষণে কয়েকজন ভক্ত আশ্রমে এসে গেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে যথারীতি প্রার্থনাদি হলো। আমরাও তাতে যোগ দিলাম। প্রার্থনাদির পর ঘরোয়াভাবে ভক্তদের কাছে কিছু বলতে হলো। তারপর কিছুক্ষণ চলল প্রশ্নোত্তরপর্ব। প্রায় ১৫-১৬ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতা লক্ষ্য করার মতো। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষ হলে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হলো। খাওয়ার পর রাতের ট্রেন ধরে আমরা মস্কো রওনা হলাম। ট্রেন সময়মতো ছাড়লেও পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে মস্কো পৌঁছাল। লিলিয়ানা ও আলেগ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বিকালে আমরা মস্কোর একটি বিশাল বাজার দেখতে যাই। কিছু কেনাকাটাও করা হলো।

প্যালেস স্কোয়ারে, পিছনে আর্মিতেজ মিউজিয়াম, সেন্ট পিটার্সবার্গ

১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। আমাদের দেশে ফেরার দিন। আজ আর বাইরে কোথাও যাইনি। ফেরার পথে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দও আমাদের সঙ্গে যাবেন। দুমাসের জন্য দেশে যাচ্ছেন। সকালের দিকে কয়েকজন ভক্ত দেখা করতে এলেন। সকলে মিলে দুপুরে খাওয়া হলো। বিকাল ৪টায় আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। লিলিয়ানা আমাদের বিদায় জানাতে বিমানবন্দর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। বিমান স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে ছাড়ল। পরদিন সকাল ৩টা ২০ মিনিটে বিমান নির্বিঘ্নে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করল। দেশে ফিরে এলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম এক নতুন দেশ দেখার আনন্দ-স্মৃতি এবং সেদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

রাশিয়াতে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলছে গত ১৩ বছর ধরে। বিদেশে সংগঠনের কাজ খুব একটা সহজ নয়। তার ওপর বিদেশি ধর্মসংস্থাগুলির বৃদ্ধিতে ওখানকার সরকারও বেশ উদ্বিগ্ন। ওদেশের প্রধান ধর্ম অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের কাছেও বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলির অবস্থান কাম্য নয়। এঁদের তাঁরা সুনজরে দেখেন না, বরং এঁদের উপস্থিতি তাঁদের কাছে অস্বস্তিকর। তাই বিদেশি ধর্মীয় সংস্থাগুলির অবস্থানকে মন থেকে মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন। বেদান্ত বা শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ও স্বচ্ছ ধর্মীয় ভাবধারা যে তাঁদের ধর্ম বা জাতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক—এটা বুঝতে পারেন না বা বোঝবার মতো মানসিকতাও তাঁদের নেই। তবে এমন অনেক মুক্তমনের রাশিয়ান আছেন, এবিষয়ে যাঁদের ধারণা খুবই স্পষ্ট। তাঁদের চিন্তাধারা ও আগ্রহ সত্যিই প্রশংসনীয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসীকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। এটা তাঁদের কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। তাঁদের সশ্রদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ও অন্তরের অভাব পূরণের জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একজন সন্ন্যাসীকে তাঁদের জন্য প্রেরণ করেছেন। এজন্য যে তাঁরা কৃতজ্ঞ—এটা তাঁদের কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা যায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা ধীরে ধীরে ব্যাপ্তিলাভ করছে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে। বিশাল রুশ দেশের শহরে শহরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রচুর সমাদর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর লেখা গ্রন্থগুলি এবং 'কথামৃত'-এর ক্ষুদ্র সংস্করণ মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ, সামারা প্রভৃতি শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। কেননা সাহিত্য প্রচারের অন্যতম বাহন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কৃতবিদ্য রাশিয়ানরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে থাকেন। সরকারি বিধি-নিষেধ শিথিল হলে ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের পরিধি যে ক্রমেই ব্যাপ্তিলাভ করবে, এটা নিশ্চিত।■

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের। —সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র দত্ত

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'যুগজননী সারদা' গ্রন্থের 'পত্রাবলী' অংশে হেমচন্দ্র দত্তকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের ছয়টি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি পত্রের প্রারম্ভে 'হেমচন্দ্র দত্তকে লিখিত' কথাটি লেখা থাকলেও প্রথম পত্রের পাদটিকায় তাঁর নাম 'হেমচন্দ্র ঘোষ' হয়ে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটি মুদ্রণপ্রমাদ।

হেমচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর মুখ থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদিপর্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারই কিছুটা 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন করছি। আশা করি ভাল লাগবে।

হেমচন্দ্র দত্ত বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা-র মানিকগঞ্জ জেলার খেরুপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৩ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ—এই দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীশ্রীমাকে তিনি জয়রামবাটি, কামারপুকুর ও কলকাতায় দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অকৃতদার হেমচন্দ্রবাবুর ছাত্র ছিলেন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ এবং স্বামী অজয়ানন্দ। ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর জানিয়েছেন, বেলুড় বিদ্যামন্দিরে পাঠকালে তিনি তেজসানন্দজীর কাছে তাঁর 'আদর্শ শিক্ষক' হেমচন্দ্র দত্তের কথা শুনেছিলেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হলে তেজসানন্দজী পত্রযোগে জানিয়েছিলেন ঃ "এ মৃত্যু মুনি-ঋষির কাম্য। আমরা আশ্চর্য হইনি, কারণ তিনি মায়ের আশ্রিত সন্তান ছিলেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেহরক্ষার দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি নিজের হাতে যাতায়াতের রাস্তাটি পরিষ্কার করে তাতে কামিনী ফুল বিছিয়ে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, তিনি বসে রয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। হয়তো তিনি সেদিন তাঁর ইষ্টদেবের আসার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

জেঠামশাইয়ের মুখ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের কিছু কথা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি একদা বলেছিলেন ঃ "মনে পড়ে মায়ের কাছাকাছি থাকা যাবে বলে একসময় কল্‌কাতায় শিক্ষকতার চাকরি সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। তখন আমার পরনে সাহেবি পোশাক, মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় ঢুকে মুরগির মাংস খাওয়া। একদিন রাসবিহারী মহারাজ এই মুরগির মাংস খাওয়া নিয়ে মায়ের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। মা কিন্তু নালিশটা কানেই তুললেন না। রাসবিহারী মহারাজের কেবল একই কথার পুনরাবৃত্তি। ওদিকে মা আপন কাজে ব্যস্ত। শেষে মহারাজ বলেই ফেললেন, 'হেমকে এখানে আসতে নিষেধ করে দিও।' এবারে বিস্ফোরণ! মা তীব্র স্বরে বললেন, 'আমার ছেলের ইহকাল-পরকালের ভার আমার। তা নিয়ে রাসবিহারীর এত মাথাব্যথা কেন?' মায়ের বাড়ি গিয়ে সমস্তই শুনলাম। তারপরই সাহেবি পোশাক, মুরগির মাংস সমস্ত ত্যাগ। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্রের সন্ধ্যাবেলা মা আমাকে কৃপা করে তিনটি বর দিয়েছিলেন।

"১৯৫৩-১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মায়ের আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সারগাছি আশ্রমে বিরাট আয়োজন। প্রেমেশানন্দজীর অভিপ্রায় অনুসারে সেবছর একদিনের জনসভার প্রধান বক্তার ভার আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

"শেষজীবনে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলাম—'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ'। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রেমেশানন্দজী। ভূমিকাটির একস্থানে ছিল, 'এই পুস্তকখানিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এমন কিছু নতুন তথ্য আছে, যা অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশ হয়নি।' দুঃখের কথা, বইখানি একজন প্রকাশকের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বশেষ ফটোখানা দেখা হলো। তার-পর থেকে সর্বদা মায়ের ডাক শুনতে পাই—এবার ফিরে চল।"

মিহিরকান্তি দত্ত
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

প্রসঙ্গ ঃ আচার্য বিনোবা ভাবে

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যায় 'আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত আচার্য বিনোবা ভাবে' আমার লেখার ওপর গত কার্তিক ১৪১১ সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধকুমার মাহাত-র দুটি মন্তব্য পড়ার সুযোগ হলো অনেক দেরিতে—দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার জন্য। আমার তথ্যগত ভুল লেখা—"কাশীতেই গান্ধীজীর সঙ্গে বিনোবা ভাবের দেখা হয়েছিল" তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। নিজের অজ্ঞাতসারে ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিনোবাজী কাশীতে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রালাপ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন আমেদাবাদের কচরব আশ্রমে। এপ্রসঙ্গে প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করছি ঃ "He wrote to Gandhiji from Benaras and received a prompt reply. He wrote again. Gandhiji wrote back to him, inviting him to meet him in Ahmedabad.... On 7th June 1916, he went to Gandhiji's Kochrab Ashram in Ahmedabad."

আমার দ্বিতীয় তথ্য ঃ "কাশীতেই তিনি বেদ, গীতা, উপনিষদ্‌, পুরাণ আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে নেন।"—এর সমর্থনে তাঁর মন্তব্যের উত্তরে জানাই, প্রকাশ-প্রচারে বিমুখ বিনোবাজী কোন আত্মজীবনী লেখেননি। তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে তিনি যে-গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন সে-গ্রন্থটি 'Biography' হতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 'Autobiography' নয়।

বেসান্ট নারকলকার শুরু থেকেই ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিনোবাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। আত্মজীবনী না লিখলেও বিনোবাজী সময় সময় তাঁর জীবনের ঘটনাবলি ব্যক্ত করেছিলেন ঘনিষ্ঠ মহলে।

মুম্বাইয়ের 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' প্রকাশিত বেসান্ট নারকলকারের 'The Creed of Saint Vinoba' গ্রন্থে বিনোবাজীর বিভিন্ন সময়ের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিনোবাজী সম্বন্ধে তাঁর লিখিত গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থটির ১৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ "Benaras alias Kashi was the holy city, the seat of sacred love where learned pundits from all over India assembled and studied the scripture.... Vinoba who now wanted to study Hindu scriptures had to make a start from the beginning. For at school, at the instance of his father who intended to send him to Europe for higher technical education, he had taken French in lieu of Sanskrit, as his second language. He, therefore now started taking lessons in Sanskrit."

তাপসশঙ্কর দত্ত
প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮ ০০৪

বিনীত প্রস্তাব

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকৌশিক দাশগুপ্তের 'বেদান্ত দর্শনের আলোকে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। এই ধরনের প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ উপহার দেওয়ার জন্য তাঁকে এবং সম্পাদক মহারাজকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেইসঙ্গে দুটি অনুরোধ রাখছি—(১) প্রতি সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী প্রথম থেকে শুরু করে কিছু অংশ এবং শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে কিছু অংশ দেওয়া হোক। (২) পুরাণ অথবা ধর্মমূলক ছোট গল্প প্রতি সংখ্যায় দু-একটি করে প্রকাশ করলে উপকৃত হব। প্রসঙ্গত জানাই, সুনীতি মুখোপাধ্যায় রচিত 'কথামৃত পরিচয় ঃ ছবি ও ছন্দে' রচনাগুলি আমার ছেলেমেয়েদের খুবই ভাল লাগে। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

কালীপদ ঢালী
রামকৃষ্ণপুর বাজার, লিটিল আন্দামান-৭৪৪২০৭

প্রসঙ্গ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত কৌশিক দাশগুপ্তের 'বেদান্ত দর্শনের আলোকে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। প্রশ্নগুলির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

প্রথমত, প্রবন্ধটির মধ্যে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব কী বা কাকে বলে—এমন কোন সংজ্ঞা পেলাম না। বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাঙলা তরজমা যদিও বেশ কঠিন কাজ, তবু তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করলে পাঠকের পক্ষে এই দুরূহ বিষয়টি অনুধাবন করা কিছুটা সহজ হতো।

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধটিতে লেখক নীলস বোর প্রমুখ ৮ জন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতবাদ উল্লেখ করেছেন এবং এই মতবাদগুলির সংক্ষিপ্তসার নিয়েই প্রবন্ধটির কলেবর। বহু আলোচিত এই মতবাদগুলি অনেক স্থলে হয় অমীমাংসিত, বিতর্কিত আর নয়তো খণ্ডিত—আগ্রহী পাঠকমাত্রেরই তা জানা। অবশ্য প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সুপ্রযুক্ত হয়েছে। এই বিষয়ে আরো বেশি মৌলিক চিন্তার উদ্ভাস ভবিষ্যতে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত।

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বা সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য নিবেদন করছি। পদার্থের শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় অবিরাম হয় না, তা হয় নিয়মিত পর্যায় অনুযায়ী—এটাই কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। আমাদের পরিচিত আইনস্টাইনের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আলোর ধর্ম নিয়ে, ক্ষেত্রের ওপর আপতিত আলোকরশ্মির ফোটন-সংখ্যা নিয়ে। এটা গণিতনির্ভর একটি তত্ত্ব এবং বস্তুজগতের একটি প্রত্যক্ষ ফল। বস্তুজগৎ পরিবর্তনশীল বলেই এই তত্ত্বও একদিন বিবর্তিত হবে। গণিতের সৃষ্টি তো শূন্য (০) থেকে। আর্যভট্ট এর উদ্ভাবক। এই শূন্য একটি প্রতীক—প্রকৃতির প্রতীক। প্রকৃতি অনন্ত, শূন্যের মানও অনন্ত, যা আমাদের অজানা। সমগ্র গণিতশাস্ত্র এই কল্পিত শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কল্পনায় কোন সত্য নেই, এই গণিতেও কোন সত্য নেই, তা অবিদ্যা। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শক্তি ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক গণিতের মাধ্যমে দেখিয়েছেন $e = mc^2$ সমীকরণে।

চৈতন্য থেকে শক্তি এবং পরে শক্তি থেকে বস্তুর উদ্ভব। এইজন্যই শাস্ত্রে 'ব্রহ্মযোনি'র প্রসঙ্গ এসেছে। শক্তি ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হলেও চৈতন্যের সঙ্গে শক্তি বা বস্তুর কোন সম্পর্ক স্থাপন করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। যদি তা কখনো সম্ভব হয়, তবেই লেখকের 'বেদান্ত দর্শনের আলোকে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা পাবে।

আলোক হলো ফোটন বস্তুকণার তরঙ্গ এবং তা নিজস্ব গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট। এই গুণ ও ধর্ম নিয়েই কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "সেই স্থির—বস্তু যার ওপর মন সমস্ত ছবি আঁকছে এবং যার ওপর মন ও বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত বিষয়ানুভূতি স্থাপিত, সেটাই হলো আমাদের আত্মা। সুতরাং মনের দ্বারা নিক্ষেপিত তরঙ্গ আত্মার উপর প্রতিফলিত হলে তবেই আমরা বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকি।" স্বামীজীর এই উক্তির আশ্রয়ে লেখক কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতাংশে স্বামীজী দেখার বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করেছেন। দেখার কর্তা হলেন Self বা আত্মা। বস্তুকণা ফোটন দেখার মাধ্যম। কিন্তু সেই ফোটনকণা চোখ নামক ক্ষেত্রে আপতিত হয়ে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি করে বিদায় নেয় এবং সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ মস্তিষ্কে গিয়ে জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে চৈতন্যরূপী আত্মায় প্রতিভাত হয়; তখন বস্তুদর্শন ঘটে। কাজেই গণিতনির্ভর কোয়াণ্টাম তত্ত্বটি দেখার কর্তা অশরীরী আত্মা বা চৈতন্যের কাছে পৌঁছায় না। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আমাদের স্থূল চক্ষু নামক ক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছায়, তার বেশি দূর নয়। এখানেই জড়বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

শ্রীচরণ পাল
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বিশ্বায়ন, স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের ভারত

অসীমকুমার চৌধুরী*

বৈদ্যুতিন আবিষ্কারের পিঠে সওয়ার হয়ে বিশ্বায়ন আজ এমন ঝড় তুলেছে যে, সব কিছু উথালপাথাল হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক। কারণ, প্রবল ঝড়ের মুখে তাল-নারকেল গাছের পার্থক্য বোঝা যায় না। সব কিছুর গোড়া আলগা হয়ে যাওয়ায় আজ মানুষকে তার দীর্ঘদিনের জীবনধারা ত্যাগ করে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে। ব্যক্তিমানুষকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই সমাজে নারীর ভূমিকায় এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। বিস্ময়কর এক পরিস্থিতি! কেউ কেউ এসবের ভাল-মন্দ বিচারে হয়েছেন উদ্যোগী। আবার 'গেল গেল' রবও তুলেছেন অনেকে। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর, খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যান্টনি গিডেন্স 'গেল গেল'-পন্থীদের আশ্বস্ত করার জন্য খুবই প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, এই পরিবর্তন ঝঞ্ঝাসদৃশ (swirling) হলেও এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, বরং উল্লসিত হওয়া উচিত; কারণ পরিবর্তিত বিশ্ব অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ।[১]

আশ্চর্যের কথা, একশো বছরেরও আগে (১২ নভেম্বর ১৮৯৭) লাহোরে প্রদত্ত 'বেদান্ত' সম্পর্কিত ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক গিডেন্সের কথার পূর্বাভাস শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, যাহা আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাদিগকে এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়ামাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সেদিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে।... উত্তাপ, তড়িৎ, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে; সুতরাং লোকে যে-কোন নামেই অভিহিত করুক না কেন, বিজ্ঞান এগুলিকে একটিমাত্র নামের দ্বারাই অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন হইলেও সংহিতাতেও সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তড়িৎই বল, চৌম্বকশক্তিই বল অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল—সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম 'প্রাণ'।... প্রাণ অর্থে স্পন্দন।" ব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে গেলেও প্রাণশক্তি লুপ্ত হয় না, আদি প্রাণে বিলীন হয়ে "কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে—আবার ক্রমশ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি।" তিনি বলেছেন ঃ "সৃষ্টি আর ইংরেজি 'creation' শব্দ একার্থক নহে।...'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া।" তাঁর কথায় ঃ "এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আরেকবার পড়িতেছে; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনিভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে 'সৃষ্টি' বলে।"[২]

তা বলে একথা মনে করার কারণ নেই যে, স্বামীজী বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ছোট করে দেখেছেন। তিনি সৃষ্টি-রহস্যটি উন্মোচন করেছেন মাত্র। তাছাড়া পুনরাবিষ্ক্রিয়া মানে তো পুনরাবৃত্তি নয়। তরঙ্গের উপমাটি ব্যবহার করে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিকাশধারা একরকম হয় না। দেশকালভেদে তা ভিন্নরকম হতেই পারে। তবে 'প্রাণ' যেমন কোন কোন সময়ে শান্ত থাকলেও সম্পূর্ণ গতিহীন হয় না, তেমনি সৃষ্টিও থেমে থাকে না। আবার পূর্বাপর সৃষ্টিও সম্পর্কহীন নয়। বর্তমান চমকপ্রদ বৈদ্যুতিন সৃষ্টিরও একটি উৎস আছে এবং তা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিকশিত হয়েছে। পর্যায়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্তও বটে। তবু নবতম প্রকাশ যে অধিকতর সমৃদ্ধ হবে সেটিই স্বাভাবিক। স্বামীজীই বলেছেন ঃ "মানুষ

* *'সমাজবাদী ভাবনা' শীর্ষক দ্বিমাসিক পত্রিকার সম্পাদক, চারুচন্দ্র কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।*

অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।"[৩] প্রসঙ্গত শ্রীরামকৃষ্ণের 'অমৃত' কথাটিও উল্লেখ্য —"এক-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। এক-কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোন পদার্থ থাকে না।"[৪]

বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ভূমিকায় যে-পরিবর্তন ঘটছে, সমাজে নারীর ভূমিকাতে যে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এসেছে—এসবই আসলে বিকাশ। বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি (অব্যক্ত ব্রহ্ম) সুপ্ত রয়েছে, তার প্রকাশ ঘটছে। আরো কথা, এই প্রকাশ ঘটছে শিক্ষার মধ্য দিয়ে। বিবেকানন্দের কথায়—"শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।" জ্ঞান বা সৃষ্টির বিভিন্ন শাখাকে এক সূত্রে গেঁথে নেওয়ার যে-প্রয়াস এখন চলছে তা বস্তুত বেদান্ত-উক্ত 'একত্ব'-এর সন্ধান।

যেহেতু বিশ্বায়নকে এখনো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার কাজ তেমন আরম্ভ হয়নি, তাই বিশ্বায়ন নিয়ে এত বিভ্রান্তি। অধ্যাপক গিডেন্স অবশ্য তাঁর 'The Third Way' গ্রন্থে বলেছেন, বিশ্বায়নকে বাহ্য (external) বলে ব্যাখ্যা করা হলেও তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। বিশ্বায়নের একটি সাংস্কৃতিক (cultural) মাত্রা আছে। থাকবেই। তারও পূর্বাভাস বিবেকানন্দের বক্তব্যে পাওয়া যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু বহির্মুখী, তাই বাহ্য বা ঐহিক বিষয় আমাদের আগে আকর্ষণ করে কিন্তু কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে আমরা অন্তর্মুখী হই। এই অন্তর্মুখিনতার অপর নাম আধ্যাত্মিকতা। তাই মানুষ হলো ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ। আরো ব্যাখ্যা—"আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমত বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে।... বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য একটি জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরো মহত্তর, আরো সুন্দরতর, আরো বহুগুণে বিকাশশীল।"[৫]

অধ্যাপক গিডেন্স নিজে সমাজবিজ্ঞানী বলেই বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক মাত্রাটির কথা বলতে ভোলেননি। বস্তুতপক্ষে মনুষ্যসমাজ আজ যে-জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সভ্যতা বা বহির্জাগতিক বিষয়ের আবরণে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটে বলে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য গুলিয়ে ফেলি। কিন্তু সভ্যতার সারবস্তুই হলো সংস্কৃতি।

ইত্যবসরে সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থটি একবার স্মরণে আনলে মন্দ হয় না। "Culture means the total accumulation of material objects, ideas, symbols, beliefs, sentiments, values and social forms which are passed on from one generation to another in any given society."[৬] অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো ঐহিক বিষয়, ধ্যানধারণা, প্রতীক, বিশ্বাস, আবেগ, মূল্যবোধ ও সামাজিক গঠনের এক সার্বিক সংগ্রহ, যা কোন সমাজে এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। সংস্কৃতিকে ধরে সামাজিক গোষ্ঠী বা সমষ্টির ট্র্যাডিশন বা পরম্পরা গড়ে উঠলেও তা অনমনীয় হয়। প্রত্যেক প্রজন্মই নিজ নিজ বিষয় ও ভাবগত আহরণের প্রেক্ষায় ট্র্যাডিশনকে জ্ঞাত, অজ্ঞাত উভয়ভাবেই পরিমার্জিত করে নেয়। তবে সব কিছুই ঘটে সমাজের মূল সুরটিকে বিঘ্নিত না করে। সাময়িক পরিবর্তনের ধাক্কায় মূল সুরটি অনেক সময় চিনতে না পারা গেলেও তা একেবারে হারিয়ে যায় না, কারণ তাকে ধরেই সংশ্লিষ্ট সমাজের যত কিছু পরিবর্ধন বা পরিশোধন। যে-সমাজ যত বেশি করে তার মূল সুরের ধারা বজায় রেখে জীবনের বহিরঙ্গে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সে-সমাজ তত বেশি উন্নত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি আজকের সব কয়টি উন্নত দেশ সম্পর্কেই কথাটি সত্য। ইংরেজরা বণিকজাতি বলে অধিকার, ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক রীতিনীতি ধরে

তাদের সমাজজীবনকে সুসংহত করেছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জাতিগঠন করতে হয়েছিল বলে ফরাসিদের কাছে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী হয়েছে জাতীয় ধারা। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল বলে আমেরিকানরা ব্যক্তির অধিকার ও উদারনৈতিকতাকে অত মান্যতা দেয়। আর জার্মানদের স্বাজাত্যবোধ তো ইউরোপে অনেক ওলটপালটই ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি যে ৪৫ বছর পর বিশ শতকের শেষের দিকে পুনর্মিলিত হতে পেরেছিল, তার পিছনেও কাজ করেছিল তাদের স্বাজাত্যবোধ। বিত্তশালী পশ্চিম জার্মানি স্বেচ্ছায় বিত্তহীন পূর্ব জার্মানির পুনর্গঠনের আর্থিক দায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল। সব কয়টি উন্নত দেশই নিজ নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কেবল সচেতনই নয়, গৌরবান্বিতও। সেই গৌরববোধই তাদের বহিরঙ্গের উন্নতিসাধনে উৎসাহ ও শক্তি জুগিয়েছে। তাই তারা বর্তমান বিশ্বায়নের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষেরও নিজস্ব একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারা আছে, যার প্রাচীনত্ব তাকে 'সনাতন' অভিধায় অলঙ্কৃত করেছে। সেই ধারাটি হলো ধর্ম। ধর্ম ইংরেজি Religion থেকে অনেক বেশি গভীর এবং ব্যাপক। পাশ্চাত্যের Religion পারলৌকিক বিষয় এবং তা স্বাধীনতার অঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ freedom of religion। কিন্তু ধর্ম একইসঙ্গে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। তাই ঐহিকতা ধর্মের এলাকার বাইরে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সামগ্রিকতা বোঝাতে বেলের উপমা দিয়ে বলেছেন, বেল বলতে শুধু শাঁসটুকুই বোঝায় না; খোলা, বিচি, আঠা, শাঁস মিলে বেল। তেমনি ভারতবর্ষের ধর্ম হলো ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতা মিলে এক সামগ্রিক একত্ববোধ। আরো একটি কথা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ যে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মৈত্রী, সংহতির আদর্শ ধরে নিজ নিজ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, তার সব কয়টিই ভারতবর্ষের ধর্মের মধ্যে রয়েছে—'সর্বত্র সমদর্শিনাম্'। অর্থাৎ যে যে-ভাব নিয়েই চলুক না কেন, কেউই অখণ্ডের বাইরে নয়। সকলেই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাই তো ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ/ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ/ সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু/ মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ।" ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর এটিই। বৈদান্তিক একত্ব বা অখণ্ডতা।

শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নয়, স্বামী বিবেকানন্দ জাতির মুক্তির মন্ত্র নির্বাচন করেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। জগতের হিত এবং আমার নিজের মোক্ষলাভ একসূত্রে গাঁথা। অর্থাৎ গিরিকন্দরে বসে আপন মুক্তিলাভের জন্য তপস্যা করলেই চলবে না, জগতের হিতসাধনে নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনই হলো মুক্তির একমাত্র পথ। আরো সহজ কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। তাই তো স্বামীজী মানুষ-দেবতার পূজাকে শ্রেষ্ঠ পূজা বলে মনে করেছেন। কাষ্ঠাসনে বসিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা নয়—মানুষের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বার্থসাধক উন্নয়ন। তিনি এইসঙ্গে আমাদের সাবধান করেও দিয়েছেন ঃ "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।"

তাই স্বাধীনতার উত্তর পর্বে যখন দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল, তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ লিখেছিলেন ঃ "I consider Swami Vivekananda a leader in every respect—in religion, culture, economics, sociology—all of which ought to be established on the bedrock of Vedanta, our ancient rational philosophy. If we fail to remember this and to build our nation on the foundations of our historic legacy, then India will not remain India."[৭]—বেদান্ত হলো আমাদের সনাতন যুক্তিবাদী দর্শন। দেশকে যদি সেই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার অনুযায়ী গঠিত না করা যায়, তাহলে ভারত আর ভারত থাকবে না। জয়প্রকাশ নারায়ণ একই নিবন্ধে লিখেছিলেনঃ "If we want to progress, we should understand the truth of *dharma* and follow it up."[৮] প্রগতি চাইলে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করে তাকে অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশগঠনের ভার যাঁদের ওপর পড়ল, তাঁরা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি বোঝার চেষ্টাই করলেন না। ফলে বৈদান্তিক অখণ্ডের ধারণাও অধরা রয়ে গেল। ধর্ম হয়ে দাঁড়াল প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরবিশ্বাসীদের বিষয়। তাও আবার যার যেমন ঈশ্বর। আমরা ভুলে গেলাম শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর বাণী—যিনি হিন্দুর 'ভগবান', তিনিই মুসলমানের 'আল্লা', খ্রিস্টানের 'গড'। ভুলে গেলাম, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বাক্যটি কেবল হিন্দুদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়নি। ভুলে গেলাম, 'অব্যক্ত ব্রহ্ম' কেবল হিন্দুর মধ্যেই নয়, সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছেন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'আধুনিক' হতে গিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ঐতিহাসিক প্রেক্ষায় রচিত 'সেক্যুলারিজম'-এর ধারণাটি এদেশের জনমনে প্রোথিত করার প্রয়াস ধর্মমতের বিভেদ বাড়িয়ে দিল। সেক্যুলারিজমও আজ এদেশে এক ধর্মমত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধ ও অনুসৃত না হওয়ার ফল হলো রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রেও দুর্নীতির তাণ্ডব এবং দুর্বৃত্তায়নের সম্প্রসারণ। যে-লোকসমাজ (civil society) একদিন ছিল ভারতবর্ষীয় জীবনের ভিত্তিভূমি, তা আজ খণ্ডবিখণ্ড। বহিরঙ্গ চাকচিক্যের আকর্ষণে আমরা আপনাপন বৃত্তকে সঙ্কুচিত করেই চলেছি। জাতীয় সংস্কৃতির মূল সুরটি ভুলে গিয়েছি বলেই এই দশা। দেশের স্বাধীনতার বয়স ষাট ছুঁইছুঁই, অথচ সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়ন এখনো সুদূরপরাহত! এই অবস্থায় আমরা পশ্চিমী ধাঁচের বিশ্বায়ন নিয়ে মেতে উঠেছি! আবার ভুল পদক্ষেপ। গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বায়ন হয় না। দুটি একই সূত্রে গাঁথা। অখণ্ডের ধারণা সেকথাই বলে। তাছাড়া পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিও নিজ নিজ অর্থনীতির ভিতটি পাকা করে নিয়ে তবে বিশ্বায়নের পথে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের সব কিছুতেই জমি তৈরি না করে ফসল ফলানোর চেষ্টা! এই বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ মানবসমাজের পুনরুজ্জীবন। পশ্চিমের উন্নত দেশেও মানবসমাজ খুবই শক্তিধর। নানান নামের নানান উদ্দেশ্যসাধক সব সংগঠন স্থানীয় এলাকা থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত সদা সক্রিয়।

তবে আমাদের সবটাই যে অন্ধকার, তা নয়। রামকৃষ্ণ মিশন শতাধিক বছর ধরে নীরবে মানবসমাজকে পুষ্টি জুগিয়ে আসছেন। সদা প্রসারমাণ মিশনের বহুধা কর্মসাধনা। আছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রমুখ বহু উদ্দেশ্যসাধক বেশ কয়েকটি সংস্থা। নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও গঠনমূলক কাজ করে চলেছেন। কায়েমি স্বার্থের হাতে স্বেচ্ছাসেবীরা খুনও হচ্ছেন। তবু কাজ থেমে নেই। এখন আমরা 'শহুরে' মানুষেরা যদি ক্ষুদ্রস্বার্থের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে মানবসমাজকে প্রসারিত করতে উৎসাহী হই, তবেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি আবার আপন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ■

তথ্যসূচি

১ জন লয়েডকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, 'নিউ স্টেটসম্যান', ইউ. কে., ১০ জানুয়ারি ১৯৯৭
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২৩৪
৩ দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতা লিখিত ভূমিকা—'আমাদের স্বামীজী ও তাঁর বাণী', বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ৪র্থ ভাগ, কথামৃত ভবন, ১৩৭৭, পৃঃ ৫
৫ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯
৬ The UNESCO sponsored book on traditional cultures in South East Asia, Orient Longmans. প্রদত্ত সংজ্ঞাটি স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ভাষণ-পুস্তিকা 'The Essence of Indian Culture' (Advaita Ashrama) থেকে নেওয়া।
৭ The Message of Swami Vivekananda—Jayprakash Narayan, 'Prabuddha Bharata', May 1952, p. 206
৮ Ibid., p. 245

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

অরূপরতন ভট্টাচার্য*

যেসব ঘটনা আমাদের বিপন্ন করে তোলে, আমাদের জীবনহানি ঘটায়, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করে—সেইসব সর্বনাশা ঘটনাকে আমরা 'বিপর্যয়' বলি। আর আমাদের চারপাশে যত বিপর্যয় ঘটে, তাদের অধিকাংশের জন্য দায়ী প্রকৃতি। তাই তাদের বলা হয় 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়'। 'জনান্তিক' উপন্যাসের শুরুতে এইসব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে যাযাবর বলেছেন : "এদের উপদ্রব আকস্মিক, ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আগমন অনিশ্চিত নয় বাংলাদেশে। দোল, দুর্গোৎসবের ন্যায় এগুলি বাৎসরিক। কখনো বাঁকুড়ায়, কখনো বাখরগঞ্জে, কখনো বা তিস্তা দামোদরে।" সত্যি কথা বলতে কি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির মতো এসব অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কথা আমরা জানি, যা আমাদের নিয়মিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবু তারা আসে হঠাৎ, আগাম নোটিশ জারি না করে। তাই তারা আরো বিপজ্জনক, কখনো কখনো বা ভয়াবহ।

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিপর্যয় আসে সারা বিশ্ব জুড়ে। সারা পৃথিবীতে যত বিপর্যয় ঘটে, তার শতকরা ৮০ ভাগই হলো প্রাকৃতিক। সে-বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সবসময় সহজ নয়। আজও আমরা দেখতে পাই বন্যায়, খরায়, সাইক্লোনে আমরা কতটা অসহায় বোধ করি। বিপর্যয় মোকাবিলা করার যে-পরিকাঠামো আছে উন্নত দেশগুলিতে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা নেই। আমাদের দেশেও সার্বিকভাবে সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। অথচ বিজ্ঞান নিত্য উন্নত হচ্ছে, প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু কোনদিন কি সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে যখন আমরা আবহাওয়া বা ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারব? আমাদের মতো দেশে নয়, উন্নত দেশগুলিও প্রকৃতিকে পুরোপুরি বেঁধে ফেলতে পারেনি। দৈব-দুর্বিপাকের মতো যে-বিপর্যয় নিয়ে আসবে প্রকৃতি, মানুষের পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সাধ্যের অতীত। সুনামির ঘটনাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অথচ প্রকৃতিও বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই কাজ করে। সে বিজ্ঞানের বাইরে নয়। দিন, রাত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এবং পূর্ণিমা, অমাবস্যার মতো বিজ্ঞানের নিয়মেই ঘটে বন্যা, খরা, সাইক্লোন-সহ যাবতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি কথাটা জড়িয়ে আছে, অর্থাৎ মূলত বৃষ্টির পরিমাণের হেরফেরই এসবের কারণ। অনাবৃষ্টিতে খরা, অতিবৃষ্টিতে বন্যা। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বন্যার ঘটনাই ঘটে নদীকে ঘিরে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এমনিতেই সেসময় নদীর জল বাড়বাড়ন্ত। তারপর যদি কখনো কখনো ঝেঁপে বৃষ্টি নামে এবং একনাগাড়ে সে-বৃষ্টি চলে কয়েকদিন, তাহলে নদীর জল ফুলে-ফেঁপে একেবারে টইটম্বুর অবস্থায় পৌঁছায়, জলাশয়গুলি কানায় কানায় ভরে যায়।

প্রত্যেকটা আধারের একটা ধারণ-ক্ষমতা আছে। যখন জল সেই আধারের ধারণ-ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তা উপচে পড়ে। ঘটনাটা অনেকটা ঢাকনা খুলে কেটলিতে জল ঢালার মতো। জল ঢেলে কেটলি ভর্তি করলাম। কেটলি ভর্তি হলো তার ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী। জল পুরোপুরি ভর্তি হলে কেটলির চা-ঢালার সরু মুখ দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে আসবে। কিরকম দ্রুত সে বেরোবে, সেটা হলো তার প্রবাহ-ক্ষমতা। যদি জগ-ভর্তি জল কেটলির ঢাকনা খুলে হু-হু করে ঢালি, তাহলে ঢাকনার মুখের চেয়ে কেটলির অনেক সরু চা-ঢালার মুখ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল বের করতে পারবে না। অর্থাৎ প্রবাহ-ক্ষমতা বহন-ক্ষমতার চেয়ে কম হবে। তাই যেখান দিয়ে জল ঢালছি, সেখান দিয়েই জল উপচে বেরোবে। বন্যার জল দু-কূল ছাপিয়ে স্থলভাগ প্লাবিত করে এইভাবে।

---

* মূলত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার, বাঙালি পাঠকসমাজে সুপরিচিত, কলকাতা-নিবাসী।

একথা ঠিক যে, অধিকাংশ নদীর বহন-ক্ষমতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। নদীখাতে পলি জমাই এর কারণ। সমতলে পলি জমা একটা বড় সমস্যা। নদীখাত যদি পলি জমার ফলে দিনে দিনে ভরাট হয়ে আসে, তাহলে তার গভীরতা কমে যায়। ফলে তার বহন-ক্ষমতাও পাল্লা দিয়ে হ্রাস পায়।

নদীতে পলি জমে অনেক কারণে। তার একটা হলো গাছ কাটা। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা যতই 'একটি গাছ একটি প্রাণ' স্লোগান তুলে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করি না কেন, আজও গাছ কাটা বন্ধ করা যায়নি। সমতলে গাছের সংখ্যা আগের মতো নেই। পাহাড়ি অঞ্চলেও নিয়মিত গাছ কাটা চলেছে। কিন্তু এই গাছ তো মাটির ক্ষয় রোধ করে। পাহাড়ের ঢালু জমি দিয়ে নদী সমতলের দিকে নেমে আসছে। নামার সময় সে সঙ্গে বয়ে আনে নরম শিলা আর আশপাশের মাটি। নরম শিলা ক্ষয়ে গিয়ে নদীখাতে জমছে। আশপাশের মাটিও আসছে।

সুনামির পর সমুদ্রের জল ঢুকছে আন্দামান রামকৃষ্ণ মিশনে

মাটি আলগা থাকলে কাজটা সহজ হয়। কিন্তু নদীর পাড়ে যদি গাছ থাকে, তাহলে গাছের শিকড় মাটি আঁকড়ে ধরবে। মাটি আর এতটা আলগা থাকবে না যে, নদীর খাতে সে এসে মিশে পলির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। তাছাড়া নদীর জলের অনেকটাই শিকড় শুষে নেবে। ফলে নদীর জলধারণ-ক্ষমতাও বাড়বে।

আজকাল তো নদীখাত আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সভ্যতার বিকাশের এ আরেকটা দিক। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে হু-হু করে। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে আমাদের যাবতীয় চাহিদা বাড়ে, উৎপাদনও তাল রেখে বাড়তে থাকে। নদীর দুই তীরে কল-কারখানা গড়ে উঠছে পরিকল্পনাহীনভাবে। এদিকে যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মানুষের নীতিবোধও কমে আসছে। কল-কারখানার যত বর্জ্যপদার্থ সব গিয়ে পড়ছে নদীর গর্ভে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। নদীখাত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ভরাট নদীখাতে জলধারণ-ক্ষমতা কমবেই। আর সেজন্য নদীতে জলের পরিমাণ বাড়লেই বন্যা হবে। কোথাও কোথাও আবার প্লাবনভূমিতে চাষ করা হচ্ছে। সেখানেও যে কোন পরিকল্পনামাফিক কাজ চলেছে, তা নয়। ফলে প্লাবনভূমি না পেলে নদীখাতে পলি জমার পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।

আমাদের দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে দুই বাঙালি বিজ্ঞানীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁদের একজন হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অন্যজন ডঃ মেঘনাদ সাহা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যা হয়। ১৯২৬-এ আবার বন্যা হয় ওড়িশার ব্রাহ্মণী নদীতে। এই দুটি বন্যা-উদ্ভূত সমস্যাই মহলানবিশের দৃষ্টিতে আনা হয়। তিনি চিন্তা করলেন, রাশিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর কি কিছু করা সম্ভব? তিনি উত্তরবঙ্গে ৫০ বছরের বৃষ্টিপাত এবং বন্যার হিসাব নিলেন। ওড়িশার ক্ষেত্রে তিনি নিলেন ৬০ বছরের হিসাবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং রাশিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর নিষ্পত্তি সম্ভব কিনা তার জন্য চেষ্টা করে দেখেন। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না। সাধারণভাবে যেকোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় দুভাবে। এক ঃ জলরাশি দ্রুত নিষ্কাশন করে, দুই ঃ জলাধার নির্মাণ করে জলকে ধরে রেখে। উত্তরবঙ্গে বন্যার ক্ষেত্রে মহলানবিশের মনে হলো, দ্রুত নিষ্কাশনই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে—বন্যার জল ধরে রাখার বদলে এক্ষেত্রে তা-ই বেশি কার্যকরী হবে।

ওড়িশায় বন্যার ক্ষেত্রে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করে, নদীর তলদেশ উঠে আসছে বলেই এই বন্যা। ফলে নদীর পাড় উঁচু করা দরকার। মহলানবিশ দেখালেন, না, তলদেশ উঠে আসেনি। সেই কারণে নদীর ওপর দিকে বাঁধ দিয়েই বন্যার জল ধরে রাখা যাবে। এই বাঁধের সাহায্যে সন্নিহিত অঞ্চলের জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনও সম্ভব। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। ওড়িশার বন্যা নিয়ন্ত্রণে যখন পরবর্তী কালে হীরাকুঁদ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হয়, তখন মহলানবিশের গবেষণা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

উত্তরবঙ্গের বন্যা দেখে তার প্রতিকার সম্পর্কে ভেবেছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহাও। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বছর জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে তিনি বাংলার বন্যা সমস্যা দূরীকরণে নদী সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য একটি হাইড্রোলিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার

প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এফ. স্প্রিং হাইড্রোলিক গবেষণাগারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। এইরকম গবেষণাগারে বন্যা, সেচ, নদীর নাব্যতা ও জলশক্তি সংক্রান্ত সবরকম গবেষণা সম্ভব হবে। স্প্রিংকে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলা যায়। গঙ্গার ওপরে সারা ব্রিজ-সহ অনেক ব্রিজ নির্মাণ করেছিলেন তিনি।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দামোদরের বন্যার পরে আবার নতুন করে বন্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠিত হলো। ডঃ সাহা ছিলেন সেই কমিটির এক বিশেষ সদস্য। সেই কমিটিকে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা নেন। তিনি কমিটিকে টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের মতো একটি কর্তৃপক্ষের অধীনে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠনের পরামর্শ দেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে DVC-এর কাজ শুরু হয়।

মানুষের জীবন যেমন মাঝে মাঝে বাঁক ফেরে, তেমনি নদীর গতিপথেরও পরিবর্তন হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের স্মারক গ্রন্থে ডঃ সাহার যে-প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয় (Need for a Hydraulic Research Laboratory in Bengal), তাতে আছে ঃ "it is well-known that in the past, change of river courses either by men or by Providence has been attended with dire consequences." নদীর যে গতিপথ বদলায় তার জন্য দায়ী মানুষও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছেই, কিন্তু মানুষের ঔদাসীন্য এবং অদূরদর্শিতাও অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে ত্বরান্বিত করে।

একসময়ে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। জনবহুল এবং সমৃদ্ধ এই নগরীটি গঙ্গার পথ পরিবর্তনের ফলে একদিন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। গত দেড়শো দুশো বছরের ইতিহাস থেকে এমন কথা সঙ্গত কারণেই মনে হতে পারে যে, কালাজ্বর ম্যালেরিয়ায় বাংলার গ্রামের পর গ্রাম যে উজাড় হয়ে গেছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন তার একটা বড় কারণ। মধ্য বাংলাও মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে-অবস্থা বদলে যায়। বালির চাপে, রেললাইন বসানোর ফলে এবং সেতুনির্মাণের কারণে ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মতো নদীর স্রোত বাধা পায়। ফলে নদীর গতিপথের পরিবর্তন হয়। সেইজন্য মধ্য বাংলাও এখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার।

অতিবৃষ্টিতে বন্যা একধরনের বিপর্যয় ডেকে আনে, অনাবৃষ্টিতে খরা আনে আরেক ধরনের বিপর্যয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় খরা কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে সেও মারাত্মক।

প্রকৃতিতে একটা জলচক্র আছে—আমাদের সকলেরই তা জানা। বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টির সে-জল খাল, বিল, নদী বা সমুদ্রে এসে জমা হয়। খাল, বিল, ডোবা, পুকুর ভরে যায়; নদীর জলও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। মাটিও যতটা টানার টেনে নেয়। মাটির দানার ফাঁক-ফোকরে যতটা জল জমে থাকার জমে রইল কিন্তু যখন তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তখন সেই জল জলীয় বাষ্প হয়ে ওপরে ওঠে। বায়ুমণ্ডলে সে ফিরে যায়। সেখানে আবার মেঘ হয়। মেঘ দেয় বৃষ্টি। চক্রবৎ এই খেলা চলতে থাকে।

এখন তাপ যদি বেশি মাত্রায় বাড়ে, তাহলে বাষ্পও তৈরি হবে বেশি পরিমাণে। বাষ্পীভবনের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে আর তা যদি সম্পূরণ করা না যায়, তাহলে খরা হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু বাষ্পীভবনের পরে তা সম্পূরণ করবে কে? ভরা কলসি কাঁখে এনে কেউ সেখানে জল ঢালবে না। প্রাকৃতিকভাবেই তাকে সম্পূরণ করতে হবে। সে-সম্পূরণ করবে বৃষ্টি।

মুম্বাইয়ের সাম্প্রতিক বন্যার একটি দৃশ্য ● সৌজন্যে ঃ 'ইণ্ডিয়া টুডে'

প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টি না হলে বা বৃষ্টি কম হলে খরা হতেই পারে। কিন্তু শুধু বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপরে নয়, যেকোনভাবে জলের অভাব ঘটলেই খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, অনাবৃষ্টি ছাড়া জলাভাব হবে কেন? জলাভাব ঘটে নানা কারণেই। বাষ্পীভবনের পরিমাণ এর একটা কারণ হতে পারে। মাটিতে, পুকুরে, ডোবায়, খানা-খন্দে যতটা জল জমবে, তার থেকে খরচ করবে ঐ বাষ্পীভবন। জমার থেকে খরচের পরিমাণ বেশি হলে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হবে। হয়তো বৃষ্টি হলো,

পরিমাণে তা যে খুব কম হলো, তাও নয়। কিন্তু সেখানকার বাতাসে যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকার কথা, তার তুলনায় যদি কম থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বাষ্প তৈরির প্রবণতা বেড়ে যাবে অর্থাৎ খরচের ধাক্কাটা বাড়বে। খরচ মেটানোর মতো সঙ্গতি যদি না থাকে, তাহলে ধার-দেনা চলবে। ফলে খরা পরিস্থিতি তৈরি হবে।

শুষ্ক আবহাওয়া খরা পরিস্থিতি তৈরি করে। সেই পরিস্থিতিতে যে-পরিমাণ বৃষ্টিপাতে যতটা জল জমা হওয়ার কথা, বাষ্পীভবনে খরচ বেশি হওয়ায় ততটা জল জমা হয় না। ফলে জলের অভাব ঘটে। শুধু বৃষ্টিপাত নয়, যেকোনভাবে জলের অভাব ঘটলেই খরা দেখা দেয়। জলের অভাব ঘটে অনেক কিছু মিলে। খাল, বিল, পুকুর বা ডোবার জল, মাটিতে থাকা জল, মাটির নিচে থাকা ভূগর্ভস্থ জল সব নিয়ে সমস্যাটা তৈরি হয়। যতটা জল বাষ্পীভবন হবে, তা যদি জমা জলকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলেই খরা। এ যেন কোন বিয়োগের ঋণাত্মক ফলের মতো।
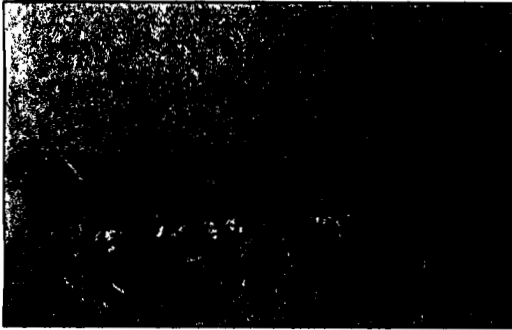
২০০৩ সালে টর্নেডো-বিধ্বস্ত জয়রামবাটী অঞ্চল

ঋণাত্মক ফল হয় নানা কারণে। এ কেবল একটা সংখ্যা থেকে তার চেয়ে বড় একটা সংখ্যা বিয়োগ নয়। ছোট-বড় অনেকগুলি সংখ্যার পর পর বিয়োগ হয়ে যেতে পারে একসঙ্গে। বৃষ্টি হলো না, তার সঙ্গে তাপমাত্রা চড়ে গেল, মাটির প্রকৃতিও এমন যে তা জল ধরে রাখার উপযোগী নয়, তাহলে মাটিতে জল জমবে কি করে!

জল ধরে রাখার জন্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে গাছপালা। গাছপালা বেশি থাকলে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। সেইজন্য খরা আটকানোর জন্য বনসৃজনের একটা বড় ভূমিকা আছে। আজ নগর সভ্যতার দ্রুত আগ্রাসনে এবং আমাদের ঔদাসীন্যে সে-সুযোগ কমে আসছে।

খরা এবং বন্যার মতো সাইক্লোনও একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বাংলায় একে ঘূর্ণিঝড় বলা হলেও সাইক্লোন নামেই এটি বেশি পরিচিত। সাইক্লোন মানেই যেন সর্বনাশ, সাইক্লোন মানেই যেন জীবনহানি, সাইক্লোন মানেই যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চূড়ান্ত ওলট-পালট।

সাইক্লোন কি? বস্তুত, সাইক্লোন একটা অত্যন্ত গভীর নিম্নচাপ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণভাবে সমুদ্রের ক্রান্তীয় বা উষ্ণ সমুদ্র অঞ্চলে এর উৎপত্তি। দেখা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি গরম হলে সাইক্লোনের আশঙ্কা থাকে। তখন বাতাস গরম হয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। যত বেশি গরম হাওয়া ওপরদিকে উঠবে, সেই পরিমাণে জায়গাটাও খালি হতে থাকবে। আর খালি হওয়ার অর্থ, বায়ুর চাপ কমবে, তৈরি হবে নিম্নচাপ অঞ্চল। বায়ুর চাপ যত কমবে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, বেশি চাপের জায়গা থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলটা ভরাট করার জন্য তত বাতাস ছুটে আসবে।

এইভাবে সমুদ্রের কোন নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রথমে সাইক্লোনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। তারপরে সমুদ্রের পৃষ্ঠভাগের অফুরন্ত জলীয় বাষ্প তাকে সীমাহীন শক্তি জোগাতে থাকে। তখন সে একটা পরিণত রূপ ধারণ করে।

আকৃতিতে সাইক্লোন একটা বায়ুস্তম্ভের মতো। এই বায়ুস্তম্ভের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ চলে সর্পিল গতিতে। উঁচুর দিকে সাইক্লোন ১০ থেকে ১৭ কিলোমিটার, কিন্তু বিস্তৃতিতে ১৫০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সাইক্লোনের পথ চলার হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, এটি ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি পথ চলে না।

সাইক্লোনকে ভয় করে না—এমন বোধ হয় কেউ নেই। সাইক্লোনে নিম্নচাপ অত্যন্ত গভীর বলে বায়ুর গতিবেগ খুবই বেশি। সেইজন্য যে-অঞ্চলে সাইক্লোন সমুদ্র থেকে এসে আছড়ে পড়ে, সেখানে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়। ফলে কাঁচা ঘর-বাড়ি আলগা হয়ে যায়, গাছপালা, টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিকের খুঁটি উপড়ে পড়ে। ঝড়ের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। নদীনালা সব কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। তেমন হলে বন্যা দেখা দেয়। তখন মাঠঘাট জলে থৈ-থৈ, সব একাকার। তবে যদি সাইক্লোনের সময় জলোচ্ছ্বাস হয়, তাহলে সেটাই হয় সবচেয়ে মারাত্মক। সাইক্লোন যখন সমুদ্র থেকে এগিয়ে এসে স্থলভাগ অতিক্রম করে, তখন যে-অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র থেকে বইছে, সেইদিক থেকে সমুদ্রের জলরাশিও বায়ুতাড়িত হয়ে স্থলভাগের দিকে এগোতে থাকে। একেই বলে জলোচ্ছ্বাস। জলোচ্ছ্বাসের গভীরতা হয় সাধারণত ৩ থেকে ৫ মিটার। তবে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কখনো কখনো ৫ মিটার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাইক্লোনের সময় বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল অনেক বেশি। সাম্প্রতিক কালের মারাত্মক কোন সাইক্লোনের কথা উল্লেখ করতে হলে

১৯৯৯-এর ওড়িশার উপকূল অঞ্চলে সাইক্লোনের কথা বলতে হয়। এই সাইক্লোনে জীবনহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ভয়াবহ।

আমাদের দেশের যদি সমগ্র সমুদ্র অঞ্চল ধরা যায়, তাহলে বঙ্গোপসাগর আর আরবসাগর জুড়ে যত মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় দেখা যায়, তার অধিকাংশই হয় প্রধানত প্রাক-বর্ষায় অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে এবং বর্ষার পরবর্তী পর্যায়ে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে। তবে মারাত্মক ধরনের সাইক্লোনের সংখ্যা আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরেই বেশি। এর একটা উল্লেখযোগ্য কারণ, বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরবসাগরের চেয়ে বেশি। আবার পশ্চিমবাংলার চেয়ে বাংলাদেশেই সাইক্লোনের প্রকোপ বেশি। এরও কারণ আছে। সাইক্লোনের গতিপথ ঘড়ির কাঁটার অভিমুখী। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেভাবে চলে সাইক্লোনের চলার পথটাও অনেকটা সেই রকমই। ফলে যে-ঘূর্ণিঝড় আজ আছে বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে, ঘড়ির কাঁটার পথে আগামিকাল সে কিছুটা সরবে উত্তর-পশ্চিম দিকে। তারপর সে হবে উত্তরমুখী, শেষ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাভিমুখী হয়ে এগিয়ে বাংলাদেশের তটে আঘাত করবে। সাইক্লোনের এইধরনের গতিপথে আঘাতটা সচরাচর পশ্চিমবঙ্গে লাগে না। লাগার কথাও নয়, যদি না গতিপথ আরো একটু ওপরে উঠে পশ্চিমবাংলার তটভূমিকে আঘাত করে।

সাইক্লোন এতই মারাত্মক যে, তার পূর্বাভাস না পেলে আমাদের চলে না। একথা ঠিক, সাইক্লোন কোনভাবে ঠেকানো যায় না, কিন্তু তার পূর্বাভাস ঠিকমতো মিললে অনেকটাই সতর্ক হওয়া সম্ভব। তাতে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যায়—পুরোটা না হলেও যে বেশ কিছুটা, এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আবহবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এদেশে সাইক্লোনের পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি হয়ে চলেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে শুধু যে ঘূর্ণিঝড়ের জায়গাটা বোঝা যায় বা ঘূর্ণিঝড়ের সময়টা জানা যায় তা নয়, বাতাসের গতিবেগ এবং ঝড়ের তীব্রতা সম্পর্কেও একটা ধারণা করা চলে।

আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এল ৩ সেন্টিমিটার রাডার। সেই শুরুর অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত উন্নতি কম হয়নি। আজ আমাদের দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের সমুদ্র-উপকূলগুলি জুড়ে দিবারাত্র অতন্দ্র পাহারায় রয়েছে আরো উন্নত, আরো শক্তিশালী রাডার। সমুদ্রের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি, এক নিমেষের জন্যও অবকাশ নেই! অনুকূল অবস্থায় ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত এরা কাজ করার ক্ষমতা রাখে। আর এদের সঙ্গে আছে ভূ-সমলয় উপগ্রহ—'ইনস্যাট'। ইনস্যাট-১এ, তার পরে ইনস্যাট-১বি। এর পাঠানো ছবিগুলি আজ অমূল্য সম্পদ। মানুষের দুরতিগম্য সব জায়গার ছবি পাঠায় এই উপগ্রহ। ফলে ঝড়, জল, সাইক্লোন এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে আরো সহজে।

ভূমিকম্পের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। কখনো কখনো আমরা অনুভব করি, পায়ের তলার মাটিতে কাঁপন লাগল, টেবিল-চেয়ার নড়ে উঠল, বালতির স্থির জল আর স্থির রইল না—হেলতে-দুলতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। তবু ভয় পাই আমরা। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখ করার মতো নয় বলে এরকম ভূমিকম্প আমাদের মনে স্থায়ী দাগ কাটে না। কিন্তু এই শতকের গোড়ায় (২০০১) জীবনহানি এবং ধ্বংসলীলার যে-ইতিহাস তৈরি হলো গুজরাটে ভুজের ভূমিকম্পে, তা আমাদের মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

২০০৪ সালের বিহারের বন্যায় আক্রান্তদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য

অথচ আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করি, ওপর থেকে তা দেখতে শান্ত। কিন্তু তার অভ্যন্তরে কি এমন খেলা চলে, যাতে শান্ত ভূপৃষ্ঠ অকস্মাৎ অস্থির, চঞ্চল, দুরন্ত হয়ে ওঠে?

ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূকেন্দ্র আছে ৬৩৭০ কিলোমিটার গভীরে। ভূবিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন, এর আন্তর ভাগ বিভিন্ন শিলাস্তরে সাজানো। শিলাস্তরগুলি সমান পুরু নয়, ঘনত্বও এদের আলাদা। এই স্তরগুলির প্রত্যেকটা এক-

একটা পাতের মতো। এদের দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ মহাদেশীয় পাত (Continental plate) এবং মহাসাগরীয় পাত (Oceanic plate)।

কিন্তু এই পাতই কি শেষকথা? না, সমস্ত পাতের নিচে অত্যধিক তাপমাত্রায় আছে লোহা, কোবাল্ট, নিকেল, সিলিকার মতো ভারি ধাতু—কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে অতিরিক্ত চাপের জন্য কঠিন অবস্থায়, তার ওপরে গলিত অবস্থায়।

ভূমিকম্পের সঙ্গে সম্পর্ক মহাদেশীয় আর মহাসাগরীয় পাতগুলির। এই পাতগুলি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় নেই। এরা সতত সঞ্চরমাণ। ফলে একটি পাত যখন আরেকটি পাতের সঙ্গে মেলে, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। সেসময় দুপাশের শিলার একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। ভূবিজ্ঞানীরা এইরকম ঘটনাকে 'চ্যুতি' বলেছেন। এই যে চ্যুতি হলো, ভূমিকম্পই এর কারণ।

ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার একটি দৃশ্য—গুজরাট

এরকম এক চ্যুতি হলো ২০০৪-এর ২৬ ডিসেম্বর। ঐদিন সকাল ৬টা ২৮ মিনিটে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরদিকে সমুদ্রের গভীরে দুটি পাতের সঙ্ঘর্ষ হয়। সেই সঙ্ঘর্ষের ফলে ১০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক চ্যুতিরেখা (fault line) সৃষ্টি হলো। সঙ্ঘর্ষে যে-ভূমিকম্প হলো, রিখটার স্কেলে তার মাপ ছিল ৯। এই ভূমিকম্পে সেই অঞ্চলের সমুদ্রতলের উচ্চতা ১০ মিটার বেড়ে গেল। ব্যাপারটা খুব সামান্য নয়। তলদেশ উত্থানের ফলে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে এক আবর্ত সৃষ্টি হলো। এই আবর্তই সুনামি ঢেউ হয়ে ভারত মহাসাগরের তটভূমিতে আছড়ে পড়ল। এই তরঙ্গমালা ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটার গতিবেগে তটভূমির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আর যখন তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে বিশাল ঢেউয়ের শক্তি নিঃশেষ হলো, তখন তার উচ্চতা ছিল ১০ মিটার। এর ফলে শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, সেইসঙ্গে আমাদের দেশের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। ক্ষয়ক্ষতি যা হলো, পরিমাণে তা অপূরণীয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূকম্পন বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রেখেছে। বিশাল সামুদ্রিক ঢেউ বা সুনামি এই ভূকম্পন বলয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ২৬টি দেশে সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে। সেসব দেশের মানুষ সুনামির সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন সময়মতো। কিন্তু সে-তালিকায় ভারত ছিল না।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সাধারণত সুনামির আক্রমণ দেখা যায় না। সেজন্য আমাদের দেশের বিজ্ঞানীমহল এবিষয়ে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁরা চিন্তাও করতে পারেননি যে, ইন্দোনেশিয়ায় উদ্ভূত ভূমিকম্প সমুদ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে ভারতের পূর্বদিকের তটভূমিকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অথচ সুনামির আবর্ত সৃষ্টির পরে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার-সহ আমাদের দেশে আছড়ে পড়তে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ঠিক সময়ে সতর্কবার্তা এলে বহু প্রাণ বেঁচে যেত। বিপর্যয় এত মারাত্মক হতো না।

অবশ্য ভূমিকম্প যে শুধু প্রাকৃতিক কারণে হয়, তা নয়। অনেক সময় অপ্রাকৃতিক কারণেও ভূমিকম্প হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের কয়নানগরে কয়না নদীর বাঁধের বিশাল জলাধারের চাপে সংলগ্ন অঞ্চলে মারাত্মক ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্প কখন হবে—এটা যদি আগেভাগে জানা যেত, তাহলে অসংখ্য মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হতো। পৃথিবীতে বহু আকস্মিক মৃত্যুও বন্ধ হতো। কিন্তু দীর্ঘ এবং ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার মতো অবস্থা আজও তৈরি হয়নি। তবে ভূবিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদের আচার-আচরণের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। সাম্প্রতিক সুনামির ক্ষেত্রেও

দেখা গেছে, সমুদ্রের তটবর্তী অঞ্চলে সুনামি এসে আছড়ে পড়ার আগে পশু-পাখিদের আচরণ বদলে গেছে। তারা তখন সব চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলেন, ভূমিকম্প জলে-স্থলে তরঙ্গঘাতে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর ঝড় আনে আবহমণ্ডলে তড়িৎ-চুম্বকীয় পরিবর্তন। মানুষের শ্রুতি এবং বোধের অগোচরে থাকলেও কোন কোন জীবজন্তু তা বুঝতে পারে। আমাদের কুড্ডালোর তটভূমিতে সুনামির ধাক্কায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়, কিন্তু গরু, মোষ, ছাগল, কুকুর অক্ষত থাকে।
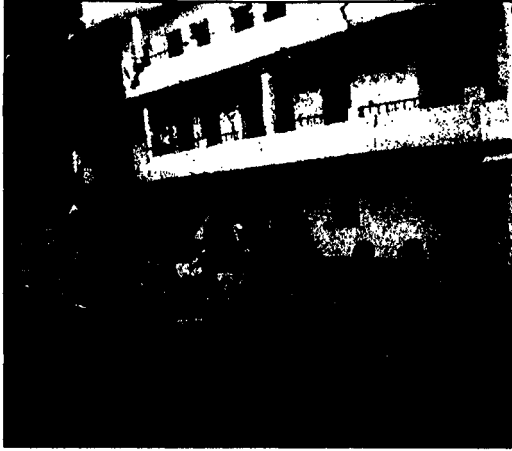
গুজরাটে একটি ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা

অনেক সময় ভূমিকম্পের হাত ধরে আসে অগ্ন্যুৎপাত এবং ধস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদেরও ভূমিকা আছে। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির কথা কে না জানে। ভূমিকম্পের সময় সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কখনো কখনো জেগে ওঠে। আগ্নেয়গিরির যখন ঘুম ভাঙে, তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে লাভা, নানারকমের গ্যাস, ছোট-বড় পাথর। পৃথিবীর নিচ থেকে উঠে আসা লাভাস্রোতে ভেসে যায় কত গাছপালা, বাড়ি-ঘর, নগর ও সভ্যতা। কত মানুষ প্রাণ হারায় এই অগ্ন্যুৎপাতে। একসময় পমপাই, হারকিউলেনিয়াম নগরী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এই লাভাস্রোতে। আমাদের দেশেও আগ্নেয়গিরি আছে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন দ্বীপটি একটি আগ্নেয়গিরি। এটি এখনো জীবন্ত। কয়েক মাস আগে এর অগ্ন্যুৎপাতের চিত্র আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখেছি।

ধস নামটা শুনলে চোখের সামনে একটা বিধ্বংসী ছবি ভেসে ওঠে। পাহাড়ের গা বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছে ছোট-বড় পাথরের চাঁই। বড় বড় গাছপালা উপড়ে পড়ছে, ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—চলার পথে যাকে সে পাচ্ছে, কাউকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না।

এইসব ধস তৈরি হয় কীভাবে? কেমন করেই বা এরা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসে সমতলের দিকে? ভূমিকম্প হলে মাটি আলগা হয়ে এমন সব পাথরের চাঁই তৈরি হওয়া সম্ভব। আলগা চাঁই, সে তো ধস হয়ে নেমে আসবেই নিচের দিকে। তাছাড়া পাহাড়ে যদি একটানা কয়েকদিন ভারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়, তাহলেও ধস নামতে পারে। দার্জিলিঙের রেলপথ ধসে অনেক সময়ে আটকে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে যাতায়াতের পথ। হিমবাহের প্রবাহ বা অতিরিক্ত বরফ জমে যাওয়ার জন্যও ধস নামে, মাটি বা শিলার ক্ষমতা কম হলেও এমন হওয়ার আশঙ্কা। সম্প্রতি কাশ্মীরে অতিরিক্ত তুষারপাতের সময় ধসে বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, বহু প্রাণহানিও ঘটেছে। বাতাস, জল নিয়ে যেসব ভূতাত্ত্বিক কাজ চলে প্রকৃতিতে, সেসব কারণের জন্যও ধস নামে।

খরা বা বন্যা, ধস, ভূমিকম্প বা সাইক্লোন—এজাতীয় বিপর্যয় যত তীব্র হোক বা যত তার ব্যাপ্তি থাকুক, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এককালীন বিপদের আশঙ্কা নেই তা থেকে।

কিন্তু সর্বগ্রাসী বিপদের এক কালো ছায়াও এগিয়ে আসছে। তার উপস্থিতি আকস্মিক নয়, সে আসছে ধীরে ধীরে, পা ফেলে ফেলে। কিন্তু এখনো সতর্ক না হলে সুনিশ্চিত, অবধারিত সে। আরো বড় কথা, সে-বিপদ ভয়াবহ, তার পরিণতি মারাত্মক। বিজ্ঞানীরা সে-বিপদ দেখছেন তাপমাত্রার দিক থেকে। তাঁরা বলছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাপমাত্রা বাড়লে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পৃথিবীর জলবায়ুর ওপরে তার প্রভাব পড়ে। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে যায়, তাহলে মেরুপ্রদেশে জমে থাকা চিরতুষার অঞ্চলের হিমশৈল কিছু কিছু গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠে আসবে। তখন সমুদ্রের পাশের নিচু জায়গাগুলি চলে যাবে জলের তলায়। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে কত অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এরা মাত্র কয়েক মিটার মাথা তুলে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠে এলে এইসব দ্বীপেরও আর ভেসে থাকার কথা নয়।

পশ্চিমবাংলায় কি হবে? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলার সব নিচু অংশ চিরকালের মতো সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওড়িশা আর বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তো আছেই।

কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ছে কেন? এককথায় বলা যায়, সভ্যতার বিকাশই এর কারণ। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে হু-

হু করে। কাট গাছ, নির্বিচারে ধ্বংস কর বনভূমি, বানাও নগর, গড়ে তোল সভ্যতা। আমরা যত সভ্য হচ্ছি, পরিবেশের ভারসাম্য তত নষ্ট হচ্ছে! আমাদের শিল্পে, বাণিজ্যে, কল-কারখানায়, যানবাহনে বিপুল পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার চলছে। মানুষ প্রতি বছর কত টন কার্বন যে জ্বালানি থেকে মুক্ত করছে তা বলা কঠিন। ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বাতাসে এই গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে।

আসল কথা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারি গ্যাস। সেইজন্য বাড়তি এই গ্যাস স্বভাবতই ভূস্তর সংলগ্ন অঞ্চলে এবং মহাসাগরের জলসীমার ঠিক ওপরে জমা হতে থাকে। এই গ্যাসের একটা ধর্ম, এর ভিতর দিয়ে আলোকতরঙ্গ এবং সৌরতাপ সহজেই চলে আসে, কিন্তু পৃথিবী যে-তাপ বিকিরণ করছে, সে-তাপ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে সূর্যালোক এসে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে তাপরশ্মি বিকিরণ করে। প্রতিফলিত তাপরশ্মির অধিকাংশই অবলোহিত রশ্মিতে পরিণত হয়। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সূর্যালোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বড়। সেইজন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের যে-প্রাচীর ভেদ করে আলোকরশ্মি এসেছিল, দীর্ঘ তরঙ্গযুক্ত তাপরশ্মি সে-প্রাচীর ভেদ করে আর বেরিয়ে যেতে পারে না। কারণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে শুধু ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যই প্রবেশের ক্ষমতা রাখে। এইভাবে আটকে থাকা তাপরশ্মির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার তাপমাত্রা বেড়ে চলে। বাস্তবিক পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে।

এই ঘটনাটিকে পরিভাষায় 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' বলা হয়। শীতের দেশে ক্যাকটাস বা অর্কিড-জাতীয় গাছকে খুব বেশি ঠাণ্ডাতেও কাঁচের ঘরে অনেকটা গ্রিন হাউস পদ্ধতিতে উত্তপ্ত রাখা হয়।

তবে আবহমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস হিসাবে শুধু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নেই, তার সঙ্গে আছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লুরোকার্বনও। এদের পরিমাণও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মিথেনের ভূমিকাই আসল।

আরো একটা নিয়ামকের কথা বলতে হয়। এটি হলো অনেক ওপরে অবস্থিত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন-স্তর। ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যদি ক্রমশ ওপরে ওঠা যায়, তাহলে প্রথমে ট্রোপোস্ফিয়ার, তারপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই স্ট্র্যাটো-স্ফিয়ারেই আছে ওজোন-স্তর। এই স্তর মহাজাগতিক রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে এবং সূর্যকিরণের যে-অংশ ক্ষতিকর নয়, শুধু সেইটুকুই এই স্তরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। এই স্তর অনেকটা ছাতার মতো জীবজগৎকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আড়াল করে রাখে। যেসব ক্ষতিকর রশ্মি ওজোন-স্তরে আটকে থাকছে, ভূপৃষ্ঠে কোনক্রমে এসে পৌঁছালে সেগুলিতে আমাদের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হবে। আমাদের ত্বকের ক্যান্সার বেড়ে যাবে। চোখে ছানি পড়ার মতো অসুখও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। সেইসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বাড়বে।

যত দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ছাতার জল আটকানোর ক্ষমতা কমে আসছে অর্থাৎ ওজোন-স্তর অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বাজতে শুরু করেছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানোন্নত যুগে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শীতলীকরণ এবং প্লাস্টিক শিল্পের প্রসারের জন্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন শ্রেণির গ্যাসের ব্যবহার। এরা ওজোন-স্তরের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন-স্তরকে দুর্বল করে তুলছে। ফলে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে সর্বত্র ওজোন-স্তরের অবক্ষয় ঘটছে।

ওজোন-স্তর আরো একভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান চালাতে হলে এমন সব অঞ্চল দিয়ে তা নিয়ে যেতে হবে, যেখানে আবহাওয়া অত্যন্ত হাল্কা অর্থাৎ বায়ুর প্রতিরোধ-ক্ষমতা খুব কম। এজন্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারই আদর্শ। ফলে নিস্তরঙ্গ জলে ইঁট ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ওঠে এবং সেই ঢেউ যেমন চারপাশে ছড়িয়ে যায়, তেমনি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন-স্তরও বিক্ষুব্ধ হয়।

তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে মহাকাশযানের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। হয় নিত্যনতুন মহাকাশযান উৎক্ষেপিত হচ্ছে, নয়তো যেগুলি আগে উৎক্ষেপিত হয়েছিল, সেগুলি ক্রমশ নিচে নেমে এসে জ্বলে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেও ওজোন-স্তরে তোলপাড় চলেছে। আর সেইজন্য ওজোন গ্যাস ক্রমশ ওপর-নিচে ছড়িয়ে গিয়ে ওজোন-স্তরের ঘনত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে। সব দিক দিয়ে ওজোন-স্তরের ভিতর দিয়ে মহাজাগতিক এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঢোকার পথে বাধা কমে আসছে।

কোন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, যেখানে মানুষ একান্ত অসহায়। পরম শক্তিমানের করুণাভিক্ষা ছাড়া তার আর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু একথাও ঠিক, যেকোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বিধাতার রোষ হিসাবে মেনে নেওয়াও উচিত নয়। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের অজ্ঞতা, উদাসীনতা বহুলাংশে দায়ী আর দায়ী তার বেপরোয়া, স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা। ■

লোকসাহিত্যে দেবী সরস্বতী

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী*

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে শুধু শাস্ত্রজ্ঞান শুকনো জ্ঞান। "ও যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ি। খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙে যায়।"[১] এজন্যই তিনি সত্ত্বগুণের অন্বেষণ করতে, নিত্য ও সত্য জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন—যে-কাজে ভরসা দেবী সারদা। সিস্টার নিবেদিতা দেবী সরস্বতীর বীণাটিকে 'mystic' আখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন ঐ বাদ্যযন্ত্র অজ্ঞাননাশী প্রহরণ।[২] সরস্বতীর বর্ণনায় নিবেদিতা লিখেছেন, সরস্বতী এক অনাড়ম্বর দেবী, কঠোর তপস্বিনী, অ-ধনাঢ্যা, শ্বেতকমলে তাঁর চরণযুগল, পুষ্প আভরণে সজ্জিতা, মণিমাণিক্যে অনাসক্তা—যাকিছু শুভ্র, বর্ণহীন, আড়ম্বরবিহীন তারই আভা প্রতিভাসিত দেবীর মূর্তিতে। তিনি স্বয়ং মাতৃরূপিণী শুভ্রতা। তিনি দুঃখহারিণী এবং শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি প্রদায়িনী।[৩] কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে এক বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন—'বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি।'[৪]

সরস্বতী বেদমাতা, অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তন্ত্র ও মন্ত্রে কীর্তিতা এবং নৃত্যগীত ইত্যাদি সকল কলাবিদ্যার দেবীরূপে চিহ্নিতা হলেও আদিতে তিনি ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা।[৫] আর্য ঋষিগণের প্রার্থনায় (৬।৬১।১০ ঋক) দেখা যায়, সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্না প্রিয়তমা সরস্বতীকে বন্দনা করা হয়েছে।[৬] 'সরস' শব্দের আদি অর্থ যে 'জল', তা বেদের প্রথম দিকের মন্ত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে।[৭]

"উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ॥"[৮] অর্থাৎ সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্না, প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যগ্রূপে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন। সমগ্র বেদ খুঁজে কোথাও তাঁকে বিদ্যার দেবী হিসাবে পাওয়া যায় না।[৯] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন: "ঋগ্বেদের কোন স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখানো যাইতেছে যে, সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত আর কিছু।"[১০] বলা হয়ে থাকে, সরস্বতীর মতো হেঁয়ালিপূর্ণ দেবী হিন্দুশাস্ত্রকারদের দেবীভাবনায় আর একজনও জন্মগ্রহণ করেননি।[১১] বিভিন্ন পুরাণে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন বিভিন্নরূপে। সরস্বতী বারেবারে বাহন পালটেছেন, সর্বশেষে ব্রহ্মার বাহন হংসে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছেন। সিংহী এবং মেষী সরস্বতীর আদি বাহন, পরবর্তী কালে দুর্গা সরস্বতীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন সিংহ, কার্তিকেয় নিয়েছেন ময়ূর। এমনকি সরস্বতীকে মোরগ বাহনারূপেও দেখা গেছে। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাহন জলচর হংস হবেন—এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী মেধারূপে, সৃজনী-শক্তিরূপে, ভাষ্যময়ীরূপে মানুষের অন্তরে প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করেন। সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী কল্পনার শুরু পুরাণে।[১২]

"তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন॥" (অন্নদামঙ্গল ঃ সরস্বতীবন্দনা)

লোক-কবি শিল্পীরা চায় তাদের জীবনের দুঃখনিবৃত্তি। শিল্পীজীবনে আপাত প্রতিষ্ঠাই এই দুঃখ নিবারণ করতে পারে, হতে পারে জীবনের পাথেয়লাভ। তাই লোকসঙ্গীত ও নাট্যের আসর-বন্দনায় সরস্বতীর স্তব-স্তুতি করা হয়। প্রাচীন থেকে আধুনিক প্রতিটি লোককবিই এই রীতিকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছেন। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে সরস্বতী-বন্দনারীতি অনুসৃত হয়েছে। এই রীতি মূলত মধ্যযুগীয় লোককবি ও সাহিত্যিকেরা অনুসরণ করলেও আধুনিক কালে তা খানিক দৃশ্য। মধ্যযুগীয় আখ্যানধর্মী কাব্যের তুলনায় আধুনিক কাব্যে সরস্বতী-বন্দনায় রূপগত, আঙ্গিকগত ও আদর্শগত পার্থক্য দেখা

* বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণারত।

যায়। লোকসাহিত্য থেকেই সম্ভবত মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যে বন্দনারীতি গৃহীত হয়েছিল। চর্যাপদে বন্দনারীতি নেই, সরস্বতী বন্দনারও প্রশ্ন ওঠে না।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র বন্দনা খণ্ডে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। সেখানে কিন্তু সরস্বতীর বাহনরূপে হাঁসের উল্লেখ নেই, বরং বলা হয়েছে শ্বেতপদ্মে তাঁর অধিষ্ঠান। দেবী এখানে পুস্তকধারিণী, সঙ্গী মসীপাত্র ও পুঁথি খুঙ্গী। অর্থাৎ তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই বন্দিতা—

"পুস্তক লইয়া করে উর দেবী এ আসরে...
বিধি মুখে বেদবাণী বন্দো দেবী বীণাপাণি...
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শুক্লধুতি পরিধান...
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলী খেলে
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসীপাত্র পুঁথি খুঙ্গী
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে ॥"

কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেননি কিন্তু তাঁর হাত ধরে দেবী লিখিয়েছেন। ভরতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। এই চণ্ডী যে অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নন, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সরস্বতীর বাহনরূপে হাঁস অবতীর্ণ। তাঁকে এখানে বেদ, বিদ্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেখানো হয়েছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য অপ্সরা, গন্ধর্ব, ঋষি, মুনি, কিন্নর, কিন্নরী অনুক্ষণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত। বন্দনা খণ্ডে দেবীকে 'প্রকৃতি প্রধান' বলে সম্বোধনে একটি অভিনবত্ব আছে—

"আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীক্যাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান ॥"

ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এ সরস্বতী-বন্দনা এসেছে। ঘনরাম বন্দনায় লিখেছেন, সরস্বতী 'বিষ্ণুর দুর্লভা' এবং 'পতিত-পাবনী'—

"করিয়া প্রণতি স্তুতি, বন্দি মাতা সরস্বতী
বিশ্বগতি বিষ্ণুর দুর্লভা।
ধবল কমলাপনা ধৌত-ধুতি-পরিধানা,
কুন্দ-কান্তি কলেবর শোভা ॥
হেন মূর্খ মিথ্যা জ্ঞানী আমি কি তোমারে জানি,
পতিত-পাবনী নাম শুনি।"

দ্বিজরামদেব বিরচিত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে সারদা-বন্দনায় মায়ের কাছে গানের তালভঙ্গ দোষ এবং অশুদ্ধ গাওয়ার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করা হয়েছে—

"উপবিশ আসনে সারদা বর দাননে
ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান।
যুগপানি হইয়া দাসে তোমার চরণে ভাষে
শুন এ আপনা গুণগান ॥
সেবকে নিবেদে পাত্র শূনহ জগৎ মাত্র
কিঙ্করের চাহি পরিহার।
তালভঙ্গ দোষ যথ অশুদ্ধ গাইমু কথ
অপরাধ ক্ষেমিবা আমার।"

মহম্মদ কবীর রচিত 'মধুমালতী' কাব্যের সূত্রপাতে বন্দনা চোখে পড়ে। এই মুসলমান কবিও প্রচলিত রীতি মেনে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেছেন। তবে আল্লা-রসুল, পীর-পয়গম্বরের বন্দনাও করেছেন—

"সরস্বতীর পদে করম নমস্কার।
পৃথিবী হইল নৌকা সংসার অপার ॥
শির রাখি প্রণমি এ পদে করতার।
গোপত থাকিয়া কর মহিমা তোমার ॥"

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে সরস্বতী-বন্দনায় দেবীর বেশভূষার বিবরণ রয়েছে। এখানে তিনি কোকিলবাহিনী। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এখানে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট। একটি লোকবিশ্বাস এই বন্দনা খণ্ডে প্রকাশিত: যার ঘটে সরস্বতীর অবস্থান, তিনি পণ্ডিতরূপে সভায় স্বীকৃত হন—

"বন্দো মাতা সরস্বতী তোমা বিনে নাঞি গতি
আসরে আসিয়া দেহ বার।
রাতুল চরণ সেবি কি আর কহিব কবি
ভরসা করিব আমি কার ॥"

হরিদেবের 'রায়মঙ্গল'-এ বাগ্‌দেবী এবং বাক্‌শক্তি-প্রদায়িনী সরস্বতী কোকিলবাহিনী এবং কোকিলভাষী। বীণাপাণি-বন্দনায় অঙ্গ ও সাজসজ্জার বিবরণ মুখ্য স্থান পেয়েছে। তাঁকে 'ভবভয়-নিস্তারিণী', 'ত্রৈলোক্য-তারিণী' এবং 'ব্রহ্মরূপ সনাতনী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"বন্দো মাতা বীণাপাণি ভবভয়-নিস্তারিণী
বাগদেবী ত্রৈলোক্য-তারিণী
বাক্‌শক্তি-প্রদায়িনী ব্রহ্মরূপ সনাতনী
উর মাতা কোকিলবাহিনী।"

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য'-এ সরস্বতী পার্ষদসহ বন্দিতা হয়েছেন—

"দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দঁ পারষদ সঙ্গে ॥"

'মঙ্গলচণ্ডী'র গীতের সারদা বন্দনায় দ্বিজমাধব সরস্বতীকে ঘটে এসে অধিষ্ঠান করার আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। দেবী সারদার আশীর্বাদ থাকলে যে মনরূপ ভ্রমর দেবী দুর্গার চরণ-মকরন্দ আহরণে সমর্থ হবে তাও ব্যক্ত হয়েছে—

"ভাবিয়া সারদা মায়ে   দ্বিজ মাধবে গায়ে
তরিবারে সংসারের ধন্ধ।
করিয়া পুটাঞ্জলি   মন মোর হইয়া অলি
(মাগঁ) দুর্গার চরণ-মকরন্দ॥"

'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা' এবং 'কমলা কন্যা' পালায় সরস্বতী-বন্দনার মধ্যে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা আছে। লোকবিশ্বাস এই, কণ্ঠে ভর করে জিভে সরস্বতীর অবস্থান ঘটলে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী হওয়া যায়—

"আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই।
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই॥
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর।
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর॥"
('কমলা', ময়মনসিংহ-গীতিকা)

"ভাল মন্দ নাহি জানি না চিনি আখর।
সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর॥
জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গাও গান।
তোমার চরণে মাগো সহস্র প্রণাম॥"
('কঙ্ক ও লীলা' পালা, শিবু গাইনের বন্দনা)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করতে গিয়ে নিজেকে সরস্বতীর পুত্ররূপে চিহ্নিত করেছেন—

"অবলা তনয় ডাকে   পদছায়া দেহ তাকে
বৈস মোর কণ্ঠের উপর
মৃদঙ্গ-মন্দিরা ধ্বনি   মিশাইয়া বাগ্‌বাণী
কণ্ঠে বসি বল সুবচন।
রাগ মন্ত তালমান   কিছু মোর নাহি জ্ঞান
তব পদে লৈলাম শরণ॥"

লৌকিক ছড়ায় অবধারিতভাবেই সরস্বতী এসে পড়েন। এখানে বন্দনা নেই। কিন্তু চিত্রকল্পে আছে তাঁর প্রাঞ্জল উপস্থিতি—

(১) "কী দুগ্‌গি দেখলাম রে চাচা!
ডাইনে বায়ে দুইটা ছুড়ি
রূপেতে তারা বিদ্যেধরী
পরায়েছে নীলাম্বরী
কাজ করেছে খাসা!"
(মুসলমানী ছড়া; যশোহর, খুলনা)

(২) "হিঁদুর দেবতা দুগ্‌গা ঠাকুর, দশখানি তার হাত।
ডাইনে বাঁয়ে আছে তার কার্ত্তিক-গণপতি।
দুটো মেয়ের নাম রেখেছে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
(দুর্গাপূজার ছড়া, নির্মলেন্দু ভৌমিক সংগৃহীত)

(৩) "যে জল ছোঁয় না লো কাগে আর বগে .
সে জল ছুঁই মোরা দুর্বার আগে॥
দূর্বা দূর্বা সরস্বতী নড়ে আর চড়ে,
নড়িয়া চড়িয়া কি বর মাগে?
সাত সতীনের পায়ে পড়ে।"
(মাঘব্রতের ছড়া, ফরিদপুর)

(৪) "ধলা মাইয়া সারিন্দা হাতে
সোনার বরন কলসি কাঁখে
পাশে বইস্যা প্যাঁচা।" (মুসলমানী ছড়া, ঢাকা)

মুসলমানী ছড়াংশে সরস্বতী-সহ অপরাপর হিন্দু দেবদেবী উপস্থিত হলেও তাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জন্ম নেয়নি। বরং তা রসবোধ-সঞ্জাত। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে তাদের সহজাত রসবোধকে সঙ্গে নিয়েই। 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেনঃ "কার্ত্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী পুরোই মানব-মানবী, কেন্দ্রীয় মূর্তিটি অতিমানবিক মানবীর।" বাঙালি লোকসংস্কৃতির বৃত্তে সরস্বতীর যে মানবীরূপ প্রতিভাত, সম্ভবত তারই কারণে মুসলমান ছড়াকার সরস্বতীর মানবরূপ অঙ্কন করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা আসর-বন্দনার একটি লেটো গানে সরস্বতীকে 'সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নজরুল এই গানে সরস্বতীকে বাদ্যযন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপেও বন্দনা করেছেন—

"এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা।
তোমার আসরে বাজে হারমনি বেহালা॥
আমার আসরে বাজে বামা আর তবলা
আমার আসরে থাকে ভাইবোন একইজনা॥"

গাজনতলার গানের বন্দনাংশে বাগ্বাদিনী সরস্বতীকে পাওয়া যাচ্ছে—

"নহে গজানন দুইজন পঞ্চদেব আদি
তেত্রিশ কোটি দেবতা লক্ষ্মী সরস্বতী
কোথায় গো মা বাক্-বাদিনী প্রাণদায়িনী।"

ওঝাদের মন্ত্রেও সরস্বতী বাদ পড়েননি। অক্ষয় কয়াল সংগৃহীত একটি মন্ত্রে সরস্বতী উপস্থিত—

"আকর্ণ পূরি এ জুড়ি বাল্মীকীর বাণ।
দেবতা অসুর কাঁপে নাহি সহে টান॥
ইন্দ্রের ঘরনি কাঁপে পাতালে বসুমতী।
চৌষট্টি ভৈরবী কাঁপে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥"

মালদহের ঐতিহ্যবাহী 'ডোমনি' লোকনাট্যের প্রারম্ভে সরস্বতীর বন্দনা থাকে। ডোমনির গায়ক দেবী সরস্বতীকে তাঁর কণ্ঠে অবস্থান করতে আহ্বান জানান। এই গান মালদহের মানিকচক, রতুয়া ব্লকের নিরক্ষর কৃষি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ। 'ডোমনি'তে সরস্বতী-বন্দনা এইরকম—

"আয়ই গে মায়ই গে দেবী সরস্বতী
কণ্ঠমে হুয়াইবে সাহায়
ধমুনা জ্বালাই তোরা পূজাই বো ম্যায়গে
কণ্ঠমে বুয়াইবে সাহায়।"

সরস্বতীকে স্মরণ-মনন করে গাওয়া হয় মালদহের গম্ভীরা গানও—

"জল বন্দ, স্থল বন্দ, বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান,
বাসুয়া বাহন শিব তার চরণে প্রণাম।"

'আলকাপ'-এর আসর-বন্দনায় সরস্বতীর জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। যথোপযুক্ত মর্যাদায় সরস্বতীর চরণ প্রার্থনা করা হয়। এই সরস্বতী 'বাক্-বাদিনী', 'জ্ঞানপ্রদায়িনী' এবং 'বীণাপাণি'—

"মাগো বাক্-বাদিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী
নমামি জননী বীণাপাণি
নাই কোন বুদ্ধিবল দেহ দেহ কণ্ঠবল
ভরসা কেবল রাঙাচরণ দুখানি।"

'ঝুমুর' হলো একধরনের গীতিকবিতা। শৃঙ্গার রসের বাহুল্য এবং মধুজাত সুরার ন্যায় মিষ্ট আকর্ষণযুক্ত গীতি হচ্ছে ঝুমুর। ঝুমুরগানেও সরস্বতীর বন্দনা বাদ পড়ে না। সরস্বতীকে স্মরণ করে মিনতি করা হয়—

"সরস্বতী স্মরণ করি আউলি আখড়া মে
ডোল্কচ লাগায়ে দিলি
ঝুমরো লাগায়ে দিলি
করে সব মিনতি।"

টুসু গানের বন্দনায় সরস্বতী প্রসঙ্গ এসেছে, তবে তা বিশেষ মাত্রা পায়নি। অন্যান্য দেবদেবীর মাঝে সরস্বতী একজন—এই পর্যন্ত।

"শাঁখ দিলাম সলিতা দিলাম
সঙ্গে দিলাম বাতি গো।
একে একে সঞ্ঝা নিন মা লক্ষ্মী-সরস্বতী গো।
সঞ্ঝা দিয়ে বাহির হলেন ঘরের কুলবতী গো
গাই এল বাছুর এল ভগবতী গো।"

সরস্বতী সম্পর্কিত বাঙলা ধাঁধার সন্ধান মেলে। ২৪ পরগনায় প্রচলিত একটি ধাঁধায় বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না উত্তরটি হবে 'বীণাপাণি'। ধাঁধাটিতে সরস্বতীর বীণাটিই উত্তর সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—

"দুইটি কথার অর্থ শুন শিশুবর।
একটিতে বাদ্যযন্ত্র, অন্যটিতে কর ॥
কথা দুটি পাশাপাশি করিলে স্থাপন।
শ্রদ্ধাভরে পূজে তারে বিদ্যার্থিজন।"

পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট কথক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (১২৩৫-১২৮০ বঙ্গাব্দ) 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে কথকতায় সরস্বতী বিষয়ক একটি পদ রচনা করেছেন। পদটি সম্ভবত মঙ্গলাচরণের জন্য রচিত—

"বাণি। বীণাপাণি।
শ্বেতকমলবাসিনি।
ত্বমজ্ঞ বিজ্ঞকারিণি,
শারদে বরদায়িনি ॥
শ্বেতবর্ণেবর্ণময়ি। বর্ণিতুমশক্তেময়ি—
ভক্তে ভব কৃপাময়ী, বাগ্বিভাবিধায়িনী।...
ত্বমসি জ্ঞানদায়িনী, কুমতি বিনাশিনী
দশ-দ্বাদশ-ষোড়শ-দলকমলবাসিনী;
ত্বমসি জগদাধারা, সাকারাগিনিরাকারা।
উদারা-মুদারা-তারা-স্বর ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥
কুণ্ঠসুকণ্ঠকারিণী। বৈকুণ্ঠকণ্ঠবাগিনি।
শ্রীকণ্ঠ বন্দিনি। ভব, সমকণ্ঠবিলাসিনী,
ত্বমসি বাক্যরূপিণী, পদাশ্রিত রঘুমণি
বাসনাবাশমানস—বাসনা ফলদায়িনী ॥"

উত্তরবঙ্গের 'খন' গানে দেখা যায়, দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে তিলকধারণের যে বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, তার নাম 'দ্বাদশফোটা'। দ্বাদশফোটার অন্যতম হচ্ছে জিহ্বা। বলা হচ্ছে, জিভের মধ্যে অবস্থান করে সরস্বতী মানুষের মুখে কথার যোগান দেন—"জিহ্বা মধ্যে সরস্বতী কথাবার্তা কন।"

বাঙলা প্রবাদ ও চলতি কথাতেও বিদ্যা ও সরস্বতীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ—

১ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে সরস্বতী।
২ সরস্বতীর বরপুত্র।
৩ দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপা।
৪ ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।
৫ বিদ্যে-সিদ্যে সব হলো দেশ করলে জয়।
এখন একটা লেজ বেরুলেই হয়।

বাঙলায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের সৃষ্টি মূলত মধুসূদনের হাতে। বাঙলা সনেটের সৃষ্টিও তাঁর হাতে। তিনি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে সরস্বতী-বন্দনা করলেও 'সরস্বতী' নামে একটি বন্দনাধর্মী চতুর্দশপদী কবিতাও লিখেছেন। 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় তিনি বলেছেন, মানবদেহে মনোরূপ-পদ্ম সুকৌশলে রোপণ করেন সরস্বতী। সেই হৃদয়-বনে প্রস্ফুটিত পদ্মই কবি সরস্বতীর রাঙাচরণে অর্পণ

করেছেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গে কবি দেবীর কৃপাপার্থী। কেননা কাব্যলক্ষ্মীর স্পর্শে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ডাকাত রত্নাকর সরস্বতীর স্পর্শে সুচন্দন বৃক্ষরূপ কবি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গে তিনি সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে লিখলেন—

"কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর-দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্-সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত-নিরুপম সুধা।
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি!"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গেও কবি হৃদয়-আসনে বিশ্ববিনোদিনীকে আহ্বান জানিয়েছেন, চেয়েছেন তাঁর প্রসাদ।

'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় ('হেমন্ত গোধূলি' কাব্যগ্রন্থ) মোহিতলাল মজুমদার বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই সরস্বতীকে দেখিয়েছেন, সেই 'সুন্দর দেবতা'র চরণ-নখর রঞ্জিত করেছেন। মোহিতলাল সরস্বতীকে দেখেছেন 'জগৎ-যৌবন-ধাত্রী' এবং 'বিশ্বরমা কন্যা'-রূপে। তাঁর কবিতায় সরস্বতীকে আহ্বানে অভিনবত্ব আছে—

"যে-বাণী বিলসি' উঠে বর্ণে গন্ধে গানে
ধরণির মধুবন, নিতুই নূতন!—
সেই তিনি—শ্রীপঞ্চমী—রূপে আজি তুমি
মুছাও তুহিন-কণা কৃপানর প্রাণে,
সরস কটাক্ষ সুধা করিয়া সিঞ্চন
আর্দ্র কর রসিকের মনোবনভূমি।"

রবীন্দ্র-চেতনায় সরস্বতীর শুভঙ্করী ও সুমঙ্গলা মূর্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীর রূপপ্রকৃতি রবীন্দ্র-মানসে এতটাই সমুজ্জ্বল যে, কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে তার প্রকাশ ঘটেছে অনিবার্যভাবে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় তিনি সরস্বতীর শুভ্র জ্যোতির্ময়ী কান্তিতে চমকিত—

"পুলকে পুরিল মন প্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে
একি! হৃদয় একি এ দেখি
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কী জ্যোতিভায়।"

বাল্মীকির প্রতি সরস্বতীর উক্তিতে তিনি লোকসমাজের শিক্ষয়িত্রীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন—

"আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।"

'প্রজাপতির নিবন্ধ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীকে বলেছেন 'অমৃতভাষিণী'। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি সরস্বতীর বর্ণনা দিয়েছেন পুরাণ অনুকরণে—

"বিমল মানসসরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণা গঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমল কুঞ্জাসনা।"

'প্রহাসিনী', খাপছাড়া' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সারস্বত সাধনার স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সরস্বতীর বীণাযন্ত্রটির প্রসঙ্গ এসেছে বারেবারে। 'গীতিমাল্য' অনুসরণে দুটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক—

(১) "প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে
অমনি ফোটে তারা
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা।"

(২) "গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।"

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় সরস্বতীকে বন্দনা করেছেন—

"কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রানি
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি।"

'বীণাপাণি'কে উপমেয় এবং কুন্দ, ইন্দু, তুষার, শঙ্খ-কে উপমানরূপে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সরস্বতীকে বন্দনা করেছেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ইন্দুকুন্দ বিনিন্দিত বরণ বিমল
সিতকণ্ঠ হার সিতবাস সায়দে।"

বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে দেবীর দেহসৌন্দর্য ও লাবণ্য প্রতিভাত হয়েছে—

"নমো নারায়ণি / বেদ পরায়ণি / বীণা শ্বেতপদ্মাসনা।
শ্বেত পুষ্পবর / শোভে শ্বেতাম্বর / শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥
শ্বেতাঙ্গে শোভিত / আভরণ শ্বেত / শ্বেত বীণা পদ্মকরে।
শ্বেতাম্বুজময় / লাবণ্যহৃদয় / লোচন শ্বেতেন্দিবরে ॥"

নবীনচন্দ্র সেন 'আবাহন' কবিতায় সরস্বতীর রূপগুণ বর্ণনার পাশাপাশি বলেছেন, দেবী 'সঙ্গীত সাহিত্যশাস্ত্র প্রসবিনী' এবং 'বেদমাতা'—

"উত্তরে ভারতীদেবী রজতবরণা
মানসসরস পঙ্কজবাসিনী
বেদমাতা, করে শোভে চারুবীণা
সঙ্গীত সাহিত্যশাস্ত্র প্রসবিনী ॥"

প্রিয়ংবদাদেবীর 'মহাশ্বেতা' এবং 'মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা' কবিতায় পাচ্ছি—

"আমার আঁধার জ্যোৎস্না-আলোকে
জাগিতেছি সেই উষার আগি,
সঞ্জীবনী যার কিরণ-পরশে
পুণ্ডরীক মোর উঠিবে জাগি।"

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে বাঙলায় সারস্বত সাধনা সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ মন্তব্য পেয়েছি। 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে এসম্পর্কে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিটি এইরকম—

"গণধর্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্মের দিকে; এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মসর্বস্ব দেশে লেখকরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না, একথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে যে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ 'ভ্যালু পেয়ব্ল্ পোস্ট' নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নবসাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে সেবিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই, কোন শাস্ত্রই একথা বলে না যে, 'বাণিজ্যে বসতে[তি] সরস্বতী'। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার ইচ্ছে থাকলে দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে-আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজারদর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেইসঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে।"

'ফাল্গুন' (১৩২৩) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সরস্বতীপূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন—

"বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায়, তাহলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের জীবন সংশয় ঘটতে পারে। এ-স্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতীপূজা বলি, আদতে তা ছিল বসন্তোৎসব।"

সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে একত্রে পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য—এ-বিশ্বাস বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় লিখলেন, সরস্বতীপূজা করলেও ধনবান হওয়া যায়—

"সরস্বতী পূজলে পর
লক্ষ্মী এসে দেবেন বর।
তাই তো শুধি বাণীর ঋণ
বৎসরেতে একটা দিন।
পরের দিনই বিসর্জন
বাকি বছর বিস্মরণ।"
('সরস্বতী', শালিধানের চিঁড়ে কাব্যগ্রন্থ)

শিক্ষিত পুরুষকে উন্নতিলাভের আশীর্বাদসহ যে প্রচল কথাটি বলা হয় 'সোনার দোয়াত কলম হোক',—তা তো লক্ষ্মী-সরস্বতী যুগপৎ সাধনার ইঙ্গিতবাহী। কর্মসংস্থানের জন্য সরস্বতীর বন্দনাতেও তার 'missing link' খুঁজে পাওয়া যাবে। ■

তথ্যপঞ্জী

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৬৪১
২ দ্রঃ 'The Saraswati Puja', The Complete Works of Sister Nivedita, Birth Centenary Publication, Vol. II, Advaita Ashrama, p. 318
৩ দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতার প্রাচ্য প্রাধ্যয়ন : সরস্বতী সন্দর্শন—দেবব্রত রায়, 'নিবোধত', ২০০৪, ১৮(২), পৃঃ ২০৯-২১৩
৪ 'চিত্রাঙ্গদা' (প্রবন্ধ সংগ্রহ)—প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৩৪, পৃঃ ১৯৮
৫ সরস্বতীর বাহন হংস এবং পদ্ম, নদী-সরস্বতীর সঙ্গে তার সংশ্লেষের ইঙ্গিত দেয়। (দ্রঃ আদিদেবীর সন্ধানে—দেবব্রত দাস, 'মাতৃশক্তি', ৪(৪), ১৪১১, পৃঃ ৩৫-৪০)
৬ ঋগ্বেদের শ্লোক এবং টীকার অনুবাদে যথাক্রমে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্তকে অনুসরণ করা হয়েছে।
৭ হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও বিকাশ—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ৩য় পর্ব, ১৯৮০, পৃঃ ১৬
৮ 'সরস্বতীসূক্ত', ঋগ্বেদ সংহিতা, ৬ মণ্ডল, ৬১ সূক্ত, ১০ ঋক
৯ সরস্বতী : ঋগ্বেদে যেমন পেয়েছি—সনৎ মিত্র, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ২০০৩, ১৬(২), পৃঃ ১৯৬
১০ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১ম খণ্ড, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৩৪৫, পৃঃ ৪৪-৬২
১১ দ্রঃ সরস্বতীর রহস্য সন্ধানে—যুধিষ্ঠির জানা, ময়না প্রকাশনী, ১৩৯৭
১২ সরস্বতী-সন্ধান-কথকতা, পাঁচালি, কবিগান—নন্দলাল ভট্টাচার্য, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ২০০৩, পৃঃ ২৬১

■ **সহযোগী গ্রন্থ :** ● মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে লোক-উপাদান—মুহম্মদ আবদুল খালেক, ১৩৯১, বাঙলা একাডেমি, ঢাকা। ● কবিকঙ্কণ চণ্ডী—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৯২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ● ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৭৮, মডার্ণ বুক এজেন্সি। ● ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল—যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১২৯০, বঙ্গবাসী প্রেস। ● কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১৯৪৯, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ● রূপরামের ধর্মমঙ্গল—সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল ও সুনন্দ সেন সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১৩৬৩। ● কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলি—সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৮, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ● সাহিত্য প্রকাশিকা—পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬০, বিশ্বভারতী। ● দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত—সুধাভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৬৫, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ● বাঙলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১৯৬৬, দে'জ। ● উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য—শিশির মজুমদার, ১৯৯০, পুস্তক বিপণি। ● 'সরস্বতী ও লোক সংস্কৃতি', বিশেষ সংখ্যা—সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, ১৪১০, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা। ● লোকসংস্কৃতি—প্রদ্যোত ঘোষ, ১৯৮২, গম্ভীরা পুস্তক বিপণি। ● আলকাপ—একটি জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতির ধারা—যোগজীবন গোস্বামী, ২০০৩, অভিযাত্রী ফেরি ২(২)। ● চাঁই সম্প্রদায়ের লোকদেবতা ও লোকগান—ছাকু মণ্ডল, ২০০৪, অভিযাত্রী ফেরি ২(৩)। ● বাঙলা ছড়ার ভূমিকা—নির্মলেন্দু ভৌমিক। ● বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা—শোভারানি চক্রবর্তী, ১৯৭৬, দি বুক ট্রাস্ট, পৃঃ ১৬৬-১৬৭। ● বাংলা ধাঁধার বিষয়-বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়—শীলা বসাক, পুস্তক বিপণি, ১৯৯০, পৃঃ ৭১

খেয়াল গান ও গানের রূপাদর্শ

অপূর্বসুন্দর মৈত্র*

ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা সঙ্গীতের যেসব অবয়ব গঠন করে গিয়েছিলেন অর্থাৎ যে-রাগরূপগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, সেসবই ছিল ভাষা-নিরপেক্ষ। অবশ্য বাণীকে বর্জন করে সঙ্গীত কোন কালে কোন দেশেই তার বিজয় অভিযানে নামতে পারেনি। তবু স্বরসন্দর্ভ রচনা বা রাগরূপ রচনাই ছিল সঙ্গীতের সাধারণ ও প্রধান লক্ষ্য।

সব দেশের সব সঙ্গীতের মূল রূপটি তাই ভাষা-নিরপেক্ষ। সাঙ্গীতিক স্বরগুলিকে কোন বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় বা form-এ নিবদ্ধ করে ব্যঞ্জিত করলেই হয় সঙ্গীতের জন্ম। ভাষার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। কিন্তু সঙ্গীত যখনি বাণীবদ্ধ হয়, তখনি গড়ে ওঠে ভাষার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং শুরু হয় সেই সম্বন্ধের মূল্যায়ন।

অবশ্য স্বর যেমন নিজের ভাব নিজেই প্রকাশ করতে পারে, ভাষাও তেমনি পারে নিজের ভাবসম্পদকে স্বাধীনভাবে অবারিত করতে। তবে কেন স্বর বা সুরের সঙ্গে কথাকে জুড়ে দেওয়া? কথা কেন তার নিজের সাম্রাজ্যের অধিকারে সন্তুষ্ট না থেকে সুরের রাজ্যে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে, আর সুরই বা কেন কথার বশ্যতা মেনে নিতে লালায়িত হয়? কেন হয় তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে মনে হয়, ভাবের মিলন-মাল্যের বাঁধনে বাঁধা পড়তে উভয়ই সমান উৎসুক।

সে যাই হোক, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, সুরের মধ্যে ভাবের অলৌকিকতা-জনিত কিছু অস্পষ্টতা আছে। সেই ভাবকে স্বপ্নের মতো শুধু অনুভব করা যায়, প্রত্যক্ষের মতো ধরাছোঁয়া যায় না। বাণীবদ্ধ কাব্যে ভাব মূলত নভোচারী হলেও অনেকটা প্রত্যক্ষ ও স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে।

তাই সুরের ভাবকে বিশেষরূপে উপভোগ করার জন্যই বাণীর ভাবের সঙ্গে তার সম্মিলন ঘটাতে হয়। অথবা বলা যায়, দুটি ভাবের স্রোতোধারাকে সম্মিলিত করে একটি বেগবান ভাবনার জন্মদানই তার উদ্দেশ্য। মনে হয়, গীতরচনার মূলগত কারণ এইটিই।

সংস্কৃত যুগে অর্থাৎ প্রাক্ মুসলমান যুগে বা তারও আগে আমাদের দেশে যেসব নিবদ্ধ গান ছিল, সেসবই ছিল ধ্রুপদ বা ঐধরনের গীতরচনা। ধ্রুপদের ভাবের মহত্ত্বকে ভাষায় বজায় রাখা হয়েছিল এবং সেই ভাবকে যথোপযুক্তভাবে স্বরমণ্ডিত করে প্রবর্ধিতও করা হয়েছিল একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় ছন্দে ও লয়ে লীলায়িত করে। কিন্তু খেয়ালের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার গুরুত্ব ও মহত্ত্বকে যেন অবজ্ঞা করার প্রবণতা দেখা দিল এবং কালক্রমে ভাষাকে সুরের দোসরের আসন থেকে নামিয়ে পদতলে দাসের আসনে বসানো হলো অসঙ্কোচে। সেইজন্য খেয়াল গানের বিপুল বিস্তারের মধ্যে বাণীর দৈন্য প্রকট হলো সর্বত্রই। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হিন্দি খেয়াল গানের গ্রন্থ 'সঙ্গীত ক্রমিক পুস্তকমালিকা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দি ভাষায় খেয়াল গানের গঠনে (যাকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় 'বন্দিশ' বলে) যত মুনশিয়ানাই থাকুক না কেন, তার ভাষাতে যে রসবস্তুর যথেষ্ট অভাব আছে তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। পূর্বোক্ত পুস্তকটির গানগুলি পর্যবেক্ষণ করলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব যদি খেয়ালের গঠন 'বন্দিশকে' ভাবসমৃদ্ধ কোন অপর ভাষায় স্থানান্তরিত ও কোন উন্নত বাণীকে উপযুক্ত সুরের দোসর করে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারা যায়, তবে আপত্তির কারণ হবে কেন? বাঙলা ভাষায় খেয়াল গান রচনা, চর্চা ও গুণিজনসভায় তার পরিবেশনে সঙ্কোচবোধ হবে কেন? বাঙলা সাহিত্য যে কাব্যগুণে আজও সমৃদ্ধ, যুক্তিতর্কের দ্বারা সে-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান কালের এবং পূর্ব কালের বঙ্গসাহিত্যকৃতিই তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। তাই কাব্যসমৃদ্ধ বাঙলা ভাষায় যথার্থ কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনা যদি খেয়াল গানে প্রযুক্ত হয়, তবে তাতে কেমন করে যে সে-গানের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে তা দুর্বোধ্য। অথচ বহু লোকের এবং বহু শিল্পীরও আজও এই ধারণাই বর্তমান যে, হিন্দি ভাষাকে পরিত্যাগ করলে খেয়ালের খেয়ালত্ব থাকবে না। কিন্তু কেন থাকবে না?

* *সঙ্গীতবিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও গবেষক।*

একথাটা ভুলে গেলে চলবে না যে, হিন্দি ভাষাটাই খেয়াল গান নয়। খেয়ালের আলাপ, বিস্তার, তান-সরগম সবই ভাষাবিহীন। এধরনের গানে যেটুকু ভাষা থাকে, স্বরবিস্তারে তাও ভাবহীন ধ্বনি মাত্ররূপেই প্রতিভাত হয়। এরকম আঙ্গিক খেয়াল গানে প্রথাগত হওয়ার জন্যই যে বাণীর মূল্য অনেকাংশে খর্ব হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। তবু যেটুকু বাণী নিয়ে খেয়ালের কারবার, সেটাই বা সুরের মতো মিলনসূত্রে আবদ্ধ হবে না কেন? কেন তার মধ্যে ভাবের সম্পদ, মহত্ত্ব ও যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না?

অবশ্য ভাব ও ভাষা-সমৃদ্ধ সব বাঙলা কাব্যাংশই খেয়াল গান তথা যেকোন প্রকার গানের উপযোগী নাও হতে পারে। সুর ও কথার মিলনে গান জন্ম নেয় বলেই গানের জন্মদাতাকে সুর ও কথায় ঐশ্বর্যগুণ-সমৃদ্ধ হতে হবে। কেবল সঙ্গীতজ্ঞ অথবা কবি দ্বারা গান রচনা সার্থক হতে পারে না। সেইজন্য গানের সৃজনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রজনীকান্ত প্রমুখ কবি-সঙ্গীতজ্ঞ যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন, অনেক ভাল কবি চেষ্টা করেও তা পারেননি। অপরদিকে অনেক উঁচু মানের সঙ্গীতজ্ঞ কবি প্রতিভার অভাবে গান রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন। আসল কথা এই যে, গান রচনার সময় সুরকে ভাব ও ভাষার মধ্যে অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের রূপগত সাযুজ্যও নির্ধারণ করতে হয়। তবেই বাণী হয়ে ওঠে যথার্থ সঙ্গীতোপযোগী। এরকম সুষ্ঠু যোগাযোগ সচরাচর হয় না, আর তা হয় না বলেই ভাবসমৃদ্ধ সব গীতরচনাকেই সার্থক গানের পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায় না।

খেয়াল গানের বিস্তারে ভাষাকে বাহন করার অবাধ অধিকার সুরকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি একটিমাত্র শব্দকে বা শব্দের একটিমাত্র বর্ণকেই সুরের সঙ্গে প্রসারিত করে ক্রমাগত এগিয়ে চলা বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করার ঢংটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করাই যেন খেয়াল গানের তদারকি বা গায়নরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেই হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে 'বঢ়ত' বলা হয়।

এর ওপর আছে 'বোলতান্' অর্থাৎ কথাগুলোকে তানের সঙ্গে নানাভাবে জুড়ে দেওয়া। অতএব যে-শব্দটিকে বা শব্দগুলিকে সুরের বাহন করা হবে, তার গতি ও গঠন এমন হওয়া চাই যাতে সে সুরকে অনায়াসে বহন করতে পারে। হিন্দি ভাষায় মনে হয় শব্দের সে বহনশক্তি আছে, আর না থাকলেও কাজ আটকে থাকে না। শব্দকে বা শব্দাংশকে যথেচ্ছভাবে টেনে-হেঁচড়ে, দুমড়ে, বেঁকিয়ে পিটে পিটে নানা ছাঁচে গড়ে সুরকে তার স্কন্ধারূঢ় করা চলে। মনে হয়, কথার দাসত্ব-সম্বন্ধটা তার বাহনত্বের মধ্যে প্রকট করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু বাঙলা গানের বেলায় কথাকে কেবল ভারবাহী করার দরকার নেই। এভাষার জৌলুসটাই এমন যে, কাঁধে না চড়ে সুর তার হাত ধরে আসরে নামতে পারে। তাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু খেয়াল গানের ঢংটিকে তো পালটে দেওয়া যায় না। তার আদল বা form-টা তো বজায় রাখতেই হবে। তবে ভাষার ভারবাহকত্বের দুর্দশা ঘোচানো যাবে কি করে? ঘোচানো যাবে যদি ভাষা সুন্দর, উপযুক্ত ও সপ্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ যদি দাস হওয়ার চেয়ে দোসর হওয়ার গুণই তার মধ্যে বেশি থাকে, যদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতাচার্যদের নির্দেশ মেনে চলা হয়।

যেসব গানে সুর কেবল নিজ কৃতিত্ব জাহির করতেই তৎপর নয়, কথাকেও গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত—সেখানে সমস্যা বড় একটা কঠিন নয়। কিন্তু খেয়ালের মতো গানের ক্ষেত্রে, যেখানে সুর কথাকে অনবরত দাবিয়ে রাখতেই চায়, সেখানে সমস্যা বড় জটিল। সুতরাং সুরপ্রধান খেয়ালে কথার জৌলুস কিভাবে আনা যেতে পারে তা দেখা দরকার। এমনভাবে খেয়ালের কাব্যাংশ রচনা করতে হবে, যাতে কথা, সুর ও ভাবের সুন্দর মিলন ঘটে; যাতে শব্দ ও বাক্যাংশগুলি খেয়ালের খেয়ালিপনার সুযোগ দেয়।

একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, সাধারণত ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত শব্দকে সুরের টানে বিস্তারিত করা কঠিন। শব্দ যখন স্বরান্ত হয়, তখনি তার বিস্তার স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। অবশ্য স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটি ছাড়া আর সব বর্ণই এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত। তাই যে-কাব্যের প্রতি কলির শেষে স্বরান্ত শব্দ (অ-ছাড়া) স্থানলাভ করে, সেই কাব্যই গানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী হয়। অবশ্য হিন্দি গানের ক্ষেত্রে ভাষায় হলন্ত শব্দের আধিক্য থাকলেও পদ ও বর্ণকে যথেচ্ছভাবে ভেঙে উচ্চারণ করার জন্য এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। বাঙলা ভাষায় রচিত গানে শব্দের এরকম বিকৃতি কিন্তু চলে না। কারণ, বাঙলা সাহিত্যে পদের ধ্বনি-সৌন্দর্য বজায় রাখাই প্রথা।

অনেক গীত-রচয়িতাই এই সত্যটি সম্বন্ধে উদাসীন বা অজ্ঞ। একাধিক ভাল রচনাও যে গানের উপযোগী হয় না, এটা তার অন্যতম কারণ। একালে আবার নিছক কবিতাকেই গানে রূপায়িত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু কবিতার গঠন ও প্রতিপাদ্য (form and content) গানের অনুরূপ নয়। যেজন্য কবিতায় সুরারোপ করা কঠিন এবং তা স্বাভাবিক হয় না; আর জোর করে সে-চেষ্টা করলে কবিতা-গানে সুরের মহত্ত্ব ও মাধুর্য থাকে না। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার বিষয় থাকলেও এখানে তার অবকাশ না থাকায় শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে।

আরো একটা কথা, খেয়াল গান রচনায় বা খেয়াল গানের মতো সংক্ষিপ্ত কাব্য রচনার প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই ভাবের

সম্পূর্ণতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এমনকি গানের প্রতিটি শব্দই যদি স্বনির্ভর ও ভাবপূর্ণ হয়, তবে সেই শব্দ নিয়ে সুরবিহার (improvisation) খুবই সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেয়াল গানে রচনা এমন হওয়া চাই যে, গানের প্রত্যেকটি পঙ্ক্তিই যেমন ভাবের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি আবার সে-রচনার আগাগোড়া ছেয়ে থাকবে একটি ভাবগত যোগসূত্রের ঐক্য।

একথা শুধু খেয়াল গানের পক্ষে নয়, সবরকম গীত রচনার পক্ষেই প্রযোজ্য। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাগের নিজস্ব ভাবের সঙ্গে বাণীর ভাবগত মিল ঘটাতেই হবে। তা না হলে খেয়াল গান সুর নিয়ে যতই খেয়ালিপনা করুক না কেন, তার বাণীর কৌলিন্য বজায় থাকবে না এবং তার গান-সংজ্ঞাটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়বে। আসল কথা, সঙ্গীতকে গান হতে গেলে কাব্যকে মর্যাদা দিতেই হবে। অতি প্রাচীন কালে নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত সেই কথাই বলেছিলেন ঃ "গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকং/ বাদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্।" অর্থাৎ স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্ব-গানে পদই হবে (সার) বস্তু এবং স্বর ও তাল হবে সেই পদেরই অনুভাবক। অনুভাবক বলতে প্রভাবযুক্ত বা ভাবানুসারী হওয়া বোঝায়।

গানের অর্থেই 'গান্ধর্ব' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সেকালে গানের দুটি বিভাগ ছিল—গান্ধর্ব এবং গান। যে-গান স্বর্গলোকে গীত হতো, তার নাম ছিল 'গান্ধর্ব' এবং যা ছিল মর্ত্যলোকের মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'গান'। সুতরাং গান্ধর্ব নামাঙ্কিত গানের আদর্শ সব গানের পক্ষেই প্রযোজ্য বলে মনে করতে হবে।

প্রত্যেক গানেই যে পদ, স্বর ও তাল থাকবে—এ তো জানা কথা। শুধু প্রশ্ন এই যে, এদের পরস্পরের সংযোগটা কেমন হবে? ভরত পদকে বললেন 'বস্তু'। তার মানে কাব্যকে দিলেন প্রাধান্য ও মর্যাদা। আর স্বর ও তালকে করলেন পদের বা কাব্যের অনুভাবক। সোজা কথায়, ভরতের সিদ্ধান্ত হলো—গানে পদ, স্বর ও তাল থাকবে। কিন্তু স্বর ও তাল পদের বা কাব্যের প্রভাবযুক্ত বা তার ভাবের অনুসারী হবে। আচার্য ভরত শুধু যে গানের পদকে উঁচু আসনে বসালেন তাই নয়, স্বর ও তালকেও তার প্রভাবাধীন করলেন। এযুগের গানে আচার্যের এই নির্দেশ মানা হয় কিনা তা বিবেচ্য?

ভরতের বহুকাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এর রচয়িতা শার্ঙ্গদেব ভরতের ভাবাদর্শ অনুসরণ করে এবং তারই বাণীকে বিশ্লেষণ করে গানের পদ কিরকম হবে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ভরত যেকথা খুলে বলেননি, শার্ঙ্গদেব সেকথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন 'বাগ্‌গেয়কার' নামে একটি নতুন কথার প্রবর্তন করে। তিনি বললেন ঃ "বাচং গেয়ং চ কুরুতে যঃ স বাগ্‌গেয়কারকঃ।" অর্থাৎ পদ বা কাব্য রচনা এবং স্বর রচনা—এই দুটি কাজই যিনি করতে পারেন তিনিই 'বাগ্‌গেয়কার'। বাগ্‌গেয়কার-এর চিন্তাটি উদ্ভূত হয়েছিল সম্ভবত এই জন্যই যে, গানের ক্ষেত্রে প্রাচীনকালে কোন এক সময় হয়তো বাক্যপদ ও স্বর রচনার সমান দক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যদি যেকোন পদের সঙ্গে যেকোন স্বরের যথেচ্ছ সংযোজন আদর্শ হতো, তবে শার্ঙ্গদেব বাগ্‌গেয়কার-এর বিষয়টির প্রবর্তন করতেন না এবং বলতেন না যে, পদরচনার দক্ষতাও স্বররচনার দক্ষতার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এথেকে বেশ বোঝা যায়, পদ, স্বর ও তাল-যুক্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে ভরত যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারই সুযোগ নিয়ে পুরাকালে একসময় প্রচুর অনুপযুক্ত পদ গানের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল। শার্ঙ্গদেবের আমল পর্যন্ত তার আধিপত্য ছিল অব্যাহত। শার্ঙ্গদেব তাই এবিষয়ে অবহিত হন এবং পদকর্তা ও স্বরসন্দর্ভ রচয়িতার মূল্যায়ন শুরু করেন। তিনি বাগ্‌গেয়কার-এর ৮টি বিশিষ্ট গুণ থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। সেই গুণগুলি হলো সুদক্ষ কবি ও কুশলী শিল্পীর সমস্ত গুণ, যা বাগ্‌গেয়কার-এর মধ্যে সংযুক্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে।

অতএব বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রমুখ কবি-সঙ্গীতজ্ঞদের গানে যে আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় তা আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদেরই নির্দেশিত গানের আদর্শ। এঁরা ছিলেন সার্থক 'বাগ্‌গেয়কার'। কিন্তু এঁদের পরে এই অত্যাধুনিক যুগে গানের সেই মহান আদর্শটি অনুসরণ করা হচ্ছে না। তার কারণ প্রধানত এই যে, পদ ও স্বর রচনায় সমান দক্ষতা দুর্লভ হয়ে উঠেছে। সফল বাগ্‌গেয়কার আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বিদেশের বিকৃত সঙ্গীতের মাদকতা এমনভাবে এদেশের সৃজনশক্তি ও মানসিকতাকে পর্যুদস্ত করেছে যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মহিমা প্রকাশ করার আর উপায় থাকছে না।

আজ ভারতবর্ষের গান যে ভারতের মধ্যেই হতমান হয়েছে, সঙ্গীতের পরিচয় যে কালিমালিপ্ত হয়েছে তাতে আর আশ্চর্য কি? রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক—সবরকম ভ্রষ্টাচারের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতও আজ নিদারুণ ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত। এই দুরবস্থা দূর করার জন্য নির্লোভ, সাহসী, আদর্শনিষ্ঠ এবং সুদক্ষ বাগ্‌গেয়কার-এর প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই সঙ্গীতব্রতীর, যিনি একাধারে কাব্য ও স্বর রচনায় পারদর্শী; প্রয়োজন সেই কাব্য ও স্বরের সুষ্ঠু সংযোজনা ও তার প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টা। ■

দেবী সারদা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

বাঁদিকে ঠাকুরের ঘর। এই ঘরে ঠাকুর ও মা প্রথমে একসঙ্গে থাকতেন। পরে মা উঠে এলেন নহবতে।
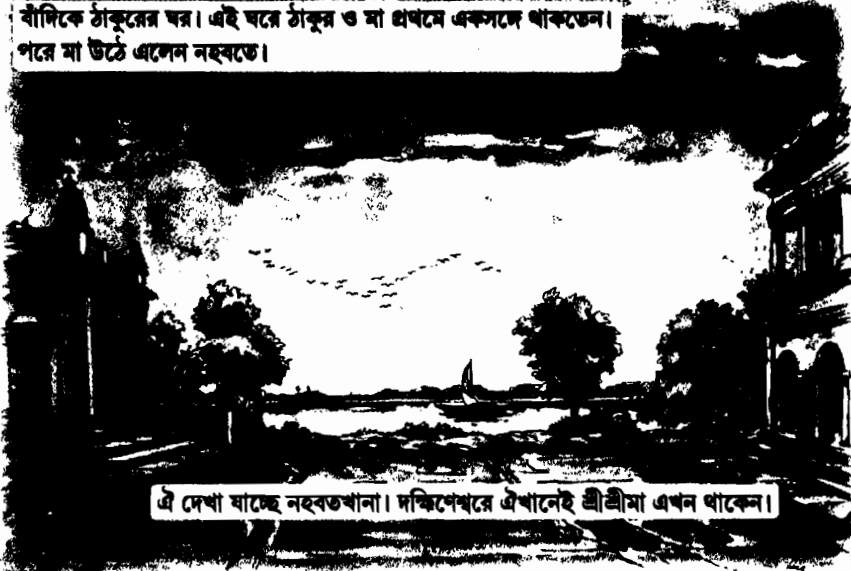
ঐ দেখা যাচ্ছে নহবতখানা। দক্ষিণেশ্বরে ঐখানেই শ্রীশ্রীমা এখন থাকেন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ফলহারিণী কালীপূজার দিনে, একদিকে মন্দিরে যখন পূজার প্রস্তুতি চলছে—

সেদিন গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীমা এসে বসলেন দেবীর আসনে। আর পূজকের আসনে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।
তুমি একটু ধ্যান কর।

বে • ঙ্গ • ল
পিয়ারলেস

অতঃপর গভীর নিশীথে—
হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।
পূজার শেষে, মা তখন সম্পূর্ণ সমাধিস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন ঃ
হে জগজ্জননী, আমার সকল সাধন ফল, জপমালা তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। তুমি গ্রহণ কর। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।/শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

মা আসেন

মা বলতেন, ভক্তের ডাকে মা আসেন সাড়া দিতে,
অনেক সময় ভক্তের তাঁকে ভুল হয় চিনে নিতে।
তাহলে এমনই এক ঘটনার কথা বলি শোন তবে,
শুনলে, মায়ের ছলনা কেমন, একটা ধারণা হবে।
মায়ের ভক্ত পাহাড়ি নদীতে করতে গেছেন চান,
মা-র ভাবনায় সারাক্ষণ তাঁর মন করে আনচান।
মনে মনে ক'ন, মাগো, এত কাঁদি, দিলে না তো দর্শন,
শুনেছি ভক্তে দয়া কর তুমি, বুঝি না মা, তা কেমন।
হঠাৎ মায়ের ভক্ত দেখেন, এক সে কিশোরী এসে
তাঁর পাশটিতে কাপড়-চোপড় কেচে চলে হেসে হেসে।
তাতে ভক্তের বড় রাগ হয়, মনে মনে চটে যান,
কাপড়ের জল ছিটে লাগে গায়, কেমনে করেন চান।
মেয়েটি স্বভাবে চঞ্চলা, মুখে হাসিটি সর্বদাই,
কাপড়ের জল কোথায় ছিটায়, কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।
পর পর দুটো দিনেই এমন বিঘ্ন চানের ঘাটে,
মায়ের ভাবনা, চানে অশান্তি—দুই নিয়ে দিন কাটে।
তৃতীয় দিনেও ভক্ত দেখেন, চানের সময়টিতে
সেই কিশোরীটি কাচছে কাপড় ছড়িয়ে জলের ছিটে।
মায়ের ভক্ত খুব রেগে যান, হলেন ধৈর্যহারা।
বলেন, তোর কি আক্কেল নেই? তুই বা কেমনধারা?
দেখছিস, সাধু চান করছেন, আর তুই তাল বুঝে
কাপড় কাচিস, আর কোন ঠাঁই পাস না কি তুই খুঁজে?
ভক্ত সাধুর অভিযোগ শুনে একটি কথা না বলে
কাপড়-চোপড় গুছিয়ে হাসতে হাসতে সে গেল চলে।
রাত্তিরে শুয়ে ভক্তের মনে একই সেই তোলপাড়,
মাগো, এত ডাকি, তবু দেখি তোর দেখা মেলা হলো ভার।
সেই রাত্রেই ভক্ত স্বপ্নে দেখলেন সেই মেয়ে
হাসিমুখে আছে চেয়ে।
ভক্ত সাধুকে বলে সে-কিশোরী অভিমান-মাখা সুরে,
দেখা তো দিলুম, চিনলি না তুই, তাড়িয়ে তো দিলি দূরে।
আহা, সে-সাধুর ঘুম ভেঙে যায়, সেই ঘাটে যান ছুটে,
কোথা সেই মেয়ে, তার সন্ধান মিলল না মাথা কুটে।
মা বলেন, ওগো, কোন্ মূর্তিতে মা আসেন কার কাছে
বুঝতে পারি না, কাজেই কারেও সরিয়ে দিতে কি আছে?*

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

* সূত্র : সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী

পুজো মানে...

পুজো মানে শরৎকাল বইছে হিমেল হাওয়া
পুজো মানে আকাশ জুড়ে মেঘের আসা-যাওয়া।
পুজো মানে কাশের ক্ষেতে আগমনীর সুর
পুজো মানে সেই সুরেতেই প্রকৃতি ভরপুর।
পুজো মানে নীল সরোবর পদ্মফুলের হাট
পুজো মানে শিশির বুকে ভোরের সবুজ মাঠ।
পুজো মানে আলোয় আলো সন্ধ্যা-রাতের বেলা
পুজো মানে ভরদুপুরেও ছেলেপুলেদের খেলা।
পুজো মানে নতুন সাজে গল্পগুজব করা
পুজো মানে বন্ধ থাকে ক'দিন লেখাপড়া।
পুজো মানে রাগ, হিংসা, অভিমানের শেষ
পুজো মানে দুর্গামায়ের অরূপরতন বেশ।
পুজো মানে ভুবনজোড়া ছাতিমফুলের গন্ধ
পুজো মানে দীনের ঘরেও এক আকাশ আনন্দ।
পুজো মানে হরেক খাওয়া, যা ইচ্ছা তাই
পুজো মানে রাত্রি জেগে ঠাকুর দেখা চাই।
পুজো মানে গৌরী সেনের মণ্ডপেতে বসা
রোগে জীর্ণ রেবতি রায়ের প্রতিমা দেখতে আসা।
পুজো মানে অসুরনিধন, শুধুই অসুর নয়
সব অশুভ নাশ কর মা, সকল রকম ভয়।
পুজো মানে অকালবোধন, বোধন ঘরে ঘরে
মানুষ আবার নতুন করে বাঁচার শক্তি ধরে।
পুজো-শেষে আস্তিকে-নাস্তিকে করে আলিঙ্গন
প্রাণের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠে সুদৃঢ় বন্ধন।

অনিবাণ কর

ছবি : সৌরাশ মিত্র

স্বামীজীর 'বাঙাল' শিষ্য

রণতোষ চক্রবর্তী*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশকে শিরোধার্য করে স্বামী বিবেকানন্দ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠান আজ শতাধিক বছর ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণে নিয়োজিত আছে। দলে দলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যেমন আত্মনিবেদন করে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মধারাকে সজীব ও সচল রেখে চলেছেন, তেমনি আছেন কতিপয় গৃহী ভক্ত ও কর্মী। মিশন প্রতিষ্ঠার একেবারে জন্মলগ্নে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গৃহী ভক্তের অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'বাঙাল' শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ভক্তদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের "ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকতে হয়, তাহলে সংসার আর ভার বোধ হয় না"—উক্তির সার্থক প্রতিরূপ ছিলেন শরচ্চন্দ্র।

স্বামী বিবেকানন্দ

সংসারী হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে অসুবিধা হয়নি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর। শুধু ভক্ত ছিলেন—এমন নয়, ছিলেন সুলেখকও। শ্রীম-র পরামর্শে শিষ্য ও গুরুর আলোচনা ও কথোপকথনের বিবরণকে তিনি ধরেছিলেন দুই মলাটের মাঝে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' শিরোনামে। এছাড়া তাঁর লেখা 'সাধু নাগমহাশয়' গ্রন্থও সুপরিচিত। মাত্র এই দুখানি গ্রন্থ আজও তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে স্মরণযোগ্য করে রেখেছে। অথচ মাত্র পাঁচবছর (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭—জুন ১৯০২) তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিবরণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে। নানা তথ্য ও তত্ত্ব-গুণে গ্রন্থটি আজও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ বুঝতে নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ। গুরু-শিষ্যের ঘরোয়া আলোচনার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে চলেছে এই গ্রন্থটি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সকলেই প্রায় ছিলেন কলকাতা ও আশপাশ এলাকার। সাবেক পূর্ববঙ্গের ভক্ত ছিলেন না বললেই চলে। ঠাকুরের কাছে একমাত্র এসেছিলেন দুর্গাচরণ নাগ—'নাগ মহাশয়' নামে যিনি আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নাগ মহাশয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি একটা ঈর্ষণীয় মাত্রা পেয়েছিল। স্বামীজী নাগ মহাশয়ের মতো মানুষ সমগ্র পৃথিবী ঘুরে একজনকেও পাননি বলে মন্তব্য করেছিলেন। শরচ্চন্দ্র ছাত্রাবস্থায় নাগ মহাশয়ের কথা শুনে তাঁর বাড়ি ঢাকা জেলার দেওভোগ গ্রামে একবার গিয়েছিলেন। নাগ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এভাবেই। তাঁর কাছ থেকেই শরচ্চন্দ্র প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিশদ জানতে পারেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর কলকাতায় যান। সেখানে ছাত্রাবস্থায় দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাজার মঠে যেতে থাকেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী

* কলকাতা-নিবাসী, শারীরবিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কয়েকটি বহুল প্রচলিত পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখের সঙ্গলাভে আনন্দিত হতেন। এঁদের উপদেশ শুনতেন। কখনো বা রান্নার কাজে তাঁদের সাহায্য করতেন, এমনকি অনেক সময় সন্ন্যাসীদের এঁটো বাসন মেজেও সেবা করতেন। নাগ মহাশয়ের স্নেহ পেয়েছিলেন শরচ্চন্দ্র। সে-কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ শরচ্চন্দ্রকে গৃহী জেনেও দীক্ষা দিতে অসম্মত হননি। অবশ্য স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল অনেক পরে। এর অনেক আগেই তিনি অন্যান্য গুরুভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থেই পাওয়া যায়ঃ "প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন-চারদিন হইল স্বামীজী কলকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ।... শিষ্য লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুজ্যে মহাশয়ের বাড়িতে বেলা প্রায় ২॥০টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনো আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।"

এখানে 'শিষ্য' বলতে শরচ্চন্দ্র নিজে। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে সঙ্গে করে স্বামীজীর কাছে নিয়ে যান। নাগ মহাশয়ের স্নেহের পাত্র, এছাড়া 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র'-লেখকের নামের সঙ্গে স্বামীজী আগেই পরিচিত ছিলেন। এবার তাঁকে সামনে পেয়ে স্বামীজী সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন, একইসঙ্গে নাগ মহাশয়ের কুশল-সংবাদ জানতে চাইলেন। প্রসঙ্গত, স্বামীজী এর পরেও শরচ্চন্দ্রকে দার্জিলিং বা আলমোড়া থেকে সংস্কৃতে চিঠি লিখতেন।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

শরচ্চন্দ্র চাইলেন স্বামীজীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করতে। তিনি স্বামীজীকে তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিলেন। উত্তরে স্বামীজী জানালেনঃ "নাগ মশায়ের আপত্তি না হলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করব।" এবং তাই হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৯ বৈশাখ শরচ্চন্দ্র মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন স্বামীজীর কাছে। প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্রের উচ্চারণ, চালচলনে পূর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে স্বামীজী স্নেহবশে কখনো তাঁকে 'বাঙাল', কখনো 'ভট্টাচায বামুন'—এরকম নানা নামে সম্বোধন করতেন। শরচ্চন্দ্রকে দীক্ষা দেওয়ার কিছুকাল পর গুরু একবার তাঁর হাতের 'বাঙাল রান্না' খেতে চেয়েছিলেন। বলরাম বসুর বাড়িতে শরচ্চন্দ্র রান্নার আয়োজন করেছিলেন। সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি। গ্রহণের জন্য রান্না-খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে শিষ্য মাছের সুক্তো, মুগের ডাল, কৈ মাছের ঝোল, মাছের টক রান্না করে গুরুর প্রশংসা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে মাছের সুক্তো স্বামীজী এর আগে কখনো খাননি।

শরচ্চন্দ্র ছিলেন সাবেক পূর্ববঙ্গীয়। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারিপুর কুড়াশি গ্রামের কোটাপাড়ায় ছিল তাঁর পৈতৃক ভিটা। তাঁর জন্ম ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। পিতা রামকমল, মাতা বিধুমুখী। পিতার যজমানি আয়ে চলত একান্নবর্তী পরিবার। রামকমল যজমানি করলেও আধুনিক শিক্ষায় তাঁর অরুচি ছিল না। তাই দেখা যায়, পুত্র শরচ্চন্দ্রের স্কুলের পাঠ শেষ হলে কলেজে ভর্তি করালেন। ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন শরচ্চন্দ্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দশ টাকা জলপানিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। ঢাকা থেকে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) তিনি বি. এ. পড়তে আসেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে শরচ্চন্দ্র সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ পরেন। তিনি ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় সফল হলে তাঁর ডেপুটি পদ পাওয়ার অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ডেপুটির পদ না পেলেও ডাকবিভাগে তাঁর চাকরি হয়েছিল। চাকরিসূত্রে তাঁকে কলকাতা ছাড়া গয়া, পূর্ণিয়া, দুমকা, ঝরিয়া, রাঁচি, পুরুলিয়া, কটক প্রভৃতি জায়গায় থাকতে হয়েছে। অবশেষে কটক থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট শরচ্চন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।
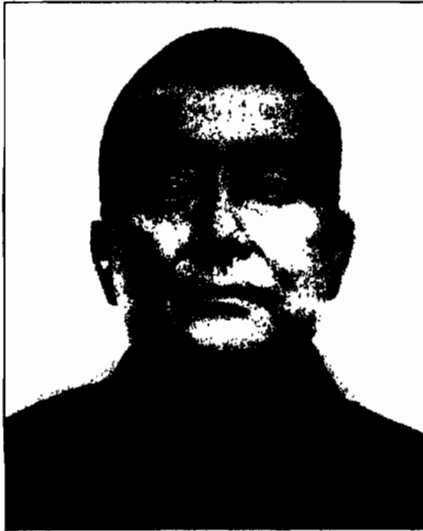
সেযুগের প্রথা অনুযায়ী শরচ্চন্দ্রকে অল্পবয়সে বিবাহ করতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম মোক্ষদায়িনী। তাঁদের ছিল পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। শরচ্চন্দ্রের ছিল একান্নবর্তী পরিবার,

তবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে সংসার পরিচালনা করতেন। রমেশচন্দ্র তাঁর শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথামতো অধ্যাপনা ছেড়ে পুস্তক ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতার 'চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং' নামে বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই শরচ্চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বলরাম বসুর বাড়িতে মিশন গঠনের পর প্রতি রবিবার একই স্থানে বিকাল চারটায় সভা বসত। তাতে শাস্ত্রপাঠক ছিলেন শরচ্চন্দ্র। এছাড়া যে-অনুষ্ঠানে স্বামীজী চারজনকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন শরচ্চন্দ্র। এই চারজনের নতুন নামকরণ হয়েছিল—স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী নির্ভয়ানন্দ। গুরুর সুখ-দুঃখের হদিশ পেতে শিষ্য শরচ্চন্দ্র ছিলেন দক্ষ ডুবুরি। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক। স্বামীজী অমরনাথ দর্শন করে ফিরেছেন, কিন্তু মন একেবারেই ভাল নেই। কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। গুরুভাইরা দুশ্চিন্তায় আছেন। এমন সময় শিষ্য শরচ্চন্দ্র এসে হাজির। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজীর অবস্থা বুঝিয়ে বলার পর অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।

গুরুর অসাধারণ স্মরণশক্তির ক্ষমতা বুঝে অবাক হয়েছিলেন শরচ্চন্দ্র। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে জানা যায়, বহু খণ্ডের 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র দশটি খণ্ড স্বামীজীর পড়া শেষ হয়েছে জেনে শিষ্য শরচ্চন্দ্র তাঁর পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং গুরুর উত্তরে মন্তব্য করেছিলেন—'মানুষের অসাধ্য'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারে সেযুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মতো শরচ্চন্দ্রের ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। তিনি কলকাতার বাইরে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ও তাঁর চাকরিস্থলের বিভিন্ন জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সাধারণের কাছে প্রচার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরচ্চন্দ্র মেদিনীপুরে অবস্থানকালে সেখানকার নাড়াজোলের জমিদার তাঁরই আগ্রহে রামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্য জমি ও বাড়ি দিয়েছিলেন। পারিবারিক সূত্রে আরো জানা যায়, শরচ্চন্দ্রের ইচ্ছায় 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁর গুরুর স্মৃতিসৌধ নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল। তাঁর লেখনীগুণেই সাধুচরিত্র পরম ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জীবনচরিত আজও শত-সহস্র পাঠকের পরিচিত। দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন। যেমন—'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামামৃত' এবং গানের মধ্যে 'মূর্তমহেশ্বরম্', 'তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম', 'কে ও রণরঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী' ইত্যাদি। এছাড়া ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য সম্পর্কে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে তাঁর নিজস্ব মত বুঝিয়ে বলেছিলেন, বলেছিলেন বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখতে। গুরুবাক্য আদেশ হিসাবে নিয়েছিলেন শিষ্য শরচ্চন্দ্র। তাই তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে 'বিবেকভাষ্য' রচনা করেছিলেন। হাতের লেখা ফুলস্কেপ কাগজের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার মূল্যবান পাণ্ডুলিপির সামান্য অংশ তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পর ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। বাকি অংশের হদিশ পাওয়া যায় না। স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে 'উদ্বোধন' পত্রিকাটির দায়িত্ব ভবিষ্যতে নিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্রকে পরবর্তী সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায়িত্ব নিতে না হলেও প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তিনি নিবন্ধ, সঙ্গীত, স্তবমালা ইত্যাদি রচনা করে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

স্বামীজীর স্নেহধন্য ছিলেন শরচ্চন্দ্র। সেই কারণে বিদেশ থেকে সংগৃহীত মাত্র পাঁচটি পোর্সিলিন প্লেটে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোর একটি স্বামীজী উপহার দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে। এই ফটোর পিছনে টাইপ করা একটি কাগজ লাগানো আছে। তার কিছু অংশ এইরকম :

"When Swami Vivekananda returned from the western world... he brought with him five identical prints of Sri Ramkrishna's coloured photograph on porcelain. This print is one from among those five that he presented to his householder disciple Sri Sarat Chandra Chakraborty."

শরচ্চন্দ্রের পুত্রবধূর কাছে আজও এই ফটোটি গৃহদেবতার আসনে সযত্নে রাখা আছে। আর আছে শরচ্চন্দ্রের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী'।■

উৎসগ্রন্থ

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ
২ সাধু নাগমহাশয়
৩ শ্রীবিবেকানন্দ-শিষ্য শরচ্চন্দ্র—স্বামী সদাশিবানন্দ
৪ শরচ্চন্দ্রের জীবনী ও রচনাবলী, বিবেকানন্দ সোসাইটি
৫ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর উত্তরপুরুষগণ

মৃন্ময়ী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী—একান্তই বাংলার

পরমানন্দ প্রামাণিক*

বহু অতীতকাল থেকেই দেবী দুর্গা আমাদের কাছে দুর্গতিনাশিনী-রূপে পরিচিতা। যখনি কোন না কোন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি, আমরা দেবী দুর্গার আরাধনা করেছি। হিন্দুদের মহাকাব্যগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারতেও বিপদে-আপদে দেবী দুর্গাকে আবাহন ও আরাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। রামায়ণে সীতার উদ্ধারে লঙ্কার (বর্তমানের সিংহল) অধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণনিধন যজ্ঞে দেবী দুর্গাকে মহামায়ারূপে অকালবোধন করে রামচন্দ্র তাঁর আশিস কামনা করেছিলেন। দেবী মহামায়া দেখা দিয়ে রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ঃ "রাবণে ছাড়িনু আমি/বিনাশী করহ তুমি।"

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে জয়লাভের জন্য দুর্গাদেবীকে প্রণাম করতে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে উপদেশ দেন। যদিও ভীষ্মপর্বের ২৩তম অধ্যায়ে দুর্গাকে 'সরস্বতী' বলা হয়েছে। এছাড়াও বনপর্ব সমাপনান্তে অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে নিজের, ভায়েদের ও দ্রৌপদীর আত্মগোপন সুনিশ্চিত করতে যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে প্রবেশের পর দেবী দুর্গাকে পূজা করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। এখানে দেবীস্তুতিতে দেবী দুর্গাকে 'মহিষাসুরনাশিনী' বলা হয়েছে। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ যে নিষ্পাপ ব্যক্তি আমার নাম স্মরণ করে, তার কোন দুর্লভ বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

দুর্গাপূজা শুধু হৈচৈ আনন্দ-উৎসব নয়, সমস্ত মানুষের সারা বছরের ভরণপোষণের রক্ষাকবচ। দেবীর কাল্পনিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের যানবাহনাদির ওপর দেশের ও দশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে বলে আমাদের বিশ্বাস। এর বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্যক জ্ঞান নেই। আবাল্য যা শুনে আসছি, তা-ই বিশ্বাস করেছি।

ঋগ্বেদের যুগ থেকেই দেবী দুর্গার পূজার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বিষ্ণু-দুর্গা, সিন্ধু-দুর্গা ও অগ্নি-দুর্গার উল্লেখ আছে। আসেরিয়দের যুদ্ধদেবী 'অনাহিতা'কে যুদ্ধং দেহী সিংহবাহিনী মূর্তিতে দেখা গেছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৮১-৯৩ অধ্যায়) দেবী দুর্গাকে 'মহিষাসুরমর্দিনী' বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এঁকেই অন্য নামে ও অন্য রূপে দেবতারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজ নিজ আয়ুধে সমৃদ্ধ করে অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুররূপী অসুরকে নিধন করে শুভ শক্তির প্রসার ঘটাতে দেবী দুর্গাকে 'মহিষাসুরমর্দিনী'রূপে পাঠিয়েছিলেন।

বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গার চৌষট্টী যোগিনীর অন্যতমা 'অপরাজিতা'র পূজা করা হয় (দ্রঃ মৎস্যপুরাণ)। অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থে মহাদেব কর্তৃক তিনি সৃষ্টা। বরাহপুরাণ-মতে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা মহিষাসুর-যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নয়নোৎপন্ন বৈষ্ণবী মূর্তির সহচরীরূপে অভিহিতা। শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনের পর দেবতাদের স্তবের উত্তরে দেবী চণ্ডী তাঁদের বলছেন ঃ আমি শাকম্ভরী অবতারে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করব বলে 'দুর্গা দেবী' নামে প্রসিদ্ধা হব। (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/৪৯-৫০)

দেবী দুর্গা শুধু হিন্দুধর্মেই পূজিতা নন—বৌদ্ধধর্মেও তিনি সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা 'কোটশ্রী দেবী' নামে পূজিতা। বৌদ্ধধর্মের 'মারিচী' দেবীও দশভুজা। তিব্বতী লামারা 'মারিচী' দেবীকে 'উমা' দেবী নামে আবাহন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের 'মহাবস্তু'তে উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব জননীর সঙ্গে কপিলাবস্তুতে এসে শাক্য বংশের 'অভয়াদেবী'র আরাধনা করেন। কারো কারো মতে, 'অভয়াদেবী'ই দুর্গা। গুরুগোবিন্দ সিংয়ের 'দশম বাদশাহ-কি' গ্রন্থের (প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুকরণে লিখিত) ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশেও দুর্গার শ্রীশ্রীচণ্ডীরূপের উল্লেখ আছে।

ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড় সংলগ্ন এলাকা হাতিদের বিচরণভূমি। এই এলাকায় জাজপুরের ভূমিজদের পেটকার জমিদাররা হাতি-অধ্যুষিত এলাকায় বাস করায় হাতিকে তাঁদের রক্ষকজ্ঞানে পূজা করেন। সেই হাতিই তাঁদের আদি দেবী 'রনকিনি'। এই

* *অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, দুর্গাপুর ইস্পাত ফ্যাক্টরি; সন্তোষপুর, কলকাতা-নিবাসী; নৃতত্ত্ব গবেষক।*

দেবী ভূমিজদের হিন্দুধর্মে রূপান্তরের পর অষ্টভুজা দুর্গার প্রতীক হিসাবে আজও পূজা পেয়ে আসছেন (জে. আই. এ. এস., জুলাই, পৃঃ ১৭৯)। তাদের উপকথায় বলা হয়েছে, পেটকার জমিদার ঘাটশিলায় রাজধানী স্থাপনের আগে স্বয়ং তাঁদের আদি পারিবারিক বাসভূমি 'ধারা' নগরে গিয়ে দেবী 'মহিষাসুরমর্দিনীর' কৃপাধন্য হতে তাঁর পূজা দিয়েছিলেন। দেবী তাঁর প্রার্থনা পূরণ করাতে তিনি মহুলিয়া পাহাড়ে তাঁর মূর্তি স্থাপনা করেন। (রাউল, ১৯২৮, পৃঃ ৩০)

কোন্ অতীতকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী এবং সুবর্ণরেখা নদী উপত্যকা অঞ্চলটা যখন গভীর বনভূমিতে এবং দূরতিক্রম অগম্য পাহাড়ি পথের ছিল, তখন থেকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি অঞ্চলের মুণ্ডাদের একটা দলছুট অংশ এখানে বসতি শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনাধীনের আগে এই এলাকার জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দু রাজাদের প্রভাবে এরা 'ভূমিজ' (যাদের চাষযোগ্য ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল) নামের আদিবাসীতে পরিবর্তিত হয়। পরে একাদশ শতাব্দীতে যখন এই এলাকাটা ওড়িশার ভূস্বামীদের অধিকারে যায়, তখন এই এলাকাতে রাজস্থান থেকে আসা ওড়িশায় বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের বসতি শুরু হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃঃ ৭৬) পরে যখন বাংলায় মুসলমানদের আক্রমণ ও আধিপত্য শুরু হয়, তখন এই ব্রাহ্মণরা জঙ্গলের গভীরে চলে গিয়ে এই ভূমিজদের সঙ্গে মিশে তাদের নিয়ে ঐ এলাকাটা সুরক্ষিত করতে একটা যোদ্ধাবাহিনী গড়ে তোলে। তখন থেকে এরা 'ভূমিজ' নামের পরিবর্তে 'হিন্দু ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হয়। ফলে এদের দলপতিরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু দেব-দেবীর ভক্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্গা ও কালীকে গৃহদেবতা হিসাবে মান্য করতে থাকে। এইভাবে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদি মুণ্ডাদের 'রণকিনি' দেবী সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে গণ্য হলেও দুর্গা, কালী গৃহদেবতা হিসাবে পরিগণিত হন—যার ধারাবাহিকতা এখনো রয়েছে।

বিষ্ণুপুরের দেবী মৃন্ময়ী

বাল্মীকি রচিত রামায়ণেও দেবী দুর্গাকে গৃহদেবতারূপে পূজার কথা বলা হয়েছে। রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য অধিবাসক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর মাতৃদর্শনে এসে দেবী দুর্গাকে তুষ্ট করার অভিলাষে রাম বলছেনঃ "নানা উপহারে মাতা কর ইষ্ট পূজা/মম প্রতি তুষ্ট যেন হন দশভুজা।" (রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৮৭)

অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, বাংলায় মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন প্রায় হাজার বছর আগের। বিগত ১০০-২০০ বছর আগেও বাংলার সমৃদ্ধশালী, স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী গৃহস্থ পরিবারের প্রতিটি বাসগৃহের চণ্ডীমণ্ডপ গৃহদেবতা হিসাবে দুর্গাপূজার নিদর্শন আজও বহন করছে। ঐসময় এমন সার্বজনীন পূজার আয়োজন ছিল না। পূজার কয়দিন এলাকার প্রতিটি পরিবারের লোকজন জাতপাত-ভেদে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে আহার করাকে দেবীর আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করতেন।

মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মৃন্ময় মূর্তিগুলি মাতৃপূজাতে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান করা যায়। এই পূজার বিবর্তন বঙ্গদেশে সমধিক দেখা যায়। মাতৃপূজা ও মাতৃ-উপাসনা বাংলায় যত প্রচলিত, অনত্র তত নয়। (প্রামাণিক, পৃঃ ৩৯২) ডাঃ অতুল সুরের মতে (বাঙালির সামাজিক ইতিহাস), বাঙালিই হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর বৈশিষ্ট্য মাতৃপূজার ঐতিহ্যকে সুমের, মেসোপটেমিয়া, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে প্রসার করেছিল (ঐ, পৃঃ ৩৯০)। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তিগুলি বৈদিক যুগের অনেক আগেই মাতৃপূজার নিদর্শন বহন করছে (ঐ, ৩৮৯)। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলার আদিম অধিবাসী হলো আদি-অস্ট্রালয়েডদের (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) বংশধর সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, হো, জুয়াং, শবর প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। প্রাচীনকালে মুণ্ডা সভ্যতা এত উন্নত ছিল যে, বর্তমানের ব্রাহ্মণ-শাসিত বাঙালি সমাজে দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িত নবপত্রিকাপূজা, লক্ষ্মীপূজার ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃষকাষ্ঠ প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিককল্পে চাল, কলা, হরীতকী, হলুদ, পান, সুপারি, সিঁদুর, ঘট, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আলপনা, গোময় ব্যবহার—এসবই মুণ্ডা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক (ঐ, পৃঃ ২৮১)। বৈদিক দেবতাদের পরিত্যাগ করে আজকের হিন্দুরা যেসব দেবদেবীর পূজা করে, তার সবগুলিই হরপ্পা সভ্যতার দ্রাবিড়ীয় দেবদেবী। (ঐ, পৃঃ ২৫৯)

ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানতে পারা যায় ঃ

(১) 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' গ্রন্থে জীমূতবাহনা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি। (২) শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) 'দুর্গোৎসব বিবেক', 'বাসন্তী বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামক তিনটি গ্রন্থে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি। (৩) বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির (১৩৭৫-১৪৫০) 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি। (৪) মিথিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০) তাঁর 'ক্রিয়া চিন্তামণি ও বাসন্তী পূজা প্রকরণ'-এ দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতির নির্দেশ আছে। (৫) শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দনের (১৫০০-৭৫) 'তিথি তত্ত্ব' গ্রন্থে মৃন্ময় দুর্গাপূজার বিধি উল্লিখিত। (৬) আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে প্রতিমা নির্মাণ করে ১৫৮০ সাল থেকে পূজা করার প্রচলন রয়েছে। (৭) এমনকি মহারাষ্ট্রের বর্গি সর্দার রঘুজী ভোঁসলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে বঙ্গীয় প্রথায় দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ২৬-২৭)।

তাছাড়াও—(১) দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তি শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত। (২) মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি গুহাতে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের দ্বাদশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি সম্ভবত প্রাচীনতম। (৩) মধ্যভারতের ৬ষ্ঠ শতকের ভূমারস্থ শিবমন্দিরে দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। (৪) মহাবলিপুরমে ৭ম শতকের অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইলোরাতেও অনুরূপ মূর্তি দেখা যায়। (৫) ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউলে মহিষমর্দিনী দুর্গার একটি সুন্দর অষ্টভুজা মূর্তি আছে। (৬) কিন্তু বাংলায় দশভুজা মূর্তিই সর্বত্র সমধিক প্রচলিত, যদিও প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "উত্তর ভারতে অষ্টভুজা, দশভুজা ও দ্বাদশভুজা পার্বতী ও দুর্গামূর্তিই বেশি পূজিতা হন। কিন্তু মধ্যভারতের নাগোদ রাজ্যে ও বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) রাজ্যের বিজাপুরের বাদামীতে মহিষমর্দিনী দশভুজার পূজা দেখতে পাওয়া যায়। কাশী থেকে আনা বাংলাদেশের রাজশাহীর বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে রাখা দুর্গামূর্তিও দশভুজা; দিনাজপুরের কেশবপুর গ্রামের দ্বাদশভুজা দেবীমূর্তি ধাতু নির্মিত।" (৭) যবদ্বীপে এবং সুদুর মিশর দেশেও মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

পাল রাজাদের সময় বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানকার আদিম অধিবাসী 'কিরাত' বা 'শবর' নামে পরিচিত ছিল। 'চণ্ডী' ছিলেন শবরদের উপাস্য দেবতা। দেবী দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়েরূপে পুত্রকন্যা-সহ গৃহস্থ ঘরে পূজিতা হন। এখানে তাঁর স্নেহময়ী মাতৃরূপের পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বজনীন পূজায় দেবীর নিষ্ঠুর হিংসাপরায়ণ, প্রতিশোধ লাভাকাঙ্ক্ষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপের সফল রূপায়ণ দেখতে পাই।

উভয় রূপের মধ্যেই দেবীর অনুগ্রহীতাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

বাঙালি জীবনে দেবী দুর্গা সংহারিণী মূর্তিতে আসেন না। দুর্জনদের কবল থেকে দুর্বলদের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে আবির্ভূতা হন। ঘরে যখন পূজিতা হন, তখন মাঙ্গলিকের নিদর্শন হিসাবে গৃহের বিবাহিতা কন্যার সন্তানাদি-সহ পিতৃগৃহে কয়েকদিনের জন্য আগমন সূচিত করে। এইসময় সকল বাঙালির মন খুশির আমেজে, আনন্দে ও স্নেহে পরিপূর্ণ থাকে। আবার বিদায়বেলায় বিষাদের উলুধ্বনি সমস্ত মনপ্রাণ আপ্লুত করে দেয়। বিদায়ের সময় সীমন্তে সিঁদুর লেপনের মাধ্যমে কন্যার স্বামি-সৌভাগ্যের ইঙ্গিত বহনকারী আনন্দময়ী জননীর শান্ত, সুশীলা গৃহবধূর কথা মনে করিয়ে দেয়। এর থেকে ধারণা জন্মায়, বাঙালি জীবনে দেবী দুর্গা কেবল সংহারিণী দেবীই নন—স্নেহময়ী কন্যাও বটে, যাঁর স্নেহধারার প্রস্রবণ ও মনের প্রশান্তি লক্ষণীয় বিষয়। বিদায়বেলায় অশ্রুসজল মহিলাদের দেখে কন্যার স্বামিগৃহে যাত্রার কথাই বারবার মনে পড়ে। স্বামিগৃহে কল্যাণময়ী কন্যার কল্যাণ হোক—এই প্রার্থনাই বারবার মনে ভেসে ওঠে।

সেই কোন্ অজ্ঞাতকাল থেকে পৌরাণিক গল্পগাথায় এবং উপকথায় দেবী দুর্গার দুর্গতিনাশিনীর ভূমিকা আঁকা আছে। সেইসব উপকথা, গল্পগাথা আজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিবেচনা করার অবকাশ নেই এবং হয়তো সম্ভবও নয়। হয়তো আমরাও আজ সত্যিই ডাকার মতো ডাকতে পারি না, তাই দেবী দুর্গাকেও আমাদের ত্রাণকর্ত্রী হিসাবে দেখতে পাই না। আজও বাংলার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর প্রতি বছর পূজা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কতখানি দুর্গতিনাশের আবেদন থাকে তা গবেষণার বিষয়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র ও রাবণ উভয়েই দেবী দুর্গতিনাশিনীর বন্দনা করেন; কিন্তু দেবী রামচন্দ্রের বিরহপ্রাণ অন্তরের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাবণের অর্ঘ্যদান উপেক্ষা করে রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মহাভারতেও দেবী উপেক্ষিত, অবহেলিত, রিক্ত, নিঃস্ব, পরিত্যক্ত অর্জুনের আহ্বানে সাহায্য করতে দুর্যোধনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

আরেকটি মত হলো ঃ ভারতীয় জীবনে মনের গহনে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে অতি সম্প্রতি নবগঠিত ঝাড়খণ্ডের কিছু বুদ্ধিজীবী 'দেবী দুর্গা'-র মহিষাসুরবধকে আর্যদের প্রতীক হিসাবে উত্তর ভারতের

আদিম অধিবাসী গোষ্ঠীকে (যাকে অনার্যদের প্রতিভূ 'অসুর' বলা হয়েছে) পরাজিত করে বৈদিক যুগের সূচনার ইঙ্গিত বলেছেন। পূর্বকালে সাধারণত সমাজের অনগ্রসর অধিবাসীদেরই 'অসুর' বলা হতো। দেবী দুর্গা কর্তৃক অনগ্রসরের প্রতীক মহিষাসুর-নিধন অগ্রসর ও অনগ্রসরের যুদ্ধ বলে তাঁরা বিধান দিয়েছেন। যেহেতু ঝাড়খণ্ড মুখ্যত বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন অধিকাংশ আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত, তাই স্বভাবতই বিহারের জাতিগত বিভেদসৃষ্টিকারী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ঝাড়খণ্ডের জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণায় পুরাণ বর্ণিত 'অসুর' কোন দৈত্য নয়, তারা তদানীন্তন ঐ এলাকার অধিবাসী (কোন বনবাসী সম্প্রদায় হবে হয়তো) এবং বর্তমানের নদীতীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। উত্তরভারত থেকে আগন্তুক জাতি যখনি এই অনগ্রসরদের এলাকায় বসবাসে বাধা পেয়েছে, তখনি বলপ্রয়োগে এই আদিম বসবাসকারীদের জমি দখল করে এলাকা থেকে উৎখাত করেছে। অনগ্রসরদের রাজা, যাকে আর্যরা 'দৈত্যরাজ' আখ্যা দিয়েছে, কোল ভাষায় তাকে 'অসুর' এবং মৎস্যজীবীদের ভাষায় 'মহা মণ্ডলেশ্বর' বলে; সহজ ভাষায় সেটাই 'মাহিষ' হয়েছে এবং এই দুটিকে মিশিয়ে আর্যদের ভাষায় 'মহিষাসুর' হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের মতে, দুর্গাপূজা ঝাড়খণ্ডের স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে আর্যদের বিজেতা ও বিজিতদের একটা সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। ঘটনাপ্রবাহে আজ থেকে ১০০০ বছরের অধিক সময়ে যা জাতিগত সাংস্কৃতিক লোকাচারের মধ্যে মিশে গেছে, তার প্রকৃত উৎস ও অর্থ খুঁজতে আরো গভীরে যাওয়া দরকার।

সমস্ত ঝাড়খণ্ডের এবং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী এলাকা (মেদিনীপুর, পুরুলিয়া) থেকে সমবেত আদিবাসী পণ্ডিতেরা সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে মিলিত হয়ে পৌরাণিক কাহিনী পুনর্বিবেচনা করে তাদের উত্তরপুরুষদের সম্বন্ধে সঠিক ঘটনা জানানো হোক এবং দেবী দুর্গার পূজার কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য দুর্গাপূজার প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনা করা হোক বলে দাবি তুলেছেন। মহিষাসুরমর্দিনীকে তাদের পূর্বপুরুষদের হত্যার কাণ্ডারী হিসাবে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর।

ষোড়শ শতাব্দীতে সংস্কৃতে লেখা উদ্ধৃত করে শরৎচন্দ্র রায় যেভাবে ইন্দ্রকে মুণ্ডাদের হত্যাকারী বলে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেভাবেই দেবী দুর্গা কোলদের হত্যা করেছেন বলে তাঁর দাবি। ঐজাতীয় পণ্ডিতদের মতে কোল, কুর্মি, কোরা (আজকের ওরাওঁ) বৈদিক শাস্ত্রের বাইরে যে ছিল, তার সঠিক প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। তাহলে পুরাণ-বর্ণিত শুধু কোল-মুণ্ডারাই বৈদিক হবে কেন? এতে তথ্যগত বিভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। যথার্থ অর্থে বৈদিক গ্রন্থে যাদের কোল, মুণ্ডা বলা হয়েছে, তার স্বপক্ষে এমন কোন প্রামাণ্য পেশ করা যাবে না, যার থেকে মনে করা যেতে পারে, বৈদিক যুগের কোল, মুণ্ডারাই বর্তমান ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী।

প্রকারান্তরে এই বুদ্ধিজীবীরা এও বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণরা ওড়িশার জগন্নাথদেবের 'সেবাইত বা পূজারী' হিসাবে কলিঙ্গ (ওড়িশা), ময়ূরভঞ্জ, রামগড় (অতীতের পাদ্রমা), ডালভূম (বর্তমানের সিংভূম), রাতু (বর্তমানের রাঁচি) এবং পঞ্চকোট (বর্তমানের পুরুলিয়া) প্রভৃতির রাজ দরবারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীরায় এইসব রাজাদের 'আদিবাসী-প্রধান' বলে তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটির বিহার ও ওড়িশার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বহিরাগত ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে তাদের বৈদিক ক্রিয়াকর্মে এইসব প্রধানদের আকৃষ্ট করে ক্ষত্রিয় পরিচয়ে সাধারণ থেকে পৃথক করে আনেন। এই পরিবর্তিত প্রধানরাই নিজেদের 'রাজপুত' বলে চিহ্নিত করে সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

'মহিষাসুরকে' নিয়ে যখন বিতর্ক উঠছেই, তখন তার নিরসন হওয়া দরকার এবং সেজন্য আরো গভীর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। মনে হয় ভবিষ্যৎ গবেষকরা এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত তথ্যপ্রকাশে সক্ষম হবেন। ■

তথ্য সহায়িকা

১ কৃত্তিবাস রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৪, পৃঃ ৮৩-৮৯
২ শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ২৬-২৭, ৪০-৪১, ২৬৯-৮৪
৩ জার্ণাল অফ দি অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি, জুলাই ২০০৪, পৃঃ ১৭৯
৪ হাউ এ হিরো ওয়াজ মেড : দি টেলিগ্রাফ—মধুশ্রী ভৌমিক, ২৯.০৯.২০০৩
৫ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১
৬ ডালভূম বিবরণ (বাঙলা)—কে. সি. রাউল : ১৯১৮ (১৯২৮), পৃঃ ৩০
৭ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া স্কুল অব মিডিয়াভাল কালচার—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৯
৮ হরপ্পার অনার্য গরিমা—প্রশান্ত প্রামাণিক, ২০০৪, জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, ত্রিপুরা, পৃঃ ২৮১, ৩৮৯-৩৯২
৯ মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিরাটপর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃঃ ৬-৭
১০ ঐ, ভীষ্মপর্ব, ২৩ অধ্যায়, পৃঃ ২০১-২০২
১১ হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর
১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঃ স্বামী শঙ্করানন্দের দৃষ্টিতে

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী*

স্বামী শঙ্করানন্দ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ। মঠে তাঁর কাছে-পিঠে কেউ বড় ভেড়েন না। সকলেই একটা ব্যবধান রেখে চলেন। মুখে কথা নেই, কড়া মেজাজের মানুষ। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীমন্দিরের উলটোদিকে মিশন অফিসের সিঁড়ির ধাপে একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকেন। হাতে একখানা বেশ মোটা লাঠি। একাই।

মঠের কয়েকজন পরিচিত সাধু এক ভক্তকে বলেছিলেন ঃ "পূজ্যপাদ মহারাজজী রাজা মহারাজের হাতে গড়া, দেখুন না যদি ওঁর কাছ থেকে কিছু বের করতে পারেন। অনেক অমূল্য সম্পদের অধিকারী। পারেন তো বুঝব বাহাদুর।"

পরদিনই মহারাজের চরণে প্রণাম করে ভক্তটি হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

মহারাজ গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ "কী চাই?"

—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীরাজা মহারাজের কথা আপনার কাছে শুনব।... আপনার মুখে শুনব।

মহারাজ খুব কড়া নজরে তাকিয়ে লাঠি তুলে গিরিশ ভবনের দিকে দেখিয়ে বললেন ঃ "যাও ওখানে, রেডিও চলছে।"

ভক্তটি পত্রপাঠ বিদায় নিলেন। গিরিশ ভবনের দিকে যেতে গিয়ে ভক্তটির সঙ্গে প্রথমোক্ত সাধুদের দেখা হলো। তাঁরা বললেন ঃ "বলুন কী হলো, শুনি।" শুনে তাঁরা হেসে চলে গেলেন।

ভক্তটি বিশুদ্ধানন্দজীকে গিয়ে জানালেন ঃ "আপনার খুব বদনাম করেছেন এক উচ্চদরের সাধু। বলেছেন—যাও ওখানে রেডিও চলছে।" শুনে হেসে উঠলেন তিনি, বললেন ঃ "অমূল্য মহারাজ বুঝি!" অনেকক্ষণ ধরে সেই হাসি চলল। বললেন ঃ "যাঁর কথা বললে তিনি বড় মহাপুরুষ। ১৯৫৬ সালের সাধুসম্মেলনে তিনিই বলতে পেরেছিলেন, প্রকাশ্য সভায় সভাপতির ভাষণে, মঠে আজও এমন সাধু আছেন যাঁকে ঠাকুর কৃপা করে দর্শন দেন, সমস্যার সমাধান করেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং উনি। বলতে বলতে হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন তাঁর উদ্দেশে।"

পরবর্তী কালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলেছিলেন ঃ "খুব উঁচুদরের সাধু। গম্ভীর থাকতেন—সবারই কাছে ঘেঁষতে ভয়। আমরা বলতাম, মঠের পাখিগুলো পর্যন্ত মহারাজকে হাঁটতে দেখলে ভয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু অন্তর ছিল স্নেহ-ভালবাসায় ভরা। নিজের কাজ নিজেই করতেন—এই যে মঠের মন্দিরগুলো দেখছ—রাজা মহারাজ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর মন্দির, ভুবনেশ্বর আশ্রম—পিছনে ওঁরই অবদান।"

২০০৫ সাল স্বামী শঙ্করানন্দের (১৮৮০-১৯৬২) জন্মের ১২৫তম পূর্তি বছর। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, ধ্যানমগ্নতা, প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন, বিদগ্ধতার সঙ্গে রসবোধ, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রফুল্লতা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যাঁরা তাঁকে নিয়মিত প্রত্যক্ষ করেছেন সেইসব প্রাচীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করেন। তিনি ছিলেন যথার্থ রামকৃষ্ণময়। তাঁর জীবনে বুদ্ধির সঙ্গে বোধি ও কর্মের অপরূপ মেলবন্ধন ঘটেছিল। নিজের সম্পর্কে তিনি কিছু বলতেন না—ভীষণ রাশভারি—কাউকে লিখতেও দিতেন না। যোগবিভূতির জ্যোতিতে অনন্যসাধারণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীর। কথা বলতেন কম, কিন্তু যা বলতেন তাতেই প্রকাশ পেত সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ১৯০২ সালের শেষদিকে সঙ্ঘে যোগদান, ৪ বছরের মধ্যে ১৯০৬ সালে সন্ন্যাস (তিনি নিজেই বলেছিলেন ঃ "আমার সন্ন্যাস আগে হয়েছিল, পরে দীক্ষা।"), ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি। ১৯৪৭ সালে সহাধ্যক্ষ, ১৯৫১ সালে অধ্যক্ষ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম কর্ণধার। তিনি ১১ বছর ছিলেন সেই পদে।

** পেশায় অর্থোপেডিক সার্জেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত সাহিত্যিক।*

স্বামী শঙ্করানন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদিপর্বের ইতিহাস। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দুর্লভ সঙ্গলাভে সৌভাগ্যবান। সঙ্ঘজীবনের প্রথম দিকে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সান্নিধ্য তাঁকে দিয়েছিল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রেরণা। এক নবাগত সাধুকে মাদ্রাজ মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেনঃ "শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বৎসর কাটাও, তাহলে সাধুজীবনে তোমার অপ্রাপ্য কিছু থাকবে না।"
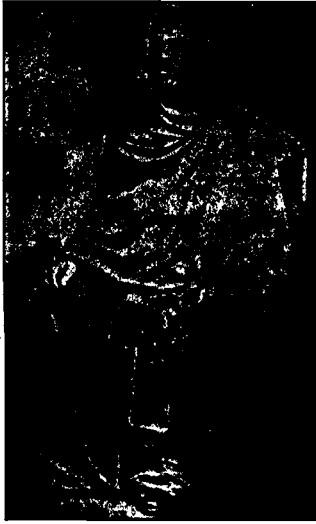
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী শঙ্করানন্দ ডাক্তারি পড়তে পড়তে সংসার ছেড়েছিলেন সম্ভবত ১৯০২ সালের ৩০ অক্টোবর। গঙ্গা সাঁতরে কলকাতা থেকে সালকিয়া—আত্মীয়স্বজনের চোখ এড়িয়ে ঘুরপথে বেলুড় মঠে। কত আর বয়স তাঁর (জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ মার্চ)। মঠে যোগ দিলেন ঐবছর নভেম্বর মাসে। মঠ তাঁর 'নিজ নিকেতন', আগে এখানে প্রায়ই আসতেন। মনের মধ্যে বরাবরই বৈরাগ্যের দীপশিখা—মাতুল স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে জ্বেলে দিয়েছেন ত্যাগের আগুন। গুপ্ত মহারাজ তাঁর চেয়ে বয়সে বছর পনেরো বড়। 'অমূল্য' ডাকনাম তাঁরই দেওয়া। স্বামী সদানন্দের সাহচর্যে কর্ম, সেবা ও সাধনার যেমন এক সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল অমূল্যর জীবনে, তেমনি নিয়মিত ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় তিনি কখনো বিরত হননি। মঠের কর্তাব্যক্তিদের কাছে তিনি রীতিমতো আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। যেকোন কাজের ভার দিলে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতেন।

মঠে ব্রহ্মচারী হিসাবে যোগদান করার কিছুদিন পরেই তিনি নিবেদিতার কাজকর্মে সাহায্য করতে থাকেন। এবিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক স্বামী সদানন্দ। অগ্নিকন্যা নিবেদিতার কাজে সহায়তার জন্য গুপ্ত মহারাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ মেনে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৩ সালের জানুয়ারির কিছুদিন মাদ্রাজে বক্তৃতার কর্মসূচি গৃহীত হলো। স্বামী সদানন্দের সঙ্গে অমূল্যকেও নিবেদিতার সঙ্গে যাওয়ার জন্য মঠ কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন।

মাদ্রাজে বক্তৃতা কর্মসূচি শেষ করার পর স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০৩ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু অমূল্য মাদ্রাজেই রয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাহচর্যলাভ। তাঁকে নিয়ে রামকৃষ্ণানন্দজী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেতেন এবং কাজকর্ম শেখাতেন। তাঁর পবিত্র, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত ভাব অমূল্যকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি মহানন্দেই শশী মহারাজের সান্নিধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। আশ্রমিক পরিবেশে চলছিল ব্রহ্মচারি-জীবনের স্মরণ-মনন, প্রার্থনা, উপাসনা। সেইসঙ্গে পরহিতায় কর্ম। মঠে তখন মাত্র পাঁচজন বাসিন্দা। রান্নার বাসন-কোসন মাজার জন্য একজন বৃদ্ধা ভক্ত। তাঁর একটি চোখ দৃষ্টিহীন—তবু সকাল বিকাল আসতেন। সারা মাসে ভক্তদের প্রণামী, চাঁদা মিলিয়ে মাত্র ২৫ টাকা মঠের আয়।

ঐসময়কার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চিত্র পাওয়া যায় অভেদানন্দজীকে লেখা রামকৃষ্ণানন্দজীর এক পত্রেঃ "আমরা এখানে আজকাল পাঁচজন আছি—যথা গুপ্ত, তাঁহার ভাগিনেয় (অমূল্য), পরমানন্দ, যোগীন মামা, একজন ব্রহ্মচারী ও আমি। শ্রীমঠে (বেলুড়স্থ) শরৎ, বাবুরাম, গোপালদা, খোকা, তুলসী, চাটুজ্জে, কানাই, নন্দ এবং অনেকগুলো কুচো ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী।"

অমূল্য মহারাজ যখন মাদ্রাজ মঠে, তখন সেখানকার সাপ্তাহিক বিবরণী পাঠ করলে মঠের জীবনধারার খানিক পরিচয় পাওয়া যায়—

সকাল ৫টা	—	শুধু শনিবার স্বাধ্যায়
৬টা	—	শয্যাত্যাগ
৬টা থেকে ৭টা	—	রামায়ণ পাঠ
৭টা থেকে ৯টা	—	অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ
৯টা থেকে ১০টা	—	স্বামীজীর রচনাবলি পাঠ ও আলোচনা
১০টা থেকে ১১.৩০টা	—	স্নান ও আহার
১১.৩০ থেকে ১টা	—	বিশ্রাম
১টা থেকে ৪টা	—	স্বাধ্যায়
৪টা থেকে ৭টা	—	অতিথি-অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ

সমুদ্রকূলবর্তী শহর মাদ্রাজ তখন দক্ষিণ ভারতের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা থেকে জাহাজে যেতে হয়—রেলপথ চালু হয়নি তখনো। বরানগর এবং আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই প্রধান ব্যবস্থাপক ও পরিচালক ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিচলিত নিষ্ঠায় সাধনভজন, ঠাকুরের সেবা-পূজা নিয়ে তাঁর সময় আনন্দের সঙ্গে কাটছিল—শত অসুবিধা এবং আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণময় তাঁর জীবন। বরানগর এবং আলমবাজার মঠের সীমানার মধ্যেই তাঁর কর্মযজ্ঞ। কিন্তু বিবেকানন্দের আদেশে বেদান্তপ্রচারের জন্য তিনি এককথায় রাজি হলেন মাদ্রাজে যেতে। ১৮৯৭ সালের মার্চের শেষে জাহাজে করে তিনি মাদ্রাজ পৌঁছালেন। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ।

মাদ্রাজ এমন একটা শহর, যেখানে ৫ মাস গরম এবং বাকি ৭ মাস আরো গরম। বহুকাল ধরে তাই চর্মরোগে ভুগেছেন শশী মহারাজ। ১৮৯৭ সাল থেকে বছরের পর বছর তাঁকে শহিদের আত্মত্যাগ বরণ করতে হয়েছিল। স্বামী প্রমেয়ানন্দ 'সেবাদর্শে রামকৃষ্ণানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "তখন তাঁর বয়স ৩৪, দেখাত অনেক কম ২৫। প্রশান্ত মুখমণ্ডল, গোলাকার, চোখ-দুটো ছোট হলে কি হবে... বুদ্ধিমত্তা ও স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বল। বক্ষ ছিল উন্নত ও বিশাল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট এবং গতি রাজোচিত...। সুদর্শন রামকৃষ্ণানন্দের ব্যক্তিত্বে অনেকেই আকৃষ্ট হতো।"

মঠের পরিবেশ ভারী মনোরম, মঠবাড়ির আসল নাম 'ক্যাসল কার্ণান'। আগেই বলা হয়েছে, মাদ্রাজ মঠের আশ্রমিক জীবনে শশী মহারাজের কাছেই অমূল্য পেয়েছিলেন অধ্যাত্ম-জীবনের প্রেরণা। তিনি একমাত্র শশী মহারাজ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন 'বেদান্ত কেশরী'তে। আর কারো সম্পর্কে এত কথা বলেননি বা লেখেননি। সবই থাকত তাঁর অন্তরে, কখনো বাইরে প্রকাশ করতেন না।

ক্যাসল কার্ণান

শশী মহারাজ সবসময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-আনন্দসাগরে ডুবে থাকতেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্রিতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি কাজ তিনি নিখুঁতভাবে অনন্যচিত্তে সম্পন্ন করতেন। সেজন্যই গুরুভাইরা বরানগর মঠ থেকেই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেছিলেন। অমূল্য পেয়েছিলেন এই নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও ভগবদ্বিশ্বাসী মহাপুরুষের একান্ত সাহচর্য ও কাজকর্ম দেখার দুর্লভ সুযোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শশী মহারাজ দাস্যভক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অনন্যসাধারণ গুরুভক্তি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎস ছিল। তিনি উপাসনাগৃহে সবসময়ই প্রভুর উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতেন। পুষ্পচয়ন, পূজা, আরাত্রিক, প্রণামাদি প্রত্যেক কাজে তিনি এত বিভোর হয়ে থাকতেন যে, উপস্থিত ভক্তদের ভিতরও সেই ভাবের সঞ্চার হতো।

শশী মহারাজের সান্নিধ্য এবং মাদ্রাজ মঠের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উত্তরজীবনে স্বামী শঙ্করানন্দ বলেছেনঃ "শশী মহারাজ সবসময় ভাবে থাকতেন।... স্বামীজী দেহ রাখলেন ১৯০২ জুলাই মাসে... আমি ডিসেম্বরে মাদ্রাজ গেছি—ক্যাসল কার্ণানে, Ice House-এ ঠাকুরকে বসানো হয়েছিল। তখন এস. বি. আয়েঙ্গার স্বামীজীর এক ভক্ত ঐ বাড়ির মালিক ছিল। বাড়ির দেওয়াল ছিল ১২ ফুট চওড়া। ভিতরের ঘর ছিল প্রায় তেতলা সমান ফাঁকা, সেখানে বরফ রাখা হতো, তাই তার নাম Ice House (বরফ ঘর)। বরফের কল তো ছিল না, তাই বিদেশ থেকে বরফ চালান হয়ে আসত। ঐ Ice House-এর দেওয়াল কেটে কেটে ঘর তৈরি করা হয়েছিল।" আরো পরে তিনি বলছেনঃ "শশী মহারাজকে মাদ্রাজে দেখেছি, সবসময়ই একটা ভাবের তোড় তাঁর মধ্যে খেলত। একদিন গরম দুধের বাটি নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরের ভোগ দিতে। হঠাৎ খানিকটা গরম দুধ চলকে পড়ে গেল। অমনি মুখ বিকৃত করে তিনি ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—'আবার গরম দুধ খাবেন, এখন খাও গরম দুধ। পড়ে তো গেল।' একটি কথার মধ্যে ঠাকুরের প্রতি শশী মহারাজের কী অপূর্ব আপনবোধ ফুটে উঠেছে! ছোট ছেলের প্রতি রাগ করে যেমন লোকে বলে থাকে, শশী মহারাজও দুধ পড়ে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আ্যাঃ! আবার গরম দুধ খাবেন, খাও গরম দুধ।' "
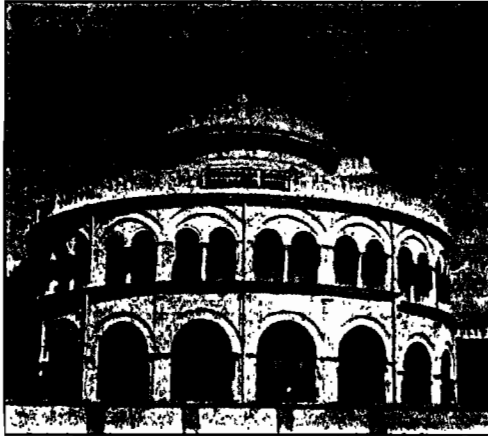
সেদিনকার প্রসঙ্গ ছিল তামাক এবং ধূমপান। শশী মহারাজ স্যার ওয়াল্টার ব্যালের কথা বললেন, যিনি ইংল্যাণ্ডে তামাকের প্রচলন করেন। স্যার ব্যালে ছিলেন খুব রসিক। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানী ছিলেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কেউ ধোঁয়ার ওজন বার করতে পারবে?"

এইটুকু বলেই চুপ করে গেলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মুখে মৃদু হাসি। সবার দিকে তাকান আর মুচকি হাসেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অঙ্ক ছিল শশী মহারাজের প্রিয় বিষয়। অবসর সময়ে তিনি অঙ্ক কষতেন।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী যোগেশ্বরানন্দ—কেমিস্ট্রির এম. এ.। তাঁর উত্তর সোজা। বললেন, প্রত্যেকবার মুখ থেকে ধোঁয়া একটা U টিউবের মধ্যে ছেড়ে নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে রেখে ওজন করলেই পাওয়া যাবে ধোঁয়ার ওজন।

শশী মহারাজ কিন্তু যোগেশ্বরানন্দজীর এই জটিল পদ্ধতি মানতে পারলেন না। অমূল্য সেখানে উপস্থিত—সহজে মুখ খোলেন না। হঠাৎই বলে উঠলেন ঃ "প্রত্যেকবার ধোঁয়া টিউবের মধ্যে ছাড়তে গেলে তামাক খাওয়ার আনন্দটাই মাটি। নিরানন্দময় ধূমপানে লাভ কী? তার চেয়ে বরঞ্চ চুরুটের ওজন থেকে ছাইয়ের ওজন বাদ দিলেই হলো। ধোঁয়ার ওজন বার হয়ে যাবে।"

শশী মহারাজ খুশি হলেন উত্তর শুনে। স্যার ব্যালেরও ছিল ঐ মত। রামকৃষ্ণানন্দজী খুশি হয়েছিলেন অমূল্যর প্রখর পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পেয়ে। শুধু পর্যবেক্ষণশক্তি নয়, যেকোন কাজ অমূল্য করতেন নিখুঁতভাবে, সুচারুরূপে। কোন ফাঁক রাখতেন না। আর এই আশ্রমে কাজের জন্য অমূল্যর মতো দীর্ঘদেহী, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও দূরদর্শী একটি অনুচরকেই যে শশী মহারাজের দরকার।

শশী মহারাজের 'ক্লাস' নেওয়া সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় স্বামী শঙ্করানন্দের জবানীতে ঃ "শশী মহারাজ ক্লাস নিতেন বিকালে বিভিন্ন জায়গায়, নির্দিষ্ট স্থলে। একদিন তিনি বললেন, 'চল অমূল্য ক্লাস নিয়ে আসি।'

"ক্লাস নিতে তাঁকে অনেক দূরে দূরে যেতে হতো। মঠের আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। পুরো গাড়ি ভাড়া করার ক্ষমতা ছিল না। মাদ্রাজে তখনকার দিনের বাহন 'ঝটকা গাড়ি'—অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে শেয়ারে ভাড়া করে যেতে হতো। সবল, সুদীর্ঘ, স্থূলশরীর। ছোট বাক্সের মতো খাঁচাগাড়িতে ছোট প্রবেশপথ দিয়ে অতি কষ্টে ঢুকে তাঁকে কুঁজো হয়ে বসতে হতো খুব কষ্ট করে।"

ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় (জুলাই ১৯৫১) শঙ্করানন্দজীর স্মৃতিচারণ বড়ই সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক—"একদিন একটা টাঙায় করে শশী মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে George Town-এ ক্লাস করতে গেলেন। যে-বাড়িতে গেলেন সেখানে ঘরটি খুব ছোট নয়—টেবিল, চেয়ার ও একটি ঘড়ি রয়েছে।"

ক্লাসঘরটি ১২ ফুট বাই ১৫ ফুটের মতো বড়। ভিতরের দিকে অন্দরমহলে যাওয়ার রাস্তা। ক্লাস নেওয়ার ঘরে শুধু একটি টেবিল, খানদুয়েক বেঞ্চ সামনে আর দেওয়ালের দিকে আরেকটা বসার বেঞ্চ। চেয়ারের পিছনের দিকে একটা দেওয়াল-ঘড়ি—৫টায় ক্লাস হবে।

ক্লাস অনেকক্ষণ চলতে পারে। কিন্তু ইলেকট্রিক নেই—সন্ধ্যার দিকে আলো ছাড়া অসুবিধা। সেকথা ভেবে পরিচারক আরেকটা টেবিলের ওপর বাতি দিয়ে গেল। কাচের বড় শেডওলা টেবিলল্যাম্প। ঘরে শুধু দুজন—শশী মহারাজ আর ব্রহ্মচারী অমূল্য।

৫টা বেজে গেল দেখতে দেখতে। ক্লাস ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই। কেউ আসছে না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন শশী মহারাজ। এদিকে সময় বাড়ছে। তবু হতাশার কোন চিহ্ন নেই তাঁর চোখেমুখে, নেই কোন ভাবান্তর। ঘড়ি দেখে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে সেই ছাত্রবিহীন ঘরে উপনিষদের বই খুলে তিনি পড়ানো শুরু করলেন। শ্রোতা তাঁর সঙ্গী অমূল্য নন—খালি বেঞ্চের অনুপস্থিত তাঁর ছাত্রদলও। সত্যি সত্যি সবাই যেন এসে গিয়েছে ক্লাসে! একঘণ্টা ধরে উপনিষদ্ পাঠ ও শ্রুতিমধুর ভাষায় তার ব্যাখ্যা করে গেলেন শশী মহারাজ। তারপর থামলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী অমূল্য। বিস্ময়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেউ তো আসেনি, তবু পাঠ করলেন?"

উত্তর দিতে গিয়ে একটু চুপ করে রইলেন শশী মহারাজ, বললেন ঃ "আমি তো কাউকে শিক্ষা দিতে আসিনি, আমি যে-ব্রত নিয়েছি, সেই ব্রত পালন করে যাচ্ছি। আমি তো আর লোকের মনস্তুষ্টির জন্য ক্লাস করি না। আমি তো সাধু।"

রামকৃষ্ণানন্দজী সম্পর্কে অন্য আরেকটি ঘটনা বলেছেন স্বামী শঙ্করানন্দজী ঃ "আরেকদিন তিনি কোথাও গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখি ঘর্মাক্ত কলেবর। নিজে একখানি পাখা নিয়ে হাওয়া করছেন। একটু স্থূলকায় ছিলেন। আমি আরেকখানা পাখা নিয়ে পিছন থেকে তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম।

স্বামী শঙ্করানন্দ

"একটু বাদে দেখি, তিনি পাখাখানা নামিয়ে রেখে—স্বামীজীর ছবি সামনে টাঙানো ছিল—তার দিকে চেয়ে ঘুঁষি পাকাচ্ছেন আর বলছেন, 'আমি পারব না। তুমিই তো আমাকে এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ—তাই কষ্ট পাচ্ছি।' আবার একটু বাদেই দেখি তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভুঁয়ে পড়ে বলছেন, 'ক্ষমা কর, আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা কর ভাই। তুমি যা করেছ তা নির্ভুল।' ('No brother, no brother, excuse me, what you have done is perfect. It is all right, it is all right.')"

একদিন রাত্রে শশী মহারাজ স্বপ্নে দেখলেন, স্বামীজী এসে বলছেনঃ "শশী দেখ, আমি শরীরটাকে থুতুর মতো ফেলে দিয়েছি।" স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর শশী মহারাজের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তার পরদিনই বেলুড় মঠ থেকে টেলিগ্রাম এল—প্রাণাধিক প্রিয় গুরুভ্রাতা আর নেই।

মাদ্রাজে নিদারুণ আর্থিক কষ্টে শশী মহারাজ অবিচলিত। তাঁর কাছে এ যেন কিছুই নয়—সর্বদা মনে করতেন আমি যে তাঁর, যা দেওয়ার তিনিই দেবেন। বাইবেলে যিশু বলছেনঃ "He giveth what is needed." অর্থকষ্ট থাক আর যাই থাক, আদর্শের ব্যাপারে তিনি অনমনীয় ছিলেন। কোন শিথিলতা পছন্দ করতেন না। তাই যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন, তাঁদের শিক্ষা হতো পূর্ণাঙ্গ এবং সুচারু। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করেই জরুরি কাজে পোস্ট অফিসে ছুটে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণানন্দজী জানতে পেরে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে মঠে পৌঁছালেন। এ এক শিক্ষা, ব্রহ্মচারীকে বুঝিয়ে দেওয়া—গুরু মহারাজের ঐসময় কোন জিনিসের প্রয়োজন হতে পারত, সেজন্য হাজার কাজ থাকলেও বাইরে না গিয়ে মঠে অবস্থানই জরুরি।

হঠাৎ একবার বেলুড় মঠ থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী মাদ্রাজ মঠে এলেন। তাঁরা রামেশ্বরম যাওয়ার পথে মাদ্রাজ মঠে থামলেন। আসল কথা কিংবদন্তিতুল্য শশী মহারাজের সঙ্গলাভের বাসনা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছাড়া অন্য সবার মাথায় হাত—এত লোক! নিজেদেরই খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান নেই! চাল বাড়ন্ত! কিন্তু নিশ্চিন্ত রামকৃষ্ণানন্দজী। তিনি ঠাকুরকে ধরে আছেন। এটা যে ঠাকুরেরই আশ্রম, তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।

শশী মহারাজ যাই ভাবুন না কেন, চিন্তা কিন্তু ব্রহ্মচারী অমূল্যেরও। রামকৃষ্ণানন্দজী অমূল্যকে আশ্রমের ভক্ত অধ্যাপক রঙ্গচারীর কাছে পাঠালেন। অন্তত এক ব্যাগ চালের ব্যবস্থা যদি অধ্যাপক করেন, তাহলে সমস্যার সুরাহা হয়। শশী মহারাজের আদেশে পথে বেরিয়ে পড়লেন অমূল্য। অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। অপরিচিত অমূল্যকে যদি তিনি পাত্তা না দেন? তবু মনে আশা—শশী মহারাজ যখন পাঠাচ্ছেন, নিশ্চয়ই ঠাকুর ব্যবস্থা করবেন; এই মঠ তো ঠাকুরেরই মঠ। এসব কথা ভাবতে ভাবতে যখন পথ চলছিলেন, হঠাৎই দেখা হয়ে গেল অন্য এক গৃহী ভক্ত ভেঙ্কটরমনের সঙ্গে। পথ আটকালেন তিনি। অমূল্যকে চেনেন। ব্রহ্মচারীর চোখেমুখে চিন্তার ভাব কেন? কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সমস্যার কথা শুনে হাসলেন।

মঠাধ্যক্ষের এক বস্তা চাল দরকার—একগাড়ি নয়। এ তো সাধুসেবা! বেলুড় মঠ থেকে আসা সন্ন্যাসীদের সেবা! নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন তিনি। না চাইতেই তিনি বললেনঃ "আপনি ফিরে যান, আমি পাঠাচ্ছি। চাল আশ্রমে পৌঁছে যাবে।"

কিন্তু ভেঙ্কটরমন বললে কি হবে, রঙ্গচারীই সেই মানুষ—যাঁর কাছে মঠের অভাবের কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসনে মাদ্রাজ মঠে তখন ব্রহ্মচারীর জীবন পালন করছেন অমূল্য। তিনি সৈনিক—নেতার নির্দেশে প্রয়োজনবোধে জীবন বিসর্জন দেওয়া যায়। এসব ভাবতে ভাবতে অমূল্য পৌঁছে গেছেন হাঁটাপথে অধ্যাপক রঙ্গচারীর বাড়ি।

রঙ্গচারী ভক্ত লোক—শশী মহারাজের আস্থাভাজন। ঠাকুরের ইচ্ছায় আর্থিক অবস্থা খুব ভাল। সব শুনে ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজের আস্থাভাজন এক আত্মীয়কে নির্দেশ দিলেন। ঠেলাগাড়িতে করে অমূল্য চাল নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

ওদিকে চিন্তায় পড়েছিলেন শশী মহারাজ—অমূল্যের ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন? এক বস্তা চাল পৌঁছে গেছে ততক্ষণে—পাঠিয়েছেন অমূল্যর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া ভক্ত ভেঙ্কটরমন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অমূল্যের—সেকথা শশী মহারাজ জানতেন না।

অমূল্যও ঠেলাগাড়িতে করে চাল নিয়ে পৌঁছে গেছেন—এই চাল পাঠিয়েছেন অধ্যাপক। জানালেন দেরি হওয়ার কারণ। চাল যোগাড় হতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন যেন অমূল্য। স্বভাবে যেন খানদানী চাষা। যে-কাজ ধরেন—শেষ না করে ছাড়েন না।

রামকৃষ্ণানন্দজীর আনন্দ আর তখন দেখে কে! খুব খুশি। জয় প্রভু! জয় প্রভু! এক বস্তা নয়—দুই বস্তা! আশ্রম তাঁর সংসার, এসব তাঁরই লীলা, তাঁরই ইচ্ছা। তিনি দেখবেন না তো কে দেখবেন? শুধু অতিথির জন্য নয়—আশ্রমের অর্থকষ্টের সময় বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি

অন্নসংস্থান করে দিলেন। শরণাগতের ভার তো তিনিই গ্রহণ করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন। তাঁর ছিল অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং সংস্কৃত ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্য। সংস্কৃত ও পুরাণ অমূল্যেরও প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে অমূল্য তাঁর পিতার কাছে ঋণী—পিতাই তাঁকে সংস্কৃত পড়তে আগ্রহী করে তুলেছিলেন।

তখন মাদ্রাজ মঠে শশী মহারাজ রামানুজের জীবনী বাঙলা ভাষায় লিখেছিলেন। ভাষা সমস্যা দেখা দিল। তেলেগু লিপিতে সংস্কৃতে লেখা রামানুজের জীবনী বাঙলায় ভাষান্তর করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তিনি তেলেগু জানেন না। সাহায্য করার জন্য অমূল্যকে বললেন। ব্রহ্মচারী অমূল্য যদি তেলেগু শিখে নেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু নবীন ব্রহ্মচারী কি পারবেন?

অল্প সময়ের মধ্যে তেলেগু ভাষা রপ্ত করে নিলেন অমূল্য। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন শশী মহারাজ। অমূল্যের রয়েছে প্রচণ্ড মানসিক বল—ইচ্ছাশক্তি, 'না' কথাটা ধাতে নেই সেই ছোটবেলা থেকে। স্বল্প সময়ের ভিতর এই ব্রহ্মচারী তাঁর মধুর ব্যবহার ও কর্মশক্তির মাধ্যমে অনেক কাছে চলে এসেছিলেন—শুধু রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছেই নয়, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাছেও হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য।

মাদ্রাজ মঠে অমূল্য মাত্র চার মাস ছিলেন। ফিরে আসতে হলো কলকাতায়। কিন্তু সেই মাস চারেকের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় সদা জাগ্রত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভালবাসা ভোলার নয়—প্রকাশ করার মতোও নয়, তা যেন শুধু অনুভবের।

কট্টর সন্ন্যাসী হলে কি হবে, মনের ভিতরটা কুসুম-কোমল ছিল শশী মহারাজের। অমূল্য কলকাতায় ফিরে আসার পরের বছরই (১৯০৪) বেলুড় মঠে এসে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর প্রিয় সন্তানকে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। খবর পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর—অমূল্য জ্বরে শয্যাশায়ী, অসুস্থ। অমন দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান ছেলেটি কাবু হয়ে পড়েছে। শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না শশী মহারাজ। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের কাছে তাঁর বক্তৃতা ছিল—ভাষণ সেরেই দু-মাইল দূরে অমূল্যের কাছে ছুটে গেলেন তিনি। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে অসুস্থ অমূল্যের শয্যার পাশে বসলেন। চোখদুটো সজল হয়ে উঠল—মাথায় রাখলেন আশীর্বাদের হাত। বললেন ঃ "চটপট সুস্থ হয়ে এস। চলে এস আমার কাছে। তোমার প্যাসেজ মানি পাঠিয়ে দেব।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নরম মন এবং অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্বাদে অভিভূত হয়ে পড়লেন ব্রহ্মচারী অমূল্য। এ তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত।

মাত্র চার মাস শশী মহারাজের পূত পবিত্র সংস্পর্শে কাটিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন এক জীবন পেয়েছিলেন অমূল্য। স্বামী সদানন্দের আহ্বানে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। কারণ, এর পরেই ছিল সিস্টার নিবেদিতার পরিকল্পনানুযায়ী ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং বিদেশযাত্রা—জাপানে। সেখানে অমূল্যের উপস্থিতি ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। তাই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু জীবনে জাগপ্রদীপ হয়ে রয়ে গেল শশী মহারাজের সান্নিধ্য, তাঁর স্মৃতি—যা ভোলার নয়। ■

সহায়ক গ্রন্থ

১ শতবর্ষের আলোকে বেলুড় মঠ—অহিভূষণ বসু
২ স্বামী শঙ্করানন্দ—স্বামী সর্বদেবানন্দ সম্পাদিত, বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ১৯১১
৩ ব্রহ্মানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ
৪ সেবাদর্শে রামকৃষ্ণ—স্বামী প্রমেয়ানন্দ
৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ
৬ Vedanta Keshari, August 1972, At the feet of saints at Madras Math—Swami Madhabananda
৭ স্বামী শঙ্করানন্দ—অমিয় বসু
৮ স্বামী তেজসানন্দজীর অপ্রকাশিত ডায়েরি—সৌজন্যে স্বামী সর্বদেবানন্দ
৯ অমৃতের সন্ধানে—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
১০ Glimpses of Swami Ramakrishnananda, Vedanta Keshari, July 1951
১১ শতরূপে সারদা

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৪৯

পাশাপাশি ঃ (১) স্মৃতি প্রস্থান, (৫) বলবতাং, (৭) সর্বপাপ, (৮) বচঃ, (৯) শংসসি, (১১) নটবর, (১৩) নমঃ, (১৬) কেবলং, (১৭) পরমধাম, (১৯) মনোরথম্।

ওপর-নিচ ঃ (২) প্রণিপাত, (৩) নব, (৪) গতাগতং, (৬) লভতে, (৭) সমাধান, (৮) বর, (৯) শমঃ, (১০) সিদ্ধানাং, (১২) বহুদরং, (১৪) ত্রিবিধা, (১৫) দেববর, (১৮) মম।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

রমা রায়চৌধুরী, আশিসকুমার ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার সরকার

ভারতের আদি অধিবাসী সমাজের অলচিকি-লিপিস্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু

শান্তি সিংহ*

ভারতে আদি অধিবাসী (Original Settlers) কোল গোষ্ঠীর মানুষ। নৃতত্ত্ববিদরা এদের 'আদি অস্ত্রাল' বা 'আদি অস্ট্রেলিয়' (Proto-Australoid) নামে চিহ্নিত করেছেন। কোল গোষ্ঠীর ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কুরকু, শবর প্রভৃতি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "কোল ভাষা হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য আর তিব্বতী-চিনা বা মোঙ্গল জাতির লোক ভারতে আসার আগেও কোল ভাষায় (অর্থাৎ আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এদেশে ছিল।"[১] আমরা জানি, ফন আইকস্টেডট পূর্ব ভারতের আদি অস্ত্রাল বা আদি অস্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠীকে 'কোলিড' বলেছেন। রাঢ় বাংলার সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায় কোল গোষ্ঠীর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই কোল গোষ্ঠীর মাঝে আত্মমর্যাদাদৃপ্ত গরিমায় উজ্জ্বল আজ সাঁওতাল সম্প্রদায় ও সাঁওতালি ভাষা।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ও শালতোড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং রানিবাঁধ, রাইপুর, সাবড়াকোন, সারেঙ্গা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি, ঝাড়গ্রাম-সহ খড়্গপুর কিংবা পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের বহু সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে উত্তরবঙ্গ তথা সাঁওতাল পরগনার নানা এলাকায় এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যেও সাঁওতালদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান আমাদের অজানা নয়। ভারতে এক কোটিরও বেশি মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা সাঁওতালি। জনসংখ্যার বিচারে ভারতে সাঁওতালি ভাষার স্থান ত্রয়োদশ। কারণ, ভারতের দশটি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত ছয়টি রাজ্যেও সাঁওতালি ভাষার অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বে সাঁওতালি ভাষার স্থান ৯৪তম।

সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপিও আছে। তার নাম 'অলচিকি'। ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, নাট্যকার, শিক্ষাবিদ রঘুনাথ মুর্মু (১৯০৫-১৯৮২) মাত্র কুড়ি বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি সৃষ্টি করেন। সাঁওতালি ভাষাশিক্ষায় কিংবা সাহিত্যচর্চায় অলচিকি লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সাঁওতাল সমাজ তথা সাঁওতালি ভাষাপ্রিয় মানুষ রোমান লিপি অথবা দেবনাগরী লিপি কিংবা বাঙলা বা ওড়িয়া লিপির মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষা চর্চা করত। তাতে সাঁওতালি ভাষার ধ্বনিরূপ সঠিকভাবে বহু ক্ষেত্রে অধরা থাকত। তদুপরি সাঁওতালি ভাষার অনুশীলনে নিজস্ব বর্ণলিপি না থাকায় সাঁওতাল জাতির জীবনে তথা ভারতের সংহতিবোধে খণ্ডবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ততার নঞর্থকভাব জাগত—যা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কাম্য নয়। কারণ, ভাষা নিয়ে জাতি এবং জাতি নিয়ে দেশ।

বিশাল ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে নানা লিপিমালা এবং বিচিত্র তাদের রূপ। সেসব দেখে রঘুনাথ মুর্মুর মনে প্রথম যৌবনেই প্রশ্ন জাগে ঃ *(১) দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষা ও লিপির মাঝে সমতা নেই কেন?* (২) ভারতের নানা রাজ্যের ভাষা এবং লিপির মাঝে সাঁওতালি ভাষার উচ্চারণ-রীতির মূল পার্থক্যের অন্তর্নিহিত রূপ কেমন? (৩) ভারত তথা বিশ্বে প্রচলিত ভাষার নানা লিপিছাঁদ থাকা সত্ত্বেও ভারতের আদি অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব লিপি তৈরির ভাবনায় সেসব সরাসরিভাবে গ্রহণ না হোক, কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপেও গ্রহণ করেনি কেন? (৪) ভারতের নানা প্রান্তে বসবাসকারী সাঁওতাল নরনারীদের মাঝে ভাবের সমন্বয় ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ কীভাবে হতে পারে? (৫) ওড়িয়া, বাঙলা, দেবনাগরী বা রোমান অক্ষরের সাহায্যে সাঁওতালি ভাষার উচ্চারিত শব্দমালাকে সঠিকভাবে কেন উচ্চারণ করা যায় না? (৬) এই ধরনের ভাষাজিজ্ঞাসার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানে কীভাবে সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব বর্ণমালা তৈরি করা যেতে পারে? (৭) সাঁওতালি লিপি তৈরি করতে হলে কতগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একান্ত দরকার? (৮) সেইসব বর্ণের আকৃতি বা চিত্ররূপ কেমন

** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার বাঙলা বিভাগের শিক্ষক, সুলেখক। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের এটি বিনীত নিবেদন।*

হবে? (৯) সেই বর্ণমালা তৈরির জন্য সাঁওতাল সমাজের লোকায়ত উপাদান ও জীবনচর্যার বিচিত্র রূপ কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে—বিশেষ প্রতীকী ভাবনায়? (১১) হাতের লেখায় লিপির ছাঁদ আদিবাসী জনগণের কাছে সহজভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কীভাবে লিপিরূপ সহজতর হতে পারে?

সবিশেষ উল্লেখ্য, সাঁওতালি ভাষার কোন ঐতিহাসিক লিপি না থাকায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল পরগনার দুমকার কাছে বেনাগড়িয়া গ্রামে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় লুথারান খ্রিস্টান মিশনারিরা নিজ ধর্মপ্রচারকেন্দ্রের ছাপাখানা থেকে স্ক্রেফস্রুডের (A. Skrefsrud) তত্ত্বাবধানে 'হড়কো-রেন মারে হাপ্ড়াম্কো-রেআঃক্ কথা' (অর্থাৎ 'হড় বা সাঁওতালজাতির পূর্বপুরুষদের ইতিকথা') নামে একটি বই রোমান লিপিতে প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, উক্ত বইটি থেকেই আধুনিককালে সাঁওতাল জাতির সাহিত্যের সূত্রপাত। 'কলেয়ান' বা 'কল্যাণগুরু' নামে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে ডেকে মিশনারিরা তাঁর মুখ থেকে সাঁওতালি পুরাণ-কথা এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গ্রহণ করে উক্ত বই লেখেন। অথচ দীর্ঘকাল সেই বইটি ইংরেজি বা অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি। কালক্রমে ১৯৪২ সালে বোডিং (P. O. Bodding) নামে সাঁওতাল ভাষাবিদের করা ইংরেজি অনুবাদ স্টেন কোনও (Sten Konow)-র সম্পাদনায় নরওয়ের অসলো থেকে প্রকাশিত হয়।

নরওয়ে থেকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় পাঁচ খণ্ডে সাঁওতালি অভিধান। পরবর্তী কালে ভারত সরকারের জনগণনা দপ্তরের তৎকালীন সচিব অশোক মিত্রের উদ্যোগে বৈদ্যনাথ হাঁসদা নামে এক শিক্ষিত সাঁওতাল বইটির বাঙলা অনুবাদ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৩৬ সালে ওড়িশার বালেশ্বরে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন গড়ে ওঠে। সেই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড ফিলিপ্স সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। ভীমপুর থেকে আগত সাঁওতাল কাঠবিক্রেতাদের কাছে তিনি সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর 'An Introduction to Santali Language' নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু

তৎকালীন ধলভূম-সংলগ্ন মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে রামদাস টুডু নামে এক শিক্ষিত সাঁওতাল নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'খেরোয়াল বংশাঃক্ ধরমপুথি' বাঙলা হরফে, সাঁওতালি ভাষায় লেখেন এবং নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করেন ১৯০৪/১৯০৫ সাল নাগাদ। বইটির 'টাইটেল পেজ' থেকে জানা যায়—ঘাটশিলা থানার কাড়ুয়াকাটা গ্রামের রামদাস মাঝি টুডু কলকাতার বেদান্ত প্রেস (১৪, রামচন্দ্র মিত্র লেন) থেকে বইটি ছাপেন। মুদ্রক শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্যাদি ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সুক্ষ্মক বাঙ্গালা' প্রবন্ধে (বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে গ্রন্থ, 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত) পাওয়া যায়।

সাঁওতালি কবিতার প্রতিষ্ঠাপর্বে সাধু রামচাঁদ মুর্মু (১৮৯৭-১৯৫৪), নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন (১৮৯৯-১৯৯২), পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু (১৯০৫-১৯৮২) প্রমুখ কবির কাব্যকৃতি বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সাঁওতালি কবিতার বিকাশপর্বের রূপবৈচিত্র্য নারায়ণ সরেন তড়ে সুতীম (১৯২২-১৯৮৯), ডোমান সাহু সমীর (১৯২৪), নাথানিয়াল মুর্মু (১৯২৮-১৯৮৮), সারদাপ্রসাদ কিস্কু (১৯২৯-১৯৯৬) প্রমুখ কবির স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কাব্যকৃতি ভারতীয় সাহিত্যে সমাদৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধু রামচাঁদ এবং পণ্ডিত রঘুনাথ সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি উদ্ভাবনে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করেছেন। পণ্ডিত রঘুনাথের ভাষাবিজ্ঞানী চেতনার প্রতি বিশেষ আশ্বস্ত ছিলেন সাধু রামচাঁদ।

সাঁওতালি ভাষায় চারটি অবদমিত ধ্বনি আছে। মিশনারি রেভারেণ্ড স্কেফস্রুড এবং পি. ও. বোডিং এই ধ্বনিগুলিকে অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির অবদমিত রূপ মনে করেই এগুলিকে যথাক্রমে রোমান হরফে 'K', 'C', 'T' ও 'D' চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করেন। সেই ধ্বনিরীতি এখনো চলছে। অথচ ফাদার হফম্যানের মতে, এই ধ্বনিগুলি ঘোষধ্বনির অবদমিত

রূপ। তার মাঝে তিনি একটিকে স্বরধ্বনির অবদমন মনে করেন। তিনি এই ধ্বনিগুলিকে ঘোষবর্ণ—যথাক্রমে স্বর অবদমিত, 'জ্', 'দ্' এবং 'ব্'-এর অবদমিত ধ্বনি হিসাবে এগুলিকে যথাক্রমে স্বর-অবদমন —'D', 'J', 'B' চিহ্নের সাহায্যে লেখার প্রস্তাব দেন।

মিশনারি পণ্ডিতদের এই বিতর্ক 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' পত্রিকায় ১৯২৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয়, পি. ও. বোডিং সেই বিতর্কে কোন লিখিত অভিমত দেননি। অথচ তিনি এইসব ধ্বনির জন্য ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্ন ব্যবহারকে ভাষার শরীরে অবাঞ্ছিত আবর্জনা বলে মনে করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন—ভবিষ্যতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র সাঁওতালি বর্ণ আবিষ্কৃত হলে যাবতীয় ধ্বনিবিজ্ঞানমূলক সমস্যার সমাধান হবে।

ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত রঘুনাথ সাঁওতালি ধ্বনির উচ্চারিত রূপকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোয় রূপ দিয়েছেন তাঁর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে। একদা বিতর্কিত অবদমিত ধ্বনিগুলি ঘোষধ্বনির ('গ্', 'জ্', 'দ্', 'ব্') অবদমিত রূপ হিসাবে চিহ্নিত করার পর তিনি সেইমতো বর্ণ সৃষ্টি করেছেন নিরন্তর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন ও অনুধ্যানে। তদুপরি, ধ্বনির কণ্ঠমূলক অবদমিত রূপ—যা বোডিঙের মতে 'K' এবং হফম্যানের মতে অবদমিত স্বর, তাকে তিনি 'গ্'-এর অবদমিত ধ্বনি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর আবিষ্কৃত লিপিমালায় এবং স্বতন্ত্র বর্ণের রূপ দিয়েছেন।

নবীন শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান মাতৃভাষায় শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বসম্মত ও অবিকল্প মনে করে। সাঁওতাল সমাজের লোকায়ত জীবনের সহজ চিত্ররূপ থেকে আহরিত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানী রঘুনাথ মুর্মুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপি। তাই অলচিকি লিপিমাধ্যমে সাঁওতালি ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন সহজতর। বলা বাহুল্য, রোমান লিপি কিংবা ওড়িয়া লিপি অথবা দেবনাগরী লিপি বা বাঙলা লিপি-নির্ভর শিক্ষা নবীন সাঁওতাল শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রায় ও মননে সহজতর বিষয় না হওয়ায় বরং চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। কারণ, তারা প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনে যে সাঁওতালি ভাষায় কথাবার্তা বলে, সেই মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষণীয় লিপির যোগ নিবিড় নয়। অথচ রঘুনাথ মুর্মুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপি এনেছে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষায় তথা সাঁওতাল সমাজে একাত্মতাবোধ—যা বিচ্ছিন্নতা বা বিক্ষিপ্ততা জাগানোর পরিবর্তে জাতীয় সংহতিকে পরিপুষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন ঃ "প্রাণিবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে, যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে।... আত্মশক্তি ব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে, সেকথা আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরববোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে।... পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয়, ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে।... কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া।"[২]

সাঁওতাল সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কুশল বাস্কে অলচিকি লিপি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "দীর্ঘপ্রাণ স্বতন্ত্র বর্ণ না থাকায় এতে (অলচিকি লিপিতে) সংখ্যা কম। এতে শিশুরা তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সময়ে বর্ণ আয়ত্ত করে, মাতৃভাষায় সাক্ষরতা লাভ করতে পারে। সাক্ষরতার অভিমতই হচ্ছে লিপিকে যথার্থভাবে আয়ত্ত করা। দেখা গেছে, একটা সাঁওতাল ছেলের বাঙলা লিপি আয়ত্ত করতে যত সময় লাগে, তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই এই লিপিতে সে সাক্ষরতা লাভ করতে পারে। অল্প সময়ে বয়স্কদের সাক্ষরতালাভের পক্ষে এই লিপি অত্যন্ত উপযোগী।"[৩]

সম্প্রতি ভারত জুড়ে সাক্ষরতা অভিযানের নানা সদর্থক উদ্যোগ নজরে আসে। অথচ ভাবতেও অবাক লাগে—১৯৪৩ সালে পণ্ডিত রঘুনাথ একজন যথার্থ শিক্ষাব্রতীর আন্তরপ্রেরণায় কলকাতার স্বদেশি টাইপ ফাউণ্ড্রি থেকে অলচিকি লিপির টাইপ ঢালিয়ে, জামশেদপুর-টাটায় চাঁদান প্রেস প্রতিষ্ঠা করে, ছাপার হরফে অলচিকি লিপিতে কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণপরিচয় ধাঁচের বই নিজস্ব অর্থব্যয়ে ছেপে গ্রামে গ্রামে সাঁওতাল শিশুদের শিক্ষার জন্য বিলি করেন। সেইসঙ্গে সাঁওতালি ভাষায় ও অলচিকি লিপিতে শিক্ষা চালুর দাবিতে জনসচেতনতার পথ বেছে নেন। তাঁর সেই শিক্ষা-অভিযান ভাবনায় ওড়িশা, বিহার, বাংলা ও অসমের আদিবাসী জনগণ নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলনের ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়।

১৯৬০ সালে পণ্ডিত রঘুনাথ গঠন করেন আদিবাসী সমাজ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৬৪ সালে ওড়িশার অল সমিতি এবং বিহারের খেরওয়াল জারপা সমিতির মিলিত উদ্যোগে জামশেদপুরে গণজাগরণ অভিযান চলে। পণ্ডিত রঘুনাথের শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাবনার সদর্থক প্রয়াসে এই দুটি আদিবাসী সংগঠন সম্মিলিতভাবে হয় 'আদিবাসী সমাজশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থা'। এর ইংরেজি নাম—

'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association'—সংক্ষেপে 'ASECA', বাংলায় 'আসেকা'। পণ্ডিত রঘুনাথের উদ্যোগে, ওড়িশার তৎকালীন মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেও মহামহিমের উকিল সুনারাম সরেনের সক্রিয়তায় এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটি কটক শহরে রেজিস্ট্রি সংস্থাভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন নং ২৬৬৭/২৬৯ অফ ১৯৬৪) হয়। তার প্রধান দপ্তর রঘুনাথের জন্মভূমি ওড়িশার রায়রংপুর। ক্রমে বিহারের পাটনায়, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ও অসমের গৌহাটিতে গড়ে ওঠে এই সংস্থার রেজিস্ট্রিভুক্ত দপ্তর।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত তাম্রফলক

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির মূল কথা ঃ মাতৃভাষায় শিক্ষা। সাঁওতালি ভাষা শিক্ষায় অলচিকি লিপির গুরুত্ব অনুরূপ—এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্ডিত রঘুনাথ ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যে শিক্ষা-আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য 'আসেকা' সংস্থাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে অগ্রণী ভূমিকায় নিয়ে আসেন। পণ্ডিত রঘুনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়েও বারবার ছুটে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে এবং এরাজ্যে অলচিকি লিপি প্রয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখেছেন। ১৯৭৯ সালের ৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে অলচিকি লিপিকে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষার একমাত্র লিপির স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৯ সালের ১৭ নভেম্বর পুরুলিয়ার হুড়া থানার ক্যাঁদবনা মাঠে লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপস্থিতিতে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে তাম্রফলক ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে বিশেষ সংবর্ধনা জানান পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাঁওতালি ভাষাকে ভারত সরকারের অষ্টম তফসিলিভুক্ত করার সপক্ষে 'আসেকা' সংগঠনের পাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় সহায়তার ফলে ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা ভারতের অষ্টম তফসিলিভুক্ত হয়।

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার ডাহারডি গ্রামে ১৯০৫ সালের ৫ মে, বৈশাখী পূর্ণিমার শুভদিনে অলচিকি-লিপিস্রষ্টা, সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, কবি, নাট্যকার, শিল্পী, শিক্ষাবিদ এবং সাঁওতাল জাতি-সংগঠক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম দরিদ্র অথচ আদর্শপ্রাণ এক সাঁওতাল পরিবারে। তাঁর মা সলমা, বাবা নন্দলাল।

২০০৫ সাল রঘুনাথ মুর্মুর জন্মশতবার্ষিকী এবং ১৮৫৫ সাল গণ-সংগ্রামের ('সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে যার বিকৃত পরিচয়) সার্ধ শতবার্ষিকী এক আশ্চর্য সমাপতন যোগ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষপূর্তির গরিমা তার মাঝে এনেছে স্বাদেশিক চেতনার অন্যতর মাত্রা।

বাংলার বর্ণাভিমানী অসংখ্য হিন্দু সাঁওতাল জাতির প্রতি নানাভাবে উপেক্ষা-অবজ্ঞার ভাব দেখানোয় অভ্যস্ত হলেও উদার মানবিক চেতনায় তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ও স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)।

দরিদ্র, অসহায়, পীড়িত নরনারীদের সেবায় বিদ্যাসাগর হয়েছেন করুণাসাগর। জীবন-সায়াহ্নেও কার্মাটাঁড়ে গরিব সাঁওতালদের তিনি স্বজন হিসাবে আন্তরিক সেবাশুশ্রূষা করেছেন। দেওঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মথুরবাবু গরিব সাঁওতালদের সেবায় অর্থব্যয় করেছেন। বেলুড় মঠ গড়ার প্রথম দিকে মাটি কাটা, জঙ্গল সাফাইয়ে যুক্ত একদল সাঁওতালকে স্বামীজী সশ্রদ্ধ আন্তরিকতায় লুচি, তরকারি, মণ্ডা, মিঠাই, দই ইত্যাদি যোগে আপ্যায়ন-শেষে বলেছিলেন ঃ "তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন ঃ "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল-চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি।"[৪] ■

তথ্যসূত্র

১ বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ২

২ রবীন্দ্র রচনাবলি, ১৪শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫

৩ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর সাঁওতালি লিপি উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া—কুশল বাস্‌কে, 'আদিবাসী বার্তা' পত্রিকা, মে ১৯৯৪, আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশ মঞ্চ, খন্যান, হুগলি, পৃঃ ৬

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং, পৃঃ ২৩৫

মেদিনীপুরের প্রাচীন চার গড়ের দুর্গোৎসব

সুদর্শন নন্দী*

অবিভক্ত মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল প্রাচীন জনপদ। আজকের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তারই একটি ছোট অংশ বলা যেতে পারে। এই জেলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন, আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত। জৈনধর্ম একসময় প্রভাব বিস্তার করে এখানে। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলি রূপান্তরিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি। ধর্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাবও এই জেলার ওপর যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। উত্তরে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছিল মল্লরাজাদের রাজধানী। এই রাজ-সংস্কৃতির প্রভাবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পড়ে ওড়িশার প্রভাব। একসময় এই জেলার অনেক অংশই ছিল ওড়িশার অন্তর্গত। ফলে বাঙালি ও ওড়িয়া—এই দুটি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে একটা সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা ও জমিদারেরা বিভিন্ন জায়গায় রাজত্ব করে গেছেন। সেসব রাজরাজড়াদের পারিবারিক রীতিনীতির প্রভাবও পড়েছে এখানকার পূজাপার্বণ, উৎসব, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব দুর্গোৎসব হয় তার মধ্যে চারটি রাজ্যের (তৎকালীন) দুর্গোৎসব অন্যতম। এই চারটি স্থান হলো চিলকিগড়, লালগড়, কর্ণগড় এবং বেত্রগড় (যা আজ 'গড়বেতা' নামে পরিচিত)।

প্রথমে আসা যাক চিলকিগড়ের দুর্গোৎসবের কথায়। ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিলকিগড়ে একসময় জামবনী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। জামবনী বংশের কর্ণধাররা রাজত্ব করতেন ধলভূমগড়ে। বংশের একটি শাখা পরে চিলকিগড়ে চলে আসে। রাজবাড়ি রয়েছে ডুলুং নদীর পশ্চিমতীরে। পূর্বতীরে রয়েছে প্রসিদ্ধ কনকদুর্গার মন্দির। এই মন্দিরটি নতুন করে তৈরি হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে। আগে এখানে ছিল একটি জোড়বাংলা মন্দির। সেটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই নতুন মন্দির তৈরি হয়। এর পাশে রয়েছে পুরনো এক পঞ্চরত্ন মন্দির। অনেকে মনে করেন, দেবী কনকদুর্গা আগে এই পুরনো মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হন। প্রাচীন পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পূর্বমুখী, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ২০ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং ২০ ফুট। অর্থাৎ প্রায় বর্গাকার। ৩০ ফুট উঁচু। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে এটি তৈরি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় প্রকৃত সাল জানার উপায় নেই। আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা এবং জঙ্গলের মাঝে এধরনের মন্দির খুব একটা দেখা যায় না। কনকদুর্গার নতুন মন্দিরটি অনেকটা উঁচু টাওয়ারের মতো। মার্বেল ফলকের ওপর লেখা রয়েছে—"শ্রীশ্রী কনকদুর্গা। শিল্পী শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র দেও ধবলদেব। ৯ পৌষ সন ১৩৪৪।" প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৯.৯৫ মিটার করে। অর্থাৎ বর্গাকার। প্রায় সাড়ে ১৫ মিটার উঁচু। মন্দিরের চারদিকে জঙ্গল এবং জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে শিবলিঙ্গ। কনকদুর্গাদেবী অশ্বারূঢ়া, ত্রিনয়না এবং চতুর্ভুজা। পুরনো মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ায় বর্তমানের অষ্টধাতুর মূর্তিটি তৈরি হয় ১৯৭১ সালে।

চিলকিগড়ের কনকদুর্গা

এখন আর রাজা-প্রজা প্রথা নেই। ধবলদেব রাজবংশ এখন ইতিহাস। একসময় জাঁকজমক করে হতো দুর্গোৎসব, এখনো হয়। স্থানীয় মানুষ পরিচালনা করেন এই পূজা। নবমীতে এখানে মোষ এবং ছাগল বলি হয়। অষ্টমীর রাতে একটি ঘরে উনুন জ্বালিয়ে হাঁড়িতে বিরামভোগ বসিয়ে পূজারী দরজা বন্ধ করে দেন। তার আগে মন্ত্রজপ করে নেন রান্নাঘরে। পরদিন অর্থাৎ নবমীতে বলি শেষ হলে দরজা খোলা হয়। দেখা যায়, ভোগ তৈরি হয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, দেবী নিজের হাতেই এই রান্না করেন। পূজার শেষে প্রসাদ পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জাগ্রত দেবীর স্বহস্তে রান্না করা প্রসাদ পাওয়ার জন্যই ভক্তদের মধ্যে এই হুড়োহুড়ি।

দশমীর দিন রাবণপোড়া অনুষ্ঠান হয়। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ভরে ওঠে। বাজির আওয়াজ আর আলোর ঝলকানির মাঝে পুড়তে থাকে রাবণ।

** খড়্গপুর-নিবাসী, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, পুরনো ইতিহাস গবেষণার নেশা, 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গের পরিচিত।*

এবার আসা যাক লালগড় রাজবংশের দুর্গোৎসবের কথায়। মেদিনীপুরের রামগড় ও লালগড়ে ছিল দুটি রাজবংশ। জাতিতে এঁরা ছিলেন ব্রহ্মভট্ট (ভাট)। আদি নিবাস ছিল মধ্যপ্রদেশের এটোয়া জেলায়। জনশ্রুতি, মেদিনীপুরের রাজবংশের কোন রাজকুমারের জন্মসংবাদ রাজাকে দিলে তিনি খুশি হয়ে রামগড় ও লালগড়ের জমিদারি দুই ভাই গুণচন্দ্র ও উদয়চন্দ্রকে দেন। নবাবী আমলে আলিবর্দী রামগড় ও লালগড় অঞ্চলে বর্গি হামলা ঠেকাতে ব্যবস্থা নেন। সেসময় গুণচন্দ্র জঙ্গলের এক বাঘ মারায় আলিবর্দী তাঁকে 'সিংহসাহসরায়' ও উদয়চন্দ্রকে 'সাহসরায়' উপাধি দান করেন। লালগড়ের বর্তমান রাজপরিবারের উপাধি 'সাহসরায়'।

আগে লালগড়ের রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল একটু দূরে শাঁখাসিনিতে। পরে রাজা স্বরূপনারায়ণ সাহসরায় লালগড়ে রাজপ্রাসাদ তৈরি করে চলে আসেন। এখানে আটপুরুষ ধরে রাজত্ব করেন রাজারা। শেষ রাজা ছিলেন পৃথ্বীশনারায়ণ সাহসরায়। রাজা-প্রজা প্রথা আজ না থাকলেও রাজপরিবারের দুর্গোৎসব হয় ঐতিহ্য মেনেই। এই দুর্গাপূজার রয়েছে এক ইতিহাস। জানা যায়, দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হন নদী থেকে। একদিন পাশের কাঁসাই নদীতে স্নান করতে গেছেন রানিমা। নদীর জলে ডুব দিয়ে উঠে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান এক অপরূপা দেবীকে দেখে। দেখলেন, দেবী উঠছেন জল থেকে। তিনি বললেন ঃ 'আমাকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে চল। পুজো কর আমার।' রানিমা নিয়ে এলেন দেবীকে। দেবীর ,পূজা হলো শ্রদ্ধাভরে। তখন থেকেই শুরু হলো রাজবাড়ির দুর্গোৎসব। সে প্রায় চারশো বছর আগেকার কথা।

দুর্গাপূজার পাঁচদিন আলাদা দুর্গামন্দিরে পূজা হয়। মন্দিরের ভিতরে দেওয়ালে খোদাই করা আছে চুন-সুরকির দেবী দুর্গা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অসুর, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কার্ত্তিক, গণেশ নেই। কেন নেই? জানা গেল, রাজবংশের কোন এক রাজার পুত্রসন্তান না হওয়ায় দেবীর কাছে প্রার্থনা করে বিফল হন আর তাই ঐ রাজা দেবীর দুই ছেলেকে কেড়ে নেন, যাতে দেবীও অপুত্রক অবস্থায় পূজিতা হন। এই দুর্গাপূজা হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে। চুন-সুরকির প্রতিমার নবকলেবর হয় বছর বছর।

লালগড় রাজবাড়ির দেবী দুর্গা

গড়বেতার দেবী সর্বমঙ্গলা

দেবীকে দেওয়া হয় সিদ্ধচালের ভোগ। সপ্তমীতে আখ, শশা ও চালকুমড়ো বলি হয়। বলি হয় সন্ধিপূজা ও নবমীতে। অষ্টমীতে সিংহবাহিনী ও কুমারীপূজা হয়। পূজাতে রয়েছে বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান। এখানে দেবীর সঙ্গে পূজা করা হয় একটি তলোয়ারেরও। এই তলোয়ারটির নাম 'ধূপখাড়া'। এটি পুরুষানুক্রমেই পূজিত হচ্ছে। কথিত যে, এই তলোয়ার দিয়ে এগারো হাজার বর্গি নিধন করা হয়। দশমীর দিন বিসর্জন পর্ব। তলোয়ার নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে। সেটি নদীর জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ করা হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একটি প্রদীপ। তলোয়ার ফিরিয়ে আনা হয় রাজবাড়িতে এবং প্রদীপটি জলে আস্তে আস্তে ডুবে যায়। দেবী যেখানে উঠেছিলেন, প্রদীপটি নাকি ঠিক সেখানেই ডুবে যায়। এভাবেই হয় দেবীর বিসর্জন। পূজা দেখতে স্থানীয় ও দূরদূরান্তের মানুষের সমাগম চোখে পড়ার মতো।

এবার আসা যাক গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দুর্গাপূজার কথায়। মেদিনীপুর শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গড়বেতা ছিল বগড়ী রাজাদের রাজধানী। এখানে রাজাদের যে-গড় ছিল, তার থেকেই নামকরণ 'গড়বেতা'। অনেকে মনে করেন, এখানে অনেক বেতগাছ পাওয়া যেত, তাই এর নাম ছিল 'বেত্রগড়' এবং পরে তা দাঁড়ায় 'গড়বেতা' নামে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিষ্ণুপুরের অষ্টম মল্লরাজা শূরমল্ল (৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ—৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ) মেদিনীপুরের এই অঞ্চল অধিকার করেন। পনেরো শতকের প্রথম দিকে বগড়ীতে একটি আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা হলেন গজপতি সিংহ। গড়বেতার প্রধান পুরাকীর্তি হলো সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির। শিলাবতী নদীর অদূরে অবস্থিত সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরটি উত্তরমুখী। মাকড়া পাথরের তৈরি মন্দিরের উঁচু দেউল ওড়িশী রেখ-দেউল রীতির। মূল মন্দিরটি লম্বায় ও চওড়ায় ১৬ ফুট করে এবং ৪৬ ফুট উঁচু। মন্দিরের ভিতরে অধিষ্ঠিতা সর্বমঙ্গলাদেবীর বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের তৈরি। জনশ্রুতি, রাজা গজপতি সিংহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। অনুমান করা যায়, এটি ষোল শতকে নির্মিত। এছাড়া সর্বমঙ্গলা-মন্দিরে অন্নপূর্ণা

ও ভৈরব নামে অভিহিত আরো দুটি পাথরের মূর্তি দেখা যায়। গর্ভমন্দিরের দুদিকে মূর্তি-দুটি অবস্থিত। সর্বমঙ্গলাদেবীর মূর্তিটি গয়নায় ঢাকা থাকায় সম্পূর্ণ বিগ্রহটি বাইরে থেকে দেখা যায় না। দেবীর দশ হাতে দশটি অস্ত্র। অনেক পুরাকীর্তি-গবেষক দেবীকে দ্বাদশভুজা বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত দ্বাদশভুজা এই দেবীর হাত-পায়ের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি দশভুজা হিসাবে বর্ণিত হচ্ছেন বর্তমানে।
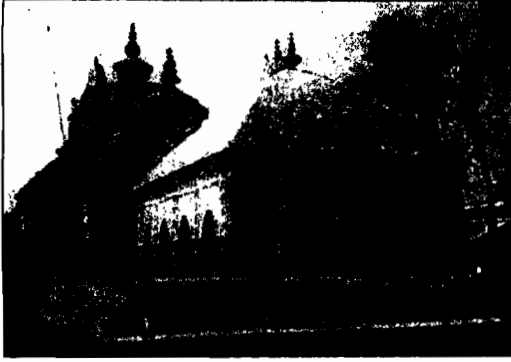
গড়বেতার দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির

এই মন্দির-নির্মাণ এবং দেবী সম্বন্ধে একাধিক জনশ্রুতি রয়েছে। বহুল প্রচলিত জনশ্রুতিটি হলো এরকম : দেবী দুর্গা ভক্তের কাছে দেখা দেওয়ার জন্য এবং পূজা পাওয়ার জন্য নিজেই এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির যখন মাটি থেকে ওপরে উঠছে, তখন ভোরের সময় একদিন একটি কোকিল ডেকে ওঠে। দেবী বিরক্ত হয়ে কোকিলটিকে পাষাণে পরিণত করেন। এভাবে একটি বানরও পাষাণে পরিণত হয়। জনশ্রুতি যাই হোক, মন্দিরটির নির্মাণ হয়েছিল ষোড়শ শতকেই। দেবীর নিত্যপূজা বাদ দিলে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। কল্পারম্ভ হয় পিতৃপক্ষের নবমীতে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা হয়। মহানবমীতে হয় মহিষবলি। মহিষবলি ছাড়াও ছাগলবলিও হয় প্রচুর। এই পূজা ও বলি দেখার জন্য এত জনসমাগম হয় যে, মূল রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়। পুরো এলাকা এক বিশাল মেলাতে পরিণত হয়।

কর্ণগড়ের মন্দির

পরিশেষে আসা যাক কর্ণগড়ের কথায়। মেদিনীপুর শহরের কাছেই ভাদুতলা। সেখান থেকে ডানদিকে পিচরাস্তা বরাবর ৭ কিলোমিটার গেলেই পড়বে ঐতিহাসিক এই কর্ণগড়। ইতিহাসখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের নায়িকা রানি শিরোমণির গড় ছিল এখানে। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কর্ণগড়ের রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে পুত্র অজিত সিংহ রাজা হন। তিনিই ছিলেন রাজবংশের শেষ রাজা। তিনি মারা যাওয়ার পর দুই রানি ভবানী ও শিরোমণি জমিদারির স্বত্ব পান। ভবানী মারা যান ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। ঐবছরই মেদিনীপুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে হস্তান্তরিত হয়। যাই হোক, এই অঞ্চলে সেসময় (১৭৯৯-১৮০০) যে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' হয়েছিল, তাতে নেতৃত্ব দেন রানি শিরোমণি। আর বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল এই কর্ণগড়। এটি কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সাধনক্ষেত্রও ছিল। তাঁর 'শিবায়ণ' (১৭১০ খ্রিস্টাব্দ) এসময়ের এক শ্রেষ্ঠ কাব্য। কর্ণগড়ের তৎকালীন রাজা রামসিংহ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখানে রয়েছে কর্ণগড় রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়ার মন্দির। জনশ্রুতি, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের পাশে রয়েছে দণ্ডেশ্বর শিব-মন্দির। দুটি মন্দিরই পশ্চিমমুখী এবং প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তবে পূর্বদিকে প্রবেশপথ রয়েছে। মহামায়ার মন্দিরের পিছনে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। এই জল ভক্তরা চরণামৃত হিসাবে পান করে থাকেন। মন্দিরে পূজিতা দেবী দুর্গা দ্বিভুজা। সিঁদুর মাখানো পাথরের মূর্তি। স্বর্ণনয়না, কাপড়ে ঢাকা সারা দেহ।

দেবী এখানে পদ্মাসনা। বাম হাত নাভিতে, ডান হাতে তিনি অভয় দান করছেন। দেবীর সিংহাসনের কাছে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। জানা যায়, কবি রামেশ্বর তান্ত্রিক পাঠক ছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহও ছিলেন তন্ত্রপাঠক। উপরি উক্ত পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসেই কবি যোগসিদ্ধ হয়েছিলেন। দুর্গাপূজায় চারদিন মহাসমারোহে বিশেষ পূজা হয়। কুমারীপূজা হয় অষ্টমীর দিন। মহানবমীতে হয় বলিদান। দশমীতে ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়। অসংখ্য জনসমাগমে মন্দিরচত্বর মেলায় রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বা সার্বজনীন দুর্গাপূজায় মূর্তি, মণ্ডপের জৌলুসের আকর্ষণ থাকলেও ঐতিহ্যপূর্ণ সাবেকি এসব পূজার আকর্ষণ চিরকালীন।

উৎস

(১) পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর—তারাপদ সাঁতরা; (২) মেদিনীপুর জেলার প্রত্নতত্ত্ব—প্রণব রায়; (৩) মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য; (৪) 'পশ্চিমবঙ্গ' (মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা), জানুয়ারি ২০০৪; (৫) 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ০৪.১০.০৪ (কিংশুক গুপ্তের প্রতিবেদন); (৬) 'বর্তমান', ২৫.০৯.০৪ (চৈতন্যময় নন্দের প্রতিবেদন)

এই রচনাটি দিল্লি-নিবাসী শ্রীধনঞ্জয় সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী শ্রীজাতা সেনগুপ্ত কর্তৃক সৃষ্ট স্থায়ী তহবিলের সৌজন্যে 'স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে স্বামীজীর সমাজভাবনা

পূর্বা সেনগুপ্ত*

ভূমিকা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাংলার বিদ্বজ্জনদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পরিচিত ছিলেন, এর ফলে তাঁর সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনায় ভগিনীর প্রভাব সুস্পষ্ট। রাধাকমল এবং রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—দুই ভাই বাংলার অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। প্রখ্যাত শিল্পী অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলি 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Shipping : A History of the Sea-borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Ancient times'-এ নিবেদিতার চিন্তাধারার প্রভাব আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'ভূমিকা'য় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থে লেখক দেখাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র এবং ব্যবসায়িক উন্নতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই কায়েম ছিল। এর উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধযুগে ভারতের নৌবাণিজ্যের প্রভাবের কথা বলা যায়। লেখক নৌবাণিজ্য বিস্তারের কথাও গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, নিবেদিতা এই বিষয়ে কিভাবে লেখককে প্রভাবিত করেছিলেন? এপ্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই যে বৈশ্যশ্রেণির সমৃদ্ধি ঘটেছিল—এই তথ্যই নিবেদিতা প্রধান গবেষণারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতের শ্রেণি-শাসন অন্য দেশের তুলনায় পৃথক, বিবর্তনের ইতিহাসও ভিন্ন। এ-তথ্য তখন প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা ভারতের সমাজ আলোচনায় যে সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনবাদের ধারাকে তুলে ধরেছিলেন, সেই ধারাটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী 'কার্ল মার্ক্স'-এর বিবর্তনের ধারণা থেকে সরে এসে আমাদের এক্ষেত্রে ভারতীয় ধারণাকে দেখতে হবে। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ যেমন নৌবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি ভারতের সমাজবিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দুজনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় স্বামীজীর ভাবাদর্শকে এক নতুন আঙ্গিকে দেখতে পাব। স্বামীজীর সমাজচিন্তা নিয়ে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা তৎকালের পত্রিকায় পাই। এইসব পত্রিকা ('প্রবাসী') থেকে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কলমে স্বামীজীর সমাজচিন্তা কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা দেখতে চেষ্টা করেছি। এই আলোচনায় আমরা বিবর্তনবাদকে নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৮)

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যেসব সমাজতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ছিল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গেও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পরিচিত ছিলেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক এবং বিশেষ করে সমাজ ও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু সমাজের বাণী'[১] শিরোনামে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শকে 'ভারতের আধুনিক সমাজতন্ত্র'-এর বাণী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের সমাজতাত্ত্বিক ধারণা গড়ে উঠেছিল 'চতুরাশ্রম' ও 'চতুর্বর্ণ'-এর বিভাজনের মাধ্যমে। এই চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণের ধীর লয়ে বিলোপ উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতে তাই গড়ে উঠেছিল নতুন অর্থনীতি, নতুন সামাজিক কাঠামো। প্রাচীন ভারতের সমাজবন্ধনের মাধ্যমগুলি, যেমন 'যৌথ পরিবার' ভেঙে যাচ্ছিল বলে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নতুন সমাজবন্ধনের জন্য বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবাভিত্তিক সমাজতন্ত্রই একমাত্র উপায়। বিবেকানন্দের ত্যাগ (Renunciation) ও সেবা (Service)-র আদর্শকে তিনি ভারতীয় 'আধুনিক সমাজতন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

* *বাঙালি পাঠকসমাজে সুপরিচিতা, গবেষিকা, কলকাতা-নিবাসিনী।*

"প্রাচীন হিন্দুর সমাজতন্ত্র এখন হীনবল, কিন্তু আধুনিক হিন্দুর নরনারায়ণ-পূজা সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে।

"প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ব্যক্তিগত ছিল, এখন ধর্ম সমাজগত হইয়াছে। ধর্ম এখন সমাজমুখী হইয়াছে।"[২]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সমাজতন্ত্রের ধারণাকে মোটা-মুটি তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন—(১) পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক ধারণা, (২) প্রাচীন ভারতের চিরাচরিত সমাজতন্ত্রের ধারণা এবং (৩) আধুনিক ভারতের সমাজতন্ত্রের ধারণা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক ভারতের সমাজতন্ত্র ও সমাজবন্ধনের সূত্র হিসাবে তিনি বিবেকানন্দের সমাজচিন্তাকে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র হিসাবে তিনি কার্ল মার্ক্স প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের কথাই বলেছেন বলে মনে হয়। তাঁর মতে: "ভারতবর্ষে যেরূপ সমাজতন্ত্র ছিল এবং এক্ষণে ইউরোপ যে-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তাহাতে অনেক প্রভেদ। ইউরোপের শ্রমজীবিগণ অনেক সময় সমাজ-তন্ত্রবাদিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া একটা ভীষণ সামাজিক বিপ্লবের জন্য আয়োজন করে। তাহাদের আশা, ধনিগণের অর্থ লুঠ করিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া তাহারা নিজেরাই আইন-কানুন করিবে। ধনিগণের অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে সমাজে দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিবে না, তাহারা মুখে বলিতেছে, সহযোগিতাই মনুষ্যের ধর্ম; তাহারা প্রচার করিতেছে, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য; কিন্তু কাজে তাহারা তস্কর দস্যুর ন্যায় স্বার্থপর, সমাজদ্রোহী।"[৩]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ওপর সমাজদ্রোহিতার দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ, ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র, তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতার প্রাধান্যকে স্বীকার করে সমাজের সহযোগিতাকে নষ্ট করে। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের মূলগত পার্থক্য ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষ সর্বদাই সমাজকে প্রাধান্য দিয়েছে, ব্যক্তিকে সামাজিক কাঠামোর ভিতর রেখেছে। চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণের দৃঢ় কাঠামো ভারতীয় সমাজকে ব্যক্তির থেকে সর্বদাই শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছে। এর ফলে, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, সমাজতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। তিনি 'ফেবিয়ান সোসাইটি পেপার'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, একদল ইউরোপীয় সমাজচিন্তক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার বিপক্ষে। তাঁরা বিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। তাঁদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সাদৃশ্যযুক্ত।

তাঁরা সত্যই ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করতে চান, তাঁদের মতে: "Socialism is merely individualism rationalised, organised, clothed and in its right mind The Fabian Society Papers."[৪]

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, আধুনিক ইউরোপও হিন্দুসমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায়। ভারতবর্ষের সমাজ যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম ও অধিকারভেদের সৃষ্টি করে ব্যক্তির জীবন গঠন করেছে, পাশ্চাত্য সমাজও এখন ঠিক তেমনভাবে ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে। খ্রিস্টধর্ম নয়, সমাজতন্ত্রই যে ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে রোধ করতে সক্ষম হবে—এই আশা আধুনিক ইউরোপের সমাজতন্ত্র-বিদেরা মনে করে থাকেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, খ্রিস্টের সেবার ধর্ম ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে সমাজমনস্ক হতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর খ্রিস্টের সমাজসেবামূলক ধর্ম আর ইউরোপকে প্রভাবিত করতে পারছে না। "Love the neighbour as thyself—ইহাতে আর ইউরোপ গাহিতেছে না। টলস্টয় খ্রিস্টকে The greatest of socialists বলিয়াছেন। কিন্তু খ্রিস্টের সমাজসেবামূলক ধর্ম, সেবার ধর্ম পাশ্চাত্য জগৎকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।"[৫]

যেহেতু খ্রিস্টের সেবামূলক ধর্ম ইউরোপকে প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না, সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতাও ভারতের নবীন সমাজতন্ত্রের অভিমুখী হতে হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য এক হলেও উপায় ভিন্ন। আধুনিক ইউরোপের সমাজতন্ত্রের নেতা হবেন বিষয়ী শ্রমজীবী-দের সর্দারগণ—যাদের মধ্যে সেই 'অনন্তবোধ' নেই, যা ভারতীয় সমাজপরিচালক ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

"হিন্দু সমাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদিগের প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই একটা অনন্তবোধ ও অসীম প্রীতির চিহ্ন থাকিত; যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধনের ভিতর থাকিয়াও আপনাদের মুক্তিসাধনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন; যাঁহাদিগের নিকট মুক্তিসাধন চরম লক্ষ্য; যাঁহাদিগের নিকট ভোগের সংসার বৈরাগ্যসাধন ও মুক্তিলাভের উপায়মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্যক্তির মুক্তিসাধন, ব্যক্তিত্ব বিকাশই সমাজজীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যে-সমাজতন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐক্য ছিল, অনৈক্যও ছিল; সহযোগিতা ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল; সাম্য ছিল, অধিকারভেদও ছিল; তাহার অনৈক্য ছিল কিন্তু স্বৈরাচার ছিল না; তাহাতে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না।... তাহাতে ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনও হইত।"[৬] প্রশ্ন হতে পারে, আশ্রমধর্মের মধ্যে সাম্যবাদের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব? বিশেষত যে-বর্ণাশ্রমের জন্য ভারতীয় সমাজ বারংবার নিন্দিত হয়েছে?

প্রথমত, হিন্দুসমাজ বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করে সমাজকে অসুস্থ প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই সমাজব্যবস্থায় সংগ্রামের ক্ষেত্র সমগ্র সমাজব্যাপী ছিল না, সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকত। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা; অন্য কোন বর্ণের সঙ্গে

ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ছিল না। এর ফলে অনেক বৃত্তিগত নিরাপত্তা ও জীবনযাপনের উদ্বেগ কম ছিল। ক্ষত্রিয়ের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয়ই ছিল, অন্য কোন বর্ণ নয়। ভারতীয় আশ্রমধর্ম আবার এই বর্ণাশ্রমের প্রতিযোগিতাকে সীমিত করে তুলেছিল মানবজীবনকে চার অংশে বিভাজিত করে। প্রতিটি ব্যক্তি জানত, তাকে কিছুদিনের মধ্যেই এই সংসার ত্যাগ করে মুক্তির খোঁজে বনবাসী হতে হবে। এর ফলে সংসারের কাজকর্ম ও প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি 'অনন্তবোধ' সর্বদাই মানবব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে রাখত, যার ফলে, সে একদিকে নিজ ধর্ম অনুযায়ী কর্মপালনে যেমন সক্রিয় হতে পারত, ঠিক তেমনভাবেই সমাজের কাঠামোর বাইরে যেতে সক্ষম ছিল না। এই কাঠামোর বাইরে সে আসত চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রমটিতে। ব্যক্তি যখন সমাজের ভিতর, তখন প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্তব্য—ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, তখন অনৈক্য। কিন্তু ব্যক্তি যখন বর্ণ ও সমাজের বাইরে, ভগবানের সম্মুখীন—তখন ঐক্য। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে বর্ণ-ধর্মের অনৈক্য ছিল না, সকলেই সমান অধিকার লাভ করত, সমান শ্রদ্ধা ভোগ করত।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন, হিন্দুর এই সমাজবন্ধনের ধারা আজ শিথিল হয়েছে। আমাদের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী বর্ণের বিভাজন আজ আর দেখা যায় না। আশ্রমপ্রথাও বিলুপ্তপ্রায়। যদিও এর অতীত অস্তিত্ব আমরা আজও দেখতে পাই। যেমন আজও আমাদের সমাজ আধ্যাত্মিকতার আদর্শে গরীয়ান, আজও সমাজে বিদ্যার আদর ও বৈরাগ্যের সম্মান অটুট রয়েছে। তবুও আমরা আজ বৈষয়িক জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, পাশ্চাত্যের ব্যক্তিপূজাও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে; তাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা অর্থনৈতিক কারণে যুগসন্ধিক্ষণে দুর্বল হয়েছে। এইক্ষণে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণা আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজকাঠামো ও ভারতীয় সমাজকাঠামোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান, তাই ভারতে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র বলবৎ হতে পারে না; কারণ, এই সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে স্বীকার করে—যেখানে ভারতের মূলমন্ত্র হলো সহযোগিতা। একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা। তাই এক্ষণে আমাদের সমাজতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের পথ দেখাবে বিবেকানন্দের 'আধুনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা।'[৭]

"বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীতে নরনারায়ণই ভবিষ্যৎ হিন্দু-চরিত্রের প্রতিমূর্তিস্বরূপ হইয়াছেন। বুদ্ধ অবতারে নর-নারায়ণ জগতে করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে নারায়ণ জগতে সেই একই বাণী প্রচার করিয়া জগদ্ব্যাপী অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শান্তি ও আনন্দ আনিবেন।"[৮]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দের নরনারায়ণ সেবা বা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ক্ষেত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে খ্রিস্টের সেবাধর্ম ও ইউরোপে তার প্রভাব, দ্বিতীয়ত শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডালে প্রেমবিতরণের বাণী ও তৃতীয়ত বুদ্ধের দয়াধর্মের উল্লেখ করেছেন। এবং পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন, এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রচারিত আদর্শ মানব-কল্যাণের কথা বলতে পারে; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো আর বলবৎ করতে পারে না। শ্রীচৈতন্যের দর্শন জাতিভেদের গণ্ডিকে ভঙ্গ করে ধর্মীয় অনুভূতিকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস ভেঙে তিনি যে নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন—সেই আন্দোলনই একসময় নতুন এক সামাজিক গোষ্ঠীর জন্ম দিল। যার ফলে উন্মুক্ত আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। বুদ্ধ জনগণের কাছে নিজের ধর্মমতকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। সনাতন ধর্মের আড়ম্বর থেকে মুক্ত করে তিনি ধর্মীয় তত্ত্বকে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনই একটা নতুন ধর্ম প্রচার করেননি; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম 'বৌদ্ধধর্ম' নামে পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করল।

সুতরাং বুদ্ধ কিংবা চৈতন্য লোককল্যাণের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সামাজিক কাঠামোতে একটি দৃঢ় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, চৈতন্য ও বুদ্ধ তাঁদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরা যে সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন, সেই সামাজিক প্রয়োজনের ভিন্নরূপ আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত সমাজকাঠামো তাঁরা পাননি, তাই বর্তমানে, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শই আধুনিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ বলে চিহ্নিত।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এই পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর বিরাট সমালোচনা প্রকাশ করেন, সমালোচনা করেছিলেন সম্পাদক নিজেই। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ধারণাকে 'আধুনিক সমাজতন্ত্র' বলে উল্লেখ করায় তিনি বিস্তর বিপক্ষযুক্তি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরিবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ দুঃখী, পাপী, তাপী, গরিব সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন।...

"উনিশ শত বৎসর পূর্বে খ্রিস্ট ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। খ্রিস্টিয়ান মতে, ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরাবতার যিশু শেষ বিচারের দিনে ধার্মিকদিগকে বলিবেন...

"আইস, তোমার পিতার আশীর্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে-রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা

আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে।... তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখিয়া আপনাকে পান করাইয়াছিলাম? কবে আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া আপনাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? তখন রাজা তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে একজনের প্রতি যাহা করিয়াছিলে, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছিলে।... (মথি লিখিত সুসমাচারের ২৫ অধ্যায়)

"খ্রিস্ট যে-উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার প্রকৃত ভক্তেরা যেরূপ নরসেবা করিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশি আধুনিক যুগে কেহ করেন নাই, পুরাকালে করিয়াছিলেন কি না জানি না। খ্রিস্টের এই উপদেশ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকাও লিখিত হইয়াছে; যেমন লাওয়েলের লেখা 'দি ভিজ্যন অব্ সার লন্‌ফল্'। সার লন্‌ফল্ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক কুষ্ঠ ভিখারিকে যখন অবজ্ঞাভরে এক স্বর্ণমুদ্রা দান করেন, তখন সে তাহা লয় নাই; কিন্তু বহুকাল পরে সার লন্‌ফল্ পৃথিবীর দুঃখতাপে দগ্ধ হইয়া যখন এ-ভিখারিকে নিজেরই রুটির ভাগ দিলেন, তখন ভিখারি ঈশ্বরাবতার যিশুর মূর্তি ধরিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, 'Who gives himself with his alms feeds three,—/ Himself, his hungering neighbour, and Me.'

"এই কবিতা বিবেকানন্দের জন্মের অনেক পূর্বে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

"জীবের সেবা যে ভগবানের সেবা, এই উপদেশ নানা আকারে পৃথিবীর অনেক সাধু দিয়াছেন। তদনুসারে কাজ ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের লোকে করিয়াছে ও করিতেছে। বিবেকানন্দ যে-পরিমাণে যতগুলি লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু 'তাঁহার অল্পায়ু জীবন হইতে তাঁহার জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে', 'বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নরনারায়ণ পূজা' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়া লেখক নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধুর চেষ্টার অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিয়াছেন বা তৎসমুদয়কে উল্লেখের অযোগ্য মনে করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শিতপ্রসূত।"[৯]

সম্পাদকের দীর্ঘ সমালোচনার এক অংশ তুলে ধরা হলো, কারণ, সমালোচক এখানে খ্রিস্টানদের সমাজসেবামূলক তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বদেশের বুদ্ধ বা চৈতন্যের নাম উল্লেখ করা তাঁর হয়তো প্রয়োজন বলে মনে হয়নি। এই খ্রিস্টপ্রীতি তৎকালের বুদ্ধিজীবীদের এক বৈশিষ্ট্য—পরাধীনতা থেকে উপজাত এক মানসিকতা। খ্রিস্টের জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় নীতি প্রচারের ফলে সংগঠিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের জনকল্যাণের চেষ্টাই জগৎ জুড়ে 'মিশনারি ওয়ার্ক' হিসাবে সেকালে পরিচিত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের উন্নতিতে যত না তাঁদের অবদান রয়েছে, তার থেকে কুফল রয়েছে বেশি। তার ওপর ভারতীয় 'নরনারায়ণ' নীতি খ্রিস্টানদের মধ্যে তখনো স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়নি। খ্রিস্টদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের সাদৃশ্য প্রচুর। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' অথবা 'Practical Vedanta'-এর ধারণাকে 'আধুনিক সমাজতন্ত্র' অভিধায় অভিহিত করে ঠিক করেছিলেন কি ভুল করেছিলেন, তা আমাদের বিচার্য নয়। আমরা তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখতে পাই একজন সমাজতাত্ত্বিকের বিবেকানন্দের প্রতি আগ্রহ ও বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তব্যের মধ্য থেকে সমাজতাত্ত্বিক ধারাকে খুঁজে বের করার একটি প্রয়াস। সমালোচিত হলেও, বিতর্কিত হলেও ভারতীয় সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে এটি আমাদের কাছে একটি গুরুত্ব বহন করে।

'প্রবাসী' পত্রিকায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় রচনা 'হিন্দুর নব্য দর্শনবাদ'[১০] প্রকাশিত হয়েছিল সরযূবালা দাসী লিখিত 'বসন্ত-প্রয়াণ' গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থের তাত্ত্বিক দিকটি রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিকে 'কাব্য' গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করলেও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটির মধ্যে একটি দৃঢ় তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের দেখা পেয়েছিলেন। সমালোচনার শেষ ভাগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গেও তিনি হিন্দুর ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "হিন্দু যুগে যুগে নতুন দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন নূতন অধ্যাত্মসাধনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে; হিন্দুত্ব যে সজীব রহিয়াছে, হিন্দুত্ব যে ক্রমবিকাশমান, ক্রমোন্নতিশীল। আজও এই গ্রন্থে হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনার সেই চিরপুরাতন চিরনূতন বাণী প্রচারিত হইল। হিন্দুত্ব যে অতীতের স্মৃতি নহে, হিন্দুত্ব যে মৃত অতীতের শব নহে, কল্পনার জীর্ণ কঙ্কাল নহে—বর্তমানের অনুভূতিতে তাহার নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল। ক্রমবিকাশমান হিন্দুত্বের কথা স্মরণ করিলে প্রথমে মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা মনে পড়ে। বিরোধ ও সামঞ্জস্যের মধ্যে মহাত্মা রামমোহন হিন্দু মুসলমান ও খ্রিস্টান দর্শন মন্থন করিয়া এক অভিনব তত্ত্ব দর্শনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের বিরোধী পারিপার্শ্বিকের মধ্যে হিন্দুত্বের সেই প্রথম সাড়া পাওয়া গেল। তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। নূতন নূতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দর্শনের সৃষ্টি হইল। নূতন সম্প্রদায়েরা বলিল, হিন্দুত্ব অসাড়, অচেতন; ইউরোপের ভাব ও চিন্তার দ্বারা তাহারা হিন্দুর তত্ত্ব দর্শনকে পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইল। হিন্দুত্ব তখন অতীত মহিমার স্মৃতিতে বর্তমান লজ্জাকে ঢাকিয়া রহিয়াছিল। তাহার কিছু পরেই, এখন হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে যখন হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনা বিদেশের

পরানুকরণ ও পরানুবাদের মোহে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন একজন তরুণ সন্ন্যাসী পাশ্চাত্য সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া সগৌরবে বেদান্তের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে শুধু অতীতের গৌরবস্মৃতি বক্ষে করিয়া সাহস পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি হিন্দুর দর্শনকে প্রাণময় সত্তাদান করিলেন, যুগোপযোগী নূতন আকার দিলেন; তাহাকে তুলনামূলক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবযুগের উপযোগী হইল, যা নবকলেবরের পূর্ণ মহিমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূজা পাইতে লাগল। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জিগীষু হিন্দুত্বের (Aggressive Hinduism) প্রবর্তক—তরুণ সন্ন্যাসী হিন্দুত্বকে এক অপূর্ব তেজ ও গরিমায় ভূষিত করিলেন। চিকাগোর ধর্মসভা নব্য হিন্দুত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিল।"

বিংশ শতাব্দীর হিন্দুত্বের প্রধান সম্বল এই নব্যদর্শনবাদ।

"এই হেয় ও নিকৃষ্ট বাস্তবের মধ্যে হিন্দুত্বের আশ্রয় ও সম্বল হিন্দুদর্শন। রামমোহন, বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর নব্যদর্শন হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক, হিন্দুসমাজের বর্তমান দৈন্যের অন্ধকারের মধ্যে ধ্রুব ও স্নিগ্ধ জ্যোতি। হিন্দুর নব্যদর্শনের আমরা আবার পরিচয় পাইলাম—এইবার পাণ্ডিত্যের তর্ক নাই, বিচারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাই, সমালোচনার তীব্রতা নাই; এইবার নব্যদর্শন একেবারে সরল, অকৃত্রিম, মর্মস্পর্শী, জীবন্ত। ইহা অধীতবিদ্যার প্রাণহীন নহে, ইহা জীবনের সত্যানুভূতিতে প্রাণময়। এই নব্যদর্শন হইতে হিন্দুসমাজ কি জীবন পাইবে না, হীন বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুসমাজ কি আদর্শবাদের দিকে অগ্রসর হইবে না?"[১১]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের এই আলোচনাও সমালোচিত হয়েছে সম্পাদকীয় মন্তব্যতে। সম্পাদক লিখেছেন, সমালোচক মূল প্রবন্ধে লেখা রামমোহন, বিবেকানন্দ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারই সঙ্গে নব্য হিন্দুদর্শন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর আর কতকগুলি ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কারণ, সম্পাদকের মতে এঁরা প্রত্যেকেই "ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাকে সম্মিলিত করিয়া নতুন কিছু গড়িয়াছেন।"[১২]

১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউট হল-এ আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত বক্তৃতাটি প্রবন্ধ আকারে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়।[১৩]

এই বক্তৃতায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রথমে পরিণামবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ মূলত দুর্বলতার যুগে যখনি তিনি চিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্তমান যুগধর্মোপযোগী পরিণামবাদের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইয়া দিলেন, তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের মহিমা-প্রচার হয় নাই—সেটা বিশ্বসভ্যতার ভারতীয় সভ্যতার বাণী প্রচার হইল।"[১৪]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতেঃ "বেদান্তবাদ কেবল ভারতের দর্শন নয়, বেদান্তবাদ যে ভারতের কর্ম। ভারতের সমাজগঠন, ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, ভারতের আচার-অনুষ্ঠান, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশলাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম ও মুক্তির যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না।"

"স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত গঠনের মন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল এই বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসার-বিমুখিনতার প্রশ্রয় দিয়া দুর্বলতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে, তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।"[১৫]

রাধাকমল বারংবার বিবেকানন্দের 'জীবসেবাব্রত' বা নব্যবেদান্তের আলোচনা করেছেন। নব্যবেদান্তের মাধ্যমে বিবেকানন্দ যে সমাজপরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, সেই পরিবর্তিত ও যুগোপযোগী ভারতীয় সমাজকাঠামো তিনি তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন বারে বারে। এই নব্যবেদান্তের মধ্যে তিনি একাধারে মৌলিকতা, অন্যধারে সমাজবিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। এর থেকে একটি মৌলিক ও আদর্শ সমাজ গঠনের ধারণাকে তিনি বের করে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। "যুগশক্তি বাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন নাই, শিক্ষা নাই, সমাজব্যবস্থা নাই, আমাদের সভ্যতা পরমুখাপেক্ষী হইয়া একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরুভারে ও প্রভুর খেতাবে গর্বিত ও স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তি নষ্ট করিতে উদ্যত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্তী পরিবার, গ্রাম্য সমাজ, নানা সামাজিক সম্বন্ধসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খণ্ড-বিখণ্ডতাপ্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর, তখন সত্যসত্যই একটা বন্ধনীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বন্ধনীশক্তি।" এখানে 'বন্ধনীশক্তি' বলতে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সামাজিক সংহতির কথা বলেছেন—যে-বন্ধনীশক্তির কথা তিনি 'প্রবাসী'র প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন সমাজতন্ত্রে গঠিত ভারতীয় জীবনধারা ভেঙে যাচ্ছে, তাকে নতুনভাবে বাঁধতে হবে বিবেকানন্দের আধুনিক সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। এর পর

রাধাকমল আরো দুজন ব্যক্তিত্বের কথা বলছেন ঃ "পূর্বে দুইজন তাঁহার অগ্রে সমাজবন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন—রাজা রামমোহন ও ভূদেব, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুইজনকে তেমন নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। একজন রহিয়া গেলেন শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক, আর একজন শুধু সনাতনধর্মের প্রচারক।"[১৬]

পরবর্তী কালে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজা রামমোহনের সমাজচিন্তার মধ্যে সমাজতত্ত্বের অস্তিত্বকে দেখতে পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কিন্তু সমাজতত্ত্বকে বারংবার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কেমন করে বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ স্বৈরাচার ও খণ্ডবিখণ্ডতা থেকে সমাজকে মুক্ত করবে তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল করিয়া জান, অনুভব কর; সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহার আহার ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতেছে।... সমাজ যে তোমারই শরীর,... সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরো বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট শরীর। তুমি দরিদ্র-নারায়ণ, দুঃখী-নারায়ণ, আতুর-নারায়ণের সেবা কর; সেই সেবাতেই তোমার ভিতর যে পূর্ণ অথচ ক্রমবিকাশমান, বিশ্বব্যাপক অথচ জিগীষু আত্মাটি আছে, তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চঞ্চল জীবনে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে অপরিসীম শক্তি অথবা ভোগ্য প্রদান করিতে পারে তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যেই পরম আনন্দ ও বল, সম্ভোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর সতর্কবাণী।"[১৭]

"বিভিন্ন বর্ণ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার তিনি প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে বিবাহকর্মকে অবশ্যকর্তব্য মনে করিয়া সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতশিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যাবহারিক বিদ্যার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সার্বজনীন; হিন্দু-ধর্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভেদ হইতে তিনি যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, দ্বন্দ্ব ও ভেদজ্ঞাপক, কাহারো আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির বিরোধী—তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"[১৮]

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দের আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের ওপর গঠিত সমাজের কথা বলেছেন ঃ "নূতন ভারত—যেখানে লোকে এক মন, সমান্তঃকরণ-বিশিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানে ও কর্মে ধর্মানুশীলনে ও বিদ্যাচর্চায় শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে—যে-জীবনে দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি কেমন যেন এক সুরে বাঁধা, ইন্দ্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত, যেখানে সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্ম-নির্দেষ্টা, যজমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যাবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষক শিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত ও শ্রমকুশল, শ্রমজীবিগণ আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে। সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, মুদির দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ হইতে, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাদের আশা আছে, ভরসা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী যেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন করিতেছেন।

"যেদিন সে-জাগরণ আসিবে, যেদিন নূতন যুগের নূতন যুগশক্তির উপযোগী কর্তব্য আমরা সম্পাদন করিব—সমাজে, শিক্ষায়, বিদ্যানুশীলনে, রাষ্ট্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণধারাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতনভাবে সকলই গঠন করিয়া তুলিব।"[১৯]

সুতরাং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, বিবেকানন্দের বক্তব্যে আধুনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা সুপ্ত রয়েছে। তিনি বিবেকানন্দের ব্যক্তি ও সমাজের ধারণা এবং জীবসেবার ধারণার একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ◼

তথ্যসূত্র

১ 'প্রবাসী', ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২১, পৃঃ ৬৩৩-৬৫৫
২ ঐ, পৃঃ ৬৪৯
৩ ঐ, পৃঃ ৫৪৬
৪ ঐ
৫ ঐ, পৃঃ ৬৪১
৬ ঐ, পৃঃ ৬৪৬
৭ ঐ, পৃঃ ৬৪৯
৮ ঐ
৯ ঐ, পৃঃ ৬৫১
১০ ঐ, ১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩২২, পৃঃ ৮৯-৯৩
১১ ঐ, পৃঃ ৯৩
১২ ঐ, পৃঃ ৯৫
১৩ বিবেকানন্দ স্মরণে—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'উদ্বোধন', ২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪, পৃঃ ১৪৪-১৫৩
১৪ ঐ, পৃঃ ১৪৫
১৫ ঐ, পৃঃ ১৪৬
১৬ ঐ, পৃঃ ১৪৭
১৭ ঐ, পৃঃ ১৪৭
১৮ ঐ, পৃঃ ১৪৮
১৯ ঐ, পৃঃ ১৫১

সোমনাথ ঃ ইতিহাসের আলোয়

সৌমেন্দ্র সাহা*

আমরা বারেবারেই শুনে এসেছি, গজনীর সুলতান মামুদ সুদূর অতীতে বহুবার প্রভাস (গুজরাট) তথা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সোমনাথের বহুখ্যাত মন্দির ধ্বংস করেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি ও ক্রীতদাস-দাসী বেঁধে নিয়ে দেশে ফিরে যান। সোমনাথের ইতিহাস বড় বিচিত্র, ঘটনাসমৃদ্ধ, আশ্চর্যজনক এবং বেদনাদায়ক তথ্যে ভরপুর। লজ্জা, গৌরব এবং কলঙ্ক সে-ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিধৃত। কিন্তু আজ পর্যন্ত যেসমস্ত গল্পকথা শোনা যায়, তার অনেকটাই অসত্য এবং বিকৃত। এটা হওয়াও আশ্চর্য নয়; কারণ এই সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রায় সহস্র বছর ধরেই আক্রমণকারীর হাতে পর্যুদস্ত হতে হতেও আবার স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিদেশি এবং স্বদেশি আক্রমণ (১০২৫-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)

গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের এক বৃহস্পতিবার অগণিত সৈন্য নিয়ে ভারত তথা গুজরাটের প্রভাস পাটানের সোমনাথ শিবমন্দির ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। সে-আক্রমণ ছিল ১৮ দিনব্যাপী। মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়। সম্পূর্ণ অরক্ষিত মন্দিরের অভ্যন্তরে সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি (প্রবাদ আছে, ২ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, কয়েকটি গাড়িভর্তি হীরা, মুক্তা, জহর, চুনি-পান্নাদি দামি রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যনির্মিত মন্দিরের আসবাব ও বাসনপত্র) এবং সহস্র ক্রীতদাস-দাসী-সহ গুজরাটের কচ্ছ ও সিন্ধুপ্রদেশের পথে পলায়ন করেন। এই লুণ্ঠনের সময় কয়েকজন দেশীয় রাজা কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে মামুদকে বাধা দিয়ে মন্দিরের শিবলিঙ্গ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন এবং সঙ্গত কারণেই বিফল হন। এইসব রাজন্যবর্গ অতঃপর আরেকটু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মামুদের পলায়নের পথে অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ করে তাঁকে বিব্রত করতে থাকেন। সৈন্যদলের ক্ষতিসাধনও করা হয়। অতর্কিত আক্রমণ, রসদ নষ্ট, নানারকম রোগের উপসর্গ এবং কচ্ছের অনেকটাই অজানা পথের কারণে মামুদের সৈন্যরা অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বন্দি ক্রীতদাস-দাসীদেরও উদ্ধার করার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে-প্রচেষ্টাও প্রায় বিফলে যায়। লুঠ করা ধনসম্পত্তি প্রায় সমস্তটাই গজনী পৌঁছে যায়। শেষপর্যন্ত মামুদের সৈন্যসামন্তের অর্ধেকেরও কম সশরীরে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হয়। যাই হোক, দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সাময়িক সাফল্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সামগ্রিক ক্ষতি কিন্তু কোনভাবেই তুলনীয় নয়। কারণ—(১) সোমনাথের মন্দির, শিবলিঙ্গ, ধনসম্পত্তি ও হাজার হাজার ভারতবাসী (গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, প্রভাস-পাটানের) সেই ১৮ দিনের ধ্বংসলীলায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। (২) ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে বিদেশি ও স্বদেশি রাজ্যলোলুপ রাজা-বাদশাদের আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়। মহম্মদ ঘাউরীর ভারত আক্রমণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (৩) বহু ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায় ভারতের অর্থভাণ্ডারে টান পড়ে। পরে দেশের উন্নয়নের খাতে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান না হওয়ায় নানা অসুবিধা, বিশেষ করে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারে বিঘ্ন ঘটে। (৪) আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ নীতির প্রয়োজনেই কিছু সামন্ত রাজা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এতে পরবর্তী কালে দেশের সুরক্ষার পথ কিছু ক্ষেত্রে সুগম হয়। (৫) সোমনাথ-মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংসের পর ভারতে সুফি সম্প্রদায়ের আগমন শুরু হয়। এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

যাইহোক, গুজরাটের হিন্দু রাজাদের ঘরোয়া বিবাদ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কিছুটা গয়ংগচ্ছ মনোভাবের জন্যই প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর পর মন্দির পুনর্নির্মিত হয় এবং ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভগবান সোমনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। গুজরাটের প্রভাব

** অধুনা অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, ইতিহাসচর্চায় দিন কাটে। লেখকের বর্ণনাটি সুন্দর। সম্প্রতি সোমনাথ-মন্দির সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইতিহাস বিষয়টিতে বরাবরই বিতর্কের অবকাশ আছে। এক্ষেত্রেও লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে কিছু কিছু স্থানে আমরা যদিও একমত নই, তথাপি লেখাটির সামগ্রিক উৎকর্ষে এর প্রকাশযোগ্যতা আছে বলে মনে করি।—সম্পাদক*

ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজগণও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু দান ও গঠনমূলক কাজ করে সোমনাথের খ্যাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই বার্তা পৌঁছে যায় দিল্লির বাদশাহের কাছে।

অতঃপর ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী প্রভাস-পাটান অবরোধ করে বসেন। সোমনাথের অতুলনীয় ঐশ্বর্য তো ছিলই, সেইসঙ্গে 'কাফের' (বিধর্মী—শরিয়ৎ বিধান যিনি মানেন না) নিধনের গৌরবগাথার আকাঙ্ক্ষাতেই বোধহয় সোমনাথ-মন্দির ও শিবলিঙ্গ আবার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো। বিশাল শিবলিঙ্গ টুকরো করে ভেঙে তার কয়েকটি দিল্লি নিয়ে যাওয়া হলো, হয়তো 'বিজয়ফলক' বা বিধর্মীদের মনে ত্রাসসঞ্চারের প্রয়োজনে। স্বভাবতই শত শত মণ ধনসম্পত্তি ও বহু ক্রীতদাস-দাসীও দিল্লি চালান হলো। এবারেও স্থানীয় হিন্দু রাজাদের দুর্বল প্রতিরোধ, বিশেষ করে খিলজীর সামরিক সামর্থ্য, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার কাছে কার্যত পর্যুদস্ত হলো। সোমনাথ ধ্বংস করে খিলজী প্রভাস-পাটানের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। প্রভাস-পাটান-জুনাগড় ও খাম্বাট অঞ্চল খিলজীর সাম্রাজ্যভুক্ত হলো।
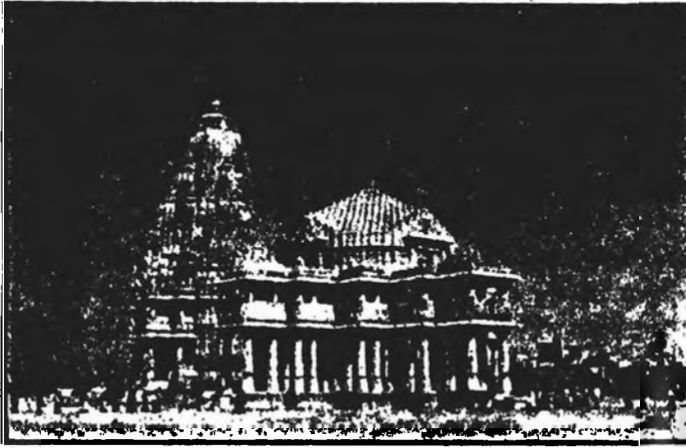
সোমনাথ-মন্দির

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর প্রভাস-পাটান-জুনাগড়ের শাসনকর্তা রাজা রাবণবর্ধন (চতুর্থ) বেশ কিছু যুদ্ধবিগ্রহের পর এই অঞ্চল, বিশেষ করে সোমনাথ-মন্দিরকে সুরক্ষিত করেন প্রভাস-পাটান থেকে খিলজীর সৈন্যদের বিতাড়িত করে। সোমনাথ-মন্দির পুনর্নির্মিত হয় এবং শীঘ্রই যথাবিহিত অনুষ্ঠান-সহ শিবলিঙ্গও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। একাধিক রাজার গ্লানিময় ও লজ্জাজনক পরাজয়ের পর প্রায় অখ্যাত এক হিন্দুরাজার এ এক গৌরবদীপ্ত বিজয়।

খিলজীদের পর দিল্লির মসনদে বসেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক। তাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ বিন তুঘলক (যিনি 'তুঘলকী' কাণ্ডের জনক) ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। নানারকম অদ্ভুত কর্ম এবং পাগলামির জন্য তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তিনি এক বিদ্রোহী পলাতক সেনাপতিকে তাড়া করে গুজরাটে উপস্থিত হন এবং জুনাগড় আক্রমণ করেন। প্রভূত ধনসম্পত্তির লোভে সোমনাথ-মন্দিরও আক্রান্ত হয়। ফলে প্রভাস-নৃপতি রাজা বিজলজী বাজা-র সঙ্গে তুঘলকী বাহিনীর ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিজলজী নিহত হন। ফলে তৃতীয়বারের জন্য সোমনাথ-মন্দির ধ্বংস এবং মন্দিরের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

এইভাবে প্রভাস-পাটানের সোমনাথ-মন্দির বারেবারেই (মোট দশবার) বিদেশি ও ভারতীয় শাসনকর্তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আক্রমণের পর ১২৬৮-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলে প্রতিনিয়ত—যতদিন পর্যন্ত জুনাগড়-গোয়া অঞ্চলে পর্তুগিজ শাসন বলবৎ হয়। সাম্রাজ্যলোভী, একসময়ে জলদস্যু ও বোম্বেটে পর্তুগিজরা তখন জুনাগড়, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকর্তা। ভারতে ইংরেজ অনুপ্রবেশ তখনো পর্যন্ত সেভাবে দানা বাঁধেনি। স্বভাবতই অন্যান্য বিদেশি অনুপ্রবেশকারী দিনেমার, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ সাম্রাজ্যলোলুপ দস্যুরা ভারতের প্রায় ৭,৫০০ কিলোমিটার সুদীর্ঘ উপকূলে নিজস্ব প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুসারে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর লুটপাট ও অত্যাচার করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এভাবেই দিউ বন্দরের পর্তুগিজ শাসনকর্তা একদিন প্রভাস-পাটান আক্রমণ করে বসলেন। উদ্দেশ্য, সোমনাথ-মন্দিরের বহুমূল্য ও অগাধ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন। ফলে আবার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রচুর প্রাণহানি ও বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি। সোমনাথ-মন্দির আরেকবার লুণ্ঠিত ও ধূলিসাৎ হলো। শিবলিঙ্গকেও রক্ষা করা সম্ভব হলো না। সেইসঙ্গে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বেশ কয়েকটি মন্দির এবং মসজিদও ধ্বংস হলো। ভারতসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যে ভুঁইঞা-রাজারা বলীয়ান হয়ে তাঁর প্রভুত্ব অস্বীকার করেন, রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন এবং সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন—তাঁদের মধ্যে দুই পরাক্রমী রাজা প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের বিজয়ী নৌসেনার সেনাপতি ছিলেন কিন্তু দুই প্রাক্তন

পর্তুগিজ জলদস্যু—রডা ও কার্ভালো। এঁরা কিন্তু ভুঁইএগ্রা রাজাদের জন্য যুদ্ধ করেই প্রাণবিসর্জন দেন। যাই হোক, পর্তুগিজদের সঙ্গে যুদ্ধে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের হিন্দুরাজারা সুবিধা করে উঠতে না পেরে দলে দলে নিহত হন। কিন্তু সকলে মিলে একজোট হয়ে তখনো পর্যন্ত বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখেননি। তাই এই লজ্জাজনক পরাজয়। পর্তুগিজরা অবশ্য একটাই মন্দ কাজ করেনি। সুলতান মামুদ, আলাউদ্দীন খিলজীর মতো কয়েক হাজার বন্দি ধরে নিয়ে যায়নি। তাহলে হয়তো পর্তুগালে ভারতীয় বংশোদ্ভবদের জন্য স্বতন্ত্র কলোনির দাবি উঠত!

সোমনাথের জ্যোতির্ধামের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় হিন্দু রাজাদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং গুজরাটের শাসনকর্তার বেশ কিছুটা সাহায্যে মন্দির আবার পুনর্নির্মিত হলো। শতসহস্র দর্শনার্থী এবং ভক্তজনের প্রণামী ও অর্থসাহায্যে মন্দিরের গর্ভগৃহ, বিশেষ বিশেষ কক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আবার ধনরত্নে ভরে উঠল এবং যে বিশাল ধনী সোমনাথের ভুবনপ্রসারী খ্যাতি এতকাল তাঁর বহু সর্বনাশের কারণ হয়েছে—সেই সুখ্যাতি ভারতসম্রাটের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে।
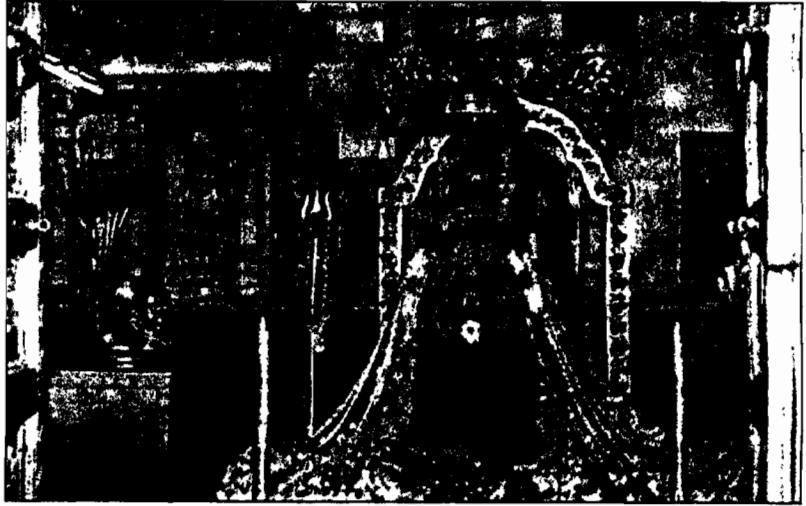
দিল্লির মসনদে আরোহণের পূর্বে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আওরঙ্গজেব গুজরাটের শাসনকর্তা হয়ে আসেন। তাঁর প্রপিতামহ সম্রাট আকবরের আদেশ ছিল—সোমনাথ বা তাঁর সাম্রাজ্যের কোন হিন্দু কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর মন্দির বা কোন উপাসনাস্থল ধ্বংস করা চলবে না। বিভিন্ন মন্দিরে বেশ কয়েকবার আইন করে বন্ধ হয়ে যাওয়া (বা করে দেওয়া) মূর্তিপূজাও আবার শুরু হবে এবং চলতে থাকবে। কেউ বাধা সৃষ্টি করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে। এই আদেশ সম্রাট আকবরের হিন্দু পত্নী যোধাবাঈয়ের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত সুদৃশ্য মন্দিরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আওরঙ্গজেব অবশ্যই এসমস্ত আদেশনামা একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং মানতেনও না। তাঁর এই অত্যাচারী মনোভাব রাজনৈতিক দিক থেকে কিভাবে ভারতে ক্ষতিসাধন করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পর নানা নৃশংস ঘটনার মধ্য দিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসলেন আওরঙ্গজেব। কাফের নিধনের সমস্ত সুযোগ এবার তাঁর হাতের মুঠোয়। একে একে তিনি প্রথমে পশ্চিম ভারত, পরে উত্তর ভারত এবং তারপর সমগ্র ভারতের সমস্ত মন্দির ও হিন্দু উপাসনাস্থল সমূলে ধ্বংস করা শুরু করলেন। অচিরে সোমনাথ-সহ বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস হলো। তার মধ্যে কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসবিদ্‌গণের মতে, একমাত্র রাজপুতানার (রাজস্থানের) মেবার রাজ্যেই একবছরে তিনি ২৪০টি মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। সেইসঙ্গে হুকুম দিয়ে বন্ধ হলো সবরকমের মূর্তিপূজা। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপর 'জিজিয়া' করও চাপিয়ে দেওয়া হলো। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে দশম বারের মতো সোমনাথ-মন্দির আবার বিনষ্ট হলো। সমগ্র ভারতে মন্দির এবং পৌত্তলিকতা-বিরোধী প্রবল হাওয়ায় প্রভাস-পাটান-জুনাগড়-সৌরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মহাশ্মশানের বেশেই বিরাজিত হয়ে থাকল প্রায় ২৫০ বছর। মাঝেমধ্যে ইন্দোরের হোলকার-পত্নী অহল্যাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠা করা প্রভাসের এক ছোট শিব-মন্দিরে এবং আরো কয়েকটি কালী ও শিব-মন্দিরে পূজার্চনা চলতে থাকল। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী সরকারি ফরমান প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল এবং প্রথমে গোপনে, কিছুকাল পর প্রকাশ্যেই মূর্তিপূজা চলতে থাকল।

জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ

এইভাবে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রভাস-পাটান-সৌরাষ্ট্রের বেলাভূমিকে আরবসাগরের লবণাক্ত জলরাশি ক্রমাগত ধৌত করে চলেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রভাস-পাটানের ধূসরভূমি শরাহত বিহঙ্গের মতো প্রতীক্ষারত ছিল কোন এক যাদুকরের প্রত্যাশায়—যাঁর যাদুকাঠির স্পর্শে আবার জাগবে সোমনাথ। আবার হবে মন্দিরনির্মাণ, শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা, পূজার্চনা ও ধর্মাচরণ। মহাকালের পুনর্জাগরণ।

মন্দির ও শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রভাস-পাটানের সোমনাথ-মন্দির সংলগ্ন জমি খনন করা হয় 'Somnath Temple Trust' ও 'Archaeological Survey of India'-র উদ্যোগে। পাওয়া গেল একটি 'ব্রহ্মশিলা' (প্রাচীন ও পবিত্র প্রস্তর-খণ্ড)। স্থানীয় গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে সেই শিলা পূজা করা হলো। পরে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সেই শিলায় প্রতিষ্ঠা পেলেন ভগবান সোমনাথ—শিবলিঙ্গরূপে। ট্রাস্টের উদ্যোগে মন্দিরনির্মাণও শুরু হলো। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে প্রভাস-পাটানের সমুদ্র উপকূলে এক নতুন মন্দির নির্মিত হলো। অতি সুন্দর সেই মন্দির অতি রমণীয় স্থানে বিরাজিত। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলো এবং সাধারণের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হলো।

মন্দিরের সামনে দিগ্বিজয় গেটের কাছে সর্দার প্যাটেলের দৃপ্ত দণ্ডায়মান মূর্তি। হয়তো বলছেন: "সহস্রাব্দের নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যের নিশি ভোর হয়ে এল। ভগবান সোমনাথ এখন থেকে সকলের জন্য এখানে বিরাজমান। সাম্রাজ্যলোভীর হাত তাঁকে আর কলঙ্কিত করবে না। সবাই এস, তাঁকে প্রণাম কর। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে জীবন সার্থক কর।"

মন্দিরের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত বিশালকায় শিবলিঙ্গ। ভগবানের দৃষ্টি বুঝি সুদূরপ্রসারী। সেই সাম্রাজ্যলোভী, নৃশংস, নিষ্ঠুর মামুদ, খিলজী আর আওরঙ্গজেবের দল তো এখন ইতিহাসের পাতায়। সহস্রাব্দের প্রায় বিনিদ্র রজনী শেষে স্বাধীন ভারতে কি এবার নবীন জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথের জ্যোতিঃপ্রকাশ হবে? ভগবান সোমনাথের আশীর্বাদধন্য হয়ে ভারত কি হবে নতুন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক?

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, সোমনাথের মন্দির প্রাগৈতিহাসিক যুগের। 'স্কন্দপুরাণ'-এ নাকি সোমনাথ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। আবার গজনীর মামুদের সঙ্গে ভারতে আগমনকারী পারস্যের ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত আলবেরুনীর মতে, ৯০০ খ্রিস্টাব্দে নাকি সোমনাথ-মন্দির বর্তমান মন্দিরের প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল এবং সেই মন্দিরও ছিল সুদৃশ্য প্রস্তরনির্মিত। আবার প্রভাস-পাটানের এক অতি প্রাচীন (ভদ্রকালী) মন্দির সংলগ্ন কিছু প্রস্তরগাত্রে নাকি কিছু লিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে যে, প্রাচীন সোমনাথের মন্দির ছিল রৌপ্যনির্মিত; নির্মাণকাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ। চন্দ্রবংশীয় রাজা সোম কর্তৃক নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন থেকে যায়, গজনী মামুদের হাতে কোন্ মন্দির ধ্বংস হয়? আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তবে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে মামুদ যে-মন্দিরটি চূর্ণ করেন, তা যে সুন্দর প্রস্তরনির্মিত ছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ■

সোমনাথ নগরের গুরুত্ব কেবল ধর্মস্থানরূপেই ছিল না। অলবিরুনি এবং মার্কোপোলোর লেখা থেকে জানা যায়, ১১শ থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে সোমনাথ একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দররূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি স্মর্তব্য, এই পবিত্র শৈবতীর্থক্ষেত্রটি কেবল লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলার ইতিহাস বহন করে না। সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি, সমন্বয়েরও এক চমকপ্রদ নিদর্শন বহন করে। ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই সোমনাথের বেরাবল নামক স্থানে উৎকীর্ণ সংস্কৃত এবং আরবি ভাষায় লিখিত একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, নুরুদ্দিন ফিরোজ নামে একজন নাখুদা বা আরব বণিক সোমনাথ নগরের উপকণ্ঠে পাশুপতাচার্য বীরভদ্র, হিন্দু বন্ধুবর 'ছাড়া' প্রমুখ আঞ্চলিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় একটি 'মিজিগিতি' বা মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত লেখাটির সংস্কৃত অংশের সূচনাতে আল্লার প্রতি প্রণাম জানানো হয়েছে 'ওঁ নমোঽস্তুতে'। আল্লাকে বর্ণনা করা হয়েছে বিশ্বনাথ, বিশ্বরূপ, শূন্যরূপ এবং লক্ষ্যালক্ষ্য অর্থাৎ একইসঙ্গে যিনি দৃষ্টিগোচর আবার দৃষ্টিগোচর নন—এইভাবে। (দ্রঃ **The Source book of Ancient Indian Civilisation—Ranbir Chakraborty, Penguin**)

—*সম্পাদক*

গ্রন্থসূত্র

১ An Advanced History of India—Dr. R. C. Majumdar, Dr. H. C. Roy Chowdhury & Dr. K. K. Dutta
২ Political History of Ancient India—Dr. H. C. Roy Chowdhury
৩ History of India—J. Mukherjee
৪ New Hisory of India—Dr. K. Chowdhury
৫ Somnath Darshan—K. K. Gupta
৬ A Short History of the world—Prof. A. Z. Manfred
৭ আধুনিক ভারতের ইতিহাস—ডঃ অমলেন্দু দে

এই রচনাটি 'রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রবোধকুমার সান্যাল : শতবর্ষের প্রণাম

[illegible] ঘোষ*

পথে-ঘাটে যে-শিল্পী [illegible] করেছেন; যিনি উচ্চবিত্ত মানুষদের নিয়ে গল্প লিখতে আনন্দ পেতেন না, যিনি একটা আদর্শকে গল্পের মধ্যে সর্বদা বজায় রেখে গেছেন, মজুর-জেলে-রাজমিস্ত্রি-গাড়োয়ান-মুচি-ফড়ে—এইসব চরিত্র নিয়ে যিনি লিখতে ভালোবাসতেন—সেই লেখকের নাম প্রবোধকুমার সান্যাল। ১৯০৫ সালের ৭ জুলাই তাঁর জন্ম। বছরটি বাঙালির কাছে এই কারণে স্মরণীয় [illegible] রচনায় ঐ একই বছরে।

তাঁর প্রথম লেখা গল্প 'মার্জনা' প্রকাশিত হয়েছিল [illegible] পত্রিকার প্রথম বছরের মাঘ সংখ্যায়। পরে তিনি ঐ পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর একজন হয়ে [illegible] নানা অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে তাঁকে গল্প লেখায় অসংখ্য উপাদান যুগিয়েছিল। তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন [illegible] চার্চ [illegible] কলেজে এবং সিটি কলেজে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে আপ্লুত করেছিল। সেই আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারাবরণ [illegible] জীবিকার জন্য নানারকম কাজ করেছেন—কখনো ডাকঘরে, [illegible] কখনো বা মাছের ভেড়িতে। ১৯২৭ সালে [illegible] কেরানির কাজ [illegible] উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্গম এলাকায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অতিবাহিত হয়েছে হিমালয়ের [illegible] অঞ্চলে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার বহু স্থানে তিনি গিয়েছেন। বোহেমিয়ানিজম্ ছিল তাঁর রক্তে। পরিব্রাজকের জীবন তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত আকর্ষণের। সেই সূত্রে [illegible] বিচিত্র মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। জেনেছেন তাদের জীবন। তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাসে।

প্রবোধকুমার সান্যাল
(৭ জুলাই ১৯০৫—১৭ এপ্রিল ১৯৮৩)

তাঁর প্রথম লেখা 'কল্লোল' পত্রিকায়। পরবর্তী [illegible] ইংরেজি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় এবং বাঙলায় [illegible] পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেছেন। প্রায় দেড় শতাধিক [illegible] তিনি পরিব্রাজক লেখক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে [illegible] তাঁর গল্পসঙ্কলনগুলির মধ্যে রয়েছে নিশিপদ্ম, চেনা [illegible] মাত্র, অবিকল, গল্প-সঞ্চয়ন, নওরঙ্গী, মধুকরে [illegible] তলায় অঙ্গার, কাটামাটির দুর্গ, তুচ্ছ, সায়াহ্ন, পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে যাযাবর, মহাপ্রস্থানের পথে, প্রিয়বান্ধবী, আঁকাবাঁকা, অগ্রগামী, কলরব, বনহংসী, হাসুবানু প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি স্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রয়েছে নদ ও নদী, শ্যামলীর স্বপ্ন, উত্তরকাল, জলকল্লোল, বনস্পতির বৈঠক,

* কলকাতার একটি মহাবিদ্যালয়ে বাঙলার বিভাগীয় প্রধান। কলকাতা-নিবাসী লেখক, গবেষক।

দেবতাত্মা হিমালয় প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালেও ঐ সম্মেলনের তিনি সভাপতি ছিলেন।

প্রবোধকুমার তাঁর মনোভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থে। গ্রন্থে ভ্রমণকাহিনীই মুখ্য।

ছোটগল্পকার প্রবোধকুমার দুটি ধারায় তাঁর গল্পের মূল ভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরের কল্লোলীয় প্রতিক্রিয়ায় তাঁর গল্পের এক রূপ, প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তাঁর ছোটগল্পের আরেক রূপ। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাঙলা কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল এক বিষম অগ্নিপরীক্ষার কাল। এই অগ্নিপরীক্ষায় দাহ্য বিষয় হয়েছিল সমকালীন সমাজ এবং পরিবারকেন্দ্রিক গ্রাম ও শহরের মানুষ। প্রবোধকুমার এই বৈচিত্র্যকে নিজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে।

'অঙ্গার'ও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। অসংখ্য চরিত্র এ-গল্পে। গল্পের মূল্যায়ন করতে বসে সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন ঃ "অঙ্গার গল্পের চরিত্র-পরিকল্পনাই এর সমস্ত গতিময়তার মূলে কার্যকরী থেকেছে। চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি নিখুঁত বাস্তবতায় ধরা।"[১] গল্পের কথক নলিনাক্ষ দিল্লি-প্রবাসী ব্যক্তি, কাজের সুবাদে কলকাতায় এসে তাঁর পিসিমা এবং অন্যান্যদের যে-পরিচয় তিনি পেলেন তা মর্মান্তিকই বটে। নলিনাক্ষের দৃষ্টি দিয়েই দেখানো হয়েছে কয়েকটি ভেঙে পড়া অসহায় মানুষের পারিবারিক ভাঙনের বেদনাদীর্ণ ছবি।

'লিডার' গল্পটি প্রবোধকুমারের রচনানৈপুণ্যের অন্য এক পরিচয় বহন করছে। তাঁর গল্পরাশির মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন ঃ "বাঙলা গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা এবং শৈলী এদিক থেকে অ-পরতন্ত্র। যেকোন গল্পেই সেই unconventional স্বকীয়তার পরিচয় প্রগাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হয়ে আছে।"[২] এই অসামান্য লেখকের মৃত্যু হয় ১৯৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল। ■

গ্রন্থসূত্র

১ বাঙলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০২, পৃঃ ৩৪৯

২ বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৬৪

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে উত্তর কলকাতায় অধুনা ঘোষ লেনে অবস্থিত বাস্তুভিটায় স্বনামধন্য ব্যবসায়ী গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাড়ম্বরে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। অবশ্য এই পূজা কলকাতার বাড়িতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলেও গ্রামের বাড়িতে (হুগলি জেলার মহানাদ মহকুমার পরঞ্চপুর, ত্রিবেণীতীর্থের নিকটবর্তী) ৪৭৮ বছর আগে সূচিত হয়েছিল। তখন দশভুজা দুর্গার পূজা প্রবর্তিত হয়নি। ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। সেইসঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শিলা। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের পিতা রতনচন্দ্র ঘোষ সপরিবারে কলকাতার সিমলা অঞ্চলের শুঁড়িপাড়ায় চলে আসেন। পরে শুঁড়িপাড়ার নাম বদল হয়ে 'ঘোষ লেন' নাম রাখা হয়। সেইসময়ে কলকাতা ক্রমশ গড়ে উঠছে এবং গ্রামবাংলার মানুষ ক্রমশ শহরমুখী হচ্ছে। একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষসাধন, নব্য বঙ্গকেন্দ্রীক ধর্মীয় রেনেসাঁস এবং বিজ্ঞানের প্রসার ঘটছিল, অন্যদিকে কলকাতা ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশের মূল কেন্দ্রস্থল। এই দুই বিপরীতমুখী বলের উপস্থিতিতে বাঙালি তথা বঙ্গসমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিলেন কলকাতাবাসী। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে গিরিশ ঘোষ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর একজন সহযোগীরূপে গৃহীত হন এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন সনদ পুনঃগ্রহণ করলেন, তখন তিনি জাহাজি ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আমন্ত্রণ পান। জাহাজের কর্মী নিয়োগ, তাদের খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি ছিল তাঁর কাজ। অবশ্য বেশিদিন তিনি একাজ করেননি। ৪ নং ঘোষ লেনের বাড়ির ঠাকুরদালানের দেওয়ালে তিনটি সিংহমূর্তি-সহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পতাকা এখনো সংরক্ষিত আছে। তার নিচে ১৮৫৬ সনটি লেখা আছে। ঐ বৎসরেই গিরিশচন্দ্র এই বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন। রক্ষণশীল ধর্মীয় সংস্কারে লালিত গিরিশচন্দ্রের প্রবর্তিত এই দুর্গাপূজা আজও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। পূজার সঙ্গে থাকে অতিথিসেবা, দরিদ্রনারায়ণসেবা, চণ্ডীর গান, যাত্রা, কবিগান ইত্যাদি। এই প্রাচীন দুর্গোৎসবে বহু গুণিজন যোগদান করেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পূজা দেখতে এসেছিলেন। অষ্টমীর দিন ১০৮ তৈলপ্রদীপ প্রজ্বালন এবং নবমীর দিন প্রতীকী বলিদান এই পূজার বিশেষ আকর্ষণ। পুরনো দিনের ঝাড় ও বাতিসাজ পরিবর্তিত হয়ে এখন যদিও বিদ্যুৎবাতি এসেছে, তথাপি দেবীর ডাকের সাজ এবং ত্রিকোণ চাল ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিভূ। নিছক পারিবারিক পূজা বলে যাতে মনে না হয় সেজন্য পূজার আয়োজকগণ ঠাকুরদালানের দরজা সর্বদাই খোলা রাখেন—যেমন থাকত গিরিশবাবুর আমলে। শেষজীবনে গিরিশবাবু কাশীবাসী হয়েছিলেন। কলকাতার প্রাচীন দুর্গাপূজার মধ্যে ঘোষ পরিবারের এই পূজা যথেষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর দেবী দুর্গার অপূর্ব সুন্দর মূর্তি এই পূজার মর্যাদা যেন শতগুণে বাড়িয়ে দেয়।

শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, সর্বার্থেই ঐতিহ্যময় বারাণসী

রাখালচন্দ্র নাথ

Varanasi: At the Crossroads • *Written by*: **Swami Medhasananda** • *Published by*: **Swami Prabhananda, Secretary, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kol-29** • *Price in India*: **Rs. 500** • *Pages*: **36+1044** • *First Published*: **January 2002**

ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে বহু গ্রন্থ ইতোপূর্বে রচিত হয়েছে; রচিত হয়েছে জেরুজালেম, রোম, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান সম্পর্কে ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত নানা পুস্তক। হিন্দু ঐতিহ্যে ও ভারত-সংস্কৃতিতে 'শাশ্বত নগরী' বারাণসী সম্পর্কেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কারণ, এর আছে প্রাচীনত্বের দীপ্তি। বেদ-উপনিষদে এর উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে এখানে সবই শিবময়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর বিশ্বাস, বারাণসীর একটি অতি-প্রাকৃত চরিত্র আছে, এখানে বাস করা পরম পুণ্যের, বিশ্বনাথের কাশীতে মৃত্যু মুক্তিদায়ক। বারাণসীর পরিমণ্ডল যেন আধ্যাত্মিক আর্তি সঞ্চার করে। অন্যান্য তীর্থের চেয়ে কাশীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিধারার সঙ্গমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন হয়েছে। স্বভাবতই বারাণসীকে ঘিরেও রচিত হয়েছে দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিতের নানা ভাষায় (ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি) নানা গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বারাণসীর মাহাত্ম্য কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ জোর দিয়েছেন এই নগরীর প্রাচীনত্বের (পৃথিবীর প্রাচীনতম) ওপর, বলেছেন—এই নগরী যেন আলোর দিশারি, কেউ তুলে ধরেছেন এর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভারত-পর্যটকদের বিবরণীতে প্রাধান্য পেয়েছে বারাণসীর কথা—বারাণসীর গঙ্গার কলকল ধ্বনি, এর ঘাট, পথ, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র, জনপরিষেবার অভাব, দারিদ্র্য ইত্যাদি; কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠে এসেছে পর্যটকের বিনম্র চিত্তের ভক্তির প্রবহন। বারাণসীর রাজনৈতিক দৃশ্যপট নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু, বিশ্লেষণধর্মী পাঠকের মনে হবে এ যেন খণ্ড খণ্ড বিবরণী। 'অন্ধের হাতি দেখা', এইসব লেখায় প্রাচীন থেকে আজকের বারাণসীর বিবর্তন বা ভবিষ্যৎ বারাণসীর কোন ইঙ্গিত নেই। অর্থাৎ একধরনের অপূর্ণতাই রয়ে গেছে।

'Varanasi : At the Cross-roads' গ্রন্থ সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করেছে, পাঠকের অতৃপ্তি দূর করেছে। বারাণসীর ইতিহাসের পাঠক ও গবেষককুল স্বামী মেধসানন্দের এই অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন এবং ভবিষ্যতে বারাণসী প্রসঙ্গে কথা উঠলেই বলতে হবে, এই গ্রন্থটি পড়ে নাও—সব পাবে।
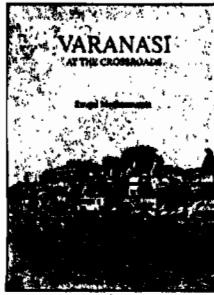
গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে আলোচিত হবে যুগসন্ধিক্ষণে বারাণসীর বিবর্তনের কাহিনী। মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগে বারাণসীর উত্তরণকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে গ্রন্থকার বেছে নিয়েছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল, বিশেষ করে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারত-আগমন থেকে মহাবিদ্রোহের সময়কাল পর্বকে (১৭৮১-১৮৫৭)। যেকোন পরিবর্তনেরই তো ইতিহাস আছে—সে-ইতিহাস রচনায় এই সময়পর্বকে কেন্দ্র করে গ্রন্থকার বারাণসীর সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। যে-কালপর্ব কেন্দ্রবিন্দু, তা পরিবর্তনের যুগ এবং সে-পরিবর্তন এসেছে যুগপৎ ভাঙাগড়ার খেলার মধ্য দিয়ে। এই সময়েই গড়ে উঠেছিল মহাবিদ্রোহ-পরবর্তী যুগে তথা আধুনিক যুগে বারাণসীর জীবন ও সংস্কৃতির ভিত।

ব্রিটিশের আগমনের পর মনন, ভাষা, সাহিত্য, রুচি ইত্যাদি ভারতে নতুন সামাজিক গতি ও অন্তরপ্রেরণা এনে দিয়েছিল। বন্ধুতা এবং বৈরিতা—এই উভয় সম্পর্ক থেকেই ঐ প্রেরণা ধীরে ধীরে সমাজের বুকে সঞ্চারিত হয়েছে। ঐসময়ে বারাণসী সম্মুখীন হয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা—প্রায় পরস্পরবিরোধী এই দুই ধারার; বৈদেশিক ভাবধারার আঘাতে দেখা দিয়েছিল জীবনের সমগ্র পরিসরে এক অভিনব সঙ্ঘাত। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন তুলে উত্তর খুঁজেছেন। প্রশ্নগুলি হলো : বারাণসী কিভাবে ব্রিটিশ শাসনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত গ্রহণ করেছিল? পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জে আত্মসমর্পণ না করে এই নগরী কি তার ঐতিহ্যমণ্ডিত চরিত্র বজায় রাখতে পেরেছিল? কত দূর পেরেছিল? তার পরিণামই বা কি হয়েছিল? বারাণসীর হিন্দুদুর্গে খ্রিস্টান মিশনারিগণ তাদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পরিকল্পনায় কত দূর সফল হয়েছিল? এছাড়াও গ্রন্থকার কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন; যেমন—অনেকে জোর দিয়ে বলেন, বারাণসী সত্যিকারের এক মহান নগরী, তাহলে কোন্ গুণে এই নগরী মহান? বারাণসী যদি সত্যিই পৃথিবীর অদ্বিতীয় বা অনুপম তীর্থনগরী হয়, তাহলে কোন্ বৈশিষ্ট্য বারাণসীকে এই মর্যাদা দিয়েছে? গ্রন্থকার সামগ্রিকভাবে বারাণসী এবং বারাণসীর কিছু কিছু দিকের অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন; পরিবেশন করেছেন অজস্র তথ্য; তাই পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে যত এগোবেন ততই আদি, মধ্য ও আজকের বারাণসী তাঁর কাছে উন্মোচিত হবে—পাঠক নিজেই বারাণসী প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত—নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে গেলেও বারাণসীর জীবন-মনন

অপরিবর্তিতই ছিল; বারাণসী আজও প্রাণবন্ত।

গ্রন্থটির কলেবর বৃহৎ। টীকা, সূত্র-নির্দেশ, সংযোজন, গ্রন্থপঞ্জী, শব্দকোষ, রেখাচিত্র প্রভৃতি সহ মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৪৪, অধ্যায় ২২টি। প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বারাণসীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তুলে ধরা হয়েছে বারাণসীর ধর্মীয় আবেদনের কথা। প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে উচ্চপ্রশংসিত এই সেই তীর্থভূমি—যেখানে সুদূর অতীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ; এখানেই একদা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বনাথ ও বিন্দুমাধবের মনোরম মন্দির; এখানেই জন্মেছিলেন তেইশতম জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ; এখানেই শ্রীরামের ধ্যানে মগ্ন হয়ে তুলসীদাস রচনা করেছিলেন 'রামচরিতমানস'; এখানেই কবীর গেয়েছেন তাঁর রচিত গান ও কবিতা; এখানেই পরিব্রাজক নানক এসে বাস করেছেন; তীর্থভ্রমণে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেই ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এভাবে বারাণসীর প্রতিটি মন্দির, সন্ন্যাসীদের মঠ, গৃহ এবং ঘাট মূল্যবান স্মৃতি বহন করছে।

পরের অধ্যায়ে বারাণসী নগরীর ভূপ্রকৃতি ও বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বারাণসীর স্থান-বিবরণ দিয়েছেন, নগরীর সীমানা নির্দেশ করেছেন, প্রশাসনের সুবিধা ও লোকগণনার জন্য বারাণসীকে যে বিভিন্ন মহল্লায় ভাগ করা হয়েছিল—সেগুলির অবস্থান, নামকরণ ও তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দিয়েছেন। মহল্লাগুলির নাম বিশ্লেষণ করে লেখক মন্তব্য করেছেন, বারাণসী নগরীর মূল চরিত্র ছিল ধর্মীয়। লক্ষ্য করার বিষয়, ব্রিটিশ বিজয়ের পর মহল্লাগুলির আইনশৃঙ্খলা আগের চেয়ে উন্নত হতে থাকে। ফলে নগরীর পরিধি বৃদ্ধি পায়। একই বৃত্তির মানুষ একস্থানে বাস করতে থাকে, মুসলমানগণও একত্রে একস্থানে বাস করত। স্থানীয় লোকদের প্রয়োজন, বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে বারাণসী বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বারাণসীর যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পরের অধ্যায়ে বারাণসীর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পেশোয়ারদের অধীনে মারাঠা উত্থান বারাণসীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। শুধু তীর্থপর্যটন নয়, স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্যও ভারতের নানা স্থান থেকে হিন্দুরা আসতে থাকে। তদুপরি সুশাসন, ন্যায়বিচার বাইরের মানুষদের আকর্ষণ করে। লেখক বারাণসী-নিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক বিভাজন, তাদের বৃত্তি, সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বিষয়ক একটি চিত্র অঙ্কন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমাগমে বারাণসী যেন একটি বিশ্বজনীন চরিত্র লাভ করেছিল, যদিও তার জাতীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল।

বারাণসীর সামাজিক পরিবেশের খুঁটিনাটি আলোচনা পাওয়া যায় পঞ্চম অধ্যায়ে। যেমন—সমাজের গঠন, পরিবারের গড়ন, দাসপ্রথা, নারীদের অবস্থা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি। পরিসংখ্যান দিয়ে লেখক যেভাবে সতীদাহ বিষয়টি আলোচনা করেছেন তা গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। সমাজে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল স্বীকৃত। সামাজিক আইনবিষয়ক ক্ষেত্রে বারাণসী সালিশের কাজ করত। সঠিকভাবেই জোর দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ১৮০৯ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (ব্রিটিশ ভারতের প্রথম দাঙ্গা), তবে নগরীর চিরগতিশীল ও সার্বজনীন চরিত্রের জন্য সাধারণভাবে এক উদার বাতাবরণ বিরাজ করত। লেখক মন্তব্য করেছেন, কলকাতার মতো বারাণসী সংস্কার আন্দোলনে কোন ভূমিকা নেয়নি; বরং ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে বারাণসী শেষ কথা বলার ভূমিকাই নিতে চাইত। পাশ্চাত্যের অভিঘাত বারাণসী এড়িয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পাশাপাশি এই নগরীর হিন্দু সমাজ তার ধর্মাবৃত চরিত্রচ্যুত হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি; বারাণসীর হিন্দু সমাজ তার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচিতি ও চরিত্র নিয়েই বেঁচেছিল।

বারাণসীর ধর্মীয় জগৎ ও জীবন পর্যালোচনায় আছেঃ (১) ধর্মান্ধদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সনাক্ত-করণ ও পুনর্নির্মাণ; (২) বারাণসীতে তীর্থযাত্রীদের পবিত্র যাত্রা—অন্তর গৃহযাত্রা, পঞ্চক্রোশীযাত্রা, পঞ্চতীর্থযাত্রা ইত্যাদি; (৩) বিশ্বনাথের মন্দির থেকে শুরু করে প্রধান ও অপ্রধান দেবদেবীর মন্দিরের বিস্তারিত বর্ণনা;
(৪) গুরুধাম ও তার গুরুত্ব;
(৫) উনিশ শতকের বারাণসীর পবিত্র কুণ্ডের বিবরণ; (৬) যোগ ও তন্ত্রের কেন্দ্রস্বরূপ বারাণসী; (৭) মঠ;
(৮) পরিব্রাজক সাধু, বারাণসীতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রধান তপস্বীদের নিয়ে আলোচনা;
(৯) ব্রাহ্মণদের স্থান;
(১০) বারাণসীর পাণ্ডা, তাদের কার্যকলাপ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবদান;
(১১) জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ ও বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম, খ্রিস্টীয় মিশনারি ও তাঁদের ধর্মপ্রচার এবং তার প্রতিক্রিয়া; (১২) ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি। গ্রন্থকার মনে করেন, নগরীর প্রধান ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম এবং আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে—বারাণসীর ধর্মীয় বর্ণচ্ছটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে-পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে, তাতে রয়েছে, উনিশ শতকে বারাণসীতে পুরনো পবিত্র স্থানসমূহের (প্রায় ৫০০) তালিকা, দেবদেবীদের বিভিন্ন অলঙ্কার ও পোশাকের পরিমাণ ও তার মূল্য, রৌপ্য, পিতল, তামা, লোহা, কাঁচ, কাঠ প্রভৃতির তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য ও তার মূল্য, মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন ইত্যাদি।

বারাণসী ছিল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র; স্বভাবতই ভারতের অন্যান্য শহরের চেয়ে এখানে সারা বছর জুড়ে সর্বাধিক মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। লেখক এগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে এদের প্রভাবের দিকটিও আলোচনা করেছেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেলাকে ঘিরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা দেখা দিত, অনৈতিকতা ও অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা বেড়ে যেত। তবে মেলা হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ও নগরীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনতে সাহায্য করত। উনিশ শতকে হিন্দু মেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে তা অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মেলা বা উৎসব উদ্‌যাপনে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। এখানেই বারাণসীর বৈশিষ্ট্য—তার বৈচিত্র্য ও সার্বজনীনতা।

বারাণসীর ঘাট যেন তার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গ—এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ঘাটগুলি যেন বিশেষ চরিত্র ও পরিচিতি অর্জন করেছে, নগরীর ঐতিহ্য ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার ৯৬টি ঘাটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন—এর মধ্যে বর্তমানের ১৪টি ঘাট ৩৫০ বছরের বেশি পুরনো, এছাড়াও ১৫০ বছরেরও বেশি পুরনো ৫১টি ঘাট আছে।

নবম অধ্যায়ে গ্রন্থকার বারাণসীর অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আঠারো শতকের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ায় অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে এলে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঐসময়ে মহাজন, বণিক ও ব্যবসায়ী, ভূস্বামী ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করত। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, প্রশাসনের সুবিধার জন্য সরকার পুরনো আইন সংস্কার করে নতুন আইন প্রবর্তন করে। ফলে অর্থনীতির প্রশাসন শক্তিশালী ও বিধিবদ্ধ হয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। পাশাপাশি স্থানীয় বয়নশিল্পের রপ্তানি কমে যায়। এক নতুন শ্রেণির জন্ম হয়, যারা ছিলেন ব্রিটিশদের প্রতিটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপের সমর্থক। এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক চরিত্র প্রকট হয়। অর্থনীতির খুঁটিনাটি তথ্য পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

একটি অধ্যায়ে বারাণসীতে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে, যেমন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে মহাবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যায়—নগরীর পৌর পরিষেবা ছিল নগণ্য; বস্তুত নগরীর বিকাশের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সত্তরের দশক থেকে। ১৮১১ সালে জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বারাণসীতে আয়ুর্বেদিক ও হাকিমী চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল। হাসপাতাল গড়ে তোলার পাশাপাশি অন্ধ ও মানসিক রোগাক্রান্তদের আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। ফলে উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে আয়ুর্বেদিক, হাকিমী, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি—সব ধরনের চিকিৎসাই বারাণসীতে চলত।

আগেই বলা হয়েছে, বারাণসীতে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন ঘটেছে। লেখক এই বিষয়টি অতি যত্নের সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। যেমন ধ্রুপদী ভাষা ও শাস্ত্রচর্চা, বৈদিক পাঠশালা, সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরিচিতি ও রচিত গ্রন্থের নাম, পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্‌দের পরিচিতি ও তাঁদের মাধ্যমে ভারতবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত, আরবি, ফারসি ও উর্দুবিদ্যার চর্চা, বারাণসীর মৌলবিদের পরিচিতি ও সৃষ্টি, হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রভৃতি। লক্ষ্য করার বিষয়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে বারাণসীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়নি। একটি অধ্যায়ে লেখক বারাণসীতে পাশ্চাত্যের প্রভাবে বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যায়তন আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন সংস্কৃত কলেজের ইতিবৃত্ত। সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্রিক ছিল বলে নতুন যুগের দাবি মেটাতে প্রতিষ্ঠিত হলো জয়নারায়ণ স্কুল (১৮১৪)—যেমন হয়েছিল কলকাতায় হিন্দু স্কুল (১৮১৭)। এই স্কুলের বিবরণের পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে মিশনারি বিদ্যায়তনগুলির রূপরেখা। আলোচনায় স্পষ্ট যে, ইংরেজি ও মিশনারিদের উদ্যোগে শিক্ষাদান নতুন চোখ খুলে দিলেও এবং কতিপয় মানুষের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাস হোঁচট খেলেও কলকাতার নব্যবঙ্গ আন্দোলনের মতো বাড়াবাড়ি এখানে হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েও ভারতের ঐতিহ্য ও সনাতন ধর্মের প্রতি তারা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারায়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের হাত ধরে এসেছে মুদ্রণ, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ—যদিও তা বেশি এগোতে পারেনি।

বারাণসী শুধু ধর্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, বারাণসীর চিত্তরঞ্জিনী দিকগুলি, যেমন শিল্পকলা, সঙ্গীত, কারিগরি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে সাহায্য করেছিল বারাণসীর একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে—যা 'বারাণসী সংস্কৃতি' অভিধায় ভূষিত করা যায়। এর আলোচনাটি এই গ্রন্থের এক বড় সম্পদ। ভারতীয় ঐতিহ্যে সঙ্গীতের গুরুত্ব ও ক্রমবিবর্তন নির্দেশ করে গ্রন্থকার আধুনিক বারাণসীর সঙ্গীত (কণ্ঠ ও যন্ত্র) এবং নৃত্যের চর্চা ও বিকাশের মনোজ্ঞ আলোচনা করে দেখিয়েছেন বারাণসীর সঙ্গীত ঘরানার বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ সঙ্গীতলহরীতে ভেসে গিয়েছিল। বারাণসীর চিত্রকলা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বারাণসীর নিজস্ব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতে, পাশাপাশি পাশ্চাত্য চিত্রকলার উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল, যার ছাপ পড়েছিল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও। লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি বারাণসী সংস্কৃতির অতি ক্ষুদ্র উপাদানের প্রতিও—রসনার তৃপ্তি,

খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, অলঙ্কার, বিনোদন ইত্যাদি। বস্তুত, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় বারাণসীর সংস্কৃতিকে গরীয়ান করে তুলেছিল—পাশ্চাত্যের স্পর্শ ছিল নগণ্য।

খুব সম্ভবত সপ্তম শতকের গোড়ায় রাজা শশাঙ্কের সময় বাংলা ও বারাণসীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীতে বাঙালিরা বেশি সংখ্যায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। গ্রন্থকার বারাণসী ও বাঙালি বিষয়ক অধ্যায়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। যেমন—কাশীতে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের বিভিন্ন কারণ, পর্যায়, বাঙালি অভিজাতদের ও জমিদারদের বারাণসীতে ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজ, বাঙালি সাধু ও ব্রাহ্মণ-কুল, বারাণসীর শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে বাঙালিদের অবস্থান ও অবদান। এই দুইয়ের সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে, উপন্যাসে, কবিতায় ও পত্র-পত্রিকায়।

১৭৮১ সালে বারাণসী ব্রিটিশের হস্তগত হওয়ার পর থেকে ইউরোপীয়দের বসবাস শুরু হয়। একটি অধ্যায়ে বারাণসীতে ইউরোপীয়দের বসবাস স্থাপনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে; আলোচিত হয়েছে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সম্পর্ক। গ্রন্থকারের মতে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এইসময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের যোগাযোগ স্থাপিত হলেও সাধারণভাবে ইউরোপীয়গণ বর্ণবৈষম্য বজায় রেখেছিল।

বারাণসীর সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রেরণায় গ্রন্থকার বারাণসীর সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত পরিবার ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন যাঁরা বারাণসী পর্যটন করেছেন বা শেষজীবন কাটিয়েছেন, যাঁরা এখানে দীর্ঘকাল বাস করেছেন বা জন্মেছেন, গদিচ্যুত রাজা প্রমুখ। উল্লেখ্য, উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষালাভ ও ইউরোপীয় সংশ্রবে এসে বারাণসীতে একটি নতুন 'এলিট' শ্রেণির জন্ম হয়েছিল—তাঁদের মননে ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব।

বারাণসীতে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রভাব ও কার্যকারিতা আলোচনা প্রসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণভাবে বারাণসীর মানুষ ছিলেন শান্ত, শান্তিপ্রিয় ও আইনানুগ। কিন্তু দেখা গেছে, তাঁরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। গ্রন্থকার বারাণসীতে এই ধরনের গণ-প্রতিবাদ ও আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন। আন্দোলনগুলি ছিল মূলত আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত।

বারাণসীর আকর্ষণ অবিসংবাদিত; কিন্তু মধ্যযুগ পর্যন্ত বারাণসী ভ্রমণকারীদের বিবরণ প্রধানত ছিল ধর্মকেন্দ্রিক; আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার তথ্য থাকত নগণ্য। কিন্তু আধুনিক যুগের উন্মেষের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, দেশি ও বিদেশি পর্যটকেরা সার্থক অর্থেই ভ্রমণ-বিবরণ লিখতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত দৃষ্টি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা এই বিবরণীগুলি নগরীর সূক্ষ্ম দিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা সরকারি বা অন্য দলিল থেকে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে আমরা পাই দেশি-বিদেশি ভ্রমণকারীদের একটি তালিকা, তাদের পরিচয়, পুস্তকের নাম ইত্যাদি।

আলোচনার ইতি টেনে যথার্থই বলা হয়েছে যে, বাহ্যত ব্রিটিশ প্রশাসনকে আশীর্বাদস্বরূপ মনে হলেও মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি শোষণই করেছে; নানা অজুহাতে নতুন নতুন কর ধার্য করা হয়েছে, অথচ শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তা ব্যয় করা হয়নি। বর্ণবৈষম্য বোধ থাকার ফলে আইনের শাসনও ইউরোপীয়দের পক্ষেই ছিল। কোম্পানি শাসনের এই নেতিবাচক দিকগুলি বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি বা সচেতনতা বারাণসীর তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের ছিল না। পাশ্চাত্য অভিঘাত বারাণসীর ভিতকে কাঁপিয়ে দিতে পারেনি। তার উদার, সার্বজনীন পরিমণ্ডল তাকে দিয়েছে নৈতিক শান্তি ও স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা; যার ফলে যুগ যুগ ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও নিজেকে মুক্ত রেখে, নতুন নতুন মানুষ ও নতুন নতুন ধ্যানধারণা আত্মস্থ করে বারাণসী আত্মীকরণ, সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আদর্শকে সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরেছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। তাই বারাণসী বিশ্ববন্দিত।

দীর্ঘকালের অভিনিবেশ ও এষণার ফল এই মননশীল গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে এটি বারাণসীর একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ—এতে বারাণসীর সামগ্রিক ও কোন কোন বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। তার ইতিহাস ও সংস্কৃতির যেসমস্ত দিক এতদিন ছিল অবহেলিত, গ্রন্থকার তা উন্মোচন করেছেন; যেসমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য এতদিন ছিল গবেষকদের অজ্ঞাত, গ্রন্থকারের নিরলস প্রচেষ্টায় সেসমস্ত তথ্য এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। সহজলভ্য ইতিহাসের উপাদান ছাড়াও এই গ্রন্থে এই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে সরকারি দলিল, যেমন—রাজস্ব, বিচারবিভাগীয়, বারাণসীর শাসকদের ব্যক্তিগত পেপার্স, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কমিটির দলিল, ডানকান রেকর্ডস, বারাণসীর কমিশনারদের দলিল ইত্যাদি। স্পষ্টতই এর ফলে নতুন নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়েছে। তদুপরি প্রত্যেকটি অধ্যায় রচনাকালে লেখক খেয়াল রেখেছেন পাঠকদের মনে কোন্ কোন্ প্রশ্নের উদয় হতে পারে, কোন্ বিষয়টি বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে ইত্যাদি। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তিনি যোগ করেছেন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য, যা বারাণসীর ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। ইদানীংকালে আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার যে-উৎসাহ দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি সার্থক সংযোজন। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ তীর্থস্থান সম্পর্কে গবেষণার একটি কাঠামো তুলে ধরে ভবিষ্যৎ গবেষকদের উৎসাহিত

করবে। এছাড়া বারাণসী তীর্থপর্যটন সার্থক ও আনন্দদায়ক করতে এই গ্রন্থটির কয়েকটি অধ্যায় (যেখানে দেবদেবী, মন্দির, মেলা, উৎসব, ঘাট, মহল্লা, বাজার, শিক্ষাকেন্দ্র আলোচিত হয়েছে) গাইড বুক বা ডিরেক্টরি হিসাবে কাজ করতে পারে। অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি গ্রন্থটির অন্যতম দিক।

গ্রন্থটির অপূর্ব বিষয়প্রাচুর্য সত্ত্বেও মনে হয়েছে, এই গ্রন্থকারই পারতেন এই নগরীর নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে—প্রাথমিক পর্যায় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। পারতেন আরো দু-একটি নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বারাণসীর তুলনা করতে—তাতে বারাণসীর মৌলিকত্বই প্রকাশ পেত। পাশ্চাত্যের ভাবধারার অন্যতম সুফল ছিল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রীস্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। আবার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি হয়ে উঠেছিল নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখপত্র। বারাণসীর জাগৃতিতে বা জনমত গঠনে এদের ভূমিকা কি ছিল—এদুটি বিষয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের অভাব ঘটেছে। গ্রন্থপাঠে মনে হয়, তথ্যের ভারে রচনার প্রসাদগুণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পর্বতের রূপ ভিন্ন মনে হতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, পর্বতের নিজস্ব এক সামগ্রিক রূপ আছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এই অমূল্য গ্রন্থে বারাণসী নগরীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু পবিত্র তীর্থভূমি শাশ্বত বারাণসীর আত্মাকে আমরা আরো বেশি করে জানতে চাই। ■

অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী বাগবাজারকে নিয়ে এক অভিনব প্রয়াস

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ধন্য বাগবাজার ● সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ● প্রকাশক : কমল ঘোষ, নিধুরাম পাল ও গৌতম গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ৩২/১ গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৩ ● মূল্য : ৪০০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০০+৯৩৬ ● প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৪

আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার জোয়ার এসেছে বিশ শতকের শেষের দিকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস লেখার তাগিদ অনুভব করছেন উৎসাহী গবেষকবৃন্দ। আঞ্চলিক ইতিহাস অবশ্যই ইতিহাসের দুর্লভ সম্পদ। তা যদি ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রত্যয়সিদ্ধ হয়, তবেই তা সার্থকতায় উন্নীত হতে পারে, নচেত তা হয়ে ওঠে পণ্ডশ্রম। সুখের কথা, আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে এক উৎকৃষ্ট উদ্যোগের সাক্ষাৎ মিলল একুশ শতকের শুরুতেই।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্পাদনায় **'ধন্য বাগবাজার'** প্রকাশিত হওয়ার পর মনে হলো, আমরা পাঠকরাই ধন্য হলাম। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে পরিমার্জিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করল ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রকাশনার উদ্যোক্তা 'রবীন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। এটি মূলত বাগবাজার 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া'র কর্মীদের সংগঠন; তাঁদের প্রয়াস ও পরিশ্রমের পরিণাম 'ধন্য বাগবাজার'। ৯৩৫ পৃষ্ঠার এই আকর গ্রন্থ লোকমাতা নিবেদিতার চরণে উৎসর্গীকৃত।

এই বিপুলকায় সাহিত্যসম্ভারে রয়েছে সুবৃহৎ পাঁচটি অধ্যায় (বাগবাজারের ঐতিহ্য, বাগবাজারের আত্মা, স্মৃতিকথা, বাগবাজারের ভগিনী ও পত্রাবলি)। এই গ্রন্থের বিশেষ সম্পদ অসংখ্য দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্রের সমাহার।

আজকের বাগবাজার অতীতের সুতানুটি; এখানেই এসে উঠেছিলেন আধুনিক কলকাতার রূপকার জব চার্ণক। এখানেই ছিল পেরিন সাহেবের বাগান। এখানেই ইংরেজরা (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) তৈরি করেছিল কেল্লা এবং সেই কেল্লায় আক্রমণ হেনেছিলেন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানেই ছিল মনুমেন্টের চেয়ে উঁচু মন্দির 'ব্ল্যাক প্যাগোডা'—প্রতিষ্ঠাতা 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র। ১৭৩৭-এর বিধ্বংসী ঝড় ও ভূমিকম্পে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে সেই স্থানে রয়েছে 'নবরত্ন মন্দির'।

বাগবাজার ঐতিহ্যে অনন্য। এখানে একসময় সুতা ও নুটির ব্যবসা ছিল (অনেকে বলেন, সেই কারণে 'সুতানুটি' নাম)। এখানে গঙ্গার ঘাট অনেক। বাগবাজারের ঘাটে কলকাতার শেষ 'সতী' হয়েছিলেন রসিকলাল ঘোষের স্ত্রী হরসুন্দরী দেবী (পৃঃ ১৯৬)। বাগবাজার একসময় ছিল সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। এখানকার সেন, বসু, মিত্র, রায়, কর, দত্ত, চক্রবর্তী—এমন বহু পরিবারই ছিল ঐতিহ্যশালী। এখানেই বসবাস করতেন নবাব সিরাজদৌল্লার সভাসদ রায় দুর্লভের পুত্র রাজা রাজবল্লভ। রসগোল্লার আবিষ্কারক নবীনচন্দ্র দাস ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাসের (কে. সি. দাস) উদ্যোগ বাঙালির শিল্পনৈপুণ্যের এক নিদর্শন। একসময়ে বাগবাজারে চলত সাহিত্য-সাধনার স্রোতোধারা। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (জন্ম ১৮৬৮-তে, কিন্তু বাগবাজার থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ
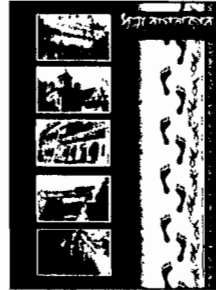
থেকে), 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৮৭৮), 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' (১৮৯০), 'শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' (১৯০১), 'যুগান্তর' (জন্ম ১৯৩৭-এ, কিন্তু বাগবাজার থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ থেকে), 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) প্রভৃতি পত্রিকার জন্ম ও প্রসার লাভে বাগবাজার জড়িত।

পরবর্তী কালে 'সাহিত্য', 'ভারত', 'পরিচয়', 'কৃত্তিবাস', 'মানবমন' প্রভৃতি পত্রিকার শুভসূচনায় লেগে আছে বাগবাজারের স্পর্শ। যেমন সাহিত্যকর্ম, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাগবাজার ছিল চিহ্নিত স্থান। অতীতের সুতা ও নুটির ব্যবসার মতো পরবর্তী কালে চুন-সুরকি, ইঁটের কল, চিনির কল ও কালির ব্যবসা এখানে প্রসারলাভ করেছে। বাবু কালচারের যে কলকাতা—চিহ্নিত 'আটবাবু'দের (রামতনু দত্ত, রাজা নবকৃষ্ণ, হুজুরিমল, বনমালী সরকার, ছাতুবাবু-লাটুবাবু, গোবিন্দরাম মিত্র, রামলোচন ঘোষ ও গোকুলচন্দ্র মিত্র) বসতিও এই বাগবাজার অঞ্চলে। বাগবাজারের বাবু গোকুলচন্দ্রই বিষ্ণুপুর-রাজের 'মদনমোহন' বিগ্রহকে বাঁধা রেখেছিলেন।

এই গ্রন্থে আছে নানা প্রখ্যাত শিল্পীর শিল্পকলার বিবরণ। আছে ক্রীড়ামোদী তরুণদের ক্রীড়াবিষয়ক নানা উদ্দীপনাময় সংবাদ; আছে মেলার প্রসঙ্গ ও বারোয়ারি দুর্গোৎসবের কথা। সেইসঙ্গে নজর কাড়ে বঙ্গীয় নাট্য আন্দোলনের ইতিবৃত্ত—কেমন করে গড়ে উঠল বঙ্গরঙ্গালয়, নটনটীকুল এবং নাট্যকার ও নাটকের ধারা। নাট্য আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গ রচনায় ও চিত্রে অনুপম। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির বিবরণও মন কাড়ে। বাগবাজারকে নাট্যতীর্থ করেছেন যাঁরা—সেই অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি সকলেই হাজির বাগবাজারের সংস্কৃতির ইতিহাসে। বাগবাজারের 'তিন গোপাল'—ক্ষীরোদগোপাল, যদুগোপাল ও ধনগোপাল স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কথিত আছে, শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'সব্যসাচী' যাঁকে দেখে লেখা—তিনি হলেন ক্ষীরোদগোপাল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ত্র আমদানির জন্য তিনি গিয়েছিলেন বর্মায়। দেশ থেকে দেশান্তরে বারবার আত্মগোপন করতে হয়েছে তাঁকে। জাভা, সুমাত্রা ঘুরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্তরীণ হন। শেষজীবনে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অন্য ভাই ধনগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অবলম্বন করে লিখেছিলেন 'Face of Silence'। রোমাঁ রোলাঁ পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। আরেক ভাই বিপ্লবী ডাক্তার যদুগোপাল (১৮৮৬-১৯৭৬)। তিন গোপাল বাগবাজারের 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'।

'বাগবাজারের আত্মা' অধ্যায়ে আছে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নানা দিক—শ্রীরামকৃষ্ণের বাগবাজারে আগমন, বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বসবাস, বলরাম মন্দির, শিকাগো সাফল্যে স্বামীজীর অভিনন্দনসভা, রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম, ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ও আরো অনেক প্রসঙ্গ। প্রত্যেকটি নিবন্ধ যেমন তথ্যবহুল, তেমনি সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গ পৃথক অধ্যায়ে রাখা হলেও স্বচ্ছন্দে তা 'বাগবাজারের আত্মা' অধ্যায়ে রাখা যেত। এই উদ্যোগের একটি বিস্ময়কর সম্পদ স্বামী সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর ইংরেজি পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতা। এছাড়া 'স্মৃতিকথা' অধ্যায়ে আছে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বহু অপ্রকাশিত চিঠি—তা যেমন মধুর তেমনি বিস্ময়ের। সিস্টার নিবেদিতা প্রসঙ্গে আলোচনাসমূহ বাঙালি পাঠকের অবশ্যপাঠ্য।

এই গ্রন্থে একটি নিবন্ধের শিরোনাম 'বাগবাজারের অহঙ্কার'। এটি একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হওয়ারও দাবি রাখে। লেখক তাঁর নিবন্ধে স্মরণ করেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অনাথবন্ধু বসু (প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ), অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বিশিষ্ট বিজ্ঞানী), অতুল সুর (ঐতিহাসিক), অমৃতলাল বসু (অভিনেতা), অশোককুমার সরকার (খ্যাতনামা সাংবাদিক), অশোকনাথ শাস্ত্রী ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী (শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত), কালীদাস ইন্দ্র (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী), গোবিন্দরাম মিত্র (বিশিষ্ট জমিদার), গোপেশ্বর পাল (প্রখ্যাত শিল্পী), দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (সাহিত্যিক) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—যাঁরা এই বাগবাজারেই জন্মগ্রহণ করেছেন বা বেড়ে উঠেছেন।

বাগবাজারের মাটি মানবসম্পদ নির্মাণের উর্বরভূমি। এই ভূমিতেই বসবাস করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম রসদদার বলরাম বসু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীকার ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ। কবি নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ সাহিত্যিকের মেলবন্ধন ঘটেছিল এখানে। বাগবাজারেরই সন্তান শচীন মিত্র 'স্বাধীন ভারতের প্রথম শহীদ'—যিনি দেশপ্রেমী, অহিংসাব্রতী এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। গ্রন্থের আরেকটি অনন্য সম্পদ যামিনী রায়ের অসংখ্য চিত্রকর্ম, অবন ঠাকুরের শিল্পকীর্তি। বাগবাজার শমিতা গাঙ্গুলিকে ভুলে যায়নি; ভোলেনি সুনয়নীদেবীর ছবিও।

বাগবাজারের অহঙ্কারের শেষ নেই! আধ্যাত্মিক আন্দোলনের বীজধারণ করে বাগবাজার তার ঐতিহ্যে গরীয়ান। এখানকার আকাশে, বাতাসে মিশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর দিব্যস্পর্শ। বাগবাজারের মাটিতে ছড়ানো আছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শত চরণচিহ্ন! তাই বাগবাজার তীর্থভূমি। আধ্যাত্মিক পুরুষ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়াবাবা, স্বামী প্রণবানন্দ (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা), প্রভুপাদ অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা), স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম

অধ্যক্ষ), প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা) প্রমুখ দিকপাল অধ্যাত্মব্যক্তিত্বগণ এই মাটিতেই বসবাস করেছেন বহুকাল। এখানেই নিকারিপাড়া ও মসজিদ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল সৌধ। এখানেই রয়েছে নন্দলাল বসুর বিশাল প্রাসাদ। রয়েছে বিশ্বকোষ লেন। ভারতীয় ভাষায় বিশ্বকোষই প্রথম কোষগ্রন্থ। দীর্ঘ ২৭ বছর পরিশ্রমের পর নগেন্দ্র বসু গ্রন্থটি ২২টি খণ্ডে সম্পূর্ণ করেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের সার্থক ট্রাডিশন! এক-একটি ব্যক্তিত্ব এক-একটি রেনেসাঁ চরিত্র।

'ধন্য বাগবাজার' ইতিহাস অন্বেষণের এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী! বিশিষ্টতার আঙ্গিক তার সর্বাঙ্গে। সত্যপ্রতিষ্ঠায় তথ্য সমাহারে তার নিবন্ধগুলি যেমন গভীরতা-মণ্ডিত, তেমনি বাগবাজারের সীমাবদ্ধতা এবং গ্লানিকেও সাহসের সঙ্গে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর। তাই আছে 'পক্ষীর দল ও নেশার' কথা। আছে বাবু-বৃত্তান্তের শিথিল জীবনচর্যার কথা।

গ্রন্থের নিবন্ধগুলি নিয়ে পৃথক আলোচনার সুযোগ কম। সবগুলিই তথ্যবহুল ও শ্রমার্জিত। বিশেষ স্মরণীয়, বিমান মুখোপাধ্যায়ের 'সারস্বত ফুলবাগিচায় সরস্বতীর সন্তানেরা'। ছন্দা মিত্র সংগৃহীত ইন্দুবালা ঘোষের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি' এবং কিরণচন্দ্র দত্তের 'স্বামীজীর স্মৃতি' বড়ই মধুর। বাগবাজারের ইতিহাস অন্বেষণে নেমে এই গ্রন্থ উপহার দিয়েছে আদি কলকাতার সাংস্কৃতিক চালচিত্র। কেবল বিষয়-গুণেই নয়, দক্ষ সম্পাদনার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে গ্রন্থের সর্বত্র। তাই গ্রন্থটি একটি 'মহাগ্রন্থ' শিরোপার দাবি রাখতে পারে অনায়াসে। চিত্রের সমাহার কেবল নয়নাভিরামই নয়—আমাদের অনভিজ্ঞ মানসিকতাকে ইতিহাসের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই প্রাপ্তিও কম নয়। এই গ্রন্থে কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনযোগ্য। গ্রন্থে বিষয়বৈচিত্র্য পর্যাপ্ত, তথাপি কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকলে ভাল হতো—গিরিশতনয় দানিবাবুর প্রসঙ্গ (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—যিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান), পদ্মবিনোদ প্রসঙ্গ (যিনি স্বামী সারদানন্দের 'দোস্ত' এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের সন্তান) এবং উদ্বোধন লেনের বস্তিবাসীদের প্রসঙ্গ (যাঁদের অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপালাভে ধন্য)।

পরিশেষে বলতেই হচ্ছে—'ধন্য বাগবাজার' প্রথানুগ প্রকাশনার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এই মহাগ্রন্থ কেবল একটি অঞ্চলের ইতিহাসকে উন্মোচন করেনি, একটি শতককে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে—বিচিত্র উপচারে। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক কেবল পরিতৃপ্তিই পাবেন না, পাঠ শেষ করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে বলতেই হবে—এও সম্ভব! ■

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও অনুবাদে শিবস্তব

শুক্লা পাঠক

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ • লেখক : হরেন্দ্রনাথ রাহা • প্রকাশক : সোদপুর চড়কতলা ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড টেম্পল কমিটি, জোড়া শিবমন্দির, সোদপুর, কলকাতা-১১০ • মূল্য : ১০০ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৭২ • প্রকাশকাল : মার্চ ২০০৫

গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'-এ বলছেন : যদি সাগররূপ দোয়াতে থাকে নীল পাহাড়ের (রঙের) মতো কালি, স্বর্গের কল্পতরু শাখা যদি হয় লেখনী আর পৃথিবী হয় কাগজ এবং দেবী সরস্বতী যদি এসব নিয়ে অনন্তকাল ধরে লিখে যেতে থাকেন—তাহলেও হে জগৎনিয়ন্তা, তিনি তোমার ঐশ্বর্য ও মহিমার সীমা নির্দেশ করতে পারবেন না।

তথাপি পুষ্পদন্ত অনাদি অনন্ত মহাদেবের স্তব-বন্দনা রচনা করেছেন। যুগে যুগে কালে কালে তা-ই হয়েছে। আমরা জানি, আমাদের বাক্য সীমাবদ্ধ, জ্ঞান সীমিত, বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, মন বাসনামলিন। তবুও তাঁকে 'অবাঙ্মনস-গোচর' জেনেও প্রাচীন ঋষি বলেন "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। এর কারণ একটাই—সেটাও পুষ্পদন্ত বলেছেন : হে ত্রিপুরনাশক মহাদেব, তোমার গুণকীর্তন-জনিত পুণ্যের দ্বারা আমার এই বাক্যকে পবিত্র করব—এই মনে করে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়পূর্বক প্রবৃত্ত হয়েছে।

কথাগুলি স্বতই মনে উদিত হয় হরেন্দ্রনাথ রাহা কর্তৃক সম্পাদিত **'বাঙলায় টীকা সমৃদ্ধ শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম সম্বলিত সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'** গ্রন্থটি পাঠ করলে। নিঃসন্দেহে এটি স্তবস্তোত্র-সম্বলিত গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি প্রশংসনীয় সংযোজন। আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান ধারায় যে-দুটি শিবস্তোত্র সর্বাধিক মর্যাদা পেয়েছে, সে-দুটি হলো—

(১) ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত মহর্ষি তণ্ডিকৃত 'শিবসহস্রনামস্তোত্রম্'—যা 'স্তবরাজ' নামে খ্যাত এবং (২) গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত রচিত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'। তবে প্রচারের দিক থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে 'স্তবরাজ'-এর চেয়ে 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'-এর পরিচিতি বেশি। বিশেষত, বাঙলা ভাষায় ইতোপূর্বে এর টীকা, ভাষ্য, অন্বয়, ব্যাখ্যাদি বেশ কিছু প্রকাশিত হলেও মহর্ষি তণ্ডিকৃত 'স্তবরাজ'-এর কোন স্বতন্ত্র বিশদ ব্যাখ্যা-অনুবাদ বা টীকা রচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। এদিক থেকে শ্রীরাহার এই প্রয়াস দীর্ঘদিনের

একটি অপূর্ণতাকে অনেকটাই পূর্ণ করেছে, এজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। বিশেষ করে একই গ্রন্থের মধ্যে 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্' ও 'স্তবরাজ'কে পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় প্রাপ্তি।

'স্তবরাজ'-এর টীকা ও অনুবাদ করতে গিয়ে লেখক শিব-অনুধ্যানকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি প্রথমে সাজিয়েছেন বন্দনাংশ—এখানে আছে মূল, অন্বয় ও অনুবাদ-সহ 'শিবাষ্টকস্তোত্রম্', 'বেদসারশিবস্তোত্রম্' এবং অবশ্যই 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'-এর মতো তিনটি অতি সুপরিচিত শিবস্তোত্র। তারপর স্তবাংশে প্রবেশের আগে তিনি আরাধ্যের স্বরূপ অনুচিন্তন করেছেন। এই অংশে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন দার্শনিক মতামত, স্তবপাঠের পদ্ধতি, ওঙ্কার গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, শিবচিন্তার বিশ্বাতীত তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, শিবলিঙ্গে শিবার্চনার শ্রেষ্ঠত্বের পৌরাণিক কাহিনী, শিবলিঙ্গের শুভাশুভ নির্ণয়। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্ঘাতের মাধ্যমে শিবচিন্তার বিবর্তন-রেখাটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে 'অবতরণিকা' অংশে 'স্তবরাজ'-এর উৎসকাহিনীটি সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে বর্ণনা করে লেখক মূল স্তবাংশে প্রবেশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ঃ "দর্শনাচার্য শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ বিরচিত মহাভারতের 'ভারতভাবদীপ' ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত 'ভারতকৌমুদী' টীকার মর্মার্থ অবলম্বনে" এই স্তোত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরিশিষ্টে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান যে একই শিবতত্ত্বে সমন্বিত হয়েছে, তার রূপটিকে তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন।

সমগ্র পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত। এইভাবে একটি নিটোল পরিকল্পনা হাতের কাছে থাকলে প্রাথমিকভাবে শিবানুচিন্তন ও শিবানুধ্যানের পক্ষে যে তা একান্ত উপযোগী, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষত, এর মধ্যে শিবলিঙ্গাদির পরিচয় সংযোজিত হওয়ার ফলে গ্রন্থের আকর্ষণ অনেকটাই বেড়েছে। এই সাধু প্রচেষ্টার দ্বারা 'শিবসহস্রনাম' বা 'স্তবরাজ' বাঙালি ভক্তসমাজে বহুল প্রচারিত হবে—এটাই স্বাভাবিক। সূচনায় "লেখকের বহু পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়-এর সমন্বয়ে সৃষ্টি এই গ্রন্থটি। বাঙলা ভাষায় শিব বিষয়ে এরূপ টীকা এবং বিশ্লেষণ-সমন্বিত গ্রন্থ আর আছে বলে আমাদের জানা নেই।"—প্রকাশকের এই দাবি অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়।

তবে, একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এত উচ্চ ভাব ও পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থটি হাতে এসেছে বলেই এর গভীরে প্রবেশ করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক ও গ্রন্থবিন্যাসে পেশাদারীত্বের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন, লেখক সবকয়টি স্তোত্রের ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক সংক্ষিপ্তিকরণের পথ নিয়েছেন। যেমন শ্লোকগুলির অন্বয়ের ক্ষেত্রে (কিছু শব্দের অন্বয় দেওয়া হয়েছে, কিছু দেওয়া হয়নি), তেমনি সম্পূর্ণ শ্লোক উল্লেখের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। 'শিবমহিম্ন' একটি বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শিবস্তোত্র। যদিও এর ৩২ থেকে ৪১ পর্যন্ত সকল স্তোত্রের ব্যাখ্যা সব টীকাকার করেননি এবং এই শ্লোকগুলি অনেক গ্রন্থে নেই কিংবা এদের ক্রমের ব্যতিক্রম আছে, তবে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত 'গীতা প্রেস' থেকে প্রকাশিত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'-এ ৩২ থেকে ৪১ সব শ্লোকই স্থান পেয়েছে বাঙলায় দুটি বিখ্যাত স্তবগ্রন্থ বসুমতী প্রেস থেকে প্রকাশিত 'স্তবকবচমালা' ও উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'তেও এই শ্লোকগুলি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শ্রীরাহা কেবল ৩১ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত করেই থেমে গেছেন। বিশেষ করে সূচনায় উদ্ধৃত শিবমহিমাজ্ঞাপক প্রধান যে-শ্লোকটি ('অসিতগিরি সমং স্যাৎ...' ইত্যাদি ৩২নং শ্লোক) পাঠে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত বারবার সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, সেই শ্লোকটি বাদ না দিলে গ্রন্থের পূর্ণতা আসত।

মূল স্তবরাজের ক্ষেত্রেও এই সংক্ষিপ্তিকরণ ঘটেছে। শ্রীরাহা 'শিবসহস্রনাম' স্তব বলতে কেবল সহস্রনামাংশটুকুকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মূল মহাভারতে অনুশাসন পর্বের সমগ্র ষোড়শ অধ্যায়টিই 'স্তবরাজ' বা 'শিবসহস্রনাম' বলে চিহ্নিত। লেখকের উল্লিখিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতেও সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামনু-শাসনপর্বাণি দানধর্মে মহাদেবসহস্রনাম-স্তোত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।" সমগ্র ষোড়শ অধ্যায়ের (অর্থাৎ স্তবরাজের) মোট শ্লোক সংখ্যা ১৮০। এটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথম (১-৩০)—স্তবরাজের প্রস্তাবনা ও মহিমা-খ্যাপন। দ্বিতীয় (৩১-১৫২)—শিবসহস্রনাম। তৃতীয় (১৫৩-১৮০)—স্তবরাজের ফলমাহাত্ম্য ও স্তবরাজ প্রচারের পরম্পরাক্রম বর্ণিত। এই তিন স্তর নিয়েই সম্পূর্ণ স্তবরাজ। শ্রীরাহা কেবল দ্বিতীয় স্তরটির টীকা-অনুবাদাদি করেছেন এবং স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে তিনি স্তবরাজের শ্লোকসংখ্যার নির্দেশও পরিবর্তন করেছেন (যেমন ৩১/৩২ না করে করেছেন ১/২ ইত্যাদি)। কেন বা কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সম্পাদনা করেছেন, তিনি তার উল্লেখ করেননি।

তবু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও বলতেই হবে, গ্রন্থটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। বিশেষ করে দু-একটি মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া গ্রন্থটির ছাপা খুবই ভাল। প্রচ্ছদটি দৃষ্টিনন্দন। পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটিগুলি শুধরে নিলে গ্রন্থটি সত্যিই সংগ্রহে রাখার মতো একটি মূল্যবান সম্পদ হবে। ■

হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ ঃ সুসজ্জিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে ঘেরা অনন্যসাধারণ এক কেন্দ্র

১৮৯৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ থেকে স্বামীজী এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতে আরেক রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদে। এই শহরে তিনি সাতদিনের কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছিলেন। ঐতিহ্যময় মেহেবুব কলেজ-প্রাঙ্গণে একটি বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণও দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। জনসাধারণের সামনে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। সারা দক্ষিণ ভারতের ভক্তপ্রাণ মানুষ আন্তরিকভাবেই বিবেকানন্দের আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর যোগদানের ব্যাপারে পর্যাপ্ত অর্থ তুলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। স্বামীজীও সর্বদাই দক্ষিণ ভারতের ভক্তদের দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন।

হায়দ্রাবাদ শহরের বেগমপেট অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে দীক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি ধর্মালোচনার জন্য তিরিশের দশকে ভাড়াবাড়িতে একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। কিছুকাল পরে আরো কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। এভাবেই বেশ কয়েক দশক চলার পর সত্তরের দশকের গোড়ায় উল্লিখিত কেন্দ্র-দুটি একত্রে মিশে গিয়ে বেলুড় মঠের স্বীকৃতি-লাভের চেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৩ সালে 'হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ' বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করে।

হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বস্তরের মানুষের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠেন। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ডোমলগোদা অঞ্চলে বিশাল ৮ একর সরকারি জমি লিজ নিয়ে তৈরি হয় সুবিশাল হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ। বর্তমানে মঠের সামনের ১০০ ফুট চওড়া বিশাল রাস্তাটির নামও 'রামকৃষ্ণ মঠ মার্গ'। সুপরিকল্পিত ও অসাধারণ শৈল্পিক ভাস্কর্যে তৈরি হয়েছে এই মঠটি। আস্তে আস্তে কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে পরম গর্বের এই রামকৃষ্ণ মঠ।

হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। তাঁর ডানদিকে রয়েছেন শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

আশ্রম-চত্বরে ঢুকলেই চোখে পড়বে বিশাল অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে সুষমামণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। দোতলা বাড়িটির একতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের নানা ঘটনা আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়েছে। দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। মেঝে গেরুয়া কার্পেটে মোড়া। শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে ভক্তরা ধ্যানে মগ্ন। কিছু দূরেই 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাণ্ড লাইব্রেরি'র পাঁচতলা বাড়িতে ক্লাস হচ্ছে নানা ভাষাশিক্ষার। তার পাশেই 'বিবেকানন্দ দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র'-এ দরিদ্র মানুষদের জন্য রয়েছে সবধরনের চিকিৎসা পরিষেবার বন্দোবস্ত। কিছু দূরেই অবস্থিত 'সারদামণি উদ্যান' নানা গ্রামীণ লোকাচারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী
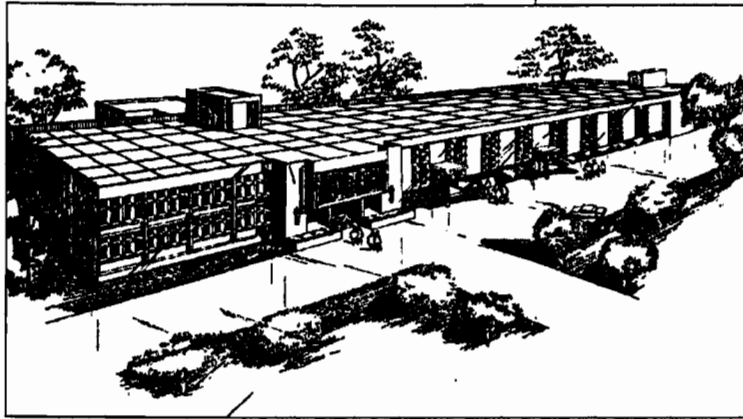
বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর মূল নকশা

উপলক্ষ্যে কয়েক বছর আগে তৈরি নতুন একটি বাড়ির একতলার প্রদর্শনীতে সাজানো হয়েছে গীতার নানা ব্যাখ্যা, সঙ্গে ইংরেজিতে ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'গীতাদর্শন'। দোতলার বিশাল ঘরে বিখ্যাত সাধু-সন্তদের ৫০টি তৈলচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'সাধুদর্শন'। হায়দ্রাবাদ মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী পরমার্থানন্দজী জানালেন, আধুনিক ও অভিনব এইসব প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্যের কথা সাধারণ মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

হায়দ্রাবাদ মঠের মধ্যেই কয়েক বছর আগে একটি বাড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে 'বিবেকানন্দ মানবিক উৎকর্ষ কেন্দ্র'। গত ২০০০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বিশাল আর্থিক প্রকল্প নিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম চালু হয়েছে 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান এক্সেলেন্স'। অভিনব স্থাপত্যকলায় নির্মিত দোতলা বাড়ির প্রতিটি কক্ষই তৈরি হয়েছে সুগঠিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে। এই কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী শ্রীকান্তানন্দজী জানালেন, স্বামীজীর মূল ভাবনা মানুষ ও জাতি গঠন করা। সেই চিন্তার ভিত্তিতে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরো জানালেন, অন্ধ্রপ্রদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের কথা স্মরণে রেখেই ছোট, মাঝারি এবং বড়—তিনরকমের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানারকম কোর্স চালু হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিমানসে স্থিতি, ধৈর্য, সাহস এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ তৈরি করা। রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, বেকার যুবক, এমনকি গ্রামের চাষি—সকলেই এখানে উপকৃত হচ্ছেন এক, তিন বা ছয় মাসের বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য কোর্সগুলি হলো—(১) ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন ফর টিচার্স, (২) ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ফর গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ার্স, (৩) কনফিডেন্স বিল্ডিং ফর ইয়ুথ, (৪) কমিউনিকেশন স্কিলস, (৫) আর্ট অফ মেডিটেশন, (৬) যোগা অ্যাণ্ড মেডিটেশন, (৭) স্পেশ্যাল ট্রেনিং কোর্স ফর প্রফেশনালস যথা ডক্টর, নার্সেস, ল-ইয়ার, ইঞ্জিনিয়ার্স ইত্যাদি। তিনটি সভাগৃহ ছাড়াও নবনির্মিত এই কেন্দ্রের শোভা বর্ধন করছে স্বামীজীর ৮ ফুট লম্বা একটি আবক্ষ মূর্তি।

কলকাতা থেকে ১,৬০০ কিলোমিটার দূরে সেকেন্দ্রাবাদ-হায়দ্রাবাদ যমজ শহরের প্রাণকেন্দ্রের কাছেই এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ সকলের অবশ্য-দর্শনীয় স্থান।

(প্রতিবেদক : পল্লব মিত্র)

ছাত্রকৃতিত্ব

উত্তর প্রদেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে ২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কানপুর বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ : পরীক্ষার্থী—১৪৩, প্রথম বিভাগ—১৪০, অনার্স (৭৫% ও তার বেশি)—২৩।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৫ সালের স্নাতক (পার্ট টু) পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক মহাবিদ্যালয়গুলির ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম ১০ জনের মধ্যে যেসকল স্থান অধিকার করেছে, তা নিম্নরূপ :

নরেন্দ্রপুর : পদার্থবিদ্যা—৬ষ্ঠ; রসায়নবিদ্যা—৪র্থ ও ১০ম; গণিত—৩য় ও ৪র্থ; পরিসংখ্যানবিদ্যা—৪র্থ, ৮ম ও ১০ম এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান—২য়।

বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ) : পদার্থবিদ্যা—৫ম, ৭ম ও ৯ম; রসায়নবিদ্যা—৩য় ও ৭ম; গণিত—১ম, ২য়, ৭ম ও ৮ম; সংস্কৃত —১ম, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১০ম; ইংরেজি—৭ম; বাঙলা—১ম, ৪র্থ ও ৯ম; ইতিহাস—৯ম, অর্থনীতি—২য় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান—১০ম।

বিভিন্ন আই. আই. টি.-তে এম. এসসি. কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ২০০৫ সালে যে 'জয়েন্ট অ্যাডমিশন' পরীক্ষা (JAM) হয়, তাতে পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক মহাবিদ্যালয়গুলির বি. এসসি. (অনার্স)-এর ছাত্রগণ সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম ১০ জনের মধ্যে যেসকল স্থান অধিকার করেছে তা এইরকম :

মহাবিদ্যালয়	পদার্থবিদ্যা	রসায়নবিদ্যা	গণিত
নরেন্দ্রপুর		১, ৪, ৮	
বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ)	৪	৩, ৫, ৯	২, ৩

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—১৪১২
সময়-নির্ঘণ্ট

২৪ আশ্বিন (১০ অক্টোবর) সোমবার
সপ্তমী — পূজারম্ভ সকাল ৫.৪০ মিঃ

২৫ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) মঙ্গলবার
মহাষ্টমী — পূজারম্ভ সকাল ৫.৪০ মিঃ
কুমারীপূজা — পূজারম্ভ সকাল ৯.০০ মিঃ
সন্ধিপূজা — সকাল ১১.০৫ থেকে ১১.৫৩ মিঃ

২৬ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) বুধবার
মহানবমী — পূজারম্ভ সকাল ৫.৪০ মিঃ
হোম — দেবীর ভোগারতির পর

পুষ্পাঞ্জলি — প্রত্যহ দেবীর ভোগারতির পর
সন্ধ্যারতি — প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২ ও ১৯ আগস্ট ২০০৫ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী।

গত ২৬ আগস্ট ২০০৫ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে শ্রীমা সারদাদেবীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন

গত ৩ আগস্ট ২০০৫, বুধবার শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনের বিরতিকালে বিধানসভার লবিতে শ্রীশ্রীমায়ের একটি আবক্ষ তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদীয় ও আবগারি দপ্তরের মন্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আব্দুল হালিম। তাঁরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন যে, সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে আজও সেই ভাব ও আদর্শ সমানভাবে প্রয়োজনীয় ও পালনীয়।

বিধানসভার লবিতে শ্রীশ্রীমায়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন। উপস্থিত রয়েছেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, বিধানসভার মাননীয় স্পিকার ও অন্যান্যরা।
সৌজন্যে ঃ 'বর্তমান'

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে আয়োজিত অনুষ্ঠান-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার কৃপাসিন্ধু সাহা, বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অতীশ সিংহ। শ্রোতৃমণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন বহু বিধায়ক, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী এবং বিধানসভার কর্মী। সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন স্বামী স্মরণানন্দজী ও স্বামী প্রভানন্দজী। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীহালিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্র বহু পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। দুটি তৈলচিত্রই বিধানসভা ভবনের প্রধান ফটকের ঠিক দুই পাশের দেওয়ালে রাখা হয়েছে।

কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কলকাতা-৯) ঃ গত ২১-২২ মে ২০০৫ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরানগর-এ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ তারিখ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গল্পবলা, আবৃত্তি, ক্যুইজ, প্রবন্ধ লেখা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সনাতনানন্দজী। অভিভাবকদেরও পুস্তক প্রদান করা হয়। ২২ তারিখ সকালে কার্যনির্বাহী সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী

পূতানন্দজী, স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী এবং পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ১৭টি আশ্রমের প্রতিনিধিবৃন্দ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী। এদিন বার্ষিক পত্রিকা 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়।

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ, বৃন্দাবনপুর (হাওড়া) ঃ গত ২১-২৪ মে ২০০৫ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে গঙ্গাজল আনয়ন ও মন্দির মার্জন, হরিনামসঙ্কীর্তন, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন, রামায়ণগান, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত উপাসনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব পালিত হয়। ২৩ তারিখ উপাসনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এদিন পূজ্যপাদ মহারাজজী ৭২ জনকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘের সভাপতি তপনকুমার সিংহ। এদিন দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাকেন্দ্র, বেলঘরিয়া কলকাতা পুলিশ হাউসিং এস্টেট (কলকাতা-৫৬) ঃ গত ২২ মে ২০০৫ চারটি বিদ্যালয়ের ১২৬ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয়ের পোশাক, স্কুল ব্যাগ, প্রয়োজনীয় খাতা, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এগুলি ছাত্রছাত্রীদের প্রদান এবং সান্ধ্যসভায় ভাষণ দান করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন এবং 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, উদ্বোধনী ও 'রামকৃষ্ণ শরণম্' সঙ্গীত গীত হয়।

কালিয়াগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর দিনাজপুর) ঃ গত ২২-২৩ মে ২০০৫ শহর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ এবং 'বসে আঁক', ভজনগান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুমনসানন্দজী, স্বামী অজেয়ানন্দজী ও পূর্ণিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ২৩ মে ২০০৫ শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি, স্মরণিকা প্রকাশ, লীলাসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজী, স্বামী সুজয়ানন্দজী ও প্রশান্তকুমার সিংহ। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী সারদা। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (বর্ধমান) ঃ গত ২৩ মে ২০০৫ সঙ্কীর্তন, বিশেষ পূজা, প্রদর্শনী, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্যসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দ পুরীজী ও অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।

দক্ষিণ বারাসত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৮-২৯ মে ২০০৫ অঙ্কন, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ২৮-২৯ মে ২০০৫ বেদমন্ত্র ও স্তবপাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৮ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী অমিতেশানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯ তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিমলকুমার ঘোষ।

উত্তরণ, কোন্নগর (হুগলি) ঃ গত ২৯ মে ২০০৫ আবৃত্তি, ক্যুইজ, বিতর্ক, স্থির-দৃশ্যাভিনয় ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক যুবশিক্ষণ শিবির ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে চরিত্রগঠন ও কেরিয়ার একই সঙ্গে সম্ভব'—এই বিষয়ের ওপর প্রশ্নের উত্তর এবং ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী শিবপ্রদানন্দজী, ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন আচার্য। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, মীনা বসু ও সবিতা মুখোপাধ্যায়। শিবিরে ৪০ জন যুবক এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (কলকাতা-৯) ঃ গত ৩-৫ জুন ২০০৫ প্রশ্নোত্তরপর্ব, শরীরচর্চা, সঙ্গীতশিক্ষা, গোষ্ঠী আলোচনা, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ, সেতারবাদন, ভজন, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুল-এ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের বার্ষিক যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৩ তারিখ মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী জিতাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন শিবিরের অধ্যক্ষ গৌরগোপাল সাহা। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী জিতাত্মানন্দজী, সোমনাথ বাগচী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রচন্দ্র

ভট্টাচার্য, রবি ভট্টাচার্য, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ। এই শিবিরে ২১৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, ফুলিয়া (নদীয়া)ঃ গত ৩-৫ জুন ২০০৫ আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, শরীরচর্চা, সঙ্গীত, পথ-পরিক্রমা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা আঞ্চলিক যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৩ তারিখ মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, অরুণাভ সেনগুপ্ত, অমিতকুমার দত্ত প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন অমিতকুমার দত্ত ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ২৮০ জন প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৪ ও ৫ জুন ২০০৫ পাঠ, আলোচনা, নাটক, নৃত্যগীত, শ্রুতিনাটক প্রভৃতির মাধ্যমে যথাক্রমে বার্ষিক উৎসব এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ তারিখ ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী প্রাণারামানন্দজী ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। ৫ তারিখ ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী, স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী ও স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী নিত্যসত্যানন্দজী। প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি যুবসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এদিন ৬ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬)ঃ গত ৫ জুন ২০০৫ মাইকেল নগরে এই কেন্দ্রের কলকাতা শাখার এক উপশাখার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের কলকাতা তথা পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সংগঠক শিবাজী ঘোষ। এরপর স্বামীজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভাষণ প্রদান করেন শিবাজী ঘোষ ও প্রব্রাজিকা দয়াপ্রাণাজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই শাখায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শের ওপর ভিত্তি করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যান শিক্ষা এবং স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্পে নানাবিধ হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, নারায়ণপুর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১২ জুন ২০০৫ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নীলমণি পাহাড়। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, রামগড় ক্যান্টনমেন্ট (ঝাড়খণ্ড)ঃ গত ১২ জুন ২০০৫ বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, নৃত্য, ওড়িশার লোকনৃত্য, যাদুবিদ্যা প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বিমোক্ষানন্দজী ও সম্পাদিকা অনমিতা ভট্টাচার্য। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভানেত্রী মণিমালা চ্যাটার্জি ও যুগ্ম-সম্পাদিকা সুস্মিতা মিত্র। এদিন ৩৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয় এবং প্রায় ২০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদঃ গত ১৮-১৯ জুন ২০০৫ শহর-পরিক্রমা, নৃত্যালেখ্য, গীতি-আলেখ্য, ভক্ত ও যুবসম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় ধূপগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিহার, উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমের মোট ৩২টি আশ্রমের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন পরিষদের সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দজী, সহ-সভাপতি স্বামী পরাশরানন্দজী, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও পূর্ণিয়া আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিজয়ানন্দজী। অনুষ্ঠানে ১০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে ৫,০০০ টাকার পাঠ্যপুস্তক এবং দাতব্য চিকিৎসালয়কে ২,০০০ টাকার ওষুধ প্রদান করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা অনুধ্যান পীঠ, বালী (হাওড়া)ঃ গত ২২ জুন ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী, বেলানগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ দিনাজপুর)ঃ গত ২২-২৩ জুন ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, অঙ্কন, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, বালুরঘাট সংশোধনাগারে আবাসিকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। ২২ তারিখ প্রায় ৩০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন ৭০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, ১ জন দুঃস্থ ছাত্রীকে সারা বছরের লেখাপড়ার খরচ এবং নিরঞ্জন (স্বপন) অধিকারী নামে এক রিক্সাচালককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদঃ গত ৩ জুলাই ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে দীপককুমার রায় ও সন্তোষকুমার ঘোষ। ৪৯টি আশ্রমের ১৯১ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন ■।

মনে রাখবেন
ভারত সরকার কেবল
আসল মার্কার
ওপরই Ⓡ চিহ্ন লাগাবার
অধিকার দেন।
তাই সবসময়ে
আসল দুলালের Ⓡ
তালমিছরির লেবেলে
শিশুর খাদ্য,
রোগীর পথ্য এবং
সর্দিকাশি উপশমে
ঘরে ঘরে সমাদৃত
ভারত সরকারের
R
চিহ্ন দেখেই কিনুন
দুলালের
তালমিছরি কিনুন
৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন: ২২১৮-৫৬৭৩, ২২১৮-০৫৪৩
PRASAR/95

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

নির্মীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফ্ট/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের স্বভাবই তো নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।

স্বামী বিবেকানন্দ

এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.

SRI MA SARADA DEVI

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন, ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয়, আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ফোন : (০১১) ২৩৫৮-৭১১০/৩০২৩
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ফোন : (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

অসম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর ফোন : (০৩৮৪২) ২৬৬৭৮৯, ২৬৭৭৮৯
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ, ফোন : (০৩৮৪৩) ২৬২২৭২
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭, ফোন : (০৩৬১) ২৪৭০৯৯১
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি**, মিশন রোড, পোঃ হাইলাকাণ্ডি-৭৮৮১৫১

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা, ফোন : (০৩৮১) ২২৩০২২২, ২৩৭৫৮৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম** পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যাণ্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী, ফোন : (০৬৭৫২) ২২২৪৭৯, ২২৮৯১৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি** খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮, ফোন : (০৬৭১) ২৩০৩৮৯২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরণা**, এন-৩/৪১৮, আই. আর. সি. ভিলেজ বি.বি.এস.আর.-১৫, ফোন : (০৬৭৪) ২৫৫৯২১২ মোবাইল : ৯৪৩৭১৯৬১০২

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩, ফোন : (০৩৬০) ২২৪৫২৭২

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪ ফোন : (০৬১২) ২৬৭০৮১৫

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি রাঁচি-৮৩৪০০৮, ফোন : (০৬৫১) ২৫৪-১৯৭০/১০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টিল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**, বিষ্টুপুর জামশেদপুর-৮৩১০০১, ফোন : (০৬৫৭) ২৪২৩৭৯৫, ২৪৩০৬৯৯
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০ ফোন : (০৫২২) ২৭৮-৭১৯১/৭১৪৩

মধ্যপ্রদেশ

- **চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়**, কোয়ার্টার নং ২৮/এস, ওয়েস্টল্যাণ্ড, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, খামারিয়া, জব্বলপুর-৪৮২০০৫, ফোন : (০৭৬১) ২৪৩০২০৬

ছত্তিশগড়

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ** কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **পি. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ও. এন. জি. সি. কে. জি. পি, ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার (পশ্চিম) মুম্বাই-৪০০০৫২, ফোন : (০২২) ২৬৪৯-৪৭৬০, ২৬৪৬-৪৩৬৩
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনি আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনি, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এ/৭, রচনা সোসাইটি, বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড, বালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : (০২৬৩২) ২৪২৩৭৩ ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com

সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই।

শ্রীমা সারদাদেবী

If you can but follow one of the Master's teachings, you get everything.

Sri Ma Sarada Devi

Call on the Lord who pervades the entire Universe. He will shower His blessings upon you.

Sri Ma Sarada Devi

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর

হুগলি-৭১২৪২৪ ● ফোন : (০৩২১২) ২৫৯-২৫০

একটি আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ (শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁর 'হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ' বলেছেন) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মভূমি ও শৈশবের লীলাক্ষেত্ররূপে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

এই গ্রামেই ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নয়জন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ধুনি জ্বালিয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য পদধূলিতে ধন্য এই আঁটপুর।

পরমপূজ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দুবার এখানে এসে গ্রামটিকে ধন্য করেছেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটায় দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপূজা শ্রীশ্রীমা দুর্গামণ্ডপে নিজে বসে থেকে পুনরায় চালু করেন। সেইসময়ই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা'রূপে অভিহিত করেন।

রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমের চেষ্টায় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটার অনতিদূরে তাঁর মাতুলালয় মিত্রবাটীতে (যেখানে বাবুরাম মহারাজের জন্ম হয়) শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর বিশেষ সমারোহে মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম অধিগৃহীত হয় এবং 'রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, বিনাব্যয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, স্থানীয় দরিদ্রদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজ চলছে।

কিন্তু আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থিত—(১) স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান মিত্রবাটীর মধ্যে মন্দির, (২) অন্যত্র অফিস এবং (৩) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটা—যেখানে ধুনিমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এসে থাকতেন। এটিই বর্তমানে সাধুনিবাস।

আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থানের ফলে এর পরিবেশ রক্ষা করা এবং আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে পুরো আশ্রমটিকে একই সীমানার মধ্যে আনা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য অন্ততপক্ষে দুই একরের মতো জমি, বাড়ি খরিদ করতে হবে।

এই কাজে ইতোমধ্যে আমরা কিছু জমি কিনেছি এবং আরো বাড়ি ও জমি কিনতে হবে। বর্তমানে এই কাজের জন্য ন্যূনতম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (আনুমানিক হিসাব) ব্যয় করতে হবে।

এই শুভ প্রকল্পে সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও প্রেমানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে সকলের মঙ্গল কামনা করি।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী বরানন্দ
অধ্যক্ষ

এই প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফ্ট/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর"—এই নামে পাঠাবেন।
U. B. I., Belur Math Branch, S.B. A/c. No. 57258

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে; তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

সংসারে কেমন করে থাকতে হয়, জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

চাঁদামামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার। তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

One who makes a habit of prayer will easily overcome all difficulties and remain calm and unsuffled in the midst of the trials of life.

Sri Ma Sarada Devi

A WELL WISHER

Chakraburti's
AID TO ED

(Estd. 1960)

POSTAL & ORAL COACHING INSTITUTE

128 Keshab Chandra Sen St, Kolkata-9 (1st Floor), Phone : 2350-5733

Admission going on for ICWAI (Foundation), Intermediate Courses, H.S. & Graduate (M. Com. Preli, M. Com. Part-I & Part-II) can get admission.

Excellent Results. Efficient Faculty Members.

Time for Enquiry : 4—9 P.M.

General Deptt. :

39, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-9
Phone : 2352-1906

Admission going on Madhyamik, H.S., B.A., B. Sc., B. Com., (Pass & Hons.) & All types of competitive courses.

Fee most reasonable.
Contact : 4—8 P.M.

One should be extremely careful about making His service perfectly flawless. But the truth is, God knows our foolishness, and therefore He forgives us.

Sri Ma Sarada Devi

A WELL WISHER

Science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity, it would stop from further progress, because it would reach the goal.

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :

SHARAFF PRINTS (MFG.) CO. PVT. LTD.

26, SHAKESPEARE SARANI
KOLKATA-700 017

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যেমন চায়, সে তাই পায়।
শ্রীরামকৃষ্ণ

The knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge.
Sri Ramakrishna

When you are doing any work, do not think anything beyond.

Swami Vivekananda

যার আছে সে মাপো—যার নেই সে জপো।

শ্রীমা সারদাদেবী

দশহরার দিন কয়েকজন ভক্ত মায়ের পায়ে পদ্মফুল দিয়া পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। মা একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ "ওমা, আমি মনসা নাকি?" পরে ঠাকুরের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন ঃ "উনিই মনসা, গঙ্গা—সব।"

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

ROSSOGOLLA

> As the snake is separate from its slough, even so is the spirit separate from the body.
>
> Sri Ramakrishna

> মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।
>
> শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

BRATATI ROY BURMAN
128/C, Bangur Avenue
Kolkata-700 055
Phone : 2574-9579

ভগবানের নাম চিন্তা যেরকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরির রুটি সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

TUSHARENDU ROY BURMAN
128/C, Bangur Avenue
Kolkata-700 055
Phone : 2574-9579

জগতের প্রতিটি কণায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তির প্রকাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

স্বামী বিবেকানন্দ
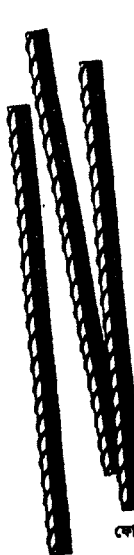
এখন এল আধুনিকতম প্রযুক্তিতে তৈরী
সবচেয়ে শক্তিশালী বাড়ী তৈরীর স্টীল

প্রফেসর ডঃ গোপাল মিত্র,
আর্কিটেক্ট : ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, আমেরিকা

KARI STEEL
The Next Generation Steel

- 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm • 9mm সাইজে পাওয়া যায়
- তিনদিকে রিব থাকায় সবচেয়ে বেশী শক্তি টেন্সাইল স্ট্রেংথ ৫৮৫ (ন্যূনতম)
- সেরা স্টীলে তৈরী বলে সম্পূর্ণ বাঁকালেও (Zero Bend) ভাঙে না
- Conforming to IS 1786 Grade Fe 550 (NABL দ্বারা পরীক্ষিত)
- ৩০% স্টীলের সাশ্রয় • ২০% অর্থের সাশ্রয়

SAHA STEEL প্রস্তুতকারক :- তিন প্রজন্ম ধরে সংভাবে আপনাদের সেবায়
এস সাহা এন্ড কোম্পানি
৭৯এ, নলিনী শেঠ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০০৭
ফোন : (০৩৩) ২২৫৯-৮৪৮০, ২৫৪৩-৩৫২৪, ৩০৯৬৮৬১৪। (০৩৪৭২) ২৭২৯৯৭ (কৃষ্ণনগর)
(০৩৪৮২) ২৬৭১৪৪ (বহরমপুর)। ০৯৪৩৩০১৪৪২৩ (বোলপুর)
Factory : 30934255, 9830010677

সুতরাং **KARI STEEL**, বাড়ী তৈরীর আগামী প্রজন্মের স্টীল।

Education is the panacea for our ills.

Swami Vivekananda

He is a true hero who performs all the duties of the world with his mind fixed on God.

Sri Ramakrishna

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

তাঁর (ভগবানের) নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

He who has a pure mind sees everything pure.
Sri Ma Sarada Devi

The national ideals of India are renunciation and service.
Swami Vivekananda

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর (ভগবানের) উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এসব কর্মের বেশি দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

পরোপকারই ধর্ম পরপীড়নই পাপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

শারদ শুভেচ্ছা
ভারত দর্শনে
আগরবাতি

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্তিক ○ ১৪১২ ১০ম সংখ্যা

"মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পৃথক্ সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

সূচিপত্র

১০৭তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ● কার্তিক ১৪১২ ● অক্টোবর ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ এই সংখ্যার মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৬ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১২-১৪১৩ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এখন আপনি বছরের যেকোন মাস থেকেই 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে পারবেন এবং সেই মাস থেকে মোট ১২ মাসের জন্য বই পাবেন। দুই বা তিন বছরের জন্য গ্রাহক হলেও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে, যেকোন মাসে গ্রাহক হলে সেই মাস থেকেই হিসাব শুরু হবে। অবশ্য, পুরনো ব্যবস্থায় (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) কেউ গ্রাহকপদ নবীকরণ করতে চাইলে তাঁকে মার্চ মাসের মধ্যেই তা করতে হবে। ঐ মাসের পরে নবীকরণ করলে পুরনো সংখ্যাগুলি (যথা এপ্রিলে নবীকরণ করলে জানুয়ারি থেকে মার্চ—এই তিনটি সংখ্যা) দেওয়া সম্ভব হবে না; সেগুলি তাঁরা আলাদাভাবে ধার্য-মূল্যে কিনে নেবেন। তাই পুরনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, গ্রাহকপদ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য আপনারা অবশ্যই মার্চের মধ্যে নবীকরণ করিয়ে নেবেন।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৮তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৬) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আজীবন গ্রাহকভুক্তি : আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

'উদ্বোধন'-এর সেবায় নটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য আটটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700 003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা :** সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

• কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী—আদ্যাশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন।

• আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে 'কালী' বলি, 'শক্তি' বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপ ভেদ।

তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষা-কালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়—রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী-মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির-ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।...

সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভি'র কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।

আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।...

বন্ধন আর মুক্তি—দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি "ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী"।

শ্রীরামকৃষ্ণ

গাই গীত শুনাতে তোমায়

কবিগুরু গাহিয়াছিলেন ঃ "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়/ ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি চেয়ে, সে তো আজকে নয়।" শ্রোতার অন্তরে প্রশ্ন জাগিল ঃ "কে তুমি? আমিই বা কে? কেনই বা গাহিতেছি তোমার (জয়)গান? সে-গানের ভাষা কী? সবই ভুলিয়াছি। কেন ভুলিলাম? এ-গান কতদিন গাহিব? ঘর ছাড়িয়াছিই বা কেন? ঘর ছাড়িবার সময়ে কি সে-গানের শুরু? তাহা হইলে সে-গান কি অনাদি? তাহা কি অনন্ত?" হাজার প্রশ্নের ভারে জিজ্ঞাসু চিত্ত হয় জর্জরিত। অথচ ঈশ্বরানুরাগী ভক্তহৃদয় অনুভব করে—"সে ডাকে আমারে, বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে।" ভক্ত বলিয়া উঠে ঃ "আমি তাই গান গাহি। আনন্দে গান গাহি। দুঃখে গান গাহি। সোজা পথে চলিতে চলিতে গান গাহি, বক্র-কুটিল পথেও চলি গান গাহিয়া। অন্যের সুখে গান গাহি, আপন সুখেও গান গাহি। বিপদে-সঙ্কটে গান গাহি, সম্পদে-বৈভবে তোমারি গান গাহি। কর্মসমুদ্রে শুনি সে তান-তরঙ্গ। জ্ঞানালোকে প্রসারিত হয় তাহার দিব্যধ্বনি। সে কি শুধুই কথা আর কথা? শব্দের শ্রেণিবদ্ধ অভিযান? সুরে, ছন্দে, তালে, বাদ্যে তাহার উত্তরণ কি সত্য নহে? পাখির প্রভাতী কলরবে তাহার অরুণ অধর কি রাঙিয়া উঠে না? অবশ্যই সে-চেতনায় জাগিয়া উঠে মানুষ। সেই দিব্যপুরুষের হাসিতে হাসিয়া উঠে পৃথিবী। তাহারই আনন্দে ভাসে-ডুবে পৃথিবীর ইতিহাস। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। কার্য-কারণের প্রবেশাধিকার সেখানে নাই। সেখানে কি মন আছে? মনের খোঁজ সেখানে আছে, আবার নাই। কারণ, সেখানে "দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।" সেখানে একদিকে "দিবীব চক্ষুরাততম্"—আলোর প্লাবনে উদ্ভাসিত বিশ্বচরাচর, অপরদিকে "অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে" সাধক-হৃদয় "চিরশান্তি পরিমলে অবিরল যায় ভাসি"। আন্তর পৃথিবীর সেই রহস্যময়তার একদিকে জাগিয়া উঠে বিষয়তৃষ্ণা, অপর প্রান্তে বৈরাগ্য; একদিকে যোগিচিত্তে ব্যুত্থান সংস্কার, অপরদিকে সাধকের নিরোধমুখী চিত্তবৃত্তি। তাহার একপ্রান্তে দৃষ্ট হয় ভক্তির উল্লাস, অপরপ্রান্তে জ্ঞানের নিঃসীম গভীরতা।

দেবতার প্রীতি উৎপাদনার্থ ভক্তহৃদয়ে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন ঃ "গাই গীত শুনাতে তোমায়, ভাল মন্দ নাহি গণি/ দাস তোমা দোঁহাকার।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে ভক্ত বিবেকানন্দ রচনা করিয়াছিলেন সান্ধ্য-সঙ্গীত ঃ "খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়; নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।" মহামায়া আদ্যাশক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন ঃ "আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" দিব্যভাবে বিভাবিতা মীরাবাঈ গাহিয়াছিলেন ঃ "মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, আনন্দ-মঙ্গল গাবন কী/ বরসে বদরিয়া সাবনকী।" নানকের সেই বিখ্যাত রচনা ঃ "যোগী যতন করত সব হারে/ গুণী রহত গুণ গাঈ/ জগ নানক হরি ভয়ে দয়ালা; তৌ সব বিধি বন আঈ॥"

এই সঙ্গীত অনাদি, অনন্ত। কারণ ভক্তের ব্যাকুলতা বাড়িলে প্রতিক্ষণ হইয়া উঠে এক-একটি যুগ। পুরীতে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভে হাত রাখিয়া নির্নিমেষ নেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গাহিতেন ঃ "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং/ শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" নিখিল বিশ্ব গোবিন্দের বিরহে যেন তাঁহার নিকট একটি নিরাবলম্বন মহাশূন্যে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কেন? কারণ অজ্ঞাত। তবু ক্রমে ভক্তের ক্ষোভ, যাতনা, বিরহ যেন এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চলিতেছে। অসীমকে স্পর্শ করিবার এক অব্যক্ত প্রত্যয়ে তাঁহার অনভিব্যক্ত আনন্দানুভূতি তাঁহাকে যেন বলিতে চাহে, প্রথমে তুমি তৃণাপেক্ষা হীন, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু হও। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।/ অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" তখনি সম্ভব হইবে এই মনের 'মই' ধরিয়া ক্রমে অসীমকে স্পর্শ করা। নতুবা "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে

'শুভ বিজয়া'র প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি। এই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই।

—সম্পাদক

তোমারে।" যেমন উপনিষদে বলা হইয়াছে ঃ "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তিনি যে বাক্যমনাতীত। তাই প্রয়োজন সঙ্গীত। সংসাররূপ গহন অরণ্যে সঙ্গীত ঈশ্বরের পদচিহ্ন। ঐ পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার নিকট কেন না পৌঁছাইব? মায়াময় এই পৃথিবীতে সমুদয় জীব অবিদ্যায় আবদ্ধ। তাহার গর্ব করিবার অধিকার কই? অহঙ্কার সে করিবে কাহার জোরে? ঠিক কথা। কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের কথা আলাদা। তিনি নিত্য স্নান করেন ভক্তির পবিত্র নির্ঝরে, প্রেমের পুণ্য অনুভূতিতে জাগ্রত হইয়া। বিশ্ব-চেতনায় চেতয়িত হইয়াই সে-ভক্ত নিজেকে তৃণের অপেক্ষা দীন, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু বলিয়া অনুভব করেন। তাঁহার ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করি ঃ "এ-অহং কার?" উত্তর পাইব ঃ "এ-অহং তাঁর।" সে-ভক্তের স্বভাবটি কেমন? মহাপ্রভু গাহিলেন ঃ "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।/ মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" আসলে বিরহের ব্যবধান মিলনকে করে দৃঢ়। যদি ভক্ত-ভগবানের সংযোগ সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যদি প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদকে দীর্ঘক্ষণ দর্শনে বঞ্চিত হয়, তখন মনের প্রত্যন্ত গভীরে দেখা দেয় প্রচ্ছন্ন বাসনা। তখন প্রাণ হইয়া উঠে ব্যাকুল। তখন নিভৃত দেবালয়ে আরতির মধুর ঘণ্টাধ্বনিতে যেন বেদনাদায়ক ছন্দপতন ঘটায় বাহিরের কোলাহল। বৈরাগ্যের তারে বাজে বেসুর। তখন আত্মসচেতক আবাহনে সাধক প্রয়াসী হন তমসার আবরণ অতিক্রম করিতে; তিনি গাহিয়া উঠেন ঃ হে জগন্নাথ, হে জগদীশ! আমি ধনবল চাহি না, আমি জনবল চাহি না, সুন্দরী নারী কিংবা নিখিল বিশ্বের জ্ঞানরাশিও নহে। হে ভগবন্, আমি চাহি জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তি, যে-ভক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল বৃন্দাবনের গোপবধূর হৃদয়ে, যে-ভক্তি তনুময় হইয়া উঠিয়াছিল ভক্তাগ্রগণ্য মহাবীর শ্রীহনুমানের প্রেমে।

প্রার্থনার কি শেষ আছে? প্রার্থনাই সঙ্গীত। প্রার্থনাই ঈশ্বরসান্নিধ্য। বিরহ-দহনে উদ্বিগ্ন শ্রীমহাপ্রভুর নিকট যখন এই ভবসিন্ধু দুষ্পার, প্রচণ্ডতম ঊর্মিমালা সমন্বিত, তখন তিনি গান গাহিতেছেন কার্য-কারণাতীত রাজরাজেশ্বরের কৃপাভিখারী হইয়া ঃ "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।/ কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥" আমি তোমার পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশ—এইরূপ বিচার করিয়া তুমি ঘোর ভবজলধিতে দিশাহারা এই দাসানুদাসকে কৃপাকণা বর্ষণ কর।

তত্ত্ব প্রেমস্বরূপ। তাই সঙ্গীত তত্ত্বানুগামী। শব্দব্রহ্মের প্রকাশ সেই সঙ্গীতে। সে-সঙ্গীত মুক্তিপ্রদ। 'সীমার মাঝে অসীম'-এর গান গাহিয়া সে-সঙ্গীত মানবকে টানিয়া লয় ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়ে। সামগান গাহিয়াছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। আধুনিক কবি গাহিলেন ঃ "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে/ প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।" উপনিষদের মুক্তিপ্রদ বাণী স্বামীজী গাহিয়া বেড়াইলেন দেশ হইতে দেশান্তরে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেখিল নবদিগন্তে মঙ্গল ঊষার আলো। অপূর্ব সুললিত কাব্যময় গদ্যে তিনি পাশ্চাত্যবাসীকে শুনাইলেন মুক্তির বাণী ঃ "ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং/ ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ/ অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা/ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"—আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই; আমার মন্ত্র, তীর্থ, বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা কিছুই নহি। আমি চিদানন্দরূপ শিব—আমিই শিব (মঙ্গলস্বরূপ)।"

সংসারমেধি জীব মৃত্যুভয়ে ভীত। মৃত্যুকে উপনিষদ্ তুলনা করিয়াছেন অন্নের সহিত ভোজ্য ব্যঞ্জনরূপে—'মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্'। উহা অন্ধকারময়। সত্যই কি তাহাই? সংসারাসক্ত মানুষ যখন জীবনের গান গাহে, তাহার মধ্যে ভাসিয়া উঠে মৃত্যুর হাতছানি। বালক হয় কিশোর। কিশোর যৌবন লাভ করে। যুবক প্রৌঢ় হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি লাভ করে বার্ধক্য। তাহার পর? মৃত্যু গ্রাস করে সবকিছু। কিন্তু সঙ্গীত আমৃত্যু অনুরণিত হয় জীবনের পরতে পরতে, এমনকি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অসংসারী জীবন্মুক্ত পুরুষ মৃত্যুর পশ্চাতে দেখেন সেই সঙ্গীতময় আলোর বন্যা, দিব্য প্রেমরসে রঞ্জিত অমৃতত্বের অনন্ত সুরপ্রবাহ। অন্তরের অদম্য আবেগে স্বামীজীর সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠে জীবন্মুক্তির জয়গান ঃ

"যাক অন্ধকার, যাক সেই তমঃ,
আলেয়ার মতো বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে
লয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।
এই তম-রজ্জু জীবাত্মা-পশুরে
জন্মমৃত্যু মাঝে আকর্ষণ করে।
সে-ই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না—জেনে তত্ত্ব এই।
বলহ সন্ন্যাসি, বলো বীর্যবান
করহ আনন্দে কর এই গান,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ ❑

স্বামী বিবেকানন্দের চারটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত

॥১॥[১]

১৭১৯ তুর্ক স্ট্রিট
সানফ্রান্সিসকো
১০ এপ্রিল ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

কিগো! তোমার খবর কি বল তো? ঘুমিয়ে পড়েছ? অনেক কাল তোমার কোন সংবাদ পাইনি।

প্রতিদিনই আমার শরীরের উন্নতি হচ্ছে এবং এরই মধ্যে একদিন—ধর, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই—তুমি কেমন আছ জানতে আমি সোজা চলে আসছি। ভাল কথা, আমি এখানে আর দুই সপ্তাহ থাকব; তারপর যাব স্টকটন নামে একটি স্থানে; সেখান থেকে পূর্বাঞ্চলে। শিকাগোতে কয়েকদিনের জন্য থামতে পারি, আবার নাও পারি।

মে মাসের প্রথমদিকে ডেট্রয়েটে নিশ্চয়ই যাচ্ছি। অবশ্য, এব্যাপারে আমি তোমাকে লিখব। তোমার দিন কেমন কাটছে? সেই একইরকম ক্লান্তিকর কাজ? একটুও কি উন্নতি হয়নি? যদি ইচ্ছে করে, খোশগল্পে ভরা একটি চিঠি লিখো। খবর পাওয়ার জন্য আমি একান্ত ব্যাকুল হয়ে আছি।

সদা সত্যাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

॥২॥[২]

বেদান্ত সোসাইটি
১০২ ইস্ট ফিফটি এইটথ স্ট্রিট
নিউ ইয়র্ক
১৩ জুন ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

উদ্বেগের কোন কারণ নেই, আগেই লিখেছি আমি পূর্বের চেয়ে সুস্থ আছি। অধিকন্তু অতীতে কিডনির গোলযোগ নিয়ে যে-ভয় ছিল তা দূর হয়েছে। 'দুর্ভাবনা'ই এখন আমার একমাত্র রোগ এবং আমি তা দ্রুত জয় করার চেষ্টা করছি।

এখানে এক বা দুই সপ্তাহ থাকব এবং তারপর ডেট্রয়েটে যাব। যদি এমন কিছু ঘটে যার ফলে আমার যাওয়া না হয়, তাহলে তোমাকে চলে আসার জন্য আমি অবশ্যই খবর পাঠাব। যাই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি এই দেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। এটা ধ্রুব নিশ্চিত যে, আগে তোমার সঙ্গে দেখা করব, তারপর ইউরোপে যাব।

সবকিছু পুনরায় উৎসাহজনক বলে মনে হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যের মতোই সৌভাগ্যও আসে জোট বেঁধে। সুতরাং আমি নিশ্চিত যে, এখন থেকে অন্তত কিছুকাল সবকিছু সাবলীলভাবে চলবে।

মিসেস ফাঙ্কেকে ভালবাসা-সহ—

সদা সত্যাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

॥৩॥[৩]

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জেলা, বঙ্গদেশ
১৩ মে ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিন,

গতকাল মঠে এসে পৌঁছেছি। আজ সকালে তোমার সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি এসেছে। ইতোমধ্যে তুমি নিশ্চয় আমার চিঠিখানা পেয়েছ এবং আশা করি, মাঝে মাঝে নীরবতা কীরকম স্বর্ণতুল্য হয়ে ওঠে সেটিতে তার স্বাদ পেয়েছ।

---

১ ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।
২ ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ৩ ঐ

আজ সকালে সব জায়গা থেকে আমি সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছি এবং আমি খুশিতে ভরপুর। অসম ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আমি দীর্ঘ ভ্রমণ করে এসেছি। পর্বত ও জলরাশির সম্মিলিত দৃশ্যের জন্য দেশের এই ভূভাগটি অতুলনীয়।

হয় আমাকে এই গ্রীষ্মে ইউরোপে যেতে হবে এবং তারপর আমেরিকায়, অথবা তুমি ভারতে চলে এস—সবকিছু সেইমতো আয়োজন চলছে। 'মা' তাঁর নিজের পন্থা অবগত আছেন। একটা ব্যাপার হলো, আমি এখন প্রশান্তিতে আছি—গভীর প্রশান্তিতে এবং আশা করি, দীর্ঘকাল এই অবস্থা বজায় রাখতে পারব; আর এই সাম্য অবিচল থাকার ব্যাপারে তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সহায়; নও কি? পরের চিঠিতে আরো লিখব; এখনকার মতো শুধু এই কয়েকটি পঙ্ক্তি—এবং তাদের স্বল্পতার জন্য আমি শতবার মার্জনা চাইছি। তথাপি এই দুনিয়ায় কখনো কখনো নীরবতাই সকল বচনের চেয়ে অধিক প্রকাশক্ষম।

সকল ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ—

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

॥৪॥[৪]

মঠ, বেলুড়, জেলা-হাওড়া
২৭ মে ১৯০২

প্রিয় ক্রিস্টিন,

আমি দুঃখিত যে, এবার আর পর্বত সন্দর্শনে যেতে পারলাম না। আমার স্বাস্থ্যের যদিও কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি, তথাপি মন্দ নয়। যকৃতের উপকার হয়েছে—এটা একটা বড় লাভ। খুব শীঘ্রই পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর রাস্তার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

পাহাড়ের পরিবেশ তোমাকে ভাল রেখেছে জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। বেশি করে খাও, যত পার ঘুমোও এবং বেশ মোটাসোটা হয়ে ওঠ। পেটে এমনভাবে খাবার ঠাস যে পর্যন্ত না তুমি বেশ গোলগাল হয়ে ওঠ বা ফেটে যাও।

তাহলে স্থানটি মিঃ ওকাকুরার মনঃপূত হয়নি; কেন? নিশ্চয় এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছিল যা তাঁকে অত্যন্ত উত্যক্ত করেছে, যার জন্য তিনি এমন আকস্মিকভাবে স্থানটি ছেড়ে চলে গেলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি তাঁর ভাল লাগেনি—তা কি তাঁর কাছে যথেষ্ট মহিমান্বিত মনে হয়নি? অথবা জাপানিরা বুঝি মহানকে আদৌ পছন্দ করে না, শুধু কি সৌন্দর্যই তারা ভালবাসে?

ছেলেদের মধ্যে একজন লিখেছে যে, ছোট ছেলেটি অবাধ্য হয়ে উঠছে ইত্যাদি। মিসেস সেভিয়ার চান যে, আমি তাঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি। সেরূপই আমি করছি। সদানন্দ ও আরেকজন সাধুকে (যাকে এখানকার কাজের জন্য আমার চাই) আলমোড়ায় গিয়ে বর্ষা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এবং বর্ষা নামলেই নিচে চলে আসতে বলেছি।

যদি তুমি মনে কর যে, তুমি মিসেস সেভিয়ারের কাছে কিছুমাত্র বোঝাস্বরূপ হয়েছ, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখবে। তাঁর ওপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করা অন্যায় হবে—তিনি আমার জন্য এতই করেন।...

এই মুহূর্তে দুটো ছাগলছানা ও তিনটে মেষশাবক পরিবারে যুক্ত হয়েছে। আরেকটি ছাগলছানা ছিল; কিন্তু সেটি হলুদ মাছ-পুকুরে ডুবে মরেছে। মার্গটি কেমন আছে? সে কি এখনো সেখানে রয়েছে? অথবা ওকাকুরার সঙ্গে চলে গিয়েছে? ছেলেদের সান্নিধ্যে সে কেমন কাটাচ্ছে?

সারাদিন তুমি কি কর—দিন কাটাও কিভাবে? সবকিছু খুঁটিনাটি আমাকে লিখবে, এবং ঘনঘন; কিন্তু আমার কাছ থেকে প্রায়ই দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা করো না।

মিসেস সেভিয়ারকে, মার্গটকে এবং বাকিদের আমার ভালবাসা জানিও, এবং যদি তুমি চাও তবে কয়েক চামচ তুমি নিতে পার।

শুধু এইটুকু সহ
বিবেকানন্দ

পুনঃ বাচ্চা ছোঁড়াটার প্রতি একটু নজর রেখো। ছেলেগুলি ওর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আছে। সেইভাবে তারা পূর্বে আরেকটি ছেলেকেও নষ্ট করেছিল।

৪ ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৮ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি।—সম্পাদক

অষ্টম অধ্যায়ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥৮॥

শব্দার্থঃ *হে পার্থ, পরমাত্মাই ধ্যেয় বস্তু। সেই ধ্যেয় বস্তু থেকে বিষয়ান্তরে চিত্তকে না লইয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা দিব্যজ্যোতির্ময় ঈশ্বরে উহা স্থাপন করিয়া সাধক সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।*

ব্যাখ্যাঃ বাহিরের কাজে অনেক হাঙ্গাম, একটা কিছু করিতে হইলে তাহার অনেক জোগাড়যন্ত্র না করিলে নয়; কিন্তু ভগবান লাভ করিতে হইলে, বিচারবুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে কেবল ঈশ্বরের কোন একটা ভাব অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। 'চেতসা-নান্যগামিনা' অর্থাৎ যাহার মন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দিকে যায় না। তাহার বুদ্ধি এমন convinced বা প্রত্যয়ী যে, অন্যদিকে মন দিলে তাহার ক্ষতি হইবে এবং যদি কোন কারণে একটু যায়ও, সে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিবে।

[মন্তব্যঃ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"অভ্যাসঃ সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহঃ" অর্থাৎ একই প্রকার চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উত্থাপিত করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ যাবতীয় মনোবৃত্তি বারংবার সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষে আপতিত (incident) হইতে থাকিবে—ইহাই অভ্যাস।—সম্পাদক]

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥১০॥

শব্দার্থঃ *সেই অনুচিন্তনীয় পুরুষ কেমন? শ্রীভগবান বলিতেছেন—তিনি কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাণ (অনাদিসিদ্ধ), অনুশাসিতা (প্রশাসক), সূক্ষ্ম (আকাশাদি অপেক্ষা), সকলের বিধাতা, চিন্তার অগোচর, আদিত্যবর্ণ (স্বপ্রকাশ), তমসার (প্রকৃতি বা অজ্ঞানান্ধকারের) পরপারে বর্তমান সেই পুরুষে মৃত্যুকালে অভিযুক্ত হইয়া অচঞ্চল চিত্তে যোগবলের দ্বারা সুষুম্নাপথে ভ্রূযুগলমধ্যে প্রাণকে সম্যগ্‌রূপে স্থাপন করিয়া যিনি অনুক্ষণ স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।*

ব্যাখ্যাঃ কবি কে? এই কাব্যময় জগতের তিনিই স্রষ্টা, তাই তাঁহাকে কবি বলা হইয়াছে। কবির মূল অর্থ—যিনি ক্রান্তদর্শী—ত্রিকালদর্শী। পুরাণম্—অভিনব, যাঁহার আদি নাই। অনুশাসিতা—যিনি সৃষ্টির শাসনকারী। (Governor of the whole creation) অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মন সূক্ষ্ম না হইলে সেই সূক্ষ্মতমকে ধরা যায় না। ধাতারম্—সৃষ্টি যাঁহাতে ধৃত (অবস্থান করিয়া) রহিয়াছে। সৃষ্টির যিনি বিধান করিয়াছেন। অচিন্ত্যস্বরূপম্—যাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া বোঝা যায় না, কেবল বোধে বোধ হয়। আদিত্যবর্ণং—সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ—Self-effulgent। তমসঃ পরস্তাৎ—অজ্ঞানের অতীত।

মৃত্যুকালে পরম ভক্তির সহিত ঈশ্বরচিন্তায় মন নিযুক্ত করিয়া রাখিলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া আজ্ঞাচক্রে আসিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন শরীরের সমস্ত ক্রিয়াশক্তি (প্রাণ) বন্ধ হইয়া আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া থাকে। এই স্তর আপনা হইতে ভেদ হইয়া মানুষের বোধশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ করে।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥১১॥

শ্লোকার্থঃ *বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষরপুরুষ বলিয়া থাকেন, সংসারবীতরাগ যতিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন—সেই পরমপদ-প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে তোমায় সংক্ষেপে বলিব।*

ব্যাখ্যাঃ নির্গুণ ব্রহ্মকে বোধ করিবার উপায় নির্দেশ করা হইতেছে।

[মন্তব্যঃ প্রণব ব্রহ্মের প্রতীক। তাই প্রণবমূলক অন্তরঙ্গ-সাধনের কথা এইবার শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিবেন।—সম্পাদক]

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥১৩॥

শ্লোকার্থঃ *সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণস্থাপন দ্বারা সাধক আত্মার সহিত যোগধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যোগাবলম্বন*

করিবেন। 'ওঁ'—এই একাক্ষর শব্দব্রহ্ম উচ্চারণপূর্বক আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপতা লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ যাহাতে না হয়, সেই জন্য চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিতে হইবে। অতঃপর মনকে সর্ববিধ চিন্তা হইতে বিরত করিতে হইবে। এই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধিতে যে নিশ্চিত ধারণা আছে তাহা যেন অবিচল থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং সেই পরব্রহ্মের প্রতীক-রূপে ওঁকার জপ করিতে হইবে। সকল চিন্তা নিরুদ্ধ থাকিয়া মন সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মে স্থির হইলে প্রাণের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায় এবং কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে সাধকের ব্রহ্মানুভূতি হয়, ইহাই ব্রহ্মানন্দ লাভের সর্বোত্তম সাধনা।

সাধারণের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি আমাদের মতো একটি ব্যক্তি, তাঁহার likes & dislikes আছে, আত্ম-পর আছে, তিনি রাগ করেন বা কৃপা করেন; কিন্তু জ্ঞানী জানেন তিনি একটি চিন্ময় সত্তা মাত্র—অজ্ঞানের আবরণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে নানাপ্রকার অ-চিৎ বস্তুরূপে দেখিয়া থাকি। মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়া সগুণ সাকার মূর্তিতে মন স্থির করিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে একটু দেরি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইলে সত্বরই মুক্তিলাভ হয়।

সেই ধারণা আনিতে হইলে 'আমিই শুধু আছি'—এই চিন্তাতে দীর্ঘদিন মন স্থির করিতে হয়। সর্ব উপাধি-বিবর্জিত 'আমার প্রকৃত সত্তা' সম্বন্ধে একটু ধারণা হইলেই সমষ্টিচৈতন্যের ধারণা করা সম্ভব হয়; তখন শাস্ত্র-কথিত অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসের ফলে সহজেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

নিরুপাধিক চিৎ-সত্তা সম্বন্ধে ধারণা হইলেও মন-বুদ্ধিকে সেই ধারণায় ডুবাইয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য কোন একটি মূর্তি বা কোন একটি শব্দে মনকে বসাইয়া রাখার পদ্ধতিও শাস্ত্রবিহিত।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥

শ্লোকার্থ ঃ *হে পার্থ, অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সদা-স্মরণকারী যোগীর পক্ষে আমি সুলভ (অন্যের পক্ষে নহি)।*

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞানলাভের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। যদি কেহ পরম শ্রদ্ধার সহিত অবিরাম ঈশ্বরচিন্তা করে, তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ সুলভ। মানুষের দেহমন রজঃপ্রধান। সেইজন্য কর্ম করিতেই তাহাদের ভাল লাগে—চিন্তা করিতে তাহাদের কষ্ট হয়। সেইজন্যই সাধকদিগকে দীর্ঘকাল অবিরাম চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জগতের যেকোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দীর্ঘকাল অবিরাম চিন্তা করিতে হয়; আর সূক্ষ্মতম বস্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইলে যে দীর্ঘকাল অবিরাম চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

শ্লোকার্থ ঃ *পূর্বে বর্ণিত আমার ভক্তরূপ মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিয়া পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। তাই দুঃখের আলয়স্বরূপ এই অনিত্য সংসারে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না। হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোকই পুনরাবৃত্তিশীল। আমার ভক্ত কোন লোকেই প্রত্যাবর্তন করেন না।*

ব্যাখ্যা ঃ জীব এবং এই সমগ্র সৃষ্টির চতুর্দশপ্রকার অবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় 'ব্রহ্মলোক'। এখান হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্ট বৃত্তের মধ্যে যেখানেই জীব থাকুক না কেন, বারংবার জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। জন্ম-মরণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যাইতে হইবে অর্থাৎ নির্বাণলাভ করিতে হইবে—ইহাই পূর্ণমুক্তি।

যাঁহারা যাগযজ্ঞ, পরোপকারাদি সৎ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকে যান। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব অভ্যাসবশত ব্রহ্মলোকে ভোগে মত্ত না হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে থাকেন; তাহার ফলে জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমমুক্তি লাভ করেন। ভক্তদের কি মুক্তি হয়? এই প্রশ্নে মতান্তর আছে।

যাঁহারা নিষ্কামভাবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মুক্তি পাঁচপ্রকার—সারূপ্য (উপাস্যের মতো রূপ), সালোক্য (তাঁহারা দেখিবেন—উপাস্যদেবতার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করিতেছেন), সামীপ্য (উপাস্যের অবস্থিতি সর্বদা অনুভব করেন, তিনি যেন কাছাকাছিই আছেন মনে হয়), সার্ষ্টি (উপাস্যের ন্যায় শক্তিশালী), সাযুজ্য (উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়া অর্থাৎ নির্বাণ—মুক্তি)। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদের মধ্যে ইষ্টলোকের বৈষম্য আছে। যেমন, শৈবরা নিজের ভাবনা অনুযায়ী শিবলোকে বাস করেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে দেহান্তে কেহ বৈকুণ্ঠে গিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের সহিত বাস করেন, আবার কৃষ্ণভক্তেরা নিত্য বৃন্দাবনধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণলোক নির্মাণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা দেহান্তে এমন এক জায়গায় যাইবে, যেখানে ঠাকুর ও মা তাঁহাদের ভক্তদের লইয়া চিরকাল লীলা করিতেছেন। এইরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এক একটা লোকের ধারণা আছে।

প্রাচীনকালে ভক্তিশাস্ত্রে যে ক্রমমুক্তির কথা লিখিত হইয়াছিল, সেই ক্রমমুক্তির একটি অবস্থাকেই সম্ভবত এইরূপ বর্ণনা করা হয়। ভক্তদের এইসব লোক চিন্ময় সগুণ ব্রহ্মলোকেরই একটি অংশ। যেমন—কোন গ্রামে ব্রাহ্মণরা যেখানে থাকেন, তাহাকে বলে ব্রাহ্মণপাড়া; বৈদ্যরা যে-অংশে থাকেন সে-অংশকে বলে বৈদ্যপাড়া ঠিক এইরকম বলিয়াই মনে হয় (অথবা—ভক্তের চিন্ময় ধাম ব্রহ্মলোকেরও উপরে এইরূপ বুঝিতে হইবে)। [ক্রমশ]॥চৌত্রিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

আজ হতে শতবর্ষ আগে
উদ্বোধন

কার্ত্তিক ১৩১২
অক্টোবর ১৯০৫

জ্ঞান ও ভক্তির একতা।

(অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।)

আবহমান কাল হইতে জ্ঞানকে অধিকার করিয়া ভক্তজগতে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ উহার নামে প্রজ্বলিত হুতাশনের অভিনয় দেখাইয়া থাকেন; কেহ বা উহাকে কর্কশ ও নিরস ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিগুম্ফিত করেন। আবার অনেকে উহার সংস্রবমাত্রও উপেক্ষা করিয়া রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামাদি যুগল নামের শরণ লয়েন এবং উহা ভগবৎ প্রাপ্তির প্রবলতম প্রতিবন্ধক—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন।

প্রস্তাবিত সমস্ত দলই যে ভ্রান্তি-সাগরে মগ্ন রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাঁহারা এমনভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন যে, অন্য চর্চ্চা শ্রবণই তাঁহাদের মতে নরকের পথপ্রদর্শক—নাস্তিকতা বা পাষণ্ডতার জ্ঞাপক। এই শিক্ষালাভে তাঁহাদিগকে সবিশেষ প্রয়াস পাইতেও হয় না। সুচতুর গুরুদেবই দীক্ষাকালে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, যাহারা স্বকীয় সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করা দূরে থাকুক, দর্শন করাও পাপ। শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত মার্গের রেখামাত্রও অতিক্রম করেন না।...

আপাতদর্শীরা জ্ঞানদেবের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মহা বিভ্রাটে পড়েন এবং নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মাকে মরণশীল ও অশুদ্ধ বলিয়া জানেন। কিন্তু ধীর স্থিরভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে ডুবিয়া যাও, দেখিবে জ্ঞান বিশেষকে প্রেমাভিধান দেওয়া কল্পনা বিশেষ অথবা জ্ঞানপক্ষপাতীদিগের জল্পনা মাত্র নহে। ঋষিদিগের ন্যায় তুমিও বুঝিবে যে, জ্ঞান বিশেষই প্রেম—ইহা ধ্রুব সত্য। প্রেমই জ্ঞান এবং জ্ঞানই প্রেম, কেবল সংজ্ঞা মাত্র ভিন্ন। উভয়েরই বাচ্য এক চিন্ময় ব্রহ্মাত্মা। এই চিন্ময় দেবই ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলেন।...

বস্তুতঃ জ্ঞানকেই কবিপ্রবীণ ও ভক্তগণ ভক্তি ও প্রেমাদি নামে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভক্তকেশরী রামানুজ 'বেদনং ভক্তি' ইত্যাদি বচন দ্বারা ভক্তি পদের অর্থ জ্ঞানই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।...

প্রমাণিত হইল যে, ভক্তির অর্থ জ্ঞানবিশেষ। ঐ জ্ঞানবিশেষ কি পদার্থ তাহাই অগ্রে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। অনুরাগ মাত্রেরই কারণ প্রীতিভাজনের সৌন্দর্য্যানুভূতি। যিনি যত অধিক পরিমাণে সৌন্দর্য্যরসের আস্বাদন বা অনুভব করিতে পারেন, তিনি তত অধিক মাত্রায় প্রীতিতরঙ্গিণীর পূতনীরে মগ্ন হইয়া ধন্য হন, এবং নিত্যানুরাগময়ী জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন।...

ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি অনুরাগেরই অন্তর্ভূত; সুতরাং অনুরাগ পদার্থ নির্ণীত হইলেই উহাদেরও নিরূপণ হইয়া যাইবে।... ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি সকলই এই অনুরাগ মহোদধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। ভক্তি বা প্রেম উৎপত্তির পূর্ব্বে ভক্তিভাজন ও প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, অনন্তর 'ইনি আমার অনুকূল'—এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে ক্রমে উহা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করে এবং ঘনীভূত হইতে থাকে।... এমন কি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে প্রয়াস পাইলেও সেই কমনীয় আকারই যেন বলপূর্ব্বক ধ্যেয়পদ অধিকার করে।...

ভক্তি ও প্রেম যেরূপ স্বভাবতঃ অন্য বস্তুতে হয়, সেরূপ আপনাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই আত্মপ্রেমই নিখিল প্রেমের অগ্রণী। এই আত্মপ্রেমই জগৎকে আত্মস্বরূপ অনুভব করাইয়া নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দেয়। কারণ উহা চিন্ময় আত্মাকে অধিকার করিয়াই আবির্ভূত হয়। পক্ষান্তরে দেহাত্মপ্রেম আবার মানুষকে পশুবৎ করিয়া অনর্থ সমুদায়কে আমন্ত্রণ করে এবং নরকের কপাট খুলিয়া দেয়। চিন্ময় আত্মপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হইলেই অনাত্ম বস্তু অদর্শনকূপে মগ্ন হয়, সকল ভেদজঞ্জাল ঘুচিয়া যায়, শোকমোহাদি কোথায় বিলীন হইয়া পড়ে, এবং অনঘ আত্মজ্যোতি সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হইতে থাকে, কেননা আত্মাই ব্রহ্ম—আত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী মহেশ্বর! যাঁহারা এই আত্মদেবকে সাড়ে তিনহাত বামনআদি সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই মেঘের অন্তরালে ঈশ্বর অন্বেষণ করেন। তাঁহারাই উন্নতশিখর গিরিরাজের পরপারে যাইয়া প্রভুর দর্শন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হন।

আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি—ইহাই প্রেমের অন্তিম ভূমিকা। কেননা প্রেমাস্পদকে আত্ম-আখ্যায় আখ্যাত করাই প্রেমবিজ্ঞানে প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে কথিত হইয়াছে। লৌকিক ভালবাসাতেও প্রিয়তমের সহিত আত্মার অভেদনির্দ্দেশই হইয়া থাকে। প্রেমের স্বভাব এই যে, ধীরে ধীরে ভেদ অন্তরিত করে ও অজ্ঞাতসারে প্রিয়তমের প্রকৃতি প্রেমিকে সঞ্চারিত করে। এজন্যই ঈশ্বর-প্রেমিক প্রেমের সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত আপনার অভেদানুভব করিয়া থাকেন।... যে জীব ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান ঋষি ও মুনিগণের হৃদয়ের ধন, যাহা 'অপৌরুষেয় বাণী' বলিয়া তাঁহারা অসকৃৎ তারস্বরে উপদেশ করিতেছেন এবং যাহা লাভ করিবার জন্য যাবতীয় সাধন সকলের আবির্ভাব—তাহাকে ঐরূপ অনাদর ও অবহেলা করা সামান্য অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। হে অজ্ঞান! জগতে তোমার দ্বারা না হয় এমন অকার্য্য কিছুই নাই, তুমি এক নিমেষের মধ্যেই সত্যকে অসত্য করিয়া ফেল!...

নির্গুণ ভক্তিরই নামান্তর অহৈতুকী ভক্তি। ইহা পরমহংসগণেরই উপসেব্য, যেহেতু এই ভক্তি কেবল নির্গুণ স্বরূপেই হইয়া থাকে।...

ব্রহ্মাকার বৃত্তিই জ্ঞান এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তিই অহৈতুকী ভক্তি। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু এবং উহাদের উভয়েরই লক্ষ্য এক চিন্ময়আত্মা।...

যিনি এই ব্রহ্মসুধাসিন্ধুর অভ্যন্তরে মগ্ন হইতে চাহেন, তিনি প্রথমে জ্ঞান ও ভক্তির একতা হৃদয়ঙ্গম করুন; তিনি পশুবুদ্ধি অর্থাৎ ভেদভাব বিবেকসলিলে ধুইয়া ফেলুন এবং উপনিষদের শ্রবণ ও মননে নিবিষ্ট হউন, অবশ্যই শুভভবিষ্যৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। অবশ্যই তিনি বিবেকানন্দনীরে স্নাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভপূর্ব্বক মানবজন্মের সফলতা সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র ১৪১২ সংখ্যার পর]

প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪১১ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য।—সম্পাদক

প্রশ্ন : *ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মানুষদের, বিশেষ করে আমেরিকানদের মতামত কী?*

উত্তর : আমেরিকায় আমার ভাষণ ও আলোচনার বিষয় হিসাবে যে-তিরিশটির তালিকা বিতরণ করা হয়েছিল, তাদের একটিকে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বেছে নিয়েছিল; সেটি হলো—'আধুনিক ভারতে সনাতন ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবর্তন'। বিশ্ব জনসংখ্যার ছয়ভাগের একভাগ মানুষ কীভাবে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, সেটা বর্তমান পৃথিবীর দৃষ্টিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্ণেলি, স্ট্যানফোর্ড ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টির ওপর ভাষণ ও তার পর প্রাণবন্ত আলোচনা-পর্ব অনুষ্ঠিত হলো। আসলে, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজের ওপর দিয়ে আজ এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ব্যাপক শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সুবিস্তৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার হাত ধরে ভারতবর্ষ আজ এমন এক পরিবর্তনের মুখোমুখি, যা তার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক। অতএব, ভারতের কী হবে; আধুনিক প্রেক্ষাপটে এদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই বা কী ভবিষ্যৎ—এসব সম্বন্ধে বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁদের কারো কারো স্থির সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, আধুনিকতার জোয়ারে ভারত ভেসে যাবে, অন্য অনেক রাষ্ট্রের মতোই। আবার, কেউ কেউ ভেবেছেন, সত্যিই যদি এমনটি হয়, তাহলে মানব-সভ্যতার পক্ষে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমাকে স্বীকার করতে হলো যে, অনিশ্চয়তা আছে এবং এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আধুনিক ভাবস্রোতের অভিঘাতে ভারতবর্ষ শেষপর্যন্ত পাশ্চাত্যের দিকেই ভেসে গিয়ে তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে একেবারে বস্তুবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেইসঙ্গে একথাটাও তুলে ধরলাম যে, এই দেশের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পিছনে একটি শক্তি আছে এবং সেই শক্তির উৎস একটি যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত দর্শন—যার নাম 'বেদান্ত'। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ঐতিহ্য কেবল তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের বলেই বেঁচে নেই; আধুনিক কালেও সে জন্ম দিয়েছে দার্শনিকতা ও প্রজ্ঞায় দীপ্ত এমন সব মনীষীর, যাঁরা এক যুগপ্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রদান করেছেন নব্য অধিকার, তেজস্বিতা, গতি ও দিশা—আমাদের চোখের সামনেই। আবির্ভূত হয়েছেন একজন রামকৃষ্ণ, একজন বিবেকানন্দ এবং এঁদের চেয়ে কিছু অল্প প্রতিভাসম্পন্ন আরো অনেক দিকপাল। তাঁদের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য লাভ করেছে সেই নতুন আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস, যার সাহায্যে আধুনিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তীব্র ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও সে নিজেকে সুসংহত ও সুস্থিতরূপে রক্ষা করে চলেছে।

কথাপ্রসঙ্গে এ-ও বললাম যে, মনে রাখতে হবে—স্বামী বিবেকানন্দ এইসব পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; স্বাগত জানিয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও গণতন্ত্রকে—তাঁর 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে। তিনি এগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই জিনিসটির স্বার্থে, যেটিকে তিনি বলেছেন 'হালকা বস্তুতান্ত্রিকতা'; যেটির—তাঁর মতে—প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষের জন্য, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি একইসঙ্গে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, এইসব পরিবর্তন প্রয়োজন কেবল বিশেষ একটি অভীষ্টসিদ্ধির উপায়রূপে; সেই অভীষ্ট বা উদ্দেশ্য হলো ভারতের মানুষের একমাত্র পরম সম্পদ—'আধ্যাত্মিকতা'র পরিপুষ্টিসাধন। তাই তিনি আধুনিক ভারতবর্ষকে প্রদান করেছিলেন তাঁর ব্যাবহারিক বেদান্ত-দর্শন, যেটির সাহায্যে ভারতের তথা বিশ্বের মানুষ আধুনিক শিল্পপ্রযুক্তির শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিতরূপে কাজে লাগিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

বিষয়টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয়ের কাছেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে এসম্বন্ধে বিবেকানন্দ স্বয়ং ভারতবর্ষকে কী ভাষায় পথপ্রদর্শন করেছিলেন, সেটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। একটু দীর্ঘ হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে সেই বাণীকে পুনরুদ্ধৃত করা যেতেই পারে। পাশ্চাত্য থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত রামনাদ রাজ্যের রাজা ও তাঁর প্রজাদের অভিনন্দনের উত্তরে জানুয়ারি ১৮৯৭-তে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

"ভারতভূমি থেকে উঠছে অনেক কণ্ঠস্বর। সেগুলো কখনো পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ, কখনো বিরুদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু ভারতের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ানো এই পাঁচমিশালি শব্দের হাট থেকে নির্ভুলভাবে উঠে আসছে মহান, মনকাড়া ও পূর্ণাঙ্গ একটি শ্রেষ্ঠ সুর—সেটি ত্যাগের। ত্যাগ কর! এ-ই হলো ভারতবর্ষের সকল ধর্মের মূল কথা। এই জগৎ দুদিনের মায়ামাত্র। বর্তমান জীবন পাঁচ মিনিটের। এই মায়ার জগতের পিছনে রয়েছে অনন্তের রাজ্য; এস, তাকে খোঁজা যাক। আমাদের এই মহাদেশ আলোকিত করে রয়েছেন এমন সব মহাতেজস্বী, মহনীয় মানস-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাধর মানুষ, যাঁরা এই তথাকথিত 'অসীম' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও গোষ্পদের মতো তুচ্ছ বোধ করে তাকে ছাড়িয়ে চলে গেছেন দূরে—বহুদূরে। তাঁদের কাছে কাল—এমনকি অনন্ত কালেরও কোন অস্তিত্বমাত্র নেই। কালকে ছাড়িয়ে তাঁরা অগ্রসরমান। দেশ বা স্থানও তাঁদের কাছে কিছুই নয়; তাকেও তাঁরা ছাড়িয়ে চলে যেতে চান। এবং নশ্বর জগৎকে এই ছাড়িয়ে যাওয়াই হলো ধর্মের আদি ও মূল সত্য। আমার জাতির বিশেষত্বই হলো এই অতীন্দ্রিয়বাদ, ছাড়িয়ে যাওয়ার এই সংগ্রাম, এই সাহস—যা প্রকৃতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে যে করেই হোক, যত বিপদের মধ্য দিয়েই হোক, যেকোন মূল্য দিয়েই হোক, পরপারের বস্তুটিকে এক ঝলক 'দেখে' নিতে চায়। এ-ই আমাদের আদর্শ; তবে দেশের সমস্ত মানুষ কখনোই সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনি যদি তাঁদের উৎসাহিত করতে চান, তো তার উপায় আছে। আপনার রাজনীতির কথা, সামাজিক পুনর্গঠনের কথা, টাকা করার কথা বা ব্যবসাদারির কথা—সবই এদেশে হাঁসের গা থেকে জলের মতো গড়িয়ে পড়ে যাবে। জগৎকে তাই এই আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাই প্রদান করতে হবে। আমাদের কি আর অন্য কোন কিছু শিখতে হবে? জগতের কাছ থেকে আমাদের কি আদৌ কিছু শেখার আছে? বোধহয় আমাদের বস্তুজগতের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; সেইসঙ্গে প্রয়োজন সংগঠনশক্তির, সুসংহতরূপে

ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারার দক্ষতার ও সামান্য উৎস থেকেও শ্রেষ্ঠ ফল বের করে আনার পারদর্শিতার। এগুলোই বোধহয় আমাদের পাশ্চাত্য থেকে কিছুটা পরিমাণে শেখার আছে। কিন্তু কেউ যদি ভারতবর্ষে 'খাও দাও আর ফূর্তি কর'-র আদর্শ প্রচার করে, যদি কেউ পার্থিব বস্তুজগতের ওপর জোর করে ঈশ্বরত্ব আরোপ করতে চায়, তবে সে-লোক মিথ্যাবাদী; এই পুণ্যভূমিতে তার কোন স্থান নেই; ভারতীয় মানসিকতা তার কথায় কর্ণপাত করতে চায় না। হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য, বাহার আর চমক থাকুক, ক্ষমতার যত অনবদ্য বহিঃপ্রকাশই থাকুক, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি তাদের মুখের ওপর বলে দিচ্ছি—এসবই বৃথা। চূড়ান্ত বৃথা। কেবল ঈশ্বরই আছেন। কেবল আত্মাই আছেন। কেবল আধ্যাত্মিকতাই আছে। সেটিকে ধরে থাক।

"তবে, কিছু পরিমাণে বস্তুতান্ত্রিকতা প্রয়োজন। আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনের কথা ভেবে একধরনের 'হালকা বস্তুতান্ত্রিকতা' তৈরি করে নিতে পারলে বোধহয় তা আমাদের এমন অনেক দেশবাসীর কাছে আশীর্বাদ বহন করে আনবে, যারা এখনো উচ্চতম সত্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়। প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সমাজে এব্যাপারে একটা ভুল করা হয়ে থাকে। এখন, বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যে-ভারতবর্ষে এই বিষয়ে যথাযথ বোধ ছিল, সেই ভারতবর্ষেও সাম্প্রতিককালে যেসব মানুষ উচ্চতম সত্যের জন্য প্রস্তুত নয়, তাদের ওপরেও সে-সত্য চাপিয়ে দেওয়ার ভুলটা করা হয়েছে।... তা না হলে আজ ভারতবর্ষে যে দারিদ্র্য ও দুর্দশা দেখা যাচ্ছে, তার অনেকটাই থাকত না। গরিব মানুষকে এমন কিছু অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে, যেগুলির তার জীবনে কোন ব্যবহারই নেই। অতএব হাত সরিয়ে নাও। গরিব মানুষটা একটু ভোগ করুক, তারপর সে নিজেই নিজেকে টেনে তুলবে ও ত্যাগ আপনিই তার জীবনে আসবে। বোধহয় এই দিক দিয়ে আমাদের পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে কিছু শেখার আছে।...

"কিন্তু মনে রেখ, হিন্দু হিসেবে আমাদের অন্য সবকিছুকে নিজেদের জাতীয় আদর্শের নিচে রাখতে হবে।... প্রত্যেক হিন্দু শিশুর জন্মগত যে কেন্দ্রীয় ভাব অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয় পবিত্রতা, সেটিকে ধরে রাখা, এবং অন্য সবকিছুকে—তার ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞান, তার নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা—সবকিছুকে সেই কেন্দ্রীয় ভাবের অধীনস্থ রাখাই হলো প্রকৃত হিন্দুর আসল চরিত্ররহস্য।... যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনের এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি ব্যাহত না হয়, ততদিন কিছুই আমাদের জাতিকে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু মনে রেখ, যদি তোমরা আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পিছনে ছোট যা তোমাদের বস্তুবাদীতে পরিণত করতে চাইছে, তবে তিন প্রজন্মের মধ্যে তোমরা একটি বিলুপ্ত জাতিতে পরিণত হবে; কারণ, জাতিটার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে, যে-ভিত্তির ওপর জাতীয়তার সৌধ গঠিত তার অবমাননা করা হবে—এবং ফল হবে সার্বিক বিনাশ।...

"অতএব, তোমরা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস কর বা না কর, জাতীয় জীবনের স্বার্থে তোমাদের আধ্যাত্মিক হতে হবে ও সেটি বজায় রাখতে হবে। তারপর অপর হাত প্রসারিত করে দিয়ে অন্যান্য জাতির কাছ থেকে যতটা পারা যায় ততটা আহরণ কর। কিন্তু এসবকিছুকে জীবনের সেই একটি আদর্শের অধীনে রাখতে হবে; আর তা থেকেই আসবে এক অসামান্য, প্রোজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ। আমি নিশ্চিত যে, সে-ভারত আসছে; অতীতে ভারত যত মহান ছিল, তার চেয়েও মহৎ হবে সে ভবিষ্যৎ ভারত। প্রাচীন ঋষি-কুলের চেয়ে মহত্তর ঋষিকুল জন্ম নেবেন সেই ভারতভূমিতে।"

ভারতবর্ষে আমাদের সেই দর্শন আছে, যা আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকতাকে সংযত করতে পারে। প্রথমত, আমাদের দর্শনে মানুষের সেক্যুলার ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গীতা মানুষের জীবনকে এক অখণ্ড অস্তিত্বরূপে দেখার শিক্ষা দেয়। এই শাস্ত্র জৈব স্তরে সীমাবদ্ধ মানুষে কোন দোষ দেখে না। সে-জীবনকে বৈধ ও প্রামাণ্য বলে ধরা হয়—যেমন ধরা হয় মানুষের আন্তর অধ্যাত্মজীবনকেও। জীবন সম্বন্ধে আংশিক ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রামাণ্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ও গীতার মতো শাস্ত্রগ্রন্থের আধ্যাত্মিক শিক্ষায়। এটিই আবার স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনেরও বিশেষ শক্তি। স্বামীজীর বাণী ও রচনার ভূমিকায় এই কথাগুলি উঠে এসেছে তাঁরই আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে—

"বহু এবং এক আসলে সেই একই সত্য—মন যাকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করে থাকে। অথবা, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একই কথাকে প্রকাশ করতেন তাঁর মতো করে—ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকারও। আবার তিনি তা-ই, যার মধ্যে সাকার-নিরাকার দুই-ই আছে।

"এটিই আমাদের গুরুদেবের জীবনকে দান করেছে তার শ্রেষ্ঠতম তাৎপর্য, কারণ এখানেই তিনি হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এক মিলনবিন্দু—শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নয়, অতীত ও ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক যদি বাস্তবিকই এক অভিন্ন সত্য হয়ে থাকে, তবে কেবল সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতিই নয়, একইভাবে সবরকম কাজ, সবরকম সংগ্রাম, সর্বপ্রকার সৃষ্টিও উপলব্ধির একেকটি পথবিশেষ। অতএব, 'সেক্যুলার' ও 'ধর্মীয়' বা 'পবিত্র'—এ-দুয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নয়। পরিশ্রম করা মানেই প্রার্থনা করা। জয় করা মানেই ত্যাগ করা। জীবনই ধর্ম। নিজের কাছে কিছু রাখা ও সেটিকে রক্ষা করায় ততটাই প্রত্যয় লাগে যতটা লাগে কোন কিছুকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে ত্যাগ করায়।

"এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে পরিণত করেছে সেই কর্মের মহান প্রচারকে, যে-কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিযুক্ত নয়, বরং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশক। তাঁর কাছে ঈশ্বর ও মানুষের মিলনস্থল হিসাবে কারখানা, পড়ার ঘর বা খেতখামার ঠিক ততটাই যথার্থ ও উপযুক্ত, যতটা কিনা সাধুর কুঠিয়া কিংবা মন্দিরের প্রবেশদ্বার। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য নেই মানবসেবা ও ঈশ্বর উপাসনায়, পৌরুষ ও বিশ্বাসে, যথার্থ ন্যায়ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর সমুদয় বাণীই হলো এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের ভাষ্যস্বরূপ। তিনি একবার বলেছিলেন, 'কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম হলো একই সত্যকে প্রকাশের তিনটি পন্থামাত্র; তবে তা বুঝতে গেলে আমাদের কাছে থাকতে হবে অদ্বৈততত্ত্ব।' "

অতএব ভারত যে নিজের আত্মাকে না হারিয়ে আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ উত্তীর্ণ হয়ে শিল্প-বাণিজ্যের শক্তি গড়ে তুলবে, তার সম্ভাবনা আছে এবং রীতিমতো ভাল সম্ভাবনাই আছে। এই প্রশ্নটা উঠে এসেছিল এমন একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করে, যা আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য বহু দেশে আমাদের বন্ধুদের চিন্তার অন্যতম বিষয়। তাই তাঁরা বারেবারে এ-প্রশ্নে ঘুরেফিরে এসেছেন। [ক্রমশ]

কয়াপাট

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানগুলির যে-বর্ণনা পরিবেশন শুরু করেছিলেন প্রয়াত নির্মলকুমার রায়, তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পঞ্চত্রিংশতম পর্যায়।
—সম্পাদক

গ্রামের নাম কয়াপাট। বদনগঞ্জ হাটতলার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের ভিতরে দেবাদিদেব মহাদেব বসে রয়েছেন গম্ভীরার মধ্যে। শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় ভক্তগণ জল ঢালেন আর গাজনের সময় আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে মন্দির-প্রাঙ্গণ। মন্দিরের সামনে আটচালা। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা থাকে বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে। মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি পতিত ভূখণ্ড—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কেউ বলেন, অতীতে ঐ ভূখণ্ডের ওপর ছিল একটি আটচালা আর তাতেই হতো 'পিলে দাগানো'। কেউ বলেন, যজ্ঞেশ্বর শিবের আটচালায় হতো সেটি। অতীতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা 'প্লিহা' (চলিত শব্দে 'পিলে') দাগাতে আসতেন এই দেবদেউলে। ভক্তেরা রোগ নিরাময়ের প্রার্থনায় এসে হাজির হতেন এই মন্দিরে। আগে তাঁরা শিবের চরণে পূজা দিতেন; তারপর হতো প্লিহা দাগানো পর্ব। ম্যালেরিয়া রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ প্লিহার বৃদ্ধি, তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলে 'স্প্লেনোমেগালি'। আজকের প্রজন্মের কাছে প্লিহা দাগানো কষ্টকল্পিত বিষয়। বর্ধিত প্লিহাকে সংযত করতে আগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্লিহার ওপর গরম কাঠির ছেঁকা দেওয়া হতো। তাতে অনেকে সুস্থ হতেন। তাই সেটি ছিল সেযুগে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের বড় দাওয়াই। শ্রীশ্রীমা প্লিহা দাগাতে এই কয়াপাট হাটতলায় যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দিরে এসেছিলেন।
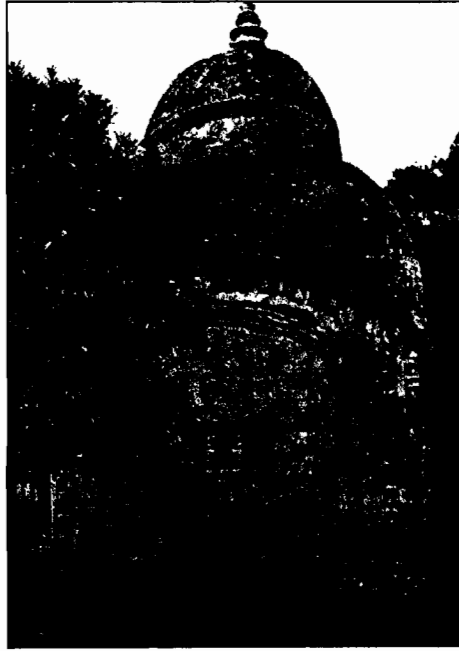
কয়াপাটে যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির

স্বামী গম্ভীরানন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ "শ্রীমায়ের সময় তখন (১২৮২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন/১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি) খুবই মন্দ বলিতে হইবে; কারণ শারীরিক ব্যাধি ও পারিবারিক শোক হইতে মুক্তি পাইবার পূর্বেই তিনি পুনর্বার ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িলেন। প্লিহা বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে কয়াপাট বদনগঞ্জে গিয়া উহা দাগাইতে হইল। এই দাগানো ব্যাপারটা সেকালের এক বিকট গ্রাম্য চিকিৎসা। উহাতে রোগের উপশম হইত কিনা নির্ধারণ করা কঠিন; কিন্তু রোগীর পক্ষে উহা অশেষ যন্ত্রণাদায়ক ছিল। স্নানের পর রোগীকে শোয়াইয়া তিন-চারিজন লোক তাহার হাত-পা চাপিয়া ধরিত, যাহাতে সে উঠিয়া না পালায়। তারপর এক ব্যক্তি একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়া পেটের উপরকার কতকটা জায়গা ঘষিত। উহাতে চামড়া পুড়িয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিত। শোনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরও প্লিহা দাগাইবার জন্য কয়াপাটের হাটতলায় গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া কয়াপাটের হাটতলায় যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার শিবমন্দিরে অন্য লোকের ঐরূপ প্লিহা-চিকিৎসা চলিতেছিল। শ্রীমা সব দেখিলেন এবং রোগীদের আর্তনাদও শুনিলেন। যথাসময়ে তিনি স্নান সারিয়া আসিলে জনকয়েক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেল। কিন্তু মা বলিলেন, 'না, কাউকে ধরতে হবে না; আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে থাকব।' বাস্তবিকই তিনি সে অমানুষিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিলেন। পরে যেকোন কারণেই হউক, প্লিহাবৃদ্ধি সারিয়া গেল।"[১]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন ঃ "কয়েকজনের কাজ হইয়া যাওয়ার পর, যে প্লিহা দাগায় তাহাকে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, 'বাবা, বেলা হয়েছে, তুমি চান করে এই নূতন কাপড়খানি পর, একটু জল খাও; আর ঐ পাতা আগুনে ফেলে দিয়ে, সব নূতন করে নিয়ে, আমার মেয়েটির পীলে দেগে দাও।' সহনশক্তিময়ী মা প্রবোধবাবুকে বলিয়াছিলেন, প্লিহা দাগাইবার সময় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই, একটু লাগিয়াছিল মাত্র।"[২]

কয়াপাট প্রসঙ্গে স্বামী প্রভানন্দের লেখনীতে বিশেষ তথ্য লক্ষ্য করা যায় ঃ "শুধুমাত্র শিহড় গ্রামে নয়, আশপাশের

কয়েকটি গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য। জনশ্রুতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা। এরকম একটি গ্রাম কয়াপাট। গোঘাট থানার অন্তর্গত। এগ্রামের পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা। কয়াপাটের হাটতলায় যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির ও তার সম্মুখেই নাটমন্দির। সম্ভবত শিহড় থেকে ঠাকুর সাড়ে তিন মাইল পথ পালকিতে চেপে এখানে এসেছিলেন এবং নাটমন্দিরে সঙ্কীর্তনে যোগদান করেছিলেন। কয়াপাট বাসস্ট্যাণ্ডের পশ্চিমে থানার উলটোদিকে ভুবনেশ্বর শিবের আটচালা। সেখানে পিলে দাগা হতো। এখানেই শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ কয়েকজনের মতে যজ্ঞেশ্বর শিবের নাটমন্দিরে শ্রীমায়ের পিলে দাগানো হয়েছিল।"[৩] যজ্ঞেশ্বর
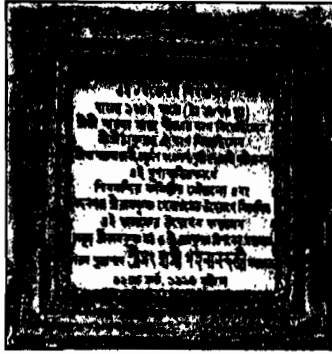
১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ উদ্বোধিত প্রস্তরফলক
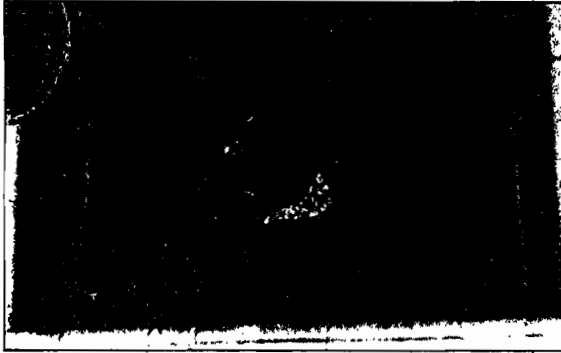
যজ্ঞেশ্বর শিবলিঙ্গ

শিবমন্দিরের দেওয়ালের ফলকে শিবমন্দিরের আটচালায় পিলে দাগানের কথা লেখা আছে। ঐ অঞ্চলের প্রবীণরা জানান, যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরের ডানদিকের (বর্তমানে ফাঁকা জায়গা) একটি আটচালায় পিলে দাগানো হতো। কয়াপাটের হাটতলায় যে পিলে দাগানো হতো, সেই কাজে ব্রতী থাকতেন কৃষ্ণগঞ্জের গড়েরা। এই পিলে দাগানোয় পাকা বৈদ্য ছিলেন তারাপদ গড় ও গুঁইরাম গড়। এই কাজের জন্য তাঁরা পাঁচপো চাল ও পাঁচ পয়সা পারিশ্রমিক নিতেন। প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় পিলে দাগানো হতো।[৪] প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই অঞ্চলকে কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা করেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে যে খোলবাদক ছিলেন, তাঁর নাম রাইচরণ দাস। তাঁর বাড়িও ছিল এই কৃষ্ণগঞ্জে।

সমকালে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, কয়াপাট প্রভৃতি অঞ্চল ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত ছিল। 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ঃ হুগলি' গ্রন্থে ওম্যালি জানিয়েছেন ঃ "During the third quarter of the 19th century the district was devastated by a peculiar type of malignant malaria fever. It was commonly known as 'Burdwan fever', though Hooghly suffered as much as Burdwan. It was endemic and became epidemic gradually. In its worst phases the fever assumed a tendency to congestion of some vital organs, most commonly the brain and lungs along with the enlargement of liver and spleen."[৫]

সমকালে ম্যালেরিয়া রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা ছিল না। দেবতার কাছে মানত ও গ্রাম্য চিকিৎসার ওপরই নির্ভর করতে হতো গ্রামের মানুষদের। কয়াপাট হাটতলায় পিলে দাগানোয় শ্রীশ্রীমা যে সহনশীলতা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা বাস্তবিকই অসাধারণ। শতবর্ষ পূর্বের সেই স্মৃতি বহন করে যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির আজও দণ্ডায়মান কয়াপাট হাটচত্বরে। এই ভূখণ্ডের নিকটেই বদনগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, বেলডিহা, শ্যামবাজার প্রভৃতি গ্রাম। এই গ্রামগুলিই একদা ঠাকুরের কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। কয়াপাট গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর দৈবীস্পর্শ। ❑

পথনির্দেশ ঃ কামারপুকুর চটি থেকে বদনগঞ্জগামী বাসে চেপে বদনগঞ্জ হাটতলা। তারই নিকটে যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির ও আটচালা।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৭, পৃঃ ৪৭
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৬, পৃঃ ২৫
৩ অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৮, পৃঃ ১২৪
৪ হরিহর দে (শ্যামবাজার, বয়স ৮৫ বছর); হরিসাধন কুণ্ডু (বদনগঞ্জ, বয়স ৯০ বছর) এবং নিতাই দাস (কয়াপাট, বয়স ৮৩ বছর)
৫ Bengal District Gazetteers: Hooghly—L. S. S. O'Malley, The Bengal Secretariate Book Depot, 1912, p. 127

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বস্তুত একটি সমন্বয়মন্ত্র

স্বামী ঋতানন্দ*

উপনিষদের মহাবাক্যগুলি হলো সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানলব্ধ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। পরমেশ্বর শ্রীভগবান নিত্য সত্য হলেও তাঁর অবতার যুগপ্রয়োজনে বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষকে সেযুগের উপযোগী পথ দেখাতে মানুষ-রূপে জগতে অবতীর্ণ হন। তাই দৈবী ও মানব ভাবের সুসমন্বয়ে গড়া অবতারের জীবন।

"জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"—এযুগে মহাবাক্যটি উচ্চারণ করেছেন ভাবসমাধি থেকে ব্যুত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ।[১] পূর্ব পূর্ব অবতারের নির্দেশাবলির মধ্যে ছিল—'জীবে দয়া'। এযুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 'জীবে দয়া'কে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে বললেন—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম কুশল শ্রোতা নরেন্দ্রনাথ—পরবর্তী কালের স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ একটি 'জীবন' যাপন করেছিলেন এবং তিনি সে-জীবনের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তত্ত্ব এবং স্বামীজী সে-জীবনের বা তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বা ভাষ্যকার। সেজন্য তিনি 'প্রফেট'।

স্বামীজী ঘোষণা করেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মধ্যে তিনি অদ্ভুত আলোক পেয়েছেন। কী সেই আলোক? তাঁর মতে—

(১) কথাটির মধ্যে শুষ্ক বলে কথিত বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি সম্মিলিত রয়েছে এবং কথাটির মধ্য দিয়ে ঠাকুর সহজ, সরস ও মধুর আলোক প্রদর্শন করেছেন।

(২) ঠাকুরের কথায় বোঝা গেছে—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন করা যায়।

(৩) শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে সাধক স্বল্পকালের মধ্যে নিজেকেও চিদানন্দময় শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব ঈশ্বরের অংশ বলে ধারণা করতে পারেন।

(৪) ঠাকুরের ঐকথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখতে পাওয়া যায়। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন করে যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হয়।

(৫) কর্মযোগ বা রাজযোগ অবলম্বনে যেসকল সাধক অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরাও ঐকথায় বিশেষ আলোক পাবেন। কারণ, কর্ম না করে দেহী যখন একদণ্ডও থাকতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপে কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং তা করলেই লক্ষ্যে আশু পৌঁছানো যায়, একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা। তিনিও পূর্বোক্ত ঘটনাটি এবং সে-সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মনোভাবকে বিবৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, লোকোত্তর ঠাকুর এরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবেশ করে জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোকপাতে প্রতিনিয়ত মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ—উভয়ের মতেই শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোদ্ধৃত কথাটি হলো দিঙ্‌নির্দেশক একটি সমন্বয়মন্ত্র। মন্ত্র হলো—গূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতির মানবীয় ভাষায় সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। মন্ত্রটি এতই সংক্ষিপ্ত যে, তাকে সূত্রই বলা চলে। আর সূত্র ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কারণ, সকলে সূত্রে নিগূঢ় অর্থ বুঝতে সক্ষম নয়। তাই স্বামী সারদানন্দ স্বীকার করেছেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনল বটে, কিন্তু তার দুর্জ্ঞেয় মর্ম কেউই তখন বুঝতে ও ধারণা করতে পারেনি। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাইরে এসে তা ব্যক্ত করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো সেদিন যা শুনেছেন সেই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করবেন—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্যটিকে নরেন্দ্রনাথ-প্রাপ্ত আলোকে আমরা আরেকটু আলোচনা করব 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটি শুধু একটি সমন্বয়মন্ত্র নয়; দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—সকলপ্রকার মতের সাধকের পক্ষে একটি সাধনপথও বটে।

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেনঃ "মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয়, তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে

* *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী, গবেষক ও সুলেখক।*

অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম—সব একাকার।...

"ঠাকুর বলিতেন, 'যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো—ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।' অর্থাৎ মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ, ঐভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত, বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝানো যাইবে? অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বারবার বলিতেন, 'ওরে ওটা শেষকালের কথা।' অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, 'যতক্ষণ আমি-তুমি, বলা-কহা প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা—দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে।"[২]

এখন প্রশ্ন ওঠে, কার্যে ও ব্যবহারে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের উপযোগিতা কোথায়? অদ্বৈতবেদান্ত-মতে জীবত্ব মিথ্যা, অধ্যস্তমাত্র। জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব। মোক্ষ জীবের লক্ষ্য। যেহেতু জীব স্বরূপত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ, সেহেতু ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই মুক্তির কারণ। আত্মার ওপর মনের মালিন্য বা অজ্ঞানের আবরণের দরুন স্বতঃপ্রকাশ আত্মা যেন আবৃত হয়ে রয়েছে। অজ্ঞানের আবরণভেদ বা মনের মালিন্য চলে গেলে আত্মা স্বতই প্রকাশিত হন। তাই কঠোর অদ্বৈতবাদীদের মতে, অদ্বৈতের সাধন নেই। কারণ, আত্মা বা ব্রহ্ম অকৃত, কৃত নন। কোন কর্মের দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা যায় না। তিনি নিত্য। সুতরাং নিরঙ্কুশ অদ্বৈতজ্ঞান (absolute knowledge)—অব্যবহার্য—যার ব্যবহার সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, চরম সত্য কখনোই ব্যবহারোপযোগী হতে পারে না। অন্যদিকে এও দেখি, এক অভিনব কর্ম-দর্শন জগতের সামনে উপস্থাপন স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক ভাবনার একটি বিশিষ্ট অবদান। তা একইসঙ্গে সনাতন বেদান্তের সিদ্ধান্তকে অঙ্গীকার করে। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মধ্যে যে বিশেষ আলোক তিনি পেয়েছিলেন তা জগতে প্রচার করার এ এক অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টা। কারণ, তাঁর মতে, সেই সমাজই সর্বোচ্চ যেখানে সর্বোত্তম সত্যগুলি বাস্তবরূপ ধারণ করে।[৩]

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞানাবস্থা এবং জ্ঞান-চর্চা দুটি পৃথক ব্যাপার। একটি সাধ্য, অপরটি সাধন। একথা জ্ঞানমার্গে প্রসিদ্ধ যে, জ্ঞানাবস্থায় কর্মের প্রবেশ বা জ্ঞান-কর্মের সহাবস্থান আলো-আঁধারের মতোই অকল্পনীয় ও অসম্ভব। জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় অসিদ্ধ। কিন্তু সাধনাবস্থায় সেবায় অধিকার সর্বমতসিদ্ধ ও অনুমোদিত। সাধ্য বা আদর্শ হিসাবে জ্ঞানকে সামনে রেখে অর্থাৎ জীবের স্বরূপ যে ব্রহ্মত্ব, সেটিকে মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আত্মার ওপরে আরোপিত অজ্ঞান বা মলিনতা দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্নের স্থান যে রয়েছে তা জ্ঞানমার্গেও স্বীকৃত। একেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন: "ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তা কর।"[৪] এখানেই সেবার প্রাসঙ্গিকতা। এখানেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সাধন। কারণ, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানের পূর্বশর্ত। চিত্তশুদ্ধি থেকে অজ্ঞাননিবৃত্তি। অজ্ঞান নিবৃত্ত হলেই জ্ঞানের স্বত উদয়। অদ্বৈতজ্ঞানের আচার্য শঙ্করের এই মত।

স্বামীজী একটু এগিয়ে বললেন—চিত্তশুদ্ধি নিঃশেষে নিষ্পাদিত হলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং জ্ঞানের উদয় ইত্যাদি মধ্যবর্তী সোপানের কল্পনার অবকাশ কোথায়? আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রকাশ। তাই চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মা স্বতই প্রকাশিত—এটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের নিশ্চয়াত্মক উক্তি: "শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা একই জিনিস।"[৫] অতএব দেখা গেল, আত্মজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা হলো চিত্তশুদ্ধি। আর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' চিত্তশুদ্ধির সাধন অর্থাৎ এটি অদ্বৈত-মতে স্বীকৃত অজ্ঞান নিরাকরণেরই সাধন।

যেহেতু অদ্বৈত-মতে জীব এবং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নেই, সেহেতু অদ্বৈতানুভূতির বৈশিষ্ট্য হলো সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি বা একত্বানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অনেক ঘটনাতেই এটি লক্ষ্য করা গেছে। এক মাঝি অপর এক মাঝির পিঠে চপেটাঘাত করাতে তাঁর পিঠে চপেটাঘাতের চিহ্ন; কেউ ঘাস মাড়িয়ে গেলে তাঁর বুকে ব্যথা অনুভব অথবা গাছের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে আসায় গাছকে চৈতন্যময় দেখা—ইত্যাদি সেই একত্বানুভূতিরই পরিচায়ক।

যাইহোক, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলন এবং তাঁর মতে, এর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অতীব সহজ, সরল ও মধুর আলোক প্রদর্শন করেছেন। এর কারণটিও নরেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মতো দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এত কাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।"[৬] স্বামীজী সমগ্র জীবন ধরে এই কাজটিই করেছেন। ৫ জুন ১৮৯৬ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেনঃ "আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।"

বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম জীব-জগৎবিশিষ্ট। জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে অংশ-অংশী বা অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ এই দিকটিরও সন্ধান পেয়েছেন এবং এপথে উক্ত উদ্ধৃতিটি সাধকের সিদ্ধিলাভের পথে এক পরম সহায়ক সাধন—একথা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎ-রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।"[৭]

স্বামীজী-কথিত এই সাধন-প্রক্রিয়াটি অজ্ঞানী বা প্রবর্তক সাধককে কিভাবে সিদ্ধাবস্থায় উপনীত করে, তারই বিবৃতি। আবার বিশিষ্টাদ্বৈত পথে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কার্যটি সিদ্ধের জীবনেও অব্যাহত থাকে। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ সেরকম সিদ্ধকে 'সিদ্ধের সিদ্ধ' বলেছেন। অন্যত্র তাঁকে বলেছেন 'বিজ্ঞানী'। তাঁর কথায়ঃ "ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে—তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।... বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ-সংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।... যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান—এসব তাঁর ঐশ্বর্য।"[৮]

"জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।... ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে, সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।"[৯]

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আমরা পেলাম, ছাদে অর্থাৎ অদ্বৈতভূমিতে অনেকক্ষণ সাধক থাকতে পারেন না, আবার নেমে আসেন। যাঁরা সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। কিন্তু সকলে নেমে আসতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তের একটি মতে, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সমন্বিত অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় এবং জীবের দেহ হলো অবিদ্যার কার্য। তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ হলে অজ্ঞানের কার্য দেহ থাকে না, তার পতন হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের পর জীবের দেহ থাকতে পারে না। তাঁদের মতে, জীবন্মুক্তি অলীক, আলো-আঁধারের সহাবস্থানের মতোই অসম্ভব। অপর একটি মতে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি সাধারণ জীবের পক্ষে সত্য। কিন্তু কিছু আধিকারিক পুরুষ—ঈশ্বরাবতার, অবতারের লীলাসঙ্গিনী, ঈশ্বরকোটি পুরুষ প্রমুখের ক্ষেত্রে ঐ সাধারণ সিদ্ধান্ত

প্রযোজ্য নয়। তাঁরা জগৎকল্যাণের জন্য ঈশ্বরতত্ত্ব (বা ব্রহ্মজ্ঞান) এবং শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণের জন্য 'জ্ঞানের আমি', 'ভক্তির আমি', 'দাস আমি' ইত্যাদির যেকোন একটিকে অবলম্বন করে জ্ঞানলাভের পরেও নেমে আসেন এবং প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দেহ থাকে। তাঁদেরই শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিজ্ঞানী' বলে নির্দেশ করেছেন।

কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), পরবর্তী কালে স্বামী তপস্যানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাত্ত্বিকগণ শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাবমুখে' অবস্থানের শুরু থেকে তাঁর পরবর্তী জীবনটিকে 'বিজ্ঞান' অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন এবং বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে নির্দেশ করেছেন। শিবক্ষেত্র বারাণসী যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথধামে দরিদ্র সাঁওতালদের মধ্যে স্বয়ং শিবকে দর্শন করে তাদের মধ্যে তাঁকে সেবা করা; যুবক ভক্তদের মধ্যে নারায়ণকে দেখা; মোমের ঘর-বাড়ি, মোমের গাছপালা দর্শনে সর্বত্র চৈতন্য জরে আছে অনুভব করা ইত্যাদি এসময়কার তাঁর বিজ্ঞানী দৃষ্টির কয়েকটি নমুনা। নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন ঃ "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।"[১১] নির্বিকল্প সমাধি থেকে উঁচু অবস্থা হলো, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করে তার সেবা করা। আর সেটিই হলো বিজ্ঞানীর লোককল্যাণের জন্য সেবা। 'আত্মজ্ঞান লাভ হলেও কি কর্ম থাকে?'—শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরূপ কর্ম থাকে না। তখন কর্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন-বলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ'—এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'।"[১২]

দ্বৈতমতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ তিনটিই সত্য এবং প্রত্যেকেই পৃথক। সেখানেই প্রকৃতপক্ষে সেবার অধিকার ও প্রাসঙ্গিকতা। তাই প্রবর্তক সাধকের পক্ষে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সহজতম সাধন। শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ শিলায় যেমন দেবত্ব আরোপ করে নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর সেবা-পূজা করা হয়, তেমনি জীবের মধ্যে শিবকে ভাবনা করে জীবের যেকোন অভাব মেটানোর চেষ্টাই শিবের সেবার অন্তর্গত। ঠাকুরের ঐকথায় ভক্তিপথেও যে বিশেষ আলোক দেখা যায়, সেপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত; শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তি লাভ করে সাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হবে—একথা বলাই বাহুল্য। 'ভাগবত'-এ একটি শ্লোকে (১১।২।৪৫) বলা হয়েছে ঃ

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ সর্বভূতে যিনি ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, ভগবানে সর্বভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, যিনি আত্মাতে সর্বভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, সর্বভূতে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন—তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজে বলেছেন ঃ "কেবল এমনটা কি? চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলে নাই।"[১৩] অর্থাৎ চোখ বুজে কাকে দেখছি? সর্বত্রই তো তিনি! এই কথাটিই স্বামীজী আরেকটু অন্যভাবে বলেছেন ঃ 'সর্বভূতে সেই প্রেমময়'। তাঁকে মন্দিরে, মসজিদে কি একটি বিগ্রহে বা একটি প্রতীকের মধ্যে খুঁজছ? তিনি কি সর্বত্র বিরাজিত নন? এই মনোভাব সাধককে ভক্তির পরাকাষ্ঠাতে নিয়ে যায়। তা যখন ব্যাহত হয়, যখন আর এগোতে না পেরে কোথাও সীমিত হয়ে আমরা আটকে পড়ি, ভক্তির হানি হয়; তখনি আমরা ভক্তিকে উন্নত না করে অবনত করি। আর তখনি নানারকম আচারবিচার, বিধিনিষেধের অভ্যাস দ্বারা নিজেদের বদ্ধ করে ফেলি। আসল কথা, ভক্তি বদ্ধ করে না, মুক্ত করে। এত দূর মুক্ত করে যে, শাস্ত্রের বন্ধন থেকেও মুক্ত করে নিয়ে যায়। জ্ঞানের মতো ভক্তিও বন্ধন মোচন করে। আর ভক্তিপথে তাই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সহজতম সাধন।

আবার, নরেন্দ্রনাথের মতে, কর্ম বা রাজ-যোগ অবলম্বনে যেসকল সাধক অগ্রসর হচ্ছেন তাঁরাও ঐকথায় বিশেষ আলোক পাবেন। কারণ, কর্ম না করে মানুষ যখন একদণ্ডও থাকতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মই যে কর্তব্য এবং তার ফলেই যে তারা লক্ষ্যে পৌঁছাবে—একথা বলা বাহুল্য। আমরা জানি, সমস্ত সাধনে সিদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি অসাধারণ উপলব্ধি হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে একটি হলো—কর্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ "সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবত ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না।... অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু কার্য বড়লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।"[১৪] যেকোন কর্ম যা আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে

সহায়ক, তা-ই স্বামীজীর মতে ধর্মীয় কর্ম বা কর্মযোগ। সুতরাং উদ্দেশ্যের ব্যাপ্তিতে সকল কর্মই আধ্যাত্মিক, কোনটিই শুধু ঐহিক নয়। স্বামীজী কর্মকে চরম জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু যেকোন কর্মই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশে সমর্থ এবং জীবের সেবা মূলত শিবের বা ঈশ্বরেরই সেবা, সেহেতু কোন কর্মই তাঁর মতে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করে না, বরং কর্ম বা সেবা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি স্থায়ী মাধ্যম। যখন মানুষ অনৈতিক কাজ করে, তখন সেই দেব-ভাবটি আবৃত হয়ে তার দেবত্বকে প্রকাশ করতে দেয় না, ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রকৃত বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘটে তখন, যখন আমাদের আত্মা বা স্বরূপ থেকে আমরা আমাদের বুদ্ধি বা মনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখি।

"বুদ্ধের প্রাচ্যের জন্য যেমন একটি বাণী ছিল, আমার রয়েছে পাশ্চাত্যের জন্য।"[১৫]—বলেছেন স্বামীজী। পাশ্চাত্যের জন্য কি সেই বাণী? স্বামীজী দেখেছেন, পাশ্চাত্য তীব্র কর্মপ্রবণ কিন্তু সেখানে রয়েছে গভীর অন্তর্মুখিনতা ও আধ্যাত্মিকতার অভাব। পাশ্চাত্যের কর্মপ্রবণতাকে কর্মযোগে পরিণত করে জীবনকে আধ্যাত্মিকতামুখী করা, অনেকের মতে, স্বামীজীর পাশ্চাত্যের প্রতি বাণী। আর তার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাক্য—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

আমরা দেখলাম, কিভাবে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত-মতে সাধনরূপে গণ্য হতে পারে। এর পিছনে রয়েছে একটি নিগূঢ় সত্য। তা হলো—উক্ত তিনটি মত প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। এটিও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম একটি উপলব্ধি। লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত-মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বত এসে উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলতেন, তারা পরস্পরবিরোধী নয়, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা-সাপেক্ষ। অর্থাৎ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-মত মানুষকে অবস্থা-ভেদে অবলম্বন করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এবিষয়ে উক্তি:

"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।"

"মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!"

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ-পঞ্চরাত্রের উপদেশমতো উচ্চ নামসঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।"[১৬]

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত-মতকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির পথে এক একটি সোপান বলে বর্ণনা করেছেন।[১৭]

স্বামীজী একবার তাঁর বন্ধু হরমোহন মিত্রকে বলেছিলেন যে, ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যেতে পারে।[১৮] কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছেন—"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই।"[১৯] বাস্তবিকই, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁরই অননুকরণীয় গল্পের সেই 'আশ্চর্য রঙওয়ালা'। ❑

তথ্যসূচি

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ফাল্গুন ১৪০১, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩১
২ ঐ, ১ম ভাগ, শ্রাবণ ১৪০০, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫৭
৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১৪০৭, পৃঃ ২৮
৪ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব, পৃঃ ৫৬
৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ৮৫৭
৬ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩১
৭ ঐ
৮ কথামৃত, পৃঃ ৫৪
৯ ঐ, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৫
১০ ঐ, পৃঃ ৩৭০
১১ ঐ, পৃঃ ১১১৬
১২ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৪০৬, পৃঃ ১১৭
১৩ কথামৃত, পৃঃ ৯৪৯
১৪ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাবের শেষকথা, পৃঃ ২১৬
১৫ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V, p. 314
১৬ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাবের শেষকথা, পৃঃ ২১৫-২১৬
১৭ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০ এবং ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩
১৮ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে, পৃঃ ১
১৯ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৫০

পাশাপাশি ঃ (১) যতাত্মবান্, (৩) তত্ত্ববিৎ, (৫) অত্র, (৬) তদ্দানং, (৭) সিদ্ধিং, (৮) ভাবা, (৯) সাত্ত্বিক, (১১) সাগর, (১৩) বিততা, (১৫) তস্মাৎ, (১৬) মাং, (১৭) নরক, (১৯) দামোদর, (২০) তং, (২১) সংন্যস্য, (২২) জ্ঞানযোগেন।

ওপর-নিচ ঃ (১) যজ্ঞতপসাং, (২) বাসাংসি, (৩) তত্র, (৪) বিদুর্দেবা, (৫) অহিংসা, (৮) ভারত, (১০) কবিং, (১২) সৎকারমান, (১৪) তানহং, (১৬) মাসানাং, (১৮) কদাচন, (২০) তস্য।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

অনামিকা অধিকারী, আলোকরঞ্জন সাহা, রমা রায়চৌধুরী, সুব্রত সেন, গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপদ গরাই, স্বদেশরঞ্জন ঘোষ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জয়া ঘোষ, নির্মলচন্দ্র জানা, কৃষ্ণা দাস, কৃষ্ণ মণ্ডল, শঙ্করপ্রসাদ পাল।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি*

বসন্তকুমার সিংহ

ছাত্রাবস্থায় আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ' ও 'কথামৃত' পাঠ করি। পরে যখন কাজের সন্ধানে বাঁকুড়ায় আসি, তখন ওখানে আমাদের গ্রামের ডাক্তার অবনীবাবুর বাড়িতে উঠি। তাঁদের বাড়িতে একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য একজন কর্মীর বিষয়ে কথা বলছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে আমি আশ্রমে থাকার ইচ্ছার কথা তাঁদের জানাই। অবনীবাবুর নিকট আমার পরিচয় পেয়ে তাঁরা আমার কথায় সম্মত হন এবং আশ্রমের অধ্যক্ষের নামে একখানি চিঠি লিখে আমার হাতে দেন। সেই চিঠি নিয়ে আমি পরদিন আশ্রমে আসি। এসে দেখি প্রায় ৫০-৬০ জন লোক ওষুধ নেওয়ার জন্য সেখানে ভিড় করেছে। একজন সন্ন্যাসী রোগী দেখছিলেন এবং অন্য একজন সন্ন্যাসী ওষুধ দিচ্ছিলেন। রোগীরা সব চলে যাওয়ার পর আমাকে দেখে একজন সাধু আমার দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি চিঠিটা তাঁকে দিই। চিঠি পড়ে তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং স্নানাদি করতে বললেন। স্নানের পর প্রসাদ পাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। দুপুরে বিশ্রামের পর আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। দেখা করলে তিনি বললেন : "এখানে থাকতে হলে আশ্রমের সব কাজ ঠাকুরের, আমাদের নয়—এই ভাব নিয়ে করতে হবে। সব কাজ সেবার মনোভাব নিয়ে করতে হয়।" আমি তাঁর উপদেশমতো আশ্রমের কাজে লেগে গেলাম। পরে জানতে পারলাম, ইনিই ডাক্তার মহারাজ (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) এবং অন্য জন শান্তি মহারাজ (স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দ)। পরে আরো অন্যান্য সকলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। তাঁরা যা আদেশ করতেন, সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করতাম। এভাবে আমি তখন সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম।

বাঁকুড়া আশ্রমে তখন থাকার ঘর খুবই কম ছিল। অন্যান্য স্থান থেকে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করতে এসে সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তেরা সকলেই বাঁকুড়া আশ্রমেই উঠতেন। কারণ, জয়রামবাটী যাওয়ার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ছিল না। সেজন্য আশ্রমে অনেক সাধু ও ভক্তের সমাগম হতো। জায়গার টানাটানি হলেও এর মধ্যে সকলের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি তখনকার বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী ও ভক্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমিও আনন্দের সঙ্গে তাঁদের যথাসাধ্য সেবাদি করতাম। এইভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সন্ন্যাসী ও ভক্তের সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল এবং তাঁদের আমার অতি আপনজন বলে বোধ হতো।

দেখতে দেখতে দুবছর কেটে গেল। একদিন আমি পূজ্যপাদ ডাক্তার মহারাজজীকে বললাম : "মহারাজ, আমি দীক্ষা নিতে চাই।" আমার বয়স তখন ১৯-২০ হবে। আমি তাঁর মুখে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কাছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজীর নাম শুনেছি। তাই তাঁরই কাছে মন্ত্র পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তা শুনে ডাক্তার মহারাজও খুব আনন্দিত হলেন এবং যথাসময়ে দীক্ষাদির সব ব্যবস্থা করে আমাকে ফণী মহারাজের (স্বামী ভবেশানন্দের) সঙ্গে বেলুড় মঠে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন।

সময়টা খুব সম্ভবত ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে হবে। ফণী মহারাজ আমাকে সঙ্গে করে বেলুড় মঠে রওনা হলেন। মনের ভিতর তখন কত কল্পনা! আর কী যে একটা আনন্দের তরঙ্গ চলছে তা মুখে প্রকাশ করা যায় না। সেই আনন্দের স্রোতে ভাসতে ভাসতে মঠে পৌঁছাই। প্রথমে মঠের ঠাকুরঘরে প্রণাম করে তারপর পূজনীয় মহাপুরুষজীর ঘরে গেলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রথম দর্শন পেয়ে ও তাঁকে প্রণাম করতে পেরে আমার জীবন ধন্য হলো।

আমার দীক্ষার ব্যাপারে আগেই ডাক্তার মহারাজ কথাবার্তা বলে রেখেছিলেন। ফণী মহারাজ সেকথা পূজনীয় মহারাজকে বলেন। তিনি প্রথমে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, পরে বললেন : "কাল সকালেই হয়ে যাবে। দেখলাম ছেলেটা ভাল ও ভাগ্যবান। আর আমারও তো বয়স হয়েছে। যারা এখানে আসছে, আমি তাদের প্রভুর পদপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছি। তিনিই তাদের সব ভার নেবেন।"

পরদিন সকালে মহাপুরুষ মহারাজজীকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে গেলাম। তাঁর সেবক মতি মহারাজ বললেন : "তুই সকালেই স্নানাদি সেরে তৈরি হয়ে ঠাকুরঘরে বসবি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবি। আমি সময়মতো তোকে ডেকে নেব।" মতি মহারাজের সঙ্গে বাঁকুড়া মঠে থাকার সময় থেকেই আমার পরিচয়। তিনি দীক্ষার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিলেন।

আমি স্নানাদি সেরে ঠাকুরঘরে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে মতি মহারাজ আমাকে ডাকলেন এবং সঙ্গে করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে মহারাজকে প্রণাম করার পর মতি মহারাজ আমাকে বসতে বলে ঘরের বাইরে

** প্রাক্তন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। লেখাটি ১২ মে ২০০২-এ বসন্তবাবুর দেহত্যাগের কয়েক বছর আগে সংগৃহীত।* —সম্পাদক

চলে গেলেন। তারপর মহাপুরুষজী সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে আমার পুরো নাম ও পদবি জানতে চাইলেন। আমি বলার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তোর কোন্ ঠাকুরের মূর্তি ভাল লাগে?" আমি বললাম: "আমাদের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের কালীমূর্তি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাসনে বসা একখানি ছবি আছে, সেটি আমার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া পাড়াতে সবাই কালীপূজা করে। তাই আমিও কালীমূর্তির চিন্তা করি।" সব শুনে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থিরভাবে বসে রইলেন। পরে আমায় মন্ত্র দিলেন ও জপ করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। চাপা আনন্দের মধ্যেও সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে আমার কেমন একটু ভয় ভয় করছিল। মহারাজ তা বুঝতে পেরে আমাকে স্থির থাকতে বললেন এবং খুবই আশ্বাস দিয়ে বললেন: "ভয় কি? তুই তো শ্রীশ্রীমায়ের দেশের লোক। কাল সকালে দক্ষিণেশ্বরে যাবি ও সেখানে কিছুক্ষণ ধ্যান করবি।" আমি তাঁর পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সামান্য ফল রাখলে তিনি বললেন: "এখন ঠাকুরঘরে যা। সেখানে বসে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। খুব কেঁদে কেঁদে ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাবি। আর প্রত্যহ নিয়মিত যাতে তাঁকে ডাকতে পারিস তার জন্য চেষ্টা করবি। উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে এরূপ করে যাবি।"

পূজনীয় মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি ঠাকুরঘরে গেলাম। তাঁর কথামতো আমার আকুল মিনতি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালাম। তখন আমার মনে কী যে আনন্দ হয়েছিল! তা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া হওয়ার নয়।

মঠ থেকে ফিরে আসার সময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রণাম করার পর তিনি বললেন: "তুই খুবই ভাগ্যবান। তোর সব ভার তিনি গ্রহণ করেছেন—এটি জানবি। আমি যা বলছি সব হয়ে যাবে। প্রত্যহ গীতা পড়বি, সব জানতে পারবি।"

তারপর দু-একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেছি। কিন্তু সেইসময়ে তাঁর শরীর খুবই খারাপ থাকার জন্য সেবকরা বেশিক্ষণ থাকতে নিষেধ করতেন। আমিও তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে খুবই বিষণ্ণ মনে ফিরে আসতে বাধ্য হতাম।

মনের মধ্যে কত স্মৃতিই যে জমে আছে! সেসমস্ত লিখতে গেলে যেন সব গুলিয়ে যায়। যাহোক, এখনো সেই স্মৃতিগুলি নিয়েই বেঁচে আছি। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বলরাম-ভবনে একদিন স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সম্মুখে ঠাকুরের প্রসঙ্গে মগ্ন হয়ে বলেন: "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" শুনে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত তারক (স্বামী শিবানন্দ, ১৮৫৪-১৯৩৪) বলেন: "তা কেন? ঠাকুর আমার ভিতর এমন শক্তিসঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কামজয় করতে পেরেছি। তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।" সবিস্ময়ে স্বামীজী বলে উঠলেন: "তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ।" তদবধি তিনি 'মহাপুরুষ' নামেই পরিচিত হন। তাঁর নিজের উক্তি: "ঠাকুর আমাকেও ঈশ্বরকোটী করে দিয়েছেন।" এই ঈশ্বরকোটী 'মহাপুরুষ' হলেন স্বামী শিবানন্দজী, পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

পূর্বনাম তারকনাথ ঘোষাল। অধুনা উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের দম্পতি—দেবীভক্ত তান্ত্রিক সাধক রামকানাই ঘোষাল ও ধর্মপ্রাণা বামাসুন্দরী দেবীর আদরের সন্তান। বাবা তারকনাথের বরে লব্ধ সন্তানের নামকরণ হয় 'তারকনাথ'। জন্ম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন মা কালীর ভক্ত। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং তাঁর শ্রীমুখে সমাধিতত্ত্ব শুনে পুলকিত হন। দ্বিতীয় দর্শন দক্ষিণেশ্বরে। ছোট খাটে উপবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে তাঁর মনে হলো যেন 'মা'। সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের কোলে মাথা রেখে প্রণাম করলে ঠাকুরও তাঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন—যেন কত আপনার। একদিন ঠাকুর স্বীয় শ্রীচরণ তাঁর বক্ষে তুলে দিয়ে দিব্যস্পর্শে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে নিয়ে যান। তিনি অনুভব করেন যে, তিনি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর—জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আরেকদিন ঠাকুর আঙুল দিয়ে তাঁর জিভে কী যেন লিখে দিলেন, অমনি তাঁর সমাধি হয়ে গেল। ঠাকুর হরিকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একবার ভাবমুখে বলেন: "তারকের উচ্চ শক্তির ঘর—যেখান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হইতেছে।" একদিন ঠাকুর শিবানন্দজীকে বলেন: "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (শ্রীশ্রীমা)—অভেদ।" তাঁর কাছে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী, সঙ্ঘনেত্রী, 'হাইকোর্ট'। কাশীপুরে একদিন রাত্রে তিনি দর্শন করেন, নিদ্রিত স্বামীজীর চারদিকে ছোট ছোট শিবমূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কাছে স্বামীজী ছিলেন সাক্ষাৎ শিবাবতার। কঠোর তপস্যা ও তীর্থদর্শন এবং তার সাথে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবপ্রচার ও সেবাকাজের সময় তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া প্রভৃতি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী তাঁকে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন, ১৯১০-এর ২৫ আগস্ট তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ হন; অতঃপর ১৯২২-এর ২ মে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মুম্বাই, নাগপুর, উটকামণ্ড আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন; গদাধর আশ্রম, বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধির ওপর ওঙ্কার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য; দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাস, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সমাধি-মন্দির, চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সঙ্ঘগুরু থাকাকালীন তিনি অকাতরে কৃপাবিতরণ করেন। অনেক সময় তিনি দেহবোধহীন লোকাতীত অবস্থায় থাকতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি হাঁপানি রোগে কষ্ট পেয়েছেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল দারুণ পক্ষাঘাতে তাঁর বাক্শক্তি ও দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর মহাসমাধি হয়। প্রচ্ছদে স্বামী শিবানন্দজীর জন্মস্থানে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির দেখা যাচ্ছে।

স্বামীজীর ভাবশিষ্যা

শিখা সেন*

"ভারতে ও এসেছে শুধুমাত্র ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানাহরণে নয়, ও এসেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে এক মিলনসেতু গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে।"—বলেছিলেন কর্মযোগী বিবেকানন্দ। এমনই এক সময়ে যখন

সমগ্র ভারত ভুগছে এক অদ্ভুত মানসিক রোগে। কর্মপ্রচেষ্টায় তারা বিমুখ—জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা ও হতাশায় আচ্ছন্ন।

আজ থেকে একশো আটত্রিশ বছর আগে আয়ারল্যাণ্ডের ডানগ্যানন শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে ছিল অজানাকে জানার এক দুর্নিবার আগ্রহ। পাদরি পিতার চরিত্র থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন উদারতা, দরিদ্রসেবা, উপাসনা ইত্যাদি অফুরন্ত সদ্‌গুণরাশি। অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা তাঁর চরিত্রের অন্যান্য গুণগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে সত্যের একাগ্র সন্ধানী করে তুলেছিল। সত্যসন্ধানে বিক্ষুব্ধহৃদয় খ্রিস্টধর্মকেই প্রথম নিজের সামনে পেয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের প্রচণ্ড অনমনীয় অনুশাসনগুলির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন না। চার্চের অপরিবর্তনীয় অনুশাসন তাঁকে সত্যকে খুঁজে বের করতে কোন সাহায্যই করল না। তিনি মনে করলেন, এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যকে যেন কণ্ঠরোধ করে লুকিয়ে রেখেছে বিলাস-ব্যসনের অন্তরালে। পাশ্চাত্য দর্শন মূলত ভোগবাদী। এই ভোগসর্বস্ব বস্তুবাদ ও জড়বাদ তাঁকে পরম সত্যের সন্ধান দিতে অসমর্থ। এইসময়ে যখন তাঁর মন ফেনিল ধর্মসমুদ্রে সত্যসন্ধানে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো ভাসমান, তখন পরম সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান 'Light of Asia' গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনী থেকে আহরণ করেছিলেন। খ্রিস্টান মতবাদকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণে প্রবৃত্ত হতেই এল দ্বিধা—এল দ্বন্দ্ব। এমনই এক সময়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় দেখা পেলেন তাঁর ভবিষ্যৎ পথের দিশারির। স্বামী বিবেকানন্দের মহিমান্বিত শক্তিঘন ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করল। স্বামীজীর নীরব আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। পরম সত্যের এতদিনের অনুদ্ঘাটিত দ্বার তাঁর সামনে উন্মোচিত হলো। তিনি দেখলেন তাঁর সামনে আরেকটি উজ্জ্বল শান্ত শাশ্বত জীবনদর্শন। যেখানে নিরন্তর বলা হচ্ছে—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল; থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু। জীবনের লক্ষ্মণ প্রতিভাত হয় এগিয়ে চলার মধ্যে। কিন্তু এই কর্মযোগ নিষ্কাম কর্মফলত্যাগেই, সেটাই কর্মের মহিমা। 'গীতা'র ভক্তিযোগে বলা হয়েছে—

"শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥"

কিন্তু প্রাচ্য-দর্শন শুধুমাত্র কর্মযোগেই তৃপ্ত নয়, তার সঙ্গে ভক্তিযোগকেও প্রাচ্য অস্বীকার করেনি। সবকিছু মিলিয়ে প্রাচ্য এগিয়ে চলেছে পরম প্রাপ্তির দিকে—জীবনের চরম সত্যের মুখোমুখি—মোক্ষযোগে। প্রাচ্য-দর্শনে ভোগেই জীবনের প্রাপ্তি নয়, জীবন পরিপূর্ণতা পায় ত্যাগের আনন্দে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এই বিশেষ উপলব্ধিই প্রাচ্য-দর্শনের মূল স্তম্ভ। 'আত্মানাং বিদ্ধি'—আত্মজ্ঞানই জীবনের আনন্দোপলব্ধি।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মার্গারেটের পূর্বের সমস্ত ধারণা আমূল পরিবর্তিত হলো। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন একটা ধাক্কায় প্রচণ্ড নাড়া খেল। মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা অজ্ঞানতার অন্ধকার আবরণ সরে গেল। তিনি দেখতে পেলেন পরম সত্যের আবির্ভাবে অজ্ঞানতার কালিমার পশ্চাদপসরণ, তিনি লিখলেন ঃ

"বর্তমানে আমি কেবল অন্ধকারে হাতড়াইতেছি। এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করিতেছি ও প্রমাণ খুঁজিতেছি।

* *কলকাতা-নিবাসিনী, সুলেখিকা।*

আশা করি একদিন প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিব, আর সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত তাহা অপরকে দান করিতেও পারিব।... একটি ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর ও আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।"

মার্গারেট স্বামীজীর মতগুলি অনেক যুক্তিতর্কের পরে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। বেদান্তের মতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাদৃশ্য খুবই কম। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক বৈসাদৃশ্য তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে এল। স্বামীজীর উপদেশামৃত তাঁর পূর্বের শিক্ষা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব অনাস্বাদিত সমন্বয় ঘটিয়েছে।

অবশেষে ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মার্গারেট। গুরুর সম্মতি পেয়ে একদিন সত্যিই ভারতের মাটিতে পা রাখলেন তিনি। এতদিন ইংল্যাণ্ড প্রচারক পাঠিয়েছে ভারতে—জ্ঞান ও সভ্যতা-বিহীন ভারতীয়দের অন্ধকার থেকে আলোতে পথ দেখাতে। মার্গারেটের এই যাত্রা যেন সেই মূঢ়তারই যোগ্য উত্তর। অধ্যাত্মজগতে স্বামীজীর মানসকন্যা মার্গারেট বাঙলা ভাষা শিখতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবুও ভারতের মানুষ তথা ভারতকে ভালবেসে সেবা করতে গেলে এই দেশকে জানতে হবে। হ্যাঁ, সত্যিই এই দেশকে তিনি জেনেছিলেন; এই দেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তাই তাঁকে আমরা কেবল অধ্যাত্মজগতের মিলনস্তম্ভ বলে জানি না, আমরা তাঁর মিলন প্রচেষ্টা দেখেছি তাঁর সাংসারিক কর্মের মধ্যেও। তিনি ভারতে এসেছিলেন এক মহান ব্রত নিয়ে। সে-ব্রত ছিল কর্মযোগের ব্রত। ভারতীয় আদর্শে এই অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসীকে করে তুলতে হবে পুনরুজ্জীবিত। জাগিয়ে তুলতে হবে গোটা ভারতকে, ভারতের মহান ত্যাগের আদর্শে করতে হবে তাদের অনুপ্রাণিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় আদর্শের যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর প্রচেষ্টা ভারতবাসী কোনদিনই ভুলবে না, ভুলতে পারে না। তাই তো তাঁকে একেবারে নিজেদের করে রেখেছে ভারতবাসী, ডেকেছে 'ভগিনী' নামে।

নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, ভারতবাসী নারীশক্তিকে ঘরের ভিতর বন্দি করে রেখে এক বিরাট শক্তির অপচয় করছে। শক্তির অপব্যবহার হচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। এই অপচয় বন্ধ করতে পারলে দেশের সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব। কলকাতায় এসে বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের খেলা, ছবি আঁকা প্রভৃতির মাধ্যমে নারীজাতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করেন। ভারতে মহিলাসভার সৃষ্টি তাঁর অনন্যসাধারণ কর্মেরই ফলশ্রুতি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি উইলে তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ভারতে নারীশিক্ষা প্রসারকল্পে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে গেলেন।

নিবেদিতা বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে বর্তমান নৈরাশ্যের কারণই হচ্ছে এতদিনের পরাধীনতা। এক্ষেত্রে তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁকে ভারতের মূল সমস্যাগুলি বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগরণে অগ্রণী হলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি। স্বামীজীর আশীর্বাদে বলিষ্ঠা হয়ে মুক্তিযোদ্ধা নিবেদিতা ইংল্যাণ্ডের দৈনিক কাগজগুলিতে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও কর্মধারার বিবরণ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তিনি এইভাবে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামে বিলেতের জনমত সৃষ্টিতে অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন।

স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা স্বামীজীর 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedanta)-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে। বলবান ব্যক্তিই ঈশ্বরলাভে সক্ষম —এই কথায় জোর দিয়ে স্বামীজী বলতেনঃ "গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিক সমীপবর্তী হইবে।" নিবেদিতা যেন এই আদর্শেরই প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে তিনি কাজ শুরু করলেন। আর স্বামীজীর তিরোভাবের পর ভারতের বিশাল কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে এসে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মিলিত হলো পাশ্চাত্যের জড়বাদী কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী ভক্তিযোগের সঙ্গে।

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ়সম্বদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।"—পরাধীন ভারতে নিবেদিতার এ-বাণী ছিল তৎকালীন সমাজে একটি বিরাট চমক। এই কথাতে এটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, তিনি ভারতাত্মাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন কতখানি। তিনি ভারতকে দেখেছিলেন পিছন থেকে, সামনে তাকাতেও তাঁর মনে দ্বিধার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছেনঃ "ভারতে প্রথম আগমনের সময়ে নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল—ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।" সেকাজে নিবেদিতা সত্যিই সফল। তিনি সত্যিই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক সুদৃঢ় মিলনস্তম্ভ। সার্থক তাঁর জীবন, সার্থক নাম দিয়েছিলেন তাঁর গুরু। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাখিবন্ধনে প্রতীচ্যের অর্ঘ্য, তিনি নিবেদিতা। ❑

মা ও বিশ্বজননী মা সারদা

স্বামী দীননাথানন্দ*

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৭৩)

—যে-দেবী সকল প্রাণী বা ভূতসমূহে মাতৃরূপে অবস্থান করছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বারবার নমস্কার।

এই মাতৃরূপ বলতে আমরা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' অনুসারী হয়ে বলতে পারি—যিনি লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, করুণা ও লক্ষ্মী-স্বরূপা এবং ধৃতি, বুদ্ধি, পুষ্টি, তুষ্টি-বিধায়ক গুণাবলিতে বিভূষিতা, তিনি মাতৃস্বরূপা। চিৎশক্তিরূপে তিনি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সন্তানের প্রতি সদা ক্ষমাশীলা বর ও অভয়-দায়িনী এই মা।

বাস্তবদৃষ্টিতে আমাদের নিকট মায়ের স্থান সবার ওপর। কারণ, মাতৃহৃদয় তাঁর সন্তানের জন্য সদাসর্বদা স্নেহ-মমতা-করুণায় ভরে থাকে। সদা ক্ষমাশীলা মায়ের পক্ষে সন্তানের দোষদর্শন অসম্ভব। সন্তানের সঙ্গে নিজের একাত্মতা মায়ের জীবনে একটি সহজাত দৃশ্য। সন্তানের নিকট মায়ের কোলই সকলরকমের আশ্রয় ও আনন্দের স্থান। সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মায়ের কত যে আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ, কত যে বিনিদ্র রজনী যাপন, তার ইয়ত্তা নেই! একজন নারী সন্তানের মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে স্নেহ-মমতাপূর্ণ তুষ্টি ও পুষ্টি-দাত্রী এক পালিনীশক্তির বিকাশ ঘটে। বয়স্ক বা বৃদ্ধ সন্তানও মায়ের নিকট শিশুর মতো। মায়ের স্নেহ-ভালবাসায় তার মনের কলুষতা ও গ্লানি যেন কোথায় সাময়িকভাবে চলে যায়। শিশু জানে, মা-ই সকল চাওয়া ও পাওয়ার মূল উৎস। তার যত মান-অভিমান, আনন্দ-নিরানন্দ মাকে আশ্রয় করেই। মাতৃহৃদয়ের এই পবিত্র নির্মল নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও করুণা ভগবানের পালিনীশক্তিরই প্রকাশ। পৃথিবীর সকল মা-প্রাণীর মধ্যেই এটির কম-বেশি প্রকাশ দেখা যায়। এই কারণে মাতৃঋণ অপরিশোধ্য। হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েই এর পরিমাপ করা যেতে পারে, অন্যভাবে নয়। বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় সন্তানের জন্য মায়ের আত্মোৎসর্গ যেন সহজাত প্রবৃত্তি।

পিতারূপে পুরুষের মধ্যে এটি অপেক্ষাকৃত কম প্রকাশ। এই কারণে যেকোন পরিস্থিতিতে মায়ের ওপরে সন্তানের আকর্ষণ অনেক বেশি। পৃথিবীতে নির্মল ও পবিত্রতম ভালবাসার দৃশ্য—আনন্দোচ্ছল সদা ক্রীড়ারত শিশুকোলে মা। এটি হলো আমাদের গর্ভধারিণী মায়ের অল্প পরিচিতিমাত্র। এখন বিশ্বজননীরূপে অপর এক মায়ের রূপ অঙ্কনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম ও দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি একরূপে জগৎ সৃষ্টি করছেন, একরূপে সৃষ্টিকে পালন করছেন, আবার একরূপে সৃষ্টি ধ্বংস করে নিজ স্বরূপে লয় করে নিচ্ছেন। তাঁকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে তাঁকে দুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যখন তিনি কোন সৃষ্টিকর্ম করছেন না, তখন তাঁকে নির্গুণ নিরাকার শুদ্ধ ব্রহ্ম বলা হয়। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে তাই বলা হয়েছে—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥" (১।৭৬)

—হে জগৎস্বরূপা, আপনিই এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, পালনকালে পালনশক্তিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা।

জন্ম থেকেই মায়ের সঙ্গে সন্তানের এক নিবিড় মধুর সম্পর্ক থাকে। সন্তান সততই যেন মায়ের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। সেই কারণে তারা ভগবান বা ঈশ্বরকে বিশ্বজননীরূপে একান্ত আপনার করেই পেতে চান বলে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে ভগবান বিশ্বজননীরূপেই আরাধিতা।

ইতোপূর্বে মায়ের যেসকল গুণাবলির কথা বলা হয়েছে, সেইসকল গুণের অধীশ্বরী হলেন এই বিশ্বজননী ঈশ্বরী। ভগবানকে নিতান্ত আপনার করে পেতেই তাঁর মাতৃরূপের আরাধনা। ভগবতী তাঁর বিশাল মাতৃহৃদয়ে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে আশ্রয় দিয়ে লালন-পালন করছেন এবং সকল মা-প্রাণীর মধ্যেই তিনি স্নেহ, করুণা ও মমতাভরা পবিত্র শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসারূপে বর্তমান। এই কারণে মাতৃ আরাধনায় নিজ গর্ভধারিণী মাকেও ভগবতীরূপে অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন করা সন্তানের পক্ষে অধিকতর সহজ। শিশু মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্নেহ-সিঞ্চিত দিব্য আনন্দের স্বাদই আস্বাদন করে। কাজেই সকল সন্তানের নিকট তার নিজ নিজ মা পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী; তবে গর্ভধারিণী মায়ের স্নেহ-ভালবাসা সাধারণত নিজ সন্তানেই আবদ্ধ থাকে, সর্বজনীন হয় না।

* রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সেবারত প্রবীণ সন্ন্যাসী।

আজকের দিনে মানুষ বহুদিন ধরেই ভগবৎ আরাধনায় ভগবতীর অশেষ কল্যাণগুণ-সমন্বিতা রক্তমাংসের শরীরধারী এমন একজন মানবীকে মা-রূপে পেতে চেয়েছিল—যিনি বিশাল মাতৃহৃদয় নিয়ে সকলের মা হয়ে ধরাতে অবতীর্ণ হবেন এবং মাতৃভাবের সাধনার রূপটিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করবেন; সাধনার দ্বারা ঐ মাতৃশক্তি সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে হৃদয়স্থ অশুভ শক্তিকে বিনষ্ট করবেন এবং শরীর-মনকে শুদ্ধতায়, পবিত্রতায় ভরিয়ে দেবেন। এই শুদ্ধ পবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের উপলব্ধিস্থল—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন, ফলে সকল দুঃখের অবসান ও পরমানন্দ প্রাপ্তি এখানেই ঘটে। সন্তানের কল্যাণ-কামনায়ও তাকে আপন স্বরূপের জ্ঞানদানের জন্য অসীম অনন্তরূপিণী ঈশ্বরী আজ সীমার মাঝে নাম ও রূপের জগতে ধরা দিয়েছেন। তাই আজ ভগবান অবতাররূপে মর্ত্যের মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে নিয়ে নরলীলায় অংশগ্রহণের জন্য। কারণ, নানা দেবদেবীরূপে দর্শন দেওয়া অপেক্ষা মানব ও মানবীর বেশে দর্শন দেওয়াতে ভক্ত সন্তানেরা তাঁদের একান্ত আপনজনের মতো পিতা, মাতা, বন্ধু ও সখা-রূপে গ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থায় আত্মবিস্মৃত নরনারীকে অতি সহজেই জাগতিক দিব্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অবতারগণ তাঁদের নিজ স্বরূপের জ্ঞানদানে সমর্থ হন। এই কারণেই ভগবান অবতারলীলায় মানবরূপ ধরে অবতীর্ণ। আবার স্বীয় রূপ ঢেকে এই অরূপের মাতৃরূপে আগমন অবোধ সন্তানের নিকট পরম কাম্য। অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ এই মাতৃভাব জাগরণের জন্য তাঁরই অভিন্ন সত্তা শ্রীমা সারদাদেবীকে অবতারসঙ্গিনীরূপে নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, সংসারে মাতৃভাব সাধনার পূর্ণ সার্থক রূপায়ণে শ্রীমাকে স্বীয় বিবাহিত ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন। এটি যেন দেবদেবীর স্তরে হর-পার্বতী বা শিব-কালীর মিলিত সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহিত স্ত্রীকে কি করলেন? এক বিশেষ দিনে ষোড়শীপূজার মধ্য দিয়ে ও নিজে পূজকের আসন গ্রহণ করে স্বীয় স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বজনীন স্বরূপটি উদ্বোধন করলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে তাঁকে বিশ্বমাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে জগৎকল্যাণে ব্রতী করলেন। কারণ, জগৎ বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিল মাতারূপে ভগবতীর মর্ত্যে আগমনের জন্য। মা ছাড়া কেই বা সন্তানদের সুখ-দুঃখের কথা শুনবেন, কেই বা স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দিয়ে তাদের অন্তরে নির্মল আনন্দের স্রোত বইয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটিও মাতৃভাবের সাধনায় জগজ্জননী মা ভবতারিণীর পূজার্চনা নিয়ে নানা দিব্য ঘটনায় সমৃদ্ধ। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, "মা-ই সব হয়েছেন, জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সব।" শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরে মা ভবতারিণী, গর্ভধারিণী মা ও শ্রীমা সারদাদেবী—তিনজনের মধ্যেই জগজ্জননী মায়ের সত্তাই দেখতেন, কাজেই জগজ্জননীরূপে আবির্ভূতা—স্বরূপ ঢেকে আগতা শ্রীমা সারদাদেবীর পরিচয় দান এই অধম সন্তানের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য বিষয়।

আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে সেযুগের গ্রামবাংলার সহজ সরল অনাড়ম্বর সবুজে ঘেরা পরিবেশে জয়রামবাটী গ্রামে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর পর্ণকুটিরটি আলো করে কন্যারূপে জন্ম নিলেন জগতের মা—শ্রীমা সারদাদেবী। পল্লির বুকে প্রাণোচ্ছল শৈশবটি মা, বাবা, ভাইদের নিয়ে ও গ্রামের অন্যান্য সকলের সঙ্গে আনন্দে কেটেছিল। কন্যারূপে, ভগিনী ও সখীরূপে, সহধর্মিণীরূপে, অবশেষে বিশ্বজননী-রূপে তাঁর লীলাভিনয়টি হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। অবোধ সন্তানের পক্ষে এই নারীরূপে বিশ্বমাতার লীলাভিনয় বুঝে ওঠা কষ্টসাধ্য, কারণ তিনি সদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই সন্তানদের মর্ত্যে মানবী মা-রূপে ধরা দিয়েছিলেন। এই মাতৃদর্শনের আনন্দে আজও সন্তানের দল গেয়ে চলে—"রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা।/ আছ মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আঁখিদুটি স্নেহমাখা।/ মা বলে ডাকিলে পার না ফিরাতে—ধুলোকাদা ঝেড়ে কোলে তুলে নিতে।/ কে আছে রে মোর জুড়াইতে ব্যথা, না ডাকিলে দাও দেখা, অবগুণ্ঠনে ঢাকা॥"

অবগুণ্ঠনবতী থাকলেও মায়ের সন্তানদের নিকট তাঁর স্নেহ, করুণা ও মমতায় ভরা হৃদয়ের ভালবাসাটি ছিল সদা উন্মুক্ত শতধারায় প্রবাহিত। এই অবগুণ্ঠনবতী মায়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন ঃ "ও সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" অন্যত্র বলেছেন ঃ "ও জ্ঞানদায়িনী মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।" পরবর্তী কালে তাঁর এই জ্ঞানদায়িনী রূপটি আমরা তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্নভাবে প্রকটিত দেখেছি। কত শত অজ্ঞানী সন্তানকে দীক্ষাদানে তাদের দেহ-মনকে শুদ্ধ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। স্থান-কাল নির্বিশেষে, পাত্র-অপাত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর অহৈতুকী কৃপার অধিকারী হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অর্পিত এই মুক্তি দেওয়ার দায়ভারটি তিনি প্রথমে নিতে অস্বীকার করলেও পরবর্তী কালে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা বহন করে গেছেন। ঠাকুর আক্ষেপের সুরে নিজ ভগ্ন শরীর দেখিয়ে একদিন বলেছিলেন ঃ "আমি কি একা সব করব? তুমি

কি কিছু করবে না?" লজ্জাশীলা মা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেনঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ "না না, তোমাকে অনেককিছু করতে হবে। এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে হবে।" ঠাকুর জানতেন, বিশ্বজননীরূপে আগতা মাকে সন্তানদের ভক্তিমুক্তির পথ দেখাতে হবে তাঁর থেকে অনেক বেশি। মাতৃশক্তির পক্ষে সেটি সম্ভব। সেইজন্য প্রতিদিনের দৃশ্যতে দেখি, মা সাধারণ গৃহকর্ত্রীর মতো সকলরকমের কাজকর্ম নিষ্ঠা সহকারে পূজার মনোভাব নিয়ে করছেন; আবার দূরাগত পরিচিত অপরিচিত সন্তানদের মাতৃস্নেহ-মেশানো ভালবাসা দিয়ে—"কি বাবা, ভাল আছ তো? কোন কষ্ট হয়নি তো? বাছা আমার কত কষ্ট করে এসেছে একটু বিশ্রাম কর; খাও।" ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাদের অভ্যর্থনা করছেন; কাশী থেকে আসা পরিশ্রান্ত দুই সন্ন্যাসী সন্তানের মুখে দুই গ্রাস গরম দুধ তুলে ধরছেন, নিজের হাতে তাদের জন্য রান্নাবান্না করে কাছে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন। আবার পরমুহূর্তে দেখি অতি সামান্য ব্যবস্থাতে নিজে ভাবস্থ থেকে ধর্মপিপাসু সন্তানদের মন্ত্রদান করে অধ্যাত্মজীবনে আনন্দলোকের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। এইরূপে সন্তানদের আহারাদি দিয়ে দেহের পুষ্টিবিধান, অপরদিকে দীক্ষাদানে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টিবিধান করছেন। সন্তানদের কোনরকম দোষত্রুটিই তাঁর নজরে বিশেষ পড়ত না। অদোষদৃষ্টিসম্পন্না তিনি। সকলের প্রতি তাঁর সমান ভালবাসা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ উচ্চ, নিচ, ধনী, দরিদ্র, চোর, ডাকাত, মদ্যপ, অসৎ চরিত্র —সকলেই তাঁর মাতৃস্নেহবন্ধনে একীভূত হয়ে যেত। ডাকাত আমজাদ, তেলোভেলোর মাঠের ডাকাতবাবা, মদ্যপ পদ্মবিনোদ, দুশ্চরিত্রা নারী থেকে শুরু করে পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, দেশসেবক—সকলেই তাঁর স্নেহছায়ায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করত। সকলের জন্য তিনি মা হয়ে ঠাকুরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতেন, আত্মিক কল্যাণের জন্য সদাই সচেষ্ট থাকতেন। বলতেনঃ "আমজাদ আমার ছেলে, শরৎও আমার ছেলে।" আমজাদ হলো ডাকাত, আর শরৎ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য ও মায়ের একনিষ্ঠ সেবক স্বামী সারদানন্দ। তিনি বলতেনঃ "আমি তোমাদের জন্মজন্মান্তরের মা, ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, তবে তো মাকেই ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে।" আরো বলতেনঃ "আমি সৎ অসৎ সকলের মা।" "সবসময়ে মনে রাখবে তোমাদের একজন মা আছে।"

মায়ের প্রতি বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের অগাধ ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। কোন সমস্যার সমাধানে মায়ের সিদ্ধান্তকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। সঙ্ঘজননীরূপে ঠাকুরের নামে সঙ্ঘকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্বের পরিচয়ও বিভিন্ন সময়ে মা দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানতেন এই সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে নবীন এক আধ্যাত্মিক ভাববন্যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলবে।

এইরূপে সীমাহীন বাঁধনহারা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহটি তাঁর পালিনীশক্তিরূপে সর্বত্রই প্রবাহিত হয়েছিল। এখনো বয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে—যুগ থেকে যুগান্তরে। তিনিই তো বিশ্বরূপে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। 'সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' হয়ে রয়েছেন। সমগ্র বিশ্বসংসার তো তাঁরই প্রতিমূর্তি। এক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেনঃ "মা, আপনি সকলের মা, এই কীটপতঙ্গেরও?" মায়ের উত্তরঃ "হ্যাঁ বাবা, ওদেরও।" তাই তো দেখি, গোবৎসের হাম্বা রবে মা 'যাই বাবা' বলে গিয়ে তার গলার বাঁধনটি খুলে দিচ্ছেন। পোষা ময়নাপাখিটিকে আহারাদি দিয়ে যত্ন করছেন। গোবিন্দ নামে জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে কর্মরত স্নেহের পাত্রের খোস-পাঁচড়াতে শরীর ভরে যায়, মা নিমপাতার জলে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন। মাতাপিতৃহারা রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি শিশুকন্যাদের নিজহস্তে সেবাযত্ন করছেন। জয়রামবাটীতে এক অসুস্থা বৃদ্ধার পায়খানাতে নোংরা কাপড়চোপড় স্বহস্তে ধুয়ে রৌদ্রে শুকোতে দিচ্ছেন। ডাকাত আমজাদকে পুত্রস্নেহে কাছে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন। নিজহাতে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করছেন। বিদেশাগতা ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা), ক্রিস্টিন, ওলি বুল প্রমুখ মহিলাগণ মায়ের স্নেহছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। মা তাঁদের চিবুক ধরে আদর করেছেন, খাইয়েছেন। মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর স্নেহ-ভালবাসায় তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দেশপ্রেমিক-গণ মায়ের আশীর্বাদ নিতে ছুটে আসতেন। পুলিশের নজর এড়িয়ে আগত সন্তানদের তিনি ছিলেন আশ্রয়দাত্রী।

অদূরদর্শী দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, মা যেন ঘোর সংসারী। ঠিক এইরূপই একদিন মনে হয়েছিল মায়ের সেবিকা যোগীন-মার। মাকে নানাভাবে সংসারের কাজকর্মে সদা জড়িত দেখে তিনি গঙ্গার ধারে বসে বসে সাধারণ গৃহকর্ত্রীর ন্যায় মায়ের আসক্তির কথা ভাবছেন ও তাঁর দেবীত্বের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সহসা ভাবনেত্রে দেখলেন, সম্মুখে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। প্রবাহিত গঙ্গাকে দেখিয়ে যোগীন-মাকে ঠাকুর বললেনঃ "ঐ দেখ, গঙ্গাবক্ষ দিয়ে এক মৃত গলিত শিশুর দেহ বয়ে চলেছে, ওতে কি গঙ্গা কখনো অপবিত্র হয়? ওকেও তেমনি ভাববে। একে (নিজদেহ

দেখিয়ে) ও ওকে এক অভিন্ন জানবে।" নিমেষে তাঁর ভ্রম ভেঙে গেল, মায়ের ওপর তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

আদ্যাশক্তি মহামায়া সারদাই আজ শতরূপ ধরে লীলা করছেন, সকলকে মমতা-মাখানো স্নেহ, ভালবাসা ও জ্ঞান দিয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। "যার মায়ের ওপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও"—এই কথাটি প্রসঙ্গান্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের লিখেছিলেন। মায়ের এই পতিতপাবনী রূপটি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ও মায়ের অনুগত সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন ঃ "যে-বিষ আমরা নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি, মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা। জয় মা জয় মা।"

এইরূপে অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু মা সকলকে কৃপা করে চলেছেন। গৃহস্থদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখানোর জন্য নিজে আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন আচরণ করে দেখিয়েছেন। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়।" তাঁর কর্মমুখর জীবনটি জগৎ-কল্যাণের জন্যই। এইভাবে মায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে শতসহস্র ঘটনাবলির দিব্যকাহিনী সত্যই বিস্ময়কর। বিশ্বজোড়া ছিল তাঁর এই বিশাল মাতৃহৃদয়।

একসময় এক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "ঠাকুর আপনাকে রেখে আগে চলে গেলেন কেন?" উত্তরে মা বললেন ঃ "জান তো বাবা, জগতের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গিয়েছেন।" তাই দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর যাওয়ার পর সুদীর্ঘ ৩৫ বছর মায়ের জীবন, কর্ম ও বাণী এই মাতৃভাব বিকাশে সদা তৎপর ছিল। আজ সেই বিকশিত মাতৃভাবের গঙ্গাধারায় বিশ্ববাসী অবগাহন করে নিজ নিজ শরীর-মনকে পবিত্র করে নিচ্ছেন, পাচ্ছেন পরম শান্তি ও আনন্দ।

নশ্বর দেহ ত্যাগ করার পূর্বে সন্তানদের জন্য ঠাকুরের নিকট তাঁর আকুল প্রার্থনা ছিল ঃ "হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এসংসারে বড় দুঃখকষ্ট, আর যেন তাদের আসতে না হয়।" সন্তানদের জন্য তাঁর শেষ আশীর্বাণী ঃ "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জন্য, জানিয়ে দিও মা আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।" যিনি জন্ম-জন্মান্তরের মা, তাঁর সন্তানদের ওপর এই আশীর্বাদ তো অনন্তকাল ধরে বয়ে চলবে। সংসারজীবনকে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধিময় করে তোলার জন্য তাঁর শেষ উপদেশ ঃ "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" অবশেষে আপন-পর সব ভেদাভেদ দূর করে সকলের মা সারদাদেবী লীলাভিনয় শেষে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্ব-স্বরূপে মিলে গেলেন। রেখে গেলেন ত্যাগ, সেবা ও প্রেমে ভরা এক শাশ্বত সনাতন বিশ্বমাতৃত্বের আদর্শ। এই আদর্শকে অবলম্বন করে নারীজাতির মধ্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনানুসারে মাকে কেন্দ্র করে শ্রীসারদা মঠ গড়ে উঠেছে। তাঁর আশা, বৈদিক যুগের বিদুষী রমণী মদালসা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো মহিলাদের পুনরাবির্ভাব হবে। বর্তমান স্বার্থপর, পরস্পর বিবদমান দুনিয়ার মানুষ যদি যথার্থ শান্তি পেতে চায়, মায়ের এই শেষ উপদেশটি তাদের জীবনে কার্যকর করা একান্ত দরকার। ফলে পৃথিবীর বুকে এক শান্তি ও মৈত্রীর পরিবেশ গড়ে উঠবে, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

উপসংহারে মায়ের শেষ পরিচয়টি আবার তুলে ধরি। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভিন্ন, কোনভাবেই পৃথক করা যায় না—সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাঁর আত্মভূত শক্তি এক ও অভিন্ন সত্তামাত্র। এই শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি নিজেকে জীবজগৎ-রূপে প্রকাশ করেছেন। অবতারাদি রূপে তাঁরই আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা এক অভিন্ন সত্তারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আগুনের কার্যকারিতা যেমন তাঁর দাহিকাশক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রীমাও ঠাকুরের কার্যকারিণী শক্তি। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও করুণায় ভরা মাতৃভাব বিকাশের জন্য ঠাকুরের অবতাররূপে আবির্ভাব। এই বিশ্বজনীন মাতৃভাবটিকে রূপদান করেছেন শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর নিজ জীবনে। এই কারণে আমরা দেখি, শ্রীমা তাঁর দৈহিক স্বরূপটিকে ঢেকে রেখে বিশ্বজননী মানবী মা-রূপে ধরা দিয়েছেন। আজ ভোগসর্বস্ব দুনিয়াতে একমাত্র মা-ই পারেন আত্মবিস্মৃত সন্তানদের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে। মা যেন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রেখেছেন। এখন কেবলমাত্র এই খেলনা ছেড়ে 'মা যাব' বলে শিশুর মতো ব্যাকুল হয়ে কাঁদা দরকার। ঐ ক্রন্দন শুনে ধুলোকাদা ঝেড়ে মা-ই তাঁর সন্তানদের কোলে তুলে নেবেন, শরীর-মন ভরিয়ে দেবেন অমৃতসুধা দানে। ❑

এই নিবন্ধটি 'রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন

গত আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৪র্থ এবং ৫ম পঙ্ক্তিতে 'ইহামূত্র' এবং 'অমূত্র'-এর পরিবর্তে 'ইহামুত্র' ও 'অমুত্র' হবে।

গত আশ্বিন ১৪১২ সংখ্যার ৭৪২ পৃষ্ঠার ৭ম পঙ্ক্তিতে 'অ্যান্টনি গিভেন্স'-এর স্থলে 'অ্যান্টনি গিডেন্স' হবে।

লোকসংস্কৃতি

বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজ

মিনতি মিত্র*

মুখ্যত ধর্মঠাকুর, কিন্তু নাম তাঁর অনেক। যেমন—'বুড়া রায়', 'বাঁকুড়া রায়', 'ফতে সিং', 'যাত্রাসিদ্ধি', 'কালাচাঁদ' ইত্যাদি। যেখানেই ধর্মঠাকুরের মন্দির, সেখানেই আরো কিছু গ্রামীণ দেবতা, যেমন—বাসলী, মনসা, পুঁড়াসুর, লৌহজঙ্ঘ, ডামরসাঞ্জি, ষষ্ঠীদেবী প্রমুখের দেখা পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পূজা পান। যদিও এখন ধর্মঠাকুরের পূজা প্রধানত রাঢ় দেশ ও তৎসমীপবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এক কালে সমগ্র বাংলাতেই এই পূজা প্রচলিত ছিল। এমনকি বাংলার বাইরে কাশী-কোশলেও ধর্মঠাকুর অজ্ঞাত ছিলেন না। তার প্রমাণও পাওয়া যায়। শুধু সেখানেই নয়, ধর্মপূজার প্রচলন বিহারেও ছিল। বিহারীদের 'ছটপরব' হয়তো তারই অবশেষ।

কিছু কিছু ভৌগোলিক কারণে মনে হয়, ধর্মপূজা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন—মনসার পূজা নদীবাহিত বাংলাদেশে প্রসারলাভ করেছিল।

প্রথমদিকে ধর্মঠাকুরের পুরোহিতরা ছিলেন ডোম জাতীয়, তাঁদের উপাধি ছিল 'পণ্ডিত'। তখনকার বিশ্বাসে ধর্ম ছিলেন সূর্য। তাই এঁর আদিকথা বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কারণ, ধর্মকে অবলম্বন করে যে মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছিল তার সৃষ্টিকাহিনী ও ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় একরকম।

শিক্ষিত সমাজে, জনমানসে ধর্মঠাকুরকে প্রথম পরিচয় করান ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি অনুমান করেন, বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের পূজায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। যদিও বর্তমানে দেশের কোন কোন অংশের পণ্ডিতদের মধ্যে এই অনুমান কতকটা শিথিল হয়ে এসেছে।

প্রথমদিকে ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে তাবৎ জনপদের সামগ্রিক জীবনই নিয়ন্ত্রিত হতো। যেমন কৃষিনির্ভর গ্রামবাসীর ধানচাষ থেকে শুরু করে দেশীয় বৃত্তিগুলি প্রথমাবধিই ধর্মঠাকুরের কৃপা-আশ্বাসে নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখানে ধর্মঠাকুর যেন রাজশক্তির প্রতিভূ। এইজন্য ধর্মঠাকুরের পূজক-পরিচারকেরা রাজাদের এবং রাজসভার পদবি ও উপাধি ধারণ করতেন। এই রীতিই বহুদিন ধরে চলে আসছিল।

মর্ত্যলোকের পূজা পাওয়ার জন্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবতাদের যেমন কাহিনী আছে, ধর্মঠাকুরকে অবলম্বন করেও তেমনি ধর্মমঙ্গলকাব্য ও তার চমকপ্রদ কাহিনী আছে। এই কাহিনীতে দেখা যায়, ধর্মঠাকুরের অন্যান্য দৈবীক্ষমতার সঙ্গে কুষ্ঠরোগের ত্রাণক্ষমতাও আছে। যে-অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের জয়জয়কার, সেই অঞ্চলটি বিশেষভাবে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। মূলত রাঢ়ভূমি এবং নিকটবর্তী অঞ্চলটি, অনেকেই জানেন, কুষ্ঠরোগপ্রধান। তাই এই অঞ্চলে ধর্মরাজ 'কুষ্ঠরোগহর' নামেও বিশেষ পরিচিত। এসম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনীও পাওয়া যায়।

গ্রামটির নাম বেলেতোড়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি'র আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভও এই মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁরা দুজনে সম্পর্কে জাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই ছিলেন। এখানে ধর্মরাজের গাজন হলো একটি 'মহা পরব'। এত জাঁকজমক এখানকার আর কোন পূজাতেই দেখা যায় না। এমনকি দুর্গাপূজাও যেন হার মানে! প্রতিটি বাড়ি তখন লোকজনে গমগম করে। কাছাকাছি কর্মস্থল থেকে পুরুষরা তো আসেই, আবার মহিলাদেরও 'বাপের বাড়ি' আসার এই এক সুযোগ। কারণ, ধর্মরাজ তো সকলেরই। গ্রামের সবকিছু দেখাশোনা করেন এই 'ঘাটিয়াল ঠাকুর'। সময়ে অসময়ে ধর্মরাজের কাছে মানসিক বা মানত মানা থাকে অনেকেরই। সন্তানহারা মা, চক্ষুহারা রোগী, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অসহায় মানুষ—সকলেই এই সময় আসেন বাবার থানে পুজো দিতে। ক্রমে ক্রমে বহু লোকের আনাগোনায় গ্রামের আসর জমজমাট হয়ে ওঠে। পুজো হয়ে ওঠে উপলক্ষ্য। মেলায়, নাচে, গানে গ্রামের চেহারাই বদলে যায়।

ধর্মরাজের গাজনের নির্দিষ্ট তিথিটি হলো আষাঢ় পূর্ণিমা। গাজনের দিন অনেক রাতে বাণফোঁড়া শুরু হয়। রাত যত বাড়ে ততই বাজনা বাজে, আর ততই যেন বাণফোঁড়ার আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। এটিই হলো এই গাজনের মূল আকর্ষণ। বাণফোঁড়া ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো শুনেছেন, কিন্তু চোখে না দেখলে এই বিষয়টি ধারণা করা যায় না। আসলে ধর্মঠাকুরের 'ভক্ত'রা 'বাণ' বা তির গোটা গায়ে বিঁধিয়ে দেয়। গোটা গায়ে বলতে কানে, নাকে, বুকে, পিঠে, জিভে—সর্বত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতে একফোঁটা রক্তপাত হয় না। বাণফোঁড়াতে ছোট-বড় সকলের উৎসাহই সমান। তারপর ঐ বিচিত্র বাণফোঁড়া শরীর নিয়ে ছোট ছোট এক-একটি দল তৈরি হয়। ঐ ছোট ছোট দলগুলি বাজনার সঙ্গে একের পর এক যখন নেচে নেচে আসতে থাকে, তখন সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—যেন চোখের সামনে বিচিত্র এক মিছিল।

এই ধরনের ভক্ত ছাড়াও আরেক রকমের ভক্ত আছে। তারা ঠাকুর যে-ঘাটে স্নান করেছেন, সেখান থেকে হয় দণ্ডী

* কলকাতা-নিবাসিনী, গবেষিকা।

কাটতে কাটতে, নাহলে গড়িয়ে গড়িয়ে (মানসিক অনুযায়ী) ঠাকুরের মন্দির পর্যন্ত পৌঁছায়। এইভাবে সারারাত উৎসব চলার পর পরদিন ভোরবেলা ধর্মঠাকুরকে তাঁর কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে পুরোহিত কোলে করে মন্দিরের দিকে নিয়ে যান। যাওয়ার সময় প্রতি গৃহস্থের দরজা থেকে তাঁকে নানারকম পুজোপহার দেওয়া হতে থাকে। মন্দিরে পৌঁছেই তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় না, মন্দিরের বাইরে বিরাট ফরাশ পেতে ধর্মঠাকুরের বৈঠকখানা রচনা করা হয়, সেখানে তাঁকে বসানো হয়। নানা জায়গা থেকে নানা বিগ্রহকে নিয়ে পুরোহিতেরা সেখানে এসে উপস্থিত হন। এ যেন এক দেবসভা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'গ্রামদেবতা' প্রবন্ধে ধর্মঠাকুরের ভক্তদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "যাহারা গাজনের সময় ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের নাম 'ভক্ত'। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই ব্রতগ্রহণের অধিকারী। শ্রেণিভেদে তিনদিন হইতে পনেরো দিন ব্রতগ্রহণের নিয়ম। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের ব্যবস্থা উপবাস, সন্ধ্যার পর ফলমূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন স্কন্ধে 'উত্তরী' ও হস্তে বেত্রদণ্ড। উত্তরী রেশম বা কার্পাস সূত্র-নির্মিত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভক্তরা অপরাহ্ণে গ্রামস্থ নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান করেন ও পরস্পরের গলায় 'উত্তরীয়' পরাইয়া ব্রত গ্রহণ করেন।"

জেমোকান্দি গ্রামে যে-ধর্মঠাকুরের ভক্ত প্রসঙ্গে লেখকের এই উক্তি, তাঁর নাম 'রুদ্রদেব'।

পুরাণে বা মঙ্গলকাব্যে ধর্মরাজের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তা আজ অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। তবে অঞ্চলভেদে, পূজাপদ্ধতির আচার-নিয়মের কিছু কিছু ভিন্নতা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। যেমন—বাণফোঁড়া বা মৃতদেহ নিয়ে নাচ ইত্যাদির বৈচিত্র্য সর্বত্র দেখা যায় না। ধর্মঠাকুর গ্রামের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু ধর্মরাজের মন্দিরের বাহ্য অলঙ্করণ বা বৈভব তেমন নেই। মন্দিরের প্রধানত দুটি অংশ। অভ্যন্তরে দেবতার অধিষ্ঠান এবং অন্য অংশে গুটিকয়েক বিরাট কাঠের ঘোড়া। এগুলি দেবতার বাহন। ঘোড়াগুলি এমনভাবে তৈরি যেন এখনি ছুটবে—এত জীবন্ত! কিন্তু তা হলে কি হবে—ঐগুলিকে নিয়ে গ্রামের মানুষ ছড়া কাটে ঃ "বাবা ধর্মরাজের ঘোড়া/ ডান পা'টা লটরপটর/ বাঁ পা'টা খোঁড়া, বাবা ধর্মরাজের ঘোড়া।" ❑

শব্দচেতনা ৫২

শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি ঃ (১) "কালী —— বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী" (৪) "—— ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্" (৫) "—— সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ" (৭) "উবাচ কালীং কল্যাণী —— চণ্ডিকা বচঃ" (৯) "যামন্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং ——কৈটভম্" (১১) "কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ ——" (১২) "—— চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি" (১৪) "তত্রাপি সা —— যুযুধে তেন চণ্ডিকা" (১৫) "দস্যুভির্বা বৃতঃ —— গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ" (১৬) "নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে ——"।

ওপর-নিচ ঃ (১) "কন্যাভিঃ ——খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরা-সেবিতাম্" (২) "উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং —— কুরু" (৩) "জনয়ামাস —— মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্" (৪) "করেণ চ মহাসিংহং —— চকর্ষ জগর্জ চ" (৬) "ইতি কৃত্বা —— দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্" (৮) "যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী ——" (৯) "তামুপৈহি —— শরণং পরমেশ্বরীম্" (১০) "অথা নঃ —— ভব" (১১) "—— যত্র তথাৰ্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্" (১২) "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ ——" (১৩) "নীলগ্রীবা বর্হিঃকণ্ঠে —— নলকুবরী" (১৪) "—— ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্"।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পৌষ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

কবিতা

নবনিকেতন

গৌরীশঙ্কর রায়

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্,
এক হতে বহু হলেন—তিনি যে স্বয়ম্
লীলা আস্বাদনে; তাই তো সৃষ্টি নব নব প্রাণের,
বিশ্বজগতে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বিচিত্র অবদানের।
তারই মাঝে চলে তাঁর অপার্থিব রসানুভূতি।
মানবজীবনে বহতা নদীর মতো দুর্নিবার গতি,
শিক্ষা, কর্ম, সংসার-ধর্ম, আত্মানুসন্ধান,
উৎকর্ষলাভের পথে জীবন যৌবন ধন মান;
এরই মধ্যে মালিকার মধ্যমণি হীরকের মতো—
বাসনার কেন্দ্রে জ্বলে উজ্জ্বল জ্যোতিতে সতত,
শান্তির আগার—এক বাসযোগ্য আবাসের ছবি,
যাকে ঘিরে রামধনু গড়ে তোলে হৃদয়ের রবি।
পাখিরা শাবকদের লালন করে নিজ নিজ নীড়ে,
দিবাশেষে ক্লান্ত দেহে সে-নীড়েই আসে তারা ফিরে।
এমন যে-বাসগৃহ—শান্তির আনন্দ নিকেতন
প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের শুভাশিসে স্পন্দিত হোক অনুক্ষণ।
এ-বিশ্বে একদিন সবকিছু হয়ে যাবে লয়,
তন্নিষ্ঠ মানবচিত্তে—ঈশ্বরই পরম আশ্রয়।

ফিরে যাব নিজ ঘরে

শেফালী চক্রবর্তী

অভিমানী বালিকার মতো দিন কেটে যায়,
ঘন অন্ধকারে তোমার মুখ মনে পড়ে।
পাইনি আমি সুচারু ফসল, সবাই যা চায়,
ভেতরে দারুণ খরা, চোখ থেকে জল ঝরে।

হতাশার দমকা বাতাস মগ্ন চরাচরে
বিষণ্ণবেলায় ভেঙে গেল চাঁদমামা
দুপুর গিয়ে সন্ধ্যে আসে—রাত্রি যায় পুড়ে
হারিয়ে গেল আমার শব্দের খেলাধুলা।

সব ছক এলোমেলো স্তব্ধ হয়ে যায়,
শব্দের ধূলিকণা ছেড়ে, অনুভবে চাঁদ ছুঁয়ে
অক্ষরের ছেঁড়া তার আমায় স্বপ্ন দেখায়,
ভাঙাচোরা বোধকে সাজাব উদ্দেশ্য-বিধেয়ে।

আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী উদ্বেগে উতলা
তুমি দীর্ঘকাল আগলে রেখেছ বুকে করে
ওরা তো জানে না মাগো বয়ে যায় কালবেলা
পরবাসী, আমি ফিরে যাব নিজ ঘরে।

গৈরিক পরিব্রাজক

অশোক কর

বেদনা যখন বিদ্রোহের সিঁড়ি বেয়ে পূর্ণ হয়,
তার নাম—শাশ্বত দ্যুতিময় এক মৃত্যুঞ্জয়।

এতদিন দেখেছি শোষণ সমাজের স্তরে স্তরে,
অর্থকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবীরা গড়েছে সংগঠন,
এসেছে অর্থ, তবু বঞ্চনার হয়নি অবসান,
রক্তহীন রুগ্ন মিছিল পথে পথে পথ খুঁজে মরে।
ধনবানের চিরন্তন শোষণ নিত্য রঙ বদলায়,
শোষণ চলেছে নিত্য শক্তিমানের বাণের নিষ্পেষণে,
শোষণ টিকে থাকে বুদ্ধিমত্তার শাণিত যুক্তিতে,
শোষণ অন্য মাত্রা পায় যূথশক্তির মাত্রাহীনতায়।

জাহাজ যায় কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরের গায়,
পৌঁছে যান তিনি মিশিগানের নীল কিনারায়,
তারপর মহামিলনের মঞ্চ-সম্মেলনকক্ষ 'কলম্বাস হল'
চলমান এক অভিজ্ঞানের জন্ম হয়—পরিপূর্ণ গেরুয়ায়।

কে জানত, ধর্ম তো ভাল হওয়া আর করার একীকরণ,
ধর্ম মানে সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে দীপ্ত প্রতিবাদ,
সুপ্ত দেবত্বের ঘুমভাঙানো হলো জীবনের ব্রত,
ছোট সত্য পেরিয়ে নিত্য বড় সত্যে উত্তরণ।

গেরুয়ামোড়া এক চুম্বকধর্মী 'Country Man'
সিস্টার বলছেন—'Swamiji was India'
নেতাজীর মধ্যে তাঁর বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণ,
তিনি বলতেন—'Man making is my Mission'।

বেদনা যখন বিদ্রোহের ডানা মেলে পূর্ণ হয়,
তখন ঘটে যায় অমৃতময় উদার অভ্যুদয়।
মাথা আমার নত হয়—কি জানি কোন মন্ত্রে
প্রণাম রাখার যোগ্য নই—কেমনে হয় প্রণয়?

কেউ যেন বলায় আমায়—আমিই 'বিবেকানন্দ',
বলতে পেলেই জোর পাই—এই আমার আনন্দ,
নাই বা হই স্বামীজী—জীবনটা যদি একটু ফোটে,
একটু সত্য, একটু নিষ্ঠা—সামান্য নয় তা যে অনিন্দ্য।

বেদনা যখন বিদ্রোহ হয়ে—হয় বুদ্ধহৃদয়,
আমার প্রতিটি স্পন্দন যেন অযুতবার উদ্বুদ্ধ হয়।

পথ বিষয়ক

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মানুষ তো পথের কাঙাল—
চলতে চলতে বুকে ওঠে ঝড়
সঠিক নিশানা খুঁজে খুঁজে
শুনে যায় ঋদ্ধ কণ্ঠস্বর।

কাকে চায়, কাকে খুঁজে যায়
ক্ষত পায় ধুলো মেখে মেখে?
দুটো চোখ খোঁজে নিরবধি
এই পথে কত ছবি এঁকে।

দেখা হয়ে যায় কোনখানে
পবিত্র প্রেমের অঙ্গীকারে
জীবনের যন্ত্রণার শেষে
চেতনার সৃষ্টির আধারে।

মানুষ তো পথের কাঙাল—
চলমান জীবন্ত সময়
মাঠ জুড়ে সবুজ বিপ্লব
জীবনের অমিত সঞ্চয়।

বদ্ধ জীবন

সুনীলকুমার পাল

ইচ্ছেমতো এধার-ওধার বেড়াই,
সুযোগ পেলে নিজের করি বড়াই,
মাঝেমধ্যে এর-ওর সাথে লড়াই,
এমনি করে দিনগুলো সব কাটছিল তো বেশ।

মন্দ ভাল হরেকরকম চাওয়া,
পূর্ণ হলো অনেক কিছুই পাওয়া,
তাই তো আমি লাগিয়ে গায়ে হাওয়া,
ভেবেছিলেম হেসেখেলেই জীবন হবে শেষ।

এমন সময় বললে তুমি—ওরে,
জালের মধ্যে আটকে আছিস পড়ে,
মুখ গুঁজে পাঁকেতে চুপ করে,
জেলে এসে হড়হড়িয়ে তুলবে সেখান থেকে।

সেই থেকে তাই লাগছে প্রাণে ভয়,
এটা তো ঠিক জীবন মোটে নয়,
জাল থেকে তো পালিয়ে যেতেই হয়,
পথ বাতলে দেবে কি হায় আমায় কাছে ডেকে?

ঋণী

সিদ্ধার্থ সিংহ

মিছিমিছি কাঁদবে না
আর
প্রাণ খুলে হেসো, বার
বার।

হাঁটবে না ভুলভাল
পথে
আঘাত দেবে না কারো
ক্ষতে।

যে যতই চলে যাক
দূরে
তুমি তার থেকো বুক
জুড়ে।

তবু যদি আসে জল
চোখে
কখনো পোড় না ভেঙে
শোকে।

বোঝ না কি রয়েছেন
তিনি
যাঁর কাছে তুমি চির
ঋণী।

তুমি

আশিসকুমার গুপ্ত

তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
আকাশে বাতাসে তুমি, তুমি মানবের মনে।
যতদূর যেথা যাই, তুমি ছাড়া কিছু নাই॥
প্রতি অনুকণা মাঝে তোমারি মহিমা গান,
তোমার সৌন্দর্য হেরি পুলকিত মম প্রাণ।

আকাশে, বাতাসে, জলে যখন যেখানে যাই
তোমার মহিমা শুনি; তোমারি মহিমা গাই।
জগৎ ব্যাপিয়া তুমি, তুমিই জীবন-স্বামী॥
চিরদিন কর বাস মানব-হৃদয়মাঝে।
তবু কত শত নর সদাই তোমারে খোঁজে।

জগতে যাকিছু আছে সমগ্র তোমাতে ভরা,
তোমারি সৌন্দর্যে এই শোভিত বসুন্ধরা।
জগতে যাকিছু রাজে, তুমিই গড়েছ তা যে,
আদি-অন্ত-মধ্য তুমি কল্যাণ কারণ,
তোমার শ্রীপাদপদ্মে বন্দি নারায়ণ।
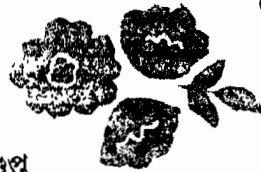
এই জগতে সত্য

যদুপতি মল্লিক

এই জগতে সত্য যে গো
নেইকো কোথাও আর
কেবলমাত্র 'ঈশ্বরই', তাঁর
পাদপদ্মই সার!

'তিনি' নাই তো সবই শূন্য
সংসারেতে দুখ—
আর যাকিছু মরীচিকা
'হরি'ই পরম সুখ!

এই জন্মের উদ্দেশ্য তো
'তাঁকে'ই ভালবাসা—
'তাঁকে' লাভ করতেই এই
পৃথিবীতে আসা!

প্রার্থনা

কিশোরীরঞ্জন গোস্বামী

মোহ-কালিমা ঘুচাও নাথ
নিবেদি তোমারি চরণে,
ঘুচাও সকল বেদনা প্রভু
অশ্রু ঝরে যে নয়নে।

পুলকিত কর হৃদয় আমার
তোমারি মহিমা গানে,
নন্দিত হোক আমার ভুবন
তোমারি নীরব দানে।

শক্তিসাগর মন্থন করে
দাও গো অমৃত প্রভু,
জীবন-সায়াহ্নে তোমারে নাথ
ভুলি না যেন হে কভু।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা ১৭নং বোসপাড়া লেনে ১৯০২ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত এই ১০ বছরকাল বাস করেছিলেন। সেটি আজ তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। বাড়ির দেওয়ালে ফলকে লেখা 'The House of Sisters'। সত্যসত্যই তিনি ছিলেন ভারতবাসীর ভগিনী। আইরিশ হয়েও তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজীর প্রেরণায়। এই বাড়িতে সেকালে কত বড় বড় লোক এসে জমায়েত হতেন। নিবেদিতার কাছে তাঁরা আসতেন একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিপ্রায়ে।

শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে এসেছেন। গোপালের মা-র শেষজীবন এখানেই কাটে। সেকালের বড়লাট লর্ড মিন্টোর স্ত্রী এখানে আসেন নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। স্বামীজী চেয়েছিলেন নিবেদিতার বাড়িকে একটি আদর্শ হিন্দু রমণীর বাড়ি করে গড়ে তুলতে।

তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ অশান্ত। পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে বিপ্লবীরা। নিবেদিতাও তাদেরই একজন। তাঁর বাড়িতে সকলেই আসেন। রবিবারে ভিড় হয় সবচেয়ে বেশি। 'স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের মন্তব্য থেকে জানতে পারি, রবিবার সকালে অনেক বড় বড় লোক এসে এবাড়িতে জলখাবারে যোগ দিতেন। তাঁদের মধ্যে থাকতেন শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র সকলে। এখানে প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের দেখা যেত। অনেকের মধ্যে বক্তা স্মরণ করেছেন একজন বাঙালি সম্পাদকের কথা। তিনি হাসির ছলে জীবনের গূঢ় কথা প্রকাশ করতেন। ১৯০৬ সালে মিস্টার উইলিয়াম জেনিংস সপত্নী তাঁর বাড়িতে আসেন। ভারতবাসী নিবেদিতাকে আপন করে নিয়েছিল এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করত। মাঝে মাঝে নিবেদিতাকে অর্থকষ্টে পড়তে হতো।

কলকাতার বাসায় লোকের ভিড়ে একটুও অবসর পান না নিবেদিতা, তাই চলে এলেন দার্জিলিঙে। শেষ করলেন তাঁর 'The Web of Indian Life' গ্রন্থটি। ১৯০৪ সালে সেটি প্রকাশিত হলো। এরপর স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কলকাতায় চলে এলেন। 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির' কর্তৃক আয়োজিত সভায় অনেকের সঙ্গে তিনিও বক্তৃতা দিলেন। ২০ জানুয়ারি গেলেন বাঁকিপুরে। সেখানে 'পাটলিপুত্র বালক সঙ্ঘ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন : "শক্তিশালী যুবকবৃন্দের আশু প্রয়োজন। কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে যেন সব শক্তি শেষ না হয়ে যায়। সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের মঙ্গলসাধনা। দেশের মঙ্গলের জন্য যেদিন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক আসবে, সেদিন কেউ যেন ঘুমিয়ে না থাকে।"

বঙ্গদেশ ও বাঙালির কাছে নিবেদিতা চিরস্মরণীয়। তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর আদর্শে এদেশীয় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মধ্যে স্বদেশমুক্তির ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রভাব। স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা স্বামীজীর সংস্পর্শে নিজেকে গড়ে তোলেন।

ভারতবর্ষের বেদান্তের আদর্শ, ভারতীয় নারীর আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। স্বামীজীর বাণীর অর্থ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মূলত স্বামীজীর কর্ম ও আদর্শই নিবেদিতাকে ভারতে টেনে আনে। ভগিনী নিবেদিতা এদেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বোসপাড়ায় ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি 'নিবেদিতা গার্লস স্কুল' নামে পরিচিত।

ভারতবাসী এই বিদেশিনীকে একান্ত আপনজনে পরিণত করেছে। ১৮৯৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ভগিনী নিবেদিতা আয়োজিত এক চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামীজীর সাক্ষাৎকার ঘটে। ভারী মিশুকে ছিলেন তিনি, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, গঙ্গাতীরে সকলের সঙ্গে তিনি আলাপ-পরিচয় করতেন হেসে হেসে। দেখা হলে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভিবাদন জানাত। নিবেদিতা এদের উদ্দেশে বলতেন : "স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র। সেই নিঃস্বার্থতার সাধনা আমাদের করতে হবে যাতে দেবহস্তের বজ্র হয়ে উঠতে পারি।" ভারতকন্যা নিবেদিতা উদাত্ত কণ্ঠে আরো বলেছেন : "আমরা কি নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখ-কাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষকে দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান : "ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তানদের কাছে তুমি একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু হয়ে ওঠ।" নিবেদিতা স্বামীজীর বাণী শুনে মুগ্ধ হন এবং ২৫ মার্চ ১৮৯৮ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় দর্শন এবং নারীর আদর্শ স্বামীজীর কাছে শুনে তাঁর অনুসরণযোগ্য মনে হয়। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ঠাকুরঘরে প্রথমে শিবপূজা, তারপর ভগবান বুদ্ধের চরণে অঞ্জলি দেওয়ালেন স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকেই মার্গারেট ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এবং সাহসী। স্বামীজী মার্গারেটের নাম রাখলেন 'নিবেদিতা'। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সকাল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন : "ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়।" বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন : "নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

নির্মলকুমার লাই
লেক টাউন, কলকাতা-৭০০ ০৮৯

প্রসঙ্গ : একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের 'একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী' লেখাটির মতামত প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যায় বিখ্যাত বীরভূম-গবেষক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় অমিত চক্রবর্তীর 'ওখবতী ভাঙনে নির্মাণে' (পরিবেশক—প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা) কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে জানাই, উক্ত কাব্যের 'ওখবতী' ঠিক নদী নয়—একটি মানবিক চরিত্র। ব্লার্বের লেখা থেকেই স্পষ্ট, মহাভারতের একটি ছায়াচরিত্রের ভাঙন ও

নবনির্মাণ। গত ২৬ জুন 'দৈনিক অসম' পত্রিকায় নারীবাদের ওপর লেখা একটি প্রবন্ধে শ্রীচক্রবর্তীর 'ওখবতী'র উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার বড়ুয়া। বিনির্মাণ তত্ত্বের কাব্যিক প্রয়োগের আলোচনায় তার প্রসঙ্গ আসাও অস্বাভাবিক নয়। নদী এখানে বন্ধনমুক্ত বহতার প্রতীক হিসাবে বিধৃত হয়েছে। মণিরত্নবাবু বিনির্মাণের ইঙ্গিতটিকে সঠিক ধরেছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুর অনুশাসনপর্ব সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে জানাই—কালীপ্রসন্ন সিংহের মূলানুগ অনুবাদে এবং রাজশেখর বসুর সারানুবাদেও এই পর্বের উল্লেখ সুস্পষ্টভাবেই আছে।

অরিন্দম সিংহ
রামপুরহাট, বীরভূম

প্রসঙ্গঃ মহাভারতের সরস্বতী এবং ওঘবতী নদী

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'সরস্বতী এবং ওঘবতী নদী' প্রসঙ্গে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন এবং মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়ের উত্তর প্রসঙ্গে জানাই, সরস্বতী নদীর সপ্তনাম মণিরত্নবাবু-লিখিত মহাভারতের শল্যপর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে নেই। একোণচত্বারিংশতম (৩৯তম) অধ্যায়ে এর উল্লেখ। শ্লোকসংখ্যাগুলি অবশ্য (৪, ১৩, ১৯, ২১, ২৩ এবং ২৫) সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর পত্রে।

চিঠির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত থেকে এই অধ্যায়ের (৩৯ অধ্যায়) প্রথম অংশ (উপশিরোনাম: 'সপ্ত সারস্বত তীর্থ বর্ণন') ৩য় ও ৪র্থ—মাত্র দুটি শ্লোকের গদ্যানুবাদ লিখে জানাচ্ছি: "সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূতা হয়েন।" (৩) "তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেন্দ্র ও বিশালোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে।" (৪) এপ্রসঙ্গে অন্য শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ বাহুল্যবোধে এবং পত্রের অকারণ দৈর্ঘ্যের আশঙ্কায় দেওয়া হলো না।

ব্যাসদেব-কৃত মূল অষ্টাদশ পর্বের মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বের নাম 'অনুশাসন পর্ব'। মহাভারতের কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত গদ্যানুবাদই সর্বাধিক মূলানুগ এবং প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কাশীরাম দাস-কৃত মহাভারতের অনুবাদেও অষ্টাদশ পর্ব, কিন্তু এতে কিছু কিছু পর্বনামের পার্থক্য আছে—কাহিনীবিন্যাসেও নানা স্থানে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন আছে। অনুরূপভাবে বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত গদ্যানুবাদ। কৃত্তিবাস ওঝা এবং জগৎরাম রায়ের পদ্যানুবাদও সর্বত্র মূলানুগ নয়—কাণ্ডের নামেও পার্থক্য আছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর মতো অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা মূল মহাভারতের বা কালীপ্রসন্ন সিংহের মূলানুগ অনুবাদের শল্যবধের তৃতীয় অধ্যায়ে মণিরত্নবাবু দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বা শ্লোকার্থের সন্ধান পাবেন না বলেই এই সংশোধনীপত্র দিলাম। এতে অনুসন্ধিৎসুরা উপকৃত হবেন আশা করি।

ধীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর হাউসিং, আসানসোল-৭১৩ ৩০৪

ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজম্

মনের ক্ষোভ জমছে অনেকদিন ধরে। কথায় আছে—কালের প্রভাবে সকল বস্তুতেই কিছুটা সদ্‌গুণ বর্তায়। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর শতাব্দী অতিক্রান্ত। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্‌মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এর সালতামামি নেওয়া খুব জরুরি মনে হয়েছে। সংখ্যায় বাড়লে গুণে বোধহয় বাড়ে না। আমরা কি এরই মধ্যে স্বামীজীর আদর্শের 'ফোকাল লেংথ'-এর বাইরে চলে গেছি? নাহলে এতটা 'আউট অফ ফোকাস' হয়ে যাই কী করে?

ক্রমাগত অভিযোগ শুনি। আজকের যুবসম্প্রদায় যে 'ক্রশ সেকশন' আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের জানার গণ্ডির মধ্যে দেখছি, তাতে আদর্শের বিশেষ কোন প্রতিফলন নেই। কিন্তু যুবসমাজ কি এজন্য দায়ী? সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের সামনে আমরা কী আদর্শ রাখছি? চুরি, জুয়াচুরি, বদমাইসি, একে অন্যের চরিত্রহনন, মহিলাদের অবমাননা—কি নয়। মুখে আদর্শের কথা বলে কাজে না করা, শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। যেমন আলো নিভলেই অন্ধকার, তেমনি কাজ ফুরোলেই হারিয়ে যাওয়া।

দিশাহারা যুবসমাজ প্রতিনিয়ত ভুয়া প্রতিশ্রুতির যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের সামনে সঙ্কুচিত। সব সুযোগই মুষ্টিমেয় কিছু তথাকথিত ভাগ্যবান মানুষের জন্য। তা অর্থের জোরেই হোক বা পৃষ্ঠপোষকতার জোরেই হোক। খালি পেটে কোন 'আদর্শ' হয় না। মহাকবি কালিদাসকেও বলতে হয়েছিল: "অন্নচিন্তা চমৎকারাঃ।" উপনিষদেও বলা হয়েছে: "অন্নম্ ব্রহ্ম।" উপনিষদ্ তো ভারতের জীবনবেদ। এও আমরা জানি—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আজ আমরা শুধু বলহীন নই—আদর্শহীনও। আজকের যুবসমাজের মেরুদণ্ড অতি সুচতুরভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। নানা প্রলোভনে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যতর মতে। এজন্য আমরা সবাই দোষী। আমরা অতি সুকৌশলে তাদের 'ব্রেন ওয়াশ' করে চলেছি। সত্য তাদের জানতে দিতে চাই না। তাহলে হয়তো তারা সচেতন হয়ে উঠবে, কৈফিয়ৎ চাইবে।

আমার মনে হয়, আজ আমাদের আপনার দর্পণে নিজেদের মুখ দেখার সময় এসেছে। মনে হয় না আর বেশিদিন আমরা এভাবে মুখ লুকিয়ে চলতে পারব। মনকে চোখ ঠেরে এভাবে চলা যায় না। সমালোচনার পায়রা যেমন উড়িয়ে দিলে তা আবার ঘরেই ফিরে আসে, তেমনি 'ব্যুমেরাং' হয়ে ফিরে আসবে আমাদের পাপ আমাদেরই ওপর। এ সত্যকে যত তাড়াতাড়ি মেনে নিতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

আদর্শ যখন প্রকৃত জনকল্যাণের জন্য তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপনা থেকেই আদর্শ হয়ে ওঠেন। সেই অর্থে স্বামীজী প্রকৃত আদর্শবান ব্যক্তি। তাই তিনি সার্থকভাবেই অঘোষিত, অনির্বাচিত এবং অবিসংবাদিত মহানায়ক। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন নেতা। স্বামীজীকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি এবং ভালবাসি। কারণ তিনি আমাদের আত্মার আত্মীয়। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। তাই স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন—জনকল্যাণে প্রয়োজনে মঠের [বেলুড়ে] জমি বেচে দেব।

আমরা কিন্তু ন্যূনতম একথাটাও বলতে পারি না যে, আমার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি আছেন। যে যুবসমাজকে আমরা পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত ইত্যাদি বলে অসম্মান করি, তাদের জন্য আমরা কতটুকুই বা করেছি। মাঝেমধ্যে এক-আধটা সেমিনার। সেই সুযোগেও আত্মপ্রচার আর পরিশেষে ভূরিভোজ। নামেই যুবকল্যাণ, যুবসমাবেশ।

যে-শিক্ষার জন্য আমরা চিৎকার করে মাথা ফাটাই, শতবর্ষেরও আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন সেই 'লোকশিক্ষার মন্ত্র'। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সে-পরম্পরা? কেন আমরা তার যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারিনি। আর কবে করব আমরা আত্মসমীক্ষা বা আত্মসমালোচনা?

আবার গোড়ার কথায় আসা যাক। স্বামীজীর আদর্শ 'আউট অফ ফোকাস' হয়নি। আসলে উপবৃত্তের যে-নাভিতে আমরা আছি, তা থেকে আপাতত 'আদর্শ' দূরে সরে গেছে বা বলতে গেলে আমরাই দূরে সরে গেছি। অর্থাৎ অপসূরে (Aphelion) আছি। আবার কাছে বা অনুসূরে (Perihelion) আসব গাণিতিক নিয়মেই। ঘড়ির দোলকের মতোই তার দুই মেরুতে যাওয়া-আসা। এই দুই প্রান্তিক গতিভঙ্গি আমাদের বিভ্রান্ত করে মাত্র। ভালমন্দের চক্রাবর্তনে এগিয়ে চলে জগতের এই জীবনছন্দ।

তাই হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দ্বন্দ্ব-প্রগতির অমোঘ নিয়মে অবস্থান্তর ঘটবেই। এর অন্য নাম 'ডায়ালেকটিক মেটিরিয়ালিজম্'।

অজিত সেন
বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬

প্রসঙ্গ ঃ 'নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত 'নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন লেখকের দৃষ্টিতে কাজি নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিক চিন্তার এই স্বচ্ছ ও মনোজ্ঞ প্রকাশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করতে সর্বতোভাবে সক্ষম।

বহু সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও গুণগ্রাহী ভক্ত কর্তৃক নজরুল প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত অগণিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বিভিন্নপ্রকার পত্র-পত্রিকায় এমনকি পড়ুয়াদের ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। সেই রচনাসমূহ একত্রিত করলে মহাভারতের সমান না হলেও 'মহা-বাঙলা'র আকার তো পাবেই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিও সেই 'মহা-বাঙলা'য় একটি অভিনব সংযোজন।

নজরুলের ঐশীশক্তিসমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁর শৈশবকাল থেকেই স্ফুরিত হয়েছিল। সাধু-সন্ত-ফকিরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে অহরহ তাড়া করে চলেছিল। কোথায় গেলে তৃষ্ণার্ত আত্মা শান্তি পাবে। এইসময় উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে যথাবিধি ও নিয়মিত যোগানুশীলনের পথের সন্ধান পাচ্ছিলেন না বলে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূচনা হয়।

পরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদের নিমতিতায় বিধিনির্দিষ্ট গুরু যোগিবর বরদাচরণ মজুমদার (লালগোলা এম. এন. একাডেমির প্রধান শিক্ষক)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে নজরুল পরম শান্তিলাভ করেন এবং তাঁর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। এটাই নজরুলের জীবনের Turning Point। তারপর থেকেই গুরুর নির্দেশে নিয়মিত যথাবিধি তন্ত্র ও যোগসাধনায় ব্রতী হন। যোগিগুরুকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী জ্ঞাত হয়ে তিনি তদ্রূপ শক্তিসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করতে থাকেন। গুরুদেবও স্বীয় যোগশক্তি প্রিয় শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু সেইসঙ্গে সাবধানবাণীও দিয়েছিলেন ঃ "ঐ ঐশীশক্তির বেগ ধারণ করতে গেলে নিজ ক্ষেত্রটিকে সেই প্রবল বেগধারণক্ষম করে তুলতে হবে।"

প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে নজরুল পুত্রশোকে এতই বিহ্বল হন যে, গুরুর নিকট ছুটে গিয়ে স্বর্গত বুলবুলকে একবার চোখে দেখার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকলে সিদ্ধগুরু বরদাচরণ মজুমদার প্রিয়তম শিষ্য 'কাজি ভায়া'র মনোবাসনা পূরণ করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ "নজরুলের আধ্যাত্মিক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ সম্ভবত বুলবুলের মৃত্যু।"

অলৌকিক যোগশক্তি করায়ত্ত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নজরুলকে অত্যন্ত মোহগ্রস্ত করেছিল। মনে হয়, তন্ত্রসাধনায় তিনি যোগিজনবাঞ্ছিত উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিলেন অর্থাৎ মনকে 'সহস্রদল' পর্যন্ত উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু অবতরণ প্রক্রিয়া সম্যগ্‌ভাবে পালনে অসমর্থ অথবা "অতিরিক্ত চেষ্টার ফলে অনেকসময় শারীরিক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়... বেশি লোভ করিলে ফল বিপরীত হইতে পারে"—গুরুদেবের এই উপদেশ উপেক্ষার ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্কের স্নায়ু বিকল হয়ে যায় এবং চিরতরে স্মৃতি ও বাক্‌শক্তি অবলুপ্ত হয়। এই দুর্ঘটনা গুরুদেবের অবর্তমানে অর্থাৎ তিরোভাবের ২০ মাসের মধ্যেই ঘটে যায়।

কোন কর্মোপলক্ষ্যে একবার ঢাকায় গিয়ে কৌতূহলবশত নজরুলকে একটু চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলাম। হায়! বিধাতাপুরুষের একী লীলা! সদাপ্রফুল্ল মুখর কবিকে একেবারেই মূক করে দিলেন। মঙ্গলময়ের এ কোন্ মঙ্গল? পীর-পয়গম্বর, শ্যাম-শ্যামা, নারায়ণের গদা, আল্লাহ্‌র তলোয়ার—'বিদ্রোহী' বলে কবিকে কেউ এই দৈব অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে এল না!!! ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে আছি—মনে হলো লাল রং দেখে যেন কবির চোখে, মুখে, শরীরে উত্তেজিত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আমার ধারণা—সাধনকালে অপার্থিব কোনকিছু ভয়াল দাবানলসদৃশ দৃশ্য হয়তো এই অঘটনের মূলে ছিল।

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিতে সুফি জুলফিকার হায়দারের গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতাটির বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগছে—১৯৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা ঐ কবিতাটি কি সত্যি নজরুলের? ঐরকম অবস্থায় নজরুলের পক্ষে কোনপ্রকার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল কি? অধিকন্তু এই কবিতাটির ছন্দ, শব্দবিন্যাস, ভাববৈচিত্র্য নজরুল কবিতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অসমঞ্জস মনে হয়। তখন তো তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গুণগ্রাহী—কারো নিকট থেকে কি এর সমর্থন পাওয়া গেছে? কবিতাটির বিশ্বাস-যোগ্যতার ওপর কোন পাঠক যদি আলোকপাত করেন তবে আনন্দিত হব।

ধরনীধর মণ্ডল
কুতুবসহর, মালদহ

আলোচনা

সত্য-সন্দর্শন—রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

মিহির বসু*

খুব সাধারণ আটপৌরে একটা শব্দ—'সত্য'। কতবার কতভাবে যে এই শব্দটা আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। তবু তাকে নিয়েই অর্থাৎ 'সত্য'কে নিয়েই এই আলোচনা। মনে আসে প্রথমবেলার সেই নীতিশিক্ষার মধ্যে সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঃ "সদা সত্য কথা বলিবে।" সেখানে সত্য ছিল গুণাত্মক। কিন্তু অন্যকে বিশেষিত না করেও তো সত্যের নিজস্ব একটা ভাবরূপ আছে। তাহলে সত্যের স্বরূপ কি অনন্য, স্বতন্ত্র? সাধারণ মানুষের মনে, দার্শনিকের চিন্তায়, বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে কি তার কোন রূপান্তর ঘটে? সত্যের ব্যঞ্জনা নিয়েই এই প্রসঙ্গ।

ব্যুৎপত্তির গভীরে গেলে হয়তো সত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু মূল যে-শব্দ থেকে সত্য বিকশিত, সেই 'সৎ'-এর অর্থ অনেকটাই ব্যাপক—অস্তিত্বমাত্র থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সবকিছুর প্রকাশ সৎ-এর মধ্যে। এই অস্তিত্বময় সত্য আছে জগতে, বিশ্বলোকে; আছে অণু, পরমাণুতে। সত্য আছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, উপলব্ধিতে, অন্তর্জগতে। সত্যের আবির্ভাব কি তবে মানুষের মনে? সত্য কি তবে মননের ফসল? মানুষ কি সত্য সৃষ্টিতে আদিষ্ট—"সেই সত্য যা রচিবে তুমি।" বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর মননের সাহায্যে প্রকৃতির যে-সত্যকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসছেন, সেই সত্যের স্বরূপ কী? অন্ধকার থেকে এই আলোয় আসা কি পরম সত্যকে আবিষ্কারের ছোট ছোট প্রয়াস? অনাদি সত্যকে একটু একটু করে জানা। আবার এ-পথে না গিয়েও প্রাচ্যের ঋষিকল্প জ্ঞানীরা কেবল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে চিনে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য অনেকটাই স্পষ্ট ঃ "আমাদের শাস্ত্রে দুইপ্রকার সত্যের নির্দেশ রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। একটি সত্য সনাতন—উহা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্পর্ক বিষয়ক... সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব এতদ্বিষয়ক মতবাদ। প্রকৃতির সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক বিষয়সমূহ সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি।" এই সত্য সনাতন বা শাশ্বত; তাই স্থান, কাল ও কারণের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বিবেকানন্দের উপলব্ধি—এই সত্য অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম এবং যোগজ শক্তির সাহায্যেই এর সন্ধান মেলে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে অন্তর্জগতে। তবে এমন অনেক সনাতন জাগতিক সত্যও আছে, যা মানুষের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে না। যেমন, 'অভিকর্ষ বল' যা স্থান ও কালের সীমা মানে না। আইনস্টাইন এধরনের সত্যকেই বলেছেন 'Objective truth', যা বক্তা-নিরপেক্ষ। বিবেকানন্দ অন্য যে-সত্যের কথা বলেছেন তা "মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য।" এইভাবে "সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়।" একে মনে করা হচ্ছে বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ও প্রতীত সত্য, বক্তাসাপেক্ষ সত্য বা 'Subjective truth'। এমন কথা এখন অনেকেই জোর দিয়ে বলে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞানী যে-সত্য প্রকাশিত করেন সেটা তার নিজস্ব নয়, সর্বসাধারণের। এই সত্যকে অনেকে বলবেন বহির্জগতের সত্য বা কেবল জাগতিক সত্য। বিবেকানন্দ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুমিত সত্যের উল্লেখ করেছেন, তা স্থান ও কালের সীমানার মধ্যে বদ্ধ। তিনি সম্ভবত একে স্থূল বা অপরিশুদ্ধ সত্য মনে করেছেন। স্থান ও কাল এই সত্যকে পরিবর্তিত করতে পারে। অর্থাৎ এইসব সত্য দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। কিন্তু আবার এমন অনেক জাগতিক সত্য আছে যা ইন্দ্রিয়াতীত। কোন কোন সময় অজস্র অতিসূক্ষ্ম পরমকণা—'neutrino' আমাদের শরীর ভেদ করে চলে যায়। আমরা তা জানতে পারি না। ইন্দ্রিয়-সাক্ষ্যকেই সত্যের ('reality'-র) শেষকথা বলে মানতে হবে কেন? বিশেষ করে যদি কোন অস্তিত্বের (সত্তার) ও তার সঙ্গে যুক্ত সত্যের পরীক্ষিত প্রমাণ পাওয়া যায়?

বিবেকানন্দ যে-দুটি সত্যের উল্লেখ করেছেন, তারা কি প্রকৃতই সম্পূর্ণ আলাদা, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, নাকি সত্যানুসন্ধানের দুটি প্রক্রিয়া মাত্র? মনে হতে পারে একটি অন্তর্জগতের প্রয়াস, অন্যটি বহির্জগতের। কিন্তু একটি পথই দুটিকে যুক্ত করেছে, তা হলো গভীর মনন বা দর্শনের পথ। বিজ্ঞানের মোটাদাগের সত্য কিভাবে দর্শনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে সেবিষয়ে বিবেকানন্দের নিজস্ব মতামত হলো ঃ "আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণাগুলি হইতে একথার প্রমাণ ক্রমশ বেশি করিয়া পাওয়া যাইতেছে (যে,) বস্তুর সূক্ষ্মতর সত্তাই সত্য। যাহা স্থূল তাহা দৃশ্যমাত্র। স্থূল বিগলিত হইয়া সূক্ষ্মাকার গ্রহণ করে। পদার্থবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হয়।" এ হচ্ছে বিবেকানন্দের বৈদান্তিক দর্শনে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। কিন্তু এটা বাস্তব যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যার গবেষণার একটি বড় অংশ পরমকণা (elementary particle)-কে ঘিরে এবং এদের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীত বা গভীর অনুমানের ফসল। আবার বর্তমান 'quantum' তত্ত্ব সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সম্ভাব্যতার কথা বলে। অস্তিত্বের অনিত্যতাই এখানে সত্য। আর এই অনিত্যতার মূলে হয়তো আছে অতিসূক্ষ্ম কোন জাগতিক কণার (quantum) ওপর মানুষের মনের (চিৎ-কণার) প্রভাব। এসবই তো বিজ্ঞানকে দর্শনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে! এখানে আবার বিবেকানন্দের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে ঃ "যখন বলা হয়, যে-শক্তি পুষ্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে—সেই শক্তিই আবার চেতনার মধ্যে

** কলকাতা-নিবাসী; প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজি বিভাগের অধ্যাপক, গবেষক ও সুলেখক।*

স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে বৈদান্তিকও এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, বহির্জগতের সত্যতা এবং অন্তর্জগতের সত্যতা একই। এমনকি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা, উহা আমাদেরই সৃষ্টি। বস্তুত, বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমাদের মনই আমাদের অনুভূত বিষয়কে পরিবর্তিত করে।" এ তো হলো অনেকটাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিপাদ্যে ফিরে আসা। এই পরিস্থিতিতে দর্শনশাস্ত্রের রূপরেখাও গেছে অনেকটাই বদলে, তার ওপর পড়েছে 'positivism' (প্রত্যক্ষবাদ)-এর প্রভাব। দার্শনিকরা আজ অনেকেই হয়ে উঠেছেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)।

একসময়ে প্রশ্ন উঠল, সত্য-সন্দর্শনে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুদ্ধতা নিয়ে। একথা ঠিকই যে, বিজ্ঞানীরা নিজেদের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করেন না; সুতরাং তাদের গবেষণালব্ধ সত্য হচ্ছে বক্তা-নিরপেক্ষ সত্য (objective truth)। কিন্তু প্রতিবাদীরা বলেন, পরীক্ষাগারে গবেষক তার নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে কি করে? সে নিজেই তো এই পরীক্ষার অঙ্গীভূত, সুতরাং গবেষণার মধ্য দিয়ে যে-সত্য প্রকাশিত হচ্ছে তাও বক্তা-সাপেক্ষ অর্থাৎ মানব-মনের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। মানবত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকরা (রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন) বলতে চান যে, মানব-চেতনাকে বাদ দিয়ে কোন সত্যের অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। কোন কোন দার্শনিক আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে মনে করেন যে, শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়েও সত্যের সঙ্কেত পাওয়া যায়। নিসর্গ, শিল্পকলা বা কাব্যের অন্তর্নিহিত এই সত্য মানুষকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। যেদিন মানুষ থাকবে না, সেদিন 'এপোলো' বা 'মোনালিসা' তাদের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে কোন সত্যের সঙ্কেত পাঠাবে না। কিন্তু এমন কোন সৌন্দর্য কি আছে, যা স্থান ও কালের প্রভাবমুক্ত? সনাতন, শাশ্বত এবং মানব-নিরপেক্ষ? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন সত্য (Objective truth) আছে। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে, প্রকৃতি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। আর প্রকৃতির সত্যগুলি সনাতন, তারা মানুষের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে না। আসলে শাশ্বত এই সত্যের জগৎ অনেকটাই অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা। বিজ্ঞানের কাজই হলো এই আবরণকে সরিয়ে সত্যকে উন্মোচিত করা। অস্তিবাদী বা প্রকৃতবাদী (realist) বিজ্ঞানীরা (আইনস্টাইন তাঁদের মধ্যে একজন) একথাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, জাগতিক সনাতন সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের দায়বদ্ধতা, সত্য রচনা করা নয়।

এরকম গোলমেলে অবস্থার মধ্যে কিছু দার্শনিক আবার মায়াবাদকে টেনে আনলেন, বিশেষ করে প্রকৃতবাদী ও প্রত্যক্ষবাদীদের বিরোধী হয়ে। তাঁরা বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কার্য-কারণবাদ সবকিছু নস্যাৎ করতে চান। তাঁদের মতে এসবই অলীক, অস্তিত্বহীন, বিশ্বব্যাপী এক বিভ্রম। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের অনুসরণ করে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো যায় না, বড়জোর একটা 'গড়' (average) সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তাকে 'সাধারণীকরণ' (generalise) করা সঠিক নয়। প্রকৃত সত্য অনেকটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। আইনস্টাইনের মতে, যদি তাই-ই হয়, তাহলে ব্যক্তি-মানুষের ঊর্ধ্বে গোটা মানব-মন এই মায়াজালে বদ্ধ। এর সোজাসুজি কোন উত্তর অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন: "সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল মায়া তাহার অবগুণ্ঠনের দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।" কিন্তু আইনস্টাইনের 'Objective reality'-র ধারণাও তো এরকমই। কেবল তিনি মায়ার বদলে বলেছেন 'অজ্ঞানের আবরণ'। জ্ঞানীরা এই আবরণ ভেদ করতে পারেন। আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বেও এই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের লুকোচুরি খেলার কথা ভাবা হচ্ছে। এই যে quantum কণাকে বলা হচ্ছে "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ", "দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন"— এসবই তাহলে মায়াবাদীদের মতে মায়ার খেলা। আবার প্রাচীন বৈদান্তিক মতে 'মায়া' নিজেই 'একটি সত্য'। পরবর্তী সময়ে বলা হয়েছে, মায়া বাস্তবের বর্ণনামাত্র। সবকিছুই যে দেশ-কাল-কারণ দিয়ে পরিচালিত, এটাই মায়া। এই মায়াতেই আমরা দার্শনিক, আবার এই মায়াতেই আমরা বিজ্ঞানী। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ অবাস্তব।

অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের সত্যদৃষ্টির পথে বাধা বোধ হয় তাদের অন্তরের অস্বচ্ছতা বা মানসিক দৈন্য, গোঁড়ামি। আইনস্টাইন কিন্তু এ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি বলছেন: "বৈজ্ঞানিক সত্য কথাটির একটিমাত্র অর্থ খুঁজতে যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তথ্যটি বা গাণিতিক প্রতিপাদ্য কিংবা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এরকম এক একটি ক্ষেত্রে, 'সত্য' শব্দটির তাৎপর্য এক একরকম।" তাঁর মতে: "উচ্চমার্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে যৌক্তিকতার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস কাজ করে তা অনেকটাই ধর্মীয় ভাবের কাছাকাছি।" তাঁর মতে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানীদের নিজস্ব ধর্মের ভিত। Karl Papper-এর মতো অনেক দার্শনিক মনে করেন, কোন বৈজ্ঞানিক সত্যই চরম সত্য নয়। কথাটা অনেকটাই বাস্তব। বিজ্ঞানের জগতে এক সত্য থেকে আরেক সত্যে উত্তরণ ঘটে। নিউটনের জাগতিক তত্ত্বের পর দেখা দেয় আইনস্টাইনের মহাজাগতিক তত্ত্ব। প্রতিদিনই আমরা এই বিশ্বকে একটু একটু করে নতুনভাবে জানছি। আইনস্টাইন বলছেন: "আমি বলতে চাই না, আমি একেবারে ঠিক। আমি কেবল জানতে চাই আমি সঠিক (পথে) আছি কিনা।" এমনি করেই বিজ্ঞান পরম সত্যের পথে এগোচ্ছে।

এখন ফিরে যাই একেবারে প্রসঙ্গের শুরুতে। দুই মনীষীর কথায়। রবীন্দ্রনাথ ও আলবার্ট আইনস্টাইন। আগের আলোচনার নিরিখে এঁদের একজনের মন জুড়ে আছে অধ্যাত্মদর্শন, আরেকজনের বিজ্ঞানদর্শন। কিন্তু আগাগোড়াই এঁদের জীবনধারা বয়েছে দুই ভিন্ন খাতে, ভিন্ন পরিবেশে। বংশপরম্পরা ও পরিবেশ যে মানুষের সত্য উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে তা অনস্বীকার্য। এই দুই মনস্বীর জীবনেও সত্যের আবির্ভাব হয়েছে দুটি ভিন্নরূপে। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১) ও আইনস্টাইন (১৮৭৯)-এর বয়সের ব্যবধান প্রায় দুই দশক। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোতে শুরু করেছে। ধনীপুত্র রবীন্দ্রনাথ

পরম নিশ্চিন্ততায়, একটি সমৃদ্ধ, কেতাদুরস্ত পরিবারের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। নানা বিষয়ে শিক্ষা ও অধ্যাত্মবাদে দীক্ষালাভ করছেন। পুষ্ট হচ্ছে এক উপনিষদের কবির মন। এই সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতকের উপান্তে আইনস্টাইন পরিবার জীবনসংগ্রামের তাগিদে এক শহর থেকে অন্য শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আলবার্টের লেখাপড়ায় এসেছে অনিশ্চয়তা, কিন্তু তীব্র হয়ে উঠছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়। জীবনের রূঢ় সত্য তাঁর সামনে। কিন্তু এরই মধ্যে সঙ্গীতের মূর্ছনা তাঁকে টেনেছে, সন্ধান দিয়েছে এক নতুন দিগন্তের। পাঁচবছর বয়স থেকেই তিনি বিস্ময়কর দক্ষতায় বেহালার সুরে নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন। বাস্তব সত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকলেও জীবনে তিনি শিল্প-সঙ্গীত-সৌন্দর্যের জগৎকে অস্বীকার করেননি কখনোই। তাঁর উন্মুক্ত মন স্কুলের ধরাবাঁধা পাঠক্রম আর আইনের কড়াকড়ি একেবারেই মানতে পারত না। কবিতা লিখে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার হাত থেকে পেয়েছিলেন মোটা অঙ্কের একটি চেক। শিশু আইনস্টাইন একদিন তাঁর রোগশয্যায় বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ছোট্ট একটি উপহার—একটি কম্পাস। প্রকৃতির রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ সেদিন তাঁর মনে এক বিস্ময়ের ঝড় তুলেছিল। আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন, প্রকৃতির এই 'রহস্যময় শক্তি' তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তাঁর আগামী পথ চলার নির্দেশ হয়তো এখানেই। ভেবেছিলেন দার্শনিক হবেন, কিন্তু একটা জ্যামিতির বই হাতে আসার পর তিনি বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করতে চাইলেন। জ্ঞানচর্চার বেশির ভাগই চলত বাড়িতে, নিজের জিজ্ঞাসার তাগিদে। এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রকৃতির রহস্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারতেন। আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "আপনার অভাবনীয় সব আবিষ্কারের মূলে কি আছে?" আইনস্টাইনের উত্তর : "আমার সত্যদৃষ্টি।" যাত্রাপথের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন জীবনের সত্যকে (reality) চিনেছেন ভিন্নরূপে। এরপর একজনের সত্য-সন্দর্শন হয়েছে অন্তর্জগতে, অন্যজনের বহির্জগতে। উত্তর আধুনিক কালের দর্শনের বাতাবরণ তখনো গড়ে ওঠেনি। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব দর্শনকে আলোড়িত করেছে নতুন করে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মমানসে ব্রাহ্ম পরিবারের, বিশেষ করে তাঁর বাবার প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। তাঁর কাব্যকৃতি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল উপনিষদের ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে। এটা কবির নিজের স্বীকৃতি : "অজ্ঞাতসারে আমি আমার বৈদিক পূর্বসূরিগণের পথই অনুসরণ করিয়াছি।" কবির ভাবনায় : "প্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রকাশের মধ্যে যে-বিস্ময় ছিল তা সর্বব্যাপী একটি সত্যের সঙ্গে যোগের নিবিড়তায় মনকে পূর্ণ করে দিয়েছিল।" এখানে উল্লেখ্য, সর্বব্যাপী এক সত্যের প্রকাশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় যোগের উপলব্ধি জেগেছিল আইনস্টাইনের মনেও। এই বিস্ময়, এই উপলব্ধির উপলক্ষ্য ছিল তাঁর বাবার দেওয়া একটি ছোট্ট কম্পাস। কম্পাসের কাঁটায় ছিল তাঁর ভাবনার দিঙ্‌নির্দেশ। বিস্ময় থেকে হয় দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব। কবি ও বিজ্ঞানীর মন এই আবির্ভাবের মধ্যে অনেকটাই কাছাকাছি এসে পড়েছে। দুজনের দর্শনে এই নিবিড়ত্ব প্রকৃতির মধ্যে সত্তা ও সত্যের উপস্থিতির উপলব্ধিতে। আইনস্টাইনের ভাবনায় প্রকৃতির রাজ্যে অনমনীয় শৃঙ্খলা ও ছন্দোবদ্ধতা ঐশীগুণের প্রকাশ। কিন্তু তিনি এমন কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না—যিনি মানুষের ভালমন্দ বিচার করেন, তাকে কৃপা করেন। আইনস্টাইন ছিলেন সেই স্পিনোজার ভাবশিষ্য, যিনি খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দর্শনে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সপ্তদশ শতকের মহিমান্বিত দার্শনিক স্পিনোজার (১৬৩২-১৬৭৭) জন্ম ইহুদি বংশে (আইনস্টাইনের মতোই)। আরোপিত ধর্মীয় সত্যের বিরোধিতা করে তিনি সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। বিশ্ববন্দিত এই দার্শনিকের রুজি-রোজগার হতো চশমার কাঁচ পালিশ করে। উপলব্ধ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর উপলব্ধ সত্য হলো —ঈশ্বর বিমূর্ত নয়, তবে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। ঈশ্বর লীন হয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতিতে, সেহিসাবে তিনি নিরাকার নন। স্পিনোজার দর্শনে এক অখণ্ড সত্তা (Substance) বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, তার কোন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নেই। স্পিনোজার এই দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের রূপান্তর বলা যেতে পারে। বেদান্তের এই বিশেষ মতবাদে বলা হয়েছে, আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্পিনোজাকে বলেছেন 'যুক্তিনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী'। এই স্পিনোজীয় দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি বলেছেন : "ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পিনোজীয় pantheistic" অর্থাৎ তিনি নিজে প্রকৃতিপূজারী হিসাবে পরিচিত হতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম আমেরিকাযাত্রার প্রাক্কালে উদ্যোক্তারা তাঁর ধর্ম-মনস্কতা জানতে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন : "আপনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী?" উত্তরে বিজ্ঞানী জানালেন : "আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এই ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী একত্ব আর ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, মানুষের কর্ম বা ভাগ্য বিচার করেন না। এই জ্ঞান ও গভীর আবেগই আমার ধার্মিকতা।" তাঁর এই অভিব্যক্তি একভাবে নাস্তিকতারই অন্য প্রকাশভঙ্গি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন : "ধর্মীয় সত্য (religious truth) আমার কাছে স্পষ্ট করে কিছুই ইঙ্গিত করে না।"

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সাধনায় এগিয়ে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন। কবি অন্তর্জগতে যে-সত্যকে আবিষ্কার করেছেন তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বাইরে। বহু মানুষের মধ্যে এক বিশ্বমানবের প্রকাশ দেখেছেন তিনি। বলেছেন : "অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা, মানুষের সীমানায়, তাকেই বলি 'আমি'।" জগতের রূপ, রস, সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান মানুষের মনে। সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের চেতনায়। কবির প্রত্যয় : "আমি বলব, এ সত্য,... এ আমার অহঙ্কার, মানুষের অহঙ্কার-পটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।" রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, তাঁর দর্শন, তাঁর উপলব্ধ সত্য (reality)—সব মানুষকে ঘিরে। কবির এই মানবমুখী সত্যানুসন্ধান তাঁর 'মানুষের ধর্ম'-এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। ১৯১৩ সালে ৪২ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। কেবল একটি বছরের যে-সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কার এল, তার মধ্যে প্রধান হলো 'Song offerings' নামে একটি ইংরেজি কবিতা সঙ্কলন। কাব্যগ্রন্থের নামটি বাঙলায় তরজমা

করা হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি'। অবশ্য মূল 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) থেকে এই সঙ্কলনের পার্থক্য অনেকটাই। রবীন্দ্রনাথের নোবেল সম্মান এল পশ্চিমী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। এল কবির বিশ্বপরিচিতি অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক হিসাবে। এল অভিনন্দন ও উচ্ছ্বাসের জোয়ার।

পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, একান্তে নিঃসঙ্গ আইনস্টাইন তখন কোন্ সত্যের সাধনায় মগ্ন? তাঁর কাছে জীবনের সত্য (reality) এসেছে অন্য এক রূপ ধরে। রণমত্ত বার্লিন শহরে বিপর্যস্ত গৃহস্থালীর মাঝখানে একা তিনি গবেষণায় ডুবে আছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্ত্রী আছেন জুরিখে। উপার্জনের প্রায় সবটাই চলে যায় সেখানে। বিজ্ঞানসাধকের আহার-নিদ্রার কোন ঠিক নেই। অনিয়মে পেটে আলসার দেখা দিচ্ছে, অসহনীয় যন্ত্রণায় স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ছে। অদম্য আইনস্টাইনের জীবনপণ—সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে রূপ দিতেই হবে। অবশেষে সাফল্য এল ১৯১৬ সালে। আইনস্টাইন তখন প্রায় শয্যাশায়ী, ২৫ কেজি ওজন হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক নন, তাই তত্ত্বকে প্রমাণিত করলে তবেই তাদের প্রতিষ্ঠা। অবশেষে যুদ্ধাবসানে ১৯১৯ সালে প্রমাণিত হলো আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত সত্য। রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু সেদিন তাঁর দুরূহ তত্ত্ব বিজ্ঞানীরাই সকলে বুঝে উঠতে পারেননি। বলা যায়, তাঁর এই দুর্বোধ্যতার জন্যই আইনস্টাইন দুনিয়ার নজর কাড়লেন, মানুষের মনের নাগালের বাইরে গিয়ে। এর অনেক আগে ১৯০৭ সালে যখন তিনি বের্ণের এক পেটেন্ট অফিসের কর্মচারী, তখন কাজের ডেস্কে বসে এই গবেষণার বিষয়টা তাঁর সত্যদৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে চাকরি করার সময় তিনি পদার্থবিদ্যায় যুগান্তকারী তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার একটি হলো আলোকাক্রান্ত তড়িৎকণার ওপর। বয়স তখন তাঁর ২৬ বছর। এই অসাধারণ গবেষণাটি পরবর্তী সময় পদার্থবিদ্যার নতুন দিগন্ত দেখিয়েছিল। এটা সকলেই স্বীকার করেন, বিজ্ঞানের জগতে তিনিই quantum theory-র জনক। এই যুগান্তকারী সত্যানুসন্ধানের জন্য ১৯২১ সালে তাঁকে নোবেলবিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। আজ প্রতিদিন বিশ্বের অগণিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এসবই পরম সত্যের সন্ধানে মানুষের ছোট ছোট পদক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন যখন নিজেদের সাধনায় গভীরভাবে মগ্ন, তখনো কিন্তু সত্যের স্বরূপ নিয়ে তাঁদের মতের সম্পূর্ণ মিল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা জীবনটি ধরেই তাঁর অধ্যাত্মভাবনাকে সযত্নে বহন করে চলেছেন। তবে জীবনের শেষ দশকে এসে সেই ভাবনার দীপ্তি মনে হয় অনেকটাই স্তিমিত। এখানে তাঁর দৃষ্টি, তাঁর প্রত্যয় কি অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে? যে অভয় শঙ্খে তিনি তাঁর প্রতীত সত্যের ঘোষণা করেছেন, তাকে অনাদৃত দেখে তিনি হাহাকার করেছেন। তিনি কি সত্যের অন্য কোন রূপ দেখেছেন? দেখেছেন নতুন কোন দেশ, যা তাঁর অজানা ছিল? সে-দেশ কি জেগে ওঠা পূর্ব ইউরোপ? তাঁর নতুন ভাবনা কি রূপ পেয়েছে কবিতার নতুন ছন্দে? এসময় পরিবর্তন এসেছে তাঁর অন্বেষায়। বিজ্ঞানের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। দার্শনিক ভাবনাগুলিকে বিজ্ঞানের নতুন আলোয় দেখতে চেয়েছেন। ১৯৩৭-এ এই নতুন জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির প্রকাশ 'বিশ্ব পরিচয়'। সেখানে বিজ্ঞানের জাগতিক অনেক সত্য কাব্যরসে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু সেখানে বিজ্ঞান সাধারণের বোধ্য হয়েছে—এমন কথা বলা যায় না। তবে এসময় তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা ছিল অনেকটাই গভীর। আমরা দেখব আইনস্টাইনের সঙ্গে দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানকে টেনে এনেছেন। বিশ্বমানব-সত্তার সপক্ষে তিনি পরমাণুর গঠনের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, অবশ্য এই মানসচিত্র পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ১৯৩০ সালে ১৪ জুলাই জার্মানির কাপুথ শহরে আইনস্টাইন তাঁর আবাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা সত্যের স্বরূপ নিয়ে কথাবার্তা বলেন। এখানে তাঁদের আলোচনার কিছু অংশ (ভাবানুবাদ) তুলে ধরা হলো। প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে।

আইনস্টাইন ॥ আপনি কি স্বতন্ত্র এক জগতে বিশ্বাস করেন, যা দিব্য লোকাতীত?

রবীন্দ্রনাথ ॥ না, স্বতন্ত্র জগৎ নয়। মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বকে নিয়েই জগৎ। সেখানে এমন কিছু নেই যা ব্যক্তিসত্তার আওতায় পড়ে না। এতেই প্রমাণ হয় যে, জগতের সব সত্যই মানবীয় সত্য। আমি একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করছি। যেমন ধরুন, পদার্থ তৈরি হয়েছে 'প্রোটন' আর 'ইলেকট্রন' দিয়ে। তাদের মধ্যে ফাঁক আছে। তবু আমরা পদার্থকে কঠিন চেহারায়ও পাই। এদের মধ্যে এমন কোন সংযোগ নেই যা তাদের সঙ্ঘাত করবে। তেমনি ব্যক্তিমানুষকে নিয়েই হয়েছে মানবসত্তা। মানবিক সম্পর্কই তাদের একত্ব দিয়েছে। এইভাবেই আমরা, ব্যক্তি মানুষেরা, এক মানবজগৎ গড়ে তুলেছি।

[মন্তব্য ঃ আইনস্টাইন আলোচনার শুরুতেই দর্শনের এক মূল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে কিছুটা বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ বহু-এর মধ্যে 'এক'-এর ব্যাখ্যা) দিয়ে এক পরম মানবের সত্তার কথা বলেছেন। কিন্তু এ-সত্য নিতান্তই ভাবের, ভবের নয়। এটি প্রতীত সত্য। মানববিশ্ব এখন বিপন্ন। তাছাড়া 'ইলেকট্রন' ও 'প্রোটনের' কণাগুলির মধ্যে আসলে তো কোন শূন্যস্থান নেই। অতিসূক্ষ্ম আদিভূত কণা (elementary particles) সেখানে উপস্থিত। আর ইলেকট্রনরা তাদের এলাকায় (shell-এ) সর্বব্যাপী, সদা অস্তিত্বময়।]

আইনস্টাইন ॥ বিশ্বকে ঘিরে দুটি ধারণা আছে—(এক) মানুষের সৃজিত একান্ত এক জগৎ, (দুই) মানুষের অস্তিত্ব বাদ দিয়েও শাশ্বত, অনাদি অস্তিত্বময় এক জগৎ।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাদের যে-জগৎ মানুষের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা, তাকে সত্য বলে জানি। তাকে সুন্দরের আধার বলে মনে করি।

আইনস্টাইন ॥ এটা সম্পূর্ণই জগৎ সম্বন্ধে মানুষের একটা উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এছাড়া অন্য কোন উপলব্ধি থাকতে পারে না। এ-জগৎটাই মানুষের। বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণাও বিজ্ঞানী মানুষের।

সুতরাং আমাদের ছাড়া জগতের অস্তিত্ব নেই। এটি একটি আপেক্ষিক জগৎ, আমাদের চৈতন্যেই তার অস্তিত্ব। কিছু যুক্তিবিচার ও আনন্দই একে সত্য করে তোলে। বহির্মানুষের (External Man) অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে আমাদেরই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

আইনস্টাইন ॥ এটা হচ্ছে সমগ্র মানবতার এক অস্তিত্বের উপলব্ধি।

[মন্তব্য : এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে মানবমুখী দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানবচৈতন্যে জগতের অস্তিত্বের কথা বলছেন তিনি। মনে করা যেতে পারে, বিবেকানন্দ এমনই এক বিশ্বব্যাপী মনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আমাদের মন 'একই মানস-সমুদ্রের ছোট ছোট তরঙ্গ'। মন নিরবচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' রচনায় বিশ্বমানব-মন সম্পর্কে বৈদান্তিক চিন্তার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে আত্মিক সম্পর্ককে উপলব্ধি করে, জীবনসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করে, সে-সত্তা পারমার্থিক। আপনার সীমাতীত সত্য। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত। আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে 'Univesal mind'-এর উল্লেখ করেছেন, এ সম্ভবত তাই। কিন্তু 'External Man' বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝাতে চেয়েছেন তা খুব স্পষ্ট নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন : "ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশ-কালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা।" এই কি তবে সেই External Man বা Universal Being? সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে যে-সত্য প্রকাশিত, আইনস্টাইন মনে করেছেন তা হচ্ছে ব্যক্তিনির্ভর (subjective) এবং এই প্রশ্ন রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের সামনে।]

আইনস্টাইন ॥ সত্যই ধরুন বা সৌন্দর্য, তা কি মানুষের উপলব্ধি থেকে মুক্ত নয়?

রবীন্দ্রনাথ ॥ না।

আইনস্টাইন ॥ তাহলে মানুষ যদি না থাকে, তাহলে বেলভেডিয়ার এপোলো (Apollo) আর সুন্দর থাকবে না?

রবীন্দ্রনাথ ॥ না।

আইনস্টাইন ॥ সৌন্দর্যের ব্যাপারে যদিও বা একমত হই, সত্য সম্বন্ধে আমি তা নই।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কেন? সত্য তো মানুষের উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে।

আইনস্টাইন ॥ আমার গভীর বিশ্বাস যে, মানুষের উপস্থিতি ছাড়াও 'বৈজ্ঞানিক সত্য'কে সত্য বলেই ধরে নিতে হবে। মানুষকে বাদ দিয়েও যদি কোন সত্তা থাকে, তাহলে তার প্রেক্ষিতে সত্যও থাকবে। আর সে-সত্তা না থাকলে সত্যও থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সত্য যা Universal Being-এর সঙ্গে একাত্ম, তা মূলত মানবিক। বৈজ্ঞানিক সত্যও মানুষের চিন্তাক্রম থেকেই পাওয়া। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মই হচ্ছে পরম সত্য। ব্যক্তিমন একে বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। এধরনের সত্য বিজ্ঞানের জগতে নেই। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূর করে বক্তা-নিরপেক্ষ (Objective) সত্যে পৌঁছাই, যা আছে Universal Man-এর (মানব পরমাত্মার) মনে।

[মন্তব্য : 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মত মাত্রই নিত্য—এমন কথা বলা চলে না। ধর্মমতের ক্ষেত্রেও তাই। ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে মনের সমস্ত মলিনতা, চাঞ্চল্য ও বিকার থেকে মুক্ত হতে হবে। আত্মিক সত্যের ক্ষেত্রে সেটা আরো বেশি প্রয়োজন। বিবেকানন্দের ভাবনার প্রতিচ্ছবি পাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি দ্বারা।" মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায় (আইনস্টাইনের মতে Objective truth) "যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেজন্য তা শ্রদ্ধেয়।" কিন্তু জড়কে 'জগৎ' করেছে প্রাণ। তাকে আমরা অস্বীকার করি কি করে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "জড়কে তথ্যরূপে জানি... সে বাইরের। কিন্তু প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। 'তার সমস্তটাই গতি'।" কিন্তু এই প্রাণকে যদি শক্তি বলে ধরে নিই, তা সে তাপই হোক, বিদ্যুৎ হোক বা গতি, তাহলে তা বস্তু বা জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, জড় ও শক্তি অভিন্ন, একে অপরের রূপান্তর মাত্র। তাহলে একই সত্য কি দুই রূপে প্রকাশমান? এমন দ্বৈত সত্য আরো আছে। যেমন আলোর প্রকাশ কখনো তরঙ্গে, আবার কখনো কণাবর্ষণে।

আইনস্টাইনের সঙ্গে উল্লিখিত এই আলোচনার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ Hubbert Lecture দেন। বিষয় ছিল 'Religion of Man' (মানুষের ধর্ম)। মনে মনে চলছিল তারই প্রস্তুতি। তাই তাঁর দর্শন হয়ে উঠেছিল মানবমুখী। অন্যদিকে আইনস্টাইনের দৃঢ় প্রত্যয় যে, সত্য মানবাতীত অর্থাৎ বক্তা-নিরপেক্ষ (Objective truth)। তাঁর মতে, প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলা আর ছন্দোবদ্ধতার মধ্যেই আছে সত্তার প্রকাশ। তিনি ছিলেন স্পিনোজীয় দর্শনে বিশ্বাসী। স্পিনোজার ভাবনায় ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত। আবার কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রসার ও অনিশ্চয়তাবাদের প্রতি নির্ভরতা আইনস্টাইনকে হয়তো অনেকটাই বিব্রত করে তুলেছিল। তিনি সেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, যিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেন না। এই বিশ্বাস থেকেই উঠে এসেছিল তাঁর বিখ্যাত উক্তি : "God does not play dice with the world." উল্লিখিত রবীন্দ্র-আলবার্ট আলাপচারিতার শেষে আইনস্টাইন দাবি করে ছিলেন যে, তাঁর ধর্মনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গভীর। অবশ্যই আইনস্টাইনের 'ধর্ম' প্রচলিত কোন ধর্ম নয়।] ❑

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অবতারে অবিশ্বাস

ডাক্তারকে বলেন গিরিশ, বুঝি না কারণ তার,
কেন যে আপনি সব বুঝে-সুঝে তবুও কিছুতে
মানেন না অবতার।
ঠাকুর বলেন, ঈশ্বর দেন অবতার হয়ে দেখা,
ও গিরিশ, ও তা মানবে কি করে? একথা যে ওর
'সায়েন্স'-এ নেই লেখা।
বলি তবে শোন, একজন এসে আরেকজনকে
বললে, বিপদ ভারি,
ভেঙে পড়ে গেছে ওপাড়ার ঐ অমুকের পুরো বাড়ি।
যে ঐ খপর লোকটার কাছে শুনল নিজের কানে,
সে আবার কিনা যে সে লোক নয়, ইংরিজি লেখা-
পড়াটাও বেশ জানে।

তাই বলে, থাম, আগে খপরের কাগজটা পড়ে দেখি,
পড়ে বলে, কৈ, কাগজ তো কিছু বাড়ি ভাঙা নিয়ে
করে নাই লেখালিখি?
আজে-বাজে কথা রাখ—
কাগজে না-লেখা খপরকে আমি, যত যা-ই বল,
বিশ্বাস করি নাকো।
ঠাকুর একথা বলার কারণ, আমরা অনেকে
কেতাবি জ্ঞানের জোরে
মানতে চাই না অনেক কিছুই অহংজনিত
অহঙ্কারের ঘোরে।

ছবি ঃ সৌরীশ মিত্র • ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ লীলাকথা

স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

১৮৮৩ সালের শেষভাগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ (তখন তারকনাথ ঘোষাল) গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করে একদিন পিতার কাছে উপস্থিত হলেন অনুমতিলাভের জন্য—

তারকনাথ অতঃপর আশ্রয় নিলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে।

একবার শ্রীম অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে দেখে তাঁরও ইচ্ছা হলো, ঠাকুরের অমূল্য কথাগুলি লিখে রাখার। একদিন তিনি ঠাকুরের কথা শুনে লিখে রাখছিলেন—

১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাস। তারকনাথ ও কালীকে (স্বামী অভেদানন্দ) সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় গেলেন তপস্যা করতে। একদিন মন্দিরের অভ্যন্তরে—

পরদিন—

১৯২৭ সালে তারকনাথ (তখন স্বামী শিবানন্দ) কাশীতে গেলেন। একদিন রাত্রে তিনি দেখলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর মন সেই অসীম আনন্দসাগরে বিলীন হতে চলল। অকস্মাৎ দেখলেন, মহাদেব পরিবর্তিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণে।

জীবনের শেষপর্বে স্বামী শিবানন্দজী বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগলেও তাঁর মন ছিল সদা প্রফুল্ল।

চিত্ররূপ: সৌরীশ মিত্র

ব্রতচারী ও গুরুসদয় দত্ত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*

'ব্রতচারী' কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনে জীবন যোগের অন্তর্লীন মার্গদর্শন। এ কেবল নিছকই এক শারীরবৃত্তীয় চর্চা নয়, আবার নাচ-গানের সমন্বয়ে এক লোককলাও নয়। ব্রতচারী হলো মানব-গঠনের, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে এক সার্বজনীন ও সম্পূর্ণ শিক্ষা। দেশে-বিদেশে মানবজাতির সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে ব্রতচারী আজ সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মানুষ-গঠন এবং সমাজ তথা দেশের সুষ্ঠু সাংগঠনিক বিন্যাস ও উন্নয়নের অন্যতম ধারক হলো ব্রতচারী চর্চা।

ব্রতচারী পরিকাঠামোর উদ্ভব ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এসে পড়ে সেই দৃঢ়চেতা কর্মযোগী মানুষটির কথা। গুরুসদয় দত্ত—এই নামটির সঙ্গে আজকের যুবপ্রজন্ম ততটা পরিচিত নয়। এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য। সমাজের অন্তঃসারশূন্য চরিত্রের এটি প্রতিফলন। অথচ পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নয়নের মণি ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁরই মস্তিষ্ক ও হৃদয়বত্তার সারাৎসার এই ব্রতচারী আন্দোলন।

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এক নান্দনিক, লৌকিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। বাংলার তরজা, কবিগান, বাউল, কীর্তন-সহ নানাবিধ লোককৃষ্টির চর্চা ছিল তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে। এসব কলাকৃতি তাঁর মন ও মননে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তী কালে বিলেতে আইন পড়তে গিয়ে ইংরেজদের স্বাজাত্যবোধ ও স্বসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখে তাঁর নিজের মনেও প্রবল স্বাভিমানবোধ জাগ্রত হয়। এছাড়া রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে উত্থিত নবজাগরণের ঢেউ ও স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের আহ্বান তাঁকে স্বসংস্কৃতির প্রতি আরো অভিনিবিষ্ট আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিলেতের পাঠ শেষ করে আইনবিদ্ ও আই. সি. এস. গুরুসদয় দত্ত ভারতে ফিরে এসে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারে উচ্চ পদে চাকরিতে যোগ দেন। প্রশাসক গুরুসদয় দত্ত কাজের সূত্রে জেলা থেকে জেলান্তরে ঘুরতে থাকেন। শৈশবের ঐতিহ্যসঞ্জাত লোকসংস্কৃতির চর্চা তথা নৃত্য-গীতের চর্চা ও প্রসারের জন্য তিনি উদ্যোগী হন ময়মনসিংহের জেলাশাসক থাকাকালীন। এই সময়ে সেখানে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ময়মনসিংহ ফোকড্যান্স রিভাইভাল সোসাইটি'। এর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পরবর্তী কালে ব্রতচারী আন্দোলনের বীজটি, যা পরাধীন ভারতে জীবনগঠনের অন্যতম চালিকাশক্তি হবে।

এরপর এই ব্যতিক্রমী মানুষটি বীরভূমে বদলি হয়ে এলেন। অনেকটা শাস্তিমূলক বদলি। মহাত্মা গান্ধীর ডাকা লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের লাঠি ও গুলি চালানোর নির্দেশ না মানায় তাঁকে বীরভূমে বদলি করে দেওয়া হয়। আর এখানেই জন্ম নিল ব্রতচারী আন্দোলনের। প্রধানত দেশাত্মবোধের জাগরণ ও দেহ-মনের সমন্বয়ে সুস্থ ও উন্নত মানুষ গঠনের তাগিদ থেকেই গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেন বীরভূম জেলার সিউড়িতে। মূলত গ্রাম পুনর্গঠন ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে, বিশেষ করে গ্রামবাংলার লোককৃষ্টির প্রকৃত রূপ তুলে ধরার কাজে বাংলাদেশের তরুণসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সিউড়িতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেল ব্রতচারী আন্দোলন ও তার কর্মপদ্ধতি।

"ব্রতচারী হয়ে দেখ
জীবনে কি মজা ভাই
হয়নি 'ব্রতচারী' যে সে
আহা কি ব্যাচারিটাই।"

'গুরুজী' অর্থাৎ গুরুসদয় দত্ত রচিত অসংখ্য গানের মতো এই গানের কলিগুলি নিছকই গান গাওয়ার জন্য নয়, বাস্তব জীবনেও খুব সদর্থক ও অর্থবাহী। পরাধীন ভারতবর্ষে সকলেই তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য

---

* *তরুণ ক্রীড়া সাংবাদিক।*

আন্দোলনরত। গুরুজী সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে বাড়তি গতি আনা ও স্বাধীনতা পাওয়ার পর তা রক্ষা করতে দেহ-মনে দৃঢ় দেশপ্রেমিক তথা সুনাগরিক হয়ে ওঠার জন্য এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

সুস্থ মানস ও সমাজ গঠনে দরকার সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা। ব্রতচারী প্রথম থেকেই বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্য-গীতের চর্চা করে চলেছে। ব্রতচারীর পঞ্চব্রত, বারো পণ, ষোলো আলি, সতেরো মানা, প্রণিতি প্রণিয়ম প্রমাণ করে, এগুলি শুধু অনাবিল সংস্কৃতির মননশীল বহিঃপ্রকাশ নয়—এর মধ্যেই রয়েছে 'পূর্ণ মানুষ' তৈরির যাবতীয় রসদ। মানুষের চরিত্র দৃঢ় না হলে তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। চরিত্রবান ব্রতচারীই নিজকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে 'সঙ্ঘ' অর্থাৎ মিলনক্ষেত্রের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও স্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। তাই গুরুজীর নির্দেশ—

"প্রথমে চরিত্র, দ্বিতীয়ে কৃত্য
তৃতীয়ে সঙ্ঘ, চতুর্থে নৃত্য।"

সিউড়িতে ব্রতচারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর ভাবাবেগ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। প্রতিষ্ঠার পরের বছর কলকাতায় 'ব্রতচারী সখা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন মেলায় ও শ্রীনিকেতনের উৎসবে ব্রতচারী সমিতির নৃত্যগীত ও ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ গুরুসদয় দত্তকে এক পত্রে (২৫ আষাঢ় ১৩৪১) লেখেন ঃ "ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক—এই কামনা করি। এই ব্রতচর্যা পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা ও লোকহিতসাধনের উৎসাহ দেশে বললাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।" ঐবছর হুগলি জেলা ব্রতচারী সমিতি, ত্রিপুরা ব্রতচারী সমিতি, ফরিদপুর ব্রতচারী সমিতি, খুলনা ব্রতচারী সমিতি, সর্বোপরি বাংলার ব্রতচারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর গুরুজী আন্তর্জাতিক লোকনৃত্য উৎসবে যোগ দিতে ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন 'অল ইংল্যাণ্ড ব্রতচারী সোসাইটি'। ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশ পায় সঙ্ঘের মুখপত্র 'বাংলার শক্তি'। এরপর বাংলার ব্রতচারী কর্মীদের বরোদা, বিহার অভিযান সংগঠিত হয় ও সেখানকার নানা স্থানে দানা বাঁধতে থাকে এই আন্দোলন। পূর্ববঙ্গ রেল ব্রতচারী সমিতি গঠন ও রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে ১৪টি ব্রতচারী কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হল-এ এক আলোচনাচক্রে 'ধর্মসমন্বয়ে ব্রতচারী' শীর্ষক বক্তব্য পেশ করেন গুরুসদয় দত্ত। তাঁর পরিচালনায় ব্রতচারী অনুষ্ঠান উপস্থিত সকল দর্শককে বিমোহিত করে রাখে। এরপর বর্ধমান ও যশোহর জেলায় ব্রতচারী সমিতি গঠিত হয়। বিহারের বারৌনিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ব্রতচারী শিবিরে এসেছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এবং স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তারপর হায়দ্রাবাদের নিজামের আমন্ত্রণে ব্রতচারী প্রদর্শনী হয় গুরুজীর নেতৃত্বে। ১৯৩৮-এ কলকাতার নাটোর পার্কে ব্রতচারী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুরে ১০১ বিঘা জমিতে জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্দেশ্যে 'ব্রতচারী গ্রাম' গড়ে ওঠে। ব্রতচারী ভাবধারায় সুশিক্ষিত সমাজকর্মী গড়ে তোলার জন্য স্থায়ী শিবিরের ব্যবস্থা, গ্রামীণ কৃষ্টি ও লোককলার অনুশীলন ও শিক্ষণের জন্য চিত্রবাড়ি স্থাপন, গণনৃত্য ও গণসঙ্গীতের স্থায়ী শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন-সহ সমস্ত রকমের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে এই গ্রামে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করলেন গুরুসদয় দত্ত। রেখে গেলেন শরীর-মন-বুদ্ধি নির্মাণের এক সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার রক্ষার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এই আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন সুযোগ্য জীবনব্রতীরা। মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) থেকে গুজরাট পর্যন্ত শাখা বিস্তার করল বাংলার ব্রতচারী আন্দোলন। ছড়িয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গেও—সেখানে যাওয়া সেসময় রীতিমতো সমস্যাসঙ্কুল ছিল। আর শুধু শাখাবিস্তারই নয়, দেশে-বিদেশে বহু বড় বড় উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি মেলে ধরতে লাগল ব্রতচারী। দিল্লি এশিয়াড থেকে মস্কোর ভারত উৎসব—সর্বত্র ব্রতচারী কর্মী ও

শিল্পীদের প্রদর্শিত নানাবিধ কলাকৌশল তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত অবস্থায় বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শুধু ব্রতচারী কর্তা ও কর্মীদের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। সরকার, রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা, সংবাদমাধ্যম প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্রতচারী হলো এক বহুমুখী শিক্ষার মাধ্যম। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা পূরণের জন্য সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা দেখিয়ে আসছে ব্রতচারী শিক্ষা। তা বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্রতচারী কর্মধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা প্রয়োজন। এই কর্মধারা ষোলোটি 'আলি' বা মূল শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে কয়েকটি—

ক্রীড়ালি ঃ হাডুডু, খোখো প্রভৃতি ক্রীড়া—যেগুলি শ্রমবহুল কিন্তু অল্প ব্যয়ে অল্প জমিতে অনুশীলন করা যায়। দৌড়, লম্ফন, ক্ষেপণ প্রভৃতি প্রচলিত ক্রীড়া বা অ্যাথলেটিক্সও এর অন্তর্গত।

মল্লালি ঃ শরীরগঠন ও আত্মরক্ষার উপযোগী কুস্তি, যুযুৎসু, যোগাসন প্রভৃতি। আবার কোন কোন আলি নৃত্যগীত প্রভৃতি কলার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন—

আবৃত্তালি ঃ ব্রতচারীর বিবিধ নীতি ও পণের ছন্দোবদ্ধ আবৃত্তি।

সঙ্গীতালি ঃ নৃত্য, গীত, বাদ্যচর্চা, নানাবিধ প্রচলিত লোকগীতি ও লোকনৃত্য।

কতকগুলি সৃজনাত্মক ও সমাজসেবামূলক। যথা—

শিল্পালি ঃ সেলাই, চিত্রাঙ্কন, হাতের কাজ।

চাষালি ঃ কৃষিকাজ ও গোপালন।

কৃত্যালি ঃ সমাজের উপকারে শ্রমদান। যথা—রাস্তা মেরামত, পুকুরের সংস্কার।

সেবালি ঃ স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা ও শিক্ষাদান, আর্তজন ও ইতরজীবের সেবা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রতচারী গ্রামে এধরনের জীবনমুখী বৃত্তি ও শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে ব্রতচারী গ্রাম ও রাজ্যের ব্রতচারী শিবিরগুলির বাইরে এর চর্চা ক্রমহ্রাসমান। একালের তরুণ প্রজন্ম পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির প্রভাবে মূল্যবোধহীন ও দিশেহারা। গোটা সমাজটাই ভোগবাদে আসক্ত। শুধু ব্রতচারীই নয়, বাঙালির স্বাস্থ্য ও লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত সবকিছুই আজ বিস্মৃতির অতলে। যে বাঙালি একদা ব্যায়াম ও যোগাসনে গোটা ভারতকে পথ দেখিয়েছিল, আজ সেই বাংলার জিমন্যাসিয়ামগুলি কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলার ব্রতচারী সংগঠনের কর্মকর্তা থেকে প্রশিক্ষক সকলের গলাতেই তাই ধরা পড়ে হতাশা ও যন্ত্রণার বিষাদ রাগের করুণ সুর। প্রত্যেকেই সখেদে জানিয়েছেন, অবিলম্বে সরকারি স্তরে উদ্যোগ ও তৎপরতা না নিলে পরবর্তী প্রজন্মের মন থেকে মুছে যাবে এই লোকায়ত ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জোকায় প্রতিষ্ঠিত ব্রতচারী গ্রামে রয়েছে বিদ্যালয়, সাঁতার প্রশিক্ষণ, ব্যায়ামচর্চা, সঙ্গীত-নৃত্যকলার ব্যবহারিক প্রয়োগধর্মী কর্মশালা, কিন্তু এলাকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে ন্যূনতম হেলদোল নেই এই বিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রতচারী গ্রাম ঘুরে দেখার। একই অবস্থা বাংলার বিভিন্ন মফস্সল শহর ও গ্রামবাংলায়। গুটিকতক ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসব শাখাকেন্দ্রগুলি। এই প্রজন্ম অনেক বেশি উৎসাহী শপিং মল, মোবাইল, ই-মেল বা কম্পিউটার চ্যানটিং, ফ্যাশন-সহ যাবতীয় বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী কার্যকলাপে।

ব্রতচারী হলো দেহ-মনের সুষম বিকাশে এমনি এক কর্মধারা, যার সাধনালব্ধ চর্চায় পরিপুষ্ট হতে পারে ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি। যে অ্যাথলেটিক্সকে বলা হয় 'মাদার অফ অল ফিজিক্যাল কালচার', সেই অ্যাথলেটিক্সেরই ব্যবহারিক আঙ্গিক হলো ব্রতচারী। ভারতের ক্রীড়াকর্তারা কবে বুঝবেন এর প্রায়োগিক উৎকর্ষ? যদি ব্রতচারী চর্চা ঠিকমতো করা যায়, তাহলে যেকোন খেলাতেই সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, রিফ্লেক্স, গতি, শক্তির সারাৎসার ব্রতচারী যেকোন মানুষকে তার অ্যাথলেটিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে—অভিমত বাংলার ব্রতচারী সংগঠকদের। ❑

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ অগ্রহায়ণ ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী প্রেমানন্দ**
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী
২৩ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার
(৯ ডিসেম্বর ২০০৫)

একাদশী-তিথি ঃ ১১, ২৫ অগ্রহায়ণ
রবিবার, রবিবার
(২৭ নভেম্বর,
১১ ডিসেম্বর ২০০৫)

গাছ ও মানুষ

হরনাথ ভট্টাচার্য*

গাছের কাছ থেকে আমরা বহু ধরনের উপকার পেয়ে থাকি। গাছ না থাকলে মানুষের অস্তিত্বই থাকত না। এখানে গাছ বলতে শ্যাওলা, ধানের চারা থেকে বট, অশ্বত্থ এবং স্থলজ ও জলজ সবরকমের গাছকেই বোঝানো হচ্ছে।

আমরা প্রধান খাদ্য হিসাবে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি যাই ব্যবহার করি না কেন, গাছ থেকেই পাচ্ছি। মুগ, মুসুর, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি ডালও গাছ থেকেই আসছে। সরষের তেল, সূর্যমুখী তেল, বাদাম তেল, পাম অয়েল প্রভৃতি যে-তেল দিয়েই রান্না করি, তা গাছ থেকেই পাচ্ছি। দক্ষিণ ভারতে নারকেল তেল দিয়েও রান্না হয়।

তরকারির জন্য উচ্ছে, পটল, ঝিঙে প্রভৃতি সবজি বা ফল এবং মুলা, বিট, গাজর প্রভৃতি মূলও আমরা গাছ থেকেই পাই। তরকারি রান্নার মশলা যেমন ধনে, জিরে ইত্যাদিও আমরা গাছ থেকেই সংগ্রহ করি। খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য যে-পান বা সুপারি আমরা খাই, তাও গাছই যোগান দেয়।

আমরা যদি আমিষাশী হই, তাহলেও শেষপর্যন্ত গাছের ওপর নির্ভর করতে হবে; কেননা ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি ঘাস, শাকপাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। মাছ খেলেও গাছের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, মাছেরা শ্যাওলা ও অন্য ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ খায় এবং বড় মাছ আবার ছোট মাছও খায়। যদি আমরা ফলাহারী হই, তাহলে আম, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল—যে-ফলই খাই, গাছ থেকেই পাব। দুধ খেয়ে থাকলেও গরু বা মোষ যে ঘাসপাতা, খড় বা খোল খায়, তাও গাছ থেকেই আসছে।

আমাদের ঘরবাড়ি তৈরিতেও গাছের অবদান যথেষ্ট। পল্লিগ্রামের বাড়িতে খড়ের চাল, কোথাওবা তালপাতার চাল তৈরি করা হয়। নারকেল বা তালগাছের গুঁড়ি খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আগে কড়ি, বরগা প্রভৃতির জন্য প্রচুর কাঠ প্রয়োজন হতো। ঘরের দরজা, জানালা ইত্যাদির জন্য শাল, সেগুন, গামার, আম, তুন প্রভৃতি কাঠ ব্যবহার করা হয়। ঘরের আলমারি, চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতি আসবাবপত্রেও প্রচুর কাঠ ব্যবহার করা হয়। কাঠের সাহায্যে জাহাজ, নৌকা, বাস, রেলের স্লিপার, রেলের কামরা ইত্যাদি নির্মিত হয়।

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও গাছের অবদান অনস্বীকার্য। যে-কার্পাস তুলা দিয়ে আমাদের ধুতি, শাড়ি তৈরি হয়, তা গাছ থেকে আসছে। যে-সিল্ক বা রেশমের পরিচ্ছদ আমরা ব্যবহার করি, সেই রেশম উৎপাদনকারী গুটিপোকা তুঁত গাছের পাতা খায়। তসরের গুটিপোকা বা মথ অর্জুন এবং শালগাছে পালন করা হয়।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল গাছ থেকে পাওয়া যায়। যেমন—বস্ত্রশিল্পের জন্য তুলা, পাটশিল্পের জন্য পাট, চিনিশিল্পের জন্য আখ, কাগজশিল্পে কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য নরম কাঠ, বাঁশ, সাবাই ঘাস, আখের ছিবড়া, দিয়াশলাই শিল্পের জন্য কাঠ, রবার শিল্পের জন্য রবার ইত্যাদি। এছাড়া প্লাইউড, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি শিল্প কাঠের ওপর নির্ভরশীল এবং চা, কফি প্রভৃতি বাগিচা শিল্পেরও উল্লেখ করা যায়। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে নরম কাঠ এবং তুলার বীজের মণ্ড ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিক শিল্পেও গাছের সেলুলোজ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। একমাত্র গাছই নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে নেয় এবং গাছের সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নেয়। শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল নেয় এবং সূর্যকিরণ ও পাতার সবুজকণা বা ক্লোরোফিলের সাহায্যে গ্লুকোজ বা শর্করা তৈরি করে বাতাসে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে 'সালোকসংশ্লেষ' (Photosynthesis) বলা হয়। গাছ পরে গ্লুকোজ থেকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট উৎপন্ন করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী শ্বাসগ্রহণের সময় বাতাসের অক্সিজেন নিজেদের প্রয়োজনে লাগায় এবং শ্বাস পরিত্যাগের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। সালোকসংশ্লেষের সময় গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। ফলে প্রাণিজগৎ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় এবং পরিবেশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে।

মাটির ওপরের স্তরে নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি থাকে এবং বিভিন্ন গাছ ও মৃত প্রাণীর দেহ পচে জৈব সার সৃষ্টি হয়। এর ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। কিন্তু বৃষ্টির ফলে মাটির ওপরের স্তর ধুয়ে বেরিয়ে যায় বা ভূমিক্ষয় হয়। এই মাটি পুকুর ও নদীতে গিয়ে পড়ে। ফলে পুকুর ও নদীর তলায় এই মাটি জমে। এই কারণে নদী ও পুকুরের গভীরতা কমে যায়। পলিমাটির স্তর নদী ও পুকুরের নিচে জমে থাকলে ভূগর্ভে জল কমে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে বলে ছোট ও বড় গাছ এবং ঘাস ইত্যাদি থাকলে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় না। জলও সবটা গড়িয়ে না গিয়ে গাছের তলায় জমে এবং আস্তে আস্তে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। হাওয়াতেও ওপরের মাটি উড়ে চলে যায়। গাছপালা সেটিও প্রতিরোধ করে। একটি হিসাবে দেখা যায় যে, চাষের জমিতে প্রতিবছর প্রতি হেক্টর জমি থেকে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ গড়ে ৫০ টন; সে-জায়গায় ঘন বনে প্রতি বছরে প্রতি হেক্টরে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ মাত্র ১-২ টন। গাছের শিকড় মাটিকে ধরে থেকে পার্বত্য এলাকায় ধস নামা প্রতিরোধ করে।

গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে যে-জল টেনে নেয়, নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর সেই জলের অতিরিক্ত অংশ পত্ররন্ধ্র দিয়ে বের করে দেয়। এর ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। দেখা গেছে, যেখানে গাছের পরিমাণ বেশি, সেখানে বৃষ্টিপাতও বেশি। গাছের পরিমাণ যত কমে, বৃষ্টিপাতও তত কমে। মরুভূমিতে গাছের পরিমাণ নগণ্য এবং বৃষ্টিপাতও খুবই কম।

* *অবসরপ্রাপ্ত রীডার, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ।*

গাছপালা ঝড়ের গতিবেগকে প্রতিহত করে এবং জলের তোড় নিয়ন্ত্রণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

যে-কয়লা আমরা জ্বালানি হিসাবে, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করি, প্রকৃতপক্ষে তা গাছ থেকেই উৎপন্ন। কোটি কোটি বছর আগে ভূ-ত্বকের আলোড়নের ফলে অনেক বনজঙ্গল মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। কালক্রমে চাপ, তাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে গাছপালার অঙ্গার বা কার্বন স্তরীভূত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়। এই কয়লা থেকে আবার আলকাতরা, ন্যাপথালিন, জ্বালানি তেল, গ্যাস, বেঞ্জল, গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গাছের পচা পাতা, ডালপালা, খোল ইত্যাদি সার হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হচ্ছে এবং একই জমিতে বছরে ২-৩ বার ফসল ফলানো হচ্ছে। এইসব কারণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে। নাইট্রোজেনঘটিত সার অনেকসময় খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্য ন্যাপথা থেকে তৈরি হয়। খনিজ তেলের মূল্য বৃদ্ধি হলে সারেরও দাম বাড়ে। সার তৈরি করতে বিদ্যুতের ব্যয়ও যথেষ্ট হয়। এছাড়া পরিবহণ-ব্যয় আছে। এইসকল কারণে রাসায়নিক সারের দাম বেশি এবং উন্নয়নশীল দেশের চাষিদের সামর্থে কুলানো কঠিন। এছাড়া দেখা গেছে যে, বছরের পর বছর রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে এই সার জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস করে দেয়।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের অন্য অনেক অসুবিধাও আছে। নাইট্রোজেন সার বেশি প্রয়োগ করলে তার কিছুটা নাইট্রেট হিসাবে জমির জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং জলজ প্রাণীদের ক্ষতি করে। ভূগর্ভস্থ জলে এই নাইট্রেট মিশে গেলে মানুষের ক্ষতি হয়। এই সার মাটিরও ক্ষতি করে এবং মাটির অম্লতা (acidity) বৃদ্ধি করে ও মাটির উপকারী জীবাণুর ক্ষতি করে। এই সার পরিবেশ-দূষণ ঘটায়। যে-স্থানে এই সার উৎপাদিত হয়, সেখানেও পরিবেশ-দূষণ ঘটে। অপরপক্ষে জৈব সার পরিবেশ দূষণ ঘটায় না এবং জৈব সারের উৎপাদন-ব্যয়ও কম। এই কারণে বর্তমানে অ্যাজোলা (Azolla)-সহ নানা নীল-সবুজ শৈবাল ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাজোলা বাতাস থেকেই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। ধানচাষের জমিতে বা কাছাকাছি পুকুর বা মজে যাওয়া জলাভূমিতে অ্যাজোলা জন্মানো যেতে পারে। অ্যাজোলা একটি জলজ ফার্ণ এবং এটি পচে যখন মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তখন এর থেকে নাইট্রোজেন ছাড়া ফসফরাসও পাওয়া যায়। অ্যাজোলা-সহ নানা নীল-সবুজ শৈবাল ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন ১৩% থেকে ১৬.৬৭% বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কোন পরিবেশ-দূষণ না ঘটিয়ে এবং মাটির ক্ষতি না করে কম ব্যয়ে সার সরবরাহের জন্য অ্যাজোলা নিয়ে বর্ধমান ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য চাষিদের অ্যাজোলা সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

গাছ থেকে নানারকম ওষুধ তৈরি হয়। পেনিসিলিয়াম একটি ছত্রাক-জাতীয় অপুষ্পক গাছ। এর থেকে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পেনিসিলিন তৈরি করেন। সর্পগন্ধা গাছের শিকড় থেকে রক্তচাপ বৃদ্ধি নিবারক ওষুধ তৈরি হয়। শুকনো বাসক পাতার ধোঁয়া হাঁপানির কষ্ট কমিয়ে দেয়। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন তৈরি করা যায়। তুলসীগাছের পাতার রসে সর্দিকাশির উপশম হয়। কালমেঘ গাছের পাতার রস কৃমিনাশক-রূপে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ব্যবহার করা হয়। অর্জুন গাছের ছাল চূর্ণ করে প্রত্যহ এক চামচ গরম দুধ ও চিনির সঙ্গে খেলে সবরকম হৃদ্‌রোগের উপশম হয়। এইরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বনভূমি মরুভূমির প্রসার রোধ করে। ভারতে থর মরুভূমির প্রসার রোধের জন্য অরণ্যবলয় রচনা করা হয়েছে।

পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে কোন দেশের মোট আয়তনের ৩ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৩৩.৩% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। অনেক উন্নত দেশেও বনভূমির পরিমাণ এর থেকে বেশি। যেমন কানাডায় বনভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ৪৫.৪%, জাপানে ৬৩%, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৫.৭% এবং ব্রাজিলে ৬৫.৯%। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বনভূমির পরিমাণ ৩১.৬%, ইতালিতে ২৮.৬%, জার্মানিতে ২৯.৫১% এবং ফ্রান্সে ২৪.৫%। রাশিয়া ও সংলগ্ন দেশগুলিতে (C.I.S.) ৪২.৩৯%। ইন্দোনেশিয়ায় বনভূমির পরিমাণ ৬৭.০৫%। পৃথিবীতে গড়ে বনভূমির পরিমাণ ৩১.১%। প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে ভারতে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৮০%। এখন ক্রমাগত কমতে কমতে বনভূমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৩৯% অর্থাৎ ৬ কোটি ৩৭.৩ লক্ষ হেক্টর।

ভারত ভূখণ্ডের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ভারতের আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র ২.৪%, কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬.৭%। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১০৪ কোটি। এর ফলে বসতি স্থাপন, কৃষিকার্য এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ও অন্যান্য কারণে ক্রমাগত গাছ কাটা হচ্ছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫১ থেকে ১৯৭১—এই ২০ বছরে ভারতে কৃষিকার্যের জন্য ২৪.৩২ লক্ষ হেক্টর, নদী উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য ৪.০১ লক্ষ হেক্টর, বিবিধ ব্যবহারের জন্য ৩.৮৮ লক্ষ হেক্টর, শিল্পের জন্য ১.২৪ লক্ষ হেক্টর এবং রাস্তা তৈরির জন্য ০.৫৫ লক্ষ হেক্টর বন কেটে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৩৪ লক্ষ হেক্টর বন কাটা হয়েছে। এই বনজঙ্গল কেটে সাফ করা ক্রমাগত চলছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে, যেখানে কানাডায় মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ ১৪.২ হেক্টর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৭.৩ হেক্টর এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৭.৬ হেক্টর ও পৃথিবীতে গড়ে ১ হেক্টর, সেখানে ভারতে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ মাত্র ০.১ হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বনের পরিমাণ ০.০২ হেক্টর। ভারতের মোট বনভূমির শতকরা প্রায় ৯৫.৩ ভাগ সরকারি মালিকানায় আছে। শতকরা প্রায় ২.৯ ভাগ পঞ্চায়েতের মালিকানায় এবং শতকরা প্রায় ১.৮ ভাগ বেসরকারি মালিকানায় আছে।

এপর্যন্ত ভারতে ৪৭,০০০ প্রজাতির গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্কিডই ভারতে ১,৩০০ প্রজাতির আছে। অর্কিড ফুল

বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অনেক প্রজাতিরই অর্কিড ফুল দীর্ঘদিন ধরে তাজা থাকে। একধরনের অর্কিড থেকে ভ্যানিলার সুগন্ধি নির্যাস পাওয়া যায়। সিকিম ও মেঘালয়ে অনেক ধরনের অর্কিড পাওয়া যায়।

১৯৭৬ থেকে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প (Social Forestry) চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানার পতিত জমিতে বনসৃজনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিজেদের জ্বালানি কাঠ, পশুখাদ্য ইত্যাদির প্রয়োজন যাতে তারা গ্রামে বনসৃজন করে মেটাতে পারে, সেজন্য পঞ্চায়েতগুলিকে এবং গ্রামবাসীদের উৎসাহদান। এছাড়া রাস্তার দুপাশে, রেললাইনের পাশে, খাল ও পুকুরপাড়ে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এসবের ফলে কিছুটা বনসৃজন হয়েছে বটে, কিন্তু নির্বিচারে বন ধ্বংসের পরিমাণ বনসৃজন অপেক্ষা বেশি বলেই মনে করা হয়। তাই কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ভারতে বনভূমির পরিমাণ ভারতের মোট আয়তনের ১৯.৩৯% থেকে কমে ১৫.৭% হয়েছে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর বনভূমির গড় হলো পৃথিবীর মোট আয়তনের ২৬.৬%।

মানুষ বড় স্বার্থপর। নিজের স্বার্থে এবং শখ মেটানোর জন্য মানুষ নির্বিচারে বন এবং বন্যপ্রাণী ধ্বংস করছে। অজস্র গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। ভারতে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির গাছ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গাছের বৃদ্ধি পরিমাপ করার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেন। তার নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ'। এই যন্ত্রে গাছের বৃদ্ধির মাত্রা কোটি গুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা ছিল। তিনি দেখেছিলেন, গাছকে আঘাত করলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

গাছের যে স্নায়ুতন্ত্র আছে, আচার্য বসু সেটি প্রমাণ করেছিলেন এবং পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, বেশি আঘাত পেলে গাছ সাময়িকভাবে অচেতন হয়ে যায়।

গাছ কথা বলতে পারে না বটে, তবে আঘাত করলে গাছের বেদনা লাগে। মানুষ যখন গাছে কুড়ুল মারে, তখন গাছের খুবই লাগে। কিন্তু এসব বিচার-বিবেচনা মানুষের কাছে আশা করাই হয়তো ভুল। তবে এখন অন্তত ভারতে একথা বোঝার সময় এসেছে যে, গাছের গোড়ায় কুড়ুল মারা মানুষের নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সামিল।

ক্রমাগত গাছ কাটার ফলে মাটির উর্বরতাসম্পন্ন ওপরের স্তর জলে ধুয়ে বেরিয়ে যায় বা ভূমিক্ষয় হয়। ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৬০০ কোটি টন মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৯৭৩-এ ৭০০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮-এ যথাক্রমে ৮৯০ কোটি টাকা, ১,২০০ কোটি টাকা এবং ১,০৯১ কোটি টাকা।

কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবহার এবং কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে, কেননা এই গ্যাস উত্তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আবহাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এখন যতটা হয়েছে, ততটা গত ৪,২০,০০০ বছরেও ছিল না। পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে কোথাও ঘূর্ণিঝড়, কোথাও খরা এবং কোথাও বন্যা হতে পারে। সমুদ্রের জলের ওপরের স্তর স্ফীত হয়ে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি জলপ্লাবিত হতে পারে এবং মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যেতে পারে। গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নেয় এবং অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, এক হেক্টর বন বছরে প্রায় চার টন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং প্রায় দুই টন অক্সিজেন গ্যাস ছাড়ে। সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কমাতে হলে বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

বনভূমির পরিমাণ ভারতে বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের সবশ্রেণির মানুষকে সচেতন করা দরকার। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতের মোট আয়তনের ৩৩.৩% বনভূমি সৃষ্টি। তাহলেই পরিবেশের সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। এই লক্ষ্য পূরণ করা বর্তমান অবস্থায় খুবই কঠিন। তবে আমাদের যতটা সম্ভব বনভূমি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তাতেই দেশের মঙ্গল হবে। যেখানেই পতিত জমি পাওয়া যাবে, সেখানেই গাছ লাগাতে হবে। বাড়িতে কিছু জমি থাকলে গাছ লাগাতে হবে। জমি না থাকলে টবেও গাছ লাগানো যায়। গাছের ফুল, ফল, পাতার বাহার তো আছেই, তাছাড়া অন্তত কিছুটা কার্বন ডাই-অক্সাইড কমলে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়লেও মানুষের উপকার হবে। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র বসু, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৮; (২) গাছের কথা—রাস্কিন বণ্ড, অনুবাদ : অরুণ মিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৫; (৩) পরিবেশ-দূষণ—এন. শেষগিরি, অনুবাদ : গুরুদাস ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৯; (৪) আমাদের এই পৃথিবী—লাইক ফতে আলি, অনুবাদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৪; (৫) ভারতের অর্কিড—এ. এস. রাও, অনুবাদ : ডঃ নীলাঞ্জনা চৌধুরী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৪; (৬) বন-সবুজের কথা—কল্যাণ চক্রবর্তী, পুনশ্চ, ১৯৯৫; (৭) ত্রিপুরার গাছপালা—নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, আগরতলা, ২০০১; (৮) ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী—কল্যাণ চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১; (৯) পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়—সুবোধচন্দ্র বোস, অনুবাদ : মনস্বিতা সান্যাল, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬; (১০) সবুজায়ন ও সামাজিক বনসৃজনে বর্ধমান জেলা—এন. ভি. রাজশেখর, 'পশ্চিমবঙ্গ', বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; (১১) অর্থনৈতিক ভূগোল—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্কর নায়ক, ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৮; (১২) India 2002—A Reference Annual published by Publications Division, Ministry of Informaton and Broadcasting, Government of India, 1999; (১৩) Ecology and Environment—P. D. Sharma, Rastogi Publication, Meerut, 1999; (১৪) Azolla: A review of its biology and utilization—Gregory M. Wagner, 'Botanical Review', Jan—Mar 1997, New York Botanical Garden; (১৫) Scent of Success—Samar Jha, Science and Technology, 'The Statesman', 29.4.2002; (১৬) Forests for Plunder—Kisor Choudhuri, 'The Statesman', 7.4.2002 (১৭) Whale Watch—Mohit Ray, Science and Technology, 'The Statesman', 3.6.2002.

নরেন্দ্রপুর শিক্ষাশৈলীর উৎস সন্ধানে

বাসব ভট্টাচার্য

মহাজীবনের সান্নিধ্যে ● *লেখক : ডঃ বৈদ্যনাথ বসু* ● *প্রকাশিকা : মণিকুন্তলা মজুমদার, গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬* ● *মূল্য : ৬০ টাকা* ● *পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮+১৭৬* ● *প্রকাশকাল : দীপাবলি ২০০৩*

বিশ্বায়নের ফলাফল সম্পর্কে বিদ্যোৎসাহী জনমানসে নানা বিষয়ে মতান্তর, পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমাদের দেশের প্রায় সকলপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিষেবার ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষার আঙিনায়ও উচ্চ গুণমানের শিক্ষা সম্পর্কিত একটি বহু

কাঙ্ক্ষিত সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা ও উদ্যম-উদ্যোগের উন্মেষ ঘটেছে। স্বাধীনোত্তর কালের নানাবিধ কার্য-কারণে তদানীন্তন উন্নত মানের স্কুলগুলি তাদের স্বকীয়তা ও অসাধারণত্ব হারায়। তাদের অতীত গৌরবময় প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের কাহিনী জনমানসে বিস্মৃতপ্রায়, অনেকটা অতীত চিরাচরিত অখণ্ড ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগের বিস্মরণের মতো। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত স্কুল বিশেষ করে নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয় ধাঁচের স্কুলগুলি থেকে সফল উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা বৃহত্তর ব্যাবহারিক জগতের বিভিন্ন পেশাদারি ভূমিকায় মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি, কখনো কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগে, কখনোবা সরকারি ব্যবস্থাপনায় আশ্রমের সাধুদের নিকটও নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়-ধাঁচের স্কুল গড়ার আহ্বান করেছে। নরেন্দ্রপুর শিক্ষাশৈলী জনসমাজকে উজ্জীবিত করেছে। নরেন্দ্রপুরকে দেখার, জানার আগ্রহ বেড়েছে। ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর নরেন্দ্রপুর শিক্ষাশৈলীর রূপকার, প্রাণপুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধিমগ্ন হওয়ার পরবর্তী সময়কাল থেকে তাঁকে জানার, বোঝার, তাঁর স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশে কতিপয় সুলিখিত সন্দর্ভে তাঁর প্রতিভাময় জীবনবৃত্তান্ত বিশেষভাবে শিক্ষার আঙিনায় সাড়াজাগানো কর্মকাহিনীর বিষয়াদি বিধৃত হয়েছে। এইসকল প্রকাশনা প্রশংসার্হ। কিন্তু শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ বৈদ্যনাথ বসুর লেখা **'মহাজীবনের সান্নিধ্যে'** সন্দর্ভখানি পড়লে মনে হয় যে, নরেন্দ্রপুর তীর্থভূমি ও আধুনিক ভারতের প্রয়োজনানুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরাসঞ্জাত নরেন্দ্রপুর শিক্ষাশৈলীর স্রষ্টা স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সর্বজন-চিত্ততুষ্টকারী বাচনভঙ্গি, ঈর্ষাদ্বেষশূন্য মন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বর্ণনা এতটা সরল, সাবলীল ঝরঝরে ভাষায় আর কোন লেখায় পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। এটি এক অনন্য সন্দর্ভ। গ্রন্থখানিতে এমন অনেক পূতপবিত্র সন্ন্যাসীদের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে যা পাঠককে প্রতি মুহূর্তে এক-একটি আনন্দময় ঘটনাপ্রবাহে টেনে নেয়। নামগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের স্মরণে আনন্দ হয়, নিজেকে ধন্য বলে বোধ করি।

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর প্রাক্‌কথন, লেখকের কথা, আধ্যাত্মিক ভাবরসে তৈরি করা ছয়টি অধ্যায়ের শিরোনামা, যথা—'চরণধ্বনি শুনি তব', 'দুঃখের বরষায়', 'আবার আসি ফিরে', 'আলোয় ভুবন ভরা', 'আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ', 'শেষের কথা' এবং পরিশিষ্ট ১ : 'বিবেক সেনা...' ও ২ : 'ওঠো জাগো...' প্রভৃতি পাঠকগোষ্ঠীকে মহৎ হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে—এই আশা রাখি। নিঃসন্দেহে গ্রন্থখানি নরেন্দ্রপুর শিক্ষাশৈলীর রূপকার স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের প্রস্তুতি-পর্বের এক অতুলনীয় দলিল। বহু শাখায়িত, তথ্যসমৃদ্ধ, সুখপাঠ্য রচনাখানির জন্য ডঃ বসুকে আন্তর অভিনন্দন। নরেন্দ্রপুর সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রইলাম। ❑

সন্ন্যাসীর চোখ দিয়ে দেখা

সুবোধ চৌধুরী

ভারতের তীর্থে তীর্থে ● *লেখক : স্বামী অচ্যুতানন্দ* ● *প্রকাশক : অরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯* ● *মূল্য : ১০০ টাকা* ● *পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৭২* ● *প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৫*

মানুষের মন বৈচিত্র্যের পিপাসু, নূতনত্বের প্রয়াসী। অজানাকে জানার ও অদেখাকে দেখার জন্য আমরা সর্বদাই কৌতূহল অনুভব করি। মাঝে মাঝে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরের জগৎটি আমাদের হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া

দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে অপরিচিত জগৎকে দেখার জন্য—অন্তরের আকুল আগ্রহে আনন্দ অনুভব করি। কেউ তীর্থভ্রমণ করে আনন্দ পান, কেউবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়ে অতীতের ইতিহাসকে নতুন রূপে দেখতে চান।

অথর্ববেদের ঋষির কণ্ঠে প্রশ্ন জেগেছিল : "কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ/ কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী-র্নেলয়ন্তি কদাচন?" (১০।৪।১।৩৭)—কেন যে বায়ু স্থির থাকে না, মন কোথাও স্থির হয়ে স্বস্তি পায় না, জলও যেন কিসের খোঁজে সতত ধাবমান! তেমনি মানুষের কৌতূহলী সত্তা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে দেশ-দেশান্তরের রূপ ও চিত্র অঙ্কন করেন ভ্রমণকাহিনীর পৃষ্ঠায়। ভ্রমণকাহিনী কেবল ভ্রমণের বিবরণ নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। ভ্রমণকাহিনীর রচয়িতা ভ্রমণের বিবরণ দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নির্মল ও গভীর রসবোধের পরিচয় দেন—এই রসবোধের পরিচয়ই বৃত্তান্ত বা বিবরণকে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করে তোলে।

স্বামী অচ্যুতানন্দের **'ভারতের তীর্থে তীর্থে'** গ্রন্থখানিতে ভারতের বিভিন্ন অংশের কুড়িটি তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী ও

মহিমা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে পাণ্ডিত্য, হৃদয়গ্রাহিতা ও সাহিত্যরসের যে ত্রিবেণী-সঙ্গম রচিত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সৌম্যকাশী, গঙ্গোত্রী, নৈমিষারণ্য, বারাণসী, মীনাক্ষী মন্দির, কামাক্ষী মন্দির, কন্যাকুমারী তীর্থ, পুরীধাম প্রভৃতির বর্ণনা যেন লেখক চোখের সামনে তুলে ধরেছেন; সঙ্গে পীঠ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নানা পুরাণকাহিনীর অবতারণা করে পাঠকের চিত্তকে ভক্তি-শুদ্ধ করে তুলেছেন। কোথাও বর্ণনা ভারাক্রান্ত হয়নি; সহজ ও সুললিত ভাষায় লেখক তাঁর অন্তরের নৈবেদ্য উপহার দিয়েছেন বর্ণনার ছত্রে ছত্রে। লেখক গ্রন্থ-ভূমিকায় লিখেছেন: "তীর্থ আমাকে টানে। আমি বিশ্বাস করি তীর্থদেবতার কৃপা ভিন্ন কোন তীর্থদর্শন সম্ভব না। আর সেই বিশ্বাস নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমার তীর্থপথে।" এই বিশ্বাস কেবল দেবভূমির মহিমায় নয়, তীর্থপথের পথিকদের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতায়।

লেখক জানিয়েছেন, তাঁর এই রচনাগুলি ইতোপূর্বে 'উদ্বোধন' এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ-পারিপাট্য, নির্ভুল সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোকের সমাবেশ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সবচেয়ে ভাল লেগেছে লেখকের উপস্থাপনা ভঙ্গিটি।❑

খ্রিস্টীয় বাঙলা সাহিত্য

দেবযানী ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় রচনা • লেখিকা: মিনতি মিত্র • প্রকাশক: সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৩৪ • মূল্য: ১৭৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১০+২৭৮ • প্রকাশকাল: বড়দিন ১৪১১

আজকের বাঙলা সাহিত্যের যে-রূপ আমরা দেখি, তার পিছনে রয়েছে এক বর্ণময় ইতিহাস। পাঁচালি, কড়চা, লোকগীতি, ভক্তিগীতি, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, গাথাকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্যের হাত ধরে সেই দ্বাদশ শতাব্দী (খ্রিস্টীয়) থেকে শুরু হয়েছে এই দীর্ঘ পথচলা, তবে এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল বহু কবি, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধ আর ভাষা সংস্কারের নীরব আন্দোলন।

এই বাঙলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন—মিনতি মিত্রের 'বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় রচনা'। এটি একটি গবেষণালব্ধ দলিল। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক উল্লিখিত গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। এর সময়কাল সতেরোশো থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল। উনিশ শতকের দেশব্যাপী ভাবসঙ্ঘাতের সন্ধিক্ষণে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে যুগান্তকারী সৃষ্টিযজ্ঞ তথা পরিবর্তনের সূচনা হয়, তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ খ্রিস্টীয় বাঙলা সাহিত্য।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মভাবনাকে আশ্রয় করে বাঙলা সাহিত্য নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক থেকে শুরু করে পাঁচালিকারেরা, বৈষ্ণব পদকর্তারা, শাক্ত সাধকেরা, শেষে বিদেশি মিশনারিরা এই ভাষাকে ধর্মপ্রচারের হাতিয়ার করেছেন। ফলে জন্মকাল থেকেই এই ভাষা ধর্মানুশীলনের বাহন হিসাবে সাহিত্যিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ্যত ধর্মপ্রচার এবং গৌণত বাঙলা চর্চা—এই দুটি বিষয়েই মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল।
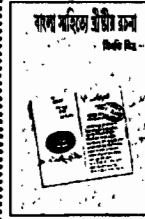
মানুষের জীবন ও সংসারের সকল অবস্থায় খ্রিস্টধর্মের আশ্রয়ই যে সর্বাধিক কাম্য এবং তাতেই যথার্থ সান্ত্বনা—এই বিষয়টিই খ্রিস্টীয় সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। এই ধর্মবিজয়ের পথে হিন্দুশাস্ত্র, পুরাণ তথা ধর্মকে নস্যাৎ করার অপপ্রচেষ্টাতেও সাহিত্যসাধনা চলেছিল। প্রধানত সেইসকল রচনাই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যা বাঙলায় রচিত, যেগুলির মূলে ছিল ধর্মপ্রচারের প্রত্যক্ষ বা তির্যক উদ্যম এবং যেগুলিতে খ্রিস্টজীবন ও খ্রিস্টধর্মের মহিমা, খ্রিস্টীয় সমাজের কথা বা অনুরূপ বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিদেশি যাজক, নিবেদিতপ্রাণ উৎসাহী কর্মী, বিদ্যোৎসাহী খ্রিস্টান, সিভিলিয়ান কর্মচারীদের উৎসাহে, মিশনারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়, কখনোবা ধর্মান্তরিত মানুষের ধর্মপ্রচারের তাগিদে এগুলি প্রকাশিত। বিভিন্ন নাট্যধর্মী রচনা, গদ্য, খ্রিস্টগীতি, প্রার্থনাসঙ্গীত, গদ্যে রচিত প্রার্থনা, খ্রিস্টীয় কবিতা, ভক্ত খ্রিস্টানদের জীবনচরিত, নানা পত্রপত্রিকা, বাইবেলের বিভিন্ন বাঙলা সংস্করণ, বাইবেল সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনা প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর, তত্ত্ব, নিবন্ধ, প্রচারকের সহায়ক গ্রন্থ এবং এইসব গ্রন্থের তালিকা। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রায় পদচিহ্নবিহীন এই প্রদেশটিকে খ্রিস্টীয় উপকরণের বিচিত্র সম্ভারের একটি শ্রেণি নির্ণয়ের প্রয়াস করেছে এই গ্রন্থটি। বাঙলা ভাষার কোন কোন ব্যাকরণ, শব্দকোষ, অভিধান ইত্যাদি এই সূত্রেই এই আলোচনায় গৃহীত হয়েছে। মনোএল-এর ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, উইলিয়ম কেরির প্রবাদ সংগ্রহ, হাল হেডের ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দ সংগ্রহ এরই নিদর্শন। ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি নানা বিদেশি মানুষ, বহু খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ও ধর্মান্তরিত দেশীয় মানুষের রচিত বাঙলা সাহিত্যধারার বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যকর্মকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রশংসাযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই গবেষণাগ্রন্থে।

তবে সকলশ্রেণির খ্রিস্টীয় বাঙলা সাহিত্যের ভাষা, লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এগুলিতে কোন গভীর বা উচ্চস্তরের তত্ত্ব বা সঙ্কেত নেই। সাহিত্যগুণের বিচারে বলা যায়, পদ্য রচনাগুলি অধিকাংশই পঙ্গু, গদ্য রচনাগুলি গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তর মাত্র। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলার প্রচলিত সাহিত্যধারা অবলম্বন করেই ধীরে ধীরে মিশনারিদের বাঙলা ভাষাচর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। এই সাহিত্যধারায় শব্দ, বাক্য গঠন, পদ্য, গদ্য, গান—কোনটি সম্বন্ধেই লেখকদের কোন সুনিশ্চিত সংস্কার বা পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না। বাংলার চিরাভ্যস্ত গৃহ-পরিসীমার কথোপকথনের যে বাঙলা

গদ্য, তার সঙ্গে খ্রিস্টীয় বাঙলা সাহিত্যে মিশেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার কথ্য বাঙলা রীতি ও ভাষা, মুঘল ও পাঠান ভাষার শব্দ এবং পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় ভাষার শব্দ। সাধু ও গ্রাম্য ভাষা, শিষ্ট ও অশিষ্ট বা অর্বাচীন শব্দের জাতিবিভাগ, বাঙলা বানানের শৃঙ্খলা, বাক্যের সুনিশ্চিত গঠন, পরিমিতিবোধ, যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিশেষ রীতি, বিভক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথম যুগের লেখকদের তেমন ধারণা ছিল না। ক্রমশ তাঁরা এইসব ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং তারই ফলে তাঁদের শব্দাধিকার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাঙলা বাইবেল বারে বারে সংশোধিত হওয়ায় ভাষার সরলতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ করতে গিয়ে এঁরা যে তৎপ্রাসঙ্গিক স্থান, নাম, চরিত্র পরিচিতি, টিকা, টিপ্পনী ইত্যাদি বহু পরিমাণে করেছেন, সেই রচনারীতি প্রশংসনীয়।

এই গবেষণাগ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ে ষোড়শ শতক থেকে পরবর্তী কয়েক শতকে বাংলায় খ্রিস্ট প্রাসঙ্গিক রচনার মূল প্রকৃতি, খ্রিস্টকথার প্রচার-প্রচেষ্টা এবং সেইসূত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সঙ্ঘের কথা এসেছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই শাখার উল্লেখযোগ্য বিষয়বৈচিত্র্য ও রীতিগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাধুরীতি-চলিতরীতি, উর্দু-আরবির সঙ্গে ইউরোপীয় শব্দমিশ্রণের উদাহরণ, আবার গদ্য, পদ্য, গান, নাট্যভঙ্গির রচনা, উপন্যাস শ্রেণির খ্রিস্টীয় পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়াসের পরিচয় এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাইবেল অনুবাদের নানা প্রয়াস ও বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, খ্রিস্টীয় প্রসঙ্গের শব্দদোষ বা অভিধান-জাতীয় গ্রন্থাদিও এই সূত্রে বিবেচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'উপসংহার'। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থতালিকা রয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থ-শেষে পরিশিষ্ট অংশে বর্ণানুক্রমিকভাবে খ্রিস্টীয় গ্রন্থগুলির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে। যথাক্রমে লঙ ও মার্ডক সাহেবের ক্যাটালগ থেকে বাংলার খ্রিস্ট প্রাসঙ্গিক রচনার তালিকা এবং সবশেষে বেঙ্গল লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ থেকে অনুরূপ তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই পরিশ্রমসাধ্য প্রয়াস অবশ্যই বিশেষ উল্লেখ ও প্রশংসার দাবি রাখে।

গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর। বাঙলা সাহিত্যের এই অঞ্চলের গবেষকরা এই গবেষণাগ্রন্থ থেকে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। গ্রন্থটিতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেরও একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে, যা স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। এখানে মিনতি মিত্র কয়েক শতকের খ্রিস্টীয় বাঙলা সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করেছেন। তাই সাহিত্যের এই বিশেষ ধারার অনুপুঙ্খ অন্বেষণে এমন গভীর মনোজ্ঞ ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণী গবেষণাগ্রন্থ আমরা হাতে পেয়েছি। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

✱ *তন্ত্র-বিজ্ঞান—শক্তিবাদ ও পূজাতত্ত্ব প্রসঙ্গে • লেখক : ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী • সঙ্কলক ও প্রকাশক : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১০ গ্যালিফ স্ট্রিট, সুইট নং-৬৩, ব্লক নং-৫, কলকাতা-৩ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০+৩৮ • মূল্য : ১২ টাকা • প্রকাশকাল : ৬ মার্চ ২০০৪।* মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে প্রকাশিত। তান্ত্রিক সংস্কৃতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই সঙ্কলনগ্রন্থ মননের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

✱ *শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলি জেলা • লেখক : রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় • প্রকাশক : ডাঃ মৃগাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, উত্তরপাড়া অরবিন্দ পরিষদ, ৯ ব্যানার্জি পাড়া স্ট্রিট, উত্তরপাড়া • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+৩৪ • মূল্য : ১০ টাকা • প্রকাশকাল : ১৫ আগস্ট ১৯৯৬ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।* শ্রীঅরবিন্দের কর্মক্ষেত্র ও আত্ম-উন্মোচনের তীর্থভূমিরূপে খ্যাত হুগলি জেলার ঘটনাবলির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

✱ *কথামৃতের গান (তথ্যসহ) • লেখক : পরিমল চক্রবর্তী • প্রকাশক : বিশ্বনাথ রমানি, সাধারণ সম্পাদক, সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট, ৪৬/জি বোসপাড়া লেন, কলকাতা-৩ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪০+৪২৮ • মূল্য : ৫০ টাকা • প্রকাশকাল : ১৫ আগস্ট ২০০৪।* গ্রন্থটি শুধু ভক্ত বা সঙ্গীত-রসিকদের আনন্দই দেবে না, একইসঙ্গে তা সঙ্গীত-গবেষকদের কাছেও আদৃত হবে।

✱ *গীতলেখা • লেখক : পরিমল চক্রবর্তী • প্রকাশিকা : মীনা সাহা, মাদার হাউস, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+৫৮ • মূল্য : ১০ টাকা • প্রকাশকাল : জন্মাষ্টমী ২০০১।* গ্রন্থের ভাবরস-সিঞ্চন ভক্তহৃদয়কে তৃপ্ত করবে।

✱ *পবিত্রগীতি (৫২টি ভক্তিমূলক গানের স্বরলিপি) • সঙ্কলক ও লেখক : পবিত্রমোহন দে • প্রকাশক : সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা-২৬ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৪+১০২ • মূল্য : ১০০ টাকা • প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০১।* সঙ্গীতসাধকদের কাছে সম্পদ হিসাবে গৃহীত হবে।

✱ *জীবনের কবি জরাসন্ধ • লেখক : যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা • প্রকাশক : জরাসন্ধ স্মৃতি সংসদ, এ-৬/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯ • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৪ • অনুদান : ৫ টাকা।* চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ) জীবন ও সাহিত্যের অনন্যসাধারণ দলিল।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল ঃ গত ৮-৯ আগস্ট ২০০৫ নবনির্মিত সাধুনিবাস, ছাত্রাবাস, ভোজনকক্ষ, গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ঃ গত ১১ আগস্ট ২০০৫ প্রস্তাবিত 'সুইমিং পুল' ও রন্ধনশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর ঃ গত ২১ আগস্ট ২০০৫ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পাঠ, আলোচনা, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্গাপুরের ভক্তবৃন্দের সহায়তায় দুর্গাপুর তারকনাথ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্বোধানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী আপ্তেশ্বরানন্দজী। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী কৃত্তিবাসানন্দজী ও স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বোধানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজী ও স্বামী ভেদাতীতানন্দজী। প্রায় ১,৬০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ, কুড্ডাপা (অন্ধ্রপ্রদেশ) ঃ গত ২৬ আগস্ট ২০০৫ জন্মাষ্টমীর পুণ্য দিনে শহরের সীমান্তে মিশনের নতুন জমিতে প্রস্তাবিত সাধুনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং ঃ গত ২৮ আগস্ট ২০০৫ নবনির্মিত রন্ধনশালা, ভোজনকক্ষ ও সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর ঃ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের স্নাতকোত্তর স্তরে (এম. এসসি.) রসায়নবিদ্যার পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে।

নতুন কেন্দ্র স্থাপন

চেন্নাই মঠের উপকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ, কুড্ডাপা সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মঠের একটি পৃথক শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ **Ramakrishna Math, 5/476 Trunk Road, Cuddapah, Andhra Pradesh-516001, Phone : (08562) 241633.**

ছাত্রকৃতিত্ব

বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়, বেলুড় মঠ ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নতুন দিল্লি পরিচালিত ২০০৩ এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের সর্বভারতীয় উত্তর মধ্যমা (উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল) পরীক্ষায় দুটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, সারদাপীঠ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের বি. এ. (সংস্কৃত অনার্স) ও বি. এসসি. (গণিত অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রগণ যথাক্রমে কলাবিভাগসমূহ (পূর্বের ঈশান স্কলার) ও বিজ্ঞানবিভাগসমূহ (পূর্বের এডওয়ার্ড স্কলার)-এর মধ্যেও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী (চৈতন্য মহারাজ) ঃ গত ৩১ আগস্ট ২০০৫ বারাণসী হোম অফ সার্ভিস হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে আসীন ছিলেন। গত ২৬ আগস্ট ২০০৫ তিনি ফ্যালসিপ্যারাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। তিনদিন পর তাঁর শ্বাসকষ্ট ও উদরস্ফীতি দেখা দেয়। তখন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিডনি অকেজো হয়ে পড়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয় এবং ৩১ তারিখ তিনি দেহত্যাগ করেন।
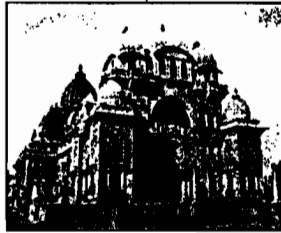
পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। জামতাড়া কেন্দ্র ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি যথাক্রমে ১১ বছর ও ২ বছর অধ্যক্ষ-পদে আসীন ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

'উদ্বোধন'-এর উত্তরণ ঃ একটি ঐতিহাসিক ক্ষণ

অবশেষে এল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত—হাতের মুঠোয় একশো বছরকে ধরে রাখার একটি অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন। স্বামীজী প্রবর্তিত 'উদ্বোধন'-এর প্রথম থেকে শততম বর্ষ—যা তাপিত হৃদয়কে শান্তিসুধা পান করায়, উজ্জীবিত করে অলস প্রাণকে আর সদা প্রেরণা দেয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে—আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কৌশলে তা নবরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এ যেন গতানুগতিকতা থেকে এক নতুন দিগন্তে উত্তরণ।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। উদ্বোধন কার্যালয়ের সুসজ্জিত সারদানন্দ হল-এ বহু সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী ও বুধমণ্ডলীর উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজীর হাতের ছোঁয়ায় একশো বছরের 'উদ্বোধন' আস্তে আস্তে উন্মোচিত হতে লাগল কম্পিউটারের পর্দায়। একটু পরেই পূজ্যপাদ মহারাজজী একশো বছরের 'উদ্বোধন'-এর এই CD-ROM প্যাকেটটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে যে-সভা হয়, তার প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি ও বর্তমানে মানবাধিকার কমিশনের কর্ণধার শ্যামল সেন। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভারতীয় যাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। মহতী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক স্বামী শ্রীকরানন্দজী; অছি পরিষদের সদস্য ও 'উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী, উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। উপস্থিত ছিলেন শ্রীসারদা মঠের মুখপত্র 'নিবোধত'র সম্পাদিকা ও সংযুক্ত সম্পাদিকা যথাক্রমে প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী। আরো উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হর্ষ দত্ত, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Registrar of Publication বিস্ময় রায়-সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, খ্যাতনামা চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজী পরিমণ্ডলের অগণিত মানুষ—যাদের কাছে 'উদ্বোধন' একান্তই আপন।

স্বামী সত্যময়ানন্দজী এবং স্বামী বিভাত্মানন্দজীর বেদমন্ত্র উচ্চারণের পর 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী প্রারম্ভিক ভাষণে এই CD-ROM নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অভ্যাগতদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'Acropolis' সংস্থা CD-ROM-টির Administrator Version নির্মাণ করে দিলে জটিল অনেকগুলি কাজ শুরু করা হয়, যার মধ্যে আছে কিছু স্বেচ্ছাসেবীর অক্লান্ত পরিশ্রমে Data Entry এবং Correction-এর কাজ; একশো বছরের 'উদ্বোধন'-এর প্রায় ৭৫,০০০ পৃষ্ঠা Scan করার কাজ ইত্যাদি। এই কাজে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে তিনবছর। এরপর 'Frame Multimedia' দায়িত্ব নেয় Client Version তৈরি করার জন্য। নানাভাবে সাহায্য করেছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাপিয়া সরকার। এরা সবাই ধন্যবাদার্হ।

তিনি আরো বলেন, বহু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য রয়েছে এই একশো বছরের সাক্ষী 'উদ্বোধন'-এ। যেমন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি ঐতিহাসিক চিঠি, শ্রীঅরবিন্দের শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সস্ত্রীক আগমন, এমনকি স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের একটি ঘি প্রস্তুতকারক সংস্থার বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়া উক্তিগুলি।

বিশেষ অতিথি শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী বলেন, মানুষের চিরন্তন চেষ্টা তার চিন্তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার—যার পরিচয় আমরা পাই শিলালিপি ও বিভিন্ন মাধ্যমে সেই চিন্তাকে উৎকীর্ণ করে রাখার মধ্য দিয়ে। সেই কারণে তিনি 'উদ্বোধন' CD-ROM-এর এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধান অতিথি শ্যামল সেন ব্যক্ত করেন, তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তিনি আরো বলেন, স্বামীজীর অভীপ্সিত মানুষের দেবত্বে উত্তরণের কাজ 'উদ্বোধন'ই করছে।

সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজীর আশীর্বাণী বর্ষিত হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকা সৃষ্টি হওয়ার ইতিহাস দিয়ে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'উদ্বোধন' যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০৭ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে তা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতেই। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও তিনি স্মরণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীকে দেখা যেত কত যত্নের সঙ্গে তিনি নিজে পুরনো 'উদ্বোধন' ও স্বামীজীর চিঠিগুলি সংরক্ষণের কাজে লিপ্ত থাকতেন। সেই কারণে মূল্যবান সম্পদ সব বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে তিনি সাধুবাদ জানান।

সিডি-রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী সর্বগানন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) শ্যামল সেন, স্বামী স্মরণানন্দজী, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, স্বামী সত্যব্রতানন্দজী।

'সারদানন্দ হল'-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের একাংশ

এরপর অভ্যাগতদের Digital Display-র মাধ্যমে দেখানো হয় এই CD ব্যবহারের রীতি। এটি সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তিগত কৌশলে অনুসন্ধানের সুবিধা (Search Facility) সংযোজিত করার ফলেই। প্রকৃতই এটি হাতের মুঠোয় একশো বছরকে নিয়ে আসার এক অভিনব কৌশল।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শিবপ্রদানন্দজী। তিনি বলেন, 'বজ্রে যে বাঁশি বাজে তা সহজ গান নয়'। এবং 'উদ্বোধন' সেরকমই দুরূহ কর্মে লিপ্ত। তিনি আরো বলেন, 'উদ্বোধন' অবিচল রয়েছে কেননা 'উদ্বোধন' পরমকে ছুঁয়ে আছে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় CESC-র Executive Director এস. এস. সিনহা বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকার বন্দোবস্ত করায়, কলকাতা পৌরনিগম—সমস্ত নিকটবর্তী এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, কলকাতা পুলিশ—নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত করার জন্য এবং সর্বোপরি স্থানীয় জনসাধারণ—সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। মঞ্চ ও অন্যান্য স্থানে ফুলসজ্জার ব্যবস্থা করেছিলেন রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সভার শেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টির প্যাকেট সরবরাহ করেন কে. সি. দাস সংস্থা। সমাগত সাধু-ব্রহ্মচারিগণ 'মায়ের বাড়ি'তে রাতের প্রসাদ পান।

আরো উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'দিনরাত' (সম্পাদক—অমিতবিক্রম রাণা) ২৩ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত সংখ্যায় 'সিডিতে একশো বছরের উদ্বোধন' শিরোনামে চিত্রসহ একটি সুন্দর দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করেন। এই সংখ্যাটি বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরিত হয়।

অনুষ্ঠান-শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখী হন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ। স্টার-আনন্দ টিভি চ্যানেলে গৃহীত এই দিনের অনুষ্ঠান পরদিন সম্প্রচারিত হয়।

মহামূল্যবান এই CD (মোট ২১টি)-র প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং Music World-এর সমস্ত বিপণন কেন্দ্রে। মূল্য ১,৫০০ টাকা।

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ২ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা মহালয়া থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকার পর পুনরায় যথারীতি চলবে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটী (কলকাতা-৫১): গত ৩ জুলাই ২০০৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরাটী হাই স্কুলে বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম): গত ২১ জুলাই ২০০৫ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরি'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। এদিন তিনি গুরুপূর্ণিমা বিষয়ে ভাষণ দেন এবং প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চন্দননগর (হুগলি): গত ২১ জুলাই ২০০৫ উষাকীর্তন, স্তবপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী, প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, সভাপতি দুলালচন্দ্র নায়েক ও অনীশ রায়চৌধুরী।

বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর): গত ২২ জুলাই ২০০৫ সঙ্ঘ পরিচালিত 'সারদা বিদ্যামন্দির'-এর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিকাবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত কথা ও সঙ্গীত, ব্রতচারী অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে বৃক্ষবন্দনা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট আদালতের বিচারপতি শ্যামলকুমার গুপ্ত, অরুণকুমার সিংহ, শচীন্দ্রনাথ সাহা, আশিসকুমার গাঙ্গুলি, চিত্তরঞ্জন দাস, রীনা সরকার ও আরতি চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি, অভিভাবক প্রত্যেকে একটি করে বৃক্ষচারা রোপণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ২৫টি এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বৃক্ষচারা এই অনুষ্ঠানে রোপণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, উষাবাজার, আগরতলা (ত্রিপুরা): গত ২৭ জুলাই ২০০৫ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কীর্তন,

মন্দির-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, অর্ঘ্যপ্রদান এবং ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে পূর্বদিন অধিবাস, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী পাঠচক্র, নজরুল ইসলাম সরণি (কলকাতা-৫২)ঃ গত ৩০ জুলাই ২০০৫ বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী। উৎসবান্তে প্রায় ১০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

গরলগাছা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (হুগলি)ঃ গত ৩১ জুলাই ২০০৫ সঙ্ঘ-সঙ্গীত, 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে গরলগাছা বালিকা বিদ্যালয়ে সারাদিনব্যাপী আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'মহামণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা ও চরিত্রগঠনের প্রাসঙ্গিকতা', 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' এবং 'মনঃসংযোগ, জীবনগড়া ও চরিত্রগঠনের ব্যাবহারিক পদ্ধতি'। ভাষণ দেন সম্পাদক গৌতমকুমার ঘোষ, সোমনাথ বাগচী, অভিজিৎ ঘোষ ও যুগল প্রধান। ১৬০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি)ঃ গত ৩১ জুলাই ২০০৫ গোষ্ঠী আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় আদর্শ ভারত ও যুবসম্প্রদায়ের ভূমিকা' এবং 'স্বামীজীর ভাবে তরুণ-তরুণীরা ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে তৈরি করবে'। ভাষণ দেন স্বামী স্বগতানন্দজী, অরূপ চ্যাটার্জি ও সরস্বতী পোদ্দার। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী স্বগতানন্দজী। সম্মেলনে ১২১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

বিরজা-কৃপা ভবন, সল্ট লেক (কলকাতা-৬৪)ঃ গত ৫-৬ আগস্ট ২০০৫, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন-স্থাপনের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন ডঃ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। উভয় দিনে ভাষণ দেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান)ঃ গত ৭ আগস্ট ২০০৫ বৈদিক মন্ত্র পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্থানীয় রবীন্দ্র পরিষদ হল-এ যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন সম্পাদক নরেন ব্যানার্জি। ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী। প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সকলকেই 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন' পুস্তক প্রদান করা হয়।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, চকপাড়া শাখা, লিলুয়া (হাওড়া)ঃ গত ৭ আগস্ট ২০০৫ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব পালিত হয়। সান্ধ্যসভায় ভাষণ দেন স্বামী অনঘানন্দজী। সভার শেষে 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দমদম-নিবাসী শ্যামাপদ বসু রায় গত ১১ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী আশালতা ঘোষ গত ১১ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর অনুরাগিণী, দিল্লি-নিবাসিনী রুবি গুপ্ত গত ১৬ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-নিবাসী ননীগোপাল দাশ গত ২৭ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের বঙ্গাইগাঁও-নিবাসী প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য গত ২৮ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাওড়ার কুশবেড়িয়া-নিবাসী বাদলচন্দ্র মণ্ডল গত ৩০ এপ্রিল ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ছিলেন 'উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বেলুড়-নিবাসিনী সরযুবালা মুখোপাধ্যায় গত ২ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার নিউ আলিপুর-নিবাসিনী ঊষা মজুমদার গত ৫ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী বিজয়া নন্দী গত ১৫ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পুরী-নিবাসী নারায়ণপদ মৈত্র গত ২০ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ❑

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন প্রকাশিত ক্যাসেট, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, ই-বুক

সঙ্গীতাঞ্জলি—২৮.০০
সঙ্গীত-আরাধনা—২৮.০০
বিশ্বজননী শ্রীমা সারদাদেবী—২৮.০০
কীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ—৩০.০০
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ—৩০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনামৃত—৩০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান—৩০.০০
ভজন মঞ্জরী—৩০.০০
শোন শোন অমৃতস্য পুত্রাঃ—৩০.০০
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে—৩০.০০
প্রভু মেরে প্রীতম্—৩০.০০
মহামানবের চরণতীর্থে—৩০.০০
শ্যামা নামের লাগলো আগুন—৩০.০০
চিকাগো বক্তৃতা—৩০.০০
শিব শক্তি মালা—৩০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা—৩০.০০
গীতা-সার-সংগ্রহ (১)—৩০.০০
গীতা-সার-সংগ্রহ (২)—৩০.০০
আগমনী ও মায়ের গান—৩০.০০
ভজন সুধা—৩০.০০
এই সেই বাড়ি—৩০.০০
তমেব বন্দে—৩০.০০
Bhajananjali—30.00
Vedic Suktas—30.00
স্তবমালা (১)—৩৫.০০
স্তবমালা (২)—৩৫.০০
ও দুটি চরণ সার—৩৫.০০
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—৩৫.০০
ত্রিশরণ—৩৫.০০
দিব্য-গীতি—৩৫.০০
অন্তরে জাগিছো মা—৩৭.০০
শ্রবণ মঙ্গলম্ (১)—৩০.০০
শ্রবণ মঙ্গলম্ (২)—৩০.০০

Compact Disk (Audio)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান—৯০.০০
দিব্যগীতি—১৫০.০০
ও দুটি চরণ সার—৮০.০০
চিকাগো বক্তৃতা—৯০.০০
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে—৮০.০০
তমেব বন্দে—৭০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনামৃত—৯০.০০
মাতৃবন্দনা—৮০.০০
প্রভু মেরে প্রীতম্—৭০.০০

Compact Disk (V. C. D.) মদমহেশ্বর ও তুঙ্গনাথ—১০০.০০ ● *e-book on a CD-Rom* শ্রীমা সারদা দেবী—২০০.০০

রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের শ্রীমা সারদাদেবীর ওপর দুটি ভাষণ ও গান :
শ্রদ্ধাঞ্জলি—ক্যাসেট : ৫০.০০ ও Audio CD : ১০০.০০
শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের অমরনাথ যাত্রা—দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও বাঙলা) : Compact Disk (V.C.D.) : ২০০.০০

Udbodhan Office

1 Udbodhan Lane, Bagbazar, Kolkata-3, Phone : 2554-2248 Web-site : www.udbodhan.org

নানা স্বাদের বই

Jyoti Bhushan Chaki's
Bengali Self Tuition in Three Months 30.00

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বই ব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার ৫০.০০
১৮৬০ সালে বরদা প্রসাদ মজুমদারের শুরু করা ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল কিভাবে—তারই সম্পূর্ণ দলিল।

শিল্প ও সংস্কৃতি—বাঁকুড়া ৫০.০০
বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির সচিত্র রূপরেখা ফুটে উঠেছে বইটিতে।

প্রসাদ সেনের
রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিলনমেলা ৪০.০০
রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি কোন উৎস থেকে এবং তা কেমন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশস্বী শিল্পীর কলমে তারই বর্ণনা।

ছোটদের বুক অফ নলেজ ৩২০.০০
বইটি বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি। বিশাল জ্ঞান-রাজ্যের প্রতিটি বিষয়ের সচিত্র সন্নিবেশ ঘটেছে প্রায় হাজার পাতার দামী কাগজে ছাপা বইটিতে। বইটি কুইজ উৎসাহীদের কাছে সোনার খনি।

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
আমাকে চেনো ২০০.০০
বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুখকেই দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। স্কুল-কলেজ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও নার্সিং ট্রেনিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি অমূল্য সম্পদ।

রাধারমণ রায়ের
কলকাতা বিচিত্রা ৫০.০০
প্রাচীনকাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত এই শহরের রূপান্তরের কাহিনী।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্কর কন্যার কাছে ৪২.০০
নর্মদা পরিক্রমার কাহিনী। অমরকণ্টক থেকে নর্মদার ধার ধরে সোজা আরব সাগরে।

গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
হিমালয়ের পর্বতশীর্ষে গুহার মধ্যে বৈষ্ণোদেবীর দরবার। যাওয়া-আসার নিখুঁত বর্ণনা। থাকার হদিস। এক কথায় এটি বৈষ্ণোদেবীর দরবার দর্শনের গাইড-বই।

প্রণবেশ চক্রবর্তী
এই বাংলায় প্রতি খণ্ড ৩৫.০০ (১ম ও ২য় খণ্ড)
বাংলার গ্রামেগঞ্জে ছড়ানো রয়েছে কত মন্দির। তাকে কেন্দ্র করে বসে মেলা, হয় উৎসব। তারই সচিত্র কাহিনী এবং বাংলাকে নতুন করে দেখার পথনির্দেশ।

সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদারের ভ্রমণ কাহিনী।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড ◆ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর

হুগলি-৭১২৪২৪ ● ফোন ঃ (০৩২১২) ২৫৯-২৫০

একটি আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ (শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁর 'হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ' বলেছেন) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মভূমি ও শৈশবের লীলাক্ষেত্ররূপে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

এই গ্রামেই ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নয়জন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ধুনি জ্বালিয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য পদধূলিতে ধন্য এই আঁটপুর।

পরমপূজ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দুবার এখানে এসে গ্রামটিকে ধন্য করেছেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটায় দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপূজা শ্রীশ্রীমা দুর্গামণ্ডপে নিজে বসে থেকে পুনরায় চালু করেন। সেইসময়ই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা'রূপে অভিহিত করেন।

রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমের চেষ্টায় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটার অনতিদূরে তাঁর মাতুলালয় মিত্রবাটীতে (যেখানে বাবুরাম মহারাজের জন্ম হয়) শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর বিশেষ সমারোহে মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম অধিগৃহীত হয় এবং 'রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, বিনাব্যয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, স্থানীয় দরিদ্রদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজ চলছে।

কিন্তু আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থিত—(১) স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান মিত্রবাটীর মধ্যে মন্দির, (২) অন্যত্র অফিস এবং (৩) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটা—যেখানে ধুনিমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এসে থাকতেন। এটিই বর্তমানে সাধুনিবাস।

আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থানের ফলে এর পরিবেশ রক্ষা করা এবং আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে পুরো আশ্রমটিকে একই সীমানার মধ্যে আনা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য অন্তত পক্ষে দুই একরের মতো জমি, বাড়ি খরিদ করতে হবে।

এই কাজে ইতোমধ্যে আমরা কিছু জমি কিনেছি এবং আরো বাড়ি ও জমি কিনতে হবে। বর্তমানে এই কাজের জন্য ন্যূনতম **পঞ্চাশ লক্ষ** টাকা (আনুমানিক হিসাব) ব্যয় করতে হবে।

এই শুভ প্রকল্পে সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও প্রেমানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে সকলের মঙ্গল কামনা করি।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী বরানন্দ
অধ্যক্ষ

এই প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফ্ট/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর"—এই নামে পাঠাবেন।
U. B. I., Belur Math Branch, S.B. A/c. No. 57258

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের স্বভাবই তো নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর-৭১২৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
  কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন : ২৬৭৩-৯২০৮
- **হারিট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ হারিট-৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ** (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
  পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন : ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম, (কামাক্ষাতলা)
  মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯, ফোন : ২৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**, (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
  উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন : ২৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
  ফোন : ২৬৬৩-৭০৪৬
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
  ফোন : ২৬৮৪-৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- **শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র**
  গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬, ফোন : ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- **জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র**, প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
  জনাই-৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-২৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+ পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ৪/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
  ফোন : ২৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**, তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ কুমরুল (তারকেশ্বরের নিকট)
  পিন-৭১২৪১০, ফোন : ২৬৬৪-৯৮১৬
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেণ্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, বগুলা-৭৪১৫০২
- **নব রামকৃষ্ণ অপেরা**, বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, সি/২০, পোঃ তাহেরপুর
- **ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল**, 'সারদা ভবন'
  ফুলিয়া-৭৪১৪০২, ফোন : ০৩৪৭৩-২৩৪০০২

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  শিক্ষাগার রোড, হাটতলা, পিন : ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার পীঠ**, 'রাণুভিলা', পোঃ বড়বাগান, সিউড়ি-৭৩১১০৩
  শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বোলপুর, ফোন : ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪
- **সর্বমঙ্গলা বুক স্টল**, প্রযত্নে রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র
  পোঃ রামপুরহাট, ফোন : (০৩৪৬১) ২৫৮৩৬৮

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩, ফোন : ০৩৪৮২-২৬৫৪০৭
- **দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬
- **অশোক দাস**, ৩৪, দৈহাট্টা রোড, পোঃ খাগড়া
  পিন-৭৪২১০৩, ফোন : (০৩৪৮২) ২৫০৩৩৩

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামহরিপুর-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, সারেঙ্গা-৭২২১৫০
- **কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩, ফোন : (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮
- **শুকজোড়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**
  শুকজোড়া গেলিয়া, ফোন : ০৩২৪৪-২৫০৫৯৬

পুরুলিয়া

- **পুরুলিয়া বুক ডিপো**, হাটতলা, ফোন : (০৩২৫২) ২২৭২৯-২২৬৫১৩

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

নির্মীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে; তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে হোমিও-চিকিৎসা

ডেঙ্গুজ্বর (Dengue) ঃ সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মশকদংশনঘটিত অস্থিবেদনা-সহ তীব্র জ্বর। অসাবধানতা-বশত মৃত্যুও ঘটতে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি ডেঙ্গু চিকিৎসায় যথেষ্ট সফল। রোগীর মানসিক ও দৈহিক লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণীত হলে সহজেই ডেঙ্গুজ্বর থেকে অব্যাহতি সম্ভব। ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচলিত কয়েকটি ঔষধের পরিচয় দেওয়া হলো।

একোনাইট (Aconite Nap) ঃ হঠাৎ তীব্র জ্বর সন্ধ্যাকালে ও দ্রুত বৃদ্ধি, তৎসহ মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, ছটফটানি, নিদারুণ জলপিপাসা। প্রবল শীতসহ গরম, সর্দি, ঘামশূন্য। শিশু মুঠি কামড়ে কাঁদে। গলা, কান, বুক, মাথায় যন্ত্রণা। চোখ লাল। পূর্ণ বা কঠিন স্ফীত নাড়ি। ১x, ৩, ৬ শক্তির ওষুধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন। ঘাম নির্গত হলেই ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফো (Eupatorium Perf) ঃ সকাল ৯টাতে কম্পসহ জ্বর। শীতকাতরতা-সহ পিত্তবমি, জিভ ময়লা; জ্বর আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগে জলপিপাসা থাকে। যদি ঘাম হয় তাহলে মাথাব্যথা বৃদ্ধি হয়। বুকব্যথা, হাড়ভাঙা ব্যথা। নড়াচড়াতে ব্যথা বৃদ্ধি, হাতের কবজি, হাত-পা ফোলা; অঙ্গের প্রতিটি স্থানে যেন লাঠিপেটা করা হয়েছে। মাথা ঘোরালে বামদিকে পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক। বামদিকে শুতে পারে না। শীতল বায়ু অসহ্য, সর্বাবস্থায় গায়ে ঢাকা রাখে। ৩০ বা ২০০ শক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার সেবন।

বেলেডোনা (Belladonna) ঃ হঠাৎ তীব্র জ্বর বিকাল ৩টা বা রাত্রি ১২টায়। মাথায় রক্তাধিক্য; মুখ-চোখ গরম, রাঙা; হাত-পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম। দেহে ব্যথা হঠাৎ বৃদ্ধি। গাঁটের, পীঠের ব্যথা, ফোলা, লাল; সহ্য হয় না ছোঁওয়া, ঝাঁকি, টেপা; নড়তে, শুয়ে বা শব্দে রোগলক্ষণ বৃদ্ধি। গলাতে, রগে, কর্ণমূলে দপদপানি। চুপচাপ গরম ঘরে শুয়ে থাকে। পিপাসাহীন। মাথাতে ঘাম। নাকে রক্ত। শিশু চমকে জেগে চেঁচায়, পালায় বা কামড় দিতে চায়। নাড়ি পূর্ণ সতেজ, জিভের মাঝে সাদা; ধার লাল। ৩০ শক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার সেবন।

জেলসিমিয়ম (Gelsemium) ঃ সকাল ১০টাতে জ্বরের আক্রমণ-সহ বৃদ্ধি; ঘুম ঘুম ভাব, ঘোর ঘোর; মাথাভার; দৃষ্টিলোপ; এক বস্তু দুটি দেখে। থমথমে মুখচোখ। হাত, পা কাঁপে। দেহ টলমল; চলা-বলাতে বেসামাল। চোখ-মুখ বন্ধ করে রাখে। জিভ কাঁপে। জিভ বার করতে দাঁতে আটকে যায়। শিউরে ওঠে। নাড়ি ধীর। জলপিপাসাহীন। নড়াচড়া বা স্পর্শ অপছন্দ। বিড়বিড় করে। উঁচু বালিশ, চাপা, ঢাকা পছন্দ। শিশু পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাকে ধরে রাখে। ৩০ শক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার সেবন।

রাসটক্স (Rhus Toxicodendron) ঃ মধ্যরাত্রে জ্বর বৃদ্ধি। অবশতা, দুর্বলতা, আড়মোড়া, এপাশ-ওপাশ করা; যেপাশে শোয়, সেপাশ ব্যথা-অবশ। শক্ত বিছানা চায়। স্থির থাকলে দেহে, গাঁটে ব্যথা বৃদ্ধি। কেবল ছটফট। কখনো বসে থাকতে চায়, আবার কখনো শুতে চায়। কোনভাবেই আরাম পায় না। নিদ্রাহীন। গা, হাত, পা টিপে দিতে বলে। জিভের ডগা ত্রিকোণ লাল; মুখ তেতো। খাদ্য গিলতে পিঠে ব্যথা; গলা, ঘাড়, কুঁচকি, চোখের পাতা ফোলা। ঢাকা ও চাপা পছন্দ। ৩০ শক্তি ২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার সেবন।

প্রতিষেধক ঔষধ ঃ ইউপেটোরিয়াম পার্ফো-৩০ বা ২০০, ৬টা বড়ি দুদিন অন্তর, প্রতি জনে, প্রাতে সেবন—মোট চারবার।

উল্লিখিত ওষুধগুলি ছাড়া, বর্তমানে ডেঙ্গু জ্বরে অধিকাংশ রোগীর নাক-মুখ দিয়ে রক্তপড়া, রক্ত বমি করার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। Intestinal Bleeding-ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে ফসফরাস-৩০ (Phosphorus-30) একটি মহৌষধ। এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই ওষুধটি রোগী গ্রহণ করতে পারেন।

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail: udbodhan@vsnl.net
Phone:2554-2248, 2554-2403

Vol.107
No.10
October
2005

Postal. Regn. No. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06
Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র।

উদ্বোধন

গত ১লা মাঘ ১৪১১ (১৫ জানুয়ারি ২০০৫) 'উদ্বোধন' ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৬ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম

* 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।
* বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ও সংযুক্ত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।
* প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে অনেক বেশি। কিন্তু সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে আগামী বছরের জন্য আমরা গ্রাহকমূল্য বৃদ্ধি করতে পারিনি, ৮০ টাকাই রাখা হয়েছে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশামতো বাঙালির ঘরে ঘরে আজও আমরা 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে পারিনি। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার অতিক্রম করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।
* 'উদ্বোধন'-এর [illegible] একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য [illegible] যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : [illegible] **Editor,** ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, ক[illegible]। চিঠিতে বা **M.O.** কুপনে [illegible] নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞ[illegible] **'Udbodhan Office,** [illegible] **700 003'**—নামে চেক বা ড্রাফটে পাঠা[illegible]

সম্পাদক

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০্ টাকা। সডাক ১০০্ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ১০্ টাকা।

If undelivered, please return
Udbodhan Office
1 Udbodhan Lane, Kolkata-3

১০৭তম বর্ষ   উদ্বোধন কার্যালয়   কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।
সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

৪২৮৪১

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● সারদাপীঠের ফোন ঃ ২৬৫৪-৬৪৮০/৫৮৯২
ই-মেল ঃ rmsppp@vsnl.com ● (বিঃ দ্রঃ বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৫৭০০-০৩)

আমাদের প্রকাশিত সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

যেসব অ্যালবামের শুধু ক্যাসেট (মূল্য ঃ ৩৫ টাকা) *আছে*

ক্যাসেট	অ্যালবামের নাম
(SP-14-16)	শ্রীকালীকীর্তন *(৩ খণ্ডে)*
(SP-18)	গীতিবন্দনা
(SP-21-22)	সংকীর্তন সংগ্রহ *(১ম ও ২য় খণ্ড)*
(SP-17)	বীরবাণী
(SP-35)	আগমনী
(SP-4)	যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ *(বক্তৃতা—স্বামী ভূতেশানন্দ)*
(SP-30)	শ্রীসারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য
(SP-19)	শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান *(বক্তৃতা—স্বামী ভূতেশানন্দ)*
(SP-28)	সরস্বতীবন্দনা

যেসব অ্যালবামের ক্যাসেট (মূল্য ঃ ৩৫ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য ঃ ১০০ টাকা) *উভয়ই আছে*

ক্যাসেট/সিডি	অ্যালবামের নাম
(SP-1 & CD/SP-1)	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
(SP-3 & CD/SP-3)	শ্রীরামনাম-সংকীর্তনম্
(SP-9 & CD/SP-9)	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
(SP-13 & CD/SP-13)	শ্রীসারদাবন্দনা
(SP-23 & CD/SP-23)	ওঠো জাগো
(SP-27 & CD/SP-27)	বেদমন্ত্র
(SP-37 & CD/SP-37)	সবাই মিলে গাই এসো
(SP-31-34 & CD/SP-31-34)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা *(চার খণ্ডে)*
(SP-39 & CD/SP-39)	শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্
(SP-41-44 & CD/SP-41-44)	শ্রীশ্রীচণ্ডী *(চার খণ্ডে)*
(SP-36,40 & CD/SP-36,40)	ভজন সুধা *(দুই খণ্ডে)*
(SP-38 & CD/SP-38)	যুগে যুগে হরি
(SP-45 & CD/SP-45)	স্বামী অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর
(SP-2,7,8,10-12 & CD/SP-2,7,8,10-12)	কথামৃতের গান *(ছয় খণ্ডে)*

ক্যাসেট (মূল্য ঃ ৩৫ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য ঃ ৯০ টাকা)

(SP-6 & CD/SP-6)	শিবমহিমা
(SP-25 & CD/SP-25)	রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
(SP-26 & CD/SP-26)	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
(SP-20 & CD/SP-20)	বিবেকানন্দ বন্দনা
(SP-29 & CD/SP-29)	শ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(SP-5 & CD/SP-5)	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব
(SP-24 & CD/SP-24)	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা

ক্যাসেট (মূল্য ঃ ৪০ টাকা) ও *সিডি* (মূল্য ঃ ৯০ টাকা)

(SP-48 & CD/SP-48)	রামকৃষ্ণের বেদিতলে
(SP-47 & CD/SP-47)	দেহি পদতরণী
(SP-46 & CD/SP-46)	মায়ের পায়ে জবা

যেসব অ্যালবামের শুধু ভিসিডি আছে

ভিসিডি	অ্যালবামের নাম
(VCD/SP-2,2A)	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আরাত্রিক *(বাঙলা ও ইংরেজি)* (২০০/-)
(VCD/SP-1A,1)	শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন *(১ম পর্ব)* *(বাঙলা ও ইংরেজি)* (১৫০/-)
(VCD/SP-3A,3B,3)	মা সারদার চরণরেখা *(বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজি)* (১৫০/-)
(VCD/SP-4)	শক্তিতত্ত্বে দেবী দুর্গা ও শ্রীশ্রীমা সারদা *(দুই খণ্ডে)* (প্রতিটি ১২৫/-)

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

প্রার্থনা ও সঙ্গীত	*মূল্য ১৮ টাকা*
শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ	*মূল্য ৫ টাকা*
শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ	*মূল্য ৬ টাকা*
স্বামীজীর উপদেশ	*মূল্য ৫ টাকা*
আরাত্রিক ভজন	*মূল্য ২ টাকা*
ধর্ম ও ধর্মজীবন	*মূল্য ৫ টাকা*
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদর্শ ও ইতিহাস	*মূল্য ৫ টাকা*
আত্মবিকাশ	*মূল্য ৬ টাকা*

গঙ্গা ধূপ

৫০ কাঠি *(মূল্য ১৫ টাকা)*, ১০০ কাঠি *(মূল্য ৩০ টাকা)*

সারদাপীঠের অন্যান্য সামগ্রী

● পঞ্চপ্রদীপ *(৮০০ টাকা)* ● ঝাড়প্রদীপ *(৭৫০ টাকা)* ● কর্পূরদানি *(৩৭৫ টাকা)* ● দীপদানি *(৩৫০ টাকা)* ● ধূপদানি [ওঁ] *(৬০ টাকা)*, [বাড] *(৭০ টাকা)* এবং [লোটাস] *(৭৫ টাকা)* ● অ্যালুমিনিয়াম ফটো ফোল্ডার *(নানা সাইজের)* ● ল্যামিনেটেড ফটো *(নানা সাইজের)* ● বাণী জ্যাকেট *(ছবিসহ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কিছু উপদেশ)* ● আর্কলিক ফটো ফ্রেম ● শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদদের ফটো *(বিভিন্ন সাইজের)*

প্রাপ্তিস্থান ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শোরুম, বেলুড় মঠ শোরুম, মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রিট ও ভারতবর্ষে এদের অন্যান্য কেন্দ্র), মেলোডি (কালীঘাট) এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম।

বিঃ দ্রঃ ডাকযোগে জিনিস পেতে হলে দ্রব্যের মূল্য M.O. অথবা D.D. মারফত নিম্নোক্ত ঠিকানায় অগ্রিম পাঠাতে হবে।
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (পি. কাম পি. অ্যাণ্ড সি. আই. সেকশন), পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২।

সূচিপত্র

উদ্বোধন ॥১০৭॥

১০৭তম বর্ষ | একাদশ সংখ্যা ❀ অগ্রহায়ণ ১৪১২ ❀ নভেম্বর ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী শিবপ্রদানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ৮০ টাকা; সডাক : ১০০ টাকা ❑ প্রতি সংখ্যার মূল্য : ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৬ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১২-১৪১৩ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ ইচ্ছায় ঘরে ঘরে সুলভে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্যও অপরিবর্তিত রাখা হলো। এই নিয়ে পর পর তিনবছর 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য একই থাকল।

গ্রাহকভুক্তি ঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকবর্ষ পুনঃপ্রবর্তন করা হচ্ছে আগামী ১০৮তম বর্ষ/২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। অর্থাৎ পূর্বের ধারা অনুযায়ী গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা হবে মাঘ/জানুয়ারি থেকে পৌষ/ডিসেম্বর পর্যন্ত। অবশ্য সাম্প্রতিককালের পরিবর্তনের নিরিখে (বছরের যেকোন মাস থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়ার ব্যবস্থা) যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন, ডিসেম্বর ২০০৫-এর পর তাঁদের যে-টাকা অবশিষ্ট থাকবে, তা আগামী বছরের গ্রাহকমূল্য থেকে বাদ যাবে। সেক্ষেত্রে, তাঁদের গ্রাহকপদ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের/ ১০৮তম বর্ষের বাকি টাকা অবিলম্বে জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে, আপনারা গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রে, কার্যালয়ে এসে অথবা দূরভাষের মাধ্যমে কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

১০৮তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৬) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।** উত্তর পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই **যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

'উদ্বোধন'-এর সেবায় নয়টি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য আটটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata-700 003'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

● এস ভাই, আমরা সব মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর আওতার বাইরে এক স্বর্গীয় জাতি সংগঠনে যত্নবান হই। এই স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে যেন কেবল প্রেমের—নিঃস্বার্থ প্রেমের, ঈশ্বরোন্মাদনা-যুক্ত প্রেমের খেলাই থাকে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলি তলোয়ারের জোরে পৃথিবী শাসন করতে চায়। এস, আমরা এই জগৎকে আমাদের প্রেম, উন্মত্ত প্রেম, আর শান্তি দিয়ে বেঁধে ফেলি; আর সমস্ত জাতিগুলিকে নিয়ে একটি জাতিতে একত্রিত করি। সব স্বার্থপরতা দূর হোক, নাম যশ গৌরব চলে যাক।

● তিনটে লোক এক হতে পার না, দম্ভ দূর করতে পার না, ভালবাসায় মেতে আপনহারা হতে পার না, জ্যান্তে মরা হতে পার না, আবার চাও কিনা ভগবান? তোমরা নাকি আবার ঠাকুরপূজা কর! শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর! ধিক্ তোমাদের! যদি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা না থাকে, তবে তোমাদের পড়াশুনা পাঠ পূজা প্রচার সব বৃথা।...

ভালবাসা এলে গলে যাবে, আনন্দ পাবে। ভাল ভাল জিনিস পেলে নিজে না খেয়ে ভাইদের খেতে দিও, এই করে ভাব বাড়ে, ভক্তি আসে। পরস্পর কেবল গুণ দেখবে, দোষের দিকে মোটেই নজর দেবে না।...

নিজ নিজ দোষ বার করতে চেষ্টা ও শুধরাবার কৌশল শিক্ষার নাম সাধন। পরের গুণ সর্বদা দেখলে ও সাধ্যমত অনুকরণ করতে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হওয়া যায়। এই জীবনে যদি সিদ্ধ হতে না পার তবে সহস্র জন্মে হয় কিনা সন্দেহ, বিশ্বাস কর এই শরীরেই হবে, হবে, হবে, মোহ কেটে যাবে, আঁধার দূর হবে।

● প্রভু আমাদের মহা উদার, অতি বিশাল বিস্তীর্ণ। সঙ্কীর্ণ স্থানে গণ্ডির মধ্যে তিনি কেমন করে থাকবেন? 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' করতে হবে। দেখছ না স্বামীজীর লীলাখেলা? 'নাল্পে সুখমস্তি', হৃদয়টা বিশাল হতে অতি বিশাল করতে হবে। তবে আমাদের প্রভুর হবে সেখানে আগমন। যদি আমাদের প্রভু কিছু ঘৃণা করে থাকেন তবে সে একঘেয়ে দলাদলি।

● দেখ, স্বার্থ, সুখ, সুবিধা ত্যাগ না করতে পারলে সে কি আবার মানুষ? ঠাকুরের নাম করবে, আবার স্বার্থপর হবে? সে ভণ্ড, তার উন্নতি কোথায়? তার দেশ চিরকাল অন্ধকারে ডুবে থাকবে, না উন্নতির আলোক পাবে? তুমি খুব ধীর স্থির হয়ে, চিন্তা করে চলবার চেষ্টা করবে।

স্বামী প্রেমানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

নব জীবনের আশ্বাসে

অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বে মানব-মনে হিংসার তীব্রতা কতটা ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। তবে বর্তমান শতাব্দীর কুৎসিত ধ্বংস ও হত্যার নারকীয় লীলা মননশীল মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতাকে যে হতমান করিয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে হিংসার কদর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিচারশীলতার কোন স্থান নাই। আজ হিংসাকে প্রতিহিংসা দ্বারা দমনের চেষ্টা চলিতেছে। তাহাতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইতেছে না। ফলে আরো নির্মম হিংসার চরিতার্থতার জন্য উদগ্র বাসনার উত্তেজনায় থরথর কাঁপিতেছে মানবসমাজ। তবে কি ইতিহাস-চক্র বিপরীতে ঘুরিতেছে? আজ প্রগতিশীল মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কিত যে ঢক্কানিনাদ আমরা শুনিতেছি তাহা কি আদিম যুগে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত করিতেছে? যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে তবে তো মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত! তবে আগামিকালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানবই সর্বাপেক্ষা হিংস্র প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত হইবে। বর্তমানে মানব-মনের হিংসার অগ্নি মানবসমাজকে দগ্ধ করিয়া তাহাকে বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। গত শতাব্দীতেও রণক্ষেত্রে হিংসার প্রকাশ ঘটিত। কিন্তু আজ এই অশান্ত ক্ষণে, প্রকৃত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব হওয়ায়, মানুষের সহিত মানুষের অবিরাম হিংসাশ্রিত সম্পর্কের অনল সমাজ ও সভ্যতাকে ভস্মীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজবিজ্ঞানিগণ ইহাকে প্রতিযোগিতার সমাজ আখ্যা দিয়া সেক্ষেত্রে 'যোগ্যতার যুদ্ধ' এবং 'বাজার দখলের সংগ্রাম' প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেন একটি মোমবাতির উভয় প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। ফলে মোমবাতি অধিক আলোক প্রদান করিলেও তাহা যে একই-সঙ্গে দ্রুত অন্ধকারে বিলীন হইবে, তাহা অনুমিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের একটি বেদনার অথচ বিচিত্র চিত্রকে স্মরণ করিতে পারি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি আততায়ীর বুলেট মহাত্মা গান্ধীকে বিদ্ধ করিয়াছিল। উক্ত বুলেট শুধু মহাত্মাকেই বিদ্ধ করে নাই, তাহা ভারতের সহনশীলতার শক্তি ও ত্যাগের ঐতিহ্যকেও আঘাত করিয়াছিল। পরন্তু মহাত্মার অন্তিমযাত্রার আয়োজন যেন ভারতের শান্তি ও অহিংসার প্রতীককে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিয়াছিল। বৃহৎ সাঁজোয়া যানের উপর শায়িত মহাত্মা গান্ধীর মরদেহের অগ্রে ও পশ্চাতে ট্যাঙ্ক ও সশস্ত্রবাহিনীর জওয়ান ও সেনাধ্যক্ষগণ শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আকাশে উড়িতেছিল টহলদারি জঙ্গিবিমান। শোকযাত্রার পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্র-সজ্জিত যাত্রা যেন সেইদিন ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ভবিষ্যতের দুর্লক্ষণের ইশারা বহন করিতেছিল।

ভারতবর্ষ খণ্ডিত স্বাধীনতালাভের পর পৃথিবীর বৃহত্তম জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল ঠিকই, কিন্তু জনগণকে সংগঠিত করিয়া জনশক্তি সৃষ্টি করা আর মুখ্য কর্মপন্থারূপে স্বীকৃত হইল না। ফলে সরকার নামক যন্ত্রটির উপর অধিকার স্থাপন করাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। সরকারি যন্ত্রটি প্রাণহীন আচারসর্বস্ব ও অক্ষম কর্মকাণ্ড হিসাবে পরিগণিত হইল এবং আত্মশক্তি ভুলিয়া জনগণ সরকার-নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত হইতে থাকিল। অন্যদিকে নেতৃত্বের (leadership) দিঙ্‌নির্দেশ ও প্রশিক্ষণের পরিবর্তে শাসনতন্ত্র কায়েম (rulership) করিবার অপচেষ্টা অব্যাহত থাকিল। ফলে জাতীয় স্তরে ও ব্যক্তিজীবনে ভালবাসার স্থানে হিংসা, দায়বদ্ধতার স্থানে ক্ষমতা দখলের নীতিবিহীন লালসা, আত্মত্যাগের স্থানে পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা চক্ষুলজ্জার আবরণকে বিদীর্ণ করিয়াছিল।

বর্তমানে মহাসঙ্কটকালে কিছু সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা যে, মানবসভ্যতার বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছে। বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিলে প্রতিমা যেমন জলে বিসর্জিত হয়, তেমনই 'মত-ঋদ্ধ-প্রতিমা' কালের স্রোতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। 'ধনতন্ত্র' অথবা 'সমাজতন্ত্র' লইয়া নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহু কালক্ষেপ হইয়াছে। তাহার অদলবদল করিয়া নূতন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তবে কি আসন্ন ধ্বংসকে একমাত্র উপায় হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে? নাকি নব সৃষ্টিপর্ব রচিত হইবে? বিসর্জনের পর পুনরায় যেমন আগমনীর আশ্বাস জাগিয়া উঠে, তেমনি ধ্বংসের ভিতরই সৃষ্টির বীজ উপ্ত হইবে। কথাটির দার্শনিক ভিত্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা চলে না। নবপথের অনুসন্ধানের দায়িত্ব আজ ভারত তথা পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উদাহরণ উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপীয় সমাজের কিছুই ধ্বংস হয় নাই। পক্ষান্তরে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী কালে ইউরোপের নানা অগ্রগামী দেশসমূহের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অনেকের মতে, আজ 'beyond capitalism and beyond socialism' অবস্থায় যাইবার উদ্যোগ করিতে হইবে। উক্ত সমাধানের ভিতর তাহার চিন্তাগত সীমাবদ্ধতা

মত বা তন্ত্রের বাহিরে যাইবার প্রচেষ্টায় নূতনতর 'ইজম' বা 'তন্ত্র'-এ বদ্ধ হইবে। ফলে তাহারও প্রায়োগিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইবে। যাঁহারা রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপীয় সভ্যতার নব উন্মেষের উদাহরণে উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা দরকার যান্ত্রিক সভ্যতা হইতে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক সঙ্কটের কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষিবর্গ বহুবার এবিষয়ে সচেতন বাণী উচ্চারণ করিলেও ভোগবাদের তাড়নায় মানবসমাজ তাহা শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ফলে অন্তরের সঙ্কট মানবচিত্তকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। যাহাদের আয়ত্তে বিত্ত বা ক্ষমতা নাই, তাহারা বঞ্চনার জ্বালায় জর্জরিত। যাহাদের সম্ভোগের জন্য প্রচুর উপকরণ রহিয়াছে, সামাজিক ক্ষমতা যাহাদের করায়ত্ত—তাহাদের অন্তরও আত্মবিচ্যুতির গ্লানিতে বিনষ্টপ্রায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তা মানব-মনকে ক্ষিপ্ত করিতেছে, তাহাকে হিংসাশ্রয়ী করিতেছে। আত্মগ্লানির কারাগারে বদ্ধ মানব-প্রাণ অসহায়ভাবে পাষাণসম স্ব-সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার প্রাচীরে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটিতেছে। 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, বিপন্ন। মাটির ফসলের সহজ গান তাঁহার মনকে টানে, উদ্বেল করিয়া দেয়। তবু সাড়া দিবার সামর্থ্য নাই। মৃত্তিকার বুকে আপন মহিমায় অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ফুল আলো আর বাতাসে খেলিতেছে। রাজা শক্তিশালী হইয়াও তাহার জাদুস্পর্শ হইতে বহু দূরে থাকিয়া পাতালের অন্ধকারে মৃত ব্যাঙ লইয়া আত্মতুষ্টির বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তথাকথিত দানবীয় সভ্যতার অভিশাপে রাজা কত দুর্বল! কত অসহায়! তাহার বাহিরে কাঠিন্য, কিন্তু অন্তরে নিঃশব্দ অবুঝ ক্রন্দন, বাক্যহীন আকুতি। আজ ভোগবাদী সভ্যতার আগ্রাসী ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিতে গিয়া বর্তমান সভ্যতার অকালমৃত্যুর কাল উপস্থিত হইয়াছে। 'Limits of Growth' সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করিয়া ভোগবাদ আজ দিশাহারা পথিকে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। তাই বিসর্জনে নহে, তাহাকে সমর্পণের পথে ফিরিতে হইবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা সগর্বে বলিতেছি, 'সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রাম'। বাহ্য যোগসূত্র স্থাপিত হইলেও অন্তরের দূরত্ব একসঙ্গেই বর্ধিত হইয়াছে। আমরা পরিবারে, বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাইতেছি, কিন্তু জীবনের দীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। বর্তমানে শিক্ষিত হইয়া জীবন-প্রতিষ্ঠার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতেছি ও অসহায়ভাবে স্বার্থপরতা তথা আত্মকেন্দ্রিকতার করাল সমুদ্রে নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিতেছি। ইহার ফলে প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতাবিহীন মানবজীবনে মূল্যবোধের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ভোগবাদের তাড়না পৃথিবীর পথে মহানাগরিকগণের মনে বিশ্বাসের সঙ্কট তীব্র করিয়া তাহাদের অগ্রসর হইবার প্রাণতা খর্ব করিতেছে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তার সহিত বিশ্লেষণী বুদ্ধি সংযোগে সৃষ্ট অভাবাত্মক ব্যবসায়িক বুদ্ধি আজ মানবসমাজে প্রভুত্ব করিতেছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর 'তিন ভুবন' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেনঃ "ব্যবসায়ের লক্ষ্য আর্থিক লাভ, রাজনীতির লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রয়োজন হয় রণকৌশল। অন্ধ আবেগে যুদ্ধ করা যায় না। এসবের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে মানুষের ক্ষমতাসন্ধানী প্রয়োগাত্মক বুদ্ধি। সভ্যতার বিবর্তনে উপেক্ষণীয় নয় পরিকল্পিত স্বার্থবোধের ভূমিকা।" স্বার্থবোধের অন্ধ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া মানবজাতির ভাণ্ডার আজ ধ্বংসাত্মক অস্ত্রে পূর্ণ হইতেছে। মানবসমাজ আজ প্রবলভাবে বিপন্ন। ইহা বাস্তবিক বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু শত বিপন্নতাকে চিহ্নিত করিলেই মানবসভ্যতা ধ্বংসের নিষ্ঠুরতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। সেক্ষেত্রে বিকল্প চেতনার বিকাশকে জাগ্রত করিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থের যুক্তির জালকে ছিন্ন করিলে প্রকাশিত হইবে হৃদয়ের বিস্তৃত ভূমা, অনুভূতির সংবেদনশীল জগৎ। আত্মশক্তির জাগরণ তথা উদ্বোধন মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবে। সমষ্টিবদ্ধতার অন্ধ আনুগত্যে মুক্তি নাই। মুক্তি আছে আত্মশক্তিনির্ভর দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সহযোগিতা ও সমবায়ের পথে। অর্থনীতিতে সমবণ্টন সংক্রান্ত বৌদ্ধিক চর্চা স্বীকৃত হইলেও সীমাহীন প্রলোভনের সম্মুখে তাহার প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ইহাকে প্রায়োগিক আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি বলিয়া আধুনিককালের দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অম্লান দত্ত আরো বক্তব্য সংযোজিত করিয়া লিখিয়াছেনঃ "অথচ লোভের পাশেপাশেই মানুষের চেতনার গভীরে আছে অন্য এক অতল আকাঙ্ক্ষা, শর্তহীন মিলনের তৃষ্ণা। সীমাবদ্ধ কালের ভিতরেও সেই মিলন আনে ক্ষণে ক্ষণে অমরত্বের আস্বাদ। শুদ্ধপ্রীতিতে আমরা আত্মাকে প্রসারিত করেই প্রীত।" সদা সম্প্রসারণশীল আত্মায় জীবন ও জগতের নিহিতার্থ বিদ্যমান। মানবচৈতন্যের চিরায়ত আকাশে উক্ত সত্য-সূর্য আলো দিতেছে, ক্রমাগত আলো দিতেছে। কালকে অতিক্রম করিয়া ইহা চলিতেছে, চলিতে থাকিবে। উপনিষদ্ এই মনুষ্যত্বের অভিযানকে বলিয়াছেন 'আত্মানং বিদ্ধি'।

আমাদের প্রাত্যহিকী, সমাজ গঠনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিকে আধ্যাত্মিকতার রসে সঞ্জীবিত না করিলে বর্তমানে এই দানবীয় সভ্যতায় লালিত আত্মঘাতী মানবসমাজ পৃথিবীর বুকে শেষ রাক্ষস প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হইবে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ ও সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্ত সেই কারণেই বলিয়াছেন ঃ "Secularise your spiritual activities নয়, Spiritualise all your secular activities. এই জগৎ ঈশ্বরময়, ঈশ্বরের দ্বারা আপ্লুত, একে তোমাকে আমাকে সকলকে পেতে হবে, তা না পেলে আমাদের কারোরই চলবে না, অল্পে সন্তোষ নেই, আমাকে সম্পূর্ণ পেতে হবে, সমগ্রের মধ্যে মিলিত হতে হবে। কিন্তু সেটা ভোগের পথে সম্ভব নয়, ত্যাগের পথেই সেই সমগ্রকে পেতে পারবে।" ভোগের পথ সীমিত, খণ্ডিত। ফলে বঞ্চনার গ্লানির রক্তে উহা পিচ্ছিল। অপরদিকে বিরাটের অখণ্ড ঐশ্বর্য আমাদিগকে সমস্ত সমাজের পরিপূর্ণতা দিবে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দিবে। মানবের মননের দেবরাজ্য সেই অফুরাণ বৈভবের ভাণ্ডার। আচার্য খ্রিস্ট সেই কারণে আশ্বাসবাণী দিয়াছেন ঃ "The kingdom of God is within you!" তরুণ বয়সে চিন্তাবিদ্ কার্ল মার্কস বিকৃত চার্চ-ধর্মকে আক্রমণ করিয়া ধর্মকে 'জনগণের আফিম' বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি জীবনের প্রান্তলগ্নে খ্রিস্টধর্মের মানবিক রূপকেও প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার কন্যা এলিনর মার্কসকে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন ঃ "Inspite of everything we must forgive much to Christianity, for it has taught us to love children."

বর্তমানে পৃথিবীর হিংসাতাড়িত সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রশাসনগত অধিকার হয়তো নরকে নরোত্তমে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নারায়ণে উদ্বর্তিত করিতে সক্ষম নহে। তাহা নরের অন্তর্লীন বৃহৎ সত্তার উদ্বোধনের মধ্য দিয়া সম্ভব হইতে পারে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সত্যই তাঁহার ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ তাঁহার দেশ। তিনি বলিয়াছেন ঃ "কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে। সেটি এটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্বদেশে, সর্বজাতির পক্ষেই একথা সমভাবে সত্য।"

মানবের মননের দেবরাজ্যে তাহারই অন্তরতর সত্তা প্রসুপ্ত রহিয়াছে। সেই 'বড় আমি' তাহার রাজা, তাহার ঈশ্বর। ইহাই তাহাকে অন্তর হইতে পরিচালনা করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে লইয়া চলিয়াছে। ফলে সৃষ্টি হইতেছে মানবকীর্তির ইতিহাস। মানবকীর্তি আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু তাহা মানবকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলে বিপত্তি ঘটিয়া যায়। মানবের কীর্তির অন্তরালে তাহার মৌলিক সত্তা আবৃত হইয়া যায়। মানবের জীবনবৃত্তে মানবসমাজ যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি অভিমুখে যাত্রা করে, তখন তাহাতে সভ্যতার অগ্রগতি সূচিত হয়। কিন্তু কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচারহীন চলমানতায় যথার্থ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে না। ফলে পরিধি অভিমুখে যাত্রা করিয়া, পরিধিকে বিস্তৃততর করিয়াও তাহাকে স্বীয় কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের চেতনার পথে তাহাকে দেবত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়া দেখিতে হইবে। তাহা পশ্চাদ্দৃষ্টি নহে, তাহা মানুষের অন্তর্দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ঃ "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" বিবেকবাণী আরো গভীরতর প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছে ঃ "তোমরা যাকে ভুল করে বল মানুষ, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি।" ভোগবাদী সমাজের উন্মত্ত হিংস্রতার একমাত্র লাগাম আত্মার আত্মীয়তা। আত্মার আত্মীয়তার অব্যর্থ শক্তি মোহলিপ্সা ও অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহায্য করিবে। ইহাকেই বিবেকানন্দ সর্ব কালের সর্ব দেশের ও সর্ব জাতির ধর্ম হিসাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ যে ধ্রুববাদ (positivism) বা উপযোগবাদ (utilitarianism) প্রচার করিয়াছিল, তাহা মানবসমাজের জীবধর্মিতাকে তৃপ্তিদান করিলেও ইউরোপীয় সমাজকে শান্ত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তাহার অন্ধ অনুসরণ করিয়া তাহার রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবনকে বর্তমানে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ যদি হিংসাশ্রয়ী আচরণকে পরিহার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অনুভূত অদ্বয়বোধ ও প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে মুমূর্ষু ভারত তথা পৃথিবী রক্ষা পাইবে। কারণ, পৃথিবীর অনাগতকালের যাত্রাপথে 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। গত শতাব্দীতে বিবেকানন্দ-বাণীর প্রাণময় চলমানতা প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ঃ "তাঁর (বিবেকানন্দের) বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে।" বিবেকানন্দের এই শক্তিসঞ্চার বৃথা হইতে পারে না। সেই শক্তিকে সম্বল করিয়া আমাদের প্রিয় আগামী প্রজন্মকে আমরা যেন বলিতে পারি ঃ "কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয়/ তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।" ❑

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী তুরীয়ানন্দের পাঁচটি পত্র

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ আলমবাজার
৩রা জুন ১৮৯৭

প্রিয় গঙ্গাধর[১],

গতকল্য তোমার একখানি হস্তলিপি পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তুমি যে মহৎ কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছ তাহার আর তুলনা নাই। আমি দুর্ব্বল, তোমাকে আর কি উৎসাহিত করিব। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি দুর্ব্বলের বল সকল মহৎ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিদাতা তোমার উদ্যম সফল করুন এবং তোমাকে অজর ও দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ ও আরও শত শত জনহিতকর শুভকার্য্যের উপযোগী করুন। তোমাকে দেখিবার জন্য বড় সাধ হইতেছে কিন্তু তুমি এখন উচ্চকার্য্যে ব্রতী, সুতরাং তোমাকে কোনরূপ অনুরোধ করিব না। পূর্ণমনোরথ হইয়া ব্রত উদ্যাপনান্তে [উদ্‌যাপনান্তে] মঠে আসিয়া আমাদের মন ও নয়নানন্দ বর্দ্ধন কর, এই মাত্র ইচ্ছা। রাজা তোমার পত্র পড়িয়াছেন এবং যথাযথ উত্তরও লিখিয়াছেন। স্বামিজি এবং তাঁহার সঙ্গীরা আলমোড়ায় অতি আনন্দে আছেন সংবাদ আসিয়াছে। শশির নিকট হইতে তুমি পত্রাদি পাইয়া থাক বোধ হয়। শশি ভাল আছেন ও মঠ হইতে একজনকে তাহার নিকট পাঠাইতে লিখিয়াছেন। বোধ হয় শুকুল মহাশয় [শুকুল মহারাজ—স্বামী আত্মানন্দ] শীঘ্রই মান্দ্রাজ যাইবেন। রামনাদের রাজা মান্দ্রাজের মঠ খরচের জন্য মাসিক একশত টাকা দিতেছেন। শরতের পত্র আসিয়াছে, সে ভাল আছে ও বেশ কার্য্য করিতেছে। হরিদাসীর [Miss Sara Elen Waldo]-ও পত্র আসিয়াছে, শরতের সুখ্যাতি ও যশে পূর্ণ আর তার শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা কি লিখিব। আমাদের লজ্জা হয়। শরৎ শীঘ্রই Green acre-এ আসিবে। শরৎ তোমাকে ভালবাসা দিয়াছে জানিবে। তুমি কি শরৎ ও কালীকে পত্র লিখিয়াছ? কালী বোধ হয় শীঘ্রই আমেরিকা যাইবে। মান্দ্রাজ হইতে এখনও কোন টাকা আইসে নাই। আসিলেই পাঠাইয়া দিব। রাজা তিনদিন পূর্ব্বে তোমাকে ৯৫ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং আজ ১০৲ পাঠাইতেছেন। প্রাপ্তিসংবাদ দিবে। এখানে অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে, ইচ্ছামত অধ্যয়নাদি হইতেছে না। স্বামিজির প্রচলিত নিয়মানুসারে মঠের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। কলিকাতার সভাও বেশ চলিতেছে। তুমি এসময় এখানে থাকিলে বড় ভাল হইত। দীননাথ কিছুদিন হইল ৺কাশীযাত্রা করিয়াছে, পঞ্জাব যাইবার ইচ্ছা আছে। Madras-এর Kidi স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিল, কাল telegram আসিয়াছে সে নিরাপদে মান্দ্রাজে পঁহুচিয়াছে। নিত্যানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দিবে এবং তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমারই
শ্রীহরি

॥২॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
২৪।৭।'০৫

প্রিয় গঙ্গাধর,

তোমার ১৩ই তারিখের দীর্ঘ পত্র পাঠে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইলাম। বোধ হয় স্বরূপানন্দ তোমায় এক পত্র লিখিবেন। আমার শরীরের ফোড়াগুলি একটু সারিয়াছে। তবে এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। আর২ সকলে ভাল আছে। সরলাদেবীর কৈলাশ যাত্রা এ বৎসর স্থগিত রহিল। তিনি এখনও এইখানেই আছেন। শীতকালে থাকিতে পারেন। তোমার শারীরিক কুশল লিখিয়া সুখী করিও। গৃহনির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব কি? যত শীঘ্র হয় ততই ভাল না? মঠ হইতে সংবাদাদি প্রায়ই পাইয়া থাক বোধ হয়। সকল ছেলেদের আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করিবে। ইতি—

তোমার
শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥৩॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
১০।৯।০৫

ভাই গঙ্গাধর,

আমার ৺বিজয়ার নমস্কার ও কোলাকোলি জানিবে এবং তোমার ছেলেদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদাদি জানাইবে। আশা করি এবার মার পূজায় তোমরা খুব আনন্দ করিয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে এবার মার নামে খুব ধূম মারিয়াছে দেখিতেছি। মা আমাদের মানুষ করুন—এই তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এখানকার সকল কুশল। তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিও। আমার আন্তরিক ভালবাসাদি জানিবে। সকলে তোমাকে ৺বিজয়ার প্রণাম প্রভৃতি দিতেছে। ইতি—

তোমার
শ্রীহরি

॥৪॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লক্ষ্য, বেনারস সিটি
৩রা ডিসেম্বর[২] '১৩

প্রিয় প্রজ্ঞানন্দ,

তোমার ১লা তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। মহারাজকে আজ উহা পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা বেতন লইয়া কার্য্য করে, কিন্তু আমাদের সাধুরা কেবল ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকিয়া যথাসাধ্য ভগবদ্ভজন ও তাহার প্রচার করেন। সুতরাং পূর্বোক্তের সহিত আমাদের সাধুর তুলনা অসমীচীন—ইহা তোমার সাহেবকে জানান উচিত ছিল। যাহা হউক তিনি তোমার পত্র শুনিয়া খুশী হইয়াছেন। এখানে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধূমধাম হইয়া গেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, আশ্রম হইয়া অবধি এত আনন্দ আর কখনও হয় নাই। যদিও উৎসব এখানে অনেকবার হইয়া গেছে। বাস্তবিকই সেদিনকার সকল কার্য্যই অতি পরিপাটিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। Xmasও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। আর নিউ ইয়ার্স ডের দিনও মার বাটিতে চব্যচোষ্যের আয়োজন হইয়াছিল। অনেক লোকসমাগম হয়। আশ্রমেও সেদিন সকালে মোগলাই চা ও লাড্ডু কচুরির ছড়াছড়ি হইয়াছিল। মার আজ বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনে যাইবার কথা ছিল। সকল আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু সম্মুখে অমাবস্যা বলিয়া স্থগিত হইল। ভবিষ্যতে সুবিধামত আবার চেষ্টা হইবে।

মাঘ মাসের প্রথমেই কোন শুভদিনে মার কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছে। তাঁহার শরীর ভাল আছে। তাঁহার বাটীর অন্যান্য সকলেও ভাল আছেন। আশ্রমের সংবাদও কুশল। Land acquisition-এর আর কোন কথা এখনও হয় নাই। বোধহয় কোন গোল হইবে না। নির্ব্বিঘ্নেই কার্য্য সমাধা হইবে। অমূল্য চিঠি পড়িয়া বলিল যে, যদি তুমি সুবিধামত রিপোর্ট যাহা অসম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিবে কি? তোমার শরীর ভাল আছে ও সিমলার আবহাওয়া অত সুন্দর জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে ঘটিবে কিনা সন্দেহ। শরীর আমার সেইরূপই আছে। বোধহয় কলিকাতা যাইতে হইবে। যেমন হয় পরে জানাইব। তারাপদবাবু অক্ষয়বাবু প্রভৃতি সকলকেই আমাদের ভালবাসাদি জানাইবে। তোমার ভায়াকেও আমার শুভেচ্ছাদি দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥৫॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী
২৬।৮।২০

শ্রীমান গুরুদাস[৩],

তোমার ২৩শে তারিখের একখানি পত্র বহুদিন বাদে পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ যাইতেছে। তিন-চার দিন হইতে সর্দ্দিজ্বরের মত হইয়াছে। আর সর্দ্দি পাকিয়াছে। বোধ হয় এইবার সারিবে। পায়ের বেদনা মধ্যে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়াছিল। এখনও খুব কষ্ট দিতেছে। ইচ্ছামত চলাফেরা আর করিতে পারি না। অতিশয় দুর্বল। অরুচি সমভাবেই চলিয়াছে। শরীর খুব কৃশ হইয়া গিয়াছে। আসরানি এখন ভাল আছে। কখন কখন আমার নিকট আসিয়া থাকে। আমি দু-একবার মাত্র তাহার বাসায় গিয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠি না। তাহাদের কলেজে যেসব কাজ খালি ছিল তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। সেখানে আর কাহারও প্রবেশ সম্ভব নহে। আমি তাহাকে তোমার পত্রের কথা বলিয়াছি। হরিপদর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছিলাম। উত্তর দিয়াছি। আর পত্র পাই নাই। পতিতপাবনেরও এক পত্র পাইয়াছিলাম। ফেল হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক আবার পড়িতেছে, ইহা সুসংবাদ বটে। হরিপদ তাহাকে অর্থসাহায্য করিবে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। তুমি নিয়মমত গীতা পড়িতেছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। "অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্"। ইহা হইতে ভবরোগ শান্তি হয় নিশ্চয়। তিলক প্রণীত গীতারহস্য আমি পড়িয়াছি বাংলায় নয় হিন্দিতে। মাধব সাপ্রে অনুবাদ করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই—ইহাই আমার ধারণা। যাহা হউক, খুব পরিশ্রম করিয়াছেন এবং সময়ের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। Progress অল্প অল্পই হইয়া থাকে এবং সেইরূপ হওয়াই ভাল। Environment নিজে create করিতে হয়। ক্রমে হয়। জ্ঞান না হইলে অনাসক্ত হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু অনাসক্ত হইবার অভ্যাস করা যাইতে পারে এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে যদি উহা আন্তরিক হয়, তাহা হইলে অনাসক্তি আপনি উদয় হইয়া থাকে। আর কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহারই প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতেছি ভালরূপে ধারণা করিলে ভগবানে ভালবাসা হয়, ইহাই ভক্তি।

মা সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন, সদাই তাহার সুখসুবিধার জন্য কত প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা কর্ম্ম বলিয়া তাঁহার একবারও মনে হয় না। ঐরূপ করিয়াই মার সুখ এবং সেইজন্য উহা কর্ম্ম নয়, ভালবাসা। ঈশ্বরে এই ভালবাসা হইলেই তাহাকে ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকি। ভগবানকে যদি ভালবাসা যায়, তাঁহাকে যদি আপনার হইতে আপনার বোধ হয়, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হয়। কারণ ভগবানই আমাদের প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ

২ তারিখটি ৩রা ডিসেম্বর ১৯১৩-র পরিবর্তে ৩রা জানুয়ারি ১৯১৩ হবে।

৩ স্বামী অতুলানন্দ

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রগুলি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজীর সৌজন্যে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালা' থেকে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজী রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি স্বামী সর্বগানন্দের সম্পাদনায় আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি।—**সম্পাদক**

অষ্টম অধ্যায় ঃ অক্ষরব্রহ্মযোগ

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥১৭॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥১৮॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥১৯॥

শব্দার্থ ঃ *মানবের হিসাবে সহস্রযুগব্যাপী ব্রহ্মার এক দিন, সহস্রযুগব্যাপী তাঁহার এক রাত্রি। তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ এই তত্ত্ব জানেন। ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত হইতে আকৃতিবিশিষ্ট সকল বস্তু অভিব্যক্ত হয় এবং রাত্রি সমাগমে অব্যক্তে লীন হয়। এইরূপে ভূতসমূহ রাত্রে লীন হইলেও ব্রহ্মার দিবাগমে স্বীয় কর্মের অধীন হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।*

ব্যাখ্যা ঃ বহু জন্ম সংসারভোগ করিতে করিতে যখন কিছুতেই শান্তি হয় না, তখন লক্ষের মধ্যে দু-একজনের বুদ্ধি একটু সূক্ষ্ম হয়। তাহারা জগতের তত্ত্ব প্রথম বুঝে। তাহার পরে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। মানুষ প্রত্যেকদিন যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন এই জগতের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু কোন লোকই এবিষয়ে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে না। শাস্ত্রকার সেইজন্য সৃষ্টির এই রহস্যটি সাধকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এই জগৎ-চক্রের ভিতর ঢুকিলে কর্ম না করিয়া থাকা অসম্ভব। এবং একটু কিছু করিলেই তাহা সংস্কাররূপে চিত্তে থাকিয়া যায় এবং পরে পুনরায় সেই কাজ করিবার জন্য বাধ্য করে। এইরূপে প্রত্যেক জীবকে অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টিচক্রের ভিতর ঘুরিতে হয়। অতিদীর্ঘকাল এইরূপে সৃষ্টির মধ্যে অশান্তচিত্ত লইয়া ঘুরিতে হইবে জানিলে কাহারও মনে যদি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিয়া মানবহিতৈষী ঋষিগণ জীবের নিকট এই সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ যদি পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এই সৃষ্টিচক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। সৃষ্টির এই ভীষণতা বুঝিয়া সৃষ্টির উপর বিরক্ত হইয়া যদি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টির পরপারে যাওয়া সম্ভব—এই কথাটি বলাই মোক্ষশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যষ্টির মিলিত রূপের নাম সমষ্টি। অসংখ্য কোষ (Cell) সম্মিলিত হইয়া জীবের একটি দেহ যেমন তৈয়ার হয়, অসংখ্য জীবের জীবন সম্মিলিত হইয়াই এই সৃষ্টি নির্মিত হইয়াছে। ইহাকে ভক্তেরা ভগবানের সৃষ্টিলীলা বলেন। এইস্থলে ইহাকে ব্রহ্মার জীবনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবের জীবনে যেমন দিনরাত্রি আছে, মৃত্যু আছে এবং পুনর্জন্ম আছে, তেমনি ব্রহ্মারও দিনরাত্রি, অবসান ও পুনরভ্যুদয় আছে। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা সৃষ্টিতত্ত্ব।

[মন্তব্য ঃ 'যুগ' শব্দের দ্বারা এখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগকে বুঝানো হইতেছে।]

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥২০॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥২১॥

শব্দার্থ ঃ ভূতগ্রামের বীজস্বরূপ অবিদ্যাই এখানে 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত। এই 'অব্যক্ত' হইতে বিলক্ষণ (পৃথক) ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর 'অক্ষর' নামক পরব্রহ্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল ভূত বিনষ্ট হইলেও নিজে বিনষ্ট হন না। তিনিই জীবের শেষ গতি। এবং উহাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ।

ব্যাখ্যা ঃ জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা যেসকল অদৃশ্যবস্তু দৃশ্য হয়, সবই পরিবর্তন ও বিনাশশীল। দ্বিতীয় স্তর, জগতের কারণ; যেমন বীজের ভিতর বৃক্ষ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—এই জগৎকারণের ভিতরে এই অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে, আবার যথাসময়ে সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়। আবার এই জগৎকারণেরও একটি কারণ আছে। জগৎকারণ বীজস্বরূপ মায়া যেসময়ে তিরোহিত হইয়া যায়, সেসময়ে অক্ষর ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়।

যতক্ষণ আমরা জগৎ ও তাহার কারণ মায়াকে অতিক্রম করিতে না পারি, ততক্ষণ বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই কার্য-কারণের স্তর পার হইয়া যাইতে হইবে।

মানুষের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের কার্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ তাহাকে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবার জন্য বারবার দেহধারণ করিতেই হইবে। আমি সংসারভোগ করিতে চাই বলিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে মাধ্যম করিয়া নানা কর্ম করি। স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের অনিত্যতা জানিয়া কর্ম সম্বন্ধে উদাসীন (কর্ম ত্যাগ করিয়া নহে) হইতে পারিলে মানুষের কারণ-শরীরের জ্ঞান হয়; তখন ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিলে সংসারের দিকে মনের প্রবণতা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন কার্য-কারণ হইতে মন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয় এবং মহাকারণের অনুভূতি লাভ হয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥২২॥

শব্দার্থ ঃ হে পার্থ, সকল জীবজগৎ পরমেশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত। ঘটাদি যেমন আকাশ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। অনন্যা ভক্তির দ্বারা সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ এই সংসারের মানুষের অভিজ্ঞতা যখন পূর্ণ হয়, তখন মানুষ জানিতে পারে—এজগতের কোন বস্তুই শান্তিদায়ক নহে এবং জগতের পিছনে পূর্ণশান্তিস্বরূপ পরব্রহ্ম রহিয়াছেন। সেই পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে যখন জগৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে না, কেবল সেই অবস্থালাভের ইচ্ছাই মনে অবিরাম উঠিতে থাকে, তাহাই অনন্যা ভক্তি। সেই ভক্তিদ্বারা পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়।

[**মন্তব্য ঃ** কোন নবীন সাধকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভব হইলে তো আমার নবনটবর শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইব না; তাই ভগবান বলিতেছেন, আমাকে পাইলে জগতের সব বস্তুকেই একসঙ্গে পাইবে। ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের নিরাকার ব্রহ্মের অনুভব হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর তিনি তাঁহার ইষ্টকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া বারবার যখন বিফল হইলেন, তখন তাঁহার খুব দুঃখ হইয়াছিল। ইহা অবশ্য পূর্বসংস্কারবশত বিদ্যামায়ার ক্ষণিক অভ্যাসমাত্র।]

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥২৩॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥২৪॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥২৬॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥২৭॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥২৮॥

শব্দার্থ ঃ হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে-কালে মৃত্যু হইলে উপাসকগণ ও কর্মিগণ যথাক্রমে মোক্ষ ও পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কালের কথা তোমাকে বলিব।

দেবযান মার্গে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস অতিক্রমপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু, সদ্যোমুক্তিভাক্ যোগিগণ জীবৎকালেই ব্রহ্মময় হন। তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হইয়া কোন লোকে যায় না।

পিতৃযানমার্গে কর্মী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক স্ব স্ব কর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগান্তে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দেবযান ও পিতৃযান—জগতের এই মার্গদ্বয় সনাতন (নিত্য) বলিয়া কথিত হয়। দেবযানে গতি হইলে মুক্তিলাভ হয় এবং পিতৃযানে গমন করিলে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়।

হে পার্থ, উত্তরমার্গে ক্রমমুক্তি ও দক্ষিণমার্গে সংসারে প্রত্যাবর্তন হয়—এই জ্ঞান থাকিলে কোন ধ্যানযোগী (উপাসক) মোহগ্রস্ত হন না। অর্থাৎ তিনি দক্ষিণমার্গপ্রাপক উপাসনাবর্জিত কর্ম কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। অতএব, হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হও।

বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দানকর্মের যে পুণ্যফল কীর্তিত হইয়াছে, এই অধ্যায়োক্ত সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত তত্ত্ব অবধারণ ও আচরণপূর্বক ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া পরমকারণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

[শেষ ছয়টি শ্লোকের ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দজী করেননি, ফলে ঐ শ্লোকগুলির অনুবাদমাত্র এখানে সংযোজিত হলো। তবে পরবর্তী সংখ্যা থেকে পূজনীয় মহারাজের অনালোচিত শ্লোকগুলি পরিহার করা হবে।—সম্পাদক]

॥ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

[ক্রমশ] ॥ পঁয়ত্রিশ ॥

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

পরেশনাথ মন্দির

অরিন্দম দাস

॥৩৬॥

১২৭৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া। ইংরেজি মতে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ৩১তম জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়ি অঞ্চলে রায়বাহাদুর বদ্রীদাস মুকিম স্থাপন করেছিলেন শিল্প, স্থাপত্য ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গঠিত এক অপূর্ব সুন্দর মন্দির। গর্ভমন্দিরে জৈনদেব দশম গুরু শীতলনাথের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর গুরু জীন কল্যাণ সুরী।

লখনৌ শহরের সীধর শ্রীমাল বংশের এক সাধারণ পরিবারে বদ্রীদাসের জন্ম হয় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। তখন তাঁর বয়স কুড়ি-বাইশ। একটি বহু মূল্যবান রত্ন বিক্রয় করে জহুরির কাজ করার পর তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। লাভের শতকরা দশ ভাগ অর্থ তিনি সৎকাজে ব্যয় করতে থাকেন। সেইসময় তিনি থাকতেন হ্যারিসন রোডে (মহাত্মা গান্ধী রোডে), প্রায়ই আসতেন এই অঞ্চলে। তখন এটি ছিল একটি জলা জায়গা, অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল পুকুর। একদিন তিনি দেখলেন, পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে। অহিংস ধর্মের পূজারী জৈনধর্মের মানুষ তিনি। স্বাভাবিকভাবে এদৃশ্য তাঁর প্রাণে আঘাত দিল। অসহায় জীবহত্যা বন্ধ করতে তিনি পুকুর-সহ প্রায় পাঁচ বিঘা জমি কিনে ফেললেন। ভাবলেন, এখানে একটি প্রমোদ উদ্যান নির্মাণ করবেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম।

বাঁদিকে পরেশনাথ মন্দির, সামনে সেই পুকুর ● আলোকচিত্র ঃ দাসানুদাস সাহা

বদ্রীদাসের ভক্তিমতী জননী খুসালকুমারী তাঁকে বললেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। বদ্রীদাস তাই করলেন। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে লাগল এক অনুপম মন্দির। কাঁচ ও পাথরের অনবদ্য কারুকার্যে ঝলমল করে উঠল দেবদেউল।

মন্দির নির্মাণের পর বদ্রীদাস তাঁর গুরু জীন কল্যাণ সুরীকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে? জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্কর। তাঁদের সকলকেই জৈনরা সমান শ্রদ্ধা করেন। তীর্থঙ্করদের নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নেই, আছে আচার নিয়ে। এই কারণে জৈনরা দুটি শাখায় বিভক্ত—শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর। বদ্রীদাস ছিলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিগম্বর জৈনদের একটি বিখ্যাত মন্দির রয়েছে এরই অদূরে বেলগাছিয়া অঞ্চলে, যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় এর তিরিশ বছর পর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

অবশেষে গুরু দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথের মূর্তি স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। কারণ, শীতলনাথ ছিলেন জলচর প্রাণীদের প্রভু বা রক্ষাকর্তা। বদ্রীদাসের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য তো তা-ই! যাই হোক, তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে শীতলনাথের মূর্তির সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তিনি মনের মতো মূর্তি খুঁজে পেলেন না। শেষকালে আগ্রায় গিয়ে এক সাধুর কাছে শীতলনাথের মূর্তির সন্ধান পেলেন। সেই সাধু তাঁকে রৌশন মহল্লার এক জৈনমন্দিরের কাছে গিয়ে বললেন ঃ 'তুমি এই মন্দিরের ভূমিগৃহে তোমার মনের মতো শীতলনাথ মূর্তি পাবে।" হলোও তাই। বদ্রীদাস লোকজন এনে কিছুটা মাটি খুঁড়তেই দেখতে পেলেন পাথরের একটি সিঁড়ি। নিচে নেমে গিয়ে দেখলেন, ছোট্ট একটি ঘরে অবস্থান করছেন শীতলনাথের একটি নয়নাভিরাম মূর্তি। তাঁকে দেখে বদ্রীদাসের বহুদিনের বিরহ-তপ্ত হৃদয় মুহূর্তেই শীতল হয়ে গেল। দেখলেন, মূর্তির সামনে জ্বলছে একটি ঘিয়ের প্রদীপ, কেউ যেন সদ্য পূজা করে গেছে! আর দেরি করলেন না তিনি। প্রাণের দেবতাকে সঙ্গে করে উঠে এলেন ওপরে, আনতে ভুললেন না সেই 'অক্ষয়জ্যোতি' প্রদীপটিকে—যেটি আজও মন্দিরে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেদীপ্যমান। কিন্তু ওপরে উঠেই চমকে গেলেন বদ্রীদাস। কোথায় গেলেন সেই সাধু? চতুর্দিক খুঁজেও পাওয়া গেল না তাঁকে। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় জীন কল্যাণ সুরী বদ্রীদাস-নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা

করলেন শীতলনাথের মর্মরমূর্তি। সুতরাং মন্দিরটি পরেশনাথ অর্থাৎ পার্শ্বনাথের নয়—শীতলনাথের। কিন্তু হিন্দু বাঙালির মধ্যে পার্শ্বনাথের পরিচিতি অধিক বলে শীতলনাথ তাদের কাছে হয়ে গেছেন 'পরেশনাথ'! প্রতিবছর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমায় এই মন্দির থেকে যে বিশাল শোভাযাত্রাটি বের হয়, যাকে বলা হয়—'পরেশনাথের মিছিল', সেখানেও পার্শ্বনাথের মূর্তি থাকে না, থাকে পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্মনাথের মূর্তি। জৈনরা একে বলেন 'রথযাত্রা'। জৈন সাধুদের সবসময় ভ্রমণ করতে হয়, শুধু বর্ষার চার মাস তাঁরা কোথাও যান না। কার্তিক পূর্ণিমায় তাঁদের আবার পথচলা শুরু হয়।[১]

জৈনরা বেদ বা ঈশ্বর মানেন না। তাঁরা কর্মফলে আস্থাবান, তাঁদের মতে কর্মের ফলদাতা কর্মই। সাধনার ফলে কর্মক্ষয় হলে দুঃখময় সংসার থেকে মোক্ষলাভ হয়। সকলেই মোক্ষলাভ করতে পারে। তবে যাঁরা নিজেদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের মুক্তিলাভের পথপ্রদর্শক হতে পেরেছেন—তাঁরাই হন সর্বজনপূজ্য তীর্থঙ্কর।
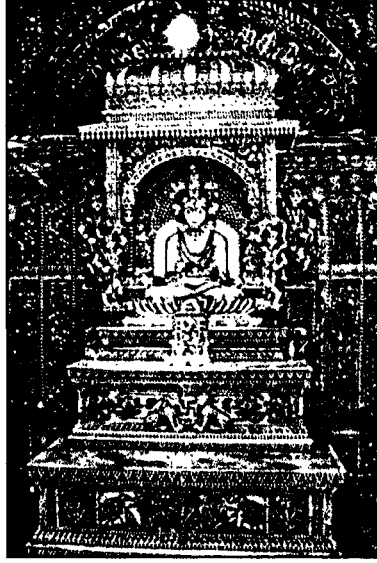
গর্ভগৃহে শীতলনাথের মূর্তি

আলোকচিত্র : দাসানুদাস সাহা

দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথের অনিন্দ্যসুন্দর এই মন্দিরটি শহর কলকাতার এক পরমাশ্চর্য ভাস্কর্য-নিদর্শন এবং তীর্থক্ষেত্র। ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের তেরোটি সোপান অতিক্রম করে মন্দিরের বারান্দায় পৌঁছালে বাস্তবিক চোখ ধাঁধিয়ে যায় চিনেমাটির ওপর বেলজিয়াম কাঁচ বসানো জমকালো কারুকাজে। মন্দিরের অভ্যন্তর ও তার আশপাশ ছোট ছোট কাঁচের ফুল, পাতা, ময়ূর ইত্যাদির অজস্র আলপনায় অলঙ্কৃত। নাটমন্দিরে ১০৮ প্রদীপের বিশাল ঝাড়লণ্ঠন, চন্দনকাঠের দরজা, মার্বেলপাথরের নানান কারুকার্য, ছোট ছোট আয়নার অপূর্ব বিন্যাস, দৃষ্টিনন্দন সব পেন্টিং, সর্বোপরি 'অক্ষয়জ্যোতি' দর্শক-মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিশেষত অবাক লাগে অক্ষয়জ্যোতির ওপর যে-ঢাকনিটি রয়েছে সেই প্রথম থেকে, আজ পর্যন্ত তার ওপর কোন ভুসো পড়েনি! শ্রীমন্দিরের দিকে মুখ করে উদ্যানের মধ্যে রয়েছে করজোড়ের ভঙ্গিতে বদ্রীদাসের মার্বেলপাথরের মূর্তি। চারদিকে মার্বেলপাথরের বিভিন্ন কারুকার্য, মূর্তি, ফুল, গাছ—সব মিলিয়ে এক চমৎকার পরিবেশ! আর সু-উচ্চ প্রবেশদ্বারের সামনেই রয়েছে সেই বিখ্যাত পুকুরটি—যেখানকার মাছদের রক্ষা করতেই এখানে শীতলনাথের স্থায়ী অবস্থান। পুকুরটি দেখলে মনে হয়, বদ্রীদাসের মহৎ উদ্দেশ্য ও সাধনা সার্থক।

তিনি তাঁর ধর্মজীবনে সেই সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন—এমন কোন তথ্য যদিও লিপিবদ্ধ আকারে কোথাও পাওয়া যায় না, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, তাঁর সাধনা সার্থক হয়ে উঠেছিল। সময়টা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। তখন তাঁর বয়স ৭৭ বছর (তাঁর দেহরক্ষা হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে)। দিনটি ছিল ১২ ভাদ্র, শনিবার। বিকালবেলায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ঘোড়ার গাড়ি এসে থেমেছিল মন্দিরের সামনে। আত্মীয়া, সেবিকা ও কয়েকজন মন্ত্রদীক্ষিত সন্তান-সহ মন্দিরভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। মন্দির দর্শন ও প্রণামের পর তিনি বাগানটি ঘুরে দেখে আনন্দলাভ করেছিলেন। তবে তাঁকে বিশেষ আনন্দদান করেছিল পুকুরের লাল মাছগুলি। পুলকিত চিত্তে তিনি বলেছিলেন : "দেখ, মাছগুলি কেমন আনন্দে খেলছে!"[২] আমাদের দৃঢ় ধারণা, জগজ্জননীকে এই নির্মল আনন্দদানের মধ্য দিয়ে জীবদ্দশাতেই সার্থক হয়ে উঠেছিল বদ্রীদাসের সাধনা। ❑

পথনির্দেশ : ৩৬, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, গৌরীবাড়ি, কলকাতা-৭০০ ০০৪। উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড থেকে পূর্বদিকে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ধরে কিছুটা গেলে একটি চৌমাথা পড়বে। সেখান থেকে উত্তরদিকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে এগোলে ডানদিকে পড়বে এই সুদৃশ্য মন্দিরটি। খান্না স্টপেজে নেমেও এখানে আসা যায়। সেক্ষেত্রে চৌমাথা থেকে পূর্বদিকে অরবিন্দ সেতু পর্যন্ত এসে তারপর ডানদিকে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁদিকের গলিতে প্রবেশ করতে হবে। শ্রীশ্রীমা সম্ভবত এই পথেই এসেছিলেন। মন্দির খোলা থাকে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

তথ্যসূত্র

১ মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মন্দিরের প্রবীণ পরিচালক এবং বদ্রীদাসের প্রপৌত্র সুরেন্দ্র মুকিমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
২ মাতৃদর্শন—স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত, ১ম সং, পৃঃ ৩৫

উদীয়মান প্রাবন্ধিক অরিন্দম দাসের এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্মৃতি-সুধা

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ সকাশে

কালীসদয় পশ্চিমা*

ইংরেজি ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে আমি পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাগবাজারের ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট (বলরাম মন্দির) হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি তিনি আমাকে লিখেন—

"কল্যাণবরেষু,

শ্রীযুক্ত কালীসদয়, তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। তুমি এখানে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছ জানিলাম; কিন্তু উপস্থিত আমি এখানে নানান কাজে ব্যস্ত আছি এবং একটি ভক্তের বাটীতে আছি। কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই। সেজন্য আমার নিকটে বা মঠে থাকিবার কোনপ্রকার সুবিধা নাই। মঠে আজকাল নিজেদের লোকদের স্থানাভাব হওয়াতে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় তোমার এখানে আসা বা না আসা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। শরীর আমার ভাল আছে। শুভাশীর্বাদ জানিও।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী ব্রহ্মানন্দ"

পত্রে যখন স্পষ্ট নিষেধ নাই, তখন আর যাইতে বাধা কী? ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর যাইয়া পরে কুঠিঘাটে খেয়াপার হইয়া যখন মঠে পৌঁছাইলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। স্বামী সৌম্যানন্দজী তখন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইতেই তিনি ঐবেলায় প্রসাদের ব্যবস্থার জন্য আমাকে বসন্ত মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বসন্ত মহারাজ আমাকে পৌঁছাইয়া দিলেন মঠের অতিথি ভবনে (Guest House) মহাপুরুষজীর (স্বামী শিবানন্দের) নিকটে। উহাই আমার প্রথম মহাপুরুষ-সম্ভাষণ। মহাপুরুষজী কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র লিখিতেছিলেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটুখানি উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন ঃ "কী চাই?"

আমি বলিলাম ঃ "আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) পত্র পাইয়া আসিয়াছি।" তিনি উত্তর করিলেন ঃ "মহারাজ পত্র দিয়েছেন তাঁর কাছে যাও। এখানে কী?" আমি ভাবিলাম—তাই তো, আমার তো বলরাম মন্দিরেই প্রথমে সন্ধান করা উচিত ছিল। কী করি, আস্তে আস্তে বলিলাম ঃ "এখন যে দুপুরবেলা।"—"ও, প্রসাদ পেতে চাও—বেশ তো, ভাণ্ডারির কাছে যাও।" বসন্ত মহারাজ একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার নির্দেশানুযায়ী আমি মঠে সকলের সহিত শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও প্রসাদ পাইলাম।

পরদিন সকালবেলা আমাকে বলরাম মন্দিরে পাঠাইবার জন্য স্বামী সৌম্যানন্দজী গঙ্গায় একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে ভিড়াইলেন। কিন্তু আমি কলিকাতায় নবাগত; পথঘাট কিছুই জানা নাই, একাকী কেমন করিয়া গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া বাহির করিব—মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজজী জনৈক সেবকের (নগেন মহারাজের) সহিত ঘাটে আসিয়া সেই নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই মঠে বাস করিয়াছি, উহাতে অপরাধ হইয়াছে এবং তিনিই বা কী মনে করিতেছেন ভাবিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে যাইতেই যেন ভয় হইতে লাগিল। নিরুপায়ভাবে যন্ত্রচালিতবৎ নৌকায় উঠিলাম এবং আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে অপরিচিতের ন্যায় মঠের দিকে মুখ করিয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে লুকাইতে চেষ্টা করিলে কী হইবে, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন ঃ "তোমার বাড়ি না সিলেটে? তুমি রাত্রে মঠে ছিলে?"

"হাঁ মহারাজ।"

"মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা হতে পারে না। তার শরীর অসুস্থ, জ্বর! তোমার সঙ্গে মহারাজের দেখা হতে পারে না, বুঝেছ?"

আমি নীরব রহিলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কী আর করিব, আমার দীক্ষাদির আকাঙ্ক্ষা করিয়া কী আর হইবে! এই তো সামনে মঠ দেখিতেছি আর গঙ্গার ওপর একই নৌকায় শ্রীমৎ মহাপুরুষজীর সহিত বসিয়া আছি, এই তো আমার সকলই হইয়া গিয়াছে, ইহার বেশি আর আমার কিছু হইবার নহে; জয় ঠাকুর।

** স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালীসদয় পশ্চিমা ১৯১৭ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে সন্ন্যাসগ্রহণ না করে সংসারেই থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে তিনি কর্মরত ছিলেন। স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ তাঁর তবলাবাদন পছন্দ করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রসঙ্গে তাঁর একটি স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ। রামকৃষ্ণ মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সৌজন্যে রচনাটি প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক*

মহাপুরুষজী গম্ভীরভাবে নৌকায় বসিয়া রহিলেন আর উপর্যুক্ত কথাগুলি কমপক্ষে ৫/৬ বার আমাকে বলিলেন ঃ "বুঝেছ, মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে না" ইত্যাদি।

যথাসময়ে নৌকা কুমারটুলি ঘাটে পৌঁছাইল। মহাপুরুষজীর সেবক তাঁহার ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন আর আমি মহাপুরুষজীর পিছন পিছন হাঁটিতে লাগিলাম। তিনি হন্‌হন্‌ করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। একবার অল্পক্ষণের জন্য জনৈক ভক্তের বাড়িতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে পথিমধ্যে এক কালীবাড়িতে বিগ্রহ দর্শন, প্রণামাদি করিয়া বলরাম বসুর বাড়িতে পৌঁছাইলেন। এমন পথপ্রদর্শক পাইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম—বিধি সুপ্রসন্ন। মহাপুরুষজী ঐ বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া আমার হাত হইতে ব্যাগটি গ্রহণপূর্বক পূজনীয় মহারাজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে কিছুই না বলিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। মনঃক্ষুণ্ণভাবে আমার জুতা, ছাতা ও বিছানাপত্র এক জায়গায় রাখিয়া নিকটের বড় হলঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। তথায় কতিপয় ব্যক্তি কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টই মনে হইল। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নিশ্চয়ই উহারা মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং অনতিকাল মধ্যে মহারাজ তথায় দর্শন দিবেন। ভাবিলাম, সুবর্ণ সুযোগ। দরজার কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইতে না লইতেই দেখি বারান্দা দিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মহারাজ নেত্রযুগল কখনো অর্ধনিমীলিত, কখনো বা প্রসারিত করিয়া যেন পাখির ডিমে তা দেওয়ার মতো ভাবাবেশে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি 'হল'-এ প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে এই আমার প্রথম দর্শন। তিনি আমার কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন ঃ "যাও বাবা, মহাপুরুষের কাছে যাও, আমার শরীর অসুস্থ।" আমি তো ঐকথা শুনিয়া অবাক। ভাবিলাম, তবে কী আমার সম্পর্কে দুজনের মধ্যে কোন পরামর্শ ইতোমধ্যেই হইয়াছে! এ কোন্‌ দৈবী রাজ্যে আমি উপস্থিত হইলাম! চেষ্টা করিয়া মহারাজের কামরার সম্মুখে পৌঁছাইয়াই দেখিলাম—মহাপুরুষজী দরজার মুখে আমারই অপেক্ষায় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে অতি সহজে তাঁহাকে পাইয়া মনের আনন্দে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ "এই যে, তোমায় আবার দেখছি এখানে!"

"মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার কী চাই?"

"দীক্ষা চাই।"

"দীক্ষা চাই! সে আবার কী? তোমার নাম জানি না, ধাম জানি না, আমি কিছুই জানি না, দীক্ষা কী করে হয়? এ কি বাজারের মাছ-পান বিক্রি যে, পয়সা ফেলে দিলে আর নিয়ে গেলে!"

আমি তখন তাঁহাকে আমার নাম-ধাম ইত্যাদি এবং মিউনিসিপাল অফিসে আমার চাকুরি ও করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট, অধুনা কাছাড় জেলা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির কার্যাদি পরিচালনার যথাসম্ভব বিবৃতি দিলাম। ঐসমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন ঃ "এই যা ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করছ—তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ঐ আমাদের দীক্ষা। অন্য দীক্ষা-ফিক্ষা আমাদের নাই। ঐ ক্রীং ফ্রীং—ঐ সব ভটচার্জিদের কাছে যাও। আমাদের কাছে নয়।"

আমি দীক্ষাদি সম্বন্ধে পূর্বে কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম, আমার ঐ বুদ্ধিতে আঘাত করা হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিলেন ঃ "তুমি দীক্ষা (নিতে) চাও? আমি তোমায়... ঐ মন্ত্র দিব, তুমি নিবে?" আমি হাতজোড় করিয়া বলিলাম ঃ "হাঁ মহারাজ, তাই নিব।" তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ "শুধু ঐটি দিব, আর কিছু দিব না। তুমি নিবে?" পূর্ববৎ উত্তর করিলাম ঃ "হাঁ মহারাজ তাই নিব।" তখন বলিলেন ঃ "তবে দীক্ষা কী আমায় বল।" আমি মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) আমার এই সঙ্কটে এক পাশে আসিয়া মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মহারাজ, ও কী চায়?" তিনি উত্তর করিলেন ঃ "দীক্ষা চায়।" কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন ঃ "দিন না মহারাজ।" তিনি উত্তর করিলেন ঃ "হাঁ, তাই তো করতে বসে আছি আর কী!"

কৃষ্ণলাল মহারাজ চলিয়া গেলেন, আমি মহাপুরুষজীর পাদমূলে মেজের উপর চিন্তাকুলিত চিত্তে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে ঐঘরে প্রবেশপূর্বক শয্যোপরি স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ঃ "মহারাজ, ও (আমাকে দেখাইয়া) তো দীক্ষা চায়।" মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে এবং বেশ জোরে জোরে কহিলেন ঃ "এই তো নাম করতে এসেছে, 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্টের নিকট দীক্ষা নিয়েছি'—এই তো নাম করতে এসেছে।" এই কথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তাহারপর আমার দিকে চাহিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে বলিতে লাগিলেন ঃ "বাবা! তোমাদের পূর্ববঙ্গের লোক সব আমার জানা রয়েছে, দীক্ষার সময় ভারী আগ্রহ প্রকাশ করে; শেষে কেউ কিছু

করতে চায় না। তাদের দল বাড়াতে এসেছ? তাদের দল বাড়াতে এসেছ?" প্রতিবাদের সুরে আমি উত্তর করিলাম ঃ "না মহারাজ, ওরূপ দল কেন বাড়াব; তার বিপরীত দল বাড়াব।" তখন আবার একটু শান্তরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন ঃ "উপযুক্ত হলে আমরা ডেকে এনে দীক্ষা দেই।" আমি তখন বলিলাম ঃ "আমি কি এমন উপযুক্ত হব মহারাজ যে, আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দিবেন!" তখন তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ "বলছি হবে, বলছি হবে।"

এই সময় মহাপুরুষজী আমার দিকে আর মহারাজের দিকে বারংবার তাকাইয়া শেষে মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া ও আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "মহারাজ, ওকে আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন।" উহাতে মহারাজ খুব শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় আশ্বাসভরে বলিতে লাগিলেন ঃ "হাঁ হাঁ, আশীর্বাদ তো করাই রয়েছে।" তখন মহাপুরুষজী আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ "এই তো তোমার দীক্ষা হয়ে গেল! আর formal আর formal—তা—তা হয়ে যাবে।" তখন মহারাজ অর্ধবাহ্যাবস্থায় আমাকে করুণাপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ "বাবা, সমস্ত বিশ্বজগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে এনে 'কূটস্থ'র ওপর নিয়ে রাখা, সে কি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথা!" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন। আর আমি নিবিষ্টভাবে সেইসব চিন্তা করিয়া শাঙ্করভাষ্য সমেত 'কূটস্থমচলং ধ্রুবম্' গীতার (১২।৩) এই শ্লোকটির অর্থ চিন্তা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমরা কি দীক্ষার সময় এত উচ্চ অনুভূতির ধারণা লইয়া আসি! ঐভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কিছুক্ষণ পরে দেখি, আমি ঐ ঘরে একাকী বসিয়া আছি! মহাপুরুষজী কিংবা মহারাজ কেহই তথায় নাই। অনন্যোপায় হইয়া তখন বারান্দায় একা পায়চারি আরম্ভ করিলাম। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে শুনি, পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুরুষজী আমাকে বলিতেছেন ঃ "ওহে! শুনে যাও, মহারাজকে গিয়ে বল, তিনি যদি অনুমতি করেন তো আমি তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দিব।" মহারাজ আমার সম্মুখেই তখন অন্য বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইয়া ঐকথা বলিতে তিনি উত্তর করিলেন ঃ "হাঁ হাঁ, অনুমতি তো করাই রয়েছে।" এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐদিন মহাপুরুষজী পূজনীয় অভেদানন্দজী-সহ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা হইতে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় যাইতেছিলেন। মহারাজের উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে সুবিধামত ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। উহাতে মহাপুরুষজী রহস্যচ্ছলে আমাকে বলিয়া উঠিলেন ঃ "কী, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে!!"

এই সময় মহারাজ আবার আমায় ডাকিয়া কহিলেন ঃ "ওহে মহাপুরুষ তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে-ইচ্ছা আমার নয়, বুঝেছ?" এই কথা আমি যখন মহাপুরুষজীকে জানাইলাম, হাত নাড়িয়া আমাকে তিনি তখন বলিতে লাগিলেন ঃ "তবে আমি কী করতে পারি বল, তবে আমি কী করতে পারি বল!" সুতরাং আমার আর মহাপুরুষজীর সঙ্গে ঢাকা যাওয়া হইল না। মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়া-দাওয়া করিবার জন্য তাগাদা দেওয়ায় মহাপুরুষজীর আদেশে আমি মঠে ফিরিয়া গেলাম এবং তারপর মঠের পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সঙ্গে বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে (যেখানে স্বামী ভূতেশানন্দজী তখন ছাত্ররূপে বাস করিতেছিলেন) থাকিয়া ৮/১০ দিন পূজনীয় রাখাল মহারাজের পূতসঙ্গ-সুখ নানাভাবে প্রায় সমস্ত দিনই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

একদা বলরাম মন্দিরে পূজনীয় মহারাজের সম্মুখে অন্যান্য ভক্তদের সহিত আমি বসিয়া আছি, ঐসময়ে লক্ষ্য করিলাম পাশের ঘরে স্বামী বরদানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীকে (পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে) সকলের অলক্ষ্যে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিতেছেন ঃ "ইনি হচ্ছেন কালীসদয় পশ্চিমা।" নিশ্চয়ই আমার ক্ষুদ্র আকৃতি ও 'পশ্চিমা' উপাধি তাঁহাদিগের মনে কৌতূহল ও কৌতুক সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

উক্ত সময় মধ্যে মহারাজকে কোনদিন প্রেমাবেশে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে উঠাইয়া শিল্পীর সুকৌশল নৃত্যভঙ্গিতে নাড়িয়া "বলি, কেমন আছ" বলিতে, আবার পরক্ষণেই আমার দীক্ষার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া "আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখং" উপদেশ করিতে, কোনদিন বা সহজ সরল উক্তি "আজ কী খেয়েছ" এবং উত্তর শুনিয়া "তবে তো বেশ খেয়েছ" বলিতে, আবার কোনদিন "আমার সঙ্গে তো দেখা হয়ে গেছে, এখন ওকে (আমাকে) চলে যেতে বল" বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া তিনবার সংবাদ পাঠাইয়া আমার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ-সুখ ভঙ্গ করিতে এবং আমার উত্তর শুনিয়া পরে নীরবতা অবলম্বন করিতে, আবার কোনদিন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমার নিজ পরিচয় দিলে "তাতে কী হয়েছে! এত তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ!" প্রভৃতি সরস মন-মাতানো কথাগুলি বলিতে এবং সর্বশেষে বিদায়ের পূর্বরাত্রে "মহাপুরুষ ফিরে না এলে তো কিছু হবার নয় বাবা" ইত্যাদি

কত প্রাণ-মাতানো দৃশ্য দেখিয়াছি, কত মধুময় বাক্য শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেগুলি স্মরণ করিয়া এখন "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।"

এইভাবে তাঁহার অলৌকিক ব্যবহার, রঙ্গের ভাবতরঙ্গ আমার অপটু মনের উপর খেলা করিয়া আমার সময়োপযোগী আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছিল। তরঙ্গায়িত মন লইয়া করিমগঞ্জে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাঁহাকে পৌঁছানোর সংবাদ দিলে নিম্নোদ্ধৃত উত্তর পাই—

Ramkrishna Math
Belur P.O
07.03.22

"কল্যাণবরেষু

শ্রীমান কালীসদয়, তোমার পত্র... কাল পাইয়াছি। তুমি তথায় নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর উপস্থিত ভাল আছে। আমার ভালবাসা আশীর্বাদ জানিও।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ"

উক্ত পত্র পাইবার প্রায় একমাসের মধ্যেই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মানবলীলা সংবরণ করেন এবং তাহারপর হইতেই স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার শুরু হয়। তিনি ইংরাজি ১২।৫।২২ তারিখের পত্রে লিখিলেন যে, যথার্থই মহারাজ আমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহারাজের অন্তর্ধানে তাঁহার দীক্ষাদি সম্বন্ধে আপাতত বড় উদ্যম বা উৎসাহ নাই। এবং আমি যেন নিরুৎসাহিত না হইয়া মহারাজের উপদেশমতো চলি।

২৬।৬।২২ তারিখের পত্রে তিনি আমায় লিখিলেন ঃ "...আমার দীক্ষাদান আর কিছুই নহে, কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতি, পতিতপাবন, কলিকলুষনাশক, যুগধর্ম-সংস্থাপক, যুগাচার্য, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন পূর্বোক্তরূপে ঐ নাম ভক্তি-প্রীতির সহিত জপ করিবে।"

১৩।৭।২২ তারিখের এক পত্রে তিনি আমায় জানাইলেন, ৩ আগস্ট একটি দীক্ষার দিন আছে। তবে ঐদিন আসার সুবিধা হইবে কিনা এবং তিনি মঠে থাকিবেন কিনা নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যাহাই হউক, চিঠিপত্র ও তারযোগে ব্যবস্থা করিয়া আমি নির্দিষ্ট দিনে মঠে উপস্থিত হইয়া প্রথমে গঙ্গাস্নানকরত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে যাইয়া ধ্যান-জপে নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলাম, যাহাতে এইবার যেন প্রত্যাখ্যাত না হই। কিছুক্ষণ পরে অঙ্গুলির তুড়িধ্বনি দ্বারা আমার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক স্বামী অপূর্বানন্দজী (শঙ্কর মহারাজ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মহাশয়, আপনার নাম কি কালীসদয়বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান? তবে আসুন।"

ঐকথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আসনত্যাগ করিয়া শঙ্কর মহারাজের অনুসরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া যেন উদ্‌গ্রীবভাবে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দভরে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "তোমায় তো আমি খুব জানি, তোমায় তো আমি খুব চিনি, তোমায় তো আমি অনেক দেখেছি।" তাঁহার এরূপ প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি মহা আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম ঃ "মহারাজ, (গত ফেব্রুয়ারি মাসে) বলরাম মন্দিরে রাখাল মহারাজ ও আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছিল।" আমি এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার উচ্ছ্বসিত বদনে ভাবান্তর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভিন্নরূপ ধারণকরত বলিয়া উঠিলেন ঃ "সেকথা কী আর বলতে! মহারাজ আজ স্থূলশরীরে নাই, আমরা সব কী আর বেঁচে আছি; এখন আর কথা বলব কার সঙ্গে?"

আমার এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ফলে তিনি বুঝিয়া নিলেন যে, আমিও যেন তাঁহারই মতো সমব্যথায় ব্যথী; তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগকরত যেন আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন ঃ "এসেছ, বেশ হয়েছে! এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে।"

যাই হউক, যথাসময়ে আমার দীক্ষা হইল এবং ফিরিবার কালে 'পত্র লিখিও' বলিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার সহিত সর্বদাই আমার পত্র আদানপ্রদান চলিত।

১২।৮।২৬ তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ "তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসারে থাকিয়া সহস্র সম্পদের ভিতরেও যে মনে করে—আমি বেশ আনন্দে ও শান্তিতে আছি, সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেহ ওরূপ মনে করিতে পারে, কিংবা একবারে যার দূরদৃষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎ কৃপায় বা বহুজন্মের সুকৃতির ফলে যার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে সে কখনোই যেকোন অবস্থায়ই হউক সংসারকে সুখময়, শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সততই সেইজন্য সে মোহের পার ভগবৎ নিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি আমার খুব আনন্দ হয়; কারণ, তোমার মন সংসারে কখন শান্তি, সুখ অনুভব করে না—ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ।..."

১৯২২ সাল হইতে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই ২/১ বার আমি

মঠে আসা-যাওয়া করিতাম, মঠের সকল সাধু মহারাজের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতাম, কখনো কখনো ২/৩ মাসও একসঙ্গে থাকিতে পারিতাম; যদিও মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে কিছুদিন মঠে থাকিবার পর করিমগঞ্জ পাঠাইয়া দিবার জন্য শেষের দিকে প্রতিবারই ব্যগ্রতা দেখাইতেন। আমার সহিত তাঁহার নানারূপ ব্যবহারের অনেক মধুময় স্মৃতি চিত্তভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। তাঁহার লিখিত অনেক চিঠিপত্রও আমার নিকট রক্ষিত আছে। সেসমস্ত বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এখানে সামান্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যদ্দ্বারা পাঠকবর্গ মহাপুরুষজীর সুদূরপ্রসারী দিব্য জীবনের গভীরতা কতকটা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন।

একদা আমি মঠে পৌঁছাইয়া আমার সহিত যে-টাকাকড়ি ছিল, তাহা মঠের অফিস ঘরে স্বামী ধর্মানন্দজীর নিকট জমা রাখিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। ঐদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিয়া যখন নিচে নামিয়া আসিতেছিলাম, সেই সময় চা খাইবার জন্য নির্দিষ্ট পুরাতন মঠের ভিতরের বারান্দায় হেলান দেওয়া বেঞ্চে মহাপুরুষজী ক্ষীণ অন্ধকারে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "কালীসদয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা-পয়সা আছে, অফিসে রেখে দিও।" আমি বলিলাম ঃ "হাঁ মহারাজ, আমি রেখে দিয়েছি।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ "রেখে দিয়েছ? তবে তো তুমি ভারী চালাক।" তারপর বলিলেন ঃ "আমি যখন তোমার চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয় বুঝেছ? কিন্তু আমি তোমায় তো সব দিয়ে দিতে পারি না। Religion must come from within. এ তো বাজারের মাছ-পান নয় যে, পয়সা ফেলে দিলে আর কিনে নিয়ে গেলে! স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লিখা রয়েছে—'Religion must come from within and not from without.' বুঝেছ?" আমি মাথা নাড়িলাম, তিনি আবার বলিলেন ঃ "স্বামীজীর বই পড় নাই—তাতে লিখা রয়েছে—'Religion must come from within not from without.' পড় নাই? পড় নাই?" আমি বলিলাম ঃ "হাঁ মহারাজ, পড়েছি।" কিন্তু তিনি আমার কথায় যেন একেবারেই কর্ণপাত না করিয়া ভাবের ঘোরে হেলান ছাড়িয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া বারবার বলিতে লাগিলেন ঃ "পড় নাই? পড় নাই?"

আমি তখন ভাবিতে লাগিলাম, আমি যদি এখন স্বামীজীর কোন চিন্তাধারার উল্লেখ করিয়া তাঁহার এই ভাবে কোনরূপ ঝঙ্কার না দিতে পারি, তাহা হইলে আমি স্বামীজীর বই পড়ি নাই বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইবে। তদুপরি তিনি জোর দিতেছেন 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' অর্থাৎ নিজ চেষ্টায় উপলব্ধি কর; এদিকে আমার প্রার্থনা রহিয়াছে—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' অর্থাৎ তুমি আমাকে উপলব্ধি করাও। তাই স্বামীজীর 'মদীয় আচার্যদেব' বইখানা অবলম্বন করিয়া উত্তর দিলাম ঃ "মহারাজ পড়েছি, এও পড়েছি—'That a great soul like you can transmit religion to others either by a touch or by a look'." এই কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় বেঞ্চে হেলান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, তারপর সোজা হইয়া উত্তর করিলেন ঃ "না, আমি তা পারি না।" তারপর একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "পারলেও তোমায় দিব না। দিলেও তুমি রাখতে পারবে না।"

স্তরে স্তরে এই তিনটি উক্তি আমার মনে একটি প্রবল আলোড়ন তুলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল তাঁহার মহিমময় জীবনের আত্মগোপনের প্রয়াস এবং আমাদের অনন্ত বিকাশের পক্ষে আত্মপ্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

ঐসময় একে একে আরো অনেকে তথায় উপস্থিত হইলে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়া কথাবার্তার স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। "Religion must come from within" —এই মহাবাক্য হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে আমি সরিয়া পড়িলাম।

বারান্তরের কথা। মঠে কিছুদিন অবস্থানের পর প্রত্যহ যেমন যাই তেমনি একদিন সকালবেলা প্রায় ৮/৯ ঘটিকার সময় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁহার কক্ষে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তিনি একাকী আপনভোলাভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ "কালীসদয়, তুমি কবে করিমগঞ্জে যাচ্ছ?" মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগক্লিষ্ট, অতিশয় দুর্বল। মঠ ছাড়িয়া শীঘ্র চলিয়া যাইবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল যুক্তি হিসাবে উত্তর করিলাম ঃ "মহারাজ, আপনার শরীরের তো এইরকম অবস্থা দেখছি, ইচ্ছা হয় আরো কিছুদিন মঠে থাকি।" এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার নিজ শরীর দেখাইয়া বলিলেন ঃ "এই পাঞ্চভৌতিক দেহ—ওটা তো যাবেই, ভিতরে দেখ।' এই কথা শুনিয়া আমার মনে বিষম ধাক্কা লাগিল এবং আমি 'সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূর ধবল গুরুঃ', 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকার্থ অবলম্বনে আমার আত্মদর্শনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলাম ঃ "না মহারাজ, ভিতরে তো কিছুই দেখতে পাই না।" আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি যেন স্থূল দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া আমার কথার উত্তর করিলেন ঃ "দেখবে আবার কী? এই চোখ দিয়ে গাছপালা দেখছ তাই তো দেখবে, তবে কিনা ঠাকুর দয়া করে আমাদের life (জীবন) তৈরি করে দিয়েছেন; তোদেরও হয়ে

যাবে, ভাবনা কি?" এই কথাগুলির দ্বারা তিনি দ্বৈতভাবে দর্শনাদির উপরের কথা অদ্বৈতানুভূতির ("Religion is being and becoming"—স্বস্বরূপাবস্থান) দিকে প্রেরণা দিচ্ছেন ভাবিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম : "মহারাজ, শাস্ত্রে তো দিব্য দর্শনের কথাও রয়েছে?" তখন উত্তর করিলেন : "হ্যাঁ, তাও রয়েছে, তাও রয়েছে।" এই কথাগুলি বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন; আমিও আস্তে আস্তে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত করিবার জন্য বেলুড় মঠে আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন নূতন কেন্দ্রকে তখন মিশনের অঙ্গীভূত করা হইবে না বলিয়া আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল। তখন মিশনের সম্পাদক ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দজী। আমি মঠের উত্তর পাইয়া ভাবিলাম—মঠ যখন করিমগঞ্জ কেন্দ্রটিকে আশ্রয় দিলেন না, তখন দেশের সেইসময়কার রাজনীতির মহা আন্দোলনের মুখে সর্বসাধারণের সহযোগে মিশনের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ বজায় রাখিয়া কাজকর্ম পরিচালন করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য এবং সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মুখ্যত নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনই শ্রেয়। কেননা, তাহা হইলে অফিসের গুরুদায়িত্ব আর আমার স্কন্ধের উপর থাকিবে না এবং স্থান-বিশেষের আকর্ষণও ক্রমশ লোপ পাইবে। মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু পূর্ব হইতেই আমাকে ইঙ্গিত করিতেন, যাহাতে জোর করিয়া চাকুরি না ছাড়ি। প্রভুর ইচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার ভক্ত এবং সন্তান হিসাবে করিমগঞ্জেই আমি দিনপাত করি, ইহাই যেন তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। অথচ মঠ এদিকে করিমগঞ্জ আশ্রমটিকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। নিরালম্ব অবস্থায় থাকিবারই বা সার্থকতা কী? এই সঙ্কটে উপস্থিত কর্তব্য স্থির করিবার নিমিত্ত মহাপুরুষজীর নির্দেশ চাহিয়া পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তরে ১৯২৮ সালের ১৩ জুলাই তারিখের পত্রে সুবিধামতো মঠে একবার যাইবার ও affiliation সম্বন্ধে working committee-র Secretary-কে পত্র লিখিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। উক্ত পত্র পাইবার ৩/৪ মাস পরে এবং মঠে সাধারণত যেসময়ে সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য দেওয়া হয়, তাহার প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া বাস করিতে থাকি। করিমগঞ্জ আশ্রমের বিষয় আমি নিজ হইতে কিছুই বলিলাম না। তিনিই একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "কালীসদয়, করিমগঞ্জের affiliation সম্বন্ধে কী হলো?" আমি বলিলাম : "মহারাজ, ওঁরা তো বলছেন যে, affiliation হবে না।" মহারাজ বলিলেন : "করিমগঞ্জের affiliation হবে না? তা আমি এখনি দিয়ে দিতে পারি, তবে কিনা আমিও তো একটা ভুল করতে পারি! ওদের ভেবেচিন্তে দেখতে বল।"

তদনুযায়ী আমি সভ্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার পর স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দজীর (পরেশ মাহারাজ) পরামর্শে শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শাখারূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব লইয়া মহাপুরুষজীর নিকট উপস্থিত হই। তিনি উহা শুনিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন। অতঃপর শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের (স্বামী প্রেমেশানন্দজীর) নিকট চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের সম্মতি প্রার্থনা করি। তিনি শীঘ্রই মঠে যাইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন জানিয়া আমি তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিতে থাকি।

ঐসময় একদিন মহাপুরুষ মহারাজের নিকট প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও আমাকে দয়া করিয়া অনুমতি দেন তো কয়েকদিন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করি। এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন : "সেটা আবার কী! তাঁর নাম করা, তাঁর ধ্যান-চিন্তা করা—ঐটিই হচ্ছে আসল।" আমি নীরব রহিলাম এবং ঐ কথার গভীরতা চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু পরে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন : "বেশ তো, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস।" সন্ধ্যারতি শেষ হইবার পর আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দেখি, তিনি বিছানায় শায়িত অবস্থায় আছেন। তাঁহার দক্ষিণপদে সুবিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক শ্রীযুক্ত ভগবান সেন এবং বামপদে তাঁহার (বিশিষ্ট) সেবক মতি মহারাজ হাত বুলাইয়া দিতেছেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : "কে?" আমার নাম বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে তিনি কহিলেন : "মতি, ওকে ঐ পাটা ছেড়ে দাও তো।" মতি মহারাজ তখন সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু কাজে অগ্রসর হইতেই একদিকে গুরুদায়িত্বের, অপরদিকে আমার অপটুত্বের কথা চিন্তা করিয়া মনে ভয় উপস্থিত হইল। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম : "মহারাজ, মতি মহারাজ আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছু সেরে নিন, তারপর আমি শুধু আমার সাধ মিটাইবার জন্য খানিক সেবা করিব।" আর মনে মনে দেবতাদের নাম স্মরণ করিয়া গুরু-কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মতি মহারাজ বাহির হইয়া গেলেন আর মহাপুরুষ মহারাজকে মনে হইল যেন নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন—কোন সাড়াশব্দ নাই। আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া ভগবানবাবুর দয়া হইল। কী করণীয় এবং স্বয়ং কীরূপে তিনি পদসেবা করিতেছেন তাহা বুঝাইয়া দিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিলেন। আমি অতি সতর্কতার সহিত পদসেবায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এইরূপে প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর মহাপুরুষজী কহিলেন : "কালীসদয়, তুমি আর কদ্দিন মঠে

আছ?" আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, মঠে ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাসদীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় মাসেক কাল বাকি। তাই বলিলামঃ "মহারাজ আরো মাস খানেক মঠে থাকার ইচ্ছা।" উত্তর শুনিয়াই তিনি তাঁহার তর্জনী খাটের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া কহিতে লাগিলেনঃ "এই আজ থেকে মাস খানেক? আজ থেকে মাস খানেক?" আমি উত্তর করিলামঃ "হাঁ, মহারাজ।" তখন বলিলেনঃ "না, সে-ইচ্ছা তো আমাদের নয়, আজ থেকে তুমি মাস খানেক এখানে থাক—সে-ইচ্ছা তো আমার নয়, তুমি ওদিকে (করিমগঞ্জ) চলে যাও, এদিকে তোমার বেশি ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই।" ইহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার ভাবনা-সাগরে প্রবল ঝড় উঠিল, আমি বিচলিত হইয়া বলিলামঃ "মহারাজ, না হয় আমি কলকাতায় কিছুদিন থেকে যাই।" তিনি উত্তর করিলেনঃ "না, তুমি কলকাতায়ও থাকতে পারবে না, ওদিকে (করিমগঞ্জ) চলে যাও।" তারপর আমি নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণাপূর্বক মঠে থাকার জন্য কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল যেন তিনি সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরদিন যখন এবিষয়ে স্বামী ভূতেশানন্দজীর সহিত আলোচনা হইল, তখন তিনি আমাকে এই বলিয়া সাবধান করিলেন যে, মহাপুরুষজীর অভিপ্রায় আমি ভুল বুঝিয়াছি। পরে দেখিলাম, তাঁহার ধারণাই ঠিক। রাত্রিতে মহাপুরুষজীর পদসেবার উদ্দেশে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া মনে হইল তিনি যেন নিদ্রা যাইতেছেন; তাই অতি সন্তর্পণে তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পায়ে হাত বুলাইয়া দিবার পর মহাপুরুষজী আমাকে বলিয়া উঠিলেনঃ "কালীসদয়, তুমি আমার কথা শুনছ না কেন?" আমি বলিলামঃ "শুনছি তো মহারাজ।" তিনি বলিলেনঃ "কোথায় শুনছ? তুমি ওদিকে চলে যাও।" আমি বলিলামঃ "এখানে কটা দিন থেকে চোখের চিকিৎসা করিয়ে যাই মহারাজ।" তিনি বলিলেনঃ "তবে বল তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে এসেছ!" আমি উত্তর দিলামঃ "মঠে থাকা আর চোখের চিকিৎসা করানো দুই-ই।" তখন তিনি বলিলেনঃ "Do you Know your future?" আমি উত্তর করিলামঃ "না, মহারাজ।" তারপর দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেনঃ "তবে আমার কথা শুনছ না কেন?" তারপর চোখমুখ ঘুরাইয়া ও অঙ্গুলি নাড়িয়া বলিতে লাগিলেনঃ "একথা মনে করো না যে, তোমায় মঠে থাকতে দেওয়া হলো না, but for your good, but for your good!" দুইবার এই কথা বলিয়াই তিনি বিছানার উপর আসন করিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে বসিয়া রহিলেন আর আমি তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিলাম ভাবিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলিলেনঃ "তুমি গান পছন্দ কর না? যাও সাধুদের গান শুনগে; মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম করলে সেই তো ভাল!"

বাহির হইয়া আসিয়া গানের আসরে বসিলাম বটে, কিন্তু মন নিবিষ্ট হইল না। নানা চিন্তায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে কলকাতা গেলাম এবং বাগবাজারে কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা করিয়া মঠে ফিরিয়াই দেখি, ইন্দ্রদয়ালবাবু বেলুড়ে পৌঁছিয়াছেন এবং গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া নিবিষ্ট মনে পুরাতন মঠবাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছেন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইন্দ্রদয়ালবাবু যেদিন শ্রীহট্ট হইতে বেলুড় রওনা হইয়াছেন, ঠিক সেইদিন রাত্রিতেই আমি মহাপুরুষজীর পদসেবায় প্রবৃত্ত হই। আর তিনিও আমাকে করিমগঞ্জে ফেরত পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। বাহ্যত এই দুই বিষয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এবং থাকিতে পারে না। কিন্তু পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় তাহাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রহিয়াছে।

ইন্দ্রদয়ালবাবুকে শুধু প্রণাম করিয়া পরে আলাপ হইবে বলিয়া সোজা মহাপুরুষজীর কাছে হাজির হইলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম যে, কলকাতায় কয়েকদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। তিনি উহা অনুমোদন করিলেন। তৎপর কাতরভাবে বলিতে লাগিলামঃ "মহারাজ, আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে?" তিনি প্রফুল্লমনে সান্ত্বনার ভাবে উত্তর করিলেনঃ "না, না, কোন অপরাধ হয়নি, কোন অপরাধ হয়নি।" আমি আমার সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াও উত্তর পাইলাম এবং তাঁহার কথামতো কয়েকটি দিন কলকাতা হইতে মঠে আসিয়া তাঁহার পূত সঙ্গ-সুখ ভোগ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভ করিলাম। ইন্দ্রদয়ালবাবুর সহিত মঠে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ হইলে তিনি বলিলেনঃ "মহাপুরুষ মহারাজ সিদ্ধসঙ্কল্প, তিনি যখন বলেছেন তখন আপনি করিমগঞ্জ চলে যান; আমি পরে এসে কার্যোপযোগী ওখানকার জন্য কমিটি গঠন করব।" আমি তাঁহাকে উত্তর করিলামঃ "আমার যখন সন্ন্যাস হলো না, তখন আমার মনে হয় আপনাকেই সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে।" তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু আমি করিমগঞ্জে পৌঁছাইয়া মাস খানেক পরেই মঠ হইতে পত্র পাইলাম যে, তিনি 'স্বামী প্রেমেশানন্দ' হইয়াছেন। করিমগঞ্জ আশ্রমের জন্য কমিটি গঠন দূরের কথা, সন্ন্যাসের পর শ্রীহট্ট জেলাতেই তিনি আর পদার্পণ করেন নাই। মহাপুরুষজীর ইচ্ছার স্রোতে আমাদের ইচ্ছা কোথায় ভাসিয়া গেল! তিনিই হাত ধরিয়া আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর পুরাতন ঘটনাবলি স্মরণ করিয়া "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ। হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।" ❑

'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'

স্বামী স্মরণানন্দ*

সাংসারিক জীবন যাপন করেও কিভাবে আমরা নিজেদের ঈশ্বরাভিমুখী করতে পারি তা একটি মূলগত প্রশ্ন।

প্রাচীনকালে মানুষের জীবন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, তা স্বতই মানুষকে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পথে, যা জীবনের চরমতম লক্ষ্য, তার দিকে এগিয়ে দিত। বস্তুত, আমাদের প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা অভিব্যক্ত জীবনের চার পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রভৃতি এমনভাবে নির্ধারিত ছিল, যাতে সকলেই নিজ নিজ জীবনে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আজকের দিনে আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছি। তার ওপর প্রযুক্তিবিদ্যার বৈপ্লবিক অগ্রগতির দরুন সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রাতেই একটা সাধারণ ধাঁচ এসে গিয়েছে। ফলে জীবনের মোড় আধ্যাত্মিকতার দিকে ফেরানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই এখন কিভাবে পরিচালিত করলে জীবন মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয়ে উঠবে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

এখানে 'মহত্তর উদ্দেশ্য' বলতে কি বুঝব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" কিন্তু ঈশ্বরলাভ তো আর এমনি এমনি হয় না। গীতায় শ্রীভগবান বলছেনঃ

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।" (৭।৩)

—অধ্যাত্মজীবনে সিদ্ধিলাভের জন্য হাজার হাজার লোক চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা চেষ্টার কিছু বাকি রাখে না। তা সত্ত্বেও সাফল্যের মুখ দেখতে পায় যৎসামান্য কয়েকজন।

এই পথ যদি এতই দুর্গম, তাহলে এই পথে পা বাড়াবার কি দরকার?—এপ্রশ্ন উঠতেই পারে এবং এটি একটি ন্যায্য প্রশ্ন। এর উত্তর পেতে হলে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—'আমি কি করছি? কোথায় যাচ্ছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?' এইসব প্রশ্নে মন বিক্ষুব্ধ হতে থাকলে ক্রমে ক্রমে আমাদের প্রতীতি জন্মাবে যে, জীবনের একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তা হলো—ঈশ্বরকে জানা। এখনি এখনি ঈশ্বরকে জানা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু যে-পথ অবলম্বন করলে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, সেই পথে চলা আমরা সকলেই শুরু করতে পারি। কিভাবে তা করা সম্ভব? এর জন্য আমাদের সুকৌশলে কাজ বা 'কর্ম' করতে হবে।

প্রাচীনকালে, বিশেষ করে 'পূর্বমীমাংসা' দর্শনের নির্দেশ অনুযায়ী লোককে যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকাণ্ড করতে হতো। প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, সারা জীবন প্রতিদিন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করতে হবে। তখনকার দিনে সাধারণ প্রথা অনুসারে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করতে হতো এবং তাতে উভয়ে সমানভাবে অংশ নিত। বাল্যকালে দেখা একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে আছে। তাতে একটি দম্পতিকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করতে অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়েছিল। শুনেছি, আজকের দিনেও এইসব অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পালন করা হয়ে থাকে, যেমন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর নামে হোমাগ্নিতে আহুতি দিই।

এছাড়া জীবনে আমাদের অন্য অনেকরকম কাজ করতে হয়। অর্থোপার্জন করতে হয়, খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয়, তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়। অতএব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন যে, এক মুহূর্তের জন্যও কেউ কাজ না করে থাকতে পারে না। ভাল লাগুক আর না লাগুক, কাজ করতে আমরা বাধ্য। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে। প্রকৃতির ব্যবস্থায় আমাদের জীবন এমনভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত যে, সবসময় আমাদের কিছু না কিছু কাজ করে যেতেই হবে।

এখন প্রশ্ন—কিভাবে আমরা তা করব? এর উত্তর—তা আমাদের করতে হবে কর্মযোগের মাধ্যমে। কর্মযোগের তত্ত্বটি 'গীতা'য় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ও তার আগে 'উপনিষদ্'-এও ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'ঈশ উপনিষদ্'-এর দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" অর্থাৎ এই জগতে সকলে কর্মে নিযুক্ত থেকে একশো বছর বাঁচার ইচ্ছা করবে।

আমাদের অনাসক্ত হতে হবে। একমাত্র এইভাবেই আমরা আমাদের জীবনকে কাজে লাগাতে পারি। বস্তুত, কাজ করলে আসক্তি জন্মায় না। মানুষের মনের ভাব,

---

* সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ২০০৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক আয়োজিত আধ্যাত্মিক শিবিরে প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণের অনুবাদ। মূল ভাষণটি ২০০৪ সালের জুন মাসের 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদকঃ শৌটিরকিশোর চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আসক্ত করে। মনে করুন, কেউ একজন এসে বলল : 'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, যা চাইবে আমি তাই তোমাকে দেব।' জানি না, সেক্ষেত্রে কজন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে কাজ করে যাবে।

আজকের দিনে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এঁরা 'পেনসন', 'গ্র্যাচুইটি' সবকিছুই পান। কিন্তু ঐসব পেয়েও তাঁরা যে সন্তুষ্ট তা মনে হয় না। স্বাধীনতার আগে আমাদের গড় আয়ু ছিল ২৫ বছর, এখন তা ৬৫ বছর এবং কিছুদিন পরে বেড়ে হয়তো ৮০ হয়ে দাঁড়াবে। অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা যে কী করবেন ভেবে পান না। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের আর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু যতদিন কেউ এই পৃথিবীতে থাকবে, তাকে কিছু না কিছু কাজ করতেই হবে। শুধু শিখতে হবে, কিভাবে কাজটি 'কর্মভোগ' না হয়ে 'কর্মযোগ'-এ পরিণত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে—কেমন করে এটি করা যেতে পারে?

'গীতা'য় শ্রীভগবান বলছেন : "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" অর্থাৎ যোগ হচ্ছে কর্মে কুশলতা বা নৈপুণ্য। কিন্তু এখানে সাধারণ অর্থে নয়, প্রকৃত ফলপ্রসূতার নিরিখে নৈপুণ্যের কথা বলা হচ্ছে। 'কৌশল' কাকে বলে? কৌশল হলো কর্মক্ষেত্রে পটুতা—সেই একই করণীয় কাজ যা আমাদের নানা বস্তুতে আবদ্ধ করে, যা করে আমরা নিজেদের আসক্ত বলে বোধ করি, তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়ে পরিণত করা। 'কৌশল'-এর এই হলো গূঢ় মর্ম।

'গীতা'র মতে এরূপ করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'কর্মযোগ' গ্রন্থে বলেছেন, এটি সম্ভব। 'গীতা' ও স্বামীজীর কালের মধ্যে প্রায় তিনহাজার বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে আর কেউ এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিষয়টির আলোচনা করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ 'গীতা'য় উপস্থাপিত তত্ত্বটির বিশদ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর 'কর্মযোগ' গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কাজ মানুষের কাছে কদাচিৎ রুচিকর হয়। সাধারণত লোকে কাজকে নীরস ও বিরক্তিকর মনে করে। এইরূপ মনে করার কারণ—কাজের প্রতি প্রীতির অভাব। প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসার ফলে লোকের মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়। আজকাল মহিলারাও অফিসে যায়। আর বাড়িতে থাকলে তাদের রান্নাবান্না করতে হয়, বাড়ি ঠিকঠাক রাখতে হয়, ঘর-গৃহস্থালির কাজ সব করতে হয়। এর ফলে তাদের মনেও বিরক্তিভাব জেগে ওঠে। আমাদের যেটা দরকার তা হলো কাজকে আনন্দময় করে তোলা।

আগেকার দিনে আমাদের সমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ছিল। অনেক লোক একসঙ্গে বাস করত। বিয়ের পরও ছেলেরা বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকত ও তাঁদের সেবাযত্ন করত। তারপর বানপ্রস্থে যাওয়ার সময় যখন আসত, তখন বৃদ্ধেরা বনে গিয়ে বাস করতেন ও বাকি জীবন অধ্যাত্মচর্চায় কাটিয়ে দিতেন। বর্তমান কালে লোকের জীবনযাত্রায় অত্যাবশ্যক বস্তুর তালিকা বেড়ে গেছে, বনে গিয়ে বাস করাও আর সম্ভব নয়। এখন সবাইকে বয়স হলেও কাজ চালিয়ে যেতেই হয়। কর্মযোগ হচ্ছে—কাজের ফল থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়ে বন্ধনের কারণ যে-কাজ, তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়ে পরিণত করা। 'গীতা'য় শ্রীভগবান এই কথাই বলেছেন :

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।" (২।৪৭)

—তোমার কর্মেই অধিকার আছে, তার ফলে নয়।

কিছু না কিছু কাজ না করে কেউ থাকতে পারে না। অবশ্য বাহ্যত চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব, কিন্তু এই অবস্থাতেও মন নিষ্ক্রিয় থাকবে না। আর এভাবে অলস হয়ে বসে কাটানো বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও নয়। কাজেই নিজেদের ভালর জন্যই আমাদের কর্মযোগের পথ অবলম্বন করা শিখতে হবে।

উপরি উক্ত শ্লোকে 'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ' বলা হয়েছে। তার অর্থ—মনকে কর্মফলে আসক্ত হতে দিও না। অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করে যাও, কিন্তু কর্মের ফলাফলে আসক্ত হয়ো না।

স্বামীজী বলেছেন—কর্তব্য কদাচিৎ প্রীতিকর হয়; কর্তব্য যেন মাথার ওপরের জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য। কিন্তু ভালবাসা মাখিয়ে মোলায়েম করে নিলে এই কর্তব্যই মধুর হয়ে ওঠে। তা করার জন্য অনাসক্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে অনাসক্ত হওয়া অর্থাৎ বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া মানে কিন্তু এই নয় যে, আমরা অফিসে কাজ করব, অথচ মাইনে নেব না। বস্তুত, কর্মফল স্বয়ং ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন। একমাত্র ঈশ্বরেরই কাজের ফলাফল মঞ্জুরির ক্ষমতা আছে। কর্মফল হলো যেন আমাদের মাইনের 'চেক'। ঐ 'চেক' সই কোম্পানির চেয়ারম্যানকেই করতে হয়। বিশেষ দিনে যদি তিনি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে ঐদিন আমাদের মাইনে আটকে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ 'গীতা'য় (৩।২২) বলেছেন : আমাকেও কর্তব্য করতে হয়। শ্রীভগবানের তো সবকিছুই আছে, তা সত্ত্বেও তিনি সদা-সর্বদা কাজে নিরত। কেন? তার উত্তরে তিনি বলছেন যে, তিনি এইভাবে কাজ না করলে অন্যেও তাঁর পথ অনুসরণ করবে। তারা ভাববে, অলস হয়ে বসে থাকাই ঠিক। শ্রীভগবান যখন কর্মহীন হয়ে রয়েছেন, তখন আমরা কিজন্য কাজ করতে যাব? এরকম হলে সমস্ত কিছু ভেঙে

পড়বে। জগতের সবকিছু ব্রহ্মশক্তির শাসনে চলছে, তাই আমাদের কাজ এড়িয়ে থাকবার যো নেই। তবে আমাদের কাজের প্রতি সঠিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কাজ করার জন্য সঠিক মনোভাব কি হবে তা আমরা আবিষ্কার করতে পারি জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে।

জ্ঞানযোগে বলা হয়—সবকিছু কর, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বয়ং অকর্তা থাক।

"প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। (গীতা, ৫।৯)
—জ্ঞানী জলে পদ্মপত্রের মতো থাকেন। ইন্দ্রিয়েরা কতরকমের কাজ করে, কিন্তু তিনি বিচলিত হন না। তত্ত্বদর্শী বলেন, আমি কিছুই করি না, সমস্ত কাজ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে হয়। আমি দ্রষ্টা মাত্র।

অবশ্য কয়জন লোক এরকম করতে পারে? বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই এরূপ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, তারা দেহে আসক্ত। তাসত্ত্বেও কর্মযোগকে এই জ্ঞানযোগের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যেতে পারে। 'গীতা'য় বলা হয়েছেঃ

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।। (৪।১৮)
—যিনি কর্মের মধ্যে কর্মহীনতা দেখেন এবং কর্মহীনতার মধ্যে কর্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী এবং সমস্ত কর্মের তিনিই কর্তা।

যে-বুদ্ধি কর্মের মধ্যে কর্মহীনতা দেখে, সেই বুদ্ধিই সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। একথার তাৎপর্য এই যে, সবকিছুই আমরা করতে পারি, কিন্তু অনাসক্ত থেকে করতে হবে। যখন আমরা আসক্ত হই, তখনি কর্ম 'অকর্ম' অর্থাৎ অকাজ হয়। আবার 'অকর্ম' অর্থাৎ কর্মহীনতা কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, কাজ না করে বসে থেকেও আমরা মনে মনে অনেক কিছু কামনা করতে পারি। অতএব এই দাঁড়াচ্ছে যে, জ্ঞানের ভিত্তিতেই আমরা কর্ম করছি না 'অকর্ম' করছি তা পুরোপুরি বোঝা যেতে পারে। প্রশ্নটা হলো—কে কর্ম করছে এবং কর্মের জমার অঙ্ক কার ব্যাঙ্কের খাতায় উঠছে? বস্তুত, আমাদের মনোভাব কি, তার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই ঐ পথ অবলম্বন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই আমরা ভক্তিযোগের সাহায্য নিতে পারি। শঙ্করাচার্য একজায়গায় বলেছেন যে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করলে যাই করা হোক না কেন, তা বন্ধনের কারণ হয় না। অবশ্য আমরা বলতে পারি—আমি সবকিছু করি, করে তা ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিই। কিন্তু মনে প্রাণে কি আমরা সেরকম অনুভব করি? 'শ্রীশিবমানসপূজাস্তোত্রম্'-এ আছে—"যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।"—হে শম্ভু! আমি যাই করি না কেন, তা তোমারই আরাধনা।

ভক্ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাকিছু করেন, তা পূজার ভাবে ঈশ্বরকে নিবেদন করে দেন। যাকিছু করছি তা পূজায় রূপান্তরিত করে দেওয়ার অর্থ—শুধু মন্দিরে যাওয়া বা যজ্ঞ-হোম করা নয়, সাধারণ যেসব কাজ আমরা করি, সেগুলিকেও পূজারূপে ঈশ্বরকে সমর্পণ করা।

এইরকম করাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বৈধী ভক্তির সাধন। তার অর্থ, বিধি অনুসারে ভক্তির সাধন করা। এতে বাহ্যত সাধক নানারকম অনুষ্ঠান ও কাজকর্মে নিরত থাকেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। কর্মযোগের লক্ষ্যও তাই—হৃদয়ের পরিবর্তন, মনোভাবের পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রায় তিনশো বছর আগেকার ফরাসি দেশের এক সাধকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। তাঁর নাম ছিল ব্রাদার লরেন্স। তিনি খুব যে একটা শিক্ষিত ছিলেন তা নয়। একটি মঠে তিনি পাচকের কাজ করতেন। এই করতে করতে একসময় তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটে। সকলে অবাক হয়ে যায়। যাঁদের অধীনে তিনি কাজ করতেন, তাঁরাও উৎসুক হয়ে জানতে চান কিভাবে তাঁর ঐ উচ্চ অবস্থা লাভ হলো। তিনি বলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না, তবে তিনি যেকোন কাজেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, তার মধ্যে সবসময় ঈশ্বরকে স্মরণ করতে ও তাঁর উপস্থিতি অনুভবের চেষ্টা করতে অভ্যাস করেছেন। অন্তরের পরিবর্তন ঐভাবেই আসে। ব্রাদার লরেন্স কর্ম করতেন 'যোগ'রূপে। তাই কর্মের ফলের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা। কর্মস্থলে আমরা যে-কাজ করি, বেতন পাওয়াকেই তার উদ্দেশ্য ধরলে চলবে না। আমাদের 'সেবা'রূপে কর্তব্য করতে হবে। হিন্দিতে বলা হয় 'সরকারি সেবা'। ভারত সরকারের বা সমগোত্রীয় অন্যান্য চাকুরির প্রসঙ্গে 'সেবা' কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকের বাস্তব চিত্র অন্যরকমের। বর্তমান কর্মের ধারাকে সহজে 'সেবা' বলা যাবে না। কাজ করুন আর না করুন, তাঁদের বেতন দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি পদস্থ কর্মচারীরাও তাঁদের পদকে কেবল সম্পদ আহরণের উপায়রূপে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরা যা করেন তাতে যদি একটু ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে একই কাজ—যা অন্যথা বন্ধনের কারণ, তা মোক্ষলাভের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

'গীতা'য় এই কথাই বলা হয়েছে—যাকিছু কর, সব ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দাও। আর 'মহাভারত'-এ এই

জিনিসই একটু ভিন্ন আকারে পাই। দেখা যায়, যুধিষ্ঠির সবকিছুই ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে চাইলে তাঁকে সচেতন করা হয়েছিল যে, সমর্পণ শুধু ভাল জিনিসই করতে হয়, খারাপ জিনিস করতে নেই; কারণ তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে যা দেবে তা বহুগুণ বর্ধিত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে।

ভক্তির প্রসঙ্গ করার সময় নিচের কাহিনীটি বলতে আমার বড় ভাল লাগে—

এক মহিলা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে আক্ষেপ করেন ঃ "আমি জপ করতে চাই, কিন্তু আমার একটি ভাইপোকে আমি বড় ভালবাসি। যখনি আমি জপ বা ধ্যান করতে বসি, তার মুখটি আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।" ঠাকুর তাঁকে বলেন ঃ "ভাল কথা। তুমি তোমার ভাইপোকে যখন খাওয়াবে, জামাকাপড় পরাবে বা তার জন্য অন্য কিছু করবে, তাকে গোপাল ভেবে করবে। মনে ভাববে, ঈশ্বর তার মধ্যে গোপালরূপে রয়েছেন, আর সেই গোপালকেই তুমি খাওয়াচ্ছ, জামাকাপড় পরাচ্ছ, তার সেবা করছ। মানুষের জন্য এইসব করছ ভাববে কেন? যেমন ভাব, তেমনি লাভ হবে।" আমরা শুনেছি, ঐরকম করার ফলে সেই মহিলা অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি করেছিলেন। এমনকি তাঁর ভাবসমাধি পর্যন্ত হয়েছিল। (দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়)

সাধনের কী অভিনব পন্থা! এই প্রসঙ্গে আমার সেই যোগীর কাহিনী মনে পড়ছে। তিনি একটি গাছের নিচে ধ্যান করতেন। একদিন সেই গাছের মাথায় দুটি পাখি কোলাহল করে তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন করছিল। তাতে তিনি তাদের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, আর পরমুহূর্তে পাখি দুটি ভস্মীভূত হয়ে গেল। এতে সেই যোগী নিজের সিদ্ধাইয়ের বিষয়ে খুব গর্ব বোধ করলেন। অতঃপর তিনি নগরে ভিক্ষা করতে গেলেন। তিনি যে-বাড়িটিতে গেলেন তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সুতরাং তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলেন। অমনি মহিলাকণ্ঠে উত্তর এল ঃ "দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমি একটু ব্যস্ত আছি।" অতএব তাঁকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো। অপেক্ষা করতে করতে তিনি একটু রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ভাবলেন—এই মহিলা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন? উনি জানেন না, আমার কী সিদ্ধাই আছে? বাড়ির অভ্যন্তরে মহিলাটি তাঁর রুগ্ন স্বামীর সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বেরিয়ে এলেন। যোগী রুষ্ট হয়েছেন দেখে তিনি বললেন ঃ "এখানে ভস্ম করার মতো কোন পাখি নেই।" যোগী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ও সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে ঐ ঘটনার কথা তাঁর গোচরে এল। মহিলা বললেন ঃ "দেখুন, আমি সারাক্ষণ আমার অসুস্থ স্বামীর শুশ্রূষা করি। আমি তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে দেখি। আপনি যখন এলেন, তখন আমি তাঁর সেবা করছিলাম। তার মাঝখানে এসে আমি আপনাকে ভিক্ষা দিতে পারিনি। তাই আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। এই সেবার কাজ করার ফলে আমার কিছু শক্তি লাভ হয়ে থাকবে। কিন্তু তা লাভ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এসম্বন্ধে যদি আপনি আরো বেশি জানতে চান, তাহলে এর পরের রাস্তায় যান। সেখানে এক ব্যাধের একটি মাংসের দোকান আছে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।"

যোগী হতবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন—একজন ব্যাধের কাছ থেকে আমার কী শেখার থাকতে পারে? যাই হোক, তিনি সেই দোকানের দিকে এগোলেন। সেখানে একজন ব্যাধ মাংস কেটে বিক্রি করছিলেন। ব্যাধ যোগীকে স্বাগত জানিয়ে বললেন ঃ "বুঝেছি, আপনাকে ঐ মহিলা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।" তারপর তিনি বাড়ি গেলেন। গিয়ে প্রথমে তাঁর অসুস্থ পিতামাতার সেবা করলেন। তা শেষ করে তিনি যোগীর প্রতি মনোযোগ দিলেন। যোগী বললেন ঃ "আপনি এত শক্তি কি করে অর্জন করলেন তা ভেবে আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।" অতঃপর সেই ব্যাধ যোগীকে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

কেউ যখন নিষ্ঠার সঙ্গে আপন কর্তব্যকর্ম করে, জীবকে শিবরূপে জ্ঞান করে শিশুরই হোক, পিতামাতারই হোক পরিচর্যা করে—তখন সেই কর্ম 'সেবা' হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমরা এই আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। সেবা করার জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। কেবল বড় মাপের সেবার ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যেই আমরা এর অভ্যাস করতে পারি। এই আদর্শ অনুসারে চললে সমগ্র পরিবারের পরিস্থিতিরই উন্নতি হবে।

বড় বড় শহরে আমরা আজকাল দেখতে পাই কত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে, কত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটছে। এসবেরই কারণ ঠিক ঠিক মনোভাবের অভাব। এইজন্যই কর্মযোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন। আমরা যাই করি না কেন, জ্ঞান অথবা ভক্তির সাহায্যে তাকে কর্মযোগে পরিণত করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, কলিযুগে মানুষের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল। তাই নারদীয়া ভক্তির সাধনই এযুগের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। এই সাধনে ক্রিয়াকাণ্ডের কথা কিছু নেই, শুধু ভগবানকে ভালবাসার কথাই আছে। এপথে চলতে চলতে কালক্রমে জীবনধারণ ব্যাপারটাই ভগবানকে ভালবাসার কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

যে-ভালবাসা আমরা জগতের ছোটখাট জিনিসকে দিই, তাকে ভগবানের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে হবে। এর জন্য আমরা ভগবানকে সাকার অথবা নিরাকার যেকোনভাবে চিন্তা করতে পারি। তবে সাকাররূপী ভগবানকে ভালবাসা সহজ। রামানুজ বলেছেন—ভালবেসে যে-বিগ্রহকে অর্চনা করা হয়, তাতে 'অর্চাবতার' অবস্থান করেন। সেটি আর শুধু মূর্তি থাকে না। বহু বছর ধরে পূজিত হলে মূর্তির মধ্যে তার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশিত হয়। তখন তাকে 'অর্চাবতার' বলে। এইজন্যই কিছু কিছু তীর্থস্থান ও মন্দিরে একটা পবিত্রতার পরিমণ্ডল, একটা অপূর্ব বাতাবরণের সৃষ্টি হয়—যা অগণিত তীর্থযাত্রীকে সেখানে টেনে নিয়ে আসে।

অতএব আমাদের সচেতনভাবে জীবনের ধারা বদলাবার চেষ্টা করতে হবে, জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। সর্বাগ্রে আমাদের লক্ষ্য কী তা স্থির করতে হবে। প্রথমেই যেমন বলেছি, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করা অর্থাৎ যা সবচেয়ে শ্রেয় তার দিকে অগ্রসর হওয়া। এটাই জীবনের পরম পুরুষার্থ।

অনেক গৃহস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতেন—আমাদের উপায় কি? আমাদের কি পরিবার ও সংসার ত্যাগ করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের বলতেনঃ 'না, তোমরা সংসারে থেকেও ভগবানকে লাভ করতে পার।" তাছাড়া, সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর জীবন সকলের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে জন্মাই। কম্পিউটারের ভাষায় বললে, প্রত্যেকের মনে একটা বিশেষ ভাব-এ 'প্রোগ্রাম' করা থাকে। আমরা আজ যা হয়েছি তা আগে থেকে যেরকম প্রোগ্রাম করা ছিল তার ফলেই হয়েছি। আগেকার সংস্কার মুছে ফেলা অত্যন্ত কঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব নয়। তার জন্য আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের মনের কম্পিউটার-এর সমস্ত বাজে প্রোগ্রাম তুলে ফেলে ভাল প্রোগ্রাম তৈরি করে বসাতে হবে। আর এই নতুন করে ভিতরের প্রোগ্রাম লেখার কাজটা আমাদের সচেতনভাবে করতে হবে।

এই পরিবর্তন যদি আমরা নিয়ে আসতে চাই অর্থাৎ যদি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে চাই, তাহলে আমাদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করে ভালবাসার ভাবে ভাবিত হতে হবে, সবকিছু একটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। শ্রীশ্রীমা এই জিনিসটা তাঁর জীবনে অপূর্বভাবে করে দেখিয়েছেন। আমরা যদি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করি তাহলে দেখব যে, সব দিক দিয়েই তাঁকে দেখতে ছিল সাদামাটা একজন মহিলার মতো, কিন্তু তাঁর মন ছিল একান্তভাবে পবিত্রতার সুরে বাঁধা। শুধু তাঁকে দর্শন করেই লোকে পবিত্র হয়ে যেত, তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসত। বর্তমান কালে চতুর্দিকে বিষয়াসক্ত লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকেও যে আধ্যাত্মিক বিকাশসাধন সম্ভব, তা তিনি নিজে করে সুস্পষ্টভাবে জগৎকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনে তিনি এ-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং তা করেছেন দৈনিক ব্যস্ত কার্যসূচি, গৃহস্থালির নানা কাজকর্মের মধ্যেও সবসময় মন ঈশ্বরে নিবদ্ধ রেখে।

এটা সত্য যে, আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন দিন লক্ষ্যে পৌঁছাব। আমরা যদি আরো কয়েক জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকি, কোন ক্ষতি নেই। কেউই আমাদের সদ্য সদ্য গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধ্য করছে না। তবে যদি আমরা সিদ্ধিলাভ করতে ব্যগ্র হই, তাহলে আমাদের সেই আদর্শকে গুরুত্বসহকারে নিতে হবে এবং নিপুণভাবে কর্মযোগের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। একমাত্র প্রশ্ন হলো—লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা কতটা ব্যাকুল? ❑

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ পৌষ ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ

শ্রীমা সারদাদেবী
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী
৭ পৌষ, শুক্রবার
(২৩ ডিসেম্বর ২০০৫)

যিশুখ্রিস্ট
৮ পৌষ, শনিবার
(২৪ ডিসেম্বর ২০০৫)

স্বামী শিবানন্দ
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী
১১ পৌষ, মঙ্গলবার
(২৭ ডিসেম্বর ২০০৫)

স্বামী সারদানন্দ
পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী
২০ পৌষ, বৃহস্পতিবার
(৫ জানুয়ারি ২০০৬)

স্বামী তুরীয়ানন্দ
পৌষ শুক্লা চতুর্দশী
২৮ পৌষ, শুক্রবার
(১৩ জানুয়ারি ২০০৬)

একাদশী-তিথি ঃ ১১, ২৫ পৌষ
মঙ্গলবার, মঙ্গলবার
(২৭ ডিসেম্বর ২০০৫,
১০ জানুয়ারি ২০০৬)

'ছিন্ন কর বন্ধনের এ অন্ধকার'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য*

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী,

আজ এই তীর্থস্থানে আসতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমি এই এলাকারই মানুষ, এই এলাকার শ্যামপুকুরে আমার জন্ম। এই বাড়িটি আমরা চিনতাম

স্বামী স্মরণানন্দজী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি অর্পণ করছেন

ছোটবেলা থেকে। পরবর্তী কালে কলেজের ছাত্র থাকাকালীন কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরতাম। এই বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে কেমন একটা হীনমন্যতায় ভুগতাম। বাড়িটি কি এইভাবেই পড়ে থাকবে? তখন অবশ্য আমার করার কিছু ছিল না। দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। তারপর সরকারে আসার পর যখন শুনলাম, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটা পুনরুদ্ধার করা হবে, তখন আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সাধ্যমতো এগিয়ে এসেছিলাম। এই বাড়ির পুনর্নির্মাণের পর আজ প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এখানে যে-স্বামীজীরা আছেন, তাঁদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে চাওয়া ধৃষ্টতা হবে। আমার জীবনে আমি যেভাবে বুঝেছি, তা হলো এই—মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে একজন ভারতীয় (১৮৬৩-১৯০২) চেষ্টা করেছিলেন আমাদের প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতাকে সংমিশ্রণ করে নতুন এক সংস্কৃতির জন্ম দিতে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম ভারতীয় কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি আমাদের বুঝিয়েছিলেন, হতদরিদ্র মানুষদের নিয়ে চলতে না পারলে এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সঙ্কীর্ণতা না দূর করতে পারলে হবে না। এ এক মহাবাণী। আজ এই যুগে বসে আমরা কতকিছু ভাবছি! কিন্তু সেই যুগে বসে ধর্ম, জাতপাত বা জাতিগত সমস্যা নিয়ে তিনি যা চিন্তা করেছিলেন, দারিদ্র্য, ভারতবর্ষ নিয়ে যা বলেছিলেন—তা আমাদের পরম পাওয়া। তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তা। সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা বা চারিত্রিক শক্তির আজ বড়ই অভাব। কিন্তু সেইখানেই বারে বারে ফিরে আসেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবনে যে শৃঙ্খলা ও বিবেকের দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন, তা একজন আদর্শ মানুষের পরিচায়ক। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। তাঁর জীবনকালেই তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা জানি, মানুষের মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু মৃত্যুর পরেও একজন মানুষের চিন্তাধারা যে অন্যদের কাছে জীবনের আদর্শ হয়ে থাকতে পারে, এরকম মনীষী খুব কমই আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ

পথচারী শিশুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক মহারাজ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

** পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন। উক্ত কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জিতাত্মানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত বক্তৃতাটি শিরোনাম-সহ প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক*

তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের গর্ব। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ভারত, ভারত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশে দেশে রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তথা আধুনিকতার সংমিশ্রণে গঠিত সংস্কৃতি আজ বোধহয় পাশ্চাত্যের আরো বেশি প্রয়োজন। কারণ, আজ যখন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, সেইসময় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার পাঠ বা শিক্ষা নিতে পাশ্চাত্যকে বারবার ফিরে আসতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হলেও কিছু জানি। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে কী হচ্ছে। শিক্ষায়, আমার ধারণা, আমাদের রাজ্যে প্রথম সারির শিক্ষা-

সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক-ফলকের আবরণ উন্মোচন করছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সঙ্গে স্বামী জিতাত্মানন্দ এবং স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন সবার ওপরে। আমাদের রাজ্যের সবথেকে ভাল ছাত্ররা বেরিয়ে আসে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, বন্যায় আমরা সরকারের পাশে আর কাউকে না পেলেও যাকে পাই, তা হলো রামকৃষ্ণ মিশন। তাঁরা যে কতবার কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, তার তালিকা আমি তৈরি করতে পারব না। কারণ, অত বড় তালিকা যে তৈরি করা সম্ভব নয়! বেলুড় মঠেও শুনলাম বিভিন্ন বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা গিয়ে সেখানে Vocational Training নিচ্ছে, যাতে তারা অন্যকিছু করে খেতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশন আজ এত বড় দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি তাঁদের অজস্র অজস্র ধন্যবাদ জানাই। আজ কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত আধুনিক গবেষণা বা Bio-Technology সংক্রান্ত শিক্ষা এবং শিক্ষা থেকে গবেষণার কাজে রামকৃষ্ণ মিশন উন্নত বিজ্ঞানচর্চাতেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবেন।

সাম্প্রতিক কালের দুটি কথা মনে পড়ছে। একটি ছোট কাজের ব্যাপারে সঞ্জীব মহারাজ (স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ) আমার কাছে গিয়েছিলেন। আমি বললাম, দেখুন পুরুলিয়া জেলা নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি। আমাদের ওখানে সবথেকে বড় সমস্যা হলো খরা। আমরা কিছু টাকা পেয়েছি। অথচ ওখানে গভীর অভাব। তাছাড়া জ্ঞানের অভাব। আপনি কিছু করতে পারেন? তারপর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কোন খবরও নেই। আমি ব্যস্ত, উনিও ব্যস্ত। আমি পুরুলিয়ায় গিয়ে জেলাশাসকের কাছে শুনলাম যে, ওনারা এসে গেছেন। গতবছর থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ওনারা একজায়গায় নয়, দুজায়গায় কাজ করবেন। পুরুলিয়ার আর্থিক অগ্রগতির জন্য কৃষির উন্নতি অন্যতম শর্ত। যে-কাজ ওখানে আমাদের করণীয় বা করতেই হবে, সেই কাজ ওনারা শুরু করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আপনারা আসুন, আমি আপনাদের সাহায্য দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং জেলা প্রশাসনকেও নির্দেশ দিলাম।

সাম্প্রতিক কালে আমার কাছে এসেছেন Hindusthan Lever। বড় কোম্পানি, বহুজাতিক সংস্থা। TATA এবং ICICI ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা তহবিল গড়েছেন। সেই তহবিল থেকে দুঃস্থ নারী এবং শিশুদের খানিকটা পুষ্টি দেওয়ার একটা পরিকল্পনা তাঁরা করছেন। তাঁরা মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প চালু করবেন। তাঁরা বললেন যে, তাঁরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বলে সরকারের সঙ্গে কাজ না করে অন্য কারো সঙ্গে কাজ করলে সুবিধা হয়। আমি বললাম যে, তাহলে সবথেকে ভাল হয় যদি আপনারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কাজ করেন। একমাত্র তাঁরাই এটা সাফল্যের ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারবেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুঃস্থদের সেবা করা রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ এবং এটা তাঁদের দর্শনের সঙ্গে জড়িত। সেই দায়বদ্ধতা, পরার্থপরতা তাঁদের আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাজ অনেকটা হয়েছে। কিছু কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। এর জন্য আমাদের অনুরোধ করতে হবে না। এটা সম্পূর্ণ করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আজ কলকাতা মহানগরীকে এগোতে হবে। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সবকিছুতেই অগ্রসর হতে হবে। যদি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে কলকাতাকে উন্নত মানের একটি আন্তর্জাতিক শহরে রূপান্তরিত হতে হয়, তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনকে বাদ দিয়ে তা কখনোই হবে না। তাই কলকাতার সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও স্বামীজীদের নমস্কার। ❑

যাত্রী

গীতারানি বন্দ্যোপাধ্যায়

কে যায়---
সোনার শৃঙ্খল ছেড়ে নগ্নপদে,
কঙ্কর বিছানো পথে---
মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আরামের সুখস্বপ্ন-ছবি।
অচেতন মৃতস্তূপে প্রাণের স্পন্দন তুলে যায়
ডাক দিয়ে যায়, অকম্পিত স্বরে---
ভৈরবীতে লাগে সুর,
কার চিত্ত স্নান করে অমর গঙ্গায়!

সে কি চায়!
তার গান নিখিলের প্রাণে দেয় দোলা
সীমার বলয় থেকে---
তারকা-নক্ষত্র পুঞ্জপারে ছায়াপথ ফুঁড়ে।
তার খোলা দরজায়
পানপাত্র তার নিত্য রসে পূর্ণ হয়,
আপনার অন্তরতর সত্তায়---
অমৃতের পরম তৃষ্ণায়!

তার অভিসার
তার যাত্রা সূচিভেদ্য শর্বরী শেষে
হবে কোন্ যবনিকা পার!
জ্যোতির্ময় আত্মদীপে স্থিতি
অনুক্ত কী সে, আনন্দ সে রসাভিসার
কে পরাবে তার কণ্ঠে বরমাল্য হার!

ক্ষুরস্য ধারা

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

জলের খোঁজে পাহাড় খোঁড়াখুঁড়ি
উঠতে বসতে দড়ির ফাঁসে গলা,
লাফিয়ে যাব দেওয়াল কড়াকড়ি---
এবং যাব পাষাণ ছুরির ফলা।

জীবনজালে মস্ত জুয়াচুরি
বুকের মধ্যে হু হু আগুন জ্বালা,
ছিটকে ফেলে পথভর্তি নুড়ি
দৌড়ে যাবে মহাকালের ঘোড়া।
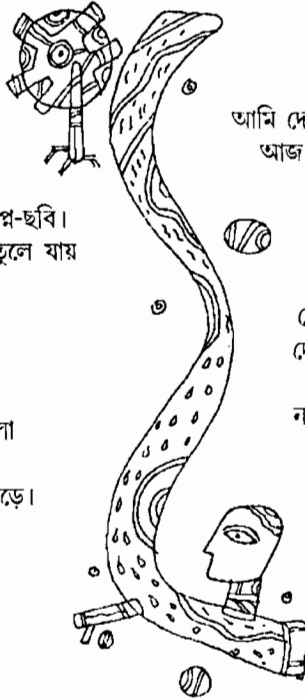
শুধু দেখব তোমায় চেয়ে

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি দেখেছি তোমার অরূপ সে-রূপ, লাল রাস্তার বাঁকে
আজ স্মৃতির পাখি আকাশ মনে ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভরা বর্ষায় জন্ম তোমার, বর্ষাতে যৌবন,
প্রৌঢ় তুমি শরৎকালে, বসন্তে আনমন।
নির্বাসনা গ্রীষ্ম রোদে রাঢ় বাংলার নদী,
সরল হতো তোমার ভাষা, কথা বলতে যদি।
তোমার ভিতর প্রাণের বাসা; দেখছি অবাক চোখে,
দেখেছি আমি তোমার সে-রূপ লাল রাস্তার বাঁকে।
মানুষের তুমি ঈশ্বর জানি, জীবননদীর কবি
নতুন প্রাণের আবেগে দেখেছি তোমার সহজ ছবি।
অলস দেহে শূন্য মনে তোমার ছবি ভাসে,
গ্রামের পাশে তোমায় দেখে মাঠের সবুজ হাসে।
মৌনমতি নদী আমার, মৌনমতি নদী!
চাও না কিছু লক্ষ্যে শুধু ছন্দে ভরা গতি।
কল্প-চোখে দেখেছি তোমার একফালি সেই রূপ
চড়ার ওপর নৌকা বেঁধে আজকে কেন চুপ?

উত্তরণ

শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবছ তুমি কৃপা করে
দেবে আমার ঝুলি ভরে?
ঝুলি দেখ কাণায় কাণায় অনাসক্তি-ভরা!
জায়গা কোথায় রাখব যেথা পণ্যের পসরা?
তবু তুমি পাঠাও ভূরি ভূরি
ছদ্ম-সুখের উপকরণ---হৃদয় হতে করতে শান্তি চুরি!
নির্বাসনা---সন্তোষেরই অস্ত্র নিয়ে হাতে
আমার মনের মণিকোঠায় শান্তি-ধনের আছে পাহারাতে!
এ প্রহরী টলতে নাহি জানে---
শান্তি-কলস অটুট রেখে, বারি তাহার ছড়াবে সবখানে!

তাই তো জানি---নাইকো আমার ভয়,
বারে বারে হেরে গেছি---এবার আমার হবেই হবে জয়!
সারা জীবন কেটে গেছে ভুলের পথে চলে,
রিপুর প্রবল তাড়নাতে---হাবুডুবু খেয়ে গভীর জলে!
অন্ধকারে নিশাচরের মতো---
নিজের রক্ত নিজেই চুষে কাটিয়েছি বুকের সাথে মনে নিয়ে ক্ষত!!
রত্নাকরের অতীত ঢেকে বিস্মৃতির বল্মীকে---
তোমার লিখন মুছে দিয়ে নতুন করে ললাটলিখন নিজেই যাব লিখে।
তাই প্রশান্ত হাসিমুখে এড়িয়ে যাই তোমার মায়ার ছল,
বীতংসে দেব না ধরা---তুমি আমার চিত্তে যোগাও বল!
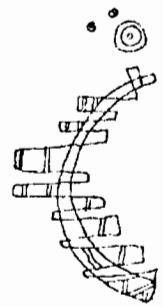
মায়ের ধ্যান

সঞ্জয় দাস

ওরে মন দেখ না ভেবে,
মনের মালিক আজ কি চান?
হেলাফেলায় দিন যে গেল
কোথায় পাবি পরিত্রাণ?
ভুল যে কত করলি ওরে
ডুবে আছিস মল-সাগরে
কে তোকে আজ মুক্ত করে
দেবে এনে মোক্ষ স্নান?
ভাবের ঘরে আছি ওরে—
চোখ খুলে আজ মুক্তি নেরে;
অনুতাপের অশ্রুজলে
সিক্ত করি চরণ তাঁর,
তিনি সদাই রক্ষা করেন
লাঘব করেন জীবনভার।
আমার আমি খুঁজতে গেলে—
আমার মাঝে কিছু না-পাই।
মায়ের আশিস জীবন বাঁচায়
মা যে আমার ধ্যান সদাই।

* সঞ্জয় দাসের বয়স অনধিক ত্রিশ। কলকাতার আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসিক। সংশোধনাগারের জীবনে তিনি মাতৃ অনুধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে সচেষ্ট থাকেন। বর্তমান কবিতাটি তারই ফসল।—সম্পাদক

আত্মার দোসর

দীপালি রায়

ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্তব্ধ ধূসর আকাশ—
সাদা আলোর দ্যুতি ছড়ায়।
কুয়াশার আস্তরণ সরে যায়
দিগ্বধূরা ঘোমটা খুলে তাকায়।
তোমার মুখের ছবি নীরব আকাশে
শুভাপ্রসন্নর বুকে লগ্ন হয়ে যায়।
'যত মত তত পথ'-এর বাণীমূর্তি তুমি,
আমাদের আত্মার দোসর।
'তোমাদের চৈতন্য হোক' আশীর্বচনে
সবাইকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এনে দিলে ধ্যানের জগৎ।
দিলে তাপিতকে আত্মার উজ্জীবন।
একটি শপথ মন্ত্রে চিত্তের উন্মেষ
তোমারই ভাবদেহ স্বামীজীর মর্মবাণী—
'উদ্বোধন' তারই মন্ত্রের জাগরণ।
তুমি পরমাত্মীয়, যুগাবতার রামকৃষ্ণ এখন।

পৃথিবী বিষয়ক তিন টুকরো

বিশ্বজিৎ রায়

১. এখানে চাকরি না পেলে সবাই মুরগির দোকান খোলে
জায়গা লাগে না বিশেষ।
টিনের চৌকো বাক্স-কল্প বড়মাপের খাঁচা
একেই বলে মুরগির দোকান।
খাঁচার ভেতরে মুরগিরা খায়, ঝিমোয়
নিয়মিত ব্যবধানে প্রাকৃতিক কর্ম করে,
ওপরে টিনের টেবিলে জ্বলে ধূপ
দাঁড়িপাল্লা, স্টিলের গামলা, ক্যাশবাক্স ভরে ওঠে
জল আর রক্তের দাগে।

পাড়ার মোড়ে মোড়ে এখন
ফোনের বুথ, জেরক্স মেশিন, মুরগির দোকান
প্রতিটি দোকানে ধূপ—
সুতরাং ধরে নেওয়া যায়
কেউ বেকার থাকবে না আর।

শুধু মুরগির খাঁচার ওপর বঁটি
রোদে চমৎকার লাগে।

২. পাথর পাথর
সহস্র পাথরে ঢাকা
পা থেকে মাথা
চোখ থেকে বুক
গুহার ভেতরে ছিল
তবু
অভিমুখ।
হাজার শ্যাওলা আর
ঝুলে থাকা বাদুড়ের দল
তবু ছিল জল।
জল শুধু জল
অজস্র সহস্র জলে
পা থেকে মাথা
যেই খুঁজে পাব
জল থেকে এসে জলে মিশে যাব।

৩. রোদ থেকে জেগে ওঠে
অন্য কারিগরি।
জানালায় রোদ নয়
গ্রিলের জটিল খেলা—
একটা দুটো ছায়াপাখি
ঘরে পড়ে আছে।
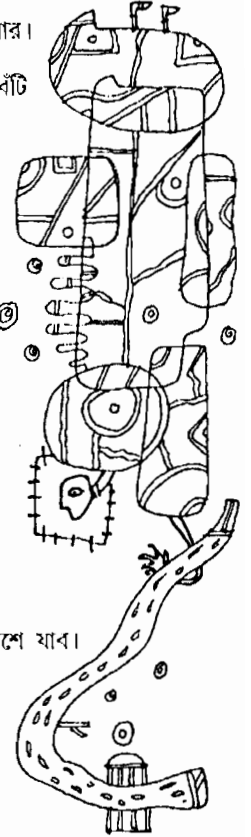
অলঙ্করণ : সৌরীশ মিত্র

জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ*

জীবনের পথ ধরে চলতে চলতে কত যে বিচিত্র ছবি চোখে পড়ে, আমরা তার ইয়ত্তা করতে পারি না। দারিদ্র্য তাকে বিবর্ণ করতে পারে না। সংগ্রামের ঘামে ভিজেও তা আশ্চর্য রঙিন। দুচোখ ভরে দেখি। আনন্দে কী এক অব্যক্ত আবেগ বুক ঠেলে চোখে আসে। তারপর নীরবে চোখ উপচে নামে গঙ্গা-যমুনা। জীবন আর তখন কঠিন পথ থাকে না। জীবন হয়ে যায় মসৃণ, নদীর মতো। সেই জীবন-নদীর অতলান্ত গভীরে থাকে মণি-মানিক। আমরা গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজে ফিরি সেই অরূপরতন। জীবনের আপাত কাঠিন্যকে তুচ্ছ করে কী অফুরন্ত শক্তিতে বৃহত্তর আঙ্গিকে জেগে থাকে অন্তরতর জীবন। তা কখনোই ফুরিয়ে যায় না। আমাদের টেনে নিয়ে যায় জীবনের নিহিতার্থের দিকে। রক্ত আর ঘাম মুছে জীবন সেখানে অনন্যসুন্দর। মরণের স্থির চোখে চোখ রেখে সেখানে মাথা তোলে প্রত্যয়ী জীবন, চৈতন্যময় অপরিমেয় জীবন। খণ্ডিত দৃষ্টির আড়াল সরিয়ে রেখে জীবন সেখানে অখণ্ড মৌনতায় স্থির হয়ে থাকে। সেই নিভৃত প্রাণের দেবতাকে আমরা প্রণাম করি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসিবৃন্দ মানুষকে কত কাছ থেকে দেখেন। তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের সেবা করতে পেরে ধন্য বোধ করেন। এই মানুষদের শরীরে আছে অপুষ্টি, গায়ে কাদা আর মাটির গন্ধ। আছে তথাকথিত শিক্ষার অভাব, আর আছে বঞ্চনার জ্বালা। পরিপার্শ্বের নির্দয় চাপে খুইয়ে ফেলা জীবনের শ্রী। তবু তারা স্বপ্ন দেখে। একথা রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী মানবসমাজ বুক ঠুকে বলতে পারেন। কারণ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবার হাত তাদের স্পর্শ করতেই তাদের চোখে জ্বলে ওঠে স্বপ্নের প্রদীপ। সেই নির্মল আলোর পথে চলেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী পৃথিবীর অগণিত মানুষজন। এভাবে পথ চলার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, তিনি বলেছেনঃ "তোমরা যাকে ভুল করে বল মানুষ, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি।" আজ আমরা জীবনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টায় ব্রতী হতে চেষ্টা করি।—**সম্পাদক**

আমি তখন কলকাতার কাছে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি। শনিবার অর্ধদিবস আর রবিবার ছুটির দিন। কয়েকজন ডাক্তার আর ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কলকাতার ব্যস্ত জনপদ ছেড়ে সুন্দরবনের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে চলে যেতাম। স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্পণের অছিলায় জীবনকে দেখার আগ্রহ ছিল বেশি। দারিদ্র্য আর অশিক্ষাকে কেন্দ্র করে দিনযাপনের গ্লানির ভারে ন্যুব্জ মানুষজন কী অদ্ভুত শক্তিতে মাথা তুলেছে! অর্থের বৈভব আর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে হতমান করে অন্তরের ঐশ্বর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তাদের হৃদয়। সহমর্মিতা আর মানবিক মূল্যবোধের দ্যুতিতে ঝলমল করছে সেইসব অনন্য জীবন। আজ সেই অনন্য জীবনের টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে মালা গাঁথায় সামিল হয়েছি। সেই মালার পরতে পরতে বিধৃত হয়ে আছে ত্যাগের জীবনের অমল সৌন্দর্য এবং সেবার মাধুর্যমণ্ডিত ঘ্রাণ।

সুন্দরবনের বনবিভাগের একটি দপ্তরে বসে আছি। রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে চা-সহযোগে কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি এলেন। শুকনো চেহারা, শোকার্ত মুখ, মলিন জামা-কাপড়। দিন দুয়েক আগে তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মধু সংগ্রহের জন্য গভীর অরণ্যে গিয়েছিলেন। তাঁরই চোখের সামনে চকিতে সেই বড় আদরের ভাই বাঘের খাবারে পরিণত হয়ে গেল! চিৎকার করতেও ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতা তাঁকে এতটাই বিহ্বল করেছিল যে, ভাঙা বুক নিয়ে বাড়ি ফিরে ভাল করে কথা বলতে পারেননি। সেদিন রেঞ্জার সাহেবের দপ্তরে এসে বানভাসি কান্নায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন তিনি। তাঁরা দুজনে সরকারিভাবে নথিভুক্ত মধুসংগ্রাহক ছিলেন না। মৃত ভাইয়ের পরিচয়পত্র দপ্তরে জমা দিয়ে বিদায় নিলেন। জীবন-সংগ্রামী সুন্দরবনের মানুষের জীবনে এমন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাঁদের বেদনার রক্তে রঞ্জিত করে রেখেছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁরা এই ভবিতব্যের কাছে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হলেও জীবন-সংগ্রামে পিছপা হননি। রেঞ্জার সাহেবের দপ্তরে হঠাৎ যেন বিষণ্ণ স্তব্ধতা নেমে এল।

সুন্দরবনের সর্দারপাড়া অঞ্চলের মাটি ছুঁয়ে বয়ে গেছে রায়মঙ্গল। সেই সর্দারপাড়া লঞ্চঘাটের কাছেই সেণ্টু মণ্ডলের বাড়ি। কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরে আসার সময় নেই। জঙ্গলের ছায়ায় আর নদীর কালো জলে তখন ক্লান্তির ঘুম নেমেছে। দুজন সহকর্মী যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেণ্টু মণ্ডলের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করতে হলো। সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোয় খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি ঘরে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে আমরা তিনজন হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। অবশেষে সেণ্টুদের বাড়ির মানুষজনদের অগোচরে আমরা মাদুর-বালিশ নিয়ে বাড়ির উঠানে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিলাম। চোখে নেমে এল প্রার্থিত ঘুম। ভোরের লঞ্চ ধরতে হবে, তাই শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মাদুরের ওপর উঠে বসে আমি যা দেখলাম তাতে তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমাদের অজান্তে বাড়ির সবাই নিঃশব্দে এসে আমাদের তিনজনকে ঘিরে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছেন। পরম বিস্ময়ে সেণ্টুর বাবাকে এই আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছিলেনঃ "এখানে বাঘ আর সাপের ভীষণ উপদ্রব। প্রচণ্ড গরমে আপনারা বাইরে শুয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনাদের ডাকাডাকি করলে বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। তাই বাড়ির সবাই আপনাদের ঘিরে শুয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনারা আমাদের অতিথি। ভাবলাম, গভীর রাতে বাঘ অথবা সাপ এলেও প্রথমে আমাদের ক্ষতি করবে। ফলে আপনারা হয়তো রক্ষা পেয়ে

* *বর্তমানে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সংগঠক।*

যাবেন।" নিজেদের জীবনের মূল্য দিয়ে অতিথিসেবার সেই ঘটনা আশ্চর্য সুর হয়ে আজও আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে চলেছে। তাঁদের জাগ্রত দেবত্ব দিয়ে আমাদের দেবত্বকে স্পর্শ করার বিরল অনুভূতি সেদিন পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

সুন্দরবনের একটি অখ্যাত গ্রাম। আমাদের কাজকর্ম শেষ করতে বেলা গড়িয়ে গেছে। আমাদের আহার্য তেমন জোটেনি। সবাই এতটাই মগ্ন হয়ে কাজে সামিল হয়েছে যে, সেসব নিয়ে কেউই ভাববার ফুরসত পায়নি। এক দরিদ্র জেলে জল-কাদা মেখে অনেক দূর থেকে ক্লান্ত দেহে তাঁর বাড়ি ফিরছেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করেছেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যখন তাঁর বাড়ি অতিক্রম করছি, তিনি তখন এগিয়ে এসে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পথ অবরোধ করলেন। তাঁর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমরা তাঁর মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসলাম। কিছু না খাইয়ে তিনি কিছুতেই আমাদের ছাড়বেন না। ভাত খাওয়ার অনুরোধ কোনরকমে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও আমাদের জন্য কয়েক গ্লাস সরবত এল। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সেই ভদ্রলোকের দুচোখ বেয়ে আনন্দের নীরব অশ্রু নামছে। অশ্রুর ভাষা আমাদের অজানা নয়। তাই ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আরেকটি মজার ঘটনার উল্লেখ করে আজ স্মৃতির ঝাঁপি বন্ধ করব। সুন্দরবন অঞ্চলের একটি গ্রামের দুই বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁরা হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাকে সন্ন্যাসী দেখে প্রণাম করলেন। তাঁদের বয়স আন্দাজ পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে। দুজনে আমার বয়স নিয়ে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হলেন। সরল বিশ্বাস আর অবুঝ আবেগ নিয়ে বিচারপর্ব চলতে থাকল। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। একজন জিজ্ঞাসা করছেনঃ "হ্যাঁরে, মহারাজটার বয়স কত?" অন্যজন উত্তর দিলেনঃ "তা আমাদের মতোই, পঁচাত্তর-আশি হবে।" প্রথমজন বিজ্ঞের মতো বাধা দিয়ে বললেনঃ "নারে, দেড়শো বা তার বেশি হবে। সন্ন্যাসীদের সঠিক বয়স বলা যায় না।" জনান্তিকে বলে রাখি, আমি তখনো চল্লিশে পৌঁছাইনি।

[ক্রমশ] ॥এক॥

জীবনের অনন্ত পরিসরে আনন্দ-বেদনার সুগভীর স্পর্শে চেতনার অন্তরতর সত্তা জেগে ওঠে। জলছবি সেই সুন্দরকে আমাদের প্রাত্যহিকীতে লগ্ন করতে প্রয়াসী হয়েছে।—সম্পাদক

শব্দচেতনা ৫৩

গীতা সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশিঃ (১) "এবমুক্তো হৃষীকেশো —— ভারত" (৫) "মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং —— ইমাঃ প্রজাঃ" (৭) "—— জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (৮) "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং —— সৌম্যং জনার্দন" (৯) "পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা ——মহঃ" (১১) "তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি ——" (১৩) "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং ——" (১৬) "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা —— দেবেষু বা পুনঃ" (১৮) "তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি ——" (২০) "ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ —— তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য" (২১) "—— বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা" (২২) "অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ —— চ"।

ওপর-নিচঃ (১) "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন —— বিচাল্যতে" (২) "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য ——" (৩) "—— পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্" (৪) "—— পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" (৬) "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা ——" (১০) "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং —— যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" (১২) "সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা ——" (১৩) "অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা ——" (১৪) "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম ——" (১৫) "—— সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ" (১৭) "প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো —— মে" (২০) "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং —— স্থিতঃ"।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মাঘ ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি ঃ হেঁয়ালি, না বাস্তব সত্য?

স্বামী যোগস্বরূপানন্দ*

একটি যুবক কোন এক গ্রামে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ঃ "ওঃ! আমি তাকে কীই না ভালবাসি! আমি তাকে কতই না ভালবাসি!" গ্রামবাসীরা তার কান্না শুনে ছুটে এল। যুবকটি শুধু একটা কথাই বলতে লাগল যে, সে তার প্রেমাস্পদকে কতই না ভালবাসে! গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করল ঃ "যাকে তুমি ভালবাস সে কে?" যুবকটি বলল ঃ "আমি জানি না।" "সে কোথায় থাকে?" "আমি জানি না।" "তাকে দেখতে কিরকম?" "তা আমি জানি না, কিন্তু ওঃ! আমি তাকে এত ভালবাসি!" গল্পটি ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য তথা অনুগামীদের বলে শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভাইসব, তোমরা এই যুবককে কি বলবে?" "কেন মহাশয়, এ তো একটা নির্বোধ!"

এই গল্পটি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আমেরিকায় দেওয়া একটি ভাষণে উল্লেখ করেন।[১] ভগবান বুদ্ধদেব এই 'নির্বোধ' যুবকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যেসব লোক ঈশ্বরের গুণাবলি অর্থাৎ তাঁর নাক সুন্দর, কান সুন্দর ইত্যাদি বর্ণনা করে থাকে অথচ তাঁকে দেখেনি, তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেনি—তারাও সেইরকমই নির্বোধ। স্বামীজী এইধরনের লোককে শুধু 'নির্বোধ' বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের যে-অভাবটির কথা তুলে ধরেছেন, তা হলো 'ব্যক্তিত্ব'। এই 'ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি' আপাতদৃষ্টিতে একটি লবণত্বহীন লবণ বা প্রভাহীন সূর্যের মতো স্ববিরোধী কথা মনে হলেও যে একটি বাস্তব সত্য, হেঁয়ালি নয়—তা তাঁর একাধিক ভাষণ, আলোচনা ও পত্রাবলিতে ফুটে উঠেছে। বলা যেতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে এটি খুব বড় স্থান পেয়েছে এবং এর গুরুত্ব তিনি যে-পরিমাণে দিয়েছেন তা সমসাময়িক বা পূর্বতন কোন আচার্য বা লোকশিক্ষক দিয়েছেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে।

ব্যক্তিত্ব কি—অভাবের দিক থেকে

স্বামীজী এই ব্যক্তিত্বকে এত বেশি গুরুত্ব দিতেন ও তার বিকাশ তাঁর কাছে এমনই একটি বিষয় ছিল যে, আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত একটি চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ "আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক-একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।"[২] ঐ চিঠিতেই তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন ঃ "আমাদের কোন সঙ্ঘ নেই—আমরা কোন সঙ্ঘ গড়তেও চাই না।" কথাটি অদ্ভুত মনে হবে এজন্য যে, আজ বিশ্বজোড়া সকলের কাছে সুপরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন নামক বিরাট ধর্মসঙ্ঘের যিনি স্থপতি তথা রূপকার, তাঁর কাছ থেকে এরকম কথা! কিন্তু আসলে তিনি যা বলতে চাইছেন তা হলো—যথার্থ ব্যক্তিত্ব না থাকলে অর্থাৎ 'ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি'কে নিয়ে যদি একটি সঙ্ঘ তৈরি হয়, তবে তার মূল্য তাঁর কাছে কিছুই নেই। সেই কারণে তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশে জোর দিয়েছেন।

প্রথমে আমরা ব্যক্তিত্বের অভাব থেকে শুরু করব। অর্থাৎ কি কি লক্ষণ দেখলে তাকে 'ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি' বলা চলে, তারপর ইতিবাচক দিকটির আলোচনা সহজ হবে। যে-গল্পটি দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু হয়েছে, সেটি নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত। একজন প্রেমিক ভালবাসছে তার প্রেমাস্পদকে, কিন্তু সে তার নাম জানে না, জানে না তার বাসস্থান বা অন্য কোন পরিচয়। অর্থাৎ তার এই ভালবাসার ঠিক ঠিক কোন স্থিতি (Status) নেই—না তার নিজের মধ্যে অথবা যাকে সে ভালবাসছে বলে মনে করছে —তার মধ্যেও। এধরনের 'পাগলামি'কে আমরা ঐ ব্যক্তিত্বের অভাব বলতে পারি। এরকম একজন মানুষ—মানে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির কথা স্বামীজী তাঁর আরেকটি ভাষণ 'বাহ্যপূজা' (Formal worship)-তে উল্লেখ করেছিলেন। তাকে দেখে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "তোমাকে যা বলব তা পালন করবে কি? তুমি কি চুরি করতে পার? তুমি মদ খেতে পার? মাংস খেতে পার?" লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল ঃ "এ আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন?" স্বামীজী বললেন ঃ "এ দেওয়ালটি কি কখনো চুরি করেছে? এ কি কখনো মদ খেয়েছে?" বৃদ্ধ উত্তর দিল ঃ "না, মহাশয়।" স্বামীজী বললেন ঃ "মানুষই চুরি করে, মদ খায়, আবার ঈশ্বরত্ব লাভ করে। বন্ধু, আমি জানি তুমি একটা দেওয়াল মাত্র নও। কিছু একটা কর। কিছু একটা কর।"[৩] পরবর্তী কালে স্বামীজী ঐ বৃদ্ধ সম্বন্ধে বলেন ঃ "লোকটি আমার সামনের টেবিলটার মতো একেবারে জড় হয়ে গিয়েছিল। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল।"[৪] এখানে আমরা ব্যক্তিত্বের অভাবের বেশ কয়েকটা লক্ষণ পেলাম। প্রথমত, সে জড়বস্তুর মতো মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মৃত—বাইরের দিক থেকে চেতনা আছে মনে হলেও আসলে তা যথার্থ চেতনা নয়। আর এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর জন্য সে কোন অপরাধও করতে অসমর্থ। যেমন—চুরি করা, মদ-মাংস খাওয়া ইত্যাদি,

** আচার্য, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া। তত্ত্বের প্রায়োগিকতার আঙ্গিকে মৌলিক ও মুক্ত চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।—সম্পাদক*

ভাল কাজ করা তো সুদূরপরাহত! আর এইরকম 'টেবিলটার মতো জড়', 'মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মৃত' অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অভাবযুক্ত ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পৃথিবী-পরিক্রমায় বহু দেখেছিলেন। তারই একটি অসাধারণ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন মৃণালিনী বসুকে লেখা একটি চিঠিতে ঃ "কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশে মেঘ কখনো কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনো মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কিনা মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।"[৫] ইতোপূর্বে যে-বৃদ্ধ লোকটির কথা বলা হয়েছিল, তার মানসিকতার একটা হুবহু চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। 'হৃদয়াকাশের মেঘ' কখনো আর কাটছে না, 'প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি' কখনো তার মনকে মুগ্ধ করছে না, কারণ সে টেবিলের মতো, ইট-পাটকেলের মতো জড় হয়ে গেছে। নিজের উপস্থিত অবস্থা থেকে ভাল কিছু আছে কিনা কেউ বললেও বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস যদি বা কিছু হলো সেই অবস্থা পেতে কোন উদ্যোগ বা চেষ্টা করতে পারে না—সেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-মনের এতই শক্তিহীন অবস্থা! অথবা তাই যদি আসে যথার্থ উৎসাহের অভাবে তা মনেই মিলিয়ে যায়। যেমন, শরতের মেঘ আকাশে জমা হতে না হতেই বাতাসের তাড়নায় আকাশে হারিয়ে যায়।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ—ইতিবাচক সমাধান

এইসব ব্যক্তিত্বের অভাবে জড়ত্বপ্রাপ্ত জরাজীর্ণ মানুষের জন্য স্বামীজী ইতিবাচক কী সমাধান দিচ্ছেন? 'বাহ্যপূজা' (Formal Worship) নামক ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত যে-ভাষণে তিনি একটু বিস্তৃতভাবেই এই individuality নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্ব কিভাবে বিকশিত হয়। মৃণালিনী বসুকে লেখা চিঠিতে হতভাগ্য মানুষ কিভাবে যথার্থ ব্যক্তিত্বের অনুশীলন করে জীবনে আবার আশা-ভরসা খুঁজে পায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন ঃ "All must struggle to be individuals—strong, standing on your own feet, thinking your own thoughts, realising your own self. No use swallowing doctrines others pass on—standing up together like soldiers in jail, sitting down together, all eating the same food, all nodding their heads at the same time. Variation is the sign of life. Sameness is the sign of death."[৬] অর্থাৎ প্রত্যেককে ঠিক ঠিক ব্যক্তি হওয়ার প্রয়াস করতে হবে। কিভাবে? শক্তিশালী হতে হবে। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে—ক্রাচে ভর করার মতো অন্যের পায়ের ওপর নয়। নিজের সংস্কার অনুযায়ী, অভিরুচি অনুসারে চিন্তা করতে হবে—অন্যের অনুকরণ করে বা কোন মতাদর্শ অনুসরণ করে নয়। নিজের ভাবে স্বরূপের উপলব্ধি করতে হবে—অন্যের ভাবে নয়। এই তিনটি হচ্ছে ইতিবাচক পথনির্দেশ। এর বিকল্প কি তা স্বামীজী এরপর বলছেন। অন্যের তৈরি কিছু মতামতকে গলাধঃকরণ করা প্রকৃতপক্ষে জেলখানার কয়েদির মতো জীবনযাপন করা—যারা একই খাবার খায়, একসঙ্গে ওঠে, একসঙ্গে বসে, একইসঙ্গে মাথা নাড়ে অর্থাৎ 'প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত' হয়ে সব কাজ করে। স্বামীজী শেষে বলছেন, এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে গেলেই আমার অন্যের সঙ্গে তফাত হয়ে যাবে; কারণ, জীবনের চিহ্নই বৈচিত্র্য, যেইমাত্র আমি অন্যকে অন্ধ অনুসরণ করতে চাইব, তখনি ব্যক্তিত্বের অভাব—ঐ 'মানসিক তথা আধ্যাত্মিক মৃত্যু' হবে। ঐ ভাষণেই তিনি বলেছেন, এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের তথা মৌলিকতার অভাবে আমাদের হৃদয়, মন তথা শরীরে rustiness অর্থাৎ মরচে পড়া একটা অবস্থা তৈরি হয়। আমরা জানি, লোহা খুব দামি একটা ধাতু হলেও একটু যত্নের অভাবে তাতে মরচে পড়ে যায় আর সেই অবস্থায় এত দামি ধাতুও সাধারণ ইঁট-কাঠ-পাথরের মতো গুরুত্ব হারায়। যদি আদৌ ঐ মরচে পড়া লোহাকে দিয়ে কোন কাজ করতে হয়, তবে তাকে অত্যন্ত উচ্চ তাপে গলিয়ে শোধন করতে হয় (refining), তারপর ছাঁচে ঢেলে তাকে আবার আকার দিতে হয়। এখানেও সেরকম ঐ মরচে পড়া ব্যক্তিত্বকে দিয়ে সাধারণভাবে কোন কাজই হয় না যদি না তাকে ঐভাবে গলিয়ে শোধন করা হয়। পূর্বে আলোচিত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে স্বামীজী যে বলেছিলেন—কিছু কর, কিছু কর (Do something, do something)—তা সে যেভাবেই হোক, সেটা এই rustiness-কে দূর করার জন্য। তা না করলে কোন কাজই হবে না।

নিজের জন্য চিন্তা করার শক্তি

এই ব্যক্তিত্বের উন্মেষ বিষয়ে 'Formal Worship' ভাষণেই স্বামীজী একটি অভিনব পদ্ধতির কথা বলেছেন যা আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তাঁর বক্তব্য হলো, যদি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করেন তবে আমি দুঃখিত হব; আমি খুশি হব যদি আমি আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি জাগাতে পারি যা দিয়ে আপনারা নিজেদের জন্য

চিন্তা করতে পারবেন—'The power of thinking for yourselves.'[৭] কথাটা শুনতে একটু আশ্চর্য লাগতে পারে, কারণ আমরা কেই বা নিজেকে নিয়ে ভাবি না। সাধারণত সমাজে আমরা এই কাজটাকে 'স্বার্থপরতা' বলে থাকি আর তাকে সবাই একটু খারাপ চোখেই দেখে—'ঐ লোকটা শুধু নিজের কথাই ভাবে, খুব স্বার্থপর।' কিন্তু একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই যে 'নিজের কথা ভাবা'—এটার চালিকাশক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান (instinct), যা পশু ও মানুষের সাধারণ ধর্ম। এইভাবে নিজের জন্য যে ভাবা, তার পিছনে কোন বিচারবুদ্ধি না থাকায় (reasoning) তা পূর্বে যে কয়েদিদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, ঐরকমই হয়ে যায়। স্বামীজী ঐরকমভাবে নিজের জন্য ভাবার কথা বলছেন না। তিনি বলছেন, মানুষের মতো বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের যথার্থ ভাল কিসে হয়, কিসে না হয়, "thinking your own thoughts, realising your own self"—সেই পথের কথা। তার জন্য একটা শক্তি অর্জন করতে হয়, কারণ তার জন্য প্রথমেই ঐ মরচে পড়া অবস্থাটা কাটাতে হয়। প্রচণ্ড তাপ দরকার—ইচ্ছাশক্তি, স্বাধীন ইচ্ছারূপ তাপ। আর এজন্য আরেকটি জিনিস দরকার, যা ঐ ভাষণের একটু পরেই স্বামীজী বলেছেন ঃ "The only value of knowledge is in the strengthening, the disciplining, of the mind."—জ্ঞানের আসল মূল্য, একমাত্র মূল্য হচ্ছে মনকে শক্তিশালী করা, সুশিক্ষিত করার মধ্যে। উপনিষদ্ আমাদের বুদ্ধিকে রথের সারথির সঙ্গে তুলনা করেছে, যা ইন্দ্রিয় নামক ঘোড়াকে মনরূপ বলগা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্বামীজী এরকম শক্তিশালী মন ও বুদ্ধি গঠনের মাধ্যমে ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্বের শক্তি অর্জন করতে উৎসাহিত করেছেন। এছাড়া নিজেকে নিয়ে চিন্তা হলো ভেড়ার দলের মতো স্বার্থচিন্তা—যাদের জীবন ঘাস খাওয়া, বংশবিস্তার ও মৃত্যুর মধ্যেই সীমিত।

শেষকথা —'স্বাধীন ইচ্ছা', তাতে ইষ্ট হোক আর অনিষ্ট হোক

অনেকে বলতে পারেন যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে কথার যা ফুলঝুরি উপহার পেলাম তা সাধারণ মানুষ, মুটে-মজুর, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য—কিছু পরিমাণে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। আমরা এসব কথা নিয়ে কি করব—বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়? প্রথমত, স্বামীজী আমেরিকায় যে-ভাষণটি দিয়েছেন তার শ্রোতৃমণ্ডলী কেউই মুটে, মজুর বা খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী নন, অত্যন্ত শিক্ষিত তথা ধনী ব্যক্তি। কিন্তু স্বামীজী দেখেছেন তাদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে, এমনকি তিনি অত্যন্ত ব্যঙ্গ করেই বলেছেন যে, আমি ভেড়ার দলের সঙ্গে কথা বলতে আসিনি; ঠিক ঠিক নরনারী, যারা ব্যক্তিত্ববান তাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তোমরা সম্ভবত, সেরকম খোকা-খুকু নও যে, রাস্তা থেকে নোংরা কিছু কাপড়-জামা এনে একটা পুতুল বানাবে।[৮] তার মানে তথাকথিত শিক্ষা যথেষ্ট থাকলেও, টাকাপয়সা বা সামাজিক মর্যাদায় বেশ কিছু লাভ হলেও ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে আমরা ঐরকম খোকা থেকে যেতে পারি। এবারে আসা যাক ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। 'ধর্ম' ও 'ধার্মিক ব্যক্তি' কথাগুলো ভারতে এত বিচিত্র বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ভক্ত-ভক্তি, সাধু-সাধক কথাগুলি বিভিন্ন সময়ে এত বিকৃত হয়েছে যে, এদের আসল তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। সত্যি কথা বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন তথা স্বামীজীর 'নববেদান্ত' না এলে এই যুগের মানুষ এইসব কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারত কিনা সন্দেহ—ভূতপ্রেত-পূজা, তন্ত্রমন্ত্রই একমাত্র ধর্ম বলে বোঝা যেত। কথাটা এই—ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা না থাকলে এই ধর্ম, সাধুতা ইত্যাদি কিরকম রূপ নেবে তা পাওয়া যায় মৃণালিনী বসুকে লেখা স্বামীজীর ঐ চিঠিতে ঃ "নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল —বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ির চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?"[৯] অদ্ভুত চারটি প্রশ্নচিহ্ন দেখা যাচ্ছে এখানে। সাধারণভাবে যদি ধর্মজীবন বলতে পূর্বপুরুষ-কৃত কর্মের বিচারহীন অনুসরণ হয়ে থাকে, তাহলে সেরকম নিয়মের অখণ্ড অনুসরণ তো গাছও করে। প্রথমে বীজ, তারপর অঙ্কুর, পরে কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল—সবই তো নিয়মে হয়। তবে তো ওরাই ঠিক ঠিক ধার্মিক! আর যদি নিজের বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে লোকাচারের ধর্মপালনে ব্রতী হই, তবে তার সঙ্গে রেলগাড়ির পার্থক্য নেই। যদি নিয়মের ঊর্ধ্বে না যাওয়া যথার্থ ধর্ম ও ধার্মিক ব্যক্তির একমাত্র পরিচয় হয়, তবে পাথরের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য নেই। আর আছে অত্যন্ত বিষময় 'পাপবাদ'। এটা করো না—পাপ হবে, ওটা করো না—পাপ হবে। এই পাপমুক্তির প্রচেষ্টার শেষে জীবন বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে যাবে! সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ঐ ব্যক্তিত্বের অভাব ঐ rustiness, ঐ power of thinking for ourselves-এর অভাবে আমাদের ধর্মজীবন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মজীবনে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যে অত্যাবশ্যক তা বলাই বাহুল্য। ঐ চিঠির পরবর্তী অংশেই স্বামীজী এই 'অচলায়তন' ভাঙার জন্য একটি অভিনব সমাধান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন

ইচ্ছা—চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।"[১০] অর্থাৎ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য, এই জড়ত্ব দূর করার জন্য, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে 'স্বাধীন ইচ্ছা'র বশবর্তী হতে হবে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বামীজী আমেরিকা থেকে তাঁর গুরুভাইদেরও একবার এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন ঃ "Independent হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ।"[১১] এখানে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে এবং স্বামীজী তা প্রয়োগ করতে বলছেন, যেহেতু এর বিকল্প হচ্ছে ঐ 'চালিত যন্ত্র'র মতো ভাল হওয়া, রেলের গাড়ির মতো ঈশ্বর-অনুরাগী বা পাথরের জড়ত্বের নিয়মভঙ্গ না হওয়া। শুধু তাই নয়, এই স্বাধীন ইচ্ছার তথা চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় চললে হয়তো আমাদের জীবনে সাময়িকভাবে কিছু মন্দ হতে পারে, কিন্তু যথার্থ ব্যক্তিত্ব, যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের গুরুতর প্রয়োজনে স্বামীজী তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তমোগুণীর সাত্ত্বিকতার ভানের চেয়ে রজোগুণীর উদ্যোগতাড়িত ভ্রান্তি ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়নের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন। গুণাতীত অবস্থা জীবনের লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু তা চেতনার ঊর্ধ্বায়নের পথে অর্জন করতে হবে, এড়িয়ে গিয়ে নয়। যদি কিছুসংখ্যক মানুষও এভাবে জীবনযাপনে প্রয়াসী হন, তবে আমাদের জন্য স্বামীজীর আবির্ভাব ও তাঁর অমূল্য রত্নরাজি বিতরণ করা সার্থক হবে। ❏

১ দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, 1984, p. 526
২ পত্রাবলি—স্বামী বিবেকানন্দ, ২০০০, পৃঃ ৪২২
৩ দ্রঃ Complete Works, Vol. VI, 1985, p. 65
৪ Ibid.
৫ পত্রাবলি, পৃঃ ৭৫৭
৬ দ্রঃ Complete Works, Vol. VI, p. 65
৭ Ibid., p. 64
৮ Ibid.
৯ পত্রাবলি, পৃঃ ৭৫৮
১০ ঐ
১১ ঐ, পৃঃ ২৫৯

রামকৃষ্ণ মিশন ঃ আমার মননে, অনুভবে

অবন চৌধুরী*

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সংগ্রাম—বহু ব্যবহারে জীর্ণ হলেও কথাটা আজও সমান গুরুত্ব বহন করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, পশুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্থূল পর্যায় পেরিয়ে এখন মানুষের সংগ্রাম পৌঁছেছে সূক্ষ্মতর মানসিক স্তরে। নিজেকে উন্নততর করার সংগ্রাম, ক্রমশ বদলে যাওয়া পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে সত্যকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম রক্তক্ষয়ী না হলেও তীব্রতায় বহু গুণ। এই সংগ্রাম রক্ত ঝরায় বুকের ভিতরে। কমবেশি আমরা প্রত্যেকেই এই সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত।

অন্তর্লোকের এই সংগ্রামে সামিল হওয়ার আগে প্রয়োজন একটি আদর্শের, যার দিকে তাকিয়ে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। সহজ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার অনায়াস অভ্যাস ছেড়ে কেন লড়াই করব—এপ্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, অশান্ত সমুদ্রে আদর্শের সঠিক অনুগমনের জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চাই কম্পাস—পরিষ্কার পথনির্দেশ, যে-নির্দেশ পৌঁছে দেয় সঠিক সিদ্ধান্তে, সাহস জোগায় অসত্যের ঝোড়ো হাওয়াকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে। আর সবশেষে আমরা খুঁজি এক আশ্রয়। যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক যে-আশ্রয়ে পৌঁছে নিশ্চিন্তে চোখ বোজে, ক্ষতের সস্নেহ পরিচর্যায় নবজীবন লাভ করে, অভয়বচনে নতুন শক্তি অনুভব করে।

আমার সৌভাগ্য, দৃঢ় বাস্তবের দিনালোকে পা রাখার অনেক আগেই, শৈশবের আলতো ভোরে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম এমন এক মহীরুহের ছায়ায়—যেখানে একই সঙ্গে মিলেছিল আদর্শ, নির্দেশ ও আশ্রয়। একটি নয়, তিন-তিনটি আলোকিত মহাজীবনের স্নেহস্পর্শে ধন্য সেই মহীরুহ। তাঁদের স্নেহকণা সিক্ত করেছিল আমাকেও। সে-মহীরুহের নাম, বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

** প্রান্তিক রাঢ় বাংলায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মাধ্যমিকে অষ্টম এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিকে ষোড়শ স্থান অধিকার করেন। বহু সম্মানে সম্মানিত অবন যে আর্থিক পুরস্কার পান তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা। সব অর্থই তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদের পঠনপাঠনের জন্য অর্পণ করেন। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। সম্প্রতি গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড একজামিনেশন (GRE) পরীক্ষায় ৯৬% নম্বর (১৫৪০/১৬০০) অর্জন করে বিদেশে যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। বিদেশে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে ভারতের সেবায় নিবেদন করতে তিনি বদ্ধপরিকর। সাংস্কৃতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক মননে সমৃদ্ধ অবন চৌধুরী তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন বর্তমান রচনায়।—সম্পাদক*

যাঁদের স্বপ্ন লালন করে চলেছে এই মিশন, সেই পুণ্যত্রয়ী সম্পর্কে লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁদের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব একেক মানুষকে আলোড়িত করে একেক ভাবে। আমি শুধু জানাতে পারি আমার অভিজ্ঞতাটুকু। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি আদর্শের দীপশিখাটি। তাঁর সহজ কথার ভাঁজে লুকিয়ে আছে উচ্চতম সত্যের উচ্চারণ। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য গাড়ি নয়, বাড়ি নয়, এমনকি নোবেল প্রাইজও নয়; 'ভগবানলাভ'—চরম শিখরে তিনি আমাদের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন। দুরূহ এই লক্ষ্যসাধনের পথে এক পা এগনোর সামর্থ্যও আমার নেই ভেবে যখন আমি দিশাহারা, তখনি দেখেছি এক ধ্যানমগ্ন জীবনজ্যোতি—স্বামী বিবেকানন্দ। 'বাণী ও রচনা'র পাতায় পাতায় তিনি তুলে ধরেছেন কীটত্ব থেকে বুদ্ধত্বে আরোহণের নির্দেশিকা। উনচল্লিশ বছরের রক্তক্ষরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর প্রতিকূলতার মুখে কেমন করে লালন করতে হয় সত্যকে। আর সবশেষে খুঁজে পেয়েছি কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়। দেখেছি এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি, অন্তরালে থেকেও অসীম মমতায় যিনি সন্তানবোধে কাছে টেনে নিচ্ছেন সকলকে। "মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন"—এই একটি কথাই কি পৃথিবীর সবথেকে নিরাপদ আশ্রয় নয়? তাই জীবনকে সংগ্রাম হিসাবে দেখার শিক্ষা আমি পেয়েছি এই মহীরুহের ছায়াতলে বসেই—কৈশোর না পেরোতেই। তারপর স্বপ্নের বছরগুলিকে পিছনে রেখে একদিন নেমে আসতে হয়েছে বাস্তবের রুক্ষ জমিতে। অবাক চোখে দেখেছি অন্যরকম এক জগৎ। অন্যরকম মানুষের নতুন রকম রীতিনীতির সঙ্গে অপরিচয় কখনো শঙ্কিত করেছে, অস্তিত্বের তাগিদে নিজেকে বদলাতে গিয়ে আশ্রম-লালিত আদর্শের সঙ্গে এসেছে সঙ্ঘাত। এইসমস্ত সঙ্কটমুহূর্তে অনুভব করেছি, কঠোর বাস্তবই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র। অন্যধারার মানুষগুলির প্রতি সন্দিহান না হয়ে তাদের দেবত্বে বিশ্বাস রাখা হলে তারা কত সহজে আপন হয়ে ওঠে, তা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। তাই মনে হয়, তপোবনের পবিত্র বাতাবরণে এই আদর্শের শিক্ষালাভ হতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত আত্মীকরণ ঘটে পরিস্থিতির মোকাবিলায়।

ব্যক্তিজীবনে আদর্শের অনুধ্যান ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখিতা আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে মিশনের বাইরে আসার পর। মিশনের পরিচালনায় দেশে-বিদেশে নিরন্তর চলতে থাকা সেবাকার্যের পরিসংখ্যানই হয়তো এর ব্যাপকতা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। তবু তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনকে অপরিহার্য হয়ে উঠতে দেখে—সে বন্যা পরিস্থিতির

মোকাবিলাই হোক বা ইউনেস্কোর শান্তিসম্মেলন। কিন্তু তারও বাইরে অন্য এক চাহিদা রামকৃষ্ণ মিশন নীরবে পূরণ করে চলেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আলগা হয়ে আসা বাঁধনটা একা হাতে শক্ত করার চেষ্টা সে করে চলেছে। নিজে সঙ্ঘশক্তির মূর্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠে আমাদের মনে করাতে চাইছে পাশের মানুষটির হাত ধরার কথা।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'সবুজ পাতা' নতুন আঙ্গিকে নিজেকে মেলে ধরতে চলেছে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে 'সবুজ পাতা'য় আসন করে নিতে পারেন।—সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশনের ভিতরে থাকার সময়ে আশ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা এতই সহজাত মনে হতো যে, সে-সম্পর্ক রচনায় রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান আলাদাভাবে চোখে পড়েনি। কিন্তু এখন দেখছি, দুরন্ত গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে মানুষ কিছুটা অসচেতন; বলা ভাল, তার সমস্ত সচেতনতা নিজেকে ঘিরে। তাই যে-মাটির, যে-মানুষের স্নেহস্পর্শে সে বেড়ে উঠেছে, তাদের অনেককেই সে ভুলে যায় অনায়াসে। ভুলে যায় তার প্রতি বৃহত্তর সমাজের অবদান। এবং সর্বোপরি, বিস্মৃত হয় নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে। তাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের বদলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সীমায়িত সাফল্যের পিছনে। এর পরিণাম, অদ্ভুত এক আঁধার বৃত্তে ছোট ছোট আলোকবিন্দুর মতো কিছু মানুষ, যাদের আলো সমাজকে আলোকিত করতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি কোন সঙ্ঘ নিঃশব্দে তুলে নিয়েছে আলোকিত করার কাজ, কাছের মানুষদের আত্মবিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনার কাজ, তখন বড় ভাল লাগে। আর সে-ভাললাগা আমার কাছে ভীষণ অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন দেখি সঙ্ঘের নাম—রামকৃষ্ণ মিশন।

সভা, সমিতি, আলোচনা, পত্রিকা, পূজাপাঠ, ত্রাণ—এর কোনটিই রামকৃষ্ণ মিশনের পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। রামকৃষ্ণ মিশনের অভিনবত্ব যত না কর্মসূচিতে, আরো বেশি তার কর্মপন্থায়—কাজের সঙ্গে পূজার অভিন্নতাবোধে, দেবতা ও মানুষের একাত্মবোধে, সাধনা ও সেবার সম্মিলনে। একারণেই বোধহয় রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী দেখতে পাই সমাজের সর্বস্তরে। যাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা আপ্লুত হন পূজাপাঠের নিষ্ঠা দেখে, ম্যানেজমেন্টের ছাত্র অনুরক্ত হয়ে পড়েন রামকৃষ্ণ মিশনের সুচারু পরিচালনদক্ষতায়। নিঃস্ব পথবাসী থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি—রামকৃষ্ণ মিশন আকর্ষণ করে সকলকেই। স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রত্যেকেই পারেন নিজের মতো করে জীবনে আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে। কেন এমন হয় জানি না, শুধু এইটুকু বুঝি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ বহিরঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ে মনের অন্দরমহলে। কাঠিন্য ছেড়ে হয়ে ওঠে ভাললাগার বস্তু। এই আদর্শের সঙ্গে একান্তে মতবিনিময় করা চলে। অভিমান করে একে ছেড়ে থাকা যায়। আবার অচিরেই নিজের ভুল বুঝে আবেগে একে জড়িয়ে ধরা যায়। বইয়ে নয়, এই আদর্শ জেগে থাকে জীবনের পাতায়। ❑

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী ও শিল্প

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার ভিত্তিতে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে শিল্পকলার নিবিড় যোগসূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় শিল্পকলায় বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে নবতম ভাবস্রোত উৎসারিত হয়েছে। শিল্প আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু অসামান্য। বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে ভারত-শিল্পের অফুরন্ত প্রেরণারূপিণী বলা চলে। নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প আন্দোলন দানা বাঁধে ও কালের পথে যাত্রা শুরু হয়—সেই মহান যাত্রায় সামিল হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ই. বি. হ্যাভল, জন উডরফ থেকে শুরু করে ভারত ও প্রাচ্য শিল্পের ব্যাখ্যাতা আনন্দকুমার স্বামী, এমনকি জাপানি শিল্পী ওকাকুরা পর্যন্ত। এইসব মনীষীর স্মৃতিচারণামূলক রচনা ও কর্ম নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বিপুল গবেষণা-সম্ভার এবিষয়ে আমাদের ঋদ্ধ করেছে।

বর্তমান কালের শিল্পীদের মধ্যে সুনীলকুমার পাল এই সুমহান ঐতিহ্যের অন্যতম অভিযাত্রী। ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সুনীলকুমার পালের অবাধ গতায়াত। আজও আত্মমগ্ন এই সাধক-শিল্পী আপন বিশ্বাসে চলমান। প্রতিভা শব্দটির বহুল প্রয়োগেও তাঁর শিল্পের মহত্তম আবেদনকে স্পর্শ করা যায় না। তাঁর শিল্পকর্ম তাঁর শিল্পজীবনের পূজা। ভারতের শিল্প জাগরণে ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যাঁরা জিগির তুলবেন, সুনীলকুমার পাল তাঁদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সুনীলকুমার পালের শিল্পকর্ম দেখে তাঁরা নিরুত্তর হবেন, সন্দেহ নেই।

কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সুনীলকুমার পাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যপ্রিয় পাল, মাতা নলিনীবালা দেবী। সত্যপ্রিয় পালের দাদামশায় নীলমাধব দে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিও'র অধিকর্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের থামে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত আলোকচিত্রটি নীলমাধব দে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিও'তে তুলেছিলেন। স্বনামধন্য শিল্পী সুনীলকুমার পালের অন্তরে এই চিত্র-শক্তি চিরজাগরুক থেকে তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মকে পরিচালিত করে চলেছে।

পরিবারে শিল্পচর্চার আবহ ছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতার 'গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট' (বর্তমানে 'গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ') থেকে মডেলিং বিভাগের শিক্ষার্থী হিসাবে সসম্মানে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে নেপাল যান এবং তাঁদের অনুরোধে তৎকালীন নেপালরাজ ও প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি নির্মাণ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা অবলম্বনে রিলিফ মূর্তি নির্মাণ তাঁর অন্যতম সেরা কীর্তি। ভাস্কর্য ছাড়াও চিত্রকলা ও স্থাপত্যবিদ্যাতেও তিনি অসাধারণ নজির গড়েছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ শিল্পীর স্থাপত্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্যের এক সুচারু সমাবেশ। পুরুলিয়া ছাড়াও দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম তাঁর শিল্পকর্মের নিবেদন গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'-এর মডেলিং ও ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এই বিনম্র শিল্পস্রষ্টা বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—১৯৪৬ ঃ রাজ্যপালের স্বর্ণপদক; ১৯৮২ ঃ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার; ১৯৮৭ ঃ অবনীন্দ্র পুরস্কার; ১৯৮৮-১৯৮৯ ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একাডেমি পুরস্কার; ২০০৩ ঃ লেডি রাণু মুখার্জি মেমোরিয়াল লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর ভিস্যুয়াল আর্ট; ২০০৫ ঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক; ২০০৫ ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি; ২০০৫ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি প্রদত্ত স্মারক পুরস্কার। প্রচ্ছদচিত্রটির শান্ত ও স্নিগ্ধ আবেদন মনকে আবিষ্ট করে। প্রচ্ছদের আঙ্গিক ও রঙের ব্যবহারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার আশ্চর্য গলাগলি আমাদের শুধু মুগ্ধতায় আবদ্ধ করে না, নতুন দিশাও দেয়।—সম্পাদক

চতুর্থ প্রচ্ছদের আলোকচিত্রী ঃ অতূণ বন্দ্যোপাধ্যায় ■ প্রচ্ছদের কারিগরি সহায়ক ঃ অরিসূদন দত্ত

যুধিষ্ঠিরের লোকব্যবহার-সৌকর্য

স্বামী সুপর্ণানন্দ*

কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধের আগে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। একটি অর্জুনের বিষাদসংক্রান্ত। সেই বিষাদ দূর করতেই শ্রীভগবান গীতার অবতারণা করলেন। গীতা শেষ হলো। অর্জুনের মোহ নাশ হলো। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় মোহ চলে গেল, স্বরূপের স্মৃতি ফিরে এসেছে আমার। তুমি এবার যা বলবে তাই করব।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এরপরই ঘটল। অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে বর্মসজ্জিত হয়ে যেই উঠে দাঁড়ালেন, তখনি যুধিষ্ঠির ধড়াচূড়া, অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিয়ে নগ্নপদে ভীষ্মের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কী বিপদ! যুদ্ধ এবার শুরু হবে। সব অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। এসময় শত্রুশিবিরে নিরস্ত্র কেউ প্রবেশ করে? অন্যান্য ভাইরাও বড় দাদার মতিগতি বুঝতে না পেরে তাঁদের রথ থেকে নেমে তাঁকে নিরস্ত করার জন্য তাঁর পিছু নিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের অনুসরণ করলেন। যুদ্ধার্থী রাজারাও উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিছন পিছন আসতে লাগলেন।

প্রথমেই অর্জুন দৃঢ়কণ্ঠে জানতে চাইলেন ঃ

"কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ যদস্মানপহায় বৈ।
পদ্ভ্যামেব প্রযাতোঽসি প্রাঙ্মুখো রিপুবাহিনীম্॥"

—রাজা! আপনার অভিপ্রায়টি কি? আমাদের ত্যাগ করে পূর্বদিকে, শত্রুদের দিকে পদব্রজেই যাচ্ছেন কেন?

ভীম বললেন ঃ "ক্ব গমিষ্যসি রাজেন্দ্র!"—হে রাজশ্রেষ্ঠ, আমাদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন?

নকুল বললেন ঃ "এবং গতে ত্বয়ি জ্যেষ্ঠে"—বড়ভাই যদি শত্রুদের মধ্যে এভাবে যান তবে আমাদের ভয় করে না?

সহদেব বললেন ঃ রাজন! যুদ্ধ করা যখন কর্তব্য তখন তা ভয়ঙ্কর ভেবে শত্রুদলে যোগদানের জন্য কেন যাচ্ছেন?

এত সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যুধিষ্ঠির মৌন ভাব অবলম্বন করে এগিয়ে চললেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ কেবল যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝতে পেরে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য—এঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে ('অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্') তবে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তাঁর এই আচরণ শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, গুরুজনদের সম্মান না দেখিয়ে যুদ্ধ করলে পরাজয় হয়, আর সম্মান দেখালে জয় নিশ্চিত। কিন্তু উভয় সৈন্যের মধ্যে একটা সংশয় দেখা দিল। যুধিষ্ঠির এই অবস্থায় ভীষ্মকে কী বলবেন আর ভীষ্মই বা কী উত্তর দেবেন? দেখা গেল—ভীষ্মের সম্মুখে যুধিষ্ঠির নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করলেন এবং প্রদক্ষিণান্তে সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন ঃ পিতামহ! আপনি দুর্ধর্ষ। আপনি অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব—

"আমন্ত্রয়ে ত্বাং দুর্দ্ধর্ষ ত্বয়া যোৎস্যামহে সহ।
অনুজানীহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয়॥"

উত্তর দিলেন পিতামহ—

"যদ্যেবং নাভিগচ্ছেথা যুধি মাং পৃথিবীপতে!
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভবায় ভারত।"

—তুমি যদি না আসতে, তবে তোমার পরাজয় কামনা করতাম এবং অভিশাপও দিতাম। কিন্তু রাজা! এখন আমি খুশি। তুমি যুদ্ধ কর, জয়লাভ কর—'যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি'। আর শোন, কৌরবেরা অর্থ দিয়ে আমাকে 'দাস' করে রেখেছে। মানুষ অর্থের দাস। আমি কী দেব তোমায়? "বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।"

একথা শুনে ভীষ্মের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা টলে যায়। বোধ করি, পিতামহও তা জানতেন। যেন সেজন্যই বললেন ঃ

"অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন।
ভৃতোঽস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি॥"

—যুধিষ্ঠির! তুমি ভাবতেই পার, বীর্যহীন নপুংসকের মতোই কথা বলছি। কিন্তু আমি কৌরবদের অর্থে ভৃত অর্থাৎ পরিপুষ্ট; যুদ্ধ তো আমাকে করতেই হবে। তাই বলছি, যুদ্ধ ছাড়া আর কী চাও?

স্বভাবতই যুধিষ্ঠির বিচলিত হলেন এবং সেইসঙ্গে আমরাও। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্তব্যে, বীর্যে, ভগবদ্ভাবনায় তুলনাহীন যে পিতামহ, তিনি সামান্য 'অন্নদাস'! তবু যুধিষ্ঠির বললেন ঃ হ্যাঁ, যুদ্ধ করতে হয় করুন। কিন্তু সর্বদা আমাদের হিত কামনা করুন। অর্থাৎ 'যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে', কিন্তু 'হিতৈষী মম নিত্যশঃ'। ভীষ্ম বললেন ঃ আমি তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করব—এতো ঠিক। তাহলে তোমার সাহায্য ঠিক কিভাবে করতে পারি—'কিমত্র সাহ্যং তে করোমি'?

যুধিষ্ঠির বুঝলেন, সত্যসন্ধ পিতামহ যুদ্ধ করতে এসে খেলা করতে পারেন না। মন, মুখ তাঁর এক। সেখানে পিতৃহারা পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর সব স্নেহ-প্রীতিও পিছনে পড়ে থাকে। অপরাজেয়, ইচ্ছামৃত্যুর আশীর্বাদধন্য পিতামহ দাঁড়িয়ে থাকলে এই যুদ্ধে পরাজয় ছাড়া আর কোন পথই তাঁদের কাছে নেই। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভরসা—এবিশ্বাস তাঁর আছে। তবুও ভয় ঘোচে কৈ? সেজন্য তাঁর সবিনয় প্রস্তাব ঃ আমার হিতৈষী থাকুন নিত্য ('হিতৈষী মম নিত্যশঃ'), আর যুদ্ধ করুন কৌরবদের হয়ে ('যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে')।

** অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক।*

বিশ্লিষ্ট চিন্তা ও আধুনিক মননের আলোকে বর্তমান সংখ্যা থেকে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কিত চিরন্তনী কথা উপস্থাপনায় প্রয়াসী হয়েছি।—সম্পাদক

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কথা বুঝতেই পারলেন না। তিনি এমন সহজ, সরল মানুষ যে, যুধিষ্ঠিরের সরলতাও যেন লজ্জিত এবং লাঞ্ছিত হলো। সত্যিই তো; যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রকাশ্যে বিনয়ের সঙ্গে তো এই কথাই জানালেন ঃ পিতামহ, আপনার হাতগুলো কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করবে; আর আপনার মন, অন্তর সবই আমাদের জন্য জয়প্রার্থনা করবে। তা করতে হলে তো এক অতি বড় দ্বিচারিতার আশ্রয় নিতে হয়। যুধিষ্ঠির এ কি বলছে? ভীষ্ম বিহ্বল।

এবার স্পষ্ট করেই যুধিষ্ঠির নির্মম বাক্যটি বললেন ঃ আমাদের মঙ্গল আপনি চাইবেনই। কিন্তু যুদ্ধে আপনি অপরাজেয়। তাহলে কিভাবে আপনাকে জয় করা যাবে? ("কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্?")

নির্ভীক উত্তর এল পিতামহের কাছ থেকে ঃ ঠিকই, আমি যুদ্ধ করতে থাকলে কেউ আমাকে জয় করতে পারবে না, ইন্দ্রও নন। ("নৈনং পশ্যামি কৌন্তেয় যো মাং যুধ্যন্তমাহবে বিজয়েত।")

যুধিষ্ঠিরের ভয় তো সেখানেই; জয় চান তিনি। তা বললেনও অকম্পিত কণ্ঠেঃ সেইজন্যই তো পিতামহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'বধোপায়ং ব্রবীহি'—আপনাকে বধ করার উপায়টা বলে দিন।

ভীষ্ম রাজি হলেন। কিন্তু এতে তাঁর কর্তব্যে অবহেলা হলো না? না, তিনি কর্তব্য করেছিলেন দশদিন যুদ্ধ করে—অন্নদাসের কৃত্যটুকু করার জন্য; তবু দুর্যোধনের 'মন' পাননি। প্রভুর মতোই দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে দাসবৎ আচরণ করে গেছেন। অস্ত্রত্যাগ করে কর্ণের হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য হুঙ্কারও দিয়েছেন (কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল—ভীষ্ম যতদিন যুদ্ধ করবেন, তিনি ততদিন নিষ্ক্রিয় থাকবেন)। দুর্যোধনের ধারণা, পিতামহ ছায়াযুদ্ধ করছেন, যুদ্ধের নামে ছেলেখেলা করছেন। সেজন্য দেখি, রাজি হয়েও নিজের বধের উপায় তখনি না বলে কর্তব্যকর্ম করার জন্য সময় নিচ্ছেন পিতামহ। বলছেন ঃ বাছা, এখন আমার মরণকাল নয় ('ন তাবন্মৃত্যকালোঽপি'), আবার এস ('পুনরাগমনং কুরু')। ইচ্ছামৃত্যু যাঁর, তাঁর আবার মরণকাল? ঠিক তাই। কোন্ অবস্থায় মানুষ মৃত্যুকে সাদরে আহ্বান করে—ভীষ্মের জীবন সেই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। এক খ্যাতিমান সাহিত্যসাধক ভীষ্মের প্রতি প্রণাম নিবেদন করে লিখেছিলেন ঃ ভীষ্মদেব গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত রয়ে গেলেন। নিজে কিছু করলেন না; দুহাত বাড়িয়ে শুধু বংশধরদের আগলে গেলেন, তাদের কীর্তিকলাপ দেখলেন, ভালমন্দ বললেন। কাজের কাজ কিছু হলো না। অমন একটা মানুষ, যাঁর স্নেহ, প্রেম, ধর্মবোধ, ঔদার্য, ত্যাগ, ক্ষমতা সমস্তই ছিল বিশাল; যিনি নিজের হাতে চারপুরুষকে আগলে রেখেছিলেন, তাঁর পক্ষে লোভ, অন্যায়, পাপ, শঠতা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, হানাহানি কোনটাই সামলানো সম্ভব হলো না। যেসব মহৎ গুণের জন্য তিনি প্রণম্য, ঠিক সেগুলোকেই ভাঙার জন্য তাঁর বংশধররা এসেছে। সব তির তাঁর বুকে বিঁধেছে। শরশয্যা এ অর্থেই। মানুষটা মরবে, কিন্তু বেদব্যাস যেন বলতে চাইলেন—'দেখ, ঐ বিরাট মানুষটার তোমরা কী দশা করেছ!' এমন মৃত্যুর তুলনা নেই। তাই ইচ্ছামৃত্যু।

পিতামহ ভীষ্ম কথা দিলেন, সময় হলেই তিনি নিজের বধের উপায় বলে দেবেন। আমরা যারা কুতর্কে জড়িয়ে এই মহাপ্রাণ মানুষটির নানা কাজের সমালোচনা করি, তখন যেন একথাটিও মনে রাখি—যাঁরা নিজের মৃত্যুর উপায় শত্রুদের বলে দেন তাঁরা মহামানব; আমাদের মতো ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ—নিত্য যারা মৃত্যুভয়ে ভীত—তাদের পক্ষে এইসব মৃত্যুঞ্জয় মহামানবের সমালোচনা করা শোভা পায় না।

সত্যসন্ধ ভীষ্মের কাছে ভীষ্মবধের পথ জানা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রণাম জানিয়ে যুধিষ্ঠির এবার উৎফুল্ল ভাইদের নিয়ে দ্রোণাচার্যের সামনে এসে প্রদক্ষিণ করলেন এবং নতজানু হলেন। দ্রোণাচার্যও প্রভূত খুশি। যুধিষ্ঠির জানালেন ঃ যুদ্ধ করার অনুমতি চাই, আর শত্রুজয় কেমন করে হবে? দ্রোণাচার্যও ভীষ্মের অনুরূপ কথা বললেন ঃ আমি দুর্যোধনের অর্থদাস। তবে আমি কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করলেও তোমার জয়ের আশা করব। আর স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁর মন্ত্রী তাঁর জয় হবেই ("ধ্রুবস্তে বিজয়ো রাজন যস্য মন্ত্রী হরিস্তব")। আর শোন, "যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।" এটি একটি অসাধারণ কথা। ধর্ম যেখানে সেখানে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ যেখানে সেখানেই জয়।

যুধিষ্ঠির তবু নড়ছেন না দেখে দ্রোণাচার্য বললেন ঃ আর কী চাও? উত্তর এল ঃ আপনাকে কেমন করে জয় করব? আপনার বধের উপায় বলুন ('বধোপায়ং বদাত্মনঃ')। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নই মনে মনে ভেবেছেন। বনপর্বে উত্তেজিত দ্রৌপদী, ভীমসেনদের সেকথা বলেওছেন। কৌরবদের রক্ষাকর্তারা যে সবাই অজেয়, সেকথা ভেবে তাঁর ঘুম হতো না। দ্রোণাচার্য বললেন ঃ অস্ত্র হাতে থাকলে আমি বধ্য নই। 'ন্যস্তশস্ত্রমচেতনম্'—অর্থাৎ অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতন হয়ে পড়লে যোদ্ধাদের কেউ আমাকে বধ করতে পারে। আর অস্ত্রত্যাগ? তা কেমন করে হবে? তা হবে, যদি অত্যন্ত গুরুতর অপ্রিয় বাক্য ('মহদপ্রিয়ম্') কোন শ্রদ্ধেয় পুরুষ আমাকে শোনায় ('শ্রদ্ধেয়বাক্যাৎ পুরুষাৎ')। পুনরায় প্রণত হয়ে যুধিষ্ঠির

সকলকে নিয়ে কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য যে অমর! ওদিকে দ্রোণাচার্য মরবেন যদি পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়, অথচ অশ্বত্থামা অমর। এইসব জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় যুধিষ্ঠির (যথার্থনামা) যুদ্ধক্ষেত্রে স্থিরমস্তিষ্কে বিচরণ করছেন। কৃপাচার্যের কাছে এসে প্রণাম, প্রদক্ষিণ শেষে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কী বলবেন? আচার্য যে বধ্য নন। জয় কি এখানে আটকে গেল? বিষাদে আকুলচিত্ত তিনি। অবশেষে চেতনা হারালেন ('নোবাচ গতচেতনঃ')। শেষে প্রাপ্তচেতন যুধিষ্ঠিরকে কৃপাচার্য বললেন ঃ রাজা! আমি অবধ্য—তথাপি তুমি যুদ্ধ কর এবং জয়লাভ কর। ("অবধ্যোঽহং মহীপাল যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি") অর্থাৎ আমাকে বধ না করেও তুমি জয় পাবে। শুধু তাই নয়, তুমি এসেছ যুদ্ধ করার সম্মতি নিতে। এতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি তোমার জয় কামনা করব—এই সত্য বললাম ("জয়ং তব...। আশাসিষ্যে সদোত্থায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে")।

এইবার যুধিষ্ঠির মামা (প্রকৃতপক্ষে নকুল-সহদেবের) শল্যের কাছে গেলেন। শল্য এমন সম্মান ভাগ্নের কাছে আশা করেননি। তা পেয়ে সমধিক খুশি। তিনি কী করতে পারেন তা জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির বললেন ঃ মামা, তুমি যুদ্ধের সময় কর্ণের বলহানি ঘটাবে ('সূতপুত্রস্য সংগ্রামে কার্যস্তেজোবধস্ত্বয়া')। শল্য কর্ণের সারথি হয়ে এই কাজ করবেন—এমন প্রতিজ্ঞা করলেন। সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ। যুধিষ্ঠির এবার ফিরে আসছেন। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, কর্ণ তুমি তো ভীষ্ম নিহত না হলে যুদ্ধ করবে না; তাহলে ভীষ্ম যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তুমি পাণ্ডবপক্ষে এসেই যুদ্ধ কর না কেন? কর্ণ উত্তরে বললেন ঃ কেশব, দুর্যোধনের কোন অপ্রিয় কাজ আমি করব না ("ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব")।

যুধিষ্ঠির এবার শেষ চমক দিলেন। উভয় সৈন্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন ঃ কেউ কি দলত্যাগ করতে চান? বিপক্ষের কেউ আমার সাহায্যের জন্য এলে তাকে সাদরে গ্রহণ করব।

একজন যোদ্ধাই শেষমুহূর্তে পাণ্ডবদলে যোগ দেন। তিনি দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু। তাঁকে গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, তুমি আমার জন্য যুদ্ধ কর। ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড এবং বংশরক্ষা তোমাতেই দেখা যাচ্ছে ("ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যতে")। অর্থাৎ নিজের জয় সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির নিশ্চিত। পাণ্ডবরা মহাত্মা; তাঁদের কালোচিত ব্যবহার, সৌজন্যবোধ, সাধারণের প্রতি কৃপা—এসব মহৎ গুণ দেখে সকলেই আনন্দিত। ধর্মরাজের আচরণে যুদ্ধক্ষেত্র সত্যিই যেন ধর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। এরপর শুরু হয় যুদ্ধ।

অর্জুনের বিষাদ এবং তার সঙ্গে গীতার প্রবচন যেমন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি যুধিষ্ঠিরের এই কালোচিত ব্যবহার এবং শিষ্টাচার আমাদের শ্রদ্ধানত করে। মানুষের ব্যবহার মানুষকে কোথায়, কোন্ সাফল্যে নিয়ে যায় তা দেখা গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য সকলেই একবাক্যে বলেছেন ঃ তুমি এই সম্মান না দেখালে আমি অভিসম্পাত দিতাম। শুধু শৌর্য, বীর্য, শক্তি, দক্ষতা দিয়ে ঐ প্রায়-চিরজীবীদের জয় করা যায় না। যুধিষ্ঠিরের অনুপম ব্যবহারই পাণ্ডবদের জয়লাভের মূলে। অর্জুন কঠোরস্বভাব, তবু আত্মীয়দের দেখে কোমল হয়ে গেলেন। আর কোমলস্বভাব যুধিষ্ঠির সেই আপনজনদের বধের উপায় জেনে নিলেন। এ কেমন কোমলতা?

সঞ্জয় এসব কথা শোনাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। গীতাতে (একাদশ অধ্যায়ে) শ্রীভগবান বলছেন ঃ "আমিই সবাইকে মেরে রেখেছি—অর্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।" আর এখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য সবারই কাছ থেকে জয়ের আশীর্বাদ এবং প্রতিশ্রুতিও পাণ্ডবরা প্রকাশ্যেই পেয়ে গেলেন। এরপর কী ঘটবে তা তো ধৃতরাষ্ট্র বুঝতেই পারছেন। স্বয়ং দুর্গাদেবীও ইতোমধ্যে অর্জুনকে সন্তুষ্ট করে গেছেন এবং জয়াশীর্বাদ করেছেন। যুদ্ধের আগেই ধৃতরাষ্ট্র এইসব কথা শুনলে ঘটনা-প্রবাহ কোন্ দিকে বইত তা বলা মুশকিল। আরো কথা। এসব শুনেও কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কোন উত্তর বা প্রশ্ন করছেন না। বিচলিত হচ্ছেন না। কেন? কারণ, তখন দশম দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং পিতামহ ভীষ্মের পতনও হয়ে গিয়েছে। এইসব ঘটনা পিতামহ ভীষ্মের পতনের পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছেন 'flash back'-এ। তখন আর ধৃতরাষ্ট্রের করার কিছু নেই—শুনে যাওয়া ছাড়া। মূল মহাভারত পড়তে পড়তে আমরা উদ্‌যোগপর্বে এসে হোঁচট খাই। বেদব্যাস নিজে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে চক্ষুদান করতে চাইলেন—যুদ্ধ দেখার জন্য। তিনি তা গ্রহণ না করে সঞ্জয়কে দান করতে বললেন। সঞ্জয় তা লাভ করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রও নিজের সন্তানদের জয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। এরপর হঠাৎ সঞ্জয় দশম দিনের শেষে দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বললেন ঃ মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে, শান্তনুপুত্র ভীষ্মের নিধন হয়েছে। হতবাক ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করলেন; কিন্তু নিজেদের জয় সম্বন্ধে তখনো তাঁর গভীর আশা—কারণ দ্রোণ, কর্ণ এঁরা সব আছেন। কিভাবে যুদ্ধ শুরু হলো, কিভাবে পিতামহ যুদ্ধ করলেন এবং নিহত হলেন তা সবিস্তার শুনতে চাইলেন তিনি। সঞ্জয়ও সেইভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শোনাচ্ছেন। এখানে সেজন্যই ধৃতরাষ্ট্র নীরব শ্রোতা। পাণ্ডবদের জয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও মন্তব্যহীন। ❑

[মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৪৩তম অধ্যায়কেন্দ্রিক এই আলোচনা]

পত্রলেখক-লেখিকাদের নিজস্ব মতামত এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে।
—সম্পাদক

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শব্দদূষণ চলছে

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে ২০০০ সালে জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে-আইন বলবৎ করার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন তা হলো—উৎসব, পূজা, মেলা, জনসভা, ক্লাব, বিবাহ, জন্মদিন, পারিবারিক বা ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদিতে ঢাকের বাদ্যি, মাইক, লাউড স্পিকার, ড্রাম, ড্রামপেট, বাজি, বোমা ইত্যাদির শব্দ ৬৫ ডেসিবেল তীব্রতার ঊর্ধ্বে যাবে না। এবং রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ঐসব বাজানো বা ফাটানো নিষিদ্ধ।

পুলিশ ও প্রশাসন কর্তারা উক্ত নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কার্যকর করাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুরের (গোঘাট থানা) কিছু লোক এবিষয়ে অসচেতনতাবশত অথবা ঐ আইনকে তোয়াক্কা না করে কান-ফাটানো শব্দ করে ও বাড়ি-কাঁপানো বাজি ফাটিয়ে প্রতিনিয়ত ঘরোয়া বা সার্বজনীন সকল অনুষ্ঠানে শব্দদূষণ দ্বারা নিজেদের বংশধরদের এবং আর সকলের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতিসাধন ও মস্তিষ্কের অপরিণততা বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা ঘটিয়ে চলেছেন। জানি না প্রশাসন কামারপুকুরের প্রতি এত উদাসীন কেন?

ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী
রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর, হুগলি-৭১২৬১২

প্রসঙ্গ 'টেপিওকা'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১২ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীকরুণাময় কোনার 'টেপিওকা' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা সঠিক নয়। 'টেপিওকা' কুল-জাতীয় ক্ষুদ্র অম্লমধুর দেশি ফলবিশেষ নয়, এটি 'Cassava' বা 'Monioc' নামক গাছের শিকড়চূর্ণ। এই শিকড় কাঁচা অবস্থায় বিস্বাদ ও বিষাক্ত। রোস্ট করার পর খাওয়ার উপযুক্ত হয়। আমরা বাল্যকালে, ষাট-সত্তর বছর পূর্বে জ্বরের উপশমে পালো বা সটিফুড খেয়ে পথ্য করতাম। 'টেপিওকা' সেই জাতীয় খাদ্যই।

অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রামকুণ্ড, বারাণসী-২২১০১০

প্রসঙ্গ 'শালগ্রাম শিলা ঃ প্রতীক, দর্শন ও বিজ্ঞান'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১২ সংখ্যার ৬০০ পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে প্রকাশিত ডঃ কমল নন্দীর 'শালগ্রাম শিলা ঃ প্রতীক, দর্শন ও বিজ্ঞান' আলোচনাটি প্রসঙ্গে এই চিঠি।

গণিতের যে ইংরেজি সূত্রটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে "Zero is lesser than the least number, one can think of"—এই বাক্যটি ভুল। কারণ, যেকোন ঋণাত্মক সংখ্যাই শূন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

আসলে সূত্রটি হলো ঃ "Positive infinity is greater than the greatest number one can think of and negative infinity is lesser than the least number one can think of."

অমরনাথ দে
দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সমাধান ঃ শব্দচেতনা (৫৭)

পাশাপাশি ঃ (১) রক্তবীজ, (৪) দেবীমন্যে, (৮) মহিষাসনা, (৯) নাশনম্, (১০) রাত্রি, (১১) বরদে, (১৪) বাহনং, (১৬) সংস্থিতা, (১৮) পরমা, (২০) দ্বিজ, (২২) দেবগণা, (২৩) রক্তভূতাসি, (২৫) পুংসাং, (২৬) হয়ানাশু।

ওপর-নিচ ঃ (২) জগাম, (৩) মহিষাসুর, (৪) দেবানাং, (৫) মহাসুরাভ্যাং, (৬) পাপনাশিনি, (৭) পানপাত্রং, (১২) দেবাশ্চ, (১৩) প্রতাপ, (১৫) নতভুবং, (১৬) সর্বজগতাং, (১৭) বিষাণাভ্যাঞ্চ, (১৯) রক্তভূতানি, (২১) শরণং, (২৪) সিংহ।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

সন্ধ্যা চক্রবর্তী, মোহিতরঞ্জন দাস, মণিকুন্তলা ভৌমিক, পিনাকীকিঙ্কর নন্দী, স্বামী আনন্দ, সৈকত হাজরা, গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা অধিকারী, কৃষ্ণ মণ্ডল, যূথিকা গাঙ্গুলি, রুণা রায়চৌধুরী, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, রামেন্দু মিশ্র, ইলা কুন্ডু, কার্তিক কোলে, চণ্ডীদাস গাঙ্গুলি, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পুতুল পালচৌধুরী, অণিমা সর্বাধিকারী, রণদেব ভট্টাচার্য, কার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য-কাব্যতীর্থ, দেবাশিস বাগচী, গীতা দাশগুপ্ত, কল্পনা চৌধুরী, শুভেন্দু বসাক, অর্জুনচন্দ্র বেরা।

বিশ্ব সমস্যার প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অমেয়ানন্দ*

স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী মায়ের মন্দির দর্শন করতে গিয়েছেন। মন্দিরের ধ্বংসাবস্থা দেখে তাঁর মনে খুব আক্ষেপ। ভাবলেনঃ "আমি থাকলে দেখতাম কে এই মায়ের মন্দির ধ্বংস করে!" তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হলো—মা ক্ষীরভবানী বললেনঃ "তুই রক্ষা করার কে? আমি তোকে রক্ষা করছি, না তুই আমায় রক্ষা করছিস?" স্বামীজী বুঝলেন, মায়ের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। একটু বিচার করলে বুঝতে পারা যায়, সব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সমাধানের অর্থ সাম্যে পৌঁছানো। কিন্তু বৈষম্য থেকে সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টি থাকলে বৈষম্য থাকবেই। অতএব সব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। এ শুধু পাঞ্চভৌতিক স্থূলজগতের কথা নয়, মনুষ্যসমাজও একই নিয়মের অধীন। স্বামীজীর চিন্তায় জ্ঞানশক্তি, রাজশক্তি, সম্পদশক্তি ও শ্রমশক্তি ক্রমান্বয়ে চক্রবৎ মনুষ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করে সমাজকে যেদিকে চালায় সমাজ সেদিকে চলে। তাই তিনি বলেছেন—ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়-যুগের সভ্যতা, বৈশ্য-যুগের ভাবের আদান-প্রদান ও শূদ্র-যুগের সাম্যের আদর্শ থাকবে, অথচ এই চারশক্তি শোষণের অস্ত্র হবে না—এরূপ পরিকল্পনায় যে-রাষ্ট্র বা সমাজ গঠন হবে, সেটি হবে আদর্শ রাষ্ট্র বা আদর্শ সমাজ। অবশ্য স্বামীজী তার প্রায়োগিকতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এরূপ রাষ্ট্র হলেও সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। প্রত্যেক নাগরিকের প্রাকৃতিক নিয়মে একই মানসিকতা ও আত্মিক বিকাশের পূর্ণতার অভাব থাকবেই। তবে এরূপ রাষ্ট্র গঠন হলে সব সমস্যার সমাধান না হলেও বেশির ভাগ সমাধান হবে অর্থাৎ মানুষের যত বেশি আত্মিক বিকাশ ঘটবে সমস্যা তত কমে আসবে। এপ্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই হতে পারে—সমস্যাগুলি কি? রাষ্ট্র, সরকার ও নাগরিকের দায়িত্ব কি? বাস্তবে কি হচ্ছে? সমাধান কি?—এই চারটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অগ্রসর হব।

■ **সমস্যাগুলি কি?**

এককথায় সমস্যার অন্ত নেই। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র, আন্তঃ-রাষ্ট্র ইত্যাদি বিশ্বের সর্ব পর্যায়ের সমস্যা। এই বহুবিধ সমস্যায় বিশ্বের মানুষ আজ জর্জরিত, ক্লান্ত ও দিশাহারা। এবিষয়ে বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রতিটি মানুষ এক এক পদক্ষেপে সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের মনীষীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, ধর্মীয় মহাপুরুষরা আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দ্বারা, জড়বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দ্বারা নানাভাবে সমাজের সর্ব পর্যায়ের মানবকল্যাণে কাজ করে আসছেন। এতে অনেক সমাধান হলেও মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ বা সমস্যার সমাধান হওয়ার মতো সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হয়নি। একমাত্র পৃথিবীর সব দেশের সেরা এই ভারতবর্ষ সেই পথ আবিষ্কার করে থাকলেও বর্তমানে তপস্যা বা অনুশীলনের অভাবে ভারতবাসীর সেই জ্ঞানশক্তি ক্ষয় হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বহুবিধ সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতবাসী তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান জানে না ও জানার ইচ্ছা করে না। অথচ স্বামীজী বলেছেনঃ "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" সারা বিশ্বের মানুষ তাকিয়ে আছে এই সুন্দর দেশ ভারতের দিকে। অতএব ভারতবাসীকে তাদের ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, তাদের পূর্বপুরুষদের সাধনলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে হবে, কারণ, 'নান্যঃ পন্থা'। মাত্র দুটি সমস্যার সমাধান হলে বাকি সব সমাধান এমনিতেই হতে পারে। সেই সমস্যা-দুটি কি? প্রথম—আদর্শগত সমস্যা; দ্বিতীয়—সুস্থ মানসিকতার অভাব।

মনে হতে পারে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে কিছুই হওয়ার আশা নেই। স্বামীজী বলেছেনঃ বিশ্বের সমস্ত ধন দিয়ে একটি গ্রামের অভাব মেটানো সম্ভব নয়—যদি না মানুষের মনের অভাব মিটে যায়। আজ পৃথিবীতে যা সম্পদ আছে তাতে কোন মানুষেরই তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা নয়। বিশ্বের সব রাষ্ট্রের অধিনায়করা ইচ্ছা করলেই মিলিতভাবে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি যথা—অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সে-মানসিকতা কোথায়? সেইজন্য আদর্শগত সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। স্বামীজী বলেছেনঃ "আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক সংবিধান—ইহাই এযুগের মূলমন্ত্র।" রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা যদিও এর সূচনা করেছে, তবুও যতদিন বৃহৎ দেশগুলির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে ততদিন কিছুই হওয়ার উপায় নেই।

● **আদর্শগত সমস্যাঃ**

(ক) এই সমস্যার প্রথম সোপান কোন মত বা ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের, রাষ্ট্রের বা সরকারের সংবিধান তৈরি হওয়া উচিত নয়।

(খ) বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব বিকাশের সাধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ভাবে শারীরিক,

* *অধ্যক্ষ, মাতৃমন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশন সারদা সেবাশ্রম, জয়রামবাটী।*

মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা তথা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকবে।

(গ) মনুষ্যত্বই সকলের ধর্ম। এক জাতি—মানুষ, এক সমাজ—মানুষের সমাজ, এক দেশ—সমগ্র বিশ্ব। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সব ধর্মের স্থান থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে একমাত্র মনুষ্যত্বের ধর্মের ভিত্তিতে গঠন হবে সংবিধান।

(ঘ) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধর্মের তুলনামূলক শিক্ষা সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক। "সবার উপরে মানুষ সত্য" অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা পূর্ণজ্ঞান লাভই এই শিক্ষার তাৎপর্য।

স্বামীজীর ভাষায় মনুষ্যত্ব বলতে বোঝায়—"Each soul is potentially divine." অর্থাৎ প্রত্যেক জীব অব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ। এখানে 'divine' শব্দের অর্থ পূর্ণ জ্ঞান—যে-জ্ঞানে জাতি, ধর্ম, দেশ, সমাজ প্রভৃতি কোনপ্রকার বন্ধন থাকে না। একমাত্র নীতির বন্ধন থাকে। তাই স্বামীজী আবার বলেছেনঃ "Religion is the manifestation of the Divinity already in man." আর এই পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশসাধনের নাম ধর্ম। পূর্ণ জ্ঞানের ফলশ্রুতি—তাঁর কোন অভাব থাকবে না, প্রশ্ন থাকবে না, সংশয় থাকবে না; তিনি আত্মানন্দে ভরপুর থাকবেন। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের যথাযথ আচরণ এবং বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি মানবসমাজকে এমন এক চিরায়ত সত্য তথা আদর্শের দিকে পরিচালিত করে যা মানুষকে উদার হতে বলে, গোঁড়ামি ছাড়তে শেখায়, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান দেয়, সমন্বয়ের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে ও বিশ্বের সকল মানুষকে ভাই বলে গ্রহণ করে—এ হেন জ্ঞানলাভের শিক্ষা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বই আদর্শগত সমস্যার একমাত্র সমাধান।

● সুস্থ মানসিকতার সমস্যা ঃ

যে-মানুষ নিজের মনের গতিবিধি সম্বন্ধে সচেতন, নিরপেক্ষ, পরিণাম বিচারশীল, শুদ্ধ মনের স্বরূপ অবগত, দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ ভালমন্দ সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত, কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্কাম—সেইরূপ মনের অবস্থাকে বলে সুস্থ মানসিকতা। যে-মানুষ উক্ত গুণগুলি অর্জন করতে পারে, সে-ই সুস্থ মানসিকতার অধিকারী। সংস্কারমুক্ত মন না হলে সুস্থ মানসিকতা লাভ করা যায় না। সুস্থ মানসিকতার অপর নাম সাত্ত্বিক মন। সেইজন্য সাত্ত্বিক ভাবের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির সমাজে সুস্থ মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

■ রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকের দায়িত্ব কি?

ট্রামে, বাসে সর্বত্র একটি কথা প্রায়ই আলোচনা হয়ে থাকে—মানুষের নৈতিক মান এত নেমে গেছে যে, কিছু হওয়ার উপায় নেই! অপর পক্ষ বলেন, সরকার এজন্য দায়ী। সরকারকে দায়ী করার অর্থ নিজের কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? কারণ, সরকার একটি যন্ত্রমাত্র। আইন-মাফিক শাসন করাই সরকারের কাজ। বিকল যন্ত্র যেমন কাজ করে না, তেমনি সরকার বিকল হলে সুশাসন হবে না। কিন্তু তাতে সংবিধানের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। রাষ্ট্রপ্রধানরা যেমন সংবিধান রচনা করেন, সরকারকে তাই মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রনায়করা যদি সার্বিক কল্যাণের কথা সঠিক না ভেবে সংবিধান রচনা করে থাকেন, তার জন্য দায়ী কে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বাধীনতার আগে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। আর বর্তমানে এই দেবভাষার চর্চা প্রায় বন্ধ। অথচ ত্রিকালদর্শী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "ভাষা-সমস্যার একমাত্র সমাধান সংস্কৃতভাষা।" বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া নয়, মানবকল্যাণমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। ভাল ভাল কল্যাণমূলক চিন্তা গ্রহণ করার জন্য যেকোন ভাষা পড়া যেতে পারে। তবে সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে বলার উদ্দেশ্য, এই ভাষায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ইংরেজি ভাষায় জড়বিজ্ঞান জগতের চিন্তারাশি বিশেষ প্রকাশ হয়েছে। তাই ইংরেজি ভাষাও সকলের শিক্ষা করা প্রয়োজন। অনেকে উর্দুভাষা চর্চার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। ভাষা যাই হোক না কেন, আদর্শ শিক্ষাই মানব-সমাজের মেরুদণ্ড। অতএব সর্বাগ্রে রাষ্ট্রনায়কদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার। তবেই আদর্শ সংবিধান রচনা হবে। আদর্শ সংবিধান হলে আদর্শ রাষ্ট্র তৈরি হবে। আদর্শ রাষ্ট্র হলে আদর্শ সরকার হবে। তাহলে আদর্শ নাগরিক নির্মাণে তাঁরা যত্নবান হবেন।

● রাষ্ট্র, সরকার ও নাগরিকের দায়িত্ব ঃ

কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত কোন ক্রিয়ার দ্বারা যেন দেশের বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি না হয় সেবিষয়ে সকলের সর্বদা সজাগ থাকা দরকার। সুশাসন যেমন আদর্শ সরকারের পরিচায়ক, স্বশাসন তেমনি আদর্শ নাগরিকের পরিচায়ক। আদর্শ মানুষই পারে নিজেকে শাসন করতে। যে-দেশের মানুষ নিজেকে নিজে শাসন করতে পারে, সেই দেশের মানুষ ও সেই দেশ তত উন্নত। অতএব রাষ্ট্রের দায়িত্ব আদর্শ সংবিধান তৈরি করা। সরকারের দায়িত্ব সুশাসন করা ও ব্যক্তির দায়িত্ব স্বশাসন করা। বিশ্বে এমন একটি সংবিধান হওয়া প্রয়োজন যাতে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ এক ছত্রছায়ায় স্থান পায় ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে পূর্ণজ্ঞান বা সার্বিক মনুষ্যত্বের বিকাশই হাতিয়ার।

■ বাস্তবে কি হচ্ছে?

বিশ্বনায়কদের মধ্যে অহমিকার লড়াই, সাম্রাজ্য গ্রাসের ক্ষুধা, একে অপরের বিনাশসাধনে আণবিক অস্ত্রের আবিষ্কার, প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েও গরিব দেশগুলির প্রতি নির্দয়—এইগুলিই বড় বড় রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের শান্তির প্রচেষ্টা মেকি। স্বামীজী বলছেনঃ "হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে... তোমরা কি এইসকল কথা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে?... যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।" যদিও ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্য করে স্বামীজী কথাগুলি বলেছেন, তথাপি সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি তাঁর হৃদয়ের এই আকুল বেদনা—এরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

■ সমাধান কি?

স্বামীজীর মতে, একমাত্র শিক্ষাই পারে সব সমস্যার সমাধান করতে। যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে—এইরকম শিক্ষা চাই। স্বামীজী বলেছেনঃ "It is man-making education all round that we want." মানুষ গড়া তো দূরের কথা, আজ ছাত্রসমাজ রাজনীতির বলি, নেতিবাচক শিক্ষায় হতাশাময় জীবনধারণে বিতৃষ্ণ! যুবকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্বাধীনতার পর রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কমিশন হয়ে গেল। এসমস্ত প্রচেষ্টার জন্য সরকার প্রশংসার পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও পর্যন্ত এব্যাপারে সর্বভারতীয় স্তরে সামগ্রিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এমনকি শিক্ষার কোন নির্দোষ সংজ্ঞা নিরূপিত হয়নি। স্বামীজী শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ "Education is the manifestation of the perfection already in man." অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে-পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তার বিকাশ। এখন প্রশ্ন, পূর্ণতা বলতে কি বোঝায়? শরীর, মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশের নামই পূর্ণতা। সুস্থ ও সবল রাখাই শারীরিক পূর্ণতা। যে-বুদ্ধিতে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বোঝা যায়, তা-ই বুদ্ধির পূর্ণতা। আর যে-জ্ঞানের সাহায্যে সত্যস্বরূপ 'আমি কে?'—এই ধারণা হয় ও মানুষ পরমানন্দের অধিকারী হয়, তা-ই জ্ঞানের পূর্ণতা। শুধু ব্যক্তিচরিত্র নয়, সমষ্টিচরিত্র এই একই খাতে প্রবাহিত করার কঠিন কাজে প্রয়াসী হতে হবে।

এই শিক্ষার মধ্যে সব ধর্মকে প্রথম স্থান দিতে হবে। সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার থাকবে। নিজ নিজ ধর্মের অনুশীলনের দ্বারা জ্ঞানলাভ করবে, যে-জ্ঞান কোন মহাপুরুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ। সব ধর্মমতেই গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা রয়েছে। তাই তাদের ভাল দিকগুলি নিয়ে দোষগুলি বাদ দিতে হবে। স্বামীজী ধর্মের গোঁড়ামি প্রভৃতি দূর করার জন্য বলছেনঃ "Vedantic brain and Islamic body." অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক অর্থাৎ চিন্তাধারা ও মুসলমান সমাজের উদার ভাবে একটি নতুন মনুষ্যসমাজ গঠন করতে হবে। শুধু বেদান্ত ও মুসলমান ধর্ম নয়, সব ধর্মের সুন্দর সুন্দর ভাবগুলিও নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সর্ব ধর্মের একটি সাধারণ ভিত্তি তৈরি করার জন্য স্বামীজী বলেছেনঃ "The Vedanta only can be the universal religion. Why? Because not only of its tolerance but acceptance also." অর্থাৎ একমাত্র বেদান্তই বিশ্বজনীন ধর্মের যোগ্যতা রাখে; কারণ, সব ধর্মের সীমাবদ্ধতাকে সে শুধু সহ্য করে না—অন্য ধর্মের ভাল দিকগুলিকেও গ্রহণ করে। প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ—দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। এখানে কেবল দার্শনিক দিক লক্ষ্য করেই স্বামীজী ধর্মের সাধারণ ভিত্তি রচনা করতে চাইছেন। কারণ, বেদান্ত দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধারায় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা করবে; তাতে কোন বাধা নেই। যেমন খ্রিস্টান নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে, মুসলমান নমাজ পড়ে ও হিন্দুরা পূজা করে। এইগুলির কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ একই বস্তু চৈতন্য সত্তা স্বয়ম্প্রকাশ—এটিই সর্বধর্মের সাধারণ ভিত্তি। নিরপেক্ষভাবে যুক্তিভিত্তিক সর্বধর্মের সমন্বয়সাধনই এই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য। তাহলে ধর্ম নিয়ে মনুষ্যসমাজে আর সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

অর্থকরী শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেনঃ "আমাদের চাই কি জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরাজী আর বিজ্ঞান পড়ানো চাই। কারিগরি শিক্ষা চাই, যাতে শিল্প বাড়ে, লোকে চাকুরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"

উপসংহারে বলা চলে, আজ পর্যন্ত মানবকল্যাণে যেসব দার্শনিক চিন্তার বিকাশ হয়েছে, সব দেশের মনীষীরা মিলিতভাবে সেই চিন্তাগুলি একত্র করে শিক্ষা বিষয়ক একটি সূত্র ও পদ্ধতি রচনা করে তা শিক্ষার মাধ্যমগুলিতে প্রয়োগ করা এযুগে বিশেষ প্রয়োজন—যাতে সব মানুষে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একই ছত্রছায়ায় শান্তিতে, আনন্দে এবং বৃহৎ পরিবারে বসবাস করতে পারে। সেদিকে সমাজের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া, সহনশীলতা, উদারতা ও সর্বোপরি ভালবাসাই এই শিক্ষার মাপকাঠি। ❑

'জ্বলিছে ধ্রুবতারা'

তন্ময় ধর*

ধ্রুবতারা। উত্তর আকাশের স্থির তারকা। তাকে ঘিরে পৃথিবীর আকাশের সমস্ত নক্ষত্র সারারাত্রি ধরে আকাশ পরিক্রমা করে চলে। স্থির, অচল ধ্রুবতারকা তাই স্মরণাতীত কাল থেকে পরিচিত পৃথিবীর মানুষের কাছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বিভিন্ন জনজাতির উপকথায়, গল্পে, ধর্মগ্রন্থে ধ্রুবতারা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী। প্রাচীনকালে নানা জনে ধ্রুবতারাকে বলেছে দিগ্‌দর্শী তারা, চালিকা নক্ষত্র, নৌ তারকা, সমুদ্র তারকা ইত্যাদি। চিনদেশে ধ্রুবতারাকে কল্পনা করা হতো দেবীরূপে। আবার গ্রিক নাবিকরা ধ্রুবতারাকেই বলতেন 'কাইনোসৌরা' (Kynosoura—the dog's tail) যা থেকে পরে ইংরেজিতে 'Cynosure' শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ—'যে কেন্দ্রীয় অবস্থানে থেকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে'।

কিন্তু ধ্রুবতারার কেন এই স্থিরতা, কেন এই ধ্রুবত্ব? খুবই সহজ উত্তর—পৃথিবীর অক্ষ আর ধ্রুবতারা একই রেখায় অবস্থিত। তাই পৃথিবী ঘুরে চললেও, পৃথিবীর আকাশে সমস্ত তারা স্থান পরিবর্তন করলেও পৃথিবীর অক্ষরেখার ওপর থাকা ধ্রুবতারা স্থির। তবু ধ্রুবতারা চিরস্থির নয়, সেও স্থান পরিবর্তন করে। তবে দু-দশ বছরে নয়, প্রায় ৩,০০০ বছর অন্তর অন্তর প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন ধ্রুবতারার। এর কারণ হলো, পৃথিবীর অক্ষরেখা অল্প অল্প করে সরে যায়। প্রায় ২৫,৮০০ বছর পর পৃথিবীর অক্ষরেখা সরতে সরতে একটি পূর্ণচক্র সম্পূর্ণ করে আগের অবস্থানে ফিরে আসে। পৃথিবীর অক্ষরেখার এই গতিকে বলা হয় 'সূক্ষ্মগতি' (precession)। এই সূক্ষ্মগতি নিয়ে আমরা পরে বিশদভাবে জানব। তার আগে ধ্রুবতারার ইতিহাসটা একটু দেখে নেওয়া যাক। ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো যে-ধ্রুবতারার কথা পাচ্ছি, তার নাম 'থুবান' (Thuban বা α-Draconis)। কালেয় নক্ষত্রমণ্ডলের (Constellation Draco) সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা এটি। বর্তমান ধ্রুবতারা (Polaris) থেকে একটু দূরেই এখন একে দেখা যায়। মিশরের পিরামিডে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই থুবানের কথা উৎকীর্ণ হয়েছে। মিশরীয়রা 'থুবান' শব্দটি সম্ভবত ভারতীয় 'ধ্রুবান' শব্দ থেকে সংগ্রহ করেছিল। ঐসময়ে ঋগ্বেদে ঐ ধ্রুবতারার নাম 'প্রচেতা' বা 'ধ্রুব'। খ্রিস্টপূর্ব ২,৮০০ অব্দে ঐ তারাটি ভূমেরুর ওপর সবচেয়ে ভাল অবস্থানে এসেছিল। প্রায় ৩,০০০ বছরে থুবান মেরুতারকার ধ্রুব অবস্থান থেকে একটু একটু করে সরতে থাকে। খ্রিস্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে নতুন তারা 'পোলারিস' (Polaris) ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করে। এটি লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল বা শিশুমার মণ্ডলের (Constellation Ursa Minor) সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। বর্তমানের এই ধ্রুবতারাটি আগামী ২,১০০ খ্রিস্টাব্দে ভূমেরুর ওপর সবচেয়ে ভাল অবস্থানে থাকবে।

বর্তমান ধ্রুবতারাটি সম্পর্কে আরো একটু বিশদভাবে জানা যাক। এটি হলুদবর্ণের দানবাকৃতি তারা। সূর্যের চেয়ে ৫০ গুণ বড় হওয়ায় এটি সূর্যের তুলনায় ২,৫০০ গুণ বেশি আলো দেয়। যেহেতু এই তারাটি বহু দূরে, প্রায় ৪৩০ আলোকবর্ষ (১ আলোকবর্ষ = ৯,৫০,০০০ কোটি কিলোমিটার) দূরে, তাই একে আমরা একটি সাধারণ উজ্জ্বলতার তারা হিসাবে দেখি। ধ্রুবতারা দ্বিতীয় প্রভার তারা। কোন নক্ষত্রের প্রভা (magnitude) বলতে বোঝায় যে কতখানি উজ্জ্বল সেটা। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর প্রথম যে-তারাগুলি আকাশে দৃশ্যমান হয়, তারাই সবচেয়ে উজ্জ্বল, তাদের বলা হয় প্রথম প্রভার তারা। এরপর আরেকটু আঁধার ঘনালে যথাক্রমে আবির্ভূত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভার তারারা। এমনি করে ষষ্ঠ প্রভা পর্যন্ত তারাদের আমরা দেখতে পাই। তবে ধ্রুবতারার ঔজ্জ্বল্য কিন্তু বাড়ে কমে। ধ্রুবতারার একটা অনুজ্জ্বল সঙ্গী তারা (Companion Star) রয়েছে, যেটাকে দূরবিন ছাড়া দেখা যায় না। ধ্রুবতারা আর ঐ সঙ্গী তারাটি পরস্পরের চারদিকে পাক খায় প্রতি হাজার বছরে একবার।

এবার জানা যাক আগামী দিনের ধ্রুবতারাদের কথা। বর্তমানের ধ্রুবতারা 'পোলারিস' আরো প্রায় দুহাজার বছর তার ধ্রুবত্বের আসন ধরে রাখতে পারবে। এরপর ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করবে বর্ষপর্ব মণ্ডলের (Constellation Cepheus) তারা 'আলরাই' (Alrai বা γ-Cephi)। আজ থেকে ৪,০০০ বছর পরে ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করবে ঐ নক্ষত্রমণ্ডলেরই তারা 'অগ্নিসম' (Alpirk বা β-Cephi) আর ৫,৫০০ বছর পরে ঐ নক্ষত্রমণ্ডলেরই সাধিষ্ঠান (Alderamin বা α-Cephi)। তবে বিভিন্ন সময়ে হওয়া বিভিন্ন ধ্রুবতারার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উজ্জ্বল হবে বীণামণ্ডলের (Constellation Lyra) তারা 'অভিজিৎ' (Vega)। আজ থেকে প্রায় ১২,০০০ বছর পরে অভিজিৎ

** লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবহবিদ্যায় এবং বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্মান লাভ করেছেন। সময়ের অনন্ত যাত্রাপথে মানুষ তার সঙ্গী হতে চেয়েছে। নতুন নতুন রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মানুষ কালের যবনিকা ভেদ করতে উদ্যত হয়েছে। মানুষের সেই বেপরোয়া অভিযাত্রা বিধৃত হয়েছে বর্তমান রচনায়।—সম্পাদক*
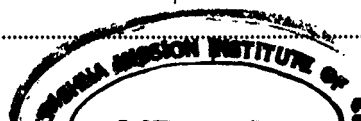
ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করবে। এমনি করে বিভিন্ন তারার পথ ঘুরে ধ্রুবতারার আসন আবার আসবে বর্তমান তারা 'পোলারিস'-এর দখলে আজ থেকে প্রায় ২৫,৮০০ বছর পর।

যে-কারণে ধ্রুবতারার এই পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পৃথিবীর সূক্ষ্মগতি (precession), তার কথায় এবার আসা যাক। আমরা জানি, পৃথিবীর মেরুদেশ বেশ কিছুটা চাপা। উলটো কথায় বললে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত ভরের যেন একটা 'বেল্ট' হয়ে রয়েছে, অনেকটা মানুষের উদরে মেদ জমা হওয়ার মতো। পৃথিবীর ঐ বাড়তি ভরের বেল্টটা মোটামুটিভাবে ২১ কিলোমিটার পুরু। এই বাড়তি বেল্টটাই তৈরি করছে পৃথিবীর সূক্ষ্মগতির অর্থাৎ লাট্টুর মতো হেলেদুলে ঘোরার ব্যাপারটা।

এখন আমাদের দেখতে হবে পৃথিবীর ওপর সূর্যের টান। ২১ মার্চ আর ২১ সেপ্টেম্বর কোন সমস্যা নেই, সূর্য থাকছে একেবারে নিরক্ষরেখার ওপর। সূক্ষ্মগতি থাকছে না। কিন্তু ২১ জুন কর্কটক্রান্তিতে সূর্য থাকে নিরক্ষরেখা থেকে অনেক উত্তরে। এইসময়ে ভাবা যাক বাড়তি ভরের ঐ নিরক্ষীয় বেল্টটির কথা। বেল্টটি সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকবে নিম্নমুখে আর সূর্যের আকর্ষণ বল সেটাকে টানতে থাকবে নিজের দিকে। আর এই টানের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেটা হলো বেল্টটির ঊর্ধ্বমুখী অংশটাকে ঐ টান চাইবে চ্যাপটা করে দিতে। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে ঐ বেল্টের যে-অংশটি সেটির কথা যদি ভাবি, সেখানেও টানের প্রভাব ঊর্ধ্বমুখী; কিন্তু তার ফলেই বেল্টটি চ্যাপটা করার টান আর বেল্টকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার টান পরস্পরকে প্রায় বাতিল করে ফেলে। পুরো বাতিল করতে না পারার কারণ হলো, বেল্টের সূর্য-নিকটবর্তী প্রান্ত এবং সূর্য থেকে দূরবর্তী প্রান্ত—এই দুই অংশে টানের পার্থক্য। যেহেতু মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পার্থক্যটা ঘটে থাকে। আর ঐ রয়ে যাওয়া সামান্য টানটুকুই পৃথিবীর অক্ষরেখাকে ধীরে ধীরে কাঁপাতে থাকে।

কিন্তু এতক্ষণ আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিনি—তা হলো চাঁদের টান। চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর নিরক্ষীয় তল থেকে বাইরের দিকে ঝোঁকা, তার ওপর কক্ষপথের আনতি (inclination) সূর্যের আপাত পথ (ecliptic) থেকে প্রায় ৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। সূর্য আর চন্দ্রের মিলিত প্রভাবে পৃথিবীর সূক্ষ্মগতি অর্থাৎ অক্ষরেখার কম্পনের মান দাঁড়ায় ৫০.৩৯ সেকেণ্ড অফ আর্ক প্রতি বছর। আবার সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের (বৃহস্পতির প্রভাবই এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি) প্রভাবে পৃথিবীর এই সূক্ষ্মগতির মান কমে দাঁড়ায় ৫০.২৯ সেকেণ্ড অফ আর্ক প্রতি বছর। আর তাতে পুরো একটি ঘূর্ণনচক্র (cycle of precession) সম্পূর্ণ করতে পৃথিবীর সময় লেগে যায় ২৫,৮০০ বছর। তাই ধ্রুবতারকাচক্রের ওপর অবস্থিত কোন তারা ২৫,৮০০ বছর পর পর তার ধ্রুবতারার আসন অধিকার করে।

পরিশেষে আবার ফেরত আসি জনশ্রুতি ও শাস্ত্রে। ধ্রুবতারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী নিঃসন্দেহে ফিনিশীয় শামান (Shaman) উপকথা 'কালেভালা' (Kalevala)-এর অন্তর্গত সাম্পো অপহরণ (The theft of Sampo), যেখানে রয়েছে এক ধ্রুবতারা থেকে অন্য ধ্রুবতারায় পরিবর্তনের কথা। 'কালেভালা'র পরবর্তী অধ্যায়ে 'সাম্পোর জন্য সমুদ্র যুদ্ধ' (Sea fight for the Sampo) থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সাম্পোই ধ্রুবতারা।

ভারতে ধ্রুবতারার কথা বর্ণিত হয়েছে সেই ঋগ্বেদের কাল থেকে। ঋগ্বেদে কালেয় নক্ষত্রমণ্ডলের নাম প্রচেতানক্ষত্রধারা। খ্রিস্টজন্মের ৫,১৬০ বছর আগে এই প্রচেতানক্ষত্রধারা ভূমেরু অতিক্রম করে এবং এর এক-একটি তারা ধ্রুবতারার স্থান নিতে থাকে। প্রচেতানক্ষত্র মেরুতারকার স্থান অধিকারের প্রায় ৯০০ বছর পর ঋগ্বেদ সঙ্কলন শুরু হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তে আমরা পাই—"বস্ব বিশ্বা বার্য্যাণি প্রচেতঃ সত্যা ভবন্ত্বাশিষো নো অদ্য।" অর্থাৎ বিশ্বের কেন্দ্রস্থিত বরণীয় প্রচেতানক্ষত্র আজ আমাদের সত্যের আশিসস্বরূপ হও।

আবার মৎস্যপুরাণে (১২৭।২৫-২৬) দেখি :

"নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ॥
তন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রভূতা দিবি স্থিতাঃ।
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাশ্চৈব ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্॥"

—নভোমণ্ডলে নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাগণ এরই [ধ্রুবতারারই] অভিমুখে চক্রাকারে অবস্থান করে। নভোমণ্ডলে ধ্রুবই এদের মেধীস্তম্ভসদৃশ [অর্থাৎ শক্ত খুঁটির মতো] অবলম্বন; ধ্রুবকেই এরা প্রদক্ষিণ করে।

মৎস্যপুরাণে বর্ণিত এই ধ্রুবতারা কিন্তু বর্তমান শিশুমার মণ্ডলের তারাটিই। একেই উত্তানপাদের পুত্র বলা হয়েছে, যেহেতু শিশুমার মণ্ডলের আকৃতি একটি ওলটানো পায়ের বা হাঁটু ভাঁজ করা মানুষের মতো। ধ্রুবের সিংহাসনলাভ প্রকৃতপক্ষে মেরুতারকার আসনলাভ করা।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইতিহাসে, উপকথায়, সমাজমানসের স্মৃতিতে যে ধ্রুবতারার কাহিনী জেগে আছে তা থেকে কী জানা গেল? জানা গেল যে, মানুষ কখনো অন্ধবিশ্বাসে সত্যকে আঁকড়ে ধরেনি। নিরন্তর পরীক্ষায়, পর্যবেক্ষণে সে জানতে চেয়েছে চিরন্তন সত্যকে। তাই ধ্রুবতারার ইতিহাস মানবমনীষার গতিময়তারই ইতিহাস। আবার, তা যতখানি ইতিহাস, প্রায় ততখানিই বিজ্ঞান। ❑

সহজ ব্যাখ্যায় ষড়্‌দর্শন

ডঃ শ্রীজয় ভট্টাচার্য

হিন্দু ষড়্‌দর্শন • লেখক : স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী • প্রকাশক : জয়দীপ রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস্‌, বাকসাড়া, হাওড়া • মূল্য : ৪৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১১২ • প্রকাশকাল : কল্পতরু উৎসব ২০০৪

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার কালো মেঘে দার্শনিক উচ্চ চিন্তাগুলি কিছুটা ম্লান বলে প্রতীয়মান হলেও সুধীসমাজের দুশ্চিন্তার তেমন কোন কারণ ঘটেনি। দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শন, তার নিজস্ব মূল্যেই মূল্যবান। কালো মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলেও সূর্য যেমন থাকে অমলিন, তেমনি আজকের দিনেও ভারতীয় দর্শন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অপেক্ষা শুধু মেঘ সরে যাওয়ার। এমনই শুভ ইঙ্গিত সুধীসমাজের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন করেছে প্রাচী পাবলিকেশনস্‌ তার সদ্য প্রকাশিত একখানি চমৎকার দার্শনিক গ্রন্থের মাধ্যমে। গ্রন্থটি হলো **'হিন্দু ষড়্‌দর্শন'**, তার রচয়িতা স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। গ্রন্থটি আদ্যন্ত একটি দার্শনিক গ্রন্থ হলেও দার্শনিক আলোচনার আপাতকাঠিন্যকে দূরে সরিয়ে রসের ধারা বইয়ে দিতে পেরেছেন মনস্বী লেখক। দর্শনের এমন সুখপাঠ্য গ্রন্থ সত্যিই বিরল।

মূল গ্রন্থটিতে আলোচিত দার্শনিক বিষয়গুলির কথা বলার আগে গ্রন্থটির নাম এবং গ্রন্থকর্তার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে নেওয়া ভাল। ভারতীয় দর্শনের মূল দুটি শাখা হলো 'নাস্তিক' এবং 'আস্তিক'। এখানে 'নাস্তিক' ও 'আস্তিক' কথাদুটি পারিভাষিক অর্থেই গ্রাহ্য। বেদপ্রামাণ্যে অবিশ্বাসী দর্শন হলো নাস্তিক দর্শন এবং বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী দর্শনই হলো আস্তিক দর্শন। নাস্তিক দর্শন মূলত তিনটি—চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন। পক্ষান্তরে আস্তিক দর্শন হলো ছয়টি—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা। বলা বাহুল্য, ছয়টি আস্তিক দর্শনই এই গ্রন্থে মূলত গৃহীত হয়েছে। বেদ হিন্দুধর্মগ্রন্থ। তাই বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী পূর্বোক্ত ছয়টি দর্শন 'হিন্দু ষড়্‌দর্শন' নামে পরিচিত, অন্যদিকে নাস্তিক তিনটি দর্শনই কার্যত অহিন্দু দর্শন বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। এই দিক থেকে গ্রন্থটির নাম যথার্থই হয়েছে, যেহেতু ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত আস্তিক তথা হিন্দু দর্শন ছয়টিই এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থকর্তার নাম থেকেই স্পষ্ট যে, তিনি ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। গ্রন্থের যে চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন সুপ্রকাশ সেন, সেই প্রচ্ছদেরই অপরদিকে লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি দেওয়া আছে। পূর্বাশ্রমে গ্রন্থকার ছিলেন দর্শনের সুপরিচিত অধ্যাপক। আরো চমকপ্রদ কাহিনী এই যে, তিনি যশস্বী বৈজ্ঞানিক ও রবীন্দ্র-সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধক্রমে গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় সমান সাফল্য দেখিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, লেখক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী দেশসেবক বিপ্লবী। এমন বর্ণময় ব্যক্তিত্ব বলেই তাঁর সম্বন্ধে 'মহাজনাংবাদ' গ্রন্থে ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অবলীলায় বলতে পেরেছেন : "একদিকে যেমন তাঁর গভীর অনুশীলন ছিল আগমে বা শাস্ত্রে, তেমনি সেইসঙ্গে অনুমান বা যুক্তিতর্কসহ মননও ছিল নিত্য সহচর আর তার ওপর ছিল ধ্যান বা গভীর তন্ময়তাজনিত রস। এই ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল বলেই তিনি এক আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন।"

বস্তুত, গ্রন্থকার শুধু দর্শনবেত্তা নন, তিনি দার্শনিক। এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইংরেজি 'Philosophy' শব্দটির বাঙলা করা হয় 'দর্শন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দর্শন' কথাটির অর্থ আরো গভীর। কেবল তত্ত্ব (reality) সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, তত্ত্বের সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ অনুভবকেই 'দর্শন' শব্দে বোঝানো হয়েছে। এই অর্থেই ভারতীয় দর্শনকে বুঝতে হবে। ভারতীয় দার্শনিকগণ 'তত্ত্বদর্শন' (vision of truth) করেছিলেন বলেই তাঁরা দার্শনিক। এই অর্থে বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতাও দার্শনিক, তিনি তত্ত্বদর্শী আবার সেইসঙ্গে মনস্বী পুরুষ।

গ্রন্থের ভূমিকাতেই মনস্বী গ্রন্থকার ভারতীয় দর্শনের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন : "এদেশের দর্শন সরাসরিভাবে মানুষের দরকার ও কাজের কথাই আগে তুলিয়াছে।" এই কথাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্যে 'Knowledge for the sake of knowledge'—এই ভাবনার সমাদর বহুস্থলেই দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন জ্ঞানের (এখানে প্রজ্ঞার) প্রায়োগিক বা ব্যাবহারিক (practical) দিকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছে। ঐ মতে প্রয়োজন ব্যতিরেকে ধীমান জীবের অর্থাৎ মানুষের শাস্ত্রাদিতে প্রবৃত্তিই হবে না। "প্রয়োজ্যতে অনেন ইতি প্রয়োজনম্‌"—'প্রয়োজন' কথাটির এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও একথাটির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়। মহর্ষি গৌতম বা অক্ষপাদ ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বোঝাতে ১।১।১ সূত্রে বলেছেন যে, প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত

নিঃশ্রেয়সাধিগম হয়। নিঃশ্রেয়ই জীবের প্রয়োজন। সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন বোঝাতে প্রথম কারিকাতেই স্পষ্ট বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তির সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয়। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের রচয়িতা। তিনি প্রথম সূত্রে বলেছেন ঃ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" সূত্রান্তর্গত 'অতঃ' (এইহেতু) শব্দের দ্বারা বেদান্তের প্রয়োজন উপদিষ্ট হয়েছে। এসমস্ত উদাহরণের আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখকের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যই সমর্থিত হয়েছে। কেবল এইটুকুই নয়, মনস্বী লেখকের আরো নানা মূল্যবান মন্তব্য এবং আলোচনায় ভূমিকাটি সমৃদ্ধ। বাহুল্যভয়ে আরো কিছু কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতেই হলো। তবে এটুকু না বললেই নয় যে, মনস্বী লেখকের মননের স্পষ্ট পরিচয় পেতে গেলে ভূমিকাটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ গ্রন্থগুলির মধ্যে এধরনের ভূমিকা প্রায়শ অনুপস্থিত থাকে।

মূল গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হলো যথারীতি বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থকার তাঁর মতো করে সরসভাবে নানা কথা বলেছেন। বিশেষত অধিকারী সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ "অধিকারীর কথাও ওদেশে তেমন কেউ বলিতে সাহস করে না। ডিমোক্রাসীর (Democracy) দেশ কিনা। সব্বাই যে সমান।" আসলে আমাদের শাস্ত্রে যে অধিকারীর কথা আছে, তার গুরুত্ব লেখক সর্বতোভাবে স্বীকার করেন এবং সেটা সঙ্গতও বটে। শাস্ত্রের পাঠ ও মননের জন্য অবশ্যই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে, সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র অচল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সকলেই বিজ্ঞানচর্চার যোগ্য নয়, সকলেই গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী নয়। কাজেই শাস্ত্রে 'অধিকার' একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অপাত্রে তত্ত্বজ্ঞান দান করাটা কোন কাজের কথাই নয়। পূর্বাচার্যগণও এমনটি করেননি। তবে ধীরে ধীরে যোগ্য বা অধিকারী হয়ে ওঠার কথা কিন্তু শাস্ত্রে অস্বীকৃত নয়। পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রে 'আনন্তর্য' অর্থে যে 'অর্থ' শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে, সেটির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এই যোগ্য বা অধিকারী হয়ে ওঠার কথাই বলা হয়েছে। সূত্রের শারীরক ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলেছেন ঃ "তস্মাৎ অথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যম্ উপদিশ্যতে।"

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, গ্রন্থকার 'প্রস্থান' শব্দটি ব্যবহার করলেও তাকে অন্যভাবে বুঝেছেন। বেদান্তে প্রস্থানত্রয় বলতে শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষদ্), স্মৃতিপ্রস্থান (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) এবং ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র)—এই তিনটিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তিনি ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্থান এবং বেদান্তকে তৃতীয় ও চরম প্রস্থান বলেছেন। এখানে বক্তব্যটুকু আরেকটু প্রাঞ্জল হওয়ার অবকাশ ছিল। সম্ভবত প্রস্থান বলতে তিনি স্তর বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর একথা স্বামীজীর বাণী মনে করিয়ে দেয় ঃ "We pass from the lower truth to the higher truth."

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় প্রমাণের কথা বলেছেন গ্রন্থকার। সরলভাবে বলেছেন ঃ "যাতে যথার্থ—ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়, তাই প্রমাণ।" (পৃঃ ৫৩) "সেই ঠিক ঠিক ('তদ্বতি তৎপ্রকারকং') জ্ঞানকে 'প্রমা' বলে।" (পৃঃ ৫৩) কিন্তু এক্ষেত্রে কথাগুলি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বললে ভাল হতো বলেই মনে হয়। "প্রমায়াঃ করণম্, প্রমাণম্"—প্রমার কারণকেই প্রমাণ বলা হয়, প্রমার যেকোন কারণকে প্রমাণ বলা যায় না। কেবল তাই নয়, ন্যায়শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়নি। জ্ঞান দুরকম—অনুভব ও স্মৃতি। তন্মধ্যে যেটি অনুভব, সেটি যথার্থ হলে তাকেই প্রমা বলা হয়েছে। যথার্থানুভব বলতে কী বোঝায়? তদ্বতি তৎপ্রকারক অনুভব হলো যথার্থানুভব। যাই হোক, ন্যায়মতানুসারে প্রমা লক্ষণের আলোচনায় এতাদৃশ আরো নানা কথাই বলা যেত। এক্ষেত্রে বিদ্যোৎসাহী পাঠক খানিকটা বঞ্চিতই হলেন, সন্দেহ নেই। তবে ন্যায়মতের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনুমান সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছেন এবং সেইসূত্রে পাশ্চাত্য তর্কবিদ্যার সঙ্গে প্রাচ্য তর্কবিদ্যা বা ন্যায়ের একটি মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় গ্রন্থকার একটি ক্ষেত্রে কিছুটা অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছেন প্রমেয়ের কথা বলতে গিয়ে। ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমাণের পরেই দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়ের স্থান। ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা পড়েন না, কেবল জীবাত্মাই পড়েন। (পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য) গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্রে এই জীবাত্মারই লক্ষণ বা সাধক লিঙ্গ (সূত্র ১।১।১০) উপদিষ্ট হয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মারই পরীক্ষা হয়েছে। ঈশ্বর বা পরমাত্মার লক্ষণ ও পরীক্ষা ন্যায়সূত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। তবে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছেন—একথা ঠিক। মহানৈয়ায়িক উদয়ন-কৃত 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। সে যাই হোক, সামগ্রিকভাবে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের আলোচনাটি মনোজ্ঞই হয়েছে। বৈশেষিক-সম্মত পদার্থ (realities) যে পাশ্চাত্য দার্শনিকের স্বীকৃত 'Categories of

understanding' থেকে ভিন্ন—একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গ্রন্থকার একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এপ্রসঙ্গটুকুও বিস্তারিত হলে ভাল হতো। এই অধ্যায়ের শেষে ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষ বা অপবর্গের কথা বলা হয়েছে। ন্যায়মতানুসারে মুক্ত জীবাত্মাতে সুখদুঃখজ্ঞানেচ্ছাদি কোন বিশেষ গুণই থাকে না। এই মত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বহুবার সমালোচিত হয়েছে। লেখকও যথার্থই বলেছেন ঃ "শেষকালে পাথর হবার ভয়েই প্রথম প্রস্থান ছাড়িয়ে উঠতে হবে।" কথাটার মধ্যে তাৎপর্য নিহিত আছে, সন্দেহ নেই। ন্যায়মতে আত্মমনসংযোগাদি কারণাভাবে মুক্ত জীবাত্মাতে জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে না।

গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সাংখ্য পাতঞ্জল অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগ দর্শন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এদুটি দর্শনের অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনা প্রথম বা মধ্যম পাঠার্থীর পক্ষে সুখবোধ হবে, বলা যায় না। এই অধ্যায়ে যেন সাংখ্য ও যোগের মূল কথাগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই ইতস্তত তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে, আহা! এমন সরস ব্যাখ্যা যদি আরেকটু পাওয়া যেত। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি কিভাবে সিদ্ধ হয়েছেন, সৎকার্যবাদের গূঢ় তাৎপর্য কী, গুণের স্বরূপ কী—এসব প্রসঙ্গে আলোচনা আরেকটু পরিপাটি হলে অতৃপ্তি থাকত না। তাছাড়া যোগ বলতে কী বোঝায়, অষ্টাঙ্গযোগের তাৎপর্য ও পরিচয়—এসমস্ত আলোচনাও প্রত্যাশিতই ছিল। মনস্বী লেখকের ব্যাখ্যায় এসমস্ত প্রসঙ্গ তেমনভাবে উপস্থিত থাকলে অধ্যায়টি যথার্থই সাদরে গৃহীত হতো। "যোগ একটা বিশাল আধ্যাত্মিক রাজ্যের সায়েন্স।"—এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এই অধ্যায়ে অব্যাখ্যাত থেকে গেছে! তিনি বলেছেন, অন্য একটি গ্রন্থে ('মন্ত্র যন্ত্র তন্ত্র') যোগের কথা আরেকটু বলবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে মীমাংসাদর্শনের আলোচনা রয়েছে। এখানে মীমাংসা বলতে জৈমিনি-কৃত কর্মমীমাংসাদর্শনকেই লেখক বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের কথা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনটির আলোচনা অন্য গ্রন্থে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাই আপাতত এই গ্রন্থে সেই আলোচনার অভাব থেকে গেল। উৎসাহী পাঠক আবারও অতৃপ্ত হবেন, সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, মীমাংসাদর্শনের আলোচনাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। আলোচনার অভিনবত্বও অনস্বীকার্য, বিশেষত যখন বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মীমাংসা-স্বীকৃত প্রমাণগুলির কথাও উঠেছে। প্রভাকর ও ভাট্টমীমাংসক যথাক্রমে পাঁচটি ও ছয়টি প্রমাণ মেনেছেন, সেকথাও বলা হয়েছে। উপমান প্রমাণের ক্ষেত্রে ন্যায় ও মীমাংসা-মতের পার্থক্যও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এককথায় গ্রন্থকার মীমাংসাদর্শনের একটি রূপরেখা সার্থকভাবেই এঁকেছেন। সুকঠিন মীমাংসা-দর্শনের আলোচনায় সরসতাটুকুও উপস্থিত ছিল।

পরিশেষে এ হেন একটি গ্রন্থ মুদ্রণপ্রমাদবর্জিত হলে ভাল লাগত। স্থানে স্থানে মুদ্রণপ্রমাদ পীড়াদায়ক হয়েছে। যেমন গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র 'ষড়্‌দর্শন' লেখা হলেও প্রচ্ছদে তা ভুলক্রমে 'ষড়দর্শন' হয়ে রয়েছে। তবে বিষয়ের গভীরতাব জন্যই গ্রন্থটি উপযুক্ত পাঠকের হাতে পড়লে সমাদর পাবে—একথা ভরসা করে বলা যায়। ❑

খাঁটি ভ্রমণকথা নয়

ডঃ সুবোধ চৌধুরী

ভ্রমণের দর্পণে • লেখক ঃ অজয়কুমার নন্দী • প্রকাশিকা ঃ মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০ই, বাচস্পতি পাড়া রোড, কলকাতা-৭৬ • মূল্য ঃ ৩৫ টাকা • পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১১২ • প্রকাশকাল ঃ বইমেলা ১৯৯৮

'**ভ্রমণের দর্পণে**' গ্রন্থটি ভ্রমণ-পিপাসুদের জন্য যেন 'গাইড বুক' হিসাবে রচিত। এতে তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু লেখক তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে এগুলি লেখেননি। লেখক এগুলিতে কেবল 'যাত্রী'। তাঁর যাত্রাপথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, শৈলপুরী, সমুদ্রকূলবর্তী অরণ্যানী, তটভূমি প্রভৃতির সৌন্দর্যময়তার চিত্র ধরা পড়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি এগুলিতে প্রধান হয়ে উঠেছে; ইতিহাসের কথা, স্থানমাহাত্ম্যের কথা, জনশ্রুতি, প্রাচীনত্বের স্বরূপ প্রভৃতি উপেক্ষিতই থেকে গেছে। ফলে এই গ্রন্থের রচনাগুলিকে খাঁটি ভ্রমণকথার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

ভ্রমণের দর্পণে

তাছাড়া রচনাগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, পাঠকের তৃষ্ণা মেটে না। ভ্রমণের 'গাইড বুক' হিসাবে গ্রন্থটি রচিত বলে এতে সাহিত্যরস খুঁজে পাওয়া যায় না, স্মৃতির মণি-দর্পণে ভ্রমণের কথাগুলি চিরন্তনতার মূল্যে অভিষিক্ত হয়নি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে 'কিভাবে যাবেন' পরিচ্ছেদ যুক্ত হওয়াতে ভ্রমণার্থীর উপকারে লাগতে পারে, কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীতে এগুলি অন্যভাবে পরিবেশিত হলে গ্রন্থটির আকর্ষণ বাড়ত। দু-একটি ক্ষেত্রে লেখক পত্রের আকারে ভ্রমণের কথা পরিবেশন করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেগুলি না হয়েছে পত্র-সাহিত্য; না হয়েছে ভ্রমণকাহিনী। প্রচ্ছদ অতি সাধারণ, ছাপা ভালই। তবে বানান ভুল বেশ কিছু আছে। দু-একটি আলোকচিত্র থাকলে গ্রন্থটির আকর্ষণ বাড়ত, সন্দেহ নেই। ❑

'প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে'

জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের উদ্যোগে গ্রামের আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমান বছরের জুলাই এবং আগস্ট মাসে জয়রামবাটী ও তার আশপাশের দশটি গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাসহায়ক কেন্দ্রের (Tutorial Class) উদ্বোধন হয়েছে। মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও 'পল্লীমঙ্গল' কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী সুরেন্দ্রানন্দজীর আন্তরিক প্রয়াসে উক্ত কর্মপ্রচেষ্টা জনমানসে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। স্বামী সুরেন্দ্রানন্দজীকে এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমীর মজুমদার। শিক্ষাসহায়ক কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অমেয়ানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জিনানন্দজী এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রেমী ব্যক্তিগণ।

জয়রামবাটী গ্রাম ছাড়াও দেশড়ার চৌসার, মাঝিপাড়া অঞ্চল, সিহড় কোয়ারপুরের মিদ্যাপাড়া, দমদমা, করালিবাগান, ডোমপাড়া, সাঁইবুনি, ডোমনার-পাড় তাঁতিপাড়া অঞ্চলে এবং সিহড় উত্তরপাড়ায় শ্যামাসুন্দরী সঙ্ঘে এই অবৈতনিক শিক্ষাসহায়ক কেন্দ্র প্রাথমিক বিভাগে (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি) ২৭৮ জন শিক্ষার্থী, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৬০ জন শিক্ষার্থী এবং নবম ও দশম শ্রেণির ২৩ জন শিক্ষার্থীকে যত্ন সহকারে শিক্ষাদান করে চলেছে। এইসব ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। দিনমজুরিই তাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের সংস্থান। জয়রামবাটী থেকে এই গ্রামগুলির দূরত্ব মাত্র চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার। গ্রামগুলিতে একটিও পাকা বাড়ি নেই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

স্বামী জিনানন্দজীর সঙ্গে মনোযোগী পড়ুয়ারা

খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে স্বামী অমেয়ানন্দজী

এইসব অঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের কাজ হয়নি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত রাস্তাঘাটের অভাব এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। নেই-রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে মাতৃমন্দিরের ব্যবস্থাপনায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে স্থাপিত শিক্ষা-সহায়ক কেন্দ্র যে আশার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে তা স্থানীয় জনজীবনে উদ্দীপনার জোয়ার এনেছে। তারা আগামী দিন ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তাদের ম্লান মুখ এই প্রচেষ্টায় একদিন হয়তো মুখরতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই অনাবিল মুখরতা জ্ঞানের পিলসুজে জ্বালিয়ে দেবে প্রাণের মঙ্গলদীপ।

ধূপকাঠি নির্মাণ ঃ শুভ কর্মপথে

জয়রামবাটীর পল্লীমঙ্গল আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বিগত পঁচিশ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করে আসছে। এই অভিনব স্বনিযুক্তি ও সেবাকার্যের সূচনাপর্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর প্রেরণা ও আশীর্বাদে তা ঋদ্ধ হয়েছিল। মহিলাদের বুনন-শিল্পজাত দ্রব্য, ধূপকাঠি ও হোসিয়ারি পণ্য প্রস্তুতি বহু জনের কাছে আর্থিক স্বয়ম্ভরতার আশ্বাস এনে দিয়েছে।

হোসিয়ারি কর্মকাণ্ড ঃ দারিদ্র্যকে হুঁশিয়ারি

দারিদ্র্যপীড়িত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকবৃন্দ অতি সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই সেবাকার্যে যুক্ত হয়েছে। মাতৃমন্দির কর্তৃপক্ষ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে এই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রে উপযুক্ত স্থানের অভাব, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত সামগ্রীর অপ্রতুলতা, দরিদ্র পরিবারভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বল্প পরিমাণ জলখাবারের ব্যবস্থাপনা ও শীতবস্ত্র প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য আয়োজনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। বার্মিংহাম থেকে অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ রায়, নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামী তথাগতানন্দজী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু মানুষজন আর্থিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছেন। বিদায়ী বর্ষার জলে আমোদর এখনও প্রায় পূর্ণ। সেই আমোদরের উজান ঠেলে নবভারত নির্মাণে মশগুল যাঁরা বুক চিতিয়ে চলেছেন, তাঁদের এই অভিনব প্রয়াসে কি আমরাও সামিল হতে পারি না?

নতুন কেন্দ্র স্থাপন

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ কোয়েম্বাটুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একটি উপকেন্দ্র **রামকৃষ্ণ মঠ, কোয়েম্বাটুর** নামে রামকৃষ্ণ মঠের একটি পৃথক শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ **Ramakrishna Math, 189-VI-B, Mettupalayam Road, Kavundanpalayam, Coimbatore-641030, Phone : (0422) 244-2990.**

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, হায়দরাবাদ ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 'বিবেকানন্দ দর্শনম্' (স্বামীজীর বাণীভিত্তিক আর্ট গ্যালারি, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান এক্সেলেন্স-এর একটি অংশ)-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিদ্যাপীঠকে কলকাতার ইন্ডিয়ান এপিক কালচারাল সোসাইটি 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ' পুরস্কার প্রদান করেছে। এই পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ১০,০০০ টাকা, একটি প্রশস্তিপত্র ও স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তি-সম্বলিত একটি ট্রফি।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদি, রাঁচি ঃ গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ চিকিৎসালয়ের ডেন্টাল চেয়ারের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পূজ্যপাদ মহারাজজী রাঁচি জেলার বুর্মু ব্লকের সোবা গ্রাম (আশ্রম কর্তৃক অধিগৃহীত একটি গ্রাম)-এ নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস অ্যানসেসট্রাল হাউস অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার (কলকাতা) ঃ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এই কেন্দ্র উদ্বোধনের প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব প্রায় ৫০০ মানুষের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমে পথশিশুদের জন্য পরিচালিত সান্ধ্য বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। স্বামী জিতাত্মানন্দজীর পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষকরা মিলে 'হরি ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ' গানটি পরিবেশন করেন। ছাত্রদের কাছ থেকে পুষ্পস্তবক গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী তাদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন। তারপর তিনি যান স্বামীজীর জন্মস্থানটি পরিদর্শন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীকরূপে গ্রানাইট পাথরে উৎকীর্ণ 'ওঁ' ফলকটির আবরণ উন্মোচনও করেন। ওঁ-কে ঘিরে রয়েছে সমস্ত প্রধান ধর্মের প্রতীকচিহ্ন।

এরপর সংগ্রহশালা ও ঠাকুরদালান ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী আসেন 'রামকৃষ্ণ হল'-এর উদ্ঘাটন করতে। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্ঘাটনকার্য সমাপনে মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগী ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ প্রমুখ।

এরপর জনসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী জিতাত্মানন্দজী। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের এবং সমস্ত মত ও পথের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে যে অভিনব বিশ্বায়নের সূচনা করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই আধুনিক যুগের মূলমন্ত্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 'আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক

বিধান'-এর আঙ্গিকে প্রচার করেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন স্বামী বিবেকানন্দ এই পথনির্দেশ করছেন তখনো রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং বিশ্বায়নের চিন্তা পৃথিবীর মানুষের মনে দানা বাঁধেনি। স্বামী জিতাত্মানন্দজী আরো বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের উক্ত তত্ত্বের বাস্তবায়নের জন্য বিগত শতবর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে আজ ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি ও পুস্তকাবলি মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দেন।

এরপর ভাষণ প্রদান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা, ত্রাণ ও সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের অতুলনীয় অবদানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের আগে 'দিব্যায়ন'-এর ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ বেলা ৩টা থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিকাল ৫টায় প্রখ্যাত বাউলশিল্পী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী তাঁর গানে শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেন।

সন্ধ্যা ৬টায় এই কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ডঃ তাপস বসুর ১০,০০০ টাকা দানের ভিত্তিতে 'সুকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন স্বামী জিতাত্মানন্দজী। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দজী।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রখ্যাত সুরবাহার বাদক অধ্যাপক সন্তোষ বন্দোপাধ্যায় বিস্তারিত তাল ও লয়কারীর মূর্ছনায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখেন।

সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ ঃ গত অক্টোবর মাসে কয়েকদিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত বর্ষণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। কলকাতারও বহু অঞ্চল জলপ্লাবিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ব্যাপক ত্রাণকার্য শুরু করেছে। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী হাজার হাজার বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি, চিঁড়া, গুড়, চিনি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে এইসব অঞ্চলে ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কানাদিঘি, কুমিরদা, বাসন্তিয়া, মুকুন্দপুর ও গোপীনাথপুর গ্রাম এবং কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটির চারটি ওয়ার্ড, এগরা সাব ডিভিশনের ৫টি অঞ্চল, চণ্ডীপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল; হাওড়া জেলার শান্তিনগর ও পশ্চিম শান্তিনগর (বেলুড় রেলস্টেশনের কাছে); দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুরুষোত্তমপুর, চেমাগুড়ি, গায়েনবাজার ইত্যাদি এবং কলকাতার সন্নিহিত কিছু অঞ্চল।

জম্মু-কাশ্মীরে ভূমিকম্প-ত্রাণ ঃ ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরে ৮ অক্টোবর ২০০৫-এর বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর পুঞ্চ অঞ্চলে অবস্থিত জম্মু কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,৯২০ কেজি আটা, ২,৫০০ কেজি লবণ, ২,০০০ কেজি বিস্কুট, ৬২৫ কেজি গুঁড়ো দুধ, ৩০০ কেজি কাপড়কাচার সাবান, ৩৬০ কেজি সরষের তেল, ৬০ লিটার ঘি, ৪,৭২৫টি কম্বল, বাঁশসহ ২৫টি টেন্ট, ১০০ কেজি প্লাস্টিক শীট, ৬০টি ফোম ম্যাট্রেস, ৫ ডজন লণ্ঠন, ৩ ডজন পেট্রোম্যাক্স, পুরুষদের ৮৮ জোড়া ও শিশুদের ৫০ জোড়া জুতো বিতরণ করেছে।

আবেদন

জম্মু-কাশ্মীরে ভূমিকম্প-ত্রাণ

গত ৮ অক্টোবর ২০০৫-এ জম্মু-কাশ্মীরে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশন পুঞ্চ অঞ্চলে অবস্থিত জম্মু কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্গত মানুষদের মধ্যে কম্বল, শীতবস্ত্র ইত্যাদি বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার জন্য ভক্তসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে।

'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর নামে নগদে, চেকে বা ড্রাফ্টে (কলকাতায় প্রদেয়) যেকোন অনুদান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুসারে করমুক্ত। অনুদান পাঠানো যেতে পারে এই ঠিকানায় ঃ

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২
ই. মেল ঃ rkmhq@vsnl.com
ফ্যাক্স ঃ 033-2654-4346

১৯ অক্টোবর ২০০৫ — স্বামী স্মরণানন্দ
বেলুড় মঠ, হাওড়া — সাধারণ সম্পাদক

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ঃ কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং ঝাড়খণ্ড সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যস্তরের সায়েন্স সেমিনারে দুটি ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, সারদাপীঠ ঃ বোস ইনস্টিটিউট, কলকাতা কর্তৃক আয়োজিত আর্সেনিক-দূষণ বিষয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতায় দুটি ছাত্রের একটি দল প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী প্রিয়ানন্দজী (বিপ্রদাস মহারাজ) গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট জন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শর্বানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি চেন্নাই মঠ, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, মাইসোর আশ্রম, শিলচর সেবাশ্রম এবং পুরী মঠের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। আলসুর মঠে তিনি গত ১২ বছর যাবৎ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ভজন-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, স্নেহপরায়ণ ও আত্মপ্রচারবিমুখ স্বভাবের।

ব্রহ্মচারী অসীমচৈতন্যজী (ফ্র্যাঙ্কলিন) গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে আমেরিকার ট্রাবুকো মঠ (বেদান্ত সোসাইটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, হলিউড-এর শাখাকেন্দ্র)-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কার্ডিওমায়োপ্যাথি রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী প্রভবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ট্রাবুকো মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নিজ গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য লাভ করেন। দীর্ঘ ৫১ বছর তিনি উক্ত মঠে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে কখনো তিনি ট্রাবুকোর বাইরে আমেরিকার অন্য কোন কেন্দ্রেও যাননি। তিনি ছিলেন সহৃদয়, কৌতুকপ্রিয় ও অদম্য কর্মতৎপর স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীকালীপূজা ঃ গত ১ নভেম্বর ২০০৫ অন্যান্য বছরের মতো মূর্তিতে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা শ্রীশ্রীকালীপূজার পর যথারীতি শুরু হয়েছে। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

ঋত্বিক, ডোমজুড় (হাওড়া) ঃ গত ১৪ আগস্ট ২০০৫ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে ডোমজুড় রূপছবি হল-এ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও ডঃ নন্দিতা ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি ডঃ ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৫ বক্তৃতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী পাঠ, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত, ব্রতচারী প্রভৃতির মাধ্যমে সিউড়ি জেলা সংশোধনাগারে স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সংশোধনাগারের আবাসিকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী। ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী, সংশোধনাগারের অধীক্ষক কুমারেশ রায় ও সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক উৎপল বিশ্বাস। অনুষ্ঠান-শেষে আবাসিকদের মধ্যে মিষ্টি প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩০ এপ্রিল ২০০৫ স্বামী দিব্যানন্দজীর তত্ত্বাবধানে এই সংশোধনাগারে আবাসিকদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং সাধারণ ও স্বনির্ভরতা বিষয়ে শিক্ষাদান কর্মসূচির শুভসূচনা হয়। প্রতি শনি ও রবিবার এই সেবাকাজ চলছে। গত ১৫ জুন ২০০৫ এই সংশোধনাগারেই আবাসিকদের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্য সম্বলিত একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী।

সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ১৭ আগস্ট ২০০৫ বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সপ্তদশ প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী ও স্বামী কৃত্তিবাসানন্দজী। অনুষ্ঠানে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধিত করা হয়। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৭ জুলাই ২০০৫ 'বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাঙ্ক'-এর সহায়তায় 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২২ জন রক্তদান করেন।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, ক্ষীরকুণ্ডী শাখা (হুগলি) ঃ গত ১৯ আগস্ট ২০০৫ প্রার্থনা, সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ অরূপ মুখোপাধ্যায়। এদিন প্রায় ১১ জন দুঃস্থ নারায়ণকে বস্ত্র এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও অনার্স গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে রৌপ্য পদক দান করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, কসবা (কলকাতা-৪২) : গত ১৯ আগস্ট ২০০৫ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ে ক্যুইজ, আবৃত্তি ও গল্পবলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন ডঃ শ্যামল গুপ্ত, ডঃ ধীরা দে, কবির বোস, সুপ্রতীম চক্রবর্তী ও হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সেবাব্রত, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) : গত ১৯ আগস্ট ২০০৫ রাখীপূর্ণিমার দিন সেবাব্রত-প্রাঙ্গণে 'দণ্ডিবাবা' বা 'দণ্ডিঠাকুর' শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, আলোচনা, স্মৃতিচারণ, গীতি-আলেখ্য, ক্যুইজ, বৃক্ষরোপণ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী অনাময়ানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী, স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী সুজয়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্নেহধন্য স্থানীয় এলাকার অনিলকুমার দে। এদিন মহারাজের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি স্থায়ী চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অকামানন্দজী।

যাদবপুর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (কলকাতা-৯২) : গত ২৮ আগস্ট ২০০৫ সঙ্ঘগীতি ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন মহামণ্ডলের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, যাদবপুর শাখার সম্পাদক ডঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সোমনাথ বাগচী, জয়দেব মাইতি প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান এবং স্মরণিকা 'অভিঃ ২০০৫' প্রকাশ করেন বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ২৭২ জন প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিকালে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ-সহ ৪৫৩ জন উপস্থিত থাকেন। তাঁদের প্রত্যেককে 'অমৃতবাণী' পুস্তিকা ও শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র প্রদান করা হয়।

মধ্যমগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাব আশ্রম (বর্ধমান) : গত ২৮ আগস্ট ২০০৫ বৈদিক মন্ত্র ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায় 'স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন মহাভাব আশ্রমের স্বামী দুর্গানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী। প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। গত ২৯ আগস্ট ২০০৫-এ আয়োজিত 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির'-এ ৩৫ জন রক্তদান করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ৫০০ ভক্ত, যুবক-যুবতী বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হাওড়া) : গত ২২ আগস্ট ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড় মঠ-এর পরিচালনায় আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সহযোগিতায় চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১২৪ জনকে চশমা প্রদান এবং ২৫ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিট-নিবাসিনী কণা বসু গত ২১ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী মদনমোহন সাহু গত ২২ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর-নিবাসিনী কুঞ্জলতা অধিকারী গত ২২ মে ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ত্রিপুরার সিধাই মোহনপুর-নিবাসী দিলীপ মজুমদার গত ৭ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কোচবিহার-নিবাসী যামিনীকান্ত ঘোষ গত ৭ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনার নারায়ণপুর-নিবাসী মঙ্গলময় মণ্ডল গত ১৬ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি নারাযণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়ার মোলডুবকা-নিবাসী প্রশান্ত রায় গত ১৭ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ❑

State Bank of India
With you all the way since 1806
Helpline : 1600 345 3455
www.statebankofindia.com
তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায়
২০০ বছর ধরে....

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

※

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

※

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

আবেদন

মহাপুরুষ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজের জন্ম অবিভক্ত বাংলার বর্তমানে বাংলাদেশে সিলেটে। অত্যন্ত মেধাবী, ম্যাট্রিক পরিক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বৃত্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তী পড়াশুনা কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হওয়া। পিতা জমিদার হরকিশোর চৌধুরীর সঙ্গে মত পার্থক্য। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল ও ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মেট্রোপলিটন অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা। সিটি স্কুলে শিক্ষকতা। পরে জয়নগর মজিলপুর স্কুলে হেডমাস্টার হওয়া। তাঁর পরবর্তী হেডমাস্টার ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। সিটি কলেজে অধ্যাপনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল করে কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। স্যার রাসবিহারী ঘোষের পরে তাঁর স্থান ছিলো। ১৯১৫ সালে জজ্ হওয়ার প্রাক্কালে সব ত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে যান। গুরু রামদাস কাঠিয়াবাবার পরবর্তী আচার্য। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত নিযুক্ত হন। এই মহান মানুষটির জীবনী খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তার পরবর্তী আচার্য স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা লিপিবদ্ধ করেন ১৯৩৬ সালে। কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যাপক এবং বিস্তৃত জীবনধারা (১৮৫৯-১৯৩৫) সম্বন্ধে বিরাট জীবনী গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে তারই নামাঙ্কিত স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার। এই ঋষি প্রতিম প্রবাদপুরুষ সম্বন্ধে কোন ঘটনা, ছবি, পত্র, ব্যবহারিক জিনিসপত্র, বিশেষ ঘটনা, কোন তত্ত্ব বা তথ্য যা অবিভক্ত বাংলায়, বিহার, আসাম, বৃন্দাবনে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এই সম্বন্ধে কারো কিছু ঘটনা বা বিবরণ জানা থাকলে যোগাযোগ করুন ঃ—

অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্ত

অধ্যক্ষ, স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার।

১০১ সার্দান অ্যাভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০২৯,

ফোন (০৩৩) ২৪৬৪-৬৪৬৪, (০৩৩) ২৪৬৩-৭২১৩, (০৩৩) ২৪১৫-৩৫৬৬।

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের স্বভাবই তো নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত
- শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-৭৪৩ ৫১০
- রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
- বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা
- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
- ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮
- বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  প্রযত্নে সুধীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩১৪৫
- স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৪৩ ৪৩৫
- হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী-৭৪৩ ১৬৫
- বিবেকানন্দ বুক সেন্টার
  প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন : (৯৫৩২১৫) ২৫৭৩৯৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন : ২৫৯২-১২৩০
- শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭
- নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪
- ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩
- ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া
  বারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন : ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন : ২৫৫০১৮
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫
- হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন : ২৫৫৩৯২
- অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড়
- হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০
- রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির
  গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)
  পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২
- বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন : ৭৪৩ ৩০২, ফোন : ২৪৩৩-৮৩৬৯
- জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-২৬০৪৫০
- দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশত-৭৪৩ ৩৭২
- শতদল সাধুখাঁ
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন : ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা : নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

গ্রাহক হউন

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ প্রবর্তিত রুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা

৬৭ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

- ☐ প্রতি ফাল্গুন (February) মাসে বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ এবং মাঘ (January) মাসে বর্ষ শেষ হয়।
- ☐ এক বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ৮০.০০ টাকা, হাতে নিলে ৭০.০০ টাকা।
- ☐ তিন বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ২৩০.০০ টাকা, হাতে নিলে ২০০.০০ টাকা।
- ☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য ১০০০.০০ টাকা (২৫ বছর পরে নবীকরণ-সাপেক্ষ)।
- ☐ শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
- ☐ গ্রাহকমূল্য ‘Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math’ এই নামে M. O. ক'রে অথবা প্রতিনিধি মারফৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন। M. O. করলে অবশ্যই আলাদাভাবে পত্রযোগে জানাবেন।
- ☐ বর্তমানে গ্রাহক করা হচ্ছে। বছরের যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বইয়ের মূল্যের উপর গ্রাহকদের ২০% ছাড় দেওয়া হয়।

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অফিস সময় : ১০টা থেকে ৫টা, ছুটির দিন বন্ধ।

✆ (০৩৩) ২৫৫৫-৮২৯২, ২৫৫৫-৭৩০০

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে; তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website www udbodhan org
e-mail udbodhan@vsnl net
Phone 2554-2248, 2554-2403

Vol.107
No.11
November
2005

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No
SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/LPWP-11/2004-06
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn No SSRM/KOL RMS/WB/RNP-039/2004-06

ISSN 0971-4316
9 770971 431004

"যখন দুঃখ পাবে, বিফলতা আসবে তখন নিশ্চিত জেনো আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ - অতিক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী একমাত্র বাংলা মুখপত্র

উদ্বোধন

উদ্বোধন সম্পাদক : স্বামী শিবময়ানন্দ ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা।

পৌষ ১৪১২ দ্বাদশ সংখ্যা

১০৭তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়।

সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন ১০৭

১০৭তম বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা ❀ পৌষ ১৪১২ ❀ ডিসেম্বর ২০০৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী শিবপ্রদানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা ❑ প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৬ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১২-১৪১৩ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ ইচ্ছায় ঘরে ঘরে সুলভে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর আগামী বর্ষের গ্রাহকমূল্যও অপরিবর্তিত রাখা হলো। এই নিয়ে পর পর তিনবছর 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য একই থাকল।

গ্রাহকভুক্তি ঃ **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকবর্ষ পুনঃপ্রবর্তন করা হচ্ছে আগামী ১০৮তম বর্ষ/২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে।** অর্থাৎ পূর্বের ধারা অনুযায়ী গ্রাহকভুক্তি/নবীকরণ করা হবে মাঘ/জানুয়ারি থেকে পৌষ/ডিসেম্বর পর্যন্ত। অবশ্য সাম্প্রতিককালের পরিবর্তনের নিরিখে (বছরের যেকোন মাস থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়ার ব্যবস্থা) যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন, ডিসেম্বর ২০০৫-এর পর তাঁদের যে-টাকা অবশিষ্ট থাকবে, তা আগামী বছরের গ্রাহকমূল্য থেকে বাদ যাবে। সেক্ষেত্রে, তাঁদের গ্রাহকপদ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের/ ১০৮তম বর্ষের বাকি টাকা অবিলম্বে জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজনবোধে, আপনারা গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রে, কার্যালয়ে এসে অথবা দূরভাষের মাধ্যমে কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

১০৮তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৬) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ◆ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

'উদ্বোধন'-এর সেবায় নয়টি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য আটটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 'Udbodhan Office, Kolkata-700 003'—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

● আমি তোমাদের ইহকালের মা, তোমাদের পরকালের মা। আমি তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের মা।

● কী, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

● যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনো, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না, বাবা! আমি থাকতে তোমাদের ভয় কী? আমি তোমাদের মা—সত্যিকারের মা। আমি মা থাকতে কে তোমাদের কী করবে?

● তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] নিজ মুখের কথা। তাঁকে স্মরণ করলে কোন দুঃখ থাকে না।

● বাসনা থেকেই সব। বাসনা না থাকলে কিসের কি? নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।

● আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। তোমাদের ভাবনা কি?

● আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।

● আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

● তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মুক্তি-লাভ হোক। জন্ম-মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।

● ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্মেই ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।

● মানুষই দেবতা হয়। কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।

● যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।

শ্রীমা সারদাদেবী

সারদা যুগের চরণধ্বনি উঠল বেজে যে

আধুনিক ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং প্রধানত বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নারীজাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতেছে। ইহা পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলনের দ্যোতক নহে। বর্তমান কালে পাশ্চাত্যে নারীবাদী আন্দোলনের মূলে অত্যাচারী পুরুষদের প্রতি ক্রোধ, সমাজের জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং তজ্জনিত হতাশা রহিয়াছে। জড়বাদী সভ্যতার অভিশাপ একদিকে যেরূপ ইন্দ্রিয়সুখের মধ্য দিয়া দুঃখকে ক্ষণিকের জন্য ভুলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে, অপরদিকে অনাবশ্যক হিংস্র-প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া আবেগ চরিতার্থ করিবার তথাকথিত স্বাধীনেচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতেছে। সেখানে অন্তর্দৃষ্টি বলে অন্তরতর সত্তার অনুসন্ধান নাই। পক্ষান্তরে তাহা বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথে গভীরতর অসুস্থতার দিকে চলিতেছে।

ভারতবর্ষে নারীজাগরণ তাহার আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সূত্রপাত হইয়াছে এবং তাহার শক্তি আগামী অগ্রগামিরূপে নারী-সমাজকে তথা সমগ্র মানবজাতিকে পথনির্দেশ করিতেছে। শ্রীমা নারীর সসম্মান অধিকারের সঙ্গে তাহার কর্তব্যের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাজের কাঠামোকে ধ্বংস না করিয়াও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহায়ে সমাজের চালচিত্র রূপান্তরিত করা যে সম্ভব তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন শ্রীমা তাঁহার নিজ জীবনের নিরিখে রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন যখন নিছক পুরুষদের সমান অধিকারের প্রশ্নে স্ত্রীজাতির 'চেতনার উন্নয়ন'-এর দাবিতে সোচ্চার, তখন শ্রীমা সারদা তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার দিব্য স্পর্শে সমগ্র পৃথিবীর মানব-মানবীকে তাহাদের জীবনের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করিতেছেন। দোষদর্শনের বিশ্লিষ্ট পথে শান্তি আসে না। পরস্পরের প্রতি সহধর্মিতা ও সহমর্মিতার আনন্দোজ্জ্বল পথেই জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। মহাসমাধি লাভের পূর্বে পৃথিবীর মানুষের জন্য শ্রীমায়ের এই ছিল অন্তিম বাণী।

শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে নব যুগের সূচনা হইয়াছে, তাহাকে 'সারদা যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করা চলে। শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী একবার প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাজীকে (শ্রীসারদা মঠের তৃতীয়া তথা বর্তমান অধ্যক্ষা) বলিয়াছিলেন ঃ "তুমি কি জান, বর্তমানে রামকৃষ্ণ যুগ শেষ হয়েছে এবং সারদা যুগ শুরু হয়েছে! এখন শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের মতন মাটিতে শুয়ে আছেন আর সারদাদেবী কালীর মতন তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং নৃত্য করছেন।" শিব ও শিবানীর এই অভিনব সম্মিলনে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই শক্তি জাগ্রতা হইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ "জগতের সমগ্র নারীজাতিকে জাগাবার জন্য মহাশক্তিরূপিণী মা এসেছিলেন নরদেহে।... মেয়েদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরো আসবে।"

আজ পাশ্চাত্যদেশের নরনারীর মধ্যে ভারতীয় জীবনের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী। ইহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তাহা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণ হইতে অধিকতর। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, পুরাণের যুগ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অনেক আধ্যাত্মিক পুরোধা পুরুষ আসিয়াছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের লীলাসঙ্গিনীদের অবদান স্বল্প। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রীমা সারদাদেবীর অবদান ও ভূমিকা আপন বৈভবের গুণে মহিমান্বিত হইয়া নব ইতিহাস নির্মাণ করিয়াছে। নিঃশব্দ ও স্নিগ্ধ শিশির-সম্পাতে পুষ্প যেমন নিজেকে বিকশিত করিয়া থাকে, শ্রীমায়ের অনন্য ও শান্ত জীবনের করুণাধারার স্পর্শে অগণিত মানব-মানবীর স্বরূপ জাগিয়া উঠিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কালোত্তীর্ণ হইয়া বিস্তৃত হইতেছেন শ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে। জীবনের অন্তিম পর্বে ভগিনী নিবেদিতা 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে শ্রীমা সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ "সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী।" প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয়ে সরলতমা সেই বাণীমূর্তি যেন 'সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য' এবং 'উদার মুক্ত মনের মহিমা' সদা বিকিরণ করিতেছে। যত নূতন অথবা জটিল সমস্যা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। নিবেদিতা অনুভব করিয়াছেন এক দীর্ঘ নীরব

প্রার্থনার মতো তাঁহার জীবন। শান্তশ্রী মার্তৃদর্শনে তৃপ্ত নিবেদিতা ২২ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখের চিঠিতে লিখিয়াছেনঃ "পূর্ণ তিনি মাতাদেবী!—পূর্ণ মাধুর্যে, মৌনে। আর কী জ্যোতির্ময়!" বিবেকানন্দের অভিব্যক্তিতে অপরূপ শান্তিরূপিণী শ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের মৌল প্রকাশ যেনঃ "...অগীত সুর আর অজ্ঞেয় জ্ঞান; জন্মতরঙ্গের অন্তরঙ্গ মৃত্যু। ঝঞ্ঝার শিরে সে নিশ্চল নিরোধ—সৃষ্টিগর্ভ সেই মহানেতি। সেখানে নিত্য ঝরে হাসির কিরণ। সেই শান্তি, জীবনের পরম লক্ষ্য—সেই হলো ধ্রুবলোক।" শ্রীমায়ের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের জয়যাত্রা অনাগত কালের পথে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির অশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছে। শরীরত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলিয়াছিলেনঃ "এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" শ্রীমা তাঁহার অফুরান মাতৃস্নেহের মাধ্যমে সেই কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীমা নিজেও বলিয়াছেনঃ "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" শ্রীমা তাঁর অহৈতুকী ভালবাসার প্রসাদগুণে উচ্চ-নিচ, গৃহী-সন্ন্যাসী, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, নারী-পুরুষ প্রভৃতির হৃদয় জয় করিয়া তাহাদের অন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসম্পদে পূর্ণ করিয়া দিতেন। আজও সেই শক্তিসঞ্চার সমভাবে বিদ্যমান। শ্রীমায়ের প্রতি সকলের আকর্ষণ অধিকতর। কারণ, মায়ের স্নেহে কোনরূপ বাছ-বিচার নাই। কোন শর্ত নাই। স্বর্গের অলকানন্দা যেন নির্ঝরিণী হইয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শত ধারায় মর্ত্যের অগণিত নর-নারীর মস্তকে নির্বিচারে বর্ষিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী কোন দীক্ষার্থীর দীক্ষার পূর্বে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব স্বামী প্রমথানন্দজীকে বলিয়াছিলেনঃ "মা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেননি। তিনি যদি তা করতেন, আমার সন্দেহ হয় যে আমি তাঁর কৃপা পেতাম কিনা! অন্যদের ক্ষেত্রেও মা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে খুব অল্পসংখ্যক দীক্ষার্থী তাঁর কৃপা লাভ করতে সক্ষম হতেন। অতএব সাক্ষাৎকারের কোন প্রয়োজন নেই।" শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী সারদেশানন্দজীর 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' গ্রন্থ সূত্রে আমরা জানিতে পারি যে, মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত একটি যুবক ভক্তের সাময়িকভাবে পদস্খলন হইয়াছিল, তবু যুবকটি শ্রীমায়ের নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া বন্ধ করে নাই। ইহাতে অন্য ভক্তগণ উক্ত যুবক ভক্তকে গতায়াত করিতে নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমায়ের নিকট অনুরোধ করিলেন। শ্রীমা উত্তরে উক্ত যুবকটির জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "আমি নিষেধ করতে পারি না। মা হয়ে ছেলেকে 'এসো না' বলা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।" সংসারের মোহে মলিন তাঁহার জগৎজোড়া সন্ততির জন্য তাঁহারই আশ্বাসবাণী "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে"—তিনি কখনোই বিস্মৃত হন নাই।

শ্রীমায়ের অশেষ স্নেহ জাতি-বর্ণ, চরিত্রগত দোষ-গুণ, সাংসারিক অবস্থার নিরিখে নিয়ন্ত্রিত হইত না। শুধু 'মা' বলিয়া দাঁড়াইলে তিনি নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় দিতেন। স্নেহ ও সহানুভূতির দ্বারা সন্তানের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ সঞ্চার করিতেন। তাঁহার মাতৃত্বের গভীর প্রভাবে দুশ্চরিত্র ও দস্যু প্রকৃতির ব্যক্তি পরম ভক্তে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। জয়রামবাটীর চৌকিদার অম্বিকা ও রাখাল বালক গোবিন্দ, দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী, সাতবেড়ের লালু জেলে, কোয়ালপাড়ার ডোম মেয়ে, ময়নাপুরের মুটে মেয়ে, শিরোমণিপুরের তুঁতে মুসলমান ডাকাত অথবা শিহড়ের পাগল ছেলে প্রভৃতি অগণিত মানুষের অবারিত দ্বার ছিল শ্রীমায়ের জয়রামবাটীর মাতৃকুটিরে। এইরূপ নির্বিচার গ্রহণ ও আশ্রয় তাঁহাকে 'গণ্ডিভাঙা মা'-রূপে মানবেতিহাসে বিশ্বজননীর আসনে আসীন করিয়াছে। অপর কেহ এইরূপ কার্যের সমালোচনা করিলে শ্রীমা বলিতেনঃ "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে।" তাঁহার মাতৃত্বের আত্মজাগানিয়া স্পর্শ পীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে মনুষ্যত্বের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অন্তরে দেবত্বের দুর্লভ অনুভূতিকে উজ্জীবিত করিয়া দিত। কলকাতার বাগবাজারে শ্রীমায়ের গৃহে গিরিশচন্দ্র, পদ্মবিনোদ, রঙ্গালয়ের অন্যান্য নট-নটী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশের বহু মানবের জন্য অবারিত দ্বার ছিল। বিভিন্ন ভাব ও স্বভাবের বহু সন্তানকে স্নেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া শ্রীমা অদ্ভুত সমাবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বামী অরূপানন্দজী শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ "তুমি কি সকলের মা?" উত্তরে শ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "হ্যাঁ!" পুনরায় প্রশ্ন হইলঃ "...ইতর জীবজন্তুরও?" শ্রীমায়ের আশ্চর্য উত্তরঃ "হ্যাঁ, ওদেরও!" সারদা যুগের সেই পরিপ্লাবী অথচ হৃদয়স্পর্শী ধারা আজও অবিশ্রান্ত-ভাবে জগৎকল্যাণে ধাবিত হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র' শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, শ্রীমাকে জগন্মাতারূপে অনাগত কালের মঙ্গলবিধান করিতে

হইবে। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন) শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করিয়া তাঁহার অন্তরে জগন্মাতার শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণে সাধনার ফল অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন ঃ "মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব।... আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম।... এই মাতৃভাব সাধনের শেষকথা।" শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি লাভের অব্যবহিত পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যে তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেইসময় শ্রীমায়ের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা যদি স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ না লাভ করিতেন, তাহা হইলে নির্বান্ধব ও নিঃসহায় তরুণদের পক্ষে বিপদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করা অসম্ভব হইত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, শ্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং আদ্যাশক্তি। পরমাপ্রকৃতিই শ্রীমায়ের মধ্যে মানবীরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য, শ্রীমায়ের ঐশী স্বরূপ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহার গুরুভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মাতৃশক্তির সর্বপ্লাবী শক্তি তথা 'সারদা যুগ'কে বোধকরি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা, যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।" স্বামী সারদানন্দ একবার বিহ্বল-চিত্ত হইয়া শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "যোগীন, নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না; কতরকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে, তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে অপরগুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।" উত্তরে স্বামী যোগানন্দ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি—তুই মাকে ধর, তিনি যা বলবেন তাই ঠিক।" এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের নিকটও অজ্ঞাত ছিল না। কারণ, জীবনের প্রান্তলগ্নে তিনি একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরো জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।" শ্রীমা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপের নির্দেশের সহিত আশ্চর্য আশ্রয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "তুমি খাবে-দাবে আর ফুর্তি করবে। যা প্রাণ চায় তাই পরবে আর যা প্রাণে চায় তাই খাবে, বাকিটা আমি দেখব।" পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে এমন অভয় অপর কেহ দিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। শুষ্ক জীবনের কাঠিন্যে বিপর্যস্ত ও আশঙ্কা-জর্জরিত শরণাগতকে চরমতম আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনো, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি।"

ব্যক্তিগত স্তরে শ্রীমায়ের আশ্বাসবাণী ও আশীর্বাদ সারদা যুগকে শুধু সূচিত করে নাই, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নির্মাণ ও অগ্রগতির পশ্চাতে তাঁহার প্রার্থনা ও অমোঘ শক্তিসঞ্চার শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কর্মকে জগৎকল্যাণে আগামী কালের দিকে পরিচালিত করিতেছে। শ্রীমায়ের জীবিতাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত 'সারদেশ্বরী আশ্রম' এবং পরবর্তী কালে 'সারদা মঠ'-এর মাধ্যমে নারীজাগরণ বস্তুতপক্ষে সারদা যুগের বিজয়নিশানকে উড্ডীন রাখিয়াছে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীমা তখনো পূজার ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মন তখন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ফিরিয়া আসে নাই। স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী লিখিয়াছেন ঃ "আমার এক গুরুভ্রাতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?' মা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'সন্তানের মতো।' উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকর্তা স্তব্ধ; মা এক গভীর মৌনতায় ডুবিয়া গেলেন।" দেবীসূক্তে রহিয়াছে ঃ "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্"—বিশ্বপিতারও আমি প্রসবিতা। অভিনবত্বের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চির উজ্জ্বল মাতৃত্বের এই চরম পরাকাষ্ঠা আধুনিক বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইল, ধন্য হইল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিজয়ানন্দজী দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় বেদান্ত প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের স্মৃতিপূজা উপলক্ষ্যে তাঁহার অশ্রুতপূর্ব অনুভূতি ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "মা তাঁর কাজ দেশ-বিদেশে করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয়, মা যেন ঠাকুরের সঙ্গে এক সিংহাসনে বসে আছেন এবং ঠাকুরকে বলছেন—তুমি একটু সরে বোস, আমি এবার কাজ করি।" শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের প্রকাশ আজ বিশ্বমানসের দিগ্‌দিগন্তে সারদা যুগের উদ্ভাসকে প্রকটিত করিতেছে। সারদা যুগের চরণধ্বনি আজ বাজিয়া উঠিতেছে। যে দৃষ্টিহীন সে দেখিতেছে না। যে বধির সে শুনিতেছে না। অথচ তাহাদের প্রতিও শ্রীমায়ের করুণার অন্ত নাই। ❑

স্বামী তুরীয়ানন্দের তিনটি পত্র

স্বামী বিরজানন্দকে লিখিত

॥১॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল
১৯।৯।১৪

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,

বহুদিন পরে গতকল্য তোমার একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তবে তোমার জ্বর হইতেছে জানিয়া দুঃখিত হইতে হইয়াছে। আশা করি শীঘ্রই সুস্থ সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। আমার শরীর ক্রমেই অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। শেষদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই—ইহাই মনে হইতেছে। প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয় তাহাই মঙ্গলকর—এই কথা স্মরণ রাখিতে পারিলে আর চিন্তা থাকে না। তুমি যে তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার সকলগুলি আমার সম্পূর্ণ মনে নাই। অনেক দিনের কথা, ভুল হইয়া গেছে। ১মটি তিনি আমাকে যখন কালিফোর্নিয়ায় শান্তি আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য পাঠাইতেছিলেন ও সঙ্গে করিয়া Detroit অবধি রেলে লইয়া আসিতেছিলেন সেইসময় বলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আমি কিরূপ কাজ করিব কিছু বলিয়া দিন। তাহাতে তিনি বলেন যে, "যাও আশ্রম স্থাপন কর, নিশান ওড়াও, ভারতবর্ষ ভুলিয়া যাও, জীবন দেখাও আর সমস্ত মা করিয়া লইবেন।" "Go establish the ashrama hoist the flag forget India live the life and the Mother will see to everything else." এই ভাবের কিছু হয় দার্জিলিং-এ কি কোথায় আমার মনে নাই। তুমি যা লিখিয়াছ ঐভাবেরই কিছু বলিয়াছিলেন বটে মনে হইতেছে। ইহাও যেমন লিখিয়াছ সেইরূপই কিছু। ব্রাহ্মণ্যশক্তি কি ব্রাহ্মণ ঠিক মনে হইতেছে না। বোধহয় বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ দেখাইতে চাই। যাই হক, এ নিয়ে আর কি হবে? মাদার[১]কে আমার শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণাদি জানাইবে এবং অন্যান্য সকলকেও। তোমার বইএর জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া আছি। শিগ্গির শিগ্গির বার করে ফেল। কয়দিন হতে আপনা হতেই তোমার কথা মনে হইতেছিল। সুতরাং তোমার পত্র পেয়ে বড়ই আনন্দ হয়েছে। এখানকার সকলে ভাল আছে। কাজকর্ম্মও একরূপ বেশই চলিতেছে। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কনখল
৩।১০।১৪

প্রিয় কালীকৃষ্ণ

তোমার ৺বিজয়ার প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণপত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি আমার ৺বিজয়ার কোলাকুলি ভালবাসা প্রভৃতি জানিবে। মাদারকেও আমার সাদর সম্ভাষণাদি দিবে। তোমার জ্বর সারিয়া গেছে ও এখন বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর এখন একটু ঠাণ্ডা পড়ায় কথঞ্চিৎ ভাল বোধ করিতেছি—তবে দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্তই যেমন তেমনি আছে। অসুখের লক্ষণ যেমন বহুমূত্রে হইয়া থাকে সেই সকলই রহিয়াছে। ঘন ঘন প্রস্রাব দারুণ পিপাসা অনিদ্রা কোষ্ঠবদ্ধতা শরীরের নানা স্থানে বিস্ফোটক হওয়া গাত্রদাহ দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনেক উপদ্রবই রহিয়াছে। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য আলমোড়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সম্মুখে শীত বলিয়া এই দুর্ব্বল শরীর লইয়া তথা যাইতে ভরসা করিলাম না। চিকিৎসা অল্পবিস্তর সবরকম করা গেছে। কিছুতেই বড় কিছু হইল না। আহারের যথেষ্ট অধিক করিয়া থাকি। ভাত

১ মিসেস সেভিয়ার

কোনরূপ মিষ্টি একেবারে খাই না। রুটি দাল তরকারি দুধ—এই খাই। বাদাম পেস্তা এবং মিষ্ট নহে—এইরূপ ফলও ব্যবহার করি। দৈ ঘোলও খাই। ঔষধের মধ্যে মকরধ্বজ মাত্র এখন খাই। আর বুড়া না হইলেও রোগে বুড়ো করে দিলে বৈকি। ক্রমেই অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে আর কি। যে কটা দিন যায়। বড় বেশি দিন আছি বলে বোধ হয় না। জীবনী[২] লিখতে আবার শুরু করে দেছ জেনে খুব খুশী হলুম। শিগ্গির বেরিয়ে গেলেই ভাল। আবার চতুর্থ ভাগও হবে বুঝি তাহলে ত যথেষ্ট বড় হয়ে উঠবে। তা হক, তাঁর বিষয় যত পার লিখতে পারলেই উত্তম। তাঁর ট্রাস্ট ডিড মঠের নিয়মাবলী প্রভৃতি সব বার করো। কিছু যেন অসম্পূর্ণ না থাকে। তোমার আশ্রম তৈয়ারি আরম্ভ করবে জেনে অতিশয় প্রীতিলাভ করলুম। ঝট করে ফেল। শুভস্য শীঘ্রম্। মাদার কি বিলাত যাইবেন নিশ্চয় হইয়াছে? গেলে বোধ হয় আর আসবেন না। বৃদ্ধ হয়েছেন। না গেলেই কিন্তু বেশ হত। যা ঈশ্বরের মনে আছে তাই হবে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে[৩] লিখিত

॥ ১ ॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

লালাবাবুর কেল্লা
অনূপসহর, বুলন্দসহর
২০।৩।০৭

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

এই মাত্র তোমার ৩রা চৈত্রের পত্র পাইলাম। রসিদ সহি করিয়া এই পত্র মধ্যেই তোমাকে পাঠাইতেছি। বইখানি তোমার নিকটই রাখিও। সময়ে২ তোমার বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র গমনে আমার কোন হানি হইবে না, কারণ আমি এ পর্যন্ত একবারও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবার আবশ্যক অনুভব করি নাই।

যাহা হউক, অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ত আমি তোমাকে এই দায় হইতে অব্যাহতি দিব। অর্থাৎ ঐ ব্যাঙ্কবুক সম্বন্ধে একটা নিশ্চয় করিয়া তোমাকে জানাইব।

মঠ হইতে গুরুদাস... আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখনও আমি তাহার টাকা দ্বারা কোন একটি আশ্রম স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি কিনা? আমি অসম্মতিই জানাইয়াছি। সে পুনরায় লিখিয়াছে যে, আরও ৩।৪ মাসের জন্য টাকাটা তাহার নামেই থাকিবে এবং আমার মত পরিবর্তন হইয়া ঐ সময়ের মধ্যে আমি কোন আশ্রম স্থাপনে ইচ্ছুক হইলে ঐ টাকা সেই কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য অপেক্ষা করিবে। নতুবা পরে উহা গুরুদাস স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে লিখিয়া দিবে। আমি ঐ পত্রের আর জবাব দিই নাই। তোমাকে সকল বিষয়ই জানাইয়া থাকি বলিয়া ইহাও লিখিলাম। যখন আমি আশ্রম স্থাপনে রাজি হইয়া গুরুদাসের দ্বারা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কনখল হইতে পত্র লিখাইয়াছিলাম, তখন আমার এবিষয়ে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ছিল।... প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি আর এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে রাজি নহি। তোমরা সব ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। কাল তোমাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। মঠ অথবা অন্য কোন সম্বন্ধেই কোন খবর পাই নাই। শরীর মন্দ নাই। দিল্লি ও আলিগড় প্রভৃতি স্থানে খুব প্লেগ। এখানে তত নহে। শ্রীবৃন্দাবনে কেমন? আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

২ Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples

৩ উত্তর কলকাতার বাগবাজার-নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী।

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রগুলি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের সদস্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজীর সৌজন্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালা' থেকে প্রাপ্ত।—**সম্পাদক**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজী রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি স্বামী সর্বগানন্দের সম্পাদনায় আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি।—**সম্পাদক**

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥২॥

শব্দার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীররূপী দৃশ্যটিকে 'ক্ষেত্র' বলা হয়। যিনি এই শরীরকে জানেন অর্থাৎ স্বাভাবিক বা ঔপদেশিক জ্ঞানের বিষয় করেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেন।*

ব্যাখ্যা ঃ জীব বলিতে দুইটি জিনিস বোঝায়। একটি চিৎ, অন্যটি অচিৎ। খেলার ছলে অচিৎকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে চিৎ যে স্বতন্ত্র, একথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহার অল্প একটু সুখের সহিত দারুণ দুঃখ আসিয়া থাকে। যে এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহে, তাহার একমাত্র কর্তব্য—এই অচিৎ দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া এবং নিজের স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥৩॥

***শব্দার্থ ঃ** হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রের দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ এক। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে পৃথক। আমাকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বদেহই প্রকৃতির পরিণাম। এক ক্ষেত্রজ্ঞ দেহাদি উপাধি দ্বারা প্রবিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। তাঁহাকে সর্বোপাধিবিবর্জিত, সদসদাদি সমস্ত শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর 'আমি' বলিয়া জানিবে। কারণ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এইপ্রকার জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।*

ব্যাখ্যা ঃ সর্বজীবের মধ্যেই চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অবিদ্যা তাহাকে আবৃত করিয়া রাখে। নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া স্ব-স্বরূপ চিৎ-এর চিন্তা নিরন্তর করিতে পারিলে জীব এই অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। অচিৎ বস্তুতে 'আমি' বোধ না করিয়া স্ব-স্বরূপকে বোধে বোধ করাই পূর্ণজ্ঞান।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৪॥

***শব্দার্থ ঃ** সেই ক্ষেত্র যাহা ও যেপ্রকার, যাদৃশ ধর্মযুক্ত, যেরূপ বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যেভাবে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপত যাহা ও যেরূপ উপাধিকৃত শক্তিশালী, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।*

ব্যাখ্যা ঃ সেই 'ক্ষেত্র' সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥৫॥

***শব্দার্থ ঃ** এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাথাত্ম্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখাতেও এই তত্ত্ব বিবিধ ছন্দের দ্বারা বিভিন্নভাবে গীত হইয়াছে এবং যুক্তিযুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক বেদবাক্য-সমূহ দ্বারা এই তত্ত্ব অসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হইয়াছে।*

ব্যাখ্যা ঃ সনাতন ধর্মের গোড়াতেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রেই নানাপ্রকারে যুক্তি-তর্ক সহিত ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

[**মন্তব্য ঃ** এই কারণেই স্বামীজী মনে করিতেন শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতির মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। যেখানে শ্রুতির সহিত যুক্তির কিংবা যুক্তির সহিত অনুভূতির বিরোধ ঘটে, সেখানে সত্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।]

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥৬॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥৭॥

***শব্দার্থ ঃ** পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, মহাভূতের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ মূলা প্রকৃতি (অব্যাকৃত ব্রহ্মশক্তি), দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় স্থূল পঞ্চভূত এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহ-সংঘাতে ও দেহ-সংঘাতে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি—এইসকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।*

ব্যাখ্যা ঃ অন্নময় দেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (দ্বারস্বরূপ) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (করণস্বরূপ) আছে। প্রাণময় দেহের

কী কাজ? সর্ববিধ ক্রিয়ার পরিচালনা করা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়কে স্থির রাখা বা প্রয়োগ করা। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকে 'ধৃতি' বলা হয়। মনোময় দেহে রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃত্তির প্রভাব লক্ষিত হয়। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় দেহ মূলত পূর্বসংস্কারের সাহায্যে কর্তব্য-অকর্তব্য কিংবা গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া থাকে। এবং আনন্দময় দেহে পূর্বোক্ত চারটি দেহের সর্ববিধ কর্মের ভর্তা, ভোক্তা, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা-রূপ অহং অবস্থিত। ইহাই সমগ্র 'ক্ষেত্র'-এর সুস্পষ্ট বিজ্ঞান। সব মিলাইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি-সঙ্ঘাত (compound)। অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে একত্র সম্মিলিত সংহতি। অর্থাৎ পঞ্চভূতের মিলিত সত্তাই সঙ্ঘাত। অতএব ইন্দ্রিয়গুলি কোন পৃথক সত্তা নহে। তাহারা পঞ্চভূতের দ্বারাই নির্মিত। যখন বলিতেছি চেতনা, সাধারণভাবে ইহা মনেরই function বা ক্রিয়া। অনুরূপে প্রাণের function বা ক্রিয়াই ধৃতি।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্॥৯॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥১০॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥১১॥

শব্দার্থ ঃ *উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, প্রাণিপীড়নে অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃশৌচ, মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সন্মার্গে পরিচালনা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমানশূন্যতা; জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃপুনঃ দোষদর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভপ্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্যভাব, ভগবানই একমাত্র গতি—এই নিশ্চিত বুদ্ধির দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, নির্জন বাস, প্রাকৃত জনের সংসর্গত্যাগ।এইগুলি আত্মজ্ঞানের সাধন বলিয়া কথিত হয়।*

ব্যাখ্যা ঃ অমানিত্ব অর্থাৎ আত্মশ্লাঘার অভাব—গুণ থাকিলে বা না থাকিলে। কোন অবস্থাতেই আত্মশ্লাঘা না করা।

দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুর সেবাই **আচার্যোপাসনা**। এখন যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাকালে শিষ্য তাহার শিক্ষাগুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিত। এখন 'আচার্য'-এর তেমন ধারণা নাই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মতোই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাকে মনে করিয়া লোকে 'কোর্স' করিতে চাহে। কিন্তু ইহা মানুষের inner life—আন্তর জীবন, বাজার করিবার বস্তু নহে, তাহা বুঝা দরকার। স্বামীজীর ভাষায় "being and becoming"। অবশ্য বর্তমানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সেবা বা উপাসনা করিবার উপায় তাঁহার বাণী ও জীবনীর আলোচনা, তাঁর উপদেশ শিক্ষা করিয়া নিজের জীবন গঠন করা।

আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ তপস্যা। শরীরকে কিছুটা কষ্ট দেওয়া। যেমন পায়ে হাঁটিয়া তীর্থগমন, একাদশীর উপবাস, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ (জামাকাপড় ধোওয়া কিংবা রান্না করিয়া খাওয়া) নিজেই সম্পাদন করা ইত্যাদি। তপস্যার একটি সীমা রাখা প্রয়োজন, যেন তপস্যা করিতে গিয়া ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ আসল উদ্দেশ্য ভুল না হয়। আবার 'ইহার বেশি করা ভাল নহে' ব্যাপারটিও বুঝিয়া দেখা দরকার; তপস্যার আড়ালে যেন সুখ-সম্ভোগে মন চলিয়া না যায়।

কতকগুলি বস্তুর উপর প্রীতি ও সেইসব বস্তু পাইবার ইচ্ছা এবং কতকগুলি বস্তুর উপর অপ্রীতি ও তাহা পরিহার করা বা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা—এই দুইপ্রকার কর্ম লইয়াই সকল জীবের জীবনচক্র। ইহারই অপর নাম রাগ-দ্বেষ বা সুখ ও দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ হইলে জীবনের ঊর্ধ্বে পূর্ণানন্দ লাভ হইতে পারে। চেষ্টা করিতে করিতে যখন মন হইতে রাগ-দ্বেষ সম্পূর্ণ চলিয়া যায়, তখনি ঈশ্বরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ হয়। তাহার ফলশ্রুতিতে আধ্যাত্মিক অপরোক্ষানুভূতি লাভ হয়। ইহার পর বিনা চেষ্টাতেই উপর্যুক্ত দিব্য অবস্থাসকল চিরস্থায়ী হইয়া যায় অর্থাৎ এই ব্যাবহারিক জীবন যতদিন থাকে ততদিন ঐসকল গুণও সাধকে বজায় থাকে। ইহাকেই স্বামীজী বলিলেন—"being and becoming"।

মুক্তিলাভের পথে কোন্ কর্ম নিষিদ্ধ বা অবিহিত, তাহা বলা হইয়াছে। এগুলি মুক্তিলাভের পথের বহিরঙ্গ। শ্রীভগবান এখন অন্তরঙ্গ সাধনের কথা অর্থাৎ কি কি করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন।

পূর্বোক্ত সাধনার ফলে মন ক্রমশ পরিশুদ্ধ হইলে ভগবানের প্রতি এমন একটি আকর্ষণ অনুভূত হইবে যে, সাধক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন দিকে মন লাগাইতে পারিবেন না। 'অনন্যযোগেন' শব্দের ইহাই অর্থ। এই অবস্থা হইতে সাধকের অবস্থান্তর হয় না, তাই বলিলেন—'ভক্তিরব্যভিচারিণী'। এবং তখন সাধক ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত লোকের সহিত বাস করিতে অসমর্থ হন। এই অবস্থায় সাধক সর্বদা ভগবচ্চিন্তার অনুকূল স্থানে বাস করিবেন। 'বিবিক্তদেশসেবিত্ব' শব্দে শ্রীভগবান একথাই বলিলেন।

[ক্রমশ]॥ছত্রিশ॥

এই রচনাটি 'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বিশ্বে তাঁর অবদান

স্বামী গহনানন্দ*

উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিগণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং নবনির্মিত সংযুক্ত-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত। আপনারা সকলেই জানেন, এই অনুষ্ঠানটি গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হওয়ার কথা ছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, নতুন দিল্লিতে আকস্মিক কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যাবতীয় অনুষ্ঠানসূচি বাতিল করে দিয়ে সত্বর রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ২৯ অক্টোবরে সঙ্ঘটিত সেই ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যেসব নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমরা অন্তরের গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করছেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সঙ্গে উপস্থিত স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ইনসেটে স্বামীজীর মূর্তিটি দেখা যাচ্ছে।

আদিম উগ্র প্রবৃত্তি এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা আজ সমগ্র সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সুতরাং আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও আজ এই হিংস্র আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজ বিশ্বব্যাপী মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক নীতি এবং শক্তি সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সংহতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর। বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয় সংক্রান্ত গঠনমূলক আলোচনা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি। ভারতবর্ষ কোন ধর্ম, কোন জাতি এবং দেশের মধ্যে উদ্ভূত অথবা দেশের বাইরে থেকে আহৃত কোন চিন্তাধারাই প্রত্যাখ্যান করেনি; কিন্তু তার সবগুলির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়সাধন করে ভারতবর্ষ এক নতুন ভাবধারার জন্ম দিয়েছে, যা ভারতীয় সভ্যতার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র। এদেশে অবক্ষয়ের দিন পূর্বেও এসেছে; কিন্তু যথাসময়ে প্রফেট ও ঋষিবর্গের আবির্ভাব মানুষের ধর্মীয় শক্তি তথা উদ্দীপনাকে নব উদ্যম দান করে সমগ্র সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজ জীবনে এক অপূর্ব সংহতি এবং সমন্বয় সাধন করেছিলেন। নিজ ধর্ম ত্যাগ না করে অন্যান্য ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি নিজ জীবনে গ্রহণ করার প্রথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেছিলেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি এক সার্বজনীন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, যার গভীরে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি সম্মিলিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, জগতে একটিমাত্র নিত্য-ধর্ম বর্তমান; অন্যান্য সকল ধর্মই তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। পরবর্তী কালে এমন এক সার্বজনীন ধর্ম সৃজনই হবে সমগ্র মানবসমাজের এক সুমহান কীর্তি এবং এ-কাজে আমাদের সকলেরই একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাকে কিন্তু কোনভাবেই 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা হবে না। কিন্তু জীবনে সংহতিসাধন, শান্তি ও পূর্ণতা লাভের জন্য সমগ্র মানবসমাজের বেশ কিছু সাধারণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব তথা ভাবাদর্শের প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে বেদান্তের প্রভাবে সাম্প্রতিককালে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়েছে। আজ ধর্ম শুধু একটি বিশ্বাস, একটি মতবাদ, নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান অথবা গির্জার সদস্য হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, তুরীয় এবং জীবন-রূপান্তরকারী এক চরম উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনে পরিপূর্ণতা ও শান্তি লাভ করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য। এজাতীয় বিশ্বাস থেকেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের বিরূপ মনোভাব আজ পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণেচ্ছু এবং শ্রদ্ধাশীল

** বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। গত ৬ নভেম্বর ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার সংলগ্ন গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং ইনস্টিটিউট-সংলগ্ন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ শিরোনাম-সহ প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক*

হয়ে উঠছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানের ফলে ধর্মীয় সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে তার মর্ম এখনো গভীর এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি।

প্রকৃত সত্য হলো যে, শুধু সামাজিক ও জাতীয় স্তরে আইনসভার মাধ্যমে অথবা সহিষ্ণুতা ও উদাসীনতার নীতি অনুসরণ করে সর্বধর্মসমন্বয় সাধন সম্ভব নয়; একমাত্র ধর্মের প্রকৃত অনুভূতিলাভের সাহায্যে অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সকল ধর্মের মধ্যে নিহিত সাধারণ ভাবগুলি উপলব্ধির মাধ্যমে তা সম্ভবপর। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বুঝিয়েছেন যে, সকলপ্রকার ধর্মীয় বিবাদের মূল কারণ হলো ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া, যেমন—প্রতীক, আচার, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ধর্মের মূল নির্যাসকে অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে পৃথক করা আমাদের আশু কর্তব্য। যেকোন ধর্মই ঈশ্বরলাভের উপায়স্বরূপ। এটি হলো সকল ধর্মেরই মূল কথা। একমাত্র এই মূল ভাবটির ওপর প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করলেই যথার্থ ধর্মসমন্বয় সম্ভব হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রচার করেছিলেন এবং তার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কারণ, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অতি মূল্যবান ভূমিকা আছে। প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের মানুষ আরো অধিকসংখ্যায় তাঁদের সংস্কৃতির প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করতে এবং ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সমন্বয় সাধনের প্রেক্ষিতে সেই সংস্কৃতির যথাযথ অনুশীলন করতে সক্ষম হবেন। ধন্যবাদ। ❑

ভাষান্তর ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং নবনির্মিত সংযুক্ত-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ঃ একটি প্রতিবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ গত ৬ নভেম্বর ২০০৫ সকাল ১০টায় সমবেত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২ ফুট উচ্চ সুসজ্জিত পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জমূর্তির (দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্কের ট্রাফিক আইল্যান্ডে ৮ ফুট উঁচু বেদিতে স্থাপিত) আবরণ উন্মোচন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী, অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য ও ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র মাননীয় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন মেয়র মাননীয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি ও বুদ্ধিজীবিগণ এবং অগণিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ ইনস্টিটিউট-সংলগ্ন নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই সম্পর্কিত স্মৃতিফলকটির আবরণ উত্তোলনের পর পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর তিনি স্বামী স্মরণানন্দজীর সঙ্গে বিবেকানন্দ সভাগৃহে উপস্থিত হন। সকাল সাড়ে ১০টায় দৃষ্টিনন্দন সজ্জায় শ্রীমণ্ডিত মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজকে মাল্যদান করেন স্বামী প্রভানন্দজী। এরপর তিনি এ. কে. শর্মাকে পুষ্পস্তবক, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক ও স্মারক এবং পার্থ ঘোষ, ভাস্কর অনিত ঘোষ, ইন্দ্রনীল সেন এবং এস. সরকারকে পুষ্পস্তবক, স্মারক ও শাল উপহার দেন। স্বামী প্রভানন্দজী তাঁর স্বাগত ভাষণে তাঁকে প্রেরিত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর একটি পত্র উদ্ধৃত করেন। উক্ত পত্রে গত ৩০ অক্টোবর ২০০৫ স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং নবনির্মিত সংযুক্ত-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ বিবৃত হয়। ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক মহারাজ ১৯৬১ থেকে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করার প্রেক্ষিতে সংযুক্ত-ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় মূর্তি স্থাপন সম্পর্কে তাঁর গভীর তৃপ্তি ব্যক্ত করে বলেন, এই কর্মকাণ্ডে কলকাতার তৎকালীন মেয়র হিসাবে তিনি অন্যতম শরিক হয়েছিলেন।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিপূত উত্তর কলকাতার মতো এখন থেকে দক্ষিণ কলকাতাও বিবেকানন্দ মূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে গর্ব করতে পারে।

পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ তাঁর আশীর্বচনে (পূর্বপৃষ্ঠাতে উল্লিখিত) বর্তমানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেন।

স্বামী স্মরণানন্দজী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামীজীর বাণী অনুসরণে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা বলেন।

অধ্যাপক এ. কে. শর্মা সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান-শেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ❑

স্বামী বিবেকানন্দ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি ঃ কার্ত্তিক ১৪১২ সংখ্যার পর

*রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 'A Traveller look at the world' গ্রন্থের ভাষান্তর ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্কটের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের পথনির্দেশ কতটা প্রাসঙ্গিক ও জরুরি তা বিধৃত হয়েছে এই ধারাবাহিক রচনায়। মূল ইংরেজি রচনার ভাষান্তরের কাজটি গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে করে চলেছেন অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।—**সম্পাদক***

প্রশ্ন ঃ *বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খ্রিস্টধর্মের অবস্থাটি ঠিক কীরকম?*

উত্তর ঃ খ্রিস্টধর্ম আজ তার নিজের মধ্যেই এমন এক প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে, যা সে তার দীর্ঘ ইতিহাসে আগে আর কখনো দেখেনি। এই ধর্মে আসছে আমূল এক পরিবর্তন। বহু খ্রিস্টান আজ উপলব্ধি করছেন যে, এত কাল ধরে তাঁদের ধর্ম হয়ে থেকেছে সৃজনশক্তিহীন, নিষ্ক্রিয় একটি অস্তিত্বমাত্র, যা পশ্চিম দুনিয়ার সমাজ, রাজনীতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাবে উৎপন্ন ধর্মীয় সংস্পর্শহীন কিছু শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত ও পরিচালিত। এইসব মানুষ অনুভব করেন যে, খ্রিস্টধর্ম আজ আর সৃজনশীল নেই এবং পাশ্চাত্য জীবনে এটিকে আবার সৃজনশীল করে তুলতে হলে এ-ধর্মকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর এর জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণার সন্ধান করেন বেদান্তে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সেই বেদান্তের অভিব্যক্তিতে। অনেক খ্রিস্টান বোঝেন যে, খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা বলে তাঁরা এত কাল যেসব মতবাদকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু আর বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। খ্রিস্টধর্মের এই পুনর্মূল্যায়ন খ্রিস্টানদের কাছে এবং তাঁদের মাধ্যমে অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠতে চলেছে। এটি একটি ধীর প্রক্রিয়া।

খ্রিস্টধর্মের এই সঙ্কটকে 'কাজে লাগিয়ে' গড়ে তুলতে হবে এক সার্বজনীন আধ্যাত্মিক খ্রিস্টধর্ম—যা যিশুখ্রিস্টের বিশ্বজনীন মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সেই ধর্মকে ভিত্তি করতে হবে যিশুর বেদান্ত-অনুসারী এই তিনটি মুখ্য বাণীর ওপর—ঈশ্বরের রাজ্য তোমার ভিতরেই আছে; যাদের হৃদয় পবিত্র, তারাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবে; এবং সেই কারণে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো তোমরাও পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হও। এইসঙ্গে সরিয়ে রাখতে হবে 'আদিম পাপ', প্রায়শ্চিত্ত বা 'একমাত্র ঈশ্বরপুত্র'-র মতো দৃঢ়মূল ধারণাগুলিকে।

প্রশ্ন ঃ *আপনার কি মনে হয় যে, ভারতীয় ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে চার্চগুলি অবহিত আছে?*

উত্তর ঃ চার্চের বেশির ভাগ অংশই জানে না যে, খ্রিস্টধর্মের এই সার্বিক পুনর্মূল্যায়নের পিছনে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বেদান্তের কার্যকরী শক্তি। কিন্তু স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পুরো বিষয়টি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খ্রিস্টধর্মের বর্তমান বিপ্লবের পিছনে মূল সদর্থক কারণ হলো স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই ধর্মের সঙ্গে বেদান্তের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার ব্যাপারটি। আর তার সূচনা ঘটেছিল ১৮৯৩-এ শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, বিশেষত উপসংহারে প্রদত্ত তাঁর এই প্রফেটীয় উক্তিতে—"জগতের কাছে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন যদি কোন কিছু দেখিয়ে দিয়ে থাকে, তবে তা এই—জগতের কাছে এই সম্মেলন প্রমাণ করেছে যে, পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও পরোপকারিতার মনোবৃত্তি পৃথিবীর কোন চার্চের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; প্রমাণ করেছে যে, প্রত্যেক ধর্ম থেকেই জন্ম নিয়েছেন উচ্চতম চরিত্রগুণের নারী ও পুরুষ। আর এই প্রমাণের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন যে, কেবল তাঁর ধর্মই বেঁচে থাকবে এবং অন্যগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আমি তাঁকে মনের গভীর থেকে করুণা করি এবং তাঁকে বলে দিতে চাই যে, বাধা সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় খুব দ্রুত লিখিত হয়ে যাবে এই কথাগুলি—'সংগ্রাম নয়, সহায়তা', 'ধ্বংস নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ', 'বিবাদ নয়, সংহতি ও শান্তি'।"

তবে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, খ্রিস্টধর্মের ওপর বেদান্তের প্রভাবের ব্যাপারটিকে কোনদিনই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না—যেমন বিবেকানন্দ বলেছেন। কারণ, যথার্থ আধ্যাত্মিক প্রভাব বলেই এটি স্বরূপত নীরব। আসলে, ভারতীয় প্রভাব সাধারণভাবে বরাবরই নীরব ও শান্ত হয়; আর তাই ইতিহাসের পাতা থেকে সেগুলিকে খুঁজে বের করা যায় না। ইতিহাসে আমরা কোন্ কোন্ জিনিসকে নথিবদ্ধ হতে দেখি? আক্রমণ, আগ্রাসন, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, গণহত্যা—এইসব। নীরব, সৃজনী প্রভাবের তুলনায় এগুলি খুব সহজেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে যায়। বিদেশে কতকটা মজা করেই বলতাম, হাজার হাজার পরিবার আনন্দে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে; এখন ধরুন কোন একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছে—এটি খবরের কাগজের প্রতিবেদন হিসাবে ঠিক উপযুক্ত নয়; কিন্তু ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একবার মনোমালিন্য হয়ে ঝগড়া লেগে যাক, আর সেটা তুমুল আকার ধারণ

করুক—অমনি তা সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে যাবে। ইতিহাস বলে যা লেখা হয়, তার অনেকটাই এরকম। এসব খবর সত্য হতে পারে; কিন্তু দীর্ঘকালের যথার্থ ইতিহাসের বিচারে আরো অনেক অ-গ্রথিত সত্যের সমান তাৎপর্যপূর্ণ এরা নয়। এমন অনেক ভাল জিনিস, সৃজনশীল আন্দোলন ও নীরব ঘটনা আছে, যেগুলি ক্বচিৎ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটির নামমাত্র উল্লেখ দু-একটি রোমক ইতিহাসে থাকলেও তাঁর পবিত্র জীবন তথা তাঁর আশপাশের মানুষজনের ওপর সে-জীবনের পুণ্যপ্রভাব সম্বন্ধে সে-ইতিহাসে কিছুই পাওয়া যায় না।

বহির্বিশ্বে ভারতীয় প্রভাব চিরকালই নীরব স্বভাবের। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"আমরা আমাদের ভাব প্রচার করার জন্য কখনো তরবারি ধরিনি বা কোথাও আগুন জ্বালাইনি। পৃথিবীর মানুষের ওপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্যক্ত করার উপযুক্ত কোন শব্দ যদি ইংরেজি ভাষায় থেকে থাকে, তবে তা হলো—'ফ্যাসিনেশন' অর্থাৎ একটা অদ্ভুত ভাললাগা। হঠাৎ করে কোন ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঠিক বিপরীত এই ব্যাপারটি; এটি আপনার অজান্তেই ধীরে ধীরে আপনাকে মুগ্ধ করতে থাকে। ভারতীয় ভাব, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে অনেকে প্রথম প্রথম পিছু হঠেন; কিন্তু তাঁরা যদি একটু ধৈর্য ধরেন, পড়েন, এইসব ভাবের মূলগত মহান আদর্শসমূহের সঙ্গে পরিচিত হন, তবে শতকরা প্রায় একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, সেই অদ্ভুত ভাললাগাটা তাঁদের এসে যাবেই—তাঁরা 'ফ্যাসিনেটেড' হয়ে পড়বেন। ভোরে যেমন শিশির পড়ে—সবার অলক্ষ্যে, নিস্তব্ধে, স্নিগ্ধভাবে অথচ অসামান্য কাজ করে যায়; ঠিক তেমনভাবেই এই ধৈর্যশীল, শান্ত, সর্বংসহা আধ্যাত্মিক জাতিও বিশ্বের ভাবজগতে তার সুমহান কাজ করে চলেছে—ধীরে, নীরবে।

খ্রিস্টধর্মের আধুনিক হয়ে ওঠার পিছনে গত ৭৫ বছর ধরে ভারতীয় ভাবনা এইভাবেই তার নিজের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রশ্ন ঃ *পাশ্চাত্যে ইদানীং খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ভাবধারার যে-সংঘাত বাধছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিককালে ধর্মের প্রকাশভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

উত্তর ঃ স্বামী বিবেকানন্দ বারবার এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন যে, যেকোন ধর্মের দুটি দিক আছে—একটি তার কেন্দ্রীয়, আবশ্যক, মৌলিক দিক; অপরটি তার গৌণ, বাইরের দিক। ধর্মের এই বহিরঙ্গটিকেই ভারতীয় ঐতিহ্যে 'স্মৃতি' বলা হয়েছে। এর মধ্যে মানুষের করণীয় ও অ-করণীয় কর্মের যে-তালিকা আছে, তা সর্বযুগের সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য নয়; অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও বদলাতে হয়ই। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে যাকে 'শ্রুতি' বলা হয়েছে, ধর্মের সেই মৌলিক ও আবশ্যিক অংশটি চিরকালের। এখানেই ধরা থাকে যেকোন ধর্মের নিয়ন্ত্রক আধ্যাত্মিক সত্য। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

ধর্মের স্মৃতি অংশটিকে পরিবর্তনের এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মেলানোর প্রয়োজন হয়। তাই কোন ধর্ম যদি সৃজনশীল ও প্রগতিমুখী থাকতে চায়, যদি সে নিজেকে তার অনুগামীদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব খর্বকারী একটি অনুশাসনমাত্রে পরিণত করতে না চায়, তবে তার পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো মূল শ্রুতি অংশের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ, পরে গৌণ স্মৃতি অংশটিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা। এটা করতে পারলে পৃথিবীর ধর্মগুলি নিজেদের মধ্যে ও নিজেদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখতে পারবে; আবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিককালের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এবং নিজের ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে যে-কারণে ব্যবধান—এমনকি পর্বতপ্রমাণ অন্তরায় পর্যন্ত তৈরি হয়ে যায়, তা হলো স্মৃতির মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি, গুরুত্ব ও কর্তৃত্বলাভ। খ্রিস্টধর্মে কোন্ বিষয়টি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের পৃথক করে রেখেছে? নিশ্চয়ই সে-ধর্মের শ্রুতি[১] অংশ নয়, কারণ তা বিশ্বজনীন; তা শুধু খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়কেই ছাড়িয়ে যায়নি, সে-ধর্মের আপন সীমাকেও অতিক্রম করে তা উদারভাবে বিরাজ করছে। বিভেদটা আসলে আসছে ঐ ধর্মের স্মৃতি অংশ থেকে। অতীতে এবং বর্তমানে খ্রিস্টীয় শাখা-প্রশাখাগুলি কেবল এই স্মৃতির বিভিন্ন অংশকে নিয়েই বিরোধে লিপ্ত ছিল ও আছে। আজ কিন্তু তারা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে চেষ্টা করছে স্মৃতির এই অতি-আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ও শ্রুতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে এক নির্বিরোধ খ্রিস্টীয় ঐক্য গঠনের। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মে এমন প্রচুর শ্রুতি-উপাদান পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে সব ধর্মকে অবিচ্ছিন্ন, সমন্বিতরূপে গ্রথিত করা যায়। সব ধর্মেরই আবশ্যিক ও বিশ্বজনীন অংশরূপে অবস্থিত আছে পবিত্রতা, ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, দয়া ও সেবার মতো আদর্শ—যেগুলি মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে পবিত্র বন্ধন রচনা করে।

১ লক্ষণীয় যে, এখানে ও পরবর্তী আলোচনায় পূজ্যপাদ মহারাজ 'শ্রুতি' শব্দটিকে কেবল তার প্রচলিত 'শ্রুত পরম্পরা' অর্থে গ্রহণ না করে ধর্মের অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত সত্য—এই ব্যাপকতর ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন।—**অনুবাদক**

হিন্দু ভাবধারায় তার স্মৃতি অংশগুলি নিয়মিত পরিবর্তনের এবং শ্রুতি অংশগুলিকে উজ্জ্বলতর, অধিকতর উপযোগীরূপে ধারাবাহিকভাবে রক্ষা করার প্রাজ্ঞ বন্দোবস্ত করা আছে। হিন্দু ঐতিহ্যের এই সুমহান চিন্তার এক আধুনিক ও অসামান্য সমর্থন রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিতে যে, নবাবী আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না।

একটা গাছ যখন বাড়ে, তখন তার সঙ্গে তার ছালটাও বাড়ে। ছালটা গাছের সঙ্গে সঙ্গে না বাড়লে সে গাছটাকে চেপে মেরে ফেলবে। আর গাছটা যদি সুস্থ-সবল থাকে, তবে সে পুরনো ছাল ফেলে দিয়ে নিজের জন্য নতুন ছাল তৈরি করে নেবে। সব 'ট্র্যাডিশন' সম্বন্ধেও সেই একই কথা—তাদের বেড়ে উঠতেই হবে। মানবসভ্যতায় আজ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে বিশাল পরিবর্তন। তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতি। আর প্রত্যেক প্রাচীন ভাবধারাকেই এই নতুন পরিস্থিতির নিরিখে নিজেদের পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে। হিন্দুধর্ম কিন্তু এর ব্যবস্থা রেখেছে। আর তাই হিন্দুধর্মকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। এ-ধর্ম এগিয়ে চলে—নতুন পথে, নতুন রূপে। এ সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু কখনোই একে প্রাচীনত্ব গ্রাস করে না; এ-ধর্ম অমর।

এমনকি শ্রুতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনও প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে স্মৃতির দিক দিয়ে এটি নতুন। আমি প্রায়ই বলে থাকি—রামকৃষ্ণ স আমরা আধ্যাত্মিকভাবে প্রাচীন ও একমুখী, কিন্তু সামাজিকভাবে আধুনিক ও বহুমুখী। সমস্ত ব্যাপারে এ-ই আমাদের অবস্থান। আর এজন্যই আমরা বিদেশ যেতে পারি, সর্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি, এবং হিন্দুদের সঙ্গে যতটা, অ-হিন্দুদের সঙ্গেও ততটা মিলেমিশে থাকতে পারি। ধর্ম ও সমাজের স্বার্থে আমরা জেনেবুঝে এইসব পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নিয়েছি; তা না হলে প্রাচীন এক স্থবিরত্ব চলতেই থাকত এবং এক সুমহান ঐতিহ্যকে বিপদাপন্ন করত। মনে রাখতে হবে, ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত হিন্দু ঐতিহ্য স্থবিরভাবেই অবস্থান করছিল। কিন্তু আজ আর তা নয়। আর তাই, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম-সহ সব ধর্মেই শ্রুতি অংশের ওপর জোর দেওয়ার আশু প্রয়োজন রয়েছে। স্মৃতিরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় শ্রুতির আলোকে তাকে পরিমার্জিত করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ *কিন্তু, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং ধর্মে ধর্মে শ্রুতির মধ্যেও কি কিছু পার্থক্য নেই?*

উত্তর ঃ না, না; ধর্মে ধর্মে বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শ্রুতি অংশে কোন পার্থক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য হৃদয়ের পবিত্রতার প্রসঙ্গ। যিশুখ্রিস্ট বলেছিলেন—যাদের হৃদয় পবিত্র, তারাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবে। এখন, এটি শ্রুতির অন্তর্গত; এটি একটি অধ্যাত্ম-সত্যের উচ্চারণ। আর তাই এটি কোন ব্যক্তিগত মত নয়; এটি সত্য; এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত বাক্য—যাকে পরীক্ষা করা যায়। 'বাস্তু' বা সত্য বিষয়ের ভিত্তিতে উচ্চারিত এটি একটি 'বাস্তু তন্ত্র' উক্তি; কোন ব্যক্তি বা 'পুরুষ'-এর মত-মর্জিমতো করা 'পুরুষ তন্ত্র'-এর কোন উক্তি নয়—যেমন কিনা শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। এখন কথা হলো, আমরা কী করে পবিত্র হব? সেটা আমাদের ব্যাপার। ধর্মবিজ্ঞানে মানুষের মধ্যে সদা বর্তমান ঈশ্বররূপী যে-সত্য, তাঁকে উপলব্ধি করার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। যেমন—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এসবের মধ্যে থেকে যাঁর পক্ষে যেটি সবচেয়ে উপযোগী, সেটি তিনি বেছে নেবেন। ধর্মের শ্রুতি-ভাবনার এ-ই হলো বিশেষত্ব ও মাধুর্য। ধরাবাঁধা কোন পদ্ধতির প্রসঙ্গ এখানে নেই। স্মৃতিতে কিন্তু সবই নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত। আর তাই স াত আসে এবং নতুন যুগের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্মৃতিগুলিকে নতুন ছাঁচে গড়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ক্রমশ

অনুষ্ঠান-সূচি ঃ মাঘ ১৪১২

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ৭ মাঘ, শনিবার (২১ জানুয়ারি ২০০৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া, ১৭ মাঘ, মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি ২০০৬)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ঃ মাঘ শুক্লা চতুর্থী, ১৮ মাঘ, বুধবার (১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঃ মাঘী পূর্ণিমা, ৩০ মাঘ, সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা ঃ মাঘ শুক্লা পঞ্চমী, ১৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

একাদশী-তিথি

১২, ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার, বুধবার (২৬ জানুয়ারি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

পিয়াশালা গ্রাম ঃ দীনময়ী দেবীর গৃহ

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥৩৭॥

শ্রীশ্রীমায়ের মাসিমা দীনময়ী দেবীর বাড়ি পিয়াশালা গ্রামে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এই গ্রামটি শিলাবতী নদীর তীরে। গড়বেতা থেকে মোরাম রাস্তা পেরিয়ে যেতে যেতে দেখা যাবে বিচিত্র তরুরাজি, যারা শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছে আপন খেয়ালে। চোখে পড়বে ধীর গতিতে বহমান শিলাবতী নদীর জলধারা। তারপর বগড়ী-কৃষ্ণনগর। সেখান থেকে বগড়ীর মোড়। শেষে ডিহিবগড়ী। তার কাছেই ছোট্ট গ্রাম পিয়াশালা। সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের মাসি দীনময়ী দেবীর শ্বশুরালয়।
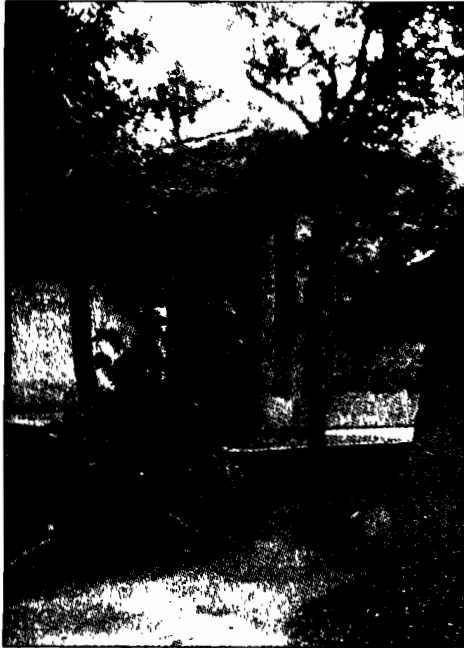
পিয়াশালা গ্রামে চক্রবর্তীদের বাড়ি

সে অনেকদিন আগের কথা। সম্ভবত তখন শ্রীশ্রীমায়ের কৈশোরকাল। তিনি এসেছিলেন এই পিয়াশালা গ্রামে। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "শ্রীশ্রীমা শৈলানন্দকে বলিয়াছিলেন, তিনি দুইবার নিজের মাসির বাড়িতে গিয়াছেন ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বগড়ী-কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণরায়জীউকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মাসিবাড়ি বগড়ী-কৃষ্ণনগর হইতে একক্রোশ ব্যবধানে—পিয়াশালা গ্রামে।"[১]

পিয়াশালায় চক্রবর্তীদের কুলদেবতা

শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচ মাতুল (রামব্রহ্ম, রামতারক, কেদার, শ্রীপতি ও বৈকুণ্ঠ) এবং এক মাসি দীনময়ী।[২] তাঁর প্রথম চার মাতুলের পর গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরীর জন্ম; তারপর কনিষ্ঠ মাতুল বৈকুণ্ঠ (রামদাস) এবং মাসি দীনময়ী। এই মাসির সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের ছিল বিশেষ সৌহার্দ।

দীনময়ী দেবী দিদির বাড়ি জয়রামবাটীতে প্রায়শই যাতায়াত করতেন। কনিষ্ঠা ভগিনী বলে দীনময়ী দেবীর ওপর শ্যামাসুন্দরী দেবীর বিশেষ স্নেহ ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের 'সারদা' নামকরণের সঙ্গে মাসি দীনময়ী দেবীর নাম অমর হয়ে আছে। এপ্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন ঃ "নামকরণ সম্বন্ধে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ একদিন শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা, আপনার নামটি কি আপনার মা পছন্দ করে রেখেছিলেন?' শ্রীমা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'না বাবা, আমার মা আমার নাম রেখেছিলেন ক্ষেমঙ্করী। আমি হবার আগে আমার যে-মাসিমা এখানে সেদিন এসেছিলেন, তার একটি মেয়ে হয়। মাসিমা তার নাম রেখেছিলেন সারদা। সেই মেয়ে মারা যাবার পরেই আমি হই। মাসিমা আমার মাকে বলেন, 'দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ; তাহলে আমি মনে করব আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে এবং আমি ওকে দেখে ভুলে থাকব।' তাইতে আমার মা আমার নাম সারদা রাখলেন।"[৩]

দীনময়ী দেবীর বিবাহ হয়েছিল পিয়াশালা গ্রামের ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁর এক কন্যা ও চার পুত্র। কন্যাটি শৈশবে মারা যায়। সেই কন্যার স্মৃতিমানসে শ্রীশ্রীমায়ের নাম 'সারদা' হয়। দীনময়ী দেবীর পুত্রগণ হলেন রামপ্রসন্ন, হারাধন, থাকরাম ও রামপদ। হারাধন

ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বংশধর নেই। তাঁর তিন পুত্র, যথাক্রমে—গোবর্ধন, নবগোপাল ও সুধাংশু। এঁদের মধ্যে কেবল নবগোপাল চক্রবর্তীই (৭৯ বছর) জীবিত। তিনি দীনময়ী দেবীকে দেখেননি, কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথা শুনেছেন তাঁর বাবা ও মায়ের কাছে। তিনি জানিয়েছেন ঃ "শ্রীশ্রীমা একাধিকবার পিয়াশালা গ্রামে এসেছেন এবং দীনময়ী দেবীও প্রায়শই (বিভিন্ন পালা-পার্বণে) জয়রামবাটী যেতেন। দীনময়ী দেবী পঁচাশি বছর বয়সে প্রয়াতা হন, কিন্তু ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তী তাঁর প্রয়াণের বহু আগেই দেহত্যাগ করেছেন। ক্ষেত্রমোহন ও দীনময়ীর সংসারে অর্থপ্রাচুর্য না থাকলেও তাঁরা অনাড়ম্বর, সরল ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। ক্ষেত্রমোহনের খড়ের চালের মাটির ঘরের একটি ছোট কুঠুরিতে থাকতেন বাস্তুদেবতা রাধাদামোদরজীউ। তাঁর নিত্যসেবা ও ভোগের ব্যবস্থা সুচারুরূপে প্রতিপালিত হতো। জন্মাষ্টমীতে বিশেষ পূজা এবং বৈশাখ মাসে বৈকালিকের ব্যবস্থা থাকত। দীনময়ী দেবীর প্রাচীন কুটির ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশধরগণ একটু দূরে নতুন গৃহ নির্মাণ করেছেন। দীনময়ী দেবীর আদি বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন চক্রবর্তী পরিবারের কুলদেবতা রাধাদামোদরজীউ। তাঁর গৃহ পাকা। এই দেবতার পূজার্চনায় আদি নিয়ম সব যথাযথ পালিত হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের পিয়াশালা গ্রামে আগমনের প্রধান উপলক্ষ্য ছিল কৃষ্ণরায়জীউয়ের দোল উৎসব। পিয়াশালা গ্রাম-সংলগ্ন 'রঘুনাথবাড়ি' মৌজায় কৃষ্ণরায়জীউয়ের মন্দির। সেখানেই হয় দোল উৎসব ও মেলা। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে সেখানে। কৃষ্ণরায়জীউয়ের সেবাইত হলেন কৃষ্ণনগরের রায়েরা। শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে একটি এবং দক্ষিণ তীরেও একটি মন্দির বিদ্যমান। জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণরায়জী অবস্থান করেন কৃষ্ণনগরের মন্দিরে; আবার দোলের সময় কৃষ্ণরায়জীউ কৃষ্ণনগর থেকে আসেন 'রঘুনাথবাড়ি'তে। এই স্থান পিয়াশালা গ্রামের নিকটেই। কৃষ্ণরায়জীউয়ের মেলা এই অঞ্চলের প্রধান লোকসংস্কৃতির উৎস। মাদুর, পাথরের শিলনোড়া, কলাই ভাঙার যাঁতা, শাঁখা, ঢোলক প্রভৃতি শিল্প উপাদানের বড় বিপণনকেন্দ্র এই মেলা। তাছাড়া এই মেলাকে কেন্দ্র করে কবিগান, যাত্রা, তরজা প্রভৃতি আনন্দোপকরণের ব্যবস্থা থাকত ঐ মেলায়।

বগড়ীর কৃষ্ণরায়জীউয়ের মন্দির খুব প্রাচীন। এই মন্দির সম্পর্কে জানা যায় ঃ "শিলাবতী নদীর বামতীরে অবস্থিত কৃষ্ণরায়জীউয়ের মন্দির। পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত এই মন্দিরটির গঠন পুরোপুরি বাঙালি ধাঁচে। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এটির প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণরায়ের মূর্তিটি কালো ব্যাসাল্টে খচিত, স্থাপত্যে চমৎকার। দোলযাত্রার সময় লক্ষাধিক লোকের মেলা হয়।"[৪]
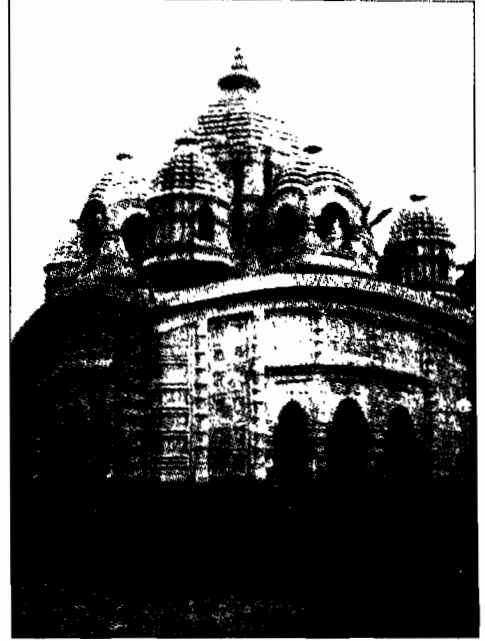
পিয়াশালা গ্রামে কৃষ্ণরায়ের মন্দির

অতীতের ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই পিয়াশালা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাবধারায়। শ্রীশ্রীমায়ের চরণস্পর্শধন্য ভূমিতে পিয়াশালা-হোমগড়ের বাসিন্দারা গড়ে তুলেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র'। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ছড়িয়ে আছে গ্রামের আকাশে-বাতাসে। সেই বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভরপুর গ্রামবাসী। ❑

পথনির্দেশ ঃ মেদিনীপুর রেলস্টেশন থেকে বাসে যেতে হবে আনন্দপুরে। সেখান থেকে দুমাইল দূরে পিয়াশালা গ্রাম।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীসারদাদেবী— ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিঃ, ১০ম সং, পৃঃ ১৪৪
২ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩শ সং, পৃঃ ৪৫
৩ ঐ, পৃঃ ১৬
৪ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ঃ মেদিনীপুর— তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৯, পৃঃ ২৩০-২৩১

অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমা ঃ মহামধুরিমা

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

শিল্পী ঃ অনিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজিনী পল্লি, বারাসত

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (রামময় মহারাজ) শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহধন্য এবং মন্ত্রশিষ্য। তিনি জীবনের প্রান্তলগ্নে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরোধে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে যান। পূজনীয় মহারাজের সেবক স্বামী শিবদাসানন্দের সৌজন্যে সম্প্রতি রচনাটি জয়রামবাটী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনকথা "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের অমূল্য স্মৃতিকথার কিয়দংশ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হলেও কিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বর্তমান রচনায়। তাই পুনরুক্তি থাকলেও তা মাতৃ-অনুধ্যানে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পূজনীয় মহারাজের রচনা এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য শিরোনাম-সহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হলো। — সম্পাদক

আমাকে বহু ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছিলাম? এর কারণও আছে। কেননা ঐসময়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী অঞ্চলের লোকেরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে মানত না। তারা বলত ঃ "যা যা! গদাই চাটুজ্যে তোদের ভগবান হয়েছে আর সারী বাম্‌নী তোদের ভগবতী হয়েছে। আমাদের কাছে আর ওসব কথা বলিসনি।" অথচ আমি ঐ অঞ্চলের ছেলে হয়ে কি করে যে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছিলাম তা ভেবে কুল পাই না। আমি যখন ১৯১৪ সালে সাত ক্লাসে পড়ি, তখন একদিন আমাদের জনৈক শিক্ষক (প্রধান শিক্ষকমশাই নন) আমাকে স্কুলের ছুটির পরে দেখা করতে বলেন। ক্লাসে এত ছাত্র থাকতে আমাকে কেন ডাকলেন ভাবতে ভাবতে গেলাম। ভয়ে ভয়েই গেলাম। মনে ভয় এজন্য যে, আমাকে পাছে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে চারটি রসগোল্লা ও এক গেলাস জল দিলেন। যাক, শাস্তির ভয় কেটে গেল। আমি খেয়ে বসার পর তিনি আমাকে আমি ভগবান মানি কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করলেন। আমার উত্তরে তিনি খুশি হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সাত/আট মাইল হাঁটতে পারি কিনা। আমি তার চেয়েও বেশিদূর হাঁটতে পারি বলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কাল শনিবার ছুটির পর আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে? তোমার সোমবারের পড়ার বই নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব।" আমি বললাম ঃ "বাবাকে জিজ্ঞাসা করব। তিনি যেতে বললে যাব।" মাস্টারমশাই রাজি হলেন। আমি বাড়ি গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ "বেশ তো, মাস্টারমশায়ের বাড়ি যেতে পারিস। বিশেষ করে তিনি পড়িয়েও দেবেন বলেছেন।" আমি শনিবারে বাড়ি থেকে কাপড়, গামছা ও সোমবারের পড়ার বই নিয়ে স্কুলে এলাম এবং ছুটির পরে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কামারপুকুর পেরিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি পৌঁছালাম। মাস্টারমশায়ের মা ও স্ত্রী আমাকে খুব আদর করলেন। মাস্টারমশায়ের কাছে প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "ইনি কোথায় থাকেন? এঁকে কোথায় গিয়ে প্রণাম করতে পারব?" তার উত্তরে

মাস্টারমশায় বললেন ঃ "ইনি স্থূলশরীরে নেই। এখন ইনি ধ্যানগম্য।" পরে স্বামীজীর ছবি দেখে তিনি কে জিজ্ঞাসা করায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু জেনে এবং তাঁকে যুবক মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "ইনি কোথায় থাকেন এবং কোথায় গেলে এঁকে প্রণাম করতে পারব?" তার উত্তরে মাস্টারমশায় বললেন ঃ "ইনিও স্থূলশরীরে নেই। এখন ইনিও ধ্যানগম্য।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মাস্টারমশায় এবং ঐ গ্রামে আরো পাঁচ/ছয় জন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য থাকলেও কারো কাছে তাঁর ছবি দেখিনি এবং তাঁরা কেউ আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। পরে ঐ গ্রামের ভক্তেরা মিলে গ্রামের একপ্রান্তে যেখানে একটি খুব উঁচু গম্বুজ আছে, তার কাছে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালযুক্ত একটি ঘর তৈরি করেন। তাতে একখানি ঠাকুরঘর, সাধু থাকার একটি ঘর ও একটি রান্নার চালা ছিল। গ্রামের ভক্তেরা যখন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন, তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন ঃ "মা, আমরা একটি আশ্রমের জন্য ঘর তৈরি করছি। যদি কোন সাধু গিয়ে থাকেন তো আমাদের খুব আনন্দ হবে। তিনি ঠাকুরের পূজাদি করবেন ও সন্ধ্যায় কথামৃতাদি পাঠ করবেন। আমরা সকলে শুনব।" শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "আচ্ছা বাবা, দেখব যদি কেউ যেতে চায়।" একদিন ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছিলেন, জ্ঞান মহারাজও কোয়ালপাড়া আশ্রম থেকে এসেছিলেন। এই জ্ঞান মহারাজের জন্মভূমি বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় ছিল। তিনি ছোটবেলায় সাধু হবেন বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে আঘাউড়ার এক আশ্রমে যান। কিন্তু সেখানে ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষের পত্নী ও দুইটি বিবাহযোগ্যা কন্যাও থাকেন বলে তিনি সেখান থেকেও পালিয়ে হেঁটে হেঁটে কলকাতায় ও বেলুড় মঠে আসেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমাকে ঘন ঘন দর্শন করতে পারবেন বলে তিনি কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকতে শুরু করেন। এই আশ্রম ঐ অঞ্চলের সর্বপ্রথম আশ্রম। তখন জয়রামবাটী, কামারপুকুর বা বাঁকুড়ার কোথাও আশ্রম ছিল না। নবাসনের ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করেন, যদি ঐ সাধু গিয়ে নবাসনে থাকেন। তাঁর খাওয়া-পরার সব ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। তখন শ্রীশ্রীমা জ্ঞান মহারাজকে বললেন ঃ "বাবা জ্ঞান, এই ছেলেরা আশ্রমের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছে। এরা তোমার খাওয়া-পরার সব ব্যবস্থা করবে। তুমি যাবে?" জ্ঞান মহারাজ বলেন ঃ "আপনি যেতে বললে যাব।" শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "হ্যাঁ, আমি যেতে বলছি।" তখন জ্ঞান মহারাজ ওখানে থাকতে লাগলেন। তাঁর কাছেই প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেখি। তাঁকে মায়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু বলেন। তিনি কোথায় থাকেন ও কোথায় গেলে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে পারব জিজ্ঞাসা করায় বলেন ঃ "তিনি এখান থেকে পাঁচ/ছয় মাইল দূরে জয়রামবাটীতে থাকেন।"

[ক্রমশ] ॥এক॥

মাতৃময় রামময় মহারাজ ঃ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ
(এক অনন্য জীবনালেখ্য)

শ্রীমা সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে আছেন। আনুমানিক ১৯১৫ সাল। সেখানে তখন ভক্তের মেলা। বহু মানুষজন অন্তরের আর্তি নিয়ে ছুটে আসেন মায়ের চরণপ্রান্তে। মায়ের পবিত্র স্পর্শে জুড়িয়ে যায় তাঁদের মনপ্রাণ। বাংলাদেশের পাবনা অঞ্চল থেকে দীক্ষাগ্রহণের আকাe । নিয়ে অল্পবয়স্ক এক দম্পতি এসেছেন মাতৃ-সকাশে। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পরও তাঁরা মাতৃস্নেহে পরমানন্দে জয়রামবাটীতে দিনযাপন করছেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন স্থানীয় স্কুলের একটি ছোট্ট ছেলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মাকে নানা কাজে সাহায্য করে। কোন জড়তা বা সঙ্কোচের বালাই নেই। শ্যামবর্ণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অথচ চেহারায় বেশ ছোটখাট। সরল, শান্ত মুখমণ্ডল। মা তাকে বিশেষ স্নেহ করেন। আর ছেলেটিরও মা-অন্ত প্রাণ। অন্যদিকে পাবনার সেই দম্পতি মায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তাঁরা, বিশেষ করে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী সেই ছেলেটির মুখোমুখি হলেই লজ্জায় প্রকাণ্ড ঘোমটা টেনে নিজেকে আড়াল করতেন। শ্রীমা সেই ভদ্রমহিলাকে 'বৌমা' বলে সম্বোধন করতেন আর সেই সূত্র ধরেই ছোট্ট ছেলেটি তাঁকে 'বৌদি' বলত। কিন্তু সেকালের সামাজিক অনুশাসনে বদ্ধ সেই ভক্ত-মহিলার পক্ষে ছোট ছেলেটির কাছে সহজ হওয়া সম্ভব ছিল না। তা লক্ষ্য করে একদিন হঠাৎ মা তাঁকে বললেন ঃ "বৌমা, তুমি রামময়ের সামনে ঘোমটা দাও? ও তো আমার মেয়ে গো!" ক্রমশ ॥এক॥

শিল্পী

জীবেন্দ্র বিশ্বাস

এক দানা তণ্ডুলে এঁকেছেন কিছু লিপি
কোন এক মানবশিল্পী,
বিস্ফারিত চোখে তাকে উষ্ণতা দিলাম।
দৃষ্টি ফেরাতে দেখি আরেক শিল্পী
এককণা বালুকায় এঁকেছেন সংখ্যাহীন ছবি
ধরা নামে পেলাম।

নীলাম্বর মুখার্জির বাড়ি

গিরীন্দ্রনাথ চাকী

অধরার পথে উড়ে যেতে যেতে
ডেকে উঠল পাখি।
বৃষ্টি ছিঁড়ে এগিয়ে চল আরো—আরো
সামনে বৃষ্টি-ভেজা ইঁট-পাতা পথ
দুধারে শুধু নীল ফুলের কেয়ারি
দেখিয়ে দেয় আঙুল তুলে—
এই তো নীলাম্বর মুখার্জির বাড়ি!

বাঁয়ে থেমে সিঁড়ি—
ধাপে ধাপে বিজন শূন্যতা ঘিরে
এ কার আহ্বান?
এ কোন্ সারদা শুভ্রতায়
জ্বলে উঠল পঞ্চতপা আলো?
খুলে গেল রুদ্ধ গঙ্গা-ধারা
এবং শীতের আলোয়ান।
জানালার পাশে চাঁপাগাছ
খসে পড়ল পাতা শব্দহীন
তারপর কোথায় হারিয়ে হাওয়া
দিকশূন্য কোন্ মহাব্যোম!

ফিরে আসে
মায়ের চরণ ছুঁতে রাত্রিদিন... রাত্রিদিন...।

প্রকৃতিপাঠ

গৌতমকুমার দে

কার কাছে মাথা নত করি আমি নিজেই জানি না
আকার-শূন্য প্রকৃতির কোন দেবালয় নেই তবু
সুন্দরের সেই মুগ্ধপটে, বিহ্বলতা লগ্ন থাকে শুধু
আমি তার কাছে মাথা না-নামিয়ে পারি না।

মায়া

চিরন্তন কুণ্ডু

উঠোনে পেয়ারাপাতা। কপিকলে ঝিকোচ্ছে অঘ্রাণ।
মোরগঝুঁটির ফুল লালে ছয়লাপ।
বাঁশ বেয়ে লাউমাচা। কাঠবিড়ালির দাপাদাপি।
একটি মোড়াও আছে। উলবোনা। ছোট ছোট মোজা।
খোলা দরজা দিয়ে যেন শালিক চড়ুই হাওয়া
সহজেই ঢুকে আসতে পারে।
সাবেক তুলসীমঞ্চ। সেখানে খড়ম রেখে
খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে সংসার দেখেন দেবতা

বর্ণপরিচয়

শিপ্রা ভৌমিক

একটা পুঁথি লেখাপড়ার জমি
সেই পুঁথিতে পাঁচপুরুষের বাস;
তারই বর্ণে আজও হাতেখড়ি
সেই বর্ণেই প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস।

কোন বর্ণ স্বাধীনচেতা স্বর
কোন বর্ণ পরাশ্রয়ী প্রাণ;
কোন বর্ণ এখনো বিতর্কিত
কোন বর্ণ উচ্চারণেই গান।

বর্ণরা সব তৈরি করে জোট
মানুষ যেন বর্ণেরই যোগফল;
রাখাল-গোপাল চেনা মুখের সারি
জীবন জুড়েই বর্ণমালার দল।

বিদ্যাসাগর-জাতক শিশুপাঠ
সার্ধশতক পরেও অক্ষয়।
ভুবনজয়ী বাঙলা ভাষার 'মা'
রত্নগর্ভা বর্ণপরিচয়।

দুটি কবিতা

সুভাষ ঘোষাল

১ ■ জ্বালিয়ে রেখেছি ধুনি

আমার গর্ভধারিণী গেলেও আমি কোনদিন যাইনি
তবু আমি জানি কামারপুকুরে কতটা বিজয়ী বোধ
জয়রামবাটী গিয়েছেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গ চাইনি
অথচ চেয়েছি জানলার কাছে সারদাপ্রসাদি রোদ।

মহাশক্তির ছবি দেখে দেখে কেটেছে আমার দিন
পৃথিবী ঘুমোলে বহুদূর থেকে আরতির ধ্বনি শুনি
জলমহিমায় বিচরণশীল সেই যে শান্ত মীন
তার কথা ভেবে ঘরের আসনে জ্বালিয়ে রেখেছি ধুনি।

২ ■ শেষে সুর হয়ে

হাত পেতে আছি প্রায় এক যুগ হলো
কখনো দাঁড়াই কখনো-বা বসে পড়ি
নিজের মনেই মাঝে মাঝে বলি—খোলো
পুরনো বাঁধন আর নবতম দড়ি।

কেউ কাছে নেই অথচ সবাই আছে
লাল নীল রব তবু নীরবতা ঘোর
শুধু দুটো হাত একে অপরের কাছে
রেখেছে তাদের কিছু না পাওয়ার জোর।

যদি কোনদিন মহানিশীথের কণা
হাতের ভিতর ঝলমল করে ওঠে
তবে নিশ্চিত এত যে প্রবঞ্চনা
শেষে সুর হয়ে ধ্বনিত আমার ঠোঁটে।

শক্তিরহস্য

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

আবাহন আর আরাধনা, নৈবেদ্য,
কিছুই হয়নি রুদ্ধ আজকে—
এ-ধারা শুধু ভক্তির,

যদিও ঝঞ্ঝা, প্লাবন ও ভূকম্প,
তদুপরি ব্যাধি, ক্লান্তি, বিয়োগব্যথা
হরণের ছলে চরম পরখ ব্যক্তির।

পরমাত্মার লীলা কী জানে অন্তর?
মগজের শ্লাঘা মূঢ়তা ভয়ঙ্কর—
অচিন্তনীয় কৃচ্ছ্র ও সেবা মানুষের
বিধাতা স্বয়ং জোগান দেন সে-শক্তির!

বুকে বেদান্ত

সুশীল মণ্ডল

অল্প-বিস্তর বাতাসে
ভেসে ভেসে
কি একটা আগুনের গন্ধ
সকাল সন্ধ্যে আমাদের বন্ধ
দরজায় কড়া নাড়ে—

গন্ধে যন্ত্রণা পোড়ে
বন্ধ হয় রক্তক্ষরণ
এমনকি মরণ
নির্বিকার কাছে আসে
ভরিয়ে দেয় না হা-হুতাশে
জীবন এই পৃথিবীর—

সবাই আগ্রহে অধীর
জীব মানে শিব
ব্রহ্ম অর্থে সজীব জড় ক্লীব
একথা তারই সাজে
যার বুকে বেদান্ত বাজে।

ক'টা মাছ পড়ে ধরা?

সতীশ বিশ্বাস

ছোট্ট নদীর জলে
মাছেরা সাঁতার কাটে সুখে, আর
ঘোরে ফেরে দলে দলে।

জেলেরা মাছ ধরে।
তীরে ঘুরে ঘুরে জাল ফেলে ছুঁড়ে;
কিছু মাছ ধরা পড়ে।

এই যে বহতা নদী
অসংখ্য মাছ অনন্ত নাচ
দেখায় যে নিরবধি!

যতই চেষ্টা করা—
জেলের জালেতে বা বঁড়শি পেতে
ক'টা মাছ পড়ে ধরা?

"জগৎ তোমার" ঃ নবযুগের মহাবাক্য

বনানী রায়*

দেবতাত্মা হিমালয়ের নির্জন গুহাকন্দরে, অরণ্যের শ্যামল আবেষ্টনীতে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ আর্য ঋষির অন্তর্জ্যোতির্লোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল যে পরম জ্ঞান, সভ্যতার প্রত্যূষে উন্মোচিত সেই অমল জ্ঞানরাশি সঞ্চারিত হয়েছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। রূপ নিয়েছিল উপনিষদ্, বিশ্বমানবের সভ্যতার অঙ্গনে ভারতের শ্রেষ্ঠতম অবদান। উপনিষদ্‌গুলির পাতায় পাতায় ধ্বনিত সেই চিরন্তন সত্যের অনুরণন আজও চিন্তাশীল মানুষের হৃদয় আলোড়িত করে, সন্ধান দেয় এই জরা-জন্ম-মৃত্যুতপ্ত মর্ত্যলোকের পারে কোন এক অজানা অমৃতলোকের।

অরণ্যকেন্দ্রিক সেই সভ্যতা আজ বিলুপ্ত ইতিহাস। আজকের নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার যুগে সুদূর অতীত থেকে ভেসে আসা সেই আরণ্যক জ্ঞানরাশি হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়েই মিলিয়ে যায় দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে। কর্মকোলাহলমুখর ব্যস্ত জীবনে বেদান্তোক্ত মহাবাক্যের অনুধ্যান অসম্ভব না হলেও অনেকের পক্ষেই প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু মন মানে না। শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানির গরল ধারণ করেও অমৃতের সন্তানের তৃষিত হৃদয়ে বেঁচে থাকে অমৃতত্বলাভের চিরন্তন আশা। সত্তার গভীর গহনে ধ্বনিত হয় প্রার্থনা ঃ "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" অসৎ থেকে সদ্বস্তুতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে ফেরার এ এক আকুল প্রার্থনা। সচ্চিদানন্দময় নিত্যস্বরূপের অনিবার্য আকর্ষণে মানব-অন্তঃকরণে অন্তঃসলিলা নদীর মতোই নিত্য-নিরন্তর প্রবহমান এই প্রার্থনা। অবশেষে মর্ত্যমানবের আর্তিতে সাড়া দিতে, 'অমৃতস্য পুত্র'কে অমৃতে ফেরার পথ দেখাতে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছিল এক অমর্ত্য শান্তির আলো—আত্মপ্রকাশ করেছিল মহামহিমময়ী জননীরূপে। শান্তশ্রী, কল্যাণময়ী, পবিত্রতাস্বরূপিণী সেই জননী সারদার কাছে জগৎ পেল নবযুগের মহাবাক্য ঃ "কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"

লেখিকা অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপিকা। পরবর্তী কালে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। বয়সে নবীনা হলেও মননের জীবনে সমৃদ্ধ তিনি গভীর অধ্যাত্মচিন্তা ও চর্চায় নিজেকে নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছেন। ব্রহ্মময়ী শ্রীমায়ের জীবনবেদই আধুনিক বিশ্বে নব-বেদ হিসাবে স্বীকৃত। তাঁরই দিব্য ঐশ্বর্যের আলোকে প্রত্যয়ী ও সশ্রদ্ধ মাতৃবাণী-বিচার বিশেষভাবে জনমানসে আদৃত হবে সন্দেহ নেই। ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের আঙ্গিকে আত্মবিলয়-সাধন ও অনুভূতি বিধৃত হয়েছে বর্তমান রচনায়।—সম্পাদক

এবারের এই মহাবাক্যের উন্মোচনের পটভূমি তুষারাবৃত হিমালয় নয়, নয় নির্জন অরণ্য। নগর কলকাতার জনবহুল বাগবাজার পল্লিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে 'অন্নপূর্ণার মা' নাম্নী জনৈকা ভাগ্যবতী মহিলাকে উপলক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের প্রাতঃস্মরণীয় এই অন্তিম উপদেশটি ঃ "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" এ যেন জগৎকে মায়ের দেওয়া মুক্তিমন্ত্র। মাতৃকণ্ঠোচ্চারিত এই মহাবাক্য মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে মুক্তি দেয় ক্ষুদ্রতার ঘেরাটোপ থেকে বিরাট বিশ্বাঙ্গনে। 'কেউ পর নয়'—এই সত্য যে আমরা ভুলে গেছি! নিজেকে ক্ষুদ্র, পৃথক ভেবে ভেবে নাম-রূপের খাঁচায় পড়ে বদ্ধ বিহঙ্গের মতো অবস্থা! দূরের সীমাহীন অনন্ত আকাশ, মুক্তির আনন্দ যেন সুদূর স্বপ্ন মনে হয়।

আমাদের সত্তার মূলেই গ্রথিত 'আমি', 'আমার' বোধ। এই ক্ষুদ্র 'আমি', 'আমার' বোধই মানুষকে বদ্ধ করে, দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রণার কারণ হয়। সেই 'আমি', 'আমার' বোধকে ব্যবহার করেই মা শেখাচ্ছেন মুক্তির উপায়। বলছেন ঃ "জগৎ তোমার।" অর্থাৎ 'আমার' বোধটিকেই আরো বিস্তৃত কর, জগতে প্রসারিত করে দাও। শুধু তোমার এই ক্ষুদ্র দেহ, গৃহ, পরিবার, পরিজন কেন—সারা জগৎটাকেই নিজের বলে ভাব। কারণ, 'কেউ পর নয়'—এই তো সত্য। এই সত্য ভুলে গেছি। তাই আবার শিখতে হবে। তাই, "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো।"

'আমার' বোধ যার ওপর আরোপিত হয়, তাতেই আমিত্ব বা অহম্ সত্তা প্রসারিত হয়। 'জগৎ আমার' বোধ করলে তাতেও প্রসারিত হবে অহম্ সত্তা। সদ্যোজাত শিশু মায়ের অচেনা থাকে। দেখামাত্র যেই তাতে 'আমার' বোধ আরোপিত হলো, তৈরি হলো অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন। এইরকম সবক্ষেত্রেই। বনের পাখি বনে ছিল। যেই ঘরে আনা হলো, অমনি তাতে অহম্ সত্তা প্রসারিত হয়ে তাতে 'প্রিয়' এবং 'আমার' জ্ঞান হলো। সেই পোষা পাখি মরে গেলে কত দুঃখ। এই চিত্রই দেখা যায় সংসারে। 'আমি', 'আমার' বোধের বৃত্তটির পরিধি ক্ষুদ্র হলেই তা থেকে আসে দুঃখ, কষ্ট, বন্ধন। এই 'আমার' বোধই সারা বিশ্বে প্রসারিত হলে তা থেকে আসে মুক্তি।

সীমা থেকে অসীমে, ব্যক্তিত্ব থেকে স্বরূপত্বে উত্তরণের অনায়াস চাবিকাঠি মাতৃকণ্ঠোচ্চারিত ঐ মহাবাক্য।

বেদান্তোক্ত মহাবাক্যগুলিতে উপনিষদের সার নির্যাস নিহিত। বলা হয়, মহাবাক্যের অনুধ্যানে মানুষের মূল অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, অজ্ঞান নাশ হয়, বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় এবং চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে পরব্রহ্মের সঙ্গে একত্বানুভূতি লাভ হয়ে

মানুষ কৃতকৃত্য হতে পারে। জগতের কলকোলাহল থেকে বহু দূরে নির্জন অরণ্যচারী ঋষিমুনিরা এই মহাবাক্যগুলি হৃদয়ে ধারণ করে নিয়ত অনুধ্যানে রত থাকতেন। বেদান্তের হৃদয় বলা হয় এই বাক্যগুলিকে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদে আছে প্রথম মহাবাক্যটি। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' অর্থাৎ চৈতন্যময় বোধময় স্বরূপ বা প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম, যা জগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। উপনিষদ্ বলছেন ঃ তিনিই (ব্রহ্ম) ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি। তিনিই এইসকল দেবতা। তিনিই পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। তিনিই এইসকল ক্ষুদ্র প্রাণীতে।... তিনিই অশ্ব, গাভি, মানুষ ও হস্তীরূপে রয়েছেন। ''সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।'' (ঐতরেয় উপনিষদ্, ৩।১।৩) এই সবই প্রজ্ঞার আধারে স্থাপিত, প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত, প্রজ্ঞাই তাদের লয়স্থান, প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় মহাবাক্যটি ''অহং ব্রহ্মাস্মি'' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।১০) জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদাত্মক অপরোক্ষানুভূতির নির্দেশক। যজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে এটি। নিজের সঙ্গে পরব্রহ্মের একাত্মতা অনুভব করে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। তখন তিনি জগতের সবকিছুর মধ্যে সর্বান্তরাত্মারূপে নিজেকে দেখেন।

তৃতীয় মহাবাক্য ''অয়মাত্মা ব্রহ্ম''। অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্য উপনিষদে গ্রথিত এই মহাবাক্যটিও আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদবাচক। উপনিষদ্ বলছেন ঃ ''সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।'' (মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ২) 'সর্বং হি এতৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যাকিছুর অস্তিত্ব আছে, জড় বা চেতন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অতীন্দ্রিয়—এই জগতের সবই ব্রহ্ম। এই আত্মা অর্থাৎ যাকে ক্ষুদ্র জীবাত্মা মনে হয়, তাও ব্রহ্ম।

উপনিষদ্ শোনাচ্ছেন এক অশ্রুতপূর্ব ঐক্যময় সত্যের সুমহান বাণী, Micro আর Macro যেখানে একাকার; যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর অগ্নি স্বরূপত এক।

চতুর্থ মহাবাক্যটি আছে সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে। এখানে পিতা পুত্রকে তার স্বরূপের উদ্বোধক মন্ত্র শোনাচ্ছেন। ঋষি উদ্দালক তাঁর আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু পুত্র শ্বেতকেতুকে বলছেন ঃ 'তত্ত্বমসি'। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।৮।৭) অর্থাৎ তুমিই সেই (ব্রহ্ম)। ছান্দোগ্য উপনিষদে সাত-বার উল্লেখ আছে আত্মজ্ঞানের দ্যোতক এই মহাবাক্যটির।

দেখা যাচ্ছে মহাবাক্যগুলির মূল ভাব কিন্তু এক। প্রতিটি মহাবাক্যই এই জগতের বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতা থেকে ব্রহ্মময় একত্বে উত্তরণের বাণী। এই একই অদ্বৈত ভাব, যা শ্রীশ্রীমায়ের অন্তিম উপদেশটির মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। ''কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার''—এই বাক্যটি গভীরভাবে ধারণা ও মনন করলে দেখা যাবে, সেটি উপনিষদোক্ত একাত্মময় ও অপরোক্ষানুভূতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে দিচ্ছে। অমোঘ শক্তিময়ী এই মাতৃমহাবাক্যের শ্রদ্ধাপূর্ণ নিত্য অনুধ্যান সাক্ষাৎ ফলপ্রদ।

'কেউ পর নয়' ভাবতে পারলে সকলের প্রতি আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা সহজ হয়। দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি, ক্ষমা, সহ্য প্রভৃতি দৈবী সম্পদ হৃদয়ে প্রকাশিত হয় অনায়াসে। দৈবীসম্পদ মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। ''দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়।'' (গীতা, ১৬।৫) অদোষদর্শিতা এই মাতৃমহাবাক্য অনুধ্যানের প্রত্যক্ষ ফল। শান্তি চূড়ান্ত প্রাপ্তি। শাস্ত্র বলেন, এই জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত। 'জগৎ তোমার' মন্ত্রের মূল অর্থ হলো, নামরূপের দৃষ্টিতে আমরা পৃথক হলেও স্বরূপত আমরা সবাই এক। তাই 'কেউ পর নয়'। একমাত্র এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই প্রকৃত প্রেম, সহানুভূতি ও শান্তি লাভ হতে পারে।

সাধারণত, মন জগৎকে দুইভাগে ভাগ করে রাখে। 'আমি', 'আমার' এবং 'অন্য'। দ্বিতীয় কক্ষটি নাশ হলেই ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি সংস্কার লুপ্ত হবে। কারণ, 'অন্য' থেকেই আসে ভয়. 'অন্য' বোধ থেকেই মাথা তোলে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি আসুরিক সংস্কার। দ্বিতীয় কক্ষটি বিনষ্ট হলেই সারা জগৎ আমার। অহম্ সত্তার প্রসার হতে হতে 'আমি' তার উৎসে ফিরে যাবে, অনন্তে লয় হবে। কারণ, এই ক্ষুদ্র 'আমি' বোধ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী 'বিরাট আমি'র ছায়ামাত্র। কিন্তু এ তো শুধু বৌদ্ধিক স্তরে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার জিনিস নয়, গভীর অনুভববেদ্য শাশ্বত সত্য। 'জগৎ তোমার'—এই মহাবাক্যের শ্রদ্ধাপূর্ণ গভীর অনুধ্যান চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ক্ষুদ্র জীবসত্তাকে। এই চরাচর জগৎ, বিশ্বপ্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত এবং অবিচ্ছিন্ন। অথচ নিজেকে ক্ষুদ্র ও পৃথক ভেবে সারা জগৎ ও বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করে আমরা কষ্ট পাই। এ এক আশ্চর্য রহস্য। একই পৃথিবীর ওপর আমরা জীবনধারণ করি, একই বাতাসে নিঃশ্বাস নিই, একই আকাশের নিচে, একই সূর্যরশ্মিতে পুষ্ট হই—পরস্পর নির্ভরশীল (interdependent) আমাদের অস্তিত্ব। অথচ নিজেকে বিশ্বচরাচর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, পৃথক এক অস্তিত্ব বলে মনে করি। বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণী, মানুষজন সবার থেকে একেবারে পৃথক এই 'আমি'টির জন্য সুখের উপকরণের অন্বেষণে হন্যে হয়ে ফিরি। যত পায় ক্ষুধা তার বেড়েই চলে। কাম্য বস্তু না পেলেই ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ। পেলে হারাবার ভয়। তার ওপর আবার মাৎসর্য—আমি পেয়েছি, আমার একারই থাক; অন্যে না পায়। ফল—বন্ধনের ওপর বন্ধন, দুঃখ, যন্ত্রণা। শ্রুতি বলেন, এই ক্ষুদ্র

অহম্ সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় সংস্কাররাশি। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের রশ্মি দিয়ে বেঁধে পথভ্রান্ত জীবাত্মাকে নিয়ে যায় জন্ম থেকে জন্মান্তরে। অবিদ্যা আর অস্মিতা—জীবের মূল ক্লেশ।

তবে উপায় কি? সৃষ্টির আদিতে এই অহম্—মূল অবিদ্যা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শেখালেন মহামন্ত্রঃ "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।"—হে ঈশ্বর, আমি কিছু নয়, তুমিই সব। বললেন, 'আমি' যায় না। তাই ঈশ্বরের 'দাস আমি' হয়ে সংসারে থাক। তাঁর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে লয় করে দাও।

সুন্দর, সহজ উপায়। ভক্তের পক্ষে সহজ। কিন্তু যার ব্যক্তি-ঈশ্বরে (Personal God) বিশ্বাস নেই অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা নেই, দেহাত্মবুদ্ধিধারী সাধারণ মানুষ বা 'সেক্যুলার' মনোভাবাপন্ন মানুষ, জগৎটা যার কাছে ষোল আনা সত্য, পুরুষকারে প্রবল বিশ্বাস—সে কি করবে?

মা শেখালেন, তোমার আমিটাকে প্রসারিত কর, ছড়িয়ে দাও সারা জগতে। 'জগৎ তোমার'—এই উপায়। এই সাধনা, এই সিদ্ধি। অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। মায়ের সম্বন্ধে না জানলেও ক্ষতি নেই। শুধু মহাবাক্যটির শ্রদ্ধাপূর্ণ নিয়ত অনুধ্যান ও জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা থাকলেই হলো।

প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। এখানে শ্রীশ্রীমা শান্তিলাভের জন্য কোন দেবদেবীর পূজা-আরাধনার কথা বললেন না। বললেন না দীক্ষা, জপ-তপ বা ব্রত উপবাসের কথা। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ একটি উপায় বলে দিলেন। কিন্তু মননের আলোকে কী অসাধারণ দীপ্তিময় মায়ের এই ছোট্ট উপদেশটি! প্রাত্যহিক জীবনে শান্তি তো বটেই, পারমার্থিক শান্তিলাভেরও অমোঘ নিদান। জগজ্জননীর এই উপদেশটির প্রাসঙ্গিকতা ও আবেদন সর্বজনীন, সর্বকালীন। সাধু, গৃহী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধর্মপরায়ণ বা সেক্যুলার মনোভাবাপন্ন—জীবনের যে-স্তরে যেখানে যিনি আছেন সকলেই এই মহাবাক্যটি হৃদয়ে ধারণ করে পরাশান্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে পারেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ জগন্মাতা সারদাদেবীর স্নেহধন্য ছিলেন। তাঁর সমীপে সমাগত সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের তিনি বলতেনঃ "শ্রীশ্রীমার একটি উপদেশ আমি প্রত্যহ চিন্তা করি।... মা বলেছিলেন, 'যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না।... জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' নিমগাছের সবই তেতো, কিন্তু মৌমাছি নিমফুল থেকেও একটু মধু আহরণ করে নিয়ে যায়। সংসারে ভালমন্দ সবরকম লোক রয়েছে বটে, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান। সকলকেই আপনার জ্ঞান করতে হবে। মায়ের এই অন্তিম উপদেশটি পালন করলে তোমাদের জীবন মধুময় হয়ে যাবে।"

বেদান্তোক্ত মহাবাক্যগুলি আলোচনা করলে দেখি, চারটি মহাবাক্যই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। মহাবাক্যগুলির প্রতিটি অদ্বৈততত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ-কালাতীত শাশ্বত সত্য এবং স্বরূপের অববোধক এই বাক্যগুলির অনুধ্যানে মনের ক্ষুদ্রতাবোধের বিলোপ ঘটে, অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়। কিন্তু বৌদ্ধিক স্তরে নয়। এরা কাজ করে সত্তার গভীরে। বাক্যগুলির নিয়ত অনুধ্যানের মাধ্যমে আন্তর রূপান্তর ঘটে। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠোচ্চারিত মহাবাক্যটিও ব্যতিক্রম নয়। সহজ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এর অনুধ্যান। এই মাতৃমহাবাক্যের গভীর অনুধ্যানে হৃদয়ের প্রসার হয়, আপনবোধের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং দ্বেষবুদ্ধির বিলোপ ঘটে। উদার হৃদয়ে স্বতই প্রকাশিত হয় করুণা, সহানুভূতি ও মৈত্রীভাব। ফল—চিত্তের প্রসাদ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্র'-এ বলেছেন চিত্তের প্রসন্নতালাভের উপায়ঃ "মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" (১।৩৩)

শ্রীশ্রীমায়ের উপদিষ্ট এই মহাবাক্য অনুধ্যানের প্রত্যক্ষ ফল চিত্তের প্রসাদ। আর "প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" (গীতা, ২।৬৫) চিত্তের প্রসাদলাভে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়—এ তো ভগবদ্‌বাক্য। সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরাশান্তি প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভের অব্যর্থ নির্দেশ শ্রীশ্রীমায়ের এই আপাত-সরল ছোট্ট উপদেশটির মধ্যে নিহিত।

উপনিষদের পাতায় পাতায় শুনি 'কেউ পর নয়... জগৎ তোমার'—এই মহামন্ত্রের শাশ্বত অনুরণন। "যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।" (ঈশ উপনিষদ্, ৬) যিনি সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন—তিনি কাউকে ঘৃণা বা দ্বেষ করেন না। কারণ, সেই একই পরমাত্মা বিভুরূপে সকলের মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজিত। উপনিষদ্ বলছেন, এই বৈচিত্র্যময় জগৎ স্বরূপত ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নয়। একই ব্রহ্ম নানারূপে। "তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।/ প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।১।৭) এই ব্রহ্ম থেকেই এসেছে দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি; উৎপন্ন হয়েছে প্রাণ ও অপানরূপ শ্বাসবায়ু; ধান, যবাদি শস্য; এমনকি তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং শাস্ত্রবিধিও। দৃশ্য এবং অদৃশ্য এই জগৎ ব্রহ্মে আশ্রিত, ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং।" তাই 'জগৎ তোমার'—এই মহাবাক্যের অনুধ্যান নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের দ্বারা জগৎপালিনী সেই বিশ্বাত্মিকা শক্তি বা ব্রহ্মের

বিরাট সত্তার সঙ্গে একত্বের সুমহান অনুভূতি এনে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ, ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দের অন্তিম উক্তি ঃ "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত।" উপনিষদেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি। "তদেতৎ সত্যম্। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।১।১)—জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ এই জগৎ এবং তার সকল বস্তু সেই সত্যবস্তু ব্রহ্ম থেকে উৎসারিত। যুগে যুগে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-মনীষীদের অনুভবসিদ্ধ এই পরম সত্য। পুরাকালে মোক্ষকামী সাধক 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এই বাক্য হৃদয়ে ধারণ করে জগৎকে অস্বীকার করে জগতের পারে নামরূপাতীত, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানরূপ সাধনকেই অবলম্বনীয় বলে গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজকের এই কর্মব্যস্ত যন্ত্রযুগে নানাপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষের পক্ষে সেই অজাত, অপ্রাণ, অমূর্ত, অমনা, 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' ব্রহ্মকে ধারণা করাই কঠিন, নিতান্ত অসম্ভবও বলা চলে। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে অক্ষম সন্তানদের মা দিলেন জগৎ-রূপে প্রকাশিত সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার মন্ত্র। যে-মহাশক্তি আমাদের ভিতরে সুপ্ত আছেন, চিদ্‌রূপিণী সেই আত্মশক্তির উদ্বোধন-মন্ত্র এই মাতৃমহাবাক্যটি। আজকের যুক্তিবাদী, সমাজসচেতন ও বিচারপ্রবণ মনের মানুষ মায়ের এই বাক্যটির মধ্যে পেতে পারে নতুন পথের দিশা, নতুন সাধনের অবলম্বন—যা তাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম, দেশ প্রভৃতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়ে পৌঁছে দিতে পারে একত্বময় অনুভূতির পরম লক্ষ্যে। "ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"—এ সেই অনবদ্য অনুভব।

ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা। পিতা থেকে পুত্রে বা গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে পরিবাহিত। পুরাকালে ব্রহ্মা যে-পরাবিদ্যা স্বীয় পুত্র অথর্বাকে দান করেছিলেন বলে কথিত, সেই পরম জ্ঞান এই নবযুগে সারদা সরস্বতী দান করলেন তাঁর ভক্ত সন্তানদের। সাড়ে তিন হাত মাপের রক্তমাংসের এক নশ্বর খাঁচার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ করে মূঢ়, পথভ্রান্ত, শ্রান্ত যে 'অহম্' তার আপন ঘরের ঠিকানা ভুলে 'সংসার-বিদেশে বিদেশির বেশে' পথে পথে ঘুরে মরছিল, তাকে তার নিজ নিকেতনে ফেরার পথ দেখালেন মা। জগতের নাম-রূপ মিথ্যা বা ক্ষণস্থায়ী হলেও তার আধার ও আধেয়রূপে জগতের প্রতি কণায় অনুস্যূত হয়ে আছেন যিনি—তিনি বিশ্বগত আবার বিশ্বাতীত। তিনি আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যে। "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীতা, ১৩।১৪) সর্বত্র তাঁর হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, শির, মুখ এবং সবকিছু আবৃত করে তিনি বিরাজ করছেন। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" জগৎকে 'আমার' জ্ঞান করে সেই জগৎকারিণী, জগৎপালিনী শক্তির সঙ্গে একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা। 'জগৎ তোমার'—মাতৃকণ্ঠোচ্চারিত এই জ্ঞান আমাদের দিব্য উত্তরাধিকার। দেশকালাতীত, নামরূপাতীত সত্তায় উত্তরণের আশ্বাস। জগৎ-রূপে প্রকাশিত সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বানুভবের দ্বারা পরাশান্তিলাভের উপায়।

বলা হয়, মায়ের তুল্য গুরু নেই। "নাস্তি মাতৃসমা গুরু।" নিজের এবং জগৎ সম্বন্ধে শিশুর প্রথম পাঠ শুরু হয় তার মায়ের কাছে। মা-ই শিশুকে শেখান তার আত্মপরিচয়, বংশপরিচয় ও লোকব্যবহার। চিনিয়ে দেন কে আপন, কে পর। জগজ্জননী মর্ত্যতনু ধারণ করে মর্ত্যলোকে এসে আমাদের শেখালেন ঃ "কেউ পর নয়।" বলে দিলেন ঃ "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো।" কারণ—"জগৎ তোমার।" এই জ্ঞানই আমাদের আত্মপরিচয় ও স্বরূপের অবভাসক জ্ঞান, আমাদের মাতৃপ্রদত্ত দিব্য ঐশ্বর্য। সে-ঐশ্বর্য হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করলে সকল ক্ষুদ্রতাবোধের বিলোপ হয়ে বিশ্বাত্মিকা অনুভূতি এবং আত্মসাম্রাজ্য লাভ হতে পারে—যে-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আনন্দে বলা যায় ঃ "সকলেই আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।" ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৫২

পাশাপাশি ঃ (১) করালবদনা, (৪) ততঃ, (৫) নবমং, (৭) ললিতং, (৯) মধুং, (১১) দারুণা, (১২) স্বজনেন, (১৪) নিরাধারা, (১৫) শূন্যে, (১৬) মহাকালিকাং।

ওপর-নিচ ঃ (১) করবাল, (২) বদনং, (৩) পুরুষং, (৪) তং, (৬) মতিং, (৮) তমোগুণা, (৯) মহারাজ, (১০) সুতরা, (১১) দাবানলো, (১২) স্বরাত্মিকা, (১৩) নলিকাং, (১৪) নিন্যে।

সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, রমা রায়চৌধুরী, চণ্ডীদাস গাঙ্গুলি, হৃষীকেশ চক্রবর্তী, উমা পালচৌধুরী, পুষ্পরেণু হালদার, বকুল ঘোষ, স্বদেশরঞ্জন ঘোষ, অণিমা সর্বাধিকারী, গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা অধিকারী, নন্দিতা নাগ, বিশ্বরঞ্জন দাস, মোহিতরঞ্জন দাস, মনোরঞ্জন মিশ্র।

জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ*

জীবনের পথ ধরে চলতে চলতে কত যে বিচিত্র ছবি চোখে পড়ে, আমরা তার ইয়ত্তা করতে পারি না। দারিদ্র্য তাকে বিবর্ণ করতে পারে না। সংগ্রামের ঘামে ভিজেও তা আশ্চর্য রঙিন! দুচোখ ভরে দেখি। আনন্দে কী এক অব্যক্ত আবেগ বুক ঠেলে চোখে আসে। তারপর নীরবে চোখ উপচে নামে গঙ্গা-যমুনা। জীবন আর তখন কঠিন পথ থাকে না। জীবন হয়ে যায় মসৃণ, নদীর মতো। সেই জীবন-নদীর অতলান্ত গভীরে থাকে মণি-মানিক। আমরা গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজে ফিরি সেই অরূপরতন। জীবনের আপাত কাঠিন্যকে তুচ্ছ করে কী অফুরন্ত শক্তিতে বৃহত্তর আঙ্গিকে জেগে থাকে অন্তরতর জীবন। তা কখনোই ফুরিয়ে যায় না। আমাদের টেনে নিয়ে যায় জীবনের নিহিতার্থের দিকে। রক্ত আর ঘাম মুছে জীবন সেখানে অনন্যসুন্দর। মরণের স্থির চোখে চোখ রেখে সেখানে মাথা তোলে প্রত্যয়ী জীবন, চৈতন্যময় অপরিমেয় জীবন। খণ্ডিত দৃষ্টির আড়াল সরিয়ে রেখে জীবন সেখানে অখণ্ড মৌনতায় স্থির হয়ে থাকে। সেই নিভৃত প্রাণের দেবতাকে আমরা প্রণাম করি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসিবৃন্দ মানুষকে কত কাছ থেকে দেখেন। তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের সেবা করতে পেরে ধন্য বোধ করেন। এইসব মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষিত অথচ নিম্ন বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। আর আছে দরিদ্র মানুষ। তাদের শরীরে আছে অপুষ্টি, গায়ে কাদা আর মাটির গন্ধ। আছে তথাকথিত শিক্ষার অভাব, আর আছে বঞ্চনার জ্বালা। পরিপার্শ্বের নির্দয় চাপে খুইয়ে ফেলা জীবনের শ্রী। তবু তারা স্বপ্ন দেখে। একথা রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী মানবসমাজ বুক ঠুকে বলতে পারেন। কারণ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবার হাত তাদের স্পর্শ করতেই তাদের চোখে জ্বলে ওঠে স্বপ্নের প্রদীপ। সেই নির্মল আলোর পথে চলেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী পৃথিবীর অগণিত মানুষজন। এভাবে পথ চলার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ, তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা যাকে ভুল করে বল মানুষ, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি।" আজ আমরা জীবনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টায় ব্রতী হতে চেষ্টা করি।—**সম্পাদক**

'মা' শব্দটির মধ্যে যে গভীর আবেগ, আশ্রয় আর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চিত্তের প্রখর তাপকে মমতা দিয়ে হরণ করে ছায়ার স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে যিনি ক্লান্তিহীনভাবে আমাদের রক্ষা করেন—তিনিই মা। আমাদের জন্য তাঁর অন্তহীন ক্ষমা, চিরকালের সাগ্রহ অপেক্ষা। মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারলে মিলবে অফুরান আনন্দ আর অপার শান্তি। সন্তান মাকে ভুলে অনেক সময় আপাত আকর্ষণীয় কিছু নিয়ে মেতে ওঠে। দিনান্তে ক্লান্তপদে সর্বাঙ্গে অবসাদ মেখে যখন সে ঘরে ফেরে তখন বিস্ময়ের সঙ্গে সে লক্ষ্য করে, গভীর অন্ধকারে গৃহদ্বারে মায়ের দুটি চোখ প্রতীক্ষার প্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

মা কখনো গর্ভধারিণী, কখনো দেশমাতৃকা আবার মা বুঝি জগন্মাতা। মা জন্মদাত্রী, মা পালনকর্ত্রী, মা মুক্তিপ্রদায়িনী। মা তাই আমাদের পরমারাধ্যা। মাকে ঘিরেই আমাদের জীবন। মা-ই আমাদের জীবনীশক্তি, আমাদের চালিকাশক্তি। সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলের তেমনই একজন মাতৃগতপ্রাণ শিক্ষকের উজ্জ্বল স্মৃতি আজও আমাকে আলোড়িত করে, প্রেরণা দেয়।

পরেশনাথ চক্রবর্তী হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলের একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। গভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর সর্বসাকুল্যে পেয়েছিলেন মাত্র এগারো হাজার টাকা। সাংসারিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সেই টাকা ব্যাঙ্কের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলে জমা করে দেন। প্রতিবছর ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত সুদের ভিত্তিতে প্রচলন করেন 'বামাসুন্দরী স্মৃতি মেধা পুরস্কার'। বামাসুন্দরী দেবী ছিলেন পরেশবাবুর গর্ভধারিণী মা। প্রতি বছরই এই মেধা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সভাপতিত্বে এই সারস্বত সম্মেলনে বিশিষ্ট দু-তিনজন শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকেন এবং শিক্ষাবিষয়ক ইতিবাচক নানা আলোচনা করেন। শ্রোতার আসনে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়াও পুরনো ও বর্তমান পুরস্কার-প্রাপক, তাঁদের অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা ক্যুইজ, বক্তৃতা, আবৃত্তির মাধ্যমে মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী চর্চায় অংশগ্রহণ করেন। হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রতিবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম পাঁচজন, উচ্চ মাধ্যমিকে ঐ অঞ্চলের প্রথম তিনজন এবং পৃথগ্‌ভাবে ছাত্রী ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রথমজন (মেধাতালিকার অন্তর্গত নয়) বিশেষভাবে উক্ত সভায় পুরস্কৃত হয়। সকলের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা থাকে পরেশনাথ চক্রবর্তীর বদান্যতায়।

ব্যক্তিগতভাবে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে উক্ত সভায় আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আশি বছর অতিক্রান্ত বৃদ্ধ প্রবল উৎসাহে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রতিবছর তিনবার হিঙ্গলগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসতেন। প্রথমবার অনুষ্ঠানের দিন স্থির করতে, দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণলিপি হাতে পৌঁছে দিতে এবং তৃতীয়বার গাড়িভাড়া দেওয়ার জন্য আসতেন। অথচ স্নেহপ্রবণ এই মানুষটি আমাদের অধিক পরিশ্রম করতে দেখলে মিষ্টি ভর্ৎসনা করে বলতেন ঃ "বাবাজি, শরীরটা একটা যন্ত্র। যন্ত্রেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। তা নইলে যন্ত্র বিদ্রোহ করবে।"

অনুষ্ঠানে মঞ্চসজ্জার অভিনবত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মঞ্চের মধ্যস্থলে পরেশবাবুর মায়ের অর্থাৎ বামাসুন্দরী দেবীর প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতির একদিকে পিতলের থালায় হিঙ্গলগঞ্জের একতাল মাটি এবং অন্যদিকে হিঙ্গলগঞ্জের জলপূর্ণ একটি কলস। মঞ্চে এই মা, মাটি এবং জলের বিন্যাসের ঠিক

* *বর্তমানে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সংগঠক।*

জীবনের অনন্ত পরিসরে আনন্দ-বেদনার সুগভীর স্পর্শে চেতনার অন্তরতর সত্তা জেগে ওঠে। জলছবি সেই সুন্দরকে আমাদের প্রাত্যহিকীতে লগ্ন করতে প্রয়াসী হয়েছে।

—সম্পাদক

পিছনে টেবিলের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের আলোকচিত্র সাজানো হতো। ছয়টি ফুলের মালায় সজ্জিত প্রতীকী উপস্থাপনা সভার শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে রেখাপাত করত, সন্দেহ নেই। সেই আবেশ সকলের মন-প্রাণকে আরো গভীরভাবে আন্দোলিত করত যখন আবেগে আপ্লুত পরেশবাবু মঞ্চের প্রতিকৃতিগুলিকে এবং হিঙ্গলগঞ্জের মাটি ও জলকে ধূপ-ধুনো দিয়ে আরতির মাধ্যমে মাতৃবন্দনার সূচনা করে সভায় উপস্থিত সকলকে একইভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে আরতি সমাপন করতেন।

পুরস্কার বিতরণের দিন পরেশবাবুর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকত না। তিনি বলতেন ঃ "আজ আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। কারণ, এদিন আমার মাকে বিশেষভাবে মনে পড়ে। মাকে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পাই।" পরেশনাথ চক্রবর্তী সম্ভবত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সাধন চক্রবর্তী এবং নাতি গণেশ চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে আমেরিকায় গবেষণারত) প্রতিবছর গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐতিহ্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। আজও মা, মাটি, জল, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে যোগ দেন রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন একজন সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ এবং আত্মীয়-পরিবৃত শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে হিঙ্গলগঞ্জের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষিতের হার খুবই আশাব্যঞ্জক এবং শিক্ষার মানও বেশ উন্নত। হিঙ্গলগঞ্জের সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনের অন্ধকারে যে শিক্ষার আলো জ্বলে উঠেছে, তা সম্ভব হয়েছে পরেশনাথ চক্রবর্তীর বুকের পাঁজরের বিনিময়ে। একলা রাতের অন্ধকারে তাঁর জীবনের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে তিনি জ্বেলেছেন আত্মনিবেদনের অনির্বাণ আলো।

মানুষের শরীর মরণশীল। কিন্তু তার কীর্তি তাকে অমরতা দেয়। আজও হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ আনত হয়ে তাঁদের গ্রামের মাস্টারমশাইকে প্রণতি জানায়। পরেশবাবু শেষ বয়সে বড় আনন্দে থাকতেন। উপনিষদ্ বলেন, আনন্দই আমাদের স্বরূপ, আমাদের সত্তা। সর্বজনের মনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, বোধকরি, পরেশবাবু নিজের সত্তার কাছে ফিরতে পেরেছিলেন। শেষের দিকে পরেশবাবুর মাড়িতে একটিমাত্র দাঁত অবশিষ্ট ছিল। দাঁতটি তুলে ফেলার পরামর্শ দিলে ফোকলা হাসিতে দুষ্টুমি মিশিয়ে বলতেন ঃ "এটা থাক। সিদ্ধিদাতা গণেশেরও তো একটি দাঁত।" পরার্থে জীবনদান করে পরেশনাথ চক্রবর্তীও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যা নিরন্তর আমাদের জীবনে ঋদ্ধিদান করে চলেছে। [ক্রমশ] ॥ দুই ॥

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী ও শিল্প

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার ভিত্তিতে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে শিল্পকলার নিবিড় যোগসূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় শিল্পকলায় বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে নবতম ভাবস্রোত উৎসারিত হয়েছে। শিল্প আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু অসামান্য। বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে ভারত-শিল্পের অফুরন্ত প্রেরণারূপিণী বলা চলে। নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প আন্দোলন দানা বাঁধে ও কালের পথে যাত্রা শুরু হয়—সেই মহান যাত্রায় সামিল হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ই. বি. হ্যাভেল, জন উডরফ থেকে শুরু করে ভারত ও প্রাচ্য শিল্পের ব্যাখ্যাতা আনন্দকুমার স্বামী, এমনকি জাপানি শিল্পী ওকাকুরা পর্যন্ত। এইসব মনীষীর স্মৃতিচারণামূলক রচনা ও কর্ম নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বিপুল গবেষণা-সম্ভার এবিষয়ে আমাদের ঋদ্ধ করেছে।

বর্তমান কালের শিল্পীদের মধ্যে সুনীলকুমার পাল এই সুমহান ঐতিহ্যের অন্যতম অভিযাত্রী। ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সুনীলকুমার পালের অবাধ গতায়াত। আজও আত্মমগ্ন এই সাধক-শিল্পী আপন বিশ্বাসে চলমান। প্রতিভা শব্দটির বহুল প্রয়োগেও তাঁর শিল্পের মহত্তম আবেদনকে স্পর্শ করা যায় না। তাঁর শিল্পকর্ম তাঁর শিল্পজীবনের পূজা। ভারতের শিল্প জাগরণে ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যাঁরা জিগির তুলবেন, সুনীলকুমার পাল তাঁদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সুনীলকুমার পালের শিল্পকর্ম দেখে তাঁরা নিরুত্তর হবেন, সন্দেহ নেই।

কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সুনীলকুমার পাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যপ্রিয় পাল, মাতা নলিনীবালা দেবী। সত্যপ্রিয় পালের দাদামশায় নীলমাধব দে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিও'র অধিকর্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের থামে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত আলোকচিত্রটি নীলমাধব দে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিও'তে তুলেছিলেন। স্বনামধন্য শিল্পী সুনীলকুমার পালের অন্তরে এই চিত্র-শক্তি চিরজাগরুক থেকে তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মকে পরিচালিত করে চলেছে।

পরিবারে শিল্পচর্চার আবহ ছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতার 'গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট' (বর্তমানে 'গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ') থেকে মডেলিং বিভাগের শিক্ষার্থী হিসাবে সসম্মানে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে নেপাল যান এবং তাঁদের অনুরোধে তৎকালীন নেপালরাজ ও প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি নির্মাণ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা অবলম্বনে রিলিফ মূর্তি নির্মাণ তাঁর অন্যতম সেরা কীর্তি। ভাস্কর্য ছাড়াও চিত্রকলা ও স্থাপত্যবিদ্যাতেও তিনি অসাধারণ নজির গড়েছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ শিল্পীর স্থাপত্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্যের এক সুচারু সমাবেশ। পুরুলিয়া ছাড়াও দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম তাঁর শিল্পকর্মের নিবেদন গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট'-এর মডেলিং ও ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এই বিনম্র শিল্পস্রষ্টা বহু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—১৯৪৬ ঃ রাজ্যপালের স্বর্ণপদক; ১৯৮২ ঃ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রদত্ত নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার; ১৯৮৭ ঃ অবনীন্দ্র পুরস্কার; ১৯৮৮-১৯৮৯ ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একাডেমি পুরস্কার; ২০০৩ ঃ লেডি রাণু মুখার্জি মেমোরিয়াল লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর ভিস্যুয়াল আর্ট; ২০০৫ ঃ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক; ২০০৫ ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি; ২০০৫ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি প্রদত্ত স্মারক পুরস্কার। প্রচ্ছদচিত্রটির শান্ত ও স্নিগ্ধ আবেদন মনকে আবিষ্ট করে। প্রচ্ছদের আঙ্গিক ও রঙের ব্যবহারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার আশ্চর্য গলাগলি আমাদের শুধু মুগ্ধতায় আবদ্ধ করে না, নতুন দিশাও দেয়।—সম্পাদক

চতুর্থ প্রচ্ছদের আলোকচিত্রী ঃ **অতুণ বন্দ্যোপাধ্যায়** ■ প্রচ্ছদের কারিগরি সহায়ক ঃ **অরিসূদন দত্ত**

শক্তির উদ্বোধন

সোমা ঘোষ*

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কোন এক পৌরাণিক সন্ধ্যালগ্নে ভারতবর্ষের জীবন্ত তীর্থ অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পত্নী দেবী সীতা এবং প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে চোদ্দ বছরের বনবাস শেষ করে ফিরে এসেছিলেন। যেহেতু সেই সন্ধ্যাটি ছিল অমাবস্যার নিশি, সেইহেতু চারিদিক ছিল অন্ধকারের কালো। তাই মাতা কৌশল্যা আদেশ দিলেন সমগ্র অযোধ্যায় এত প্রদীপ জ্বালানো হোক, যার ফলে সেই রাতের অযোধ্যায় কোথাও কালো অন্ধকারের এতটুকু চিহ্ন না থাকে। তাঁর কথামতো প্রদীপের আলো অন্ধকারের রাতকেও দিনের মতো আলোকিত করে তুলেছিল। কিন্তু যখন শ্রীরাম তাঁর প্রিয়া সীতাকে নিয়ে পুষ্পক রথ থেকে অযোধ্যায় তাঁর চরণযুগল রাখলেন, তখন তাঁদের উপস্থিতি সহস্র দীপের আলোর থেকেও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেবী সীতার লাবণ্যের সামনে সকল দীপই ম্লান হয়ে লজ্জিত হলো। ঠিক যেমন করে সহস্র নক্ষত্রের মাঝে এক ও অদ্বিতীয় চন্দ্র উদিত হলে নক্ষত্রেরা লজ্জা পায়।

অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যা থেকে 'সবুজ পাতা' নতুন আঙ্গিকে নিজেকে মেলে ধরেছে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে 'সবুজ পাতা'য় আসন করে নিতে পারেন।—সম্পাদক

লঙ্কার অশোক বন থেকে সীতা উদ্ধারের দিনটি 'ধনবর্ষা' বা 'ধনতরাস' নামে পরিচিত এবং রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দিনটিতে যে দীপের উৎসব হয়েছিল, তা-ই হলো 'দীপাবলি'। এই দুটি উৎসব আজও মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। ধনতরাসে আমরা নতুন ধাতু কিনে ঘরে আনি অর্থাৎ মা লক্ষ্মীকে আহ্বান করি। ঠিক যেমন রামচন্দ্র তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে এই দিনেই ফিরে পেয়েছিলেন। আর রামচন্দ্রের আগমন-রজনীতে যেমন আলোর উৎসব হয়েছিল, ঠিক তেমনি আজও ঘরে প্রদীপ জ্বেলে আমরা শ্রীবিষ্ণুকে আহ্বান ও প্রার্থনা করিঃ "অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।/ ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥"—হে বিষ্ণু! আমার ঔদ্ধত্য দূর কর, অন্তঃকরণ সংযত কর, বিষয়-মৃগতৃষ্ণা শান্ত কর, জীবের প্রতি দয়া বিস্তার কর এবং আমায় সংসারসাগর থেকে ত্রাণ কর।

এ তো গেল পৌরাণিক কাহিনী। বর্তমানে এই অমাবস্যা তিথিতে মা মহাকালীর আরাধনা করা হয়। এই প্রথা কবে, কিভাবে বা কার দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল তা আমার জানা নেই। তবে একথা আমরা জানি, দেবী মহাকালী পাপসংহারিণী। তিনি মহারুদ্রা। অর্থাৎ শুভকে পালন করেন এবং অশুভকে ধ্বংস করেন। দেবীর পদযুগলে আমাদের শতকোটি প্রণাম।

দেবী মহাকালীর যে-মূর্তি আমরা দেখি, তাতে তিনি নৃমুণ্ডমালিনী। সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে, দেবীর মুণ্ডমালার নরমুণ্ডগুলি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক।

যখনি পৃথিবীতে পাপের তাণ্ডব চরমে উঠেছে, তখনি ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন মর্ত্যে। যখন আমরা তাঁকে প্রাণ থেকে ডাকি, হৃদয় থেকে ডাকি, অন্তরের অন্তস্তল থেকে ডাকি তখন তিনি আসেন। মনে পড়ে শ্রীবিষ্ণুর আগমনের পথ প্রস্তুত করার জন্য দস্যু রত্নাকর মহাসাধক বাল্মিকী হলেন। এমনকি তাঁকে আহ্বানের জন্যই দেবী অহল্যা পাষাণ হলেন।

তিনি সেদিন দুঃখীর আর্তনাদে এসেছিলেন। আজও আবার সেই আর্তনাদেই শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে জগতের শক্তি জাগরিতা হয়েছেন। সেই শক্তি শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে জগতের কল্যাণে। মানুষের মধ্যে যে-শক্তি রয়েছে, তাকে ঊর্ধ্বায়িত করে নতুন পৃথিবীর নির্মাণে চালিত করে চলেছে রামকৃষ্ণ-সারদা যুগল শক্তি। আপাতভাবে এখন সঙ্কটকাল উপস্থিত বলে মনে হলেও তা সাময়িক। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ সেই আনন্দবার্তা দিকে দিকে প্রচার করে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ একত্র হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ পরিগ্রহ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনা মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী মায়ে পরিণত করেছে।

তাই দেবীর সামনে শুধু নিজের ও নিজের স্বজনদের মঙ্গলকামনা করেই যেন আমরা ক্ষান্ত না হই, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করব। বিন্দু বিন্দু জলের মিলনে যেমন সাগর তৈরি হয়, তেমনি সকলের মিলিত প্রার্থনায় তিনি আবির্ভূতা হবেন আমাদের অন্তরে। তিনি অশুভের বিনাশ করবেন, ধরণি সুন্দর হবে, পুণ্যের আলোক জ্বলে উঠবে এই বিশ্বে। ❑

** হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের বি. এ. তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ধর্মজীবনে গভীরভাবে বিশ্বাসী এই শিক্ষার্থী সহজ-সরলভাবে তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক পৃথিবীর সঙ্কটকালে যথাযথ ধর্মীয় জীবনই মুশকিল আসান করতে পারে, তারও ইঙ্গিত রয়েছে বর্তমান রচনায়।—সম্পাদক*

"দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান"

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ*

যিনি নিজে যাতনার মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য পেয়েছেন অথবা যাতনার মধ্য দিয়ে যাঁর জীবনে বোধির উন্মেষ ঘটেছে, যিনি "তাপিতের তরে নরদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে"[১] এ ধরাধামে এসেছেন, ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্যের পেষণে যিনি পিষ্ট, পড়াশোনার সুযোগ থেকে চির-বঞ্চিত, শৈশবে যাঁর গা থেকে গহনা খুলে নেওয়া হয়েছিল তাঁর অজান্তে, যাঁকে আট হাত ছেঁড়া কাপড় গাঁট দিয়ে পরতে হতো, পল্লিবাসীদের কাছ থেকে যাঁকে বহুবার 'পাগলের স্ত্রী'—এই অপমানসূচক ব্যাঙ্গোক্তি শুনতে হতো, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যাওয়ার পরেও যাঁকে শাক বুনে খেতে হতো, ভগবান ছাড়া সহানুভূতি জানাবার যাঁর কেউ ছিল না, মাথা নত করে নীরবে যিনি সকলপ্রকার অপমান ও দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করেছিলেন, কেবল তিনিই বলতে পারেন ঃ "দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান!" "তুমি যে আছ বক্ষে ধরে বেদনা তাহা জানাক মোরে—চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে।"[২]

বেদনা দিয়েই শুরু হয় মানুষের প্রকৃত জীবনজিজ্ঞাসা। "যত বেদনা তত চেতনা, যত চেতনা তত উত্তরণ"—জীবনের পৃষ্ঠায় এটাই প্রতিধ্বনিত হয় বারবার। "ঘর্ষণ ছাড়া রত্ন যেমন উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ চোখের জল ছাড়া পরিপূর্ণ মানুষ হয় না।" ("The gem cannot be polished without friction, nor man can be perfected without tears."—Confucious)[৩]

বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্ট 'মানুষের ঈশ্বর' হয়ে গেলেন। একটি অসহায় ছাগের জীবনরক্ষার জন্য আত্মদানে প্রস্তুত বুদ্ধদেব করুণাবতার হিসাবে অমরতা লাভ করলেন। গোমুখ থেকে পতিত অমসৃণ শিলাখণ্ড যখন খরস্রোতা নদীর স্রোতের ধাক্কায় আঘাত পেতে পেতে মসৃণ হয়, তখনি সে পূজার বেদিতে স্থান পায়। সুতরাং 'যত আঘাত, তত উত্তরণ'। স্বামীজী বলছেন, এমন স্থানে যাও যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করুক, অপমান করুক, তোমার ক্ষুদ্র অহঙ্কারটাকে গুঁড়িয়ে দিক এবং তখনি তুমি ঈশ্বরের অতি নিকটস্থ হতে পারবে। "যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।"[৪] প্রত্যেকের জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখ ও কী নিদারুণ যন্ত্রণা থাকে, তা তো আমাদের সকলেরই জানা। সক্রেটিসকেও সংসারের অভাবের জন্য ছেলেবেলায় পড়াশোনার পরিবর্তে পাথরকাটার কাজ নিতে হয়েছিল, কত উপহাস, কত ব্যঙ্গোক্তি তাঁকে শুনতে হয়েছিল এবং জীবনের প্রান্তলগ্নে বিষপূর্ণ পাত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিণামে কি হলো? সক্রেটিস হয়ে উঠলেন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন। টমাস আলভা এডিসনকেও বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য ট্রেনে খবরের কাগজ, চকলেট, বাদাম বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করতে হতো। মাইকেল ফ্যারাডে খেতে পেতেন না, সারা সপ্তাহে একখানি পাঁউরুটি খেয়ে কাটাতেন, ১৩ বছর বয়সে তাঁকে পত্র-পত্রিকা নিয়ে ফেরি করতে হতো, তারপর বই বাঁধাইয়ের কাজ করে সংসার চালাতে হতো। পরবর্তী কালে তাঁরা নোবেলজয়ী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন। লর্ড বায়রনের পা ছিল বিকৃত। জুলিয়াস সিজার মৃগীরোগী ছিলেন। টমাস আলভা এডিসন বধির ছিলেন। অ্যাডমিরাল নেলসা একচক্ষু ছিলেন। আধুনিক বিশ্বের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। হেলেন কেলার জন্মের পরই দৃষ্টিহীন ও বধির হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই জীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন শুধু দুঃখ আঘাত ও যন্ত্রণায় ভরপুর। পিতার মৃত্যু, গর্ভধারিণী মা ও ভাইদের ক্ষুধার্ত মুখ, বোনের আত্মহত্যা, আত্মীয়-স্বজনদের অসহযোগিতা, বিদেশের মাটিতে স্বদেশি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা, কুৎসা, নিন্দা-অপবাদ-রটনা, প্রাথমিকভাবে গুরুভাইদের ভুল ধারণা—এইরকম বহু আঘাত তাঁকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত বেদনা-দুঃখ নিজের করে নিয়েছিলেন বলেই আজ তিনি বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ হতে পেরেছেন। ইটালির রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন জারজ সন্তান। এই বেদনা তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। সেইজন্যই হয়তো তাঁর তুলি থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল জীবন্ত শিল্পসম্ভার, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত চিত্র 'ভার্জিন অফ দি রক্স', 'মোনালিসা', 'লাস্ট সাপার', 'দি ব্যাটল অফ আগিয়ারি'। তুলসীদাস তাঁর স্ত্রীর ভর্ৎসনাপূর্ণ কথায় মনে খুব আঘাত পেয়ে ঈশ্বর-আরাধনায় চিরনিমগ্ন হন এবং সন্ত তুলসীদাস হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির শিখরে আরোহণ করলেও প্রিয়জন হারানোর শোক, নিকট আত্মীয়ের কাছে পাওয়া তীব্র অপমান, অর্থকষ্ট, ঈর্ষাকাতর মানুষের তরফ

---

* বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের গ্রন্থাগারিক। অনুভবী লেখক। শ্রীমা সারদাদেবীর বাণীর প্রেক্ষিতে মনীষীদের জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করেছেন বর্তমান নিবন্ধে। রচনাটি আঙ্গিকে নিবন্ধ হলেও কবিতার আমেজ এনে দেয়।—**সম্পাদক**

থেকে কুৎসা রটানোর চেষ্টা ও নিন্দাবাদ তাঁর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। পরিবর্তে রবীন্দ্র-হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল সৃষ্টির পেলব আলো। "কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ? চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো। অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব। তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।"[৫] তাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ভাষায় বলতে হয়ঃ "সেই সঙ্গীতগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে মধুর, যেগুলি দুঃখের চিন্তা বয়ে নিয়ে আসে।" স্বামীজী মৃণালিনী বসুকে লিখছেন ঃ "মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে।... যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয়, যেন এ-যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে—তখনি এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, একফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।"[৬]

সীতার ব্যথার সাক্ষী একমাত্র ধরিত্রী! রাবণ তাঁকে অপহরণ করে অশোক বনে রেখে রাক্ষসীদের দিয়ে নিদারুণ অত্যাচার করেছে। রামচন্দ্রও প্রজাদের কথা শুনে তাঁকে অবিশ্বাসের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করেছেন, পিতৃ ও শ্বশুরালয় ছেড়ে তাঁকে বনবাসী তথা আশ্রমবাসী হতে হয়েছে। অবশেষে বোবা কান্নার চাপা অসন্তোষে ধরিত্রী ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেয়ে উঠেছে ঃ "নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ, শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,/ পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে॥/ শতদলদল খুলে যাবে থরে থরে,/ লুকানো রবে না মধু চিরদিন-তরে॥"[৭]

দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ও আঘাতে তিনি সেদিন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন বলেই আজ তিনি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে দেবীর আসনে চির অধিষ্ঠিতা হয়ে পূজিতা হচ্ছেন!

মীরাবাঈকেও কী নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল! চিতোরের রাণা বিক্রমজিৎ ও তাঁর দেওয়ান দয়ারাম ষড়যন্ত্র করে চরণামৃতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ও ফুলের সাজির মধ্যে গোখরো সাপের বাচ্চা রেখে দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু ভগবান যাঁর হাত ধরে আছেন, তাঁকে মারে কে? বিষ পরিণত হলো অমৃতে, গোখরো সাপ শালগ্রাম শিলায় ও নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পে। "আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।"[৮] অবশেষে বিক্রমজিৎ তাঁকে যখন লাঞ্ছনা ও অপমান করে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন, তখন মীরা গাইলেন ঃ "তুমহরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা—অব মোহি ক্যুঁ তরসাও। অব ছোড়া নহি বনৈ প্রভুজী—চরণকে পাশ বুলাও।"[৯]—তোমারি লাগিয়া সব সুখ ছাড়িনু—আর কেন পিপাসিত রাখো? "আরো আরো, প্রভু, আরো আরো। এমনি করে আমায় মারো।"[১০] রাজকুলবধূ মীরাবাঈ এখন ভিখারিণী! শয়ন তাঁর এখন—"সুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, আর গৃহছাদ বিস্তীর্ণ আকাশ!" কথায় আছে—"যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ। তবু যে করে আশ, হই তার দাসের দাস।"

"যস্য মাং ভজতে নিত্যং বিত্তং তস্য হরাম্যহম্। করোমি বন্ধুবিচ্ছেদং স তু কষ্টেন জীবতি।/ এষু তাপেষু সন্তপঃ, যদি মাং নঃ পরিত্যজেৎ/ দীয়তে পরমং স্থানং যৎ স্থানং দেবদুর্লভম্॥"[১১]—যে আমাকে ভজনা করে তার বিত্ত হরণ করি, তার বন্ধু বিচ্ছেদ করি, তাকে অতি কষ্টে রাখি। এত কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও যদি সে আমাকে পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাকে পরম স্থান দিই, যে-স্থান দেবতাদের নিকটও দুর্লভ। "আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে/ তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে।"[১২] যিশুখ্রিস্টের কথায় ঃ "যার আছে তাকে আরো দাও, যার নেই তার সব কেড়ে নাও।"

এখন, একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে পুণ্যাত্মারা এত দুঃখ পান অথচ আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা বেশ সুখে থাকেন কেন? ন্যায়দর্শনের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—দুঃখ জীবাত্মার গুণ, সুতরাং গুণ আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। আর, আশ্রয়ভূত গুণ যেহেতু অনুভবসাপেক্ষ, সেহেতু তা কখনো বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা আশ্রয়ভূত গুণকে অনুভব করি। মন সূক্ষ্মশরীরের অংশ। এই সূক্ষ্মশরীরেই প্রারব্ধ-কর্ম সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে ভবিষ্যতে ফল দেওয়ার জন্য। "শুভ কর্মে—শুভ, মন্দে—মন্দ ফল, এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।"[১৩] শেষ বস্তুতে আঘাতের তারতম্য অনুসারে যেমন বিভিন্ন তরঙ্গের শব্দ উৎপাদিত হয়, সেইভাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কর্ম তদনুযায়ী বিভিন্ন ফলপ্রদান করে, এটা স্বাভাবিক। কর্মফলদাতা একমাত্র ঈশ্বর। জীব যাতে কর্মফল ভোগ করতে পারে, সেজন্য তাদের নানা অদৃষ্ট অনুযায়ী ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার ফলেই পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চার হয়। সুতরাং দুঃখের কারণ আমি, ঈশ্বর নন। আমি যখন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হই, তখনি সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সংযোগ আসে ইচ্ছা নামক প্রবৃত্তি থেকে। যেমন, উট তার প্রবৃত্তিবশত সুখানুভবের জন্য কাঁটাঘাস খেতে যায়, কিন্তু রক্তক্ষরণের পর যখন যন্ত্রণা শুরু হয় তখন সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। তার ফলে প্রারব্ধ-

কর্ম ক্ষয় হয়। অথবা, শিশু কখনো রূপে মুগ্ধ হয়ে (অপকেন্দ্রিক বল) আগুনে হাত বাড়ায়। কিন্তু যখন হাতে ছ্যাঁকা লাগে (অভিকেন্দ্রিক বলের সৃষ্টি হয়), তখন নিবৃত্তিরূপ সংস্কারের প্রভাবে সে পুনরায় হাত বাড়ায় না। এইভাবে ভোগের মাধ্যমে সঞ্চিত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়। সাধারণত সকল ইচ্ছারই থাকে কোন না কোন বিষয়। সেই বিষয়টি হতে পারে ফল বা সাধন, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কোনরূপ ফললাভের আকাঙ্ক্ষা আছে অথবা সর্বশক্তিমান তাঁর কোন সাধন বা উপায় গ্রহণের ইচ্ছা হয় —এই ধরনের কল্পনা একেবারেই অবান্তর। সুতরাং, তাঁর জগৎ-সৃষ্টি এবং আমাদের শুভাশুভ কর্মানুযায়ী তিনি যে ফলদান করেন তা আমাদের প্রতি একান্ত করুণাবশত। ক্রমাগত দুঃখভোগের মাধ্যমে আমাদের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ে এবং মন সেই কারণে পরমার্থমুখী হয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গীরা উভয়েই যে দুঃখ পান তা ভগবানের দয়ারই দান।

আমাদের অবস্থা ঠিক দুর্যোধনের মতো। দুর্যোধনের বিবেক সংস্কার ছিল, কিন্তু সে তার (শুভবৃত্তির) প্রয়োগে অক্ষম ছিল। ধর্ম ও অধর্ম কি তা সে ভালই জানত, কিন্তু ধর্ম অনুশীলনে ও অধর্ম ত্যাগে তার কোন প্রবৃত্তি ছিল না। সেইরূপ আমাদেরও ভোগস্পৃহারূপ প্রবৃত্তিমার্গ প্রবল হওয়ার জন্য বারে বারে দুঃখ আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও (রক্তক্ষরণ/হাতে ছ্যাঁকা) কাঁটাঘাসই চিবাতে থাকি অথবা আগুনের দিকে হাত বাড়াতে থাকি! অতএব আমাদের কর্মই আমাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে নিয়ে যায়। মা একজনকে পূর্বকৃত শুভকর্মের ফলে সরাসরি 'নিবৃত্তিমার্গ' অবলম্বনে সদর দরজা দিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে যান অর্থাৎ দুঃখ, আঘাত, যন্ত্রণা পেতে পেতে যে-সন্তান কেবলই 'মা যাব', 'মা যাব' করতে থাকে, মা তখন তাঁর সব কাজ ফেলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নেন। "আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে—তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক তারে।।" আর, যে ধুলোকাদা মেখে খেলা করতে পছন্দ করে, রক্তক্ষরণ হওয়া সত্ত্বেও যে কাঁটাঘাস চিবাতেই পছন্দ করে, তাকেও প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে খিড়কির দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘুঁটি পাকিয়ে কোলে তোলেন। "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ; আমি না ডাকিতে, হৃদয়মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ; 'ও পথে যেও না, ফিরে এস' বলে কানে কানে কত কয়েছ; তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।"[১৪] সুতরাং ঈশ্বর তাঁর কোন সন্তানের প্রতিই কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না, কারণ যিনি সকলের ব্যষ্টিমনের নিয়ন্তা, সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক—তিনি কারো প্রতি কেনই বা পক্ষপাতিত্ব করবেন? সুতরাং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় মার্গে বিচরণকারীদের বিষয়েই বলা যায়—"দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান।"

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের যেসব মহান ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানি, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবন শুধু আঘাত, দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনায় ভরপুর! হলাগ্র-বিদীর্ণ না হলে বসুমতী যেমন শস্যপ্রসবের উপযুক্ত হন না, তেমনি আত্মাভিমান ও লালসায় পরিপূর্ণ মানবহৃদয় কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণায় জর্জরিত না হলে ভগবৎপ্রেম গ্রহণ করতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত জমিতে বর্ষার অবিরল ধারাপ্রপাতে উৎপন্ন ফসলের আনন্দে কৃষক যেমন আপনার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করে; ভক্তও তেমনি প্রথমাবস্থায় বহু ক্লেশ, বহু পরীক্ষা অতিক্রম করে পরিণামে ভগবদ্দর্শনরূপ অনুপম আনন্দে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্তিলাভ করেন। "আঘাত করে নিলে জিনে, কাড়িলে মন দিনে দিনে।।/ সুখের বাধা ভেঙে ফেলে তবে আমার প্রাণে এলে—/ বারে বারে মরার মুখে অনেক দুখে নিলেম চিনে।।/ তুফান দেখে ঝড়ের রাতে ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।/ বাটের মাঝে, হাটের মাঝে, কোথাও আমায় ছাড়লে না-যে।"[১৫]

দুঃখের সময় ভগবান আমাদের তাঁর কোলে তুলে নিয়ে জীবনযুদ্ধের বড় বড় আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন। তাই করুণাময়ী জননী শ্রীমা সারদাদেবীর বাণী "দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান" সত্যের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। দুঃখভোগ বস্তুত তাঁর লীলামাত্র—আমাদের কাছে আদর্শস্থাপনের জন্য। ❑

তথ্যসূচি

১ আমাদের গান—স্বামী চণ্ডিকানন্দ, ১৯৯৪, পৃঃ ১২৭
২ গীতবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূজা পর্ব, ২০০২, পৃঃ ৭৩
৩ Living moments of suffering—J. Maurus, 3rd ed., p. 38
৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২০৮
৫ গীতবিতান, পৃঃ ১৪২
৬ পত্রাবলি—স্বামী বিবেকানন্দ, ২০০০, পৃঃ ৭৫৯-৭৬০
৭ গীতবিতান, পৃঃ ৭৮
৮ ঐ, পৃঃ ৫৫
৯ মীরাবাঈ (ভজনমালা), পৃঃ ৩৪
১০ গীতবিতান, পৃঃ ৭৩
১১ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পত্র-সঙ্কলন, ৩য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ৮
১২ গীতবিতান, পৃঃ ৫৪
১৩ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ৩০৮
১৪ আমাদের গান—রজনীকান্ত সেন, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪৪
১৫ গীতবিতান, পৃঃ ৬৯

পুরাণ-প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ

পূর্বা সেনগুপ্ত*

উৎসকথা

পুরাতন হয়েও যা নবীন তাই পুরাণ। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তার অষ্টাদশ পুরাণের মাধ্যমে। সন্ন্যাসীর কথকতায়, নিবিড় সন্ধ্যার উষ্ণতায় সমবেত মানুষ আজও উপভোগ করে প্রাচীন ভারতের পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনী। জাতীয় জীবনকে নৈতিকতার শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে এই বিপুল সাহিত্য। জীবনের পলে পলে মানুষ অনুসরণ করতে চায় তাঁদের, যাঁরা সাহিত্যে নাটকীয়ভাবে ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়েছে। ধর্মভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে এই পুরাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী চরিত্র গঠিত হয়েছিল গ্রামবাংলার শ্যামলিমায়। যাত্রা, কথকতা, পালাগান এই দুই জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল চিরকাল। আবার কামারপুকুরের বালক গদাধর জগন্নাথ-দর্শনগামী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতেন, দক্ষিণেশ্বরেও বহু সন্ন্যাসী সমবেত হতেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজ মুখেই তিনি বলেছেন ঃ "আমি শুনেছি কত!" স্বয়ং শাস্ত্র যিনি, তাঁর সম্মুখে শাস্ত্রবাক্য উচ্চারিত হলেই তা অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। তাই আমরা দেখি মহাভারতের শান্তিপর্বে 'জনক-সুলভা' সংবাদে আলোচিত উপমার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধকের উপমা ব্যবহারে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য। রাজর্ষি জনক ব্রহ্মবাদিনী সুলভাকে অনাসক্তি সম্বন্ধে বলছেন ঃ "যথা চোপ্তাপিতং বীজং কপালে যত্র তত্র বা।/ প্রাপ্যাপ্যঙ্কুর-হেতুত্বমবীজত্বান্ন জায়তে॥/ তদ্বদ্ভগবতা তেন শিখা প্রোক্তেন ভিক্ষুণা।/ জ্ঞানং কৃতমবীজং মে বিষয়েষু ন জায়তে॥" (৩১০।৩৩-৩৪)—যেকোন মাটির শরাবপাত্রে বা অন্য কোন পাত্রে ভর্জিত বীজ অঙ্কুর উৎপাদনের হেতু হয়েও ভর্জনে সে-বীজত্ব নষ্ট হওয়ায় যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে না; সেইরূপ সেই ভগবান সন্ন্যাসী পঞ্চশিখাচার্য আমার বুদ্ধিকে আসক্তিহীন করে দিয়েছেন; সুতরাং সে-বুদ্ধি আর স্রক্‌চন্দন প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না।

** প্রত্যেক জাতির জীবনে নবজাগরণের মহাতরঙ্গ আসে; আর সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে বিরাজ করেন একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষ তাঁর প্রবল শক্তি সমাজে প্রয়োগ করে জগতের মহান চিন্তানায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ কল্যাণকর লক্ষ্যে জগৎকে পরিচালিত করে। প্রাচ্যের মানবেতিহাসের তথা পুরাণের ধারাকে আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। পুরাণ-প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে শ্রীরামচন্দ্র-সহধর্মিণী সীতাচরিত্র বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন এই বিশিষ্ট গবেষিকা ও লেখিকা।—সম্পাদক*

কামনার বীজকে ভর্জিত করলে তা থেকে আর বিষয়-বাসনার উৎপত্তি সম্ভব নয়। কারণ, ভর্জিত বীজ যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন করতে পারে না, তেমনি জ্ঞানাগ্নিতে ভর্জিত কামনার বীজ জীবের পুনর্জন্ম দিতে পারে না। ঠিক এই উপমাই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহার করেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের বলেছেন ঃ "যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ-সংসারে আসতে হয় না।... সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নতুন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-উল্লিখিত এইরকম বহু উপমাকেই আমরা শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মেলাতে পারি। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ নন, তাঁর প্রতিচ্ছবি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মধ্যে রয়েছে যুগসন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্ব, সত্য যাচাই করার মনোভাব, বিজ্ঞানমনস্কতা। তাঁর আলোচনায় আমরা পাই নানা পৌরাণিক চরিত্রের বিশ্লেষণ। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বের দরবারে নতুন করে পৌঁছে দিয়েছেন প্রাচীন ভাবনাকে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে পুরাণ ও জাতির জননী সীতা

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ। ইংল্যান্ডের রিডিং শহর থেকে স্বামীজী গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "তুমি বসে বসে একটা কাজ কর—ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সামান্য পুরাণ-তন্ত্র পর্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ নরক আত্মা মন বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় মুক্তি সংসার (পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে কে কি বলে একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) যোগাড় হচ্ছে আসল কাজ।"[২]

শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য যা প্রাচীন ভারত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবনাকে ব্যক্ত করে সেসম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যাকার সন্ন্যাসী-রূপে নয়। এই বিষয়ে তিনি একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো সচেতন বিশ্লেষক। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসে পৌরাণিক কাব্য, মহাকাব্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সম্বন্ধে পুনর্কথনের একটি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতার কারণ ছিল, পুরাণের নানা ঘটনা বিদেশিদের চোখে অবাস্তব, অযৌক্তিকরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশিদের সমালোচনাকে প্রতিহত করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষেরা নানাভাবে পুরাণোক্ত চরিত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এর সার্থক উদাহরণরূপে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজী প্রাচীন সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনার মধ্যে যেমন পৃথিবীর মহত্তম আচার্যগণের জীবনী স্থান

বিশ্লিষ্ট চিন্তা ও আধুনিক মননের আলোকে অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যা থেকে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কিত চিরন্তনী কথা উপস্থাপনায় প্রয়াসী হয়েছি।
—সম্পাদক

পেয়েছে, ঠিক তেমনি স্থান পেয়েছে পুরাণ ও মহাকাব্যের নানা কাহিনী—ভক্তসম্রাট প্রহ্লাদ বা সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ জড়ভরত কিংবা রাজর্ষি জনক! এর সঙ্গে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন মহম্মদ ও যিশুর জীবন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—তাবৎ পৃথিবীর ধর্মভাবনা একত্রিত হয়েছে, সম্মিলিত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ ব্যাখ্যায়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশিদের চোখে উচ্চপর্যায়ে স্থাপনের জন্য কেটেছেঁটে ব্যক্ত করেননি, যা অবাস্তব তাকে অবাস্তব বলতে এতটুকু কম্পিত হয়নি তাঁর কণ্ঠ! কিন্তু তিনি চরিত্র বা ঘটনাগুলির মধ্য থেকে এমন এক ইতিহাসের গতিসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, যে-গতিসূত্র জানায় এই পুরাণ, মহাকাব্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। চরিত্রগুলি ব্যক্ত হয়, বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের ভাষায়, 'আইডিয়াল টাইপ'-রূপে।* তা জাতীয় ভাবের পরিপূর্ণ বিগ্রহ। ভক্তশ্রেষ্ঠ কে? না প্রহ্লাদ! ভক্তচরিত্র বর্ণনায় পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদ উল্লিখিত হয়েছে স্বামীজীর ভাষণে। এই চরিত্র তখন ভক্তনির্ণয়ের মাপকাঠি। আবার ধরা যাক সীতাচরিত্র। স্বামীজী ভারতীয় রমণীদের শিরোমণিরূপে সর্বংসহা সীতার বর্ণনা করেছেন। এই চরিত্র যেন ভারতবর্ষের নারী আদর্শের মাপকাঠি। স্বামীজী রামায়ণ বর্ণনাকালে বলেছেন ঃ "রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষত বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া।... সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কিনা, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এবিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সীতাচরিত্রে যে-আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনো বর্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতে অনুস্যূত হইয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে—সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের আদর্শ তেমন হয় নাই। ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য 'সীতা' নামটি তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে-ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন নারীকে আশীর্বাদ করেন, তিনি তাহাকে বলিয়া থাকেন—সীতার মতো হও; বালিকাকে আশীর্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় নারীগণ সকলেই সীতার সন্তান।"[৩]

সীতাচরিত্র বর্ণনার সময় স্বামীজী ভারতীয় নারীর আদর্শ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি দেশ একটি বিশেষ আদর্শের বাস্তবায়িত রূপ। পুরাণ, মহাকাব্য, জীবনদর্শন—সবকিছুই অনুরণিত হয় সেই জাতীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে। সুতরাং জাতীয় আদর্শের দিক দিয়ে দেখলে সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রতীকীরূপ লাভ করেছে। শুদ্ধস্বভাব যে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েও অমলিন থাকে, তাকে ভারতের প্রাচীন কবিগণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। প্রজাদের অনুরোধে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রজাদের অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহে তিনি অস্বীকার করেন। এই ঘটনাকে স্বামীজী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। স্বামীজী বলেছেন ঃ "ভারতে প্রাচীন রাজাগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ করিতেন, রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার ছিল না, ধর্মকার্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকিবে। সেইজন্য পত্নীর অপর একটি নাম সহধর্মিণী—যাঁহার সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানকালে পত্নী সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কর্তব্যটুকু না করিলে কোন ধর্মকার্যই বিধিমতো অনুষ্ঠিত হইত না।

"যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, 'তাহা কখনো হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।' সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্তি নির্মিত হইল।"[৪] [ক্রমশ] ॥এক॥

তথ্যসূচি ঃ (১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, অখণ্ড, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৯৮ (২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৫ (৩) ঐ, ৮ম খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ১৫৫-১৫৬ (৪) ৪ ঐ, পৃঃ ১৫৪

* সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সমাজের বিভিন্ন অংশের তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য 'আইডিয়াল টাইপ'-এর ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রতি সমাজে এমন কিছু ভাবনা প্রচলিত থাকে যা আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। সমাজমন সর্বদা সেই আদর্শকে সামনে রেখে সামাজিক ঘটনার ভাল-মন্দ বিচার করে।
—**লেখিকা**

পরাধীন ভারতের সংগ্রামী প্রতীক ঃ ধ্যানচাঁদ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতকে সম্মান ও মর্যাদার উত্তুঙ্গ এভারেস্টে তুলে দিয়েছিলেন যিনি, সেই হকিসম্রাট ধ্যানচাঁদের জন্মশতবর্ষ চলছে এখন। অথচ কী অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও অবহেলার শিকার এই কীর্তিমান মানুষটি। নমো নমো করে তাঁর জন্মদিন পালন করে দায়িত্ব সেরেছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। দেশবাসী হয়তো এতদিনে ভুলেও গেছে দিনটির (২৯ আগস্ট) কথা। সেদিন থেকে পরবর্তী একবছর যথাসম্ভব অনাড়ম্বরেই পালন করা হবে মনীষিতুল্য হকি যাদুকরের জন্মশতবর্ষ। বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি টুর্নামেন্ট আর ছোটখাট সভাসমিতির মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হবে একপ্রকার নিস্তরঙ্গভাবেই।

অথচ এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। যে-মানুষটি তাঁর খেলার দ্যুতি ছড়িয়ে পরাধীন ভারতে প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি আরেকটু সম্মান প্রদর্শন করা কি আমাদের কাম্য বা আবশ্যক নয়? স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জীবনের সব ক্ষেত্রে নবতরঙ্গের অভ্যুদয়। গোটা ভারতবর্ষের নবজাগরণ। ক্রীড়াজগতে সেই নবজাগরণের যথার্থ ঋত্বিক ছিলেন ধ্যানচাঁদ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ে আন্দোলিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলা। গোটা ভারতে তার রেশ সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বিশ্ব হকিতে ধ্যানচাঁদের অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম ও ভারতবর্ষের অপ্রতিহত গতি এদেশের সমাজমানসে জীবনের জয়গান রচনা করেছিল।

১৯২৮ এর অলিম্পিক ফাইনালে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় হকির বিক্রমশৈলী। যে-ইউরোপ তখন ভারতকে হীন চোখে দেখত, সেই ইউরোপের প্রতিটি দেশকে ধ্যানচাঁদ ও তাঁর দল একাদিক্রমে অলিম্পিক ও অন্যান্য সবকয়টি আসরে হারিয়ে দেশবাসীর মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারতবাসী খেলার মাঠে তাঁর পরাক্রম দেখে ভাবতে শেখে, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনেও ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পরাভূত করা সম্ভব। তাই ধ্যানচাঁদের স্টিক থেকেও প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস খুঁজে নিয়েছিল পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম তাঁকে ডাকত 'অ্যাঞ্জেল' বলে। অ্যাঞ্জেল বা দেবদূতের মতো অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অধিকারী না হয়েও তিনি এই অভিধা পেয়েছিলেন কেবল খেলার গুণে। কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি ধ্যানচাঁদের ক্রীড়াদ্যুতি এমনই আলো ছড়িয়ে রেখেছিল প্রায় দুই দশক জুড়ে দেশে-বিদেশে সর্বত্র। নাহলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের স্বপ্নলোক হলিউড! ঘটনাটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অনায়াসলব্ধ সোনাজয়ের পর শুধু ধ্যানচাঁদের সঙ্গ পাওয়া ও তাঁর সঙ্গে খেলার অভীপ্সাই চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, হ্যারল্ড লয়েড, মেরি পিকফোর্ডদের টেনে এনেছিল হকি মাঠে। তৎকালীন বিশ্বের তাবড় তারকাকুল একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল হলিউডে ভারতীয় দলের সঙ্গে। ম্যাচ শেষে ধ্যানচাঁদের স্বাক্ষরও নিয়েছিলেন তাঁরা। এমনই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৫-এ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহরে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ২০টি ম্যাচে প্রায় সাড়ে তিনশোর মতো গোল করেছিল ভারত। সফর শেষ হয়েছিল অ্যাডিলেডে লর্ড মেয়র আয়োজিত সংবর্ধনাসভায়। ঐ সভার খবর পেয়ে ডন ব্র্যাডম্যান নিজে ছুটে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে।

১৯২৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত টানা চব্বিশ বছর বিশ্ব হকিতে অব্যাহত ছিল তাঁর স্টিক ওয়ার্কের ছান্দসিক মহিমা। এর মধ্যে টানা চারটি অলিম্পিকে সব প্রতিপক্ষকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে বিজয়মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে ভারতীয়রা। অলিম্পিক-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক আসর, শুভেচ্ছা সফর সব জায়গাতেই ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, দারা—এই ত্রয়ীর

তরুণ ক্রীড়া সাংবাদিক। মুক্তিকামী পরাধীন ভারতবাসীর ইচ্ছাপূরণ-মূর্তি হকি-শিল্পী ধ্যানচাঁদের জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে রচনাটি প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্পর্শে হকির সুর-তাল-লয়ের নান্দনিক ব্যঞ্জনা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই গৌরবান্বিত করেছিল। তাঁর খেলায় ছিল টেকনিকের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রকাশ, স্টাইলের মধ্যে শিল্পের মহিমা। টেকনিক ও স্টাইল অর্থাৎ বিজ্ঞান ও শিল্পের মণিকাঞ্চন সংযোগে ধ্যানচাঁদ হয়ে উঠেছিলেন ক্রীড়া-শিল্পী। স্টিকে-বলে শূন্যের বুকেও সৌন্দর্য সৃষ্টি কম করেননি ধ্যানচাঁদ! স্টিক শূন্যে তুলে চ্যাটালো করে পেতে তার ওপর বল নাচাতে নাচাতে মাঠের এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে যেতেন ধ্যানচাঁদ। সাধে কি আর তাঁকে 'যাদুকর', 'দেবদূত' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল?

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস—যেকোন খেলাতেই গুরু বা কোচের কাছে তালিম নিয়ে বা সিস্টেমের মধ্যে অনুশীলন করে সাধনার দ্বারা অনেক দূর যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সহজাত ক্রীড়াশৈলীর অসাধারণ ক্ষমতা ছাড়া কারো পক্ষে বিশ্বশ্রেষ্ঠের সম্মান পাওয়া সম্ভব নয়। ফুটবলের পেলে, পুসকাস, টেবিল টেনিসের ভিক্টর বার্না, বক্সিঙের মহম্মদ আলির মতো হকির ধ্যানচাঁদরা আপন চরিত্রগুণে খেলা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। জীবিত অবস্থাতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'মিথ'। তাঁকে নিয়ে বিদেশে বহু গল্পগাথা রচিত হয়েছে। ইউরোপের বহু দেশে স্থাপিত হয়েছে তাঁর মর্মরমূর্তি। স্বদেশে পূজা না পেলেও বহির্বিশ্বে ধ্যানচাঁদ কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াসংস্কৃতির অন্যতম অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ সময় এসেছে ধ্যানচাঁদের আদর্শকে সামনে রেখে তাঁর পরিকল্পিত রূপরেখা অনুযায়ী ভারতীয় হকির রাহুমুক্তি ঘটানো। ভারতীয় হকির অধঃপতনের সূচনা তিনি দেখে গিয়েছিলেন। এর থেকে মুক্তির উপায়ও তিনি বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপরামর্শ কানে নেয়নি ফেডারেশন কর্তারা। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। নামতে নামতে ভারতীয় হকি আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বর্তমান প্রজন্ম প্রায় ভুলতে বসেছে টানা পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় হকির একাধিপত্যের কথা। পরাধীন ভারতে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, দারারা যে অতিমানবিক কীর্তি রচনা করেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি কিভাবে সম্ভব? যতই হকি-বিশ্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমবর্ধমান হোক, ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া-ঐতিহ্য ও তাঁর চিন্তা-চেতনার যথাযথ রূপায়ণে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ভারতীয় হকি। সেটাই হবে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। ❑

শব্দচেতনা ৫৪

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি ঃ (১) জয়রামবাটী কোতুলপুর থানার যে-ফাঁড়ির অন্তর্গত (৪) পাগলী মামির মেয়ে (৫) শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবিকা (৭) গোঘাট থানার অন্তর্গত এক গ্রাম, মন্দাকিনী সেখানকার বৌ (৮) শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীর ধূলি মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন ঃ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি ——" (৯) মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে নেশাগ্রস্ত পদ্মবিনোদের গান "মা —— কে লবে এই অকৃতি অধম ভার" (১০) শ্রীশ্রীমাও যাঁকে 'দেবমাতা' নামে সম্বোধন করতেন (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ যে-গুরুর কথামতো নিজ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর হয়েছিলেন (১৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের ঘর (১৫) শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিধন্য 'বাঁড়ুজ্যে ——' (১৭) "কেউ —— নয় মা, জগৎ তোমার" (১৮) শ্রীশ্রীমাকে সারদানন্দজী শোনাতেন ঃ "—— নিজজন প্রতিপালিনী শ্রীকালী"।

ওপর-নিচ ঃ (২) শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহভাজন বিভূতিবাবুর জননী (৩) শ্রীশ্রীমা এই তীর্থে এসেছিলেন (৪) রুটি বেলা নিয়ে যাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের খুনসুটি (৬) শ্রীশ্রীমা ভোরবেলা গাইতেন ঃ "উঠ লালজী, ভোর ভয়ো ——" (৮) 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থের রচয়িতা (১১) রাধারমণের মন্দিরে এঁর স্ত্রীকে শ্রীশ্রীমা ভাবচক্ষে দেখেছিলেন (১৩) আমোদরের অপর তীরে এক গ্রাম (১৬) শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যসঙ্গিনী।

স্নেহাশিস কুমার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ফাল্গুন ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

টমাস আলভা এডিসন, ফোনোগ্রাফ ও স্বামী বিবেকানন্দ

সলিল মুখোপাধ্যায়*

মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখার প্রথম যন্ত্রটির নাম হলো 'ফোনোগ্রাফ' (Phonograph)। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)।

ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের ঘটনাটি বেশ মজার। স্কুলের পড়া শেষ না করে মাত্র বারো বছর বয়সে এডিসন খবরের কাগজ বিক্রির কাজ শুরু করেন। ১৮৬২ সালে পনেরো বছর বয়সে এডিসন একটি মুদ্রণযন্ত্র কিনে পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরায় সেটি রেখে 'হেরাল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে শুরু করেন। এই কাগজটির তিনি ছিলেন সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, এমনকি পরিবেশকও। পরিত্যক্ত সেই কামরাতে বসে চলত নানা রাসায়নিক গবেষণাও। একদিন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসেন। তাই তাঁকে ঐ পরিত্যক্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর নানা জায়গায় ঘুরে একুশ বছর বয়সে তিনি বোস্টনের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে কাজ পান।[১]

টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে এডিসনের কাজ ছিল মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রে যেসব খবর আসে, সেগুলি সংগ্রহ করে রাখা। মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রে পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎসঙ্কেত পাঠিয়ে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়। এইভাবে বার্তা পাঠানোর মূলে রয়েছে মর্স কোড। ইংরেজি বর্ণমালা, সংখ্যা ও যতিচিহ্নগুলির জন্য নানারকম সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। কোন বার্তা পাঠানোর সময় প্রেরকযন্ত্রের বোতাম টিপে ঐ কোডে সব বার্তা পাঠাতে হয়। গ্রাহক-প্রান্তে গ্রাহকযন্ত্রে 'টরে-টক্কা' শব্দে খবর আসে। তাই শুনে খবর লিখে নিতে হয়।

টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে দিনের বেলার তুলনায় রাতেই বেশি খবর আসত। রাতে যে খবর আসত তা এত দ্রুত হতো যে, এডিসন সামাল দিতে পারতেন না। এর জন্য তিনি দুটি পুরনো মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগাড় করলেন। একটিতে একটা লম্বা কাগজের ফিতে ঢোকালেন। যখন দ্রুত সংবাদ আসে তিনি তখন কাগজটা টানেন। পাতলা কাগজের ওপর এভাবে বিভিন্ন সঙ্কেতের বিভিন্ন রকম দাগ পড়তে লাগল। খবর নেওয়া শেষ হলে দাগকাটা কাগজের ফিতেটি অপর টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তিনি যখন আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন, তখন 'টরে-টক্কা' শব্দ বের হতে লাগল। এবার দ্রুত সংবাদ নেওয়ার আর কোন ঝামেলা রইল না।[২]
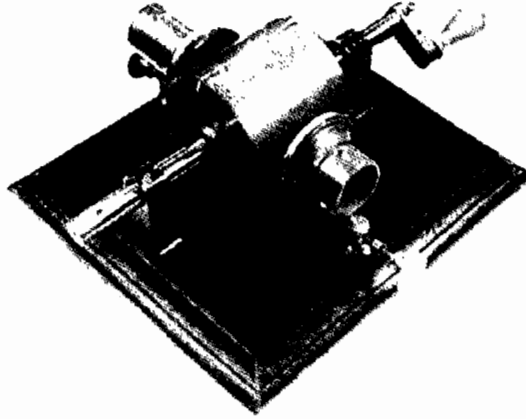
এডিসন-উদ্ভাবিত পুরনো ফোনোগ্রাফ যন্ত্র

এই বিশেষ ঘটনাটি এডিসনের মনে দাগ কেটেছিল। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। চাকরিতেও এসেছে পরিবর্তন। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হলো, টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' শব্দ থেকে যদি কাগজে দাগ কাটা যায়, আর সেই দাগ থেকে যদি আবার ঐ শব্দ বের করা সম্ভব হয়, তবে মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে দাগ কেটে আর সেই কাটা দাগ থেকে কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। যেই ভাবা অমনি কাজ। একটা পাতলা চামড়া সংগ্রহ করে সেটিকে টানটান করে চোঙের আকারে বাঁধলেন। একটি হাতল লাগালেন ঐ চোঙের সঙ্গে, যাতে এটিকে ইচ্ছামতো ঘোরানো যায়। এবার ঐ পাতলা চামড়ার সঙ্গে একটি পিনকে শক্ত করে এঁটে পিনের তলায় একটি মোম মাখানো কাগজ এমনভাবে রাখলেন যাতে পিনটা ঐ মোম মাখানো কাগজে অনায়াসে গিয়ে ঠেকে। এবার চোঙের হাতলটা ঘুরিয়ে চোঙের সামনে মুখ রেখে তিনি কয়েকটি শব্দ করলেন। দেখা গেল মোম মাখানো কাগজের ওপর পড়েছে বেশ কয়েকটি দাগ। ঐ

** স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার সম্পর্কে কৌতূহল ও প্রত্যাশার অন্ত ছিল না। সেই আগ্রহের কথা স্মরণে রেখে পরিশ্রমী-গবেষক সলিল মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনা প্রস্তুত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ টমাস আলভা এডিসনের গৃহে যান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন।—**সম্পাদক***

দাগের ওপর পিন ঘোরাতেই খুব অস্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটল ঐ কয়েকটি শব্দের। দিনটি ছিল ১৮৭৭ সালের ১৮ জুলাই। জন্ম নিল মানুষের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করার প্রথম যন্ত্রটি। এডিসন তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম দিলেন 'ফোনোগ্রাফ'।

জনসমক্ষে এই যন্ত্রটির কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হয় ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৭। অবশেষে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ যন্ত্রটির পেটেন্ট নেওয়া হয়। তাই ১৮৭৮ সালকে ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের বছর হিসাবে ধরা হয়। যদিও মোমের প্রলেপ দেওয়া চোঙওয়ালা ফোনোগ্রাফ বাণিজ্যিকভাবে প্রথম তৈরি করা হয় ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর এডিসন ও নানা বিজ্ঞানীর গবেষণায় ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটির অনেক উন্নতিসাধন করা হয়। পরবর্তী কালে আমরা যে-ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটি পাই, তার একটি সহজ বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। এই যন্ত্রে একটি শঙ্কু আকৃতির হর্ন থাকে। ঐ হর্নের সরু প্রান্তে থাকে একটি ধাতব পর্দা। পর্দার মাঝখানে তার সঙ্গে সমকোণে একটি সরু পিন যুক্ত থাকে। পিনের সূচালো ভাগ মোমের প্রলেপযুক্ত একটি চোঙকে স্পর্শ করে থাকে। ঐ চোঙটিকে হাতলের সাহায্যে ঘোরালে পিনটি মোমের ওপর দাগ কাটে। চোঙটি ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে। শব্দ রেকর্ড করার সময় বক্তাকে হর্নের সামনে কথা বলতে হয়। হর্ন বক্তার কণ্ঠস্বরের শব্দতরঙ্গকে গ্রহণ করে তাকে ধাতব পর্দাটিতে পৌঁছে দেয়। শব্দের তীব্রতা অনুযায়ী ঐ পর্দা কেঁপে ওঠে এবং ধাতব পর্দার সঙ্গে যুক্ত পিনটি পর্দার সঙ্গে সমকোণে কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় হাতলের সাহায্যে ঐ চোঙটিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে ঘোরানো হয়। ফলে পিনের সামনে রাখা চোঙের ওপরকার মোমের প্রলেপে দাগ পড়ে। বক্তার কণ্ঠস্বরের শব্দতরঙ্গের তীব্রতা অনুসারে চোঙের ওপর দাগের গভীরতার পরিবর্তন হয়। এইভাবে ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে শব্দ রেকর্ড করা হয়। ঐ শব্দের পুনরাবৃত্তির জন্য পিনটিকে জায়গা থেকে সরিয়ে চোঙের ওপর যেখান থেকে দাগ শুরু হয়েছে সেখানে রাখা হয়। তারপর হাতল ঘুরিয়ে চোঙটিকে আগের গতিবেগে ঘোরালে ঐ পিন রেকর্ড করা দাগ বরাবর অগ্রসর হয় এবং দাগের গভীরতা অনুসারে ওঠানামা করে। এর ফলে পর্দাটিতে শব্দ রেকর্ড করার সময় যেমন কম্পন হয়েছিল, সেইরকম কম্পন হয়। হর্নের ভিতরের বায়ুতে ঐ কম্পন সঞ্চালিত হলে শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলিতেও আমরা ফোনোগ্রাফের উল্লেখ পাই। ফোনোগ্রাফ সম্বন্ধে স্বামীজী খুবই উৎসুক ছিলেন। এমনকি এডিসন যে এই যন্ত্রটির নানারকম উন্নতিসাধন করছেন, এসম্বন্ধে স্বামীজী ওয়াকিবহাল ছিলেন। একথার আমরা উল্লেখ পাই ২৪ জানুয়ারি ১৮৯৪ ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ, শিকাগো থেকে মাদ্রাজী ভক্তদের উদ্দেশে লেখা এক পত্রেঃ "ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুগ্রহ-পূর্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফোনোগ্রাফের কথায় বিস্মৃত হই নাই। তবে এডিসন সম্প্রতি ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন; যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।"[৩]

২৮ জুন ১৮৯৪ ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ থেকে জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে অন্য একটি পত্রে তিনি তড়িৎ-সঞ্চয়ক কোষের কথা বলতে গিয়ে ফোনোগ্রাফেরও উল্লেখ করেছেনঃ "আমি তোমাকে ফোনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে একরকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার, বড় সুন্দর চলে। এই ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কাজ হয়, তারপর যেকোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হলো।"[৪]

স্বামীজী আমেরিকা থেকে খেতড়ির রাজা অজিত সিংকে একটি ফোনোগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন। সেই ফোনোগ্রাফটি সময়মতো খেতড়ির রাজার কাছে না পৌঁছানোয় স্বামীজী বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ৩১ আগস্ট ১৮৯৪ আমেরিকা থেকে স্বামীজী তাঁর বিশেষ অনুগত শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ "আমি খেতড়ির রাজাকে একটি ফোনোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এখনো পাইনি। খবরটা নিও তো। আমি কুক অ্যান্ড সন্স, র‍্যামপার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় তা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো।"[৫]

খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের ফোনোগ্রাফটি সময়মতো না পৌঁছানোয় স্বামীজী যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন তার প্রমাণ মেলে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ হোটেল বেলভিউ, বেকন স্ট্রিট, বস্টন থেকে মিসেস জি. ডব্লিউ. হেলকে লেখা তাঁর আরেকটি পত্রেঃ "ফোনোগ্রাফের এখনো কোন সংবাদ নেই। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যাক, তারপর আমরা অনুসন্ধান করব। যদি খেতড়ির স্ট্যাম্প দেওয়া কোন পত্র দেখেন, বুঝবেন নিশ্চয়ই সংবাদ আসছে।"[৬] রাজা অজিত সিং অবশ্য ফোনোগ্রাফের প্রাপ্তিস্বীকার করে স্বামীজীকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্রের উল্লেখ আমরা পাই ১৯ নভেম্বর ১৮৯৪ নিউ ইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা স্বামীজীর এক পত্রেঃ "ফোনোগ্রাফ সম্বন্ধে তোমাদের আর খবর লইবার প্রয়োজন নাই। আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা নিরাপদে তথায় পৌঁছিয়াছে।"[৭]

কলকাতায় ফোনোগ্রাফ কখন এবং কবে এসেছিল—এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়।

যেমন, বাঙালি মনীষীদের কণ্ঠস্বর ধরে রাখার জন্য হেমেন্দ্রমোহন বসুর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে কলকাতায় মোমের তৈরি গোলাকৃতি সিলিন্ডার রেকর্ড তৈরি করতেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষক এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ফাদার ইউজিন লাফোঁই প্রথম কলকাতায় ফোনোগ্রাফে মোমের রেকর্ড বাজিয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তাঁর ছাত্রদের অবাক করে দিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে বিলাত থেকে ফেরার পরে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু পার্শিবাগান লেনের বাড়িতে এসে ওঠেন। সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে পদার্থবিদ ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু লিখেছেন ঃ "বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে জন আন্দোলন গড়ে উঠবার ফলে রাজনীতিতে স্বরাজলাভের আর শিক্ষা ও শিল্পে স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম। এতে আমাদের গোষ্ঠীও প্রভাবিত হয়।... রবীন্দ্রনাথ ঐ আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যান আর তাঁর বিখ্যাত স্বদেশি গানগুলি ঐ সময়কার রচনা। তিনি তাঁর সর্বাধুনিক গানগুলি গেয়ে শোনানোর জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে একদিন অন্তর আসতেন। হেমেন্দ্রমোহন বসু সেইসব গান মোমের রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করে রাখতেন।"[৮]

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 'আমার পাঠদ্দশার কালে' নামক স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "আমরা যখন এম. এ. ক্লাসে, জগদীশচন্দ্র বসু বিলেত থেকে ফিরলেন। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি মাঝে মাঝে এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন।... গল্প করতেন, খাওয়াতেন। একদিন বিকেলে আমরা গিয়েছি, তখন সবে এদেশে ফোনোগ্রাফ এসেছে, এইচ. বোস দেশি রেকর্ড তৈরি করছেন। রেকর্ডে একটি গান দেওয়া হলো—'মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বইতে পারলাম না।' "[৯]

তখনকার দিনে ফোনোগ্রাফের দাম কত ছিল? ১৯০৬ সালের ১৬ মার্চ ইংরেজি দৈনিক 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন মডেলের ফোনোগ্রাফের দাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—একটি ফ্যামিলি ফোনোগ্রাফের দাম ৭০ টাকা, গ্র্যান্ড ট্রিপিল ফোনোগ্রাফের দাম ১৭৫ টাকা, স্টুডেন্ট ফোনোগ্রাফের দাম ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা। এছাড়া প্রতিটি রেকর্ডের মূল্য ছিল ২ টাকা থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে আলভা এডিসনের হারিয়ে যাওয়া ফোনোগ্রাফের একটি খবর আমাদের অনেকেরই হয়তো নজরে পড়েছে। খবরটি এইরকম ঃ

গত ২০ জানুয়ারি বার্লিনের ফ্রিডরিসসাইনে একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে বাড়ির বেসমেন্টে আবিষ্কৃত হয় বিশাল এক কাঠের বাক্সের মধ্যে স্বয়ং আলভা এডিসনের তৈরি প্রথম ফোনোগ্রাফের সঙ্গে আরো ছাপান্নটি রেকর্ড এবং প্রতিটি রেকর্ডই ১৮৯০ সালের মধ্যে তৈরি। এডিসনের নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করা সেই বিখ্যাত ছড়াটির (মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব) মোমের রেকর্ডও। রেকর্ডে বিস্তর আঁচড় সত্ত্বেও এখনো বাজিয়ে শোনা যায়। এই রেকর্ডের ওজন প্রায় সোয়া কিলো। সাইজও বেঢপ। রেকর্ড এবং ফোনোগ্রাফের পাতের ওপর টমাস আলভা এডিসনের স্বাক্ষরও আছে। এই রেকর্ড এবং ফোনোগ্রাফ তাঁর নিজের সংগ্রহেই ছিল। মৃত্যুর পর খোয়া যায়। ফ্রিডরিসসাইনের যে পুরনো বাড়ি ভাঙতে গিয়ে এই আবিষ্কার, ঐ বাড়িটি ছিল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান প্রফেসর কার্ল স্টুম্পফের। মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হলেও তিনি নিজে ফোনোগ্রাফ তৈরির চেষ্টা করেন বলে ইতিহাসে জানা যায়। অন্যদিকে মানসিক রোগীদের ওপরে তিনি ফোনোগ্রাফের রেকর্ড বাজিয়ে পরীক্ষা চালাতেন। ১৮৯৩ সালে এই পরীক্ষার কথা ডায়েরিতে লিখেছেন অধ্যাপক স্টুম্পফে।[১০]

স্বামীজী বোধহয় আরো একটি ফোনোগ্রাফ আলাসিঙ্গা পেরুমলকেও পাঠিয়েছিলেন। কারণ, ৩০ নভেম্বর ১৮৯৪ আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ "ফোনোগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে পৌঁছেছে জেনে আনন্দিত হইলাম।"[১১]

ফোনোগ্রাফ সম্বন্ধে স্বামীজীর অসীম আগ্রহ ছিল। নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন স্বামীজী তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর ফোনোগ্রাফের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। মনে হয় সেইসময় স্বামীজীর কাছে নিজস্ব কোন ফোনোগ্রাফ ছিল না। তাই তিনি ফ্রান্সিস এইচ. লেগেটকে বলেছিলেন কয়েকটি চোঙ অর্থাৎ খালি রেকর্ড সংগ্রহ করে রাখতে। এই কথার উল্লেখ আমরা পাই জুন (তারিখ নেই) ১৮৯৫ নিউ ইয়র্ক থেকে মার্কিন ভক্ত জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা এক পত্রে ঃ "মিস্টার লেগেট তোমার ফোনোগ্রাফের কথা বলছিলেন। তাঁকে কয়েকটি চোঙ সংগ্রহ করতে বলেছি। 'কারো একটি ফোনোগ্রাফে ঐগুলি দিয়ে কথা বলি, পরে ঐগুলি জো-কে পাঠিয়ে দি'—আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন, 'আমি তো একটা ফোনোগ্রাফ কিনে দিতে পারি। জো যা বলে আমি তাই করি।' তাঁর অন্তরে একটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে সুখী হলাম।"[১২]

স্বামীজীর এই কথাগুলি থেকে অনুমান করা যায়, তিনি নিজের কণ্ঠস্বরের বেশ কয়েকটি রেকর্ড করেছিলেন।

সেইসব রেকর্ডের নমুনা কোথাও আছে বলে জানা নেই। গবেষকরাই এর হদিশ দিতে পারেন। তবে মহীশূরের মহারাজার বিশেষ অনুরোধে তাঁর কণ্ঠস্বর ফোনোগ্রাফে রেকর্ড করে রাখা হয়। স্বামীজী মহীশূর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণবশত তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর ফোনোগ্রাফে রেকর্ড করে রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামীজী সম্মত হন। সেদিন তাঁর কণ্ঠস্বরের যে-রেকর্ড করা হয়েছিল, কেউ কেউ বলেন সেই কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে গেলেও আজও তা অতি যত্নসহকারে মহীশূরের রাজপ্রাসাদে রাখা আছে।[১৩]

এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বোধহয় এটাই স্বামীজীর রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর যা আজও এক অমূল্য সম্পদ। লক্ষণীয়, এর পূর্বে অন্য কোন বাঙালি মনীষীর কণ্ঠস্বরের রেকর্ডে গৃহীত কোন নমুনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। এবিষয়ে আরো গবেষণার* প্রয়োজন রয়েছে। ❑

১ বিজ্ঞানের হঠাৎ আবিষ্কার মজার আবিষ্কার—শান্তা শ্রীমানী, পত্রলেখা, পৃঃ ৫৯
২ ঐ, পৃঃ ৬০
৩ পত্রাবলি—স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, পৃঃ ১০৩
৪ ঐ, পৃঃ ১৫৬
৫ ঐ, পৃঃ ১৮০
৬ 'উদ্বোধন', ১০৫তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, পৃঃ ৩০৭
৭ পত্রাবলি, পৃঃ ২২৬
৮ যন্ত্ররসিক এইচ. বোস—সিদ্ধার্থ ঘোষ, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, ৯ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ৪৬
৯ ঐ, পৃঃ ৪৫
১০ সংবাদ প্রতিদিন, ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃঃ ৪
১১ পত্রাবলি, পৃঃ ২২৬
১২ ঐ. পৃঃ ৩৩৮
১৩ স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২২ জুলাই ২০০০

* স্বামী বিবেকানন্দের রেকর্ডে-ধৃত-কণ্ঠস্বর সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজে ইতিবাচক সংবাদের প্রত্যাশায় বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক-লেখক স্বামী প্রভানন্দজী তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।—**সম্পাদক**

পত্রলেখক-লেখিকাদের নিজস্ব মতামত এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে।
—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার বিজয়ের পঁচাত্তর বছর

বর্তমান বছরের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার জন্যই এই পত্র। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের এক বৈপ্লবিক প্রয়াস চালিয়েছিল। বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। আজ হয়তো আমরা অনেকেই জানি না, এই দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক প্রয়াসের মহানায়ক এবং নায়কেরা স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সহকর্মী গণেশ ঘোষের গ্রন্থ 'বিপ্লবী সূর্য সেন' থেকে জানা যায়—

"এই নবজাগৃতি ও নূতন জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ অবদান আছে।... বিবেকানন্দ ইংরাজ দস্যুদের স্বরূপ কিছুটা চিনতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর কথায় প্রকাশ্য অভিব্যক্তি না থাকলেও দেশের যুবশক্তির কাছে থাকত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথ গ্রহণের ইঙ্গিত ও আহ্বান। তিনি সাধু ছিলেন কিন্তু তাঁর ভগবৎ উপাসনা দেশের রাজনীতিকে বাদ দেয়নি। তিনি দেশের যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন, তারাই ভগবানের কাছে যেতে পারে যাদের সবল বাহু ও গঠিত পেশি আছে এবং যারা ফুটবল খেলে ও গীতাপাঠ করে। দেশের যুবশক্তিকে প্রায় প্রকাশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ গ্রহণে আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মা তাদের কাছেই আসেন যারা স্বেচ্ছায় বুক পেতে দুঃখ বরণ করে নেয়, মৃত্যুকে যারা এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করে। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেছেন, ভারতের স্তিমিত জাতীয়তাবাদ বিবেকানন্দের শ্বাসপ্রশ্বাসেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরেই তা বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করেছিল।" উক্ত গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায়, তখন বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে দেশের যুবশক্তির প্রতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান অনুরণিত হচ্ছে। সেই সময়েই সূর্য সেন ভূমিষ্ঠ হন।

চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের আরেক নায়ক অনন্ত সিংহের লেখা থেকে জানা যায়—মাস্টারদা সূর্য সেনের নির্দেশ ছিল ঃ "কালীপূজা, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের বাণী ও গীতাপাঠ কর্তব্য হওয়া প্রয়োজন।" সেকারণে "এঁদের প্রত্যেকের নিজের ঘরে মা কালীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও একখানি গীতা রাখাটা নিয়মে পরিণত হলো।"

বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীকে একসময় জানিয়েছিলেন ঃ "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বল মহাশয়ের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলাম। তাঁর নিজ মুখ থেকেই শুনেছি, মাস্টারদা যেমন আমাদের গীতার মর্মকথা বুঝিয়েছিলেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী', 'বর্তমান ভারত', 'কর্মযোগ' ও স্বামীজীর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাবলি পড়তে উৎসাহ যোগাতেন।" প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড থেকে জানতে পারি—"ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস সূর্য সেনের, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের, নির্মল সেনের, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের—সেই বিশ্বাসের বলেই তাঁর বিপ্লবী। কারণ, তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন ঐ বিশ্বাসের অগ্নি উৎস বিবেকানন্দের কাছ থেকে।"

মহিলা বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৩২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর একদল বিপ্লবীর নেত্রী-রূপে চট্টগ্রাম পাহাড়তলি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ভয়ানক আক্রমণ চালান। প্রীতিলতা ছিলেন বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত। প্রীতিলতাকে আরেক বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে এক চিঠিতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "যুগগুরুর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে তোমার খুব ভাল লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে, ওর পরিচয় কি তোমার জানা আছে? কী জবাব দেব ভেবে পাইনে। ওকে কতখানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে Cyclonic Hindu। আমার মতে He is the moral and spiritual force of India.... ওর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওর কথা বলেই মেনে নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্তচিত্তে নির্ভর করা চলে।... ওকে চিনবার যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার তরফ থেকে আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালবেসেছে কি?"

আজ সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের কথা স্মরণ করা বাঙালি ও ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য।

স্বপনকুমার আইচ
সম্পাদক, তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কোচবিহার

ঝকঝকে হাসির বই

বিশ্বজিৎ রায়

বত্রিশপাটি ● সম্পাদনা ঃ তপনকুমার দাস ● প্রকাশক ঃ অণিমা বিশ্বাস, দোয়েল, 'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা-৭০০ ১১১ ● মূল্য ঃ ৭৫ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১৭২ ● প্রকাশকাল ঃ ২০০৫

গোছানো বাঙলায় যাকে বলে শিশুসাহিত্য, মুখের কথায় যার নাম ছোটদের বই—তার উৎপাদন বঙ্গভূমে খুব বেশিদিন শুরু হয়নি। হুতোম প্যাঁচার নকশার সাক্ষ্য মানলে একটা সময় 'ইয়ারগোচের স্কুলবয়' আর 'বাহাত্তুরে ইনভেলিড' একইসঙ্গে হাফ আখড়াই শুনত। হাফ আখড়াই গানের যা বিষয়বস্তু, একেলে অভিভাবকরা তা শুনলে মোটেই 'স্কুলবয়'দের অ্যালাউ করতেন না। স্যাটেলাইট চ্যানেলের দাপটে গণসংস্কৃতির রকমফের বদলাচ্ছে, তবে সেই বদলের 'অপপ্রভাব' থেকে ছেলেমেয়েদের বাঁচানোর জন্য দস্তুরমতো 'চাইল্ড লক' আছে। টিভির পর্দার যা ইচ্ছে তো আর ছেলেমেয়েদের দেখতে দেওয়া যায় না! তারা কী পড়বে, কী দেখবে তার একটা মাপকাঠি অভিভাবক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরি করেছে। মাপকাঠিটি অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি। উনিশ শতকে ইংরেজ উপনিবেশ তৈরি হলো। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে নেটিভ বাঙালি লেখাপড়া, সাহিত্য, শিল্প, পরিবার, সমাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন দস্তুর গড়ে তুললেন। বালবিবাহ রদ, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, সাধারণের জন্য শিক্ষালয় নির্মাণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর পরিবার ও সমাজজীবন নতুন করে নির্ধারিত হলো—স্বভাবতই বাঙালির ছেলেমেয়ের শৈশবও এই নতুনভাবে গড়ে ওঠা বড়দের জগতের সূত্রে নির্ণীত। এই নতুন জগতে পড়া ও শোনার অন্যতম উপাদান বই। কোন্‌টি কার পাঠ্য তারও সুনির্দিষ্ট সীমা আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' খেয়াল করলে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যাবে। তিনি সেখানে জানিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি তৎকালীন বঙ্গসমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনরাও 'বঙ্গদর্শন'-এ মজেছিলেন। সাহিত্যের কী ও কেন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে চিন্তিত—পাশ্চাত্যশিক্ষায় দীক্ষিত, বাঙলা ভাষা ও বাঙালিয়ানা নিয়ে বিচলিত এই মানুষটি বাঙালির ঘরে ঘরে 'অমৃতফল' ফলানোর জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে বাঙালি নারীপুরুষের সাংস্কৃতিক চিন্তাক্ষেত্র প্রভাবিত হবে, বাঙালি নবজাগ্রত হবে—এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু তাই বলে 'বঙ্কিমী উপন্যাস' তো অপরিণত বালক-বালিকার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়টি তাই বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' চাবিবন্ধ করে রাখতেন। রবির ছেলেবেলায় এই ছিল 'চাইল্ড লক'। অবশ্য নিদ্রিত আত্মীয়টির চাবি হাতিয়ে শেষপর্যন্ত বঙ্গদর্শনে ডুব দিতে রবির অসুবিধা হয়নি। পরিণত রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর শৈশবের কথা স্মরণে রেখেই ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁর ছোটবেলায় তেমন বই ছিল না বলেই বড় রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য বই লিখেছেন। 'সে', 'খাপছাড়া', 'ডাকঘর', 'শিশু ভোলানাথ'-লালিত বাঙালির ছেলেবেলা—'সহজপাঠ'-এর মতো মজার প্রাইমারে ভরপুর বাঙালির ছেলেবেলা। সুধীর সরকারের 'মৌচাক', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'রংমশাল' বাঙালি ছেলেমেয়েদের মনের খোরাকের যোগানদার। যোগীন্দ্রনাথ সরকার শুধু ছোটদের বই লিখতেন না, সিটি বুক স্টোরের মাধ্যমে ছোটদের জন্য নানারকম বই সরবরাহ করতেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় দীপ্ত মাতৃভাষায় উজ্জীবনে আশাবাদী অভিভাবক ও স্কুল-শিক্ষকরা জন্মদিনে, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব বই ছোটদের হাতে তুলে দিতেন। সেসব বইপত্র ছেলেমেয়েদের শুধু হেডমাস্টারি ঢঙে জ্ঞান দিত না, আমোদ-আহ্লাদের ফোয়ারা বইয়ে দিত। বাঙালি ছেলেমেয়েরা তো শুধু বড় সুবোধ বালক গোপালের কাহিনীই পড়েনি, পাগলা দাশুর বৃত্তান্তও তাদের বর্ণপরিচয়ের দোসর।
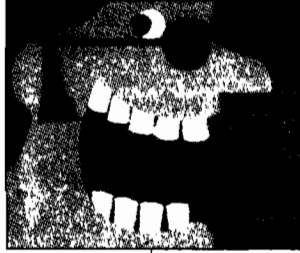
হতে পারে ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট এইসব বইপত্তরে কোথাও নিছক মজা করে এমন কিছু লেখা হয়েছিল যা নিয়ে আপত্তি তোলাই যায়, কেউ কেউ তুলেছেনও; তবু বাঙলা ছোটদের বইয়ের সমারোহপূর্ণ সমৃদ্ধ জগৎটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঔপনিবেশিক বাঙালির শিশুপাঠ্য সাহিত্যে অবাঙালি ভারতীয়দের নিয়ে রসিকতার খামতি নেই—সেই রসিকতা বহু ভাষা ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর বলেই আপত্তিজনক। তবে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'লঙ্কাকাণ্ড' গল্পে 'বেহারি' রাক্ষসদের নিয়ে রসিকতা আছে বলেই তো তাঁকে 'রেসিস্ট' বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না। বরং বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের এই যে জাতিগতভাবে অন্যদের তুলনায় নিজেদের কেউকেটা বলে মনে করার বদভ্যাস, তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা যেতে পারে। এ তোমার আমার পাপ। এখন আন্তর্জাতিক স্তরে

আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাষা ইংরেজি, আর সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দি। এই দুই ভাষায় সাংস্কৃতিক পণ্যেরও অভাব নেই। যেমন ইংরেজি ভাষায় ছোটদের জন্য নানা মাপের যেসব নয়নশোভন, মনলোভন বইপত্র প্রকাশিত হয়, তার তুলনায় এই মুহূর্তে বাঙলা প্রকাশনাজগৎ যে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর আন্তর্জাতিকতার সচেতন ও অসচেতন চাপে স্বাধীনতার পরে পরেও বাঙালি অভিভাবকদের মধ্যে যেটুকু জাতীয়তাবাদী আবেগ ছিল তাও অস্তমিত। ফলে ছেলেমেয়েদের বাংলা বইপত্র কিনে দেওয়ার দায়টুকুও অনেকেই বোধ করেন না। বাঙলা ভাষায় আমোদ-আহ্লাদ করলে, ভাল করে বাঙলা শিখলে যে ইংরেজি শেখা আটকায় না, বরং বহু ক্ষেত্রে যুক্তিবুদ্ধির বিকাশে মাতৃভাষার বিকল্প নেই—এটি ইতিহাস-পরীক্ষিত সত্য হলেও অনেকে তা মানতে চান না।

তবু এই অসময়েও কোন কোন প্রকাশক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ার চেষ্টা করছেন। 'দোয়েল' প্রকাশনার বইপত্রেও এই লড়াইয়ের সাক্ষ্য স্পষ্ট। ঝকঝকে ছাপায়, পরিচ্ছন্ন অলঙ্করণে, বিষয়বস্তুর সুনির্বাচনে, সামগ্রিক বিন্যাসে শেষপর্যন্ত পাঠকের দরবারে তাঁরা যা হাজির করেন তা সত্যি কিনে পড়ার মতো। বই নামক পণ্যের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও তাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন।

'দোয়েল' প্রকাশিত **'বত্রিশপাটি'** ছোটদের জন্য নানা সময়ে নানা লেখকের লেখা হাসির গল্পের সঙ্কলন। সেকালের সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে একালের শীর্ষেন্দু, সঞ্জীব পর্যন্ত অনেকেই হাজির। গল্পগুলি পরপর পড়ে গেলে বঙ্গজীবনে হাসির বিষয়বস্তুর রদবদল চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এঁদের লেখা ছোটদের গল্পে বাংলা 'লোককথা'র মেজাজ ও মর্জি উপস্থিত। লোকশ্রুতিতে প্রচলিত আখ্যানকে উপস্থাপনের অভিনবত্বে এঁরা নতুন করে নিচ্ছেন। লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বিষয় নির্বাচনে ও পরিবেশনে লোকশ্রুতির ওপর নন, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। সঞ্জীবের গল্পের দুই মামা—শিক্ষিত, অবিবাহিত, খামখেয়ালি। তাঁদের ছেলেমানুষী খামখেয়াল ছোটদের হাসির খোরাক। লীলা মজুমদারের 'গনশার চিঠি' আবার ছোটদের মতো ভাবতে পারার পরিপাটি আনন্দে ভরপুর। ছোটবেলায় জগজ্জীবন সম্বন্ধে যে অজানা রহস্যবোধ থাকে, গনশার কলমে তা ভর করেছে। তার বিশ্বাস, যে-স্কুলে তাকে ভর্তি করা হবে সেই স্কুলের মাস্টারমশাই ছাত্রদের ম্যাজিক করে ছাগল করে দেন। এই রোমাঞ্চকথাই সে লিখেছে। তার চিঠি পড়ে অবশ্য শেষপর্যন্ত ছোট পড়ুয়াদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেঞ্জি উঁচু হয়ে যায়নি, দাঁতকপাটি ঝলসে উঠেছে। অতঃপর বাঙালির ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য 'দোয়েল'-এর 'বত্রিশপাটি'। অভিভাবকরা আশা করি তাঁদের ছেলে-মেয়েদের এই গ্রন্থসুখ ও হাস্যরস থেকে বঞ্চিত করবেন না।

তবে এইসব প্রাপ্তির মধ্যেও কয়েকটি অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে। গ্রন্থ-সম্পাদক তপনকুমার দাসের উচিত ছিল সঙ্কলনের শেষে রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান। আর, গৃহীত গল্পগুলির প্রকাশতারিখ এবং তা লেখকদের কোন্ গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হলো তা না জানালে কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্বে ফাঁক থেকে যায়। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে সম্পাদকের ছবি ছাপা হবে অথচ সম্পাদক তাঁর কাজে ফাঁকি দেবেন—এমন কাণ্ড ছোটদের বইতে মানায় না। ❑

চেতনার নতুন আকাশ

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

মিনি বই (৮টি) ● সম্পাদনা ঃ আর. গোস্বামী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ● প্রকাশক ঃ অণিমা বিশ্বাস, দোয়েল, 'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা-৭০০ ১১১ ● মূল্য ঃ ৮০ টাকা ● পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৩০ (প্রতিটি) ● প্রকাশকাল ঃ ২০০৫

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল গল্প। লোক-শিক্ষায় গল্পের অবদান বিশিষ্টতার আসন অধিকার করে আছে। বড়-ছোট কেউই গল্পের আকর্ষণ অস্বীকার করতে পারেন না। সেই কথা মাথায় রেখে আজকের দিনের বাঙালি শিশুদের কাছে 'দোয়েল' রঙ আর মজার জগৎ আবার খুলে দিলেন। জীবনের ইঁদুর-দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধ্য হয়ে শিশু-শিক্ষার্থীরা যখন দমবন্ধ করা পরিবেশে হাঁসফাঁস করছে, তখন 'দোয়েল' প্রকাশিত পকেট বইয়ের আঙ্গিকে **'মিনি বই'** তাদের হাতের কাছে এনে দিয়েছে চেতনার নতুন আকাশ।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী শিশুদের জন্য লোককাহিনী, গল্প, ছড়ার বই প্রকাশ করেন। 'দোয়েল' সেই বিস্মৃতপ্রায় আটটি পুস্তিকা বর্তমান বছরে পুনঃপ্রকাশ করে বহু মানুষের অভিনন্দন পেয়েছেন। **'মিনি বই'** ছোটদের স্বপ্ন আর কল্পনাকে উস্কে দেবে। তবে, আটটি পুস্তিকার দাম আশি টাকা হওয়ায় নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের কাছে বোধকরি তা অধরা থেকে যাবে। ❑
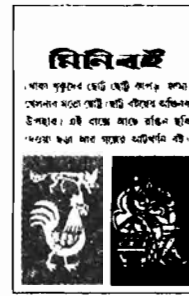
উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ঃ গত ১০-১৩ অক্টোবর ২০০৫ মহাসমারোহে ও আনন্দের সঙ্গে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজার হাজার ভক্ত জগন্মাতার আশীর্বাদ-লাভের জন্য এই চারদিন মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হন। আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। ১১ তারিখ কুমারীপূজা ও সন্ধিপূজায় অন্যান্যবারের মতো প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। আগের বছরগুলির মতো এবছরেও কলকাতা দূরদর্শন সবদিনই বিভিন্ন সময়ে এই পূজা সরাসরি সম্প্রচার করে। এই কয়দিনে প্রায় ৭৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, কাঁথি, কোচবিহার, ধলেশ্বর (আগরতলার অধীন), ঘাটশিলা, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মনসাদ্বীপ, মেদিনীপুর, মুম্বাই, পাটনা, পোর্টব্লেয়ার, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জির অধীন), শিলং, শিলচর এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম, চেন্নাইঃ গত ৩ আগস্ট ২০০৫ সংস্কার করা একটি কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। ১৯২১ সালে এই কক্ষে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ একমাসের অধিক অবস্থান করেন। এখন থেকে এই কক্ষটি স্মৃতিকক্ষরূপে রক্ষিত হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘরঃ গত ৪ অক্টোবর ২০০৫ নেহরু সায়েন্স সেন্টার, মুম্বাই-এ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল সায়েন্স সেমিনারে একটি ছাত্র ২য় স্থান অধিকার করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, কলকাতাঃ গত ৪ অক্টোবর ২০০৫ নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজ অফ নার্সিং-এ নার্সিং-এর বি. এসসি. (অনার্স) কোর্সের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদি, রাঁচিঃ গত ১০ অক্টোবর ২০০৫ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অর্জুন মুণ্ডা আশ্রম পরিদর্শন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চেন্নাইঃ আশ্রম পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির একটির প্রধান শিক্ষক তামিলনাড়ু সরকারের কাছ থেকে 'ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অ্যাওয়ার্ড ফর দি বেস্ট টিচার-২০০৫' লাভ করেন।

সেবাকার্য

২০০৩-২০০৪ সাল থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা ও সারদাপীঠ কেন্দ্র নিকটবর্তী সংশোধনাগারের আবাসিকদের মূলস্রোতে ফেরানোর প্রচেষ্টায় (ক) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা, (খ) পশুপালন, মৎস্যচাষ, সেলাই, কাঠের কাজ ইত্যাদিতে বৃত্তিগত শিক্ষা, (গ) স্বল্পমেয়াদি শিবিরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও যত্ন নেওয়া বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কার্যে যুক্ত রয়েছে।

বহির্ভারত

মরিশাস আশ্রম এবং বাংলাদেশের বালিয়াটি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রে দুর্গাপূজার বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় সরকার ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, আইনমন্ত্রী মৌদুদ আহমেদ, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক রাজ্যমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং আরো কয়েকজন সম্মানীয় ব্যক্তি।

দেহত্যাগ

স্বামী ভক্ত্যানন্দজী (বিশ্বনাথ মহারাজ) গত ২৫ অক্টোবর ২০০৫ বিকাল ৫টা ৫৫ মিনিটে ভুবনেশ্বর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা পীড়ায় ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শর্বানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে শারীরিক অসুবিধার কারণে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পূর্বপর্যন্ত তিনি ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেই কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, তপস্বী ও মধুর স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৩ ও ১৫ নভেম্বর ২০০৫ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

নিমতলা-চৌবেড়িয়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫ আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামীজীর জীবন', 'মহামণ্ডলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য', 'চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা', 'মনঃসংযোগ' ইত্যাদি। ভাষণ দেন অমিতকুমার দত্ত, অরুণাভ সেনগুপ্ত এবং বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুরেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে ১৭৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ইছাপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের উদ্যোগে সেবাসঙ্ঘের পরিচালনায় যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে পরিষদের ১৪টি সংগঠনের ১০৬ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। শরীরচর্চা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড় মঠ'-এর 'বিবেক বাহিনী'র প্রশিক্ষকগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরণা, ভুবনেশ্বর (ওড়িশা) ঃ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ প্রদীপ প্রজ্বলন, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অসীমাত্মানন্দজী, স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী ও পি. কে. সাঁই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভি. কে. সেনাপতি।

দীঘা সারদা-রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা, প্রবন্ধ, কবিতা ও নৃত্য প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্থানীয় মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম হল-এ স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী অক্ষতানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও কমলকুমার মান্না। স্বাগত-ভাষণ দেন সভাপতি বিমলানন্দ কর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজী। প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, চকমানিক (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, ভজন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা তাপসপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দুর্গাপ্রাণাজী, ডঃ পূর্বা সেনগুপ্ত ও অধ্যাপিকা চিত্রলেখা গুপ্ত। এদিন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৫০টি বস্ত্র দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 'ইনার হুইল' গার্ডেনরিচ শাখার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবিরে ৩৫ জন মহিলার চিকিৎসা করেন ডাঃ সারদা রায়।

আগ্রা সারদামণি পল্লিমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মবিদানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক দিল্লেশ্বর বিশ্বাস। প্রায় ১৭৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সারদা পাঠচক্র, কল্যাণনগর (কলকাতা) ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০৫ বিশেষ পূজা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দীপক গুপ্ত। বৈকালিক অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও স্বামী শুকদেবানন্দজী। প্রায় ৩০০ ভক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ও প্রসাদ পান। এদিন ৪০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে বই, খাতা, পোশাক প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

রাজাপুর সেবানিকেতন, উলুবেড়িয়া (হাওড়া) ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন শিশির সাহা, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রভাত নিয়োগী।

কাটোয়া সারদা নারী সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০৫ বৈদিক মন্ত্র, শ্রীশ্রীচণ্ডী, পরমার্থ প্রসঙ্গ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা এবং কবিতা পাঠ, আগমনী গান, সমবেত সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সহযোগিতায় স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা তন্ময়প্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ

প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদিকা পার্বতী দাস। এদিন সঙ্ঘ-পরিচালিত ফ্রি কোচিং সেন্টারের ২০ জন ছাত্রীকে নতুন পোশাক প্রদান করা হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র, বেলঘরিয়া কলকাতা পুলিশ হাউসিং এস্টেট (কলকাতা-৫৬) ঃ গত ৫ অক্টোবর ২০০৫ বৈদিক মন্ত্র ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মসভা ও সেবাকাজ অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী ত্যাগিবরানন্দজী। এদিন ৩০ জন দুঃস্থ বিধবা ও ৫২ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বিশ্ব বিবেকতীর্থ, যাদবপুর (কলকাতা-৩২) ঃ গত ১০ অক্টোবর ২০০৫ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১৩০ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে নতুন পোশাক প্রদান করা হয়। গত ২৩ অক্টোবর বিজয়গড় বালিকা বিদ্যাপীঠে 'বিজয়া সম্মিলনী' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদিকা নিবেদিতা দাস।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া) ঃ গত ১০ অক্টোবর শ্রীশ্রীমায়ের পটে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ২০০ প্রতিবন্ধীকে সুগন্ধী সাবান ও তেল মাখিয়ে স্নান করানো, সিঁদুর ও চন্দনচর্চিত করে সাজানো, প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন-ভোজন, আরতি প্রভৃতির মাধ্যমে অভিনব সেবাপূজা ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এক প্রতিবন্ধী বালিকাকে সাজিয়ে 'কুমারীপূজা'ও করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী জিনানন্দজী। বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক কানাইলাল মাইতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। গত ১৫ অক্টোবর বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, হাইলাকান্দি (অসম) ঃ গত ১০-১২ অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনই ভক্তবৃন্দ বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে ১৭৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে নতুন শাড়ি ও ধুতি বিতরণ করা হয়। ১০ তারিখ সেবাসমিতির 'শিশু সঙ্ঘ' কর্তৃক গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কোচবিহার) ঃ গত ১০-১৩ অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৯ অক্টোবর দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে ৪৭৫টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সারদা রামকৃষ্ণ পাঠতীর্থ, সাঁতা (বর্ধমান) ঃ গত ৬ নভেম্বর ২০০৫ আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী দেবপ্রিয়ানন্দজী প্রমুখ। প্রায় ৫৭০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

বামনগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, কুলবেড়িয়া (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ৬ নভেম্বর ২০০৫ আলোচনা, ক্যুইজ প্রভৃতির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী প্রাণারামানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য। প্রায় ৩২৩ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সেবাব্রত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, বিশ্বনাথ চারালী (অসম) ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ বিশ্বনাথ মহকুমার মালিমারা, শগুনকাঠি অঞ্চলে বন্যায় পীড়িত শরণার্থীদের মধ্যে ২০০ প্যাকেট পাউরুটি ও ৪০০টি বস্ত্র বিতরণ এবং ৩০০ জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রদান করা হয়।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, বিজুর (বর্ধমান) ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ গলসী লায়ন্স আই হসপিটালের ব্যবস্থাপনায় চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১১০ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয় এবং ৫ জনের চোখে মাইক্রোসার্জারি করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর (হাওড়া) ঃ গত ৬ নভেম্বর ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং হিমাদ্রি মেমোরিয়াল ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে ৬১ জন রক্তদান করেন। স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ এবং দন্ত ও সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। শিবিরে মুম্বাই টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হসপিটালের প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আশিস মুখার্জি থ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সার সম্বন্ধে ভাষণ দেন ও রোগীদের পরীক্ষা করেন।

মনোস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ইমহার'

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত 'ইমহার' (ইনস্টিটিউট ফর মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন) একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। 'ইমহার'-এর সূচনালগ্ন ৩ নভেম্বর ১৯৯৯, ৪১সি বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে। মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সুগঠিত করে তাকে আলোর পথে যাত্রা করতে সাহায্য করাই এই সংস্থার প্রধান কাজ। রামকৃষ্ণ মঠ, বলরাম-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দজীর শুভেচ্ছা সম্বল করে গত বছর মহালয়ার পুণ্য

তিথিতে কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে 'ইমহার'-এর কর্মকাণ্ড স্থানান্তরিত হয়। স্বামী পূতানন্দজী সর্বসাধারণের উপযোগী করে বাঙলায় 'ইমহার'-এর নামকরণ করেন—'মনোস্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র'। স্বামী পূতানন্দজী তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ও মানুষকে ভালবাসার পথ ধরে মনোস্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র একদিন বটগাছের মতো বড় হবে ও মানসিক রোগে বিপন্ন বহু মানুষকে আশ্রয় দেবে।" উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্রের উপস্থিতি ও বক্তব্য সকলকে উৎসাহিত করে। 'ইমহার'-এর সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক-অধ্যাপক ডাঃ অশোক চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার বৈশিষ্ট্য শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরেন ও সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মনোরোগ ও মনোস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা, গবেষণা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান মনোরোগীকে সুস্থ ও উপযোগী সদস্য হিসাবে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে যেতে সাহায্য করে। এবিষয়ে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে আলোচনাচক্র, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে 'ইমহার'-এর 'সেলফ হেলপ গ্রুপ' তথা 'সৃজনী'র অবদান উল্লেখযোগ্য। 'সৃজনী' বিশ্বাস করে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব রয়েছে; তাই ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' বিসর্জন দিতে পারলে মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। মানসিক রোগে চিকিৎসাধীন মানুষজন প্রতি মাসের দুটি রবিবার 'সৃজনী' আয়োজিত সভায় যোগদান করে তাঁদের সুখ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা, অসুস্থতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একে অপরের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে বিনিময় করেন এবং নৃত্য-গীত-আবৃত্তি ও নানা শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতিভাকে মেলে ধরেন। জয়িতা সেনের নিঃস্বার্থ সেবা 'সৃজনী'র কাজকে পরিচালিত করছে। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী প্রদীপ পাইনের মাতৃ-সম প্রয়াস 'ইমহার'-এর পরিবারভুক্ত সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

সম্প্রতি কলকাতায় ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০০৫ জাতীয় মনোস্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত অনুষ্ঠানে ইস্রায়েল থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জোসেফ জোহার যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনি ভারতের তরফ থেকে ডাঃ ই. মোহনদাস এবং ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীর মতো বিশিষ্ট চিকিৎসক-সহ প্রায় তিনশো জন মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 'সৃজনী'র সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ 'লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ' শীর্ষক একটি উপজীব্য নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন, যা উপস্থিত প্রায় ৫০০ দর্শকের চিত্তকে হরণ করে নেয়। তাঁদের অনুষ্ঠান প্রমাণ করে দেয় 'from patienthood to personhood' কথাটির সার্থকতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ বার্তা "Stop exclusion, dare to care" স্মরণে রেখে 'ইমহার' যে-ভাববার্তা তাদের কাজের প্রেক্ষিতে সমাজে পৌঁছে দিতে চাইছে তা স্বামী বিবেকানন্দেরই অমোঘ নির্দেশ—"Stop not till the goal is reached."

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ঝাড়গ্রাম-নিবাসী নারায়ণচন্দ্র গুহ রায় গত ১৯ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ঝাড়গ্রাম-সেবায়তনের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। উদ্বোধন কার্যালয় ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার গাঙ্গুলিবাগান-নিবাসিনী নিভা দে গত ২২ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী গোপালচন্দ্র আচার্য গত ২৬ জুন ২০০৫ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ❑

ভ্রম-সংশোধন

গত আশ্বিন ১৪১২ সংখ্যার ৭১৬ পৃষ্ঠায় 'অ্যানটেনা সোর্ড'-এর যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, তার পরিবর্তে পাশের ছবিটি হবে।

গত আশ্বিন ১৪১২ সংখ্যার ৬৭৫ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীমায়ের কামারপুকুরে অবস্থানের তালিকায় ১ নম্বরে 'মে ১৯৫৯ থেকে মে ১৮৫৯'-এর পরিবর্তে 'মে ১৮৫৯ থেকে মে ১৮৫৯' হবে।

গত অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যার ৯৯৬ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ২১ পঙ্‌ক্তিতে '১০,০০০ টাকা'র পরিবর্তে '১,০০,০০০ টাকা' হবে।

গত অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যার ৯৯১ পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে সমালোচক 'ডঃ শ্রীজয় ভট্টাচার্য'-এর পরিবর্তে 'ডঃ জয় ভট্টাচার্য' হবে।

গত অগ্রহায়ণ ১৪১২ সংখ্যার ৯৭৫ পৃষ্ঠায় 'শব্দচেতনা-৫৩'-তে ওপর-নিচ (২০)-র পরিবর্তে (১৯) হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

১০৭ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে

দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

১০৭ তম বর্ষ

মাঘ ১৪১১ থেকে পৌষ ১৪১২

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৫

সম্পাদক

স্বামী সর্বগানন্দ

(মাঘ/জানুয়ারি—কার্তিক/অক্টোবর)

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

(অগ্রহায়ণ/নভেম্বর—পৌষ/ডিসেম্বর)

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ আশি টাকা ❑ সডাক ঃ একশো টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা ❑

❑ শারদীয়া সংখ্যা ঃ পঞ্চাশ টাকা ❑

৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড্ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উদ্বোধন

১০৭তম বর্ষ

মাঘ ১৪১১—পৌষ ১৪১২ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৫

বর্ষসূচি

দিব্য বাণী

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাষণ, আলোচনা ইত্যাদি

ইতিহাস, গবেষণা, অনুবাদ-সাহিত্য, সঙ্গীত, রম্যরচনা, শ্রদ্ধার্ঘ্য, ব্যক্তিত্ব, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি

ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র, পৌরাণিকী, চিরন্তনী কথা, শারদ অর্ঘ্য ইত্যাদি

স্মৃতিকথা, পরিক্রমা, মাতৃতীর্থপরিক্রমা ইত্যাদি

বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমাজদর্শন, ক্রীড়াজগৎ ইত্যাদি

কবিতা

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্ষ শুরু মাঘ (জানুয়ারি) মাস থেকে। প্রতিবছর 'শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করছি'—এই সন্তানোচিত মনোভাব নিয়ে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। মূল্যবান রচনা পাঠানোর জন্য লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র এবং সম্পাদনার কাজে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলির অনুবাদ করেছেন মূলত সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত। মুদ্রণের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রচ্ছদ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা করেছেন অরিসূদন দত্ত। সম্পাদনা ও অন্যান্য নানাভাবে সহায়তা করেছেন শিল্পী সুনীলকুমার পাল, রেণুপদ ঘোষ, অরূপরতন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা জানাই। সকলের সমবেত প্রয়াসে 'উদ্বোধন'-এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রচারও বেড়েছে যথেষ্ট। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২৪০ টাকা

[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ২৩৫০-১৭৫১

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

শ্রীমা সারদাদেবী

Supplier of Plants to Different Centres of Ramakrishna Math & Mission and all over India.

KAMAL NURSERY

P. O. Andul-Mouri
Howrah-711302
Phones : 2669-0698, 2669-1165

নিবেদন

কাশীদাসী মহাভারত ৩৫০.০০
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২৭০.০০
শ্রীমদ্ভাগবত ৩৬০.০০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ২০০.০০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২৬০.০০
পদ্যছন্দে গীতা ১০.০০
শ্রীমদ্ভগবতগীতা ৪৪.০০ (বোর্ড বাঁধাই)
শ্রীমদ্ভগবতগীতা ১৫০.০০ প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪৪.০০

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ও সাধক মহাপুরুষদের জীবনকথা ২৫০.০০
মেয়েদের ব্রতকথা ৩০.০০
বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি ৩২.০০

পদ্মাপুরাণ ১২০.০০
শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ২৪০.০০

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ প্রতিটি ১০০.০০
ঈশ, কেন, কঠ ১০০.০০

ছান্দোগ্যোপনিষদ ১ম
ছান্দোগ্যোপনিষদ ২য়
প্রতিটি ১০০ টাকা
তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড ২০.০০
ঐত্তিরীয় ১৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭
E-mail : devsahitya@caltiger.com

লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

পিতা ঃ ৺ডঃ মনোরঞ্জন বসু

মাতা ঃ ৺সাবিত্রী বসু

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের পরমারাধ্য পিতা ও পরমারাধ্যা মাতা শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁরা দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে স্থান পেয়ে চিরশান্তি লাভ করেছেন।

তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

পুত্র ঃ উৎসব বসু, পুত্রবধূ ঃ শর্বরী বসু
কন্যাগণ ঃ প্রতিমা গুহ, তপতী দত্ত, সুমিত্রা ঘোষাল, মালা গাঙ্গুলি
পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও জামাতাবৃন্দ
এবং অগণিত আত্মীয় ও সুহৃদগণ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের স্বভাবই তো নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এরগ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,** আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব),** বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়,** ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক,** ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনি, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  গুসকরা-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **ডঃ শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
  ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৬১২৩৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ,** সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ-৭১৩৪০৩
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  মেমারি কেন্দ্র, পারিজাত নগর
  মেমারি-৭১৩১৪৬, ফোন ঃ ০৩৪২২-২৬০৩৬২
- **মধ্যমগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাব আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ মধ্যমগ্রাম-৭১৩৪২২
  ফোন ঃ ০৩৪২-২৭১৬৩৯৫
- **দাঁইহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ**
  পোঃ দাঁইহাট-৭১৩৫০২, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৪৪১৬৭

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ**
  নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯
- **অজয়কুমার গাঙ্গুলি**
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ,** প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লি, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১

বিপণনকেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল,** কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল,** শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল,** হাওড়া রেলস্টেশন

রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর

ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭

একটি আবেদন

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপূজা করাকেই তিনি তাঁর জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

নির্মীয়মান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে—তাঁরই পূর্বপুরুষদের ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি।

অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শান্তির আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না।

সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ
অধ্যক্ষ

মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর"—এই নামে পাঠাবেন।

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়—তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

ধর্মের রহস্য তত্ত্বকথায় নয়—আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে চিৎকার করে—সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে—সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। **স্বামী বিবেকানন্দ**

There is no treasure equal to contentment and no virtue equal to fortitude.
SRI MA SARADA DEVI

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

☼

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

☼

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। মানুষকে ভালবাসলে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়। তার দুঃখ-কষ্ট থাকে না।

শ্রীমা সারদাদেবী

শুভাশিস পালিতের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
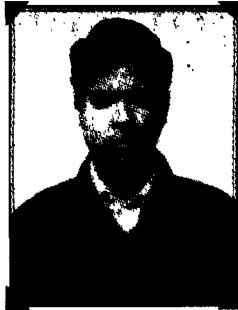
শুভাশিস পালিত

জন্ম—১২।১০।১৯৭২ মৃত্যু—২০।১২।২০০২

জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তোমার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বাবা, মা, দাদা, বৌদি, ভগিনীগণ ও ভগিনীপতিগণ

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর

হুগলি-৭১২৪২৪ ● ফোন ঃ (০৩২১২) ২৫৯-২৫০

একটি আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ (শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁর 'হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ' বলেছেন) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মভূমি ও শৈশবের লীলাক্ষেত্ররূপে হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।

এই গ্রামেই ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নয়জন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ধুনি জ্বালিয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য পদধূলিতে ধন্য এই আঁটপুর।

পরমপূজ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দুবার এখানে এসে গ্রামটিকে ধন্য করেছেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটায় দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপূজা শ্রীশ্রীমা দুর্গামণ্ডপে নিজে বসে থেকে পুনরায় চালু করেন। সেইসময়ই স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা'রূপে অভিহিত করেন।

রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমের চেষ্টায় বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক ভিটার অনতিদূরে তাঁর মাতুলালয় মিত্রবাটীতে (যেখানে বাবুরাম মহারাজের জন্ম হয়) শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর বিশেষ সমারোহে মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম অধিগৃহীত হয় এবং 'রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, বিনাব্যয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, স্থানীয় দরিদ্রদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজ চলছে।

কিন্তু আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থিত—(১) স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান মিত্রবাটীর মধ্যে মন্দির, (২) অন্যত্র অফিস এবং (৩) স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটা—যেখানে ধুনিমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এসে থাকতেন। এটিই বর্তমানে সাধুনিবাস।

আশ্রমটি তিনজায়গায় অবস্থানের ফলে এর পরিবেশ রক্ষা করা এবং আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে পুরো আশ্রমটিকে একই সীমানার মধ্যে আনা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য অন্ততপক্ষে দুই একরের মতো জমি, বাড়ি খরিদ করতে হবে।

এই কাজে ইতোমধ্যে আমরা কিছু জমি কিনেছি এবং আরো বাড়ি ও জমি কিনতে হবে। বর্তমানে এই কাজের জন্য ন্যূনতম **পঞ্চাশ লক্ষ** টাকা (আনুমানিক হিসাব) ব্যয় করতে হবে।

এই শুভ প্রকল্পে সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও প্রেমানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে সকলের মঙ্গল কামনা করি।

ভবদীয়
নিবেদক
স্বামী বরানন্দ
অধ্যক্ষ

এই প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
চেক/ড্রাফ্ট/মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর"—এই নামে পাঠাবেন।
U. B. I., Belur Math Branch, S.B. A/c. No. 57258